ভিটাচ্যুত

(গল্প)

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১

একতারা বাজিয়ে বাউল গান গেয়ে যায়—

হের গিরিরানী তোমার নন্দিনী

রাজরানী বেশে আসিছে।

তপন তখন জানালা খুলে চেয়ে থাকে পথের পানে। শরতের আকাশ আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে থাকে, কখনও কখনও সাদা মেঘগুলো তুলার টুকরার মত ভাসতে ভাসতে এসে আবার চ'লে যায়, তাদের আড়ালে প'ড়ে যায় চাঁদ সূর্য নক্ষত্রনিচয়। নীচে ধরার বুকে অপূর্ব সৌন্দর্যের বিকাশ, স্থলপদ্ম স্থল ও জলপদ্ম জল আলোকিত ক'রে ফেলেছে; নদ নদী জলে ভ'রে উঠেছে, গাছ, লতা, পাতা নূতন শোভায় ঝলমল করছে।

দূরে চৌধুরী বাড়ির প্রতিমা গড়া শেষ হয়ে গেছে, রং দেওয়া হচ্ছে। কাজেই সেখানে ছেলেমেয়ের ভিড় জমেছে বড় কম নয়। তাদের আনন্দপূর্ণ কলোচ্ছ্বাসে চারিদিক পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তপন মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকে।

কতকগুলি ছেলেমেয়ে পথের ধারে শিউলি ফুল গাছের তলায় শিউলি ফুল কুড়চ্ছে; কত ফুল পায়ের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে সেদিকে তাদের দৃষ্টিও নাই।

তপন ভাবছিল তার গতজীবনের কথা। এমনই সময় তারও ছিল, তারও জীবনে এসেছিল এই দিন। আজ কোথায় গেছে সে দিন, কোথায় মিশে গেছে কে জানে। সে ভাবে, যদি সে দিনটাকে সে মুহূর্তের জন্যও ফিরে পেত।

তপন জানালা বন্ধ ক'রে দেয়, আর তার এসব দেখতে ভাল লাগে না। নিজের গতজীবনের সঙ্গে এখনকার কথা মিলিয়ে সে নিজেই নিজের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। তার মনে হয়, মানুষের বেঁচে থাকাই ঝকমারি, এরকম-ভাবে বর্তমান থাকার চেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই ভাল।

শিশুদের সে আর সইতে পারে না, ওদের দেখলেই মনে হয় নিজের হারানো অতীত জীবনের কথা, শীর্ণকায় তপনের দুই চোখ জ্বলতে আরম্ভ করে।

তখনই আবার সে আগুন নিবে যায়,—তার চোখ সজল হয়ে ওঠে।—

কেন, কার জন্য সে সব হারাল, নিজের স্বাস্থ্য পর্যন্ত?

তপন শীর্ণ হাতে নিজের মাথা টিপে ধরে।

২

দিনের আলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে আসে। ধনী জমিদার চৌধুরী বাড়িতে বোধনের বাজনা বাজে।

তপন বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। আজ তাকে দেখে কেউ বলবে না, একদিন তারই স্বাস্থ্য ছিল অটুট সুন্দর, একদিন সে একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়ালে একশত লোক ভয়ে পালাত। আজ সে জীর্ণ, শীর্ণ, জেল হ'তে ফিরে এসে সে একেবারে উদ্যমহীন হয়ে পড়েছে।

দুই বছর আগে তার নাম গ্রামের লোক খুব বেশী রকমই করত, দুই বছরের মধ্যে সে একেবারে নিঃশেষ হয়ে মুছে গেছে। একদিন যাদের জন্য সে দাঁড়িয়েছিল, যাদের জন্য সে জেলে পর্যন্ত গিয়েছিল, আজ তারাও তাকে ভুলে গেছে।

সে যেন একটা দীপশিখা। যতক্ষণ সে জ্বলেছিল, ততক্ষণই ছিল তার সার্থকতা, তার আবশ্যকতা; যখনই সে নিবেছে, তখনই তার সকল আবশ্যক ফুরিয়ে গেছে। অন্ধকার এসেছে চারিদিক ঘিরে, আজ সেই অন্ধকারের পানে তাকিয়ে তপন শিউরে ওঠে, হাঁপিয়ে ওঠে; আর্তভাবে দুইটি শীর্ণ হাতে সেই জাল ছিঁড়তে চায়, কিন্তু জাল ছেঁড়ে না।

দিদি বলেন, "এমন ক'রে ঘরে দিনরাত প'ড়ে থাকিস নে তপন, গঙ্গার ধারে খানিকটা বেড়িয়ে আয়।"

দু দিন তপন গিয়েছিল। গঙ্গার ধারে যেসব জেলেরা কুটীর বেঁধে বাস করে, মাছ ধ'রে কোনও রকমে জীবিকা নির্ভর করে, তাদেরই জন্য তপন একদিন সংগ্রাম চালিয়েছিল এবং জেলে গিয়েছিল। আজ তাদের ঘরের সামনের পথ দিয়ে সে যায়, ওরা যেন তাকে চিনতেও পারে না।

তপন প্রথম আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, রাগ করেছিল; কিন্তু তার পর ভেবে দেখেছিল, এতে ওদের অপরাধ কিছুমাত্র নাই। শান্তি সুখে বাস করতে সবাই চায়, কেউ নিত্য অশান্তির মধ্যে থাকিতে চায় না। এরা সংসারী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বাস করে; এরা চায় না ধনী জমিদারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, অনর্থক অশান্তি কিনতে।

তপন যখন তাদের অবস্থা বুঝিয়ে তাদের জাগাতে চেয়েছিল, তারা একটা নূতন প্রেরণা সাময়িকভাবে পেয়েছিল এবং সেই ঝোঁকের বশেই তারা চলেছিল। তারা ভাবে নি—এর জন্য তাদিকে সইতে হবে উৎপীড়ন, অত্যাচার; সইতে হবে লাঞ্ছনা, অবমাননা। প্রবলের প্রবল পীড়নে দুর্বল অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এবং তার পরে তারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে প্রবলের শক্তিপাদমূলে বলিদান করেছিল।

ক্ষমতাদৃপ্ত চৌধুরীবাবু এইসব অস্পৃশ্যদের নেতা তপনকে এমনভাবে নানা অপরাধের অভিযোগে জড়িয়ে ফেলেছিলেন, যাতে সহজেই তাকে দুই বছরের মত জেলে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তপনের জন্য কেবল দুইটি মেয়ে ফেলেছিল দীর্ঘশ্বাস, মুছেছিল চোখের জল। একজন তপনের বিধবা দিদি, অপর জন চৌধুরীবাবুর একমাত্র মেয়ে, বীণা।

বীণার ছোটবেলাকার সাথী তপন। হয়তো একটা

ছিল একদিন এদের বিবাহ হবে; গ্রামের লোকেরাও তাই বলত। শিক্ষায়, সৌন্দর্যে, বংশমর্যাদায় তপন চৌধুরী বাড়ির জামাই হওয়ার অনুপযুক্ত ছিল না। হয়তো তপনও এ আশা করত। কিন্তু হ'ল না কিছুই। ভাগ্য তাকে বিপথে নিয়ে গেল, যাতে চৌধুরীবাবুই তার পরম শত্রু হয়ে উঠলেন এবং তপনকে যে কোনও রকমে জব্দ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

জেলে ব'সেই দিদির পত্রে তপন জানতে পেরেছে, বীণার বিবাহ হয়ে গেছে এবং জামাতা চৌধুরী বাড়ির উপযুক্ত।

তপন সেদিন একটু হেসেছিল।

জেল হ'তে ফিরে এসে এক সময় নিজের বাক্স খুলে তলায় যে শুকনো ফুলের মালাটা পড়েছিল, সেটা নিঃশব্দে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছিল।

৩

দিদি ভাইয়ের শীর্ণ দেহটার পানে চান, তাঁর চোখ জলে ভরে ওঠে। বলেন, "একবার কলকাতায় গিয়ে ভাল ডাক্তার একটা দেখিয়ে আয় তপন, এমন ক'রে ভুগবি?"

তপন হাসে। সংসারের অবস্থা তো জানাই আছে। জমিদারের বিরুদ্ধাচরণের ভয়ে যে জমিগুলো ভাগে বন্দোবস্ত করা ছিল, সেগুলো আর কেউ চাষ করতে চায় না, ফলে জমিজমা এমনি প'ড়ে আছে। দিদির গায়ের গহনা প্রায়ই এক একখানা বিক্রি করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করানো তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব, দিদিও তা জানেন, তবুও বলেন ও কথা।

তপন বলে, "ডাক্তার দেখাবার কোনও দরকার হবে না দিদি, তোমার হাতের রান্না দু দিন খেলেই ভাল হয়ে যাব।"

সেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল মধু দাসের সঙ্গে; প্রকাণ্ড বড় একটা মাছ নিয়ে সে জমিদার বাড়ি চলেছে। এই মধু দাসের উপর নির্যাতন নিয়েই তপন দাঁড়িয়েছিল। জাতিতে সে চাঁড়াল, অস্পৃশ্য।

সে নাকি অন্যায় দাবি করেছিল স্পৃশ্যদের সঙ্গে সমান অধিকার পাবার এবং এই আবদার সে সব জায়গায় চালাতে গিয়েছিল। চৌধুরীবাবু প্রথমে তাকে ডেকে সাবধান ক'রে দেন, কিন্তু তপন তার পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে উৎসাহিত করে।

সে বুঝাতে চেষ্টা করে স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্য সকলেরই সমান দাবি আছে। সাধারণের কাছ হ'তে চাঁদা নিয়ে যে দুর্গাপূজাটি প্রত্যেক বছর গ্রামে হয়, সে পূজার অঞ্জলি দেওয়ার অধিকার হিন্দুমাত্রেরই আছে, হোক না সে চাঁড়াল, মালো, হাড়ী বা বাগদী। কেন একজন মন্দিরে উঠতে পাবে, একজন পাবে না? পয়সা যখন সবারই সমান, পূজার অধিকারও সবারই সমান থাকবে।

এই নিয়েই বেধেছিল দলাদলি, মারামারি। শেষ পর্যন্ত গ্রামে পুলিস আসতে বাধ্য হয়েছিল।

এর মধ্যে রাজনৈতিক কথাটা যে কেমন ক'রে উঠল, তা আজ বুঝতে পেরেছে, সেদিন বোঝে নি। নিজেকে দান ক'রে সে যে এই গরিবদের বাঁচিয়েছে, এইটুকু সার্থকতাই তপন আজ বোঝে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যথাটাও তার বুকে জাগে, যাদের জন্য সে এত কষ্ট সইলে, তারা তাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেল। অদ্ভুত মানুষের প্রকৃতি।

মাছ হাতে মধু দাসকে দেখে তপন বুঝেছিল, সে কোথায় যাচ্ছে, তবু জিজ্ঞাসা করল,—"কোথা যাওয়া হচ্ছে মধু?"

একেবারে তপনের সামনাসামনি মধু দাস এর মধ্যে আর কোনও দিনই আসে নি। মানুষের মনের মধ্যে যে বিবেক আছে, সে কষাঘাত ক'রেই থাকে, তাকে কেউ কোনও দিন গলা টিপে মারতে পারে না। এই বিবেকই মধু দাসকে তপনের চোখের সমুখ হ'তে গোপন ক'রে রাখত।

তপন জিজ্ঞাসা করলে, "মাছ কোথায় চলেছে মধু, বিক্রি না ভেট?"

মধু দাস থতমত খেয়ে দাঁড়াল, হঠাৎ সে উত্তর দিতে পারলে না। তপন আবার জিজ্ঞাসা করলে, "চৌধুরী বাড়ি চলেছ বোধ হয়?"

মধু একটু হাসতে গেল, তাতে তার মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল মাত্র; বললে, "ওঁরা জমিদার লোক, বাড়িতে লোক এসেছে কিনা, তাই আজ সকালেই জমিদারবাবু বলে পাঠিয়েছিলেন, যদি বড় মাছ পাওয়া যায়, তা হলে—"

তপন একটু হাসলে; বললে, "অনুরোধ না আদেশ?"

মধু দাস মনে মনে চটেছিল, কারণ তার দুর্বলতার দিকটা ধরা পড়ে গেছে। দুর্বলতা ধরা পড়লে অতি শান্ত মানুষও সময় সময় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং অপরের উপর রাগ বা নির্যাতন ক'রে তার ক্ষোভ মেটাতে চায়। মধু দাস উত্তর না দিয়ে মাছ নিয়ে স'রে পড়ল, ক্লান্ত তপন ঘরের মধ্যে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সে হিসাব করে, কত দিন আগে বীণার সঙ্গে তার শেষ দেখা হয়েছিল; বীণা তাকে দিয়েছিল নিজের হাতে গাঁথা ফুলের মালা; তখনও তপন চৌধুরীবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি। বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দরকারও হ'ত না, যদি চৌধুরীবাবু তার কথায় কান দিতেন। তাঁর জামাতা হওয়ার সুযোগ নিয়ে তপন যে চৌধুরীবাবুকে এখনই চোখ রাঙাতে এসেছে, এই কথা ব'লে সেদিন তিনি তাকে অপমান করেছিলেন এবং সেই অপমানের কথা আজও তপন ভুলতে পারে নি।

তার পর মনে পড়ে বীণার তাচ্ছিল্যের কথা; সে তপনের সঙ্গে আর দেখা করে নি এবং শোনা যায় তার বিরুদ্ধে অনেক কথাও বলেছে।

নিদারুণ প্রত্যাখ্যান। অথচ একদিন এই বীণাই দরিদ্রদের দুঃখে বিচলিত হওয়ার প্রেরণা তার মনে জাগিয়েছিল, দেশের দুর্নীতি দূর করতে উৎসাহিত করেছিল।

তপন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। অন্তর্হিত শক্তি, আজ একবার পূর্ণোদ্যমে জেগে ওঠে, দেশলাইএর কাঠির জ্বলায় যেটুকু সার্থকতা আছে, তপন সেই সার্থকতাটুকু লাভ

কর্ক—অন্ততঃপক্ষে একটুখানির জন্যও সে সফল হ'ক, সে ধন্য হ'ক।

(৪)

চৌধুরীমশাই ডেকে পাঠিয়েছেন। লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার সঙ্গেই তপনকে যেতে হবে, দেরি করলে চলবে না, এখনই দরকার।

উৎকণ্ঠিত দিদি বললেন, "এই শরীর নিয়ে তুই যাবি কি ক'রে তপন?"

তপন বললে, "না পারলেও অন্ততঃপক্ষে চেষ্টাও তো করতে হবে দিদি।"

"চেষ্টা করতে হবে।" দিদি রাগ করলেন, "কেন, কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছিস তুই যে, নিজের এরকম শরীর নিয়েও তোকে যেতে হবে, আমি বলছি যেতে হবে না, এতে চৌধুরীমশাই যা ইচ্ছা হয় করুক, না হয় আবার পলিস নিয়ে আসুক, জোর করে নিয়ে যাক, হুকুমে নয়।"

দিদির দৃঢ়তাপূর্ণ মুখের পানে চেয়ে অকস্মাৎ তপনের দুটি চোখ জলে ভ'রে উঠল। জগতে আজ তার কেউ নাই, আছেন কেবল দিদি, বার বার কেবল এই কথাটিই তার মনে হ'তে লাগল।

জেলে যাওয়ার আগে সে বীণার চোখের জল দেখেছিল; জেল হ'তে ফিরে সে বীণার ভিন্ন ব্যবহার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মানুষ যে এমন ক'রে বদলাতে পারে, এ ধারণা সে আগে কোনও দিন করতে পারে নি। বিশেষ, যদি কেউ কাউকে কোনওদিন ভালবেসে থাকে, সে যে তার বিরুদ্ধে কখনও দাঁড়াতে পারে, এ কল্পনাও সে করতে পারে নি।

তবু সে জোর ক'রে হেসেছিল। মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, মানুষ মানুষ ছাড়া নয়, বীণারও যে পরিবর্তন হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। যাদের স্বপক্ষে একদিন সে দাঁড়িয়েছিল, তারাও তো কেউ তার দিকে দাঁড়াল না, কেউ তার হয়ে একটা কথা বললে না; আজ তারাই হয়েছে তার বিপক্ষ এবং পারলে তারা তার সর্বনাশ করতেও প্রস্তুত।

সেদিনকার মাছের কথাটা মধু দাস যে চৌধুরীমশায়ের কানে তুলেছে, তাতে তপনের এতটুকু সন্দেহ ছিল না এবং সেই ব্যাপার নিয়েই যে তিনি তাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন, তাও সে জানে।

এর পরই জমিদারের একখানা পত্র নিয়ে তাঁরই কাছারির হালসানা এসে উপস্থিত হ'ল। জমিদার জানিয়েছেন, কয়েক বৎসরের খাজনা বাকী পড়েছে, তা ছাড়া বাড়ির সংলগ্ন বাগান ও পুষ্করিণী তাঁর কাছে তিন বৎসরের জন্য বন্ধক ছিল, সে তিন বৎসর অতীত হয়ে যায়, তিনি টাকা চান, না পেলে বাধ্য হয়ে তাঁকে নালিশ করতে হবে।

তপন পত্রখানা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। দায়ে প'ড়ে বাগান পুষ্করিণী বন্ধক রাখতে হয়েছে জমিদারের কাছেই। দিদির আশা ছিল তপনের সঙ্গে বীণার বিবাহ হবে এবং এগুলি তিনি জামাতাকে যৌতুক দেবেন। শুষ্কমুখে দিদি বললেন, "উপায়?"

রুগ্ন তপন একটু হেসে বললে, "দুঃখ কেন দিদি, সব যায়, গাছতলা তো আছে।"

দিদি চোখের জল ফেললেন।

জমিদার নালিশ করলেন। কিন্তু এর জন্যে নালিশ করবার দরকার ছিল না, তপন নিজেই সব ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'ল। পাড়ার লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে সে যাবে কোথায়, থাকবে কোন্‌খানে, খাবেই বা কি? তপন পথ দেখিয়ে দিলে, শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলে, "পিতৃপুরুষের ভিটে রাখার যোগ্যতা আমার নেই। নিজের জন্যে আমার দুঃখ নেই, কারণ আমি বেশ জানি, আমি বেশী দিন বাঁচব না; শুধু ভাবছি আমার দিদির জন্যে। দেখি কোনও সহজ পথ পাওয়া যায় কি না।"

সাত দিন সময় ছিল, এ সাত দিন তপন এই ভিটেতেই কাটিয়ে যাবে, সম্পূর্ণ ক'রে একে উপভোগ ক'রে নেবে। ভিটের মায়া যে এত বেশী, তা তপন এতদিন জানতে পারে নি, আজ যাবার বেলায় তার মনে যতখানি বেদনা জেগে উঠেছিল, তার কল্পনাও সে কোনওদিন করে নি। সাত-পুরুষের ভিটে আজ লক্ষ বাঁধন দিয়ে তাকে বাঁধতে চায়; বহু দিনের লক্ষ স্মৃতি মনে জাগিয়ে তোলে।

বিধবা দিদি কেবল কাঁদেন; তাঁর চোখের জলে অঞ্চল ভিজে ওঠে। সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা তপন খুঁজে পায় না।

মনে হয়, যারা আজ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তাদেরই জন্য সে জমিদারের কাছে সব বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়েছিল, আজ তাদের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক ফুরিয়ে গেছে। ওই মধু দাস সেদিন ছিল কঠিন বেয়ারামে শয্যাগত, ডাক্তার ডাকা বা ঔষধ আনার ক্ষমতা তার ছিল না। টাকা খরচ ক'রে নিজে ডাক্তার ডেকে, ঔষধ কিনে এনে, অপর্যাপ্ত সেবা ক'রে এই তপনই না তাকে সেদিন বাঁচিয়েছিল? সুরেন মালোর ঘরখানা হঠাৎ পুড়ে গেলে, সেই না তাকে ঘর তোলবার টাকা দিয়েছিল, তাই না আজ সুরেন মালো স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখে বাস করছে?

তপনের চোখ বুজে আসে, ক্লান্তদেহে সে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে ডাক দেয়, "দিদি—"

দিদি এসে দাঁড়াল। তপন চোখ বুজে বলে, "বুকটা হঠাৎ কি রকম ধড়ফড় করছে দিদি, একটু হাত বুলিয়ে দাও।"

দিদি ত্রস্তভাবে তার পাশে ব'সে বুকে হাত বুলান, উদ্বেগ পরিপূর্ণ কণ্ঠে বলেন, "আজ আবার ভাবতে শুরু করেছিস বুঝি?"

তপন শুধু হাসে। ভাবনা তার সাথী, তাকে ত্যাগ করা চলে না; সে তপনকে পেয়ে বসেছে।

(৫)

গভীর রাত্রি।

আকাশে কালো মেঘ সেজে এসেছে, পৃথিবীর বুকে জমাট বাঁধা অন্ধকার ছড়িয়ে দিয়েছে।

আজ সকাল থেকেই তপনের বুকে কিরকম একটা

যন্ত্রণা হচ্ছিল, দিদিকে সে কথা সে জানায় নি; অনর্থক তিনি ভয় পেয়ে যাবেন। বিছানায় শোবার পর হ'তে যন্ত্রণাটা অত্যন্ত বেশীরকম ধরায় সে অজ্ঞানের মত পড়েছিল। দিদি পাশের কামরায় ঘুমিয়েছেন, তপনের কষ্টের কথা তিনি জানেন না।

গভীর রাত্রে হঠাৎ যেন তপনের জ্ঞান ফিরে এল, কে যেন তার কাছে ব'সে। "দিদি—"

তপন ডাকলে। নারীমূর্ত্তি কাছে এগিয়ে এল, মুখখানা তার কানের কাছে এনে চাপা সুরে বললে, "চুপ কর, চেঁচিও না, আমি দিদি নই, আমি বীণা।"

"বীণা!"

তপন নির্বাক হয়ে গেল, বীণা আগেকার মতই চাপাসুরে বললে, "হ্যাঁ, আমি বীণা।"

"তুমি—তুমি এসেছ? বীণা—"

তপন উঠতে গেল, বুকে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হওয়ায় একটা অস্পষ্ট শব্দ ক'রে সে আবার শুয়ে পড়ল।

"আলোটা একটু বাড়িয়ে দাও বীণা, লণ্ঠনের অত কম আলোয় আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি নে।"

বীণা বললে, "না, ওইরকম কম করাই থাক, আলোয় আমি নিজেকে প্রকাশ করব না ব'লেই রাত্রির অন্ধকারে গা ঢেকে এসেছি।"

তপন জিজ্ঞাসা করলে, "হঠাৎ কি মনে ক'রে এসেছ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? চার বছর যে আমার প্রকাশ্য শত্রুতা ক'রে আসছে, আজ চলে যাওয়ার মুহূর্তে সে কি করতে আমার কাছে এসেছে সে কথা জিজ্ঞাসা করাটা বোধ হয় অশোভন হবে না।"

বীণা ক্ষণকাল নীরব রইল, তারপর শান্ত কণ্ঠেই বললে, "কাল তোমরা চলে যাবে শুনে আজ আমি দেখা করতে এসেছি।"

তপন একটা হালকা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "অসম্ভব দয়া তোমার, জান—এতখানি দয়ার পাত্র আমি নই; জান—যদি শক্তি সামর্থ থাকত, আজও আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতুম!"

বীণা উত্তর দিলে, "জানি।"

তপন বললে, "জেনেও তবু এসেছ?"

বীণা বললে, "এসেছি কারণ আমি চাই—তুমি ভাল হয়ে ওঠ, মানুষ হয়ে যুদ্ধ কর। সামান্য এই টাকার জন্যে তোমাকে ভিটেচ্যুত হতে হবে আমি তা চাইনে, আমি চাই তুমি তোমার বাড়িতে থাক, মানুষের মত দাঁড়াও।"

স্বল্পান্ধকারের মধ্যে দারুণ যন্ত্রণা সত্ত্বেও তপন হাসলে, বললে, "জান, টাকা কালকের মধ্যে দেওয়ার দিন, না দিতে পারলে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমায় বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। টাকা তো বড় কম নয়, অথচ আমার একটি পয়সা নেই, দিদির গহনা বিক্রি ক'রে কোনও রকমে খাওয়া চলছে, চিকিৎসা পর্যন্ত হতে পারে নি। এ সময় তোমার এসব কথা আমার কাছে পরিহাস বলেই মনে হচ্ছে বীণা।"

বীণা দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "আমি পরিহাস করতে আসি নি, তোমার দেনা শোধ করবার মত টাকা আমি এনেছি। কাল তুমি এ টাকা জমা দিতে পারবে, তখন বাবার ক্ষমতা টিকবে না যে তিনি তোমায় ভিটেচ্যুত করতে পারেন।"

এক তাড়া নোট সে তপনের হাতের মধ্যে দিলে, বললে, "জানি তোমার আত্মমর্যাদাজ্ঞান খুব বেশী, তুমি কখনও কারও কাছ থেকে কিছু নাও নি, তাই তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি এ টাকা আমার বাবার নয়, স্বামীর নয়, এ টাকা আমার নিজের গহনা বিক্রির টাকা। আমি কলকাতায় থাকতে খবর পেয়েছি। আমার নিজের গহনা বিক্রি ক'রে টাকা নিয়ে কাল আমি এখানে এসেছি; কেন এসেছি তা আমার স্বামী বা বাবা কেউ জানেন না। আমি কাল ভোরের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে যাব, ওখান থেকে শুনতে পাব তুমি তোমার বাড়িতে থাকতে পেয়েছ। তোমার দেনা শোধ করেও এতে আরও টাকা থাকবে যাতে তোমার চিকিৎসা চলতে পারবে; তুমি আবার মানুষ হ'তে পারবে।"

তপন দুই হাতে বুকখানা চেপে ধরল, ভারী যন্ত্রণা হচ্ছিল। একটু সামলে নিয়ে সে রুদ্ধকণ্ঠে ডাকল, "বীণা—"

বীণা উঠে দাঁড়িয়েছিল, বললে, "আর কোন কথা নয়, আমি চ'লে যাচ্ছি। এই রাতের অন্ধকারেই আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। তুমি চিকিৎসা ক'রো, তুমি মানুষ হয়ো। আমি দূর হতে তোমার কথা শুনব। হয়তো কোনওদিন তোমার বিরুদ্ধে আমিও দাঁড়াব, তোমার বিরুদ্ধে কথা বলবার দিন আমাকে দয়া ক'রে দিও, তার আগে যেন পৃথিবী হতে মুছে যেয়ো না।"

তপন অভিভূতের মত পড়েছিল, তার জ্ঞান যেন আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে আসছিল, চোখে সে দেখতে পাচ্ছিল শুধু অন্ধকার যাতে এতটুকু আলোর রেখা পর্যন্ত নাই। মাথার মধ্যে শুধু ঝিম ঝিম শব্দ করছিল, কানে বাইরের কোনও শব্দ আসছিল না।

স্বপ্নের মত মনে হল, কে যেন তার কপালের উপর ঝুঁকে পড়ল, কার এতটুকু ওষ্ঠের স্পর্শ তার কপালে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ফোঁটা গরম চোখের জল ঝ'রে পড়ল তার কপালে।

ঘর স্তব্ধ।

"দিদি, দিদি—"

দিদি ঘুম থেকে ধড়ফড় ক'রে উঠে বসলেন। পাশের কামরা হ'তে গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছুটে এসে আলোটাকে উজ্জ্বল ক'রে দিয়ে তিনি দেখলেন—তপন গোঁ গোঁ করছে; তার মুখের দুই পাশ দিয়ে টাটকা লাল রক্তধারা গড়িয়ে পড়ে বালিশটা লাল ক'রে দিয়েছে। তার চোখ দুইটি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, সে চোখে পলক নাই। হাতের মধ্যে এক তাড়া নোট এখনও ধ'রে আছে, কতকগুলো ছড়িয়ে পড়েছে।

"তপন, ভাই!"

(শেষাংশ ১৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সজীবতার পরিমাপ

শ্রীসুধীরকুমার বসু

লর্ড কেলভিন বলিয়াছিলেন, কোনও বিষয়কেই প্রকৃত-পক্ষে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, যে পর্যন্ত না পরিমাপ প্রণালীর বিবিধ ব্যবস্থা ঐ বিষয়ে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়। বস্তুত বিজ্ঞান যতই পূর্ণতা লাভ করে, গণিতশাস্ত্রের বিবিধ 'ফরমুলা' বা সূত্র দ্বারা ততই তাকে ধরা সহজ হইয়া উঠে। এই হিসাবে কিন্তু জীব-বিজ্ঞান আজও পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। যদিও বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ইহার বিভিন্ন বিভাগে অসামান্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং জীবনধারার বহুতর ব্যাখ্যা নিখুঁতভাবেই ইহা জনসমাজে পরিবেশন করিয়াছে, তথাপি জীবনের পরিমাণবাচক দিকটা আজও তত সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। তুমি বাঁচিয়া আছ; কিন্তু কতটুকু বাঁচিয়া আছ. তোমার প্রাণশক্তির পরিমাণ কত, এক বৎসর পূর্বেই বা তোমার জীবনশক্তি কি ছিল, আজিকার জীবনেই বা তাহার কতটুকু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এ সবের উত্তর কিন্তু আজ পর্যন্ত সন্তোষজনকভাবে জীব-বিজ্ঞান হইতে পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

আপাতদৃষ্টিতে এ সব প্রশ্নের কোন মূল্য নাই বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু জীবিতের জীবনধারা সম্যক্ বুঝিতে হইলে এ প্রশ্নগুলির সমাধান হওয়াও প্রয়োজন। যে লোক যক্ষ্মায় ভুগিতে ভুগিতে মরিতে বসিয়াছে, একজন সুস্থ ব্যক্তির তুলনায় সে যে কম 'সজীব', তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। যে নিজ মনোবেদনায় হাহুতাশে সংসারের এক কোণে পড়িয়া দিনাতিপাত করিতেছে, তাহার চেয়ে যে ব্যক্তি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া সংগ্রাম করিতেছে, তাহার প্রাণশক্তি যে নিশ্চয়ই বেশী, তাহাও সুস্পষ্ট। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে সজীবতার পার্থক্য কতটুকু, তাহা বর্তমানে আমরা বলিতে পারিতেছি না। জীবিতের এই প্রাণশক্তির বা সজীবতার পরিমাপ করিতে হইলে আমাদের প্রথমেই পরিমাপের কতকগুলি 'মান' স্থির করিয়া লইতে হইবে।

কোনও শুকনো বীজ মাটিতে পুতিলে কিছুকাল পরে তাহা হইতে বিরাট মহীরুহের উৎপত্তি হয়। শুধু বীজ দেখিয়া কিন্তু বুঝিবার উপায় থাকে না, কোনটি মৃত, কোনটিই বা জীবন্ত। বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইলে পর আমরা বুঝিতে পারি যে, উহা সজীব ছিল। বীজ হইতে যখন চারা বাহির হইয়া আসে, তখন বীজ মরিয়া যায় বটে, কিন্তু পশ্চাতে রাখিয়া যায় ফলফুলে শোভিত বিরাট মহীরুহ। পূর্বেই বলিয়াছি, বীজ দেখিয়া উহা মৃত কি প্রাণবন্ত, তাহা বলা কঠিন। কোন্‌টি পুতিলে ভাল গাছ হইবে, কোন্ বীজটি হইতে মোটেই চারা জন্মিবে না, তাহা জানা যেমন শক্ত, তেমনি একটি বীজ হইতে অপর একটি বীজ কতটা অধিকতর জীবন্ত, তাহাও বলা সহজ নহে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক পরলোকগত ওআলির বীজের প্রাণশক্তির পরিমাপ করিবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি অতি সূক্ষ্ম এক তড়িৎ পরিমাপক যন্ত্র 'গ্যালভেনোমিটার'-এর সঙ্গে কৌশলে বীজগুলির যোগাযোগ সাধন করিয়া দিলেন। 'লীডেন জার' হইতে প্রবহমান বিদ্যুচ্ছটার বিদ্যুৎ যেমন বীজগুলিকে উত্তেজিত করিতে লাগিল সেই উত্তেজনার মুখে যে বীজ যতটুকু সাড়া দিল, তাহাই সূক্ষ্ম গ্যালভেনোমিটার-এ ধরা পড়িল। অধ্যাপক ওআলির এক বৎসর হইতে পাঁচ বৎসরের পুরানো বীজ লইয়া এ ভাবে পরীক্ষা করিয়া যে ফল পাইলেন, তাহা অনেকটা এইরূপঃ—

বীজের বয়স	তড়িৎ-পরিমাণ
১ বৎসর	০·০১৭০
২ "	০·০০৫০
৩ "	০·০০৪৩
৪ "	০·০০৩৬
৫ "	০·০০১৪

উপরোক্ত ফল হইতে যে তত্ত্ব প্রকাশ পাইল, তাহা হইতে আমরা আজ বলিতে পারি যে, এক বছরের বীজ পাঁচ বৎসরের পুরাতন বীজ হইতে বার গুণ অধিকতর সজীব। চারি বৎসরের পুরাতন বীজ এক বৎসরের বীজ হইতে কমপক্ষে ৪·৭২ গুণ কম 'জীবন্ত'।

উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে এই পরিমাপ যত সহজে সম্ভবপর হইয়াছে, প্রাণিজীবনের পক্ষে কিন্তু তাহা নির্ণয় করা তত সহজ নহে। কারণ প্রাণিদেহের স্বাভাবিক গঠন-বৈচিত্র্যে এরূপ পরীক্ষার জটিলতা বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমেই প্রশ্ন হইবে, প্রাণ-শক্তির পরিমাপ করিবার কালে সমগ্র দেহের শক্তিরই পরিমাপ করা হইবে কিংবা বিশেষ কোনও প্রত্যঙ্গ বা তন্মধ্যস্থ 'টিসুর' পরীক্ষা দ্বারাই ইহা বিচার করা সুবিধা হইবে। সমগ্র প্রাণিদেহের সজীবতা বিচার করিতে হইলে তাই বহুবিধ বিষয়ে পরিমাপ প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া ওঠে।

প্রথমত, দেহে যে পরিমাণ তাপের সঞ্চার হয় বা যে পরিমাণ তাপ দেহ হইতে নির্গত হয়, উহা এরূপ পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইতে পারে। প্রতি ঘণ্টায় দেহের উপরিভাগ হইতে যে পরিমাণ তাপ বাহির হইয়া যায়, তাহা 'ক্যালরি'তে (calorie) প্রকাশ করা যাইতে পারে। পরিমাপ করিয়া দেখা গিয়াছে, পূর্ণবয়স্ক কোনও পুরুষের দেহ হইতে প্রতি

ঘণ্টায় প্রত্যেক বর্গ মিটার পরিমিত দেহাংশ হইতে বিশ্রাম সময়ে যে তাপ বহির্গত হয়, তাহার পরিমাণ ৪০ ক্যালরি। অনুরূপ অবস্থায় মেয়েদের দেহ হইতে যে তাপ নির্গত হয়, তাহা ৩৭ ক্যালরি হইবে। প্রাণতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন, মানুষের দেহাভ্যন্তরে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলে, নারীদেহের তুলনায় পুরুষের দেহে তাহা অধিকতর দ্রুত সংঘটিত হইয়া থাকে।

সমগ্র দেহের কথা ছাড়িয়া দিয়া শরীরের বিশেষ কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরীক্ষা হইতেও সজীবতার একটা আন্দাজ করা যাইতে পারে। দৃষ্টিশক্তির পরিমাপও এ বিষয়ে কম সাহায্য করে না! চোখের পশ্চাতে একান্ত সংক্ষোভ্য (sensitive) যে একটা রেটিনা বিরাজ করিতেছে, আমাদের দ্রষ্টব্য পদার্থগুলির প্রতিবিম্ব তাহার উপর সুস্পষ্টভাবে পড়িলেই শুধু উহা আমরা ভালরূপে দেখিতে পাই। এইরূপ প্রতিবিম্ব গঠন নির্ভর করে আবার চক্ষু-মধ্যস্থ স্থিতিস্থাপক গুণ সম্পন্ন স্ফটিকাকৃতি এক লেন্সের উপরে। বিশেষ একটি গোলাকৃতি মাংসপেশীর সঞ্চালনে উহা কাজ করিয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত লেন্সের স্থিতিস্থাপকতা কমিয়া আসে। ফলে, মাংশপেশীর ঐরূপ ফোকাস করার ক্ষমতারও হ্রাস হয়। সুতরাং বিশেষ একটা বয়সে লেন্সের স্থিতিস্থাপকতা ও উহার সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীর কর্মক্ষমতার যদি আমরা পরিমাপ করিতে পারি, তাহা হইলেও ঐ বয়সের আগে বা পরে উহাদের শক্তি যেরূপ দাঁড়াইবে, তাহার সহিত তুলনা করা সহজ হইয়া পড়ে। লেন্সের প্রতিসরণ ক্ষমতার (refractive power) পরিমাপ করিয়া দেখা গিয়াছে, ষাট বৎসর বয়সে কোনও ব্যক্তির লেন্সের যে শক্তি থাকে, সত্তর বৎসর বয়সে তাহারই ক্ষমতা একচতুর্থাংশ হইবে মাত্র।

নার্ভের অবস্থা হইতেও প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। প্রাণিদেহে কোনরূপ আঘাত লাগিলে নার্ভ-সমূহের ভিতর দিয়া উহারা যেরূপ গতিবেগে প্রবাহিত হয়, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারিলে, এই বিষয়ে সাহায্য হইতে পারে। অবশ্য সমস্ত প্রাণিদেহে সমভাবে 'নার্ভ-ইমপাল্‌স' প্রবাহিত হয় না, যদিও প্রত্যেক প্রাণীরই তাহার পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিবার যোগ্যতা পরিলক্ষিত হয়। অতি নিম্নস্তরের প্রাণীদের সহিত তুলনায় মানুষের নার্ভের শক্তি যে কত অধিক, বিভিন্ন প্রাণিদেহে 'নার্ভ-ইমপাল্‌স্‌'-এর নিম্নলিখিত হার হইতে তাহা বুঝা যাইবে।—

	প্রতি সেকেণ্ডে
কাঁকড়া	০·৪০ মিটার
গলদা চিংড়ি	১২·০০ „
সাপ	১৪·০০ „
বেঙ	২৮·০০ „
মানুষ	১২০·০০ „

মানুষের নার্ভের শক্তি কাঁকড়া বা টিকটিকি হইতে যে কত বেশী, উপরোক্ত তালিকায় তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষীণজীবী মানুষের সহিত তাই আমরা অনেক সময় 'টিকটিকির প্রাণ'এর তুলনা করিয়া থাকি।

জীবন ধারণের নিমিত্ত অক্সিজেন গ্যাস একান্ত প্রয়োজনীয়। শরীরের বিভিন্ন তন্তুগুলি যত অধিক সতেজ বা সক্রিয় হয় ততই ইহারা অধিক পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করে। সুতরাং প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদের পরিমাণ নির্ণয় করিয়াও জীবনের পরিমাণবাচক দিকটার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন। বিশেষ কোনও মাংসপেশী কতটা পরিমাণ অক্সিজেন শোষণ করে, এই পরীক্ষায় তাহাই পরিমাপ করিয়া দেখা যাইতে পারে। মাংসপেশীর অবস্থা অনুযায়ী এই পরিমাপের তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। কর্মরত কোনও মাংসপেশী প্রতি মিনিটে যে পরিমাণে অক্সিজেন শোষণ করিবে, কর্মহীন অবস্থায় সেই মাংসপেশীই ততটা করিতে পারিবে না। মাংসপেশীর বিভিন্ন অবস্থা হইতে তাই অনেক সময় সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিংবা মাংসপেশীর গতি স্বভাবত অলস দেখা গিয়াছে, জীবের মৃত্যু সংঘটিত হইলেও দেহের ঐসব অংশের সজীবতা কিছুকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। প্রাণিদেহের বহু অঙ্গ তাই মৃত্যুর পরেও কম বা বেশী সময় সজীব থাকে বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন প্রাণিদেহের মাংসপেশীর সঞ্চালনের মধ্যেও আবার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ইহাও সজীবতার পরিমাণ নির্ণয়ে সাহায্য করিতে পারে। কচ্ছপ-দেহের মাংসপেশীগুলির সংকোচন ও প্রসারণে যে সময় লাগে তাহার সহিত তুলনায় একটি বোলতার ডানার পেশী সঞ্চালনের সময়ের যদি তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে শেষোক্ত জীবের পেশীগুলি কচ্ছপের পেশীর তুলনায় প্রায় দুই শত গুণ অধিক দ্রুত কাজ করিয়া থাকে। জীবনের সহিত গতিবেগের যোগাযোগ তাই স্বতই আমাদের নজরে পড়ে। Fast life, slow life বলিয়া যে কথাগলির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মধ্যেও একটা বৈজ্ঞানিক পরিমাপের আভাস পাওয়া যায়। বিশেষ একটি সীমার বাহিরে গতিবেগ সহ্য করা প্রকৃতির রেওয়াজ নহে। তাই সহসা অতি সুউচ্চ শব্দের ঝংকারে আমাদের কর্ণকুহরে প্রচণ্ড আঘাত অনুভূত হয়। বিশেষ জোরে ছুটিলে তাহার জোর সহ্য করাও দুরূহ হইয়া উঠে। আমাদের প্রতি অঙ্গের কাজের সীমাও তাই প্রকৃতি অনেকটা এমনিভাবে বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, উহা অবহেলা করিলে জীবনীশক্তির ক্ষয় অনিবার্য।

জীবিতের দেহে যে হারে অক্সিজেনের দহনকার্য (oxidation) প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয় সেই হারই প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনীশক্তি বা সজীবতা পরিমাণজ্ঞাপক বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। অক্সিজেনের শোষণের সহিত জীববিশেষের দৈহিক কার্য-ক্ষমতার নিকট সম্বন্ধ বর্তমান। পরিমাপ করিয়া দেখা গিয়াছে, ঘোড়া যখন বিশ্রাম করে, তখন প্রতি মিনিটে সে ১·৬ লিটার (১ লিটার ১০০০ ঘন সেণ্টিমিটার) অক্সিজেন টানিয়া লইতে পারে। হাঁটিয়া বেড়াইলে সে ৪·৭ লিটার

অক্সিজেন এবং দৌড়াইলে ৮ লিটার অক্সিজেন গ্রহণ করে। সুতরাং অক্সিজেনের পরিমাণ তাহার মাংসপেশীর কার্যক্ষমতারও পরিচায়ক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

কোনও কর্মকারের যখন খুব গনগনে আগুনের দরকার হয়, সে তখন কিছু কাল অত্যন্ত জোরের সহিত হাপর চালাইতে থাকে। হাওয়ার সংযোগে আগুন যতদূর সম্ভব উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সজীবতার সম্পূর্ণ পরিমাপও অনুরূপভাবেই পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রটিকে যতদূর সম্ভব চালনা করিয়া যেই পরিমাণে আমরা আমাদের শরীরের বিভিন্ন তন্তুগুলিকে অক্সিজেন গ্রহণ করাইতে ও ব্যবহৃত অক্সিজেনকে বর্জন করাইতে পারি, সেই পরিমাণে আমাদের দৈহিক সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহার জীবনীশক্তি কমিয়া আসিয়াছে, তাহারও তুলনা আমরা কর্মকারের হাপরের মধ্যেই পাইতে পারি। হাপর চালানো বন্ধ হইলে অঙ্গারগুলি যেরূপে নিষ্প্রভ হইয়া যায় ও ধিকিধিকি জ্বলিতে থাকে, জীবনীশক্তির পাথেয় সঞ্চয়ের পথ বন্ধ হইলে মানুষের সজীবতাও তেমনি কমিয়া আসে।

সজীবতার পরিমাপ সঠিকভাবে নির্ণয় করা এখন পর্যন্ত সম্ভবপর হইয়া না উঠিলেও আমরা আমাদের সাধারণ কথাবার্তায় এরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, যাহা দ্বারা সঠিকভাবে না বুঝাইলেও পরিমাপের ভাবই প্রকাশ পাইয়া থাকে। 'অমুকের vitality বেশী নাই, রোগীর vitality (প্রাণশক্তি) বড় কম', এ ধরনের কথায় সজীবতার পরিমাপের আন্দাজ করারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। তবে বিজ্ঞানের যুগে এরূপ পরিমাপে আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। আমরা যতটুকু সজীব, তার সঠিক পরিমাপ জানিতে পারিলে জীবনযুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করার অনেক সুবিধা হইতে পারে। নিজের প্রাণশক্তির পরিমাপ না জানিয়া কাজে নামিলেও পরিণামে পরাজয়ের পদে পদে সম্ভাবনা থাকে।

বিপদে পড়িলে বন্ধুবান্ধবেরা মৌখিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। কে কতটুকু সত্যিকার দুঃখিত হন, তাহা পরিমাপের কোনও সুবিধা না থাকায়, কাহার মনোভাবে কতটুকু আন্তরিকতা আছে, তাহাও বুঝা শক্ত হয়। মানুষের জীবন নানাপ্রকার সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে যেভাবে আলোড়িত হয়, তাহাতে এ সমস্তের পরিমাপ করার ব্যবস্থা হইলে জীবনের বহু রহস্য হয়তো সুস্পষ্ট হইতে পারিত।

ভিটাচ্যুত

(১৩০ পৃষ্ঠার পর)

আহত হরিণীর মত দিদি তার বুকের উপর লুটিয়ে পড়লেন।

পরদিন। বাড়ি দখল করতে লোক এসেছে, টাকা দেওয়ার সময় পার হয়ে গেছে।

নিস্তব্ধ বাড়ি, জনমানবের সাড়া নাই। এঘর ওঘর দেখতে দেখতে তারা একটা ঘরের দরজার কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। বিছানায় পড়ে আছে তপনের মৃতদেহ, তার বুকের উপর মূর্ছিতা দিদি, যিনি মায়ের মত করে দেড় বছর বয়স থেকে তপনকে মানুষ করেছিলেন। বিছানার উপরে ঘরের মেঝেয় রাশীকৃত নোট ছড়ানো পড়ে আছে।

কলকাতায় স্বামীর আলয়ে প্রসাধনরতা বীণা তখন ভাবছিল, ঋণমুক্ত তপনের মুখখানা এতক্ষণ প্রশান্ত হাসিতে পূর্ণ হয়ে গেছে, সে নিশ্চয় এতক্ষণ নিজের ভিটে ফিরে পেয়েছে।

মানুষের ঘর

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীহাসিরাশি দেবী

সুদুর বড় সাধের, বড় আদরের একমাত্র ছেলে মানিক, হৃদয় মানিক। তার বিয়ে দিয়ে যে সে ঘর আলো করা বউ আর সিন্দুক ভরা টাকার তোড়া সাজিয়ে আনতে একান্ত ইচ্ছুক, এতে আর বৈচিত্র্য কি, বিস্ময়ই বা কিসের। তাই সে দিকে দিকে খবর পাঠাল ছেলের বিয়ে দেবার। সম্বন্ধও আসতে লাগল একে একে, কনে দেখাও চলতে লাগল ঘন ঘন. কিন্তু কোনওটাই যেন সদুর মনে ধরছিল না। ছেলে তার ময়ূর ছাড়া কার্তিক বললেও চলে। যেমন চেহারা, তেমনি স্বাস্থ্য; আর অবস্থাই বা কি এমন মন্দ! এতে সে সর্বাঙ্গ সুন্দরী বউ আনবার কল্পনা করবে না কেন?

কিন্তু মনের সব কথা সে সাহস ক'রে মানিকের কাছে প্রকাশ করতে পারে না; বলতে গিয়েও থেমে যায়, মনে হয় মানিকের মুখখানা যেন সর্বদাই কেমন একটা বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন, দৃষ্টিও যেন উদাস। অথচ বয়স তার এমন কিছু বেশী নয় যার জন্যে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত, অভাব-অভিযোগের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তার উৎসাহ হ'বে ব্যাহত, আনন্দ হবে ম্লান। তবে তার এই ঔদাস্য, এই নির্বিকার ভাবের অর্থ কি? সদু মনে মনে ভেবে কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পারে না। একবার মনে হয়, ওর শরীরটা বোধ হয় তেমন ভাল নেই, ভাতও বোধ হয় তাই তেমন পেট ভ'রে খেতে পারে না। শরীর খারাপ হওয়ার দরুন মুখের রুচি পালটে গেছে মনে ক'রে সদু এটা ওটা রাঁধে বাড়ে, মানিকের ভাতের পাতে সাজিয়েও দেয়। কিন্তু মানিক তেমনি নিরুত্তর; যেন তার কারও কাছে কোনও বিষয়ে কিছু নালিশ নেই, আবদার নেই, কোনও বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলে হাসিমুখে তার উত্তর দেয়; যেমন আগেও দিত।

সদু ভেবে কিছুই পায় না; তাই ছেলের কল্যাণের জন্য মানসিক করে নানা দেবতার কাছে, নানাভাবে। কিন্তু তবু যেন কেমন একটা সন্দেহের জটিলতার মধ্যে সে দোল খায়; মাঝে মাঝে মনে হয়, তার এত সাবধানতার মধ্যেও কোথায় যেন কি একটা ভুল, একটা সমান্য ত্রুটি মস্ত হয়ে মানিককে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলছে তার সুখের স্বর্গের কল্পনা থেকে। তার কল্পনা—মানিকের বউ আসবে; ছোট্ট রাঙা টুকটুকে বউ; যাকে সস্নেহে তিরস্কার করা চলে, কোনও সংকোচের দরকার হয় না। তার পর সে বড় হবে, এই গৃহের গৃহিণী হবে, তার হাতের কাজ সাজানো থাকবে পর পর; তার সন্তানেরা সদুকে ঘিরে বায়নার উপর বায়না করবে, অস্থির করবে, উদ্ব্যস্ত করবে।

সে কি আনন্দ! এত দিনের দীর্ঘ জীবনে সদু যার স্বপ্ন দেখেছে, এইবার তার সফল হবার পালা। কিন্তু মানিক। হঠাৎ একটা কথা সদুর মনে হ'ল। মানিকের এই মানসতার মূলে বিপিনের মেয়েটা নেই তো? কিন্তু সে তো খুব সুন্দরী নয়।

নিস্তব্ধ রাত্রে সংসারের খাওয়া দাওয়া, কাজকর্ম চুকিয়ে সদু বিছানায় ব'সে এই কথাগুলো মনে মনে আলোচনা করছিল। সামনের জানালা খোলা, তারই মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে রাত্রের অন্ধকার আকাশ, আর তার মধ্যে অসংখ্য নক্ষত্র। সৌদামিনীর মনে পড়তে লাগল গত জীবনের এমনি অনেকগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির কথা। এমনই নিস্তব্ধ রাত্রি, এমনই নক্ষত্রময় আকাশ, আর এই ঘর। কত দিন, কত দিন তার জীবনে কেটেছে; কত দিন তার শিয়রের মাটির প্রদীপ ধীরে ধীরে নিবে গেছে তন্দ্রাচ্ছন্নতার অবসরে। কানে এসেছে বিপিনের কণ্ঠস্বর।—'জীবনে আমার ওই একমাত্র বন্ধন, ওই আদু। হাতে ক'রে ওকে মানুষ করেছি, তাই শুধু ওই একমাত্র আকর্ষণ আমার এই সংসারে। তাই ভাবছি কি করব ওর ভবিষ্যতের জন্যে, কি করলে পরে আমাকে আর আফসোস করতে হবে না!'

সদু উত্তর দেয় নি তখন সে কথার। কিন্তু আজ সে উত্তর দিতে পারে; বলতে পারে, অসীমের কল্পনা সীমাতে আবদ্ধ হয় তখন, যখন তার নিজের সত্তা, আত্মানুভূতি তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে। বিপিন হয়তো একদিন ভেবেছিল মেয়ের বিয়ে দিয়েই সে একদিন তার কর্তব্য চুকিয়ে দেবে। কিন্তু তা হ'ল না; মেয়ের বিয়ের বয়েস হ'লেও তাকে অন্যের হাতে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে সে শঙ্কিত হ'চ্ছে এই ভেবে যে, তার সংসারের উপর যতটুকু আকর্ষণই থাক, সেটুকু পাছে শিথিল হ'য়ে পড়ে, পাছে বা খুলে যায়; মেয়ের কল্যাণ কামনায় নয়।

কথাটা একদিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে প্রকাশ করলে অন্নদার কাছে। কিন্তু অন্নদা তার কোনও জবাব দিলে না, যেমন নিজের মনে তরকারি কুটছিল, তেমনি কুটতে লাগল। সদু আবার বললে, "আদুর বয়স কত হবে ঠাকুরঝি?"

"এই পনেরয় পা দিলে বোধ হয়।"

"পনেরো?" চোখে মুখে আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে সদু বললে; "অমন বয়সের কত আগে আমাদের বিয়ে থাও হয়ে গেছে, শ্বশুর ঘরেও এসেছি সংসার করতে। সতের বছর বয়েসে মানিক আমার কোলে এসেছে, আর এই ফাল্গুনে মানিকের বয়েস আমার এক কুড়ি দু বছর হবে।"

অন্নদা বললে, "বিয়ে তো আমারও হয়েছিল, তবে অত বয়সে নয়।"

"বয়েস বলে বয়েস, একেবারেই বিয়ের বয়েস পেরিয়ে যাওয়া! আজকাল একঘরে করবার লোক নেই গাঁয়ে, তাই, নইলে অ্যাদ্দিন ক'বে একঘরে হ'তে হ'ত আদুর বাপকে,

এই ব'লে রাখলাম ঠাকুরঝি। আর এই বে না দেওয়ায় মেয়ের ভালও কিছু হচ্ছে না, তা ব'লে রাখলাম। বরঞ্চ মন্দই হচ্ছে এতে মেয়ের।"

অন্ন উপেক্ষা ভরে একবার মুখ বিকৃত করলে; বললে, "কে জানে বাপু, কার মনে কি আছে!"

হাতের কাজ সে তাড়াতাড়িই ক'রে যেতে লাগল; সদুও বিদায় নিলে আর দু-চারটে সদুপদেশ দিয়ে। বেলা বেড়ে উঠল; অন্নও উঠে পড়ল কাজ সেরে।

পরের দিন ভোরে একটা ঘটনা তাকে চঞ্চল ক'রে তুলল; দরজা খুলেই সে দেখলে সামনের বারান্দায় ব'সে আদু। গভীর পরিশ্রম আর চিন্তায় ওর মুখ চোখ ম্লান, শ্রান্তিতে যেন সব দেহ মন ভেঙ্গে পড়েছে ধীরে ধীরে! আদুর চোখ লাল, মুখ শুকনো, পায়ের হাঁটু পর্যন্ত ধূলিমলিন।

অন্ন নীরবে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল। নিজের চোখকেও সে যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না, তাই দুই হাতে চোখ রগড়ে জিজ্ঞাসা করলে, আদু যে?"

আদু উত্তর দিল; "হ্যাঁ, আমিই।" একটু থেমে বললে, ওখান থেকে চ'লে এলাম পিসী, থাকতে আর ভাল লাগল না।"

"কিন্তু একা?"

কথাটা অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ ক'রে অন্নদা চোখের পলক ফেলে আবার আদুর দিকে তাকাল; আদু এবার আর মুখ তুলে তাকাতে পারলে না; কেমন একটা সংকোচে তার মাথাটা নুয়ে পড়ল বুকের উপর, চোখের পাতা বুজে এল ধীরে ধীরে। অন্নদা বললে, "উঠে হাতে মুখে জল দিয়ে ঘরে যা আদু, বাইরে এমন করে বসে থাকতে নেই। "আর একটা কথা—", গলার স্বর খাদে নামিয়ে অন্নদা বললে; "আর একা যে এখানে এসেছিস, এ কথা যেন কাউকে বলিস নে, বলিস, কারও সঙ্গে গাড়ি ক'রে এসেছিস, নইলে লোকে নিন্দে করবে।"

কথাটা আদু কান পেতে শুনল, কিন্তু উঠবার কোনও লক্ষণই প্রকাশ করলে না। অন্ন আবার ডাকলে, "আদু,"

আদু উঠল; শিথিল পায়ে ঘরে ঢুকে অনেক দিন আগের যে তক্তাপোশে বিছানা পেতে শুত, সেই তক্তাপোশের উপরেই উবুড় হয়ে পড়ল; যেন অনেক দিনের জমাট বাঁধা কান্নার বাঁধ খুলে দিতে, প্রাণ ভ'রে কাঁদতে। চোখের জল সে অনেক দিন ফেলতে পারে নি; তাই যে জল ছিল চোখের কোলে, সে জল আস্তে আস্তে জমাট বেঁধেছে তার বুকের মধ্যে। আদু তক্তাপোশের উপর গুটিয়ে রাখা ছেঁড়া কাপড়ে অন্নর সযত্নরচিত কাঁথা আর রংচটা বালিশের উপর উবুড় হয়ে প'ড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

অন্নদা তখন বিপিনের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকছিল, "দাদা, ও দাদা—"

বিপিন ঘুমুচ্ছিল; ডাকের ওপর ডাক শুনে ঘুমটা পাতলা হয়ে আসতে উত্তর দিলে, "কেন?"

"আদু বাড়ি এসেছে যে।"

"আদু? এসেছে?"

বিপিনের ঘুমের ঘোর একমুহূর্তে টুটে যেতেই সে বিছানার উপর উঠে বসল তাড়াতাড়ি। বললে, "আদু বাড়ি এল কেন হঠাৎ? কার সঙ্গে?—"

অন্নদা ম্লান মুখে জবাব দিলে, "হ্যাঁ, আদুই বাড়ি এসেছে বটে, কেন এসেছে তা জানি নে। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

বিস্ফারিত চোখে বিপিন তাকাল অন্নদার দিকে। অন্নদা হঠাৎ কোনও কথা বলতে পারলে না; তার বুক কেমন যেন একটা আশঙ্কায় ঢিপ ঢিপ করছিল, অই সত্য কথাটা আর যার কাছেই চাপবার চেষ্টা করুক, আদুর সব চেয়ে হিতাকাঙ্ক্ষী বিপিনের কাছে চাপতে পারলে না, বললে, "কিন্তু সে একাই এসেছে।"

"একা?"

বিপিন যেন থেমে গেল কথা বলতে বলতে। তার পর উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। "কই কোথায় সে?"

"ওই হোথা।"

আঙুল বাড়িয়ে অন্নদা যে ঘর দেখিয়ে দিলে বিপিন সেই ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখলে তক্তাপোশের উপর চুপ ক'রে ব'সে আছে; মুখ তার আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর। বিপিন প্রশ্ন করলে,—"কিছু না জানিয়েই হঠাৎ চ'লে এলি যে? সঙ্গেও কেউ একবার এসে পেঁ'ছে দিয়ে গেল না! সরোজও এল না সঙ্গে?"

আদুর মুখখানা ছাইএর মত সাদা হয়ে উঠল; কে যেন তাকে ছোরা মেরেছে! একটু চুপ ক'রে থেকে সে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বিপিন তার এ কান্নার অর্থ বিশেষ কিছু বুঝতে পারলে না। তবু কেমন যেন একটা আঘাত খেয়ে সে খানিকক্ষণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল; তার পর এগিয়ে এসে আদুর মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলে। বললে, "ভাবনা কি রে, আমি তো এখনও বেঁচে আছি। তোর আসবার আগে একখানা চিঠি লিখে জানালি নে কেন?"

আদু কোনও উত্তর দিলে না, নীরবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বিপিনের বুকটা আজ যেন অনেক দিন পরে মৃত পত্নীর জন্য কাতরে উঠল, চোখ দুটোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন আরও তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল অদৃশ্য শারদা ও সরোজের উদ্দেশ্যে। হাত দুখানা তার একটু একটু কাঁপতে লাগল। আদুর অসংযত চুলগুলো সস্নেহে গুছিয়ে দিতে দিতে সে যেন অনুভব করল, সে চ'লে আসবার পরে যে কয়দিন গেছে সেই কয়দিনের মধ্যে সে যেন অনেকখানি রোগা, অনেকখানি শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। ক্রমে বিপিনের সেই রুক্ষ দৃষ্টি কোমল ও সজল হয়ে উঠল; বললে, "আদু, কেউ তোকে কিছু বলেছিল?"

আদু মাথা নাড়লে; বললে, "না।"

"তবে?"

"কিছু হয় নি।" চোখ মুছে আদু জানালে।

বিপিন আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না; ধীরে ধীরে আদুর মাথায় হাত বুলতে লাগল পরম সান্ত্বনার মত। আদুও কথা বললে না, চুপ ক'রে চোখ বুজে অনুভব করলে বিপিনের হাত দুখানা থেকে থেকে কাঁপছে।

দু ফোঁটা গরম জলের স্পর্শও অনুভব করলে চুলের মধ্যে; কিন্তু বিস্মিত হ'ল না, আগ্রহও হ'ল না তার কারণ জানবার জন্য। যেন অনেক দিন পরে সে একটা পরম সান্ত্বনার স্থল খুঁজে পেয়েছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেবার মত। একটা দীর্ঘশ্বাস ওর সমস্ত বুকখানা কাঁপিয়ে সকালের ঠান্ডা হাওয়ায় মিশে গেল।

বিপিন বুঝলে, সে তার সবল বাহুর বন্ধনের মধ্যে ঘিরে রেখে চারিদিক থেকে মেয়েকে রক্ষা করলেও যে আঘাত সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বুকে নিয়ে তার কাছে ফিরে এসেছে সে আঘাত দেবার মূলে রয়েছে সে নিজে। সে যদি আদুকে নিয়ে শারদার বাড়ী না যেত, সেখানে তাকে না রাখত, সরোজের সঙ্গে না মিশতে দিত তা হলে এ আঘাত তাকে সইতে হ'ত না।

বিপিনের চোখ দুটো আর একবার জ্বালা করে উঠলো। প্রতিঘাত সে ভালরকমেই দিতে জানে; মানুষকে একেবারে না মেরে কি করে যে তিলে তিলে মারতে হয় সে প্রণালী তার নখাগ্রে। কিন্তু মাঝখানে রয়েছে আদু। আদুর শুকনো মুখ আর সজল চোখের কল্পনাও তার পক্ষে মৃত্যু যন্ত্রণার মত; কি করে সে তা দিনের পর দিন সহ্য করবে? না, সে তা পারে না, কিছুতেই পারে না। কিন্তু তবু তাকে শক্ত হ'তে হবে, কর্তব্য তার সামনে; আদুর সজল চোখ যেন সে কর্তব্যকে বিস্মৃত না করে।

বিপিন আস্তে আস্তে হাত দুটো আদুর উঠিয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ালো। "বেলা হল আদু, হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাও গে যাও।" বলতে বলতে সে ঘর ছেড়ে বার হয়ে পড়ল।

তার এরকম ব্যবহারে আদু একটু বিস্মিত হলেও কোনও কথা বললে না। বসেও রইল না; উঠে চিরদিনের অভ্যাস মত ঘাটে চলল কাপড় কাচতে; যেমন সে আগে যেত। যাবার সময় দেখলে অন্ন এর মধ্যে উনুনে কাঠ দিয়ে গরমজল চড়িয়েছে। আদুকে ঘাটে যেতে দেখে বললে, "একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস আদু, চায়ের জল চড়িয়েছি, এখুনি ফুটে উঠবে হয়তো; কিন্তু চা তো আমি করতে জানি নে।"

আদু বললে, "আমি আসছি এখুনি, তুমি জ্বাল দাও পিসী।"

মাজা কলসীটা কাঁখে নিয়ে তাড়াতাড়ি পা ফেলে সে অদৃশ্য হল সেখান থেকে।

(ক্রমশ)

প্রত্যাশা

শ্রীআশা চক্রবর্তী

কুঞ্জদুয়ার আলোকিত করি'
আসিবে না প্রিয়তম?
নিবিয়াছে দীপ শ্রাবণের বায়ে
আসিছে আঁধার জীবনে ঘনায়ে
উতল ধারায় ঝরিছে বাদল
পরাণ আকুল মম,
হেন রজনীতে আসিবে না তুমি
ওগো মম প্রিয়তম?

কতকাল আমি রহিয়াছি জাগি'
জানো অন্তরযামি,
যত আলো ছিল, নিবিয়াছে সব
হইয়াছে শেষ যত উৎসব
থামিয়াছে গীতি নিরাশার মাঝে
কাঁদিয়া অন্ধ আমি,—
নয়নের আলো, দেবতা আমার
আসিবে না আজি স্বামি!

রাজার দুহিতা চলে অভিসারে
এমনি কাজল রাতে
অতীতের সেই সাহসিকা নারী
চ'লেছিল পথে, লাজ ভয় ছাড়ি'
মেঘে ঢাকা পথ পার হ'য়ে যায়
কেহ তো ছিল না সাথে,—
দয়িতের ডাকে ছুটিয়াছে রাধা
সেদিন এমনি রাতে।

হইয়াছে শেষ, সে যুগের আজি
রহিয়াছে শুধু সুর,
জাগে হৃদি মাঝে সে-সুর মাধুরী
আভাসে তাহার হিয়া ওঠে ভরি'
আকুল পরাণ ডাকে দেবতায়
মনে হয়, কতদূর?
এমন রাতেও পিতম্ আমার
রহিবে কি বহু দূর?

কাজল মেঘের সজল ধারায়
জুড়াও তাপিত চিত,
এ গভীর রাতে মেঘ-গরজনে
অতীতের কথা জাগিতেছে মনে
বিরহী বিশ্ব কাঁদিয়া ফিরিছে—
কোথা ওগো মরমিয়া
কুঞ্জদুয়ারে রহিয়াছি জাগি'
আসিবে না মোহনিয়া?

রঞ্জাবতী

শ্রীবলাই দেবশর্মা

বাঙলার যে একটা বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ স্বভাব ধর্ম আছে, তাহা বঙ্গের বাহিঃপ্রকৃতিকেই কেবল শ্যামল সজল করে নাই, বাঙলার অন্তঃপ্রকৃতিকেও এক বিশেষরূপে রূপায়িত করিয়াছে। তাই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ কিংবা শংকরের মায়াবাদ বঙ্গভুবনে আসিয়া "গোবিন্দভাষ্য"র মধ্যদিয়া লীলারসে সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। শাণ্ডিল্য বা নারদের ভক্তিসূত্র এখানে স্নেহ, সখ্য, মধুর প্রভৃতি রসে লীলায়িত। যে বৌদ্ধবাদ সমগ্র ভারতের গণচিত্তকে নব ধর্মভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, বঙ্গের বৌদ্ধবাদ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উহা মহাবল হীনবল বা সহজ বল নহে, বঙ্গের বৌদ্ধবাদ—ধর্ম ঠাকুরের পূজা।

খৃষ্টীয় দশম শতকে দক্ষিণ রাঢ়ে ধর্ম ঠাকুরের পূজার উদ্ভব। ধর্ম পূজার যিনি প্রবর্তক, তাঁহার নাম রামাই পণ্ডিত। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের সহিত আর একজনের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে, তিনি লাউশেন জননী রঞ্জাবতী! ধর্ম পূজা প্রবর্তনের যে-সকল ইতিহাস আছে, সেই ধর্ম মঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীন মঙ্গল গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, মর্তালোকে ধর্ম ঠাকুরের পূজা প্রচারের জন্য রঞ্জাবতীর জন্ম।

'ধর্ম মঙ্গলের অন্যতম লেখক মানিক গাঙ্গুলি রঞ্জার জন্ম পালায় লিখিয়াছেন, নিরঞ্জন ঠাকুর আপনার পূজা প্রচারের জন্য একদিন সুর সভা মাঝে উপস্থিত হইয়া অদ্ভুত বেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সভায় তিলোত্তমা, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি দেব-নর্তকী উপস্থিত। কিন্তু রম্ভাবতী নাম্নী অপ্সরা নিরঞ্জনের নৃত্য দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাতে ধর্ম ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া রম্ভাকে মর্ত্যে জন্মগ্রহণের জন্য অভিশাপ দিলেন।

রম্ভাবতী নিরঞ্জনের অভিশাপে ভীত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, পৃথিবীতে গিয়া পূজার প্রকাশ কর। এবং ইহাও বলিয়া দিলেন, বাহুড়ায় বেণু রায় নামে এক ধর্মশীল রাজা আছেন, তাঁহার পত্নীর নাম বিমলা, বিমলার গর্ভে রঞ্জাবতী নাম লইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিবে।

রঞ্জাবতীর ধর্ম প্রচারের কাহিনী সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে নিরঞ্জন বা ধর্ম ঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। 'শূন্য পুরাণে' ধর্মকে নিরঞ্জন বলা হইয়াছে। ধর্মের ধ্যানের উপসংহারে বলা হইয়াছে, নিরঞ্জনায় নমঃ। এই নিরঞ্জনই আবার ধর্ম।—

ধর্মশীলা নামে তাহা ব্যাপিল ব্রহ্মাণ্ড। মানিক গাঙ্গুলি তাঁহার 'ধর্ম মঙ্গল'এ নিরঞ্জন এবং ধর্ম উভয় শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন।—

মার্কণ্ডেয় মুনি তথা ধর্ম পূজা করে।

ধর্ম পূজা বিধানে ধর্ম ঠাকুরকে নিরঞ্জনও বলা হইয়াছে, আবার ধর্মও বলা হইয়াছে—ধর্মরাজ নমোঽস্তু তে। এই ধর্মরাজ শূন্য মূর্তি। ঐ ধর্ম পূজা বিধানেই দেখিতে পাওয়া যায়।—

পূজি শ্রীনৈরাকার॥
শূন্যে মূর্তি ধ্যান করি।

ধর্ম ঠাকুরের পূজার বহুলপ্রচার; অন্তত প্রকাশ্য প্রচার রঞ্জাবতী হইতেই হইয়াছিল। এই ধর্ম প্রবর্তনার অতিলৌকিক কাহিনী যাহাই হউক, বর্তমান দিনে তাহা বিশ্বাস্য বা অবিশ্বাস্যই হউক, রঞ্জাবতীই সর্বপ্রথম এই অভিনব ধর্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন; ইহা ইতিহাসসিদ্ধ।

এখন রঞ্জার জীবন কথা আলোচনা করা যাউক। রঞ্জাবতী বেণু রায়ের কন্যা, তাঁহার মাতার নাম বিমলা। বেণু রায়ের বাস-ভূমি ছিল বাহুড়ায়। তিনি গৌড়েশ্বর মহীপালের একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন। বাহুড়ার অবস্থান ভূমি ভল্লুকা নদের উৎপত্তি স্থানের নিকট। উহা দক্ষিণ রাঢ়ে অবস্থিত।

রঞ্জাবতী রাজা বেণু রায়ের সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান। রাজা ও রানীর মৃত্যুর পর রঞ্জা ও তাহার অগ্রজ মাহুদ্যা গৌড়েশ্বরের আশ্রয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রঞ্জার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত মহীপালের বিবাহ হইয়াছিল। রঞ্জাবতী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সম্রাট্ মহীপাল অন্যতম সামন্ত রাজা কর্ণ সেনের সহিত তাঁহাকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিলেন।

রাজা কর্ণ সেনের কোনও সন্তানাদি না হওয়ায় দম্পতিযুগল নানা ব্রতব্রত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। তখন সামোলা নাম্নী এক প্রবীণা নারী রাজাকে ধর্ম পূজা করিবার পরামর্শ দিলেন। সামোলার উক্তি এইরূপঃ—

প্রধান পুরুষ পূর্ণ প্রভু ধর্মরাজ।
সেবিলে তাঁহার পদ সিদ্ধ হয় কাজ॥
আর লভে চতুর্বর্গ অন্য ফল কতি।
নির্ধন ধনাঢ্য হয় বন্ধ্যা পুত্রবতী॥
অন্ধ কুষ্ঠ আদি করি ব্যাধি উপচয়।
সকল ঘুচয়ে ধর্ম হইলে সদয়॥

ইহার পর সামোলা ধর্ম পূজার ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। এই ইতিবৃত্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে, মার্কণ্ডেয় মুনি বল্লুকার তীরে ধর্ম পূজা করিতেন। তাহার পর করিতেন রামাই পণ্ডিত। ইনি লাউ সেনের সমসাময়িক। এবং ইনিই তৎকালীন সমাজে ধর্ম পূজার প্রবর্তক। রঞ্জাবতী রামাই পণ্ডিতের নিকট ধর্ম দীক্ষা লইয়া সর্বপ্রথম ধর্ম পূজা করেন। তৎপূর্বে মার্কণ্ডেয় মুনি যে ধর্মপূজা করিয়াছিলেন, তাহা অতিলৌকিক ও অনৈতি-হাসিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়।

ময়ূরভট্টের 'ধর্মমঙ্গল'এ রঞ্জার ধর্ম দীক্ষার বিশেষ বিবরণ আছে। পরবর্তীকালের মানিক গাঙ্গুলি রঞ্জার ধর্মপূজার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এইরূপ।—ধর্ম ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্তির জন্য রঞ্জাবতী 'শালে ভর' দিয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে নিরঞ্জন রঞ্জার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির বর দান করিলেন এবং অনুরোধ করিলেন।—

মনোরথ সিদ্ধতো হইল বাছা তোর।
মায়ে পোয়ে পূজার প্রকাশ কর মোর॥

নিরঞ্জনের আদেশ পাইয়া—

যে আজ্ঞা বলিয়া রঞ্জা জোড়করে কয়।
প্রকাশ করিব পূজা যে রূপেতে হয়॥

এই ঘটনার ঐতিহাসিকতা যাহাই থাকুক, রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা বিধান জাত ইহাই সর্বপ্রথম ধর্মপূজা। তৎপূর্বে প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম ঠাকুরের পূজার আর কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। ধর্মপূজার প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যাইতেছে, রাজা কর্ণ সেনের প্রাসাদে সর্বপ্রথম রানী রঞ্জাবতী ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

পুরোহিত পাদুকা লইয়া পুরঃসর।
সর্ব সমিভ্যারে রাজা প্রবেশিলা ঘর॥

(শেষাংশ ১৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জড়ভরত

(গল্প)

মেঘদূত

এক

স্টেশনের অনতিদূরে কয়েতবেল গাছের নীচে বসিয়া যে লোকটা আপন মনেই দাঁত কিড়মিড় করিতেছিল তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই আপিস ঘরে সেদিনকার মিটিং বসিয়াছিল। 'অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লার্ক' অবসর সময়ে দৈনিক 'কালেকশনের' পুরাতন টিকিটগুলির 'কমেনসিং নম্বর' এবং 'ক্লোসিং নম্বর' মিলাইতেছিল। বলিল, "আশ্চর্য, বেটার সাত চড়ে রা নেই। ভয়ানক মিসচিভস ওটা। চোখ দুটো মার্ক করেছেন দাদা, যেন দুটো আগুনের ভাঁটা। যত রাজ্যের বদমাইসি ঠাসা ওর মাথায়।"

"চোর-টোর নয়তো হে?"

মাছের রেজিস্টার লইয়া যে ছেলেটি হিসাব মিলাইতেছিল, সে সম্প্রতি আই এ পাস করিয়া কাজে ঢুকিয়াছে; এবং তাহার এখনও গোঁফ ওঠে নাই। কথা শুনিয়া সে মুখ তুলিল। তাহার পর কৃত্রিম উপায়ে ভ্রূ নাচাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, "অ্যাবসোলিউটলি নট।"

"কে বললে নট?"

স্বল্পভাষী ছেলেটি কাজের ফাঁকে আবার ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনি ভুল করছেন তড়িৎদা। হি ইজ এ লুনেটিক। সিমপ্লি অ্যান্ড অ্যাবসোলিউটলি এ লুনেটিক।"

"তোমার বাপু যত সব ছেলেমানুষী কথা। লুনেটিক না আরও কিছু। সারা দিনে রাত্তিরে মুখে একটা রা নেই। পাগল দেখেছ কখনও? অমন ক্যাবলার মত তারা হাঁ ক'রে সৃষ্টির নক্ষত্র গুনে বেড়ায় না। এই তো সেদিন এত ক'রে জিগ্‌গেস করলাম সবাই মিলে, 'হ্যাঁরে পাগলা, তোর নাম কি? কোথা থেকে এলি তুই?' তা জবাব একটা কিছু দে, ও বাবা! এমন কমমট ক'রে চাইলে যে পালাতে পথ পাই না। পাগল বললেই হল আর কি!"

স্টেশনের পোর্টার রামদিন একাগ্রচিত্তে কর্তাদের মন্তব্য শুনিতেছিল। সে এইবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'সো তো বাবু হামি ফিন দেখিয়েছে। উ বেটাছেলে হামার উপর ভি নজর রাখে হরদম। ঘণ্টি দিতে চলি যব তব হামার পিছু লিয়ে সঙ্‌সঙ্ চলিয়ে আসে। কি মতলব, কুছু তো হামার মালুম না হোয় বাবু—" বলিতে বলিতে হঠাৎ সে আচমকা থামিয়া যায়। দরজার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলে, "ওহি দেখিয়ে, বাত তো হামার বিলকুল শুনিয়ে লিলো বাবু।"

জড়ভরত একটা মৃত গোখুরা সাপের লেজে দড়ি বাঁধিয়া প্লাটফরমের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। স্টেশন মাস্টার ফিসফিস করিয়া বলিলেন, "স্পাইটাই নয়তো হে! দেখো বাবা, আগে থাকতে না হয় থানায় ইনফর্ম ক'রে রাখি।"

রামদিন উগ্র গোঁফে তা দিয়া বলিল, "নেহি বাবু, সো কুছু ডর নেহি আছে। লেকিন পাগলাটার কুছু মতলব তো আছে মালুম হোয়।"

স্টেশন মাস্টার শঙ্কিতভাবেই বলিলেন, "তাইতো হে, ভাবিয়ে তুললে দেখছি। জেনে শুনে শেষকালে বাঘের সঙ্গে বাস করতে হবে?"

অ্যাসিস্ট্যান্ট আশ্বাস দিলেন, "তবু ভরসা এইটুকু যে ওটা কথা বলতে পারে না, বোধ হয় একেবারে বোবা।"

আই এ পাস ছেলেটি জুড়িয়া দিল, "অ্যান্ড ডেফ অ্যাট দি সেম টাইম।"

স্টেশনমাস্টার তবু বলিলেন, "তা হলে কি হবে হে; মিসচিভস লোকগুলো এমনিতেই ডেনজারাস। ও বোবা কালায় কিছুই যায় আসে না; ছুরি দিয়ে দাও হাতে, দেখবে দিনে দুপুরে মানুষ খুন করে আসবে। ওরা ডাকাত।"

অল্প বয়সী ছেলেটি আবার ফিক করিয়া হাসিল। —"এ আপনার মিথ্যে ভয় দাদা। একটা পাগলকে ভয় করাও যা, একটা চাইল্ড অব থ্রীকে ভয় করাও তাই।"

বলিয়া সে যেন একটু বেশী করিয়া হাসিল। স্টেশন মাস্টার উত্তপ্ত হইয়া ধমক দিয়া উঠিলেন, "তুমি তো বড় ডিস-ওবিডিয়েন্ট হয়ে পড়েছ হে! অ্যাঁ? কথা নেই বার্তা নেই ফিক ফিক করে হাসলেই হ'ল? লাইনের ডিসিপ্লিন জান না?" একটু থামিয়া পুনরায় কিঞ্চিৎ নরম সুরে বলিলেন, "আমার আর কি, নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারছ। কন-ফিডেনসিঅ্যাল রিপোর্ট খারাপ হলে তখন বাপু আমার কাছে এসো না কিন্তু।"

যাহাকে লইয়া এত কথা হইয়া গেল সেই বিকৃতমস্তিষ্ক জড়ভরত তখন গোটাকয়েক গঙ্গাফড়িং ধরিয়া সুতায় বাঁধিয়া সেগুলি তাহার প্রিয় পালিত বেজিটিকে খাওয়াইতে তৎপর।

তাহাকে দেখিয়া সকলেই বলিত—জড়ভরত। লোকটা আসলে কিন্তু জড় নয়, বিকৃতমস্তিষ্ক, পাগল।

কয়েক দিন হইল পাগলটা কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে। স্টেশনের নিকটে কয়েতবেল গাছের আশ্রয়ে ইতিমধ্যে সে একটি ক্ষুদ্র সংসার পাতিয়া ফেলিয়াছে—পাগলের সংসার। সঙ্গে একটি পুরাতন টুকরা কাগজের থলি। মাটিতে গর্ত করিয়া সম্প্রতি তাহার মধ্যে দুইটি হাড়গিলার বাচ্চা আনিয়া রাখিয়াছে। গর্তের মধ্যে সজীব বেঙ ছাড়িয়াছে কয়েকটা—তাহাদের খাদ্য। কিছুদিন পূর্বে উক্ত গর্তের মধ্যে একজোড়া গাঙ শালিকের বাচ্চা দেখা গিয়াছিল। লোকে বলে পাগলটা নাকি সেগুলি খাইয়া ফেলিয়াছে। পাগলটা অদ্ভুত। পাখি, সাপ খোপ, বেঙ, মশা, মাছি, কিছুই তাহার

বাদ যায় না; সবই সে পুড়াইয়া খায়।

সকলেরই দৃষ্টি তাহার উপর। তাহাকে কথা কওয়াইবার কত চেষ্টাই না তাহারা করিয়াছে। কিন্তু জড়ভরত বোবা, জড়ভরত কালা, কথা বলিবে কোথা হইতে। কাহারও সহিত সে কথা বলিতে পারে না, আকারে ইঙ্গিতেও না। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া সে মাঝে মাঝে গাড়ি ছাড়িবার সময় যাত্রীদের কোলাহলে প্ল্যাটফর্মএ আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এঞ্জিনের সম্মুখে গিয়া নিবিষ্ট মনে কি যেন লক্ষ্য করে ঢং ঢং করিয়া গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে জড়ভরত হঠাৎ চমকিয়া ওঠে, ছুটিয়া পালাইয়া যায়। কখনও বা চোখ পাকাইয়া, মুষ্টিবদ্ধ হাত দুইটি ঊর্ধ্বে তুলিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়া চলন্ত ট্রেনকেই শাসন করে।

জড়ভরত পাগল, বদ্ধ উন্মাদ।

দুই

নৈহাটি জংশন লাইনের মধ্যে ছোট একটি স্টেশন। কয়েক দিন হইতেই ছোট স্টেশন ঘরটির সম্মুখে যাত্রীদের ভিড় ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই টিকিট কাটিতে পারে নাই, অনেকেই অল্প সময়ের মধ্যে জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতে পারে নাই, ট্রেন ফেল করিয়াছে। আগামীকাল হইতে নাকি তিনটি স্পেসাল ট্রেন দেওয়া হইবে।

তিন দিন পরে মেলা। কাঁচড়াপাড়া স্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ফুলিয়া গ্রামে অপরাধ ভঞ্জনের মহোৎসব এবং চার দিনব্যাপী বিরাট মেলা। বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব ফুলিয়া নিবাসী বৈষ্ণব নিন্দক পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ মার্জনা করিয়া তাঁহাকে আদর্শ ভক্তে পরিণত করেন। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে পণ্ডিত দেবানন্দের তিরোভাব ঘটে। ভক্তগণের বিশ্বাস যে, এই তিথিতে শ্রীপাট ফুলিয়ায় আসিয়া পূজা অর্চনা করিলে এবং প্রসিদ্ধ দ্বাদশ বকুলকুঞ্জ ও গৌর-নিতাই মন্দির পরিভ্রমণ করিলে সকল পাপ ও অপরাধ ভঞ্জন হয়।

মেলার কয়েক দিন পূর্ব হইতেই যাত্রীর ভিড় অসম্ভব বাড়িয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র স্টেশনটিতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় নিকটস্থ মাঠেই যাত্রীদের অস্থায়ী আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কৃষ্ণচূড়া ও দেবদারুর ছায়ায় তাহারা একটি ছোটখাটো মেলার সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। হালুইকর কচুরি ভাজিয়া বিক্রি করিতেছিল, এক পার্শ্বে কয়েকটি ইরানী মহিলা ছুরি কাঁচির দোকান খুলিয়া বসিয়াছে, তাহার পার্শ্বেই ক্ষুদ্র ব্যূহ রচনা করিয়া একটি নিম্নজাতীয় রমণী ভানুমতীর খেলা দেখাইতেছিল। সকাল হইতেই আকাশটা কেমন যেন থমথমে হইয়া রহিয়াছে। জড়ভরত পা টিপিয়া টিপিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এক দুই করিয়া ছয়টা দল অতিক্রম করিয়া সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার সম্মুখেই নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের পট সাজাইয়া একটি অতি আধুনিক 'ফরচুন টেলার' বসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে খাঁচায় কতকগুলি ছোট ছোট রঙিন পাখি। অনেকেই হাত দেখাইতেছে, অনেক প্রশ্ন করিতেছে। ফরচুন টেলার নীরব গাম্ভীর্যে পাখি-গুলির সম্মুখে কয়েকটি টুকরা কাগজ তুলিয়া ধরিতেছে, চঞ্চুপুটে এক এক খণ্ড কাগজ টানিয়া পাখিগুলিই তাহাদের ভাগ্য নির্ণয় করিয়া দিতেছে। সারি সারি স্ত্রী পুরুষ হাত পাতিয়া বসিয়া গিয়াছে, হাত দেখাইবে। জড়ভরতও তাহাদের মধ্যে একজন। তাহার প্রসারিত হাতখানা টানিয়া লইয়া 'ফরচুন টেলার' বলিল, 'তুমহারা নসিব বহুত আচ্ছা হয়।' হঠাৎ পাগলটা দাঁত কিড়মিড় করিয়া এক ঝটকায় হাত টানিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সকলেই বলিল, 'উটা পাগল।'

আপিসঘরের সম্মুখে যাত্রীরা ভিড় করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল, "হেঁই বাবু ভাটি গাড়ি আর আসবেক নাই? হেঁই বাবু তোমাগোর পায়ে গড় করি, টিকিসগুলো দিয়ে দেও"।

স্টেশন মাস্টার বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। দুইখানা স্পেশ্যল্ বোঝাই হইয়া পঙ্গপালের মত যাত্রী গিয়াছে। আর একটিমাত্র স্পেশ্যল্ পাওয়া যাইবে; অথচ যাত্রীর সংখ্যা এখনও বাড়িয়াই চলিয়াছে। সুতরাং টিকিট দেওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই টিকিট করিতে পারে নাই, অনেকের আত্মীয়ের মধ্যে কতক চলিয়া গিয়াছে, বাকীগুলি ট্রেনে উঠিতে পারে নাই। মেয়েদের অনেকে ক্রন্দন শুরু করিয়াছে। চীৎকার—হট্টগোল।

স্টেশন মাস্টার চটিয়া গেলেন; অদ্যকার মজলিসের সমস্ত মজা এমনভাবে মাঠেই মারা যাইবে? সবেমাত্র কাগজে যুদ্ধের খবর বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে; বড় বড় হেডলাইনগুলি চক্ষু ধাঁধাইয়া দেয়। দীনু বাগদীর ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল; এ বৎসর নাকি তাহার বি এ পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। হারু মণ্ডলের মেয়েটা নাকি কালরাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী গৃহত্যাগ করিয়াছে; সোমত্ত বয়স, সেইটাই গুরুতর কথা। পাড়ার প্রাইমারি স্কুলে আগামী মাস হইতে নাকি একজন মেম-সাহেব পড়াইতে আসিবে। মাস্টার মশাই বিপুল উদ্যমে বলিতেছিলেন, "না, বুকের পাটা ছিল বলতে হবে মোতিলাল চৌবের; এই স্টেশনেরই ভার ছিল তার উপর। হ্যাঁ, মরদকে বাচ্চা! তখন তোমাদের গোঁফ বেরোয় নি। ওঅরের ঠিক পরে, এই নাইণ্টিন টোয়েণ্টি টোয়েণ্টি ওআন হবে। মোতি-লাল ছিল এখানকার ইনচার্জ হ'য়ে। হাতটানের অভ্যেস ছিল বড্ড বেশী। রিপোর্ট গেল উপরওয়ালাদের কাছে। ফরমার পোস্ট থেকে তাকে ডিগ্রেড্ ক'রে দেওয়া হ'ল বুকিং সেকশনে। কিন্তু বাবা 'অঙ্গার শতধৌতেন',—ই'দুরের চরিত্তির যাবে কোথায়! ফের রিপোর্ট গেল। তার পর মোতিলালকে সেখান থেকে সরিয়ে করা হ'ল পোর্টার, সেখান থেকে পয়েণ্টসম্যান, তার পর তাকে ক্রসিংএর গেটকীপার করে দেওয়া হল। কিন্তু বাবা জাত কেউটে! সেখানেও ধরি মাছ না ছুঁই পানি ক'রে ক'রেও বেশ দু-চার পয়সা—বুঝলে হে?—"

যাত্রীদল এইবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হট্টগোল

করিতে লাগিল। স্টেশন মাস্টার বাধা পাইয়া খেপিয়া গেলেন। আহা! এমন সরস কাহিনীটি শেষ করিতে পারিলেন না। কাহিনীটির পরিশেষে ছিল মেসোপটেমিয়া ফেরত মোতিলাল বড়সাহেবের নিকট নির্ভীকভাবে জানাইয়াছিল—রেললাইনের সর্বত্রই হাতটানের বন্দোবস্ত রহিয়াছে। সুতরাং—ইত্যাদি। কুপিত হইয়া তিনি হাঁক দিলেন, "রামদিন!"

রামদিন তেওয়ারী হুকুম পাইয়া তাহাদের দরজার সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিল। ভিখু বলিল, "দোয়া করেন বড়বাবু, তোমার মঙ্গল হবেক। মুরা গরিব চাষাভুষো নোক। তে-রাত্তি হেথায় কাটিয়ে শ্যাষে গাঁয়ে ফিরে যাব বাবু? দোয়া করেন বাবু, এই ল্যান মাশায় লগদ একটা পয়সা বেশী দিই, টিকিস্‌টা দিয়ে দ্যান হুজুর, মুরা চইলে যাই।"

স্টেশন মাস্টার চীৎকার করিতে গিয়া থামিয়া গেলেন; সামনে জড়ভরত। পাগলটা ভীড়ের মধ্যে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্টেশনমাস্টার আমতা আমতা করিয়া ধমক দেন, "তুই এখানে কি করছিস,—অ্যাঁ?"

তাঁহার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া পাগলটা চলিয়া যায়।

তিন

রাত্রি দশ ঘটিকা; শেষ ডাউন ট্রেন আসিবার সময় হইয়াছে।

স্টেশনের প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অন্ধকার পথ বাহিয়া জড়ভরত ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার কাঁধে ছিন্ন চটের মধ্যে কি একটা ভারী পদার্থ। মহামূল্য সম্পত্তির ন্যায় অতি যত্নে অতি সতর্কতার সহিত সে তাহাই লইয়া ছুটিয়াছে। আকাশের মেঘ কাটিয়া বৃষ্টি নামিল বুঝি। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিতেছিল—মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জন। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও গায়ে আসিয়া লাগিল; পাগলের হুঁশ নাই, ছুটিয়াই চলিয়াছে। এই দারুণ শীতেও তাহার সর্বাঙ্গ হইতে দরদর ধারে ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছিল। পাগল জড়ভরত ছুটিয়া চলিয়াছে। উন্মাদ জড়ভরত পথের পর পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে।

ছোট্ট পুষ্করিণীর পাশে আসিয়া গুরুভার বস্তুটি নামাইয়া সে কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিল। রাত্রির অন্ধকারে তাহার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার পর, আশ্চর্য, বোবা পাগলাটা হঠাৎ বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "লে লে—গাড়ি ছাড়্ ঢং ঢং—ঢং ঢং—"

তাহার পর নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া সে বিকট শব্দে হাসিয়া উঠিল।

স্টেশনে ডাউন ট্রেন ডিটেন হইয়াছে। ওদিক হইতে আপ্ ট্রেনও আসিয়া গিয়াছে। ছাড়িবার সময় চলিয়া গেল। যাত্রীর কোলাহল, ভিড়!

প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে স্টেশনমাস্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট বুকিং ক্লার্ক, গার্ডসাহেব, রামদিন ও চেকারগুলি একত্রে জটলা করিয়া কিসের অনুসন্ধান করিতেছেন। প্ল্যাটফর্মের ঘণ্টাটা পাওয়া যাইতেছে না, কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

দ্বিধা

সমীর ঘোষ

হে দেব! অনেক দেশ পারায়ে
এসেছি তোমার এই তোরণে;
অস্তরবির রঙে রাঙায়ে
তোমারে লভিনু পুন স্মরণে।
আমার পিছনে কাঁপে বাতাসে
শালের সবুজ ঘন বীথিকা;
সোনালী মেঘেরা ভাসে আকাশেঃ
পূরবী রাগিণী ভরা গীতিকা।

এমন ক্ষণেতে আজি সহসা
এসেছি অনেক পথ পারায়ে;
তোরণ খুলিবে এই ভরসা
রেখেছি বুকের তলে জাগায়ে।

সমুখে নামিছে কালো রজনী;
ঊর্ধ্ব আকাশে নেই আলো তো;
ভাবনা এখন মনেঃ এখনই
হে দেব! লাগিবে মোরে ভালো তো?

তোমার তোরণে তাই দাঁড়ায়ে
চরণ বাড়ায়ে দ্বিধা জাগে যে;
পথের শতেক বাধা পারায়ে
শঙ্কায় অন্তর ভাঙে যে।
সূর্য নিভিয়া গেছে গগনে,
আঁধারে শালের বন মিলালো;
তোরণ খুলিয়া এই লগনে
হে দেব! দেখাবে আজি কি আলো!

নিউইয়র্ক

(ভ্রমণকাহিনী—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

মানহাটন দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাংশ হারলাম নামে পরিচিত। এ স্থানের বাসিন্দা অধিকাংশ নিগ্রো। বাড়ি-ঘর একই ধরনে তৈরী। যদি নিগ্রোরা এখানে বাস না করত তবে এখানকার এত বদনাম হ'ত না। হারলামে ঘর ভাড়া একটু সস্তা ব'লে অনেক আমেরিকান এদিকে বসবাস করতে চায়। কিন্তু সমাজের ও সম্মানহানির ভয়ে, কিছুটা-বা কুসংস্কারেরও প্রভাবে প'ড়ে অনেকেই অন্যত্র কষ্টে দিন কাটায়, কিন্তু এদিকে আসতে রাজী হয় না। রাত্রি যখন অধিক হয় তখন অন্যান্য স্থানের লোক হারলামের দিকে আসতে থাকে। তখন হারলাম হয় ভূস্বর্গ।

সত্যই হারলাম ভূস্বর্গ। এমন মনোরম স্থান আমি কখনও দেখি নি। আমি এর রূপ বর্ণনায় অক্ষম। সাংহাই, জিব্রালটার, নীস এবং বোধ হয় প্যারিসও এর কাছে লাগে না। ভূস্বর্গের বসতি ক্রমে বেড়ে চলেছে। পূর্বে ভূস্বর্গের সীমানা ছিল ১০৪ স্ট্রীট পর্যন্ত, বর্তমানে হয়েছে ১০৮ স্ট্রীট পর্যন্ত। ক্রমেই ভূস্বর্গের সীমা বাড়ছে দেখে ফাদার হপকিনের মন কেঁপে উঠছে, ফাদার ডিভাইনএর আনন্দ বাড়ছে। উভয়েই খৃষ্ট ধর্ম প্রচারক। উভয়েই ইহুদী, নাৎসী ও কমিউনিস্ট বিদ্বেষী। অথচ উভয়ের মধ্যে মিল নেই। ফাদার হপকিন চান নিগ্রোদের নিপাত ক'রে সাদা চামড়াদের একাধিপত্য বিস্তার করতে। বোধ হয় শুধু আমেরিকায় নয়, পৃথিবীর সর্বত্র।

ইটালি যখন আবিসিনিয়া আক্রমণ করে, হারলামের নিগ্রোরা আবিসিনিয়ানদের সাহায্য করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও কিছু ক'রে উঠতে পারে নি। ফাদার হপকিন তখন সুর উঠিয়েছিলেন, আমেরিকার অর্থ যদি এমন ক'রে বিদেশে চ'লে যায় তবে দেশের দুর্গতি হবে। 'অ্যামস্টারডম নিউজ' সেই হপকিনী যুক্তিকে কাটবার জন্য নানা যুক্তি দেখিয়ে নানা প্রবন্ধ লিখলেন। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' তার প্রতিবাদ ক'রে পাল্টা প্রবন্ধ লিখলেন। সংবাদপত্ররা যতই বাগ্‌যুদ্ধে মাতলেন, নিগ্রোরা ততই দুঃখিত হ'তে লাগল এবং গির্জায় গির্জায় হাবসী সম্রাটের জন্য প্রার্থনা করতে লাগল। হাবসী সম্রাটকে সাহায্য করবার কথা ভুলে না গিয়ে পুরোদমে তারা অর্থ জমাতে লাগল। ফাদার হপকিন হঠাৎ একদিন ঘোষণা ক'রে দিলেন, বর্বর সম্রাট হাইলে সেলাসিকে আমেরিকা কোনওরূপ সাহায্য করতে পারবে না এবং নিজের শক্তি দেখাবার জন্য কতকগুলো ভাড়াটে গুণ্ডা গির্জায় গির্জায় পাঠিয়ে দিলেন যাতে ক'রে চাঁদা তোলা বন্ধ হয়ে যায়। ফল তার উলটো হ'ল, দাঙ্গা শুরু হ'ল। শ্বেতকায়গণ হারলামে দোকান ক'রে বেশ দু পয়সা উপার্জন করছিলেন, সেটি করা বন্ধ হ'ল। দাঙ্গার কথা সংবাদপত্রে এমন ঘটা ক'রে বার হ'তে লাগল যে ইটালি-আবিসিনিয়ার যুদ্ধের কথা লোকে ভুলে গিয়ে দাঙ্গার কথা নিয়েই মেতে উঠল। আসল কথা, দাঙ্গা তেমন হ'ক না হ'ক, দাঙ্গার অতিরঞ্জিত সংবাদকে জাগিয়ে রাখবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হারলামের লোক, আমেরিকার নিগ্রোরা যেন ইটালি-আবিসিনিয়ার লড়াইএর কথা ভুলে যায়। যখন আমি আফ্রিকাতে ছিলাম, ইওরোপীয়রা ইংরেজী সংবাদপত্র পাঠ ক'রে ফেলে দিতেন না, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতেন; যাতে ক'রে নিগ্রোরা ইতালি-আবিসিনিয়ার যুদ্ধের কোনও সংবাদ না পায়।

হারলামের এমন গির্জা নেই, এমন ক্লাব নেই যেখানে আমি আমার আফ্রিকা ভ্রমণের কথা না বলেছি। এই কারণেই অনেক নিগ্রো আমার সংস্পর্শে এসেছিল এবং আমাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবেসে তাদের দৈনন্দিন আচার ব্যবহারের সকল দিকই আমার কাছে খুলে ধরেছিল। আমি তা দেখে সুখী হতাম, তাদের কথায় আনন্দ হ'ত।

আমাদের দেশের এক ধনীকে হারলামে নানা স্থানে বেড়াতে দেখলাম। আমি তারই মত একজন হিন্দু যে শ্রীমতী মেয়ো দেবীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় হারলামের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছি সে সংবাদ তিনি রাখতেন না। ভারতীয় মজুরদের তত অর্থ নেই যে তারা বিশিষ্ট রেস্তোঁরায় ব'সে এক গ্লাস বিয়ারের দাম পঞ্চাস সেণ্ট (দেড় টাকা) আর 'সীট প্রাইস' তিন ডলার (নয় টাকা) দিতে পারে। কাজেই ভারতীয় ধনী মহাশয় ভুলেও ভাবতে পারেন নি যে একজন হিন্দু তাঁদের আশপাশে থাকতে পারে। আমার অর্থ ছিল না বটে, কিন্তু আমার প্রতি সকলের ভালবাসা, সমবেদনা প্রভৃতি ছিল। সেজন্যই আমার সব সুযোগই সেখানে ছিল।

তখন রাত্রি তিনটা। দুজন অর্ধ নিগ্রোকে সঙ্গে নিয়ে ১৩৯ স্ট্রীটে বেড়াতে লাগলাম। উদ্দেশ্য মেয়ো দেবীর দর্শন-লাভ। আমাদের দেশে লোকে মহাত্মা গান্ধীর চরণ ছুঁয়ে, জওহরলালের দর্শন লাভ ক'রে, সুভাষচন্দ্রকে ফুলের মালা পরিয়ে সুখী হয়, কৃতার্থ হয়; কিন্তু আমার ওসব ভাল লাগে না। আমার মনে হয় চরণ ছুঁতে চাওয়া, ফুলের মালা দিতে চাওয়া প্রভৃতি হ'ল মনের দুর্বলতার লক্ষণ। তবুও কেন যে এত রাত্রে দেবী দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ঘুরে বেড়াচ্ছি তার এক কৈফিয়ৎ আছে। বিখ্যাত বই লিখে এত নাম অর্জন ক'রে পৃথিবীর কোথাও স্থান না পেয়ে শেষে মিস মেয়ো চ'লে এলেন কিনা একদম শ্বেতকায় বর্জিত নিগ্রোদের মাঝে! কারণ কি?

আমেরিকা আজ নূতন রূপ নিয়েছে। আজ দরিদ্র এবং ছাত্র সমাজ বুঝতে পেরেছে, আর লীডার বানিয়ে দরকার নেই, ভোটা-ভুটিতে গিয়ে বেগার খেটে কাজ নাই; কর্তৃত্বের মূলে যারা আছেন, তাঁরা থাকেন ওআল্‌স্ স্ট্রীটের উপর তলায় ব'সে। জাতীয়তা-বাদ, ধর্ম ও ডিমক্র্যাসির দোহাই দিয়ে তারা নিজেদেরই অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন মাত্র। কাজ শেষ হয়ে গেলেই তাঁদের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, 'very busy'র তালা ঝুলতে থাকে। কিন্তু তেমন ক'রে আর চলবে না। মিস মেয়োও তা বুঝতে পেরেছেন। একদা তিনি বাজার নিলামে বিক্রীত হয়েছিলেন, আজ আর সেরূপ আত্মবিক্রীত হবার ইচ্ছা নাই। তাই বোধ হয় তাঁর সুবুদ্ধি এসেছে, নূতনভাবে মত্ত হয়ে এবার তিনি দরিদ্র এবং ছাত্র বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে এসেছেন। তিনিই করুণ সুরে বলেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে আর চালবাজি করলে চলবে না। নিজেদের মাঝে যে নূতন রাশিয়া গ'ড়ে উঠছে তাকে অস্বীকার ক'রা চলবে না, ইহুদী ও কমিউনিস্ট দলন পৃথিবীর সকলের চেয়ে বড় পাপ ব'লে গণ্য হবে। সেইজন্যই তিনি হারলামে, অন্য কোনও মতলবে নয়। তিনি হারলামে সত্যের উপলব্ধি অর্থে আত্মগোপন করেছেন। বাস্তবিক, যখন তিনি দুঃখ ক'রে তাঁর দুর্বলতার কথা বলতে লাগলেন, তখন আর তাঁকে কড়া কথা শোনাবার ইচ্ছা হ'ল না; পরিবর্তন দেখে সুখী হলাম। আমার সঙ্গী দুজনও সুখী হয়েছিল।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নীমতে নামতে একবার পড় পড় হয়ে-ছিলাম। আমেরিকায় অন্ধকার সিঁড়িতে নামা বিপজ্জনক।

বাড়িটা আটতলা। বই ভরা ঘরগুলির মধ্যে মিস মেয়ো একাকী ভূতের মত বাস করেন। হায়রে কালের গতি! কোথায় 'মাদার ইন্ডিয়া', লাখে লাখে যার বিক্রি হয়েছিল, আর কোথায় আজ তার মালিক নূতন ভাব ধারায় আত্মনিমজ্জিত হয়ে স্ট্যালিনের শিষ্য হয়ে ব'সে আছেন। পরিবর্তন একেই বলে। মজার কথা এই, যারা এই পথের পথিক তাদের কথা সংবাদপত্রে বার হয় না; জেলে তাদের প্রতি অত্যাচার হ'লে সে সংবাদ জেলের বাহিরে অজ্ঞাত থাকে। অত্যাচারের, প্রতিধ্বনি হয়তো পরে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে একেবারে বিপ্লবের ভিতর দিয়ে। মিস মেয়ো কি সেই প্রত্যাশার আশাতেই ব'সে আছেন? যদি তাই হয় তবে তাঁকে সইতে হবে অনেক বেশী। হয়তো তাঁকে পথে হাঁটতে হবে, ফ্ল্যাটগুলি ছেড়ে দিতে হবে। গরিবদের রেস্তোরাঁয় খেতে হবে। তখন তাঁর কলম কোন্ দিকে চলবে তা কে জানে।

শ্রীমতী মেয়োর কাছ থেকে যখন বাসার দিকে ফিরলাম, রাত্রি তখন দুটো। পুরো দমে তখন প্রাইভেট কাফেতে নৃত্যগীত চলছে। পুরুষ নারীর বেশে নারী পুরুষের বেশে নাচছে। শরীরে তাদের রক্ত আছে, পকেটে তাদের ডলার আছে, আইনও তাদের বিপক্ষে নয়; অতএব তাদের ভয় ভাবনার কারণ নেই। আনন্দের ফোয়ারা তাদের চারিদিকে। আর ওই গরিব সাদা, কালো, বাদামী লোকগুলো পথে যদি শুয়ে থাকে, ফুটপাতে যদি দাঁড়িয়েও ঘুমবার চেষ্টা করে তো পুলিস এসে ধরে নিয়ে যায়। তাদের দারিদ্র্যের কারণ কেউ স্বীকার করতে চায় না, বলে ওরা মন্দভাগ্য। আমরা তিনজনে মন্দভাগ্যদের পাশ কাটিয়ে একটা ছোট রেস্তোরাঁয় ব'সে কাফি খেয়ে বাসায় এলাম।

তখন রাত্রি প্রভাত হয়েছে। সূর্যদেব তাঁর নিয়মিত পথ ধ'রে মানব সমাজে কিরণ দিতে উঠে আসছেন। কয় দিনেই নিউইয়র্ক যেন কত পরিচিত ব'লে মনে হ'তে লাগল। আর কিছু যেন দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে না। মনে হ'তে লাগল বিদায় নিই এইবার এই মহানগরীর কাছ হ'তে। পথের মানুষ এইবার পথে যাই, পথের নেশায় নিজেকে হারিয়ে ফেলি। চলতেই আমার ভাল লাগে, বাসা বাঁধতে ভাল লাগে না। নগর, নগরী শুধু ধনী দরিদ্রে আর প্রপাগ্যান্ডায় ভরতি, পথ শুধু পথই। কিন্তু আরও কয়টি বিষয় দেখার রয়ে গেছে। সেগুলি দেখে নিয়েই নিউইয়র্ক থেকে বিদায় নেব।

রঞ্জাবতী

(১৩৭ পৃষ্ঠার পর)

জলধারা দিয়া লয়ে ধর্মের পাদুকা।
প্রাসাদে রাখিল ক'রে রতন বেদিকা॥

এখানে বলা আবশ্যক যে, ধর্ম ঠাকুরের পাদুকা পূজা করার বিধান ছিল। ধর্ম শূন্য মূর্তি হইলে, তিনি আবার 'ধবল বসন, ধবল পাদুকা পরিহিত।' 'ধর্মমঙ্গল'এ শীলারূপী ধর্মের পূজার ব্যবস্থাও আছে, আবার ধর্মের পাদুকা পূজারও রীতি আছে। ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল'এ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—

শ্রীধর্ম পাদুকা লয়ে শিরে।

রামাই পণ্ডিত নির্দেশিত যে ধর্মপূজা, তাহার সর্বপ্রথম পূজারিণী রঞ্জাবতী। এই সময় অন্তঃপুরে বা একটা সাধক গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মপূজার প্রচলন থাকিলেও, রাঢ় দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে শক্তি উপাসনারই সমাদর ছিল। তখন মধ্য রাঢ়ের ঈশ্বরী ঘোষ বা ইছাই প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা; তিনি শক্তি সাধক। কাজেই, ইছাই ঘোষের প্রতাপে রামাই পণ্ডিতের ধর্ম ঠাকুরের পূজা তেমনভাবে প্রচলিত হইতে পারিতেছিল না। এই বাধা উৎখাত করিবার জন্য রাজার পুত্র লাউ সেন ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এবং ধর্ম ঠাকুরের কৃপায় লাউ সেন জয়ী হইয়া ঢেকুরে দেবী শ্যামারূপার পরিবর্তে শীলারূপী ধর্ম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইছাই ঘোষের পরাজয় ও মৃত্যুতে সমগ্র রাঢ়দেশে ধর্মপূজার সমাদর বাড়িল। যে উদ্দেশ্যে রঞ্জার জন্ম তাহা সুসিদ্ধ হইল।

রাঢ়ের যেসকল অঞ্চলে এখনও ধর্মপূজার প্রচলন আছে, সেখানে ধর্ম ঠাকুরের সহিত রঞ্জাবতীরও পূজা হয়। ডোম পণ্ডিতেরা ধর্ম ঠাকুরের সহিত রঞ্জার দেহরা প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্ম-পূজা বিধানে রঞ্জার পূজা করে।

গোধূলি রাগ

(উপন্যাস)

শ্রীতারাপদ রাহা

১

শীতের একটি নাতিশীতল অপরাহ্ণ। মাঘ মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল, অথচ বসন্তের মিঠা বাতাস এখনও বহিতে শুরু করে নাই। বৃদ্ধ কুমারেশবাবু তাঁর নূতন বাড়ি 'অবসান'এ একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়াছিলেন। উটের লোমের একখানি দামী শালে তাঁর পা হইতে গলা পর্যন্ত ঢাকা, পালিশ করা রূপার মত ঝকঝকে এবং রেশমের মত কোমল একরাশ চুলওয়ালা মাথাটা একটু কাত করিয়া চক্ষু অর্ধমুদ্রিত করিয়া হয়তো তিনি একটু ঘুমাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। আর তাহারই সম্মুখে একটি দাঁড়ে বসিয়া তাহারই মাথার চুলের মত শাদা, পনের বছরের পোষা বিশ্বস্ত কাকাতুয়াটি প্রভুর অনুকরণ করিতেছিল। কাকাতুয়া তার প্রভুর মতই বেশী কথা বলা পছন্দ করে না। আর একটু আগে দেবপ্রসাদ তাহাকে এক ছটাক আঙুর ও পেস্তা খাওয়াইয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন তাহার কথা বলিবার প্রয়োজনই বা কি।

কুমারেশবাবুর হয়তো একটু ঘুমের আবেশই হইয়াছিল, এমন সময় কাকাতুয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ভারতী এসেছে, আাঁ! ভারতী!

কুমারেশের তন্দ্রা কাটিয়া গেল। তিনি চোখ মেলিয়া দেখিলেন; হয়তো ভারতীকে খুঁজিলেন। কিন্তু ভারতী তখনও আসে নাই, তার বেবি অস্টিনের শব্দও কানে আসিল না। তন্দ্রার রেশটুকু কাটিয়া গেল। পাশের দেওয়ালে আয়নায় ছায়া পড়িয়াছে, কুমারেশ তাকাইয়া দেখিলেন মাথার চুলগুলি কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফের মত সাদা, কপালে সারি সারি কয়েকটি সুদীর্ঘ রেখা। কাল সযত্নে কুমারেশের জীবন-ইতিহাসে বার্ধক্যের পরিচ্ছেদ লিখিয়া দিয়াছে, ঘন সূক্ষ্ম ভ্রূ দুইটির প্রায় সবটুকুই মাথার চুলের মতই সাদা হইয়া আসিল। তা আসুক, কুমারেশের এখন আর ইহাতে দুঃখ নাই।

হাঁ, একদিন ছিল বটে তার দুঃখ; গভীর অস্ত্রাঘাতের ন্যায় বেদনাদায়ক। মনে পড়ে, একদিন, কুমারেশের বয়স তখন সবেমাত্র ত্রিশ, শেয়ারের স্পেকুলেশনে একদিনে বাষট্টি হাজার টাকা লাভ করিয়া কুমারেশ বাড়ি আসিতেছিলেন। পথে, রেড রোডে, গাড়িতে বসিয়া নিজের উল্লসিত মুখখানা দেখিয়া লইতে হ্যান্ডব্যাগ খুলিয়া তিনি আয়না বাহির করিলেন। নিজের আনন্দের উচ্ছলতায় কুমারেশ নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিলেন। মুহূর্তের সে উজ্জ্বল ছবি কুমারেশ এখনও ভোলেন নাই, কিন্তু সে তো মুহূর্তেরই! উচ্ছ্বাসের অশোভনতাকে ঢাকিতে কুমারেশ ব্রাশ বাহির করিলেন, রূপার পাতে বাঁধানো ব্রাশ। মুখের সামনে আয়না রাখিয়া ঘন ঘন ব্রাশ চালাইতে চালাইতে কুমারেশ নিজের মাথার দিকে নজর দিয়াছিলেন।

আঙুরের মত স্তবকে স্তবকে সাজানো কালো মেঘের মত একরাশ চুল; রূপ আর রূপেয়া। কুমারেশের দেহমনের ভিতর দিয়া সেদিন শিহরন জাগিতেছিল, আজকার শান্ত উদাস গম্ভীর কুমারেশের সহিত তাহার মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কুমারেশের ব্রাশ আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। গাড়িতে কুমারেশ একা, সুতরাং এ খেলা কতক্ষণ চলিত কে জানে। আর আমাদের স্বল্পকালব্যাপী সানন্দ জীবনের উপসংহার কাহার কিভাবে হইবে তাহাই বা কে জানে। ছোট আয়নার উপর কুমারেশের মুখের ছায়া হঠাৎ বদলাইয়া গেল; কুমারেশের মনে হইল কালো মেঘের বুক চিরিয়া এক-খানা ইস্পাতের ছুরিকা নাচিয়া বাহির হইয়া গেল। মুহূর্তে কুমারেশের হাত আড়ষ্ট হইয়া আসিল, রূপার ব্রাশ দিয়া ধীরে ধীরে চুল সরাইয়া কুমারেশ দেখিলেন মাথার যেখানটা আজ আনন্দের আতিশয্যে ঈষৎ উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই প্রায় মধ্যভাগে একটি রূপালী রেখার আঁচড়ে কাল তাহার জীবনের উপসংহার লিখিতে শুরু করিয়াছে।

বাড়িতে আসিলে মন্দাকিনী স্বামীর মুখ দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—আহা, মুখখানা কী হয়ে গেছে! কিছু টাকা হেরে এসেছ বুঝি আজ?

উত্তরে কুমারেশ একবারে পাগলের মত হাসিয়া উঠিয়াছিলেন—আজ বাষট্টি হাজার টাকা লাভ করেছি মন্দা, বাষট্টি হাজার!

মন্দা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে বিহ্বল হইয়া চাহিয়া ছিলেন।

তারপর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। সেকালের কুমারেশকে যাহারা দেখিয়াছে তাহাদের কেহ বাঁচিয়া থাকিলে আজিকার কুমারেশকে আর চিনিতে পারিবে না। কুমারেশের মাথার অর্ধেক চুল উঠিয়া গিয়াছে, বাকী অর্ধেক ভাদ্রের কাশগুচ্ছের মত শুভ্র। ভ্রূ দুইটি ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহারই একটির পাশ দিয়া একটি নীলাভ রেখা গলা হইতে উঠিয়া ললাটে গিয়া মিশিয়াছে। কুমারেশ গত ফাল্গুনে তাঁর জীবনের পঁচাত্তর বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন।

তন্দ্রা হইতে জাগিয়া পাশের দেওয়ালের আয়নায় কুমারেশ নিজের মূর্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ব্রাশ করা চুল, ভ্রূ ও সুবিন্যস্ত গুম্ফ পালিশ করা রূপার মত ঝক ঝক করিতেছে। ইহাদের পরিবর্তনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, ইহারা আর তাঁহাকে তেমন গভীর করিয়া দুঃখ দিবে না।

বাড়িটা আটতলা। বই ভরা ঘরগুলির মধ্যে মিস মেয়ো একাকী ভূতের মত বাস করেন। হায়রে কালের গতি! কোথায় 'মাদার ইণ্ডিয়া', লাখে লাখে যার বিক্রি হয়েছিল, আর কোথায় আজ তার মালিক নূতন ভাব ধারায় আত্মনিমজ্জিত হয়ে স্ট্যালিনের শিষ্য হয়ে ব'সে আছেন। পরিবর্তন একেই বলে। মজার কথা এই, যারা এই পথের পথিক তাদের কথা সংবাদপত্রে বার হয় না; জেলে তাদের প্রতি অত্যাচার হ'লে সে সংবাদ জেলের বাহিরে অজ্ঞাত থাকে। অত্যাচারের প্রতিধ্বনি হয়তো পরে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে একেবারে বিপ্লবের ভিতর দিয়ে। মিস মেয়ো কি সেই প্রত্যাশার আশাতেই ব'সে আছেন? যদি তাই হয় তবে তাঁকে সইতে হবে অনেক বেশী। হয়তো তাঁকে পথে হাঁটিতে হবে, ফ্ল্যাটগুলি ছেড়ে দিতে হবে। গরিবদের রেস্তোরাঁয় খেতে হবে। তখন তাঁর কলম কোন্ দিকে চলবে তা কে জানে।

শ্রীমতী মেয়োর কাছ থেকে যখন বাসার দিকে ফিরলাম, রাত্রি তখন দুটো। পুরো দমে তখন প্রাইভেট কাফেতে নৃত্যগীত চলছে। পুরুষ নারীর বেশে নারী পুরুষের বেশে নাচছে। শরীরে তাদের রক্ত আছে, পকেটে তাদের ডলার আছে, আইনও তাদের বিপক্ষে নয়; অতএব তাদের ভয় ভাবনার কারণ নেই। আনন্দের ফোয়ারা তাদের চারিদিকে। আর ওই গরিব সাদা, কালো, বাদামী লোকগুলো পথে যদি শুয়ে থাকে, ফুটপাতে যদি দাঁড়িয়েও ঘুমবার চেষ্টা করে তো পুলিস এসে ধরে নিয়ে যায়। তাদের দারিদ্র্যের কারণ কেউ স্বীকার করতে চায় না, বলে ওরা মন্দভাগ্য। আমরা তিনজনে মন্দভাগ্যদের পাশ কাটিয়ে একটা ছোট রেস্তোরাঁয় ব'সে কাফি খেয়ে বাসায় এলাম।

তখন রাত্রি প্রভাত হয়েছে। সূর্যদেব তাঁর নিয়মিত পথ ধ'রে মানব সমাজে কিরণ দিতে উঠে আসছেন। কয় দিনেই নিউইয়র্ক যেন কত পরিচিত ব'লে মনে হ'তে লাগল। আর কিছু যেন দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে না। মনে হ'তে লাগল বিদায় নিই এইবার এই মহানগরীর কাছ হ'তে। পথের মানুষ এইবার পথে যাই, পথের নেশায় নিজেকে হারিয়ে ফেলি। চলতেই আমার ভাল লাগে, বাসা বাঁধতে ভাল লাগে না। নগর, নগরী শুধু ধনী দরিদ্রে আর প্রপাগ্যাণ্ডায় ভরতি, পথ শুধু পথই। কিন্তু আরও কয়টি বিষয় দেখার রয়ে গেছে। সেগুলি দেখে নিয়েই নিউইয়র্ক থেকে বিদায় নেব।

রঞ্জাবতী

(১৩৭ পৃষ্ঠার পর)

জলধারা দিয়া লয়ে ধর্মের পাদুকা।
প্রাসাদে রাখিল ক'রে রতন বেদিকা॥

এখানে বলা আবশ্যক যে, ধর্ম ঠাকুরের পাদুকা পূজা করার বিধান ছিল। ধর্ম শূন্য মূর্তি হইলে, তিনি আবার 'ধবল বসন, ধবল পাদুকা পরিহিত।' 'ধর্মমঙ্গল'এ শীলারূপী ধর্মের পূজার ব্যবস্থাও আছে, আবার ধর্মের পাদুকা পূজারও রীতি আছে। ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল'এ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—

শ্রীধর্ম পাদুকা লয়ে শিরে।

রামাই পণ্ডিত নির্দেশিত যে ধর্মপূজা, তাহার সর্বপ্রথম পূজারিণী রঞ্জাবতী। এই সময় অন্তঃপুরে বা একটা সাধক গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মপূজার প্রচলন থাকিলেও, রাঢ় দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে শক্তি উপাসনারই সমাদর ছিল। তখন মধ্য রাঢ়ের ঈশ্বরী ঘোষ বা ইছাই প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা; তিনি শক্তি সাধক। কাজেই, ইছাই ঘোষের প্রতাপে রামাই পণ্ডিতের ধর্ম ঠাকুরের পূজা তেমনভাবে প্রচলিত হইতে পারিতেছিল না। এই বাধা উৎখাত করিবার জন্য রাজার পুত্র লাউ সেন ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এবং ধর্ম ঠাকুরের কৃপায় লাউ সেন জয়ী হইয়া ঢেকুরে দেবী শ্যামারূপার পরিবর্তে শীলারূপী ধর্ম-ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইছাই ঘোষের পরাজয় ও মৃত্যুতে সমগ্র রাঢ়দেশে ধর্মপূজার সমাদর বাড়িল। যে উদ্দেশ্যে রঞ্জার জন্ম তাহা সুসিদ্ধ হইল।

রাঢ়ের যেসকল অঞ্চলে এখনও ধর্মপূজার প্রচলন আছে, সেখানে ধর্ম ঠাকুরের সহিত রঞ্জাবতীরও পূজা হয়। ডোম পণ্ডিতেরা ধর্ম ঠাকুরের সহিত রঞ্জার দেহরা প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্ম-পূজা বিধানে রঞ্জার পূজা করে।

গোধূলি রাগ

(উপন্যাস)

শ্রীতারাপদ রাহা

১

শীতের একটি নাতিশীতল অপরাহ্ন। মাঘ মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল, অথচ বসন্তের মিঠা বাতাস এখনও বহিতে শুরু করে নাই। বৃদ্ধ কুমারেশবাবু তাঁর নূতন বাড়ি 'অবসান'এ একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়াছিলেন। উটের লোমের একখানি দামী শালে তাঁর পা হইতে গলা পর্যন্ত ঢাকা, পালিশ করা রূপার মত ঝকঝকে এবং রেশমের মত কোমল একরাশ চুলওয়ালা মাথাটা একটু কাত করিয়া চক্ষু অর্ধমুদ্রিত করিয়া হয়তো তিনি একটু ঘুমাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। আর তাহারই সম্মুখে একটি দাঁড়ে বসিয়া তাহারই মাথার চুলের মত শাদা, পনের বছরের পোষা বিশ্বস্ত কাকাতুয়াটি প্রভুর অনুকরণ করিতেছিল। কাকাতুয়া তার প্রভুর মতই বেশী কথা বলা পছন্দ করে না। আর একটু আগে দেবপ্রসাদ তাহাকে এক ছটাক আঙুর ও পেস্তা খাওয়াইয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন তাহার কথা বলিবার প্রয়োজনই বা কি।

কুমারেশবাবুর হয়তো একটু ঘুমের আবেশই হইয়াছিল, এমন সময় কাকতুয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ভারতী এসেছে, অ্যাঁ! ভারতী!

কুমারেশের তন্দ্রা কাটিয়া গেল। তিনি চোখ মেলিয়া দেখিলেন; হয়তো ভারতীকে খুঁজিলেন। কিন্তু ভারতী তখনও আসে নাই, তার বেবি অস্টিনের শব্দও কানে আসিল না। তন্দ্রার রেশটুকু কাটিয়া গেল। পাশের দেওয়ালে আয়নায় ছায়া পড়িয়াছে, কুমারেশ তাকাইয়া দেখিলেন মাথার চুলগুলি কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফের মত সাদা, কপালে সারি সারি কয়েকটি সুদীর্ঘ রেখা। কাল সযত্নে কুমারেশের জীবন-ইতিহাসে বার্ধক্যের পরিচ্ছেদ লিখিয়া দিয়াছে, ঘন সুক্ষ্ম ভ্রূ দুইটির প্রায় সবটুকুই মাথার চুলের মতই সাদা হইয়া আসিল। তা আসুক, কুমারেশের এখন আর ইহাতে দুঃখ নাই।

হাঁ, একদিন ছিল বটে তার দুঃখ; গভীর অস্ত্রাঘাতের ন্যায় বেদনাদায়ক। মনে পড়ে, একদিন, কুমারেশের বয়স তখন সবেমাত্র ত্রিশ, শেয়ারের স্পেকুলেশনে একদিনে বাষট্টি হাজার টাকা লাভ করিয়া কুমারেশ বাড়ি আসিতেছিলেন। পথে, রেড রোডে, গাড়িতে বসিয়া নিজের উল্লসিত মুখখানা দেখিয়া লইতে হ্যান্ডব্যাগ খুলিয়া তিনি আয়না বাহির করিলেন। নিজের আনন্দের উচ্ছলতায় কুমারেশ নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিলেন। মুহূর্তের সে উজ্জ্বল ছবি কুমারেশ এখনও ভোলেন নাই, কিন্তু সে তো মুহূর্তেরই! উচ্ছ্বাসের অশোভনতাকে ঢাকিতে কুমারেশ ব্রাশ বাহির করিলেন, রূপার পাতে বাঁধানো ব্রাশ। মুখের সামনে আয়না রাখিয়া ঘন ঘন ব্রাশ চালাইতে চালাইতে কুমারেশ নিজের মাথার দিকে নজর দিয়াছিলেন।

আঙুরের মত স্তবকে স্তবকে সাজানো কালো মেঘের মত একরাশ চুল; রূপ আর রূপেয়া। কুমারেশের দেহমনের ভিতর দিয়া সেদিন শিহরন জাগিতেছিল, আজকার শান্ত উদাস গম্ভীর কুমারেশের সহিত তাহার মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কুমারেশের ব্রাশ আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। গাড়িতে কুমারেশ একা, সুতরাং এ খেলা কতক্ষণ চলিত কে জানে। আর আমাদের স্বল্পকালব্যাপী সানন্দ জীবনের উপসংহার কাহার কিভাবে হইবে তাহাই বা কে জানে। ছোট আয়নার উপর কুমারেশের মুখের ছায়া হঠাৎ বদলাইয়া গেল; কুমারেশের মনে হইল কালো মেঘের বুক চিরিয়া এক-খানা ইস্পাতের ছুরিকা নাচিয়া বাহির হইয়া গেল। মুহূর্তে কুমারেশের হাত আড়ষ্ট হইয়া আসিল, রূপার ব্রাশ দিয়া ধীরে ধীরে চুল সরাইয়া কুমারেশ দেখিলেন মাথার যেখানটা আজ আনন্দের আতিশয্যে ঈষৎ উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই প্রায় মধ্যভাগে একটি রূপালী রেখার আঁচড়ে কাল তাহার জীবনের উপসংহার লিখিতে শুরু করিয়াছে।

বাড়িতে আসিলে মন্দাকিনী স্বামীর মুখ দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—আহা, মুখখানা কী হয়ে গেছে! কিছু টাকা হেরে এসেছ বুঝি আজ?

উত্তরে কুমারেশ একবারে পাগলের মত হাসিয়া উঠিয়াছিলেন—আজ বাষট্টি হাজার টাকা লাভ করেছি মন্দা, বাষট্টি হাজার!

মন্দা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে বিহ্বল হইয়া চাহিয়া ছিলেন।

তারপর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। সেকালের কুমারেশকে যাহারা দেখিয়াছে তাহাদের কেহ বাঁচিয়া থাকিলে আজিকার কুমারেশকে আর চিনিতে পারিবে না। কুমারেশের মাথার অর্ধেক চুল উঠিয়া গিয়াছে, বাকী অর্ধেক ভাদ্রের কাশগুচ্ছের মত শুভ্র। ভ্রূ দুইটি ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহারই একটির পাশ দিয়া একটি নীলাভ রেখা গলা হইতে উঠিয়া ললাটে গিয়া মিশিয়াছে। কুমারেশ গত ফাল্গুনে তাঁর জীবনের পঁচাত্তর বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন।

তন্দ্রা হইতে জাগিয়া পাশের দেওয়ালের আয়নায় কুমারেশ নিজের মূর্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ব্রাশ করা চুল, ভ্রূ ও সুবিনাস্ত গুম্ফ পালিশ করা রূপার মত ঝক ঝক করিতেছে। ইহাদের পরিবর্তনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, ইহারা আর তাঁহাকে তেমন গভীর করিয়া দুঃখ দিবে না।

যে দুঃখ অনিবার্য তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার বয়স আর তাঁহার নাই।

চোখ ভাল থাকিলেও চশমা ছাড়া কুমারেশ এ বয়সে খুব ভাল দেখিতে পান না; তাই ললাটের সুদীর্ঘ গভীর কয়েকটি রেখা, ডান চোখের পাশের নীল শিরাটি, মুখের লম্বাটে ধরন, ক্ষৌরমসৃণ দৃঢ়নিবদ্ধ চিবুক ছাড়া নিজের আকৃতির বিশেষ কিছু আর তিনি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। কুমারেশ নিজের হাতদুটি আয়না ব্যতিরেকেও ভাল দেখিতে পান। তাই সে দুটির দিকে আর নজর দিবার প্রয়োজন মনে করিলেন না। হাতদুটি ইস্পাতের দুটি দণ্ডের মত সরু আর এককালে সেইরূপই মজবুত ছিল বলিয়া মনে হয়। আঙুলগুলি সুদীর্ঘ ও শীর্ণ। নখগুলি কুমারেশ সপ্তাহে দুবার করিয়া কাটেন ও ব্রাশ করেন, নইলে স্বস্তি পান না।

সংসারে এরূপ একদল লোক আছেন যাঁহারা এ বয়সে কুমারেশের এরূপ প্রসাধন পছন্দ করেন না। তাঁহারা কুমারেশের চক্ষুশূল। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কুমারেশের যুক্তি অনেকটা এইরূপ।—তাঁহারা কি বলিতে চান জগতের সৌন্দর্য ও আনন্দের মেলায় বৃদ্ধদের কোনও স্থান নাই? বৃদ্ধদের কোনও কিছু চাহিবার অধিকার নাই?

কুমারেশের সব চেয়ে বড় দুঃখ, লোকে বৃদ্ধদের অনুকম্পার চোখে দেখে। যেন তাহাদের সকল প্রয়োজনের শেষ হইয়াছে। কিন্তু কই কুমারেশ তো তাহা বোঝেন না। সুন্দর একটা দৃশ্য দেখিলে কুমারেশের চোখে এখনও ভালই লাগে, মধুর কোনও শব্দ শুনিতে কুমারেশের দুটি কান এখনও ব্যগ্র হইয়া ওঠে।

কাকাতুয়াটি অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এইবার আবার মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—ভারতী এসেছে? —আঁা—ভারতী? দিদিমণি?—দাদু, ভারতী এসেছে?

কুমারেশ তাহার দিকে মুহূর্তের জন্য একবার তাকাইয়া একটু হাসিলেন, নহিলে মুশকিল আছে। কাকাতুয়া হয়তো এমনি বকর বকর করিয়া পাগল করিয়া তুলিবে।— কথা বলবে না, আঁা দাদু? রাগ করেছ, দাদু, আঁা দাদু, রাগ করেছ আঁা?

কুমারেশ এইবার ভাবিলেন, এই ধর না কাকাতুয়া। একটা কাক না পুষে কাকাতুয়া কেন পুষেছি? না সৌন্দর্যের কারণে; ওকে কেন কাছে রেখেছি? না সাহচর্যের কারণে। ওর অন্তরঙ্গতাটুকুও আমার ভালই লাগে। ও যে ভারতীকে ভালবাসে সেটুকুও আমার ভাল লাগে। কারণ আমি ভারতীকে ভালবাসি, ভারতীর স্নেহ আমার প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে অনিবার্য শ্বাস-বায়ুর মত। তবুও কি বলব আমার ভালবাসা চাওয়া শেষ হয়ে গেছে? যাদের অর্থের অনটন আছে তারা অর্থের কথা ভাবুক, ভাবুক সাংসারিক অভাব অভিযোগের কথা। যারা রোগী তারা রোগের কথা ভাবুক, ভাবুক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির কথা। যাদের সন্তান সন্ততি নেই তারা তার অভাব বুঝুক।

কিন্তু কুমারেশের ইহার কিছুরই অভাব নাই। তাঁহার কি চাই, কেমন করিয়া তাঁর দিন কাটিবে? লোকে বলে 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ' ভগবৎ সাক্ষাৎকারের জন্য। কুমারেশের হাসি পায়; রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের অতীত করিয়া তাঁহাকে কল্পনা করিয়া লাভ কি? এ জগতে সন্ধ্যা আছে, প্রভাত আছে, পাখি আছে, ফুল আছে, ভারতীর ভালবাসা আছে। ইহারই মাঝে ভগবানের রূপ কুমারেশ দেখিতে পান।

কুমারেশ ভাবেন, প্রকৃতির যে রূপ আমাদের কাছে ব্যক্ত হয়েছে, অব্যক্ত রয়েছে তার কত বেশী। বিকাশের পর বিকাশ আমাদের আনন্দকে ক্রমে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। মন্দার ভালবাসার ভিতর ভারতীর স্নেহ লুকিয়েছিল!

কুমারেশ আরও কি ভাবিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কাকাতুয়া ডাকিয়া উঠিল—ভারতী এল না, আঁা দাদু, আঁা— ভারতী?—

দেবপ্রসাদ আসিয়া বলিল—দিদিমণি তো এখনও এল না, আপনাকে চা দিই?

কুমারেশ ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলেন পাঁচটা বাজিয়া কুড়ি। বলিলেন—ভারতী এখনও এল না, একবার ফোন কর।

দেবপ্রসাদ বাবুর সকল কাজই করিতে জানে, আর একটিও কথা না বলিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। কাকাতুয়া ডাকিল—চা খাবে না, আঁা দাদু, আঁা! ভারতী! তাকে ডাক।

কুমারেশ এখন একটা বিষয়ের চিন্তা করিতে গেলে অন্য বিষয়ের কথা ভুলিয়া যান। এতক্ষণ নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, ভারতীর কথা মনে নাই। এখন ভারতীর জন্য দুশ্চিন্তায় ললাটের রেখাগুলি ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠিল, অথচ আগাইয়া দেবপ্রসাদের ফোন করা শুনিবার উপায় নাই! মর্যাদাবোধ, ঔচিত্য! যাহাদের ব্যবহারে শালীনতা ও গাম্ভীর্য নাই তাহারা কুমারেশের চক্ষুশূল।

দেবপ্রসাদ ফিরিয়া আসিল, কুমারেশ তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। দেবপ্রসাদ বলিল—সরস্বতী পুজোয় দিদিমণিদের ইস্কুলে থিয়েটার হবে, দিদিমণি তার মহলা দিচ্ছেন।

কুমারেশের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া উঠিল,—কিছু খেয়েছে সে?

দেবপ্রসাদ ভীত হইয়া বলিল—তা তো জিজ্ঞাসা করি নি।

যাও, আবার ফোন কর, কিছু না খেয়ে থাকে তো এখুনি বাড়ি আসতে বল, ওখানে যেন কিছু না খায়। একটু মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন—এরা আগে কিছুই বলবে না! শোফারের সঙ্গে চা খাবার পাঠিয়ে দিতাম। যেমন হয়েছে স্কুল, কর্তব্যবোধ এদেশে কারও নেই!

ইজিচেয়ারে বসিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া চোখ বুজিয়া কুমারেশ পড়িয়া রহিলেন। আর দু মাস পরে সোমেশ ফিরিয়া আসিবে, ভারতীর দেখাশুনা সেই করিবে।

কথাটা ভাবিতে কুমারেশের কষ্ট লাগে। ভারতীর

ভার অপর কেহ লইবে কুমারেশের ইহা ভাল লাগে না। আর তা ছাড়া, সে বিবাহ করিয়া আসিতেছে, তাহার মতি-গতি কেমন হইবে কে জানে। এর চেয়ে সেই বাঙালী মেয়েটি যেন ঢের ভাল ছিল,—হোক না গরীবের মেয়ে। সে লেখাপড়া জানে, হয়তো রূপও আছে। কুমারেশ অবশ্য তাহাকে দেখেন নাই, সোমেশের চিঠিতে যেরূপ শুনিয়াছেন।

দেবপ্রসাদ আসিয়া বলিল—ভারতী দিদিমণি ইস্কুলে চা খেয়েছে, আপনি চা খান। আধ ঘণ্টা পরে তিনি ফিরে আসছেন।

কুমারেশ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই বলিলেন—নিয়ে এস।

কুমারেশের চা-পান যখন শেষ হইল তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। কুমারেশ জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চিমের লাল আভা বুঝি এখনও চোখে পড়ে, রায় বাহাদুরের বাড়ির সম্মুখে দেবদারু গাছের ডালে কি একটা পাখি নাচিয়া নাচিয়া শিস দিতেছে। এই পরি-বেশটির সঙ্গে কুমারেশের নিজের জীবনের কোথায় যেন একটু সাদৃশ্য আছে; কুমারেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারেন না, বুঝিবার চেষ্টাও করেন না। একটা ইউক্যালিপটস্ গাছ হইতে কয়েকটা শুকনো পাতা পর পর ঝরিয়া পড়িল। কুমারেশের মনটা একটু যেন উদাস হইতে চায়। পূবের আকাশে আধ ফালি চাঁদ দেখা দিয়াছে; কুমারেশের সে ভাব কাটিয়া যায়।

ভারতীর আসিতে এখনও কত দেরি? কুমারেশ র‍্যাপারখানা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া বাহির হইয়া পড়েন। ভারতী কাছে থাকিলে সন্ধ্যা একরকম কাটিয়া যাইত। লাল কাঁকরের পথে বারবার পায়চারি করিতে করিতে কুমারেশ একটা অস্বস্তি বোধ করেন—কিসের যেন একটা অভাব। এমন সুন্দর শান্ত নীরব একটি সন্ধ্যায় মানুষের মন কেন সুন্দরের সঙ্গ কামনা করে?

কাকাতুয়া ডাকিয়া উঠিল—ও দাদু, দাদু তুমি কোথা? ভারতী এল?

ভারতী এখনও আসিল না, কুমারেশ গেটের দিকে আগাইয়া গেলেন। একখানা মোটর পোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল। না, ভারতী নয়। কুমারেশ এইবার প্রায় গেটের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছেন—কে? কুমারেশের মুখ দিয়া শব্দটা প্রায় বাহির হইয়াই গিয়াছিল আর কি। তিনি দেখিলেন, তাঁহাদের ঘন লতা মণ্ডিত গেটের ধারে সেই পুরানো আম গাছের নীচে যে পাথরের বেঞ্চখানা রহিয়াছে তাহাতে বসিয়া একটি মেয়ে।

যৌবনে কুমারেশের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ছিল; সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় তিনি দেখিলেন মেয়েটির বয়স হয়তো ত্রিশের কাছাকাছি। রং ফরসা, দেহ নিটোল, সুগঠিত; পোশাকে একটুও আড়ম্বর নাই, কাগজের মত ঠাস বোনা মিহি সাদা থান কাপড়ে মেয়েটির জীবনের একটি বিশেষ দিকের রিক্ততার পরিচয় স্ফুট। হাতে একটি রুপার ছোট রিস্ট-ওআচ, পায়ে একজোড়া কালো লেডিজ শু। একটু লক্ষ্য করিলে সেই অস্পষ্ট আলোতে, কুমারেশের মত বৃদ্ধও দেখিতে পান যে, জুতাজোড়া পরিবার আগে সযত্নে ব্রাশ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে কুমারেশের দেখা পাইয়া মেয়েটি যেন একটু অপ্রতিভ হইল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটি ছোট নমস্কার করিয়া অনধিকার প্রবেশের জন্য মাপ চাহিবে বলিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল। ওষ্ঠ দুইটি ঈষৎ উন্মুক্ত হইল, সুপরিষ্কৃত সুবিন্যস্ত কুন্দফুলের মত দাঁতগুলির আভাও বুঝি চোখে পড়িল। বৃদ্ধ মেয়েটির দিকে যে দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিলেন তাহাতে রোষের লেশমাত্রও নাই দেখিয়া মেয়েটি আর কিছু বলিল না, বৃদ্ধের দিকে আর একবার ভাল করিয়া চোখ বুলাইয়া ধীরে ধীরে লেকের পথ ধরিল। মেয়েটির বাঁ গালে একটি ছোট তিল দেখিয়া কুমারেশের যেন কাহার কথা মনে পড়িবার মত হইল।

কে সে? কাহার কথা? কুমারেশ তাহার স্মৃতি-সাগর মন্থন করিতে নিশ্চয়ই একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, নইলে ভারতীর মোটর আর কোনও দিন তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। গাড়ি থামিলে, ভারতী নামিয়া ছুটিয়া আসিয়া কুমারেশের হাত ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া বলিল—দাদু, কি ভাবছ অমনি করে? বাঃ রে!—আমার গাড়ি দেখতে পাও নি?

কুমারেশ ভারতীর বাঁ হাত ধরিয়া বলিলেন—আয় তোর জন্যেই দাঁড়িয়েছিলাম।

থানপরা মেয়েটি তখন সামনের রাস্তা ধরিয়া কিছু দূর আগাইয়া গিয়াছে। ভারতী ডান হাত দিয়া তাহাকে দেখাইয়া বলিল—দাদু, ও কে আমাদের এই বেঞ্চটায় ব'সে ছিল? কুমারেশ একবার ভারতীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলেন, তার পর ভারতীর মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিলেন—তোমাকে কতদিন বলি নি কারও দিকে আঙুল দিয়ে দেখাতে নেই?

ভারতী অপরাধীর মত কুমারেশের দিকে তাকাইয়া রহিল। কুমারেশ বলিলেন—এতে আমি বড় কষ্ট পাই। আর এমনি কষ্ট তুমি আর আমায় দেবে না, কেমন?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল—না।

সিঁড়িতে পা দিতেই কাকাতুয়া ডাকিয়া উঠিল—দাদু, ভারতী এসেছে? অ্যাঁ, অ্যাঁ—ভারতী দিদিমণি?

কুমারেশ কোনও উত্তর দিলেন না, তিনি ভাবিতে-ছিলেন, নাঃ এ কুমুদিনীর কাজ নয়; কুমারেশের দৌহিত্রী, বনলতা বসুর মেয়েকে মানুষ করা কুমুদিনীর কাজ নয়। কাল সকালে ওর টিউটরকে বলতে হবে, নয় সামনের মাস থেকে একজন গভর্নেস রাখতে হবে। হাঁ তাই রাখতে হবে—that's settled.

(ক্রমশ)

ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরে সংগ্রাম

ব্রিটিশ নৌসচিব মিঃ আলেকজাণ্ডার গত ৭ই আগষ্ট তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"আমাদিগকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শত্রুপক্ষ এবারে কোন উপায় অবলম্বন করিবে তাহা স্থির করিলে তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবে। সুতরাং প্রচণ্ড সংঘাত ও দুর্দ্দিনের অগ্নিপরীক্ষা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।"

জার্ম্মানী যত সত্বর ইংলণ্ড আক্রমণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, তাহা করিতে পারে নাই, কিন্তু ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার মতলব সে যে ছাড়ে নাই, সামরিকগণ সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। জার্ম্মানীর সমরনীতিকগণ যুদ্ধের বহু পূর্ব্ব হইতেই এই কথা বলিয়া আসিতেছিলেন যে, ইংলণ্ডকে কায়দায় ফেলিয়া তাহার নিকট হইতে সুবিধাজনক সর্ত্তে সন্ধি আদায় করিতে হইলে, ইংলণ্ড আক্রমণের উপরই সমগ্রভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে, অন্য কোনভাবে সহজে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাইবে না। ব্রিটিশ সমরনীতিকগণ জাতিকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন, জার্ম্মানী অন্যত্র আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট রাখিবার চাল চালিবে। কিন্তু সেদিকে বেশী জোর দিতে গিয়া আমরা যেন ইংলণ্ডের উপর আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টায় শৈথিল্য প্রদর্শন না করি। ইংলণ্ড রক্ষার উপর এই বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার নীতিই ব্রিটিশ সমরনায়কগণ বর্ত্তমানে অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন। ইংরেজের নরওয়ে ত্যাগ সেই নীতিরই ফল। জার্ম্মানী ইংরেজের দৃষ্টি অন্যত্র আকৃষ্ট রাখিবার নীতি পরিত্যাগ করে নাই, মিশরের দিকে দিকে ইটালীর হুমকি, সোমালীল্যাণ্ডে ইটালীয় বাহিনীর আক্রমণ এবং পূর্ব্ব এশিয়ায় নূতন পরিস্থিতির মূলে জার্ম্মানীর সেই নীতি যে রহিয়াছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। জাপান আমেরিকাকে ঘাঁটাইবার সাহস বেশী পাইবে না, কারণ আমেরিকার বিপুল নৌবহর রহিয়াছে। জাপান এখন চাপ দিতে চেষ্টা করিবে ইংরেজের উপর। সে বুঝিয়া লইয়াছে যে, ইংলণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করিবার দিকেই ইংরেজের সমস্ত শক্তি প্রযুক্ত রহিয়াছে।

জাপানের বর্ত্তমান পররাষ্ট্রসচিব মাৎসুকো সেদিন স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন যে, ফরাসী ইন্দোচীন, ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ জাপান দখল করিতে চেষ্টা করিবে; যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রিত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, কোন্ কোন্ দেশ বা রাজ্য জাপানের আশ্রয়ে আনা হইবে, সে সম্বন্ধে ধরাবাঁধা কথা তিনি এখনও কিছু দিতে পারেন না। এই কথাতে অন্তত ইহা বুঝিবার উপায় নাই যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দখলের মতলব জাপানের একেবারে নাই; যদি তেমন সুযোগ সে পায়, তবে তাহা সে ছাড়িবে না, ইহা সুনিশ্চিত। জাপান যদি এই নীতি লইয়া ধীরে ধীরে কার্য্যে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ইংরেজের স্বার্থ যে বিপন্ন হইয়া উঠিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। জাপান যদি ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপ-

পুঞ্জে অধিকার করিতে পারে এবং দক্ষিণ মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ হাত করিয়া সেখানে বিমানবহরের ঘাঁটি বসায়, তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিবে। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে জাপানের এমন সান্নিধ্য আতঙ্কের কারণ হইবে এবং ইংরেজ কিছুতেই সেক্ষেত্রে নির্ব্বিকার থাকিতে পারিবে না। ফরাসী ইন্দোচীন জাপানের দখলে গেলে জাপান প্রকৃতপক্ষে ভারতের সীমানায় আসিয়া হাজির হইবে। ফরাসী ইন্দোচীনের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য বলিতেছেন যে, তাঁহারা কিছুতেই জাপানের দাবী স্বীকার করিয়া লইবেন না এবং অস্ত্রধারণ করিয়া জাপানকে বাধা দিবেন; কিন্তু ফ্রান্সের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতিক বিপর্য্যয়ের পর জাপানকে তেমনভাবে প্রতিহত করিবার শক্তি তাঁহাদের আছে কি না, এ বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে।

তারপর মিশর সীমান্ত ও এডেন বন্দরের কথা। ফ্রান্সের পরাজয়ে উত্তর আফ্রিকা এবং লিবিয়ার ফরাসী কর্ত্তৃক লিবিয়া আক্রমণের ভয় ইটালীর এখন আর নাই; এজন্য ইটালী আক্রমণাত্মক সমরনীতি অবলম্বন করিতে সুবিধা পাইয়াছে। ইটালীর সেনাদল মিশরের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সোল্লাম নামক স্থানে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। সোল্লাম হইতে এই বাহিনী অগ্রসর হইতে হইলে সমুদ্রের উপকূলভাগ দিয়া দুর্গম মরুভূমি অতিক্রম করিতে হইবে; এই পথে ইংরেজের রণতরী এবং বিমান আক্রমণে তাহার বিপদের ভয় রহিয়াছে। সুতরাং মিশরের দিকে ইটালী সহজে সুবিধা করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ব্রিটিশ সোমালীল্যাণ্ডে ইটালীয় সেনাদল অভিযান আরম্ভ করিয়াছে, এডেন উপসাগরের তীরবর্ত্তী বারবারা নাকি তাহাদের লক্ষ্য। বারবারার পথে ইটালীয় সেনাদল জেইসানাকক বন্দরটি দখল করিয়াছে। উত্তর কেনিয়াতে ইটালীর সেনাদল সীমান্তস্থিত ময়েল নামক ঘাঁটি অধিকার করিয়া বালুকাময় মরু অঞ্চলে কিছু দূর আগাইয়া গিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সেনাদলদিগকে বাধা দানে এদিকে তাহাদের অগ্রসর ব্যাহত হইয়াছে। এডেন উপসাগরের ধারে আসিবার দিকে ইটালীর লক্ষ্য রহিয়াছে।

একটি ক্রুজার ট্যাঙ্ক খাড়া পাহাড় অতিক্রম করিতেছে

ইংরেজের দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য এইগুলিকে উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে; কিন্তু জার্ম্মানীর প্রধান দৃষ্টি এখনও ইংলণ্ডের উপরই রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই সংবাদ পাওয়া যায় যে, জার্ম্মানীর মাইন তোলা জাহাজের বহর নরওয়ের উপকূলভাগে বিশেষ রকম তৎপরতা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জার্ম্মানীর সংবাদপত্রসমূহ নরওয়ে জার্ম্মানীর দখলে যাইবার পর লিখিয়াছিল, নরওয়ের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহ তাহাদের অধিকারে যাওয়াতে তাহারা ঐ সব

জায়গা হইতে উড়োজাহাজযোগে ইংলণ্ড আক্রমণের বিশেষ সুযোগ পাইবে, ডেনমার্ক হাতের কাছে এবং ডেনমার্ক তাহাদের দখলে থাকিতে রসদপত্রের চিন্তা তাহাদের হইবে না। ঐ স্থান হইতে স্কটল্যাণ্ডের উপর জার্ম্মানেরা সামরিকভাবে হানা দিবে।

জার্ম্মানী তিনটি উপায়ে ইংলণ্ড আক্রমণ করিবে বলিয়া সামরিকগণের বিশ্বাস। প্রথমত, যুগপৎ বিমান এবং নৌপথে আক্রমণ, দ্বিতীয়ত বিমান আক্রমণের তীব্রতা, তৃতীয়ত ডুবোজাহাজ, মাইন, মোটরচালিত টর্পেডো বোট এবং উড়োজাহাজের সাহায্যে ইংরেজকে কাবু করা। এতকাল পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে যাহাকে ইংলণ্ড আক্রমণ বলা চলে জার্ম্মানেরা তেমন কিছু করিতে পারে নাই, শুধু উড়োজাহাজে বে-সামরিকভাবে তাহারা হানা দিয়াছে মাত্র। সুতরাং জার্ম্মানেরা যে কথা বলিতেছে, নূতন তেমন কোন অদ্ভুত রকমের বৈজ্ঞানিক কৌশল যদি তাহারা প্রয়োগ করিতে না পারে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের উপকূলে সেনা নামাইয়া তাহারা সুবিধা করিতে পারিবে না। জার্ম্মানেরা এই গর্ব্ব করে যে, নরওয়েতে প্রত্যহ উড়োজাহাজ যোগেই তহারা দুই সহস্র করিয়া সেনা নামাইয়াছে; কিন্তু নরওয়ে এবং ইংলণ্ডের অবস্থা সমান নয়। নরওয়ের শক্তি সামান্য, বিশেষত সে তেমন প্রস্তুত ছিল না; হল্যাণ্ডের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে।

বিমান আক্রমণের তীব্রতা বাড়িবে, এমন আশঙ্কা অনেকেই করিতেছে। এ পর্য্যন্ত এই বিমান আক্রমণ যেভাবে চলিয়াছে, তাহাকে কেবল মহড়া বলা যাইতে পারে। জার্ম্মানেরা রাত্রির অন্ধকারেই এই আক্রমণ প্রধানত চালাইবে বলিয়া ব্রিটিশ রণনীতিকদের বিশ্বাস। তাঁহারা বলিতেছেন যে, দুই একখানা নয়, বহুসংখ্যক জার্ম্মান উড়োজাহাজ যুগপৎ ইংলণ্ডের উপর হানা দিতে চেষ্টা করিবে এবং সেজন্য তাঁহারা প্রস্তুতও আছেন।

জলপথে জার্ম্মানীর আক্রমণের আতঙ্ক সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার বেলায় সকলেরই দৃষ্টি ফ্রান্সের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার দিকে আকৃষ্ট হইবে। ফ্রান্সের ইংলিশ প্রণালীর উপকূলবর্ত্তী সকল বন্দর এবং আটলাণ্টিক সমুদ্রের তীরবর্ত্তী বন্দরগুলি বর্ত্তমানে জার্ম্মানদের অধিকারে গিয়াছে। এ কথাও শুনা যাইতেছে, জার্ম্মানেরা ফ্রান্সের উপকূল দিয়া ইংলণ্ডের দিকে বড় বড় কামান বসাইতেছে এবং সৈন্য সমাবেশ করিতেছে। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ পক্ষও বলিতেছেন,—তাঁহাদের পক্ষে নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ ঘটে নাই, পরন্তু দেশরক্ষা ব্যবস্থার ফল অতীব আশাপ্রদ বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন। মোটের উপর বর্ত্তমান পরিস্থিতি যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই কথা বলিতে হয় যে, জার্ম্মানী যে কারণেই হউক, নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে পারে নাই। ইহাতে ইংরেজকে প্রস্তুত হইবার সুযোগ সে দিয়াছে। জার্ম্মানীর সমুদ্রপথে গতিবিধি বন্ধ হইয়াছে, তাহার ফলে তাহাকে অসুবিধায় পড়িতে না হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। অবশ্য বর্ত্তমানে সমগ্র মধ্য ইউরোপে জার্ম্মানীর দখলে রহিয়াছে। সুইডেনের লোহা, হল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ফ্রান্সের কাঁচামালের উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব চলিতেছে, বলকানে তেলও সে পাইতেছে; কিন্তু কয়লার অভাব তাহার খুবই বেশী, ইহার পর শীত আসিয়া পড়িল, আবহাওয়ার অসুবিধার মধ্যে তাহাকে পড়িতে হইবে; জার্ম্মানী সম্ভবত শীত পড়িবার পূর্ব্বেই ইংলণ্ডের উপর একটা বড় রকমের আক্রমণ চালাইবার জন্য চেষ্টা করিবে এবং সেই আক্রমণের সুবিধা করিবার উদ্দেশ্যেই আফ্রিকার উপকূলভাগে, ইটলীর কর্ম্মতৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে, এ বিষয়ে ইটালী ও জার্ম্মানীর কূটনীতি নূতন খেলা খেলিতে পারে, এমন আশঙ্কাও অনেকে করিতেছেন।

শ্রেষ্ঠদান

অরুণ সরকার (মেদিনীপুর)

মনুষ্যে সৃজন করি' ভেবেছিলে মনে
হে বিশ্বভুবন স্রষ্টা, অন্য জীব সনে
সমপর্য্যা নাহি করি উচ্চতর স্থানে
তাহারে আসন দেবে। নিত্য নব দানে
তাহারে ভূষিত করি' সে ইচ্ছা তোমার
করেছ সম্পূর্ণ দেব। অন্তরে তাহার
জাগায়েছ জ্ঞান, বুদ্ধি, জাগায়েছ স্নেহ,
ভক্তি, প্রীতি, প্রেমে তার ভরি' দেছ গেহ।
দিয়াছ বিচার বুদ্ধি, ন্যায়ান্যায় বোধ,
শিখায়েছ ধর্ম্ম, ক্ষমা, সম্বরিতে ক্রোধ,
রিপুরে করিতে জয়। হয় নাই তবু,
হে মঙ্গলময় তারে আরো দেছ প্রভু
শিখায়েছ মনুষ্যত্ব—আত্মার সম্মান
শেষ আশীর্ব্বাদ সেই, তব শ্রেষ্ঠ দান।

জানোয়ারের ভাব

সাপ আর নেউলে কোনদিন ভাব হয় নি। এমনি আরও অনেক জানোয়ার আছে, যারা অপর কোন জানোয়ারের সংগে মোটেই সদ্ভাব রাখতে আজও পর্য্যন্ত পারে নি। গৃহপালিত জীবের মধ্যে বেড়াল এবং কুকুরের গৃহযুদ্ধ সকল সময়েই লেগে আছে। উভয়ের কেউ অপরকে একেবারে দেখতে পারে না।

কুকুরের বাচ্ছাকে আদর করছে

সম্প্রতি জনৈক বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় এই ধরণের জানোয়াররা শত্রুতা ভুলে গিয়ে রীতিমত ভদ্রলোক সেজে চিরকালের শত্রুকে বন্ধু ক'রে নিয়েছে। বেড়াল কেবল কুকুরের সংগেই বন্ধুত্ব করে নি, ইন্দুরের সংগেও বেশ ভাব ক'রে খেলার সাথী করেছে। কুকুরও টিয়াপাখীর খাঁচার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে সকালবেলায় তার খবরাখবর নিয়ে আসে। পুসীবেড়াল কুকুরের অবর্ত্তমানে তার বাচ্চার তদারক করে।

বৈজ্ঞানিক এই কয়েকটি গৃহপালিত জন্তুকে দিয়ে প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ করেছেন। ছোট অবস্থা থেকে অনেকদিনের মেলামেশায় এই সব জন্তু বৈজ্ঞানিকের শিক্ষার গুণে চিরকালের শত্রুতা ভুলে এক সংগে এক খাঁচার মধ্যে বাস করতে অভ্যস্ত হয়েছে।

দন্ত চিকিৎসকের সাহস

নিউইয়র্ক পশুশালার দাঁতের ডাক্তার এক জলহস্তীর দাঁতের রোগ সারিয়ে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। জলহস্তীটা কিছুদিন ধরে দাঁতের রোগের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পশুশালা কাঁপিয়ে তুলছিল আর কি! ডাক্তারের নির্দ্দেশে
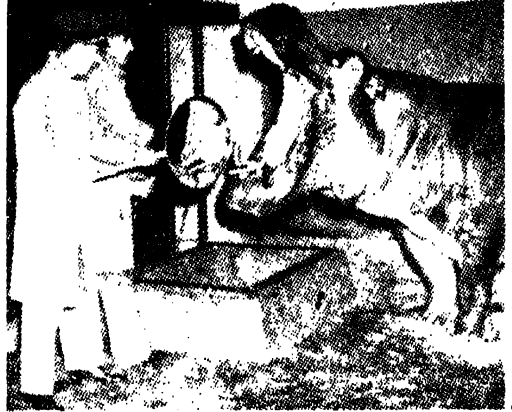
দাঁতের ডাক্তার জল-হস্তীর সামনে আর্শি রেখে ভিতরে কোথায় কি হয়েছে তার খোঁজ নিচ্ছেন।

ভালছেলের মত জলহস্তীটা বৃহৎ 'হাঁ' ক'রে রোগের কারণ খুঁজে নিতে ডাক্তারদের সাহায্য করেছিল।

ডাক্তার এবং তাঁর সহকারী অক্ষত দেহেই খাঁচা থেকে ফিরেছিলেন।

লম্বা নাকের বহর

কোন কোন লোকের নাক অস্বাভাবিকভাবে লম্বা হ'য়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের টমাস ওয়েডারসের নাক এমনি বাড়তে বাড়তে শেষে সাড়ে সাত ইঞ্চিতে পৌঁছায়। প্রকাশ, তাঁর নাকই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে লম্বা ছিল; এ পর্য্যন্ত এত বড় লম্বা নাকের অধিকারী কেউ হতে পারে নি। মিঃ ওয়েডারস সাধারণ প্রদর্শনীতে লম্বা নাক দেখিয়ে দর্শকদের যেমন হাসির খোরাক জমিয়েছিলেন তেমনি প্রচুর অর্থও উপার্জ্জন ক'রেছিলেন।

দাবা খেলার নেশা

কথায় আছে, "তাস, দাবা, পাশা তিন কর্ম্ম নাশা"। একবার এ নেশার ফাঁদে পড়লে সহজে নিজেকে সামলান যায় না। তা না হ'লে যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের মুখের কাছে বসে কেও দাবা খেলে না কী? বর্ত্তমান যুদ্ধের সংবাদে প্রকাশ, ম্যাজিনো লাইনের রক্ষী সৈন্যদলের কোন কোন সৈনিক অবসর সময়ে দাবার ঘুঁটির পরিবর্ত্তে মোটরের স্প্রিং, লোহার টুকরো দিয়ে দাবা খেলায় মশগুল থাকে। সত্যি বলতে কি, সৈনিকেরা এ খেলায় যথেষ্ট আনন্দ পায়।

জলে ও মাটিতে চলা গাড়ী

একই গাড়ী যদি মাটিতে এবং জলে চালান যায় তাহ'লে সকলেরই কত সুবিধা হয়! বৈজ্ঞানিকেরা সম্প্রতি এই ধরণের একটি গাড়ী আবিষ্কার করেছেন। যে সমস্ত রাস্তায় প্রায়ই নদী নালা পার হ'তে হয় সেখানে এই গাড়ীর প্রয়োজন বেশী; বর্ষাকালে ত সব থেকে বেশী। মজবুত কলকব্জা, শক্তিশালী ইঞ্জিন দিয়ে গাড়ীটা তৈয়ার করায় মাঝ রাস্তায় পথিককে বিপদে পড়তে হয় না। যাঁদের মোটরে চড়ে দেশ ভ্রমণের সখ বেশী তাঁরা নব আবিষ্কৃত এই গাড়ীতে বেশ স্বচ্ছন্দে বহু দেশ বেড়িয়ে আসতে পারবেন।
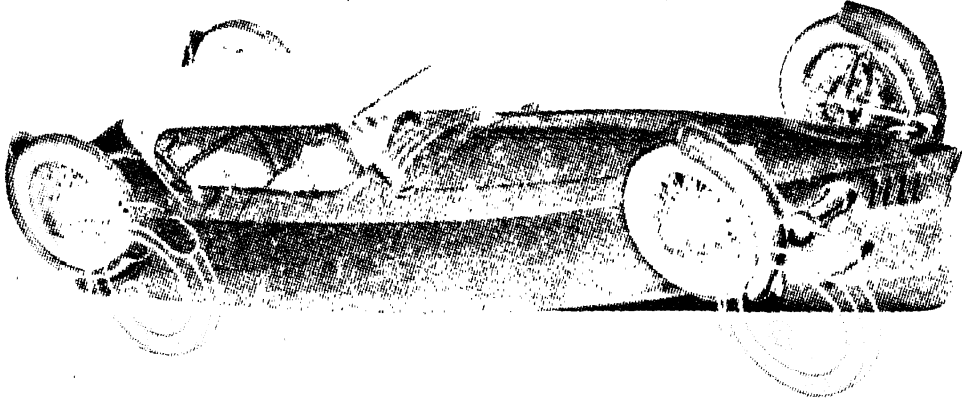
এই অভিনব গাড়ী রাস্তায় ও জলের উপর সমানভাবে চলে

ডাইয়িং ক্লিনিংয়ের ৫০,০০০ চিহ্ন

কাপড় জামা খুঁজে বের করবার জন্যে ডাইয়িং ক্লিনিং থেকে কাপড়ের উপর নানা রকম চিহ্ন দেওয়া হয়। আমেরিকার জনৈক ভদ্রলোকের বিভিন্ন স্থানের ডাইয়িং ক্লিনিং থেকে এই ধরণের বিভিন্ন চিহ্ন সংগ্রহ করবার বাতিক ছিল। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি আমেরিকার বিভিন্ন স্থান থেকে ছোট বড় ডাইয়িং ক্লিনিংয়ের ব্যবহৃত প্রায় ৫০,০০০ চিহ্ন সংগ্রহ করেন। চিহ্ন সংগ্রহ করতে ভদ্রলোকের অর্থব্যয় এবং যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আমরা হয়ত ভদ্রলোকের মাথার স্থিরতা সম্বন্ধে নানা সন্দেহ প্রকাশ করছি। ভাবছি, এ ধরণের বাতিকের কিছু মানে আছে না কি? মানে যে ছিল তা পরের ঘটনাটুকু শুনলেই বুঝতে পারবেন। তাঁর সংগ্রহিত ডাইয়িং ক্লিনিংয়ের চিহ্নের সাহায্যে ১৫০টি জটিল হত্যাকাণ্ডের সূত্র খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশ বহু মূল্য দিয়ে তাঁর কাছ থেকে চিহ্নের ফাইলটি কিনে নেয়। সেই সময় থেকে সেখানকার পুলিশ অফিসেও বিভিন্ন ডাইয়িং ক্লিনিংয়ের ব্যবহৃত চিহ্ন রেখে দেবার ব্যবস্থা সুরু হ'ল।

দর্শকের শক্তি

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, ফুটবল খেলায় ১০০,০০০ লোকের কথাবার্ত্তায় যে 'এনারজি'র বিকাশ হয় তাকে উত্তাপে পরিণত করলে এক কাপ চা সহজেই গরম করা চলে।

অভিনব ঘড়ি

দেওয়াল ঘড়ি দেওয়ালে টাঙ্গানো অবস্থায় যদি সামনে থেকে না দেখে পাশ থেকে দেখা যায় তাহলে প্রকৃত সময় ঠিক পাওয়া যায় না; সময়ের বেশ তারতম্য দেখা যায়। সম্প্রতি, আমেরিকার কোন প্রসিদ্ধ ঘড়ি ব্যবসায়ী এক অভিনব ঘড়ি আবিষ্কার করেছেন। এই অভিনব ঘড়িকে যে কোন দিক থেকে দেখলে নির্ভুল সময় পাওয়া যায়।
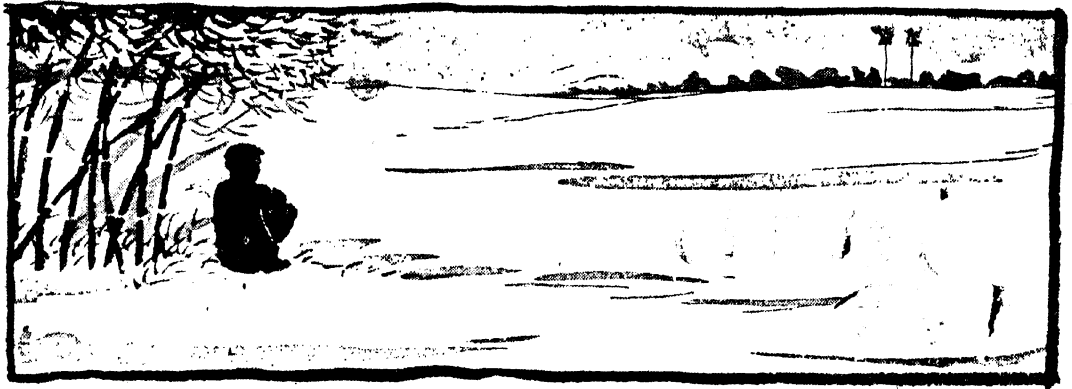
আজ-কাল

বড়লাটের ঘোষণা

কংগ্রেস 'জাতীয়' গবর্ণমেণ্ট গঠনের সর্ত্ত দিয়ে সহযোগিতার প্রস্তাব করার পর বড়লাট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে এক ঘোষণা করেছেন। তাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটিশ নীতি যথারীতি ঘোরালো ভাষায় বর্ণনা করে' নিম্নলিখিত তিনটি 'অফার' দেওয়া হয়েছেঃ—(১) প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয়দের নিয়ে বড়লাটের শাসন পরিষদ বাড়ানো হবে; (২) ভারতীয় নৃপতিদের প্রতিনিধি এবং ভারতের অন্যান্য স্বার্থের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা সমর পরিচালন পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা হবে; (৩) যুদ্ধ মেটার পর নতুন শাসনতন্ত্রের কাঠামো ঠিক করবার জন্যে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান প্রধান স্বার্থের প্রতিনিধিমূলক একটা সংসদ গঠন করা হবে। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র ও বর্ত্তমান নীতি তখন আবার পর্য্যালোচনা করা যাবে। কিন্তু যে সিদ্ধান্তই তখন করা হোক, তা দ্বারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বাধ্যবাধকতা ক্ষুন্ন করা চলবে না; আর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এমন কোনো শাসন ব্যবস্থার কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন না, যার সম্বন্ধে ভারতীয় জাতীয় জীবনে বিশেষ বিশেষ স্বার্থবানদের (সংখ্যালঘু) আপত্তি আছে।

কংগ্রেসের অসন্তোষ

যুদ্ধ বাধার পর বড়লাট যে প্রথম ঘোষণা করেছিলেন তার সংগে বর্ত্তমান ঘোষণার মূলত কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং এ ঘোষণায় সাড়া দেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব বলে' মনে হয় না। ঘোষণার পর বড়লাট ভারতীয় নেতাদের তাঁর সংগে সাক্ষাতের জন্যে ডাকেন; তন্মধ্যে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অন্যতম। কিন্তু তিনি জানিয়েছেন যে, বড়লাটের ঘোষণায় এমন কিছু নেই যা নিয়ে আলোচনার কোন কারণ আছে; সুতরাং তিনি বড়লাটের সংগে সাক্ষাৎ করতে অসমর্থ। সর্দ্দার বল্লভভাই বলেছেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি যথাসময়ে এ বিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাবেন; এ ঘোষণায় বিশেষ বিবেচনার যোগ্য নতুন কিছুই নেই। তিনি উপসংহারে বলেছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবারও কংগ্রেসের আন্তরিক সহযোগিতার প্রস্তাবের মূল্য উপলব্ধি করলেন না; তাঁদের এ ভুল ইতিহাসে বড় হয়ে থাকবে। (প্রসংগত একটা কৌতূহলকর বিষয় উল্লেখযোগ্য—গান্ধীজীর কাছে মত চাওয়া হলে তিনি বলেন, কংগ্রেস থেকে তিনি 'সম্পূর্ণ সরে' এসেছেন বলে' তাঁর পক্ষে মতামত দিতে যাওয়া অসংগত। আর রাজাগোপালাচারীর কাছে মত জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, গান্ধীজীর সংগে পরামর্শ না করে' তিনি বা ওয়ার্কিং কমিটি কোনো মত দিতে পারেন না।)

অন্যান্য দল

বড়লাটের ঘোষণায় অন্যান্য দলও বিশেষ সন্তুষ্ট হয় নি। জিন্না সাহেব মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক না করে' কিছু বলবেন না বলেছেন। সম্ভবত তিনি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত কি হয় জানবার জন্যে অপেক্ষা করছেন, কারণ সে সিদ্ধান্তের বিরোধী একটা কিছু তাঁকে করতে হবে। তবে জিন্না সাহেব বড়লাটের সংগে মোলাকাত করে' বহুক্ষণ আলাপ করেছেন। হিন্দু মহাসভা ঘোষণায় খুশী হয় নি। মহাসভা ওয়ার্কিং কমিটি আলোচনা করে' তাঁদের সিদ্ধান্ত সভারকারকে জানিয়েছেন যাতে তিনি বড়লাটের সংগে সাক্ষাতে তা পেশ করতে পারেন। একনিষ্ঠ সেবকের ছাড়া মডারেট মনও বড়লাটের ঘোষণায় উৎসাহ বোধ করে নি—স্যার চিমনলাল শীতলবাদ ও পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর বিবৃতি তার প্রমাণ।

বাঙলায় ভারতরক্ষা আইন

ব্যবস্থা পরিষদে স্যার নাজিমুদ্দীনের বিবৃতিতে প্রকাশ, বাঙলায় ভারতরক্ষা আইনে এ যাবৎ ৭১ জনকে ধরে' বিনা বিচারে আটক করা হয়, তার মধ্যে ১৭ জনকে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; ঐ আইন বলে ২৬৫ জনকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে।

ভারতরক্ষা আইনে ধরপাকড় এখনও সর্ব্বত্র সমানভাবে চলেছে। বহু পুঁথি ও পুস্তিকাও ক্রমাগত বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। বাঙলা মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। গত ১০ই আগষ্ট কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে শ্রীসন্তোষচন্দ্র বসুর সভানেতৃত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। দ্বিতীয় মিউনিসিপাল আইন সংশোধন বিল ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ করে' এবং সুভাষচন্দ্রের মুক্তি দাবী করে' সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ছাত্র বিক্ষোভ

ইসলামিয়া কলেজে পুলিশের লাঠিচালনা সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্যে বাঙলা গবর্ণমেণ্ট এক বিচার বিভাগীয় কমিটি নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র প্রতিনিধিরা এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, ঐ তদন্ত কমিটি বে-সরকারী নয় বলে' তাঁরা তদন্তে কোনোরকম সহযোগিতা করবেন না; আর তাঁদের আসল দাবী হচ্ছে ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে' শিক্ষা-বিভাগীয় ডিরেক্টর যে সার্কুলার জারী করেছেন তা প্রত্যাহার করতে হবে, তা না করা হলে তাঁরা আন্দোলন থেকে বিরত হবেন না। তদন্ত কমিটি সম্পর্কে ছাত্রদের আরও আপত্তি এই যে, শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরই আবার ঐ কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছেন।

চাঁদা আদায়

সরকারী যুদ্ধভাণ্ডারে চাঁদা দেওয়াটা অবশ্যক হতে পারে না, বিভিন্ন লোকের প্রবৃত্তির উপর সেটা নির্ভর করে। 'চাঁদা' কথাটার মধ্যে ইচ্ছার প্রশ্নটা অন্তর্নিহিত থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষুদে মাতব্বরেরা অতিরিক্ত উৎসাহে তা ভুলে যান। বাঙলার কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট তাঁদের এলাকায় নানা লোকের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে চাঁদা তলব করেছেন, অন্যথায় শাস্তির হুমকি দেখিয়েছেন, এই সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে।

ডাঃ বা ম গ্রেপ্তার

ব্রহ্মের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বা ম' ব্রহ্মরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছেন। বিচারের জন্যে তাঁকে মান্দালয়ে নেওয়া হয়েছে। মান্দালয়ে সম্প্রতি "ব্রহ্ম স্বাধীনতা সংঘ"এর সম্মেলনে ডাঃ বা ম সংঘের ডিক্টেটর নির্ব্বাচিত হন। ব্রহ্মের প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ থেইন মাউং ইতিপূর্ব্বে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। রেংগুনে তাঁর বিচার চলছে। ডাঃ মাউংও "ব্রহ্ম স্বাধীনতা সংঘ"এর সদস্য।

* * *

ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় এ পর্য্যন্ত মোট ৪১ জন লোক

মারা গেল। দুর্ঘটনা সম্বন্ধে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এখনও তদন্ত করছেন।

ইওরোপ

জার্ম্মান আক্রমণ

ইংলণ্ডের উপর জার্ম্মান বিমান-আক্রমণের তীব্রতা ক্রমশ বাড়ছে, শুক্র, শনি, রবি ও সোমবারে বেশ বড় আক্রমণ হয়েছে; একশ' দেড়শ' করে' জার্ম্মান বিমান এ কদিন এক এক জায়গায় হানা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান স্পীড বোট জলে আক্রমণ চালিয়েছে। বৃটিশ সরকারী ইস্তাহারে এক একদিন ৫০।৬০টা করে জার্ম্মান বিমান ধ্বংসের দাবী করা হচ্ছে, বৃটিশ পক্ষের ক্ষতি তার এক চতুর্থাংশ। তবে জার্ম্মান হানায় মাঝে মাঝে বেশ ক্ষতি হচ্ছে বলে স্বীকার করা হয়েছে; রবিবারের হানায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে আধ মাইল পরিমিত স্থানের সমস্ত বাড়ীঘর ধ্বংস হয়েছে। বৃটিশ জাহাজের উপরও বিশেষভাবে আক্রমণ চালানো হচ্ছে। হিটলার-সহকারী হের হেস এক বক্তৃতায় হুমকি দেখিয়েছেন যে, বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার এই সময়; বৃটেনের ভাগ্যে যে কি আছে তার কিঞ্চিৎ আস্বাদ এখন সে প্রত্যহই পাচ্ছে।

বৃটিশ বিমান বহরও প্রায় প্রত্যহ জার্ম্মান এলাকায় বিমান আক্রমণ চালিয়ে যথেষ্ট ক্ষতি করেছে।

ইতালীয় অভিযান

গত ৪ঠা আগষ্ট থেকে ইতালীয় সৈন্যবাহিনী বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডের উপর অভিযান সুরু করেছে এবং তিনদিনের মধ্যে জেইলা, হারগেইসা ও ওডউইনা দখল করে' নিয়েছে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে বার্ব্বেরা বন্দর। বার্ব্বেরা দখল করতে পারলে ইতালী এডেন উপসাগরের উপর আধিপত্য স্থাপন করবে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বল্ছেন, তাঁদের সৈন্যেরা ইতালীয়দের বাধা দেয় নি, বার্ব্বেরার পথে পার্ব্বত্য অঞ্চলে তারা লড়াই করবে। তবে তাঁরা বলছেন যে, সোমালিল্যাণ্ডের জন্যে বেশী শক্তি ক্ষয় করে' কোনো লাভ নেই, আর ইতালী ও রাজ্য দখল করলে তার কোন সুবিধে হবে না।

রুমেনিয়ার সঙ্কট

রুমেনিয়া প্রথমে হাঙ্গারী ও বুলগেরিয়ার দাবী প্রতিরোধের যে মনোভাব দেখিয়েছিল এখন তা শিথিল হয়ে গেছে। সে ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে এখন প্রস্তুত হয়েছে, তবে আপোষের মনোভাব দেখিয়ে যতটা রক্ষা করা যায়, এই তার চেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে রাজা ক্যারোল বুলগেরিয়ার রাজা বোরিসের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে নাকি অজ্ঞাত স্থানে যাত্রা করেছেন। মঃ মানিউর দল ট্রান্সিলভেনিয়া ছেড়ে দেওয়ার বিরোধী ছিলেন; কিন্তু তাঁরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ছাড়া আর কিছু করতে পারবেন বলে' মনে হয় না। সোভিয়েটের কাছ থেকে নাকি মঃ মানিউ জানতে পেরেছেন যে, রুমেনিয়া যদি হাঙ্গারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তা হলে জার্ম্মানরা সমস্ত ট্রান্সিলভেনিয়া দখল করে' নেবে এবং সে ক্ষেত্রে সোভিয়েট কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালার পশ্চিমে অধিকাংশ রুমেনিয়ান রাজ্য দখল করবে। জার্ম্মানী ও ইতালী হাঙ্গারীর পক্ষ থেকে চাপ দিতে থাকায় রুমেনিয়ানদের পক্ষে বিশেষ কিছু গোলমাল করবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

মঃ কুসিনেন

এ সপ্তাহে খবর পাওয়া গেল, ফিনিশ কমিউনিষ্ট নেতা মঃ কুসিনেন ফিনিশ-কারেলিয়া সোভিয়েট গণতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসাবে সুপ্রীম সোভিয়েটের অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হয়েছেন। খবরটা আশ্চর্য্যের। কারণ সোভিয়েট-ফিনিশ যুদ্ধের শেষ দিকে 'রয়টার' ফলাও করে এইরকম খবর রটিয়েছিলেন যে, ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েট বিপর্য্যস্ত হওয়ায় 'ডিক্টেটর' ষ্টালিন ক্ষেপে গিয়ে কুসিনেনকে কোতল করেছেন। কাহিনীটা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা সে খবর পরে 'রয়টার' কষ্ট করে' জানানো প্রয়োজন বোধ করেন নি। কোন্ কোন্ সংবাদের মধ্যে মনস্তত্ত্বের প্রভাব কতখানি থাকে পাঠক হিসেবে জানতে আমাদের কৌতূহল হয়।

প্রাচ্য পরিস্থিতি

এ সপ্তাহে ফরাসী ইন্দোচীনের অবস্থা গুরুতর হয়ে ওঠে। খবর পাওয়া যায় জাপান ইন্দোচীনে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করবার এবং চীন অভিমুখে যাবার জন্যে জাপ সৈনাদের পথ পাওয়ার দাবী জানায়। দাবী স্বীকার না করলে সে বলপ্রয়োগের হুমকি দেখায়। সঙ্গে সঙ্গে জাপ নৌবহর ইন্দোচীনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং বহু জাপ সৈন্য ও সমরোপকরণ ইন্দোচীনের উত্তর পূর্ব্বে হাইনান দ্বীপে এসে সমবেত হয়। প্রথমে শোনা যায় পেত্যাঁ গবর্ণমেণ্ট জাপানকে প্রতিরোধ করবার সংকল্প করেছেন এবং ইন্দোচীনে দ্রুত সামরিক তোড়জোড় চলছে; পরে খবর আসে, ফরাসী কর্তৃপক্ষ একটা মিটমাটের জন্যে জাপ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করছেন। হিটলার ও মুসোলিনী নাকি জাপানের দাবী স্বীকার করে' নেবার জন্যে মার্শাল পেত্যাঁর উপর চাপ দিচ্ছেন।

এ অবস্থায় চীন ঘোষণা করে যে, জাপ-সৈন্য ইন্দোচীন চড়াও করলে চীনা সৈন্যেরা ইন্দোচীনে প্রবেশ করবে; তারা নির্ব্বিবাদে ও দিক থেকে জাপানীদের আসতে দেবে না।

এই সময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হঠাৎ সাংহাই ও উত্তর চীন থেকে তাঁদের সৈন্য দল অপসারিত করেন। প্রথমে এটাকে জাপ তোষণের নীতি বলে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু পরে অনুমান করা হয় যে, বৃটেন সম্ভবত জাপানের সঙ্গে একটা গোলমাল বাধবার আশঙ্কা করছে, সেই জন্যে বিচ্ছিন্ন সৈন্য দলকে এই-ভাবে সরিয়ে আনা হল, নইলে ঐ সব সৈন্য জাপানীদের কবলিত হবে।

জাপানে বৃটিশ-বিদ্বেষও আবার তীব্র হয়ে উঠেছে। নানা জায়গায় বৃটিশ বিরোধী জনসভা হচ্ছে; টোকিওতে এক জনসভায় এক লক্ষ লোক বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে (প্রস্তাবগুলির মর্ম্ম কি তা রয়টার জানান নি)। জাপ-জাতীয়তাবাদী সঙ্ঘগুলি বৃটিশ দূতাবাসের জাপানী কর্ম্মচারীদের কাজ ছেড়ে দিতে বলেছে। বৃটিশ দূতাবাসের ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বাড়ীতে যে সব জাপানী চাকর চাকরাণী কাজ করে তাদের এই বলে' ভয় দেখানো হয়েছে যে, কাজ না ছাড়লে তাদের খুন করে ফেলা হবে। ওসাকার বৃটিশ কন্সালেট বিশেষ পাহারার জন্যে জাপ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেছিলেন; কিন্তু তাঁদের আবেদন নাকি অগ্রাহ্য হয়েছে।

-৮-৪০

—ওয়াকিফহাল

ব্যাডমিণ্টন খেলার মর্য্যাদা বৃদ্ধি

ব্যাডমিণ্টন খেলা পৃথিবীর ক্রীড়াক্ষেত্রে বহুদিন হইতেই স্থানলাভ করিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনও গঠিত হইয়াছে। পৃথিবীর টেনিস খেলোয়াড়গণের সংখ্যা অপেক্ষা ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়গণের সংখ্যা যে বেশী, ইহাও জোর করিয়া বলা চলে। কিন্তু তাহা হইলেও ব্যাডমিণ্টন খেলা পৃথিবীর ক্রীড়ামোদিগণের নিকট টেনিস খেলার ন্যায় সম্মানলাভ করে নাই ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। টেনিস খেলার ন্যায় ব্যাডমিণ্টন খেলা যাহাতে মর্য্যাদা লাভ করে, তাহার জন্য সম্প্রতি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের পরিচালকগণ চেষ্টা করিতেছেন। টেনিস খেলায় ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ন্যায় একটি ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ফেডারেশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ করিতেছেন। এই প্রতিযোগিতার জন্য ফেডারেশনের সভাপতি স্যার জে টমাস একটি কাপ প্রদান করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতা ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্যেক দেশ এই প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের দেশের প্রতিনিধিগণকে ফাইনালে খেলিবার পূর্ব্বে তিনটি বিভাগীয় প্রতিযোগিতার একটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। নিম্নে তিনটি বিভাগীয় বা জোন প্রতিযোগিতার নাম প্রদত্ত হইলঃ—ইউরোপীয়ান, আমেরিকান ও অষ্ট্রেলিয়ান। ভারতীয় খেলোয়াড়গণকে অষ্ট্রেলিয়া বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। ভারতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন উপলক্ষে কলিকাতায় নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামী ডিসেম্বর মাসে এক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। এই প্রতিযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

এইরূপ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হওয়ায় ব্যাডমিণ্টন খেলার মর্য্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইল। টেনিস খেলোয়াড়গণের ন্যায় পৃথিবীর ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়গণের সমতুল্য সম্মানলাভের উপায় হইল। ব্যাডমিণ্টন ক্রীড়াকৌশলের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযোগিতায় খেলার প্রথম প্রবর্ত্তক ভারতবর্ষের সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষ যে ব্যাডমিণ্টন খেলার প্রথম প্রবর্ত্তক ইহা অনেক ক্রীড়ামোদীই অবগত নহেন। এইজন্য দায়ী নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ। যাহা হউক সকল ক্রীড়ামোদীর অবগতির জন্য নিম্নে ব্যাডমিণ্টন খেলার পূর্ব্ব ইতিহাস প্রদত্ত হইল।

ব্যাডমিণ্টনের পূর্ব্ব ইতিহাস

এই খেলাটি সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতের কোন্ অঞ্চল সর্ব্বপ্রথম এই খেলার প্রবর্ত্তন করে তাহার কোনই ইতিহাস নাই। তবে ইংল্যাণ্ডে এই খেলাটি প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে বোম্বাইএর পুনা শহরে এই খেলার যে চলন ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৬৮ সালে পুনা শহরে ডিউক অফ বোফোর্ট রেজিমেণ্ট দলের কয়েকজন সৈনিক এই খেলাটির আবিষ্কার করে। খেলার নিয়মকানুন পর্য্যন্ত স্থানীয় খেলোয়াড়-গণের নিকট হইতে সংগ্রহ করে। এই বোফোর্ট রেজিমেণ্ট দল ১৮৭৩ সালে যখন ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যায় তখন এই খেলাটির প্রচলনের ইচ্ছা যেসকল সৈনিকগণ শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাদের মনে জাগে। তাঁহারা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিভিন্ন স্থানে এই খেলার কৌশলাদি প্রদর্শন করেন। এই সময় এই বোফোর্ট সৈনিকদল গ্লষ্টারসায়ারের ব্যাডমিণ্টন ফোর্টে অবস্থান করিতে-ছেন। ১৮৮৭ সালে এই ফোর্টের মধ্যে উক্ত সৈনিকগণের প্রচেষ্টায় প্রথম ব্যাডমিণ্টন খেলার নিয়মকানুন নূতন করিয়া গঠন করা হয়। ব্যাডমিণ্টন ফোর্টের মধ্যে এই সকল ব্যবস্থা হওয়ায় খেলার নাম দেওয়া হইল "ব্যাডমিণ্টন"। ইহার পর অল্প সময়ের মধ্যেই এই খেলাটি ইংল্যাণ্ডে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৮৯৫ সালে ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে এই খেলাটির সুপরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯৯ সালে নিখিল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় ও ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। ১৯০৩ সাল হইতে আন্ত-র্জ্জাতিক ব্যাডমিণ্টন খেলার ব্যবস্থা হয়। তবে এই প্রতি-যোগিতায় ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের খেলোয়াড়গণ ব্যতীত ইউরোপের অন্য কোন দেশের খেলোয়াড়গণ যোগদান করেন নাই। ইহার পরবর্ত্তী বৎসর হইতে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এই খেলার উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাডমিণ্টন খেলার খবর ভারতে পৌঁছিলে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ পূর্ব্বপ্রচলিত আইনকানুন ত্যাগ করিয়া ইংল্যাণ্ডের প্রবর্ত্তিত নূতন আইনকানুন গ্রহণ করত খেলার প্রচলনের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। প্রথমে বোম্বাই ও মাদ্রাজ অঞ্চলে এই খেলার বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে এই খেলা ভারতের সর্ব্বত্র জনপ্রিয়তা লাভ করিল। ইংল্যাণ্ডের ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের নিয়মানুসারে সকল স্থানেই খেলা পরিচালিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বের প্রচলিত ভারতীয় নিয়মাবলীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইল। নিয়মাবলীর অস্তিত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে খেলাটি যে ভারতীয় খেলা ইহা জানিবার পর্য্যন্ত উপায় রহিল না। এইজনাই বর্ত্তমানে যাঁহারা এই খেলার প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই আশ্চর্য্য হইয়া যান যখন বলা হয় যে ব্যাডমিণ্টন খেলা ভারতীয় খেলা, বৈদেশিক খেলা নহে। ইহা যে কত দুঃখের বিষয় তাহা বলাই বাহুল্য।

সমর বার্তা

৭ অগস্ট।—

কায়রোতে প্রকাশিত ৫ অগস্টের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ডের উপর ৪ অগস্ট হইতে ইতালীয়দের অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। তিনটি বাহিনী তিন দিক হইতে উডউইনার, হারগেসা ও গারাগারার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

মস্কো রেডিও—প্রশান্ত মহাসাগরে সোভিয়েট নৌবহরের ব্যাপক মহড়া চলিতেছে।

ওআশিংটনে অপরাধ সম্বন্ধীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈঠকে উক্ত বৈঠকের সাব-কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ, যুদ্ধারম্ভের পর জার্মন ও ইতালীয় গুপ্তচরেরা দৌত্য বিভাগ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সাজিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকা ছাইয়া ফেলিয়াছে।

মস্কোর ৬ অগস্টের সংবাদ—সোভিয়েট পার্লামেণ্ট সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবার এস্তোনিয়াকৃত আবেদন অনুমোদন করিয়াছেন।

৮ অগস্ট।—

সকালে ইংলিশ চ্যানেলের পোতসমূহ জার্মন বিমান কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। জার্মনের ৯টি ও ইংরেজদের ২টি বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। ব্রিটেন বিমান বহর আর আর শত্রুস্থানেও হামলা করিয়া আসিয়াছে।

কাইরোর এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ৫ অগস্ট ইতালীয় সৈন্যেরা বিনা বাধায় জীলায় প্রবেশ করে। ১৯৩৫ সালে ইতালিকে জীলা দান করিবার প্রস্তাব করা হয়, ইতালি প্রত্যাখ্যান করে। এই কারণে জীলা অরক্ষিত ছিল। কাল ইতালীয়দের হারগেইসা দখলেরও সংবাদ আসিয়াছে।

বার্লিনের সংবাদ—হিটলার ঘোষণা করিয়াছেন, ভবিষ্যতে আলসাস, লোরেন আর লুক্সেমবুর্গ সরাসরি হিটলারের অধীন শাসনকর্তাদের দ্বারা শাসিত হইবে।

জুলাই মাসে ব্রিটেনে জার্মনদের হাওয়াই হামলার ফলে ২৫৮ অসামরিক জন নিহত, ৩২১ জন গুরুতর আহত হইয়াছেন।

৯ অগস্ট।—

ইংলিশ চ্যানেলে কাল সারা দিনব্যাপী প্রচণ্ড আকাশযুদ্ধ হইয়াছে। প্রকাশ, এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের ৬০টি বিমান বিনষ্ট। জার্মন বিমানগুলি প্রধানত ব্রিটিশ 'কনভয়'এর উপরেই আক্রমণ চালায়। ইংরেজদের মোট ৫০৩৯ টন ওজনের জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে, ৭টি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত। ইংরেজদের ১৬টি বিমানের কোনও খোঁজ নাই। চেরবুর্গ ও হল্যান্ডের হ্যামস্টিড বিমান ঘাঁটিতে ইংরেজরা হাওয়াই হামলা করে।

সাংহাই-এর সংবাদ—ফর্মোসা হইতে বৃহৎ জাপ নৌবহর ইন্দোচীনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ২০টি যুদ্ধ জাহাজ টোংকিন উপসাগরে সমবেত। ইন্দোচীন আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত হইতেছে। প্রকাশ, জাপান ইন্দোচীন দিয়া চীন আক্রমণের পথ চাহিতেছে।

কায়রোর সংবাদ—লিবিয়ার আকাশে ইতালীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের প্রচণ্ড আকাশ যুদ্ধে ইতালির ১৫টা বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। দুইটি ব্রিটিশ বিমান নিরুদ্দেশ।

১০ অগস্ট।—

গতকল্য রাত্রে জার্মন বিমানসমূহ ইংলান্ডের বিভিন্ন জেলায় বোমা বর্ষণ করিয়াছে। ইংরেজরাও বহু শত্রুস্থানে হাওয়াই হামলা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। শত্রুপক্ষের বিমান ঘাঁটিই ইংরেজদের লক্ষ্য ছিল।

লন্ডনের সংবাদ—ইতালীয় বিমানসমূহ এডেন উপসাগরস্থিত ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজগুলির উপর আক্রমণ চালায়। ক্ষতির সংবাদ নাই। তরুক বন্দরে ও সোমালিল্যান্ডে সম্প্রতি স্থাপিত ইতালীয় হেড কোআর্টারসে ইংরেজদেরও বোমারু বিমান হামলা করিয়াছে।

ডেলি হেরাল্ড পত্রের সংবাদদাতার মতে পেতাঁ গভর্নমেণ্ট জাপানকৃত ইন্দোচীনে জাপানীদের সামরিক বিমান ও নৌঘাঁটি স্থাপন এবং ফরাসী এলাকার মধ্য দিয়া ইউনস প্রদেশে সৈন্য প্রেরণের সুবিধা দান, এই দুই দাবি মানিয়া লইবেন বলিয়া আশা করিয়াছেন। ডোমাই-এজেন্সির এক সংবাদে প্রকাশ, কাল চুংকিংএ জাপানীদের হাওয়াই হামলার ফলে চিয়াং কাইসেকের বাসভবনের কতক অংশ বিধ্বস্ত হইয়াছে।

১১ অগস্ট।—

আজ প্রাতে ডোভার প্রণালীর উপর প্রচণ্ড আকাশ যুদ্ধের পর জার্মনদের বিমান ওয়েমাউথ ও পোর্টল্যান্ড আক্রমণ করে। আজিকার সংঘর্ষে জার্মনদের ৫০টি এয়ারোপ্লেন নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইংরেজদের ১৯টা এয়ারোপ্লেনের কোনও সংবাদ নাই। ১০ অগস্টের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে ইংরেজদের হাওয়াই হামলার ফলে নানাস্থানে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে।

বুখারেস্টএর ১০ অগস্টের সংবাদ—রুমানিয়া হাঙ্গারি ও বুলগেরিয়াকে ভূখণ্ড প্রত্যর্পণে সম্মত হইয়াছে। জার্মনি ও ইতালির চাপেই নাকি রুমানিয়ার এই মতিপরিবর্তনের কারণ।

ওআশিংটনে ১০ অগস্টের সংবাদ—ওয়াকিফহাল মহলের সংবাদ—জাপানীরা ইন্দো-চীন আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য ভিসি গভর্নমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন।

১২ অগস্ট।—

আজ অপরাহ্ণে দক্ষিণপূর্ব ইংলন্ডের এক শহরে জার্মনরা প্রচণ্ড হাওয়াই হামলা করে। অনুমান ৩০টা জঙ্কর ও ৮৮টা ডাইভ বোম্বার এই হামলায় ব্যাপৃত ছিল। ৫টা বিমান ভূপাতিত হয়। রবিবারে ও সোমবারের আকাশযুদ্ধে ৭২টা জার্মন বিমান ধ্বংস ও ২৬টা ব্রিটিশ বিমান নিরুদ্দেশ হইয়াছে। ইংরেজদের বিমানও বহু শত্রুস্থানে হামলা করিয়া আসিয়াছে।

টোকিওর সংবাদ—টোকিওর হাইড পার্কে এক ব্রিটিশবিরোধী সভায় এক লক্ষ লোক যোগদান করে। সভার সজ্জায় জাপ পতাকার দুই পার্শ্বে ইটালি ও জার্মান পতাকা শোভিত ছিল।

রোমের সংবাদ—গ্রীক আলবেনিয়ান সীমান্তে একজন দেশ-প্রেমিককে গ্রীক গুপ্তচরেরা হত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ রটিয়াছে। ফলে ইতালীয় ও আলবেনিয়ান সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়াছে।

১৩ অগস্ট।—

লন্ডনের নিউইয়র্ক হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ফ্রান্স হইতে ব্রিটিশ উপকূলে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। লন্ডনে এ সংবাদ অসমর্থিত। ব্রিটেনের উপকূলে অবিরাম বিমান যুদ্ধ চলিতেছে। সকালে ইংলন্ডের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে প্রবল আকাশযুদ্ধ হয়। একজন পর্যবেক্ষক বলেন, যদিও মেঘের আড়ালে যুদ্ধ চলিতে-ছিল তথাপি শব্দ শুনিয়া মনে হইতেছিল যে, দুই-তিন মিনিট অন্তর ঢেউএর পর ঢেউএর মত এয়ারোপ্লেন আসিতেছে। প্রকাশ, ৫০০ হইতে ৬০০ এয়ারোপ্লেন আজিকার যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। সোম ও মঙ্গলবারে জার্মানদের ৮৯টা বিমান নষ্ট হইয়াছে, ইংরেজদের ১৭টা নিরুদ্দেশ। জার্মান এলাকায় ইংরেজদেরও যথাপূর্ব হাওয়াই হামলা চলিয়াছিল।

সাংহাই-এর সংবাদ—ইন্দোচীন সম্বন্ধে ফ্রান্স ও জাপানের মধ্যে নাকি আপস হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৭ অগস্ট।—

আজ অপরাহ্ণে শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে অনুষ্ঠিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথকে 'ডক্টর অব লিটারেচর' উপাধি ভূষিত করা হইয়াছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে সার্ মরিস গায়ার রবীন্দ্রনাথকে সনদ দান করেন। বলেন, 'হে শ্রদ্ধেয়, বিদ্বান ও বাণীর প্রিয়তম পূজারী, ভাইস চানসেলারের প্রতিনিধিরূপে এবং সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া আমি আপনাকে এই 'ডক্টর অব লিটারেচর' উপাধি প্রদান করিতেছি।' অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত হেণ্ডারসন উপাধি দানের জন্য সার্ মরিস গায়ারকে আমন্ত্রণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বহু সাধুবাদে পূর্ণ এক বক্তৃতা করেন। সার্ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন রবীন্দ্রনাথকে উপাধি প্রদান উপলক্ষে লাটিন ভাষায় রচিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাষণের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত বড়লাটের এক ঘোষণায় প্রকাশ, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে এইসব বিষয় সম্বন্ধে অধিকার দিয়াছেন।—(১) শাসন পরিষদে যোগদান করিবার জন্য কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয়কে আমন্ত্রণ, (২) যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতা পরিষদ প্রতিষ্ঠা, (৩) সংগ্রামের শেষে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের নূতন কাঠামো স্থির করিবার জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান প্রধান স্বার্থের প্রতিভূ লইয়া একটি সংসদ গঠিত হইবে, এই বিষয়ের ঘোষণা। প্রথমতঃ প্রতিভূ গঠিত সংসদটির রূপ ও তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি এবং দ্বিতীয়তঃ শাসনতন্ত্রের নীতি ও কাঠামো সম্বন্ধে ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয়রা যদি আপসের ভিত্তিতে উপনীত হইবার জন্য আন্তরিকভাবে কোনও কার্যকর উপায় অবলম্বন করেন তো ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট হৃষ্টচিত্তে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন।

ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় আহতজনদের মধ্যে আরও চারজন মারা গিয়াছেন।

৮ অগস্ট।—

বোম্বাইএর ৭ অগস্টের সংবাদ—শ্রীযুক্ত বড়লাটের বিবৃতি সম্পর্কে শীঘ্রই শ্রীযুত আজাদ, শ্রীযুত জিন্না, সার্ দেলভি, শ্রীযুক্ত সাভারকর, ডাঃ আম্বেদকর, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার হইবে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। শঙ্কার কারণ নাই।

৯ অগস্ট।—

মোরাদাবাদ জেলার জলপার নামক এক গ্রামের নিকট কে বা কাহারা রোহিলখণ্ড কুমায়ুন রেলপথের দুইটি ফিশপ্লেট সরাইয়া দেয়। তাহা একজন কীম্যানের নজরে পড়ায় দুর্ঘটনা নিবারিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত কে এম আমেদের সভাপতিত্বে কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে এক ছাত্র সভায় ডি পি আই-এর সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবি এবং ছাত্রকর্মীদের গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সিমলার এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, রেল কর্মচারীদের মাগগি ভাতা দেওয়ার বিষয় তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য ভারত সরকার একটি তদন্ত কোর্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১০ অগস্ট।—

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর সভাপতিত্বে বর্তমান অধিরাষ্ট্রীয় (international) অবস্থা এবং বাঙলার প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিমণ্ডলীর সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট নীতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য শনিবার মধ্যাহ্নে দেশবন্ধু পার্কে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। প্রায় ২৫ হাজার লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্গালার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর সাম্প্রদায়িক কার্যপ্রণালীর প্রতিবাদকল্পে রাজবাড়ি, যশোহর, বিষ্ণুপুরে (২৪ পরগনা), নবদ্বীপ, সিউড়ি, বর্ধমান প্রভৃতি বহুস্থান হইতে নিখিল বঙ্গ প্রতিবাদ দিবস পালনের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় আহতজনের আর একজন মৃত হইয়াছেন। মৃতের সংখ্যা মোট ৪০ জন হইল।

শ্রীযুক্ত বড়লাটের শেষ বিবৃতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য শ্রীযুক্ত আজাদ আগামী ১৮ অগস্ট ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন।

ভারতরক্ষা আইন।—প্রভাব অল্পাধিক পূর্ববৎ। আজ কলিকাতা, দিনাজপুর, হাওড়া, চট্টগ্রাম, শ্রীরামপুর, বর্ধমান, বীরভূম, গড়বেতা (মেদিনীপুর), বারাণসী, হাজারিবাগ, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর প্রভৃতি বহু স্থানের ধরপাকড়, খানাতল্লাশ, কারাদণ্ড বহিষ্কার প্রভৃতির সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

১১ অগস্ট।—

বাঙ্গালার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর সাম্প্রদায়িক কার্যপ্রণালীর প্রতিবাদ ও প্রতিকারকল্পে শিবপুর, উত্তরপাড়া, রাইলাদি (ঢাকা), বহরমপুর, বৈদ্যবাটী, স্থলনওহাটা, কলমা, মাদারিপুর, গুরুদাসপুর (রাজশাহি), সোতাল (খুলনা), জেমো (কালনা), বরিশাল, নড়াইল, রূপপুর (পাবনা), দেওভোগ (ফরিদপুর), সুসলী (ময়মনসিংহ), পাড়েরহাট, নান্দাইল, গোপালনগর, জঙ্গীপুর, চাউমোহর প্রভৃতি বহুস্থান হইতে নিখিল বঙ্গ প্রতিবাদ দিবস পালনের সংবাদ আসিয়াছে।

কংগ্রেস কর্তৃক সুভাষচন্দ্র, স্বামী সহজানন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উপর যে শাস্তি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদকল্পে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে অ্যালবার্ট হলে এক বিরাট জনসভায় সুভাষ নিষেধাজ্ঞা দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

নাগপুরে অধিবেশিত ভারত হিন্দু মহাসভার ওআর্কিং কমিটি শ্রীযুক্ত বড়লাটের ঘোষণায় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

১২ অগস্ট।—

আজ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় দোকান কর্মচারী বিলের কয়েকটি ধারা গৃহীত হইয়াছে। তাহাদের মর্ম মোটামুটি এইরূপ।—প্রত্যেক দোকান সপ্তাহে অন্তত দেড় দিন বন্ধ রাখিতে হইবে, প্রত্যেক কর্মচারীকে অন্তত দেড় দিন ছুটি দিতে হইবে, দিনে ১০ ঘণ্টার বেশী কাহাকেও খাটানো চলিবে না, রাত্রি ৮টার পর কোনও দোকান খোলা থাকিবে না।

ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে আরও একজন মারা গিয়াছেন। মোট মৃত্যু সংখ্যা ৪১ জন হইল।

আজ বোম্বাইএ শ্রীযুক্ত জিন্নার সঙ্গে শ্রীযুক্ত বড়লাটের সাক্ষাৎকার হইয়াছে।

১৩ অগস্ট।—

'নিউজ ক্রনিকল' পত্রের অনুরোধে মহাত্মাজী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বড়লাটের বিবৃতি নৈরাশ্যজনক। ইহাতে কংগ্রেস ও ইংলণ্ডের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রিটেন যদি ভারতের প্রতি ন্যায়বিচার করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াইবার দাবি সে করিতে পারে না। মিথ্যা স্তোকবাক্য ও অনান্তরিক ব্যবহারে কোনও কিছুরই প্রতিকার অসম্ভব।

যক্ষ্মা চিকিৎসা (প্রথম খণ্ড)ঃ—শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, রসসিন্ধ, ভিষগাচার্য, জ্যোতির্ভূষণ। গ্রন্থকার কর্তৃক ১৭২ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

এই পুস্তকে যক্ষ্মা রোগের আয়ুর্বেদসম্মত চিকিৎসার প্রণালী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা প্রথম খণ্ড; অন্যান্য খণ্ড ক্রমে প্রকাশিত হইবে বলিয়া ভূমিকায় উল্লেখ আছে। প্রথম খণ্ড সাত অধ্যায়ে বিভক্ত। ১ম অধ্যায়ে রোগের প্রথম অবস্থা, অন্যান্য ব্যাধি হইতে এই রোগের উৎপত্তি, বিভিন্ন অঙ্গে যক্ষ্মা, রোগের কারণ, ফুসফুসের যক্ষ্মার প্রথম অবস্থার স্বরূপ, স্ত্রীলোকদের আন্ত্রিক যক্ষ্মা; ২য় অধ্যায়ে রোগের মধ্য অবস্থা; ৩য় অধ্যায়ে শেষ অবস্থা; ৪র্থ অধ্যায়ে নাড়ীবিজ্ঞান; ৫ম অধ্যায়ে যক্ষ্মার শাস্ত্রীয় নিদান ও লক্ষণ; ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে চিকিৎসা, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা; ৭ম অধ্যায়ে রোগের প্রথম অবস্থায় প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন প্রকার যক্ষ্মার চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের ভাষায় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি নাই বলিলেই হয়। সে হিসাবে কবিরাজ মহাশয়ের এই উদ্যম প্রশংসনীয়। আমরা এই গ্রন্থের সমাদর দেখিলে সুখী হইব।

বইটির কাগজ উত্তম নয়; যুদ্ধের বাজারে কাগজের দুর্মূল্যতাই তাহার কারণ বলিয়া মনে করি। ১৬২ পৃষ্ঠাযুক্ত গ্রন্থের আড়াই টাকা দাম খুব বেশী বলিয়া মনে হয়, যদিও সাধারণত চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকের দাম কিছু অধিক হওয়াই বিধি।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা—শ্রীঅনিলবরণ রায়, তৃতীয় খণ্ড। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে; মূল্য ৯/০ আনা। প্রকাশক—শ্রীবিভূতিভূষণ রায়, ১০৮।১, মনোহরপুকুর রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

শ্রীযুত অনিলবরণ রায় মহাশয়ের বৃহৎ সংস্করণ গীতার তৃতীয় খণ্ড আমরা পাইয়াছি। অনিলবরণের ব্যাখ্যার একটা বিশেষত্ব আছে; সে ব্যাখ্যা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনই সুপরিস্ফুট, পারিভাষিক জটিলতা এ ব্যাখ্যায় নাই এবং ধারণার অস্পষ্টতাও নাই। আমরা তাঁহার গীতা পাঠ করিয়া প্রকৃতপক্ষেই মুগ্ধ হইয়াছি। বাঙলার ঘরে ঘরে ইহার প্রচার হওয়া উচিত।

নারী প্রগতিঃ—লেখক শ্রীপ্রবোধ সরকার, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

লেখক প্রারম্ভে জানিয়েছেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যুগধর্ম্মী নবীন ও প্রবীণ সম্প্রদায়ের সহানুভূতি হতে বইখানি বঞ্চিত হবে না।' অবশ্য আপনার দৌর্ব্বল্য সম্বন্ধে স্বার্থপরতা আপামর সাধারণের মজ্জাগত, তাই তাঁরা নিজ রচনাকে ট্রাজিডির পরাকাষ্ঠা বলে ভাবতে পারেন। আলোচ্য পুস্তক সমালোচনা ক'রতে গিয়ে এই কথাটিই সবচেয়ে আগে মনে পড়বে আর এই ধারণাই বদ্ধমূল হবে যে, 'যুগ-ধর্ম্মী নবীন ও প্রবীণ উভয় সম্প্রদায়ই' মূল পুস্তকের চেয়ে প্রচ্ছদ-পটের উপরই আকৃষ্ট হবেন বেশী। প্রগতি সম্বন্ধে লেখক সত্যের চেয়ে কল্পনাকেই বেশী প্রশ্রয় দিয়েছেন। লেখকের এই কাল্পনিক দৃষ্টি মোটেই উচ্চস্তরের নয়। যদিও লেখক ব'লেছেন 'সত্যে এর প্রারম্ভ আর কল্পনায় এর পরিণতি। বাস্তব জগতে এর প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত আর সম্ভবত আজও জীবিত'। বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতা বড়ই অপ্রচুর বলে মনে হয়। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

বিজ্ঞপ্তি

'দেশ'এর ৩৭ সংখ্যায় গুনাইগাছা, পাকশী হইতে শ্রীসুধাংশু ভট্টাচার্য্য লিখিত 'পৃথিবী' শীর্ষক এক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘটক আমাদিগকে জানাইয়াছেন, কবিতাটি তাঁহার এবং তাহা 'বাসি ভালো' নামে ১৩৪৬ সালের ১৫ই পৌষের দৈনিক 'যুগান্তর'এ প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকরা সাধারণতঃ ভদ্র হইবেন, এইরূপ আশা করাই স্বাভাবিক; তাই রচনা নিৰ্ব্বাচনকালে চোরের কথা আমাদের মনেই থাকে না। চোর যদি কেহ আসে তো তাহার অনিবার্য অসদাচার সম্বন্ধে পরে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর আমাদের গত্যন্তর নাই। —সম্পাদক, দেশ।

৭ম বর্ষ । শনিবার, ৮ই ভাদ্র, ১৩৪৭ সাল Saturday, 24th August, 1940 [৪১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত—

ওয়ার্দ্ধাগঞ্জে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি দীর্ঘ অধিবেশনে সম্প্রতি বড়লাট যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী নিজে এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। বড়লাটের বিবৃতিতে কংগ্রেসের দাবী স্বীকার করা হয় নাই, বরং বিপরীত কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং সে বিবৃতিতে মিটমাটের পথ খোলা আছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া সমস্যার প্রকৃত সমাধানের যে বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে আমরা এমন মনে করি না। সময়ের অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজেদের শক্তিকে সংগঠন করিবার দিকে মন দেওয়াই কংগ্রেসের বর্ত্তমানে একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু দক্ষিণী দল পরিচালিত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি সে দিকে এ পর্য্যন্ত কিছুই কার্য্যত করেন নাই; শুধু চরকার সুরেই সুর যোগাইয়া আসিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত অকেজো আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব কথা ছাড়িয়া প্রতিপক্ষকে বাধ্য করিবার মত বলিষ্ঠ কর্ম্মনীতি প্রয়োগের বাস্তব সত্যকে যদি সুপ্রতিষ্ঠিত করে, তবেই কিছু কাজ হইতে পারে। বড়লাটের বা ভারত সচিবের কোন কথার কি ভাষ্য, কি গূঢ়ার্থ ইহা লইয়া ব্যর্থ বিচার বিতণ্ডার সময় আর নাই, আবশ্যক কাজের। পরমুখাপেক্ষিতার সকল বন্ধন কাটাইয়া কংগ্রেসের দক্ষিণী দলের সাধ্য-সাধনা দেশের জনশক্তিকে জাগ্রত করিবার দিকে যদি ওয়ার্দ্ধার সিদ্ধান্ত প্ররোচিত করে, তবেই ইহা সার্থক হইবে।

বাঁটোয়ারাবিরোধী দিবস—

গত ১লা ভাদ্র, শনিবার বাঙলা দেশের সর্ব্বত্র বাঁটোয়ারা বিরোধী দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে যে সব সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বিভিন্ন দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন, ইহা আশার কথা। এ দেশকে যাহারা নিজেদের কায়েমী দখলে রাখিতে চায়, ভেদনীতি তাহাদের প্রধান অস্ত্র এবং এই অস্ত্র যতদিন তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত পরের পদলেহন করিয়া দুই চারজনের নেতাগিরি করিবার সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু দেশের বিপুল জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষিত হইবার কোন উপায় নাই। আজ আমাদের সম্মুখে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে, লোক ভুলান দুই একটা সংস্কারে তাহার সমাধান হইবে না। উপরে উপরে এখানে সেখানে দুই একটু সংস্কারের অছিলায় প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে দেশের বিরাট শোষণ পথ খোলাই রাখা হইয়াছে। দেশ বা জাতি এ অবস্থায় মানুষের মত মানুষের জীবন যাপন করিতে পারে না। আগে দরকার দেশের স্বাধীনতা এবং সেজন্য প্রয়োজন সংহতির। এই সোজা সত্যটা বুঝিতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না এবং সেজন্য বিদেশী মাতব্বরদের ভাষ্যের ভরসায় বসিয়া থাকারও কোন প্রয়োজন হয় না। সস্তায় নেতাগিরি ফলাইবার লোভে এবং নিজেদের সঙ্কীর্ণতার দায়ে যাঁহারা ভেদনীতির অন্তর্নিহিত ইতর স্বার্থের মায়ায় দেশকে বৃহত্তর স্বার্থ হইতে বঞ্চিত রাখিতেছে, দেশবাসী যে তাহাদের বিভীষণ বৃত্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে, ইহা সুখের বিষয়।

কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের দ্বিতীয় দফা সংস্কারের যে আয়োজন করা হইয়াছে, দায়িত্বশীল পৌর-প্রতিষ্ঠানস্বরূপে কর্পোরেশন যে তাহার বিরুদ্ধতা না করিয়া পারেন না, ইহা পূর্ব্ব হইতে বুঝা গিয়াছিল। কর্পোরেশন হইতে নিযুক্ত স্পেশাল কমিটি প্রকৃতপক্ষে বিলটি পরিবর্জ্জনের জন্যই সুপারিশ করেন। কর্পোরেশনের সভায় বিপুল ভোটাধিক্যে কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ সদস্যেরা পর্য্যন্ত বিলের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মিঃ বার্ণস এবং মিঃ ভার্ণনের মন্তব্য এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। তাঁহারা বলেন, এই বিলে কর্পোরেশনকে সকল ক্ষমতা হইতে এমনভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে যে, কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্মানের সঙ্গে তেমন ক্ষেত্রে কাজ চালান সম্ভব হইতে পারে না। যাঁহারা বিদেশী, তাঁহারা পর্য্যন্ত বিলের বিরুদ্ধতা করিয়াছেন; কিন্তু নিতান্ত লজ্জা এবং বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কলিকাতার পৌরবৃন্দের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্ব্বাচিত মেয়র পৌর-প্রতিনিধিদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিলটি সমর্থন করিয়াছেন। পৌর-প্রতিনিধিরা তাঁহাকে যে বিশ্বাসের আসন দিয়াছিলেন, তিনি তাহার মর্য্যাদা রাখেন নাই। সে মর্য্যাদা রাখা যদি তাঁহার স্ব বিবেক এবং বিশ্বাসের বিরোধীই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে সসম্মানে পদত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। গত ১৮ই আগষ্ট বাঙলার স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ এবং কলেজের অধ্যাপকগণ দুইটি স্বতন্ত্র সম্মেলনে সমবেত হইয়া এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দল এই সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, তাঁহারা পরিষদে এই বিল উত্থাপনের সময় হইতে বাধা দিতে আরম্ভ করিবেন; সিলেক্ট কমিটি গঠিত হইলে তাহার সদস্য পদ লইবেন না, তাহাতেও না হইলে অপরাপর কোন বিল সম্বন্ধে গঠিত সিলেক্ট কমিটির সদস্য পদ তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না। এই বিল যাহাতে প্রত্যাহৃত হয়, তজ্জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন চালাইবার জন্যও তাঁহারা সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতার নীতি বাঙলা দেশের আবহাওয়াকে দূষিত করিয়া ফেলিয়েছে; কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার নীতি যদি প্রাধান্য লাভ করে তবে এই অনিষ্টকারিতা চূড়ান্ত আকার ধারণ করিবে। বাঙালীর শিক্ষা এবং সভ্যতা বলিতে কিছু থাকিবে না। শিক্ষার আদর্শই যদি এইভাবে নষ্ট হয়, তাহা হইলে মুসলমান সম্প্রদায়েরও যে কল্যাণ ইহাতে হইবে, এমন আশা করা নিতান্তই ভ্রান্ত। সাম্প্রদায়িকতার প্রবৃত্তিকে উস্কাইলে জনকয়েকের হীন স্বার্থই সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য শিক্ষার আদর্শকে বলি দিবার ফলে জাতির ভাগ্যে যে দুর্দ্দৈব আপতিত হইবে, আমরা আশা করি, জাতির সকল সম্প্রদায়ের সুস্থচিত্ত ব্যক্তিই তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। আইন সভার জোটবাঁধা জো-হুকুমের দল দেশের স্বার্থকে বিকাইয়া দিতে পারে, জানি আমরা যে, তাহাদের অসাধ্য কিছুই নাই; কিন্তু এই জোটবাঁধা জো-হুকুমের দলই যে দেশের ভাগ্যবিধাতা নয়—বাঙলা দেশ মধ্যযুগীয় অন্ধতার গণ্ডী কাটাইয়া উপরে উঠিয়াছে, আজ এর পরিচয় বিশেষভাবে দিবার সময় আসিয়াছে। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দল এজন্য আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং দেশের প্রগতিমূলক সকল শক্তিকে সংঘবদ্ধ করিবার উদ্যমে তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। যে বাঙালী মর্লে সাহেবের পাকা সিদ্ধান্তকে কাঁচা করিয়া ছাড়িয়াছিল, সে বাঙালী যে মরে নাই কাজের দ্বারা হক মন্ত্রিমণ্ডলীকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে, নহিলে সাম্প্রদায়িকতার বিষে বাঙলার সর্ব্বনাশ হইবে।

স্বরাজ লাভে মহাত্মাজী—

মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি 'হরিজন' পত্রে স্বরাজে লাভের উপায়স্বরূপ তের দফা সম্বলিত একটি গঠনমূলক কর্ম্ম-তালিকা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই কর্ম্মতালিকায় হিন্দু-মুসলমান অথবা সাম্প্রদায়িক ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, মদ্যপান নিবারণ, খাদি, অন্যান্য গ্রাম শিল্প, গ্রাম স্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা, স্ত্রীলোকদের উন্নতি সাধন, স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর পালনোচিত শিক্ষা, রাষ্ট্রভাষার প্রচার, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ এবং অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা অনেক আছে এবং স্বাধীন, অ-স্বাধীন সব জাতিরই ন্যূনাধিক পরিমাণে দুর্ব্বলতা থাকে। সেইগুলি বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া এক একটি করিয়া সংশোধন করিবার পর, তবে যদি জাতিকে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে জগতে বোধ হয় এমন কোন জাতি নাই, যে স্বাধীনতা লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। দুর্ব্বলতা থাকে এবং দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও জাতি স্বাধীন হয়, যদি তাহার একটি গুণ অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের জন্য দুরন্ত আবেগ এবং পরাধীনতার প্রতি অত্যন্ত বিক্ষোভ অন্তরে থাকে। দফাওয়ারীভাবে জাতির দুর্ব্বলতা কোন দিন দূর করা যায় বলিয়া আমরা মনে করি না। স্বাধীনতার জন্য প্রবল স্পৃহা জাগাইতে পারিলে, কেবল সেই পথেই কার্য্যকর রকমে জাতির দুর্ব্বলতা দূর হয়, ইহা আমাদের বিশ্বাস। দুর্ব্বলতার উপর নিরন্তর নজর রাখিবার ভীতি জাতির অগ্রগতি বৃদ্ধি করে না, পক্ষান্তরে স্বাধীনতার প্রেরণাময় ত্যাগমূলক বলিষ্ঠ কর্ম্মনীতি যুগান্তের

জীর্ণতার গ্লানি হইতে জাতিকে মুক্ত করিয়া থাকে। পাছে ভুল করি, এই ভয়ে নৈষ্কর্ম্যের ফলজনিত ভয় যত বেশী, বলিষ্ঠ কর্ম্মপ্রেরণার তোড়ের মুখে ভুল হইলেও, সেই ভয় ততটা মারাত্মক নয়। আজ এই সত্যটি ভাল করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

জনস্বাস্থ্য বিভাগের সংস্কার—

বাঙলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার পল্লী অঞ্চলে জনস্বাস্থ্য বিভাগের সংস্কার ও প্রসারের জন্য নূতন একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক দুইটি ইউনিয়নকে লইয়া এই একটি স্বাস্থ্য-কেন্দ্র গঠিত হইবে। এক একটি কেন্দ্রে এক একজন ডাক্তার থাকিবেন। তাঁহার অধীনে দুইটি ইউনিয়নের জন্য দুইজন হেল্‌থ এসিস্ট্যাণ্ট, একজন ধাত্রী এবং একজন ভৃত্য থাকিবে। মাণিকগঞ্জ, গোয়ালন্দ, কান্দী, রঙ্গপুর শহর, বাখরগঞ্জ শহর এবং ময়মনসিংহ শহর এই সাতটি মহকুমায় এই নূতন পরিকল্পনা লইয়া প্রথম কাজ আরম্ভ হইবে। স্বাস্থ্য-বিধানের দিক হইতে বাঙলার পল্লী-অঞ্চলে দুর্দ্দশার আজ অবধি নাই; কিন্তু এদেশের কর্ত্তাদের প্রস্তাব-পরিকল্পনার উপর আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা নাই; কারণ সেগুলি কাগজ-পত্রেই থাকে, কাজে পরিণত হয় খুব কম, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু ঠাট-কাঠামোই হয় সার। বর্ত্তমান পরিকল্পনার সম্বন্ধেও আমাদের সেই আশঙ্কা মনে উদয় হইতেছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রায় ২৫ শত মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত করিতে হইবে। এক একজনের অধীনে দুইটি করিয়া ইউনিয়ন থাকিবে। ইঁহাদের জন্য যে ৩১ দফা কাজের ফিরিস্তি বাঁধা হইয়াছে, তাহার কতটা ইহাদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব, কর্ত্তারা হয়ত ভাবিয়া দেখেন নাই। পরিকল্পনার প্রধান ত্রুটি এই যে, বার বৎসরের অধিককাল হইল বাঙলার পল্লী অঞ্চলে কাজ করিয়া দেশের হালচাল সম্বন্ধে যাঁহারা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, এই পরিকল্পনায় তাঁহাদের সেই অভিজ্ঞতাকে কোন মূল্য দেওয়া হয় নাই। এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত হইলে চার শত স্যানিটারী ইন্সপেক্টর বেকার হইয়া পড়িবেন। এতদিন পরে এই সব কর্ম্মচারীর অবস্থা কি দাঁড়াইবে, বাঙলা সরকার সে বিবেচনা করিয়াছেন কি না, আমরা জানিতে চাই। পল্লী-স্বাস্থ্য পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে, ইঁহাদের অভিজ্ঞতাকে মূল্য দান করা উচিত। ইঁহাদিগকে চাকুরীতে রাখিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন হইবে, ইহা আমরা জানি; কিন্তু বাঙলার জনস্বাস্থ্য বিধানের জন্য বড় প্রস্তাব ফাঁদিলেই চলিবে না। সরকারকে পয়সা খরচ করিতে হইবে। এত দিকে এত রকম বেহুদা ব্যয় হইতেছে, আর অর্থাভাবের কথা উঠে শুধু দেশের লোকের চিকিৎসার ঔষধ, রোগের শুশ্রূষা, ব্যাধির প্রতিকারের বেলায়, এই সব অযুক্তি আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি।

যুদ্ধে ন্যায় ও অন্যায়—

মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি 'হরিজন' পত্রে জনৈক পত্র-প্রেরকের প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন,—"যুদ্ধ যদি অন্যায় হয়, তাহা হইলে কিরূপে ইহা নৈতিক সমর্থন লাভ করিবার যোগ্য হইতে পারে? আমার মতে সমস্ত যুদ্ধই অন্যায়; কিন্তু আমরা যদি বিবদমান দুই পক্ষের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, একপক্ষ ন্যায়-পথাবলম্বী এবং অপরপক্ষ অন্যায় পথাবলম্বী। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাউক, ক খ-এর দেশ অধিকার করিতে চাহে, তাহা হইলে খ-এর প্রতি অন্যায় করা হইবে। তাহারা উভয়ে অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিবে। আমি সশস্ত্র যুদ্ধে বিশ্বাসী নহি; কিন্তু ইহাতে কিছু আসে যায় না। 'খ' ন্যায়পথে, সুতরাং সে আমার নৈতিক সাহায্য ও শুভেচ্ছা লাভের পাত্র।" মহাত্মা গান্ধীর এই নৈতিক সাহায্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিয়া উঠা অতি কঠিন; নিজেদের দেশরক্ষা করিতে অস্ত্র ধারণ যদি অন্যায় না হয় এবং তেমন অস্ত্র-ধারণকারীর শুভেচ্ছা যদি অন্তরে থাকে, তাহা হইলে অপরপক্ষের পরাজয়ের ইচ্ছাও অনিবার্য্যভাবে অন্তরে কাজ করিবে, সে ইচ্ছাকে মনের কোণে পুষিয়া না রাখিয়া কার্য্যে প্রতিফলিত করাই সত্যাচরণ হইবে মনে হয়। অহিংসার নামে মিথ্যাচার কখনই ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। যেখানে প্রকৃত অহিংসা সেখানে ভেদজ্ঞান নাই; প্রকৃতপক্ষে ভেদজ্ঞানরহিত হইয়া কোন জাতির বাস্তব সত্তা এ জগতে সম্ভব কি না, ইহাই সন্দেহের বিষয়।

ইংলণ্ডে বিমান আক্রমণ—

সপ্তাহকাল হইল ইংলণ্ডের উপর জার্ম্মনীর উড়ো-জাহাজের আক্রমণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উপর বিমানযুদ্ধে এক সপ্তাহে জার্ম্মনীর মোট ৫৬৮ খানা বিমান ধ্বংস হইয়াছে। এক রবিবার দিনের লড়াইতেই জার্ম্মনীর ১৪১ খানা উড়ো-জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া ব্রিটিশ বিমান বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন। জার্ম্মনীরা কিরূপ ঝুঁকি লইয়া ইংলণ্ডের উপর আক্রমণ চালাইতেছে, তাহাদের এই ক্ষতির পরিমাণ হইতেই বুঝা যাইতে পারে। এতটা ঝুঁকি লইবার উদ্দেশ্য কি? ব্রিটিশ বিমানবহরকে এইভাবে যে কাবু করিয়া ফেলিয়া ইংলণ্ডে সেনা নামাইবার মতলবে আছে, এমন মনে হয় না; যদি তেমনি মতলব তাহাদের থাকিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডকে অবরোধ করিবার সংকল্প তাহারা ঘোষণা করিত না। বিমান আক্রমণের এই প্রচণ্ডতা ইংলণ্ডে আতঙ্ক সৃষ্টি করিবে, এই ধারণা লইয়া জার্ম্মনেরা যদি চলিয়া থাকে, তাহাও ভুল; কারণ, ইংলণ্ড ফ্রান্স নহে, যে এক প্যারিস শহরকে আতঙ্কিত করিয়া ফেলিতে পারিলেই দেশের সর্ব্বত্র বিপর্য্যয় দেখা দিবে, ইংলণ্ডে তেমন বিপর্য্যয়ের ভাব

আনিতে হইলে ইংলণ্ডের অভ্যন্তরভাগে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি আক্রমণ করা প্রয়োজন, যদিও জার্ম্মান বিমান-বহরেরা এ পর্যন্ত তাহা করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রসিদ্ধ মার্কিন সংবাদদাতা মিঃ এইচ আর নিকারবোকারের অভিমত এই যে, জার্ম্মানেরা যতদিন পর্য্যন্ত পাঁচ হাজার উড়োজাহাজ লইয়া একযোগে ইংলণ্ডের অভ্যন্তরভাগস্থ ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলগুলি আক্রমণে প্রবৃত্ত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের দিকে আসল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে বলা চলিবে না। প্রসিদ্ধ 'জার্ম্মন সমরনীতিবিদ্ অধ্যাপক বান্‌শেও বহুদিন পূর্ব্বে এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের উপকূলভাগের কয়েকটি বন্দরের ক্ষতি করিলেই ইংরেজ কাবু হইবে না—ক্রমিক অবরোধের পথে তাহা হইতে পারে; কিন্তু ইংলণ্ডের বিপুল নৌশক্তি সে অবরোধকে ব্যর্থ করিতে সমর্থ। ইংলণ্ডকে সন্ত্রস্ত করিতে হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলগুলিকে ধ্বংস করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এ পর্যন্ত জার্ম্মনদের তেমন উদ্যম সফল হয় নাই।

সোমালিল্যাণ্ড পরিত্যাগ—

ব্রিটিশ সৈন্য ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছে। ব্রিটিশ সৈন্যের সোমালিল্যাণ্ড পরিত্যাগের ফলে যুদ্ধের দিক হইতে ব্রিটেনের অসুবিধা কিছু হইবে বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হইবে আফ্রিকার এই মরুময় উপকূলভাগে নয়, তাহা হইবে ইংলিশ প্রণালীর উপকূলে। সোমালিল্যাণ্ড ইটালীর দখলে যাওয়াতে ইহাই সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যুদ্ধ এখন ভারতের ঘরের কাছে আসিয়া পড়িল। অতঃপর ইটালীর দৃষ্টি এদেশের উপর পড়িবে কি মিশরের উপর পড়িবে, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, "এই দিকে বৃহত্তর সংগ্রাম আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং সেজন্য ব্রিটিশের বিপুল বাহিনী প্রস্তুত আছে। সমুদ্র পথে ব্রিটিশের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং ইংরেজ এ সম্বন্ধে তাহার যথাকর্ত্তব্য পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না।" যুদ্ধ ভারতের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতের সম্বন্ধে ইংরেজের যথাকর্ত্তব্য প্রতিপালন করাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।

প্রশংসনীয় উদ্যম—

বাখরগঞ্জ জেলা শিক্ষক সমিতি একটি প্রশংসনীয় উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন। ঐ সমিতির পক্ষ হইতে বাখরগঞ্জ জেলার প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত লেখকের নাম এবং রচনাবলী সংগ্রহের উদ্যোগ চলিতেছে। এই উদ্যমের ফলে যে শুধু বাঙলা সাহিত্যেরই সেবা হইবে, তাহা নহে। রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়াও এমন উদ্যমের বিশেষ একটি সুফল ফলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাঙলা দেশে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ ছড়াইয়া পড়িতেছে, জেলার হিন্দু মুসলমান সকল সাহিত্যিককে সম্মান দানের সূত্রে সেই বিষের পরিব্যাপ্তি রুদ্ধ হইবে। সাহিত্যই এখন একমাত্র সম্বল যাহার দ্বারা বাঙালীর বাঙালীত্ব, তাহার সংস্কৃতি সুদৃঢ় রাখা সম্ভব; অন্য পথ নাই। আমরা আশা করি, বাখরগঞ্জ জেলার শিক্ষক সমিতির আদর্শ বাঙলার অন্যান্য জেলাতেও অনুসৃত হইবে। সাহিত্যিকদের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের ভেদ বিস্মৃত হইবে। বাখরগঞ্জ জেলা শিক্ষক সমিতির এই সময়োচিত উদ্যমের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে বঙ্গবাণীর সাহিত্যিক সন্তানদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হউক—ইহার ফলে সংস্কৃতির বিকাশ হইবে এবং সংহতি জাগিবে।

প্রাদেশিকতার ধূয়া—

সমগ্র মারাঠী ভাষাভাষীদিগকে লইয়া মহাবিদর্ভ নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবী উঠিয়াছে। মহারাষ্ট্র নেতা শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি আনে মহাবিদর্ভ সম্মেলনে প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন, সব দিক দিয়া মারাঠী জাতির পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে এইরূপ প্রদেশ গঠনের প্রয়োজন আছে। ভাষাকে ভিত্তি করিয়া প্রদেশ গঠনের দাবী কংগ্রেসও সমর্থন করিয়াছেন এবং কংগ্রেস সম্ভবত এই প্রস্তাবকেও সমর্থন করিবেন। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে বাঙলা ভাষাভাষীদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। বাঙলার কতক অংশ গিয়াছে আসামের মধ্যে, কতক গিয়াছে বিহারের ভিতর। বাঙালীর জাতীয় শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশকে সাম্রাজ্যবাদীরা চিরকাল শঙ্কা করিয়াছে এবং বাঙালীর সংহতি শক্তিকে নানাভাবে দুর্ব্বল করিয়াছে। আজ ভারতের সমগ্র প্রদেশই নিজের নিজের স্বার্থে জাগ্রত হইতেছে। পিছনে পড়িয়া থাকিতে কেহই চাহে না; কিন্তু বাঙালী যদি তাহার নিজস্ব স্থানগুলিকে ফিরিয়া পাইবার জন্য দাবী করে, তবে মহা অপরাধ হয়। বিহারের ক্ষতি হইবে, আসামের ক্ষতি হইবে, এই যুক্তি দেখান হইয়া থাকে। বাঙালী পরার্থপরতার যূপকাষ্ঠে নিজের নিজত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষতি ভিন্ন লাভ হয় নাই এবং হইবেও না। বিদেশীরা নিজেদের স্বার্থের দায়ে এ সত্যকে স্বীকার করিবে না জানি, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের জাতীয়তার বুলি যাঁহারা মুখে আওড়ান, তাঁহারাও যে এই-ভাবে বাঙালীকে খাটো করিয়া রাখিবার অনিষ্টকারিতাকে উপলব্ধি করেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়। তাঁহাদের এখনও বুঝা উচিত যে, বাঙালীর জাতীয়তার বিকাশ ভারতের স্বাধীনতা ও বৃহত্তর জাতীয়তার বিকাশের পরিপন্থী কোন দিন হয় নাই, এখনও হইবে না। বাঙালীই ভারতে স্বাধীনতার আন্দোলনকে উদ্বোধন করিয়াছে; জাতীয়তার জোয়ার বহিয়াছে গোটা ভারতে এই বাঙলা দেশ হইতেই।

মানসী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্রনাথ বি-এ ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের তাঁর "মানসী" বইএর ভূমিকাস্বরূপে 'মানসী'র প্রথম কবিতাকে উপলক্ষ ক'রে তাঁর মত প্রকাশ করেন। তাঁর সেদিনকার কথার অনুলিপি ক'রেছিলেন শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। পরে সেটি কবি যথাপ্রয়োজন শোধন ক'রে দেন। 'মানসী'র প্রথম কবিতাটি প্রথমে উদ্ধৃত করা হ'ল।]

উপহার

নিভৃত এ চিত্তমাঝে
নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই
মুহূর্তে বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর
ফুটিতেছে নিরন্তর,
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা;
বিচিত্র সে কলরোলে
ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চির-জীবন তাই
আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে
তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।
বাহিরে পাঠায় বিশ্ব
কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে
ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহমন্ত্র গানে
কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি অন্তঃপুরবাসে
সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই
ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।
সেই
আনন্দ মুহূর্তগুলি
তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।

(৩০ বৈশাখ ১৮৯০)

কবিতার কী করে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে হয়, তা আমার জানা নেই। কবিতা আমি রচনা করেছি। ময়রা সন্দেশ তৈরি করে, কিন্তু তার মধ্যে কতটা ছানা, কতটা চিনি আর কতটা ফাঁকি তা বলা কঠিন। তোমাদের অনেকের লক্ষ্য এই জীর্ণতরীকে আশ্রয় ক'রে সসম্মানে পরীক্ষা সমুদ্র উত্তীর্ণ হবে। তার ঠিক পন্থা কী, আমি ভালো ক'রে জানি নে; যাঁরা এই ব্যবস্থা করেছেন তাঁরাও কতটা জানেন বলতে পারি নে। পরীক্ষার প্রশ্ন তুলনামূলক হ'তে পারে। কে ভালো, কে মন্দ তার থেকে হয়তো ঝগড়ার উৎপত্তি হবে। অথবা, উপমা ঠিক হয়েছে কি না, কোন্ শ্রেণীভুক্ত, এমন প্রশ্নও হ'তে পারে। এ বিষয়ে আমার কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই সংকোচের সঙ্গে আজকের কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

ইংরেজীতে যাকে বলে mystic, মানসীর প্রথম কবিতাটি সেই শ্রেণীর। যখন রচনা করি, তখন কী মনে করে লিখেছিলাম, তা বলা শক্ত। কিছুদিন পরে যখন পিছু ফিরে দেখি, তখন অনেক লেখা ঝাপসা মনে হয়, তার সম্পূর্ণ অর্থ কী তা বলা যায় না।

আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বের নানাদিক থেকে প্রেরণা আসে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বিশ্ব অহরহ আমাদের মনের মধ্যে নানা দূত পাঠাচ্ছে, প্রভাতের আলো, আকাশের নীলিমা, পাখীর কলরব সমুদ্রের তরঙ্গ, আমাদের মনে বিচিত্র বাণী বহন ক'রে আনছে। আমরা হয়তো অনেক সময় অন্যমনস্ক থাকি, কিন্তু নিরন্তর তার অভিঘাত চলেছে, আমাদের মনকে জাগিয়ে রেখেছে। এর দুটি ধারা; একটি আনন্দের, সুন্দরের, আর একটি ভয়ের ভীষণের। আজকের আকাশে যে ভীষণ নির্মমতা, তার মধ্যে ভয়ানক দুঃখের আশঙ্কা আছে। এর যেমন একটা বাণী আছে, তেমনি বসন্তকালে আনন্দের রবে চতুর্দিক ভ'রে ওঠে, তাতে আমরা কান দিই বা না দিই, তার প্রতি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

এই বাণীর ভাষায় কোনও প্রকাশ নেই, ব্যাকরণ শুদ্ধ বানানো কোনও কথা নেই, কিন্তু তার একটা ধ্বনি আছে তা অনির্বচনীয়। সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত ক'রে সেই

ধ্বনি ওঠে। আমাদের চারিদিকে যা রয়েছে, তা অসীম তার কোনো নির্দিষ্ট ভাষা নেই, তা অতি বিরাট, কবি তাকে ছন্দের মধ্যে, ছাঁচের মধ্যে ফেলে তৈরি ক'রে তুলেছেন, তিনি মনের ভিতরে যে প্রতিমা গড়েছেন তাতে তাঁর আশা, ভালোবাসা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। এই হচ্ছে কবির কাজ। তাকে সুন্দরের সীমায় বাঁধতে চেয়েছেন, তাই তিনি তাঁর মানসী প্রতিমা গড়েছেন, সেই প্রতিমায় রূপ নিয়েছে—তাঁর আশা, তাঁর ভালোবাসা।

কিছুদিন আগে উপনিষদের একটি বচন তোমাদের শুনিয়েছি, ঋষি তাতে বলেছেন যে, ইন্দ্রের না আছে বন্ধু, না আছে সঙ্গী। তিনি যখন প্রকাশ হ'তে চান, তখন তিনি বন্ধুর খোঁজ করেন। উপনিষদে ঋষি বলেছেন—"অভ্রাতৃব্যো অমাত্বনাপিরিন্দ্র জনুসেষা সনাদসি। যুধেদাপিত্ব মিচ্ছসে।" হে ইন্দ্র, তুমি শত্রু রহিত নায়ক রহিত বন্ধু রহিত। কিন্তু তিনি যখন প্রকাশ চান, তখন বন্ধুর খোঁজ করেন। বিরহী তাঁর বাণী, যতক্ষণ না সেই হৃদয়ের সঙ্গে মিলন হয় যে আনন্দের সঙ্গে তাকে গ্রহণ করে। যতক্ষণ আমি তাকে গ্রহণ না করেছি, ততক্ষণ তিনি নিঃসঙ্গ। বিশ্বের যা কিছু দান, তা আমাদের হৃদয়দ্বারে এসে বলছে, আমাকে গ্রহণ কর, আমাকে অবজ্ঞা ক'রো না। সে যেন সাথী, দরদী বন্ধুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এদিকে বিশ্বের বিচিত্রবাণী মানুষের হৃদয়েও জাগাচ্ছে বিরহ বেদনা, যে মিলনে পূর্ণতা সেই মিলনকে সে খুঁজছে। তার কামনা শিল্পে ছন্দে গানে মূর্তি ধরতে থাকে। তাই নিয়ে কবির কবিত্ব, গুণীর গুণপনা। নিরন্তর অন্তরে বাহিরে ঘাত-প্রতিঘাতে এই যে কাব্য রূপের সৃষ্টি চলেছে মানসীর প্রথম কবিতায় তারই কথা ব্যক্ত হয়েছে।

'মানসী'র প্রথম পাঁচ-ছয়টি কবিতা বেদনার কবিতা। এই কাব্য দুঃখের কথায় শুরু হ'ল কেন, এটি একটি তর্কের বিষয়। মানুষ তার রসসৃষ্টিতে, রচনাতে বড় স্থান দিয়েছে দুঃখকে, বেদনাকে। Aristotle থেকে আরম্ভ ক'রে, পৃথিবীর যত আলংকারিকরা তার কারণ নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন অনেক প্রকারে। এ বিষয়ে আমার নিজের একটি মত আছে। আমরা নিজেকে অনুভব করতে চাই। নিখিল বিশ্ব যখন আমাকে স্পর্শ করে, তখন আমরা আপনাকে অনুভব করতে পাই, সুন্দরকে যখন দেখি তখন নিজেকে উপলব্ধি করি। এইরকমে আপনাকে যখন পাই, তখন আমরা খুশী হই।

আমরা যখন কোনও বন্ধুকে পাই, তখন সেই বন্ধুর ভিতর দিয়ে নিজেকে নিবিড়ভাবে অনুভব করি। উপনিষদেও আছে, পুত্র যে আমাদের প্রিয়, তাও নিজের জন্য; সেই পুত্রের ভিতরে আপনার আত্মাকে নিবিড়ভাবে অনুভব করি। আপনাকে অনুভব করাই আনন্দের ভিত্তি। দুঃখের মধ্যে আমরা গভীরভাবে আপনাকে অনুভব করি। কিন্তু সংসারে বাস্তবক্ষেত্রে দুঃখের সঙ্গে ক্ষতি জড়িত থাকে। সাহিত্যে সেই নিত্য সম্বন্ধ নেই। যেমন King Lear এ রাজার মানসিক বিকৃতি, রামায়ণে সীতার কাহিনী। সেই কঠিন দুঃখের মধ্যে আপনাকে দেখতে পাই, কিন্তু ক্ষতির কোনো কারণ থাকে না, সম্পূর্ণ নিষ্কাম দুঃখ।

ছেলেরা যেমন আবদার করে, ভূতের গল্প বল। তারা জানে যে, ভূত তাদের কিছু করতে পারবে না, তবু সেই ভয় করাটাই তাদের ভালো লাগে; এই ভয়ের উপলব্ধির মধ্যে নিজেকে নিবিড়ভাবে তারা পায়। যে দুঃখের সঙ্গে ক্ষতি আছে, আমরা তাকে এড়িয়ে যেতে চাই। আমাদের মধ্যে যাঁরা বীরপুরুষ, তাঁরা লাভ লোকসানের কোনো ধার ধারেন না, তাঁরাই প্রকৃত ভয়ের আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁরা নিবিড়ভাবে আত্মোপলব্ধি করেন। এইসব কবিতাতে যা বলতে চেয়েছি, তার মূলে জীবনের কখনো না কখনো কোনো অভিজ্ঞতা হয়তো ছিল, কিন্তু সে অভিজ্ঞতা মানুষ ভোলে না কেন? কারণ সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষ এমন কিছু পায়, যা দুঃখের ভিতর দিয়ে মনকে গভীরতর উপলব্ধি ও অনুভূতিতে নিয়ে যায়, যা চিরস্মরণীয়, যা ভোলবার নয়।

(ক্রমশ)
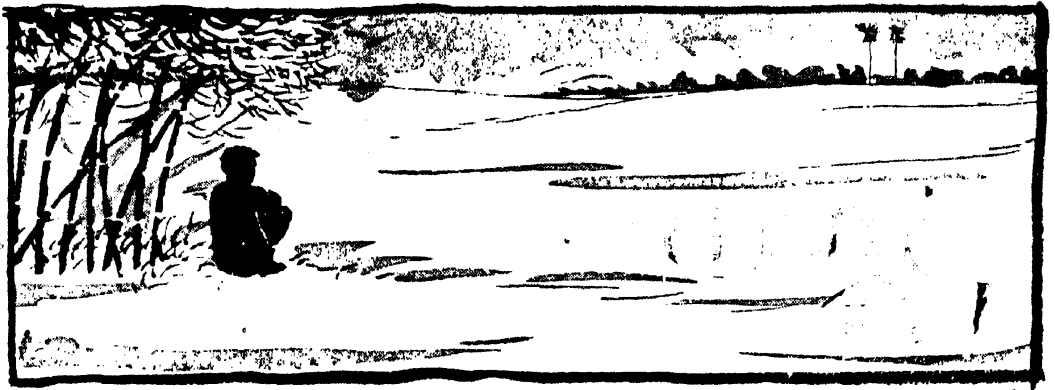
ডাঃ মুঞ্জে ও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের দুর্গতি

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার]

১৯২৩ সালে অসহযোগ আন্দোলনের শেষ পর্ব্বে মালাবারে যে নৃশংস কান্ড ঘটে, তাহা সাধারণত "মোপলা বিদ্রোহ" নামে পরিচিত। মালাবারের মুসলমানগিকে 'মোপলা' বলে। মালাবারের এই মোপলারা ১৯২১ সালে স্থানীয় হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল—মহাত্মা গান্ধীর 'অহিংসার' বাণীও তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হইতেছিল। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের অবসানে সহসা মোপলাদের মধ্যে একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে মালাবারে হিন্দুদের সঙ্গে মোপলাদের প্রবল সংঘর্ষ হয়। মোপলারা জোর করিয়া ৩।৪ হাজার হিন্দুকে 'মুসলমান' করিয়া ফেলে, বহু হিন্দু নারী মোপলাদের দ্বারা ধর্ষিত হয়, বহু হিন্দু মন্দির কলুষিত হয়। মালাবারে হিন্দুরাই সংখ্যাধিক, তৎসত্ত্বেও তাহারা এইরূপে মোপলাদের হাতে সর্ব্বপ্রকারে বিপর্যস্ত হয়।

'মোপলা বিদ্রোহের' এই শোচনীয় কাহিনী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং হিন্দুদের মধ্যে স্বভাবতঃই প্রবল চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে শৃঙ্গেরী মঠের জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য মধ্য প্রদেশের প্রসিদ্ধ হিন্দু নেতা ডাঃ বি এস মুঞ্জেকে প্রকৃত অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মালাবারে যাইতে অনুরোধ করেন। ডাঃ মুঞ্জে মালাবারে গিয়া সমস্ত অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যের নিকট একটি রিপোর্ট দেন। ডাঃ মুঞ্জের এই রিপোর্ট বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। আমরা বহু চেষ্টা করিয়া পুণার "মারাঠা" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত কেটকারের সৌজন্যে উহা সংগ্রহ করিয়াছি। ঐ রিপোর্টে ডাঃ মুঞ্জে মালাবারের হিন্দুদের অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে সমগ্র ভারতের হিন্দু সমাজের দুর্গতির যে সব কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই ১৭ বৎসর পরেও তাহার সত্যতা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। ভারতের সমস্ত প্রদেশের হিন্দুদেরই ডাঃ মুঞ্জের এই মূল্যবান রিপোর্টের মর্ম্ম অবগত হওয়া এবং উহা লইয়া আলোচনা করা উচিত। কেননা উহার ফলে হিন্দু সমাজের ব্যাধির মূল কোথায়, তাহা উপলব্ধি করা সহজ হইবে এবং প্রতিকারের পন্থা অবলম্বন করাও সম্ভবপর হইবে।

মালাবারের হিন্দুদের শোচনীয় এবং অসহায় অবস্থার জন্য ডাঃ মুঞ্জে ব্রাহ্মণদিগকেই দায়ী করিয়াছেন, কেননা প্রাচীনকাল হইতে ব্রাহ্মণেরাই হিন্দু সমাজ শাসন করিতেছেন এবং এ যুগেও তাঁহাদের প্রভাব অসীম। তাঁহাদেরই প্রবর্ত্তিত নানা সামাজিক অনুশাসন, বিধিনিষেধ, আচারব্যবহারের কুফল ভারতের অন্যত্র যেমন, মালাবারেও তেমনি হিন্দুরা ভোগ করিতেছে। ডাঃ মুঞ্জে তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন ঃ—

"মালাবারের ব্রাহ্মণদের নিজেদের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এমনই অদ্ভুত ধারণা যে কোন অ-বর্ণ বা নিম্নজাতীয় হিন্দু তাঁহাদের নিকটে অন্ততপক্ষে ৫০।৬০ ফিটের মধ্যে আসিতে পারে না। এই কুপ্রথার মধ্যে শোচনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐ সব অ-বর্ণ হিন্দুরা যতক্ষণ হিন্দু থাকে, ততক্ষণই তাহাদের ঐ নিয়ম পালন করিতে হয়,—কিন্তু যেই তাহারা মুসলমান হইয়া 'খাঁ', 'সৈয়দ' প্রভৃতি পদবী গ্রহণ করে, অমনি তাহারা স্পৃশ্য ও আচরণীয় হইয়া উঠে, ব্রাহ্মণেরা আর তাহাদের সান্নিধ্য অপবিত্র মনে করেন না। আর ঐ সব নবদীক্ষিত মোপলা—যাহারা কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই হিন্দুরূপে অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য ছিল—তাহারাই উচ্চ জাতীয় হিন্দুদের উপর প্রভুত্ব করিতে কুণ্ঠিত হয় না। হিন্দু সমাজের এই অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা সম্বন্ধীয় বিধিবিধান 'থিয়া', 'পঞ্চমা' প্রভৃতি অ-বর্ণ হিন্দুদের চিন্তা ও চরিত্রের উপর ঘোর অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মালাবারের হিন্দু সমাজে ইহারাই সংখ্যাধিক এবং ইহারা পরিশ্রমী, কষ্টসহ, দৈহিক শক্তিশালী। বিপদের সময়ে মোপলাদের আক্রমণ হইতে অন্যান্য হিন্দুদিগকে ইহারাই রক্ষা করিবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সামাজিক পাপের ফলে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা ইহাদের সহানুভূতি হারাইয়াছে। যদি ইহাদিগকে হিন্দু সমাজের মধ্যে সম্মানের স্থান দিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, তবেই কেবল হিন্দু সমাজ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।"

ডাঃ মুঞ্জে মালাবারের হিন্দু সমাজের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, বাঙলার হিন্দু সমাজের সম্বন্ধেও ঠিক সেই মন্তব্য করা যাইতে পারে। এখানেও "অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়" হিন্দুদিগকে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ঐ সব 'অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়' হিন্দু হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান বা খৃষ্টান হয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা তাহাদিগকে ভয় ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে। "অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়" অর্থাৎ নিম্নজাতীয় হিন্দুদের প্রতি উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের এই ব্যবহারের ফলে হিন্দু সমাজ বহুধাখণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছে,—নিম্নজাতীয় হিন্দুরা নিজেদের আর 'হিন্দু' বলিয়া কখনই গর্ব্ব বোধ করিতে পারে না।

মালাবারের অধিকাংশ মোপলাই হিন্দুদের বংশধর। কিরূপে মালাবারের মোপলাদের সংখ্যা এরূপ বাড়িয়া গেল, তাহাদের এতটা প্রাধান্যই বা কিরূপে সম্ভব হইল, তাহার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া ডাঃ মুঞ্জে বলিতেছেন ঃ—

"প্রচলিত কাহিনী এই যে, ৮ শত বৎসর পূর্ব্বে মালাবারের হিন্দু রাজা ব্রাহ্মণদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় নিজের রাজ্য মধ্যে বসতি স্থাপন করিবার জন্য আরব মুসলমানদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা প্রদান করেন। রাজা ঐ সব আরবকে মুসলমান-ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য অনুমতি তো দিলেন-ই, তাহাদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদানকল্পে এমন আদেশও জারী করিলেন যে, প্রত্যেক হিন্দু ধীবর পরিবারের অন্তত একজন পুরুষকে মুসলমান হইতে হইবে। এইরূপে একদিকে রাজার প্রশ্রয় ও সাহায্য, অন্যদিকে মুসলমানদের উৎসাহ, জবরদস্তি এবং প্রলোভনের ফলে দলে দলে হিন্দুরা মুসলমান হইতে লাগিল, হিন্দুরা জীবনসংগ্রামে পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। আর জামোরিণ রাজাদের তথা হিন্দু সমাজের গুরু ও পরামর্শদাতা ব্রাহ্মণেরা প্রসন্ন ঔদাসিন্যের সহিত সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, 'অস্পৃশ্য' হিন্দু তথা মুসলমান সম্প্রদায় উভয়ের আক্রমণ হইতেই তাহাদের পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম নিরাপদ রহিল। ব্রাহ্মণেরা সমুদ্রযাত্রার যে নিষেধবিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এ সমস্ত তাহারাই প্রত্যক্ষ পরিণাম। মালাবার সমুদ্রকূলবর্ত্তী রাজ্য—উহা রক্ষা করিবার জন্য নৌবহর ও নৌসৈন্য চাই। কিন্তু সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া হিন্দুরা ঐ সব কাজ করিতে পারে না। কাজেই রাজাকে উহার জন্য আরব মুসলমান ও উহাদের দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু বংশধরদের উপরই নির্ভর করিতে হইল।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত একটা অস্বাভাবিক সামাজিক নিষেধবিধির জন্য মালাবারের হিন্দু রাজার নির্দ্দেশে হিন্দু সমাজ আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইল। পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজে এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রসূত আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত বিরল। বাঙলার হিন্দু সমাজেও সমুদ্রযাত্রা নিষেধবিধি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কি ঘোর অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা আমরা সকলেই জানি। এরূপ আত্মহত্যাকর সামাজিক বিধান হিন্দু সমাজে আরও বহু আছে।

সাধারণভাবে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের দুর্গতির মূলে নির্ণয়

করিতে গিয়া ডাঃ মুঞ্জে বলিয়াছেন যে, হিন্দু সমাজের গঠন ব্যবস্থাই তাহার দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ। হিন্দু সমাজ নানা জাতি ও নানাস্তরে বিভক্ত। ইহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, প্রত্যেকের সংস্কৃতি, শিক্ষা, আচারব্যবহার স্বতন্ত্র, এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের প্রাণের যোগ নাই। পরস্পরের প্রতি সমবেদনা নাই। সুতরাং এই সমাজে সংহতি শক্তি আসিবে কোথা হইতে? ইহার এক অংশ আক্রান্ত হইলে, অন্য অংশ যে সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে না, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যতদিন হিন্দুরা স্বাধীন ছিল ততদিন এই জাতি-ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ বিশেষ কোন বাধা পায় নাই। উচ্চ জাতিরা নিম্ন জাতিদের অবজ্ঞা করিত, তাহাদের পায়ের তলায় রাখিত, আর নিম্ন জাতিরাও সেই দাসত্বকে অদৃষ্ট ও কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া নিরুপায়ভাবে মানিয়া লইত। কিন্তু যখন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিদেশীরা বিজয়ীবেশে এদেশে আসিল এবং প্রভু হইয়া বসিল, তখন হইতে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। প্রথমে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী পাঠান ও মোগলেরা, তারপর খৃষ্টান ইউরোপীয়েরা। ইহাদের কাহারও মধ্যে জাতিভেদ নাই,—ইহাদের সামাজিক ব্যবস্থায় সকলেই সমান, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের বিচার তো নাই-ই। নিম্ন জাতিরা সহজেই এই তথ্য আবিষ্কার করিল এবং বিদেশী প্রভুদের আশ্রয় ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে বিলম্ব করিল না। বিদেশী প্রভুরাও তাহাদিগকে মানুষের মর্য্যাদা দিতে লাগিল। যাহারা এতকাল স্বীয় সমাজের উচ্চশ্রেণীর নিকট অবজ্ঞা ও অপমান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা বিদেশী প্রভুদের নিকট ভিন্নরূপ ব্যবহার পাইয়া স্বভাবতঃই তাহাদের অনুগত হইয়া পড়িল। ইহার ফলে হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণীয় ও নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়িয়া গেল,—উচ্চবর্ণীয়দের প্রতি নিম্নবর্ণীয়দের যেটুকু সহানুভূতি ও মমত্বের ভাব ছিল, তাহাও হ্রাস পাইতে লাগিল। তারপর নিম্নবর্ণীয়েরা যখন দেখিল যে, ঐসব বিদেশী প্রভুদের নিকট উচ্চবর্ণীয়েরাও মাথা নত করিতে লাগিল, তাহাদের চাকুরী গ্রহণ করিল, তখন স্বভাবতঃই উচ্চবর্ণীয়দের প্রতি নিম্নবর্ণীয়দের শ্রদ্ধাও ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তীক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণেরা এই পরিবর্ত্তন দেখিয়াও দেখিলেন না, ইহার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া আত্মরক্ষার তথা সমাজ রক্ষার কোন ব্যবস্থা করিলেন না। ফলে আজ নিম্ন জাতীয়েরা হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ দেখা দিয়াছে। বিদেশী শাসকেরা একটা কৃত্রিম 'তপশীলী' সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া সেই বিচ্ছেদ ও স্বাতন্ত্র্যকে পাকা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

ডাঃ মুঞ্জে মালাবারে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা স্বভাবতই শান্ত, নিরীহ এবং 'বশম্বদ' প্রকৃতির তাহারা দুর্দ্দান্ত এবং বেপরোয়া প্রকৃতির মুসলমান প্রতিবাসীদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না, সহজেই নতি স্বীকার করে। হিন্দুদের এই প্রকৃতি-গত দৌর্ব্বল্যের কারণ কি, ডাঃ মুঞ্জে তাহার বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এস্থলে বলা যাইতে পারে ডাঃ মুঞ্জে মালাবারের হিন্দুদের চরিত্রে যে ত্রুটী লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা ভারতের সকল প্রদেশের চরিত্রেই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ডাঃ মুঞ্জের এই বিশ্লেষণ সকল প্রদেশের হিন্দুদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ডাঃ মুঞ্জেও সেই দিক হইতেই ইহার বিচার করিয়াছেন। ডাঃ মুঞ্জের মতে হিন্দু সমাজের এই প্রকৃতিগত দৌর্ব্বল্যের কারণ—(১) হিন্দুরা সাধারণত নিরামিষাশী, নিরামিষ খাদ্য মানুষকে শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ করিয়া তোলে। (২) বৈদিক আদর্শ ছিল জীবনকে বীর্য্য-বানের মত ভোগ করা। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রভৃতির আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল বৈরাগ্য ও ত্যাগ। এই আদর্শ হিন্দুদের ঘোর অনিষ্ট করিয়াছে। (৩) 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'—এই অ-বৈদিক আদর্শ হিন্দু সমাজের সবল মনোবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। (৪) বাল্য বিবাহও হিন্দুদের **শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। এমন কি, ডাঃ মুঞ্জের মতে বাল্য বিবাহ ও নিরামিষ আহার—এই দুইয়ে মিলিয়া হিন্দু সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।**

হিন্দু সমাজের সংহতি শক্তির অভাবের জন্য জাতিভেদই যে প্রধানত দায়ী, একথা ডাঃ মুঞ্জে পুনঃপুনঃ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি সরাসরি জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করেন নাই। জাতিভেদের কুফলকে কিরূপে প্রতিহত করিয়া হিন্দু সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সংহতিসম্পন্ন করা যায়, তাহারই উপায় চিন্তা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ডাঃ মুঞ্জের সিদ্ধান্ত এই:—

(১) হিন্দুদের এমন একটা স্থান থাকা চাই যেখানে সমস্ত জাতি ও বর্ণের হিন্দু একত্র মিলিত হইতে পারে। মুসলমানদের মসজিদ এইরূপ স্থান। এখানে উচ্চনীচ ধনী দরিদ্র ভেদ নাই, সকলে মিলিত হইয়া সামাজিক কল্যাণ ও সুখদুঃখের কথা আলোচনা করে। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা কণ্টকিত হিন্দুদের মধ্যে ঐরূপ সাধারণ মিলন ভূমি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এখন হিন্দু সমাজের কল্যাণের জন্য মন্দিরকে ঐরূপ মিলন ক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে। এখানে উচ্চনীচ ভেদ থাকিবে না, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে হইবে। ডাঃ মুঞ্জে বলেন ইহা একটা অসম্ভব প্রস্তাব নয়, পুরীর জগন্নাথ মন্দির এখনও সর্ব্বজাতীয় হিন্দুর মিলনক্ষেত্র। জগন্নাথ মন্দিরের দৃষ্টান্ত সমস্ত গ্রামে নগরে অনুসরণ করিতে হইবে। ইহার ফলে হিন্দু সমাজের সংহতি শক্তি বাড়িবে।

(২) অসবর্ণ বিবাহ প্রথার বহুল প্রচলন করিতে হইবে। এই প্রথা বর্ত্তমানে অপ্রচলিত হইলেও মোটেই অ-শাস্ত্রীয় নহে। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের ব্যবস্থা মনু ও অন্যান্য স্মৃতিকার সমর্থন করিয়াছেন; পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে যে ইহা প্রচলিত ছিল, তাহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। ডাঃ মুঞ্জে মনে করেন যে, অসবর্ণ বিবাহ বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইলে, জাতিভেদের তীব্রতা হ্রাস হইবে, হিন্দু সমাজের সংহতি শক্তিও বাড়িবে। অসবর্ণ বিবাহের সুফলের উপর ডাঃ মুঞ্জের এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিয়াছেন—

I believe that it is the reversion to this "Dharmasastric" sociology which will prove a panacea for all the social evils that beset the present Hindu Society.

(৩) অস্পৃশ্যতা ও অনাচারনীয়তা বর্জ্জন। ডাঃ মুঞ্জে বলেন,—"হিন্দু সমাজের পক্ষে ইহাই বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন, কেননা ইহা ব্যতীত হিন্দুরা তাহাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে নিজেদের প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিবে না এবং জীবন সংগ্রামে বিদেশী ও বিধর্ম্মীদের দ্বারা পদে পদে প্রতিহত হইবে।" সর্ব্বাগ্রে তথাকথিত অস্পৃশ্য ও অনাচারনীয়দের মন্দির প্রবেশের অধিকার এবং অন্য সকলের সঙ্গে মিশিয়া দেবতার পূজা করিবার অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তারপর তাঁহা-দিগকে অন্য সমস্ত সামাজিক অধিকার দিতে হইবে। অস্পৃশ্য, অনাচারনীয় ও অবনতরূপে যাহাদিগকে আমরা পৃথক করিয়া রাখিয়াছি তাহাদিগকে যদি আপনার করিয়া লইতে না পারি, তবে হিন্দু সমাজের ও হিন্দু জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য।

উপসংহারে ডাঃ মুঞ্জে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের সমস্যাকে **দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) জাতিভেদ প্রপীড়িত হিন্দু সমাজকে কিরূপে সঙ্ঘবদ্ধ ও সংহতি শক্তিপন্ন করিতে হইবে; (২) "নিরীহ ও শান্ত" হিন্দুকে কিরূপে সবল মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ও আত্মরক্ষায় সক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে। ১৭ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ মুঞ্জে হিন্দু সমাজের সম্মুখে যে সমস্যা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, এখনও আমরা তাহার সমাধান করিতে পারি নাই। অদূর ভবিষ্যতে যদি না করিতে পারি, তবে হিন্দু সমাজের পক্ষে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব।**

মানুষের ঘর

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীহাসিরাশি দেবী

(১৪)

জীবনটা যেন মস্তবড় একটা প্রহেলিকা ব'লে বোধ হচ্ছিল সরোজের; সরোজ ভাবছিল কেন এমন হয়; কোথাও সে তো জেনেছিল যে, আদুকে বিয়ে করা তার পক্ষে অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব। তবুও সে আশা কেন করেছিল কে জানে। সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলে সে উঠে প'ড়ল। বাইরের পৃথিবী অসীম অনন্ত, তার জন্য অপেক্ষা করছে। অনেক কাজ, তাই তাকে এতটুকু বাধায় আটকে থাকলে চলবে না; ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবার জীবন তার নয়। তার আকর্ষণ চারিদিকে, নানা কাজের মধ্য দিয়ে। গায়ে জামা দিয়ে সে পথে বার হয়ে পড়ল।

সোজা এসে উঠল শারদার বাড়ি। হারমোনিয়মটায় বার কয়েক একটা সুর বাজিয়ে আজ যেন সে অতি অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তাই সেটা ছেড়ে শুয়ে পড়ল একটা আরাম কেদারায়। শারদা এসে প্রবেশ করতেই বলে উঠল "একটা কাজের ঠিক ক'রে দাও না মামীমা, উপায় তো চাই! একটা চাকরি তো গেল, কিন্তু তাই ব'লে তো ব'সে থাকা চলবে না। আর অবস্থাও তো খুব ভাল নয় যে চিরদিন বসে চালাব।"

শারদা তাকিয়ে দেখলে মৃদু হাসিতে সরোজের সমস্ত মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, চোখে তার উৎসাহের আনন্দ। শারদা তার এ কথার কোনও উত্তর হঠাৎ না দিতে পেরে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে।

বেশীদিন নয়, মাত্র কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই কয়ঘণ্টা আদুর অন্তর্ধানের পর কেটেছে। যে মানুষ তার সঙ্গে বেশীর ভাগ সময় কাটিয়ে আনন্দ অনুভব করেছে, যে আনন্দ শারদার চোখকেও লুকনো চলে নি, সেই মানুষ এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার অনুপস্থিতির বেদনাটুকুও অনুভব করলে না! নিজের চোখকেও যেন শারদার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল না; সে চোখের পলক ফেলে আবার তাকালে সরোজের দিকে।

সরোজ প্রশ্ন করলে, "কি দেখছ মামীমা?"

শারদা আজকে আর নিজের জিহ্বাকে বুদ্ধির চাবুক মেরে সোজা করে রাখতে পারলে না, ব'লে ফেললে, "তোমাকে।"

"আমাকে!" সরোজ যেন একটু চমকে উঠল; "আমাকে কেন?"

শারদা তীব্রস্বরে বললে, "কেন তা তোমাকে এখনও ব'লে বুঝিয়ে দিতে হবে? নিজের মন দিয়েও বুঝছ না?"

সরোজ যেন হাঁপাতে লাগল; "কই, না তো!"

শারদার কণ্ঠস্বর তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল;— "আমি ভেবেছিলাম তোমার মনে মনুষ্যত্ব বলে না হ'ক, অন্তত মায়া, দয়া থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু এখন দেখছি আমার সে চিন্তা আগা গোড়াই ভুল।"

"তার মানে?" আত্মসম্মানের কোনও জায়গায় একটু আঘাত লাগতেই সরোজ সচেতন হয়ে উঠল; বললে, "তার মানে আপনি কি বলতে চান মামীমা?"

দৃঢ়স্বরে শারদা জবাব দিলে, "মানে বলতে চাই, যাকে তুমি এতদিন এতভাবে বুঝলে চিনলে জানলে, সে কি তোমার মনের উপর কিছুমাত্রও দাবি করতে পারে না?"

"আপনি আদুর কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ!"

সরোজ চুপ ক'রে ব'সে রইল। কানের কাছে শারদার দৃঢ় কণ্ঠস্বর আর চোখের সামনে ওরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ণতর হয়ে মনের অন্তস্তল পর্যন্ত পাছে দেখে ফেলে এই ভয়েই সে যেন মুখ তুলে তাকাতে পারল না শারদার দিকে। শারদা দেখলে ধীরে ধীরে সরোজের মুখের হাসি, চোখের উজ্জ্বলতা নিবে গিয়ে সেখানে বিরাজ করতে লাগল একটা স্থির বিষণ্ণতা। ডাকল, "সরোজ!"

সরোজ মুখ তুললে না, যেমন নতমুখে বসেছিল, তেমনি বসে রইল। শারদা পাশে সরিয়ে নিয়ে এল নিজের বসবার আসনটা; কোমল কণ্ঠে বললে, "তোমায় আজ একটা কথা বলতে চাই সরোজ, অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে।"

মাথা নেড়ে সরোজ জানালে, তার কোনও আপত্তি নেই।

শারদা বললে, "সরোজ, বয়সে আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়, তোমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিই আমার পাকা হয়েছে, তাই তোমায় বলছি, মুখে তুমি কিছু না ব'লে মনের ওপর ঢাকা দিতে চাইলেও তোমার মন জানতে আমার বাকি নেই।"

সরোজ নির্বাক নিস্পন্দ। কিছুক্ষণ কারও মুখেই কোনও কথা নেই, শুধু ঘড়ি চলার মৃদু টিক-টিক শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে আসছিল না। হঠাৎ সে নিস্তব্ধতা ভেঙে কথা কইলে প্রথমে সরোজ; ডাকল, "মামীমা!"

শারদার মনে হ'ল ওর কণ্ঠস্বর যেন একটু ভাঙ্গা, একটু ভারী। কি ভেবে শারদা হঠাৎ নীচু হয়ে নিজের হাতের মধ্যে সরোজের হাত দুখানা টেনে নিলে; বললে, "আদু কোথায় গেছে আমি জানি, কিন্তু তুমি আদুকে বিয়ে কর সরোজ, বিয়ে কর।"

সরোজ চ'মকে উঠল; "বিয়ে?"

শারদা বললে, "হ্যাঁ, বিয়ে।"

সরোজ চুপ ক'রে রইল। শারদা ব'লে উঠল, "আমি শুধু তার পিসী বলে বলছি না সরোজ, তোমার দিকেও তাকিয়ে বলছি। তোমরা দুজনকে দুজনে বিয়ে না করলে সুখী হবে না, শান্তি পাবে না জীবনে; হয়তো চিরজীবন নানা অশান্তি-অসুখে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে! তার চেয়ে তাকে বিয়ে কর, সহধর্মিণী ব'লে গ্রহণ কর, সে বাঁচবে,

তুমি সুখী হবে। এতে তোমার মা, তোমার মামীমা তাকে তোমার স্ত্রী ব'লে স্বীকার না করলেও তোমার মন তো তা অস্বীকার করতে পারবে না সরোজ, আর সেইটুকুই তো হবে তার জীবনে সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। আর তার পরের কথা বলবে? সে তো আমি আছি সরোজ! আমার যা কিছু আছে তা তোমাদের জন্যেই থাকবে; তবু জানব আমার নিজের সন্তানসন্ততি কিছু না থাকলেও তোমরা আছ, তোমাদের ভোগই আমাকে সান্ত্বনা দেবে, গভীর অতৃপ্তি থেকে মুক্তি দেবে। ভাবব, জীবনে আমি যা পাই নি, সে শান্তি তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি।"

সরোজ নির্বাক। শারদা বললে, "সরোজ, চুপ ক'রে রইলে কেন, উত্তর দাও।"

সরোজ নীরবে বসে কি ভাবছিল কে জানে, শারদার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য মুখ তুলেই সে থেমে গেল, দেখলে দরজায় দাঁড়িয়ে অবিনাশ। শারদা দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল, সে অবিনাশকে দেখতে পেলে না; মনের চাঞ্চল্যের দরুন সরোজের সন্ত্রস্ত দৃষ্টির অনুসরণও করলে না। আবার বললে, "চুপ ক'রে রইলে যে?"

অবিনাশ ঘরে ঢুকল, মুখ তার আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর; চোখের দৃষ্টিতে মনের আগুন ফুটে বার হচ্ছে। নিঃশব্দে শারদার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে সে বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকল, "শারদা!" শারদা চমকে উঠল বজ্রাহতের মত; বললে, "তুমি!"

"হ্যাঁ, আমি,—আমিই তোমার কথার জবাব দিচ্ছি সরোজের বদলে, বল, কি শুনতে চাও তুমি। সরোজ কেন তোমার ভাইঝিকে বিয়ে করছে না? তোমার অতুল ঐশ্বর্য, এমন বাড়ি, জুড়িগাড়ি, সমস্ত পাবার লোভ সত্বেও সে কেন তোমার অনুরোধ রাখতে দ্বিধা বোধ করছে? সে কথা তুমি তোমার মত মেয়েমানুষ বুঝবে না শারদা, কারণ অন্দরের মর্যাদা যে কি, তা তোমার বোঝবার কথা নয়। তুমি বুঝবে বাইরের জাঁকজমক, চমকদার সাজ সরঞ্জাম; কিন্তু এটা ভুলে যাচ্ছ যে, সকলেই আমার মত অপদার্থ নয়। স্ত্রীর অধিকার পায়ে ঠেললেও মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করা সকলের পক্ষে সহজ নয়। তারা তোমার অতুল ঐশ্বর্যকে—এমন কি তোমাদের মত প্রবৃত্তির মেয়েজাতকেও এমনি ক'রে সরিয়ে চ'লে যেতে পারে।"

হঠাৎ সে এমন জোরে শারদার বসবার আসনে পদাঘাত করলে, যার টাল সামলাতে না পেরে শারদা উলটে পড়ল কার্পেটপাতা মেঝের উপরে। ঘরের মাঝখানে পাতা টেবিলটার পায়া হয়তো তার কপালে বেশ জোরেই লাগত, কিন্তু সরোজ তাকে ধরে ফেললে তাড়াতাড়ি। দুই হাতে ধ'রে সে যখন শারদাকে কার্পেটের উপর তুলে বসিয়ে দিলে, অবিনাশ তখন ঘর ছেড়ে চ'লে গেছে।

শারদা হাঁপাচ্ছিল। তার এ হাঁপানো আঘাতের ফলে নয়, গভীর অপমান, অপ্রত্যাশিত লাঞ্ছনার ফলে। বড় বড় চোখ-দুটো তার হয়ে উঠেছিল আরও বড়, বিস্ফারিত। মুখের আতঙ্কিত ভাব ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল দরজার সামনে গমনশীল অবিনাশকে দেখবার জন্য, তার পরেই ফিরে এসে দাঁড়াল পূর্বের জায়গায়। দৃঢ়স্বরে বললে, "আমি জানতাম সরোজ, এইরকম কিছু একটা কাণ্ড শীঘ্রই ঘটবে, সেই জন্যে—"

হঠাৎ সরোজের দিকে তাকিয়ে সে নীরব হয়ে গেল। তার সমস্ত মুখখানা বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো ম্লান। অবিনাশের ব্যবহারে সে যে কতখানি মর্মাহত হয়েছে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে তার মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে। ডাকল, "মামীমা!"

শারদার মুখের উপর ধীরে ধীরে একটু হাসির রেখা ভেসে উঠল। বললে, "সরোজ, তুমি ভাবছ তোমার মামার এরকম ব্যবহার পাওয়া বুঝি আমার পক্ষে নতুন। কিন্তু না, এরকম ব্যবহার আমি অনেক দিন, অনেক তুচ্ছ কারণেও পেয়ে এসেছি। কিন্তু কাউকে জানতে দিই নি, নালিশও করি নি কারও কাছে। আজও করতাম না, কিন্তু তোমার সামনেই যে হঠাৎ এ কাণ্ডটা ঘটবে তা বুঝতে পারি নি।"

সে চুপ ক'রে কি যেন ভাবতে লাগল। একটু পরে বললে, "আমার একটা কাজ করবে সরোজ, যদি তোমার বিশেষ অসুবিধা না হয়?"

"বলুন।"

"আমি আর এখানে থাকব না,—অনেক দিন থেকেই এ ইচ্ছে আছে। তাই মনে করছি দিনকয়েকের জন্যে অন্য কোথাও যাব।"

"কোথায় যাবেন মামীমা?"

মুহূর্তের জন্য শারদার চোখের দৃষ্টিতে একটা গভীর নৈরাশ্যের ছায়া ভেসে উঠল। সত্যই, কোথায় যাবে সে? তার যাবার জায়গা কোথায়? কে তাকে আশ্রয় দেবে? একটা দীর্ঘশ্বাস তার সমস্ত বুকখানাকে কাঁপিয়ে বার হয়ে গেল। মনে পড়ল এমন একদিন তারও ছিল যেদিন না চাইতেই সাদর আহ্বান আসত সমস্ত জায়গা থেকে, সসম্মানে তারা মাথা নীচু ক'রে দাঁড়াত। আর আজ? আজ হয়তো তারাই তাকে দেখে মুখ ঢেকে হাসবে, দূরে স'রে দাঁড়াবে—সুচিতা বাঁচাবার জন্য। সকলের কথা বাদ দিয়ে ঐ অবিনাশের কথাই ধরা যাক, যার মনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে এতদিন সে পরিচিত, সে-ই আজ তাকে সামনে দাঁড়িয়ে স্মরণ করিয়ে দিলে তার পরিচয়, তার অধীকার কতটুকু।

অথচ এই অবিনাশই এত দিন ধ'রে তার হাতে তার জীবনের মূল্য ছেড়ে দিয়ে তাকে অপার বিশ্বাস ক'রে এসেছে, যার জন্য শারদা হয়তো নিজের অজ্ঞাতেও ধরা দিয়েছে তার কাছে; প্রতিদানে আশা করেছে তার পক্ষে অসীম, অনন্ত। তাই আজকের এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, ভেসে গেল সমস্ত সংযম, বিশ্বাস। বিপরীতগামী মনোভাবকে সে সংযত ক'রতে পারলে না, বললে, "যাব যে এটা ঠিকই সরোজ, তবে কোথায় এটা ঠিক করতে পারি নি এখনও। করলে তোমায় জানাব, তুমি আমায় পৌঁছে দিয়ে এসো।"

শারদা আর সরোজের উত্তরের অপেক্ষা করলে না, ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বার হয়ে গেল।

সরোজ স্থির হয়ে ব'সে রইল সেইখানে, সেই চেয়ারের উপর। শারদাকে সান্ত্বনা দেবার মত কথা সে এখনও খুঁজে পেলে না। তাকে ফিরে ডাকতেও সাহস হ'ল না তার। চোখ বুজে সে অনুভব করলে মাত্র কয়েকটি দিনের আগের একটি সন্ধ্যা। এই চেয়ারটিতে ব'সে সে, আর সম্মুখের ঐ চেয়ারটিতে ব'সে আদু। ক্রন্দনজড়িত স্বরে সে গাইছে, সেদিনের সেই গানটা—

মোর পূজার থালিকা হ'তে নিয়েছ পূজা,
ভুলে গেছ পূজারিণীরে,
তব দেউল দুয়ার হ'তে শূন্য হাতে
বারে বারে এসেছি ফিরে।

বুকটা একবার কেঁপে উঠল দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে, যাবার জন্যে সে উঠে দাঁড়াল।

যাবার আগে শারদাকে জানাবার প্রয়োজন মনে ক'রে সে উঠে এঘর ওঘর খুঁজেও শারদাকে দেখতে পেলে না; অবিনাশকেও নয়। অগত্যা সে কাউকে কিছু না ব'লেই বাড়ির বার হয়ে পড়ল।

(১৫)

ইন্দু তরকারি কুটছিল। বেলা হয়েছে, বারান্দার চাতালে এসে পড়েছে উজ্জ্বল রৌদ্র। প্রাচীরের ওপাশে হেলে পড়া ডুমুর গাছটার পাতাগুলো সিরসির ক'রে উঠছিল থেকে থেকে। ওরই ডালে এসে বসছিল ছোট ছোট চড়াই পাখিগুলো; ওদের কিচ কিচ শব্দে ছায়গাটা ভ'রে উঠেছিল। এমনি সময় সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হ'ল, ভারী পায়ের জুতো। ইন্দু গ্রাহ্য করল না, কিন্তু গ্রাহ্য না করলেও যে মানুষটি আর সামনে এসে দাঁড়াল, তাকে দেখে সে না চমকে উঠে পারল না। চমকাল কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা বা ভয়ে। যে এল সে অবিনাশ।

অবিনাশের পদক্ষেপ অসংযত, পাঞ্জাবির আস্তিন ছেঁড়া, সর্বাঙ্গে একটা তীব্র দুর্গন্ধ। অবিনাশ আসতে আসতে কর্মরতা ইন্দুর সম্মুখে মুহূর্তের জন্য থামল, তার পরে গিয়ে প্রবেশ করল তার বহুদিনের পরিত্যক্ত শয়নকক্ষে। আজও সে কক্ষের আসবাবপত্র সেইভাবে সেই জায়গাতেই সাজানো আছে, শুধু ছিল না সে নিজে। অবিনাশ ঘরে ঢুকে খাটের উপর এসে বসল; সামনের লম্বমান আয়নায় প্রতিফলিত হ'ল তার শ্রীহীন বার্ধক্যের প্রতিমূর্তি। অবিনাশ যেন একটু শিউরে উঠল; আজ যেন ওর এই দৈহিক পরিবর্তন ওর নিজের চোখেই নূতন হয়ে দেখা দিয়েছে। যেন আজ ও বয়সের চেয়েও দশ বৎসর গেছে আগিয়ে। চোখের কোলে কালির রেখা, কপালের মাঝখানে কুঞ্চন, নাকের হাড় উন্নত। সব মিলে আজ যেন নিজের কাছেই নিজেকে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত ব'লে মনে হ'ল। অবসন্নের মত সে তাকিয়ে রইল আয়নার দিকে।

এমন সময় ঘরে এসে দাঁড়াল ইন্দু। হাতে তার পূর্ব অভ্যাসমত অবিনাশের জন্য সাজা গোটাকয়েক পান সুদ্ধ ডিশ। সেটা অবিনাশের সম্মুখে নামিয়ে রাখতেই সে ব'লে উঠল, "ও আর আমি খাই নে, অনেক দিন হ'লো ছেড়ে দিয়েছি। তার চেয়ে বরঞ্চ ব'সো, দুটো কথাবার্তা কই।"

ইন্দু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে সামনের চেয়ারখানায় ব'সে পড়'ল। অনেক দিন পরে আজ আবার এই প্রথম সম্বোধন। এ সম্বোধনকে সে অবহেলার আঘাত দিয়ে সরাতে পারল না বটে, কিন্তু মনে মনে নিঃসংকোচে গ্রহণও করতে পারল না; দুই'এর মাঝে প'ড়ে সে সংশয়ের দোলায় দুলতে লাগল।

অবিনাশ ইন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, বললে, "কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা?"

ইন্দু উত্তর দিলে "হচ্ছে, ব'লে যাও কি বলতে এসেছ।"

"কি বলতে এসেছি? ত, দেখ, বলতে এসেছি যে এবার থেকে বাড়িতেই থাকব, খাব-দাব, ঘুমোব তোফা তোয়াজে। বুঝলে কি না! শুনলে আমার কথা? না শুনেও বিশ্বাস করতে পারছ না? স্পষ্ট বল। ওরকম চুপচাপ থাকা আমার মোটে ভাল লাগে না তা জান তো! আমি চাই জবাব, সিধে বাঙলা কথায়—উত্তর।"

মাথা নেড়ে ইন্দু জানালে, সে তা জানে। অবিনাশ এপাশ ওপাশ ফিরে সোজা হয়ে বসল; বললে, "হ্যাঁ, সত্যিই তোমাকে ফ্র্যাংক্‌লি বলছি, এবার আর এক পা বার হচ্ছি না বাবা ঘর থেকে—। এইখানে চুপ ক'রে ব'সে তোমার হাতের সেবা যত্ন নেব। বিয়ে করেছিলাম তো শুধু এই জন্যেই।"

অবিনাশ বাহুর উপর মাথাটা রাখতেই ইন্দু উঠে গিয়ে মাথায় বালিশটা এগিয়ে দিলে—"এইটেয় মাথা রেখে শুয়ে পড়, ঘুমোও কিছুক্ষণ।"

অবিনাশ একবার মাত্র ইন্দুর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে শুয়ে পড়ল পাশ ফিরে। কিছুক্ষণ পরেই তার উচ্চ নাসিকাধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। সে নিঃসন্দেহে বুঝল অবিনাশ ঘুমিয়েছে; গভীর অবসাদে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিছুক্ষণের জন্য আর জাগছে না। কিসের এত অবসাদ, এত ক্লান্তি?

হয় তো সে রাত্রির পর রাত্রি জেগে কাটায় অনিয়মে, অত্যাচারের মধ্যে, তার পর আজকের এই প্রভাতের মত প্রতি প্রভাতে ক্লান্ত দেহ তার দুরন্ত শিশুর মত নিঃসন্দেহে নির্বিকারভাবে সমর্পণ করে নিদ্রার কোলে। ইন্দুর সমস্ত মন কেমন একটা তিক্ত অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল নিদ্রিত অবিনাশের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে। বাইরে তার অনেক কাজ! এখনও এবেলার রান্নার সমস্ত আয়োজনই প্রায় বাকী। ইন্দু আবার এসে বসল তরকারি কুটতে।

একপাশে চুপড়ি ভরা আনাজ, অন্য পাশে কোটা শাক, তরকারি আর বঁটি। ইন্দু সেগুলিতে হাত দিতেই সামনে এসে দাঁড়ালেন কাত্যায়নী। সর্বাঙ্গ তাঁর একখানি আধময়লা মটকার কাপড়ে ঢাকা, শীর্ণ দেহে ও সমস্ত মুখের উপর সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে একটা ক্লেশের ছায়া। অবিনাশের বাড়ি ফেরার খবরটা ইন্দু তাঁকে না জানিয়ে পারল না; একটু ইতঃস্তত ক'রে বললে, "বড়দি—"

কাত্যায়নী এঘর থেকে ও ঘরে যাচ্ছিলেন কি কাজে, ফিরে তাকিয়ে বললেন, "কি বলছ বউ?"

"আপনার ভাই বাড়ি ফিরেছেন।"

"কে, অবিনাশ!" কাত্যায়নী সচকিতে ফিরে দাঁড়ালেন; "অবিনাশ বাড়ি এসেছে? কখন? কোথায় সে?"

ইন্দু শোবার ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ঘুমুচ্ছেন।"

কাত্যায়নীর মনটা বোধ হয় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তাকে দেখবার জন্যে! অনেক দিন, হ্যাঁ অনেক দিনই হবে তিনি তাকে দেখেন নি। বোধ হয় যতদিন ইন্দু এবাড়ি এসেছে তত দিন। মনের মধ্যে অতীতের দৃশ্যগুলো পর পর ভেসে উঠতেই তিনি ক্ষণিকের জন্য চোখ বুজলেন, তার পরে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন ইন্দুর মুখের দিকে, যেন ওর অন্তর পর্যন্ত তিনি এই দৃষ্টিপাতে দেখে নিতে চান। প্রশ্ন করলেন, "কিছু ব'ললে না সে?"

"বলেছে।" কুণ্ঠিত স্বরে ইন্দু উত্তর দিল।

কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কি বলেছে?"

"আর বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না।"

"বটে!" ক্রুর হাসির একটু আভাস কাত্যায়নীর ওষ্ঠাধরে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল, নিজের মনেই যেন ব'ললেন "কি জানি, ওর কথায় ঠিক বিশ্বাস ক'রতে পারি নে কি না, নইলে—"

কি একটা কথা বলতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন। তার পর বললেন,—"ঘুম থেকে উঠলে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, ব'লো, আমি ডেকেছি।" ধীর পদক্ষেপে তিনি চ'লে গেলেন, ইন্দুও উঠল কাজ সেরে। কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছিল সে। এ অস্বস্তি ঠিক আনন্দের কি না তা সে বুঝে উঠতে পারছিল না; আবার এসে দাঁড়াল অবিনাশের ঘরের দরজায়। দরজাটা অল্প ভেজানো ছিল, ওরই ফাঁকে সে দেখলে অবিনাশ জেগেছে, কিন্তু এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। একটা চুরুট ধরিয়ে সে টানছিল; দরজার কাছে ছায়া পড়তে দেখে প্রশ্ন করলে, "কে ওখানে?" ইন্দু উত্তরে বললে, "আমি"।

"ও, বউ? আরে ভেতরে এস, ভেতরে এস; তোমাকেই তো খুঁজছিলাম এতক্ষণ।"

এত দিন পরে, এ কি সাদর আহ্বান! সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এ আহ্বান পেয়ে ইন্দুর সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠল, তবু সে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে; ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"কেন বুঝতে পারছ না?" অবিনাশ হাসল : "চা খাওয়াতে পার এক কাপ? বেশ গরম চা?" একটু থেমে আবার বললে, "কি জান এগুলো খেয়ে খেয়ে বড্ডই বদ অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে; চট্ ক'রে ছাড়তে পারছি নে; তবে আশা আছে তোমার আশ্রয়ে কিছুদিন থাকলে হয় তো ঐ বদ অভ্যাসটা যেতে পারে।"

ইন্দু কোনও উত্তর দিল না। অবিনাশ আবার জিজ্ঞাসা করল, "কেন, ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা?"

"কেন, হবে না। কিন্তু—"

"কিন্তু ভাবছ নিশ্চয় যে, যে মানুষ এতদিন এত বদ অভ্যাসে রীতিমত পাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে,—সে, সহজে তো নয়ই কষ্ট ক'রেও ছাড়তে পারে কি না সন্দেহ। কেমন, এই তো?"

হো হো ক'রে হেসে উঠে সে নিজেই নিজের কথার জবাব দিলে। বললে, "ভাববার কথা বটে। আচ্ছা দেখ, সে ভাবনা চিন্তা পরে হবে, আগে এক কাপ চা দাও তো। পরের কথা পরে।"

ইন্দু চলে যাচ্ছিল, অবিনাশ ডাকলে, "শোনো।"

"কি?"

"দেখ, আমার মাথার ঠিক নেই, এই এখানে আছি আবার এক ঘণ্টা পরে দেখবে এদেশেও আমার চিহ্ন নেই। তাই বলছি আমার কথায় তুমি কিছু মনে ক'রো না, আর আমার আসার খবরটাও দিদিকে দিয়ে কাজ নেই।"

মলিন মুখে ইন্দু বললে, "কিন্তু আমি যে ব'লে ফেলেছি।"

অবিনাশ কেমন যেন চমকে উঠলো; "বলেছ! আচ্ছা রসো; তাতে দিদি কিছু বললে না?"

"হ্যাঁ, একবার দেখা করতে বলেছেন।"

"হুঁ।" অবিনাশ অন্য দিকে মুখ ফেরালে অত্যন্ত অবসন্ন ভাবে। ইন্দু চ'লে গেল, একটু পরে ফিরলো এক কাপ গরম চা হাতে নিয়ে। কাপটা ওর হাত থেকে নিয়ে অবিনাশ চুমুক দিতে দিতে বললে, "বেলা কটা বেজেছে বলতে পার?"

আলমারির এক কোণে একটা ছোট টাইমপিস ঘড়ি টিক টিক করছিল, সেই দিকে তাকিয়ে ইন্দু বললে, "এগারটা বেজে গেছে।"

চায়ের কাপটা ধীরে ধীরে নিঃশেষ ক'রে অবিনাশ বললে, "তা হ'লে তো তোমাদের মতে এখন স্নানাদি সেরে আহারের সময় হয়ে এল বল।"

—"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমার অভ্যাসটা তো ঠিক তোমাদের মত রুটিনে বাঁধা নয়, রুটিন মাফিক করতে কিঞ্চিৎ সময়ের প্রয়োজন। অর্থাৎ আমার স্নান এবং আহারাদি বেলা তিনটের পূর্বে হবে না। এ কষ্ট যদি তোমরা সহ্য করতে রাজী থাক তবেই আবার আমায় ফিরিয়ে নিতে পারবে ব'লে আশা করতে পারি। নয়তো—"

ইন্দু যেমন ছিল তেমনিভাবেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল অবিনাশের দিকে চেয়ে। আজ যেন সে অবিনাশকে নূতন চোখে দেখতে শুরু করেছিল। সে দেখায় শুধু চোখের দৃষ্টিই ছিল না, ছিল মনের সূক্ষ্ম সমবেদনা, আর ছিল একটা ক্ষীণ ভরসা। সে ভরসা অবিনাশকে ফিরে পাবার জন্য নয়, ফিরিয়ে দেবার আগ্রহেও নয়, সে ভরসা সান্ত্বনার। সব হারিয়েও হৃদয় যে সান্ত্বনা পাবার আশায় কাঙাল হয়ে ওঠে সেই সান্ত্বনা। সে বুঝেছিল অবিনাশ হঠাৎ আজ খেয়ালের খুশিতে বাড়ি ফেরে নি, ফিরেছে কোনও একটা আকস্মিক ঘটনা উপলক্ষে।

(ক্রমশ)

নিউইয়র্ক

(ভ্রমণকাহিনী—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

চিকাগো নগরীকে অনেকে 'শিকাগো' ব'লে থাকেন। সে এক ব্যাপক ভাষার (Esperanto) উচ্চারণ, বানানের সুরু হ'ল tz দিয়ে। আমি কিন্তু 'চিকাগো'ই বলব, কারণ ও ভাষার পক্ষপাতী আমি নই, আমি পক্ষপাতী ইংরেজী ভাষার।

দেশে থাকতে নিউইয়র্ক নগরীতে গরমের জন্য লোক মরছে, সংবাদপত্রে এই সংবাদ পাঠ ক'রে মনে নানারূপ চিন্তা হ'ত। এবার ভাবলাম, দেখলেই হয়। কাজেই একদিন দুপুরবেলা একটা গরম অথচ বড় পথ ধ'রে চলতে লাগলাম, পথ চলতে চলতে গরম লেগে প'ড়ে ম'রে গেল এমন দৃশ্য যদি চোখে পড়ে। পথটির নাম 'ব্রড ওয়ে', শেষ হয়েছে গেটো (Ghetto)য়। এদিকে গরিব লোক বাস করে। গ্রাণ্ট রোডের ৩৩৩নং বাড়িতে অনেক হিন্দু বাস করে। বিদায়ের পূর্বে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটা কর্তব্য মনে ক'রে সর্বপ্রথম তাদের বাড়িতেই গিয়েছিলাম। তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গেটো দেখার অভিপ্রায় জানালাম। তারা তো হেসেই খুন! বলে, "গেটোয় যাবেন? সে যে গরিবের রাজ্য! সেখানে ভগবানের আশীর্বাদ পড়ে নি, সেখানকার লোক মহাপাপী ব'লেই তাদের ওই দুর্দশা।" যাই হ'ক, শেষ পর্যন্ত তাঁরা আমাকে গেটোর পথ দেখিয়ে দিয়ে বিদায় দিলেন।

'গেটো'র আভিধানিক অর্থ হ'ল ইহুদী পল্লী; আমেরিকার গেটোকে দেখলাম ওরা নোংরা পল্লী (slum area) বলে। নিউইয়র্কের এবং আশপাশের ছোট ছোট শহর থেকে যত দরিদ্র লোক এখানে এসে বাস করে। পথ ঘাট শহরের অন্যান্য স্থানেরই মত, তবে শহরের অন্যত্র এক-একটা ঘরে (compartment) যত লোক থাকতে পারে, এ পল্লীতে তার দ্বিগুণ বাস করে। অকর্মণ্য হ'য়ে যাদের দিন কাটাতে হয় তাদের দিন যে কত কষ্টে কাটে তা এই পাড়ার লোকরাই ভাল ক'রে জানে।

যেখানকার জলবায়ু ভাল, সেখানে থাকবার স্থানের অভাব হ'লেও পেটে লোকের খিদে হয়। খিদেয় জ্ব'লে পথে হাঁটতে হাঁটতে অনেকে অখাদ্য খায়; ক্রমে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। স্নানের অসুবিধা থাকায় অনেকে স্নান করতে পারে না। যদিও ঘরে বাইরে গরম তবুও জলের পাইপ খুললে যে জল আসে তা ভয়ানক ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা জলে স্নান করা শীতের দেশের লোক সহ্য করতে পারে না, তাই তারা বিনা স্নানেই থাকে। ক্রমাগত না খেয়ে, না নেয়ে যখন অভ্যাসবশে পথে বেরয় তখন তারা অনেক সময় গরম সহ্য করতে পারে না। কাজেই পথে প'ড়ে যায়। এবং দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্র অনভ্যস্ত উত্তাপে সহজেই স্থির হ'য়ে যায়। একেই বলে 'drop down'। এই মরণ বড়লোকদের কাছে ঘেঁষে না, গরিবদেরই বিনাশ করে। সৌভাগ্য বলব কি দুর্ভাগ্য বলব জানি না, গেটোয় গিয়ে তিনটি লোককে পথে প'ড়ে মরতে দেখেছিলাম। পুলিস এসে তাদের পকেট পরীক্ষা ক'রে একটি সেণ্টও বার করতে পারে নি; পেয়েছিল কতকগুলো মামুলী কাগজপত্র, যার দাম ওই তিনটি লোকের কাছেই ছিল—বাইবেলের পাতা, স্যোসিঅ্যালিজ্‌ম সম্বন্ধে ছোট দু-একটা পুস্তিকা, ইত্যাদি। বিকালের সংবাদপত্রে বেরল—গেটোয় আজ তিনজন হীট ওয়েভ সহ্য করতে না পেরে মারা গেছে। দারিদ্র্যের জন্য, না খেতে পেয়ে দুর্বল হ'য়ে মারা গেছে, একথা কেউ বলে না। যেখানে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সর্ববিদিত, যেখানে ডিমক্র্যাসির পূর্ণ প্রভাব বর্তমান, সেখানেও মুদ্রাযন্ত্র অবলীলায় গরিবের কথা ভুলে থাকে।

আমার ধারণা ছিল পৃথিবীর সকল ইহুদীই সুখী এবং ধনী। গেটোতে এসে আমার সে ধারণা ভাঙল। দরিদ্র ইহুদীর দল বেঁচে থাকবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কিন্তু ব্যবসায়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। গেটোতে সারা দিন কাটিয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে অনেকক্ষণ বিশ্রামাদি ক'রে ফের বিকালে দশটার সময় গেটোতে ফিরে এলাম। ভদ্রলোকরা সাধারণত যে সময়ে হারলামে আসেন আরাম করতে, আমি গেলাম সে সময়ে গেটোতে দরিদ্রের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের উগ্রত হৃদয়ংগম করতে।

তখনও রাত্রি হয় নি, সবেমাত্র দশটা বেজেছে। দরিদ্রের ছেলে মেয়েরা সারা দিন পথে বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে তথাকথিত অ্যাপার্টমেণ্টএ ফিরে চলেছে। অল্পাহারে ও পরিশ্রমে কেউ বা কাতর, কেউ বা প্রায় অর্ধমৃত। খৃষ্টধর্ম প্রচারকরা আমেরিকার জাতীয় পতাকা টাঙিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পাপীদের পরিত্রাণার্থে ডাকছে; কেউ একটা পয়সাও পাপীদের পেটের জন্য দিচ্ছে না। কেউ দাঁড়িয়ে শুনছে, কেউ বা কান না দিয়েই চ'লে যাচ্ছে। ছেলেতে ছেলেতে মেয়েতে মেয়েতে পথের উপর দাঁড়িয়ে বেশ বচসা চলছে সামান্য এক টুকরা রুটির জন্য। বৃদ্ধ বৃদ্ধকে পথের কাছে দাঁড়িয়ে বলছে "আজ আর কিছু খেতে পাই নি"। আমি নিগ্রো-বেশে পথে চলেছি তাই আমাকে কেউ কিছু বলছে না। দুএকটা বলবান যুবক মাত্র মাঝে মাঝে মুখের কাছে এসে বলছে, "Have you got a cigarette?" যখনই বলছি, "Boss I need one, have you got a butt?" অমনি "sorry" ব'লে পাশ কাটিয়ে তারা চ'লে যাচ্ছে।

ছোট ছোট কাফিখানায় সস্তা দরে কাফি বিক্রি হচ্ছে। এক পেয়ালা কাফি এবং একখানা মারগ্যারিন * মাখানো রুটির টুকরো পাঁচ সেণ্টে বিক্রি হচ্ছে। ছোট ছোট মিষ্টির টুকরোর দাম এক সেণ্ট। ছোট ছোট মিষ্টির দোকানে খুব ভিড়; কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শৃঙ্খলা এবং ধৈর্য বজায় রেখে কি সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে! এই সব দেখলে আমেরিকার শিক্ষা বিভাগকে ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকা যায় না।

বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলাম মিশনারীরা যেমন একদিকে দাঁড়িয়ে ভগবানের গুণ কীর্তন করছেন, একটু দূরে দাঁড়িয়ে নাস্তিকরাও তেমনি ভগবানের নিন্দা করছেন। আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেতাম, ডিমক্র্যাসির প্রশংসা ক'রে উচ্চকণ্ঠে লেকচার চলছে, আর তার কাছেই আর একদল লোক ডিমক্র্যাসিকে হিপক্র্যাসি ব'লে কমিউনিজ্‌মএর লেকচার দিচ্ছেন। পূর্বেই বলেছি, গেটো গরিবের স্থান। কমিউনিজ্‌ম এখানকার প্রাণের জিনিষ; তবু অন্য তিন বক্তাকে কেউ আক্রমণ করছে না। যার বক্তৃতা ভাল হচ্ছে তার বক্তৃতা লোকে নির্বাক হয়ে শুনছে। যার বক্তৃতা লোকের ভাল লাগছে না তার কাছ থেকে লোক চ'লে যাচ্ছে। এমনও দেখেছি, কোনও কোনও বক্তার সামনে একটিও লোক নেই। বক্তৃতার বিরামও নেই তবু। মাঝে মাঝে এরূপ বক্তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কখনও দেখতাম বক্তা একজন শ্রোতা পেয়েও সুখী। কিন্তু যখনই বলতাম, "কালো লোকের আবার ভগবান কি? আপনাদের মত শ্বেতকায়দের সেবা করা, কথা মেনে চলাই হ'ল কালোদের ধর্ম, আপনারাই হ'লেন আমাদের ভগবান, অমনি বক্তৃতার সমাপ্তি হ'ত।

গেটোতে বাতি জ্ব'লে উঠেছে। অন্ধকার ঘরে পথ দেখার ও সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সুবিধা হয়েছে। ঘরে বাতাস নেই, আলো নেই, অপরিষ্কার। অনেকে বলে এসব ওদেরই দোষ, ওরাই নোংরা

* নকল মাখন।

(শেষাংশ ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

টুকু

(গল্প)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

কী যে হয় এক-এক দিন, কিছুতেই পড়ায় মন লাগে না। টুকু দেখেছে মন যেদিন খুব খারাপ থাকে সেদিন যেমন পড়া হয় না, আবার হঠাৎ যেদিন খুব ভাল লাগতে থাকে, সেদিনও তেমনি গুন গুনিয়ে গান গাইতে ইচ্ছা করে, এঘরে ওঘরে মিছামিছি ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে, গল্প করতে ইচ্ছা করে ওঘরের ফুলুদির সঙ্গে, রান্নাঘরে গিয়ে মার এটা ওটা করে দিতেও মন্দ লাগে না। পৃথিবীর সবই যেন সেদিন করা যায়, শুধু অঙ্ক কষা আর ভূগোল মুখস্ত করা ছাড়া। বই বন্ধ করে টুকু পুবের জানালায় এসে দাঁড়াল।

'নিবেদিতা ছাত্রীনিবাস' ভারি সুন্দর দেখায় রাত্রে। ওর ক্লাসেরই সব মেয়ে, এক বেঞ্চে যাদের সঙ্গে ও বসে পাশাপাশি, কত কথা কাটাকাটি হয় যাদের সঙ্গে তারাই যে থাকে ওখানে একথা এখন যেন আর টুকুর বিশ্বাস হতে চায় না। জানলায় জানলায় নানা রং-এর পর্দা, পর্দার ভিতর দিয়ে আসে আলো। মাধবীদি আজ আবার তাঁর পর্দার রং বদলেছেন। এই এক শখ মাধবীদির। এক-এক দিন এক-এক রংএর পর্দা টাঙ্গাবেন তাঁর জানলায়। এই নিয়ে মেয়েরা হাসাহাসি করে কত। টুকুর কিন্তু ভারী ভাল লাগে তাঁর এই শখ; তার নিজেরও ইচ্ছা করে এইরকম রংবেরংএর পর্দা টাঙ্গাতে। সেদিন একটা রঙিন পর্দা তৈরীও করেছিল, কিন্তু দুদিনও কি গেল? খোকার বমি মুছতে মুছতে তার চিহ্নটুকুও আর রইল না। শখ বলতে কিছু যদি মায়ের থাকে!

মাধবীদির মত অমন ছোট একটা ঘর যদি টুকু পেত। কী চমৎকার হ'ত তা হ'লে। সেও অমনি সুন্দর ক'রে ঘর সাজাতে পারত তা হ'লে। ঠিক অমনি পরিষ্কার ধবধবে থাকত তার বিছানা, একা এক বিছানায় সে ঘুমোত, ঘুমের ঘোরে ভুলু অমন ক'রে পা তুলে দিতে পারত না তার গায়ে, কমলা প্রতি রাত্রে বিছানা নষ্ট ক'রে দিত না, ঘুম ভেঙে গেলে ওঘর থেকে ঠাকুরমার অমন বিশ্রী নাক ডাকার শব্দ আসত না কানে। মাথার কাছে থাকত গল্পের বইএর সেল্ফ্, আলো জেবলে শুয়ে শুয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত টুকু নভেল পড়ত মাধবীদির মত।

নভেল। কথাটা মনে হ'তেই টুকুর সর্বাঙ্গে যেন একটা অদ্ভুত শিহরন খেলে গেল। নভেল শব্দটার মধ্যে ভয় ও চমৎকারিতা যেন মেশামিশি ক'রে রয়েছে। যে কথাটা উচ্চারণ করতেও টুকুর লজ্জা পাওয়া উচিত, তার মধ্যেই এত আনন্দ পাওয়া যায় কেন। নভেল পড়া তার পক্ষে ভয়ংকর নিষিদ্ধ। বাবা সেদিন তাকে মায়ের ট্রাঙ্ক থেকে চুরি ক'রে নেওয়া 'শুভরাত্রি' বইখানা হঠাৎ পড়তে দেখে ফেলেছিলেন। সে কী রাগ! 'এতটুকু মেয়ে, এই বয়সেই নভেল পড়তে শিখেছ? আর যদি দেখি কোনও দিন—।' নভেল অবশ্য কোনওদিনই আর টুকু পড়বে না, কিন্তু অমলা আর অনিলের যে কী হ'ল শেষ পর্যন্ত, তা না জানা পর্যন্ত যেন স্বস্তি নেই টুকুর মনে, গোপনে গোপনে অনেক খুঁজেছে সে বইখানাকে, কিন্তু বাবা যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন তা কে জানে।

'এই বুঝি তোর পড়া হচ্ছে?'

টুকু চমকে পিছন ফিরে তাকাল। ছোটনকে কোলে নিয়ে মা কখন এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছেন, টুকু একটুও টের পায় নি।

সুলতা বললেন, বেশ ফাঁকিবাজ মেয়ে হয়েছিস যা হ'ক। কাজকে এখনই এত ভয়? আরও তো দিন প'ড়েই আছে। পড়ার অজুহাতে এখানে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছিস, পাছে আমি তোকে কিছু করতে বলি। আর তোর আক্কেলখানা কি বল্ দেখি, ওকে তুই রান্নাঘরে ছেড়ে দিয়ে এলি কোন কথায়? গরম ডালের মধ্যে আর একটু হ'লেই তো পড়ছিল গিয়ে! সব পুড়ে ঝুড়ে মরুক, তোর ইচ্ছেই তো তাই।'

এক মুহূর্ত তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সুলতা, তার পর ছোটনকে মেঝের উপর সশব্দে বসিয়ে দিয়ে চ'লে যাচ্ছেন; টুকু তীক্ষ্নকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও কি, ওকে আবার রেখে যাচ্ছ যে এখানে? আমি যখন কাউকে দেখতেই পারি না, আমি যখন সংসারের সব কাজ এড়িয়ে এড়িয়েই যাই, তখন কারও ছেলেও আমি আর রাখতে পারব না।'

দুঃসহ ক্রোধে এক মুহূর্ত সুলতার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরল না; তার পর বললেন, 'চার আঙুলে মেয়ে নয়, আট আঙুলে কথা! পারবি নে তো রাখতে? আচ্ছা, তুই যদি আবার কোনও দিন ওকে ধরতে আসিস—' একটা কঠিন দিব্য সুলতার মুখে আসছিল তাড়াতাড়ি সেটাকে সামলে নিয়ে বললেন, 'দেখি খাওয়া আসে কোত্থেকে আজ।'

সুলতা ছেলেকে নিয়েই যেমন এসেছিলেন, তেমনি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন।

ততক্ষণে সমস্ত জগৎ টুকুর কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে। পৃথিবীতে কোনও রং নেই, রস নেই, আনন্দ নেই। সশব্দে পুবের জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে টুকু খাটের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু শুয়েও যেন থাকা যায় না; মাকে আরও কয়েকটা কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারলে যেন ভাল লাগত। যেসব কথা তখন মনে হয় নি বা তাড়াতাড়িতে বলতে পারে নি, সেইসব অনেক ধারাল কথা টুকুর এখন মনে প'ড়ে যেতে লাগল।

মা তাকে মোটেই দেখতে পারে না। আর সকলেই তো তাকে ভালবাসে, প্রশংসা করে। নিমাইদা তার গানের কত প্রশংসা করেন, এমন মিষ্টি গলা তিনি আর কারও শোনেন নি, এ কথা তো কতবার তিনি বলেছেন। মাধবীদির কাছে প্রত্যেকবার ইংরেজী পরীক্ষায় সে ফার্স্ট হয়। তিনিও তো এক ক্লাস মেয়ের সামনে প্রায় প্রত্যেক দিন তার প্রশংসা করেন। শুধু নিজের মায়ের মুখেই সে এ পর্যন্ত কোনও-দিন একটা ভাল কথা শুনতে পেল না, সব সময়েই একটা না একটা গাল লেগেই আছে তাঁর মুখে। সব দোষই যেন টুকুর,

ভুলু, দিলু ওদের কারও যেন কোনও দোষ নেই। টুকু এ কাজ পারে না, ও কাজ পারে না; মা নিজেই বা কোন্ কাজ পারেন এক রান্না করা ছাড়া? তিনি কি পারেন মাধবীদির মত অমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে, অমন সুন্দর ক'রে ঘর সাজাতে, অমন চমৎকার ক'রে ইংরেজী পড়তে?

রান্নাঘরে ছোটনকে নিয়ে সুলতার ভারী অসুবিধা হচ্ছিল। তা হ'ক, তবু তিনি সাহায্যের জন্য টুকুকে আর কোনও দিন ডাকতে যাবেন না। এই তো সন্তান! টুকু যে তাঁরই পেটের মেয়ে, কথা শুনলে একথা কে বিশ্বাস করবে? মেয়ে নয় যেন সতীন, কথা শুনলে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। কোনও কিছু ব'লে সেরে যাবার জো নেই, তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে তার জবাব দেবে। এখনও কোন কাজ কর্ম শিখলে না, কোনও কাণ্ডজ্ঞান হ'ল না; কিন্তু বয়স কি কম হ'ল? প্রায় এই বয়সেই তো তিনি এসেছেন এসংসারে, কোন্ কাজ না তাঁকে করতে হয়েছে? এখনও তিনি যা করেন, তখনও তিনি তাই করেছেন; আর মৃত্যু পর্যন্ত এইভাবেই চলবে। টুকু কি এখন সব বোঝে না? সে কি বোঝে না তাঁর কি কষ্ট হয় এইসব ছেলে মেয়ে নিয়ে? তার পর ছোটন হবার পর থেকে তাঁর শরীর একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। সামান্য একটু পরিশ্রম করলেই বুক কাঁপতে থাকে। ও কি পারে না একটু সাহায্য করতে, সংসারের এক আধটা কাজ ক'রে দিতে? ও কি বোঝে না তার কষ্ট? এখনই যদি না বুঝল, তবে বুঝবেই বা কবে, আর বুঝে লাভই বা হবে কি তখন!

•

বীরেনবাবু এলেন রাত সাড়ে আটটায়। মল্লিক কোম্পানী ডিউটি বাড়িয়েছে, কিন্তু মাইনে আছে ঠিক। বাঙালীদের স্বভাবই এই। সব সময়েই বীরেনবাবুর মাথায় ঘুরছে কি দিয়ে কি করবেন, কি দিয়ে কি হবে, কি কথা ব'লে কাকে ক দিন পরে দিলে চলবে, একটু ফাঁক পেলেই শুধু এই চিন্তা আসে মাথায়। উপায় কি! সংসারে কারও কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না। কোনও সঙ্গী তাঁর নেই যার সঙ্গে এক দণ্ড এসব বিষয়ে পরামর্শ করতে পারেন! সুলতা। সুলতা পারে শুধু খরচ করতে। যত তাকে এনে দিতে পার, ততই ভাল। কিন্তু কোথা থেকে যে এনে দেওয়া যায়, তা কি একবারও তার মনে আসে?

জুতার শব্দ শুনেই টুকু তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে অঙ্কের খাতা খুলে বসল। বীরেনবাবু দেখেই ধমক দিয়ে উঠলেন, 'এখন বুঝি তোর অঙ্ক কষার সময় হ'ল? এতক্ষণ করছিলি কি শুয়ে শুয়ে।' টুকু বুঝল ভুল হয়েছে। যথারীতি তোয়ালে, লুঙ্গি, জল আর চটিজুতো দিলে এগিয়ে।

হাত পা ধোয়া হয়ে গেলে বীরেনবাবু বললেন, 'দেখে আয় তো রান্না হ'ল নাকি। রাত দশটা পর্যন্ত রান্নাই ফুরোয় না, আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেছে যা হ'ক।

টুকু ভেবেছিল মায়ের সঙ্গে কথা বলবে না, রান্নাঘরেও আর যাবে না, কিন্তু তা আর হয় না। না হ'ক ভাত কিন্তু সে আর খাবে না এ আজ সে ঠিক ক'রে রেখেছে। খাওয়ার জন্য যখন এত খোঁটা, তখন কী এসে যায় ভাত না খেলে?

রান্না শেষ হয়ে গিয়েছিল। বীরেনবাবু খেয়ে উঠে শুয়ে পড়লেন একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়ে।

টুকু মনে মনে ভূগোল মুখস্ত করছে—সুলতা এসে নীরস কণ্ঠে বললেন, 'আবার বই নিয়ে বসলি যে, তোদের জন্য আমি কি সারা রাত ব'সে থাকব রান্নাঘরে? খেতে চল্।'

টুকু বললে, 'আমার শরীর ভাল নেই। খাব না আমি আজ।'

বীরেনবাবু অপেক্ষাকৃত মোলায়েম সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন কি হ'ল আবার তোর?'

সত্যি যা হয়েছে তা বলা যায় না। তাতে শুধু যদি মার ভাগ্যে কিছু হ'ত তাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু টুকু নিজেও বাদ পড়বে না। টুকুকে তাই আমতা আমতা ক'রে বলতে হ'ল, 'শরীরটা ভাল লাগছে না বাবা।'

বীরেনবাবু বললেন, 'না খেলে আরও খারাপ লাগবে। যা, আজ আর পড়াশুনো দরকার নেই, খেয়ে এসে এখনই শুয়ে পড় গিয়ে।'

শান্তভাবেই বলুন, আর রেগেই বলুন, বীরেনবাবু যা বলবেন, তার প্রতিবাদ করবার সাধ্য এ বাড়িতে কারও নেই। রাগে আর অভিমানে টুকুর চোখ দিয়ে জল এল, তবু কোনও উপায় নেই, খেতে তাকে যেতেই হবে।

টুকু খেতে গেল। কিন্তু খেল নামমাত্র। কোনও রকমে দু-চার গ্রাস মুখে দিয়েই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। মেয়ের আচরণে সুলতার সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে যাচ্ছিল, কিন্তু কোনও কথা আর তিনি বললেন না। এমনিতেই তিনি খুব কম কথা বলেন, রাগ হ'লে একেবরেই বলতে পারেন না; কপালে শুধু খানিকটা কুঁচকে ওঠে, দাঁতে দাঁত শক্ত হয়ে লেগে যায়।

খেয়ে এসে নিজের জায়গায় না শুয়ে টানা বিছানার একেবারে দক্ষিণ দিকে প্রায় দেওয়াল ঘেঁষে টুকু শুয়ে পড়ল। কোনও সংস্পর্শ নেই, কোনও সম্পর্ক নেই সুলতার সঙ্গে। সুলতা কটাক্ষে একবার সব দেখে নিলেন, তার পর নিজেও গিয়ে ক্লান্ত শরীরে যথাস্থানে শুয়ে পড়লেন।

শেষ রাত্রে টুকুর ঘুম ভেঙে গেল। সমস্ত ঘরটা অন্ধকার, নিস্তব্ধ। শুধু কতকগুলি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হাতটা একটু টান করতেই দেওয়ালে ঠেকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে টুকু শিউরে উঠল, কি ও,—কি ও! এক মুহূর্ত টুকু চোখ বুজে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে রইল। কি যেন একটা অস্বস্তি, কিসের যেন ভয়। টুকুর মনে হ'ল সে যেন সম্পূর্ণ একটা নতুন জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছে। সেখানে মা নেই, আর কেউ নেই, সে শুধু একা। একাকিত্বের কল্পনা অত্যন্ত দুঃসহ, ভয়ংকর ব'লে মনে হ'ল টুকুর কাছে। দু হাতে ভর দিয়ে টুকু একবার সাহস ক'রে সামনের দিকে তাকাল। জানালার একটা পাট খোলা, সেখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে শুধু অন্ধকার আর কি যেন কালো মত একটা। আর যেই একটু বাতাস হচ্ছে জোরে, অমনি তার উপর কি যেন ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়াচ্ছে।

টুকু চেঁচিয়ে উঠল, 'মা ও-মা, আলো জ্বালো শীগগির।'

সুলতার তৎক্ষণাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, 'কি রে টুকু? বাইরে

যাবি বুঝি? আয় আমার সঙ্গে।'

টুকু বলল, 'না।'

সুলতা হেসে বললেন, 'তুই একা তো আর যাচ্ছিস না, আমারই সঙ্গে যাবি তার আবার ভয় কি!'

না, এখন আর টুকুর ভয় নেই। উজ্জ্বল ইলেকট্রিক লাইটে টুকু তার পরিচিত পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, সেই নিবেদিতা ছাত্রী-নিবাস আর ছাতের উপর হেলে পড়া নারকেল গাছটা।

তবু বাইরে থেকে এসে টুকু আর দক্ষিণের দেওয়ালের ধারে গেল না, অন্যান্য দিনের মত তার নির্দিষ্ট স্থানে মার-পিঠ ঘেঁষে গিয়ে শুয়ে পড়ল। সুলতা সস্নেহে তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'অত দূরে গিয়ে শুয়েছিলি কেন, ভয় পাস নি তো?'

টুকু অত্যন্ত সপ্রতিভ কণ্ঠে জবাব দিলে, 'ভয় না আরও কিছু! ভয় আমি কিছুতেই পাই নে, আমি কি দিদু নাকি যে ভয় পাব?'

নিউ ইয়র্ক

(১৭১ পৃষ্ঠার পর)

হয়ে থাকে। কিন্তু দারিদ্র্যনিষ্পেষিত লোকের পরিচ্ছন্নতার দিকে আর মন থাকে না; যাতে গুটিকতকও সেন্ট দিনান্তে আসে সেই ভাবনাতেই তারা বিব্রত। অনেক উপদেশ দেওয়া হয়েছে, পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অনেক সিনেমা বিনি পয়সায় দেখানো হয়েছে, অনেক বইও তাদের বিতরণ করা হয়েছে, কিছুতেই কিছু হয়নি। কিন্তু এইবার কার্ল মার্ক্স এসে গেটোয় প্রবেশ করেছে, সামান্য পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। হয়তো ওআল্‌স্ স্ট্রীটকেও একদিন গেটোকে নমস্কার করতে হবে। ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকানরা বই লেখে, ভারতে ধর্ম প্রচার করতে লোক পাঠায়, কিন্তু গেটো তো তাদের বুকের উপর নৃত্য করছে উলঙ্গ হয়ে লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে; কই পুঁজিবাদী ধর্মপ্রচারক ও লেখকরা সে দৃশ্য চেয়েও তো দেখছে না।

রাত্রি তিনটে পর্যন্ত গেটোয় কাটালাম; দেখলাম গরিবদের বহু-ব্যাপী দৈন্য। সমস্ত পৃথিবীরই এই ব্যাপার। সর্বত্রই ধনমদে মত্ত মাতঙ্গের দলের চরণতলে পিষ্ট হচ্ছে রাজ্যের নগণ্য ও নিরন্ন লোক।

আজ *

কবিভূষণ শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

এখনি শোন গো কথা, সময় চলেছে উড়ে
চল চঞ্চল ডানার আঘাতে তার,
প্রণয়ের অমরতা ডুবে যায় দূরে দূরে
স্মৃতির আলোকে নিভে যায় বারে বার;
বেদনায় ভরা বেদনার যত মর্মন্তুদ গাঁথা
ফেলে রেখে দেওয়া কর্মের জঞ্জাল,
আজ যাহা পারে মুখ দিয়ে বলা তুচ্ছ দুইটি কথা;
হৃদয় তাহারে হয়তো হারাবে কাল।

নদীর ওপারে ঐ যে শ্মশানভূমি
তোমারে যখন চাহিবে গো চিরতরে,
তুহীন শীতল মৃত্যুর কর চুমি
মালা হতে সব ফুলগুলি যাবে ঝ'রে,—
চিতাভস্মের আড়ালে পড়িবে সব
আশা প্রদীপের তীব্র আলোক রাশি,
আজ না বলিলে সেদিন কেমনে কব—
"ওগো প্রিয়তমা তোমারে যে ভালবাসি।"

চিরনিদ্রিত তোমার শয্যা 'পরে
বকুলের বনে নামিবে শোকের ছায়া,
মলিন জ্যোছনা কাঁদিয়া করুণ ক'রে
শত শত হাতে জড়াবে তোমার কায়া;
আকাশের কোণে একটি ক্ষুদ্র তারা
ধীরে ধীরে যবে মিলাবে দিগন্তরে,
তুমি ত সেদিন কোথায় হয়েছ হারা
"ভালবাসি প্রিয়া"—আজই বলি ভাল ক'রে।

* W. H. Ogilvie-র To-day কবিতার অনুবাদ।

শিল্পের উপকরণ

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

রসের অনুভূতিকে প্রকাশ করবার জন্য উপকরণের দরকার। এক উপকরণের দ্বারা সকল রকমের অনুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব নয়; সেইজন্য আর্টিস্ট মাত্রেরই উপযোগী উপকরণ চিনে নেওয়া এবং তাহার ব্যবহার কৌশল আয়ত্ত করা প্রয়োজন। মনের মধ্যে যখন কোনও বিশেষ রসের অনুভূতি জাগে, সে রস তখন বিমূর্ত (abstract) এবং সে অনুভূতি একান্তভাবে ব্যক্তিগত হয়। অপরে তার অস্তিত্ব বুঝতে পারে না। যখন সেই অনুভূতি উপকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাইরে প্রকাশিত হয় তখনই সেটি হয় আর্টের বস্তু। ভাষা (বাক্য) শব্দ বা ধ্বনি (সংগীত) রূপ (চিত্র, ভাস্কর্য) ইত্যাদি যেমন প্রকাশের উপকরণ তেমনি শিল্পীর আর এক উপকরণের দরকার, তাহা ব্যবহারিক উপকরণ বা হাতিয়ার (ব্যবহারিক উপকরণ বলতে অনেক কিছু বোঝায় চিত্রকরের ছবি করবার তোড়জোড়, রং তুলি, কাগজ ইত্যাদি; সাহিত্যিকের লেখার জিনিস; সংগীতজ্ঞের বাদ্যযন্ত্র এবং তার কণ্ঠস্বরকেও ব্যবহারিক উপকরণ-এর মধ্যে ধরতে হবে)। এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির উপকরণ যেমন প্রকাশের পথে সাহায্য করছে, তেমনি মূল অনুভূতির স্বরূপ উপকরণের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে রূপান্তরিতও হচ্ছে। এখন এ কথা বলা যায়, উপকরণ যেমন প্রকাশের সহায় তেমনি বাধাও বটে।

উপকরণ মাত্রেরই প্রকৃতি এই। উপকরণের বাধাকে অনেক দূর পর্যন্ত অস্বীকার করা যায় কিন্তু তার স্বভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

রূপধর্মী শিল্পের (চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি) ক্ষেত্রে দুটি আদর্শবাদীকে আমরা দেখি। একদল যাঁরা উপকরণের গণ্ডিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন অপর দিকে যাঁরা উপকরণের বাধাকে স্বীকার করেছেন। উপকরণের এই দুইপ্রকার ব্যবহার রীতিতে শিল্পীর মূল অনুভূতিকে কতদূর রূপান্তরিত করতে পারে, ছবিকে কেন্দ্র ক'রে আজ সংক্ষেপে তারই আলোচনা করব।

ছবি রূপপ্রধান হ'লেও বর্ণই তার মূলবস্তু। আরও সূক্ষ্মভাবে দেখলে দেখা যাবে আলোই ছবির প্রাণ। ছবির ক্ষেত্রে বর্ণের সবচেয়ে সহজ ও সরল প্রকাশ হয়েছে সাদা কালো (আলো-ছায়া)র ছবিতে সেইজন্য এই আলোচনা সাদা কালোর ছবির মধ্যেই আবদ্ধ রাখছি। সাদা কালো বা আলো ছায়াকে চিত্রকররা কিভাবে ব্যবহার করেছেন প্রথমে তাঁর উদাহরণ দিই।

প্রথম উদাহরণ। সাদার উপর কালোর ব্যবহার। কালো এখানে দেখবার বস্তু, সাদা পশ্চাদভূমি। এখানে বস্তুর ছায়া—লক্ষ্য, পশ্চাদ্‌ভূমি উপলক্ষ্য। এ জাতীয় কাজ প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষণ করে সব সময়ে তা রসের দিক থেকে নয়; আমরা সচরাচর যেমনভাবে জিনিসকে দেখি তার থেকে এর রূপ কিছু ভিন্ন ব'লেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ।—প্রথম উদাহরণ যেমন কালো অর্থাৎ ছায়া ছিল লক্ষ্য এখানে তেমনি সাদা (আলো)কে দেখানো হচ্ছে কালোকে উপলক্ষ ক'রে।

তৃতীয় উদাহরণ।—এখানে আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের সমন্বয় দেখতে পাই, এখানে একসঙ্গে কালো সাদা দুটোই দেখবার বস্তু। সাদা কালোর ব্যবহারের এই কয়টি সূত্রই দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ রং ও রূপের অনুভূতিকে আলো ছায়ার সাহায্যে প্রকাশ করতে হ'লে অন্য উপায়ে তা করা সম্ভব নয়। এই মূল সূত্র কয়টিকে আমরা চিত্র রচনার বিশেষ পদ্ধতি বলতে পারি।
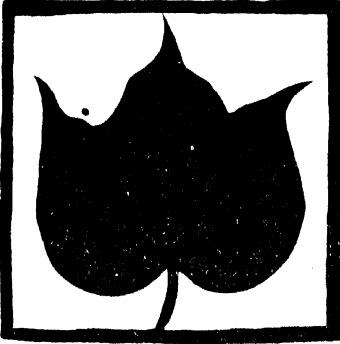
প্রথম উদাহরণ

দ্বিতীয় উদাহরণ

তৃতীয় উদাহরণ

তুলির টানে করা সাদা কালোর ছবি, বিলাতী আর্টিস্টদের কলমের কাজ বা বিভিন্ন দেশের এনগ্রেভিং উপকরণের ব্যবহারের মূল সূত্র এক। তবু চীনে তুলির বৈচিত্র্যবহুল জটিল কাজের যে রস, বিলাতী এনগ্রেভিং-এর রসের সঙ্গে তার প্রভেদ আছে। মূল উপকরণ এক হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকটির চেহারা ভিন্ন। দেখা যাচ্ছে মূল উপকরণ অনেকখানি রূপান্তরিত হচ্ছে ব্যবহারিক উপকরণ বা হাতিয়ারের দ্বারা। যেমন রসের অনুভূতি উপকরণের দ্বারা খণ্ডিত হচ্ছে (এখানে উপকরণ বর্ণ) তেমনি ব্যবহারিক উপকরণ হাতিয়ার উপকরণবিশেষে নিজের বিশিষ্ট ছাপ দিয়ে যাচ্ছে। সে ছাপকে এড়িয়ে কোনও রস প্রকাশিত হ'তে পারে না, অনুভূতির পূর্ণ বা বিমূর্ত রূপ কখনই আমরা প্রকাশ করতে পারি না। উত্তাপ থেকেই যেমন আমরা আগুনের প্রচণ্ডতা উপলব্ধি করতে পারি তেমনি প্রকাশিত বস্তুর থেকে আমরা অনুভূতির তীব্রতা উপলব্ধি করি। শিল্পীর মনের যেটুকু আমরা পাই তা মূল ও ব্যবহারিক উপকরণের সাহায্যেই পাই। আর বেশির ভাগই যা অব্যক্ত থেকে যায় তারও কারণ উপকরণের স্বভাবেই রয়েছে। আমি প্রথমেই বলেছি, উপকরণের ব্যবহার দু রকমে হ'তে পারে। শিল্পীর মন যখন অনুকরণের দিকে

কথাটা ব'লে বড় অন্যায় ক'রে ফেলেছি, না দাদু? ও আমাদের এখানে থাকতে যাবে কেন। ও হয়তো মনে করেছে যথেষ্ট সাবধান না হয়ে আমি ওকে একটু পরিহাস করেছি। নারীমর্যাদাবোধ হয়তো ওর একটু ক্ষুন্ন হয়েছে। কিন্তু আমায় বিশ্বাস ক'রো, এমন কোনও অভিসন্ধি আমার মনে ছিল না, আমি সরল মনেই কথাটা ওকে বলেছিলাম।......

একদিন হয়তো স্পষ্ট ক'রেই এ বাড়িতে তাকে চিরদিনের জন্য আনবার প্রস্তাবটা তাকে জানাতে হবে; অবশ্য তোমার অনুমোতি পেলে। সমাজ সম্বন্ধে তোমার উদারতা আমার ভাল জানা আছে বলেই আমার মনোভাব তোমায় জানাতে পারলাম এমনভাবে। ও যে বিধবা সে কথা তো তোমায় আগেকার চিঠিতেই জানিয়েছি। বয়সেও ও আমার প্রায় সমানই হবে। কেননা আমার চেয়ে অল্প বয়সের মেয়ের এম এ ক্লাসে পড়া সম্ভব নয়। ওর বয়স দেখে আর ও বিধবা ব'লে তোমার কাছ থেকে আপত্তি উঠবে না এ কথা আমি জানি। তোমার উদারতায় আমার অগাধ বিশ্বাস। আমার শিরায় শিরায় একই রক্ত কি না।

ওকে তোমায় একবার দেখাতে ইচ্ছা করে। আমি জানি তুমি ওকে দেখলেই ভালবাসবে, আমার কাজটা অনেকখানি সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু সে তো হবার উপায় নেই, তুমি যে বহুদূরে। তুমি কবে আসবে দাদু, শকুন্তলাকে তোমায় না দেখাতে পারলে আমার আর ভাল লাগছে না। আর তা ছাড়া তোমার এ নতুন বাড়ি তুমি না দেখলে কি তোমার মনের মত করে আমি তৈরি করতে পারব?

শকুন্তলার কাছ থেকে তার ফটো চাইব এবং যদি পাই তবে পরের চিঠির সঙ্গে পাঠাব।

প্রণাম ও ভালবাসা নিও, ভারতীকে আমার ভালবাসা দিও। ইতি—

সোমেশ

কুমারেশ এইরকমই কিছু একটা খুঁজিতেছিলেন বটে কিন্তু যাহা খুঁজিতেছিলেন এ যেন ঠিক তা নয়। চশমাটা বেশ ভাল করিয়া মুছিয়া চোখে লাগাইয়া চিঠির পর চিঠি উলটাইয়া কুমারেশ যে চিঠিখানা বাহির করিলেন তাহাতে গৃহনির্মাণ সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রয়োজনীয় বৈষয়িক সংবাদের পর সোমেশ লিখিয়াছে—

.....কিন্তু দাদু, একটি বিষয়ে তোমাকে নিরাশ হ'তে হবে। শকুন্তলার ফটো আমি তোমায় পাঠাতে পারলাম না। কৌশলে ওর একখানা ছবি পাবার জন্য আমি খুব চেষ্টা করেছি, কিন্তু তার কি ধনুক ভাঙ্গা পণ, ছবি সে কিছুতেই দেবে না বলে, 'ছবি আমার নেই, আছে খুব ছেলে বেলার, সে আমি কাউকে দেখাই না।' কারণ জানতে চাইলাম তো জবাব দিলে না। বুঝলাম ওর হয়তো কোনও আপত্তি আছে। ওর কোনও বিষয়ে বেশী পীড়াপীড়ি করতে পারি না। ওর ছেলেবেলা ছ বছর বয়সে একবার বিয়ে হয়, তার পাঁচ ছয় মাস পরেই তার স্বামী মারা যায়। ওটা হয়তো তখনকারই কোনও ছবি হবে তাই ওর দেখাতে লজ্জা করে। ও এখনও শাড়ি পরে না, নরুণ পেড়ে ধুতি প'রেই কলেজে আসে। ওর সেই ছেলেবেলার খেলার সাথীর কথা হয়তো মনেও নেই তবুও ওটুকুর জন্য আমি ওকে আরও বেশী শ্রদ্ধা করি। ওটুকুই ওর জীবনে এই বয়সে একটা গাম্ভীর্য আর শুচিতা এনে দিয়েছে, আর, তুমি জান, এ না থাকলে আমি তার দিকে আকৃষ্ট হ'তে পারতাম না। ওকে না দেখলে ওর সম্বন্ধে তুমি কোনও ধারণাই করতে পারবে না। তার সম্বন্ধে সকল কথা ব'লে বোঝানো কঠিন। তবু, ফটো যখন আমি পাঠাতে পারলাম না, তখন চিঠিতেই ওর চেহারার একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করি।—

ও লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হবে, অর্থাৎ আমার চেয়ে প্রায় আধ হাত ছোট। রং ফরসা— আমার চেয়েও; হয়তো যৌবনে তুমি যেমন ছিলে তার চেয়েও। গঠনে সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষায় ওকে তন্বঙ্গী বলা যেতে পারে। আঙুলগুলি ঠিক চাঁপার কলির মত অতি সুন্দর। আমার মনে হয় ও একটা শিল্পী হ'লেই ওকে ভাল মানাত।

মেয়েদের রূপ, তুমি দাদু হ'লেও তোমার কাছে বর্ণনা করতে আমার সংকোচ লাগে। ছেলেবেলা থেকে অতিরিক্ত আহ্লাদ দিয়ে আমাকে তুমি যেমন ক'রে মানুষ করেছ, তাতেই এসব কথা তোমাকে লিখতে সাহসী হচ্ছি, নইলে আর কোনও নাতি তার দাদুকে এমনি ক'রে বন্ধুর মত মনের কথা খুলে বোধ হয় চিঠি লেখে না। এক কথায়, মেয়েটির সৌন্দর্যের তুলনা নেই দাদু। একে তুমি ঘরে পেলে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসবে, এ কথা শপথ ক'রে তোমায় বলতে পারি।

এইবার বল, কনে দেখে তোমার পছন্দ হ'ল? তোমার মত না পেলে তার সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠতা করতে সাহস করি না আমি। তোমার আদরে স্পর্ধা আমার অনেক বেড়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু তোমারই নাতি ব'লে আমার আর এগনো চলে না, তোমার অনুমতি যদি না পাই। ভারতীকে আমার ভালবাসা জানিও, তুমি প্রণাম নিও। ইতি

ইহার পর আরও কয়েকখানা চিঠি উলটাইয়া কুমারেশ সোফায় আসিয়া এলাইয়া পড়িলেন। এত বড় একটা অসংগতি কেমন করিয়া ঘটিল, তাহার নিজের নাতি এ কাজ কেমন করিয়া করিল! চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতে সমস্ত ঘটনা তাহার চোখের সম্মুখে দ্রুত নাচিয়া গেল। কুমারেশ তাহার শিষ্টতা ও উচিতবোধ লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

চিঠিতে পরিচয় পাইয়া কুমারেশ শকুন্তলা ও সোমেশের বিবাহে অনুমতি দিয়াছিলেন। তাহাদের ভালবাসার প্রতিদিনের ঘটনা কুমারেশের জানা। সোমেশ দাদুর কাছে সমস্ত কথা অকপটে লিখিত, তাঁহার মতামত লইত। এইজন্য সোমেশকে তাহার আরও ভাল লাগে।

শকুন্তলাকে দেখিবার জন্য কুমারেশ একবার এত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, নিজের স্বাস্থ্যকামনা বিসর্জন দিয়া কলিকাতায় ছুটে দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ডাক্তার বারণ করিলেন, কুমারেশ নিজের মনের চঞ্চলতার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইলেন। কুমারেশ সেবার দুইজনের জন্য দুখানা শাল পাঠাইয়াছিলেন, সে কথা এখনও তাহার মনে উজ্জ্বল হইয়া আছে।

তার পর একে একে কত কথাই কুমারেশের মনে পড়ে। তাঁহার নূতন বাড়ি তৈরি হইলে শকুন্তলা আসিয়া তাহাতে বাস করিতেছিল। সোমেশের ইহাতে আপত্তি ছিল, শকুন্তলার নিজেরও, কিন্তু শকুন্তলা একা একখানা ঘর লইয়া যেভাবে কাটাইতেছিল, কুমারেশ তাহা পছন্দ করেন নাই। একদিন যে মেয়ে তাহার ঘরে বধূ হইয়া আসিবে তাহাকে এমন অসহায় অরক্ষিত অবস্থায় কুমারেশ রাখিতে পারেন না। শকুন্তলা নিজে কিছুতেই আসিতে চাহে নাই, কিন্তু কুমারেশ বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইবেন শুনিয়া শেষ পর্যন্ত সে না বলিতে পারে নাই। সুদূর কাশ্মীর হইতে এ কথা শুনিয়া কুমারেশের যে কি ভালই লাগিয়াছিল।

সোমেশ ও শকুন্তলার একসঙ্গে খাওয়া উঠা বসা, একসঙ্গে পড়া বেড়ানো, সিনেমা দেখার কথা মনে করিয়া বৃদ্ধ কুমারেশের মনে রোমাঞ্চ জাগিত। বিবাহের পূর্বে পাত্র পাত্রীর পরস্পরের মন জানিবার জন্য যে জীবনযাপন করা তাঁর উচিত বলিয়া মনে হয়, নিজের জীবনে সে সুযোগ তিনি না পাইলেও, নিজের পৌত্র সোমেশের মাঝে তিনি সেই জীবনকে অনুভব করিতে চাহিয়াছিলেন।

কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে ডাক্তারের অনুমতি তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সোমেশ ও শকুন্তলার স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পথে উপস্থিত হইয়া বিন্দুমাত্রও বাধা সৃষ্টি করিতে তাঁহার ভাল লাগে নাই। তাহাদের পরীক্ষা হইয়া গেলে তাহারা দুজনে কাশ্মীর আসিবে, তার পর কাশ্মীর দেখিয়া দাদুকে লইয়া ফিরিয়া যাইবে এই তাদের মনোগত ইচ্ছা। কুমারেশও মনে করিয়াছিলেন এইখানে আসিলে তাহাদের দু হাত এক করিয়া দিবেন, এইখানেই তাহারা মধুচন্দ্রিমা করিবে। তার পর নাতি নাতবউ লইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন।

মাঝে মাঝে মনে হইত ভূস্বর্গ কাশ্মীরে তিনি একটি স্থায়ী আবাস রচনা করিবেন। সোমেশ আসিলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা যাইবে। কুমারেশের ইচ্ছা, সোমেশের সাহায্যে তিনি একটা নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এখান হইতে শাল, আলোয়ান, জামার কাপড় প্রভৃতির চালান দিলে বেশ লাভ হইতে পারে। শকুন্তলা লেখাপড়া জানা মেয়ে, এখানে থাকিয়া কুমারেশকে সাহায্য করিবে এবং সোমেশ কলিকাতা ও অন্যান্য স্থলে তাহার বিলি ব্যবস্থা করিবে।

এমনি করিয়া নানা ভবিষ্যৎ স্বপ্ন রচনায় কুমারেশের দিন কাটিতে লাগিল। সোমেশ ও শকুন্তলার পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি কাশ্মীরে থাকাই স্থির করিলেন।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল। সোমেশের পরীক্ষার দিন ঘনাইয়া আসিল। সোমেশের কাছ হইতে কুমারেশ কম চিঠি পাইতে আরম্ভ করিলেন। চিঠি কম হইলে ক্ষতি ছিল না, কুমারেশ বৃদ্ধ হইলেও তাহার অন্তরের দৃষ্টি অতিশয় প্রখর, তিনি দেখিলেন সোমেশের চিঠির সুর বদলাইয়া গিয়াছে, সোমেশ ও শকুন্তলার মধ্যে কি যেন একটা ঘটিয়াছে। বৃদ্ধ মনে মনে হাসিলেন।—অভিমান! আরও দিন কাটিল, পরীক্ষা আসিল, শকুন্তলাও একখানা চিঠি লিখিল না। কুমারেশ মনে মনে একটু বেদনা অনুভব করিলেন। ইহারা বুড়াকে এমন করিয়া অবহেলা করে!

কুমারেশ ইহাদের একটু সুখবরের আশায় প্রতিদিন পত্রের প্রতীক্ষায় থাকিতেন। অনেক দিন পর পর সোমেশের কাছ হইতে কার্ড আসিত তাহাতে শকুন্তলার খবর কিছুই থাকিত না। মনের চাঞ্চল্য কুমারেশ কোনদিন বাহিরে প্রকাশ করেন না। একবার শুধু সোমেশকে লিখিয়াছিলেন—শকুন্তলা কি আমাদের ওখানে নাই, উত্তরে সোমেশ শুধু লিখিয়াছিল—আছে। কুমারেশ চিঠি পড়িয়া ভাবিলেন ইহারা বুড়ার বেদনা কিছু বোঝে না।

পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। কুমারেশ ভাবিলেন এইবার হয়তো সোমেশ ও শকুন্তলা সশরীরে আসিয়া তাঁহাকে একেবারে অবাক করিয়া দিবে। আরও কয়েক দিন কাটিয়া গেল, সশরীরে কেহই আসিল না, আসিল সোমেশের চিঠি। তাহাও বিস্তৃত নয়, সংক্ষিপ্ত।

আমি বিলাত যেতে চাই, তুমি বাধা দেবে না তা জানি। পাথেয় ছাড়া আরও কিছু আমার কাছে আছে, পৌঁছে চিঠি লিখলে আরও পাঠিও। পড়াশুনা করতেই যেতে চাই। এখানকার পরীক্ষা ভালই হয়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। আসছে হপ্তায় পাসপোর্ট পাব। প্রণাম নিও। আমি ভালো আছি। ইতি

সোমেশ

কুমারেশ পত্র পড়িয়া পুনরায় ভাবিয়াছিলেন, ইহারা বুড়ার ব্যথা কিছু বোঝে না।

ইহার পর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, জগতে কত ওলোটপালোট হইয়া গিয়াছে। সোমেশ ডি লিট হইয়াছে, সেও বিয়ে করিয়াছে। ইহাদের সকলেরই জীবন হইতে শকুন্তলা হারাইয়া গিয়াছে।

বাড়ীর সামনে পথের মাঝে দেখা মেয়েটিকে কেন্দ্র করিয়া কুমারেশের আবার করিয়া সেইসব কথা, শকুন্তলার কথা মনে পড়িতে লাগিল।

(ক্রমশ)

গোপা অর্থাৎ সত্যধর্ম্মের রক্ষক ইত্যাদি। এবং অগ্নির নিকট যে প্রার্থনা করা হইতেছে যে, উহা যেন দেবতাদিগকে সঙ্গে করিয়া সাধকের নিকট বহিয়া আনে, সে সব অর্থহীন বা বিকৃত অর্থপূর্ণ হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক ঋষির নিকট অগ্নি হইতেছে চিন্ময় তপঃ বা দিব্য ইচ্ছাশক্তি। অধ্যাত্মক্ষেত্রে যাহা তপঃশক্তি, সেক্ষ্মতত্ত্বের জগতে যাহা তেজঃ, স্থূলজগতে তাহাই মূর্ত্ত হইয়াছে অগ্নিরূপে, বিভিন্ন স্তরে একই শক্তির এসব বিভিন্ন প্রকাশ। আর যজ্ঞ হইতেছে মানুষের জীবন-সাধনার প্রণালী, আত্মাহুতি, আত্মোৎসর্গ, আত্মনিবেদন। এই যজ্ঞ বা আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়া মানুষ স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের দিকে অগ্রসর হয়,—একটা বৃহত্তর মহত্তর সত্তার মধ্যে জীবনের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। জীবনযজ্ঞের অর্থাৎ আত্মবলিদানের মধ্য দিয়া জীবনের ক্রমিক উন্নতি ও উর্দ্ধগতির প্রথম অবলম্বন হইল অগ্নি অর্থাৎ তপঃশক্তি। তপঃশক্তির সহায়েই সাধক সাধনার পথে অগ্রসর হন, এবং সেজন্যই অগ্নি হইল যজ্ঞের পুরোহিত। এই তপঃশক্তিই সাধকের নমঃ বা আত্মোৎসর্গ বহন করিয়া লইয়া যায় সৃষ্টির মূলে অবস্থিত বিশ্বশক্তিসমূহের বা দেবতাদিগের নিকট এবং দেবতাগণকে আবার সাধকের আধারে আহ্বান করিয়া আনিয়া প্রতিষ্ঠা করে, তাই অগ্নিকে বলা হইয়াছে হোতা। অগ্নি আবার ঋত্বিক, কারণ মানুষ ও দেবতার মধ্যে এই যে আধ্যাত্মিক বিনিময়, অগ্নি এই কাজ যথাসময়ে সুসম্পন্ন করিতেছে সত্যের অটুট ছন্দে। সাধক কখন কোন্ পথে কিভাবে অগ্রসর হইবেন এবং কিরূপ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তপঃশক্তিই তাহা নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেয়। অগ্নিকে আবার বলা হইয়াছে কবি-ক্রতু, কেননা অগ্নির শক্তি হইল দিব্যজ্ঞান হইতে সঞ্জাত কর্ম্মসামর্থ্য। সাধককে সর্ব্বাগ্রে হইতে হয় অগ্নিব্রত বা অগ্নিসাধক, কারণ প্রথমতঃ তপঃশক্তি জাগ্রত হইলেই অন্যান্য দেবতার আশীর্ব্বাদ লাভ হয় এবং সাধক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে অমৃতের দিকে অগ্রসর হন। আর এই কারণেই ঋগ্বেদ আরম্ভ হইয়াছে অগ্নির উদ্বোধন করিয়া, অগ্নিকে জীবনযজ্ঞের পুরোভাগে থাকিয়া অমৃতলোকের পথ সুগম করিতে অনুরোধ জানাইয়া।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় সূক্তে ঋষি বায়ু ও ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন সোমরস পান করিবার জন্য, এবং বরুণ ও মিত্রকেও আহ্বান করিতেছেন, কেননা বরুণ রিশাদস অর্থাৎ আততায়ীকে হনন করে, এবং মিত্র পূতদক্ষ অর্থাৎ বিশুদ্ধভাবে সত্যের নির্দ্দেশ দেয়। শ্রীঅরবিন্দের মতে বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতিকে ইঁহাদের স্থূল অর্থে গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তি হিসাবে শুধু বুঝিলে উঁহাদের প্রতি বেদে যেসব বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেসব দুর্বোধ্য হইয়া উঠে এবং বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। সাধারণ অর্থে বায়ু হইল সর্ব্বগত পবন ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইন্দ্র হইলেন ঝড় ও বজ্রের দেবতা, সোম হইল উত্তেজনাকারী ও আনন্দবর্দ্ধক একপ্রকার মদ্য, বরুণ হইলেন অনন্তবিস্তারিত আকাশের দেবতা অথবা রাত্রি ও অন্ধকারের দেবতা, এবং মিত্র হইলেন আলো ও সূর্য্যের দেবতা। এরূপ অর্থ করিলে বেদকে প্রাকৃতিক শক্তির প্রচণ্ডতায় অভিভূত আদিম মানবের বিস্ময়াবিষ্ট মনের স্তুতিগান ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কিন্তু আধুনিকতার গর্ব্ব ও অভিমান ত্যাগ করিয়া একটু সূক্ষ্মদৃষ্টির সহায়ে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, বেদের ভাষা রূপক ও প্রতীকের ভাষা এবং উহার অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে গভীরতম অধ্যাত্মসাধনার কথা। বৈদিক সাধনার লক্ষ্য অমৃত প্রাপ্তি, "সত্যং ঋতং বৃহৎ"এর সন্ধান। আমাদের ক্ষুদ্র দেহ প্রাণ ও মন এই অমৃতত্বলাভের অন্তরায়। কিন্তু তাই বলিয়া বেদ মায়াবাদের মত দেহ-মনঃপ্রাণকে অস্বীকার করিয়া অনন্তের মধ্যে মিলাইয়া যাওয়ার কথা বলে না। বৈদিক সাধনার উদ্দেশ্য আমাদের ক্ষুদ্র দেহমনঃপ্রাণকেও অমৃতত্বের আনন্দে পূর্ণ করিয়া তোলা, সত্যের তেজে শুদ্ধ করিয়া বৃহতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। বৈদিক ভাষায় বায়ু অর্থ প্রাণশক্তি। আমাদের অজ্ঞানাবৃত প্রাণ ক্ষুদ্র সুখভোগের প্রতি সর্ব্বদা আকৃষ্ট। বৈদিক ঋষি আমাদের এই সংকীর্ণ ভোগলিপ্সার গতি ফিরাইয়া ধরিতে চান অমৃতের ভূমানন্দের দিকে। সোম-রস এই দিব্য আনন্দের, "দেবতার দিব্যসত্তার চিন্ময় রসায়ন"এর প্রতীক। ঋষি তাই প্রাণশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ুকে আহ্বান করিতেছেন সোমরস পান করিয়া অর্থাৎ তুরীয়ানন্দের আস্বাদন লইয়া আমাদের জীবনকে ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের দিকে লইয়া যাইতে। প্রাণের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় দিব্য আনন্দ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে মনকেও শুদ্ধ ও পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত করা দরকার। ইন্দ্র এই শুদ্ধ মনের দেবতা, স্বর্লোকের অধিপতি। ঋষি তাই ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন তুরীয়ানন্দে পূর্ণ হইয়া মনকে শুদ্ধ করিয়া তুলিতে, যেন শুদ্ধবুদ্ধির সহায়ে প্রাণে শুদ্ধভোগ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। প্রাণ ও মন শুদ্ধ হইলে সাধক প্রতিষ্ঠিত হইবে বৃহতের জগতে, অনন্তের অনন্ত প্রসারে। বরুণ এই বৃহতের দেবতা। ঋষি বরুণকে আহ্বান করিতেছেন আমাদের অজ্ঞানাবৃত মনের খণ্ডতা, ভিন্নতা ও অন্ধকার দূর করিয়া, প্রজ্ঞানের হননকারীকে বিনাশ করিয়া মনকে বৃহতের ছন্দে ছন্দায়িত করিতে। আর এই বৃহতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধক লাভ করিতে পারেন সত্যধর্ম্ম ও সত্যদৃষ্টি, এবং তাঁহার জীবন সেই গভীর সত্যানুভূতির প্রেরণায় পূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হয়। অনন্ত সত্যের মধ্যে যেই সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও সামঞ্জস্য আছে, মিত্র তাহারই দেবতা। ঋষি তাই মিত্রকে আহ্বান করিতেছেন জীবনকে সত্য-সৌন্দর্য্যে সুন্দর করিয়া তুলিতে।

ঋগ্বেদের প্রথম দুই সূক্তের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যের ইঙ্গিত করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহারই একটা আভাস দিতে চেষ্টা করিলাম। শ্রীঅরবিন্দের চক্ষে বেদ শুধু অন্ধ প্রকৃতি পূজা অথবা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়মপদ্ধতি মাত্র নয়—অতি উচ্চাঙ্গের অধ্যাত্মসাধনার মন্ত্রাবলী। বেদকথিত দেবতাবৃন্দ একই অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্যের বহুল প্রকাশ; তাঁহারা মূলশক্তিরূপে সমস্ত সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া আছেন এবং সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরে এক একটা বিশেষ ধর্ম্মের দিব্যমূর্ত্তিরূপে ক্রিয়াশীল। বৈদিক ঋষিগণ সাধনা করিয়াছেন শুধু ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য ব্যক্তিগতভাবে নয় সমষ্টি-মুক্তির জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে। তাঁহাদের এই সঙ্ঘবদ্ধ সাধনার লক্ষ্য ছিল যজ্ঞ বা আত্ম-উৎসর্গের মধ্য দিয়া দেবতাদিগকে পার্থিব জীবনে অব্যাহতভাবে কার্য্যকরী করা এবং সত্তার প্রতি অঙ্গে দিব্য ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা করা। বৈদিক যুগের আদর্শ ছিল জীবনকে সমগ্রভাবে শুদ্ধ ও সিদ্ধ করিয়া পূর্ণতার মধ্যে বিকশিত হওয়া; জীবনকে পঙ্গু করিয়া অনন্তে মিশাইয়া যাওয়া বৈদিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু তখনকার মানুষের সমষ্টিচেতনা বিবর্ত্তনপ্রবাহের এই চরম পরিণতির জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিল না। মানুষের জীবনের নিম্নতর স্তরগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ ও উর্দ্ধমুখী করিবার জন্য বুদ্ধি-বৃত্তিরও অবাধ খেলার প্রয়োজন আছে। ভারতের দার্শনিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ও সংঘর্ষ হইতে উদ্ভূত আজিকার এই বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভ, বস্তুতন্ত্রবাদ ও নৈরাশ্যবাদ পর্য্যন্ত এই বুদ্ধির (Reason) রাজত্ব চলিয়াছে। ফলে আজ প্রকৃতির ক্রমপরিণাম ধারায় এক সংকটকাল উপস্থিত হইয়াছে, এবং এক উর্দ্ধতন দিব্য-শক্তির আত্মপ্রকাশের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে চলিয়াছে। ভগবানের যে অতিমানস শক্তির সহায়ে বৈদিক ঋষির দেবজন্মের স্বপ্ন সফল করা সম্ভব, শ্রীঅরবিন্দ তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, এবং বৈদিক সাধনার সূত্র ধরিয়া অনন্তের পূর্ণ ঐশ্বর্য্যকে সান্তের বুকে ফুটাইয়া তুলিবার বিরাট তপস্যাতেই তিনি আজ মগ্ন।*

---

*শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবস (১৫ অগষ্ট) উপলক্ষে রচিত।

চোর

(গল্প)

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

লোকে বলে কলঙ্কিনীর খাল। এই খালেই নাকি রতনের স্ত্রী ডুবিয়া মরিয়াছিল। মণিগ্রামে সেবার বন্যা হইয়াছিল; সে অনেক কালের কথা। সেই বছরই রতন স্ত্রীকে যেন খুন করিতে চাহিয়াছিল, কি একটা বিশেষ কারণে। সে কথা ভাল করিয়া আমরা জানি না. অনেক কালের কথা কিনা! আর পাছে রতন খুন করে এই ভয়েই নাকি দামিনী খালে আত্মহত্যা করে। সেই হইতে লোকে খালটিকে বলে কলঙ্কিনীর খাল। লোকে আরও অনেক কিছুই বলে কিন্তু সে কথায় রতন কান দেয় না। লোকে কি না বলে, তাহাদের কথায় কি কান দিলে চলে? আমরাও তাই কান দিব না, ইহাতে যাহার যা খুশি বলুক।

দামিনী তো মরিল কিন্তু রতন বেচারা পড়িল মহা কষ্টে। স্ত্রীকে সে ভালবাসিত। গ্রামের লোকে রতনের মন বিষাইয়া দেয় দামিনীর চরিত্রের খোঁটা দিয়া। তাই রাগের মাথায় রতন একদিন স্ত্রীকে খুন করিতে চাহিয়াছিল। রাগের মাথায় লোকে কি না বলে; পুরুষের রাগিলে কি আর জ্ঞান থাকে নাকি। তাই বলিয়া রতন কি দামিনীকে সত্যই খুন করিত? এমনি করিয়া দামিনী যে আত্মহত্যা করিয়া বসিবে রতন তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই।

মরিবার আগে দামিনী যেন কেমন একরকম হইয়া গিয়াছিল। রতনকে সে ভয় করিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে সে চমকাইয়া উঠিত, রাত্রে স্বপ্নের ঘোরে ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিত। আরও কত কি করিত, আজ অনেক দিন পর রতনের সে সমস্ত কথা ভাল মনেও পড়ে না।

তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর রতন কষ্ট পাইয়াছিল। পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল বেচারা। মণিপুর গ্রামের বহু লোক তাহাকে খালের ধারে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখের জল ফেলিতে দেখিয়াছে। কিন্তু এ সব পুরানো কথা। পুরানো কথা তুলিয়া আর লাভ কি বল. রতন বেচারীকে অতীতের কথা মনে করাইয়া দিয়া কষ্ট দেওয়া বই তো নয়। কাজেই দামিনীর কথা আর তুলিব না, রতনের কথাই বলি।

দুইটি মেয়ে ছিল রতনের। বড়র বয়স দশ বৎসর নাম যামিনী আর ছোটর বয়স বছর আট, নাম কামিনী। রতন মেয়ে দুইটির মুখ চাহিয়া স্ত্রীর শোক ভুলিতে লাগিল।

যামিনীর বুদ্ধি ছিল। সংসারের সমস্ত ভার এই অল্প বয়সে মাথায় লইয়া মোটেই সে বিব্রত হইয়া পড়িল না, বরং সুগৃহিণীর ন্যায় সংসারের কাজগুলি সম্পন্ন করিতে লাগিল। রতন সকাল বেলা খেতে বাহির হইয়া যায় পান্তা খাইয়া, ফেরে দুপুরে। তাহার পর ভাত খাইয়া আবার বাহির হইয়া যায়। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরিয়া মেয়েদের সঙ্গে বসিয়া গল্প করে।

রতনের সবই ছিল। বাড়ি, গোলা ভরা ধান আর পরিশ্রম করিবার অসাধারণ ক্ষমতা। সকলে তাহাকে হিংসা করিত। প্রচুর পরিশ্রম করিতে পারিত রতন, কখনও তাহার ক্লান্তি আসিত না। একদিন তাহার কিছুই ছিল না, বলিতে গেলে চাষাদের মধ্যে তাহারই অবস্থা সব চেয়ে খারাপ ছিল। কিন্তু রতন স্বপ্ন দেখিয়াছিল খেতে সোনা ফলাইবার। কতদিন দারুন জ্বর লইয়াও সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেতে কাজ করিয়া গেছে। তার পর আস্তে আস্তে আজ যখন সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন আত্মহত্যা করিল দামিনী।

কে যেন বলিয়াছিল, 'আবার তুই বিয়ে কর রতন।'

'কেন?'

'সংসারটা বজায় রাখতে হবে তো।'

'তার জন্যে বিয়ে করতে হবে নাকি।'

'আর বয়সও তো তোর অল্প।'

'এই বয়সেই একটাকে খেয়েছি দাদা', রতনের চোখে জল আসিয়াছিল, 'আর একটাকে খাবার ইচ্ছে নেই।'

'খেয়েছিস মানে? অমন স্ত্রীর মরাই ভাল।'

'কি বললে?' রতন একেবারে খেপিয়া উঠিয়াছিল, 'মুখ বন্ধ কর্ শালা, তোকে আমি খুন করব।'

লোকটা পালাইতে পথ পায় নাই।

কিন্তু রতনের বড় মেয়ে যামিনীর বিবাহ এ গ্রামে দেওয়া অসম্ভব; ছোট গ্রাম, হাই তুলিলেই লোকের টনক নড়ে। রতনের স্ত্রীর আত্মহত্যা করিয়া মরিবার কথা কাহারও জানিতে বাকী নাই। পুরানো কথা হইলেও যাহারা রতনকে হিংসা করে তাহারা এখনও সে কথা লইয়া আলোচনা করিতে ছাড়ে না। এ গ্রামের কেহ যে রতনের মেয়েকে বিবাহ করিবে না একথা রতন জানে।

তবু মেয়ের বিবাহ দিতেই হইবে। বিশেষত যামিনীর বয়স হইয়াছে, আর তো ঘরে রাখা চলে না। রতন মেয়ের বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। সুপাত্র সে যোগাড় করিবেই যামিনীর জন্য; জেদ আছে রতনের। যাহা ধরে তাহা সে করেই। আর জেদ আছে বলিয়াই তো খেতে সে সোনা ফলাইতে পারিয়াছে। একটা ভাল পাত্র কি আর যোগাড় করিতে পারিবে না?

পাত্র একটা পাওয়া গেল পাশের গ্রামে। পাত্রটি খুব ভাল, নাম হরিদাস। বাপ মা কেহ নাই কিন্তু পয়সা আছে। তবে হরিদাস পণ চায় একটু বেশী। তাহা তো চাহিবেই। মেয়েকে ভাল করিয়া পার করিতে হইলে পয়সা না খসাইলে চলিবে কেন। এ পাত্রকে রতন কোনও মতেই হাতছাড়া করিবে না। যেমন করিয়া হউক হরিদাসের সহিত যামিনীর বিবাহ দিবেই।

কিন্তু গ্রামের লোকেরা রতনকে জব্দ করিবার জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। রতন জানে এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য তাহাদের চেষ্টার লেশমাত্র ত্রুটি হইবে না। কাজেই আগে হইতেই পথ পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাউক। রতন হরিদাসকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল।

'মানে, একটা কথা আছে হরিদাস।'

'বলুন।'

'এই যামিনীর মায়ের সম্বন্ধে।'

'কি কথা?'

'সে আত্মহত্যা করেছিল।'

'কেন?' হরিদাস একটু আশ্চর্য হইল।

'আমার জন্যেই সে আত্মহত্যা করেছিল হরিদাস, আমি তাকে মেরে ফেলব বলেছিলাম।'

'কেন, কেন?'

'লোকে তার নামে অপবাদ দিয়েছিল তাই আমি রেগে গিয়েছিলাম।'

'লোকে কি না বলে বলুন', হরিদাস হাসিল একটু, 'তাদের কথায় আপনার কান দেওয়া মোটেই উচিত হয় নি।'

রতন খুশী হইল। হরিদাস ছেলেটি সত্যই ভাল। যাক রতনের বুক একেবারে হালকা হইয়া গেল। দেখা যাক এবার কেমন করিয়া গ্রামের লোক বিবাহ ভাঙ্গে।

হরিদাস যামিনীকে পছন্দ করিল। মেয়ের মায়ের নামে

লোকে মিথ্যা কলঙ্ক দিলে সে মেয়েকে কেন বিবাহ করিবে না? এ আবার একটা কথার মত কথা নাকি? তবে হরিদাস শুধু পণের টাকাটা দ্বিগুণ করিয়া দিল। যামিনীকে বিবাহ করিতে তাহার কোনও আপত্তি নাই।

এইবার রতন মাথায় হাত দিল—সে যে অনেক টাকা! কিন্তু ঘাবড়াইবার লোক রতন নয়। পণ সে দিবেই হরিদাসকে।

* * *

রতনকে একেবারে সর্বস্বান্ত করিয়া দিয়া যামিনী হরিদাসের ঘর করিতে গেল। একটি মেয়ে পার করিতেই রতনকে অনেক কিছুই বেচিতে হইল; কিন্তু রতন তাহাতে দুঃখিত নয় মোটে। পুরুষ সে, সম্পত্তি তাহার আবার হইবে পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা থাকিলে। কিন্তু এমন জামাই হাতছাড়া হইয়া গেলে তো আর পাওয়া যায় না। গ্রামে রতন এখন বুক ফুলাইয়া চলে। যাহারা তাহাকে হিংসা করে তাহারাও বলাবলি করে, 'রতন চাঁদের মত ছেলেকে জামাই করেছে বটে।'

কামিনী অর্থাৎ রতনের ছোট মেয়ে এখন আর ছোট নাই, বড় হইয়াছে। কিন্তু বিবাহের যোগ্য হয় নাই। আরও কিছুদিন তাহাকে রাখা চলে ঘরে। যামিনী চলিয়া যাইবার পর রতনের ঘর যেন শূন্য হইয়া গেল।

'দিদি কবে আসবে বাবা?' কামিনী জিজ্ঞাসা করে।

'দাঁড়া মা, এই তো গেল সেদিন।'

'আমি কিন্তু বাবা তোমাকে ছেড়ে যাব না কখনও।'

রতন হাসে, 'বেশ বেশ।'

যামিনী বড় কান্নাকাটি করিয়াছিল যাইবার সময়। রতন অনেক বুঝাইয়া তাহাকে সামলাইয়া রাখিয়াছিল। দিদির দেখাদেখি কামিনীও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিল। তাই সে বাবাকে ছাড়িয়া যাইতে চায় না।

রতনকে দুই মেয়েই ভালবাসে খুব।

অনেক সময় যাহা ভাবা যায় তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারা যায় না, ইচ্ছা এবং শক্তি থাকিলেও। অনেকের বেলায় যাহা হয়, রতনের বেলাতেও ঠিক তাহাই হইল। যামিনী যাহা লইয়া গিয়াছিল, রতন আর কোনও মতেই তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারিল না, প্রচুর পরিশ্রম করিয়াও। অনর্থক পরিশ্রম করিয়া ফল কি বল? রতন গরু বেচিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল অন্যের হইয়া চাষ করিয়া কিছু পারিশ্রমিক লইবে তাহার কাছ হইতে। করিতেছিল সে তাহাই। কিন্তু তাহাতে কি রতনের চলে? সামান্য পয়সায় তাহার দিন চলা সম্ভব নয়। কিন্তু সামান্য পয়সাও যে আর পাওয়া যায় না। কে আর রতনকে দিয়া কাজ করাইবে বল? সকলেই চায় নিজেরা কাজ করিয়া পয়সা বাঁচাইতে। রতনের উননে হাঁড়ি চড়াও বুঝি বন্ধ হইবে এবার। চোখে সে অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

গরিবের ঘরের মেয়ের অল্প বয়স হইলেও সংসার সে চালাইতে পারে বেশ গুছাইয়া। কামিনী তাহাই চালাইতেছিল। কোনও দিন কোনও অভিযোগ সে করে নাই। কিন্তু আর বুঝি চলে না। কামিনী ছেলেমানুষ হইলেও নিজের জন্য সে ভাবে না, কিন্তু ভাবে রতনের জন্য। বাবার কষ্ট সে দেখিতে পারে না। কামিনী উপবাস করিতে পারে অনায়াসেই। তাহাই তো সে করে মাঝে মাঝে। এবার বুঝি রতনকেও উপবাস করিতে হয়। কামিনী গোপনে নীরবে চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

কথায় বলে বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না। রতন সে কথা বেশ ভাল করিয়া উপলব্ধি করিল। খেতের এমন অবস্থা আর কখনও হইয়াছে বলিয়া রতনের মনে পড়ে না। চাষাদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। কাহারও কাছে হাত পাতিতে রতন মরিয়া গেলেও পারিবে না। চাষাদের মধ্যে তাহার অবস্থাই ছিল সব চেয়ে ভাল। আর আজ তাহাকে ভাবিতে হয় খাইবার ভাবনা। এর আগে রতন মরিয়া গেল না কেন! কামিনীর দিকে সে আর চাহিতে পারে না। মেয়েটা একেবারে রোগা হইয়া গিয়াছে।

'বাবা', কামিনী রতনের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়।

'কি মা?'

'কি খাবে বাবা?'

'কেন্ রে কামিনী, ঘরে কি কিছুই নেই?'

'না', কামিনী আর দারিদ্র্য চাপিয়া রাখিতে পারে না।

'তুই কি খাবি মা?'

'কিছু না বাবা।'

'সে কি, উপবাস করবি?'

'হ্যাঁ বাবা।'

রতন এইবার হাঁ করিয়া কামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।—ঠিক দামিনীর মত দেখিতে—তাহার স্ত্রীর মত। এ মেয়েকে রতন কোনও মতেই না খাইয়া থাকিতে দিবে না। একটা উপায় সে করিবেই। এমনি করিয়া আর দিন চালানো যায় না।

'ভাবিস না কামিনী সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কেমন ক'রে বাবা?'

'যেমন ক'রে হ'ক রোজগার আমি করবই।'

'আজ কি হবে বাবা?'

'আজকের দিনটা যে ক'রে হ'ক চালিয়ে দে মা, কাল থেকে আর ভাবতে হবে না তোকে।'

'কি করবে তুমি?'

হাসিয়া রতন বলিল, 'দেখিস তখন।'

'দিদি কেমন আছে জান?'

'ভালই আছে।'

'আসবে নাকি শিগ্‌গির?'

'হরিদাস বলেছে তো পাঠাবে এইবার।'

'কত দিন দেখিনি দিদিকে!'

রতন ম্লান হাসিয়া বলিল, 'আমিও দেখিনি অনেক দিন।'

কামিনীর চোখে কি জানি কেন জল আসিতেছিল। আর কোনও কথা না বলিয়া সে আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

খালের ধারে আসিয়া রতন একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বেশীক্ষণ এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ভাল নয়, কেহ সন্দেহ করিলেই মুশকিল। শেষ টান দিয়া রতন বিড়িটি জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

দত্তবাড়ির বড় ছেলে আজ কলিকাতা হইতে ফিরিয়াছে। সে মাসে একবার বাড়ি আসে মাহিনা পাইয়া। তাহাদেরই বাড়ির দিকে যাওয়া যাক—রতন ভাবিল।

চারপাশে বেশ অন্ধকার। রাত্রি অনেক। গ্রাম একেবারে নিস্তব্ধ, কোনও সাড়া শব্দ নাই। সকলেই ঘুমাইতেছে। রতন জোরে জোরে পা চালাইয়া দত্তবাড়ির উদ্দেশে পথ ভাঙিতে লাগিল।

রতনকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এমনি করিয়া না খাইয়া সে শুকাইয়া মরিতে পারিবে না। কামিনীর বিবাহ দেওয়া বাকী আছে তাহার। রতনের একবার আজ ঈশ্বরকে মনে পড়িল অনেক দিন পরে। পর মুহূর্তেই তাহার হাসি আসিল। ঈশ্বরকে ডাকিবার উপযুক্ত সময় বটে এখন।

দত্তদের বাড়িটা বেশ বড়; রতন এ বাড়িতে অনেকবার আসিয়াছে। কে কোন্ ঘরে থাকে সে কথা সে ভাল করিয়াই জানে। বড় ছেলে থাকে একেবারে সামনের ঘরে, তাহার স্ত্রী দেখিতে বেশ সুন্দর। কিন্তু সৌন্দর্যের প্রয়োজন রতনের নাই। তাহার প্রয়োজন অর্থের এবং অর্থকে সংগ্রহ করিবেই আজ রাত্রে।

ঘরের জানলা খোলাই ছিল। উঁকি মারিয়া রতন দেখিল

বড় ছেলে আর তাহার স্ত্রী অকাতরে ঘুমাইতেছে। ঘরে প্রবেশ করা যায় ইচ্ছা করিলেই, পাখিগুলির ভিতর দিয়া হাত গলাইয়া দরজার খিল খোলা যায় অনায়াসে। কিন্তু তাহাতে ভয়ের সম্ভাবনাও আছে—শব্দ হইতে পারে; আর কেহ জাগিয়া উঠিলেই বিপদ। এত রাত্রে এমন অবস্থায় রতনকে দেখিলে কেহ তাহাকে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী ভাবিবে না নিশ্চয়ই। বরং দরজার খিল না খুলিয়া জানলা দিয়াই কিছু লইবার চেষ্টা করা যাক। রতন চারিধারে দেখিতে লাগিল।

দেওয়ালের গায়ে একটা পাঞ্জাবি ঝুলিতেছে; কিন্তু পাঞ্জাবি লইয়া কি হইবে? তবু যদি পকেটে কিছু থাকে। রতন খুব সাবধানে পাঞ্জাবিটা টানিয়া লইল। বেশ ভারী ঠেকিতেছে যেন। নিশ্চয় ভরা মনিব্যাগ রহিয়াছে পকেটে। হাঁ, ঠিক তাই। ব্যাগটি বাহির করিয়া রতন জানলা দিয়া পাঞ্জাবিটা ঘরের ভিতর ফেলিয়া দিল। যাক আর ভাবনা নাই। রতন খুশিতে অস্থির হইয়া পড়িল; নিশ্চয়ই অনেক কিছু আছে ইহার ভিতর। সে লম্বা লম্বা পা চালাইয়া বাড়ির দিকে চলিল। কামিনীর নিশ্চয়ই ঘুম ভাঙে নাই একবারও। ঘুমাইলে সে জাগে ভোরবেলা। আজ কিন্তু হঠাৎ যদি তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায় তাহা হইলেই মুশকিল।

মনিব্যাগে অনেক কিছুই ছিল। রতন তাহার দুরবস্থা দূর করিতে পারিবে বটে। পরদিন সকালবেলা কামিনীর হাতে সে দুইখানি দশ টাকার নোট তুলিয়া দিল।

'কোথায় পেলে?' কামিনী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

হাসিয়া রতন বলিল, 'বলেছিলাম না তোকে রোজগার আমি করবই যেমন করে হ'ক!'

'কিন্তু এক রাত্রের মধ্যে এত টাকা তুমি পেলে কোথায়?'

রতন উত্তর না দিয়া হাসিল শুধু।

'ধার কর নি তো?'

'কে ধার দেবে আমাকে।'

'তবে?'

'ওসব তুই বুঝবি না, বুদ্ধি থাকলেই হ'ল।'

কামিনী সত্যই কিছু বুঝিতে পারিল না।

রতন যেন রক্তের স্বাদ পাইয়াছে। এই রকম করিয়াই তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এই তো বেশ। কি প্রয়োজন তাহার হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিবার। চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড় ধরা। ধরা পড়িবে কেন? নিজের উপর রতনের বিশ্বাস আছে প্রচুর।

রতনের নূতন জীবন আরম্ভ হইল। আজকাল সে বেশ অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। শাবল দিয়া খুব সাবধানে বেশ ভাল করিয়া সিঁধও কাটিতে পারে। অনেকে এরই মধ্যে তাহাকে সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। করে করুক, রতনকে হাতে হাতে ধরিবার সাধ্য কাহারও নাই। দেখিতে দেখিতে রতন পাকা চোর হইয়া উঠিল।

রতন ভাবিয়াছিল কামিনী কিছুই বুঝি বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু কামিনী তেমন বোকা মেয়ে নয়, প্রথম হইতেই সে রতনকে সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং একদিন শেষ রাত্রে কামিনীর কাছে রতন ধরাও পড়িয়া গেল।

বুদ্ধিমান চোরেরা গ্রীষ্মকালে চুরি করে শেষ রাত্রে। রতন বুদ্ধিমান চোর। শেষ রাত্রে চুরি করিয়া ঘরে ফিরিল।

'কে?' কামিনীর কণ্ঠস্বর।

'আমি।'

'তুমি এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে বাবা?'

'যাই নি তো কোথাও।'

'একটু আগে ডেকে ডেকে তোমার সাড়া পাইনি আমি।'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম রে।'

'তোমার বিছানা খালি দেখলাম যে।'

সর্বনাশ! রতন ঘাবড়াইয়া গেল। কামিনী তাহা হইলে টের পাইয়াছে সব। রতন মাথায় হাত দিল।

'আমি জানি তুমি কোথায় গিয়েছিলে', কামিনী উঠিয়া আসিল।

'কোথায়?' খুব আস্তে আস্তে রতন জিজ্ঞাসা করিল।

'চুরি করতে।'

রতন চমকিয়া উঠিল।

'আমি অনেক দিন থেকে জানি বাবা', কামিনী হাসিল।

যাক, রতনের মাথা হইতে যেন বোঝা নামিয়া গেল। কামিনী হাসিতেছে। হাসিবেই বা না কেন? ইহাতে কাঁদিবার কি আছে। রতন এবং কামিনীকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে তো। আর উপবাস করিয়া ধার্মিক হইয়া থাকিবার মেয়ে কামিনী নয়।

রতন খুশীই হইল। তাহার বুক অনেকটা হালকা হইয়া গেল যেন। আর কামিনীর কাছে বেশী দিন লুকাইয়া রাখাও সম্ভব নয় এসব কথা।

'যা শুতে যা এবার।'

'তুমি শোবে না বাবা?'

'হ্যাঁ শোব।'

'আজ কি আনলে?'

'কিছু না।'

'পেলে না বুঝি কিছু?'

'পেয়েছিলাম কিন্তু আনতে পারলাম না।'

তাহারা ঘুমাইতে গেল।

অকস্মাৎ একদিন দিন কয়েকের জন্য যামিনী বাপের বাড়ি বেড়াইতে আসিল। হরিদাস পৌঁছাইয়া দিয়া গেল, আবার যথা-সময়ে লইয়া যাইবে।

যামিনীকে দেখিয়া রতন খুশী হইল। সুখী যামিনী খুব হইয়াছে দেখিলেই বুঝা যায়। যামিনীর গায়ে গহনা যেন আর ধরে না! বড়লোকের বউ সে। কামিনী অর রতন খুব খুশী হইল।

'কেমন আছ বাবা?'

'ভাল।'

'কি রে কামিনী খুব বড় হয়ে উঠেছিস দেখছি।'

কামিনী হাসিল। 'তুমি কেমন আছ দিদি?'

'ভাল রে, ভাল।'

গল্প চলিতে লাগিল।

যামিনীর মত বুদ্ধিমতী মেয়ের বুঝিতে একটুও দেরি হইল না যে রতনের অবস্থা একেবারে খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। কামিনীর কাছ হইতে তার পর সে সব শুনিল। এমন কি রতনের কেমন করিয়া দিন চলে সে কথাও। সে একটু দুঃখিত হইল। কিন্তু কয়েকদিনের জন্য আসিয়া রতনকে কিছু বলিয়া কষ্ট দিতে সে চাহিল না। ঈশ্বরকে ডাকিল শুধু।

'তোমার এই হারটা কি সুন্দর দিদি!'

'পরবি নাকি কামিনী?'

'তুমি দেবে?'

'বাঃ, দেব না কেন? তুই পর্ না যত দিন তোর ইচ্ছে।'

'কবে দেব তোমাকে?'

'আমি চ'লে যাবার পর যখন তোর ইচ্ছে হবে পাঠিয়ে দিস কাউকে দিয়ে।'

'সত্যি পরতে দেবে অত দিন?'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ।'

(শেষাংশ ১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জার্মানীর ঝটিতি-যুদ্ধ

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জার্মানীর 'ব্লিটজ্‌ক্রীগ' বা ঝটিতি-যুদ্ধ রণনীতিতে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্বে রণাঙ্গনের পশ্চাতে শান্তি-পূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করিত। রণক্লান্ত সৈন্যগণ সেখানে যাইয়া বিশ্রামলাভে সক্ষম হইত, যুদ্ধের রসদ সেখানে সঞ্চিত থাকিত; একমাত্র ভয় থাকিত বিমান-আক্রমণের। রণাঙ্গন হইতে ত্রিশমাইল পশ্চাতে থাকিলেই লোক নিজেদিগকে অনেকখানি নিরাপদ মনে করিত; বিমান-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই সেখানে লোক নিশ্চিন্তে

জার্মান বিমান আক্রমণে পূর্ব ইংলণ্ডের একটি বিধ্বস্ত অঞ্চল

থাকিতে পারিত। কিন্তু জার্মানগণ ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়াগাড়ীর সাহায্যে যেরূপ দ্রুতগতিতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়, তাহাতে কোন স্থানকেই আর নিরাপদ বলা চলে না। আধুনিক সচলবাহিনী সংগ্রাম করিতে করিতে অবিরাম আগাইয়া চলে। একদিকে বাধা পাইলে অপরদিক দিয়া ব্যূহ ভেদ করে, পরিখার মধ্যে স্থিরভাবে বসিয়া যুদ্ধ করে না। বন্যার জল বাঁধ দিয়া আটকাইতে গেলে যে অবস্থা হয়, জার্মানীর যান্ত্রিকবাহিনীকে বাধা দিতে গেলেও সেইরূপ একদিক না একদিক ভেদ করিয়া সে শত্রুপক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেই। এইজন্যই যুদ্ধ আর আজকাল কোন নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে না, উন্মত্ত জলপ্রবাহের ন্যায় চারি-দিকে ছড়াইয়া পড়ে। গত মহাযুদ্ধেও দেখা গিয়াছে, অসুবিধা বুঝিলে পশ্চাতে হটিয়া যাইয়া কোনও নিরাপদস্থানে নূতন ব্যূহরচনার সময় ও সুযোগ পাওয়া যাইত; কিন্তু জার্মানীর আধুনিক যান্ত্রিকবাহিনী এতই দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলে যে, পশ্চাতে হটিয়া নূতন ব্যূহরচনার সময় ও সুবিধা পাওয়া যায় না। কয়েকদিনের পথ তাহারা কয়েকঘণ্টায় অতিক্রম করে। ফলে দেখা যায়, কোনও স্থানে পশ্চাদপসরণের পূর্বেই জার্মানবাহিনীর একাংশ যাইয়া সেইস্থান দখল করিয়া বসিয়াছে। ইহাতে পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যদলের যে কি অসুবিধায় পড়িতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। কিভাবে ইহা সম্ভব হয় নিম্নে তাহাই বলিব।

জার্মানবাহিনীর প্রথমেই লক্ষ্য থাকে কিভাবে বিপক্ষের বিমানঘাঁটি বিধ্বস্ত বা দখল করা যায়। এতদুদ্দেশ্যে তাহারা প্রথমেই চালায় ভারী ভারী ট্যাঙ্ক এবং 'ডাইভ—বোম্বিং' বিমান—অর্থাৎ যে সকল বিমান উপর হইতে বাজপাখীর মত খাড়া নীচের দিকে ছুটিয়া আসিয়া লক্ষ্যস্থলের উপর বোমা ফেলিয়া যাইতে পারে। আক্রমণের প্রথমদিকে ভারী কামান-শ্রেণী বসাইয়া জার্মানরা আজকাল আর মুহুর্মুহু কামান দাগে না। বোমার সাহায্যেই কামানের গোলার কাজ চালায়।

সংবাদবাহী পায়রা

বর্ত্তমানে সংবাদ প্রেরণের যে রকম সুব্যবস্থা হয়েছে প্রাচীনকালে এরূপ ছিল না। কোন দূর অঞ্চলে সংবাদ পাঠান একরকম অসম্ভব ছিল। লোক মারফৎ সংবাদ সংগ্রহ বেশীর ভাগ সময়ে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করত; যথাসময়ে খবর পেয়ে কোনরূপ ব্যবস্থা হ'য়ে উঠত না। পায়রা মারফৎ সংবাদ প্রেরণ বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। যতদূর জানা যায়, পারস্য দেশেই নাকি পায়রার সাহায্যে সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা প্রথম আরম্ভ হয়। পায়রাই সংবাদ বহনের একমাত্র উপযোগী দেখে অন্য সমস্ত দেশ পায়রার সাহায্যে সংবাদ পাঠাতে থাকে। প্রাচীনকালে গ্রীসের অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ফলাফলের সংবাদ প্রধান প্রধান দেশে পায়রা মারফৎ পাঠান হ'ত। এ ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রের গোপনীয় সংবাদ পায়রা যেভাবে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পেঁাছে দিত সে রকম অন্য কেহ পারত না। সকল পায়রা সংবাদ প্রেরণের উপযোগী নয়। 'হোমার' জাতীয় পায়রা অতি দুর্গম স্থানের মধ্যে গোপনীয় সংবাদ বহনের একমাত্র উপযোগী। প্রবল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে হোমার শত শত মাইল দূর পথেও সংবাদ বহন করে নিয়ে যায়। হোমারকে একটানা এক হাজার মাইল পথ অতিক্রম ক'রে সংবাদ পেঁাছে দিতে দেখা গেছে। যুদ্ধের সময় বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংবাদ পাঠান যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে সে সময়ে পায়রাকে দিয়ে সংবাদ পাঠান ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযুদ্ধের সময়েও সংবাদবাহী পায়রার প্রয়োজন কিছুমাত্র কমেনি। গত মহাযুদ্ধে সংবাদ প্রেরণের অন্য সব ব্যবস্থা অচল হ'য়ে পড়লে পায়রা মারফৎ কিরূপ তৎপরতার সঙ্গে সংবাদ পাঠিয়ে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদলের আক্রমণ থেকে স্বপক্ষীয় সৈন্যদলকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কতবার রক্ষা করা হয়েছিল--ইতিহাসের পাতায় এরূপ অনেক ঘটনার সংবাদ ছাপা আছে। গত মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের সংবাদে প্রকাশ, তারা শতকরা নব্বইটি সংবাদ পায়রা সাহায্যে সংগ্রহ করেছিল। সংবাদবাহী পায়রাকে সংবাদ বহনের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। রাস্তার মধ্যে বিশেষ পরীক্ষা না ক'রে সংবাদবাহী পায়রা কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ করে না। লোভ সংবরণ না করতে পারলে প্রতি পদে বিপদের আশঙ্কা বেশী। নতুন কোন জিনিষের মোহে আকৃষ্ট হ'লেই শত্রুর ফাঁদে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়। পায়রা আকাশে এত উঁচু দিয়ে সংবাদ নিয়ে যায় যে, শত্রুপক্ষের বন্দুকের গুলী সহজে কোন অনিষ্ট করতে পারে না। তবুও সংবাদবাহী পায়রাকে হত্যা ক'রে সংবাদ নষ্ট ক'রে দেবার জন্যে বিপক্ষদল পায়রার উপর বিমান থেকে বন্দুকের গুলী ছোড়ে। ফলে কোন কোন সময়ে সংবাদবাহী পায়রাকে আহত হ'তে হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার এমনই আশ্চর্য্য গুণ, আহত হয়েও সংবাদবাহী পায়রা শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। গত মহাযুদ্ধে প্রেসিডেন্ট উইলসন নামে একটি সংবাদবাহী পায়রা গুলির আঘাতে একটি পা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেও যথাসময়ে সংবাদ পেঁাছে দিয়েছিল। উইলসন আহত হ'য়েও একুশ মিনিটে কুড়ি কিলোমিটার পথ উড়ে আসে। ঐ সময়ে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সংবাদবাহী 'দি মকার' ডানদিকের চোখ গুলীর আঘাতে হারিয়ে ফেলে রক্তাক্ত দেহকে যদি কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম দিত তা'হলে গোপন সংবাদের অভাবে স্বপক্ষের এক সৈন্যবাহিনীকে চিরকালের জন্য শত্রুপক্ষের কামানের গোলায় পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য চলে যেতে হ'ত। 'মকারের' আনীত সংবাদে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা সর্ব্বক্ষণই। সেইজন্য সৈন্যেরা যখন পরিখার মধ্যে আত্মগোপন ক'রে আক্রমণের অপেক্ষা করে সে সময়ে সংবাদ প্রেরণের জন্য সংবাদ-সংগ্রহকারী সৈনিকেরা শিক্ষিত সংবাদবাহী পায়রা সঙ্গে রাখে।

সংবাদবাহী পায়রা

সংবাদবাহী পায়রাকে আকাশের পথে উড়তে দেখলেই বিপক্ষদল নানা কৌশলে তাকে নিজেদের আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করে। কৌশলে যদি কিছু ফল না পাওয়া যায় তাহলে নানা শব্দে অথবা কোনরূপ অদ্ভুত জিনিষের আবির্ভাবে পায়রাকে ভয় দেখিয়ে ভিন্ন পথে পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সংবাদবাহী পায়রার এ সব দিকে দৃষ্টি দেবার কোন আগ্রহই থাকে না। সংবাদ পেঁছে দেওয়াই তার তখন একমাত্র লক্ষ্যবস্তু। পায়ের সংলগ্ন সুরক্ষিত সংবাদটিকে পায়রা বারবার অনুভব করে আর যেন ভাবে তার বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর ক'রে বহু সহস্র সৈন্য আকাশের পথে দৃষ্টি মেলে আছে।

উড্ডীয়নকালে সংবাদবাহী পায়রাকে শত্রুপক্ষের বন্দুকের গুলী, অদ্ভুত শব্দ যতখানি না বিব্রত করে তাদের শিক্ষিত বাজপাখীর আক্রমণ তার চেয়ে বেশী ভয়ের সৃষ্টি করে। বাজপাখীর আক্রমণের ফলে সংবাদবাহী পায়রার মৃত্যু বরণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। ফ্রান্স দেশে সংবাদবাহী পায়রা যাতে বাজপাখীর আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, সেইজন্য পায়রার লেজে এক রকম বাঁশী বেঁধে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। বাতাসে সেই বাঁশীর কর্কশ শব্দে ভয় পেয়ে বাজপাখীও শিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ত।

জাপানে সংবাদপত্র অফিসে শিক্ষিত সংবাদবাহী পায়রার সাহায্যে বিভিন্ন স্থান থেকে টাটকা সংবাদ আনাবার ব্যবস্থা আছে। দীর্ঘ সংবাদ তারযোগে পাঠান ব্যয়সাধ্য। তাছাড়া গোপনীয় সংবাদ তারযোগে সব সময় পাঠান নিরাপদ নয়। এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষিত সংবাদবাহী পায়রা যথেষ্ট কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দেয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পায়রা সংবাদপত্র অফিসে সংবাদ পেঁছে দিয়ে পরে গৃহকর্ম্মে মন দেয়। সংবাদের অপেক্ষায় সাংবাদিকদের কোন দিন চিন্তিত হ'য়ে পড়তে দেখা যায় নি। সংবাদবাহী 'হোমার' পায়রার সুতীক্ষ্ণ চক্ষু, সুপুষ্ট পক্ষদ্বয়, উন্নত গ্রীবা এবং সর্ব্বোপরি অন্তরের ভালবাসা এবং কর্ম্মনিষ্ঠা সংবাদ সংগ্রহের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

চোর

(১৮৫ পৃষ্ঠার পর)

'তোমার বর কিছু বলবে না?'

হাসিয়া যামিনী বলিল, 'উনি খুব ভাল লোক।'

কামিনীও মুচকিয়া হাসিল।

তারপর একদিন খুব কান্নাকাটি করিয়া আবার যথাশীঘ্র সম্ভব আসিবে প্রতিশ্রুতি দিয়া যামিনী হরিদাসের সঙ্গে চলিয়া গেল।' কিন্তু হারটি রাখিয়া গেল কামিনীর কাছে। ছোট বোন চাহিয়াছে যখন, পরুক না যতদিন খুশি। সে তো আর একেবারে লইয়া লইতেছে না।

'হার কোথায় পেলি রে কামিনী?' রতন জিজ্ঞাসা করিল।

'দিদি দিয়ে গেছে।'

'সে কি!' বিস্ময়ে রতন হাঁ করিল।

হাসিয়া কামিনী বলিল, 'একেবারে নয় বাবা, দিন কয়েকের জন্যে পরতে।'

'ও', রতনও হাসিল এবার, 'পর্ পর্ খুব পর্, আমি তো আর তোকে কিছু দিতে পারলাম না।'

'ও কথা ব'লো না বাবা', কামিনী রাগ করিল; 'তা হ'লে আমি আর পরব না এ হার।'

'না না কিছু বলব না পর্ তুই।'

রতন বাহির হইয়া গেল।

রতনের দিন কাটিতেছিল বেশ ভালভাবেই। চুরি করা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল; প্রয়োজন না থাকিলেও সে চুরি করিত। তবে লোকে কিছু জানিতে পারিত না। আর পাছে লোকে সন্দেহ করে এই জন্য রতন রায়বাবুদের বাড়িতে একটা চাকরি লইয়াছিল—চাকরের কাজ।

'বাবা তুমি আবার খেতে কাজ কর', কামিনী বলিল একদিন।

'কি দরকার?'

'কোনও দিন ধরা প'ড়ে জেলে যাবে, তখন আমার কি হবে বল তো?'

হাসিয়া রতন বলিল, 'তোর বাবাকে জেলে পাঠায় এখনও এমন কেউ জন্মায় নি রে কামিনী।'

কামিনী আর কিছু বলিল না।

একদিন সকালে কামিনীর মনে হইল এইবার যামিনীর হারটি ফিরাইয়া দেওয়া উচিত—অনেক দিন হইয়া গেল। সে দিনটা বিশেষ ভাল ছিল না, আকাশে সকাল হইতেই মেঘ করিয়াছিল। রতন ঘরে বসিয়া রহিল, চাকরি করিতে গেল না সে দিন।

'বাবা কাজে যাবে না?' কামিনী জিজ্ঞাসা করিল।

'না, ইচ্ছে করছে না আজ।'

কামিনী হাসিল, 'বেশ।'

একটু চুপচাপ।

'দিদির হারটা ভাবছি এবার ফেরত দেব', কামিনী বলিল।

'হ্যাঁ, অনেক দিন হয়ে গেল।'

'কিন্তু পাঠাব কেমন ক'রে?'

'আমি যাব ভাবছি আজ ওখানে', রতন বলিল। বলিল, 'আমার হাতে দিয়ে দিস, দিয়ে আসব।'

কামিনীর মুখ কালো হইয়া গেল, 'না বাবা, থাক আমার কাছে।'

'কেন? আমি যে যাব আজ।'

'না না, পরে ফেরত পাঠাব, দিদি তো আসলেই বলেছে শিগগির, তখন দিয়ে দেব তার হাতে।' কামিনী বাহির হইয়া গেল।

রতনের বুকে কে যেন ধারাল তীক্ষ্ণ ছুরি চালাইয়া দিল। তাহার বুঝিতে এক মুহূর্তেও দেরি হইল না, কামিনী কেন তাহাকে হার দিতে আপত্তি করিতেছে। রতন চোর, তাই কামিনী তাহাকে অবিশ্বাস করিতেছে। চোরকে সোনার জিনিস দিয়া কে বিশ্বাস করিবে বল। রতনের আজ নিজেকে মনে হইল ঘৃণ্য, অত্যন্ত ছোট, মেয়ের কাছে মুখ দেখাইতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। কেন সে মরিয়া গেল না? হাজার বার জেল ঘুরিয়া আসিলেও এত আঘাত তাহার লাগিত না। আজ প্রথমবার সে উপলব্ধি করিল যে, সত্যই সে চোর। রতনের বুকের ভিতরটা পুড়িয়া যাইতে লাগিল যেন। চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। আজ আবার অনেক দিন পর তাহার মনে পড়িল স্ত্রীর কথা। সেই দামিনী, যে ডুবিয়া মরিয়াছিল—কলঙ্কিনীর খালে।

আজ-কাল

ভারত-সচিবের ভাষ্য

কমন্স সভায় ভারত সম্বন্ধে বিতর্কে মিঃ এমেরী তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা ও উত্তরে বড়লাটের ঘোষণা ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যদের কাছে দায়ী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রে গঠনের জন্যে কংগ্রেস যে দাবী করেছেন, মিঃ এমেরী তা পরিষ্কার অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, ও দাবী মেনে নিতে গেলে ব্যবস্থা পরিষদের বর্ত্তমান গঠন অর্থাৎ বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র বদলাতে হয়, যা এখন সম্ভব নয়। মিঃ এমেরীর মতে কংগ্রেস সংখ্যায় সব চেয়ে বড় দল হলেও সে সমস্ত ভারতবাসীর বিশ্বাস-ভাজন নয়; ভারতীয় অধিবাসীদের বৃহৎ বৃহৎ অংশ কংগ্রেসের সর্ব্বভারতীয় প্রতিনিধিত্বের দাবী অস্বীকার করে; এ অবস্থায় তাদের মধ্যে আগে মতৈক্য না হলে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থা পরিষদের কাছে দায়িত্বের প্রশ্ন উঠতে পারে না।

কারা কারা কংগ্রেসের দাবীর বিরোধী, তার হিসেব মিঃ এমেরী দিয়েছেনঃ—(১) ৯ কোটি মুসলমান (মুসলিম লীগ এবং মুসলমান যে এক নয় একথাটা তিনি ভুলে গেছেন: উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কংগ্রেসপন্থী মুসলমান ও প্রাক্তন সীমান্ত গবর্ণমেণ্ট, লীগ-বহির্ভূত সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট, আজাদ মুসলিম দল, মোমিন সম্প্রদায়, অহ্‌রর দল, জমিয়ৎ-উল-উলেমা—এদের কথা অনায়াসে বিস্মৃত হওয়া খুব কৃতিত্বের বিষয়); (২) তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় (এই নব সৃষ্ট 'মাইনরিটি' সম্বন্ধে বৃটেন আজকাল খুব সচেতন); (৩) ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ (ভারতের ভাগ্য নির্দ্ধারণে এঁদেরও অনুমোদন প্রয়োজন, করণ এঁদের প্রতি বৃটিশরাজের বিশেষ 'বাধ্যবাধকতা' রয়েছে)। ইংরেজ 'মাইনরিটি'র নাম বোধ হয় মিঃ এমেরী ইচ্ছে করেই করেন নি; করলে কিন্তু তালিকাটা আপাতত পূর্ণ হত।

বড়লাটের তিনটি 'অফার'ও ভারত-সচিব ব্যাখ্যা করেছেন। বড়লাটের শাসন-পরিষদে বিভিন্ন দলের যে সব সদস্য নেওয়া হবে বড়লাটই তাঁদের মনোনীত করবেন এবং তাঁরা বড়লাটের কাছেই দায়ী থাকবেন। সমর পরামর্শদাতা পরিষদে সকল পক্ষের প্রতিনিধি নেওয়া হবে; তাতে ইংরেজরাও থাকবেন। ভারতের শক্তি সম্পদকে পূর্ণমাত্রায় হিটলার দমনে নিয়োজিত করাই হবে এই পরিষদের কাজ। যুদ্ধের পর নতুন শাসনতন্ত্রের কাঠামো রচনার জন্যে যে পরিষদ গঠিত হবে তা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের মতৈক্য অনুযায়ী গঠিত হবে, অর্থাৎ তখনও ভারতের 'মাইনরিটি' সমস্যা মিটমাটের সেই মামুলী প্রশ্নই বহাল থাকবে। 'মাইনরিটি'র সূচীছিদ্র দিয়ে ভারতীয় জাতীয় হাতী যদি একবার পার হতে পারে তা হলে আর চিন্তা নেই, নতুন শাসনতন্ত্র রচনা পরিষদ গঠিত হয়ে যাবে, তার সুপারিশ 'সীরিয়াসলি' বিবেচনা করা হবে, সেই সুপারিশের উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র রচিত হবে এবং পার্লামেণ্টে তা অনুমোদিত হবে; তারপর ভারতে প্রবর্ত্তিত হবে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস, যা মিঃ এমেরীর মতে এই মরজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার।

কংগ্রেসের অসুবিধা

কিন্তু বড়লাটের ঘোষণা ও মিঃ এমেরীর ব্যাখ্যায় কংগ্রেস নেতারা মুস্কিলে পড়েছেন। তাঁরা বার বার আপোষের ইচ্ছে জানিয়ে যে দাবী দাওয়া উপস্থিত করেছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তা আমলে না এনে তাঁদের পুরনো কথাকেই নতুন ভাষায় পুনরাবৃত্তি করছেন। তবুও কংগ্রেস-নেতারা হাল ছাড়ছেন না। রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বড়লাটের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার সংবাদ অস্বীকার করেছেন। এদিকে শ্রীভুলাভাই দেশাই ও শ্রীবি জি খের বড়লাটের সংগে গিয়ে আলাপ করে এসেছেন। এমন মিতালীর আবহাওয়ায় সংঘর্ষের সম্ভাবনা লুকনো থাকে না।

বড়লাটের ঘোষণা বিবেচনার জন্যে ওয়ার্ধায় এখন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হচ্ছে। এখনও কমিটির সিদ্ধান্ত তৈরী হয় নি; তবে শোনা যাচ্ছে যে, ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করবেন, "কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি দ্বার বন্ধ না করেন তা হলে তাঁরা এমনভাবে চলতে রাজী আছেন যাতে পরিস্থিতির উন্নতি হয়।"

ওয়ার্কিং কমিটির এই বৈঠকে প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন গান্ধীজী, ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব তাঁর অনুমোদনেই শেষ পর্যন্ত ঠিক হবে। মাত্র কয়েকদিন আগে অবশ্য তাঁর সংগে ওয়ার্কিং কমিটির নীতিগত ও কর্ম্মগত বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি কংগ্রেসের কোনো ব্যাপারে নেই বলে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে এই বিচ্ছেদের ঠাটটা বজায় রাখা যাচ্ছে না। তিনি পৃথক থেকে অনুচরদের দিয়ে যে আপোষের পথ ধরিয়েছিলেন, তার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এখন দ্বিতীয় ব্যবস্থার বিধান তাঁকেই দিতে হবে, হয় তো শেষ পর্যন্ত সকলকে শুনিয়ে বড় গলায় বলতে হবে, "রাজাজী, সর্দ্দারজী এখন তোমরা আমার সত্য পথেই ফিরে এস।"

মিউনিসিপ্যাল বিল

কলকাতা কর্পোরেশন তুমুল বিতর্কের পর ভোটাধিক্যে সরকারী ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল (দ্বিতীয় সংশোধন)এর প্রধান বিধানগুলি অগ্রাহ্য করেছেন। মুসলিম লীগ, ইউরোপীয়ান ও সরকার মনোনীত দল ঐ বিধানগুলি সমর্থন করে, বিরোধিতা করে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা দল। গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের অভিমত জানবার জন্যে বিলটি কর্পোরেশনে পাঠিয়েছিলেন। বিরোধীপক্ষ কর্পোরেশনকে সরকারী কুক্ষিগত করার চেষ্টার প্রতিবাদ জানান। যে বিধানগুলি কর্পোরেশন অগ্রাহ্য করেন, তার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্যঃ—(১) গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নিয়োগ; (২) কর্পোরেশনের লোক নিয়োগের জন্যে সার্ভিস কমিশন নিয়োগ এবং কর্পোরেশনের কয়েকটি বড় অফিসার পদ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রণ; (৩) গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্পোরেশন এবং ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ও সাব-কমিটির সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেখার ক্ষমতা।

এদিকে বাঙলার কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টি ব্যবস্থা পরিষদে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও দ্বিতীয় মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিলের বিরোধিতা করবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

গত শনিবার বাঙলায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিরোধী দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতায় বিরাট জনসভায় হিন্দুরা ঐ অন্যায় ব্যবস্থার বিলোপ দাবী করেছে।

'প্রাচীন স্মৃতিসৌধ রক্ষা আইন'-এর আমল থেকে ভারত গবর্ণমেণ্ট হলওয়েল মনুমেণ্টকে খারিজ করেছেন। এখন ঐ স্মৃতিস্তম্ভ সরিয়ে ফেলা যাবে।

সংবাদপত্র সম্পর্কে ভারত রক্ষা বিধান

পাটনার "সার্চ্চলাইট" ও লক্ষ্ণৌর "ন্যাশনাল হেরাল্ড" কাগজের উপর এ সপ্তাহে ভারত রক্ষা আইন জারী হয়েছে। "সার্চ্চলাইট"কে বৃটিশ সৈনিকদের সম্পর্কে সমস্ত উল্লেখ সরকারী প্রেস অফিসারকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে; আর "ন্যাশনাল হেরাল্ড"কে সংবাদের সমস্ত শিরোনামা প্রেস অফিসারকে দেখিয়ে নিতে হবে। "ন্যাশনাল হেরাল্ড" শিরোনামা ছাড়া সংবাদ প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

ইওরোপ

বৃটেনের উপর আক্রমণ

বৃটেনের উপর দিনের পর দিন প্রচণ্ড জার্ম্মান বিমান আক্রমণ চলছে। এ আক্রমণ সুরু হয়েছে ৮ই আগষ্ট থেকে, এখনও তার তীব্রতা হ্রাস পায় নি, বরং আরও বাড়বে বলে' অনুমান করা হচ্ছে। এই আক্রমণকেই ইংরেজরা 'ব্লিৎস্‌ক্রীগ' (তড়িৎ আক্রমণ) নামে অভিহিত করছেন।

আক্রমণ প্রত্যহই সমানে চালানো হচ্ছে, তবে গত শনিবার খানিকটা বিরতি গেছে। এ কদিন প্রাত্যহিক আক্রমণে ৫০০ থেকে ১০০০-এর বেশী জার্ম্মান বিমান হানা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার তারা বৃটেনের বিমানঘাটিগুলি আক্রমণ করে; তন্মধ্যে লণ্ডনের উপকণ্ঠে ক্রয়ডন অন্যতম। তারা লণ্ডন আক্রমণ করে শুক্রবারে; রবিবারে আবার জার্ম্মান বিমান লণ্ডনে হানা দেয়। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ বলছেন যে, জার্ম্মান আক্রমণে কিছু লোকজন হতাহত ও বাড়ীঘর ধ্বংস হচ্ছে বটে, কিন্তু গুরুতর ক্ষতি এ পর্যন্ত কিছুই হয় নি; আর আকাশযুদ্ধে প্রতিদিন বৃটিশ বিমানের গড়ে চারগুণ জার্ম্মান বিমান ধ্বংস হচ্ছে। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের হিসেবে প্রকাশ, ৮ই আগষ্ট থেকে ১৮ই আগষ্ট পর্যন্ত ইংলণ্ডের উপর আক্রমণে জার্ম্মান বিমান ধ্বংস হয়েছে ৬৯৮টি এবং বৃটিশ বিমান ধ্বংস হয়েছে ১৫২টি।

জার্ম্মানরা সমুদ্রপথে বৃটেনের পূর্ণ অবরোধেরও চেষ্টা করছে। তারা বৃটেনের চারদিকে মাইন পেতেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, নরওয়ে থেকে আরম্ভ করে বৃটেনকে বেড় করে' বিস্কে উপসাগর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ দরিয়ার মধ্যে যে কোনো জাহাজ এলেই তাকে আক্রমণ করা হবে। ইংরেজরাও জার্ম্মান অভিযান প্রতিহত করবার জন্যে চারদিকে মাইন পেতেছে।

বৃটিশ বিমানবহরও জার্ম্মান এলাকার উপর পাল্টা হানা দিচ্ছে। একদিন তারা বার্লিনের নিকটবর্ত্তী কারখানা আক্রমণ করে। অন্যান্য বিমানঘাটি, তৈল গুদামও তারা আক্রমণ করে। তারা প্রতিপক্ষের প্রভূত ক্ষতি করেছে বলে' দাবী করছে। বৃটিশ বিমানবহর একদিন আল্‌পস্ পার হয়ে ইতালীর অন্তর্গত মিলানে কাপ্রোনি বিমান কারখানা ও তুরিনে ফিয়াট বিমান কারখানা আক্রমণ করে' প্রচুর ক্ষতি করে। পরদিনও তারা ঐ স্থানে হানা দেয়।

বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড দখল

ওদিকে বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডে ইতালীর অভিযান অপ্রতিরোধ্যভাবে অগ্রসর হওয়ায় বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ সোমালিল্যাণ্ড থেকে সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরে' এসেছেন। ফলে বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড এখন ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড হয়ে গেল। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সোমালিল্যাণ্ড দখল করে' ইতালীর বিশেষ সুবিধা হবে না; কারণ ইতালী যোগাযোগের পথ পাবে না, আর সোমালিল্যাণ্ডের বন্দরগুলিও নষ্ট করে' দেওয়া হয়েছে।

লিবিয়ার উপর বৃটিশ নৌবাহিনী প্রবল গোলাবর্ষণ করেছে; ফলে ইতালীয় সৈন্যেরা ফোর্ট কাপুৎসো থেকে হটে গেছে বলে' বৃটিশ বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয়েছে।

ফ্রান্সের খবর

ফ্রান্সের রিয়ঁ শহরে সুপ্রীম কোর্টে পেতাঁ গবর্ণমেণ্টের অভিযোগ অনুসারে প্রাক্তন মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষদের বিচার আরম্ভ হয়েছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করে' শাস্তি দেওয়াই হচ্ছে এই বিচারের উদ্দেশ্য। কে কে অভিযুক্ত হয়েছেন, তা এখনও জানা যায় নি।

পেতাঁ গবর্ণমেণ্ট প্যারিসকে রাজধানী করবার অনুমতি জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের কাছে চেয়েছিলেন; কিন্তু জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট 'নীতির দিক দিয়ে' ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সে অধিকার স্বীকার করলেও, এখন ঐ ব্যবস্থায় রাজী হন নি।

বল্কান

মাঝে ইতালী ও গ্রীসের মধ্যে মনোমালিন্য ঘনিয়ে উঠেছিল। আলবেনিয়ার এক নেতার হত্যার জন্যে ইতালী গ্রীসকে দায়ী করে; গ্রীস অভিযোগ করা সত্ত্বেও ইতালী সন্তুষ্ট হয় নি। তারপর গ্রীক উপকূলে এক গ্রীক ক্রুজার অজ্ঞাত সাবমেরিনের আক্রমণে জলমগ্ন হয়; পরে দুটি গ্রীক ডেস্ট্রয়ারকে ইতালীয় বোমারু বিমান আক্রমণ করে। এই সব ঘটনায় গ্রীস অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু ইতালী দুঃখপ্রকাশ করায় মনোমালিন্য আপাতত দূর হয়েছে; ঠিক হয়েছে যে, গ্রীস এখন থেকে তার জাহাজের গতিবিধি আগে থেকে ইতালীকে জানাবে।

রুমেনিয়ার সঙ্গে বুলগেরিয়া ও হাঙ্গারীর আলোচনা চলছে। বুলগেরিয়াকে দক্ষিণ দোব্রুজা প্রত্যর্পণের ফলে শীঘ্রিই একটা মিটমাট হয়ে যাবে বলে' আশা করা যায়। কিন্তু হাঙ্গারীর সঙ্গে রুমেনিয়ার এখনো দর কষাকষি চলছে; শেষ পর্য্যন্ত আপোষে মিটমাট হবে কি না, বলা যায় না।

আমেরিকা ও কানাডা

আমেরিকায় এ সপ্তাহের প্রধান খবর হচ্ছে, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্ত দেশরক্ষার ব্যবস্থা। ইওরোপের যুদ্ধ যাতে আমেরিকায় না আসতে পারে, সেইজন্যেই নাকি এই পাকা ব্যবস্থা হয়েছে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ডেস্ট্রয়ার প্রাপ্তির বিনিময়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে বৃটিশ দ্বীপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইজারা দেবার প্রস্তাব করেছেন। এ সম্বন্ধে মার্কিন সলাপরামর্শ চলছে।

জাপান

এদিকে অষ্ট্রেলিয়া জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করছে। তারা প্রত্যেকেই অপর দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেছে।

জাপান ও ইন্দোচীনের ব্যাপার এখনও রহস্যাবৃত। জাপ দাবী সম্বন্ধে ইন্দোচীন কি সিদ্ধান্ত করল, তা পরিষ্কার জানা যায় নি। তবে জাপ সৈন্য ও নৌবহর ইন্দোচীনের কাছে ঘাঁটি করে' আছে।

জাপান আবার শ্যামের কাছেও এক চরমপত্র দিয়েছে। সে শ্যামে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের ও পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি করবার, এক কথায় শ্যামকে জাপ কর্ত্তৃত্বে আনবার দাবী জানিয়েছে। শ্যামের প্রতিনিধিরা আলোচনার জন্যে জাপানে গেছেন। ইন্দোচীন ও শ্যাম জাপানের দখলে গেলে, বর্ম্মা জাপ-বাহিনীর প্রতিবেশী হবে।

অষ্ট্রেলিয়ার এক বিমান দুর্ঘটনায় সমরসচিব, বিমানসচিব, শাসন-পরিষদের সহ-সভপতি, সেনাপতিমণ্ডলীর কর্ত্তা, তাঁর এক সহকারী প্রমুখ দশজন বিশিষ্ট লোক মারা গেছেন।

১৯।৮।৪০

—ওয়াকিবহাল

শ্রী চিত্রগৃহে 'ব্যবধান'

মতিমহল থিয়েটার্সের এই নূতন চিত্রখানি গত শনিবার হইতে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন, ধীরাজ, প্রতিমা, অরুণা, সন্তোষ সিংহ, সত্য মুখার্জি, নৃপতি চ্যাটার্জি প্রভৃতি। ছবিটি পরিচালনা করিয়াছেন ফণি বর্মা ও নীরেন লাহিড়ী।

গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপঃ মতিচ্ছন্ন গৃহস্থ, ততোধিক মতিচ্ছন্ন জ্যেষ্ঠপুত্র; পিতা মোকদ্দমা লইয়া, সন্তান রেস লইয়া সর্বস্বান্ত। কনিষ্ঠা কন্যা যক্ষ্মাক্রান্তা, জ্যেষ্ঠাটি কলেজিয়ান। অর্থাভাবে রুগ্না কন্যার চিকিৎসা হয় না। জ্যেষ্ঠা কন্যা সংগীত ও নৃত্যাভিনয়ে পটিয়সী। নাম নমিতা। নমিতার সখী চিত্রা। চিত্রার ফিয়াঁসে (ভাবী বর) অরুণ বন্ধুদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করিয়া মেয়েদের অভিনয়কালে গ্রীণরুমে পর্যন্ত প্রবেশ করে। প্রবেশ করিতে যাইতে লাগে নমিতার সঙ্গে ঠোকাঠুকি। ইহার পর অরুণ নমিতার সহিত সাক্ষাতের চেষ্টায় ঘুরিয়া ফেরে—একদিন সুযোগ মেলে। তারপর স্বভাবতই বিত্তশালী অরুণের বাড়ি নমিতার কাজ জোটে, ভালবাসাও জন্মায় এবং উভয়ে উভয়ের কাছে সমর্পণ করে। চিত্রার সহিত এনগেজমেণ্ট নাটকীয় অবস্থায় ভাঙিয়া যায়। নমিতা অভিমান বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে পলায়ন করে। চিত্রা ত্যাগের মহিমায় নমিতাকে খুঁজিয়া বাহির করে, প্রাপ্তিস্থান—সেই স্যানাটোরিয়াম যেখানে ছিল নমিতার ছোট বোন এবং নমিতার আর এক সখী অপর্ণা—অপর্ণার স্বামী ডাঃ বজ্রপানি ঘোষ। সে রুগ্না অপর্ণায় পরিতৃপ্ত না হইয়া নমিতার মোহে পড়ে। গররাজী নমিতা চিত্রাসম্ভিব্যাহারে অরুণের বক্ষে আশ্রয় পায়। ইহাই মিলন—ইহাই ব্যবধান।

এই কাহিনী রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, কিন্তু এই আখ্যানবস্তুতে চরিত্র সৃষ্টি ও শিল্পের কারুকার্য সাধারণ; কেবল মাত্র ডায়ালোগে প্রেমেনবাবুর আঁচ পাওয়া যায়। মতিচ্ছন্ন অথবা আত্মভোলা পিতা অথবা মাতৃহীনা বালিকার উপর পিতার স্নেহাতিশয্যের আবহাওয়া না থাকিলে প্রেম রসাইয়া উঠে না, শরৎচন্দ্র দত্তা ও বন্দনায় সে নজীর রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের কোনো সাহিত্যিকই এই সুলভ সুবিধা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রেমেনবাবুর কৃতিত্ব এই, মতিচ্ছন্ন পিতা ও মতিচ্ছন্ন দাদা, রুগ্না কনিষ্ঠার সহিত বাস করিয়া কলেজিয়ান মেয়েও পথভ্রষ্টা হইতে পারে এই সম্ভাবনার অঙ্ক কষিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ সংস্কার কাটাইয়া উঠিতে না পারায় ত্যাগের মহিমা, সুনীতির ভাণ ও উদ্ধত যৌন সম্ভোগেচ্ছার যে মিশ্রণ নমিতার চরিত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা এত গতানুগতিক যে ডায়ালোগ ছাড়া প্রেমেনবাবুকে খুঁজিয়া পাওয়াই দায়। ঘটনার সমাবেশ অসংগত ও স্থানে স্থানে অসম্ভব। মেয়েদের নাটকাভিনয় তাহার দর্শক পুরুষশ্রেণী—বাস্তবের সীমানা এইটুকু—কিন্তু চ্যালেঞ্জ করিয়া গ্রীণরুমে প্রবেশ করিতে গিয়া নমিতার সহিত ঠোকাঠুকি ও চোখাচোখি কেবল মঞ্চেই স্থান পাইতে পারে। কলেজিয়ান মেয়ের সহিত রাস্তায় দেখা হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু কলেজিয়ান মেয়েরা নিঃসংকোচে পরপুরুষের গাড়িতে ভদ্র ড্রাইভারের পাশেই বসে, কলেজিয়ান মেয়েদের প্রতি ইহা কমপ্লিমেণ্ট নহে। গাড়িতে ব্যাগ ফেলিয়া যাওয়া ফ্রয়েডিয়ান বিশ্লেষণ সত্য, সুন্দর ও স্বাভাবিক কিন্তু পিতার সহিত পরিচিত করাইবার পর কল্পিত স্কুলের সেক্রেটারী সত্যই গানের সেক্রেটারী হয় এবং নমিতার চাকুরী হয়, এত বড় কোইন্সিডেন্স জবরদস্তি না করিলে মানা কষ্ট। তারপর ভালবাসা বা মোহ—সেই সুলভ ব্যবস্থা—ছেলের উপরওয়ালা কেহ নাই, বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, ইডেন গার্ডেন আছে—মেয়েরা স্বভাবতই ঐশ্বর্যলোলুপ। ভাবী স্ত্রী চিত্রাও বড় ঘরের মেয়ে কিন্তু আসন্ন সম্পর্ক কি করিয়া ভাঙ্গা যায়?—না, এনগেজমেণ্টের টি-পার্টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিদের হাজির করাইয়া দেওয়া। তাহার পর, এক প্রতিদ্বন্দ্বী ত্যাগী হইল এবং অপরের উপভোগের পথ খুলিয়া গেল।

ঘটনা সমাবেশ শিথিল, ঠাসবুনোনি নাই। সিনারিওতে আখ্যানভাগের শৌকর্য দরকার নাই, পণ্ডিতদের ইহাই অভিমত; বিশেষ, আমাদের দেশে ভাল সাহিত্য ছবি করিতে গিয়া সমগ্র বইখানা মাটি হইয়াছে এরূপ উদাহরণ প্রচুর। সেইদিক দিয়া প্রেমেন্দ্রবাবুর রচনাকে আমরা বাদ দিতে পারি কিন্তু ইহার পরিচালকদের রেহাই দিতে পারি না। নমিতার ভূমিকায় প্রতিমার অভিনয় সুরুচির পরিচয় দেয় না। তাহার মাথায় এই একটিমাত্র দুর্বুদ্ধি কে ঢুকাইয়াছে জানি না যে কটাক্ষ না হানিলে চিত্রাভিনয় জমে না। গরীবের ঘরের কলেজের মেয়েদের মনের গঠন আমরা জানি, স্বাধীন প্রবৃত্তি তাহাদের কাছে কিন্তু রুগ্না কনিষ্ঠার প্রতি কটাক্ষ হানিয়া কথা বলিবার প্রবৃত্তি তাহাদের হয় না। প্রতিটি কথা বলিবার পর শ্রোতার উপর তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তাহা আড়চোখে বা মুখভঙ্গি করিয়া দেখিয়া লইবার ঔৎসুক্য অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। নমিতার চোখের অনাবশ্যক বিকৃতি চিত্রটিকে বহুলাংশে খর্ব করিয়াছে। অভিনেত্রী প্রতিমার চলনভঙ্গি সুন্দর ও সহজ কিন্তু কণ্ঠস্বর ও অবস্থান মনোরম নহে; কথনভঙ্গি অনাবশ্যকরূপেই কঠোর ও রূঢ়। অহংকৃত চাহনি ও পদক্ষেপের মধ্যে অকস্মাৎ 'থমকিয়া' কিছু প্রত্যাশা করার যে আচরণ তাহা আগাগোড়া নমিতার চরিত্রে একটা অবিচ্ছিন্ন অস্বাভাবিকতা আনিয়া দিয়াছে।

নমিতা তখনও কলেজের ছাত্রী; বাড়িতে রুগ্না ভগ্নী। স্কুলে নাচের উৎসব—বসন্তোৎসব। বাড়িতে এমন জামা নাই যেটা ছিঁড়ে নাই। দারিদ্র্যের পরিচয় নমিতার ক্ষেত্রে ইহার বেশী নহে। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়ে কিন্তু হাতে চামড়ার ব্যাগ—চাকুরী খুঁজিতে আসিয়া মহিলা সেবাশ্রমে চাঁদাও দেয়। সামান্য দুই দিনের চিন্তা, তাহার পরই কপাল খুলিয়া যায়—বিত্তশালী গৃহস্থের সহিত অবাধ মেলামেশা চলে। পরিচালকদ্বয় গ্রীণরুমের আলোচনা দিতে পারিতেন, কিন্তু নমিতার ব্লাউজ খুলিয়া ফেলিবার দৃশ্যটুকু না দিলে পরিচালনার দিক হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। দর্শকদের রুচি এত নগ্ন ও নিম্নস্তরের—এই ধারণা তাঁহারা না করিলেই ভাল করিতেন। ব্যাগ ফেরৎ দিতে আসিলে অরুণকে নমিতার পিতা বসিবার ঘরে বসাইয়া চা আনিতে বলিলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চা আসিয়া হাজির—নমিতাই আনিল। সেলুলয়েড চিত্রের স্পীড্ আছে জানি, কিন্তু অত তাড়াতাড়ি চায়ের জল হয় না। দর্শকেরা দরিদ্র গৃহের আসবাবপত্র ও গৃহ দেখিয়া অবাক হইলে আশ্চর্যের কথা হইবে না, কেননা উহা স্টেজ, সত্যই কোন দরিদ্র গৃহ নহে।

প্রাচীন সাহিত্যে বাঙালের চরিত্র আঁকা একটা ফ্যাসান ছিল, উহাই ছিল তখনকার দিনের রস ও রসিকতা। প্রেমেনবাবুর এই চিত্রে অনুরূপ রসিকতা অথচ রসভঙ্গ দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। প্রথমত বাঙালের ভাষা, দ্বিতীয়ত অবাঙালকে দিয়া বাঙালের কথা বলানো, দুই ব্যাপারেই রচনা ও নির্বাচন অপটুতার প্রকাশ পায়।

ধীরাজ ভট্টাচার্য অরুণের ভূমিকায় সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। চরিত্রটি অবশ্য পৌরুষবর্জিত। কথাবার্তা মন্দ নহে, কিন্তু তাঁহার এই সাহেবী পোষাকটা কি অর্থপ্রাচুর্যের লক্ষণ?

আধুনিক চিত্র-সাহিত্যে এক বর সাজিয়া বিবাহ করিতে যাওয়া ছাড়া সর্বদা অনর্থক সাহেব সাজিয়া থাকার রেওয়াজটা বাঙলার চিত্রকে আরও অবাস্তর করিয়া তুলিতেছে। নায়ক হিসাবে ধীরাজের অভিনয় অনুল্লেখযোগ্য। চিত্রার ভূমিকায় অরুণা দাসের অভিনয় মন্দ নয়।

নমিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভূমিকায় অর্ধেন্দু মুখার্জি তাহার অভিনয়ে প্রথমাংশ বাদ দিলে প্রশংসনীয় অভিনয় করিয়াছেন। বাহুল্য নাই এবং চেহারাটিও ভূমিকা হিসাবে মানানসই হইয়াছিল। সত্য মুখার্জি ও নৃপতি চ্যাটার্জি মুখার্জি ও দত্তের ভূমিকায় সুঅভিনয় করিয়াছেন। নিভাননী অভিনয় কৌশল দেখাইতে পারেন নাই। সন্তোষ সিংহ ডাঃ বজ্রপাণি ঘোষের ভূমিকায় অতি-অভিনয় করিয়াছেন। তবুও বলিতে হয় নমিতার ভূমিকায় প্রতিমাই এই চিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করিয়াছেন। ব্যবধানের সংলাপ ছবিটিকে যেমন মাধুর্যমণ্ডিত করিয়াছে তেমনি ইহাকে সম্পদবান করিয়াছে কয়েকটি সংগীত। প্রেমেন্দ্রবাবুর সংগীত রচনার নৈপুণ্য, বলিতে দ্বিধা নাই, রাবীন্দ্রিক পর্যায়ের নিম্নে নহে, শব্দ নির্বাচন সুষ্ঠু ও উপযোগী এবং ইহার সুন্দর সুর সংযোজনা যে মধুর আবেশের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে এক এক সময় রবীন্দ্র সংগীত শুনিতেছি বলিয়া মনে হইতেছিল। দুইটি গানে রবীন্দ্র-সুরের সুস্পষ্ট অনুকরণ লক্ষ্য করিলাম।

নির্মল দে আলোকচিত্রের জন্য কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন না। সি এস নিগমের শব্দধারণে অসঙ্গতি আছে। শব্দ গ্রহণের বৈষম্য স্থানে স্থানে কানে ঠেকিতেছিল, গানগুলি এই দোষেই খানিকটা নষ্ট হইয়াছে। সম্পাদনা বাঙলার পূর্ব পূর্ব চিত্র অপেক্ষা অনেক নামিয়া গিয়াছে। দৃশ্য পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কিছু নাই। এনগেজমেণ্ট টিপার্টিতে একদল সখীর আবির্ভাব, নমিতাকে লইয়া যাওয়ার জবরদস্তি ও গান বহু পূর্বেকার যাত্রার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

'ব্যবধানের' সঙ্গে মতিমহল থিয়েটার্সের হাস্যকৌতুকপূর্ণ দুই রীলের চিত্র কর্মফল দেখানো হইতেছে। গল্পাংশ রচনা করিয়াছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রধান ভূমিকায় অভিনয় ও পরিচালনা করিয়াছেন ধীরেন গাঙ্গুলী। সঙ্গে আছেন পূর্ণিমা, রাজলক্ষ্মী ও আশু বোস। ছবিটির প্রথমদিকের রসিকতা কিঞ্চিৎ স্থূল হইয়া পড়িলেও শেষের দিকে বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

এলিট সিনেমায় "হাউস এ্যাক্রস দি বে"

ওয়াল্টার ওয়েঙ্গার প্রডাকশনের ছবি "হাউস এ্যাক্রস দি বে" শুক্রবার হইতে এলিট সিনেমায় দেখানো হইতেছে। প্রধানাংশে অভিনয় করিয়াছেন জর্জ র‍্যাফট্, জোয়ান বেনেট, ওয়াল্টার পিজিয়ন।

একটি প্রণয়মূলক কাহিনী অবলম্বনে ছবিখানির গল্পাংশ রচিত। সমালোচনার কষ্টিপাথরে আলোচ্য ছবিটিকে উচ্চ পর্যায়ে গণনা করা যায় না। কিন্তু চিত্রামোদিগণের পছন্দ-অপছন্দের দিক দিয়া দেখিলে মনে হয় ইহা জনসাধারণকে আনন্দ দিতে পারিবে।

নায়িকার ভূমিকায় জোয়ান বেনেটের অভিনয় এবং সংগীত সকলের ভাল লাগিবে বলিয়া মনে হয়। জোয়ান বেনেটের বন্ধুর ভূমিকায় ওয়াল্টার পিজিয়নের চরিত্রচিত্রণকার্যে নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নাট্যমঞ্চ সংবাদ

মিনার্ভা:—শ্রীশচীন্দ্র সেনগুপ্তের প্রথম পৌরাণিক নাটক **"হর-পার্বতী"** ২৪শে আগষ্ট মঞ্চস্থ হইবে। শচীনবাবু নাট্য জগতে প্রগতির যুগ আনয়ন করিয়াছেন, আশা করি **হর-পার্বতীতে** আমরা নূতনের আভা দেখিতে পাইব।

ষ্টার:—শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তের **"পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ"** সাফল্যের সহিত অভিনীত হইতেছে।

রঙমহল:—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যের **"মালা রায়"** নামক একখানি সামাজিক নাটক গত সপ্তাহে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এই নাটকখানি পূর্বে বিজ্ঞপ্ত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রাখা হইয়াছিল।

নাট্যভারতী:—প্রবীণ নাট্যকার শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত সামাজিক নাটক **"সিঁথির সিঁদুর"** শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর পরিচালনায় অভিনয়ার্থ প্রস্তুত হইতেছে।

নাট্যনিকেতন:—শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদারের শ্রমিক সমস্যা লইয়া লিখিত **"মহাযুদ্ধ"** নামক একখানি সামাজিক নাটক অভিনয়ার্থ প্রস্তুত হইতে হইতে হঠাৎ বিশেষ কোন কারণে আয়োজন বন্ধ হইয়া যায় এবং শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যের **"নরনারী"** নামক একখানি নাটক অবিলম্বে মঞ্চস্থ হইতেছে বলিয়া আমরা সংবাদ পাই। দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে কিন্তু নাটকটি মঞ্চস্থ হইবার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

পুস্তক পরিচয়

ত্রৈমাসিক "সোম"; সূচনা সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৪৭। সম্পাদক—শ্রীবীরেন রায়; ৭২নং আপার সার্কুলার রোড, প্রতি সংখ্যা ।৵০, বার্ষিক সডাক ২্ টাকা। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স; কমলা বুক ডিপো; দি বুক কোম্পানীতে পাওয়া যাইবে।

আলোচ্য সংখ্যায় শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীসরোজ রায়চৌধুরী, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত চারখানি বড় গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীবীরেন রায়ের কবিতা স্থির, পদাবলী সুখপাঠ্য। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও রঙ্গজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা মনোজ্ঞ। আধুনিক বাঙলা দেশে সাহিত্য ও বিবিধ শিল্পকলায় যাদের প্রতিভা সৃষ্টিমুখী, তাঁহারাই স্বভাবত এরূপ চেষ্টা অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করিবেন। সম্পাদক যদি তাঁহার প্রারম্ভের সংকল্প বরাবর রক্ষা করিয়া চলেন, তাহা হইলে পাঠকবর্গও স্বেচ্ছাবশে পত্রখানির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিবেন। আমরা পত্রিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

সহরতলী:—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

বিপুলায়তন সহরগুলির খোরাক জোগাইতে যে সকল সহরতলীর সৃষ্টি হয়, তাহাদেরই একটিকে কেন্দ্র করিয়া আলোচ্য উপন্যাসখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিষয় বৈচিত্র্যে, লেখকের ঘটনা প্রযোজনার প্রকাশ ভঙ্গিতে সমস্ত বইখানি উপভোগ্য হইয়াছে। লেখক বইখানিতে কল্পনা অপেক্ষা বাস্তব চিত্রের দিকে বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন।

স্থূলকায়া বাড়ীওয়ালী যশোদা তাহার বহু ভাড়াটিয়া পরিবার এবং বিরাট বস্তির প্রতিবেশীদের লইয়া ততোধিক যে বিরাট পরিবারের সুখদুঃখের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিল তাহাতে তাহাকে কম বিপর্যস্ত হইতে হয় নাই। কিন্তু যশোদা একা চাঁদের মা ছিল না। বহুজনের উপর নজর রাখিতে গিয়া এই ধরণের বিপদ আপদ একরূপ তাহার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বিনা কাজে যশোদার মন একদণ্ড চুপ করিয়া থাকিতে চাইত না।

শ্রমিক আন্দোলন, জ্যোতির্ম্ময়বাবুর সংসার, মতি, তাহার ভাড়াটিয়া এমনি আরও কতজনের উপর যশোদা নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। কিন্তু দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিল। সত্যপ্রিয়—মিলের স্বত্বাধিকারী সত্যপ্রিয়ের শঠতায় বহুদিনের অযাচিত সম্মান, যশগৌরব যশোদা হারাইয়া ফেলিল। সেই অসময়ে চাঁদের মাকে প্রায় সকলেই ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যে দুই একজন পড়িয়া রহিল তাহাদের মধ্যে ধনঞ্জয়,—যশোদার ভালবাসার টানে আর বাকির কেহ বা অর্থের অনটনে। বাস্তব জগতে যাঁহারা কখনও সহরতলীর জীবনধারার সহিত চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়াছেন তাঁহারা বইখানি পড়িয়া লেখকের একনিষ্ঠতার পরিচয় পাইবেন।

বইখানির বাঁধাই, কাগজ এবং ছাপা চমৎকার হইয়াছে।

সমর বার্তা

১৪ অগস্ট।—

গত রাত্রে ব্রিটিশ বিমানবহর জার্মানির রাজধানি বার্লিনে হানা দিয়া আসিয়াছে। এই সংবাদ জার্মান নিউজ এজেন্সি কর্তৃক স্বীকৃত। বিমান সচিবের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ইংরেজরা গত রাত্রে বহু শত্রুস্থানে হাওয়াই হামলা করিয়াছে। ইংলণ্ডে জার্মান বিমানের আক্রমণ বহাল আছে। মঙ্গল ও বুধবারে জার্মানদের ৯০টা বিমান নষ্ট ও ইংরেজদের ১৩টা নিরুদ্দেশ হইয়াছে। ব্রিটেনে অবতরণ করিবার জন্য জার্মানরা তোড়জোড় করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইংলিশ চ্যানেলের আবহাওয়া বর্তমানে খুব অনুকূল। মনে হইতেছে প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করিবার পূর্বে ব্রিটিশের বিমান ও নৌবহরকে পঙ্গু করাই জার্মানদের লক্ষ্য।

বিমান বিভাগের ১৩ অগস্টের ঘোষণা—গত ৩ দিনে ইংরেজরা ১৯৬টা জার্মান এয়ারোপ্লেন ধ্বংস করিয়াছে; ১৮ জুন হইতে আজ পর্যন্ত মোট ৫২৩টা এবং যুদ্ধারম্ভের পর হইতে আজ পর্যন্ত মোট ৫৯৭টা জার্মান এয়ারোপ্লেন বিনষ্ট হইয়াছে।

রোমের বেতারে আলবেনিয়ার নেতা হোগিয়ার হত্যা সম্পর্কে ব্রিটেনই দায়ী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ব্রিটেনের উস্কানিতে গ্রীক কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিতেই নাকি এইরূপ ঘটিয়াছে।

বার্লিনের ১৩ তারিখের সংবাদ—লুক্সেমবুর্গএর জার্মান শাসনকর্তার ঘোষণানুযায়ী লুক্সেমবুর্গএর পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। ভবিষ্যতে সরকারী দলিলে 'ডাচি' বা 'লুক্সেমবুর্গ দেশ' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা চলিবে না।

১৫ অগস্ট।—

আজ ইংলণ্ডে আকাশযুদ্ধ প্রবল। সকালে জার্মানরা দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে কয়েকটি বিমানঘাঁটির উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। বিকালে উত্তরপূর্ব অঞ্চলেও উভয় পক্ষের আকাশযুদ্ধ হইয়াছে। সরকারী ঘোষণা এই যে, আজ ৮৮টা জার্মান বিমান বিনষ্ট হইয়াছে; ইংরেজদের ৭টা। আজ ক্রয়ডন বিমানঘাঁটিও আক্রান্ত হইয়াছিল। ব্রিটিশ বিমানবহরও শত্রুরাজ্যে ব্যাপক আক্রমণ চালাইয়াছিল।

ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডে ইতালীদের অগ্রগতি ঘটিয়াছে। ব্রিটিশ সৈন্যেরা সামান্য পিছু হটিয়াছে। কমন্স সভায় শ্রীযুক্ত চার্চিল এই সংবাদকে 'সন্তোষজনক নহে' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১৬ অগস্ট।—

বৃহস্পতিবারে সহস্রাধিক জার্মান বোমারু ও জঙ্গীবিমান ইংলণ্ডে প্রবল হামলা চালায়। প্রকাশ, ছয় শতাধিক মাইল জুড়িয়া ব্যাপক আক্রমণ চলিয়াছিল। ইহাই সর্বাধিক প্রবল 'ব্লিৎসক্রীগ' আক্রমণ। এই দিনে ১৬৯টা জার্মান বিমান ধ্বংস হইয়াছে; ইংরেজদের ৩৪টা। ১৭ জন বৈমানিক রক্ষা পাইয়াছেন। আজও ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে জার্মান হাওয়াই হামলার সংবাদ আছে। আজ ৫০টা জার্মান বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডের অবস্থা সংকটজনক। ইতালীয় বাহিনী অগ্রসর, ব্রিটিশ বাহিনী পশ্চাদপসরণরত। এই পশ্চাদপসরণের কারণ, ফরাসীদের সাহায্য বঞ্চিত অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে ২ ডিভিসন ইতালীয় সৈন্যের নিয়োগ। লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহল মনে করেন, ব্রিটিশকে হয়তো বারবারা পর্যন্ত হটিয়া যাইতে হইবে।

চুংকিংএর সংবাদ—সোমবারে সুচাওএর উপর জাপ বিমান আক্রমণের ফলে প্রায় ৩০০০ অসামরিক অধিবাসী নিহত হইয়াছেন।

১৭ অগস্ট।—

আজ রাত্রে লণ্ডন মহানগরীতে প্রথম জার্মানরা হাওয়াই হামলা করিয়াছে। লণ্ডনের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকণ্ঠে বোমা বর্ষিত হয়। জার্মান নিউজ এজেন্সির সংবাদ, জার্মান হাইকমাণ্ড অতঃপর ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জকে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিবে; সমস্ত ব্রিটিশ দরিয়ায় মাইন পাতা হইয়াছে। গত রাত্রে ইংরেজরাও শত্রুস্থানে প্রবল হামলা চালাইয়া আসিয়াছে। লাইপজিগের একটি বিরাট বিদ্যুতের কারখানা অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত। ১১ হইতে ১৬ অগস্ট, এই ছয় দিনের বিমানযুদ্ধে ইংরেজদের ১১৫ জার্মানদের ৫৯১টা এয়ারোপ্লেন নষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডে ইতালির চাপ ক্রমবর্ধমান। তব্রুক বন্দর ব্রিটিশ বিমান কর্তৃক আক্রান্ত। ক্যাপুজা দুর্গে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ হইতে প্রবল গোলাবর্ষণ হইতেছে।

বুখারেস্টএর সংবাদ—রুমানিয়া গভর্নমেণ্ট বুলগেরিয়াকে সিলিস্ট্রিয়া ও বলটিক ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছেন।

১৮ অগস্ট।—

ইংলণ্ডে জার্মানদের হাওয়াই হামলা পূর্ববৎ। আজ লণ্ডন এলাকায় দুইবার আক্রমণ চলে। আজিকার আকাশযুদ্ধে জার্মানরা ৩৬টা এয়ারোপ্লেন খোয়াইয়াছে। কাল জার্মান অধিকৃত বহু অঞ্চলে ইংরেজরা ব্যাপক আক্রমণ চালাইয়াছিল। বার্লিন হইতে ডোমেই এজেন্সির নিকট প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, জার্মান গভর্নমেন্ট ব্রিটেনের উদ্দেশ্যে পুনরায় এক গুরুত্বপূর্ণ ইস্তাহার পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছে। সবিস্তার অজ্ঞাত।

কায়রোর সংবাদ—ইতালীয়রা মিশর-লিবিয়া সীমান্তের ক্যাপুজা দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ হইতে এই দুর্গের উপর প্রবল গোলাবর্ষণ হয়।

চুংকিংএর সংবাদ—জাপ বিমানবহর চুংকিংএর উপর অবিরাম আক্রমণ চালাইয়াছে।

১৯ অগস্ট।—

কাল ইংলণ্ডে তিনবার জার্মানদের বিমান আক্রমণ হয়। এই আক্রমণে জার্মানদের অন্তত ৬০০ বিমান নিযুক্ত হয়। বিকালে শত্রুপক্ষীয় বিমানসমূহ টেমস নদীর মোহানা ধরিয়া লণ্ডনের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু ব্রিটিশ বিমানবহরের প্রবল আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। আজ ১৪৪টা জার্মান বিমান ও ২২টা ব্রিটিশ বিমান নষ্ট হয়।

লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ইংরেজরা ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড সাফল্যের সহিত পরিত্যাগ করিয়াছে। আদ্দিস আবাবায় ব্রিটিশ বিমানবহরের ব্যাপক ও সফল আক্রমণ ঘটিয়াছে।

কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আত্মরক্ষার উদ্যম উপলক্ষে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও শ্রীযুক্ত ম্যাকেঞ্জি কিংএর যুক্ত বিবৃতির এক স্থানে যুদ্ধের বিভীষিকা পশ্চিম গোলার্ধের দিকেও বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

২০ অগস্ট।—

লণ্ডনে এখন সকলেই মনে করিতেছেন যে, ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল লক্ষ্য করিয়া ফ্রান্স হইতে কামান দাগা হইতেছে। এই উপকূলভাগে শস্যহানি করিবার জন্য জার্মানরা প্রায় ১২০ একরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে আগুনে বোমা ফেলিয়াছে। কোনওরূপ ক্ষতি হয় নাই। ওয়েলস্ শহরে আজ দিনের বেলায় জার্মানরা হাওয়াই হামলা করে।

আজ লণ্ডনের কমন্স সভায় বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চার্চিল বলিয়াছেন, ইংলণ্ডকে ১৯৪১ ও ১৯৪২ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বলিয়াছেন, আজ ইংলণ্ড যেরূপ শক্তি অর্জন করিয়াছে, এরূপ শক্তিশালী সে আর কোনও কালে ছিল না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৪ অগস্ট।—

আজ লণ্ডনের লর্ডস সভায় ভারত সম্বন্ধীয় আলোচনার উদ্বোধন প্রসঙ্গে লর্ড স্ট্র্যাবোলগি বলেন যে, শ্রীযুক্ত আমেরির উচিত ব্যাপক ক্ষমতা লইয়া সত্বর ভারতে গিয়া একটা মীমাংসা করিয়া আসা। লর্ড ডেভনশায়ার বলেন, এই যুদ্ধের সময় ভারতের মত একটা বিরাট দেশের শাসনপ্রণালী বাতিল করিয়া দিয়া নূতন শাসনপ্রণালী প্রণয়ন সম্ভব নহে; তবে এ সম্বন্ধে প্রাথমিক কাজগুলো অনেকটা তাঁহারা এখন করিয়া রাখিতে পারেন। ভারতীয়দের মধ্যে মীমাংসার ফলাফল না দেখিয়া এবং উহাকে ভিত্তি না করিয়া ভারতকে আরও স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত আমেরি বলেন যে, কংগ্রেস ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী। কংগ্রেস নেতৃবর্গ ইহাকে জাতির যথার্থ প্রতিনিধিস্থানীয় এবং সর্বদলের মিলনক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিলে তাহার দাবি চড়া হইলেও সমস্যা ভিন্নরূপ ও সরল হইত। কিন্তু ভারতের প্রধান কয়েকটি জাতির গঠিত সম্প্রদায় কংগ্রেসের দাবিতে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাট মুসলমান সম্প্রদায় সর্বপ্রধান।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় দোকান কর্মচারী বিলটি আগাগোড়া গৃহীত হইয়াছে।

১৫ অগস্ট।—

ইসলামিয়া কলেজের ব্যাপার সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট নিয়োজিত তদন্ত কমিটির কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

আজ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক জরুরী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত খাজা নাজিমুদ্দিন বলিয়াছেন, হলওয়েল মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহে ধৃত বন্দী শ্রীযুক্ত যতীন বিশ্বাস ইমামবারা হাসপাতালে মারা গিয়াছেন।

পণ্ডিচেরির সংবাদ—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দের ৬৯তম জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

১৬ অগস্ট।—

কলিকাতা করপোরেশনের স্পেশাল কমিটি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা করপোরেশনে গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা রিপোর্ট গ্রহণের পক্ষে এবং মুসলিম লীগ ও শ্বেতাঙ্গরা বিপক্ষে ছিলেন। উক্ত বিল আইনে পরিণত হইলে কংগ্রেস, হিন্দুসভা ও জাতীয়তাবাদী অন্যান্য দল করপোরেশন হইতে বাহির হইয়া গিয়া একযোগে বিল রদ করিবার জন্য তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করিবেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

সিমলার সংবাদ—এই সপ্তাহের ইণ্ডিয়া গেজেটে কলিকাতার হলওয়েল মনুমেণ্টকে পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইনের বহির্ভূত বিষয় বলিয়া ঘোষিত করা হইয়াছে।

কাশীর এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, 'ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনর্থক আলোচনায় বৃথা কালক্ষেপ করিয়া দরকার নাই। ভারতের উপর দিয়া অত্যাচার নির্যাতন অনেক হইয়া গিয়াছে।'

১৭ অগস্ট।—

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও শ্রীযুক্ত এম, এস, আনের নির্দেশক্রমে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দিবস পালন উপলক্ষে কলিকাতা ও হাওড়ার বহু ও বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যহীনতা সত্ত্বেও ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে উপস্থিত হইয়া এই বাঁটোয়ারা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক মানসতা বাড়াইয়া যে কি ভীষণ বিষ-ক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বিবৃত করেন।

১৮ অগস্ট।—

ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে। মহাত্মাজী এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ, তিনি ওআর্কিং কমিটির আলোচনায় পুরাদস্তুর যোগদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আজাদের নিকট হইতে বাণী প্রার্থনা করিলে তিনি বলেন, 'আপনারা প্রস্তুত হউন, ইহাই আমার বাণী'।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে অ্যালবার্ট হলে অধিবেশিত এক বিরাট জনসভায় বর্তমান অধিরাষ্ট্রীয় (international) সংকটের আলোচনা, বাঙলার মন্ত্রিসভার বিরূপ কার্যপ্রণালীর নিন্দা ও প্রতিবাদ, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র ও রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১৯ অগস্ট।—

শ্রীযুক্ত আনেকে বড়লাটের শাসন-পরিষদে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইবে বলিয়া সিমলায় গুজব রটিয়াছে।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিল ও বঙ্গীয় রাজস্ব বিল বিনা পরি-বর্তনে ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়াছে।

ওয়ার্ধায় ওআর্কিং কমিটির বৈঠক চলিতেছে। গান্ধীজী প্রত্যেক দিন অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবেন।

মাজদিয়া ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত শ্যামসুন্দর দীক্ষিতের উত্তরাধিকারীদের রেল কর্তৃপক্ষ ৩০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়াছেন।

২০ অগস্ট।—

ঢাকা মেলের লাইন-চ্যুতির জন্য যাহারা অপরাধী, তাহাদের সন্ধান দিতে পারিলে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ই বি রেল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি কস্টেলোর অনুপস্থিতিতে বিচারপতি বিশ্বাস কর্তৃক ভাওয়াল মামলার আপিলের রায় পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। মামলা চালাইতে আজ পর্যন্ত ২০ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ভারতরক্ষা আইন।—গত ২৮ জুলাইএর হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির বিরোধিতা' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশের অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট উভয় পত্রের সম্পাদক ও মুদ্রাকর মহাশয়দের ৩১ অগস্ট আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির অধিবেশন আজও চলিতেছে। আজ শ্রীযুক্ত এম এস আনে শ্রীযুক্ত বড়লাটের সঙ্গে এক ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা করিয়াছেন।
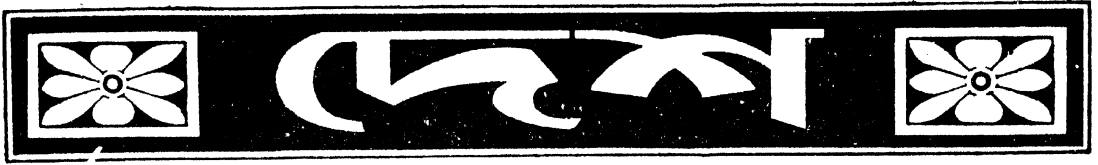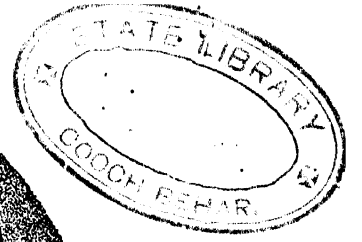
৭ম বর্ষ] শনিবার, ১৫ই ভাদ্র, ১৩৪৭ সাল Saturday, 31st August, 1940 [৪২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ব্রিটিশের ভারত নীতি—

বড়লাট কংগ্রেসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, সুতরাং বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য সংখ্যা বাড়াইলে কংগ্রেস তাহাতে যোগদান করিবে না। ভারতের সর্বপ্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে বর্জন করিয়া বড়লাটের শাসন-পরিষদের এই গঠনে যে জনমতানুমোদন থাকিবে না, ইহা সুস্পষ্ট। কংগ্রেস ভারতের দলবিশেষ নয়, সমগ্র ভারতের জনমতের প্রতীক হইল কংগ্রেস। ব্রিটিশ জাতি এতদিনেও ইহা না বুঝিয়াছে, এমন নয়; কিন্তু কায়েমী স্বার্থের মায়া ব্রিটিশ রাজনীতিকদের দৃষ্টিকে এই দুঃসময়েও অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শুনা যাইতেছে, বিলাতের শ্রমিক দল কর্তা-দিগকে এই কথাটা বুঝাইবার জন্য এখনও চেষ্টা করিতেছেন যে, কংগ্রেসের সাহচর্য ব্যতীত বড়লাটের শাসন-পরিষদের সম্প্রসারণ করিলেও ভারতের স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতা পাওয়া যাইবে না। এই সম্পর্কে কেহ কেহ ভারতসচিব লর্ড আমেরিকে ভারতে আসিতে পরামর্শ দিতেছেন। আমাদের মতে ভারতসচিবের ভারতে আসা না আসা অবান্তর কথা। কংগ্রেস বিশেষ বিবেচনার পর ব্রিটিশ জাতির নিকট শেষ যে দাবি করিয়াছে, তাহাতে সকল পক্ষেরই স্বার্থ সিদ্ধ হইতে পারে। ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ যদি সে দাবি স্বীকার করিয়া লইতে রাজী না থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ভারতের জনমতের ধার তাঁহারা ধারেন না; নিজেদের মাতব্বরি এবং সেই মাতব্বরি ফলাইবার পিছনে তাঁহাদের যে জোর, সেই জোরকেই তাঁহারা ভারতের জনমতের জোরের চেয়ে বড় মনে করিয়া থাকেন। কংগ্রেসের দাবির সঙ্গে তাঁহাদের মতিগতির মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে এই দিক হইতে। মাতব্বরি যদি ফলাইবার মতলবই এখনও থাকে, তবে ভারতের বাহিরে থাকিয়া ফলানই ভাল, মাতব্বরির মনোবৃত্তিতে ভারতে আসিয়া ভারতবাসীর আত্মমর্যাদায় প্রত্যক্ষতর আঘাত না করাই বর্তমান সময়ে ভারতসচিবের পক্ষে সমীচীন পন্থা হইবে। ভারতবাসীরা চায় তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের আন্তরিক স্বীকৃতি; সে দাবিকে কাজে উপেক্ষা করিয়া শুধু কথার দহরম-মহরম উচ্ছিষ্ট-প্রত্যাশীর দলই পরিতুষ্ট হইবে এবং সাগর পার হইতে রুটির দুই একটা টুকরা ছুড়িয়া দিলেই যাহারা সন্তুষ্ট হয়, তাহাদের জন্য সাগর পাড়ি দিয়া আসিবার পরিশ্রম স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

অনিষ্টকর নীতি—

মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রে লিখিয়াছেন—'দেশের লোক এই কথাই সর্বদা স্মরণ রাখিবে যে, যেখানে শাসকগণ জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বশীল নহে, সে দেশে দেশপ্রেম একটি অপরাধ। ডাক্তার লোহিয়া এবং অন্যান্য কংগ্রেস-কর্মীদের কারাবন্দী করার ব্যবস্থা বস্তুত কতকগুলি হাতুড়ির আঘাত মাত্র। ঐ আঘাতে ভারতেরই অধীনতার শৃঙ্খল জীর্ণ হইয়া আসিবে। গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসকে সাধিয়া আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। ব্রিটিশের দুঃসময়ে তাহাকে আঘাত করিবার যে সংকল্প কংগ্রেস করিয়াছিল, আজ গভর্নমেণ্ট স্বেচ্ছায় সেই আঘাত যথাসময়ের পূর্বেই আহ্বান করিতেছেন।' ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়া সেদিন নাগপুরের একটি বক্তৃতায় দেশের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—"ভারতসচিব আমেরি, আমরা কতদূর কি করিতে পারি, মনে হয় তাহা দেখিবার জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এইজন্যই নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইতেছে, ভারতের ৩১৫ জন প্রতিনিধির এই অধিবেশনে সমবেত হইয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করিবেন।" কংগ্রেস ব্রিটিশ জাতির প্রতি সম্মানজনক সর্তে সহযোগিতায় হাত বাড়াইয়াছিল। ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ আয়র্ল্যাণ্ডে এবং আমেরিকার বেলায় যেরূপ ভুল করিয়াছিলেন, কংগ্রেসের দাবিকে অগ্রাহ্য করিয়া এখনও সেই ভুলই করিতেছেন, ইহা

বড়ই দুঃখের বিষয়। ভারতের স্বাধীনতা যদি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট স্বীকার করিয়া লইতেন, তাহা হইলে সমগ্র ভারত আজ সংহতিবদ্ধ হইয়া উঠিত এবং স্বাধীনতাকামী-দের প্রতি অবিশ্বাস এবং সন্দেহ-সংশয়পূর্ণ অন্তরে ভারত-রক্ষা নীতির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাও কর্তারা দেখিতেন না। বিশ্বস্তির ভাব দেশে বৃদ্ধি পাইত, দেশের শৃঙ্খলা শান্তির পক্ষে তাহাই প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল---

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক দম্ভভরে বলিয়াছিলেন যে, মাধ্যমিক বিল বাঙলার জনমতের বিরোধী নহে। এই কয়েকদিনে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার এই উক্তির ভিত্তিহীনতাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। বাঙলার বিভিন্ন স্থানের ১১৫টি হাইস্কুলের পক্ষ হইতে এই বিলের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কলিকাতার বিরাট জনসভায় বাঙলার আইন-সভার গভর্নমেণ্ট বিরোধী পক্ষসমূহ একত্র হইয়া এই বিলের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহার পরও কি বাঙলার প্রধান মন্ত্রী বলিতে চাহেন যে,---"জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই বিলের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদের চিহ্নই তিনি দেখিতে পাইতেছেন না; কেবল পেশাদারী আন্দোলনকারিগণই চীৎকার করিতেছে। দেশের পক্ষ হইতে কোন আন্দোলন উঠিলেই বিলাতের স্বার্থবাদী রাজনীতিকগণের মুখে পেশা-দারী আন্দোলনকারীদের আবির্ভাবের কথা আমরা শুনিতে অভ্যস্ত আছি। জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের স্পর্ধা করিয়াও ঐ ধরনের বুলি বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর মুখে শোভা পায় না। কথায় আছে, ঘুমান মানুষকে জাগান যায়; কিন্তু জাগিয়া যে ঘুমায়, তেমন মানুষকে জাগান যায় না। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী জাগিয়া ঘুমাইতে চাহেন। এমন মানুষকেও জাগান না যায় এমন নহে, তবে একটু বেশী জোরের প্রয়োজন হয়। আমরা আশা করি, বাঙলার জনমতের সেই জোরের পরিচয় প্রধান মন্ত্রী অচিরেই পাইবেন। বাঙলার শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে বাঙালী প্রগতি-বিরোধী শক্তির হাতে সঁপিয়া দিয়া কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিবে না। ঐক্যের শক্তিতে সুসংহত বাঙলার জনমত জাগিয়া উঠিয়া মন্ত্রিমণ্ডলের চৈতন্য সম্পাদন করিবে।

যুবকদের আদর্শ---

স্যার আকবর হায়দারি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমা-বর্তন সংস্কার-সভায় ভারতের জাতীয়তা এবং ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐক্যের উপর জোর দিয়াছেন। যুবক-দিগকে সাবধান করিয়া তিনি বলেন, ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার রহিয়াছে তোমাদের উপর। বিশ্বের দরকারে ভারতকে মর্যাদা দিবে তোমরা। ভারতভূমির বিরাট এবং বিশালত্বের অনুপাতে ইহার শক্তিশালী সেনাদল, নৌবহর প্রভৃতি গঠন করিতে হইবে। ৪০ কোটি লোকের বাস যে দেশে, সেই দেশকে জাগাইলে জগতে এক মহাশক্তির সৃষ্টি হইবে। এই সৃষ্টির সম্মানের অধিকারী হইবে ভারতের তরুণেরা। স্যার আকবর হায়দরি যে ভারতের স্বপ্ন দেখিতেছেন, সে স্বপ্ন সার্থক হইবে সেইদিন, যে দিন ভারতের ঐক্য এবং সংহতির বিরুদ্ধে যাহারা চলিতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে যুবকদের মনে বিক্ষোভের সঞ্চার হইবে। ধর্মের দোহাই দিয়া যত বুজরুকি চলিতেছে, তখন তরুণদের কাছে সে সব কিছুই খাটিবে না। আমরা সেই তরুণ-জাগরণের অপেক্ষায় দিন গণিতেছি।

খেলোয়াড়ী প্রস্তাব---

ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার পর কংগ্রেস কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে, দেশের লোকে ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারী এক নূতন কর্মপন্থা প্রকাশ করিয়াছেন। বিলাতের 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রের প্রতিনিধির নিকট তিনি বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ভারত গভর্নমেণ্টকে জাতীয় গভর্নমেণ্টের আকারে গঠন করিতে সম্মত থাকেন, তাহা হইলে সেই গভর্নমেণ্টের প্রধান মন্ত্রিত্ব যাহাতে মুসলিম লীগের সদস্য পাইতে পারেন এবং সেই প্রধান মন্ত্রী যাহাতে স্বেচ্ছানুসারে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে পারেন, কংগ্রেসকে তাহাতে সম্মত করাইতে তিনি প্রস্তুত আছেন। সংখ্যা-লঘিষ্ঠের অজুহাতে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ ভারতের ভাগ্য লইয়া যে খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই খেলার বাজিমাৎ করিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয়, রাজাজীর এই প্রস্তাব। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের খেলোয়াড়ী চাল এ প্রস্তাবে যে বন্ধ হইবে, আমাদের এমন বিশ্বাস নাই। মুসলমানই প্রধান মন্ত্রী হউন, আর হিন্দুই প্রধান মন্ত্রী হউন, আপত্তির কোন কারণই থাকিতে পারে না, আসল কথা হইল এই যে, কংগ্রেসের যে রাজনীতিক উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, রাজাজীর প্রস্তাবে তাহা সিদ্ধ হইবে কি না। কংগ্রেসের প্রধান দাবিই হইল এই যে, জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পূর্বে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে, রাজাজীর প্রস্তাবে এই প্রধান সর্তটিই প্রথমত চাপা পড়িয়াছে। মুসলিম লীগ কংগ্রেসের ঐ দাবি সমর্থন করে না। মুসলিম লীগকে তুষ্ট করিবার জন্য রাজাজী কি কংগ্রেসের সুবিবেচিত সিদ্ধান্তকেও বাতিল করিতে চাহেন? ভারতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার দায়ে সে দাবিও ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, রাজাজীর ইহাই যদি মতলব হয়, তাহা হইলেও এই প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, মুসলিম লীগের সদস্য যদি প্রধান মন্ত্রী হন এবং তাঁহার কর্মনীতি অনুযায়ী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়, তাহা হইলে ভারতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে সুবিধা হইবে কি? মুসলিম লীগ ভারতের জাতীয়তাকে স্বীকার করে না, পাকিস্থান প্রস্তাবের দ্বারা লীগ ভারতকে বিখণ্ডিত করিতেই সংকল্পবদ্ধ এবং সে সংকল্প তাঁহাদের এখনও অটুট আছে। শুধু তাহাই নহে, বড়লাট সম্প্রতি বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার মধ্যে সেই পাকিস্থানী প্রস্তাবের উপর

জোর দিবার সুযোগের সন্ধান পাইয়াই লীগওয়ালারা উল্লাস বোধ করিতেছেন। সুতরাং ভারতের বর্তমান অবস্থার সন্তোষজনক সমাধানের পক্ষে রাজাজীর এই প্রতীয়মান ঔদার্যপূর্ণ প্রস্তাবের সুফল কিছু ফলিবার সম্ভাবনা নাই, বরং কুফল ফলিবার সম্ভাবনাই ষোল আনা। লীগওয়ালারা ইহার ফলে নিজেদের জাতীয়তাবিরোধী নীতিতেই জোর পাইবে। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা গিয়াছে যে, লীগ ওয়ালাদের তোয়াজ করিবার তেমন চেষ্টা উত্তরোত্তর তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক ক্ষুধাই বাড়াইয়া দিয়াছে। রাজাজীর প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা এই দিক হইতে উদ্বেগেরই কারণ সৃষ্টি করিবে।

উদারনৈতিক দলের মনোভাব—

উদারনৈতিক দলের সাড়া মাঝে মাঝে আবেদন-নিবেদনের স্থলে এখনও কিছু কিছু পাওয়া যায়। সম্প্রতি ইহাদের সঙ্ঘের কাউন্সিলের একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সঙ্ঘ ভারতসচিব মিঃ আমেরির বিবৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন। মন্তব্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কথা আছে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, 'ভারতসচিব তাঁহার বক্তৃতায় ঔপনিবেশিক অধিকার ও ভারত-সম্পর্কিত তাঁহাদের নীতির মধ্যে যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে ভারতের জনসাধারণের মনে গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতসচিব ভারতে ব্রিটিশের নৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হয়ত অন্যান্য উপ-নিবেশগুলি যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে, ভারতের পক্ষে সেইরূপ স্বাধীনতা লাভের পরিপন্থী হইবে। সংখ্যা-লঘিষ্ঠ কোন দলের আপত্তি থাকিতে পারে, এমন কোন শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতে স্বীকার করিয়া লইবেন না। এই মতিগতি বজায় থাকিতে ভারতবাসীরা ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রও ব্রিটিশের নিকট হইতে পাইবে না, ভারতবাসীরা এই আশঙ্কা করিতেছে, উদারনৈতিক দলের মন্তব্যের ইহাই হইতেছে মর্ম কথা। যাঁহারা এইরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসী যে, স্বাধীনতা অপরের দান হিসাবে পাওয়া যায়, ভারতসচিবের উক্তিতে আশঙ্কার কারণ দেখিবে তাঁহারাই। আমাদের তেমন কোন আশঙ্কার কারণ ঘটে নাই: কারণ, স্বাধীনতা অপর কেহ আমাদিগকে কৃপা করিয়া দিবে, আমরা ইহা যেমন বিশ্বাস করি না, তেমনই অপরের অনুগ্রহ-প্রদত্ত তেমন স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত দৈন্য প্রকৃত স্বাধীনতার পথ হইতে জাতিকে বিচ্যুত করে, ইহাই আমরা বিশ্বাস করি। ভারতসচিবের বিবৃতিতে উদারনীতিক দলের অন্তরকে পর-প্রত্যাশার কুসংস্কার হইতে যদি এতদিনেও কিছু মুক্ত করিয়া থাকে, তবে তাহা সুখের বিষয় বলিতে হইবে। অবশ্য সে ধারণা দূর হইলেই যে তাঁহারা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের জন্য কাজের পথে নামিতে পারিবেন, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। সংস্কার চিত্ত হইতে সাময়িকভাবে দূর হইতে পারে; কিন্তু যুক্তিবুদ্ধির পাকে পাকে জড়াইয়া আবার যেমন ছিল, তেমনভাবেই উহা আসিয়া জমে।

ধনসাম্য ও মহাত্মা গান্ধী—

'অবতার এবং ভগবৎজনিত ব্যক্তিরা তাঁহাদের তপস্যা দ্বারা মনুষ্য জাতির শাশ্বত নিয়মের আভাস দিয়াছেন'— মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রে সমাজে ধনের বণ্টন সাম্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে এই কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু অবতার এবং ভগবৎজনিত ব্যক্তিদের সেই কথা জগৎ মানিয়া লইয়াছে কি, এবং কখনও জগতের এমন অবস্থা হইবে কি, যখন জগতের লোক তাঁহাদের কথা মানিবে? ধনসাম্য সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেন,—প্রত্যেক লোকের এমন উপায় থাকা উচিত, যাহার দ্বারা তাহার সমগ্র স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটে, তাহার অধিক নহে; মহাত্মাজীর এই যে উক্তি অধ্যাত্ম-নীতির দিক হইতে ইহা নূতন নহে। ভাগবতে আছে যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ করে সে দণ্ডবিধানের যোগ্য। কিন্তু নৈতিক আদর্শগত ভাবে এই যে দণ্ডার্হতা ও নিন্দা তাহা মানুষকে এ পর্যন্তও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। মানুষ নিজের প্রয়োজন ভোগাসক্তির দিক হইতে অপরের অপেক্ষা বড় করিয়াই দেখিতেছে। মহাত্মা গান্ধী বলেন, ধনী অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী নহেন, অভিভাবক মাত্র। এই নীতি অনুসারে ধনীরা যদি অভিভাবকের ন্যায় আচরণ না করেন, তাহা হইলে প্রতিবেশীদের অপেক্ষা এক টাকা অধিক পাইবার অধিকারও তাঁহার নাই। গীতায় এই নৈতিক আদর্শ অনুসারেই ঐরূপ ধনীকে স্তেন বা তস্কর পর্যন্ত বলা হইয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ধনীদের মনে যজ্ঞ বা সেবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হয় নাই। মহাত্মাজী যে আদর্শের কথা বলিয়া-ছেন, রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থা দ্বারাই তাহা বাস্তবে প্রবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্র তেমন ব্যবস্থা করিবে তখন, যখন সে দরিদ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং রাষ্ট্রের তেমন ব্যবস্থাও যে ধনীরা সহজে মানিয়া লইবে তাহা নয়, তখন দণ্ডের প্রশ্ন উঠিবে। রাষ্ট্রের সম্পর্কে অহিংসার নীতি জগতে যদি প্রবর্তন সম্ভব হয়, তবে পুলিশ বা সৈন্যের কোন প্রয়োজন থাকে না, যুদ্ধ বা বিগ্রহ ঘটে না; মহাপুরুষ বা অবতারদের বাণীই বড় হয়। দুঃখের বিষয় অহিংসার ক্ষেত্রে তেমন আবিষ্কার এখনও অসম্ভবই রহিয়া গিয়াছে, এবং হয়ত চিরদিনই থাকিবে; কারণ দ্বন্দ্ব বা সঙ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষের ভিতর দিয়া মানবের অগ্রগতি চলিতেছে। দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম না থাকিলে মানব-জীবন বা মানবত্ব বলিতেও কিছু থাকিবে না।

লণ্ডনের উপর বিমান আক্রমণ—

ফ্রান্সের উপকূলভাগে জার্মানি বড় বড় কামান বসাইয়াছে। গত ২৪শে তারিখ শনিবার হইতে জার্মানেরা সেই সব কামান হইতে ইংলণ্ডের উপর কামান দাগিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে উড়োজাহাজের ঝটিতি আক্রমণও সুরু হয়। লণ্ডন শহরের উপরও উড়োজাহাজ হইতে আক্রমণ হইতেছে, আগুনে বোমা ফেলিয়া ঘরবাড়ী জ্বালাইবার চেষ্টা হইতেছে। জার্মানেরা ইহার মধ্যে এই হুমকিও দেখাইয়াছে যে, প্যারা-

সুটীদের বিরুদ্ধে যদি কোন রকম নৃশংস ব্যবস্থা ইংলণ্ডে অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহার প্রতিশোধ লইবে। বলা বাহুল্য, ফরাসীদিগকেও তাহারা এমন হুমকি দেখাইয়াছিল। এই হুমকি হইতে ইংলণ্ডেও তাহারা প্যারাসুটীদের নামাইবার চেষ্টা করিবে, ইহার পূর্বাভাস সূচিত হয়। শুনা যায়, জার্মনদের দশ হাজারের মত প্যারা-সুটী সৈন্য আছে। প্যারাসুটীদের কাজের সাফল্য নির্ভর করে 'পঞ্চম কলম' অর্থাৎ ঘর শত্রু বিভীষণদের সাহায্যের উপর। ইংলণ্ডে সে সুবিধা পাইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই; সুতরাং সেখানে প্যারাসুটীদের অবতরণ করা মৃত্যুকে বরণ করার সমতুল্যই হইবে। হিটলারী দলের ইংলণ্ডের উপর এই বিমান আক্রমণ হইতে ইংরেজ ফ্রান্সের পরাজয়ের পর আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় কতটা উন্নতি সাধন করিয়াছে, ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। হিটলার হয়ত আশা করিয়া-ছিলেন যে, উড়োজাহাজের সংখ্যার জোরে তিনি ব্রিটিশ বিমান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করিবেন এবং ইংলণ্ডে আতঙ্কের সৃষ্টি করিবেন; তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ব্রিটিশ বিমানবহর শত্রু-শক্তির ক্ষতি সাধনে এবং আত্মরক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে।

যুক্তির স্বরূপ—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গত ২৭শে আগস্ট বোম্বাইয়ের এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতসচিব মিঃ আমেরির বক্তব্যের বিশ্লেষণ করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় তাহার অন্তর্নিহিত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। পণ্ডিতজী বলেন—"এই সম্পর্কে যে সকল সর্ত আমাদের উপর চাপান হইয়াছে, তাহা পালন করা আমাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। কল্পনা করা যাক্—দেশের শতকরা নব্বইজন এক ধরনের শাসনতন্ত্র চাহে এবং কয়েকটি দল তাহা চাহে না। কল্পনা করা যাক্—দেশের শতকরা নিরানব্বইজন এমন কিছু চাহে, যাহা দেশীয় নৃপতিবর্গ এবং কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ইউ-রোপীয় সম্প্রদায়, যাহারা নাকি ভারতের জাতীয় জীবনের বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন এক সম্প্রদায়, তাহারা তাহা চাহে না; এক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কোন পরিবর্তন, কোন নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন না এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বরাবর পরিপুষ্ট হইয়া চলিবে ও সময়ের দুই পাল্লা ধরিয়া বসিয়া থাকিবে। অর্থাৎ হাঁপাইতে থাকিলেও শ্বেতাঙ্গদিগকে তাহাদের এই বোঝা বহন করিতে হইবে।"

অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন জনমতকে মানিব, এ কথার অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু গণতান্ত্রিক নীতির দোহাইও দিব, অথচ সকল সম্প্রদায়ের মতকেই মান্য করিব, ইহার অর্থ হয় না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত-সম্পর্কিত বর্তমান নীতির মূলে এই অযৌক্তিক যুক্তি। পণ্ডিত জওহরলাল ইহার বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—"ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বহু বাগাড়ম্বর করিয়া বলিতেছেন যে, ভারতে বিশেষ কোন দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু কে আধিপত্য চাহিতেছে? কে ইহার প্রস্তাব করিয়াছে? কংগ্রেস কখনই এমন কথা বলে নাই।" কংগ্রেস ভারতের বহু মতেরই প্রতিনিধিত্ব করিতেছে, ব্রিটিশ গভর্ন-মেণ্ট বিশেষ কোন দলের আধিপত্য চাহিতেছেন না, মুখেই শুধু এই কথা বলিতেছেন; কিন্তু কার্যত দলবিশেষের আধিপত্যই স্বীকার করিয়া গণতান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করিতেছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য পণ্ডিত জওহর-লালের কথায় সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন,—"ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বক্তব্য এই যে, এক দল সুবিধাভোগী লোককে কখনও চাপ দিয়া রাখা উচিত নহে; যদিও তাহারা বিদেশী। কিন্তু দেশের শতকরা নিরানব্বইজন ব্যক্তিকে যত খুশি চাপ দিয়া দাবাইয়া রাখা হউক, ইহাতে অন্যায় কিছুই নাই।" রাজনীতিক জ্ঞান যাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র জন্মিয়াছে, এমন মতিগতির অন্তর্নিহিত যুক্তি বুঝিতে তাহাদের বেগ পাইতে হয় না। ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ এখনও ভারতীয়-দের কতটা নাবালক মনে করেন, তাঁহাদের উপস্থাপিত এই ধরণের উৎকট যুক্তি হইতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়।

এ দেশ ও সে দেশ—

মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল হইতে একটি খবর আসিয়াছে। খবরটি এই যে, একজন লোক তাহার কোন প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে এক মন ধান চুরি করিয়াছিল। আদালতে সে অপরাধ স্বীকার করিয়া বলে যে, তাহার ছেলে-পেলেরা না খাইয়া মরিতে বসিয়াছিল, তাহাদের প্রাণ বাঁচাই-বার দায়ে পড়িয়াই সে চুরি করিতে বাধ্য হয়। ম্যাজিস্ট্রেট দয়াপরবশ হইয়া আসামীকে ক্ষমা করেন এবং তাহাকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেন। আদালতের সমস্যা এইভাবে মিটিল বটে, কিন্তু আসামীর সমস্যা মিটিল না। বেচারা খালাস পাইল, কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে, খালাস পাইয়া সে নিজের পেটের ভাত যোগাইবে কি করিয়া, শিশু সন্তানদিগকেই বা বাঁচাইবে কি উপায়ে।। অন্য পথ থাকিলে নিশ্চয়ই সে চুরি করিত না। ম্যাজিস্ট্রেটের চিত্তে তাহার প্রতি যে দয়ার উদ্রেক হইয়াছে, তাহার এই অবস্থা বুঝিয়াই হইয়াছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আছে। ইংলণ্ডেও আছে বেকারদের সাহায্য ব্যবস্থা, নাই এ দেশে। এ দেশ ও সে দেশ আমরা ও তাহারা পার্থক্য এইখানে।

হলওয়েল মনুমেণ্টের সদ্গতি—

হলওয়েল মনুমেণ্ট সরাইবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে এই পাথরের স্তম্ভটি সরান লইয়া একটা সমস্যা দেখ দিয়াছিল, তখন আমরা বলিয়াছিলাম যে, উহার অস্তি বজায় না রাখাই সমীচীন। এখন শুনিতেছি গির্জ প্রাঙ্গণে ঐটিকে সরাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। হলওয়ে মনুমেণ্টের এই সদ্গতি লাভে আমাদের আপসোসের কো কারণ নাই। তবে হলওয়েলের প্রেতাত্মা গির্জার প্রাঙ্গণে ঘাঁটি গাড়িয়া যাহাতে প্রত্নতাত্ত্বিক নূতন উপদ্রব সৃষ্টি করিতে পারে, সেজন্য কিঞ্চিৎ স্বস্তিবাচন উহার সং সংযুক্ত হওয়া উচিত।

মানসী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

সাধারণত কবির চিত্তের দুটি পর্ব বা অধ্যায় থাকে। এক অধ্যায়ে সে তার জীবনের গভীর বেদনাকে প্রকাশ ক'রে বলতে চায়, সেই বলার জন্যে তাঁর মন অস্থির হয়ে পড়ে। এই যে তার বেদনা প্রকাশের ব্যাকুলতা, এটা তাকে অতি-মাত্রায় চঞ্চল ক'রে তোলে। তার জীবনের আর একটা দিকও আছে; সে অধ্যায়ে সে, বেদনার উৎস হ'তে প্রাপ্ত ভাবকে, জীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণময় রসের সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই যে সৃষ্টির আবেগ, এটা তাকে এমন একটা রসোপলব্ধির মধ্যে নিয়ে যায় যেটা প্রকৃতপক্ষে দুঃখ নয়, বেদনাও নয়, তা হচ্ছে দুঃখ বেদনাতীত এমন একটা বস্তু যা বর্তমানের সীমাকে অতিক্রম করে, চিরন্তনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা চায়। কবি তাঁর কাব্যে, রচনায়, জীবনের দৈনন্দিন সুখ দুঃখের মধ্যে যা পান সেইটেকেই দৈনন্দিন গণ্ডীর থেকে পার ক'রে নিয়ে চিরন্তনের সুরে তাকে দেন বেঁধে। এই চিরন্তনের মধ্যে নিজের জীবনের ভাব এবং অনুভূতিকে প্রকাশ করাই কবির ধর্ম, এইরকম ক'রেই কবিরা তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির শেষ-রক্ষা করেন।

প্রথম পর্বের সঙ্গে, দ্বিতীয় পর্বের বিশেষ তফাৎ এই যে, প্রথম পর্বে কবি নিজেকে ঘোষণা করেন অর্থাৎ কারও কাছে দরদ আদায় করবার ইচ্ছেটাই তাঁর তখন প্রবল। দ্বিতীয় পর্বে কবি বেদনাকে অবিকল ব্যক্ত করেন না, তখন তিনি সৃষ্টি করবার জন্য, সুখ দুঃখের সীমাকে অতিক্রম ক'রে যান। প্রথম পর্বের মতন অন্যের কাছে নিজের বেদনার জন্য দরদ প্রার্থনা করেন না।

মানসীর প্রথম দিকের কবিতাগুলোকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা উচিত, বলা কঠিন। তাতে কবির হৃদয়ের আবেগ রয়েছে; কিন্তু কবিতার শেষ কথা তো তা নয়। হৃদয়ের আবেগ কবিতায় উপকরণ বা মশলার মতন, সেই সব উপকরণ থেকে সৃষ্টি হয় সৌন্দর্যের, সেই সৌন্দর্য-সৃষ্টি সুচারু-রূপে সম্পন্ন করলে কবি তখন ভুলে যান তুচ্ছ দিকের কথা। তখন সে সেই আবেগকে উপলক্ষ ক'রে মনের বেদনার ভিত্তি ভূমিতে সৃষ্টি করতে চান শিল্প কুশলতায় সুন্দরকে। অর্থাৎ তিনি তখন এমন শিল্প রচনা করেন যাতে তাঁর সুখ দুঃখ, সাময়িক আবিলতা-মুক্ত হয়ে চিরন্তনের বুকে গেঁথে যায় নির্মাল্যে। এই শিল্প-সৃষ্টিকে গৌণভাবে বলতে পারা যায় অটোবায়গ্রাফি, কিন্তু মুখ্যভাবে তা হচ্ছে আপনার রচনাকে, আপনার সৃষ্টিকে চিরস্থায়ী করবার আগ্রহ।

মানসীর গোড়ার কবিতা হচ্ছে সেই ভাবের আল্পনা। ছন্দের দিকে দৃষ্টি দিলে তা বোঝা যায়। তার আগে বাঙলা কবিতায় এসব ছন্দের আমদানি হয়নি। বাঙলা কাব্য পয়ার আর ত্রিপদীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে যুক্ত অক্ষরকে কবিতার মধ্যে আহ্বান ক'রে, তার ধ্বনির পূর্ণ মূল্য দেওয়া। এমনি ক'রে কাব্যে গাম্ভীর্য ও সরসতার প্রতিষ্ঠা ঘটল। বিষয় বস্তুকে কৌশলে বলাটাই হচ্ছে শিল্প রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য, বিষয়টা হচ্ছে গৌণ। কবির কলার মধ্যে থাকে চিরকালের বুকে থাকবার ইচ্ছা। দাশরথি রায়ের "অতি নগণ্য কাজে 'ছি ছি জঘন্য সাজে' ঘোর অরণ্য মাঝে কত কাঁদিলাম", ইত্যাদি এই কবিতাটিকে রিয়্যালিস্টিক বলতে পারা যায়। কিন্তু এর ভিতরে মজার কথা হচ্ছে অলংকার আর অনুপ্রাস। এই অনুপ্রাস এবং অলংকারের মধ্যে চিরন্তনের দিকে পৌঁছবার বেগ আছে। সহজ নিত্য-নৈমিত্তিক কথা বা বিষয়কে এমনভাবে বলেছেন যেন তা সময় সমুদ্রের ওপারে যাবে। নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ের কথাকে এমন ক'রেই সাময়িকতার সীমা অতিক্রম ক'রে চিরন্তনের দরবারে উপস্থিত করার ইচ্ছা সকলেরই হয়।

বেদনার কথা হচ্ছে। আজ যে বেদনা পরিপূর্ণ কাল তাই হারিয়ে যায় বিস্মৃতিতে, এইটেই সত্যিকার দুঃখের বিষয়। আজ যে সম্বন্ধে আনন্দপূর্ণ সেটা যদি যায় চ'লে বিস্মৃতিতে তবেই দুঃখ। কিন্তু এই দুঃখকে কবি শিল্প-সূত্রে রাঙা রঙ দিয়ে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন সেটা দুঃখকে উত্তীর্ণ ক'রে, চিরন্তনের বুকে নেয় চিরস্থিতির আসন।

কবিতায় যে দুঃখকে রূপ দেওয়া হয় সে দুঃখ দুঃখকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রকাশ করে নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে, এইভাবে বলাটাই হচ্ছে কথার শিল্প, সেইটে দিয়েই কবি চিরন্তনের বুকে স্থিতি দাবি করেন, সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টায়, আগ্রহে।

মানসীর গোড়ার কবিতাতে বারে বারে ভুল করবার কথা আছে, সেটা কিন্তু ধুয়োর মতন, ঐ ধুয়োর মধ্যেই কারিগরি, তারই সহায়তায় ভুলে যাবার দুঃখকে একটা সৌন্দর্যের পটে প্রকাশ করা হয়েছে। বিস্মৃতির বেদনাকে যেন পৃথিবীতে কেউ না ভুলে যায়, যেন সাহিত্যের মধ্যে সেই না ভোলবার বেদনা, সেই না ভোলবার রস যেন থেকে যায়; এমন ক'রেই কবি বলবার চেষ্টা করেছেন দুঃখের ব্যথাকে—সেই অনির্বচনীয় আনন্দকে।

কাব্যে যে বেদনা ফুটে ওঠে সে বেদনা ব্যক্তিগত নয়। বেদনার তীব্রতা যতক্ষণ না ভুলতে পারা যায় ততক্ষণ তার ভিতরকার কথা বলা যায় না। যতক্ষণ ব্যথা তীব্র হয়ে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত, তা মনকে কেমন আড়ষ্ট ক'রে রাখে, সেটার তীব্রতা ক'মে গেলে তার স্মৃতিকে ভিত্তি ক'রেই কবি তাঁর রচনা শুরু করেন। এই কারণে, টাটকা আঘাতের বিষয়টা, তাঁর হৃদয়াবেগের ধারাটা কাব্যে বিশেষ স্থান পায় না। কাজেই দুঃখকে ভুলে যাবার অর্থাৎ দুঃখের মুহ্যমান

অবস্থাকে ভোলবার অতিক্রম করবার প্রয়োজন আছে। সেটা ভুলতে পারলেই দুঃখকে সুন্দর ক'রে তুলতে পারা যায়। সময় সময় অনভিপ্রেত বিষয় ও ভাবও প্রকাশের কৌশলে কবিতায় বড় স্থান নেয়।

মানসীর দ্বিতীয় কবিতাতেও একই কথা বলা হয়েছে। ভাবের গ্রন্থি ছন্দ দিয়ে বেঁধে বেঁধে এমনভাবে আঁট করে রাখা হয়েছে যেটাতে বহু বৎসরের ঘাঁটাঘাঁটি সত্ত্বেও যেন তা অক্ষত থাকে, থাকে অমলিন। এই সময় মাথায় যেসব বিচিত্র ছন্দ এল তারই সাহায্যে আনন্দময় বাণীকে বেঁধে দেওয়া গেল। এমন কৌশলে বেঁধে দেবার চেষ্টা করা গেল যেন, কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, অক্ষয় হয়ে থাকে চিরন্তনের বুকে।

প্রতিদিনের লাভ লোকসানের দুঃখ সুখের তুচ্ছতাকে মানুষ জানে। এক দিকে মানুষের এই তুচ্ছতাময় ব্যাপার, তার অন্য দিকে আছে অনন্তকালের একটা ক্ষেত্র,—অসীমের দিকে যাত্রাপথ। অসীমকালের ইঙ্গিত মানুষকে নিরন্তর ডাক দিচ্ছে, তার প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে কত বিচিত্রতার প্রকাশে। এই সবের মধ্যেই আছে চিরন্তনের স্বাক্ষর, তাই সুন্দরের স্বাক্ষর।

এইজন্যেই দেখতে পাই, মানুষের জীবনের দুটো দিক। এক দিকে সে চায় ক্রমাগত ভুলতে জীবনের তুচ্ছতাপূর্ণ ঘটনা, বিষয়; অন্য দিকে সে চায় না ভুলতে, বেদনার স্মৃতি আনন্দকে। মানুষের মন তাকেই খুঁজে বেড়ায়, চায় তাকেই অবলম্বন করে থাকতে। সে তার জীবনের, কল্পনার অনুভূতির শ্রেষ্ঠ ধনকে, পরম সম্পদকে সেই নৌকায় তুলে দিতে চায়, যে তরণী অনন্তকালের দিকে চলে যাত্রা ক'রে, যা এঘাটে ওঘাটে আটকে পরম যাত্রার লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়।

মানুষের দুরাশা সে তার ক্ষণিক জীবনকে বেঁধে দেবে চিরকালের সূত্রে। মানুষের জীবনে, কবির জীবনে নানা রকমেই এই দুরাশা অভিব্যক্ত হয়েছে। নিজ নামে প্রতিষ্ঠিত ইমারতের গায়ে অনেকে যে নিজের নাম লিখে দেয় তার কারণ আর কিছু নয়, কারণ হচ্ছে নিজের নামকে এমন একটা কিছুর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যা তার নামের সাক্ষ্য বহন করবে চিরকালের দরবারে চিরদিনের জন্য। শাহজাহানের তাজমহলের দেওয়ালে যেসব নাম পেনসিলে লেখা হয়, তার উদ্দেশ্যের কথা তা-ই। অর্থাৎ এই অমর কীর্তির মধ্যে মিশে অমর হয়ে থাক তাদের নাম। চিরন্তনের সঙ্গে যোগ স্থাপনের এই ইচ্ছাই মানুষকে, টেনে তোলে প্রতিদিনের তুচ্ছতা থেকে।

একটা কথা তোমরা মনে রেখো, বেদ উপনিষদের মন্ত্রাদির একটা গভীর অর্থ ছিল। মন্ত্র কেবল বাক্য নয়, সেটা ধ্বনি। ধ্বনি বাক্যের চেয়ে বড়। ধ্বনি ক্রমাগত মনকে জাগায়। শব্দার্থ সীমাবদ্ধ, ধ্বনির অনুরণন অসীম। নিরন্তর মনকে নিয়ে যায় সেই ধ্বনি। ধ্বনির কোনও সীমা নেই ব'লেই সে ক্রমাগত মনকে চালায়। লৌকিক প্রয়োজনের বাহন হচ্ছে ছন্দ। ছন্দ বাণীকে দেয় ধ্বনি, সে ধ্বনি অর্থ-জড়িত নয়। ছেলেদের জন্য ছড়াগুলির কথা ভেবে দেখ। এটা গোড়া থেকেই হয়ে এসেছে যে, তাদের মন ভোলাবার জন্য শব্দ দ্বারা ক্রমাগত ধ্বনি সৃষ্টি ক'রে রসে পূর্ণ এক রকমের ছবিকে তাদের মনে জাগানো হয়। এইজন্যেই বলছি সাহিত্যে গোড়া থেকেই ধ্বনির ব্যবহার হয়েছে।

কবির হাতে সেই ছন্দের ব্যবহার। মানুষের মনের সাধারণ দুঃখ সুখের কথা নিয়েই ছন্দে বদ্ধ হয় বাণী, সেই ছন্দের শব্দ বাণীকে প্রকাশ করার জন্য হয় মন্ত্র, তার সুরে তালে লয়ে। কেননা ধ্বনি প্রবহমান এবং অর্থাতীত। মনে যদি বাজাতে চাও বচনাতীত বিষয় তাহলে ছন্দের আশ্রয় নিতে হয়। এইজন্য কবিরা তাঁদের বাণীকে সৃষ্টিকে রক্ষা করেছেন ছন্দে ধ্বনিতে। এইরকম ক'রেই ছন্দের দ্বারা সৃষ্টি স্থায়িত্ব লাভ করেছে। কবিও তাঁর বাক্যকে স্থায়ী করে রাখতে চান ছন্দের দ্বারা স্পন্দিত ক'রে।

এইরকম ক'রে রাখবার প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে কবির আনন্দ। সুতরাং কবি তাঁর কবিতায় যা বলেন সেটা তাঁর অটোবায়গ্রাফি বললে ভুল করা হবে, সেটা অটোবায়গ্রাফি নয়। কাব্য রচনায় আসলে প্রধান হচ্ছে কবির আনন্দ, বর্ণনীয় বিষয়টা গৌণ।

'মানসী' রচনার সময় আমি ছিলেম গাজীপুরে। গোলাপের জন্য গাজীপুর বিখ্যাত। কিন্তু সে গোলাপ থাকে না কবিদের প্রিয়কুঞ্জবনে—থাকে ব্যবসায়ের ছাঁদে। কিন্তু গোড়ায় আমি ভেবেছিলেম আমি যাচ্ছি সেই গোলাপ-নিকেতনে যেখানে বুলবুল গান গায়, সাদী এবং হাফেজ যেমন ক'রে মুগ্ধ হতেন আনন্দ পেতেন পারস্যের গোলাপ কুঞ্জে, ভেবেছিলেম তেমনি ক'রে আমার দিন কাটবে গাজী-পুরের গোলাপ কুঞ্জে। কিন্তু যা দেখলাম সেটা কল্পিত রূপের ঠিক উলটো। কিন্তু সেখানকার গোলাপ কুঞ্জের অবস্থা যাই থাক আমার মনের ইচ্ছার মধ্যে যে আনন্দ নিয়ে গিয়েছিলেম, তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি, আনন্দ ছিল। সেই আনন্দই মানসীর কাব্যে ধরা দিয়েছে, নিজেকে প্রকাশ করেছে ছন্দে। বুলবুলের মতন কিংবা সেই কবিদের মতন সেই আনন্দই মন্দ্রিত হয়েছে ছন্দে, ছন্দের ধ্বনিতে।

সে সময় কত রকমের ছন্দ গুঞ্জরিত হয়েছিল আমার মাথায়। এইসব ছন্দের লীলাভূমি হচ্ছে সাংসারিক বিষয়। কিন্তু তবু বিষয়টা হচ্ছে গৌণ, বলবার ভঙ্গীটাই হচ্ছে আসল। গোলাপের প্রতি টানটা শেষ পর্যন্ত একটা মনের আনন্দে পরিণত হ'ল তার অনির্বচনীয়তায় ভ'রে উঠল 'মানসী'র ছন্দের সাজি।

হঠাৎ গ্রীষ্মের সময় বেল ফুলে ভ'রে উঠল বেলের গাছ। হঠাৎ পুষ্প ব্যতীত অনির্বচনীয় রসকে প্রকাশ করা যায় না তাই প্রকৃতির নিয়ম এইরকম। তেমনি মানুষও মনের আনন্দের মুকুলকে মুঞ্জরিত করে নিজের মাধুর্যে। কবি দিতে চান ছন্দে তাঁর বাণীকে ঐ রকমে পুষ্পিত ক'রে।

মানসীর প্রথম দিকের অনেক কবিতায় মনে হবে আত্মজীবনের প্রেরণা আছে, এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ

(শেষাংশ ২২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতের তোরণদ্বারে সংগ্রাম

ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার পূর্বভাগে সামরিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। লিবিয়াতে ইটালি রণসজ্জা করিতেছে। ইটালির সেনাধ্যক্ষ মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি তিন লক্ষ সৈন্য লইয়া নাকি আফ্রিকার উপকূলে শক্তিপরীক্ষা করিতে নামিয়াছেন। তাঁহার এই সেনাদল আধুনিক সমরসজ্জায় সজ্জিত এবং মরু-সংগ্রামে তাহারা সুদক্ষ বলিয়া প্রতিপক্ষ স্পর্ধা করিতেছে। সোমালিল্যাণ্ডের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মিশরে সমরাশঙ্কা দেখা দিয়াছে। মুসোলিনি এবার সুয়েজ খালের দিকে ধাওয়া করিবেন, সমর-নীতিজ্ঞদের এইরূপ বিশ্বাস। মিশরের প্রধান মন্ত্রী সাবরে পাশা সেদিন ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইটালি যদি মিশর আক্রমণ করে, তাহা হইলে মিশর ইটালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, মিশর গভর্নমেণ্ট শত্রুর সঙ্গে বুঝাপড়া করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপেই প্রস্তুত আছেন। সুয়েজ খালের জন্য মিশরের সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী, সুয়েজ খাল এবং লোহিত সাগর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়; ব্রিটিশের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের ইহা প্রধান সংযোগ সূত্র বলা যাইতে পারে; সুতরাং এই সুয়েজ খালের নিরাপত্তাকে ইংরেজ কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। ইটালি এই দিকে কোন উদ্যম করিতে গেলে প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হইবে।

ইটালি কর্তৃক সোমালিল্যাণ্ড দখলের গুরুত্ব ভারতের দিক হইতে বিশেষভাবে রহিয়াছে। আজ যুদ্ধ ভারতের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড পূর্বে এডেনের ন্যায় ভারত গভর্নমেণ্টেরই শাসনাধীন ছিল। ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী বারবারা এডেনের ঠিক বিপরীত দিকে আফ্রিকার উপকূলভাগে অবস্থিত। এডেন
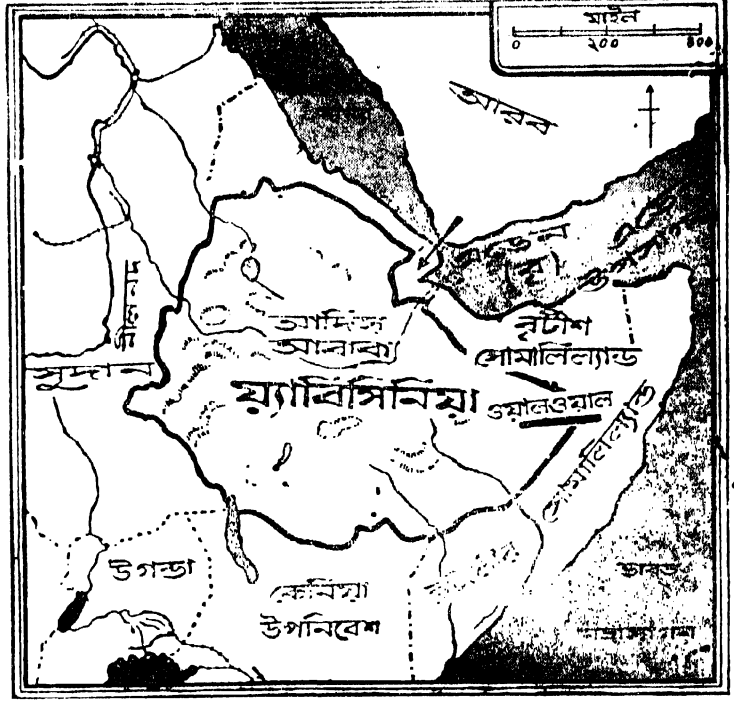
এবং বারবারার মধ্যে ব্যবধান মাত্র ১৫০ মাইল। এডেনকে সামরিক দিক হইতে ভারতের তোরণ বলা হইয়া থাকে। যদি এডেন ভারতের তোরণই হয়, তাহা হইলে সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী বারবারা সেই তোরণের একটি স্তম্ভ বলা চলে। সোমালিল্যাণ্ড বর্তমানে আর ভারত গভর্নমেণ্টের শাসনাধীনে
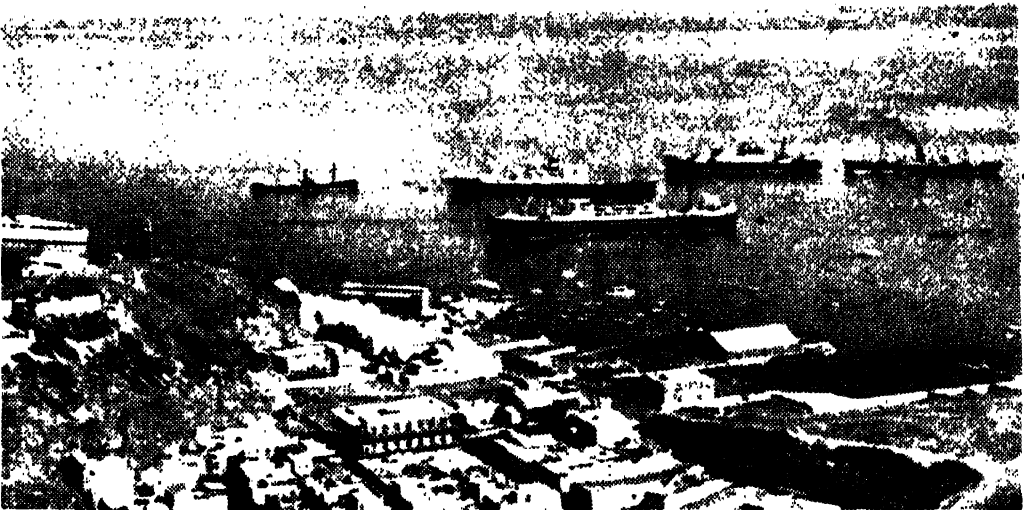
এডেন শহর। প্রহরীর ন্যায় ভারতের পথ রক্ষা করিতেছে

নাই, ইহা ব্রিটিশ উপনিবেশ বিভাগের অধীন ছিল; তাহা হইলেও এইখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত ভারতবাসীদের হাতেই ছিল।

স্পেনীয় মরক্কোর জিব্রালটার এবং সিউটার বন্দর হিসাবে সামরিক গুরুত্ব যেরূপ, এডেন এবং বারবারার সামরিক গুরুত্বও কতকটা সেইরূপ। জিব্রালটার এবং সিউটা ভূমধ্যসাগর হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের সংযোগ সূত্র স্থলে অবস্থিত, সেইরূপ এডেন এবং বারবারা লোহিত সাগর এবং ভারত মহাসাগরের মোড়ের মুখে অবস্থান করিতেছে; সুতরাং সামরিক দিক হইতে ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। সামরিক গুরুত্ব এই দুইটি স্থানেরই আছে। ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডকে ইংরেজকে ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে, কিন্তু ইংরেজ এডেনের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখিতে

সুয়েজ খাল। এই খালে প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় ইটালি ও আবিসিনিয়ার যোগ ছিন্ন হইয়াছে।

বাধ্য হইবে; শুধু তাহাই নহে, ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড ইটালি সাময়িকভাবে অধিকার করিলেও; এডেনের বিপরীত তটবর্তী এই বন্দরটি ইংরেজ কিছুতেই শত্রুপক্ষের হাতে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না। ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড পুনরধিকারের প্রচেষ্টায় তাহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবেই।

ফ্রান্সের বিপর্যয়ের পর আবিসিনিয়ার দিকে ইটালি এক রকম নিরঙ্কুশ হয়, জিবুতি শহরটি তাহাদের দখলে যায়। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড তিন দিক হইতে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। সোমালিল্যাণ্ডে ইংরেজের বেশী সৈন্য ছিল না, একটি কেল্লায় কিছুমাত্র সৈন্য ছিল; এই সেনাদল সোমালিল্যাণ্ড উষ্ট্রবাহিনী এবং কিংস আফ্রিকান্ রাইফেলস নামে অভিহিত। এই সেনাদল সুসজ্জিত এবং সুশিক্ষিত হইলেও শুধু অভ্যন্তর শান্তিরক্ষার পক্ষেই উপযুক্ত ছিল, ইটালির বিপুল বাহিনীকে বাধাদানের শক্তি তাহাদের ছিল না। ইটালির প্রথম বাহিনীর প্রায় দশ হাজার সেনা ফরাসী অধিকৃত সোমালিল্যাণ্ডের সীমানা ধরিয়া আসিয়া প্রথমেই জেইলা বন্দরটি দখল করে। পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, হোর-নাভাল চুক্তির সময় এই বন্দরটি ইটালিকে ছাড়িয়া দিবার জন্য ইংরেজ পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল। জেইলা বন্দর হইতে ইতালীয় সেনাদল সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া বারবারার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ব্রিটিশ পক্ষ হইতে বারবারার কাছে প্রবল সংগ্রাম চালাইতে হয়; কিন্তু শত্রু-পক্ষের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিবার পর ব্রিটিশ বাহিনী সমুদ্রপথে বারবারা পরিত্যাগ করিয়া আসে। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের পতনের পরই উত্তর আফ্রিকার সামরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। টিউনিসের দিক হইতে ইটালি নিরঙ্কুশ হইয়া লিবিয়াতে জোর পায় এবং ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড হইতে নিরঙ্কুশ হইয়া সোমালিল্যাণ্ড এবং আবিসিনিয়াতে সে জোর পায়। লিবিয়ার দিক হইতে মিশর পাছে আক্রান্ত হয়, সেজন্য ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডের দিকে সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না, কারণ ইটালির বিরুদ্ধে লড়াই চালাইবার পক্ষে সামরিক গুরুত্বের দিক হইতে মিশরের স্থান অনেক মূল্যবান, সোমালিল্যাণ্ডের সেরূপ গুরুত্ব নাই। সব দিককার অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড পরিত্যাগ করা একরূপ স্থিরই করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, শত্রুপক্ষের ক্ষতি সাধন করা; সোমালিল্যাণ্ডে অবস্থিত ব্রিটিশ সেনাদল, বিমানবহর এবং ব্রিটিশ নৌবহর ইহাতে অনেকটা কৃতকার্য হইয়াছে বলিয়াই ব্রিটিশ সমরনায়কদের বিশ্বাস।

এডেন বন্দরই যে ইটালির প্রধান লক্ষ্য, ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। ইটালি সঙ্গে সঙ্গে বিমানপথে এডেনে হানাও দিতেছে; কিন্তু যে পর্যন্ত সমুদ্রপথে ইংরেজের

(শেষাংশ ২৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মানুষের ঘর

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীহাসিরাশি দেবী

যে দৃষ্টিতে ইন্দু অবিনাশের দিকে তাকিয়ে ছিল, সে দৃষ্টি কেমন যেন অসহ্য ব'লে বোধ হচ্ছিল অবিনাশের। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ব'স।" ইন্দু বসল না, আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে খাটের বাজু ধরে দাঁড়াল। হঠাৎ বললে, "একটা সত্যি কথা বলবে?"

"কি, বল।"

"কি জন্যে হঠাৎ তুমি আজ বাড়ি ফিরলে?"

"ও, এই কথা?" অবিনাশ আবার অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করল, "দেখ বউ—"

"বল।"

"আমার সম্বন্ধে এইসব অবান্তর কথা জিজ্ঞাসা না করলেও তো চলে।"

ইন্দু উত্তর দিল না এ কথার। অবিনাশের কণ্ঠস্বর যেন ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে উঠছিল। বললে, "তোমার পক্ষে ভালো কি জান, আমার সম্বন্ধে মাথা মোটেই না ঘামানো।" ইন্দু আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে না, নীরবে ঘর ছেড়ে বা'র হয়ে গেল। অবিনাশও তাকে আর ফিরে ডাকলে না, খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে নেবা চুরুটটাকে আর একবার ধরিয়ে নিলে।

(১৬)

আদুকে গান শেখানোর কাজটা গিয়ে পর্যন্ত সরোজ যেন নিজেকে কেমন একরকম বেকার ব'লেই মনে কচ্ছিল দিনরাত। হাতে আর যেন কোনও কাজই নেই, অখণ্ড এই অবসরকে সে পূর্ণ করবে কি দিয়ে! খবরের কাগজের কর্মখালিগুলোয় দিলে পত্র লিখে; জানা, চেনা যারা যেখানে ছিল তাদের কাছেও চাকরির আশায় গিয়ে দাঁড়াল ভিক্ষার্থীর মত। যেন চাকরি ছাড়া তার জীবনে আর কোনও উদ্দেশ্য, কোনও কাজই আর নাই। কি করবে সে? কেমন ক'রে পূর্ণ করবে তার এই নিরবচ্ছিন্ন ক্লান্তিকর অবসরকে?

ইন্দু কিন্তু বুঝলে অন্যরকম। কথায় কথায় বললে, "আচ্ছা সরোজ, শুনেছি আদুর বাপের বাড়ি এখান থেকে বেশী দূরে নয়।"

সরোজ চেয়ে রইল ইন্দুর মুখের দিকে। বললে, "শুনেছি বটে, কিন্তু সে খবরে আমাদের দরকার?"

ইন্দু বললে, "বিশেষ কিছু নয় বটে, কিন্তু সেখানে একটু খোঁজ নিলে হয় না?"

সরোজ বুঝলে যেমন ক'রেই হ'ক আদুর অন্তর্ধানের কথাটা ইন্দুর কানে উঠেছে; তবু না জানার ভান ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "কিসের খোঁজ?"

"আদুর।"

সরোজ চুপ ক'রে রইল। ইন্দু বললে, "মানুষের সঙ্গে মানুষের সামান্য জানা শোনা, এমন কি মুখ চেনা থাকলেও মানুষে তার বেদনায়, তার দুঃখে সহানুভূতি দেখায়, সাহায্যও করে যতটুকু তার ক্ষমতা। তাই বলছি সরোজ, আমার কথাটাকে তুমি ভুল বুঝো না।"

"ভুল!" সরোজ হাসতে চেষ্টা করল; "মামীমা, সব মানুষকে তুমি এখনও চেন নি।"

"কেন?"

"চিনলে এ কথা বলতে না।"

একটু থেমে বললে, "মানুষ দেবতা নয়, দানবও নয়, এ কথা সত্যি, কিন্তু ওই দুই প্রকৃতিই যে মানুষের কাঁধে ভর ক'রে সময় সময় তাকে দুইরও অতীত ক'রে তোলে তা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করে না। আমিও হয়তো করতুম না, কিন্তু সেদিন মামাবাবু আমার সে ভুল ভেঙ্গে দিয়েছে।"

যে কথা ইন্দু বলবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, হঠাৎ ভুলে গেল সেকথা, মুখখানা তার বিবর্ণ হয়ে উঠল; সরোজের যে ভুল অবিনাশ ভেঙ্গেছে, সেই ভুল ভাঙ্গার উপরেই নির্ভর করছে অবিনাশের হঠাৎ এখানে আসা। মনের যে তন্ত্রীতে মৃদু স্পর্শ লাগলেই ঝংকৃত হয়ে ওঠে, সেই তন্ত্রীতেই ইন্দুর স্পর্শ লেগেছিল বোধ হয়, তাই সে কথা বলতে চাইলেও পারলে না। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যাবার পরে ইন্দু যেন হঠাৎ চমক ভেঙ্গে ডাকলে, "সরোজ!"

"কেন মামীমা?"

"আমার মনে হয় তুমি মিথ্যে বলছ।"

"মিথ্যে?" সরোজ করুণ হাসি হাসলে; "তুমি তা হ'লে আমার সম্বন্ধে কিছুই জান না মামীমা, বরঞ্চ তোমার চেয়ে আদু জানে। যদি কোনওদিন তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়—", একটু থেমে বললে, "তবে তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রে জেনো।"

ইন্দু জবাব দিলে, "কিন্তু সে আশা তো সুদূরপরাহত, তার আগে তুমিই ব'লে ফেল না।"

সরোজ মুহূর্তের জন্য কি ভেবে নিয়ে বললে, "সে এসেছিল আমার কাছে, কিন্তু আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি।"

"ফিরিয়ে দিয়েছ? কাকে?"

"আদুকে।"

ইন্দু চমকে উঠল। সরোজ বললে, "শুধু তাই নয়, তার পিসীও আমায় লোভ দেখিয়েছিলেন তাঁর বিপুল সম্পত্তির।"

ধীরে ধীরে ইন্দুর ওষ্ঠাধরে শ্লেষের হাসি ভেসে উঠল; "তুমি তা হ'লে নিজেকে একেবারে আদিম আমলের দেবব্রত ক'রে তুলেছ বল!"

সরোজ উত্তর দিল না। ইন্দু বললে, "ত্যাগের সিংহাসনে সেই মহান আদর্শকে স্থাপন করলেও, মানুষের জীবনে, দুঃখ সুখের সংসারে তার শ্রেষ্ঠত্ব আমি মানতে পারি নে সরোজ। কোথায় যেন একটা অসম্পূর্ণতা, একগুঁয়েমির ব্যর্থতা সমস্ত অনুভূতিকে আঘাত করে।"

"অর্থাৎ তুমি কি বলতে চাও?"

"আমি বলতে চাই একেবারে জলের মত সোজা কথা, যার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ নেই।"

"সেই সোজা কথাটাই তো জানতে চাই সরল ভাবে।"

"অর্থাৎ আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়তাম, তা হ'লে আদুকে কখনও ফেরাতাম না, গ্রহণ করতাম অন্তরের ধর্মকে সাক্ষী ক'রে।"

সরোজ চুপ ক'রে বসে রইল, কোনও উত্তর দিলে না এ কথায়। ইন্দু বললে, "কারণ আমি মনে জানি, যা আমার পক্ষে চরম সত্য, তাকে অস্বীকার করবার মত খেয়ালকে প্রশ্রয় দেওয়াও মহা অপরাধ।"

ইন্দু আর একটু এগিয়ে এলো।—"সরোজ!"

"কেন মামীমা?"

"আমার এখনও কী ইচ্ছে হয়, জান?"

"কি?"

"তাকে ফিরিয়ে আনবার; তাকে—"

সরোজ চঞ্চল হয়ে উঠল, হয়তো এখনই আবার কোন্ কথা সে ব'লে বসবে। মুহূর্তের জন্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেদিনের স্মৃতি। শারদার মুখেও এই অনুরোধ, চোখে এই মিনতিরই প্রতিচ্ছবি, কাতরতা।

সম্পত্তির প্রলোভন! অবিনাশের পদাঘাত! তার পরে আজ এই কয়দিন কেটে গেছে; বেশী দিন নয় তবু সরোজ সেই যে শারদার বাড়ি ছেড়ে বার হয়েছে আর সে বাড়িতে যায় নি, জিজ্ঞাসাও করে নি কারও কাছে শারদার খবর। কিন্তু তবু ওপথে যাবার কথা মনে হ'তেই মনে পড়ে শারদার কথা, আদুর কথা। সরোজের মুখের উপর তার মনের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠেছিল কি না কে জানে, ইন্দু সে দিকে তাকিয়ে আগের কথার সূত্র ঘুরিয়ে দিলে। বললে, "তোমার মামা বাড়ি ফিরে এসেছেন, জান?"

সরোজ চমকে উঠল;—"কবে?"

"কাল।"

নিজের অজ্ঞাতেই সরোজের মুখ থেকে বার হয়ে এল, "আর মামীমা?"

ইন্দু বললে, "তা তো কিছু বলেন নি তিনি।"

সরোজ চুপ ক'রে গেল। এ সম্বন্ধে আর কোনও কথাবার্তা বলার মত ইচ্ছা তার ছিল না। আজ চার পাঁচ দিন আগে, তুচ্ছ কারণে অবিনাশের যে মূর্তি সে প্রকাশ হ'তে দেখেছে সে মূর্তির কথা সে এত তাড়াতাড়িই ভুলতে পারছিল না; একটা বেদনাময় স্মৃতি তাকে অভিভূত ক'রে ফেললে ক্ষণেকের জন্য। কি ভেবে সে বার হয়ে পড়ল চটি পায়ে দিয়ে। বললে, "একটু ঘুরে আসি।"

বাড়ি ছেড়ে সে বার হয়ে পড়ল সত্যি, কিন্তু কোথায় সে যাবে? ভেবে ঠিক করতে না পারলেও সামনের পথে এগিয়ে চলল দ্রুত পায়ে। চারিদিকে রৌদ্রের উজ্জ্বলতা, চোখ যেন ঝলসে যায়, শুধু মাঝে মাঝে বড় বড় বাড়িগুলোর ছায়া পড়ে।

সরোজের চলার গতি ক'মে এল, এসে দাঁড়াল শারদার বাড়ির সামনে, তার পরে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

সম্মুখে দাঁড়িয়ে শারদা। পরনে তার লালপাড় শাড়ি, হাতে শাঁখা। সদ্যস্নাত তার চুলগুলো কাঁধে, পিঠে, বাহুর উপরে লুণ্ঠিত। সমস্ত মুখে এমন একটা ক্লেশের ছায়া, যা সরোজকেও বিস্মিত করলে। কিন্তু সাহস ক'রে কোনও প্রশ্নই করতে পারলে না সে তাকে।

শারদা বললে, "তুমি এসেছ সরোজ, ভালই হ'ল, ভাবছিলাম আবার বুঝি তোমায় ডেকে পাঠাতে হবে।"

"কেন মামীমা?"

"ঘরে এস বলছি।"

শারদার অনুসরণ ক'রে সে তার শোবার ঘরে এসেই বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল। কোথায় গেল ঘরের সেই সাজসজ্জা, সেই শোভন সরঞ্জাম? এ যে শারদার মতই অত্যন্ত সাধারণ, আভরণহীন। সরোজকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শারদা হাত বাড়িয়ে একখানা জলচৌকি টেনে পেতে দিলে, বললে, "বস।"

"বসছি; কিন্তু চারিদিকে তাকিয়ে আমার যেন কেমন ধাঁধা ব'লে ঠেকছে মামীমা।"

"কি রকম?"

সরোজ হাসতে চেষ্টা করলে, কষ্টকর হাসি; "এই দেখ না তুমিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ! তার পরে তোমার ঘরের, বাড়ির—ঝি, চাকর, ঠাকুর, দারোয়ান সবগুলোই কি একসঙ্গে চ'লে গেছে?"

হাসিমুখে শারদা উত্তর দিলে, "না বাবা, তারা কেউই স্বইচ্ছেয় আমায় ছেড়ে যায় নি, আমিই বিদায় দিয়েছি সকলকে, মিছামিছি কতকগুলো লোকজন পুষে বাজে খরচ করার চেয়ে তাদের জবাব দেওয়াই ভাল নয় কি?"

"কিন্তু কাজ?"

"ভুল করছ সরোজ, মানুষ কমলে কাজও ক'মে যায়। আর অবশিষ্ট যা আছে তা কি আমি সম্পূর্ণ করতে পারব না? আর, আমি তো চিরদিনই এমন ভাবে কাটাই নি সরোজ!"

সরোজ বুঝলে আজ তার প্রশ্নের কি জবাবদিহি শারদা করতে চায়। কিন্তু জবাব তার যা-ই হ'ক, আজ সে জবাব শোনবার ইচ্ছা সরোজের ছিল না, ধৈর্যও ছিল না ততক্ষণ অপেক্ষা করবার। প্রশ্ন করল; "কিন্তু আমাকে কি বলবে বলেছিলে না?"

শারদা বললে, "হ্যাঁ!"

জানালা দিয়ে বাইরের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, "কিন্তু এখন তো বেশ বেলা হয়েছে সরোজ, যদি তোমার আপত্তি না থাকে তা হ'লে এখানে থেকে দুটো খাওয়া দাওয়া করলে চলত না? রান্না তৈরী।"

সরোজ বুঝলে শারদা আজ তাকে অনুরোধ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে। হয়ত এ কুণ্ঠার কারণ তার নিজের দিক থেকেই সে প্রকাশ করেছে, কিংবা সেদিন সেই অবিনাশের ব্যাঙ্গোক্তিই শারদার এই কুণ্ঠার কারণ। কিন্তু একেই নির্বিবাদে স্বীকার করা তো সরোজের পক্ষে সাজে না! যার কাছে সে এত দিন অসংকোচে আবদার করেছে, কেড়ে

খেয়েছে, তার এ সংকোচ যেন সরোজের উপর শাস্তিদান ব'লেই মনে হ'ল। সরোজের সমস্ত মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল এই বেদনাঘাতে; বললে, "মামীমা।"

"কেন বাবা?"

"মামা তোমার সঙ্গে যেমন ব্যবহারই করুন, আমি যে তোমার কাছে স্নেহের দাবি ক'রেই এসেছি এত দিন, এ কথা বোধ হয় অবিশ্বাস কর নি?"

"আজও তো করছি না সরোজ।"

"তবে আদেশ না ক'রে অনুরোধ করছ কেন?"

চির পুরাতন সেই শান্তহাসির রেখা ভেসে উঠল শারদার মুখে; বললে, "ভুলও তো মানুষে করে সরোজ। ভুল করাই তো মানুষের স্বভাব। তবে তার উপরে সন্দেহ কেন?"

সরোজ চুপ ক'রে রইল; শারদা ব'লে যেতে লাগল, "ভুল হয়তো আমিও করেছি, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্তও আমাকেই করতে হবে। তাই ভেবেছিলাম তোমাকে একবার ডেকে পাঠাবার কথা। কিন্তু ভগবানের দয়া, তাই তোমায় না ডাকতেই দরজায় এসে দাঁড়ালে।"

একটু থেমে আবার বললে, "আমি কিছু দিনের জন্যে এখান থেকে চ'লে যাব সরোজ, তোমায় তাই দিয়ে আসতে হবে।"

"আমাকে? কোথায়? কত দিনের মত?"

শারদা বললে, "কতদিনের মত তা ঠিক বলতে পারি নে বাবা, তবে কোথায় তা বলতে পারি।"

"বেশ, তাই বল।"

"বেশী দূরে নয় সরোজ, ভয় নেই তোমার। কারণ লোকে যেমন সময় সময় তুচ্ছ কারণকে বড় ক'রে সংসার ছেড়ে তীর্থযাত্রী হয়, আমাকে তুমি সে প্রকৃতির মনে ক'রো না। সংসার ছেড়ে আমি কোনও দিন কোথাও যাব না এটা ঠিক জেনো। এই সংসারেই জড়িয়ে থাকব, নানা কাজের মধ্যে রাত্রিদিন ডুবে থাকব, এই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় আশা, বড় প্রার্থনা। কিন্তু এখানে আর নয়; নতুন জায়গায়, নতুন সংসার গড়িগে। তাই বলছি আমি এখান থেকে যাব; কিন্তু বেশী দূরে নয়, মাত্র কয়েকটা স্টেশন পরে, আমার শ্বশুরের প'ড়ো ভিটেয় আবার নতুন ক'রে সংসার পাততে।"

"কবে যাবে?"

"আজই; যাবে সরোজ আমাকে পৌঁছে দিতে?"

সরোজ শঙ্কিত হয়ে উঠল; "কিন্তু মামা যদি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন?

"বলবে জানি না; আমার সম্বন্ধে তুমি কিছু জান না।"

অবিনাশের সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে শারদার মুখের সে কোমল ভাব মুছে গিয়ে হয়ে উঠল কঠিন ও বিষণ্ণ। সরোজ চুপ ক'রে ব'সে রইল অবসন্ন ভাবে।

পড়ন্ত বেলায় সে যখন বাড়িতে না জানিয়ে, কাউকে কিছু না ব'লেই শারদার সঙ্গে ট্রেনের একটা কামরায় উঠে বসল তখন নিস্তেজ রৌদ্র মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আলোছায়ার খেলা খেলছিল রেল লাইনের দুই পাশে, ফসলশূন্য ধান-খেতে। ট্রেন হু হু ক'রে ছুটে চলেছিল।

দুই পাশে কোথাও জলা, কোথাও গ্রাম, উঁচু, নীচু-বাগান, মাঠ পার হয়ে তারা যে স্টেশনটায় এসে নামল সেটা একটা ছোট স্টেশন। যাত্রী কম, তবে দুই একখানা গরুর গাড়ি স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছে দেখা গেল। স্টেশনের বাইরেই একটা বড় বট গাছ; জ্ঞানবৃদ্ধের মত বহুকাল থেকেই দাঁড়িয়ে আছে হয়তো ওইখানে। পাতায় পাতায় তার সূর্যাস্তের শেষ আলোটুকু এসে পড়েছিল; তারই নীচে গিয়ে দাঁড়াল শারদা আর সরোজ।

মোটগুলো আনিয়ে গাড়িতে তুলে গাড়োয়ান ওদের পরম খুশী মনে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে গাড়ি ছাড়লে। অনেক দূরে যেতে হবে, প্রায় সাত ক্রোশ। পৌঁছতে রাত হবে অনেক। গাড়ির এক দিকে একখানা চাদর বিছিয়ে দিয়ে শারদা বললে, "শুয়ে পড় সরোজ, রাত জেগো না; সে অভ্যাস তোমার নেই।"

(১৭)

এত দিন পরে, এত ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এসেও হঠাৎ যেদিন মানিক সদুর মুখের উপরেই ব'লে বসল, "আদুকেই আমি বিয়ে করব", সেদিন সদু বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'লেও, যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই আদু কিন্তু শুনে এতটুকুও বিস্মিত হ'ল না। বিস্মিত না হবার মত হয়তো তার কিছু কারণ ছিল, কিংবা ছিলই না, কিন্তু মানবমনের অস্থিরতাটুকু যে ভাবে তার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিল এটাকে সে নিরর্থক মনে করতে পারছিল না।

হয়তো অনেকের সঙ্গে মিশবার তার সুযোগ হয় নি, কিন্তু সরোজের সঙ্গে সে মিশেছিল। তাকে চেনবার যতখানি সুযোগ সে পেয়েছিল, তাই তার এ জীবনের পক্ষে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। এর পরে যেন আর কিছু তার জানবার ইচ্ছা ছিল না, এখনও নেই।

মানিকও সেই মানুষ, তাই পৌরুষের অহংকার হয়তো তার মনেও বদ্ধমূল। সুতরাং আদু তাকেও শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পারে না কেমন একটা অক্ষমতার অভিমান তাকে সমস্ত পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে ঘিরে রেখেছে। এ আবেষ্টনী ছাড়াবার শক্তির আজ তার অভাব, নিতান্ত অভাব। চারিদিকের এত অবিশ্বাস কাটাবার মত তার যুক্তি কই, তর্কের ধৈর্যেরও অভাব।

আদু আর ভাবতে চায় না, তাই একটার পর একটা টেনে আনে সংসারের খুঁটিনাটি কাজ। অন্নদা সন্তুষ্ট হয় তার কথায় বার্তায় কাজে কর্মে। কিন্তু বিপিন কি যেন ভাবে। কি যেন সে আদুর হয়ে সকলকে বুঝিয়ে বলতে চায় কিন্তু পেরে ওঠে না। মেয়ের মলিন বিষণ্ণ মুখ, কাতর দৃষ্টি যেন তাকে অনুরোধ জানায় নীরব থাকতে।

সেদিনও সে ব'সে এই কথাই ভাবছিল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অন্ন আদুকে নিয়ে ঘাটে গেছে কাপড় কাচতে, বাড়ি জনশূন্য। শুধু বিপিনের তামাক খাওয়ার একটানা শব্দ নিস্তব্ধ বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। বিপিন ভাবছিল

অনেক কিছু। হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ না ফিরিয়েই সে জিজ্ঞাসা করলে "কে?"

"আমি।"

এ কণ্ঠস্বর চেনা। বিপিন চমকে উঠল; "কে মানিকের মা?" হঠাৎ তুমি যে? কি মনে ক'রে?"

সে ফিরে বসল; হাতের হুঁকোটা নামিয়ে রেখে বিস্মিত দৃষ্টি পাত করল সদুর মুখের দিকে। সদু তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটু তফাতে বসল, জিজ্ঞাসা করল, "এরা সব গেল কোথায়?"

"ঘাটে।"

"ভালই হ'ল আদুর বাপ। তুমি তো আর ভুলেও ও পথ মাড়াও না, তাই আমিই এলাম তোমায় একটা কাজের কথা বলতে। বল, রাখবে আমার কথা?"

বিপিন বিস্মিত হয়েছিল আগে থেকে, এখন একটু কৌতুক অনুভব ক'রে হেসে ফেললে। বললে, "কথাটা কি তোমার, তাই আগে শুনি!"

"কথা নতুন নয় নেহাত; তুমিও যে একেবারেই না জান তাও নয়।"

"তবে?"

"তবে আর কিছু নয়, তোমার আদুকে আমায় দিতে হবে মানিকের জন্যে।"

"ও, এই কথা?"

কথাটা যেন উপেক্ষা ভরে উড়িয়ে দিয়েই বিপিন নামানো হুঁকোটা আবার তুলে নিলে। হাতের এক পিঠে কলকের আগুনটা পরীক্ষা ক'রে বললে, "এ তো নতুন কথা কিছু নয় মানিকের মা। বরঞ্চ এত পুরনো—মনে হয় যে, কথাটা শোনাও যত সহজ, না শোনাও তেমনি। ওর মধ্যে ভিন্ন ভেদ কিছু নেই।"

সদু, বিপিনের এ উত্তরে মনের চাঞ্চল্য গোপন করতে পারে না, প্রশ্ন করলে, "তবে তুমি আমার কথা রাখতে চাও না?"

"কে বললে।"

"বলে নি বটে কেউই, কিন্তু তোমার আচার ব্যবহার, ভাবভঙ্গি সেই উত্তরই দিচ্ছে আদুর বাপ। কিন্তু এসব বাজে কথায় আমার কথা কাটলে চলবে না, সত্যি বল, আমার কথা রাখবে না?"

তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল, বিপিন কিন্তু নির্বাক। কথা বলতে যেন ভুলেই গেছে সে। সদু আবার বললে, "আদুর বাপ, বল, আমার কথার উত্তর দাও।"

সদুর গলার স্বর কাঁপছিল উত্তেজনায়। বিপিন দৃঢ়স্বরে বললে, "উত্তর তো অনেক দিন আগেই দিয়েছি সদু, সে উত্তর আজ মনে নেই: নতুন কিছু বল।"

বিপিনের মুখের উপর যে বেদনাময় হাসিটুকু ফুটে উঠল সেটুকু সেই সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে সদুর চোখে ধরা পড়ল না। সে যেমন উত্তরের অপেক্ষায় আগ্রহাকুল চোখে বিপিনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল তেমনি তাকিয়েই রইল। বিপিন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "সত্যি কথা শুনবে সদু?"

"বল।"

"অনেক দিন আগে তুমি যেদিন প্রথম আদুকে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছিলে, সেদিন আমার কি মনে হয়েছিল জান? মনে হয়েছিল সে আমার সৌভাগ্য; কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে এ প্রস্তাবটা তোমার তরফ থেকে নতুন ক'রে না শোনাই যেন আমার পক্ষে ভাল।"

"কিন্তু আদুর বাপ—" সদু এবার তার ধরা গলাটা একটু কেশে পরিষ্কার ক'রে নিলে; "কিন্তু আদুর বাপ, আমার যে আর উপায় নেই!"

সদুর কথায় যেন কান্না ঝরে পড়ল; "আমার যে আর উপায় নেই আদুর বাপ। মানিক যে আদুকেই বিয়ে ক'রতে চায়। আমার মানিক—তাকেই উপলক্ষ ক'রে আমার মনে মনে আঁকা সাজানো সংসার—সব ভেঙ্গে চুরে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে আদুর বাপ?"

সদু এবার সত্য সত্যই কেঁদে ফেললে। কাঁদতে কাঁদতে বললে, "আমার অনুরোধ রাখ, এই একটি বার,—শেষবার; আর কিছু বলব না কোনও দিন, আর কিছু চাইব না তোমার কাছে।"

সদু উপুড় হ'য়ে পড়ল বিপিনের পায়ের উপর কিন্তু স্পর্শ করতে পারল না। বিপিন পা সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, বললে, "ওরা এখনই ঘাট থেকে ফিরবে মানিকের মা, ওঠ; মিছে মিছে কান্নাকাটি করবার কোনও মানে হয় না।"

তার কণ্ঠস্বর বিরক্তিতে ভরা। কিন্তু সে বিরক্তি সদু গ্রাহ্য করলে না, ব্যাকুল স্বরে বললে, "তা হ'লে?"

"তা হ'লে কি?"

"কখন জানব?"

"আমাকেও তো ভাববার সময় দেওয়া উচিত, ভেবে যা হ'ক কাল বলব তোমায়।"

আর কোনও কথা বলবার বা শোনবার অবকাশ না দিয়ে বিপিন সেস্থান ত্যাগ ক'রে ঘরে ঢুকল, সদুও উঠল।

আলো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ চ'লে যখন সে বাড়ি এসে পৌঁছল তখন গ্রামের সকল ঘরেই সন্ধ্যা প্রদীপ জ্ব'লে উঠেছে; গ্রাম্য দেবতার মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজছে মুহুর্মুহু। ঘর অন্ধকার। সদু সেই অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে দরজার তালা খুলে ফেললে। সন্ধ্যা প্রদীপ জেলে প্রতিদিনের মত তুলসীতলায় আলো দেখিয়ে ঘরে উঠতেই আজ অকারণে তার দুই চোখ জলে ভ'রে উঠল। মনে হ'ল অনেক দিন সে এমন ক'রে কাঁদে নি, এমন ব্যাকুলতাও কোনও দিন মনের মধ্যে অনুভব ক'রে নি সে। তাই আজকের এই সামান্য বেদনার আঘাত, যা তুচ্ছ করলেও চলত, তাকেই সে অনুভব করলে বড় ক'রে গভীর ক'রে।

ঘরের এক দিকে একটা ছোট কুলঙ্গি, সেইখানেই প্রদীপটা তুলে রেখে সে লণ্ঠন জ্বাললে তার পর সেটাকে খুব কমিয়ে রেখে বারান্দায় এসে বসল চুপ ক'রে।

উপরে রাত্রের অন্ধকার আকাশ, তাতে অসংখ্য নক্ষত্র। মাঝে মাঝে এলোমেলো হাওয়ায় উঠানের একপাশে পোঁতা কলাগাছগুলোর পাতা কাঁপছে, নড়ছে সর সর ক'রে। দুই

(শেষাংশ ২১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পড়ল না। সে যেমন উত্তরের অপেক্ষায় আগ্রহাকুল চোখে বিপিনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল তেমনি তাকিয়েই রইল। বিপিন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "সত্যি কথা শুনবে সদু?"

মাঝে মাঝে এলোমেলো হাওয়ায় উঠানের একপাশে পোঁতা কলাগাছগুলোর পাতা কাঁপছে, নড়ছে সর সর ক'রে। দুই

(শেষাংশ ২১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আশ্রয়স্থল চাঁদ রায় ও কেদার রায় প্রবন্ধটি লেখেন ... এ প্রবন্ধটি ১২৯১ সালের চৈত্র সংখ্যার "ভারতী" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কৈলাসবাবু লিখিয়াছিলেন ঃ "প্রবল পরাক্রান্ত ভৌমিক চাঁদ রায়ের সম্বন্ধে "ভক্তমাল" গ্রন্থে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

... ভুঁইয়াদের প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণের মতে—
"Pratapaditya fell by the beginning of 1612. During the Viceroyalty of Islam Khan and in the

পড়ল না। সে যেমন ...

বিপিনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল তেমনি তাকিয়েই রইল। বিপিন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "সত্যি কথা শুনবে সদু?"

...

মাঝে মাঝে এলোমেলো হাওয়ায় উঠানের একপাশে পোঁতা কলাগাছগুলোর পাতা কাঁপছে, নড়ছে সর সর ক'রে। দুই

(শেষাংশ ২১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৮চাঁদরায়ের শিবমন্দির

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নদীয়া জেলার নানাস্থানে প্রাচীনকালের অনেক কীর্তি আছে। সে সকলের সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোনও অনুসন্ধান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, এমনকি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগও এ সমুদয় কীর্তির তথ্য বিশদভাবে সংগ্রহ করিয়াছেন কিনা তাহাও জানি না।

আমি প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে এই মন্দিরটি প্রথম দেখিয়াছিলাম, সম্প্রতি দুই বৎসর পূর্বেও একবার দেখিয়া আসিয়াছি। ব্রহ্ম শাসনের এই মন্দিরটি দেখিবার জন্য আমার কেন আগ্রহ জন্মিয়াছিল, আজ সেই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের সম্বন্ধেও আলোচনা করিব।

"বিক্রমপুরের ইতিহাস" ১৩১৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। উহা প্রকাশিত হইবার পর অনেকেই আমাকে বার ভূঁইয়ার
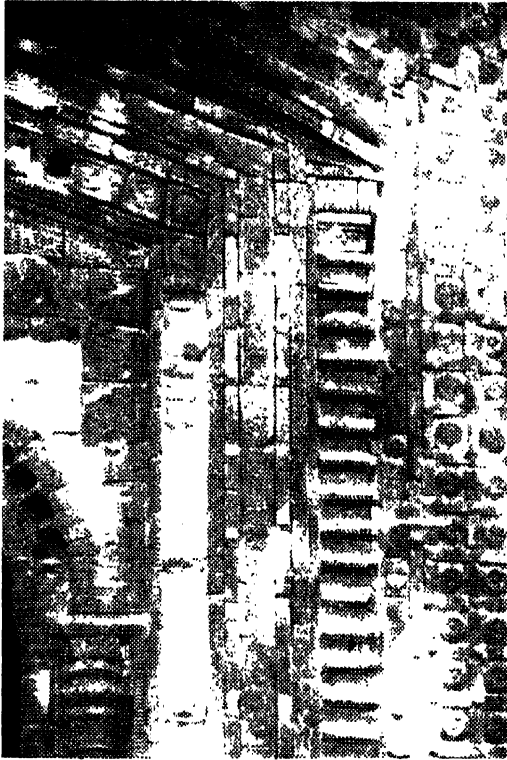
ব্রহ্মশাসনের শিব মন্দিরের গাত্রের কারুকার্য

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর কেদার রায়ের সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করেন। তৎকালীন সাহিত্য পরিষদের সভাপতি স্বর্গত স্বনাম প্রসিদ্ধ বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এ বিষয়ে আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেন। আমি এজন্য চাঁদ রায় কেদার রায় সম্পর্কে ইংরেজী, বাঙলা এবং অন্যান্য ভাষায় কে কি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং কে কে এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া স্বর্গত ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের লিখিত "বাঙলার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস—শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়" প্রবন্ধটি দেখিতে পাই। ঐ প্রবন্ধটি ১২৯১ সালের চৈত্র সংখ্যার "ভারতী" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কৈলাসবাবু লিখিয়াছিলেন ঃ "প্রবল পরাক্রান্ত ভৌমিক চাঁদ রায়ের সম্বন্ধে "ভক্তমাল" গ্রন্থে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

............চাঁদরায় নাম।
জমিদার অতি আঢ্য দস্যুবৃত্তি কাম॥
তিন লক্ষ মুদ্রা খায় কর নাহি দেয়।
নবাব আসোয়ার আইলে মারিয়া ভাগায়॥
লস্কর বন্দুক তোপ অনেক আছয়।
নবাব তাহার সনে যুদ্ধে না পারয়॥
শক্তি-মন্ত্র-উপাসক দুর্গোৎসব করি।
প্রজাদণ্ড কাড়ি লয় পূজা ছল করি॥
ছাগল মহিষ বধ লক্ষ লক্ষ করে।
গো-ব্রাহ্মণ আদি বধ করিতে না ডরে॥

'ভক্ত মালে' এই চান্দ রায় সম্বন্ধে লিখিত আছে ঃ—'রাজমহলেতে-স্থিতি চান্দ রায় নাম।' কৈলাসবাবু রাজমহলেতে স্থিতি কথাটা উদ্ধৃত না করায় আমার কেমন সন্দেহ হইয়াছিল—কেন না ঐতিহাসিক বার ভুঁইয়ার বীর কেদার রায় ও চাঁদ রায়ের সহিত যে 'রাজমহলেতে স্থিতি চান্দ রায়ে'র কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। কৈলাসবাবু ঐরূপ কাল্পনিক সিদ্ধান্ত করায় আমি একটু সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলাম। 'ভক্ত মাল' পড়িয়া দেখিলাম যে, **রাজমহলেতে স্থিতি চান্দ রায়ের** সহিত বার ভুঁইয়ার ভৌমিক কেদার রায় চাঁদ রায়ের কোনও সম্পর্ক নাই। নাম সাদৃশ্য দেখিয়াই কৈলাসবাবু ঐরূপ ভুল করেন এবং রাজমহলেতেস্থিতি এই কথাটি তুলিয়া দিয়া আরও সংশয়ে ফেলিয়াছিলেন।

স্বর্গতা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সম্পাদিত 'জাহ্নবী' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের ফাল্গুন সংখ্যায় [জাহ্নবী। ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। ফাল্গুন, ১৩১৪] আমি "বিক্রমপুরে চাঁদ ও কেদার রায়ের কীর্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম ; "নদীয়া জেলার অন্তর্ভূত শান্তিপুরের কিয়দ্দুরে বা বাগআঁচড়া নামক গ্রামে একটি মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার পূর্বদিকের দরোজার উপরে ইষ্টকের মধ্যে আট ছত্রে খোদিত একটি লিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশিবঃ। শাকে বারমত
বাণ হরিণাঙ্কে নাস্ক
তে শঙ্করং সংস্থাপ্যাশুস্দ্
ধা কর কর ক্ষীরোদনী
রোপমং তস্মৈ সৌধমিদম্
দা সুজলদানীল নীলোধবজং
তত্ পাদোরত ধীর ধীর
বিরতং শ্রীচাঁদরায় দদৌ॥

ইহার অর্থ এই যে, "ধীর স্থির বুদ্ধি বিশিষ্ট শ্রীচাঁদ রায় পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্নার মত ও ক্ষীরোদনীর সমতুল্য এবং নিবিড় নীরদ-সংলগ্ন ধ্বজাবিশিষ্ট এই মঠ ১৫৮৭ শকে নির্মাণ করিয়া শিব প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া শিবপদে অর্পণ করিলেন।" কেহ কেহ এই খোদিত লিপি পাঠে ও এই মন্দিরের কারুকার্যাদির সহিত রাজ-বাড়ীর মঠের সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে ইহাকেও বিক্রমপুরের চাঁদ রায় কর্তৃক তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে নির্মিত বলিয়া অনুমান করেন। ১৫৮৭ শকে অর্থাৎ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে এই শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল।

বাঙলাদেশে বার ভুঁইয়ারা ষোড়শ শতাব্দীতে প্রভাবশালী হইয়া উঠেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই তাহাদের পরাজয় ঘটে। মোটকথা সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষভাগে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম সময়েই বার ভুঁইয়াদের প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণের মতে—

"Pratapaditya fell by the beginning of 1612. During the Viceroyalty of Islam Khan and in the

reign of Jahangir and not by the hands of Mansingha during the reign of Akbar."*

এরূপ স্থলে বিক্রমপুরের বার ভূঁইয়ার চাঁদ রায় কেদার রায়ের সহিত বাগআঁচড়া ব্রহ্ম শাসনের চাঁদ রায়ের কোনরূপ সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

বাগআঁচড়া ব্রহ্মশাসনের চাঁদ রায়—বার ভূঁইয়ার চাঁদ রায়ের বহু পরবর্তী লোক। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরের লিপিই তাহার প্রমাণ। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, চাঁদ রায়ের এই শিব মন্দিরটি সম্রাট আলমগীরের রাজত্বকালে নির্মিত হয়। তখন বাঙলাদেশের শাসনকর্তা ছিলেন শায়েস্তা খাঁ। তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল বাঙলাদেশ শাসন করেন।

এখন আমাদের কাছে বিষয়টি বেশ পরিষ্কার হইল—বাগআঁচড়া ব্রহ্ম শাসনের চাঁদ রায় ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। ইঁহার সহিত বার ভূঁইয়ার বিক্রমপুরের চাঁদ রায়ের এবং ভক্তমালের লিখিত চাঁদ রায়ের কোন সম্পর্কই নাই। ব্রহ্ম শাসনের এই মন্দিরটির বয়স ২৭৫ বৎসর—তিন শতের কাছাকাছি।

'বিশ্বকোষের' প্রথম সংস্করণে স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহোদয়ও 'ভক্তমালের' চাঁদ রায়ের সহিত বাগআঁচড়ার চাঁদ রায়কে অভিন্ন মনে করিয়া তাঁহাকে অসচ্চরিত্র ও দস্যুদলপতি বলিয়াছেন। "প্রজা পীড়ন ও পরধন লুণ্ঠনই ইঁহারই প্রধান ব্যবসায় ছিল। দিন দিন বড়ই গর্বিত হইয়া উঠিলেন। নবাবের অধীনতা তাঁহার পক্ষে ভাল লাগিল না, তিনি রাজকর বন্ধ করিয়া দিলেন। এখন তিনি একপ্রকার স্বাধীন। নবাব জানিতে পারিয়া কর আদায়ের জন্য লোক পাঠাইলেন, চাঁদ রায় তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ইনি অধীন দস্যু দল দ্বারা নবাবের প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন। নবাব বহু যত্নেও তাহা নিবারণ করিতে কৃতকার্য হইলেন না। চাঁদরায়ের ভয়ে ও অত্যাচারে লোক সকল পথে ঘাটে বাহির হইতে সাহস পাইত না। সতীত্বনাশ, সাধুর অপমান প্রভৃতি সমস্ত অসৎ কার্যই ইঁহার অঙ্গভূষণ ছিল। ব্যয় নির্বাহার্থ দুর্বল নিরীহ প্রজাবর্গের উৎপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। পূজার সময় দেবীর নিকট লক্ষ লক্ষ ছাগ মহিষ প্রভৃতি বলি দেওয়া হইত। গো হত্যা, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাপ আচরণেও ইনি ভীত ছিলেন না।"

"কিছুদিন পরে পাপের ফল ফলিল, দস্যুপতি চাঁদ রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অনেকের বিশ্বাস একটি ব্রহ্মদৈত্য চাঁদ রায়ের দৌরাত্ম্য দেখিয়া ইঁহার শরীরে আশ্রয় করে। ইহাকে বিনাশ করিয়া প্রজাবর্গের শান্তি স্থাপনই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। চাঁদ রায়ের কনিষ্ঠের নাম সন্তোষ রায়। সন্তোষ অনেক বৈদ্য আনাইয়া ইহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। পাপের ফল দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। সন্তোষ রায় গড়েরহাট নিবাসী নরোত্তম ঠাকুরকে আনাইয়া ইঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তাহার কিছুদিন পরেই চাঁদ রায় নীরোগ হইলেন। নরোত্তম ঠাকুরের ধর্মোপদেশে ইহার মতিগতি ফিরিয়া গেল। ইনি সকল অসদাচরণ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্র ও পরম বৈষ্ণব হইয়া পড়িলেন। প্রজাবর্গের শান্তি হইল। নবাবও নিয়মিতরূপে রাজকর পাইতে লাগিলেন।"

'ভক্তমালে' আছে,—

> নবাব তাহার সনে যুদ্ধে না আঁটয়॥
> দেশে দেশে দস্যুপনা করিয়া লুটয়।
> ঘাটে মাঠে পথে লোক ভয়ে না চলয়॥
> পরের রমণী আনি বলাৎকার করে।
> কে কোথা সুন্দরী খুঁজি ফিরে ঘরে ঘরে॥
> * * * *
> কত যে করয়ে পাপ সীমা নাহি হয়।
> চিত্রগুপ্ত লিখিবারে নাহিক পারয়॥
> পাপের শরীরে হয় প্রেতের যে ভোগ।
> ব্রহ্মদৈত্য আশ্রয় করিয়া হইল রোগ॥
> মহাবাই প্রচণ্ড হইয়া জ্ঞানহত।
> হইল উন্মাদপ্রায় প্রলাপয়ে কত॥
> ভাই সে সন্তোষ রায় উদ্বিগ্ন হইয়া।
> নানা তৈল ঔষধ করয়ে বৈদ্য দিয়া॥
> * * * *
> একদিন এক সাধু বৈষ্ণব আসিয়া।
> অতিথি হইয়া আসি গেলেন ফিরিয়া॥
> বাটীর বাহিরে কোন লোকেরে কহিল।
> বৈষ্ণবআশ্রয় বিনে না হইবে ভাল॥
> * * * *
> গড়েরহাট নাম স্থানে তাঁহার বাস হয়।
> শ্রীল নরোত্তম যে ঠাকুর মহাশয়॥
> তাঁহার মহিমা যে সন্তোষ রায় জানে।
> শীঘ্রগতি চলি গেলা তাঁহার চরণে॥
> * * * *
> কৃপা কর মহাশয় লইনু শরণ।
> মো সবার আশ্রয় দিতে হবে শ্রীচরণ॥
> শ্রীকৃষ্ণ ভজনে মোরা নিশ্চয় করিনু।
> কায়মনে তোমার চরণে বিকাইনু॥
> একবার মোর গৃহে চরণ অর্পিয়া।
> আমা সবার সবংশে আইস উদ্ধারিয়া॥

নরোত্তম ঠাকুর এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন কিনা সে বিষয়ে দ্বিধাভাবাপন্ন হইলেন, কেন না,—

> এ হেন পাপীর হেন মতি কি হইব।
> মদ্যপ ইহার বাটী কেমতে যাইব॥

সেদিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন ঃ—

> নিদ্রাকালে প্রভু কহে, শুন নরোত্তম।
> পর উপকার যেই সেই সে উত্তম॥
> * * * *
> প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা আনন্দে ভাসিল।
> রায়ের সহিত তাহার গৃহেতে চলিল॥
> * * * *
> ঠাকুরের আগমন হইবা মাত্রেতে।
> শঙ্খধ্বনি করে হুলুহুলু স্ত্রীলোকেতে॥
> ঠাকুরের পদার্পণ গৃহে হবা মাত্র।
> চাঁদরায় নিব্যাধি হইল সুপবিত্র॥
> পরিবার সহ আসি চরণে পড়িল।
> ক্ষিতি লোটাইয়া কৃতকৃতার্থ মানিল॥
> * * * *
> কাকুবাদ শুনি ঠাকুরের দয়া হইল।
> অঙ্গে হাত বুলাইয়া আশ্বাস করিল॥
> হরিনাম কর্ণে দিয়া রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র।
> দীক্ষা দিয়া শিখাইলা ভক্তিমার্গতন্ত্র॥
> * * * *
> কহেন ঠাকুর বহু হিত উপদেশ।
> সদাচারময় রাজা সাধন বিশেষ॥
> শুন বাপু চাঁদরায় এই মোর বাক্য।
> একথা যে রাখিবে হৃদয়ে করি সৌখ্য॥

এইরূপে চান্দ রায় রোগ মুক্ত হইয়া—আবার মানুষের মত মানুষ হইয়া নিজ পরিবারের ও জনগণের কল্যাণ করিতে লাগিলেন। আমরা এখানে স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম যে বাগআঁচড়ার ব্রহ্মশাসনের চাঁদ রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

'নদীয়া কাহিনী' লেখক বাগআঁচড়া ও ব্রহ্মশাসনের কথা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—"শ্রীবাগ্‌দেবী মাতার স্থান বলিয়া বাগআঁচড়ার খ্যাতি ও পরিচয়। রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে জনৈক সাধক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। সাধক রঘুনন্দন এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন

---

* Bengal Past & Present, Vol. XXX-VIIII 1929—Bengal Chiefs struggle for Independence in the reign of Akbar and Jahangir by N. K. Bhattasali.

য়া লোকে এ স্থানটিকে সিদ্ধাশ্রম বলিয়া থাকে। কথিত ন্দনের ভাগিনেয় মহাদেব মুখোপাধ্যায় এই স্থানে সিদ্ধিলাভ য়াছিলেন। এই সিদ্ধ মহাত্মার অভিশাপে এখানকার সিদ্ধ চাঁদ রায় সবংশে নির্বংশ হয়েন। এই চাঁদ রায়কে কেহ র দেওয়ান কেহ বা বার ভুঁইয়ার অন্যতম শ্রীপুরের চাঁদ রায় করেন, কিন্তু 'অন্নদা মঙ্গলে' ইঁহাকে প্রিয় জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় রায় বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।"

ব্রহ্মশাসন—"নবদ্বীপাধিপতি রুদ্র একখানি আদর্শ ব্রাহ্মণ গ্রাম স্থাপন মানসে এক শত আট ঘর নিষ্ঠাবান ও সুপণ্ডিত মনোনীত করিয়া তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্বাহোপযোগী পত্তি প্রদানপূর্বক চাঁদ রায়ের সাহায্যে গ্রামখানি স্থাপনা ন। ব্রাহ্মণের সুপ্রতিষ্ঠাহেতু গ্রামখানি ব্রহ্মশাসন নামে হিত হয়।"

আমাদের কাছে কুমুদবাবুর লিখিত এই বিবরণটিই যথার্থ য় মনে হয়। কেন না চাঁদ রায়ের মন্দিরের লিপি হইতে তে পারি যে, উহা ১৫৮৭ শকে অর্থাৎ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ষ্ঠাপিত হয়। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা রুদ্রও দিল্লীশ্বর মগীরের সমসাময়িক। রুদ্র দানশীল ছিলেন। তিনি কাহতার্থে বহু জলাশয় খনন, রাজবর্ত্ম প্রস্তুত প্রভৃতি অশেষ র্যের অনুষ্ঠান করেন। দিল্লীশ্বর আলমগীর তাঁহার এই সৎকীর্তিগাথা শ্রবণ করিয়া ১৬৭৬ অব্দে (১০৮৭ রাতে) এক ফারমান দ্বারা গয়েশপুর, হোসেনপুর, খাড়ি, প্রভৃতি কয়েকটি বিস্তীর্ণ পরগনার স্বামিত্ব প্রদান করেন তাঁহার প্রাসাদের উপরিভাগে দিল্লীশ্বরের প্রাসাদের অনুকরণে রা নির্মাণের অধিকার দেন। ইনি নবদ্বীপে এক মন্দির ণ করিয়া একটি শিবলিঙ্গ স্থাপনা করেন এবং তাঁহার পিতার পত রাজধানী বেউইয়ের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে কৃষ্ণনগর রণ করেন।"

আমাদের বিশ্বাস মহারাজা রুদ্র এবং ব্রহ্মশাসনের চাঁদ রায় সময়ের লোক। চাঁদ রায় রুদ্রের দেওয়ান ছিলেন কিনা তাহা দ্বীপ রাজপরিবারের পুরানো দপ্তরখানা একটু অনুসন্ধান লই নির্ণীত হইতে পারে। চাঁদ রায়ও যেমন শিব মন্দির ষ্ঠা করিয়াছিলেন, মহারাজা রুদ্রও তেমনি শিব মন্দির ইত্যাদি ষ্ঠা করিয়াছিলেন।

চাঁদ রায় ছিলেন ধীর স্থির চরিত্র বিশিষ্ট। তিনি দস্যু ন, নারীহরণকারী দুরাচার ছিলেন—এমন কোনও প্রমাণ দের কাছে নাই। 'ভক্তমালের' চাঁদ রায়ের সহিত তাঁহার ও সম্পর্ক নাই। একথা সম্পূর্ণ সত্য।

দেখা যাইতেছে যে, মহারাজা রুদ্র চাঁদ রায়ের সাহায্যে ব্রহ্ম-গ্রামখানি স্থাপনা করেন। চাঁদ রায় যদি রুদ্রের প্রিয়পাত্র কোনও কর্মচারী না হইবেন তবে মহারজা রুদ্র তাঁহার লইবেন কেন? এবং কীর্তিমান চাঁদ রায়ই বা রাজা রুদ্রের শক্রমে নিজ গ্রামের সন্নিকটে ব্রহ্মশাসন গ্রামখানি স্থাপিত ন কেন?

আমাদের মনে হয়, বাগআঁচড়া নিবাসী চাঁদ রায় এই গ্রাম কালে নিজ নামে এই শিবালয়টি চারিটি মন্দিরসহ স্থাপন ছিলেন। অন্য তিনটি মন্দিরেও খোদিত লিপি থাকা ব নহে।

আর যদি চাঁদ রায় দস্যুবৃত্তির দ্বারা অর্থলাভ করিয়া বড় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে খোদিত তে 'ধীর ধীর বিরতং শ্রীচাঁদ রায়' বলা হইত কিনা জানি না। আমরা কিন্তু চাঁদ রায়কে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা রুদ্রের ন কিংবা উচ্চ প্রিয় রাজকর্মচারী বলিয়াই মনে করিতেছি। বন্ধে নদীয়ার ইতিহাসানুরাগী অধিবাসীদিগকে অনুসন্ধান করিতে বলি। তাঁহারা অনুসন্ধান করিলে কীর্তিমান চাঁদ রায়ের প্রকৃত পরিচয় জানা সহজেই সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে করি।

এইবার মন্দিরের কথা বলিতেছি। মন্দিরটি পূর্বদ্বারী। ক্ষুদ্র জঙ্গলাকীর্ণ চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের মধ্যে পূর্বে চারিটি মন্দির ছিল। তিনটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কেহ যত্ন করিলে হয়ত বা রক্ষা পাইত। উত্তর দিকের মন্দিরটি অনেকটা

ব্রহ্মশাসন গ্রামের চাঁদরায় প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরের সম্মুখভাগ ও খোদিত লিপি

ভাল অবস্থায় আছে, কিন্তু উপরের চূড়া বা আচ্ছাদন নাই। মন্দিরের সম্মুখ দিকের ভিত্তির গায়ে ইষ্টকের গায়ে নানা খোদিত মূর্তি ছিল। তাহাও লোপ পাইতেছে ও অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। খোদিত লিপিটি মন্দিরের পূর্ব দিকের দ্বারের উপর ইষ্টকে খোদিত। লিপির কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

আমি এই শিব মন্দিরটি এবং উহার গায়ের কারুকার্য

দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কত পদ্ম যে খোদিত রহিয়াছে, কত সুন্দর লতাপাতা গায়ে শোভা পাইতেছে তাহা না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের উপরের দুইদিকেও ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দির খোদিত। মন্দিরের গায়ে বটগাছ ও বিবিধ বন জঙ্গল এমনভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে যে আমার আশংকা হয় যে, শীঘ্রই এই মন্দিরটি ধ্বংস পাইবে। খোদিত লিপিটি সপ্তদশ শতাব্দীর সুস্পষ্ট সুন্দর বঙ্গাক্ষর। সকলেই পড়িতে পারেন। শান্তিপুরের জলেশ্বরের মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্মিত হইয়াছিল। জলেশ্বর মন্দির নির্মাতা স্থপতিরা বাগআঁচড়া মন্দিরের অনুকরণে জলেশ্বর মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছিল তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। মনে হয় যে, একই শিল্পী এই মন্দির দুইটি নির্মাণ করিয়াছে। ব্রহ্মশাসনের শিব মন্দিরের যে স্তরে মূর্তি ইত্যাদি খোদিত ছিল বলিয়া মনে হয়, সেই স্তরের ইষ্টক ফলক (terra cotta) খসিয়া পড়িয়াছে। এখনও যাহা আছে তাহা বাঙলাদেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

চাঁদ রায় যদিই-বা দস্যুবৃত্তি করিয়া ধনী ও ক্ষমতাশালী হইয়া থাকেন (যদিও আমরা তাহা বিশ্বাস করি না) তাহা একেবারে অসম্ভব নাও হইতে পারে। তবু এই মন্দির তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এক সময় নদীয়া জেলা দস্যু ডাকাতের রঙ্গভূমি ছিল। সরকারী বিবরণ হইতে জানিতে পারি যে,—

"In the year 1808 the crime of gang-robbery or dacoity was very prevalent in the district. Mr. Lumsden, in a minute records on 13th June of that year, stated "that the existing system of Police has entirely failed in its object, and that the detestable crimes of gang-robbery and murder are now equally prevalent in every part of Ben (the Division of Dacca, perhaps, excepted) a any former period, are truths of too much n riety to admit of dispute. The details of enormities which are still committed with impu in the immediate neighbourhood of the capita British India, as described in the report, are too highly coloured. (Nadia District Gazet P. 29).

নদীয়ার বিখ্যাত দস্যু বিশ্বনাথ সর্দারের নাম এক সময়ে ন জেলার সর্বত্র আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। সে যাহাই হউক কেন আমি বাগআঁচড়া ব্রহ্মশাসনের এই মন্দিরটি সংরক্ষণের গভর্নমেণ্ট প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ত একান্ত অনুরোধ "নদীয়া সম্মিলনী"র কর্তৃপক্ষগণও যেন এই মনোযোগী হন, নতুবা নদীয়া জেলার একটি গৌরবময় ক ভূমিসাৎ হইবে। এই মন্দিরের বঙ্গাক্ষরে খোদিত লিপিখা অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পূর্ববঙ্গের রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে নব প্রকা "বাঙলায় ভ্রমণ" গ্রন্থে এই মন্দিরের যে চিত্র প্রকাশিত হই তাহাও বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের উদ্যোগেই সম্ভব হইয়াছে। গ্রন্থের ১০১ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে ১৮৫৭ শকে (১৬৬৫ খৃষ্টা মুদ্রিত হইয়াছে। উহা ভুল—১৫৮৭ শক হইবে। আশা রেল কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যত সংস্করণে এই ভ্রম সংশোধন করি এই প্রবন্ধে যে চিত্র দুইখানি মুদ্রিত হইল, তাহা পূর্ববঙ্গ পথের প্রচার বিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি এজন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রাচীন বিশ্বের প্রতি *

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

হয়তো তোমার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন সাহসী ও জ্ঞানী,
হয়তো সহস্র দীপ তাঁরা জ্বালিয়েছিলেন—
কিন্তু তাতে কি এসে যায়?
কবরের সামনে
তুমি বসে আছ বৃদ্ধ নৃপতি,
নিজের পাপে পড়েছ তুমি বিধ্বস্ত হয়ে,
বিশ্ব তোমার মাথায় পড়েছে ভেঙে।

প্রাচীন তোমার
রাজার পোশাক,
শতছিন্ন পড়ছে মাটিতে ঝুলে—
জমে উঠেছে তার জরির ফুলে
মলিন ধুলার কঠিন আবরণ।
থাক্—তেমনি পড়ে থাক্
বিচ্ছিন্ন, বিশ্রস্ত ঐ রাজবেশ,
তোমার ইতিহাসের শেষ পাদটীকার মত।
কালের লৌহ পুস্তকাধারে
একান্তে তুমি বিশ্রাম করো—
আর শোনো অনাগত ভবিষ্যের গান;
দেখ কলহাস্য মুখর শিশু
কেমন করে পরিণত বয়সে
তোমার ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে তুলেছে
নূতন বিশ্বের সুন্দর সৌধ।

---

*Joseph Freeman-এর To the Old Wo কবিতার মর্মানুবাদ।

গোধূলি রাগ

(উপন্যাস)

শ্রীতারাপদ রাহা

(৩)

ফাল্গুনের শেষে লেকের রোইং ক্লাবের ধারে স্টুডিবেকার গাড়িতে বৃদ্ধ কুমারেশ একা বসিয়া আছেন। দূরে এক বেলুন-ওয়ালা রংবেরংএর একরাশ বেলুন লইয়া হাঁক ছাড়িতেছিল দেখিয়া ভারতী বেলুন কিনিবে বলিয়া বায়না ধরিল। দুটো-একটা বেলুনে ভারতীর কোনও দিনই পোষায় না, তাই একটা সিকি বাহির করিয়া শোফারের হাতে দিয়া কুমারেশ বেলুন কিনিতে পাঠাইয়াছেন। ভারতী নিজে পছন্দ করিয়া কিনিবে বলিয়া শোফারের পিছু পিছু ছুটিয়াছে। বৃদ্ধ একা বসিয়া পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছেন। কুমারেশের যদি আজ যৌবনাবস্থা হইত তবে তাহার মুখের ভাব দেখিয়া যে কেহ মনে করিতে পারিত যে তিনি তাহার হারানো প্রিয়া বা মানসীর কথা ভাবিতেছেন। কিন্তু এ বয়সে বৃদ্ধের মনে এমন কি ভাব থাকিতে পারে যাহাতে তাহার দুই চোখে অমন উদাস ভাব আনিয়া দিতে পারে?

কে বলে বৃদ্ধ হইলে তার সকল চাওয়া শেষ হইয়া যায়? যাওয়ার আগে বাসনার শত বন্ধন বুঝি তাহাকে নিবিড় করিয়া বাঁধিতে চায়, জগতের যত শোভা বুঝি তাহাকে মোহিনী হইয়া উর্বশী হইয়া হাতছানি দিতে থাকে।

পশ্চিম আকাশে কে যেন এক রাশ সিন্দুর মাখাইয়া দিয়াছে। এই কয়েক মুহূর্তে আগে সূর্যাস্ত হইয়াছে; বেদনা চাপিতে গিয়া পশ্চিমাকাশ যেন সারা মুখখানা লাল করিয়া বসিয়াছে। দিনের মৃত্যু হইল, তাহার বাজিবে না? আলো যে নিবিয়া গেল। যে আলো কত রূপ, কত শোভা, কত ফুল, কত লতা, কত প্রেম, কত আশা ও আনন্দকে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছে।

আলোর মৃত্যুতে কে যেন মুখ কালো করিল, কাঁদিল না; একটি উচ্চ রবও করিল না। কুমারেশের বেশ লাগে, শোক প্রকাশের সুন্দর ভঙ্গী। বৃদ্ধের জীবনের সাথে কোথায় যেন এর সাদৃশ্য আছে; এমনি করিয়াই বুঝি বৃদ্ধকে বেদনা সহিতে হয়। তরুণের সুখে দুঃখে কত উচ্চ রব করা চলে, না করিলে ত্রুটি হয়; কিন্তু বৃদ্ধের আনন্দে নিরানন্দে একটি কথাও বলিতে নাই। কিন্তু কুমারেশ জানেন, বৃদ্ধেরা ওই আকাশের মত করিয়াই বেদনায় নীরবে হৃদয় রাঙা করে।

একখানা ট্রেন কুমারেশের চোখের সমুখ দিয়া ভকভক করিয়া ধূঁয়া ছাড়িয়া কোথায় মিলাইয়া গেল। কুমারেশের মনে হইল, মনুষের জীবন ঠিক এমনি করিয়াই দ্রুত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কোথায়?

কুমারেশের পাশ দিয়া একদল ছেলেমেয়ে হল্লা করিতে করিতে চলিয়াছে। কুমারেশের চিন্তার সূত্র কাটিয়া গেল, তিনি তাকাইয়া দেখিলেন দুইটি ছেলে সিগারেট ফুঁকিতেছে, কয়েকটি মেয়ে চীনাবাদাম ডালমুট চিবাইতে চিবাইতে চলিয়াছে। তাহারা হাসিয়া হাসিয়া একে অন্যের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে।

কুমারেশের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। জঘন্য, এমন একটি লোক চোখে পড়িল না যাহার রুচির প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়, যাহার মুখ দেখিলে আনন্দ হয়, ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। এমন সুন্দর নীরব সন্ধ্যার মত একখানা মুখও কি মানুষের মাঝে মিলে না? কুমরেশ আরও কি ভাবিতে যাইতেছিলেন, সহসা ভারতীর কন্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলেন।

—দাদু, ও দাদু, তুমি আমাদের দেখতেই পেলে না? এই দেখ কে! তুমি চেন একে? আচ্ছা সেদিন আমাদের বাড়ির সামনে যাকে দেখেছিলাম তিনি না?

সামনের মূর্তিটির দিকে নজর পড়িতে কুমারেশের অতি প্রাচীন বুক একটু কাঁপিয়া উঠিল; ঠিক এমনি একখানি মুখই তিনি আজ সন্ধ্যায় বুঝি কামনা করিতেছিলেন। আর একদিন সন্ধ্যায় অস্পষ্ট আলোকে ঠিক এমন একখানি মুখ দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গিয়াছিল। কুমারেশ মেয়েটির মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। ভারতী চীৎকার করিয়া উঠিল—ও দাদু, কথা বলছ না যে! বল না! ঠিক তিনি কি না?

মেয়েটি ইহাদের কান্ড দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। শোফার বলিল—দিদিমণির বেলুনগুলি হাত থেকে ফসকে উড়ে যেতে উনি ধ'রে দিয়েছেন; সেই থেকে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। উনি চ'লে যাচ্ছিলেন, দিদিমনি ওঁর হাত ধ'রে টেনে নিয়ে এল; বললে, চলুন দাদুর কাছে, আমাদের বাড়িতে যেতে হবে আপনার।

মেয়েটি দুই হাত তুলিয়া কুমারেশকে নমস্কার করিলেন; তাঁহার মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ফিরিয়া আসিল। কুমারেশ প্রতি নমস্কার করিলেন। তাহার মন হঠাৎ যেন খুশী হইয়া উঠিল। মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন আপনার সঙ্গে আর কেউ আছেন?

—না।

—আপনি এখন বাড়ি যাবেন? আমরা আপনাকে একটা লিফ্ট্ দিতে পারি।

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিল—না, আমি আর একটু ঘুরে বাড়ি যাব।

—কারও কি প্রত্যাশা করছেন আপনি?

—না, একাই ঘুরব।

বৃদ্ধ সাগ্রহে বলিলেন—তবে আসুন না আমাদের মোটরে, দু-একটা রাউন্ড দেওয়া যাক।

মেয়েটি বৃদ্ধের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিল না, ভারতীর হাত ধরিয়া উঠিয়া বসিল। ভারতী তাহার হাতে একটি মৃদু চাপ দিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল—কি, আসবেন না নাকি! কেমন জব্দ! আমি যখন বললাম তখন অমনি 'না', আর দাদু বলতেই অমনি সুড়সুড় ক'রে উঠে এলেন।

মেয়েটি শুনিয়া একটু হাসিল।

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে কুমারেশ বলিলেন—আপনি রোজই লেকে বেড়াতে আসেন নাকি?

—না, রোজ নয়, তবে প্রায়ই আসি।

ভারতী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—রোজ এলে বেশ হয়, না দাদু? আমাদের সঙ্গে রোজ দেখা হয়ে যাবে, আমাদের গাড়িতে রোজ বেড়াবেন উনি! তারপর মেয়েটির দিকে তাকাইয়া বলিল—বেশ মজা হয় তা হ'লে, আপনি আসুন না রোজ।

মেয়েটি ভারতীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, কোনও উত্তর দিল না।

—কি কথা বলছেন না যে!

—রোজ আমার ছুটি থাকে না, অনেক কাজ থাকে যে!

—আপনি আবার কাজ করেন নাকি? ভারতী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল।

মেয়েটি আবার হাসিল।—কাজ না করলে কি চলে? তুমি বুঝি মনে কর সবাই তোমাদের মত বড়লোক?

কুমারেশ এবার ফিরিলেন।—আপনি—

মেয়েটি বলিল—আমি এখেনকার একটা মেয়ে স্কুলে পড়াই।

—হেড মিসট্রেস?

চোখ দুটি ঈষৎ নত করিয়া মেয়েটি বলিল—আজ্ঞে হাঁ।

মেয়েটির পরিচ্ছদে একক জীবনের' কথা সুস্পষ্ট লেখা রহিয়াছে, সুতরাং কুমারেশ বলিলেন—আপনি কি হোস্টেলেই থাকেন নাকি?

আগে হোস্টেলেই থাকতাম হোস্টেলের সুপারিনটেনডেণ্ট হয়ে, কিন্তু পোষাল না, মাস কয়েক হল ছেড়ে দিয়েছি। এখন বাসা করে আছি।

ভারতী এইবার একটু সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে। ইনি যে একটা মেয়েস্কুলের হেড মিসট্রেস এত কি সে আগে জানিত? জানিলে সে কখনওই তাহার সহিত এত চপলতা করিতে পারিত না।

কুমারেশ আবার প্রশ্ন করিলেন—বাসায় আর কে আছেন?

মেয়েটি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি একাই থাকি, মাঝে মাঝে আমার ছোট ভাই এসে থাকে।

কুমারেশের ললাটের রেখাগুলি যেন আরও একটু গভীর হইয়া উঠিল, যেন তাহার মনে হইল তিনি হয়তো ঠিকই ধরিয়াছেন। বলিলেন—আপনার ছোট ভাই? কি করেন তিনি?

—সে ওআই এম সি-এর হোস্টেলে থেকে বি-এ পড়ে, ছুটি-ছাটা হলে আমার কাছে এসে থাকে।

কুমারেশের ভ্রূ যেন এবার আরও কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার নামটা কিন্তু এখনও আমার—

—আমার নাম শকুন্তলা মিত্র।

ভারতী চমকিয়া উঠিল। কুমারেশ আগে থেকেই এইরূপ একটা কিছু আশঙ্কা করিতেছিলেন, তবুও স্পষ্ট করিয়া নামটা যখন শুনিলেন তখন তাহার শীর্ণ দেহ একবার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। যন্ত্রচালিতের মত তিনি বলিলেন—আমি কুমারেশ রায়। আর ভারতীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া—ইনি ভারতী।

শকুন্তলা গাড়িতে বসিয়াই কুমারেশের পায়ের ধুলো লইয়া তার পর ভারতীর চিবুকে আঙুল ঠেকাইয়া বলিল—আমি জানি।

গাড়ি দুইবার লেক প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রিজের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; শোফার কুমারেশের মুখের দিকে চাহিল। কুমারেশ ইশারায় চালাইয়া যাইতেই বলিলেন; গাড়ি বিদ্যুদ্-গতিতে ছুটিতে লাগিল।

কুমারেশ একবার শকুন্তলার মুখের দিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন, শকুন্তলা বাহিরের দিকে তাকাইয়া পাষাণপ্রতিমার মত চুপ করিয়া রহিল। শুধু ভারতী আশ্চর্য হইয়া একবার কুমারেশের আর একবার শকুন্তলার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। শকুন্তলার নাম সে কাশ্মীরে থাকিতে বহুবার শুনিয়াছে, ভারতী বুঝিয়াছে এ সে-ই। দাদার সহিত ইঁহার বিবাহের কথা হইয়াছিল তাহাও সে বেশ মনে করিতে পারে। দাদা মেম বিয়ে করিয়াছে, নইলে ইনিই তাহার বউদিদি হইতেন। হইলে বেশ হইত। এমন সুন্দর যার চেহারা, এমন সুন্দর যার ব্যবহার তিনি তাহার বউদিদি হইলেন না, এ কথা ভারতীর মনে কেবলই বেদনা দিতেছিল। দাদু চুপ করিয়া রহিয়াছেন, শকুন্তলা একটিও কথা কহিতেছেন না, ভারতীর ইহা একটুও ভাল লাগিতেছে না। বেলুনগুলি ডান হাতে ধরিয়া বাঁ হাতে শকুন্তলার হাত ধরিয়া মৃদু চাপ দিয়া ভারতী বলিল—চলুন না আমাদের বাড়িতে; যাবেন? আমাদের গাড়ি আবার আপনাকে বাড়ি পেঁছে দেবে।

উত্তর শুনিবার জন্য ভারতী শকুন্তলার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। একটি অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা শকুন্তলার ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল, সে কোনও উত্তর করিল না।

ভারতীর আমন্ত্রণে কুমারেশ অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলেন। নিজের মনের অতি গোপন যে ইচ্ছাটা তাঁহার নিজের পক্ষে প্রকাশ করা শোভন হইত না, ভারতী সেই ইচ্ছাটাই প্রথম উত্থাপন করিয়াছে। তাই উত্তর শুনিবার জন্য তিনিও উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। কিন্তু শকুন্তলা যখন ভারতীর কথার জবাবে কিছুই বলিল না, অথচ আমন্ত্রণটা যখন একবার করা হইয়া গিয়াছে, তখন কুমারেশ নিজে চুপ করিয়া থাকাটা সংগত বিবেচনা করিলেন না। তিনিও শকুন্তলার দিকে চাহিয়া বলিলেন—হাঁ চলুন না আমাদের বাড়িতে, বেশ হবে। রাত্রের খাওয়া খেয়ে একেবারে বাড়ি যাবেন, গাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

শকুন্তলা নিজের জুতার দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—আজ থাক। তার পর একটু থামিয়াই বলিল—আমাকে 'তুমি' বলেই ডাকবেন।

শকুন্তলা মুখ আর তুলিল না, কুমারেশও বুঝিলেন, আজ ইঁহাদের সঙ্গে দেখা হইয়া গিয়া শকুন্তলার মনটা ভাল যাইতেছে না। আজ তাহাকে বাড়িতে আহ্বান করা বুদ্ধির কাজ হয় নাই।

কুমারেশেরও মনটা ভাল যাইতেছিল না। আজীবন মানুষ দেখিলেই তিনি তাহার ত্রুটি ধরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আজ এমন একটি লোক তাঁহার পাশে আসিয়া বসিয়াছে যে,

কুমারেশের মনে হইল তাঁহার জীবন ধন্য হইয়া গেল। সোমেশ ইহাকে ঘরে আনিলে কুমারেশ রোজ ইহাকে লইয়া বেড়াইতে পারিতেন। তরুণেরা বোঝে না, নাতি ও নাতবউ লইয়া বেড়াইতে বৃদ্ধদের কত আনন্দ। আজ হঠাৎ কুমারেশের মন সোমেশের উপর বিরূপ হইয়া উঠিল। ছি, এমন রত্নকেও সে হারাইয়াছে।

ইহাদের মৌন ভারতীর একেবারে ভাল লাগিতেছিল না, সে ক্ষুব্ধকণ্ঠে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া কহিল—বেশ! যাবেন না তো? আচ্ছা।

ভারতী অভিমান করিয়াছে বুঝিয়া শকুন্তলা তাহার পিঠে হাত রাখিয়া বলিল—রাগ ক'রো না লক্ষ্মী, আমার অনেক কাজ কিনা তাই আজ যেতে পারলাম না।

ভারতী ঘাড় বাঁকাইয়া আবদারের সুরে বলিল—তবে কাল চা-এ আসবেন বলুন?

—কালও না।

—তবে?

—কালও কাজ আছে কিনা।

—তবে পরশু? পরশু রবিবার, সেদিন নিশ্চয় কাজ নেই আপনার।

শকুন্তলা হাসিয়া বলিল—আচ্ছা। চা কিন্তু তোমাকে করতে হবে, নিমন্ত্রণ তুমিই করলে কিনা, তোমার দাদু তো কিছু বলেন নি!

কুমারেশ একটু হাসিলেন। তাই হবে, সরঞ্জাম সব হাতের কাছে তৈরী পেলে ও সুন্দর চা করে; আমার চাও মাঝে মাঝে ও-ই করে দেয়।

শকুন্তলা মুগ্ধদৃষ্টিতে ভারতীর দিকে চাহিয়া দুইটি আঙ্গুল দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিল।

গাড়ি ঘুরিয়া আবার পুলের কাছে আসিল। আব-হাওয়া এবার যেন অনেকটা হালকা হইয়া আসিয়াছে। কুমারেশ বলিলেন—চল এবার তোমায় বাসায় পৌঁছে দিই। শকুন্তলা আর আপত্তি করিল না।

ল্যান্সডাউন রোডের বাসায় শকুন্তলাকে নামাইয়া দিয়া কুমারেশের গাড়ি যখন বাড়ি ফিরিতেছিল তখন ভারতী এক-বার বলিয়া উঠিল—দাদু, ইনি আমার বউদি হলে বেশ হত নয়? কেমন সুন্দর চেহারা, মেমেদের চেয়েও অনেক ভাল, নয়?

উত্তরে ছোট্ট একটা 'হুঁ' বলিয়া কুমারেশ আবার যেন চিন্তার সাগরে ডুবিয়া গেলেন। (ক্রমশ)

মানুষের ঘর

(২১০ পৃষ্ঠার পর)

একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে একটানা সুরে। ধীরে ধীরে দেব-আরতির ঘণ্টা কাঁসর ধ্বনি থেমে এল, গ্রাম পথও হয়ে উঠল পথিকহীন। শুধু মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল নিশাচর জীব জন্তুর পদধ্বনি, কুকুরের ডাক।

এমনি ক'রেই রাত যে কত এবং কেমন ক'রে বেড়ে চলল, সদু তার খোঁজও করল না। মানিক যখন হাতের লাঠি মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বাড়ি এসে হাজির হ'ল তখনও সে বারান্দায় আঁচল পেতে শুয়ে। মানিক ডাকলে, "মা!"

সদু উঠল; লণ্ঠনটা বাড়িয়ে উঁচু ক'রে ধ'রে বললে "আয়।"

মানিক ঘরে এল; গায়ের হাতকাটা ফতুয়াটা খুলে আলনায় রেখে এসে বারান্দায় বসল সদুর পাশে। বললে, "ভাত দেবে না? রাত তো হ'লো অনেক।"

সদু বললে, "ভাত রাঁধিনি!"

"তবে?"

"রুটি ক'রে রেখেছি ওবেলা।"

মানিক হাসলো; বললে, "বেশ তো মা, তাই খাওয়া যাবে দুজনে।"

সদু এ কথার জবাব দিলে না। মানিক আজ অনেক দিন পরে সদুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সেইখানে; সদু চুপ ক'রে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার মাথায়।

এমনি ভাবে কিছুক্ষণ যাবার পরে মানিকের মনে হ'ল যেন তার কপালের উপরে গরম দুফোঁটা জল ঝ'রে পড়ল সদুর চোখ থেকে। সে চমকে উঠল; "মা তুমি কাঁদছ?"

চকিতে চোখ মুছে সদু জবাব দিলে, "না রে।"

"তবে?"

"চোখে কি পড়েছিল।"

মানিক বুঝল মানুষের মন কোনও সময়ে ভালও থাকে যেমন, আবার খারাপও হয় তেমনি। তাই নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না।

মানিক চুপ ক'রে রইল।

সদু উঠে পড়ল। বারান্দায় ঠাঁই ক'রে খাবার দিয়ে ডাকলে, "আয় মানিক।"

মানিক এসে বসল খেতে; বললে, "আর তুমি?"

"আমার আজ শরীরটা মোটেই ভাল নেই মানিক।"

মানিক লক্ষ্য করেছিল সদুর মুখখানা আজ যেন কেমন বিমর্ষ; তাই সে আর খাওয়ার বিষয় নিয়ে তাকে বেশী অনুরোধ করলে না, খাওয়া সেরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমতে পারল না। সদুও এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং তার নাসিকাধ্বনি অনতিবিলম্বে মানিককে জানিয়েও দিলে যে সে নিদ্রিত।

কোথাও আর কোনও শব্দ নেই, শুধু তার বুকের শব্দটাই যেন স্পষ্ট দ্রুত হয়ে উঠেছে তার কাছে।

কতক্ষণ এভাবে কেটে গেল কে জানে, ধীরে ধীরে এক সময় উঠে সে দরজা খুলে বার হয়ে এল বারান্দায়। তার দরজা খোলার শব্দে সদুর ঘুম ভেঙ্গে গেল; চোখ চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাচ্ছিস মানিক, এই রাত দুপুরে?"

একটু হেসে মানিক জবাব দিলে, "কোথাও নয় মা, এই বারান্দায়। বড্ড গরম কিনা তাই। তোমার ভয় নেই, ঘুমও।"

সদু আর কোন কথা কইলে না। (ক্রমশ)

পাকিস্থানে দরিদ্র মুসলমানের স্থান

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

মুসলিম লীগ পরিকল্পিত পাকিস্থানের বিষয়ে এযাবৎ বহু আলোচনা হইয়াছে। সত্য সত্যই যদি ভারত বণ্টন হইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত ভারতের নিরাপত্তা কিভাবে রক্ষিত হইতে পারে, তাহা পরিকল্পনারচকগণ স্থিরভাবে বলিয়া দিতে পারেন নাই। লীগওয়ালারা পাকিস্থান ব্যতীত অন্য কোন সুবিধাজনক প্রতিশ্রুতিতে সম্মত হইবেন না। কিন্তু এই পরিকল্পনার কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিক অবহেলা করিলে চলিবে কেন? সর্বপ্রথম সমস্যা ভারতবর্ষকে কেমন করিয়া বণ্টন করিবেন? বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মতিক্রমে ইহা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। ব্রিটিশ সরকার এইপ্রকার সম্মতি ব্যতিরেকে কেবল মাত্র লীগওয়ালাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পাকিস্থান পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং একমাত্র পথ রহিল গৃহযুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পাকিস্থানকে কার্যকরী করা সম্ভব হইবে না। আয়ারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্তকে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আইরিশবাসীদের সম্মতিক্রমে আয়ারল্যাণ্ড হইতে আলস্টার বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এজন্য রীতিমত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। অন্যান্য দেশও গৃহযুদ্ধ ব্যতীত দ্বিখণ্ডিত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিতে হইলে গৃহযুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হইবে না।

কিন্তু ভারতবর্ষে গৃহযুদ্ধ বলিতে কি বুঝায়? আর এই যুদ্ধের পরিণতিই বা কি হইতে পারে? হয়তো প্রথম প্রথম একদিকে সমগ্র হিন্দু ও অন্যদিকে সমগ্র মুসলমান এইভাবে দুই দল গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হইবে। হিন্দু চাহিবে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত হইতে দিব না। আর মুসলমান চাহিবে যেমন করিয়াই হউক দ্বিখণ্ডিত করিব। এইপ্রকার গৃহযুদ্ধ পরিশেষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ ধারণ করিতে বাধ্য হইবে। কারণ হিন্দু মুসলমানের গৃহযুদ্ধের একমাত্র পরিণতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হইবে কে? আর কেই বা হইবে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত? ইতিপূর্বে দেশে যেসব দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, এই দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে হিন্দু মুসলমানের কায়েমী স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে হাজার হাজার জনসাধারণ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে উভয় সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ নানাভাবে লাভবান হইয়াছে। ভবিষ্যতে দেশের যেখানে যেভাবেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হউক না কেন, তাহাতেও সেই কায়েমী স্বার্থই লাভবান হইবে। আর জনসাধারণ সকল বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। হিন্দু কায়েমী স্বার্থ একাকী মুসলিম কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, অথবা মুসলিম কায়েমী স্বার্থ একাকী হিন্দু কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়িতে যাইবে না, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোটি কোটি জনসাধারণের ধর্মান্ধতার কোমল অনুভূতির সুবিধা লইয়া কার্য করিবে। কার্যোদ্ধার হইয়া গেলে জনসাধারণকে প্রত্যেক ব্যাপারে বঞ্চিত করিতে থাকিবে। পাকিস্থানকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ হইবে, তাহাতে জনসাধারণ হয়তো অনায়াসে যোগদান করিবে; কিন্তু যে পক্ষেরই জয় হউক না কেন, তাহাতে জনসাধারণের কোন উপকার হইবে না। এত সাধ্য সাধনা ও রক্তপাতের পর যে ফল পাওয়া যাইবে তাহা সাধারণ লোকের আর্থিক দুর্গতি দূর করিতে পারিবে না। তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িবে। পাকিস্থানের পুণ্যভূমিতে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াও দরিদ্র মুসলমানের দুর্দশা মোচন কোনও দিনই হইবে না।

যাহারা দেশের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি চাহে, তাহাদের দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা একটা সমস্যাই নহে। তাহারা বিশ্বাস করে অর্থনৈতিক সমস্যার কোন সাম্প্রদায়িক অর্থ হইতে পারে না। বড়লোক পুঁজিপতি, জমিদার প্রভৃতি যে সম্প্রদায়ের হউক না কেন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ লইয়া কোন দ্বন্দ্ব নাই, সংঘর্ষ নাই, তাহারা এক ও সমস্বার্থ বিশিষ্ট। সেইরূপ অর্থনীতিক সমস্যা লইয়া জনসাধারণের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ নাই। যুগে যুগে পুঁজিপতিগণ নানা কৌশলে জনসাধারণকে আপনাদের কবলে রাখিয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিয়াছে। এই যে দেশে সতত সাম্প্রদায়িক কলহ দাঙ্গা হাঙ্গমা হইয়া থাকে তাহাও সেই পুঁজিপতি ও দরিদ্র জনসাধারণেরই সংগ্রাম। ইহার আকার আলাদা হইতে পারে, সংগ্রামের ধারা বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য একই—পুঁজিপতিদের দ্বারা জনসাধারণের শোষণ। আমাদের বিবেচনায় ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে এইভাবে বিচার করিলে স্পস্ট বোধ হইবে যে, ইহার প্রধান কারণ মতামতের পার্থক্য নহে, ইহাও সেই অর্থনৈতিক সমস্যাসম্ভূত একটা বিরাট সংঘর্ষের সূত্রপাত। লীগের পাকিস্থান পরিকল্পনার মধ্যেও এই কায়েমী স্বার্থকে চিরস্থায়ী করিবার গোপন উদ্দেশ্য নিহিত আছে। সুতারং সাধারণ মুসলমানের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। যতই দিন যাইতেছে, ততই কংগ্রেস ও লীগের পার্থক্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। উপস্থিত পাকিস্থানকে কেন্দ্র করিয়া যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আপসের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মুসলিম লীগ চায় ধর্মনৈতিক রাষ্ট্র, আর কংগ্রেস চায় ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। মুসলিম লীগ চায় না যে, মুসলিম শ্রমিক, কৃষক ও বেকার হিন্দু শ্রমিক কৃষক ও বেকারের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ দূরে করিবার চেষ্টা করুক। কারণ তাহা হইলে ধর্মনৈতিক রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। এই সব মুসলিম বেকার, কৃষক ও শ্রমিক তাহা হইলে কি করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ দূরে করিবে? লীগের মতে সমগ্র মুসলিম সংহতি হইতে পৃথক হইবার তাহাদের কোন অধিকার নাই। সুতরাং ইহাদিগকে মুসলিম পুঁজিপতি জমিদার ও কায়েমী স্বার্থের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিয়া থাকিতে হইবে। ইহাতে যদি তাহাদের কিছু ক্ষতি হয় সেও স্বীকার। কিন্তু মজার কথা এই যে, জমিদারদের কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকিলে, যত ক্ষতি দরিদ্রদের হইবে, জমিদারদের হইবে না। কারণ পুঁজিবাদের মর্মকথা হইতেছে শোষণ। শোষক কখনও নিজেকে শোষিত হইতে দিবে না। সে অপরকেই শোষণ করিতে থাকিবে। সমগ্র মুসলমান একই দলের অন্তর্গত। লীগের এই দাবি যদি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে মুসলমানের দিক হইতে সমগ্র শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তি ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। আর লীগওয়ালারা তাহাই চান। সেই জন্য তাঁহারা নানাভাবে মুসলিম সংহতির মহিমা প্রচার করিয়া থাকেন। আর পাকিস্থানেরও ইহাই হইল মর্মকথা। পূর্বে যে গৃহযুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, হয় ত তাহার ফলে ভারত বণ্টন হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাতে কি দরিদ্র মুসলমানের অর্থনৈতিক সমস্যার কোন সমাধান হইবে? আজ হিন্দু শ্রমিক ও মুসলিম শ্রমিকের সাধারণ কর্মকেন্দ্র আছে, তাহারা সেইখানে দাঁড়াইয়া সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারিবে। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখণ্ডিত হইলে শ্রমিকদের মিলিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। তাহাদেরকে অসহায় দেখিয়া ধনিকগণ তাহাদেরকে অধিকতর নির্মমতার সহিত শোষণ করিতে থাকিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাকিস্থানের দ্বারা ধনিক মুসলমানগণ লাভবান হইতে পারে, কিন্তু তাহা দরিদ্রদের জন্য কোন মঙ্গলের আভাস দিবে না। তাহাদের জন্য পাকিস্থান অভিশাপস্বরূপ হইবে। আমরা আশা করি পাকিস্থান পরিকল্পনার কথা শুনিয়া দেশের মুসলমান জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইবে না। তাহাদের আর্থিক মুক্তির পথে শত শত বাধার মত ইহাও একটা মস্ত বাধা স্বরূপ হইবে। আজ সমস্ত শক্তি দিয়া পাকিস্থানের প্রতিবাদ করিতে হইবে। নতুবা দরিদ্র মুসলমানের ধ্বংস অনিবার্য।

পরলোকগত লেয়ন ট্রট্স্কি

মেক্সিকোর রাজধানীতে আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণের ফলে রুশ বিপ্লবের প্রাক্তন বিপ্লবী পৃথিবী-বিখ্যাত মনীষী লেয়ন ট্রট্স্কির মৃত্যু হইয়াছে। স্বদেশ-বহিষ্কৃত এবং সাম্যবাদী বিপ্লবী সমাজে অধুনা নিন্দিত এই প্রতিভাশালী ব্যক্তি শেষ জীবনে 'অভিশপ্ত ইহুদি'র মত দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া অবশেষে দূর মেক্সিকোতে শোচনীয় মৃত্যু আলিঙ্গন করিলেন। এই চরম ঘটনার দায়িত্ব কাহার এবং মূল কোথায় সে বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন, এক অসাধারণ জীবনের অবসান যে এইভাবে হইল, ইহাই সর্বাপেক্ষা মর্মন্তুদ।

মঃ ট্রট্স্কির জীবন অতি বৈচিত্র্যময়। পাণ্ডিত্য, কর্মশক্তি, আত্মোৎসর্গ, আত্মশ্লাঘা, সমষ্টি-আদর্শে অনুরাগ, ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রবণতা, মহত্ত্বের গুণগ্রহণ ও মহত্ত্বের বিরোধিতা—এই সকলের অদ্ভুত সংমিশ্রণ হইয়াছিল একটি চরিত্রে। এই কারণে তাঁহার জীবনও ছিল অস্থির, অশান্ত অসহিষ্ণু। এই কারণেই, মনে হয়, তিনি সেই সমষ্টিগত অস্তিত্ব ও দলগত একাগ্রতা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, যাহা সাম্যবাদীর পক্ষে অপরিহার্য। ইহা আবার তাঁহাকে আরও অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছে এবং অনেক সময় বিপথগামীও করিয়াছে। এইভাবে নিজের প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তিনি পরবর্তী জীবনে এক বিষচক্রে আবর্তিত হইয়াছেন। বিপ্লবের স্থিতিহীন আলোড়নে যে জীবন খাপ খাইয়াছিল, ধীর সংগঠন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিনে তাহা নিজেকে কিছুতেই মানাইয়া লইতে পারে নাই। এইখানেই ট্রট্স্কির জীবনের ট্র্যাজিডি।

মঃ ট্রট্স্কির প্রকৃত নাম লেইবা ডেভিডভ ব্রোনস্টাইন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার অন্তর্গত এলিজাবেথগ্রাডের নিকট এক মধ্যবিত্ত ইহুদি পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ওডেসার স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিপ্লবী বলিয়া ধৃত হন এবং পূর্ব সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। ১৯০২ সালে তিনি "লেয়ন ট্রট্স্কি" এই ছদ্মনামে ইংলণ্ডে পলায়ন করেন, (তখন হইতেই তিনি ঐ নাম ব্যবহার করিতে থাকেন)। লণ্ডনে ১৯০২ সালে লেনিনের সহিত ট্রটস্কির প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার অসামান্য বুদ্ধি ও প্রতিভায় লেনিন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার সহযোগিতায় রুশ "সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক লেবার পার্টির" মুখপত্র "ইস্ক্রা" প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯০৩ সালে "সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টি"র দ্বিতীয় সম্মেলনে কর্মপন্থা লইয়া পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হয়; পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনে লেনিনপন্থীদের জয় হয় এবং প্লেখানভপন্থীরা পরাজিত হয়। সেই হইতে লেনিনপন্থীদের নাম হয় "বলশেভিক" (সংখ্যাগুরু) এবং বিরোধী দলের নাম হয় "মেনশেভিক" (সংখ্যালঘু)।

ট্রট্স্কি এই দুই দলের কোন দলেই যোগদান করিলেন না, কার্যত তিনি বরং মেনশেভিকদের সহিত খানিকটা সহযোগিতা করিতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৩ হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি বলশেভিকদের বিরুদ্ধতাই করেন।

১৯০৫ সালে জাপানের সহিত যুদ্ধে রুশিয়া পরাজিত হইলে জারতন্ত্র গণবিপ্লবের সম্মুখীন হয়। এই সময় ট্রট্স্কি স্বদেশে ফিরিয়া যান এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গ "সোভিয়েট অব ওআর্কার্স অ্যান্ড ডেপুটিজ"এর সদস্য হন এবং উহার এক সভায় সভাপতিত্ব করার সময় গ্রেফ্তার হন। তাঁহাকে পুনরায় সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। তিনি পুনরায় সাইবেরিয়া হইতে পলায়ন করিয়া ভিয়েনায় যান এবং "আর্বাইতারৎ সাইতুং" ও "প্রাভ্দা" পত্রিকার জন্য কাজ করিতে থাকেন। ১৯১০ সালে ট্রট্স্কি কোপেনহাগেনে সোশ্যাল ডেমক্র্যাট পার্টির কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যবর্তী একটা পথ অবলম্বন করেন। ১৯১২ সালে তাঁহার সহিত গুপ্ত দল ভাঙিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী "লিকুইডেটর"দের মৈত্রী হয়। ১৯১৩ সালে তিনি সমর সংবাদদাতারূপে কনস্টান্টিনোপলে যান। পর বৎসর তিনি অস্ট্রিয়ায় আসেন। তখন মহাযুদ্ধ বাধে। সেখান হইতে ফ্রান্সে যান; ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি ১৯১৬ সালে স্পেনে যান। স্পেনীয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাঁহাকে গ্রেফ্তার করেন; কিন্তু পরে আমেরিকায় যাইবার অনুমতি দেন। আমেরিকায় তিনি "নোভি মির" (নূতন জগৎ) নামে এক বৈপ্লবিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

লেয়ন ট্রট্স্কি ও তাঁহার পত্নী

১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ বাধিলে মেনশেভিকরা জাতীয় শাসক শ্রেণীর পক্ষে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ সমর্থন করিতে থাকে; কিন্তু ট্রট্স্কি যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করেন। যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়া জার্মান ভাষায় এক পুস্তক লেখার জন্য তাঁহার আট মাস কারাদণ্ডও হইয়াছিল। তবে লেনিনের সহিত তখনও তাঁহার পূর্ণ মতৈক্য হয় নাই—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করিবার জন্য লেনিন যে নীতি প্রবর্তন করেন সে সম্বন্ধে তাঁহার বিরোধী মত ছিল।

১৯১৭ সালে রুশিয়ায় বিপ্লব আরম্ভ হইলে ট্রট্স্কি স্বদেশে

যাত্রা করেন। কিন্তু হ্যালিফ্যাক্সে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে আটক করেন। পরে অস্থায়ী রুশ গভর্নমেন্টের দাবীতে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মে মাসে তিনি রুশিয়ায় পৌঁছান। লেনিন তখন অস্থায়ী গভর্নমেন্টের নিকট হইতে রাজক্ষমতা সোভিয়েটের হস্তগত করার জন্য আন্দোলন করিতেছিলেন। ট্রট্স্কি ইহাতে তাঁহাকে সমর্থন করেন। কিন্তু তখনও তিনি বলশেভিক দলের সদস্য হন নাই। বলশেভিক দলে তিনি নাম লেখান ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে। নভেম্বর মাসে বলশেভিক বিপ্লব হইয়া গেলে তিনি সোভিয়েট গভর্নমেন্টের পররাষ্ট্রসচিব পদে নিযুক্ত হন।

জার্মানদের সহিত সোভিয়েটের ব্রেস্ট লিটভস্ক্ চুক্তির আলোচনায় ট্রট্স্কি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। প্রথমে জার্মানরা যে সর্ত দেয় ট্রট্স্কি তাহা অগ্রাহ্য করেন, যদিও লেনিন উহা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। অতঃপর ট্রট্স্কির সহিত বিতর্ক করিয়া লেনিন তাঁহাকে স্বমতে আনেন। ইহার পরে পূর্বাপেক্ষা কঠোরতম জার্মান সর্তে ব্রেস্ট লিটভস্ক্ চুক্তি নিষ্পন্ন করিতে হয়। চুক্তির পর ট্রট্স্কি সমরসচিব পদে স্থানান্তরিত হন। এই পদে তিনি অসামান্য কর্মক্ষমতার পরিচয় দেন। তাঁহার প্রবল আবেগ ও উৎসাহ সকলকে অসমসাহসিক কর্মোদ্যমে উদ্বুদ্ধ করে; তাঁহার বক্তৃতায় শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে অপূর্ব উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, অল্পকালের মধ্যে সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী গড়িয়া ওঠে। যদিও জার আমলের অফিসারগণকে নিয়োগের নীতি বলশেভিক দলের অনেক নেতা বাধা দেন, তথাপি ট্রট্স্কি তাহাদিগকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করেন। পূর্ব হইতেই রচনা শক্তির জন্য ট্রট্স্কির খ্যাতি ছিল, এই সময় লেনিনের সাহচর্যে দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠান, বাগ্মিতা, পান্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব তাঁহার খ্যাতিকে সর্বত্র বিস্তৃত করে।

১৯২০ সালে ট্রট্স্কি ওয়ারস অভিযানের বিরোধিতা করেন; কিন্তু লেনিন তাঁহার মত অগ্রাহ্য করেন। ১৯২৩ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রাচীন সদস্যেরা তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষমতা হস্তগত করিয়া ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করার অভিযোগ করিতে থাকেন। স্ট্যালিন, জিনোভিয়েভ প্রমুখ নেতা তাঁহাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তাঁহার অনেক বন্ধু ব্যক্তিকে তাহাদের পদ হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। এই সময় তিনি যখন স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ককেসাসে যাইতেছিলেন, তখন লেনিনের মৃত্যু হয়।

বাহির হইতে সকলে ভাবিয়াছিল যে, লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্স্কিই তাঁহার পদাধিকারী হইবেন। কিন্তু তাহা হইল না। যাঁহারা বরাবর কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য থাকিয়া কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি পার্টির বেশী আস্থা ছিল। ক্রমে ক্রমে স্ট্যালিন সম্মুখে আগাইয়া আসিলেন।

ট্রট্স্কি ককেসাস হইতে ফিরিলে তাঁহাকে সমরসচিবের পদ হইতে সরাইয়া অন্য এক সাধারণ পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৫ সালে তিনি সে পদ ত্যাগ করিলে অন্য এক পদে নিযুক্ত হন। ভিতরে ভিতরে এই সময় স্ট্যালিনের সহিত তাঁহার বিরোধ চলিতে থাকে। বলশেভিক কর্মনীতি লইয়া তাঁহাদের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। ট্রট্স্কি আশু বিশ্ববিপ্লবের মতবাদ ব্যক্ত করেন, স্ট্যালিন রুশিয়ায় প্রথমে সমাজতন্ত্রবাদ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করার অভিমত উপস্থিত করেন।

স্ট্যালিনের সহিত দ্বন্দ্বে ট্রট্স্কি পরাজিত হন; কম্যুনিস্ট পার্টি স্ট্যালিনকেই সমর্থন করেন। ১৯২৭ সালে ট্রট্স্কি নানারকম পার্টি বিরোধী কাজ করার অভিযোগে পার্টি হইতে বহিষ্কৃত হন। ১৯২৮ সালে তিনি তুর্কীস্থানে নির্বাসিত হন। পরে তাঁহাকে সোভিয়েট হইতে বহিষ্কৃত করা হইলে তিনি ১৯২৯-এ কনস্টান্টিনোপলে চলিয়া যান।

১৯২৯ হইতে ট্রট্স্কি নানাদেশে আশ্রয়প্রার্থীরূপে ঘুরিয়াছেন। নয়টি দেশ তাঁহাকে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়ায় তিনি ১৯৩৩ সালে কর্সিকায় যান, পরে ফ্রান্সে থাকিবার অনুমতি পান। সে অনুমতি ১৯৩৪ সালে প্রত্যাহার করা হইলে, তিনি নরওয়েতে আশ্রয় পান।

ইহার কিছু পরেই সোভিয়েট রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বহু বিশিষ্ট নেতার বিচার হয়। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট অভিযোগ করেন যে, ট্রট্স্কি এই সকল ষড়যন্ত্রের মূলে আছেন। একাধিক মামলায় বহু ব্যক্তির প্রাণদণ্ড ও কঠোর কারাদণ্ড হয়। ইহার পর সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের চাপে নরউইজান গভর্নমেণ্ট ট্রট্স্কিকে অন্তরীণ করিয়া রাখেন। নরওয়েতে থাকিবার মেয়াদ শেষ হইলে মেক্সিকো গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে আশ্রয় দেন।

ট্রট্স্কির পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা অবিসংবাদী। তাঁহার বক্তৃতার ক্ষমতাও অনন্যসাধারণ। অনেকের মতে তিনি বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী।

ট্রট্স্কির ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা ও আত্মসচেতনতা সম্বন্ধে তাঁহার গুণানুরাগী বন্ধু লুনাচার্স্কি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃতিযোগ্য। লুনাচার্স্কি বলিয়াছেন,—

"একটি বিরাট উদ্ধত ভাব, অন্য লোক সম্বন্ধে কোমল ও মনোযোগী হইবার অক্ষমতা বা অনিচ্ছা এবং যে মাধুর্য লেনিনকে সর্বদা ঘিরিয়া থাকিত, তাহার অভাব ট্রট্স্কিকে এক রকম একাকীত্বে নির্বাসিত করিয়া রাখিত। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহার কয়েকজন ব্যক্তিগত বন্ধুও (আমি অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কথা বলিতেছি) পরে তাঁহার ঘোর শত্রু হন। রাজনৈতিক দলে কাজ করিবার পক্ষে ট্রট্স্কি উপযোগী ছিলেন না বলিয়া মনে হয়; কিন্তু যে ঐতিহাসিক ঘটনার সমুদ্রে এই সব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে সেখানে শুধু তাঁহার গুণের দিকটাই সামনে আসিত।......

"ট্রট্স্কির প্রধান বাহ্যিক গুণ হইতেছে তাঁহার বাগ্মিতা ও রচনাশক্তি। আমি ট্রট্স্কিকে আমাদের কালের সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলিয়া মনে করি। আমি আমার সময়ে সমাজতন্ত্রবাদের ক্ষেত্রে সমস্ত বড় পার্লামেণ্টারী ও জনপ্রিয় বাগ্মীর বক্তৃতা এবং বুর্জোয়া জগতের বহু বিখ্যাত বাগ্মীর বক্তৃতা শুনিয়াছি; কিন্তু এক ঝোরে (ফরাসী সমাজতন্ত্রী নেতা) ছাড়া তাঁহাদের আর কাহাকেও ট্রট্স্কির পাশাপাশি বসাইতে পারি না।......আমি ট্রট্স্কিকে আড়াই হইতে তিন ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিয়া যাইতে শুনিয়াছি, আর এই সমস্ত সময়টা শ্রোতারা দণ্ডায়মান হইয়া সম্পূর্ণ নীরবভাবে তাঁহার কথা শুনিয়াছে, যেন তাহারা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া এক বিরাট রাজনৈতিক নিবন্ধ শুনিতেছে।

"ট্রট্স্কি অসহিষ্ণু ও প্রভুত্বভাবাপন্ন। শুধু লেনিন ও তাঁহার মিলন হওয়ার পর লেনিনের সহিত সম্পর্কে তিনি সর্বদা একটা কোমল মর্মস্পর্শী বশ্যতা দেখাইতেন। তিনি মহৎ-সুলভ বিনয়ে লেনিনের প্রাধান্য স্বীকার করেন।...........

"চার্নোভ যখন গভর্নমেণ্টে পদ গ্রহণ করেন, তখন ট্রট্স্কির একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য আমার মনে আছে। ট্রট্স্কি বলিয়াছিলেন—'কি ঘৃণ্য লিপ্সা—একটা দপ্তরের জন্য ইতিহাসে তাঁহার স্থান বিসর্জন দিলেন।' ইহার মধ্যেই ট্রট্স্কির সমস্ত পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মধ্যে কোন শূন্যদম্ভ নাই।

....

"ট্রট্স্কি প্রায়ই নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, যাহা লেনিন করিতেন না। ট্রট্স্কি তাঁহার ঐতিহাসিক ভূমিকাকে মূল্যবান মনে করিয়া লালন করেন এবং প্রকৃত বিপ্লবী নেতার জ্যোতির্ময় রূপ লইয়া মানবজাতির স্মৃতিতে জাগরূক থাকিবার উদ্দেশ্যে তিনি যে কোনরূপ আত্মোৎসর্গ করিতে, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে নিঃসন্দেহে প্রস্তুত। তাঁহার ক্ষমতাপ্রিয়তা লেনিনের সম প্রকৃতির; কিন্তু পার্থক্য এই যে, লেনিনের মত

(শেষাংশ ২২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দীক্ষা

(অনূদিত গল্প)

শ্রীজয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রবিবার। গির্জার ঘণ্টা নিস্তব্ধ প্রভাতের মৌন ভঙ্গ ক'রে বেজে উঠে উপাসনার দিন ঘোষণা করলে।

বার্কহিলের ছোট্ট দু মাসের ছেলেটির আজ দীক্ষা। সকাল থেকেই বার্কহিলের বাড়িতে উত্তেজনা ও আনন্দের যেন শেষ নেই। বাবা, মা, দিদিমা, ঠাকুরদা, ঠাকুমা, মায় ছেলেটির নার্সটা পর্যন্ত আজ চঞ্চল।

যথাসময়ে সাজগোজ করে চকোলেট চিবুতে চিবুতে শ্বেতকায় ছেলেটিকে সিল্কের চাদরে ঢেকে নিয়ে শোভাযাত্রার মত করে সকলে গির্জা অভিমুখে অগ্রসর হল। সকলেরই মুখে চোখে আনন্দের প্রতিচ্ছায়া।

গির্জা। বার্কহিলের বড় ভাইই হলেন পুরোহিত। তিনি অবিবাহিত, ধর্মের কঠোর অনুশাসনে তিনি সকল বাঁধনের ঊর্ধ্বে। বয়স বত্রিশ; রূপবান। ভিড় করে সকলে ভিতরে ঢুকল। মুহূর্তের মধ্যে একটা গম্ভীরভাব প্রত্যেককে আত্মসমাহিত করে তুলল। ছোট ছোট ছেলেগুলো পর্যন্ত আর তাদের স্বভাবসিদ্ধ চাঞ্চল্য প্রকাশ করলে না।

দীক্ষা শুরু হল। চৈত্যের উপর থেকে পুরোহিত গম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করে দিলেন। বার্কহিল আর তাঁর স্ত্রী তাঁদের ছোট্ট ছেলেটিকে বুকে করে যীশুর ক্রুশের তলায় হাঁটু গেড়ে বসলেন। পুরোহিত হঠাৎ শিশুটির মুখের দিকে দু মিনিট তাকিয়ে অকারণে চমকে উঠলেন। কিন্তু এ চমকে ওঠা মুহূর্তের জন্য। স্মিতহাস্যে তিনি শিশুকে আশীর্বাদ করলেন; নামকরণ হল -আলফ্রেড জন।

আবার চেঁচামেচি, হুড়োহুড়ি করতে করতে দলটি ফিরে চলল বাড়ির দিকে। পুরোহিতের গির্জার কাজ শেষ হয়েছিল, তিনিও তাদের সঙ্গ নিলেন।

নার্সটা মোটা, অন্তত আড়াই মন তার ওজন। তারই কোলে নবদীক্ষিত জন শুয়ে শুয়ে দুনিয়ার অবোধ্য ভাষায় জানাচ্ছিল নিজের রহস্যময় আনন্দ; হাত পা ছোঁড়ার তার আর বিরাম নেই। পথের মাঝখানেই নার্স ক্লান্তির একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে; ফোঁস করে শব্দ হল। তার পর পুরোহিতের দিকে চাদর মোড়া জনকে তুলে ধরে বললে,—"না হয় আপনার বিয়েই হয় নি, কিন্তু তাই বলে কি ভাইপোকে একটু ধরতেও নেই? নিন ধরুন।" বলে জোর করেই সে পুরোহিতের কোলে জনকে চালান করে দিলে।

ছোট্ট নরম নরম একতাল মাংসপিণ্ড হাত নাড়ছে, পা নাড়ছে, মধ্যে মধ্যে হেসেও উঠছে। পুরোহিত অবাক হয়ে তাই দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন। জীবন তাঁর কঠিন, বন্ধনহীন; সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে একান্তমনে ডাকা আর তাঁর বাণী জগতের লোকদের কাছে পবিত্রভাবে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ ছাড়া আর কোনও কামনাই তাঁকে স্পর্শ করে না। কিন্তু পুরোহিত আজ কি জানি কেন বিচলিত হলেন। হঠাৎ নরম কচি ঠোঁটের উপর একটি সুদীর্ঘ চুম্বন অঙ্কিত করে দিলেন।

ব্যাপারটা রসিক ঠাকুরদার চোখ এড়াল না; শোরগোল করে তিনি বলে উঠলেন, "ইচ্ছে করলে ওই রকম মধুর বস্তু তুমিও পেতে পারতে স্মিথ। আমাদেরও তাই ইচ্ছে, এ সব বয়সে কি ধর্মচর্চা হয়, না সাজে?" বলে হো হো ক'রে তিনি হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসির সঙ্গে অন্যেরাও যথাকালে যোগ দিলে। পুরোহিতের মুখ দেখে মনে হল কে যেন তাঁর সুন্দর মুখে আবীর মাখিয়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যা। পাড়াপড়শীরা এসে যোগ দিয়েছে বার্কহিলের বাড়ির ভোজ উৎসবে। ঘরের মধ্যে লম্বা টেবিল পাতা, তার চারপাশে সকলে বসে গিয়েছে খেতে। চা, কাফি, ডিম, মাংস, নানাবিধ কেক্, পুডিং, স্যাণ্ডউইচ্...কিছুরই অভাব নেই।

ঘরের আবহাওয়া হাসি ঠাট্টায়, হালকা অভিমানে হয়ে উঠেছে মুখর; দুঃখ বা বেদনা কোনও কালে যে কেউ পেয়েছে তার এতটুকু চিহ্ন কারও মুখে নেই। বুড়ো ঠাকুরদা অবিবাহিতা তরুণীদের সঙ্গে রসিকতা করে মাঝে মাঝে তাদের মুখমণ্ডলকে রাঙা করে তুলছিলেন।

ঘরের একটা কোণে আলাদা আসনে পুরোহিত বসে ছিলেন, মুখ গম্ভীর; চোখে কি যেন একটু অনির্দিষ্ট ব্যথার ছোঁয়াচ। আস্তে আস্তে তিনি কেক খাচ্ছিলেন; খাওয়ার মধ্যেও কোনও আন্তরিকতা ছিল না। ঠাকুরদা হঠাৎ বলে উঠলেন, "তুমি যে কিছুই খাচ্ছ না স্মিথ? তোমার হয়েছে কি।"

উদাসস্বরে পুরোহিত উত্তর দিলেন,—"ভাল লাগছে না।"

সকলে তাঁর মুখের দিকে একবার তাকাল মাত্র, হাস্য-পরিহাস চলতে লাগল। পুরোহিতের পাশে জনকে শোয়ানো ছিল। জন খেলছিল বেশ,—হঠাৎ হাসির বোমাবর্ষণে সে কেঁদে উঠল! ঠাকুরদা বলে উঠলেন, "ছেলেটা ভারী অরসিক তো! যাও যাও ওকে ওঘরে শুইয়ে এস গে।"

জনের মা উঠে গেল ছেলেকে নিয়ে। তার পর পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এসে বললে, "ঘুমুচ্ছে।"

তার পর কখন সকলের অলক্ষ্যে পুরোহিত উঠে চলে গেলেন।

আধ ঘণ্টা পরে জনকে দেখে আসবার জন্য ওর মা উঠে গেল। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকেই ভয়ে চীৎকার করে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এসে বললে, "চোর ঢুকেছে—ভূত; ঠিক যেন কান্নার শব্দ!"

কোনও জায়গায় বোমা পড়লে তার চারিপাশে যেমন লন্ডভন্ড বেধে যায়, হেলেনার কথায় ভোজের টেবিলেও যেন ঠিক তেমনি ব্যাপার হল। বড় বড় চোখ করে ঠাকুরদা তার রূপো বাঁধানো লাঠিটা তুলে নিয়ে এগিয়ে চললেন চোরের সন্ধানে। পিছনে চলল সব পদাতিকের দল। প্লেট, গেলাস, ফুলদানি, বিস্কুটের খালি বাক্স—যা সামনে পেলে তাই তুলে নিয়ে।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে ঠাকুরদা সুইচ টিপলেন; উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভেসে গেল। দেখা গল, নিদ্রিত জনের দোলনার উপর মাথা রেখে পুরোহিত স্মিথ হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে আছেন; দু চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাঁর জল।*

*মোপাসাঁ হইতে।

পরলোকগত লেয়ন ট্রট্স্কি

(২২৪ পৃষ্ঠার পর)

অভ্রান্তপ্রায় বিচারশক্তি তাঁহার না থাকায় ভুল করা তাঁহার পক্ষে বেশী সম্ভব এবং ক্ষণক্রোধী স্বভাব বলিয়া তিনি সাময়িকভাবে হইলেও ব্যক্তিগত রিপুতে অন্ধ হইয়া যাইতে পারেন; আর সদা-নির্বিকার স্থিতপ্রজ্ঞ লেনিন কখনও সামান্য উত্তেজিত পর্যন্ত হন না।"

ট্রট্স্কির রচিত বহু পুস্তক আছে। তাঁহার সমস্ত রচনাই মনীষী সমাজে প্রচুর প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। যখন যে মতামতই তিনি ব্যক্ত করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহার বুদ্ধির দীপ্তি, ভাষার তীক্ষ্ণতা ও বেগবত্তা সর্বজনস্বীকৃত।

অতুলপ্রসাদ

অজয় ভট্টাচার্য

বাঙলার মাটি বাহিরে নীরব, হৃদয়ে সুরের ধারা,
হে বাউল তব একতারা বুঝি পেয়েছে তাহার সাড়া!
রাখালের বেণু বাঙলার গোঠে বাজায় বনের সুর,
স্বপ্নে তোমার ফুটিল কি তাই হারানো সে ব্রজপুর?
মধু-লীলা মধু-রাস
তব গীতি-রাগে জাগিয়াছে নিতি ল'য়ে মালতীর বাস।
নিদালির দেশে হে চারণ কবি নিদ-ভাঙ্গানিয়া গান
শুনায়েছ তুমি। এনেছ আঁধারে সূর্যের আহ্বান।
শীতে বসন্তে কান্নাহাসির অরূপ-রূপের মালা
দিয়েছ মায়ের চরণ-প্রান্তে;—জুড়াল যুগের জ্বালা।
হায় কবি তুমি নাই,
ফিরিয়া আসিলে হয়তো দেখিতে তুমি আছ সব ঠাঁই।
তোমার সুরের কাঁপন শিহরে সোনার ফসলে আজি
নদী-কল্লোলে জল-তরঙ্গে কি ধ্বনি চলিছে বাজি'।
পল্লীছায়ায় ঝিমানো ঝিমানো ঝুমুরে কাহার শুনি—
বকুলের তলে ঝিঁঝিঁর ঝাঁঝর ভ্রমরার গুনগুনি—
এ সুরের মায়া কা'র?—
অতুল-প্রসাদ নাই যদি;—আছে অতুল প্রসাদ তা'র॥

উত্তর-বঙ্গের ঢাকের জাগরণ গীতিকা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ

অতীতের বীর্যশালী গঙ্গারাঢ়ীদের বংশধর বাঙালী স্বকীয় জাতীয়তা ভুলিয়া আজও ঘুমাইয়া রহিয়াছে। বহু অতীতে যে জাতির মধ্যে বিজয় সিংহের মত দেশ বিজয়ী বীর জন্মিয়াছে, সে জাতি এখনও ঘুমন্ত কেন? যে বাঙালীদের পূর্বপুরুষেরা ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে নৌযানে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে গিয়া তাহাদের জীবন্ত কীর্তি রাখিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাদের সে দুর্জয় শক্তিধারা কোথায়? যে জাতির মধ্যে জননায়ক গোপাল, রাষ্ট্রপতি দিব্য, রাজা ভীমের ন্যায় মহাবীর ভূপতিগণের সম্ভব হইয়াছে, সেই জাতি আজ হইবে। সেদিনের গণ-প্রাণের নির্ভীক কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইবে নূতন জাগরণের গীতি। সেদিন জাতীয় গৌরব গাথার বোধন-শঙ্খে জ্ঞান আর কর্মের সুর বাজিয়ে উঠিবে।

অতীত দিনের বাঙলা ছিল শক্তিচর্চার ক্রীয়াভূমি। সেখানে বাজিয়া উঠিত রণ-ডঙ্কা। রণ-দামামার সুরে সুরে বীর সৈন্যেরা মাতিয়া উঠিত রণ-নৃত্যে। সৈন্যবাহিনীর রণ-নৃত্যের তালে তালে চারিদিকে যে তূর্য নিনাদের সৃষ্টি হইত, তাহাতে বাঙলার আকাশে বাতাসে ছুটিয়া চলিত বিজয় ও মুক্তির বাণী। সেদিনের রণ-নৃত্যের ছবি আজও বাঙালীর স্মৃতি হইতে মুছিয়া

গম্ভীরার ভক্তদের নৃত্য

শতধা বিচ্ছিন্ন কেন? সেদিনও যেখানে রাজা প্রতাপাদিত্য, ঈশা খাঁর ন্যায় বীর নৃপতি, মোহনলালের ন্যায় দুর্জয় বীর সেনাপতি অবতীর্ণ হইয়াছে, সেখানে এত আত্মবিস্মৃতি আসিল কোথা হইতে? বাঙালীর এই সুদীর্ঘ দিনের বিস্মৃতির মূলে রহিয়াছে গণ-মনের সুগভীর সুপ্তি। বাঙালী ভুলিয়াছে তাহার স্বজাতীয়তা, তাহার স্ব-সংস্কৃতি, ভুলিয়াছে তাহার স্ব-বৈশিষ্ট্য; এক কথায় বাঙালী তাহার আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছে! বাঙলার গণ-প্রাণ আজ সসুপ্ত।

যে মুহূর্তে বাঙালী আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হইবে, আত্মশক্তিতে গরীয়ান হইবে, সেই মুহূর্তেই বাঙলায় শক্তিশালী ঐক্যের সংস্থাপন অবশ্যম্ভাবী। বাঙলার ঘুমন্ত প্রাণকে জাগাইতে হইলে অতীত দিনের বীরত্বের ইতিহাসের আলোচনা আবশ্যক। জাতীয় গৌরবর গাথার সুরে সুরে যখন জন্মভূমির অতীত গৌরবের স্মৃতি রূপায়িত হইয়া উঠিবে, তখনই গণ-প্রাণের নিদ্রার আবেশ দূরীভূত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার দুর্জয় ক্ষমতা সম্ভব যায় নাই। সেদিনের সেই দুর্জয় রণ-নৃত্যের ক্রমধারা আজও উত্তর-বঙ্গের গম্ভীরায় গম্ভীরায় বর্তমান রহিয়াছে বীর্যাত্মকে লোকনৃত্য হিসাবে।

চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত দেখিতে পাই, উত্তর-বঙ্গের গ্রামগুলি জয়ঢাকের তূর্যধ্বনিতে সর্বদা মুখরিত। ঢাকীরা ঢাকে ঢাকে যে জাগরণের বাণী মূর্ত করিয়া তোলে, তাহাতে মানুষের অন্তর উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে শক্তির মন্ত্রে।

গম্ভীরায় গম্ভীরায় দাঁড়াইয়াছে সারি সারি শৈব সৈন্যবীর। মুখোশ পরিয়া সৈন্য বীরদের কেহ সাজিয়াছে বুড়াবুড়ী, কেহ সাজিয়াছে ভূত প্রেতিনী, কেহ সাজিয়াছে মহাকালী, কেহ সাজিয়াছে চামুণ্ডা, কেহ সাজিয়াছে জটাধর শিব। তার পর দলপতি সন্ন্যাসী ঠাকুর ধূপ নৃত্য সাহায্যে ভক্তবীরদের অন্তরে শক্তির উদ্বোধন করেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর গুরু গম্ভীর সুরে ধূপচির জন্মকথা গাইতে থাকেন—

মাটি মাটি সৃজন করিল কে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ তিনে মাটি সৃজন করিল॥
সে কাল কুমার বলে গোঁসাই মনে পড়িল।
কাল কুমার বেটা ছিল দু তিন ভাই।
মাটি কাটিয়া তারা চড়িয়া দিল চাকে।
ঘট দুপাঁচ ডংকের পাতিল গড়ায় আড়াই পাকে॥
সুরেষ শুকায় ব্রহ্মা পোড়ায় তিরিশ কোটি ব্রহ্মা দিল বর।
ঘট দুপাঁচর জন্মকথা বলিলাম সভার ভিতর।

ধুপ নৃত্যে হয় মহাশক্তির উদ্বোধন ঢাকীরা জয়ঢাকে তোলে তেটি নিনাদ, গম্ভীরার চারিদিকে বাজিয়া ওঠে কাঁসর ঘণ্টা, শঙ্খ শিঙ্গা। দেবমণ্ডপ মুখরিত বিজয় ডঙ্কায়। এই গুরু গম্ভীর বিজয় ধ্বনির মধ্যে ঢাকী ঢাকের কাঠির জাগরণের ছড়া গীতি গাহিতে লাগিল।—

ছয় মাসের খরচ দেব অঞ্চলে বাঁধিল।
ছয় ঝঙ্কার ঘাটে দেব বনে প্রবেশিল॥
ঢাকন চিকন গাছ তার তলা হইতে পাত।
না হয় এই হয় করলীর গাছ॥
আগা গোড়া কাটি তার মধ্যখানি নিলে।
চাঁচিয়া ছিলিয়া কাঠি নির্মাণ করিলে॥
বাম কাঠি সরস্বতী দক্ষিণ কাঠি ঊর্দ্ধ।
শিব দুর্গার বরে এই গম্ভীরার ঢাকীর কাঠি শুদ্ধ।

কাঠিতে এমনই যাদুকারী গুণ আছে যে, ইহার স্পর্শ মাত্রেই ঢাকে সরস্বতীর মহাবাণী মূর্ত হইয়া উঠে।

অতঃপর ঢাকী ঢাকের জাগরণ গীতিকা গাহিতে থাকে।—

লঙ্কা গেল হনুমান খায় আম্র ফল।
মর্ত্যে ফেলিল আঁঠি তাইতে হৈল বৃক্ষ অমরাবতী॥
আগে বাহিরার অঙ্কুর তার পাছে গাছ।
ছয় ছয় মাসে বাড়ে দ্বাদশ হাত॥
আগাল গোড়া কাটি তার মধ্যখানি নিলে।
চাঁচিয়া ছিলিয়া ঢাক নির্মাণ করিলো॥
শিব শিব বলিয়া ঢাকে দিলে ঘা।
মরা চামড়া কাঢ়িলেক বিয়াল্লিশ রা॥

সত্যই গম্ভীরার ঢাকে ঢাকে রণভেরীর মত বাদ্য বাজিয়া ওঠে। ঢাকের রণবাদ্যে ভক্তবীরদের অন্তর্বীণায় শক্তির রস উৎসারিত হইয়া ওঠে। ভক্তবীর তাই ঢাকের রণবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করে মত্ত মাতালের মত। গম্ভীরার রণবাদ্যে তাহার

গম্ভীরার ঢাকী

মন শক্তির রাগে রঙ্গিন হইয়া ওঠে, তাহার চিত্তে জাগে শক্তি ও মুক্তির আশা। গম্ভীরার রণবাদ্যে যাহার চিত্ত হয় না চঞ্চল, যাহার মনে জাগে না সাড়া, সে নিশ্চয়ই নির্জীব, ভীরু।

গম্ভীরায় গম্ভীরায় বাঁচিয়া থাকুক ঢাকের রণভেরী, শক্তির মন্ত্রে মাতিয়া উঠুক মানুষের প্রাণ, শক্তি আর মুক্তির বাণীতে ভরিয়া যাউক বাঙলার আকাশ বাতাস।

মানসী

(২০৪ পৃষ্ঠার পর)

তার মধ্যে অত্যুক্তি অনেক, তার মধ্যে রকমারি ভাব আছে, যে সব ভাব কবির নিজের নয়। কারিকর কার্পেটে ছবি রচনার সৌন্দর্যসৃষ্টির আনন্দে এমন অনেক লতা পাতা ফুলের ডিজাইন আঁকেন যার সঙ্গে প্রকৃতি রাজ্যের লতা পাতা ফুলের কোনও মিল নেই, কিন্তু তাঁর সেই আনন্দময় সৃষ্টি কার্পেটে যেমন বিশেষ একটা সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে তেমনি কবিও গৌণভাবের বিষয়ের পটে শিল্প রচনা করেন আনন্দ দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টির উৎসাহে। এই আনন্দ দিয়ে সৃষ্টি করার কাজে দুঃখ আছে। কিন্তু এই সৃষ্টি করার যে সাধনা যে দুঃখ, সেইটাই কবির ধর্ম। এইভাবে মানসীর কবিতা গুলিকে দেখলে তবেই এর আনন্দ পাবে।

মানসীর "বিরহানন্দ" কবিতাটির বিষয়বস্তু স্বাভাবিক নয়, কিন্তু বিষয়টি কবিতা বিচারের পূর্বোক্ত হিসাবে সত্য কেবল ছন্দের জন্য। এর সৃষ্টি হ'ল শিল্প নৈপুণ্যের জন্য। বিরহের একটি আনন্দরূপকে ফুটিয়ে দেওয়া হ'ল বিরহের অসীম পরিপ্রেক্ষিতার মধ্যে এমন কিছু নেই যা অ-মধুর। বাস্তবের কঠোর রূপের সঙ্গে মিলনে মেলে না মাধুর্য। বিরহে একটা পরিপূর্ণতা কল্পিত হয়। মিলনের বাস্তবতার সত্যে কল্প সত্য লোপ পায়। সুতরাং বিরহের কল্পনার মধ্যে মিলনের যে আনন্দ রস পাওয়া যায় সেইটেকেই ছন্দে ধ্বনিতে বলা হয় তাতেই বলবার বিষয় হয়ে ওঠে সুন্দর এবং শিল্পিত। এই রকমের শিল্প নৈপুণ্যে কৃতিত্বলাভ করাই কবির সাধনা।

কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছন্দের দ্বারা বাণীকে মিলিত করা, চিরন্তন করা। কবির জীবনে আছে দুটো প্রেরণা, একটা ব্যাবহারিক দিকের অন্যটা অসীমের মধ্যে চিরন্তনের দিকে যাত্রার দিকের। ব্যবহারিক দিকের বিষয়ে যখন অসীমের বাণী আসে তখন কাব্য সে কথা বলে। কবিরা উভচর। একদিকে তিনি চলেন পায়ে, অন্য দিকে তাঁর মন বিচরণ করে ভূমায়। বিরহের মধ্যে সেই ভূমার সংস্পর্শ অমলিন, কিন্তু বাস্তবের মধ্যে ভূমার অনির্বচনীয়তা নষ্ট হয় বাস্তবতার তুচ্ছতায়। এইরকমে বাস্তবতার পীড়নে ওই অনির্বচনীয়তা নষ্ট হয়ে যাওয়া কাব্য রাজ্যের ট্র্যাজেডি, সেটা শোকাবহ।

অনুলেখক—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

অদ্ভুত বিপদ চিহ্ন

যে সব স্থানে বিপদের সম্ভাবনা সেখানে জনসাধারণকে সাবধান করে দেবার জন্যে বিপদ চিহ্ন দেওয়া থাকে। ট্রেনে ভ্রমণ করতে গিয়ে দেখবেন বিপদজনক স্থানে ইঞ্জিন চালককে গাড়ীর গতি হ্রাস করে দেবার জন্যে লাইনের ধারে মাঝে মাঝে 'আদেশ' দেওয়া আছে। আমেরিকার একটি বিপদ-জনক রাস্তার উপর অদ্ভুত এক বিপদ চিহ্নের কথা বলছি। রাস্তার বাঁক এমনই ছিল যে, প্রত্যহই একটা না একটা মোটর দুর্ঘটনা হ'ত। প্রতি মাসে সাংঘাতিক মোটর দুর্ঘটনার খবর দুই একটা ত পাওয়াই যেত। স্থানটি যে বিপদজনক সে বিষয়ে সতর্ক ক'রে দেবার জন্যে নানা কৌশলে বিপদ চিহ্নও দেওয়া ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার সংখ্যা সেইরকমই প্রায় রইল।
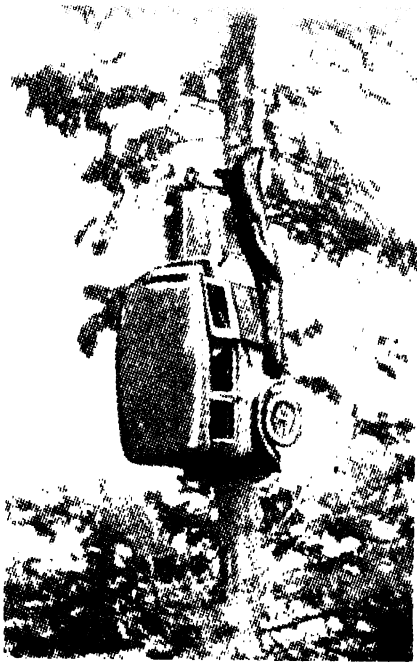
বিপদজনক স্থানে মোটরচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গাছের উপর মোটর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোটরটি বিপদ চিহ্নের কাজ করে

শেষে বি এ পিট্রি নামে একজন মোটর ইঞ্জিনিয়ার মোটর চালকের দৃষ্টি যাতে সহজে বিপদ চিহ্নের উপর পড়ে সে জন্যে একটা প্রকাণ্ড মোটরের বডি একটা লম্বা গাছের উপর ঝুলিয়ে দিলেন। ফল ভালই হ'ল। বিপদ স্থানের অনেক দূর থেকেই মোটর চালকেরা গাছের উপর মোটর দেখে গাড়ীর গতি হ্রাস করে দিতে আরম্ভ করল। ফলে বিপদস্থান নিরাপদে সকলেই অতিক্রম করতে লাগল।

ওদেশে সবই সম্ভব।—রাস্তার উপর গাড়ী দাঁড়ালে যে দেশে লোকের ভীড় তাড়ানই দায় সেখানে মোটর গাড়ী গাছে চড়লে কি হবে তাই ভাবছি। হুজুগে লোকের অভাব আমাদের দেশে কম নেই।

আলোকবিকাশী জীব

জীবজগতের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর জীবের দেহ থেকে আলো বিকীর্ণ হ'তে দেখা গেছে। এই শ্রেণীর জীব আলোকবিকাশী জীব নামে পরিচিত। আলোকবিকাশী জীবের মধ্যে জোনাকি পোকার আলোর সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত আছি। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, কেবল জীবদেহ কেন উদ্ভিদ দেহ থেকেও আলো বের হতে দেখা যায়। উদ্ভিদ জগতের মধ্যে প্রকৃত ছত্রাক এবং ব্যাকটিরিয়াই আলোকবিকাশী উদ্ভিদ বলে প্রমাণিত হয়েছে। জীব-জগতের কেবল পূর্ণবয়স্ক জীবই আলোকবিকাশী নয়। এমন কি কোন কোন জীবের ডিমের মধ্যে থেকেও পরিষ্কার আলো বিকীর্ণ হয়। দীপ মক্ষিকার ডিম বের হবার পর থেকেই তার থেকে আলোক বের হতে আরম্ভ করে। যে সব জীব আলোকবিকাশী নয় তারাও আলোকবিকাশী ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কেবল মৃত অবস্থায় নয় জীবিত অবস্থাতেও আলোক বিকিরণ করতে সক্ষম হয়। স্যান্ড ফ্লী'র শরীর থেকে যে আলো আসতে দেখা যায় তা তার নিজস্ব আলো নয়। ঐ সব কীট আলোকবিকাশী ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ আক্রান্ত হয় বলেই আমরা তাদের দেহ থেকে আলো আসতে দেখি। জনৈক বৈজ্ঞানিক কাবার এক জলাশয়ে একটি ব্যাঙের শরীর থেকে আলোক বিকীর্ণ হ'তে দেখেন। পরীক্ষা করে জানা যায় ব্যাঙটি প্রকৃত আলোকবিকাশী ব্যাঙ নয়। দীপ মক্ষিকা গলাধঃকরণ করায় উদরস্থ মক্ষিকার দেহ থেকে ঐ আলো ব্যাঙের পাতলা চামড়া ভেদ করে বৈজ্ঞানিকের চোখে ধাঁধা লাগিয়েছিল।

আলোকবিকাশী ব্যাকটিরিয়া কোন কোন জীবের দেহে সারা জীবন ধরে অবস্থান করে। উদাহরণস্বরূপ বান্দা সমুদ্রের আলোকবিকাশী মাছের কথা বলা যায়। এখানকার দুই শ্রেণীর মাছের চোখের ঠিক নীচে আলোক প্রস্তুতকারী একটি যন্ত্র আছে। এই আলোক প্রস্তুতকারী যন্ত্র আলোক-বিকাশী ব্যাকটিরিয়া জন্মাইবার জন্যই বিশেষভাবে প্রস্তুত। যন্ত্রটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্তচলাচল করে এবং আলো থেকে মাছের অন্যান্য টিস্যুগুলিকে রক্ষা করবার জন্য একটি পর্দা আছে। এ ছাড়া যন্ত্রটি অদ্ভুত উপায়ে চারি পাশে আলোকসম্পাত দ্বারা মাছকে শিকার সন্ধানে সাহায্য করে। কোন কোন পাখীর পালক এবং প্রজাপতির পাখার উপরস্থ সূক্ষ্ম শিরাগুলি বিশেষ আলোকবিকাশী বলে বৈজ্ঞানিকগণ মত দিয়েছেন।

আলোকবিকাশী ব্যাকটিরিয়াই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র আলোক বিন্দু। আলোক প্রস্তুত করবার শক্তি ছাড়া সাধারণ ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে আলোকবিকাশী ব্যাকটিরিয়ার কোন গঠন পার্থক্য নেই। আলোকবিকাশী ব্যাকটিরিয়ার আলো এরূপ ক্ষীণ যে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে একক ব্যাকটিরিয়ার আলোক বিন্দু অনুধাবন করা যায় না। বহু সহস্র আলোকবিকাশী ব্যাকটিরিয়ার সমাবেশ হ'লে আমরা আলোকের উপস্থিতি বুঝতে পারি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের আলোকবিকাশী 'কুকুজো' পতঙ্গের আলোক রশ্মি এরূপ দৃশ্যমান যে, রাত্রিকালে আকাশে উড্ডীয়মান অবস্থায় তাদের কক্ষচ্যুত নক্ষত্র বলে সকলেই ভুল করে। প্রাচীনকালে স্প্যানিশ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার অধিবাসীরা প্রদীপের পরিবর্তে এই আলোকবিকাশী কুকুজো পতঙ্গ দ্বারা উৎসব রাত্রিতে গৃহ সুসজ্জিত করত। সেখানে জুন মাসে 'কুকুজো'র প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী। উৎসব উপলক্ষে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা আলোকবিকাশী পতঙ্গ দ্বারা সুসজ্জিত পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে অন্ধকার রাত্রির পথে দল বেঁধে চলাফেরা করা বিলাসিতা মনে করে। সে দেশীয় যুবতীদের মাথার চুলে 'কুকুজো' বাঁধা সাজসজ্জাব একটা বিশেষ অনুষ্ঠান বলে অভিহিত। অন্ধকার রাত্রিতে জঙ্গলের পথ আলোকিত করবার জন্যে তারা আবার পায়ে অসংখ্য আলোকবিকাশী 'কুকুজো' বেঁধে চলে। সাউথ আফ্রিকায় এক শ্রেণীর দুষ্প্রাপ্য পতঙ্গের জ্বলন্ত পুত্তলি পাওয়া যায়। এই পুত্তলির মাথার উপরদিকে জ্বলন্ত কয়লার মত লাল আলো ধক্ ধক্ করে। পুত্তলি লম্বায় মাত্র দুই ইঞ্চি। তার দুই ইঞ্চি দেহের দুই পার্শ্বে আবার সবুজ আলোর মালা। ১৮০৯ সালে এজারা প্রথম এই পুত্তলির আলোর কথা জনসাধারণের গোচরে আনেন। সেই অবধি এই দুষ্প্রাপ্য পুত্তলিকে বহু লোকেই পরীক্ষা করে আসছে। পুত্তলি ইচ্ছা অনুযায়ী আলোর শক্তি বৃদ্ধি এবং হ্রাস করতে পারে। রাত্রিতে আমাদের দেশে গাছের সারা দেহে জোনাকি পোকার মেলা বসতে সকলেই দেখেছেন। দিনের আলোতে জোনাকির আলো কিন্তু দেখা যায় না।

আমেরিকার বেশীর ভাগ দীপ মক্ষিকা দিনের বেলায় গাছের পাতার নীচে আশ্রয় নেয় এবং সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করে। পুং-দীপমক্ষিকা পাঁচ থেকে দশ বার আলোক বিকিরণ ক'রে সহস্র সহস্র স্বজাতির মধ্যে থেকে নিজের সঙ্গী স্ত্রী দীপ মক্ষিকার সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়। শ্রেণীভেদে দীপমক্ষিকার আলোক বিকিরণ করবার কৌশলও ভিন্নরূপ।

আলোকবিকাশী পতঙ্গ একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করে আলোক বিকিরণ করে। কয়েক শ্রেণীর পুং আলোকবিকাশী পতঙ্গ আলোকের সাহায্যে সমশ্রেণীর স্ত্রী পতঙ্গদের প্রলুব্ধ করে। তাদের আলোক বিকিরণ করবার পন্থা যেন একটা ছন্দের তাল অবলম্বন করে চলেছে। আর সেই পুরুষের আলোকসম্পাতের তাল অনুধাবন করে স্ত্রী মক্ষিকা আর একটি ছন্দের তালে তালে আলো বিকিরণ ক'রে পুং সঙ্গীকে উত্তর পাঠায়। বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষভাবে পরীক্ষা করে অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

জীবজগতের মধ্যে বেশীর ভাগ আলোকবিকাশী মাছই স্বাধীনভাবে আলোক বিকিরণ করতে সক্ষম। সমুদ্রের তলদেশে যেখানে সূর্য রশ্মি পেঁছাতে পারে না সেখানে দলে দলে আলোকবিকাশী মাছের আস্তানা খুঁজে পাওয়া যায়। অন্ধকার পথে ঐ সব আলোকবিকাশী মাছ অতি সহজে নিজেদের শরীর থেকে আলোক প্রকাশ করে শিকারের অন্বেষণ করে। কোন কোন মাছের আলো বৈদ্যুতিক আলোর মতই স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল।

বৈজ্ঞানিকদের মতে আলোকবিকাশী জীবের বিক্ষিপ্ত আলোক রশ্মি বিভিন্ন বর্ণের। যাঁরা সমুদ্রের তলদেশে অন্ধকারের মধ্যে পাড়ি দেবার কোনদিন সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁরাই সমুদ্রের বিভিন্ন শ্রেণীর আলোকবিকাশী মাছের বিক্ষিপ্ত রশ্মির বিচিত্র বর্ণচ্ছটা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার জন্য দুর্গম সমুদ্রের তলদেশে অদ্ভুত জীবের সন্ধানে অভিযান সুরু করেন। আমরা তাঁদের আবিষ্কৃত জীবের কথা পড়ে বিস্মিত হই।

বিনা মাটিতে ফুলগাছের জন্ম

বাড়ীর ড্রয়িংরুমের ফুলদানিতে সখ ক'রে ফুলগাছ সাজিয়ে রাখা হয়।

ফুলদানির ফুলগাছ প্রচুর মাটির অভাবে এবং আলোর অভাবেও বেশ সতেজ হয় না। বৈজ্ঞানিকরা বর্ত্তমানে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত একপ্রকার তরল পদার্থের আবিষ্কার করেছেন। এই তরল পদার্থে ছোট ছোট ফুলগাছ বেশ স্বচ্ছন্দে বহুদিন জীবিত থাকে। ফলে মাটির আর কোন প্রয়োজন হয় না। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত তরল পদার্থ থেকে খাদ্য গ্রহণ ক'রে গাছগুলি সময়ে যথাবিহিত ফুল ধারণ করে এবং ঘরের শোভাবৃদ্ধি করে। মাটির কোন সংস্পর্শ না থাকায় ফুলদানির মধ্যস্থ তরল পদার্থও গাছগুলিকে চমৎকার দেখায়।

চোর ধরা কল

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যেমন প্রভূত উপকার হয়েছে, তেমনি অপব্যবহারের ফলে মানুষকে কম ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয় নি। বড় বড় শহরে ব্যাঙ্কের সিন্দুক ভেঙ্গে ডাকাতরা যেভাবে বেমালুম টাকা চুরি ক'রে নিয়ে যায়, তাতে ডাকাতদেরই এক একজনকে বৈজ্ঞানিক বললেই চলে। অবশ্য তারা সত্যিই কি আর বৈজ্ঞানিক? কিভাবে ডাকাতদের ধরা যায়, এ নিয়ে রীতিমত বৈজ্ঞানিকেরা মাথা ঘামিয়ে এক উপায় ঠিক ক'রলেন যে, লোহার সিন্দুক ভাঙ্গতে গেলেই চারিদিক আলো ক'রে ডাকাতদের সকলেরই ছবি উঠে যাবে, তা ছাড়া বিপদসংকেত ঘণ্টা সশস্ত্র প্রহরীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ডাকাতদের ধরে ফেলতে সাহায্য করবে। এই ব্যবস্থায় ডাকাতি কিছু কম হ'লেও পাশ্চাত্য দেশে যে লোমহর্ষণ ডাকাতির কথা জানা যায়, তাতে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। পুলিশের তীক্ষ্মদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তারা বেশ ব্যবসা চালিয়ে থাকে।

আজ-কাল

কংগ্রেসের প্রস্তাব

কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটি শেষ পর্যন্ত ভারত-সচিব ব্যাখ্যাত বড়লাটের প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে অগ্রাহ্য করেছেন; এ ছাড়া তাঁদের প্রকাশ্য কোনো পথও ছিল না। ওআর্কিং কমিটি বড়লাটের প্রস্তাবকে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারতের বিকাশের পক্ষে বিঘ্ন বলে' বর্ণনা করে' ভারতবাসীকে জনসভা দ্বারা এবং প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের মারফতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মনোভাবের নিন্দা প্রকাশ করতে আহ্বান করেছেন।

কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, তার মর্ম এই:—কংগ্রেস মিটমাটের যে সৎ প্রস্তাব করেছিল, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তা অগ্রাহ্য করেছেন। বড়লাটের ঘোষণা ও ভারত-সচিবের বিবৃতিতে ভারতের স্বাধীনতার অধিকার অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছে এবং বৃটেনেরই সর্বেসর্বা থাক্‌বার অন্যায় দাবি আবার ব্যক্ত করা হয়েছে। তাঁরা মাইনরিটি প্রশ্নকে ভারতের অগ্রগতির পক্ষে একটা অনতিক্রমণীয় বাধা হিসাবে খাড়া করেছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচিত বিভিন্ন দলীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে অস্থায়ী জাতীয় গভর্নমেণ্ট করলে নতুন শাসনতান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেবে এবং সংখ্যালঘুর প্রতিকূলে সংখ্যাগুরুর পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে—বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এই যুক্তি বিস্ময়কর। এই সব থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বৃটিশ কর্তৃত্ব ভারতের জাতীয় জীবনে বিরোধ সৃষ্টি করছে, বজায় রাখছে ও বাড়াচ্ছে এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এই বিবৃতি দ্বারা গৃহবিবাদ ও সংঘর্ষে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ ও প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। আরো বোঝা যাচ্ছে যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতীয় জনসাধারণের অধিকার স্বীকার না করে বরং সংখ্যাধিক ভারতীয়ের বিরোধী উপদল ও ব্যক্তিদের একত্র ক'রে কাজ চালাতে ইচ্ছুক।

বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নিজেদের কথা দিয়েই তাঁদের পরখ করবার জন্যে শ্রীরাজগোপালাচারী এক বিবৃতিতে প্রস্তাব করেন যে, মুসলিম লীগই একজন প্রধান মন্ত্রী মনোনয়ন করুক এবং তিনি তাঁর ইচ্ছামত জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠন করুন; কংগ্রেস সে ব্যবস্থা মেনে নেবে এবং তাতে মিঃ এমেরির মাইনরিটি সমস্যাও দূর হবে। বলা বাহুল্য, এ প্রস্তাব সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট নীরব আছেন।

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ওআর্ধায় ওআর্কিং কমিটির অধিকাংশ প্রধান সদস্যের সঙ্গে গান্ধীজীর পরে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনার বিবরণ গোপন রাখা হয়েছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন যে, এখন আর কংগ্রেসে দ্বিমত নেই, কারণ গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের মিল হয়ে' গেছে।

স্বেচ্ছাসেবক দল

স্বেচ্ছাসেবকদল সম্বন্ধে কংগ্রেস এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এ সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট যে অর্ডিনান্স জারী করেছেন, তা অস্পষ্ট বলে বর্ণনা করে তাঁরা বলেছেন যে, বলপ্রয়োগে বা ভীতিপ্রদর্শনে রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বে-সরকারী বাহিনী গঠন করতে দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু কংগ্রেসের অহিংসাপন্থী স্বেচ্ছাসেবক দল অন্যরকম; সুতরাং তাদের আইনসঙ্গত কাজে যেন হাত না দেওয়া হয়। ভারত গভর্নমেণ্ট এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, সামরিক ড্রিল ও ইউনিফর্ম পরিধান এই বিধানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ড্রিল করা ও ইউনিফর্ম পরার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুশৃঙ্খল শক্তি প্রদর্শন; সুতরাং কোনো গভর্নমেণ্টই এ রকম বে-সরকারী সংগঠন বরদাস্ত করতে পারেন না। আর যে প্রতিষ্ঠানের, বিশেষত অহিংসাপন্থী প্রতিষ্ঠানের সে রকম কোন উদ্দেশ্য নেই তার জন্যে ঐ রকম সংগঠন অত্যাবশ্যক নয়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, গভর্নমেণ্ট কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দলকে দমন করতে পিছপাও হবেন না।

ধাঙগড় ধর্মঘট

কলকাতায় আবার ধাঙগড় ধর্মঘট আরম্ভ হয়েছে। করপোরেশনের কর্মকর্তা ঘোষণা করেছেন যে, ধাঙগড়রা যদি ২৮শে অগস্ট ভোর ৫টার মধ্যে কাজে যোগ না দেয়, তাহলে তারা বরখাস্ত হ'ল ব'লে ধরে নেওয়া হবে। ধাঙগড়দের পক্ষ থেকে করপোরেশন শ্রমিক ইউনিয়নের সভানেত্রী বেগম সাকিনা ময়াজ্জাদা বলেছেন যে, গত মার্চ মাসের ধর্মঘটের সময় করপোরেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যে সকল সর্ত হয়েছিল, কর্তৃপক্ষ তা পালন করেন নি। সাময়িকভাবে এক টাকা করে' মাগ্‌গি ভাতা অবশ্য তাঁরা দিয়েছেন; কিন্তু ডবল সিফ্‌টে কাজ করার প্রথা প্রবর্তন করে ধাঙগড়দের উপার্জন যথেষ্ট কমিয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া বহু লোককে বরখাস্ত করা হয়েছে। করপোরেশন কর্তৃপক্ষ এর যথাসাধ্য সাফাই দেবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু স্বীকার করেছেন যে, স্পেশাল কমিটির সুপারিশ করপোরেশন অনুমোদন না করা পর্যন্ত সব সর্ত পালন করা যাবে না। পাঁচ মাসের মধ্যে স্পেশাল কমিটির রিপোর্ট তৈয়ারী ও আলোচনার অবসর হয় নি। এখন শোনা গেল, স্পেশাল কমিটি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেছেন এবং ২৮শে অগস্ট করপোরেশনে তার আলোচনা হবে। ধাঙগড়দের পক্ষের আর একটা অভিযোগ আছে যে, তাদের ধর্মঘট কমিটির সহযোগিতায় তদন্ত করবার যে সর্ত হয়েছিল, করপোরেশন তা অনুসরণ করেন নি।

ধাঙগড়-ধর্মঘটের সঙ্গে আলো, জল প্রভৃতির শ্রমিকদের মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অনেকে তাদের ধর্মঘটও আশঙ্কা করছেন।

এবার কলকাতায় ধর্মঘটে বৈশিষ্ট্য (এ বৈশিষ্ট্য সম্ভবত সর্বত্র স্থায়ীভাবে এখন থেকে দেখা যাবে) এই যে, সরকারী উদ্যোগে নবগঠিত সিভিক গার্ড ধর্মঘটের প্রথম দিনই রাস্তায় পাহারা দিতে আরম্ভ করেছে।

ভার্নেরের মন্তব্য

শনিবারে কলকাতা করপোরেশনের সভায় শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর মুক্তি দাবি ক'রে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায় ইওরোপীয় দলের নেতা মিঃ ভার্নন বলেন যে, সুভাষচন্দ্রকে কিছুতেই মুক্তি দেওয়া উচিত নয়; কারণ তিনি যুদ্ধবিরোধী ও আইনবিরোধী কাজ করছিলেন; জার্মানিতে হ'লে তাঁকে গুলি ক'রে মারা হত, এখানে তার বদলে আলিপুর জেলে আরামে রেখে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজ ভার্নন সাহেবের এই উক্তিতে সভায় প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

কলকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন (দ্বিতীয়) বিল এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়ে হক-মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বিস্তৃত হয়েছে এবং এ নিয়ে বাঙলার কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা সম্মিলিত হয়েছেন। তাঁরা এক সঙ্গে গত

রবিবারে এক সভা ক'রে "জাতীয়তাবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল" দিল দুটির প্রত্যাহার দাবি করেছেন।

"অন্ধকূপ"

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিনা ডিভিসনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে যে বইতে স্বীকার করা হবে, সে বই বাঙলার শিক্ষায়তনে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বা উপহার-পুস্তক হিসাবে ব্যবহার যাতে না করা হয়, সেজন্যে গভর্নমেণ্ট অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*

নিখিল ভারত ফরওআর্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক লালা শঙ্করলালকে ভারতরক্ষা আইনে কলকাতায় গ্রেফ্তার করা হয়েছে।

*　　*　　*　　*　　*　　*

গত ২০শে অগস্ট থেকে হাইকোর্টে ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার আপীলে বিচারপতিরা রায় দিতে আরম্ভ করেছেন। এখনও কিছুদিন ধ'রে রায় পাঠ চল্‌বে। তিনজন বিচারপতির রায় পড়া হলে তবে চূড়ান্ত ফল জানা যাবে। এখন বিচারপতি বিশ্বাস রায় পড়ছেন।

ইওরোপ

আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ

গত সপ্তাহে জার্মানি বৃটেনের উপর ব্যাপক বিমান-আক্রমণের বদলে ছোট ছোট বিমানবহর দিয়ে আক্রমণ চালাতে থাকে। লণ্ডন, পোর্টস্‌মাউথ ও র‍্যামস্‌গেটের উপরই উপর্যুপরি আক্রমণ চলে। লণ্ডনের উপর শনিবারে দুইবার এবং রবিবারে দুইবার বিমান হানা হয়। শনিবার রাত্রে জার্মান বিমান লণ্ডনে হাজার হাজার আগুনে বোমা ফেলে; ফলে নগরীর এক অংশে বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয়। পোর্টস্‌মাউথ ও র‍্যামস্‌গেটেরও বেশ ক্ষতি হয়।

ফরাসী উপকূলস্থ জার্মান বড় কামান এ সপ্তাহে দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ডের উপর গোলা বর্ষণ করে। তাতে ডোভার অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি হয়। জার্মানরা ইংলিশ চ্যানেলে বৃটিশ কন্‌ভয়ের উপরও কামান দাগে। বৃটিশ গোলন্দাজরা ডোভার থেকে কালে অঞ্চলের উপর পাল্টা তোপ দাগে। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ বিমানবহর কালে, বুলোঞ প্রভৃতি স্থানে জার্মান কামান-মঞ্চগুলির উপর বোমা বর্ষণ করে। বৃটিশ বোমারু বিমান জার্মানি ও জার্মান অধিকৃত এলাকার অন্যান্য স্থানেও হানা দিয়ে ক্ষতি করে। তারা বার্লিনের উপর গিয়ে আগুনে বোমা ফেলে আসে।

বৃটিশ বিমানবহর উত্তর ইতালির কারখানা আবার আক্রমণ করে।

লিবিয়াতে সামরিক লক্ষ্যবস্তু আক্রমণ করা হয়; বৃটিশ নৌবহর ফোর্ট কাপুৎসোর উপর গোলাবর্ষণ করে' ইতালীয় সৈন্যদের হটিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তারা আবার কাপুৎসোতে এসে ঘাঁটি করেছে। বার্দিয়ার উপরও কামান দাগা হয়। লিবিয়ার বোম্বাতে বৃটিশ বিমানবহর ৪টি ইতালীয় রণতরী ডুবিয়ে দিয়েছে ব'লে দাবি করেছে।

চার্চিলের বক্তৃতা

২০শে অগস্ট মিঃ চার্চিল যুদ্ধ সম্বন্ধে কমন্স-সভায় এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। বৃটেনে যে প্রচুর সমর-সম্ভার এখন তৈরী হচ্ছে এবং আমেরিকা থেকে যা আসছে, তিনি তার উল্লেখ করে ইংরেজদের যুদ্ধ চালাবার দৃঢ় সংকল্প আবার ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, জার্মান অধিকৃত এলাকায় তাঁরা কোন খাদ্যদ্রব্য বাইরে থেকে পৌঁছতে দেবেন না, কারণ বাইরের এ সাহায্য জার্মানির যুদ্ধ পরিচালনার অনুকূল হবে। পরিশেষে তিনি বলেন যে, বৃটেন ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে জার্মানির উপর আক্রমণ চালাবার সম্ভাবনা দেখ্‌ছে।

বল্কানে গোলমাল

বল্কান নিয়ে গোলমাল এখনো চল্‌ছে। রুমেনিয়া ও হাঙ্গারীর আলোচনা (তুর্ন সেভেরিনে-এ) ফেঁসে গেছে। হাঙ্গারী ট্রান্সিলভেনিয়া যতখানি চায়, রুমেনিয়া তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দিতে ইচ্ছুক। হাঙ্গারী রুমেনিয়ার মনে যুদ্ধ বাধাবার অভিপ্রায় রয়েছে বলে' অভিযোগ করেছে। রাজা ক্যারল সৈন্যদের ছুটি বাতিল করে দিয়েছেন। ট্রান্সিলভেনিয়ায় নাকি রুমেনিয়ান সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। তবে রুমেনিয়ান ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, আলোচনা আবার আরম্ভ হতে পারে। জার্মানি ও ইতালি সালিশ করে' একটা মিটমাট করবে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে।

বুলগেরিয়ার সঙ্গে একটা আপোষ কার্যত হয়ে গেছে বলেই মনে হয়; কারণ দক্ষিণ দোব্রুজা থেকে রুমেনিয়ানদের চলে' আসতে রুমেনিয়ান কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন।

গ্রীসের সঙ্গে ইতালির মনোমালিন্যের আরো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। ইতালীয় সৈন্যদল নাকি গ্রীক সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

আলবেনিয়ায় দুই সপ্তাহের মধ্যে দুইবার আলবেনিয়ান-দের বিদ্রোহের খবর প্রচারিত হয়েছে। আলবেনিয়ার ইতালীয় সামরিক ব্যবস্থাই নাকি এর কারণ। বিদ্রোহ করে আলবেনিয়ান সৈন্যেরা। বহু ইতালীয় সৈন্য নিহত হওয়ার পর বিদ্রোহ দমিত হয়েছে।

মঃ ট্রট্‌স্কির হত্যা

মেক্সিকোর রাজধানীতে রুশ-বিপ্লবের প্রাক্তন নেতা মঃ ট্রট্‌স্কি আততায়ীর আক্রমণের ফলে হাসপাতালে মারা গেছেন। আততায়ী তাঁরই পরিচিত ও আমন্ত্রিত এক ফরাসী ইহুদী। হাতুড়ীর অতর্কিত আঘাতে সে ট্রট্‌স্কিকে মারাত্মকভাবে আহত করে। মৃত্যুর আগে ট্রট্‌স্কি বলেন, আততায়ী হয় সোভিয়েট গুপ্তচর, নয় ফাশিস্ট। আততায়ী বলেছে, সে ট্রট্‌স্কিরই অনুরাগী ছিল; কিন্তু ট্রট্‌স্কির কাছে এসে ক্রমে তার ভুল ধারণা ভেঙেছে। সে পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্যে' তাঁকে হত্যা করেছে। ব্যাপারটা এখনো রহস্যাবৃত; মামলায় আসল তথ্য প্রকাশ পেতে পারে। ঘটনার কারণ যাই হোক, ট্রট্‌স্কির মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির এইভাবে প্রাণবিনাশ যে অত্যন্ত শোচনীয় তাতে সন্দেহ নেই।

২৬-৮-৪০

—ওয়াকিব্‌হাল

রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা

পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত বোম্বাই রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। আই, এফ, এ, শীল্ড প্রতিযোগিতার ন্যায় এই প্রতিযোগিতা পুরাতন না হইলেও ইহার স্থান আই, এফ, এ শীল্ডের পরেই হইতে পারে। এই বৎসরের আই, এফ, এ, শীল্ড প্রতিযোগিতায় যেরূপ কম উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায়ও সেইরূপ অনুভূত হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের সৈনিক দলের যোগদান না করার ফলেই এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা হইলেও কলিকাতার দুইটি বিশিষ্ট ফুটবল দল মহমেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগান এই বৎসর রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করায় বোম্বাইর ক্রীড়ামোদিগণ এই খেলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই বৎসর সর্বশুদ্ধ ২৮টি দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। উক্ত ২৮টি দলের মধ্যে মাত্র ৮টি দল ছাড়া অন্য সকল দলের খেলা প্রতিযোগিতার খ্যাতি অনুযায়ী হয় নাই। প্রতিযোগিতার ফলাফল বর্তমানে যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কোন্ দল রোভার্স কাপ বিজয়ী হইবে তাহা এখনও বলা যায় না। তবে অনেকেই আশা করিতেছেন, কলিকাতার দুইটি দল ফাইন্যালে মিলিত হইবে। তাহাই যদি হয়, তবে কোন্ দল বিজয়ী হইবে এখন হইতে বলা খুবই কঠিন। মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং উভয় দলই ইতিপূর্বে একবার করিয়া এই প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে খেলিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিল। মোহনবাগান দল ১৯২৩ সালে এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠিয়া ডারহ্যাম রেজিমেণ্ট দলের নিকট ৪—১ গোলে পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের পর মোহনবাগান দল আর এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে না। ১৭ বৎসর পরে তাহারা পুনরায় রোভার্স প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। সেইজন্য আশা করা যায়, মোহনবাগান দল ১৭ বৎসরের পূর্বে যে সম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল এই বৎসর তাহার উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

মোহনবাগান দল

মোহনবাগান দল এই বৎসর শক্তিশালী দল লইয়াই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। গৌহাটী মহারাণা ক্লাবের ২টি খেলোয়াড়, কাস্টমসের কে ভট্টাচার্য ও ভবানীপুরের গোলরক্ষক টি দত্তকে পর্যন্ত তাহারা দলভুক্ত করিয়াছে। ইহার ফলে রক্ষণভাগ ও আক্রমণভাগ উভয় ভাগই শক্তিশালী হইয়াছে। প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায় বি, ই, এস, টি দলকে ৫—১ গোলে পরাজিত করিয়াছে। ইহার পরবর্তী রাউণ্ডে বোম্বাইর হারউড লীগ প্রতিযোগিতার রানার্স আপ ওয়াই, এম, সি, এ দলের সহিত তাহাদের খেলিতে হইবে। প্রথম খেলায় কর্দমাক্ত মাঠে মোহনবাগান দল যেরূপ উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে তাহা বোম্বাইর ক্রীড়ামোদিগণ সকলেই আশা করেন মোহানবাগান দলের পক্ষে ওয়াই, এম, সি, এ'কে পরাজিত করা কোনরূপ কঠিন হইবে না। এই খেলায় জয়লাভ করিলে মোহনবাগান দলের সেমি-ফাইনালে বাঙালোর মুসলীম দলের সহিত মিলিত হইবার সম্ভাবনা আছে। বাঙালোর মুসলীম দল ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে রোভার্স কাপ বিজয়ী হইয়াছিল। সুতরাং এইরূপ গৌরব অর্জনকারী একটি দল সহজে যে মোহনবাগান দলের নিকট পরাজয় বরণ করিবে ইহা কল্পনা করা অন্যায় হইবে। তবে এই কথা ঠিক ১৯৩৭ সালে অথবা ১৯৩৮ সালে বাঙালোর মুসলীম দল যেরূপ উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল, এই বৎসরের যোগদানকারী বাঙালোর মুসলীম দল সেইরূপ খেলিতে পারিতেছে না। সেইজন্য মোহনবাগান দলের এই দলের সহিত মিলিত হইয়া জয়লাভের যে কোনই আশা নাই ইহাও ধারণা করা অন্যায় হইবে। তাহার পর ফাইনাল খেলা। অপরদিক হইতে যে দল উঠিবে তাহার উপরই ফলাফল নির্ভর করিবে।

মহমেডান স্পোর্টিং দল

মহমেডান স্পোর্টিং দল এইবার লইয়া তিনবার রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিল। ১৯৩৭ সালে মহমেডান স্পোর্টিং দল ফাইনালে উঠিয়া বাঙালোর মুসলীম দলের নিকট একটিমাত্র গোলে পরাজিত হয়। মহমেডান স্পোর্টিং দল পুনরায় যোগদান করিয়াছে সেই ক্ষুণ্ণ গৌরবের পুনরুদ্ধার করিবার জন্য। এই বৎসরের প্রথম খেলায় আর, এ, এফ দলকে শোচনীয়ভাবে ৮—০ গোলে পরাজিত করিয়া তাহারই প্রমাণ দিয়াছে। পরবর্তী রাউণ্ডে এই দলকে হেভী ব্যাটারীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। হেভী ব্যাটারী প্রথম রাউণ্ড ও দ্বিতীয় রাউণ্ডের দুইটি খেলায় যেরূপ খেলিয়াছে তাহাতে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। মহমেডান স্পোর্টিং দল হেভী ব্যাটারীকে পরাজিত করিবে ইহা সকলেই ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার পরেই সেমি-ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে বোম্বাইর হারউড লীগ বিজয়ী ওয়েলচ রেজিমেণ্ট দলের সহিত মিলিত হইতে হইবে। খেলার ফলাফল কি হইবে কেহই বলিতে পারে না। ওয়েলচ রেজিমেণ্ট দলের শক্তি মহমেডান স্পোর্টিং দল অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। তাহা ছাড়া এই দলে ল্যাংলন ও হিল নামে দুইটি ইংল্যাণ্ডের পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড় আছেন। ইঁহারা দুইজনেই এই বৎসর ওয়েলচ রেজিমেণ্ট দলকে লীগ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক খেলায় জয়লাভে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের ক্রীড়াকৌশল খুবই উচ্চাঙ্গের। মহমেডান স্পোর্টিং দলের রক্ষণভাগ এই দুইটি খেলোয়াড়কে আটকাইয়া রাখিতে বিশেষ বেগ পাইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যদি মহমেডান স্পোর্টিং দলের রক্ষণভাগের পক্ষে ইহা সম্ভব হয় তবেই জয়লাভ সমর্থ হইবে। সুতরাং এই খেলার ফলাফলের উপরই মহমেডান স্পোর্টিং দলের রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেন—ইহা আমরা কামনা করি। ইহাতে বাঙলার ফুটবল স্পোর্টিং দল ফাইনালে উঠেন ও অপরদিক হইতে মোহনবাগান দল ফাইনালে উঠে—ইহা আমরা কামনা করি। ইহাতে বাঙলার ফুটবল খেলোয়াড়গণেরই সম্মান বৃদ্ধি পাইবে। এই দুইটি দলের মধ্যে একটি দল রোভার্স কাপ বিজয়ী হইলে বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণের আনন্দই হইবে।

নিম্নে রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার বর্তমান খেলার অবস্থা প্রদত্ত হইল :—

তৃতীয় রাউণ্ড

মহমেডান স্পোর্টিং : হেভী ব্যাটারী
ওয়েলচ রেজিমেণ্ট : স্যাণ্ডিম্যানিয়ান্স
বাঙালোর মুসলীম : বি, বি, সি, আই ও
সিটি পুলিশ বিজয়ী।
মোহনবাগান : ওয়াই, এম, সি, এ ও
কোহাট দল বিজয়ী।

বৈদেশিক ক্রিকেট দল

এই বৎসরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে আর একটি বৈদেশিক ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড সমর্থন করিয়াছেন। এই দলের নাম সিংহল ক্রিকেট দল। এই দলের খ্যাতি অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড বা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ন্যায় না হইলেও পৃথিবীব্যাপী অশান্তিকর যুদ্ধের সময় ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় ও ক্রীড়ামোদিগণের প্রাণে ক্রিকেট খেলার কিছু উৎসাহ যে দান করিবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড সিংহল ক্রিকেট দলের ভারতে তিনটি স্থানে মাদ্রাজ, কলিকাতা ও বোম্বাইতে খেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই তিনটি স্থানে কোন্ কোন্ দিন খেলা হইবে তাহাও স্থির করিয়াছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড তাঁহাদের ব্যবস্থার কথা সিংহল ক্রিকেট দলকে জানাইয়াছেন। যদি সিংহল দল উক্ত তিনটি স্থান ছাড়াও আরও অধিক স্থানে খেলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে খেলার তালিকা পরিবর্তন করা হইতে পারে। নিম্নে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড সিংহল ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা প্রদত্ত হইলঃ—

সিংহল ক্রিকেট দল ১৬ই ডিসেম্বর কলম্বো হইতে রওনা হইয়া ১৮ই ডিসেম্বর মাদ্রাজে পৌঁছিবে। ২০শে, ২১শে ও ২২শে ডিসেম্বর এই তিন দিনব্যাপী খেলায় মাদ্রাজ দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। ২২শে ডিসেম্বর রাত্রে মাদ্রাজ হইতে রওনা হইবে ও ২৪শে ডিসেম্বর কলিকাতায় পৌঁছিবে। ২৫শে, ২৬শে ২৭শে ডিসেম্বর এই তিন দিনব্যাপী খেলায় বাঙলা দলের সহিত অথবা ভারতীয় দলের সহিত খেলিবে। ২৭শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ২৯শে ডিসেম্বর বোম্বাইতে পৌঁছিবে। ৩১শে ডিসেম্বর হইতে তিন দিনব্যাপী খেলায় ভারতীয় দলের সহিত খেলিবে। ৩রা জানুআরি বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিবে এবং তথা হইতে জাহাজযোগে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবে। উক্ত তালিকা অনুযায়ী সিংহল ক্রিকেট দল খেলিবে কি না তাহা শীঘ্রই জানিতে পারা যাইবে।

বেঙ্গল জিমখানার নূতন ব্যবস্থা

বাঙলার ক্রিকেট খেলার উৎসাহদানকারী বেঙ্গল জিমখানার পরিচালকগণ কলিকাতা ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করিবার জন্য আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। এই আলোচনা বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মিঃ আই, ঘোষের প্রচেষ্টায় আরম্ভ হইয়াছে। বেঙ্গল জিমখানার ২৭শে অগস্ট তারিখের কার্যকরী সমিতির সভায় মিঃ আই, ঘোষ তাঁহার পরিকল্পিত কলিকাতা ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতার খসড়া পেশ করেন। বেঙ্গল জিমখানার ঐ সভা তাঁহার খসড়া সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য একটি সাবকমিটি গঠন করিয়াছেন। এই সাবকমিটির সভ্য হইয়াছেন বর্ধমানের মহারাজকুমার মিঃ এম দত্ত রায়, আই, ঘোষ ও মিঃ এ, এল, ঘোষ। এই সাবকমিটি বিবেচনার পর তাঁহাদের মতামত জিমখানার সভায় পুনরায় পেশ করিবেন এবং তখন এই পরিকল্পনা গৃহীত হইবে কি না তাহা সঠিকভাবে জানা যাইবে। জিমখানার কর্তৃপক্ষগণের মনোভাব হইতে যতদূর মনে হয় তাহাতে তাঁহারা মিঃ আই, ঘোষের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন এবং তাহা কার্যকরী হইবে ১৯৪১ সাল হইতে।

লীগ খেলার ব্যবস্থা হইলে বাঙলার ক্রিকেট খেলার উন্নতি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে; সুতরাং ইহার প্রবর্তন যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল।

রঙ্গজগৎ

(২৩৩ পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে নন্দার ভূমিকায় মিস্ প্রধানই তাঁহার অনবদ্য কলানিপুণ অভিনয়ের জন্য প্রশংসার দাবি করিতে পারেন।

আখ্যানবস্তুর মধ্যে কিন্তু 'সিভিল ম্যারেজ' সম্পৃক্ত কোন সমস্যা প্রাধান্য লাভ করে নাই। এই নামকরণের কোন সার্থকতা বুঝিতে পারা গেল না। বিভিন্ন সমাজস্তরের বিভিন্ন রুচি সংস্কৃতি ও চরিত্রসম্পন্ন নরনারীর মধ্যে প্রেম ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব— ইহাই হইল চিত্রটির বক্তব্য।

ঘটনা ও সমস্যাগুলিকে যেভাবে যোজনা করা হইয়াছে নিউ-থিয়েটার্সের 'দিদি' চিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। টেকনিকের দিক দিয়া চিত্রটির উৎকর্ষ সমসাময়িক অন্যান্য চিত্র হইতে বহু গুণে অগ্রসর।

এই চিত্রটির সম্পর্কে বিশেষ একটি বক্তব্য আছে। 'সিভিল ম্যারেজে'র মধ্যে এমন সব গুরুতর বিবিধ সমস্যা জোড়াতাড়া দিয়া অবতারণা করা হইয়াছে, যাহার বিসদৃশতায় স্বভাবত মনে অন্য এক সংশয়ের উদয় হয়। যেমন, কাপড়ের মিলের ধর্মঘট। প্রবোধ নামক নায়কটি একজন আদর্শ মজুর-হিতৈষী যুবক। এই নায়কের মুখে লম্বা লম্বা কয়েকটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া অতি সূক্ষ্ম কৌশলে পুঁজিবাদী স্বার্থের কীর্তন করান হইয়াছে। ধর্মঘট ব্যাপারটিকে কোন হীনচরিত্র লোকের দুষ্ট-বুদ্ধি ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সাধনার কীর্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদের পক্ষে ইহা সত্যই আশঙ্কার বিষয় যে, বিশুদ্ধ আর্টের ও আনন্দের প্রচার যাহার কর্তব্য, সেই ছায়াচিত্রের মারফৎ এইবার পুঁজিওয়ালাদের ধর্মতত্ত্ব পরিবেশন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

এই প্রপেগাণ্ডাজনিত রূঢ়তা ব্যতীত চিত্রটির অপর অপর আখ্যান অংশ, সংলাপ, গান সমস্তই উপভোগ্য।

এলিট সিনেমায়—'দে স্যাল হ্যাভ মিউজিক'

স্যামুয়েল গোল্ডুইনের নূতন ছবি **"দে স্যাল হ্যাভ মিউজিক"** শুক্রবার হইতে এলিট সিনেমায় দেখানো হইতেছে। বিশ্ব বিখ্যাত বেহালাবাদক জ্যাসা হাইফেজের বেহালা বাদ্য এই ছবির বিশিষ্ট আকর্ষণ। সাধারণত গীতিবাদ্যবহুল ছবিগুলিতে গল্পাংশ অত্যন্ত দুর্বল হয়, কিন্তু আলোচ্য ছবিতে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এক-দল অল্পবয়সী বালকবালিকা এই ছবিতে সুন্দর অভিনয় করিয়াছে।

সমর বার্ত্তা

২১ অগস্ট।—

আজ সকালে জার্মান বিমানসমূহ দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে পূর্বেরই মত হাওয়াই হামলা করে। কম পক্ষে ৮টা জার্মান এয়ারোপ্লেন আজ ভূপাতিত হইয়াছে। ব্রিটিশ বিমান বিভাগের দপ্তর হইতে প্রকাশ, জার্মান অধিকৃত অঞ্চল সমূহে ইংরেজদের ব্যাপক হাওয়াই হামলা হয়। ৩০টা জার্মান বিমান ঘাঁটি আক্রান্ত হইয়াছিল। 'নিউইয়র্ক টাইমস'এ প্রকাশিত হইয়াছে যে ১৯ অগস্ট রাত্রে বার্লিনে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিমান আক্রমণ জ্ঞাপক সংকেতধ্বনি হয়, পশ্চিম উপকণ্ঠে বিমানধ্বংসী কামান গর্জন করিতে থাকে।

দোব্রুজা সম্পর্কে বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার মধ্যে একটা চুক্তি হইয়াছে। রুমানিয়া বুলগেরিয়াকে দুইটি প্রদেশ ছাড়িয়া দিবে।

২২ অগস্ট।—

ইংলণ্ডে জার্মান বিমান বাহিনীর প্রতাপ কমিয়াছে। গত রাত্রে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে সামান্য আক্রমণ হইয়াছিল। তবে ডোভার প্রণালী অতিক্রম করিবার সময় একটি ব্রিটিশ কনভয়এর জাহাজসমূহের উপর ফরাসী উপকূলের জার্মান কামান হইতে আজ গোলা বর্ষণ করা হয়। প্রকাশ ৭০টারও অধিক গোলা নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু কোনও ক্ষতি হয় নাই। কামানের গর্জনে ইংলণ্ডের উপকূলবর্তী শহরগুলি কাঁপিতে থাকে। আকাশ হইতেও কনভয়এর উপর আক্রমণ চলে। বিমানধ্বংসী কামান সমূহ তৎপর হইয়া বিমানসমূহকে দূরে সরাইয়া দেয়।

কায়রোর সংবাদ—মিশরের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন, ইতালীয় সৈন্যগণ যদি মিশর আক্রমণ করে তো মিশর ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। মিশরের মেকানাইজড্ বাহিনী প্রস্তুত।

টোকিওর সংবাদ—জাপ পররাষ্ট্র সচিব শ্রীযুক্ত মাতসুওকা বিদেশ হইতে ৪০ জন কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে টোকিওতে প্রত্যাবর্তনের জন্য তার করিয়াছেন। ডোমাই সংবাদ প্রতিষ্ঠান মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা জাপানের নূতন কূটনৈতিক অভিযানের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

২৩ অগস্ট।—

গত রাত্রে ফরাসী উপকূলে অবস্থিত জার্মান কামান হইতে ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে গোলা নিক্ষিপ্ত হয়। অনুমান ১২টার অধিক গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। গত কাল বৈকালে ডোভার অঞ্চলেও গোলা নিক্ষিপ্ত হয়। কয়েকটি বাড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত এবং কয়েকজন হতাহত হইয়াছে। জার্মানদের কামান গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ বিমানবহর কামানগুলির উপর বোমা বর্ষণ করিতে থাকে। জার্মান নিউজ এজেন্সির সংবাদ—ব্রিটনরাও ক্যালে লক্ষ্য করিয়া ইংলণ্ডের উপকূল হইতে কামানের গোলা বর্ষণ করে।

প্রকাশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটিশ সাহায্য প্রতিশ্রুতি বাতিল করিবার জন্য ইতালি গ্রীসকে এক চরমপত্র দিয়াছে। লণ্ডন সরকারী মহলে এ সংবাদ অসমর্থিত। ইতালিও তাহা অস্বীকার করিয়াছে।

ব্রিটিশ বিমান বহর ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের নানা স্থানে, তব্রুকে ও লিবিয়ায় ব্যাপক আক্রমণ করিয়াছে।

২৪ অগস্ট।—

ফরাসী উপকূল হইতে আজ সকালে ডোভার লক্ষ্য করিয়া কামান দাগা হইয়াছিল। কয়েকটি গৃহের অল্প ক্ষতি ও কয়েকজন লোক হতাহত হইয়াছে। ব্রিটিশ উপকূল হইতেও ফরাসী উপকূলের জার্মান কামানগুলির উপর কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ডোভারে বিমান আক্রমণ ঘটে; লণ্ডনে দুইবার আক্রমণের চেষ্টা হয়। ইংরেজরাও শত্রুদের ২০টা বিমান ঘাঁটির উপর ব্যাপক বিমান আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে। সরকারী ঘোষণা—আজ ৩২টা জার্মান বিমান বিনষ্ট ও ১০টা ব্রিটিশ বিমান নিরুদ্দেশ।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, আলবেনিয়ার ইতালীয় সৈন্যদল গ্রীক সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। গ্রীসের ব্রিটিশ সাহায্য প্রতিশ্রুতি বাতিল করিবার ইচ্ছা নাই।

২৫ অগস্ট।—

শনিবার শেষ রাত্রে লণ্ডন নগরীর এক অঞ্চলে জার্মানরা হামলা করিয়া যায়। সাবধান সংকেতধ্বনি জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ২০টা সার্চলাইটের আলোয় নগরীর আকাশ আলোকিত হইয়া যায়। একটু পরেই এয়ারোপ্লেনের শব্দ শুনা যায়। তাহার পর বোমা বিদীর্ণ হইবার প্রচণ্ড শব্দ হয় ও লাল আভায় সেই অঞ্চলের আকাশ আলোকিত হইয়া ওঠে এবং আকাশে উল্কার ন্যায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে থাকে। এ ছাড়া ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেও জার্মানরা হামলা করিয়াছে। ফ্রান্সে অবস্থিত জার্মানদের কামানশ্রেণীর উপর ইংরেজরা প্রবল বিমান আক্রমণ করিয়াছে। সরকারী ঘোষণা—আজ ৪৫টা জার্মান এয়ারোপ্লেন নষ্ট হইয়াছে।

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত বুখারেস্টএর সংবাদ—হাঙ্গেরির সহিত রুমানিয়ার আলোচনায় কঠিন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। বুদাপেস্ট হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে রুমানিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলা হইয়াছে যে, সে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সামরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত হইতেছে।

২৬ অগস্ট।—

জার্মান নিউজ এজেন্সির সংবাদে প্রকাশ—গত রাত্রে ইংরেজরা বার্লিনের উপর প্রবল বিমান আক্রমণ করে। 'নিউইয়র্ক টাইম্স'এর বার্লিনস্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন, অনুমান ৩ ঘণ্টা কাল বার্লিনের বিমাননাশক কামানগুলি কর্মনিরত থাকে। ব্রিটিশ বিমান বিভাগের ইস্তাহার গত রাত্রে ব্রিটিশ বিমান বাহিনী জার্মানির নানা সামরিক লক্ষ্যে আক্রমণ চালায়। নাৎসী বিমান বাহিনীও লণ্ডনে ও ইংল্যাণ্ডের নানা স্থানে আক্রমণ চালাইয়াছে। আজ ৩৭টা জার্মান ও ১৫টা ব্রিটিশ বিমান বিনষ্ট হইয়াছে।

ডাবলিনের সংবাদ—একটা জার্মান বিমান আয়ারল্যাণ্ডের নানা স্থানে বোমা ফেলিয়া গিয়াছে। ফলে একটি মাখনের কারখানার ৩টি বালিকা নিহত ও ১টি আহত হইয়াছে।

২৭ অগস্ট।—

গত সন্ধ্যা হইতে আজ সকাল পর্যন্ত জার্মান বিমানবাহিনী ব্রিটেনের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী নৈশ আক্রমণ এই প্রথম। এই আক্রমণ ব্রিটেনের প্রায় পাঁচ শতাধিক মাইল স্থান ব্যাপিয়া চলে। লণ্ডনের উপরে আরও জার্মান আক্রমণ চলে ছয় ঘণ্টার পর নিরাপত্তা সূচক বংশীধ্বনি হয়। গত রাত্রে ইংরেজরাও বার্লিনের উপর বিমান আক্রমণ করে। সুইডেনের কাগজে বার্লিনের সংবাদদাতাগণের প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, রবিবারের আক্রমণের ফলে বার্লিনের রাজ-পথসমূহ শেলের টুকরা ও প্রচার পুস্তিকায় সমাচ্ছন্ন। কাল দিনের বেলাতেই ব্রিটিশ এয়ারোপ্লেনসমূহ জার্মানদের ২৭টা বিমান ঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ করে।

কায়রোর সংবাদ—মিশরের প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২১ অগস্ট।—

ওয়ার্ধাগঞ্জে কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির অধিবেশন চলিতেছে। আজ সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে শ্রীযুক্ত আজাদ বলেন যে, তিনি ইতিপূর্বেই শ্রীযুক্ত বড়লাটের নিকট তাঁহার পত্রের উত্তর প্রেরণ করিয়াছেন। জানাইয়াছেন, বড়লাটের ঘোষণাকে ভিত্তি করিয়া কংগ্রেস ও গভর্নমেণ্টের মধ্যে কোনওরূপ মিলনের ক্ষেত্র রচিত হওয়া অসম্ভব।।

কানপুরের সংবাদ—যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত পালিওয়াল ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করায় গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন।

কলিকাতা করপোরেশনের সাধারণ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে সুভাষচন্দ্রের আশু মুক্তির দাবি সংবলিত তিনটি প্রস্তাব মেয়র শ্রীযুক্ত আবদুর রহমান সিদ্দিকির নির্দেশে আজ সভায় উত্থাপিত হইতে পায় নাই।

মেক্সিকো সিটির সংবাদ—মসিয়ে ট্রট্স্কি কাল অপরাহ্ণে অতর্কিত আক্রমণের ফলে গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছেন। হাতুড়ির আঘাতে তাঁহার মাথার খুলি ভাঙিয়া গিয়াছে। চিকিৎসকগণ বলিতেছেন তাঁহার জীবনের আশা নাই। আততায়ী ফরাসী ইহুদী, নাম ফ্রাঙ্ক জনসন।

২২ অগস্ট।—

ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটি চলিতেছে। শ্রীযুক্ত বড়লাটের ঘোষণা সম্পর্কে এই কমিটি ৭৫০ শব্দ সংবলিত এক প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, বড়লাটের ৮ অগস্টের ঘোষণা এবং কমন্স সভায় শ্রীযুক্ত ভারত সচিবের বক্তৃতা যুদ্ধ সম্বন্ধে ব্রিটিশের ঘোষিত গণতান্ত্রিক আদর্শেরই যে পরিপন্থী, তাহা নহে, ইহা ভারতের স্বার্থেরও বিরোধী। সুতরাং কংগ্রেস এই ব্রিটিশ প্রস্তাব কদাপি গ্রহণ করিতে পারে না বা দেশবাসীকে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিতে পারে না। কংগ্রেস দেশবাসীকে জনসভা করিয়া ও অন্য নানা উপায়ে এবং প্রাদেশিক আইন সভায় তাঁহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাহায্যে তীব্র নিন্দা করিতে আহ্বান করিতেছেন।

২১ অগস্ট রাত্রি ৭টা ৩৫ মিনিটে শ্রীযুক্ত ট্রট্স্কি মেক্সিকোর হাসপাতালে মারা গিয়াছেন।

ইসলামিয়া কলেজ ব্যাপারের তদন্ত করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট কর্তৃক গঠিত কমিটির সাক্ষ্য গ্রহণের কাজ শেষ হইয়াছে। প্রকাশ, শ্রীযুক্ত ফজলল হকই ইসলামিয়া কলেজে পুলিস প্রেরণের নির্দেশ দান করিয়াছিলেন।

২৩ অগস্ট।—

স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গভর্নমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা বা অর্ডিনান্স সম্বন্ধে এক প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির অধিবেশন আজ শেষ হইয়াছে। কমিটি বিশ্বাস করেন যে, আইনানুগ কার্যকলাপ দমন করিবার নিমিত্ত উক্ত অর্ডিনান্স জারি হয় নাই। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের কাজ আইন বহির্ভূত নহে। অতএব কমিটি তাহাদিগকে তাহাদের স্বাভাবিক কার্যকলাপ করিয়া যাইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিক্‌ল' পত্র জানাইয়াছেন, শ্রীযুক্ত বড়লাটের প্রস্তাব কংগ্রেস অগ্রাহ্য করায় লণ্ডনের সরকারী মহলে নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছে।

রাজশাহির এক সংবাদে প্রকাশ, পদ্মানদীতে নৌকাডুবির ফলে ১২ জন দিনমজুর ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

ভারতরক্ষা আইন।—প্রতাপ অক্ষুণ্ণ আছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে উত্থাপিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত নাজিমউদ্দিন কৃত উত্তরে প্রকাশ, ভারতরক্ষা বিধানে বাঙালার আজ পর্যন্ত ২৬৬ জন দণ্ডিত হইয়াছেন।

২৪ অগস্ট।—

আজ বৈকালে করপোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনে করপোরেশনের অলডারম্যান শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের শীঘ্র মুক্তি দাবি করিয়া এক প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ দল ব্যতীত কংগ্রেস, স্বতন্ত্র দল, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের সদস্যগণ ইহা সমর্থন করেন। শ্বেতাঙ্গ দলের শ্রীযুক্ত জি এস জি ভার্নন উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, সুভাষচন্দ্রের মুক্তিতে দেশের বা প্রদেশের অমঙ্গল হইবে; তিনি যদি আজ নাৎসী জার্মানিতে থাকিতেন তো তাঁহাকে এতদিনে গুলি করিয়া মারা হইত; তাহার বদলে তিনি আলিপুর জেলের আরাম উপভোগ করিতেছেন বলিয়া নিজেকে তাঁর সৌভাগ্যবান মনে করা উচিত। এজন্য করপোরেশনে তীব্র উত্তেজনা ও বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে।

বোম্বাইএর সংবাদ—১৫ সেপ্টেম্বরে বোম্বাইএ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইবে।

ভারতরক্ষা আইন।—নিখিল ভারত ফরওআর্ড ব্লকের জেনারেল সেক্রেটারি লালা শংকরলাল কলিকাতায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

২৫ অগস্ট।—

ভারতরক্ষা আইন।—কলিকাতা, ঢাকা, শিলচর, রংপুর, ২৪ পরগনা, তামিলনাদ, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, ফেনি, সিউড়ি, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট, আলমোড়া প্রভৃতি বহু স্থানে ধরপাকড়, খানাতল্লাশ, কারাদণ্ড প্রভৃতি ঘটিয়াছে।

নাগপুর হইতে প্রবল বন্যার সংবাদ আসিতেছে। কয়েক স্থানে ট্রেন চলাচল ব্যাহত।

শ্রীযুক্ত আজাদ, মহাত্মাজী, শ্রীযুক্ত জওহরলাল, ডাঃ সৈয়দ মামুদ, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ ওআর্ধায় এক গোপন বৈঠকে বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভা মাধ্যমিক বিল ও মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের কাজ সোম বা মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ হইবে।

২৬ অগস্ট।—

কলিকাতা করপোরেশনের ধাঙড় ও ময়লা পরিষ্কারে নিযুক্ত অন্যান্য শ্রমিকরা এক বেতনে দুই শিফ্‌ট্‌এ কাজের প্রতিবাদে এবং এক টাকা করিয়া যুদ্ধকালীন মাগ্‌গি ভাতার দাবিতে আজ হইতে ধর্মঘট শুরু করিয়াছে।

ভারত সরকার যুদ্ধে সাহায্যার্থ লটারির সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ নিষিদ্ধ করিয়া পঞ্জাব গভর্নমেণ্টকে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন।

২৭ অগস্ট।—

কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটি ১৩ সেপটেম্বরে ওআর্ধায় এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৫ সেপটেম্বরে বোম্বাইএ অধিবেশিত হইবে।

বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বাস তাঁহার ভাওয়াল মামলার আপিলের রায় পাঠ শেষ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লজের রায় পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। উভয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। এজন্য প্রবল চাঞ্চল্যের সঞ্চার ঘটিয়াছে।

নিউদিল্লির সংবাদ—পাড়গঞ্জ নামক মুসলমান পাড়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিয়াছে। জন্মাষ্টমীর এক মিছিল গান বাজনা করিয়া এক মসজিদের পাশ দিয়া যাইবার ফলে এইরূপ ঘটিয়াছে। ৫জন মুসলমান গ্রেপ্তার এবং শহরে ৪দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি হইয়াছে।
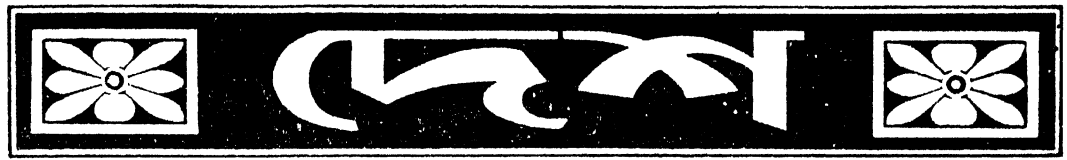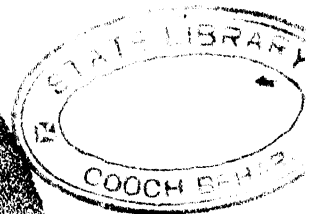
৭ম বর্ষ । শনিবার, ২২শে ভাদ্র, ১৩৪৭ সাল Saturday, 7th September, 1940 । ৪৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মন্ত্রিমণ্ডলের পরাজয়—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মাধ্যমিক শিক্ষা বিলে শিক্ষা-সংস্কারের নামে বাঙলাদেশের শিক্ষা-সংহারের জনাই উদ্যত হইয়াছেন। জোটবাঁধা ভোটের জোরে মন্ত্রিপক্ষের জয় হইলেও বিলের অন্তর্নিহিত অনিষ্টকারিতার কোন ব্যতিক্রম হইবে না। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা-সংস্কার এবং শিক্ষার প্রসারের জন্য হক মন্ত্রিমণ্ডলের গরজ যে কতখানি বাঙলার উভয় আইন সভাতেই তাহার পরিচয় মিলিয়াছে। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ অর্থ-ব্যবস্থা দাবী করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ এবং ব্যবস্থাপক সভা উভয় স্থানেই মন্ত্রীদের প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁহাদের পক্ষকে বিপুল ভোটের জোরে পরাজিত করিয়া দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মন্ত্রীদের পক্ষ হইতে স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় আর্থিক অনটনের মামুলী দোহাই উপস্থিত করিয়াছিলেন, একঘেয়ে সে মামুলী যুক্তি টিকে নাই। গত কয়েক বৎসরে বাঙলা-দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেহুদা নানা কাজে অর্থ ব্যয় হইতেছে, অথচ অর্থ জুটে না অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মাঝে মাঝেই অনুন্নত সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করিয়া মধুর মধুর বুলি শুনাইয়া থাকেন। শুধু কথায় চিঁড়া ভিজে না—নিজেদের মতলব হাসিল—লোকের যে পর্যন্ত চোখ কান ভাল করিয়া না ফুটে সেই পর্যন্ত। দেশের লোক এখন আর ঘুমাইয়া নাই। কত দরদ হক মন্ত্রিমণ্ডলের অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য এবং কত দরদই বা তাঁহাদের বাঙলাদেশে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য—দেশের লোক এখন তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। নিজেদের ভোটের জোর বজায় রাখাই হইল মন্ত্রিমণ্ডলের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনুন্নত সম্প্রদায়ের অবস্থা শিক্ষার দিকে যেমনই হউক, সেজন্য মাথা ব্যথা তাঁহাদের যেমন নাই, সেইরূপ শিক্ষা সংস্কারের নামে নিজেদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষা সংহার করিতেও তাঁহারা সঙ্কুচিত নহেন। এই দিক হইতে তাঁহারা নির্লজ্জতার শেষ সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন।

হক সাহেবের ফাকির—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী হক সাহেবের বক্তৃতায় বিশেষত্ব কিছু থাকিবেই। বোম্বাইতে গিয়া সম্প্রতি হক সাহেব এক জোরালো বক্তৃতা দিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, মুসলমানেরা পাকিস্থান ব্যতীত কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না। হিন্দু ও মুসলমান যে একসঙ্গে বাস করিতে পারে না, একথা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। পাকিস্থানের পরিকল্পনার উপরই মুশ্লিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নির্ভর করে এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগে মুসলমানদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। হক সাহেব ইহাও জানান যে, দরকার হইলে উহার জন্য তিনি নিজে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছেন।

পাকিস্থানী প্রস্তাবের জন্য হক সাহেবের ফাকির গ্রহণ করিবার এই যে সঙ্কল্প, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বাহবা ইহাতে মিলিবে, ইহা নিশ্চিত এবং ইহাও সত্য যে, এই বাহবা পাওয়াই তাঁহার লক্ষ্য। তিনি ইহা জানেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদীদের আনুকূল্যই ঐ প্রণালী কার্যে পরিণত করিবার একমাত্র পথ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আনুকূল্যের যে পথ, সে পথে মন্ত্রিত্ব ছাড়িবার কোন প্রশ্নই কোন দিন দেখা দিবে না। ভারতের স্বাধীনতার যে পথ, সে পথেই এ প্রশ্ন আসিয়া দেখা দেয়। পাকিস্থান প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতা কোনদিনই আসিবে না; কারণ ভারতের স্বাধীনতা আসিতে পারে কেবল জাতীয়তার সংহতির জোরে; পাকিস্থানী প্রস্তাব সেই সংহতির মৌলিক ভিত্তির উপরই আঘাত করিবে। এই দিক হইতে ভারতের স্বাধীনতা যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহারা লীগদলের ঐ নীতি কোন-ক্রমেই সমর্থন করিতে পারেন না। শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারীর রাজনৈতিক মত যাহাই হউক না কেন, তিনি একজন জাতীয়তাবাদী ইহাই আমরা জানিতাম। সম্প্রতি মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা মাহমুদাবাদের রাজা সাহেবের নিকট এক চিঠিতে রাজাজী এই পাকিস্থান প্রস্তাব সম্বন্ধে

যে কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। রাজাজী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গণপরিষদ দ্বারা ভারতের শাসনতন্ত্র যখন রচিত হইবে. তখন যদি মুসলমানেরা 'পাকিস্থানে'র জন্য একান্ত জিদ ধরিয়া বসেন এবং যদি কিছুতেই তাঁহাদিগকে ঐ কল্পনা ত্যাগ করিতে সম্মত না করা যায়, তখন গৃহযুদ্ধ করা অপেক্ষা হিন্দুরা পাকিস্থান প্রস্তাবই স্বীকার করিয়া লইবেন। রাজাজীর এমন ধরনের উক্তি আমরা বিশেষ অনিষ্টকর বলিয়াই মনে করি। প্রথমত আমরা এমন বিশ্বাস করি না যে পাকিস্থান প্রস্তাব ভারতের অধিকাংশ মুসলমানদের সম্মত সুতরাং গণপরিষদে মুসলমান জনমতের দ্বারা যে জনকয়েক স্বার্থপর সাম্প্রদায়িকতাবাদী তথাকথিত স্বয়ং-সিদ্ধ মুসলমান নেতার ঐ মত সমর্থিত হইবে, এমন কথা আমরা স্বীকার করি না। আজাদ মুস্লিম সম্মেলন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেই মুসলমান জনমত যে কোন দিকে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। তবে কেহ এ কথা বলিতে পারেন যে, মুসলমান জনমত পাকিস্থান প্রস্তাবের পক্ষেই হইবে রাজাজী এমন কথা বলিতেছেন না; তিনি বলিতেছেন, যদি হয়, এই কথা। এ সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য এই যে, এই ধরনের দ্ব্যর্থবোধক উক্তির মধ্যে যে ঔদার্যের পরিচয় রাজাজী দিয়াছেন, অতীতে তাহার ফল বিপরীতই হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতাবাদিগণ ঐ ধরনের মনোবৃত্তিতে প্রশ্রয় পাইয়াছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদিগণ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সেই প্রশ্রয়প্রাপ্ত মনোবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া ভারতের উপর তাহাদের অভিভাবকত্বকে অনিবার্য করিয়া তুলিবার সুযোগই লাভ করিয়াছে। সমগ্র জাতীয়তাবাদী ভারত রাজাজীর এমন অসমীচীন উক্তির প্রতিবাদ করিবে।

কথা ও কাজ—

কর্নেল হুইলার দক্ষিণ ভারত শ্বেতাঙ্গ সভায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বর্তমান যুদ্ধে ইংরেজেরা জয়লাভ করিলে জগতে গণতান্ত্রিকতার যে যৌথরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, ভারতবর্ষে তাহাতে সমমর্যাদার আসন লাভ করিবে। হুইলার সাহেবের উক্তি অনেকের নিকট অবশ্য শ্রবণমধুর হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজনীতিকরা ভারত-সম্পর্কিত তাঁহাদের নীতিতে এমন কিছু করেন নাই, যাহাতে ভারতবাসীরা ঐ আশায় উল্লাস বোধ করিতে পারে। কর্নেল হুইলার শ্বেতাঙ্গদিগকে ভারতবাসী ও শ্বেতাঙ্গ—এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বৈষম্য আছে তাহা বিস্মৃত হইতে পরামর্শ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন, শুধু সামাজিক আচার-ব্যবহারের দিক হইতেই ঐ ভেদ ভুলিলে চলিবে না, রাজনীতির দিক হইতেও ঐ ভেদ বিস্মৃত হইতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, রাজনীতির দিক হইতে যতদিন পর্যন্ত ভেদের কারণ রহিয়াছে, ততদিন পর্যন্ত সামাজিক ভেদ এবং বৈষম্যও সম্পূর্ণরূপে দূর হইবার নয়। কারণ, অনুকম্পা বা অনুগ্রহ ভেদকে দূর করে না, বরং অনুগ্রহের মধ্যে যে নিগ্রহ আছে তাহার আঘাত অনুগৃহীতকে বেদনা দান করিয়া থাকে। এই ভেদও বৈষম্যগত সমস্যার আত্যন্তিক সমাধান হইতে পারে শুধু ভারতবাসীরা যখন শ্বেতাঙ্গ জাতির প্রভুত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিজেরা নিজেদের ভাগ্যের নিয়ামক হইবে তখন। সেই মুখ্য প্রশ্নটিকে এড়াইয়া অন্য যত কথা সব অবান্তর। শ্বেতাঙ্গ এবং ভারতবাসীর মধ্যে ভেদ ও বৈষম্য যদি শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে কেহ কেহ দূর করিবার জন্য অনুপ্রাণিত সত্যই হন, তাহা হইলে ভারতবাসীদের রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে তাঁহাদের যোগদান করা উচিত এবং ভারতবাসীদের জাতীয়তামূলক কর্মপ্রচেষ্টায় তাঁহাদের সাহায্য করা কর্তব্য। দুঃখের সহিত আমাদিগকে এ কথা বলিতেই হইতেছে যে, শ্বেতাঙ্গগণের নিকট হইতে তেমন মনোবৃত্তির পরিচয় খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই বাঙলাদেশের কথাই উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙলার শাসনকার্য পরিচালনে এখানকার শ্বেতাঙ্গ সমাজ আগাগোড়া জনমতের বিরুদ্ধতাই করিয়া আসিতেছেন এবং উন্নতিকামীদিগের প্রতিবন্ধকতা ঘটাইতেছেন। বাঙলার আইন সভায় যে কয়েকটি জনমতবিরোধী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় বরাবরই প্রগতিবিরোধী এবং ভেদমূলক নীতির যাহা সমর্থক, তাহাদের দিকেই সায় দিয়াছেন। আসামের সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কথা ও কাজে যেখানে এমন পার্থক্য সেখানে কথাকে গুরুত্ব প্রদান করিতে দ্বিধা আসিবে, ইহা স্বাভাবিক।

নাগপুরে বাঙলা দিবস—

"বাঙলা দেশ সুখের দেশ, কবিতার দেশ, শিল্পকলার দেশ এবং সাহিত্যের দেশ। কিন্তু আমরা বাঙলাকে সব চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করি, কেননা, বাঙলা বীর দেশ সেবকের এবং স্বাধীনতার পূজারীর দেশ। এই স্বাধীনতার স্পৃহা এবং অতুলনীয় স্বার্থত্যাগের জন্যই আজ বাঙলাকে এত দুঃখে পড়িতে হইয়াছে"—গত ২৬শে আগষ্ট নাগপুরে 'বাঙলা দিবস' অনুষ্ঠান সভায় অধ্যাপক দেশপাণ্ডে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর নীতির প্রতিবাদ করিয়া বাঙলা দেশের সম্বন্ধে এই প্রশস্তিপূর্ণ উক্তি করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীযুক্ত মাণ্ডকর তাঁহার উদ্বোধন বক্তৃতায় বলেন,—সিন্ধুনদ হইতে সমুদ্র পর্যন্ত হিন্দুস্থান এক জাতির দেশ। সুতরাং বাঙলার হিন্দু একাকী লড়িবে—ইহা আমরা চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে পারি না। আমরা আজ বাঙলাকে এই কথা জানাইবার জন্য সমবেত হইয়াছি যে, যতদিন না বাঙলার হিন্দুগণ বিজয়লাভ করে, ততদিন নাগপুরে হিন্দু যুবক সম্প্রদায় এই সংগ্রামে তাঁহাদের পার্শ্বে শরিক বন্ধু হিসাবে দাঁড়াইবে।" বাঙালী সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বড় করিয়া দেখে না; বাঙালী চায় স্বাধীনতা, বাঙালী চায় অখণ্ড ভারতের ঐক্য এবং সেজন্য সে সকল দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছে এবং এখনও লইতে প্রস্তুত আছে। সমগ্র ভারতের জাতীয়তাবাদিগণ যদি এই সাধনায় বাঙালীকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে দেশের স্বাধীনতা লাভের দিন নিকটবর্তী

হইবে। আমরা জানি সে পথ কুসুমে আস্তৃত নয়, সে পথ কণ্টকসঙ্কুল। কিন্তু দুর্গম পথে চলার আনন্দ বাঙালী আস্বাদন করিয়াছে। "সকল মহৎ সিদ্ধি পরম প্রয়াসে"— বাঙলার বীর সাধক সন্তানগণের ইহাই হইল বাণী।

লীগওয়ালাদের সিদ্ধান্ত—

বোম্বাই শহরে মুশ্লিম লীগের কার্যকরী সমিতির বৈঠক হইয়া গিয়াছে। ভারত সচিব এমেরি সাহেবের বক্তৃতায় লীগওয়ালারা খুশী হইয়াছেন এবং এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মুশ্লিম লীগের সম্মতি এবং অনুমোদন ব্যতিরেকে ভারতের কোন শাসনতন্ত্রই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট স্বীকার করিয়া লইবেন না, ভারত সচিবের বিবৃতির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে এই আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। কার্যত এই বিবৃতিতে মুশ্লিম লীগের দাবীই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। তবে ভারত সচিব এবং বড়লাটের বিবৃতির মধ্যে লীগের মতে কিছু কিছু বেফাঁস কথা নাকি আছে। সে কথাগুলি হইল ভারতের জাতীয় জীবনের ঐক্য সম্বন্ধে। লীগ সেজন্য হুজুরে আরজী করিয়াছে যে, ভারতের জাতীয় জীবনে ঐরূপ কোন ঐক্য নাই, ঐরূপ ঐক্যের কথা ঐতিহাসিক সত্যের দিক হইতে ভিত্তিহীন এবং পরস্পর-বিরোধী। লীগ কর্তাদের কাছে এই দরবার করিয়াছে যে বড়লাটের শাসন পরিষদে এবং যুদ্ধ সাহায্য সম্পর্কে যে সব পরামর্শ কমিটি গঠিত হইবে সেগুলিতে বাটোয়ারা ব্যবস্থার দ্বারা মুশ্লিমদের সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হউক, তাহা হইলে লীগওয়ালারা সর্বান্তঃকরণে সমরোদ্যমে প্রবৃত্ত হইবেন। মুশ্লিম লীগওয়ালাদের এই সিদ্ধান্তের বিশদ ব্যাখ্যা আমরা নিজেরা করা আর প্রয়োজন বোধ করি না। বাখরগঞ্জ জেলা কৃষক এবং প্রজা সমিতির নেতা মৌলবী সৈয়দ হবিবর রহমানের উক্তি আমরা এ সম্বন্ধে উদ্ধৃত করিতেছি। সম্প্রতি তিনি পাকিস্থান প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"এই প্রস্তাবে মুসলমান জনসাধারণ, এমন কি, মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাঁহাদেরও কোন উন্নতি সাধিত হইবে না; শুধু মুশ্লিম লীগের নেতাদেরই স্বার্থ সিদ্ধি হয়ত হইতে পারে এবং এই দাবীতে ভারতের স্বাধীনতার দাবী প্রতিহত করিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সুযোগ পাইবে।" জগতের সর্বত্র নবজাগ্রত ইসলাম, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। মিশরে, ইরাকে, ইরানে, প্যালেস্টাইনে, তুরস্কে মুসলমান জাতি আজ প্রগতির পথে আগাইয়া যাইতেছে, আর লীগওয়ালারা ভারতের স্বাধীনতার বিরোধীদের বলই বাড়াইতেছেন। লীগওয়ালাদের এই প্রচেষ্টা ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে বিশ্ব জগতের ইসলামের দৃষ্টিতে কিরূপ অবমানিত এবং ধিকৃত করিতেছে, আত্মমর্যাদায় জাগ্রত মুসলিম তরুণ সম্প্রদায় অবশ্যই তাহা উপলব্ধি করিবে, ইহাই এ দুর্দিনে আমাদের ভরসা।

রণ-সম্ভার সভা—

আগামী অক্টোবর মাসে দিল্লীতে ছয় সপ্তাহ ব্যাপী রণসম্ভার সভার আয়োজন হইতেছে। এই সভায় অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ রোডেসিয়া, ব্রহ্মদেশ, হংকং, সিংহল, মালয় এবং পূর্ব আফ্রিকার ব্রিটিশ-শাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিবেন। যুদ্ধের সাফল্যলাভের নিমিত্ত কোন দেশ হইতে কিরূপ তোড়জোড় সরবরাহ করা সম্ভব হইতে পারে, এই বিষয়ে আলোচনাই হইবে সভার উদ্দেশ্য। পশ্চিম এশিয়ায় রণাঙ্গন বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমর-সম্পর্কিত দায়িত্ব ক্রমেই ভারতের উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং সকলেই এই দিক হইতে ভারতের সাহায্যের গুরুত্বকে স্বীকার করিতেছেন। ভারতের প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও এই বিষয়ে জনসাধারণের সাহায্য লাভ করিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ ভারতের স্বাধীনতা দাবী—এ বিষয়ে প্রথম প্রয়োজন তাহা স্বীকার করিয়া লইতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। আজ যদি ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ দূরদর্শিতার সঙ্গে কংগ্রেসের দাবীকে স্বীকার করিয়া লইতেন, তাহা হইলে ৪০ কোটি লোকের বাসভূমি এই ভারতবর্ষের সর্বত্র নবীন উদ্দীপনার সঞ্চার হইত। স্বাধীন ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় ইংরেজের সমর শক্তি দুর্বর্ষ হইয়া উঠিত। ভারতবর্ষ সামরিক শক্তির দিক হইতে শক্তিশালী করিবার দিকে উপেক্ষা করিয়া এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ যে ভুল করিয়াছেন, আজও ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে স্বীকার না করিয়া লইয়া তাঁহারা সেই ভুলই বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। ভারতের জনমত আজ চায় স্বাধীনতা। কোন রাষ্ট্রনীতিক কূট যুক্তির দ্বারাই জাতির সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সম্ভব নহে। অথচ ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মুখে সেই মামুলী কূট যুক্তির অবতারণাই আজও দেখিতেছি।

ভাওয়ালের মামলা—

'এমন এক মামলা সম্পর্কে এই আপীলের উদ্ভব হইয়াছে যাহার চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক কাহিনীর তুলনা এ দেশের বা পৃথিবীর অপর কোন দেশের আদালতে মিলে নাই —ভাওয়ালের মামলার আপীলের রায়ে বিচারপতি কস্টেলো এই মন্তব্য করিয়াছেন। সত্যই ভাওয়ালের মামলা ইহার অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিবে। লর্ড বার্কেনহেড জগতের বিভিন্ন স্থানের বিস্ময়কর মামলার বিবরণযুক্ত আইনের সূক্ষ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক যে পুস্তক লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই বিখ্যাত গ্রন্থেও ভাওয়ালের মামলার ন্যায় বিস্ময়কর মামলার কথা নাই। ঘটনার দিক হইতে ভাওয়ালের মামলা বিস্ময়কর, কিন্তু শুধু তাহাই নয়, এই মামলার সম্পর্কে ব্যবহার-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের যে, সমস্ত সমস্যার সমুদ্ভব হইয়াছে, তাহার জন্যও এই মামলা সমস্ত জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। মামলায় হাইকোর্টের দুইজন বিচারপতি কস্টেলো এবং বিচারপতি বিশ্বাস নিম্ন

আদালতের বিচারক শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসুর সহিতই একমত হইয়াছেন, যোগ্যতার এত বড় পুরস্কার সহজে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। বিচারপতি বিশ্বাস তাঁহার রায়ে যে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি এবং বিশ্লেষণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, ব্যবহার-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহা সম্পদস্বরূপে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। মামলার ফলাফল যাহাই হউক, ব্যবহার এবং তর্কবিজ্ঞানের দিক হইতে ভাওয়ালের মামলা ইতিহাসে স্থান লাভ করিবে এবং সেই সঙ্গে শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু ও বিচারপতি বিশ্বাসের পান্ডিত্য এবং মনীষার খ্যাতিও স্থায়ী হইয়া থাকিবে।

হিটলারের সঙ্কল্প—

মিঃ এণ্টনি ইডেন যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিলাতে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, "শরৎকাল নিকটবর্তী, সুতরাং ইংলন্ড আক্রান্ত হইবার ভয় কাটিয়াছে, এমন মনে করা নির্বোধের কাজ হইবে। ইংলন্ড আক্রমণ করিয়া ইংরেজ জাতিকে অধীন করিতে হইবে, হিটলার এই যে সংকল্প ঘোষণা করিয়াছিলেন, সে সংকল্প তিনি যে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণই এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আগামী কয়েক সপ্তাহের জন্য আমাদিগকে খুবই সতর্ক থাকিতে হইবে, এমন সতর্কতা অবলম্বনের যথেষ্ট কারণ দেখা যাইতেছে।" ইডেন সাহেবের এই বক্তৃতায় বেশই বুঝা যাইতেছে যে, যুদ্ধ সহজে মিটিতেছে না। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট পোপের সঙ্গে যোগ দিয়া একটা মিটমাটের চেষ্টা করিবেন শুনা যাইতেছে। কিন্তু তেমন চেষ্টার ফল যে কি হইবে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কাজেই সে পরিচয় মিলিয়াছে। তিনি সেদিনও এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর প্রবলতম আক্রমণের আশংকা আমেরিকায় আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য আমাদিগকে পূর্ব হইতেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কারণ বিলম্ব ঘটিলে সব নষ্ট হইয়া যাইবে; অতএব কর অস্ত্রসজ্জা।" শান্তির সূচনাই বটে!

কলিকাতার ধাঙগড় ধর্মঘট—

কলিকাতার ধাঙগড় ধর্মঘট সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য কর্পোরেশন হইতে যে স্পেশাল কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। রিপোর্টে বলা হইয়াছে,—"আমরা দেখিতেছি কলিকাতার ফুটপাথ পাকা হইয়াছে, রাস্তায় টার-ম্যাকাডাম পড়িয়াছে, গ্যাসের আলোর উপর বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে। উচ্চতন অফিসারদের বেতন প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। এমন কি ১৯৩৪ সালে ধাঙগড়দের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য ৫ বৎসরকাল বৎসরে ৩ লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিবার যে ব্যবস্থা মঞ্জুর করা হইয়াছিল, এই ৬ বৎসরেও উহা কার্যে পরিণত করিবার কথাও কাহারও স্মরণ হয় নাই।" ধাঙগড়দের সকল দাবীই সঙগত এবং প্রত্যেকটি মানিয়া লইতে হইবে, এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু তাহাদের সঙগত দাবী এবং যে সব দাবী মানিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, কমিটির রিপোর্টে দেখা যাইতেছে, সেগুলি প্রতিপালন করিবার জন্যও কর্তৃপক্ষের গরজ নাই। ধাঙগড়েরা গরীব বলিয়াই কি এই উপেক্ষা অথচ তেলা মাথায় তেল ঢালিবার কাজ কিন্তু সব চলে। ধাঙগড়দের ন্যায্য দাবী যাহাতে যথাসম্ভব পূরণ করা হয় এবং ধর্মঘটের অবসান হয়, অবিলম্বে তেমন ব্যবস্থা করিলেই আমরা সুখী হইব।

বাঙলায় শিক্ষার অবস্থা—

বাঙলা সরকারের ১৯৩৮-৩৯ সালের শিক্ষা বিভাগীয় রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই রিপোর্টে প্রাপ্ত তথ্যের হিসাব করিলে দেখা যায় যে, বাঙলা দেশের সকল বালক এবং বালিকা প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধা পাইবে, এমন অবস্থায় যাইতে আরও ত্রিশ বৎসর লাগিবে। আলোচ্য বৎসরে ত্রিপুরা এবং ফরিদপুর জেলায় দুইটি স্কুল বোর্ড গঠিত হইয়াছে, ফলে ১৪টি স্কুল বোর্ড বাঙলা দেশে দাঁড়াইল। আলোচ্য বৎসরে বাঙলা সরকার বাঙলার বে-সরকারী কলেজগুলির জন্য ২,৩৭,০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন ইহা ছাড়াও কলেজ লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী প্রভৃতির জন্য সুবে বাঙলায় ব্যয় করিয়াছেন সাকুল্যে ৮০ হাজার তঙ্কা। সুতরাং শিক্ষা বিস্তারের জন্য হক মন্ত্রিমন্ডলের যে ত্রুটি আছে, কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন কথা বলিবে! প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিবেচনার জন্য ঐ বৎসরে যে পরামর্শ পরিষদ গঠিত হয়, সেই পরিষদ ৬ হাজার শিক্ষাপ্রাপ্ত 'গুরু' তৈয়ারী করার প্রয়োজনীয়তার প্রস্তাব করিয়াছেন। হক মন্ত্রিমন্ডল পরম ঔদার্য সহকারে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন; এতদূর উদারতার ক্ষেত্রে অন্য আলোচনা অবান্তর।

জীবন

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

কালের উচ্ছল স্রোত নিখিল ধরায়
উত্তাল তরঙ্গ তুলি বহে মত্ত প্রায়;
আলোড়নে বিলোড়নে ক্ষণে ক্ষণে তায়
ভেসে ওঠে জীবন বুদ্বুদ।

প্রবাহের অনুকূলে চলে সে বহিয়া
অনন্ত পুলক ভরে নাচিয়া নাচিয়া।
ক্ষণিক প্রমূর্ত থাকি, ত্রস্তে বিদরিয়া
ডুবে যায় জীবন বুদ্বুদ।

যুদ্ধের এক বৎসর পরে

ব্রিটিশ মন্ত্রী মিঃ আর্থার গ্রীনউড গত ৩০শে অগস্ট ঘোষণা করিয়াছেন—"যুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল, আমরা সঙ্গতভাবেই এ গর্ব করিতে পারি যে, বিজয়-লাভ হইবে আমাদেরই এবং স্বাধীনতার পক্ষই জয়যুক্ত হইবে"।

গত বৎসর ১লা সেপ্টেম্বর জার্মান পোল্যান্ড আক্রমণ এবং ইহার দুইদিন পরে ৩রা সেপ্টেম্বর ইংরেজ ও ফরাসী জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই এক বৎসরের মধ্যে জগতের উপর দিয়া একটা প্রলয়ের ঝড় বহিয়া গিয়াছে এবং ইউরোপের মানচিত্র একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। দানবীয় ধ্বংসলীলায় ইউরোপ আজ বিপর্যস্ত, সমস্ত জগত তাহার ভয়াবহতায় স্তম্ভিত।

বহু শোণিতপাত এবং আত্মোৎসর্গের পর যে পোল জাতি স্বাতন্ত্র্য-লাভ করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই পোল জাতি স্বাধীনতা হারাইয়া পুনরায় বিজিত শক্তির ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু পোলেরা বীরের জাতি: তাহারা সহজে এই অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লয় নাই। বীরের মত বহু বলশালী শত্রু-শক্তিকে তাহারা বাধা দিয়াছে। পোলজাতির সন্তানগণ অকাতরে মরণকে বরণ করিয়া লইয়াছে। দেশের স্বাধীনতা তাহারা রক্ষা করিতে পারে নাই ইহা ঠিক, কিন্তু আত্মদানের ভিতর দিয়া আদর্শকে তাহারা উজ্জ্বল করিয়াছে এবং তাহাদের সাধনা সিদ্ধির অমোঘ শক্তিকে অনাগতের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রুষিয়া যদি জার্মানির সঙ্গে যোগ দিয়া পোল্যান্ড আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে পোলেরা সম্ভবত আরও কিছুদিন
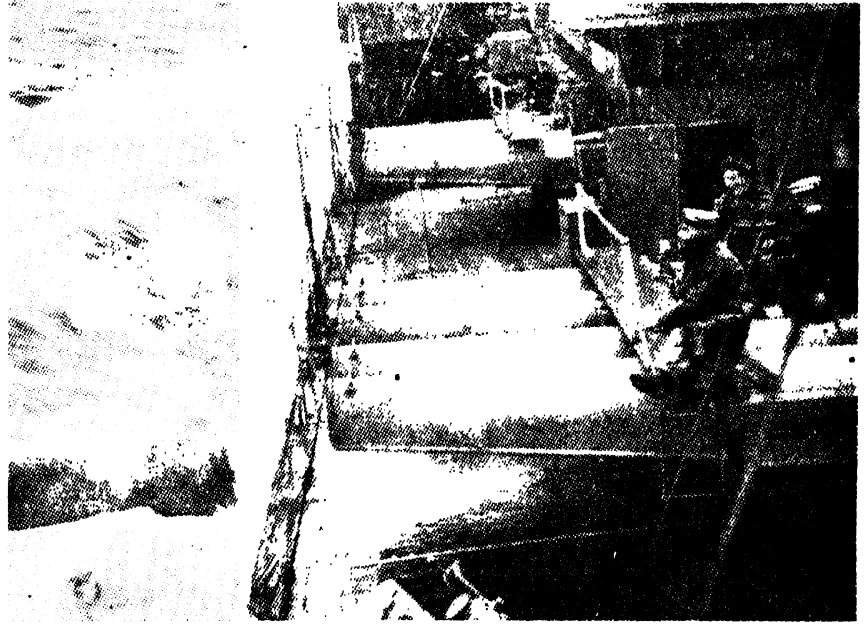
ডেষ্ট্রয়ার হইতে একটি টর্পেডো ছাড়া হইতেছে।
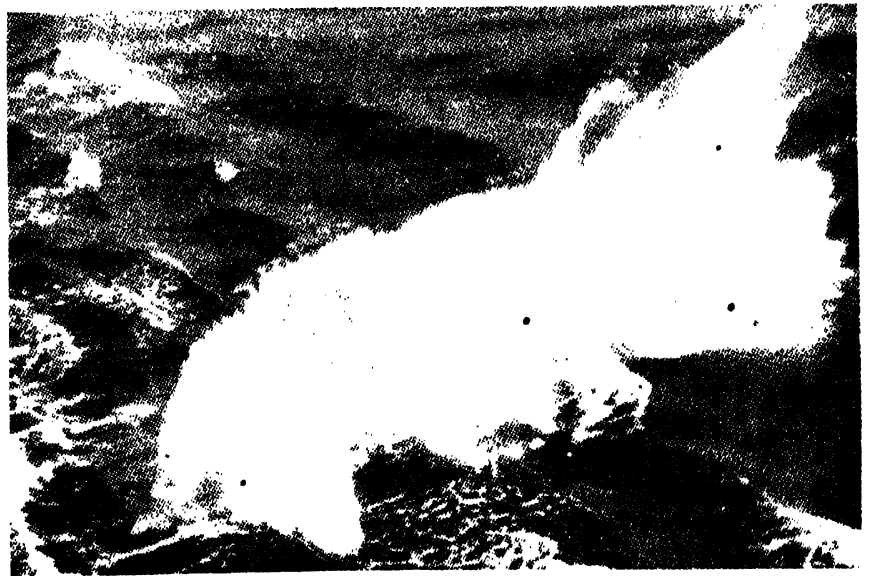
জলের নীচে টর্পেডোর গতি।

জার্মানির সঙ্গে সংগ্রাম চালাইতে পারিত, কিন্তু পরিণামে তাহাদিগকে জার্মানির অধীনে যাইতেই হইত; কারণ এ পক্ষে মিত্রশক্তির সাহায্যই ছিল তাহাদের প্রধান সম্বল। পোল্যাণ্ডের অবস্থান যেরূপ, তাহাতে মিত্রশক্তি তেমন সাহায্য সহজে তাহাদিগকে করিয়া উঠিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না। রুষিয়ার পোল্যাণ্ডে হস্তক্ষেপে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-হানির দিক হইতে অবস্থার বিপর্যয় বিশেষ কিছু ঘটে নাই।. রুষিয়ার এই চাপে বাল্‌টিক সাগরতটে জার্মানি প্রকৃতপক্ষে দুর্বল হইয়াছে। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ যুদ্ধ ঘোষিত হইবার বিশ দিন পরে পোল্যাণ্ডের পতন ঘটে এবং সেই পতনের প্রতিক্রিয়া বাল্‌টিকের পরপারে প্রসারিত হয়। ফিনদের দেশ—বলগা হরিণের বাসভূমি তুষারাবৃত ফিনল্যাণ্ড। রুষিয়া ৩০শে নভেম্বর ফিনল্যাণ্ডে অভিযান করে; ফিনল্যাণ্ডের গভর্নমেণ্ট জনপ্রিয় ছিলেন না;

পাকি রকমে দখল করিয়া লওয়ায় নারভিক দখলে আনিয়াও ইংরেজ সামরিক দিক হইতে নরওয়েতে বিশেষ কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার পর পশ্চিম সীমান্তে জার্মানির চাপ পড়ে এবং ইংরেজকে নরওয়ে ছাড়িয়া আসিতে হয়। পোল্যাণ্ড এবং নরওয়ের এই বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়। নরওয়ের পতনের পরই জার্মানি প্রবল বিক্রমে যুগপৎ হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং লুক্সেমবুর্গে হানা দেয়। ল্যাক্সেমবুর্গ যেদিন আক্রান্ত হয়, সেইদিনই আত্মসমর্পণ করে এবং হল্যাণ্ড ১৫ই মে অর্থাৎ পাঁচদিন লড়াইয়ের পর আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। বেলজিয়ামে মিত্রশক্তির সেনাদল প্রবেশ করিয়া কিছু সাহায্য করিয়াছিল; কিন্তু বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড মিত্রশক্তির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া জার্মানির নিকট আত্মসমর্পণ করেন।
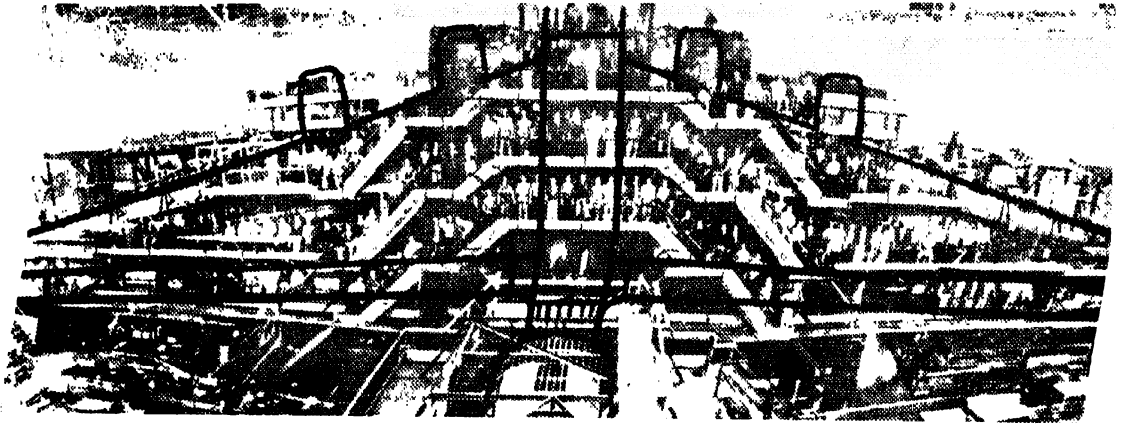
পৃথিবীর বৃহত্তম দূর-পাল্লার বোমারু বিমান। ইহার ওজন ১৬০,০০০ পাউণ্ড। কালিফোর্নিয়ার কারখানায় ইহার নির্মাণকার্য চলিতেছে।

প্রধানত এই অন্তর্দ্রোহের দরুনই ফিনল্যাণ্ডে রুষিয়া বিজয়লাভ করে। গত ১৩ই মার্চ ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে রুষিয়ার সন্ধি স্থাপিত হয়। বালটিক সাগর তীরে রুষিয়া নিজের ঘাঁটি আরও দৃঢ় করে। ইহার পর আরম্ভ হয় ডেনমার্কের পালা। ডেনমার্ক জার্মানিকে বাধা দেয় নাই, এবং বাধা দিবার সামর্থও তাহার ছিল না। জার্মানি কয়েকখানা রণপোতযোগে ডেনমার্কে সেনা নামাইয়া ত্বরিতগতিতে ডেনমার্ক দখল করে, এই সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানির সেনাদল নরওয়েতেও অভিযান করে। নরওয়ে মাসাধিককাল জার্মানিকে বাধা দিয়াছিল। ৯ই এপ্রিল জার্মানি নরওয়েতে অভিযান করে এবং ২রা মে তারিখে নরওয়ের পতন ঘটে। মিত্রশক্তি নরওয়েকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন; কিন্তু সে সাহায্য নরওয়ের স্বাধীনতা রক্ষার উপযোগী হয় নাই। নরওয়ের রাজা ইংলণ্ডে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ইংরেজ সেনা কিছুদিনের জন্য নরওয়ের উত্তর অঞ্চলের নারভিক বন্দরটি দখলে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু নরওয়ের প্রধান অংশ, বিশেষভাবে উড়োজাহাজের ঘাঁটিগুলি জার্মানি পাকা-

লিওপোল্ডের এই আকস্মিক আত্মসমর্পণে মিত্রপক্ষের সেনাদলের অবস্থা ফ্লাণ্ডার্সে অতি শোচনীয় আকার ধারণ করে। এই সময় জনমতের চাপে ইংলণ্ডে চেম্বারলেনের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং চার্চিল সাহেব প্রধান মন্ত্রী হন। চার্চিলের প্রধান কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ফ্লাণ্ডার্সের রণাঙ্গন হইতে ব্রিটিশ রক্ষিবাহিনী নিরাপদে ফিরাইয়া আনার ভিতর দিয়া। ২৮শে মে তারিখে বেলজিয়ামের আত্ম-সমর্পণের পর এই সেনাদল জার্মান সৈন্যদের দ্বারা এমনভাবে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইহাদের উদ্ধারের কোন আশাই ছিল না। ডানকার্ক হইতে এই সেনাদল ইংলণ্ডে আনয়ন করা চার্চিলের রণকৌশলের পরিচয় প্রদান করে। প্রধান মন্ত্রীস্বরূপে চার্চিল সাহেব ফ্লাণ্ডার্সের এই পরাজয়কে গুরুতর সামরিক দুর্দৈব বলিয়া অভিহিত করেন।

কিন্তু দুর্দৈব চরম আকারে দেখা দেয় ইহার পরে। জার্মান সৈন্য বিপুল বিক্রমে উত্তর দিক ঘুরিয়া ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যে ম্যাজিনো লাইনের দুর্ভেদ্যতা ফ্রান্সের ছিল একমাত্র সম্বল, সে ম্যাজিনো লাইন ফ্লাণ্ডার্সের পরাজয়ের পর ফরাসীদিগের পক্ষে কোন

কাজেই আসে না। ৫ই জুন তারিখে ফ্রান্সের লড়াই আরম্ভ হয়। ফরাসীদের সেনাবল পর্যাপ্ত ছিল না, সমরোপকরণের আধুনিকতার দিক হইতেও তাহারা জার্মনদের চেয়ে নিকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হয়, প্যারিসের পতন ঘটে। প্যারিসের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জার্মনবাহিনী দ্রুতগতিতে ফ্রান্সের উত্তর উপকূলস্থ বন্দরগুলি দখল করিয়া ইংরেজদের সঙ্গে ফ্রান্সের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু ইংরেজের সাহায্যের অপেক্ষায় না থাকিয়াই ২৪শে জুন তারিখে ফ্রান্সের পেঁতা গভর্নমেণ্ট জার্মানির নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং অত্যন্ত অবমাননাকর শর্ত স্বীকার করিয়া লন। ফ্রান্সের এই পরাজয় বর্তমান সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অধ্যায় বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। অতঃপর আরম্ভ হয় যুদ্ধের তৃতীয় পর্ব। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীস্বরূপে চার্চিল ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পর ঘোষণা করেন—"আমাদিগকে এখন এককভাবেই সংগ্রাম চালাইতে হইতেছে। কিন্তু আমরা শুধু নিজেদের জনাই সংগ্রাম করিতেছি না। আমরা নির্ভীকভাবে শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি।"

গত ৮ই অগষ্ট হইতে ইংলণ্ডের উপর জার্মনদের প্রত্যক্ষ আক্রমণ আরম্ভ হয় বলা চলে। সেই হইতে এখনও আক্রমণ চলিতেছে। জার্মনেরা ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে কামান বসাইয়া ইংলণ্ডের উপর তোপ দাগিতেছে, কিন্তু এই উপায়ে ইংলণ্ড দখল করা যায় না। জার্মন উড়ো-জাহাজের আক্রমণ লণ্ডনের উপরও চলিতেছে। যে কোন প্রকারে ধ্বংসলীলার প্রসার করা এবং ইংলণ্ডের সর্বত্র ভীতির সঞ্চার করাই দেখা যাইতেছে ইংলণ্ডে জার্মনদের অবলম্বিত রণনীতির লক্ষ্য। জার্মন বিমান বীরদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার ভিতর দিয়া ইংলণ্ডের আত্মরক্ষার শক্তি সুপরীক্ষিত হইয়াছে। জার্মনের ক্ষতি হইতেছে অসাধারণ রকমের। শুধু তাহাই নহে, ইংরেজ বিমান-বীরেরাও জার্মানির নানা-স্থানে হানা দিতেছে, বার্লিনের উপর হানা দিয়াও তাহারা বোমা ফেলিতেছে এবং ইংরেজ বিমানবীরদের আক্রমণজনিত ক্ষতি জার্মানি সরকারীভাবেও স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইতেছে।

যুদ্ধের এই তৃতীয় পর্বে প্রধান ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে আফ্রিকার উপকূলে এবং লোহিতসাগরের তীরে যুদ্ধের সম্প্রসারণ। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সোমালীল্যাণ্ড ইংরেজ ছাড়িয়া আসিবার পর ইটালির লক্ষ্য রহিয়াছে এখন মিশর এবং সুদানের উপর। ইটালির এই নীতির সাফল্যে ও অসাফল্যের উপর এদেন ও লোহিতসাগরের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। এই দিক হইতে যুদ্ধ এখন ভারতের সীমানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে বলা যায়। সুদান দখল করিয়া ইটালি লিবিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত মহাসাগরের উপকূলভাগ পর্যন্ত এক লাগোয়া নিজের অধিকার বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা অসম্ভব নয়। ইটালির এই উদ্যমে বাধা দিতে হইলে কেনিয়া হইতে মিশর হইতে ইংরেজকে চাপ দিতে হইবে। ফরাসী অধিকৃত কঙ্গো প্রদেশের ফাদ নামক উপনিবেশটি পেঁতা গভর্নমেণ্টের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া ইংরেজের সাহায্য করিবে সঙ্কল্প করিয়াছে। মিশর ইটালি কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আতঙ্কের স্থলে এই স্থানের বিদ্রোহ ইংরেজকে সাহায্য করিবে। ফাদ প্রদেশটি সুদানের ধারে অবস্থিত, ইহার উত্তরে ইটালির লিবিয়া। ফাদ হ্রদটি সুদানের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত গিয়াছে। আবিসিনিয়ার বিদ্রোহীরা যদি এশিয়ায় মাথা তুলিতে পারে তাহা হইলেও ইংরেজের বিশেষ সুবিধা হইবে। কারণ শুধু লোকবল ও সমরোপকরণেই আফ্রিকার সংগ্রামে বড় কথা নয়, প্রতিনিধির ক্ষমতা এক্ষেত্রে বড় জিনিস এবং ইহা বিশেষভাবে নির্ভর করে স্থানীয় অধিবাসীদের আনুকূল্যের উপর। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, শুধু ইংলণ্ডে আত্মরক্ষার উপর সর্বতোভাবে জোর দিলেই ইংরেজের চলিবে না। পশ্চিম এশিয়ায় শত্রুপক্ষকে নির্জিত রাখিতে হইবে এবং সেজন্য মিশর ও লোহিতসাগরতটে ও ভূমধ্যসাগরে বিপুল বলবাহিনী আবশ্যক। এই দিক দিয়া বর্তমানে ভারতবর্ষের সমরশক্তির সাহায্য গ্রহণ করা ইংরেজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। শুধু পশ্চিম এশিয়াই নয় পূর্ব এশিয়ার অবস্থার পরিবর্তনের উপরও ইংরেজকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জাপান হিন্দু-চীনের দিকে হাত বাড়াইবার তালে আছে, কোন্ দিন প্রশান্ত-সাগরের বীচিমালা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে, তাহাই বা কে জানে? সুতরাং সর্বদিক হইতেই একথা এখন আর বলা চলে না যে, ভারতবর্ষ যুদ্ধের প্রভাব হইতে এখন বহুদূরে রহিয়াছে। যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর শান্তির সম্ভাবনাকে আসন্ন করে নাই, বরং যুদ্ধ যে সুদীর্ঘকাল চলিবে এবং যুদ্ধের সমস্যা যে অধিকতর জটিল আকার ধারণ করিবে, এই সম্ভাবনাকেই সুদৃঢ় করিতেছে। যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা দান করিতেছে যে, যে দুর্বল এবং অসহায়, জগতে তাহার স্থান নাই। এ জগতে মানুষের অধিকার উপভোগ করিতে হইলে আত্মশক্তিই একমাত্র সম্বল। দুর্বলতা সবচেয়ে বড় পাপ এবং এই দুর্বলতার পাপে যে পাপী, অপরের পরম উদারতাও তাহাকে তাহার স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ গভীর প্রকৃতির সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন অজস্র। সে তুলনায় তাঁর কৌতুকপ্রধান রচনা বেশী নয়। এমন কি তাঁর গভীর প্রকৃতির উপন্যাস, প্রবন্ধ বা ছোট গল্পের মধ্যে হাস্যরস একটা খুব বড় স্থান অধিকার করে নেই। কিন্তু বিশেষ বিচার করে দেখলে মনে হয়, হাস্যরসের বিচিত্র ও বহু দিকে একসঙ্গে যেসব উচ্চশ্রেণীর সৃষ্টি তিনি করেছেন, বাঙলা সাহিত্যের আর কোনও লেখকের ভাগ্যে সে গৌরব ঘটে নি। রঙ্গ, ব্যঙ্গ, হিউমার—হাসির সব রসই তাঁর হাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা, রঙ্গপ্রধান গল্প, কবিতা ও প্রহসন কিছুই তিনি বাদ দেন নি। তাঁর পরে হাস্যরসের এক-এক দিকে কোনও কোনও শক্তিশালী প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে সত্য, কিন্তু এক বাঙলা সাহিত্যের বিচিত্র দিকে বিচিত্র হাস্যরস এমন অনবদ্যভাবে রূপায়িত করে তুলেছেন, এমন শিল্পীকে দেখা যায় না। আমাদের সাহিত্যে হাস্যরসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব শুধু এই কারণে নয়; এর চেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, তিনি হাস্যরসের ইতিহাসে যোগ করেছেন নূতন অধ্যায়। বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরস রূপায়িত করেছেন নূতন ঢঙে, হাসির মধ্যে তিনি জাগিয়েছেন নূতন সুর।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস মূলত খুব হালকা। মনে হয় এক 'মৃচ্ছকটিক' নাটক বাদ দিলে হাস্যরস রূপায়িত হয়েছে মাত্র রঙ্গপ্রধান ঘটনাসমাবেশে কিংবা অস্বাভাবিক বা অতি অদ্ভুত চরিত্রের রঙ্গালাপে। সাধারণভাবে বলতে গেলে মনে হয়, সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস যেন বিদূষকের একচেটে ছিল। হাস্যরসের মূল উৎস হচ্ছে অসংগতির অনুভূতি তা স্বীকার করি। সাধারণত আমাদের হাসি পায় তখনই যখন আমরা এমন কোনও ঘটনা দেখি যার মধ্যে স্বাভাবিক সংগতি থাকে না। 'সাহিত্যদর্পণ'প্রণেতা বলেছেন, "বিকৃতাকারবাগ বেশচেষ্টাদে কুহকাদ্ভবেৎ।" ইউরোপীয় সাহিত্য-বিচারকেরাও স্বীকার করেন, বিকৃতি বা অসংগতিই হাস্যরসের মূল উৎস। তত্ত্বের দিক থেকে তাঁদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই, কিন্তু অসংগতির অনুভূতির মধ্যে রয়েছে দুই দলের পার্থক্য। অসংগতি একমাত্র অত্যদ্ভুত চরিত্রের মধ্যেই থাকে না। কেবল অতি অদ্ভুত চিরত্রের বা ঘটনা-সমাবেশের অসংগতি থেকে যে হাস্যরস সাহিত্যে রূপায়িত হয়ে ওঠে, শ্রেণীবিচারে তার স্থান খুব উঁচুতে নয়। ইউরোপীয় সাহিত্যের হাস্যরস আরও গভীরতর জিনিস। আমাদেরই চারপাশে সাধারণ জীবনের বিচিত্র গণ্ডির মধ্যে মানুষের দুর্বলতা, দুর্বুদ্ধি ও উদভ্রান্তিকে ভিত্তি করে কত যে কৌতুক ও বেদনা জমা হয়ে আছে তার সন্ধান পেয়েছেন ইউরোপীয় শিল্পীরা। শুধু অতি অদ্ভুত কিছুর মধ্যে তাঁরা হাস্যরস খুঁজে বেড়ান নি। তাঁদের হাসি, আমাদের মন শুধু ফাঁকা হাসি দিয়ে ভরে দেয় না, তা আমাদের হাসায় ভাবায় আবার কাঁদায়ও। তাই তাদের হাস্যরস শুধু এক ধরনের নয়, বিচিত্র ধরনের। লঘু পশ্চাদ্‌-ভূমিতে তাঁদের শিল্পী মন ফুটিয়ে তুলেছে গভীরকে।

হাস্যরস সম্বন্ধে আমাদের অনেকের ধারণা ঝাপসা। উঁচু জাতের হাস্যরস সাহিত্যের অন্যান্য রসের মতই গভীর। তার ছন্দ লঘু এবং আকৃতি চপল হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি লঘু নয়। আয়তনে যা গুরু নয় তা যে গভীর হতে পারে না, এ রকম ধারণা করা ভুল। হাসিমাত্রেই সাহিত্যের হাস্যরস নয়। বিচার করে দেখলে মনে হয়, বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক রেনেসাঁস যুগের আগে কোনও লেখকের এ ধারণা ছিল না। এমন কি রেনেসাঁস যুগের প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে পর্যন্ত যে হাস্যরস পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্যের হালকা হাস্যরসের প্রভাব। তাঁর বিদ্যাদিগ্‌গজ, বামনী, তর্সাবিরওয়ালী প্রভৃতি চরিত্র সংস্কৃত সাহিত্যের বিদূষক চরিত্রগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তারা মূর্খ, না হয় আধ-পাগলা; সাধারণ স্তরেরও নীচের মানুষ।

রবীন্দ্র সাহিত্যে আমরা প্রথম দেখতে পাই নূতন প্রকৃতির হাস্যরস। তাঁর হাসি শুধু আমাদের মনে ফাঁকা হাসির উদ্রেক করে না, তা আমাদের ভাবায়, সময়ে সময়ে আবার সেই হাসি অশ্রুর স্পর্শে অপরূপ হয়ে ওঠে। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য থেকে হাস্যরসের দৃষ্টান্ত তুলে পাশে রেখে রবীন্দ্রনাথের কৌতুকপ্রধান রচনা পড়লে মনে হয় যেন এদের জাত সম্পূর্ণ আলাদা। রবীন্দ্র-প্রতিভার কল্পনার প্রসার ও গভীরতা জগত ও জীবন সম্বন্ধে চিন্তার বিস্তৃতি এবং বিচিত্র বিষয়ে অনুরাগের ব্যাপকতা বাঙলা সাহিত্যের ঘরোয়া হাস্যরসকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান দিয়েছে। অবশ্য বঙ্কিম-সাহিত্যেই এর সূচনা দেখা গিয়াছিল। বঙ্কিম লোক-রহস্য ও কমলাকান্তের দপ্তরএ নূতন ধরনের রসসৃষ্টি করেছেন বটে কিন্তু তিনি তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। তাঁর বই-গুলিতে হাস্যরসের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জাতির শিক্ষাগুরু বঙ্কিম-চন্দ্র শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। হাস্যরসই হাস্যরস সৃষ্টির প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের মধ্যে সাধারণভাবে লোকশিক্ষার প্রেরণাই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। সেখানে হাস্যরস একটা উপায় মাত্র হয়েছে লক্ষ্য হতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের হাতে হাস্যরসের শুধু প্রকৃতি বদলায় নি, আকৃতিও বদলেছে। আকৃতি মানুষের প্রকৃতির অনুগামী। মানুষের ক্ষেত্রে যা সত্য, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা সত্য। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস পুরাতন হাস্যরসের সংস্কার নয়, একেবারে আমূল পরিবর্তন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী তা একেবারে বদলে দিয়েছে। ফলে তাঁর হাতে হাস্যরসের শুধু ধরন বদলায় নি, বদলেছে আকারও। হাস্যরস রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি যেমন কেবল অতি অদ্ভুত ঘটনাসমাবেশ বা অতি অদ্ভুত বিষয়বস্তুতে মনোযোগ দেন নি, তেমনি আগেকার লেখকদের মত অতি অদ্ভুত ভাষারও আশ্রয় নেন নি। আগেকার লেখকদের ভাষা অনেক সময় হাসির উৎসে ভরপুর হত কিন্তু তার মধ্যে শিল্পোচিত হাসির দ্যোতনা খুব উঁচু ধরনের হত না। তাঁদের ভাষা যেমন রসাল, বিষয় তেমন রসাত্মক নয়। রসের উচ্চতা নির্ভর করে ভাষার অন্তরে সূক্ষ্ম সংকেতময়তায় এবং শব্দের নির্বাচনে। সাধারণভাবে বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি বিশিষ্ট দান হচ্ছে অপরূপ সংকেতময় ভাষাসম্পদ। সংকেতময়তাই ভাষাশিল্পের প্রাণ। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ঐশ্বর্য দান করেছেন, উইটের (wit) বিশেষ ক্ষেত্রেও তা দিতে কার্পণ্য করেন নি। সূক্ষ্ম ভাব ও ভাষার যোগে তিনি হাস্যরসকে বাঙলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর শিল্পের সম্মানীয় আসন দিয়েছেন। যে অতীন্দ্রিয় স্পর্শে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা সাহিত্যের বাহন হয়ে ওঠে, রবীন্দ্র-প্রতিভাই প্রথম আমাদের সাহিত্যে হাস্যরস জাগিয়ে তুলেছেন সেই সোনারকাঠির স্পর্শ দিয়ে। আগেকার সাহিত্যিকরা হাস্যরসের ভাষাকে রসাল করতে গিয়ে অনেক সময় তার মধ্যে এই স্পর্শকে হারিয়েছেন। ফলে গ্রাম্যতা দোষে তাঁদের ভাষা অনেক স্থানে বিকৃত হয়ে গেছে। কিংবা ভাবের উপযোগী ভাষা না পাওয়ায় প্রকাশের মধ্যে জড়তা এসে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসের মধ্যে ভাষার গ্রাম্যতা বা জড়তা নেই। তাঁর উইট যে কোনও দেশের বড় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উইটের তুল্য।

(শেষাংশ ২৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মানুষের ঘর

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীহাসিরাশি দেবী

নানা কথার মধ্য দিয়ে নয়, রহস্য ছলেও নয়, আদুকে নিয়ে অন্নদা ঘাট থেকে বাড়ি ফিরতেই বিপিন ব'লে বসল, "মাণিক কেমন ছেলে বল্ তো অন্ন, আজ যদি তার সঙ্গে আদুর বিয়ে দিই, তা হ'লে কাল আর তার ভাবনা ভাবতে হবে কি না?"

আদু কাপড় ছাড়তে ঘরে উঠেছিল, অন্ন তখনও বারান্দায় জল ভরা কলসী নামিয়ে সবেমাত্র ভিজে কাপড় নিংড়াতে সুরু করেছে। বিপিনের কথায় হাতের কাজ স্থগিত রেখে মুখ তুলে তাকাল তার দিকে; কিন্তু আলো না থাকার দরুণ অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখতে পেলে না, জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার এ কথার মানে?"

ম্লান হেসে বিপিন বললে, "মানে এই যে, মানিকের মা এইমাত্র এখানে এসেছিল আমাকে এই অনুরোধ করতে—যাতে মানিকের সঙ্গে আদুর বিয়েটা খুব তাড়াতাড়িই হয়ে যায়। কিন্তু আমারও একটা মতামত আছে তো? আর তোদের জিজ্ঞাসা না ক'রেই বা কি ক'রে উত্তর দিই বল্?"

অন্ন একটু আশ্বস্ত হ'ল; বললে, "হুঁ, তা ভাববার কথা বটে, কি বলছিল?"

"হ্যাঁ, বলছি মানিকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মেয়ের ভবিষ্যতের জন্যে আর আমায় ভাবতে হবে না তো?"

এতক্ষণ পর অন্ন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে, কাপড়ের জল নিংড়ে ঘরে উঠতে উঠতে বললে, "তুমি কি যে বল দাদা!"

"কেন?"

"কেন নয়? মানিকের মায়ের কথা ধরি না, কিন্তু লোকে তার সম্বন্ধে যাই-ই বলুক, মানিকের মত অমন ছেলে শুধু এ গাঁয়ে কেন, আশপাশের গাঁয়েই বা ক'টা আছে শুনি? বিদ্বান না হোক, অমন সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান ছেলে তুমি আর কোথায় পাবে শুনি? আমার কি মনে হয় জানো দাদা?—"

"কি।"

"মনে হয় অমন ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়ারও সৌভাগ্য থাকা চাই।"

অন্ন ঘরে গিয়ে ঢুকলো কাপড় ছাড়তে। বাইরে দাঁড়িয়ে বিপিন তামাক খাচ্ছিল তখনও, আপনমনে হয়তো অন্নর কথাগুলো ভাবছিলও, এমন সময়ে শুনল অন্ন আদুকে লক্ষ্য ক'রে বলছে, "ভর সন্ধেবেলায় শুয়ে পড়লি যে অমন ক'রে? কি হ'ল তোর? আদু, অ আদু—"

আদুর তরফ থেকে কোনও উত্তর এল না। অন্ন আবার ডাকল, "আদু অ আদু!"

বিপিন গিয়ে ঘরে ঢুকল। অন্ধকার ঘরের খোলা জানালা দিয়ে যেটুকু সন্ধ্যার আলো এসেছিল, তারই সাহায্যে সে দেখলে আদু বিছানার উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে আছে, আর অন্ন ক্রমাগত ডেকে চলেছে, "আদু অ আদু!—"

বিপিন তাড়াতাড়ি হারিকেলটা জেবলে আনতেই অন্ন কেঁদে উঠল,—"আদুর কি হ'ল দাদা!"

কি যে হয়েছিল এবং কি যে করতে হবে সবই বিপিন বুঝল, তাই ওর মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে বিরক্তস্বরে ব'লে উঠল, "তুই চুপ কর্ দিকি অন্ন, হয় নি বিশেষ কিছুই, কিন্তু তুই চেঁচাস নে।"

মুখে চোখে জল দিতে দিতে কিছুক্ষণ পরে আদুর যখন জ্ঞান ফিরল, বিপিন তখনও তার মাথা কোলে নিয়ে ব'সে, আর অন্ন চেয়ে আছে আগ্রহ আকুল চোখ মেলে। আদুকে চোখ মেলতে দেখে প্রশ্ন করলে, "জল খাবি আদু, ঠাণ্ডা জল?"

মাথা নেড়ে আদু জানালে খাবে। বিপিন জল দিলে তার মুখে, অন্ন হাতপাখাটা নাড়তে লাগল আরও জোরে, আরও তাড়াতাড়ি। ঠিক এমন সময় বাইরে থেকে মানিকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "পিসীমা, মা এসেছে এখানে?"

"কে, মানিক? এদিকে এস।" ঘর থেকে বিপিন ডাকল।

মানিক সে ডাক উপেক্ষা করতে পারল না, কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রেই সে থমকে গেল। বললে, "কি হয়েছে আদুর, কাকাবাবু?"

শান্তস্বরে বিপিন উত্তর দিলে, "ও কিছু নয়, শরীরটা আদুর বড্ডই খারাপ হয়ে পড়েছে শহরের কলের জলে, দিনকতক এখানে থাকলেই ভাল হয়ে যাবে আবার। কিন্তু সে কথা থাক, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে মানিক, তোমার শোনবার সময় হবে তো?"

মানিক একটু আহত হ'ল যেন এ কথায়; "সময় হবে না কেন কাকাবাবু? বরঞ্চ সময় আমার এত বেশী যে সেটাকে আর কাজে লাগাতে না পারলে আমার শান্তি হচ্ছে না।"

বিপিন এ কথার কোনও উত্তর দিলে না।

আদুর জ্ঞান হয়েছিল, মানিককে দেখে সে যে বেশ সংকুচিত হয়ে পড়েছিল তা অনুমান ক'রে বিপিন ধীরে ধীরে উঠল। সে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল মানিককে সঙ্গে নিয়ে। একখানা আসনে নিজে ব'সে আর একখানা দেখিয়ে মানিককে বললে, "ব'স।"

মানিক বসল; বিপিন প্রশ্ন করল, "তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে না, তোমার মা এখানে এসেছিলেন কি না!"

মানিক বললে, "হ্যাঁ।"

বিপিন বললে, "তিনি এসেছিলেন বটে কিছুক্ষণ আগে,

তার পর চ'লে গেছেন। কিন্তু কি বলতে এসেছিলেন জানো?"

মানিক মাথা নেড়ে জানালে, সে জানে না। বিপিন বললে, "বলতে এসেছিলেন তোমার সঙ্গে আদুর বিয়ের কথা। আমি এখনও এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলি নি বটে, তবে বলব। কিন্তু তার আগে একটা কথা।" বিপিন যে পিঁড়েটায় বসেছিল সেটা টেনে নিয়ে এল মানিকের আরও কাছে।

একেবারে সামনাসামনি; বললে, "কিন্তু, একটা কথা মানিক—" হঠাৎ সে মানিকের হাত দুখানা জড়িয়ে ধরলে ব্যগ্রভাবে; "কিন্তু তাকে কোনও দিন অবহেলা, কিংবা তার কোনও দোষ ত্রুটি ধ'রে তাকে ঘৃণা করবে না বল!"

বিপিনের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল একটা অব্যক্ত বেদনায়। যে বেদনা সে সাধ করে টেনে এনেছে, আদুকে দিয়েছে আর আজ আবার যার আঘাত মানিককে সে দিতে চলেছে—তার কথা মনে হ'তেই বিপিন বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু সে চঞ্চলতা সে মুখের কথায় প্রকাশ করতে পারল না মানিকের কাছে। পাছে সে কথা প্রকাশ করলে আদুর কোনও বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় তার বুক কাঁপতে লাগল থেকে থেকে। তবু সে মানিকের হাত ছাড়ল না। আগের কথার খেই ধ'রে আবার বললে, "বল, উত্তর দাও মানিক।"

মাণিক কিন্তু হঠাৎ এ কথার কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না, কারণ এর জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। একটু আগে পর্যন্ত জানতে পারে নি যে তাকে এইরকম একটা সংশয়ের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়তে হবে। তাই সে কথা হারিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিপিনের মুখের দিকে। মানিকের মনের অবস্থা বিপিনের বুঝতে দেরি হ'ল না; তার হাত দুখানা ছেড়ে দিলে সে। বললে, "যাক, এ কথার উত্তর আজ না দিলেও কাল দিতে পারবে ব'লেও আমার আশা হয় মানিক। আর একটা কথা, মনের ওপর যে জোর জবরদস্তি করা চলে না সেটা আমিও জানি; জানি ব'লেই বলছি, আদুকে তোমার হাতে দিতে আমার অনিচ্ছে নেই, কিন্তু তাই ব'লে তোমার কাছে কিছু লুকনোও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আদু আমার দিদির বাড়িতে ছিল সে কথা তুমি জান, তার সম্বন্ধে অনেকে অনেকরকম হয়তো তোমার কাছে ব'লে থাকবে। যদিও সব সত্যি নয়, কিন্তু তবু মানুষের তো মন, দুর্বল হ'তে কতক্ষণ—সেই দুর্বল মুহূর্তে যেন তুমি আমাকে না হ'ক, আমার মেয়েকে ভুল বুঝো না মানিক, তোমার কাছে আমার এই একটিমাত্র অনুরোধ।"

বিপিন উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে মানিকও উঠে পড়ল। বিপিনের বাড়ি ছেড়ে পথে বার হয়ে দুজনে দুদিকের পথ ধরল। দুজনের মনের চিন্তাও এগোচ্ছিল দুইটি ভিন্ন পথ ধ'রে, কিন্তু মূলে ছিল ওই এক জায়গায়, ওই একজনকেই ঘিরে। মানিক ভাবছিল, যে কথাটা সেই একদিন মুখ ফুটে বিপিনকে বলবে ভেবেছিল, সেই কথাটাই হঠাৎ বিপিনের মুখ দিয়ে ঘুরে এল কেমন ক'রে। আর বিপিন ভাবছিল, মানিকের হাতে আদুকে সমর্পণ করার সংকল্প স্থির করার আগে কি কথাটা আদুকে একবার জিজ্ঞাসা করলে হ'ত না?

আদুর মা নেই; থাকলে আদুর সম্বন্ধে এত ভাবনার দরকার বিপিনের হ'ত না। এসব কাজ আদুর মায়ের—তার নয়; সে বেঁচে থাকলে এতদিন শেষ ক'রেও ফেলত এসব। কিন্তু সে আজ নেই, তাই বিপিনকেই তার সব কাজ শেষ করতে হবে, এর মধ্যে কোনও অবহেলা, কোনও সংকোচ রাখলে চলবে না। আদুকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করতে হবে, জানতে হবে, এ বিয়েতে তার মত আছে কি না।

বিপিন চলেছিল লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে। দেখলে—রোজকার মত আজও নীলু চক্কোত্তির আটচালায় দাবার ছক বসেছে। দূর থেকে বিপিন দেখলে প্রতিদিনের সেই ফাটা কাগজ সাঁটা হারিকেনটা আজও জ্বলছে সেখানে। তারই আলোয় দেখা যাচ্ছে জনকতক লোককে, যারা ব'সে খেলা করছে। হাওয়ায় ভেসে আসছে তাদের কথোপকথনের শব্দ, তাদের উচ্চ চীৎকার। ওই আখড়ায় মাঝে মাঝে বিপিনেরও ডাক পড়ে, যায়ও খেলায় যোগ দিতে, কিন্তু আজ আর সে গেল না।

একবার সে চলতে চলতে একটু থামলে, কি ভাবলেও মনে মনে, কিন্তু অগ্রসর হ'ল না; যে পথে এসেছিল সেই পথেই ঘুরে চলল আবার। পথের ধারে ধারে আম কাঁঠালের বাগান, ছোটখাটো ঝোপ-ঝাড়, দুই একটা বা জলা।

আজ আর বিপিনের হাতে তার এত দিনের সাথী সেই চারকোণা হারিকেনটা জ্বলছিল না, অন্ধকারেই হাতের লাঠি পথের উপর ঠুকতে ঠুকতে সে যখন বাড়ি এসে পৌঁছল, অন্ন তখনও আদুকে সাবধান করছিল; "এখন উঠিস নে আদু, খানিকটে চুপ ক'রে শুয়ে থাক্।"

বিপিন ঘরে ঢুকল; লাঠিটা দরজার পাশে ঠেস দিয়ে রেখে তক্তাপোশের উপরে বসল। তার পর আদুর শুষ্ক মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে কি যেন ভাবলে, দেখলে অন্ন, ঘর ছেড়ে বার হয়ে যাচ্ছে। বিপিন ডাকল, "আদু!"

আদু চমকে উঠল, মনে হ'ল বিপিনের এ কণ্ঠস্বর যেন তার অচেনা, কোনও দিনই যেন সে তা শোনে নি। উত্তর না দিয়েই সে তাকাল বিপিনের দিকে ভীত ও চকিতদৃষ্টিতে। বিপিন তার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই বললে, "আমি মানিকের সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক করেছি, সামনের লগ্নেই; তাতে তোমার কোনও আপত্তি নেই নিশ্চয়?"

বিপিনের কথা বলার স্বর, ভঙ্গী বিচারকের মত গম্ভীর। বিচারক যেমন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে দণ্ডাদেশ দেয় অকম্পিত গম্ভীর স্বরে, এও তেমনি স্থির, অচঞ্চল। আদু যেন একবার নিজের অজ্ঞাতেই শিউরে উঠল, তাড়াতাড়ি সে কোনও উত্তরই দিতে পারলে না।

কিন্তু তার এ নীরবতায় বিপিনের সমস্ত অন্তর তিক্ত বিরক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। সে যে এই বিবাহে তার মায়েরই মত সমবেদনাপূর্ণ অন্তর নিয়ে তার মতামত জানতে এসেছিল, এ কথা ভুলে গেল, কঠিন স্বরে বললে, "দেখ আদু, এটা পাড়াগাঁ, পাড়াগাঁয়ে কোনও শহুরে চাল, মানে নাচগান

কি লেখাপড়ার চর্চা চলবে না। এই পাড়াগাঁয়ের গরিবের মেয়ে তুমি—একথা ভোলা তোমার কোনও রকমে উচিত নয়। কাজেই এটাও তোমার পক্ষে জেনে রাখা দরকার যে শহুরে ছেলে সরোজের মত স্বামী পাওয়ার কল্পনাও তোমার পক্ষে পাগলামি। আর তার আশা করাও তোমার পক্ষে মস্ত বড় অপরাধ।"

বিপিন থামল, হয়তো তার দরকারও ছিল, কিন্তু আদু তার কোনও উত্তর দিলে না; নীরবে পুতুলের মত স্থির হয়ে ব'সে বিপিনের কথা শুনতে লাগল। বিপিন বললে, "তবে যদি বল আমাকে এতদিন শহরে রেখেছিলে কেন, তার উত্তর শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, আমি ভেবেছিলাম তোমার বড় পিসী যাই-ই করুক না কেন তোমার ওপর অবিচার করবে না।" কিন্তু—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিপিন বললে, "কিন্তু তার ফল হ'ল অন্যরকম। যাক্ সে কথা, মানিকের সঙ্গেই তোমার বিয়ের ঠিক ক'রে ফেলেছি, আপত্তি আছে কিছু?"

মৃদুস্বরে আদু উত্তর দিলে, "না।"

বিপিন উঠে দাঁড়াল। বস্, আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করবার নেই তার। আদুর মা থাকলে তিনি যে কাজ করতেন, বিপিনও আদুর জন্য তার কোনও ত্রুটি করে নি। এখন আদুর কপাল। আদু যদি সুখী হয় সেও যেমন তার বরাত, দুঃখী হওয়াও তেমনি তার অদৃষ্টলিপি।

বিপিন উঠে গেল সেখান থেকে, চুপ ক'রে ব'সে রইল একা আদু। বিছানার ওধারের জানালাটা ভাল ক'রে খুলে দিয়ে সে স'রে বসল জানালার দিকে; শুনল, হাওয়ায় বাইরের আমবাগানে ডালপালা নড়ার শব্দ হচ্ছে, কাছাকাছি নারকেল গাছের ডালপালাগুলোও নড়ছে, দুলছে সরসর ক'রে। আদু ব'সে ব'সে শুনতে লাগল। মনে হ'ল, ওরা যেন আজ সবাই মিলে আদুর কথার আলোচনাতেই মুখর হয়ে উঠেছে, হাসাহাসি করছে ওরই অদৃষ্ট নিয়ে।

(১৯)

কয়েক দিন পরে সরোজ বাড়ি ফিরল একখানা 'অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার' হাতে নিয়ে। মুখ তার অত্যন্ত প্রফুল্ল, আনন্দে যেন সে আজ পরিপূর্ণ। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বহু দিন আগের মত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাক দিলে, "মা, মামীমা!"

উপরময় কেমন একটা বিষণ্ণ নিস্তব্ধতা, কেউ কোনও সাড়া দিলে না।

সরোজ উপরে উঠে এল। সিঁড়ি পার হয়েই সামনে বড় দালান, কিন্তু মানুষের অভাবে শূন্য। এপাশে ওপাশে দুই একটা আরসোলা, দুই একটা ইঁদুরও দৌড়দৌড়ি করছে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত। সরোজের সাড়া পেয়ে কয়েকটা চড়ুই পাখি কলকণ্ঠে উড়ে গেল। সরোজ চলতে চলতে একটু থামল, তার পর ইন্দুর দরজার কাছে এসে ডাকলে, "মামীমা!"

ভিতর থেকে ইন্দুর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল, "কে, সরোজ? ভিতরে এস।"

বিস্মিত সরোজ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই দেখলে ইন্দু বিছানায় শুয়ে আছে, চোখ মুখ লাল। পাশের টেবিলে সাজানো কতকগুলো ছোট বড় নানা রঙের ওষুধের শিশি, কতকগুলো ফল। পা থেকে বুক পর্যন্ত ঢাকা চাদরখানার ভিতর থেকে একখানা জ্বরতপ্ত শীর্ণ হাত বার করে ইন্দু পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলে; বললে, "ব'স।"

সরোজ বসল; ইন্দুর কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করে সে শিউরে উঠলো; "এ জ্বর আবার কবে থেকে হ'ল মামীমা?"

ইন্দু একটু হাসবার চেষ্টা করল; "বেশী দিন নয়, দিন তিনেক হবে। কিন্তু এবারের অসুখে আমার আর বিশেষ কোনও কষ্ট হচ্ছে না সরোজ, বরঞ্চ একটু আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে এবার তোমাদের মুক্তি দিয়ে যেতে পারব; আর বেশী দিন তোমাদের আমার সঙ্গে ভুগতে হবে না।"

"এ কথার মানে?"

"মানে, আর বাঁচব না সরোজ, মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে।"

ইন্দু আবার হাসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। সরোজও কোনও কথা বলতে পারলে না, কথা বলবার শক্তি যেন তার লোপ পেয়েছিল। অনেকক্ষণ কেটে গেল এই ভাবে। এক সময়ে মুখ তুলে সরোজ জিজ্ঞাসা করলে, "মামা কোথায় মামীমা?"

"তিনি?" একবার যেন দম নিয়ে ইন্দু বললে, তিনি আজ দুদিন থেকে বাড়ি ছাড়া, কোথায় গেছেন জানি না।

সরোজ উঠে দাঁড়াল, তীব্র স্বরে বললে, "তোমরা জান না, কিন্তু আমি জানি তিনি কোথায় গেছেন আর কেন গেছেন। তাই তোমরা তাঁকে রেহাই দিলেও আমি সহজে রেহাই দিতে পারি না। কারণ আমি জানি তোমার এ ইচ্ছা-মৃত্যুর মূলে আছে তাঁরই অমানুষিক ব্যবহার; সেই ব্যবহারের জবাবদিহি আজ তাঁকে করতে হইবে আমার কাছে।"

সে চ'লে যাচ্ছিল, ইন্দু ডাকল; বললে, "শোন।"

সরোজ ফিরল; ম্লান হেসে ইন্দু বললে, "ছেলে মানুষ তুমি, তাই রাগ করছ তোমার মামার ওপর, কিন্তু সত্যিই তিনি দায়ী নন, দায়ী আমি নিজে, দায়ী আমার কপাল। তাই বলছি, রাগ করে কোনও কাণ্ড করে বস না যেন।"

একটু থেমে আবার বললে, এত দিন পরে বাড়ি ফিরেছ সরোজ, বড়দি বড় ভাবছেন তোমার জন্যে, আগে তাঁর সঙ্গে দেখা কর।"

"কোথায় তিনি?"

ইন্দু বললে, "পাশের ঘরে। সারা রাত আমায় নিয়ে জেগে কাটিয়েছেন, সকালের দিকে ঘুম এসেছে বোধ হয়।"

সরোজ যাচ্ছিল বোধ হয় তাঁরই খোঁজে, এমন সময়ে দরজার সামনে দেখা গেল কাত্যায়নীকে। মুখ তাঁর গম্ভীর, বর্ষণের পূর্ব মুহূর্তের মত। একবার মাত্র সরোজের দিকে তাকিয়েই তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে যে এ কয়দিন কোথায় ছিল, কেমন ছিল, এসব কোনও প্রশ্নই তিনি করলেন না; যেন এ সম্বন্ধে কোনও কৌতূহলই নেই তাঁর। ঘরে

(শেষাংশ ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জ্ঞানদাসের নূতন পদাবলী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

"রাঢ় দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়।
তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়॥"

সুপ্রসিদ্ধ "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থের চতুর্দশ তরঙ্গে জয়গোপাল কায়স্থের বাসগ্রামের উল্লেখ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত দুই পঙক্তি কবিতায় কাঁদরা গ্রাম এবং মঙ্গলঠাকুর ও জ্ঞানদাসের নাম পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ পূর্বে মঙ্গল জ্ঞানদাসকে লইয়া বহু গবেষণা করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন মঙ্গল জ্ঞানদাসেরই অপর নাম। কেহ বলিয়াছেন তিনি ভুবনমঙ্গল হরিনাম বিলাইয়া মঙ্গল নামে পরিচিত হন। আবার কেহ আবিষ্কার করিয়াছেন জ্ঞানদাস দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন বলিয়া তিনি মদনমঙ্গল নামেও অভিহিত হইতেন। বলা বাহুল্য মঙ্গল ও জ্ঞানদাস পৃথক ব্যক্তি। আমাদের কয়েকটি প্রবন্ধে ও বীরভূম বিবরণ ৩য় খণ্ডে এই প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়ায় ইদানীং এই সমস্ত গবেষণা নিরস্ত হইয়াছে।

নিত্যানন্দ শাখা গণনায় এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত বৈষ্ণবগণের নামের তালিকায় জ্ঞানদাসের নাম আছে। মঙ্গল ঠাকুর শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শাখা, ইনিও খেতরীতে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ও নরোত্তম বিলাসে ইনি মঙ্গল বৈষ্ণব নামে পরিচিত। কাঁদরা গ্রাম পূর্বে বীরভূমের অন্তর্ভুক্ত ছিল, গত সন ১২৭২ সালের ৩২শে আষাঢ় বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আমোদপুর-কাটোয়া শাখা রেলপথের অন্যতর স্টেশন রামজীবনপুরের নামকরণ রহস্য আমরা জানি না। রামজীবনপুর ও কাঁদরা একই গ্রাম, সুতরাং স্টেশনের কাঁদরা নাম রাখাই সঙ্গত ছিল। বীরভূম বর্ধমানের লোকে কাঁদরাকে বড় কাঁদরা বলে। গ্রামে মঙ্গলঠাকুরের বংশধরগণ বর্তমান আছেন, জ্ঞানদাসের মঠ নামে একটি দেবমন্দির জ্ঞানদাসের স্মৃতি বহন করিতেছে। কাঁদরায় প্রতি পৌষ পূর্ণিমায় জ্ঞানদাসের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কবি জ্ঞানদাস বর্তমান ছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে জ্ঞানদাসের স্থান অনেক উচ্চে। কিন্তু আলোচনার অভাবে পাঠ বিভ্রাট ও ব্যাখ্যার গোলযোগে তিনি আজিও অবজ্ঞাত রহিয়াছেন। আমরা জ্ঞানদাসের কতকগুলি নূতন পদ পাইয়াছি। সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিতেছি।

জ্ঞানদাস বাঙলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছিলেন। জ্ঞানদাসের কোনও কোনও পদে পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কবিরঞ্জন যদুনাথ ও রায় শেখরের প্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও পদাবলী রচনায় তাঁহার একটি নিজস্ব ভঙ্গী ছিল। যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের দর্শন লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, তিনি জাহ্নবা দেবীর নিকট মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তথাপি শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দের বহু অন্তরঙ্গ পার্ষদের সঙ্গ লাভে তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সময় তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল ছিল। বাঙলার বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেই পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং শুদ্ধ শিক্ষার দিক দিয়া নহে, বৈষ্ণব সাধনার দিব্যানুভূতির মধ্যেও তিনি আপন জীবনের সার্থক পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বভাবজ কবিত্বের সঙ্গে এই শিক্ষা ও সাধনার সুসমঞ্জস মিলন ঘটিয়াছিল। তাঁহার রচিত পদে ইহার সুপরিস্ফুট পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়। যাঁহারা পদকল্পতরুধৃত জ্ঞানদাসের পদাবলীর সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা এ কথার সত্যতা স্বীকার করিবেন। আমাদের সংগৃহীত পদগুলি নূতন। এই পদগুলির মধ্যেও কবির নিজস্ব মর্যাদা অক্ষুন্ন আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া জ্ঞানদাস বলিতেছেন :—

"বেলোয়ার"

কষিল কনক রুচির গৌর — অখিল ভুবন মরম চৌর
করভ শুণ্ডে বাহু দণ্ড — মলমষ তাপ ত্রাসনি।
প্রচুর পুলক শোভিত অঙ্গ — নটন লীলা অধিক রঙ্গ
বয়ন শরদ পূর্ণিম ইন্দু — সরস হাস ভাষনি।
আজুবেণি গৌরচান্দ — জগজন মন নয়ন কান্দ
উরহি দোলত কুন্দমাল — ভালে তিলক লায়নি॥ ধ্রু॥
নয়নে বহত সলিল ধার — কমলে ঝরু কি মধু অপার
চৌদিকে বেঢ়ল ভকত ভৃঙ্গ — হরিষে হরি বোলনি।
মত্ত গজেন্দ্র গমন মন্দ — নিরখি মদন হৃদয় কন্দ
অসুর অমর ফিরে নারী নর — ত্রিজগত চিত দোলনি॥
তরুণ বয়স গৌর দেহ — অন্তরে উয়ল গোকুল মেহ
ভাবে ভরল মরম তরল — চৌদিকে করুণ চাহনি।
ধন্য ধরণি ধন্য কাল — ধন্য ধন্য পঁহু দয়াল
করল কীর্তন জীবতারণ — জ্ঞানদাস গুণ গাহনি॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার একটি পদ :—

সারঙ্গ

শ্যামধাম — কুন্দদাম — চারু চিকুর মোহনি।
বরিহা পদ্ম — ভ্রমরী সঙ্গ — মধুর মধুর শোহনি॥
দেখত লাল — উরহিমাল — মন্দ মন্দ আয়নি।
মোহন বংশ — পরম অংশ — মধুর মধুর গায়নি॥ ধ্রু॥
মকর গণ্ড — তিমির খণ্ড — ভালে তিলক লায়নি।
রমণী কুল — আধ দুকুল — আধ মুদিত চাহনি॥
বদন চান্দ — কামের ফান্দ — নয়নকি শর ধাওনি।
জ্ঞানদাস — পিরীতি আশ — ওরূপ চিতে ভাওনি॥

জ্ঞানদাসের প্রচলিত পদগুলির মধ্যে এরূপ ছন্দ ঝঙ্কার বড় দেখিতে পাই না। কিন্তু পদকল্পতরুধৃত পদের মধ্যে জ্ঞানদাসের রূপ বর্ণনার এমন একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে, উপরি উদ্ধৃত পদের সঙ্গে যাহার পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। উদ্ধৃত পদে ভাষার পরিপাট্য আছে, ছন্দের ঝঙ্কার আছে, ঈষৎ অনুভূতির আবেশও আছে, কিন্তু কবি হৃদয়ের যে প্রাণময় অনুভূতির নিবিড়তর রূপ ভাষার তুলিকার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে অপরূপ হইয়া উঠে, উপরের পদে তাহার সম্যক স্ফূর্তির অবকাশ ঘটে নাই। উদাহরণস্বরূপ জ্ঞানদাসের একটি সর্বজন পরিচিত পদ তুলিয়া দিলাম। পূর্বরাগের পদ, সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি।

করুণা রাগ

আলো মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দীর জলে। ছলিয়া নাগর চিত হরি নিল ছলে॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, কি দেখিয়াছেন তাহা বলিবার পূর্বে নিজের প্রতি ধিক্কার দিতেছেন। কেন কালিন্দীর জলে গিয়াছিলাম, সেই শঠ ছলে আমার চিত্ত চুরি করিয়া লইয়াছে। কি দেখিয়াছি তাহাও বলিবার সাধ্য নাই, দেখিলাম রূপের সাগর, সে রূপের কুল কিনারা নাই, আঁখি ডুবিয়া গেল, আর উঠিল না। দেখিলাম যৌবনের কুসুমিত কানন, সে কাননে পথ হারাইলাম, মন হারাইয়া গেল। রূপের সাগরে আঁখি ডুবিয়া রহিল। যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥ "ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ। অন্তরে বিদরে হিয়া কিবা করে প্রাণ॥" এই তো ঘাট আর ঘর—যমুনাতীর হইতে গৃহের দূরত্ব আর বেশী কোথায়, নিতাই তো আসি যাই। কিন্তু সেই দিন হইতে এই পথ অফুরন্ত হইয়াছে, আমি আজিও পথেই ঘুরিতেছি, সখি, গৃহবাস আমার জন্মের মত ঘুচিয়াছে। অন্তরে হৃদয় ফাটিয়া পড়িতেছে, প্রাণ যে কি করিতেছে বলিবার নয়। কি দেখিয়াছিলেন এইবার যেন বলিবার শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন। মনে পড়িতেছে সেই মুখখানি, প্রসর ললাটে সেই চন্দন তিলক, প্রাণ পুতলি তো তাহার মধ্যেই বন্দী হইয়া আছে।

"চন্দনের চান্দ মাঝে মৃগ মদ ধান্দা। তাহার মাঝে পরাণ পুতলী রহিল বান্ধা॥"

"কটি পীত বসন রসনা তাহে জড়া। বিধি নিরমিল ঘাটে
কলঙ্কের ঝোড়া॥
জাতি কুলশীল সবহেন বুঝি গেল। ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা
রহিল॥
কুলবতী হইয়া দুকুল দিনু দুখ। জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি
থাক বুক॥"

মনে পড়িতেছে তাহার কটিতে পীত বসন, তাহাতে জড়ান কাঞ্চী-দাম, বিধি যেন যমুনার ঘাটে কুল কলঙ্কের অঙ্কুর নির্মাণ করিয়াছেন। আমার জাতি কুলশীল সবই গেল, সেই সঙ্গে পৃথিবী জুড়িয়া একটা ঘোষণাও রহিল। কুলবতী হইয়া দুকুলে দুঃখ দিলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন হৃদয় দৃঢ় কর।

শ্রীকৃষ্ণ রূপের আর একটি নূতন পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

সিন্ধুড়া

বরিহাচন্দ্র চিকুরে নব মালতি মল্লিকা মধুকর বৃন্দে।
তাহে কত বিবিধ কুসুম পরিপাটিত রাজিত কলিকাকুন্দে॥
সজনি সুন্দর শ্যাম কিশোর।
অরুণায়ত আঁখি কেহ অবলোকনে হিয়া জুড়ায়ল মোর॥ ধ্রু
চন্দন চান্দ ভালে ভালি রঞ্জিত তরুণী নয়ান পরাণ।
কুঞ্চিত অধরে মন্দ মৃদু বাজত মুরলী মধুরিম তান॥
শ্রুতি মণিকুণ্ডল কিরণ মনোহর মণি ভূষণ প্রতি অঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহ চিত থির না রহ হেরইতে তনুতিরি ভঙ্গে॥

জ্ঞানদাসের প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে ছন্দের বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু আমাদের সংগৃহীত নূতন পদগুলির মধ্যে নূতন ছন্দেরও সন্ধান পাইতেছি। উদাহরণস্বরূপ একটি রসোদ্গারের পদ ও একটি নৌকা খণ্ডের পদ উদ্ধৃত করিলাম। আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, এই সমস্ত পদ কিছু কম প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

॥ রসোদ্গার ॥ মল্লার রাগ ॥

নয়ান কোণের অলস বাণে হিয়ার মাঝে কাঁপ।
মুখের ছান্দে মরম কান্দে অইসে মনে জাপ॥
ভালের তিলক আলোক ভুবন মদন পালায় লাজে।
ঘরের নিয়ড়ে রহিতে নারি আগুন লাগিল কাজে॥
কি আর লোকের লাজে আকুল পরানি।
কি করিতে কিবা করি কিছুই না জানি॥ ধ্রু॥
হাসির মিশালে বাঁশীর নিশাসে রসের ছান্দে কয়॥
রসের ইঙ্গিতে অশেষ ভঙ্গি কতেক প্রাণে সয়॥
অঙ্গের পরশে যৌবন জীবন সফল করিয়া মানে।
রমণী হইয়া তারে না ছুইলে কি তার ছার জীবনে॥
সঘনে শিহরে গা ঘন উঠে হাই।
পাই বা না পাই চিতে পরতীত নাই॥
জ্ঞানদাস কহে মো পুনি কহিল আপন মনের বোলে।
সাধের সেজে ভতিয়া রহিলে পাইয়া আপন কোলে॥

॥ নৌকা বিলাস ॥ মল্লার ॥

চাপিয়া এ নায় হইল কি দায় দেখ দেখ বড়ি মা।
জীর্ণ শীর্ণ আয়স ভিন্ন অতি পুরাতন না॥
গভীর তীর, অতিথি নীর অগাধ নাহিক থা।
বিধির ঘটনা আসিয়া পবনা উপজিল বহু বা॥
পায়্যা আশ্রয় দিয়া জয় জয় যমুনা কাড়িছে রা।
কল কল কল হিল্লোল কল্লোল দেখিয়া হালিছে গা॥
হেলিছে দুলিছে তুলিয়া ফেলিছে টলমল স্রোতে না।
জ্ঞানদাস আসা কেবল ভরসা ও রাঙ্গা দুখানি পা॥

পাঠ বিভ্রাটে অন্যান্য বৈষ্ণব কবির মত জ্ঞানদাসেরও অনেক পদ অপাঠ্য হইয়া রহিয়াছে। লিপিকর প্রমাদ ইহার একতম কারণ। অধুনা অনেক সৌখীন ব্যক্তি পদাবলীর আলোচনা করিয়া থাকেন। পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ, তাহার পাঠোদ্ধার এবং পাঠের ব্যাখ্যা বুঝিবার মত অবসর এবং শক্তি ইহাদের নাই। শিখিবার আগ্রহ এবং অবসর আছে কিনা তাহাও জানি না। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইঁহাদের কেহ কেহ পদাবলীর সম্পাদক ও ব্যাখ্যাতা সাজিয়া সাহিত্যে কথঞ্চিৎ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন।

পদাবলী সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বর্গগত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম আমরা শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করিয়া থাকি। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে (১৩২৭ সালে) 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' নাম দিয়া তিনি একখানি পদ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা বাঙালীকে তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা চিরকাল স্মরণ করাইয়া দিবে। এই বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত আজীবন পদাবলী সাহিত্যের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। অন্যে পরে কা কথা পুরানো হাতের লেখা পুঁথির লিপিকর প্রমাদের ফলে এ হেন কৃতবিদ্য ব্যক্তিও অনেক পদের পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এই প্রবন্ধে আমরা জ্ঞানদাসের দুই একটি পদের পাঠ লইয়া আলোচনা করিতেছি। পদগুলি 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' ভিন্ন আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, প্রায় ছয় শত নূতন পদ পূর্ণ এই পুস্তকখানি আজ পর্যন্ত কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। সন ১৩৩৪ সালের পরিষৎ পত্রিকায় পদরত্নাবলী লইয়া আমরাই সামান্য কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম এবং রায় মহাশয় তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। পরে আর কেহ উচ্চবাচ্য করেন নাই, সুতরাং পদের বা পাঠের আলোচনাও হয় নাই। নিম্নে উদাহরণ দিলাম।

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী ৪৬ পৃষ্ঠা। নবোঢ়া মিলনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি। ধানশী॥

দুতীয়ক চান্দ সবঙ্গ নাহি হেরিয়ে
পুর্ণিম সময়ে পরভার।
ঐছন শ্রমরস ন বুঝি পরশ মত
পরএ কত এ সুখ পাব॥
এ হরি এ হরি কি বলিয়ে পারি।
তুহুঁ মত্ত কুঞ্জর কমলিনি নারি।
নিতি নিতি রাত্রি শীতে যদি অতিশয়
বরিসয়ে লাখ তুষার।
তাপে উতাপিত তিরপিত নহে খিতি
যব নহে জলধর ধার॥
কনক শিলিপ জনু শারি শরণ বিনু (?)
ঐছন রসবতী নেহ।
জ্ঞানদাস কহ বুঝিয়া না বুঝহ
এ মোহে বড়ই সন্দেহ॥

"শারি শরণ বিনু" শব্দের শেষে বন্ধনী মধ্যে জিজ্ঞাসা চিহ্ন রায় মহাশয়ের ব্যবহৃত। পদরত্নাবলীর মধ্যে ব্যাখ্যা দেওয়া নাই। পদের দ্বিতীয় পঙক্তির পাঠান্তর এইরূপ 'ঐন শ্রমরস পরশন ঐছন না জানিয়ে কিয়ে সুখ পাব'। পদটির ব্যাখ্যা এইরূপ—শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে চাঁদের সম্পূর্ণ অংশ দেখিতে পাই না, পূর্ণিমা সময়েই তাহার প্রভাব। এই শ্রমের কি রস, এই স্পর্শে কি সুখ পাও বুঝিতে পারি না। ওহে হরি, ওহে হরি, তোমাকে কি বলিতে পারি, তুমি মত্ত কুঞ্জর, নারী কমলিনী। নিত্য নিত্য শীতের রাত্রি যখন লক্ষ তুষারকণা বর্ষণ করে তখন তো তাপে উত্তাপিত ক্ষিতি তৃপ্ত হয় না, যতক্ষণ জলধর ধারা বর্ষণ না করে।

এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে "শারি শরণ বিনু" কথা কয়টির প্রকৃত পাঠ হইবে "শারি সরণ রেণু"। (শারি অর্থে —কপটতা) সমাপ্ত পঙক্তিটির পাঠ এইরূপ হইবে,—

"কনক শিলপী জন্   শ্যারি সরণ রেণ্
ঐছন রসবতী নেহ"

স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণ রেণ্গুলি কপটতায় (লুকাইয়া) রাখে, তেমনই রসবতীর প্রেম। অর্থাৎ শ্রীরাধা আপন প্রেম এখন যত্নে গোপন করিতেছেন, স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণ রেণ্গুলি গোপন করে। সম্ভাব্য পাঠ এইরূপও হইতে পারে—

"কনক শিলিপ জনি সাধি সরণ রেণ্ ঐছন রসবতী নেহ"
স্বর্ণরেণুতে যেমন কনক শিল্প (সোনার শিল্পকার্য, অলঙ্কার ইত্যাদি) সাধিত হয় না, তেমনই রসবতীর প্রেম। অর্থাৎ লক্ষ তুষারকণায় তাপিত ক্ষিতি যেমন তৃপ্ত হয় না, স্বর্ণকণায় যেমন শিল্পকার্য সাধিত হয় না, তেমনই নবোঢ়া শ্রীরাধার এই প্রথম প্রেমে তোমার তৃপ্তি হইবে না, এই প্রেমে কোন কারিগরি চলিবে না।

দ্বিতীয় আর একটি পদ আক্ষেপানুরাগের। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী ৪৮ পৃষ্ঠা। সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি। সুহই॥

পহিলহি প্রেমক সায়রে ডুবহুঁ
অব বুঝহুঁ পরিণামে।
মাণিক জানি পরশে চিত পরশল
অব বিঘটন কোন্ ঠামে॥
সজনি তুহুঁ জনি বিছুরসি মোয়।
নাহ সোহাগে আছহুঁ জগবল্লভ
অবহোঁর পুছয়ি না কোই॥
নিতি নিতি অনুসর মালতী মধুকর
পুণ্যে পরশ সেহো পায়।
অহো নিরগুনি ধনী কুসুম নাম ধরু
সে মোরি ১ চরণে লুটায়॥
সময় বসন্ত বদরী তরু জীবই
ঐছন গতি মতি ভেল।
জ্ঞানদাস কহ কহইতে হিয়া দহ
কোন্ এতয়ে সুখ দেল॥

ছয় পঙ্‌ক্তির ১ চিহ্নিত 'সে মোরি' পাঠে কোন অর্থ হয় না। প্রকৃত পাঠ 'শিমরি' (শিমুল ফুল)। সামান্য গোলযোগে সমস্ত পদটি নিরর্থক হইয়া রহিয়াছে। ব্যাখ্যা এইরূপ—প্রথমে প্রেমসায়রে ডুবিয়াছিলাম, এখন পরিণাম বুঝিলাম। চিত্ত মাণিক জানিয়াই পরশ স্পর্শ করিয়াছিলাম, এখন কোন স্থানে বিঘটন ঘটিল। সখি তুমি যেন আমায় ত্যাগ করিও না। নাথের সোহাগে জগতের অধিশ্বরী ছিলাম, এখন দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। মধুকর নিত্য নিত্য মালতীর অনুসরণ করে, পুণ্যে কেহ স্পর্শ পায় (নিত্য নিত্য অনুসরণ করিলেও মধুকর ভাগ্যফলে মালতীর স্পর্শ পায়)। (আবার) কুসুম নাম ধরিলেও (পুষ্প মধ্যে পরিগণিত হইলেও) তাহা গুণহীনা ধনী শিমুল (ফুল)—(মধুকরের) পদে লুণ্ঠিত হয়। (মধুকর ফিরিয়াও চাহে না), বসন্তকালে কুলগাছের বাঁচিয়া থাকা যেমন, (এই কণ্টকবৃক্ষে না ফুলের শোভা, না সৌরভ, না ফলের কোন মাধুর্য, অথচ কালের মহিমায় ফুলও হয়, ফলও হয়), আমারও মতিগতি সেইরূপ হইল। (যৌবন শ্রীকৃষ্ণ পদে অর্পিত হইল না) জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কহিতে হিয়া দগ্ধ হয়, কে এত দুঃখ দিল।

জ্ঞানদাসের একটি বিখ্যাত পদ কীর্তনীয়াগণের অত্যন্ত পরিচিত। এই গানে অনেক সময় তাঁহাদের শক্তির পরীক্ষা হয়; আমরা বহু বিখ্যাত কীর্তনীয়ার মুখে পদটি শুনিয়াছি। সম্প্রতি কলিকাতার শিক্ষিত সমাজেও এই পদ লইয়া আলোচনা চলিতেছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় সম্পাদিত পদামৃতমাধুরীর মধ্যেও ছাপার অক্ষরে গানটি প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই পদের একটি ভুল পাঠের প্রতি আজ পর্যন্ত কেহই লক্ষ্য করেন নাই। প্রচলিত পদ ও তাহার শুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি।

রূপানুরাগ॥ সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি॥ শ্রীরাগ॥

চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ   কে দিলে ময়ূরপুচ্ছ
ভালে সে রমণী মন লোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা   ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥
মল্লিকা মালতী মালে   গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
মনে হেন অনুমানি   বহিতেছে সুরধুনী
নীলগিরির শিখর বাহিয়া॥ ১
কালার কপালে চাঁদ   চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল ফাগু রঞ্জিয়া।
রজতের পত্রে কেবা   কালিন্দী পূজিল গো
জবা কুসুম তাহে দিয়া॥ ২
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার   অঙ্গে কে দিয়াছে গো
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয়   মোর মনে হেন লয়
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে॥

পদটির আলোচনাকালে মনে রাখিতে হইবে, ইহা একজন প্রথম শ্রেণীর কবির রচিত পদ। নিতান্ত অধম মিল এবং উপমার দৈন্য জ্ঞানদাসের পদে বিরল। সুতরাং ১ ও ২ চিহ্নিত পঙ্‌ক্তি সম্বন্ধে সাধারণতই সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। ১ পঙ্‌ক্তির 'বাহিয়া' স্থলে পাঠ হইবে 'ঘেরিয়া'। মাত্র উপরের পঙ্‌ক্তির 'বেড়িয়া' শব্দের অনুরোধেই এ পাঠ সমীচীন মনে হয়। মিলের অনুরোধের সঙ্গে অর্থেরও অনুরোধ রহিয়াছে। সুশ্বেত মল্লিকা ও মালতীর মালা জলদবরণ কানুর কাল কেশের উপরে চূড়ার চারিদিক বেড়িয়া রহিয়াছে, তাই মনে হইতেছে, নীল চূড়ার চারিপাশে সুরধুনী বহিয়া যাইতেছে। ২ চিহ্নিত পঙ্‌ক্তির অর্থ—"রূপার পাত্রে (রূপার পাতে) জবাফুল রাখিয়া যমুনার পূজা"—অসংলগ্ন বলিয়াই মনে হয়। রূপার বিল্বপত্র বলিলেও না হয় "জবাফুল ও বেলের পাতা"র একটা সামঞ্জস্য হইত। কিন্তু রূপার পাতা তো জলে ভাসিবে না, সুতরাং এ উপমার কোনও সার্থকতা নাই। এই পঙ্‌ক্তির প্রকৃত পাঠ—রজতের পাত্রে কেবা কালিন্দী পূরিল গো জবা কুসুম তাহে দিয়া (কালাচাঁদের কপালে চাঁদের মত চন্দনের ঝিকিমিকি, তাহার উপরে কে ফাগুবিন্দু রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে)। বিন্দু বিন্দু চন্দন দিয়া শ্যামের কপালে নানারূপ পত্রাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই চিত্র রচনার অবকাশে নবদূর্বাদলের কমনীয় লাবণ্য উথলিয়া পড়িতেছে। সেই অবকাশস্থলে ফাগুবিন্দু দেখিয়া মনে হইতেছে, রূপার পাত্রে কেহ যেন কালিন্দী বারি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, আর সেই পাত্রস্থিত জলে জবা ভাসিতেছে। চন্দনের সুসজ্জিত বিন্দুগুলি রৌপ্য পাত্রের সুদৃশ্য শ্বেত (কিনারা) রেখার মত, তাহার অবকাশ মধ্যস্থিত শ্যাম ললাটের উজ্জ্বল-কান্তি ঢল ঢল যমুনা জলের শোভা বিস্তার করিতেছে। এ উপমা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ললাটের অল্পপরিসর স্থানের সঙ্গে এই উপমার সুন্দর সামঞ্জস্যও রহিয়াছে। পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে করবী পুষ্পে কালিন্দী পূজার উপমাটি কেমন সুসঙ্গত হইয়াছে দেখুন—কালার সর্বদেহে কে হিঙ্গুল ছিটাইয়া দিয়াছে। শ্যাম-তনুর উচ্ছলিত লাবণ্যের লহরী লীলা যেন কালিন্দী সলিলের হিল্লোল মালা। তাহার উপর হিঙ্গুল বিন্দু যেন যমুনাবক্ষে ভাসমান্, অজস্র করবী পুষ্প। কবি বলিতেছেন, কেহ রক্তকরবী দিয়া যমুনার পূজা করিয়াছে। সেই পূজার ফুল যমুনা তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। এরূপ উপমার সার্থকতা সহজেই বোধগম্য হয়। "রজতের পাত্রে কেবা কালিন্দী পূরিল গো" মূল পাঠ

এইরূপই ছিল। লিপিকর প্রমাদে "পূরিল" কোথাও 'পূজিল' হইয়াছে। পূরিল=পূর্ণ করিল।

পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতির ভণিতায় একটি সংক্ষিপ্ত রসোদ্গারের পদ আছে। (২৪৬ সং পদ) সামান্য একটু এদিক ওদিকে একটিমাত্র অক্ষরের সংযোগ বিয়োগে কিরূপ পাঠবিভ্রাট উপস্থিত হয়, এই পদটি তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই পদ আমরা জ্ঞানদাসের ভণিতায় পইয়াছি এবং তাহার মধ্যে পাঠের কোনও অসংগতি নাই। যৎসামান্য ব্রজবুলিমিশ্রিত বাঙলা ভাষায় রচিত এই পদটি আমরা জ্ঞানদাসের ভণিতাতেই গ্রহণ করিয়াছি।

মন্দিরে আছিলুঁ সহচরি মেলি।
পরসঙ্গে রজনি অধিক ভৈ গেলি॥
যব সখি চলল হুঁ আপন গেহ।
তব মঝু নিন্দে ভরল সব দেহ॥
শূতি রহল হাম করি এক চিত।
দৈববিপাকে ভেল সব বিপরীত॥
না বোল সজনি শুন স্বপন সম্বাদ।
হসইতে কেহ জানি করে পরিবাদ॥
বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ।
তুরিতে ঘুচায়লুঁ নীবিক কাজ॥ ১
এক পুরুখ পুন আয়ল আগে।
কোপে অরুণ আখি অধরক দাগে॥ ২
সে ভয়ে চিকুর চির আনহি গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল॥
কতয়ে করব কেহ অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহ সো পতিয়াব॥

১ চিহ্নিত পঙক্তিদ্বয়ের পাঠান্তর
বিষদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝে।
তুরিত ঘুচাইতে নিজ নথ বাজে॥

পদকল্পতরুর পাঠে "হৃদয়ে বিষাদ পড়িল (দুঃখিত হইলাম) এবং ত্বরায় নীবিবন্ধ ঘুচাইলাম।" এ অর্থ একেবারেই অসংগত। বিষদ অর্থে ভুজঙ্গ, অন্য অর্থে নাগরের বাহু। স্তনমণ্ডলে নায়ক শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্পিত নখ ক্ষত চিহ্ন গোপনের জন্য নায়িকা শ্রীরাধা বলিতেছেন,—"বক্ষে সর্প পতিত হওয়ায় ব্যস্ততার সঙ্গে তাহাকে দূরীভূত করিতে (বক্ষে) আমারই নখ বাজিয়াছে। (আমারই নখে ক্ষতচিহ্ন হইয়াছে)।

২ চিহ্নিত পঙক্তিদ্বয়ের পাঠান্তর—
এক পুরুখ পুন আনি দিল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক দাগে॥

আমি সর্পকে বক্ষ হইতে অপসারিত করিলাম, কিন্তু এক পুরুষ সেই সর্প পুনরায় আমার সম্মুখে আনিয়া দিল। (আমি সর্পকে দূর করায়) ক্রোধে তাহার চক্ষু এবং (দশন দংশন হেতু) ওষ্ঠ রক্তবর্ণ। এখানে ভুজঙ্গ অর্থে শ্রীকৃষ্ণের বাহুদ্বয়। শ্রীরাধা স্বপন বৃত্তান্তের ছল করিয়া বলিতেছেন, 'আমি ঘুমাইতেছিলাম, ও প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ আমার বক্ষে হস্তার্পণ করিলেন, আমি জাগিয়া উঠিয়া সেই ভুজঙ্গানিন্দিত বাহুযুগলবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলাম। পরবর্তী পঙক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরাধার ললাট, নেত্র ও বদন চুম্বিত হওয়ায় সেই চিহ্ন গোপন করিতে শ্রীরাধা বলিতেছেন,—"সেই পুরুষের ভয়েই আমার কেশ ও বসন আলুথালু হইয়াছে এবং (বিস্রস্ত কেশবাস সম্বরণ করিতে ব্যস্ততা হেতু) কপালে কাজল ও মুখে সিন্দুর লাগিয়াছে।"

পদকল্পতরু হইতে পাঠবিভ্রাটের আর একটি উদাহরণ দিতেছি। পদসংখ্যা ৭১৮, রসোদ্গারের পদ, সখীর প্রতি সখীর উক্তি।

সখি রাই কলাবতি কানে।
কি দুহুঁ মনোভব মনহি বুঝাওল
কিয়ে দুহুঁ আপন সুবদনে॥
দুহুঁ দিঠি অঞ্চল বসন সমাপন
চৌদিশে কত আছে আনে।
দুহুঁ জন বুঝল সেহো নাহি সমুঝল
ঐছন দুহুঁ যে সিয়ানে॥
ভুজে ভুজে বান্ধি উরহি দরশায়ল
রমণী সমুঝল কাজে।১
আনন সরোরুহ পরে পরশায়ল
সময় বুঝাওল সাঁঝে॥২
করকমলে মুখকমল লুকায়ল
আন সমুঝায়ল নাহ।৩
জ্ঞানদাস কহ তরুণি উনমহ
তৈছে কয়ল নিরবাহ॥৪

এই পদটিতে পাঠবিভ্রাটে কবির যে দৈন্য প্রকাশিত হইয়াছে সে দারিদ্র্য জ্ঞানদাসের ছিল না। "আনন সরোরুহ" ও "মুখকমল" লইয়া দুইবার সংকেত এবং ইঙ্গিতে অভিযোগ প্রকাশ করিয়া পুনরায় 'সাঁঝে' বলিয়া দিয়া আপন অরসজ্ঞতা প্রচার জ্ঞানদাসের অনুপযুক্ত। পাঠবিভ্রাটের সঙ্গে শব্দার্থেরও বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। সুতরাং ব্যাখ্যাও সংগত হয় নাই।

১ চিহ্নিত ত্রিপদীর "ভুজে ভুজে বান্ধি উরহি দরশায়ল" এই পদাংশে বক্ষের উপর ভুজে ভুজে বন্ধন দেখাইয়া আলিঙ্গনের সংকেত শ্রীকৃষ্ণের অভিযোগ "রমণী সমুঝল কাজে" অর্থাৎ শ্রীরাধা তাহা বুঝিলেন। পরের ত্রিপদীটিও শ্রীকৃষ্ণের সংকেত-রূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বুঝিবার পর এইবার শ্রীরাধার উত্তর দিবার পালা। "আনন সরোরুহ" স্পর্শ ও "মুখকমল" স্পর্শের একই অর্থ। পাঠবিকৃতি হেতুই সেই একই অর্থকে কষ্ট-কল্পনায় দুই রূপে করা হইয়াছে। "আনন সরোরুহ" স্থলে প্রকৃত পাঠ (শ্রীরাধা) "আপন শিরোরুহ করে পরশায়ল সময় বুঝায়ল সাজে॥" 'সাজে' স্থলে 'ব্যাজে' পাঠও পাওয়া গিয়াছে। আমাদের মনে হয়, ব্যাজে পাঠই সংগত। শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন কামনার প্রত্যুত্তরে শ্রীরাধা আপন কেশ স্পর্শ করিয়া (কেশ প্রসাধনের ছলে) রাত্রিতে অভিসারের সংকেত জানাইলেন। কেশ স্পর্শ দ্বারা রজনী বুঝাইবার সংকেত বহু সংস্কৃত কবিতায়, অপরাপর প্রাচীন বাঙলা কবিতায় ও বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। "আইল নিকট বাটে ছুঁইল মদন সাটে" বিদ্যাপতিকে স্মরণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ রাত্রি পর্যন্ত শ্রীরাধার বিরহ সহিবার অসামর্থ জানাইয়া—"করকমলে মুখকমল লুকায়ল আন সমুঝায়ল নাহ" —করপদ্মে মুখপদ্ম লুকাইয়া নাথ অন্যরূপে বুঝাইলেন, অর্থাৎ সন্ধ্যায় অভিসারের সংকেত জানাইলেন। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তরুণীও কম যান না। প্রত্যুত্তরে তিনিও সেইরূপ নির্বাহ করিলেন। বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, রূপ, অভিসার, মিলন, মান, রসোদ্গার, আক্ষেপানুরাগ, বিরহ, সমস্ত বিষয়ক পদেই জ্ঞানদাস স্বাভাবিক কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচিত পদ এবং পদের শেষে ভণিতা পড়িয়া মনে হয়, শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা শুধু তাঁহার ধ্যানের বস্তু, তাঁহার অনুভূতিগম্য মাত্রই ছিল না, এ লীলা তিনি চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ জানেন,—রসভাবের এই মধুর লীলায়—মহাভাবের সেবার অধিকার পাইয়াই রসরাজ কৃতকৃতার্থ। আবার রসসুন্দরূপকে আনন্দ দানই মহাভাবের একমাত্র কাম্য। জ্ঞানদাসও এই রসের রসিক ও এই ভাবের ভাবুক ছিলেন। প্রেমই তাহার সর্বার্থ ছিল। কোন কোন পদের ভণিতায় তিনি বলিয়াছেন, "প্রেম [illegible] সহনে না যায়।" চণ্ডীদাসের মত তাঁহারও সেই [illegible] প্রেম—"সুধা বিষে একুই মিলন!" তাঁহার একটি

আক্ষেপানুরাগের নূতন পদ তুলিয়া দিলাম। সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি। সিন্ধুড়া॥

যতেক আছিল মোর মনের বাসনা।
ভুবনে রহিল সবে অযশ ঘোষণা॥
বড় বলি কানুরে করিনু বড় নেহ।
আছুক আনের কাজ জীবন সন্দেহ॥
সই কহিল নিদান।
প্রেমের পরাণেসহে এত কিয়ে জান॥ ধ্রু॥
যারে দিনু তনু মন কুল শীল জাতি।
অঙ্গের ভূষণ কৈলু বড় অখেয়াতি॥
সেজনা কিলাগি এবে করে ভিনু পর।
ঝাঁপল কূপে পড়ল বনচর॥
গুরুয়া পিয়াসে ঝাঁপ দিলু সিন্ধুজলে।
অধিক পুড়িল অঙ্গ বাড়ব অনলে॥
না জানি পিরিতি কিয়ে হেন বিস্ ফল।
জ্ঞানদাস শুনি হারাইল বুদ্ধিবল॥

বিরহের বারমাস্যা বর্ণন প্রাচীন কবিগণের রচনার একটা অঙ্গ ছিল। জ্ঞানদাসের পরবর্তী কয়েকজন কবির রচিত শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার ও শ্রীরাধার বারমাস্যা পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে—"আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজায়" × এই পদে আশ্বিন পর্যন্ত চারি মাসের বর্ণনা আছে। বিদ্যাপতির রচিত (চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত) একটি খণ্ডিত পদ গোবিন্দ চক্রবর্তীর দ্বাদশ মাসিক বিরহের সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। রসশেখর চরিত একটি সংক্ষিপ্ত পদে বসন্ত হইতে শীত পর্যন্ত ছয় ঋতুর বিরহ বর্ণনা আছে। গোবিন্দ দাস অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্ষেপে দ্বাদশ মাসিক বিরহ কার্তিকে শেষ করিয়াছেন। তাঁহার পৌত্র ঘনশ্যাম অগ্রহায়ণ হইতে কার্তিক পর্যন্ত দ্বাদশ মাসের বিরহের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। জ্ঞানদাসের "পিয়া পরদেশ বেশ গেল দূর," "কানু কুক্ষণে পরদেশ সিধারল" প্রভৃতি বিরহের পদ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। চণ্ডীদাসের অনুকরণে তিনি আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্যন্ত একটি "চাতুর্মাস্য" বিরহের পদ রচনা করিয়াছিলেন। জ্ঞানদাসের এই বিরহ বর্ণনা কৃষ্ণকীর্তনের বর্ণনা হইতেও করুণ, প্রগাঢ় ভাবদ্যোতক এবং ভাষার ঝঙ্কারে ও অলঙ্কারে সমৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়। পদটি নূতন বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

॥ শ্রীগান্ধার ॥

গগনে ভরল নববারিদ হে বরষা নব নব ভেল।
ঝর ঝর বাদর ডাকে ডাহুকী সব শবদে পরাণ হরি নেল॥
চাতক চকিত নিকট ঘন ডাকই মদন বিজয়ী পিকরাব।
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহ বড় বরষা কেমনে গোঁয়াব॥
সরসিজ বিনুসর শোভা না পাবই কমল না শোভে অলিহীনা।
হাম কমলিনী কান্ত দেশান্তর কত না সহব দুখ দীনা॥
সঞ্চরু সঘন সৌদামিনী জনু বিন্ধয়ে শর খরধার।
মাস সাঙনে আস নাহি জীবনে বরিসয়ে জল অনিবার॥
নিশি আন্ধিয়ার অপার ঘোরতর ডাহুকি ডহ ডহ ভাস।
বিরহিনী হৃদয় বিদারণ ঘন ঘন শিখরে শিখণ্ডিনী ডাক॥
উৎকর্মতি সর্নতি আরোপয়ে কামনিতি জনু শব সাধন লাগি।
ভাদর দর দর অন্তর দোলন মন্দিরে একলি অভাগি॥
উলসিত কুন্দ কুমুদে পরকাশিত নিরমল শশধর কাঁতি।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে সব রঙ্গিনী নাহি জানে ইহ দিন রাতি॥
চির পরবাসি যতহুঁ পরদেশি সব পুন নিজ ঘরে গেল।
মাস আশিন খীণ ভেল কলেবর জ্ঞান কহে দুখ কোন দেল॥

নূতন মেঘে গগন ভরিয়া গেল। বরষা নিত্য নূতন। ঝর ঝর ধারে বাদল ঝরে, ডাহুকী সব ডাকে, শব্দে প্রাণ হরিয়া লইল। চকিত চাতক নিকটেই ঘন ডাকিতেছে, মদনবিজয়ী কুহুধ্বনি, আষাঢ় মাস, বিরহ বড় গাঢ়, কেমন করিয়া বর্ষা কাটাইব। সরসিজ হীন সরোবর, অলিহীনা পদ্ম শোভা পায় না। আমি কমলিনী, কান্ত দেশান্তরে, দীনা আমি, এ দুঃখ কত সহ্য করিব! সঘন সঞ্চারিত সৌদামিনী, যেন খরধার শর আসিয়া বিঁধিতেছে। শ্রাবণ মাসের অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, জীবনের আর আশা নাই। ঘোরতর অন্ধকার রাত্রি, যেন পার নাই (যেন শেষ হইবে না)। ডাহুকীর ডহ ডহ শব্দ, বিরহিনীর হৃদয় বিদীর্ণকারী পর্বত কন্দরে ময়ূরের কেকা রব, (আমার প্রাণহীন দেহ লইয়া) উন্মত্ত মদন যেন শব সাধনার জন্য নিত্যই শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। অন্তর আলোড়নকারী ভাদ্রের বৃষ্টিধারা, অভাগিনী আমি মন্দিরে একাকিনী। কুন্দ উল্লসিত, কুমুদ প্রকাশিত, শশধর মালিন্যহীন, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে রঙ্গিণীগণ এখন দিন রাত্রির ভেদ ভুলিয়াছে। (আমার বন্ধু ভিন্ন) চির প্রবাসী, যত পরদেশী সকলেই ঘরে ফিরিয়া আসিল। আশ্বিন মাস আসিয়াছে। দেহ ক্ষীণ হইল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন কে এত দুঃখ দিল।

জ্ঞানদাসের কোন কোন পদ প্রহেলিকার মত। তাঁহার পদে রূপকের পরিচয় আছে। উপমা প্রয়োগে তিনি সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার রচনায় উক্তি প্রযুক্তির সরসভঙ্গি লক্ষ্য করিবার মত। আমরা জ্ঞানদাস রচিত একটি যুগল মিলনের পদ তুলিয়া এ প্রবন্ধ এইখানেই শেষ করিলাম।

॥ সুহই ॥

নন্দের বাড়ী তমাল গাছে কনকলতা বেড়ি।
কালা দেহে পীতবসন নীলবসনে গোরী॥
এক শিরে মেঘের মালা আনে ইন্দ্রধনু।
এক মুখেতে সুধা ঝরে আরে বাজায় বেণু
জ্ঞানের মনে অনুক্ষণ রাধার পরাণ কানু॥
এক ভালেতে শশধর আর কপালে ভানু॥

শেষ পর্যন্ত

(গল্প)

নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা খড়ের গাদার সম্মুখে বসিয়া রামলোচন ভাবিতেছিল।

মস্ত খড়ের গাদা। প্রায় কুড়ি হাত লম্বা একটা বাঁশ, তাহারই চারিদিক নিবিড়ভাবে বেস্টন করিয়া সুপুস্ট এই গাদাটি। গৃহস্থের সারা বৎসরের সঞ্চয়, মানে গরুর খাইবার জন্য।

আর তাহারই সম্মুখে বসিয়া ভাবিতেছিল রামলোচন। সন্ধ্যা পার হইয়াছে অনেকক্ষণ, এদিকের লোক চলাচলও প্রায় বন্ধ; সুযোগ বুঝিয়া একান্ত সন্তর্পণে গুড়ি মারিয়া রামলোচন এখানে আসিয়া বসিয়াছে। তাহার হাতে একটা টেক্কা মার্কা দিয়াশলাই।

খড়ের গাদার ঠিক দক্ষিণ সংলগ্ন ঘরে বিন্দু চাটুজ্যের বাস। ব্যবধান তো বড়জোর সাত আট হাত, একবার দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে টেরটি পাইবে মজাটা। বুঝিবে তখন রামলোচনকে চটাইবার কী ফল!

একটা হিংস্র তৃপ্তির হাসি রামলোচনের মুখে ফুটিয়া উঠিল। এই মুহূর্তে তাহার ক্ষমতা একেবারে কম নয়, অনেককে সে গৃহহীন নিঃসম্বল করিতে পারে। যাহারা দুই দিন পূর্বে গলা উঁচু করিয়া অযাচিত স্পষ্ট কথা বলিতে আসিত, মানুষের মধ্যেই গণ্য করিত না রামলোচনকে, তাহারা জীবনে একটা মূল্যবান শিক্ষা আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া যাইবে। একটা নিদারুণ আত্মতৃপ্তিতে রামলোচনের এই মুহূর্তে ভারী ভাল লাগিতে লাগিল।

আর সত্যই তো, অপমানটা রামলোচন এত সহজেই হজম করে নাই। আজ না হয় অবস্থাচক্রে গরীব হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের দুই পুরুষ আগেরও জম-জমাট অবস্থা; কিনিতে পারিত তাহারা এই বিন্দু চাটুর্যেকে। লেখাপড়া সে না হয় শেখেই নাই, কিন্তু শিখিলে কোন না কোন একটা জজ ম্যাজিস্টর হইতে পারিত। মানুষ চেনে না হতভাগ্য, ঘাঁটাইতে আসিল কিনা একেবারে তাহাকেই।

রামলোচন কৃতনিশ্চয় হইল। একটি দিয়াশলাই কাঠি এবং অতঃপর।

দৃশ্যটা কল্পনা করিতেও চমৎকার। দাউ দাউ করিয়া লেলিহান শিখায় জ্বলিয়া উঠিবে খড়ের গাদাটা, আর তাহার পরেই বিন্দু চাটুজ্যের বিন্দুমাত্র সতর্ক এবং সচেতন হইবার পূর্বেই সহসা জ্বলিয়া উঠিবে বড় টিনের আটচালা ঘরখানা। কোনরকমে প্রাণটি লইয়া বাহির হইবে মাত্র।

রামলোচন খিল খিল করিয়া আপন মনে হাসিয়া উঠিল। অহঙ্কার করা বড় পাপ, হতভাগা বোঝে না মানুষের ধন যৌবন কতক্ষণ স্থায়ী। 'তুমি কাউরে হাসাও, কাউরে কাঁদাও, কাউরে কর বনবাসী' গানটা শুনিলেও যদি চৈতন্য নয়ন খুলিত তাহার।

রামলোচন সেদিন ঘুড়ির মাঞ্জা দিতেছিল। সাবু জ্বাল দিয়া কেবল কাঁচের গুড়া ঢালিবে এমন সময় চাটুজ্যের মেজ ছেলে ননী আসিয়া উপস্থিত; একেবারে যাহাকে বলে নবাবপুত্তুর। পায়ের স্যাণ্ডেল চট্‌পট্ করিতে করিতে আসিয়া বলা নাই কহা নাই নাটাই শুদ্ধ সুতা সেই সাবুর মধ্যে চুবাইয়া দিল। রামলোচনের ব্রহ্মতালু জ্বলিয়া গেল, স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া সে অঘটন ঘটাইয়া বসিল।

চড়ের মাত্রাটা সে হয়তো রাগের মাথায় ঠিক রাখিতে পারে নাই; কিন্তু তাই বলিয়া ননী অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাইবে নাকি? আর যদিই বা চেঁচাইল, বুড়ো চাটুজ্যেই বা অমন হাই হাই করিয়া আসিয়া পড়িল কেন? শুধু কি তাই, বকিয়া বকিয়া পাড়া সে মাথায় করিয়া তুলিল, রাজ্যের লোকের সামনে তাহার দারিদ্র্য আর মূর্খতাকে ইঙ্গিত করিয়া কী অপমানটাই না করিয়া ছাড়িল! একেবারে জাতগুস্টি লইয়া গালাগালি!

রামলোচন একটা কাঠি বাহির করিল।

বাড়ীটা পুড়িবে, দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে খুঁটি আর টিনের চাল, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িবে চাটুজ্যে--রামলোচন দূরে হইতে সে দৃশ্য দেখিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিবে।

কাঠিটা ঘসিবার জন্য সে প্রস্তুত হইল।

বাড়ীতে খুব ব্যস্ততা নামিবে। হৈ চৈ চীৎকারে পাড়া-শুদ্ধ ভাঙিয়া পড়িবে তাহার উঠানে, চাটুজ্যে ভীতি-বিহ্বল মুখে হায় হায় করিবে আর ছোট ছেলে মেয়েগুলা ভয় পাইয়া প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিবে। সে চীৎকার, কল্পিত সম্ভাবনার সে ভয়াবহ দৃশ্য তাহার আজ সত্যই উপভোগ্য মনে হইতেছে।

এক গোছা খড় টানিয়া রামলোচন দিয়াশলাইটা আগাইয়া নিল।

কিন্তু মীনা কি করিবে?

মুহূর্তে রামলোচনের মনটা কেমন হইয়া গেল। বিন্দু চাটুজ্যের একগুস্টি সে অসঙ্কোচে জ্যান্ত পোড়াইতে পারে, কিন্তু তাহার এই মেয়েটার কথা মনে হইলেই কেমন মায়া পড়িয়া যায়। আহা মেয়েটা বড় ভাল, বড় শান্ত লক্ষ্মী মেয়েটি। রামলোচনের কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল।

রামলোচন চোখের সম্মুখে মেয়েটিকে স্পস্ট দেখিতে পাইল। শান্ত স্মিত মুখ, প্রশান্ত খুসীর দীপ্তি সমস্ত মুখে প্রতিফলিত, কোন কারিগর অন্তরের সমস্ত দরদ দিয়া যেন ইহাকে পরম যত্নে গড়িয়া তুলিয়াছে। শেষপ্রান্তে লাল ফিতা বাঁধা লম্বা বেণীটি পিঠ বাহিয়া সাপের মতো ঝুলিয়া নামিয়াছে; রামলোচনের একদিন একটা অদ্ভুত ইচ্ছা হইতেছিল সে সাপটি একটু নাড়া দিয়া স্পর্শ করিয়া আসে।

আর শুধু রূপেই নয়, মেয়েটির প্রকৃতিও অতি চমৎকার। রামলোচনের স্মরণ আছে সেদিনের কথা, সে ঘোষেদের ভিটায় কাশীর পেয়ারা চুরি করিয়াছিল। নির্জন দুপুরের সুযোগ লইয়াই তার অভিযান, সত্য বলিতে সেবারে সে গোটা পঁচিশেক সরাইয়াছিল। চক্কোত্তিদের ভাঙা প্রাচীর বাহিয়া নামিয়া আসিতেছিল এমন সময় কি করিয়া একেবারে মীনার সম্মুখে বেসামাল ধরা পড়িয়া গেল। মীনা কিন্তু অদ্যাপি প্রকাশ করে নাই সে কথা, করিলে চক্কোত্তিরা তার মাথাটা ছাতু করিয়া দিত। বিশেষত ও বাড়ীর ঐ দধিটা যা গোঁয়ার, রাগিলে এতটুকু জ্ঞান থাকে না তার।

সত্যই মেয়েটিকে তার বড়ই ভাল লাগে। কিন্তু বনে না শুধু ঐ বিনয় মাস্টারটার সাথে। মীনাকে সে দুবেলা পড়ায়, তাই বলিয়া রাজ্যের সকলের মাথা কিনিয়া আছে যেন। কথায় কথায় তাড়িয়া আসে, সেদিন তো ঘাড় ধরিয়া দুঘা বসাইয়াছিল আর কি! আবার শোনা যায় মীনার সহিত তার বিবাহ হইবে। রামলোচনের সর্বশরীর যেন জ্বলিয়া গেল। হতভাগা চাটুজ্যের কী চোখের মাথা একেবারেই খাইয়াছে যে অমন সোনার প্রতিমা জলে বিসর্জন দিবে? আহা, অমন মেয়েটার কি ছিরিই না হইবে তাহা হইলে!

রামলোচন তড়াক করিয়া চমকাইয়া উঠিল। এ কী দুর্বলতা তার?

নিমেষে হাতের মাসল ফুলাইয়া সে সবেগে দুই বাহু ঝাঁকাইল, পরে নিজেকে ধমকাইয়া কহিল, রামলোচন হুঁসিয়ার! ভুলিও না তোমার প্রতিহিংসা, তোমার জাত গুষ্টিকে যাহারা অপমান করে তাহাদের ভিটায় তোমার ঘুঘু চরাইতে হইবে। নাহিলে কিসের তুমি নন্দকিশোরের সন্তান?

নন্দকিশোর এমন করিয়াই একবার তাহার অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছিল, সে কাহিনী ইহাদের বংশপীঠে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। জেল না হয় সে খাটিয়াছিল, কিন্তু তাহা সগৌরবে উদ্দেশ্য সাধন করিয়া। আর তাহার যোগ্য পুত্র হইয়া সে কিনা—

নন্দকিশোর তনয় এইবার চিত্তে সাহস সঞ্চয় করিল, পরে একটা কাঠি বাহির করিয়া ম্যাচটা ঘসিল। একটা স্ফুলিঙ্গ সে ঘসায় জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু রামলোচন আবার চমকাইয়া উঠিল।

সত্যই এ কী হইল তার? ক্ষুদ্র সেই স্ফুলিঙ্গ চকিতে তাহার চোখে কী ভীষণ মূর্তিতে দেখা দিল। সে যেন স্পষ্ট দেখিতেছে সমস্ত বাড়ীটা ঘিরিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে মত্ত আগুন, সকলের সমবেত চেষ্টাকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রমত্ত হুতাশন ধ্বংসের নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছে—কে রোধ করিবে তাহার এই সর্বগ্রাসী ধ্বংসের রূপ? চারিদিকে চীৎকার আর প্রতিবেশীর উন্মত্ত কোলাহল আর সেই অশান্ত জনতা ভেদ করিয়া পাগলের মতো এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে কে ও মেয়েটি?

রামলোচন শঙ্কাবিস্ময়ে আঁৎকাইয়া উঠিল—মীনা!

মীনা? কিন্তু কী ভীষণ চেহারা হইয়াছে তার! মাথার চুল বার আনা গিয়াছে পুড়িয়া, অর্ধদগ্ধ কাপড়ের আঁচলটায় হিংস্র লোলুপ আগুন তখনও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, যন্ত্রণা আর বিভীষিকার ছায়ায় সমস্ত মুখখানা কী করুণ ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে! মীনা অস্থির হইয়া ছুটিতেছে, এই মুহূর্তে কী অস্বাভাবিক বীভৎস দেখাইতেছে তাহাকে! শ্মশানের বুকে এক বিকট প্রেতের মতো সে সকলের মধ্য দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, আর তাহাকে থামাইবার জন্য তাহার পিছনে সমানে ছুটিল বিনয় মাস্টার।

রামলোচনের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, এ কী দেখিল সে? হাত হইতে তার দিয়াশলাইটা পড়িয়া গেল।

রামলোচন উঠিয়া দাঁড়াইল। নাঃ, এমন হিংস্র কঠিন হইতে পারিবে না সে, প্রতিহিংসা তাহার নাই বা চরিতার্থ হইল কিন্তু অমন দৃশ্য সে কল্পনাও করিতে পারে না। অমন শান্ত স্নিগ্ধ দেবী প্রতিমার দেহে সে আগুন ধরাইয়া দিবে, অমন চমৎকার, অমন অদ্ভুত সুন্দর বেণীটিকে সে নিষ্ঠুরের মতো পোড়াইয়া দিবে, এত বড় হৃদয়হীন পাষণ্ড সে হইবে কী করিয়া?

কিন্তু রামলোচন অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল তাহার একেবারে নিকটেই রক্ত চক্ষু মেলিয়া নন্দ-কিশোরের প্রেতাত্মা ভ্রূকুটি করিয়া চাহিয়া আছে, মৌন ভর্ৎসনায় তর্জন করিয়া যেন বারংবার শাসাইতেছে তাহাকে, উত্তেজিত প্ররোচিত করিতেছে দিয়াশলাইটা কুড়াইয়া লইতে। আর তাহারই ঠিক বিপরীত দিকে অতি করুণ ব্যাকুল নয়নে চাহিয়া আছে মীনা, মৌন সে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কী কাতর মিনতি! নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মতোই তাহা স্থির অথচ কোমল, শান্ত অথচ অবিচলিত।

রামলোচন আর সহ্য করিতে পারিল না, ধপাৎ করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিছনে কাহার পদশব্দে সে চমকাইয়া উঠিল।

—কি হচ্চে ওখানে, শুনি? কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুপরিচিত।

রামলোচন ত্রস্তে পেছন চাহিল। যাহা ভাবা তাই, মূর্তিমান যমদূতের ন্যায় স্বয়ং বিনয় মাস্টার। কিন্তু পরক্ষণেই সে চকিত হইয়া উঠিল, শুধু তাই নয়, মীনাও তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিনয় মাস্টার বিনয়ের তোয়াক্কা রাখেন না, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আগাইয়া আসিয়া তাহার ঘাড়টা চাপিয়া ধরিল, কহিল, কি চুরি হচ্ছিল ওখানে শুয়ার? আমি জানলা থেকে সব দেখেছি, আজ তোমার একদিন কি আমারই একদিন! বলিয়াই এক হ্যাঁচকা টানে তাহাকে টানিয়া তুলিল।

রামলোচনের উঠিতে হইল সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচটা সশব্দে নীচে পড়িয়া গেল। বিনয় মাস্টার হাই হাই করিয়া উঠিলেন—দেখি, দেখি, কী পড়ল দে আমার কাছে শিগ্‌গির?

রামলোচন সসঙ্কোচে দিয়াশলাইটা কুড়াইয়া তাহার হাতে দিল।

বিনয় মাস্টার এক মুহূর্ত থামিয়া যেন ব্যাপারটা

বিনয় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এতবড় গুরুতর অপরাধ যে এই ফাঁকে ছোঁড়াটা করিতে পারে এবং আর এক মুহূর্ত বিলম্ব হইলেই যে ভয়ানক সর্বনাশ এ বাড়ীর মাথার উপর নামিয়া আসিত ভাবিয়া বিস্ময়ের ঘোরে তাহার সমস্ত শক্তি যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তবু সেই ভাবনার তালে তালে তাহার বজ্রমুষ্টি অপরাধীর হাত দুইটাকে ক্রমেই কঠিন হইতে কঠিনতর ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে লাগিল।

রামলোচন বাধা দিল না, এতটুকু শব্দোচ্চারণও করিল না সে। তাহার শুধু বারংবার মনে হইতেছে, মীনার চোখ দুইটি সুন্দর, সত্যই সুন্দর। একটু বড় করিলে আরও সুন্দর দেখায় সে চোখ দুটি।

অনুধাবন করিবার চেস্টা করিলেন পরে সহসা লাফাইয়া উঠিলেন—মানে? আগুন, আগুন দিচ্ছিলি তুই এই খড়ের গাদায়?

রামলোচন মীনার দিকে চাহিল, তাহার আয়ত চোখ দুইটা ভয়ে বিস্ময়ে আরও বড় হইয়া উঠিয়াছে। কিছুই যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, একটা অর্থহীন বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলিয়া সে নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল।

কে যেন নিষেধ করিয়া রামলোচনের কণ্ঠ বারংবার রোধ করিতে চাহিল, কিন্তু মীনার চোখের দিকে চাহিয়া মিথ্যা সে কিছুতেই বলিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সংক্ষেপে কহিল, হ্যাঁ, সত্যিই তাই!

মানুষের ঘর

(২৪৯ পৃষ্ঠার পর)

নিস্পৃহভাবে কাত্যায়নী জবাব দিলেন, "দরকার কি।"

সরোজ চমকে উঠল; মনে হ'ল সে না জেনে কাত্যায়নীর মনের যে গোপন তন্ত্রীতে আঘাত করেছে এ তারই সুর। এ কথার সুরে আদেশ নেই, অনুরোধও নেই, আছে অভিমান। সরোজ এগিয়ে এল; সমস্ত সংকোচ ঝেড়ে ফেলে সে ডাকল, "মা!"

কাত্যায়নী বললেন, "সন্তান যাই করুক না সরোজ, মা তাকে ক্ষমা ক'রেই থাকে; আমিও তোমায় ক্ষমা করেছি, আদুকে বিয়ে করলেও করতাম।"

সরোজ কথা বলতে পারলে না, স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল কাত্যায়নীর মুখের দিকে। তিনি তা হ'লে সবই জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে তো এক দিনও কোনও কথা বলেন নি! কেন?, বলার দরকার হয় নি ব'লে?

সরোজকে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কথা বললে প্রথমে ইন্দু। বললে, "বেলা হয়েছে সরোজ, বিশ্রাম ক'রে খাওয়া দাওয়া সেরে নাও। আবার যদি কালই কাজে যেতে হয়, তারও তো যোগাড়-যন্তর আছে!"

সরোজ সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে এল। কিন্তু নিজের ঘরে গেল না, যে পথে এসছিল, সেই পথেই ফিরে চলল কাউকে কিছু না জানিয়ে।

(ক্রমশ)

এসে ইন্দুর বিছানার পাশে দাঁড়ালেন, তার পর তার মাথায় মুখে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন সযত্নে, সস্নেহে। মা যে স্পর্শ দিয়ে মুমূর্ষু সন্তানকে সাবধানে সন্তর্পণে আগলে রাখতে চায় মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে, এও তেমনি স্পর্শ।

সরোজ নীরবে দাঁড়িয়েছিল, অপরাধীর মত নতনেত্রে। তার মনে হচ্ছিল এ মা তারই, যে মা তার একমাত্র সন্তানের নিরুদ্দেশে চঞ্চল হয় না, বাস্তও হয় না একটু, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও যার এতটুকু চঞ্চলতা কোনও দিন কারও চোখে ধরা পড়ে নি, এ তার সেই মা! হয়তো এই মায়েরই মন মাটির মত কোমল, আবার অন্যদিকে পাথরের মত কঠিন। এই কঠিনতার কথা স্মরণ ক'রেই সে আদুকে পেয়েও জীবনের দরজা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে অবহেলার আঘাত দিয়ে। শারদার প্রার্থনা, ইন্দুর অনুরোধ সমস্তই এড়িয়ে এসেছে সন্তর্পণে, সাবধানে। অবশেষে সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে সে ডাকল, "মা!"

কাত্যায়নী মুখ ফেরালেন; "কেন?"

"আমি যে চাকরি পেয়েছি মা, কালই আমায় এখান থেকে চ'লে যেতে হবে।"

"বেশ তো, যেও।"

সরোজ ব্যস্ত হয়ে পড়ল; বললে, "কিন্তু কি কাজ, কোথায় যেতে হবে, তা তো জিজ্ঞাসা করলে না মা!"

নিউইয়র্ক

(ভ্রমণকাহিনী—অনুবৃত্তি)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

নিউইয়র্ক হতে বিদায়ের পূর্বে একটা ছোট কাফেতে কয়েক জন লোকের সামনে বসে হঠাৎ কি একটা কথা বলেছিলাম। সেখানে ছিলেন Rockfeller Buildingএর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। আমাকে তিনি কতকগুলি প্রশ্ন করলেন তাদের ইমারত সম্বন্ধে। আমি তার উত্তর আমার মতেই দিয়েছিলাম। অনেকের ধারণা নিউইয়র্ক ডেবে যাবে বড় বড় ইমারতের ভারে। আমি বলছিলাম "হাঁ সেরূপ ধারণা করবার লোক পৃথিবীতে অনেক আছে তবে আমি সেরূপ হিন্দু নই।" "Bottom" যেখানে উপরে ভেসে উঠেছে, গ্র্যানিট যেখানে হাতুড়ী দিয়ে ভাঙ্গা কষ্টকর হয় তথায় ডেবে যাবে একটা ইমারত, যার উচ্চতা মাত্র একশ দুইতলা। কত লক্ষ টন পাথরই বা ব্যবহার হয়েছে? বোধ হয় Managing Director মহাশয় সাধারণ লোকের কাছ থেকে এরূপ কথা শুনেন নাই; তাই আমাকে তার বাড়ী দেখতে নিমন্ত্রণ করলেন। পরের দিন যখন রকফেলার বিলডিং দেখতে গেলাম তখন দর্শকরূপে অনেক লোক তথায় হাজির ছিল। একটি একটি ক'রে অনেক দেখান হলো। আমি হাঁ হুঁ করেই যেতেছিলাম। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বললেন, এরূপ ইমারত দেখে আপনার মন যেন উঠছে না বলে মনে হয়, তার কারণ কি? আমি বললাম, দেখার মত এমন কিছু এখনও চোখে পড়ে নাই, যার উপর কোন মন্তব্য করা চলে। Re-enforced Concrete, Glass, Iron, Tin, Wireএর বেশি কিছুই দেখি নাই। তখন তিনি ঘরের দরজার সামনে কয়েকখানা পাথর দেখালেন।

আমি পাথর সম্বন্ধে কিছু জানতাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই পাথর কয়খানা যদি "Pyrites"এর হয় তবে তার ওজন কত হবে? আমি বললাম, পাইরাইটিশ গলান যায় কিনা তা আমি জানি না এবং যদি গলান সম্ভব হয় তবে প্রত্যেক-খানার ওজন পঞ্চাশ হতে ষাট টন হবে। আমার জবাব শুনে Managing Director দেখলেন আমি একমাত্র মাটির উপর ঘুরেই সন্তুষ্ট হইনি, মাটির নীচের সংবাদও কিছু রাখি। এতটুকু বাজিয়ে দেখে আমাকে তাদের রেডিও সিটিতে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভারতে কয়টা ভাষা আছে জানেন?" বুঝতে পারলাম আমার কথাটা অমনি ব্রডকাস্ট হবে। জবাব দিলাম ভারতে বর্তমানে একটি মাত্র ভাষা, যা প্রায় সকলেই বুঝে।

তার কি নাম?

হিন্দুস্থানী।

শুনতে পাই ভারতে প্রায় শ'খানেক ভাষা আছে?

আমিও শুনেছিলাম, আমেরিকায় সবাই মিলিয়নেয়ার।

তবে কি কথাটা "প্রপেগেন্ডা"?

অনেকটা তাই।

আপনার জানামতে অন্য কোন ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে?

হাঁ।

তার নাম কি?

তামিল।

হিন্দুস্থানী এবং তামিল ভাষার মাঝে প্রভেদ কি?

দুটার দুটি Origin।

তামিলরা হিন্দুস্থানী বুঝে?

পূর্বে বেশ ভালই বুঝত, মাঝে চাপা পড়ে, বর্তমানে বেশ ভাল করেই বুঝে।

অন্য কয়েকজন ভারতীয় পর্যটক এখানে দাঁড়িয়েই ভারতে অন্তত পঞ্চাশটি ভাষার কথা বলল, সে সম্বন্ধে কি বলতে চান?

এখানে দাঁড়িয়ে আমি বলব আমেরিকায় সত্তরটি ভাষার প্রচলন আছে, সে সম্বন্ধে আপনি কি বলতে চান?

আমি বলব মিথ্যা কথা।

আমি বলছি সত্য কথা, ঐ দেখুন গ্রীক্, স্লাভ, ইটালীয়ান, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, পর্তুগীজ, স্পেনিশ ভাষায় সংবাদপত্র রয়েছে, তবুও বলতে চান আমি মিথ্যা বলছি। তারপর মেডিটেরীনিয়ান-এ কত ভাষার প্রচলন আছে তা যদি দেখতে চান, তবে চলুন ২০ নম্বর স্ট্রীটে। এ সকল ভাষা তো কতকগুলি লোকের মাঝে সীমাবদ্ধ? ঠিক সেরূপ ভারতেও কতকগুলি ভাষা কতকগুলি লোকের মাঝে সীমাবদ্ধ। সকলেই বুঝে হিন্দুস্থানী। এখন বলুন এই সত্য সংবাদ দিবার জন্য আমাকে কত দিবেন এবং কতইবা মিথ্যা সংবাদ বিক্রেতাদের দিয়েছেন?

হঠাৎ চারদিক আলো করে বাতিগুলি জ্বলে উঠল। হাজার লোক বসে যথায় থিয়েটার শুনে, প্রবেশ মূল্য যথায় সকলের পকেটে সকল সময় থাকে না, হলিউডের Star-রা যথায় কথা ব'লে ধন্য হয়, সেই স্থানের পারিপাট্য, এক প্যারী ছাড়া কোথায় থাকতে পারে? নয়ন আমার সার্থক হলো সে দৃশ্য দেখে। পৃথিবীতে এরূপ বসবার স্থান কয়টি? চীন সম্রাটের মসনদ দেখেছি, দিল্লীর বাদসার মসনদ ধারণা করেছি, কিন্তু সে সব এই গৃহের কাছে কোন্ ছার। আজ আমার পরিব্রাজক-জীবন ধন্য হলো—ঠকি নাই বলে, লোভ করি নাই বলে, দেশকে বেচি নাই বলে, ছোট-খাট ভাব আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই বলে। আজ আমি আর নিউইয়র্ক-এ থাকতে চাই না। নিউইয়র্কবাসী তথা আমেরিকাবাসী জেনেছে, ভারতের প্রকৃত পর্যটক, টাকায় বশ হয় না, কারো কাছে মাথা নত করে না। আজ আমি বিদায় নিব নিউইয়র্ক হতে।

রেডিওসিটি দেখে মনে একটা কি ভাব হলো, বলতে পারি না। একদম রুমে এসে মিঃ ও মিসেস মুখার্জ্জির কাছে পত্র লিখেই তা পোস্ট করলাম এবং সাইকেল বের করে ছোট ঝোলাটি কেরিয়ারে বেঁধে সটান চিকাগোর পথে এসে দাঁড়ালাম।

চিকাগো নিউইয়র্ক হতে অনেক দূরে। হাজার মাইল পথ চলে যাব কয়েক দিনের মাঝে ভেবে পথে বেরিয়েছি, কিন্তু আমার মনে ছিল না, আমাকে একটি বৃহৎ সেতু পার হতে হবে। এরূপ সেতু পৃথিবীতে আর নাই বললেও চলে। উপর দিয়ে চলেছে এলিভেটর, তার নীচে চলেছে মোটরগাড়ি লহর। মিনিটে মিনিটে সেতুর নীচে-চলা ফেরী বোটগুলির চিমনিগুলি উপরের পথিকদের নাকমুখ ধোঁয়ার দ্বারা বন্ধ করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সে দৃশ্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হলো না, হতে পারে না। চলতে হবে, নতুবা পথ বন্ধ হয়ে যায়, ঘাড়ের উপর লোক এসে পড়ে। সেতু পার হয়ে গিয়ে একটা ফাঁকা স্থানে এসে চোখভরে নিউইয়র্ক নগরীর রূপ দেখতে লাগলাম এবং নিজের মনের দুর্বলতার কথা ভেবে আপনি লজ্জিত হলাম। শহরের পরিচিত বন্ধুদের বলে আসি নাই কোথায় যাব। কাছেই একটি মোটর স্ট্যান্ড, তথা হতে ফোন করে বাড়িওয়ালীকে

আমার পথের নির্দেশ দিয়ে জানালাম—আজ যদি কেউ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে, তবে জানাবেন আমি কোন্ পথে গিয়েছি। বাড়িওয়ালী আমাকে জানাল যে, এরই মাঝে কয়জনা এসে চলে গেছে এবং বলে গেছে আবার তারা আসবে। বাড়িওয়ালীকে জানালাম, ওয়ার্ল্ডফেয়ারের কাছেই কোথাও রাত্রি কাটাব এবং ঠিকানা জানালে যেন বন্ধুবান্ধবদের জানিয়ে দেয়। বাড়িওয়ালী Goodbye বলেই রিসিভারটা রেখেদিল। এতদিনের পরিচয় নিমিষে কেটে দিল। একেই বলে ব্যবসায়ের বন্ধুত্ব।

ওয়ার্ল্ডফেয়ারের পাশেই কতকগুলি কেবিন আছে। কেবিন মানে ছোট একখানা কাঠের ঘর। তার মাঝে পাক করবার গ্যাস, স্নানের গরম ও ঠাণ্ডা জলের কল এবং একটি বৃহৎ টব। পাক করার জন্য বাসন বিনা ভাড়ায় দেওয়া হয়। শুধু খাদ্য-দ্রব্য কাছের কোন গ্রোসারি দোকান হ'তে কিন্‌তে হয়। দক্ষিণা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য মাত্র এক ডলার। আমাদের দেশের তিন টাকা দু আনা মাত্র। অনেকগুলি কেবিন দেখলাম। প্রত্যেকটাই খালি, কিন্তু আমার জন্য খালি নয়। আমি কালা-আদমী। কালো লোকের থাকবার জন্য বিশেষ কেবিন রয়েছে—সে কথাটি আমার জানা না থাকায় আমাকে অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ টহল দিতে হলো। আমার মুখ দেখেই কেবিনের ম্যানেজারগণ একস্থান হতে অন্যস্থানে পাঠাতে লাগল। স্পষ্টভাবে কেউ বললে না, কেউ বলতে সাহস করল না,—এই কেবিনগুলি শুধু সাদা লোকের জন্য। শেষটায় যখন নিগ্রোদের কেবিনের কাছে আসলাম, একজন ম্যানেজার হেসে বললেন, "Now you have come to the right place, have a cabin." আমি কেবিনের কেরায়া চুকিয়ে দিয়ে যখন রেজিস্টারে আমার নাম, আমার দেশের নাম বিশুদ্ধ বঙ্গ ভাষায় লিখতে লাগলাম, তখন ম্যানেজারের চমক ভাঙল। ম্যানেজার বলল, আপনি ইংরেজী লিখতে জানেন না? আমি বললাম, না, জানি না, আমি শুধু নিজের ভাষায় লিখতে এবং পড়তে জানি—ইংরেজী শুধু বলতে পারি। ম্যানেজার তখন আমার দেশ কোথায়, আমি কি জাত এবং আমার দেশের নানা সংবাদ নিয়ে, কেবিনটা পরিষ্কার করবার জন্য একজন লোক পাঠাল।

যে সকল কেবিনে নিগ্রো থাকে, সে সকল কেবিন প্রায়ই নোংরা দেখা যায়। ম্যানেজারগণও সে সকল কেবিন পরিষ্কার রাখার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করেন না। কেবিনে সাইকেলটা রেখে, অফিসে গিয়ে ফের টেলিফোন করে আমার অবস্থানের কথা নিউইয়র্ক'এ জানিয়ে পুনরায় কেবিনে এসে রান্নার বন্দোবস্ত করলাম। ম্যানেজার মহাশয় আমার পরিচয় পেয়ে দুচারজন আশেপাশের লোককে আমারই কেবিনে ডেকে এনে গল্প জুড়ে দিলেন। কথা হচ্ছিল আমাদেরই দেশ নিয়ে। আমি তাদের কথায় মাঝে মাঝে সায় দিচ্ছিলাম, কিন্তু আমার মন ছিল World fair-এর দিকে। খাওয়া সমাপ্ত করে বিশ্বমেলা দেখতে বার হলাম।

সুন্দর রাত। অনেক দর্শক জুটেছে। দর্শকদের মাঝে যারা 'হিচ-হাইক' করে এসেছে, তাদের লোটাকম্বল ঘাড়ে বাঁধা দেখলেই চিনতে পারা যায়। তাদের দুএকজনের সঙ্গে কথাও হলো। অনেকে "হিচ-হাইক" করে কালিফরনিয়া হতে এসেছে। আমার ইচ্ছা হলো আমিও "হিচ-হাইক" করে পর্যটন করি। এতে দেখা হবে আরও ভাল। অনেক চিন্তা করে হিচ-হাইক করা ঠিক করে বিশ্বমেলা দেখতে লাগলাম। নিউইয়র্ক-এর বিশ্বমেলা দেখতে আমাদের দেশের দুজন মহারাজা গিয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্বমেলা দেখার জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত হয়েছিল। তাঁদের পেছনে লোক চলত। তাঁরা নূতন ধরনের রিকশায় বসতেন। তাঁরা ইচ্ছামত জিনিসপত্রও কিনতেন। তাঁদের বদান্যতায় এবং মুক্ত হস্ততার জন্য লোকে ভারতবাসীকে ধনী বলেই কয়েক দিনের জন্য মেনে নিয়েছিল। কিন্তু আমাদের মত দরিদ্রের আগমনে এ হিসাবে ভারতের ভয়ানক বদনাম হয়ে থাকে। আমেরিকান পর্যটকদের দেখে পৃথিবীর লোক যেমন ভাবে আমেরিকার লোক সবাই ধনী, আমাদের দেশের রাজা মহারাজাদের দেখেও পৃথিবীর লোক ভাবে আমরা সবাই ধনী; কিন্তু আমেরিকার গভর্নমেণ্ট তাদের দেশে, যাতায়াতের যে আইন-কানুন করে রেখেছেন, তাতে সেখানে শুধু ধনীদেরই যাওয়া চলে। যারা গরীব তারা সেই অধিকারে বঞ্চিত।

বিশ্বমেলায় পৃথিবীর প্রায় সকল স্বাধীন দেশ থেকেই প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। আমেরিকার প্রত্যেক স্টেটও তাদের প্রদর্শনী খুলেছেন। এ সব ছাড়াও আমোদ-প্রমোদের জন্য নানা আয়োজন করা হয়েছে। সেই সম্পর্কে আমাদের দেশের লোককে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমাদের দেশের আমোদ-প্রমোদ এবং আমেরিকার আমোদ-প্রমোদে অনেক প্রভেদ আছে। আমেরিকার প্রত্যেক খেলাতে কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়। তারা অর্থ উপার্জন করতে পারে বলেই খরচ করতেও সক্ষম হয়। বিশ্বমেলাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। ডুবুরিয়া কি করে সমুদ্রের নীচে গিয়া সেখানে কি আছে দেখে—এমনকি, অনেক সময় সমুদ্রের নীচভাগ "সারভে" পর্যন্ত করে আসে, আমার তাই দেখতে ইচ্ছা হলো।

একটি কাচের ঘর ক্রেইনের সঙ্গে আঁটা রয়েছে। যখনই চারজন লোক এক শত কুড়ি ফিট জলের নীচে যেতে প্রস্তুত হয়, তখনই তাদের ঐ কাচের ঘরে প্রবেশ করিয়ে এক শত কুড়ি ফিট নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়। এতে সকলেরই বেশ আনন্দ হয়, যদিও এতে মরণের বেশ সম্ভাবনা থাকে। জীবন-মরণ নিয়ে খেলা করতে যে আনন্দ, তা সকলে পছন্দ করে না, কিন্তু আমার খুব ভাল লাগে। তাই আমি পঁচিশ সেণ্ট দক্ষিণা দিয়ে এক শত কুড়ি ফিট নীচে নেমেছিলাম। যতক্ষণ জলের নীচে ছিলাম, ততক্ষণ কান দুটা বধির হয়ে ছিল। যখন জলের উপর ভেসে উঠলাম এবং কাচের দরজা খুলে দেওয়া হলো, তখন মনে হলো নূতন জগতে এসে হাজির হয়েছি। আমাদের দেশে বিশেষত ইউরোপে এমন অনেক বই আছে যাতে সাগর সম্বন্ধে অনেক আজগবী কথা লিখা রয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জগৎ জেনে সুখী হবেন, রাশিয়ার ডুবুরিয়া কাস্পিয়ান সাগরের নীচ জরিপ করেছে এবং তাতে সন্ধান পেয়েছে অনেক পুরাতন যুগের বাড়ী-ঘরের। তারা ক্রমশ সেই সকল পুরাতন জিনিসপত্র উঠিয়ে পরীক্ষা করে পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব ভাণ্ডারের জন্য অনেক কিছু সঞ্চয় করছে। আমি মাত্র এক শত কুড়ি ফিট জলের নীচে গিয়ে, বাহাদুরি অর্জন করেছি বলে যদি বলি এবং যদি বলি জীবন-মরণ নিয়ে খেলা করেছি, তবে তা হবে শুধু হাস্যাস্পদ।

গোধূলি রাগ

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীতারাপদ রাহা

(৪)

রবিবার সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই ভারতী চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে কুমারেশের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কুমারেশ একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া 'স্টেটস্‌ম্যান'এর উপর চোখ বুলাইতেছিলেন, ভারতী কাছে আসিতেই জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিলেন। ভারতী বেশী কিছু আড়ম্বর না করিয়া কুমারেশের চেয়ারের হাতলে হাত রাখিয়া পরম আগ্রহে বলিল—আজ তিনি আসবেন, না দাদু?

কুমারেশ উত্তরে একটু হাসিলেন,—হাঁ।

কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া ভারতী বলিল—হাসলে যে!

—হাত মুখ না ধুয়েই যে তার খোঁজ করতে এসেছিস?

ভারতী তার কোন উত্তর না দিয়া বলিল—মালী কি দেবপ্রসাদ যেন আজ গাছ থেকে ফুল তোলে না, বিকালে গাছ থেকে আমি ফুল তুলব।

কুমারেশ মাথা নাড়িয়া বলিলেন—আচ্ছা, তুমি মুখ ধুয়ে এস, চা খাবে, তোমার জন্য অপেক্ষা করছি আমি।

ভারতী বেণী দুলাইয়া চলিয়া গেল। কুমারেশ কাগজের পৃষ্ঠা হইতে চোখ তুলিয়া চোখ বুজিলেন।—এই মেয়েটাও শকুন্তলাকে ভালবেসেছে। কুমারেশের কেমন যেন একটু কষ্ট বোধ হইতে লাগিল; এ কি ঈর্ষা? কুমারেশ নিজের উপর বুঝি একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তাহার ভ্রূদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কুমারেশ ভাবিতে লাগিলেন, মানুষের মন এখনও সেই আদিম যুগেরই বর্বর মন; সভ্যতার আবরণে শুধু তাকে ঢেকে রাখতে চাই আমরা। কোনও এক পরম সম্পদ দেখলে অপর সকলকে বঞ্চিত ক'রে মানুষের মন তার উপর একাধিপত্য বিস্তার করতে মাতাল হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে অতি প্রাচীন বৃদ্ধের মনও শিশুর মত অবিবেচক। কুমারেশ আরও কি ভাবিতে যাইতেছিলেন, সামনের দাঁড় হইতে কাকাতুয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রথমে কুমারেশ স্পষ্ট বুঝিলেন না, পরে শুনিলেন কাকাতুয়া বলিতেছে—কুন্তলা আসবে,—আজ কুন্তলা আসবে, না দাদু?

কাকাতুয়া শকুন্তলার শ-টা বাদ দিয়া কুন্তলা করিয়াছে, কুমারেশের কাছে নামটা বেশ লাগিল। চার অক্ষরের নামটি তিন অক্ষরে আসিয়া বেশ আধুনিক মার্জনা লাভ করিয়াছে। কুমারেশ মনে মনে বিড়বিড় করিতে লাগিলেন ভারতী-কুন্তলা, কুন্তলা-ভারতী, কুন্তলা কুন্তলা—বেশ!

সকালে চা খাইতে বসিয়া ভারতীর কাছে এ খবরটা না দিয়া কুমারেশের চলিল না।

—শুনেছিস ভারতী, কাকাতুয়া শকুন্তলার এক নতুন নাম রেখেছে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ভারতী বলিল—কি?

—কুন্তলা।

চায়ের পেয়ালা ঠুন করিয়া নামাইয়া ভারতী যেন লাফাইয়া উঠিল—সত্যি?

কুমারেশ পরম সন্তোষে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—হাঁ। বলিয়া পেয়ালা মুখে তুলিয়া লইলেন। ভারতী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কাকাতুয়া রব ধরিল—কে, কুন্তলা!—আঁ বলছ না কেন? কুন্তলা কখন আসবে।

—হাঁ হাঁ, তোর মাথা। ভারতী জবাব দিল। বলিল—আচ্ছা দাদু আমি তাঁকে কি ব'লে ডাকব? বউদিদি?—না, তা তো হয় না।

কুমারেশ একটু ভাবিয়া গম্ভীর হইয়া বলিলেন—তুমি তাকে দিদি ব'লে ডেকো।

—শুধু দিদি?

—হাঁ।

কি করিয়া শকুন্তলাকে ভাল করিয়া সংবর্ধনা করা যায়, কুমারেশ সারা দিন শুধু তাহাই ভাবিলেন। কোন্ ঘরে কোন্ ছবিখানা রাখিলে ভাল হয়, কোন্ টেবিলে কোন্ টেবল ক্লথ পাতা যায়, ফুলদানিতে কি ফুল রাখা যায় ইত্যাদি ভাবনার কি আর শেষ আছে?

ঝাড়পোঁছ করিয়া ঘর গোছাইতে দেবপ্রসাদ ক্লান্ত হইয়া উঠিল। ব্রাসোর পর ব্রাসো লাগাইয়াও ফুলদানিগুলি সে কুমারেশের মনের মত করিয়া তুলিতে পারিল না। অনেক কাল পরে কুমারেশের রূপার টী-সেট বাহির হইল, তাহাতে মেটাল পলিশ লাগানো হইল।

একজন যুবতী স্ত্রীলোককে চাএ নিমন্ত্রণ করিয়া কুমারেশের এমন ব্যস্ত হইয়া পড়া শোভন হইতেছে কি না, একথা বার বার তাহার মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করিতেছিল। অতি সামান্য অশোভনতাকে হয়তো দেবপ্রসাদ কত কি মনে করিতেছে, ভারতী বড় হইয়া কুমারেশের আজিকার ব্যস্ততা লইয়া হয়তো কত কি ভাবিবে। হয়তো শকুন্তলা নিজেও এসব কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে হাসিবে। কুমারেশের মন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠিল। গড়গড়ায় তামাক দিতে বলিয়া কুমারেশ ইজিচেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

দেবপ্রসাদ তামাক দিয়া গেলে নল মুখে দিয়া কুমারেশ ভাবিলেন, না, অন্যায় অশোভন তো কিছু করা হয় নি। যেরূপে শকুন্তলার এ বাড়িতে আসবার কথা ছিল, সেরূপে এলে আজ তাকে সংবর্ধনা করতে কুমারেশকে আরও তৎপর হয়ে উঠতে হ'ত। ভাগ্যবিপর্যয়ে আজ শকুন্তলা অন্যরূপে এ বাড়িতে আসছে; তা ব'লে এর চেয়ে কম আদর ক'রে তাকে অবহেলা জানাবার অধিকার আমাদের নেই। বিশেষ ক'রে এ সম্পর্কে তার মনে একটু বেদনা থাকা আশ্চর্য নয়। কি দিয়ে আমরা তার সেই বেদনাকে একটুখানি হ্রাস করতে পারি, আজকার দিনে সেইটেই আমাদের ভাববার কথা।

কুমারেশের মনের গোলযোগ ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

সেদিন দুপুরে তিনি ভারতীকে সঙ্গে লইয়া তাহার সমবয়সী হইয়া দেবপ্রসাদের সাহায্যে ঘর গোছাইলেন। ভারতী দাদুকে সঙ্গে লইয়া বাগানে গিয়া দুপুরেই গোছা গোছা ফুল নিজে হাতে কাঁচি দিয়া কাটিয়া আনিল।

দুপুরে একটু বিশ্রাম করিয়া বেলা তিনটায় ভারতীকে সঙ্গে করিয়া কুমারেশ মার্কেটে গিয়াছিলেন। ভারতীর ইচ্ছা, সে নিজে হাতে মিঠাই কিনিয়া তাহার এই নতুন দিদিকে খাওয়াইবে। লেক হইতে সেই তাহাকে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে, সুতরাং তাহার প্রতি তার নিজস্ব কিছু দাবি থাকিবার কথা।

সময় কিছু নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই বটে, তবু কুমারেশ মনে করিয়াছিলেন শকুন্তলা সাড়ে চারটার আগে আসিবে না। চায়ের উপযোগী কিছু খাবার কিনিয়া যখন তিনি বাড়ি ফিরিলেন, তখন চারটা বাজিয়া পনের মিনিট হইয়াছে। গাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেবপ্রসাদ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—তিনি এসেছেন।

কুমারেশের সমস্ত শরীর একবার যেন কাঁপিয়া উঠিল। খাবারের ঠোঙাগুলি ফেলিয়াই ভারতী ছুটিয়া যাইতেছিল, কুমারেশ তাহাকে চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন-হাত মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে একেবারে চাএর জন্য তৈরী হয়ে এস।

ভারতীর প্রথম উদ্যম যেন একটু নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। খাবারের ঠোঙা দেবপ্রসাদের হাতে দিয়া ভারতী ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কেহ বাড়িতে আসিলে সে পায়ে একটুও শব্দ করিবে না, কুমারেশের চেষ্টায় অনেক কষ্টে সে এটা আয়ত্ত করিয়াছে।

ভারতী চলিয়া গেলে কুমারেশ দেবপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কতক্ষণ এসেছেন তিনি?

—মিনিট পনের হবে।

—কোথায় বসিয়েছ তাঁকে?

—উপরে লাইব্রেরি ঘরে।

কুমারেশ মনে মনে দেবপ্রসাদের বুদ্ধির তারিফ করিলেন। যাহারা এ বাড়ির বেশী আপনার জন, তাহারাই দর্শনার্থী হইয়া আসিলে কুমারেশের লাইব্রেরি ঘরে বসিবার আসন পায়, নইলে নীচের হল ঘরে অপেক্ষা করিয়া সংবাদ দিতে হয়।

উল্লসিত মনের সমস্ত তরঙ্গ চাপিয়া কুমারেশ ধীরে ধীরে উপরে চলিলেন। ভারতী হয়তো এখন হাত মুখ ধুইতে আরম্ভ করিয়াছে, হাত মুখ ধুইয়া সে কাপড় ছাড়িবে, মুখে পাউডার দিবে, তাহার আসিতে এখনও একটু দেরি আছে। শকুন্তলা কি করিতেছে? হয়তো আমার বই দেখিতেছে। কি ধরনের বই সে পছন্দ করে, আগে জানিলে সেই ধরনের বই কি আমি কিনিতাম? শকুন্তলা ছবির কি কিছু বোঝে?—এ আমার অন্যায় সন্দেহ। অমন সুন্দর চেহারা যাহার, ছবির মর্ম সে বুঝিবেই। কোন্ ছবিখানা সে পছন্দ করিল বেশী?

এলোমেলো চিন্তা করিতে করিতে অনামনস্ক কুমারেশ লাইব্রেরি ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য সেখানে শকুন্তলা নাই। তবে কি সে আসে নাই, দেবপ্রসাদ কি মিছে কথা বলিল। কুমারেশ একখানা সোফায় ক্লান্ত দেহটাকে এলাইয়া দিলেন। ওআল ক্লকের একঘেয়ে টক টক শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দই তাহার কানে আসিল না। কুমারেশ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন।

ঢং করিয়া সাড়ে চারটার ঘণ্টা পড়িল; বৃদ্ধ কুমারেশের জীর্ণ নার্ভগুলি চমকিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে চুপি চুপি পা ফেলিয়া দ্রুতগতিতে ভারতী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর চকিতে একবার কুমারেশের দিকে চাহিয়া বন-হরিণীর মত এদিকে ওদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দক্ষিণের বারান্দায় ছুটিয়া গেল।

দক্ষিণের বারান্দায় চাএর জন্য টেবিল চেয়ার সাজানো হইয়াছে, নিজে বাহাদুরি করিতে গিয়া ভারতী সেগুলি পাছে অগোছালো করিয়া দেয়, তাই কুমারেশ ভারতীকে একবার ডাকিবেন ভাবিতেছিলেন, কিন্তু তাহার আগেই ভারতী যেন কাহাকে দেখিতে পাইয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল।

কুমারেশ ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন ভারতী আনন্দের উচ্ছ্বাসে পিছন দিক হইতে শকুন্তলাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। শকুন্তলা কিন্তু তখনও ফিরিয়া ভারতীর এই আনন্দের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে নাই; ভারতী হয়তো একটু অপ্রতিভ হইয়াছে, কিন্তু নিরাশ হয় নাই।

ঘটনাটা দেখিয়া কুমারেশ তত খুশী হইতে পারিলেন না। ভারতীর এমন অন্তরঙ্গতার আহ্বানে শকুন্তলা কেনই বা এতক্ষণ সাড়া দিল না। শকুন্তলার মন ও রুচির সঙ্গে কুমারেশের যতটা পরিচয় আছে—অন্তত তাহার সম্বন্ধে কুমারেশ মনে মনে যতটা ধারণা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে বিনা কারণে শকুন্তলার এরূপ ব্যবহারের কথা নয়। শকুন্তলার বাহিরের রূপের সঙ্গে তাহার অন্তরের একটা অনিন্দ্যসুন্দর সামঞ্জস্য কুমারেশ মনে মনে কল্পনা করিয়া বসিয়াছেন, কোথাও কোনও ব্যবহারে তাহার একটু অসংগতি ঘটিলে কুমারেশের বিপর্যস্ত হইয়া যাইবারই কথা।

কুমারেশের চিন্তার ধারা বিপরীত মুখে বহিল। —আমরাই হয়তো তাকে এখানে ডেকে অন্যায় করেছি। মুহূর্তে কুমারেশ তার বিগত যৌবনের মনোভাব ফিরিয়া পাইলেন, তিনি বুঝিলেন আজ শকুন্তলাকে চাএ ডাকিয়া তাহার প্রতি শুধু অন্যায় নয়, নিষ্ঠুরতা করা হইয়াছে। যেখানে, যে ঘরে বসিয়া সোমেশের সঙ্গে সে আনন্দের দিনগুলি কাটাইয়াছে, যে ঘরে একদিন স্থায়ী আসন পাতিবে বলিয়া সে মনে মনে স্বপ্ন দেখিয়াছে, তাহাকে এমন করিয়া আজ সেখানে ডাকিয়া আনা ঠিক হয় নাই। সহসা কুমারেশের চোখে পড়িল বারান্দায় যেসকল ছবি টাঙানো আছে তার মাঝে একখানা সোমেশের মূর্তি, পাশে তার নব-পরিণীতা বিদেশিনী বধূ। ছবিতে তাহারা বিবাহের বেশে।

কুমারেশকে কে যেন কষাঘাত করিল। এত বড় একটা মারাত্মক ভুল তাহার কি করিয়া হইল। ইহার জন্য তিনি

শকুন্তলার ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন কি? শকুন্তলা না জানি কত ব্যথা পাইয়াছে। কুমারেশ কি করিবেন বুঝিতে না পারিয়া ডাকিলেন—ভারতী!

ভারতী কুমারেশের আহ্বানে শকুন্তলার আলিঙ্গন হইতে নিজের ক্ষুদ্র বাহু দুইটি শিথিল করিয়া তাহার দিকে চাহিল। সে কি না জানিয়া কোনও অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে!

—সাড়ে চারটে বেজে গেছে, দৌড়ে নীচে যা, দেবপ্রসাদকে চাএর সরঞ্জাম নিয়ে আসতে বল্।

ভারতীর একবার বলিতে ইচ্ছা হইল, 'সে কি দাদু, এখনই চা? আমরা তো রোজ বিকেল পাঁচটায় চা খাই—আর ইনি এলেন—একটু—' কিন্তু কুমারেশের মুখের দিকে চাহিয়া সে সাহস পাইল না। একটিও কথা না বলিয়া ভারতী ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

কুমারেশ শকুন্তলার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শকুন্তলা এতক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে। চোখ মুছিয়া কুমারেশের দিকে ফিরিয়া সে বলিল—আমি লজ্জিত, আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি।

চোখ তাহার রাঙা হইয়া রহিয়াছে। কুমারেশ তার হাত ধরিয়া বলিলেন—এস, দোষ তো আমারই, মাপ আমারই চাওয়া উচিত।

শকুন্তলা কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া হঠাৎ কুমারেশের পায়ে একটি প্রণাম করিয়া বলিল—কি যে বলেন আপনি। আপনি—আপনি ডাকলে কখনও না এসে থাকতে পারি আমি?

কথাটা শুনিয়া কুমারেশের অন্তরটা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কুমারেশের যৌবন কবে কোন্ যুগে ফুরাইয়া নিঃশেষ হইয়া গেছে। আর শকুন্তলার চোখের জল তখনও একেবারে শুকাইয়া যায় নাই।

(৫)

চাএর টেবিলে শকুন্তলার সামনে বসিয়া চা খাইতে খাইতে কুমারেশের মনে হইল এমন করিয়া চা খাওয়া তাঁর জীবনে ঘটে নাই—এত আনন্দ! আনন্দে যেন হৃদয় ব্যথিত হইয়া ওঠে। এত ক্ষুধাও বুঝি চাএর আসরে তাঁর কোনও দিন হয় নাই, ভীম নাগের সন্দেশের একটার জায়গায় তিনি তিনটা খাইয়া ফেলিয়াছেন হয়তো মনের অজ্ঞাতেই। আর এতক্ষণ ধরিয়া চাএর আসরে এক তাঁহার স্ত্রী মন্দাকিনী ছাড়া আর কেহ কখনও তাঁহাকে বসাইয়া রাখিতে পারে নাই।

শকুন্তলাকে তিনি তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়া লইয়াছেন। শকুন্তলার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ছাড়া সে চা খাইতে বসিয়া কেমন করিয়া কথা বলে, কি করিয়া পেয়ালা ধরে, ঠোঁট দুটি কতটুকু ফাঁক করিয়া কেকের ভগ্নাংশ মুখে পোরে, কুমারেশের চক্ষুতে কিছুই বাদ পড়ে নাই। কত দিন আগে শকুন্তলা নখ কাটিয়াছে, কতক্ষণ আগে জুতো ব্রাশ করিয়াছে, শাদা কাপড়ের সঙ্গে তাহার গায়ের রং কেমন সমঞ্জস হইয়াছে, কুমারেশ ইহার কিছুই দেখিতে ভুল করেন নাই।

চা খাইতে বসিয়া শকুন্তলার স্বাভাবিক স্থৈর্য ফিরিয়া আসিয়াছে, সুতরাং কুমারেশও পূর্বের সেই অপ্রীতিকর কথাটা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। কিন্তু গোল বাধিল স্যাণ্ডউইচ পরিবেষণ করিবার সময়। দেবপ্রসাদ এক প্লেট স্যাণ্ডউইচ আনিয়া চায়ের টেবিলে রাখিল। কুমারেশ চোখের ইশারায় শকুন্তলাকে দিতে বলায়—দেবপ্রসাদ তুলিয়া দিতে যাইতেছিল, শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল—কিসের?

—ডিমের।

—থাক।

ভারতী বলিয়া উঠিল—বা রে, খেতে হবে আপনাকে। নিশ্চয়। ডিমের স্যাণ্ডউইচ কি ফাইন লাগে!

কুমারেশ জিজ্ঞাসা করিলেন—ডিম খাও না তুমি?

—ছেড়ে দিয়েছি।

কুমারেশ বুঝিলেন, খাইত, ছাড়িয়া দিয়াছে। কবে ছাড়িয়াছে, কেন ছাড়িয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার আর প্রয়োজন হইল না। দেবপ্রসাদ কুমারেশকে একখানা দিতে আসিতেছিল, কুমারেশ হাতের ইশারায় নিষেধ করিলেন। ভারতী স্যাণ্ডউইচ বিশেষ পছন্দ করে, কিন্তু ইহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সেও উহা স্পর্শ করিতে সাহস করিল না।

প্রসঙ্গটা বদলাইবার জন্য কুমারেশ অন্য কথা পাড়িলেন। —তোমার ভাই কি আর এসেছিল?

স্যাণ্ডউইচ প্রত্যাখ্যান করায় যে ত্রুটি হইল, তাহা সংশোধন করিতে শকুন্তলা আর একখানা কেক্ ভাঙিয়া মুখে দিতে দিতে বলিল—হাঁ এসেছিল দুপুরে, খাওয়া-দাওয়া ক'রে চ'লে গেছে।

চাএর পেয়ালায় আর একটু চুমুক দিয়া কুমারেশ কহিলেন —ওর সব খরচপত্র কি তোমাকেই বহন করতে হয়?

মৃদু হাসিয়া শকুন্তলা বলিল—আমি ছাড়া ওর আর জগতে কেউ নেই।

হাসিটুকু কুমারেশ লক্ষ্য করিলেন। তাহার মনে হইল, শকুন্তলার জীবনের সোমেশ ঘটিত ট্র্যাজিডির সঙ্গে হয়তো ইহার সম্বন্ধ আছে।

—এখন তো তুমি নিজে রোজগার কর, তাই তার খরচ যোগাচ্ছ, কিন্তু এর আগে তুমি যখন পড়তে তখন?

—তখন ও স্কুলে পড়ত, খরচ কম ছিল, আমার টিউইসন আর স্কলারশিপের টাকা থেকে চ'লে যেত।

শুনিয়া কুমারেশের ভ্রু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সারা জীবন কি কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়া এই মেয়েটিকে চলিতে হইতেছে। অথচ তাহার দুঃখ-কষ্ট বুঝিবার লোক বুঝি আর দুনিয়ায় নাই। সোমেশ, সোমেশই দোষ করিয়াছে, মারাত্মক ভুল করিয়াছে সে। কুমারেশের মনে হইল, সোমেশের সাথে বিচ্ছেদের সকল কথা তিনি বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। সোমেশকে তিরস্কার করিয়া শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দিয়া কত কথা তাঁহার বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল; অথচ তাঁহার একটি কথাও তাঁহার বলিবার উপায় নাই। সমবেদনায় তাঁহার সমস্ত হৃদয়টাই যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল।

ভারতী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল; সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—কুন্তলাদি, আপনার ভাইকে নিয়ে এলেন না কেন? একদিন নিয়ে আসবেন বলুন।

ভারতীর এই সহজ আবদারের সুরে কুমারেশের ও শকুন্তলার দুইজনেরই মন একটু হালকা হইয়া উঠিল। কুমারেশ শকুন্তলার দিকে চাহিয়া বলিলেন—এক মজা দেখ, এই কয়দিন থেকে কাকাতুয়াটা তোমাকে কুন্তলা ব'লে ডাকছে. তোমাকে কুন্তলা ব'লে ডাকলেই বেশ হয়, না?

ভারতী বলিয়া উঠিল—আর নামের মানেটাও বেশ মিলে যায়, মাথায় যে চুল!

শকুন্তলা ভারতীর চিবুকে হাত দিয়া আদর করিল; —কুন্তলার মানেও তুমি জান?

কুমারেশ একটু গৌরব ও স্নেহযুক্ত দৃষ্টিতে ভারতীর দিকে চাহিলেন। শকুন্তলা বলিল—ডাকবেন আপনার যে নামে খুশি।

ভারতী বলিল—তা তো হ'ল, দাদুর কথার তো উত্তর মিলল, কিন্তু আমার কথার তো উত্তর দিলেন না!

শকুন্তলা জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল;—কি কথা।

—বা রে, এরই মধ্যে ভুলে গেলেন? আপনার ভাইকে নিয়ে আসবেন কবে বলুন!

শকুন্তলা মৃদু হাসিয়া বলিল—এই কথা?

—এই কথা! কথাটা বুঝি মনেই ধরল না?

এত অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীর এত ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া কুমারেশও মৃদু হাসিতে লাগিল। তোমার দিদির ভাইকে যদি নিতান্তই দেখতে ইচ্ছা করে, বেশ তো তুমিই একদিন যেয়ো না ছুটির দিনে।

শকুন্তলা বলিল—সেই তো বেশ হবে।

—সেই তো বেশ হবে! শুধু মুখে! যাবার কথা শুনে কুন্তলাদির প্রাণটা উড়ে গেছে।

কুমারেশ চোখের ইঙ্গিতে শাসন করিয়া বলিলেন—যিনি তোমার চেয়ে এত বড়, অমনি ক'রে তার নাম ধ'রে ডাকতে নেই; তুমি শুধু দিদি ব'লেই ডেক।

ভারতী নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। শকুন্তলা ভারতীর দিকে স্নেহদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—ছেলেমানুষ, অত বোঝে নি।

শকুন্তলার তখনকার ক্ষমাসুন্দর মূর্তি কুমারেশের চোখে অপূর্ব বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সোমেশ বড় ভুল করিয়াছে; ইহাকে যদি আমি ঘরে পাইতাম, আমার জীবনের শেষ দিনগুলি মধুর হইয়া উঠিত, মরণও বুঝি তখন কঠিন হইত না।

কুমারেশ শকুন্তলার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া এমনি কত-কি ভাবিতেছিলেন, শকুন্তলা তাঁহার দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। ভারতী লজ্জায় কথা বলিতেছে না। কুমারেশ সজাগ হইয়া প্রসঙ্গ বদলাইবার জন্য বলিলেন—তোমাকে কি আবার শিগগিরই ফিরে যেতে হবে?

—না, আমার আজ আর তেমন জরুরী কাজ নেই।

—কিছুক্ষণ থাকতে পারবে?

—হাঁ।

ভারতী তাহার দাদুর কানের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি কি বলিয়া আবার স্থির হইয়া বসিল। কুমারেশ শকুন্তলার দিকে চাহিয়া বলিলেন—ভারতী নিজে কয়েকটি ফুলের গাছ রুয়েছে, ওর ইচ্ছা তুমি সেগুলি দেখ।

শকুন্তলা হাত বাড়াইয়া ভারতীর চিবুক স্পর্শ করিয়া হাসিয়া বলিল—তাই নাকি! বেশ, বেশ।

কুমারেশ বলিলেন—ওর খেয়ালকে আর ওকে নিয়েই আমি এখনও বেঁচে আছি।

বৃদ্ধের এই অসহায়তার সুরটুকু শকুন্তলার অন্তর স্পর্শ করিল, সে একদৃষ্টে কুমারেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কুমারেশ বলিয়া চলিলেন—আর একটু বড় হ'লে ও হয়তো আমাকে আর তেমন গ্রাহ্য করবে না, কিন্তু তার আগেই হয়তো স'রে যেতে পারব। কুমারেশ একটি সিগার বাহির করিতে করিতে একটু হাসিলেন।

কাহার কথা মনে করিয়া সমস্ত জগতের স্নেহের প্রতি কুমারেশের এমন একটা অবিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছে, সে কথা ভাবিয়া শকুন্তলা মুহূর্তের জন্য নিজের দুঃখ ভুলিয়া গিয়া শুধু এই বৃদ্ধের দুঃখেই দুঃখ বোধ করিল। তাঁহার মনে হইল, এ জগতে বৃদ্ধের দুঃখ তরুণের বেদনার চেয়ে কি একটুও কম!

চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল, দেবপ্রসাদ টেবিল হইতে সরঞ্জাম সরাইতে আরম্ভ করিল। কুমারেশ চেয়ার হইতে উঠিতে উঠিতে বলিলেন—ও মানুষ হয়েছে, যাবার আগে শুধু এইটুকু সান্ত্বনা নিয়ে যেতে পারলেই আমার শান্তি। শকুন্তলার দিকে তাকাইয়া তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল তিনি বলেন, 'আমার বড় ইচ্ছা ছিল তোমার হাতে ওকে দিয়ে যাই, তুমি নিজের মত ক'রে মানুষ ক'রো ওকে; তোমার শিক্ষায় সাহচর্যে জীবনে তোমারই মত পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাক্ ও'. কিন্তু বলা আর হইল না, কেবল তিনি শকুন্তলার মুখের দিকে তাকাইয়াই রহিলেন।

শকুন্তলা তাঁহার মনের ভাব বুঝিল কি না, কে জানে, সে-ও কি এক রহস্যময় দৃষ্টিতে কুমারেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

(ক্রমশ)

রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস

(২৪৬ পৃষ্ঠার পর)

কবির বহুমুখ প্রতিভা বিচিত্র দিকে হাস্যরস ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এবং 'গোড়ায় গলদ'এর মত শব্দাড়ম্বরবর্জিত, গ্রাম্যতাদোষহীন রঙ্গপ্রধান প্রহসনের দৃষ্টান্ত সে যুগে খুব বেশী নেই। রঙ্গ আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে ফাঁকা হাসি। এর ভার যত কম, আওয়াজ তত বেশী। 'মুক্তির উপায়' গল্পটিতে হাস্যকর অবস্থার মধ্যে মুক্তিপ্রয়াসী সন্ন্যাসী ফকিরের দুর্গতির কথা পড়তে পড়তে আমাদের হাসি আর থামতে চায় না। রঙ্গচিত্রের মধ্যে অবশ্য শিল্পের সূক্ষ্মতা খুব থাকে না। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি পরিচিত বিষয়বস্তু নিয়ে নিরীহ, তীক্ষ্ণ অথচ নির্দোষ ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে রবীন্দ্রনাথ সুদক্ষ। 'রাজটীকার' সাহেব এবং শ্যালী দুপক্ষের কাছে নবেন্দুর লাঞ্ছনার ছবিটিতে আমাদের দেশে ইংরেজ সমাজের প্রসাদপ্রার্থী মানুষগুলির মনোবৃত্তিকে কবি অপরূপভাবে বিদ্রূপ করেছেন। 'চিরকুমার সভায়' চিরকুমারদের ক্রমশ শিথিল প্রতিজ্ঞাকে শ্লেষ করে হাস্যরসের যে অফুরন্ত উৎস সৃষ্টি করেছেন বাঙলা সাহিত্যে তার আসন অবিনশ্বর। সময়ে সময়ে তাঁর ব্যঙ্গ প্রখর হয়ে উঠেছে কিন্তু তার ফলে চিত্রের অনবদ্য রস কোথাও ব্যাহত হয় নি। 'একটা আষাঢ়ে গল্প'তে তিনি আমাদের সমাজের প্রাচীনপন্থীদের নিয়ে তীক্ষ্ণ কৌতুক করেছেন। এই ক্ষুদ্র পুরাতন গল্পতে মনে হয়, কবি তাঁর অর্বাচীন সাহিত্য বিচারকদের প্রতি যে কটাক্ষ করেছেন তা নির্মম। 'গিন্নী' গল্পে শিবনাথ পণ্ডিতের বর্ণনাও অতি তীক্ষ্ণ।—"প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় যাহাদের হুল আছে তাহাদের দাঁত নাই—আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের দুই একত্র ছিল। এদিক কিল চড়চাপড় চারাগাছের বাগানের উপর শিলাবৃষ্টির মত অজস্র বর্ষিত হইত, ওদিকে তীব্র বাক্যজ্বালায় প্রাণ বাহির করিয়া যাইত। ইনি আক্ষেপ করিতেন, পুরাকালের মত গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ এখন আর নাই; ছাত্রেরা গুরুকে আর দেবতার মত ভক্তি করে না। এই বলিয়া আপনার উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মস্তকে সবেগে নিক্ষেপ করিতেন এবং মাঝে মাঝে হুংকার দিয়া উঠিতেন।" "Christ Hospital"এ স্কুল মাস্টার বয়ার ইংরেজ হাস্যশিল্পী চার্লস ল্যামের কাছে যতটুকু বা দরদ পেয়েছে, কবির কাছে শিবনাথ পণ্ডিত ততটুকু দরদ তো দূরের কথা তার এক কণাও পায় নি। কিন্তু ব্যঙ্গের তীব্রতা সত্ত্বেও রসের স্পর্শে রচনাগুলি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য হয়েছে।

আমাদের সমাজে মানুষের উদ্‌ভ্রান্তি ও অবুদ্ধিকে ভিত্তি করে যে বেদনাময় হাসির মালমসলা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেদিকেও আকৃষ্ট হয়েছে। স্বর্ণ মৃগের মায়ামরীচিকায় আত্মহারা মোক্ষদা ও বৈদ্যনাথের দুর্বলতা দেখে যেমন আমরা হাসি তাদের শেষ পরিণতিতে তেমনি চোখের জল রোধ করে রাখতে পারি না। নয়নজোড়ের বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্র যখন 'পূর্বগৌরবের ফেল করা ব্যাঙ্কের উপর দেদার লম্বাচওড়া চেক' চালান তখন না হেসে থাকা যায় না। কিন্তু সেই হাসির মধ্যে ব্যঙ্গের জ্বালা নেই। বংশাভিমানী মানুষের নিরীহ দুর্বলতা নিয়ে শিল্পী রূপায়িত করেছেন অনবদ্য হিউমার। 'ফেল' গল্পে নন্দের সঙ্গে আজন্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাতর নলিনের যে দুর্বলতা ছিল তা নিয়ে কবি জাগিয়ে তুলেছেন হাসির উৎস। কিন্তু সেই হাসির মধ্যে নিছক হাসিই নেই। দুর্বল মানুষের মনে নিয়ত রয়েছে পাওয়ার অতৃপ্তি এবং না পাওয়ার অশান্তি। এই অসংগতিকে শিল্পী নিরাসক্তের মত ব্যঙ্গ করতে পারেন নি, দরদ দিয়ে তার ছবি এঁকেছেন। আর বাঙলা প্রহসনের ক্ষেত্রে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র বৈকুণ্ঠ তো তার বিরাট সাফল্য ও বিপুল দুর্বলতা, তার উদ্‌ভ্রান্তি ও বেদনা নিয়ে চিরকাল হাসি ও অশ্রুর স্বতস্ফূর্ত উৎস হয়ে থাকবে।

হাস্যশিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের একটি বৈশিষ্ট্য অনেকেরই চোখে পড়ে না। হাসির ছন্দে গভীর বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলা শিল্প প্রতিভার অসামান্যতার চিহ্ন। 'ক্ষণিকা' এবং 'শেষের কবিতায়' রবীন্দ্রনাথ কৌতুকময়, আপাতলঘু প্রকাশরীতির সাহায্যে গভীর বিষয়কে রূপায়িত করে তুলেছেন। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসখানির প্রথম দিকটা পড়তে পড়তে পাঠক তো ঠিক করতে পারে না, এটা উপন্যাস না ব্যঙ্গ চিত্র। ক্রমশ অমিত ও লাবণ্যের আনন্দ এবং বেদনাকে কেন্দ্র করে গল্প যখন গভীর রসে ঘন হয়ে ওঠে তখনও লিখনরীতির মধ্যে অপ্রত্যক্ষ ভাবে হাসির প্রভাব স্পষ্ট বোঝা যায়। শেষ পর্যন্ত অনেকেরই ধারণা থাকে, বইখানায় লেখকের মূল উদ্দেশ্য বাঙলার আধুনিক যুগের অতি প্রগতিপন্থী নরনারীকে ব্যঙ্গ করা। মনে হয় এ ধারণা ভুল। বইখানির বিষয়বস্তু হচ্ছে অমিত ও লাবণ্যের করুণ প্রেমকাহিনী। সেই প্রেমকাহিনীকে শিল্পে রূপায়িত করাই লেখকের মূল লক্ষ্য। যাঁরা ভাবেন অমিত একটা হাসির চরিত্র মাত্র, তাঁরা অমিতকে বুঝতে পারেন না, অমিতের সৃষ্টিকর্তাকেও না। প্রেম দয়া আত্মত্যাগ, জীবনের সবকিছুকে মূলত কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখেন এমন শিল্পীর পরিচয় বিশ্বসাহিত্যে আছে। মনে হয়, ফরাসী আনাতোল ফ্রান্সের এই বৈশিষ্ট্য ছিল। জীবনের প্রতি যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী সিনিকের মত, তাঁদের সকলেরই এই বৈশিষ্ট্য। 'শেষের কবিতা'র লেখক এই শ্রেণীর নন। প্রেমের ব্যর্থতার মধ্যেও যিনি জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান, তাঁকে সিনিক বলা যায় না। উপন্যাসটির ভিতর এই কৌতুক প্রবণতার মূল হচ্ছে লেখকের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে, তাঁর জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে নয়।

রবীন্দ্র সাহিত্য বিশ্লেষণ করে পড়লে মনে হয় তাঁর হাস্যরসের সব চেয়ে স্ফুরণ হয়েছে উইটে। দেখা যায়, তাঁর উপন্যাস, গল্প বা নাটকগুলিতে এমন কি 'পঞ্চভূতে'র মত প্রবন্ধের বই এতেও একটানা গভীর প্রকৃতির বিষয়বস্তুর মধ্যে বারবার অকস্মাৎ হাসির পুলক উৎসারিত হয়ে উঠেছে উইটের স্পর্শে। তাঁর মনের ধরন প্রধানত বুদ্ধিপ্রবণ। বিরাট তাঁর আধার। সেই আধারের অনুপাতে সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁর হৃদয়াবেগ প্রবল এবং গভীর হতে পারে কিন্তু তাঁর বুদ্ধি আরও প্রখর। বুদ্ধিপ্রধান লেখকেরা জীবনের অসংগতিকে রূপায়িত করেন প্রধানত উইটএর সাহায্যে। রবীন্দ্রসাহিত্যে উইটের প্রাচুর্য দেখা যায় কেন তার প্রধান কারণ হয়তো এইখানে। কিন্তু যে কারণেই তিনি সংসারের নানা অসংগতির অনুভূতিকে উইটের সাহায্যে প্রকাশ করে থাকুন, এ কথা সত্যি যে তাঁর হাতে উইট অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে। 'চিরকুমার সভা'র মত দীর্ঘ একখানা উপন্যাসে ঘটনাবাহুল্যহীন গল্পবস্তুর মধ্যে আগাগোড়া তিনি পাঠকদের মনোযোগ নিবিড় ভাবে আকৃষ্ট করে রাখেন একমাত্র উইটএর চমৎকারিত্বে। বইখানা পড়তে পড়তে এক জাতীয় হাস্যরসের নিরন্তর প্রবাহে আমরা মোটেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠি না। অবশ্য তাঁর উইটএ সব চেয়ে বেশী আমরা মুগ্ধ হই তখন যখন তাঁর উপন্যাস, গল্প বা প্রবন্ধ পড়তে পড়তে অকস্মাৎ তাঁর উইট ঝলকে উঠে আমাদের চমক লাগিয়ে দেয়। এ যেন নদীর উজান স্রোতে যেতে যেতে তীরের ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ অরুণ আলোর রেখা এসে ঢেউএর মাথায় মাথায় ঝকমক করে ওঠা।

ব্রেন

(গল্প)

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

গ্রীষ্মের রাত্রি। পাটি পাতিয়া শুইয়া আছি। মাঝে মাঝে গৃহিণীর পুরাতন রং-চটা নীলাম্বরী শাড়ির অংশ দিয়া তৈরী জানালায় লম্বমান পর্দাখানি বাতাসের ঢেউ-এ নড়িয়া চড়িয়া একটুখানি হাওয়ার পরশ দিয়া যাইতেছে। পাশেই মাটিতে বিস্তৃত শয্যায় রানী, মেনকা, ফুলী, সুরো ও দেবযানী—আমার পঞ্চ কন্যা নিদ্রাভিভূতা।

মেয়েদের মরনিং স্কুল; তাই তাহাদের জন্য কিছু প্রাতঃকালীন জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে গৃহিণী ব্যস্ত। মাঝে মাঝে বাসনের ঠুন ঠান আওয়াজ ও গৃহিণীর কণ্ঠের গুনগুন সুর শোনা যাইতেছে। সমস্ত দিনের খাটুনির পর রাত্রে শুইবার আগে সংসারের ছোটখাটো টুকি-টাকি কাজগুলো সারিতে সারিতে গৃহিণীর কণ্ঠ গুনগুন করিয়া সুর ভাঁজিতে থাকে। সমস্ত দিন সংসারের কাজে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রাত্রে শুইবার পূর্বের মুহূর্তটিতে যেন সে অত্যন্ত সহজ ও ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

মাত্র এক শত পঁচিশটি টাকা মাহিনা পাই। কত কষ্টে যে দিন চলে তা আমিই জানি। ইহার মধ্য হইতেই কিছু কিছু করিয়া বাঁচাইয়া গৃহিণী সেভিংস ব্যাঙ্কে কিছু জমাইয়াছে, কারণ বড় মেয়েটি তের ছাড়াইয়া এই চৌদ্দয় পড়িল। সদর দরজায় কড়া নাড়িবার শব্দ হইল—খট খট খট। এত রাত্রে কে আবার কড়া নাড়ে? কান পাতিয়া রহিলাম। আবার খট খট করিয়া শব্দ হইল। পাশের ঘর হইতে গৃহিণীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—ওগো শুনছ? দেখ তো সদরে কে যেন কড়া নাড়ছে!

নাঃ জ্বালালে!

শয্যা হইতে উঠিলাম। দরজা খুলিয়া দেখি রাস্তার উপর এক মাল বোঝাই ট্যাক্সি, আর হ্যাট কোট ধারী এক ভদ্রলোক আমার দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া।

—কাকে চান।

—এটাই কি ২১।২ গণেন মিত্রের লেন?—I mean এটাই কি শিশিরবাবুর বাড়ি?

—হাঁ আমারই নাম শিশির চৌধুরী।

—কে, শিশির? আমায় চিনতে পারছিস না? আমি সুধীর।

—কে বড়কাকা?

—হাঁ।

তাড়াতাড়ি নত হইয়া পায়ের ধুলো লইলাম।

—কতকাল পরে? পনের, হাঁ; সেই পনের বছর আগে এক রাত্রে কাউকে না বলে এক কাপড়ে রেঙ্গুন চলে যাই। সেবারেই তো তোর বিয়ে হল।

—আজ্ঞে! আমি তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া গৃহিণীকে ডাকিয়া আনিলাম; বড়কাকা এসেছেন এস।

কনক আসিয়া পায়ের ধুলো লইল।

—ভাল আছ তো মা?

—হাঁ!

—চলে এলাম মা!......বুড়ো বয়েসে বিদেশে আর মন টিকল না। আশি হাজার টাকার কাঠের ব্যবসা ঝুনঝুনি আগরওয়ালার কাছে বিক্রি করে দিয়ে এলাম; কার জন্যই বা বিদেশে পড়ে থাকি। তুমি শিশির, তোমরাই তো আমার সব। ভেবেছি কলকাতারই কোনও অঞ্চলে জায়গা কিনে একখানা বাড়ি করে তোমাদের নিয়ে এ জীবনের বাকী দিন-কটা কাটিয়ে যাব।

রাস্তা হইতে ড্রাইভারের গলা শোনা গেল। বাবুসাব, জলদি চিজ উতার লিজিয়ে।

বাড়িতে চাকর বাকরের মধ্যে এক ঠিকা ঝি, তা সে সন্ধ্যার আগেই কাজ সারিয়া বাসায় চলিয়া যায়। নিজেই আগাইয়া গেলাম।

—ওকি তুমি কেন বাবা! চাকরদের ডেকে দাও।

—চাকর তো নেই কাকা।

—নেই? তবে কাজটাজ করে কে?

—আজ্ঞে একটা ঠিকে ঝি আছে। সে—

—ও, তবু দেখ আমাদের বাঙলা দেশের ছেলেদের মেনটালিটি। এখানে ডেজ আফ্‌টর ডেজ রট করবে তথাপি বিদেশের দিকে পা বাড়াবে না। দেখ তো তুমি আমার চাইতে কত বেশী পড়েছ; বাট্ আই ওনলি অ্যান আনডার ম্যাট্রিক। বুঝলে বাবা, চাই ব্রেন! একটুখানি বুদ্ধির মার প্যাঁচ, তা হলেই দেখবে হু হু করে টাকা তোমার হাতের গোড়ায় এসে জড়ো হচ্ছে।

যাই হোক ড্রাইভারের সহিত ধরাধরি করিয়া মালপত্র নামানো হইল গোটা তিন চামড়ার সুটকেস—একটা বেডিং, দুটো স্টীল ট্রাঙ্ক।

—কত ভাড়া উঠেছে?

—দু টাকা। ড্রাইভার কহিল। ফস করিয়া প্যান্টের পকেটে হাত চালাইয়া একটা এক শত টাকার নোট বাহির করিয়া কাকা বলিয়া উঠিলেন—চেঞ্জ? তাই তো, শিশির খুচরো টাকা আছে নাকি? সেই দিনই বিকালে মাহিনা পাইয়াছি; এগারখানি দশ টাকার নোট ও খুচরা পনেরটা টাকা দেরাজের টানায় রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি গিয়া টাকা বাহির করিয়া আনিয়া দিলাম। ড্রাইভার টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

হাঁড়িতে ভাত ছিল না, কনক তাড়াতাড়ি স্টোভ জ্বালাইয়া কাকার জন্য লুচি ভাজিতে বসিল। কাকা হাত মুখ ধুইয়া ইজিচেয়ারটার উপর আসিয়া বসিলেন।

—তারপর কি করছ?

—মারচেণ্ট অফিসে চাকরি করি।

—কত মাইনে দেয়?

—একশ পঁচিশ।

—দরকার নেই আর ওসব উঞ্ছবৃত্তিতে, কালই রিজাইন দিয়ে আসবে। যা টাকা করে এনেছি দুটো পুরুষ হেসেখেলে কাটিয়ে দিতে পারবে। তবে ডোণ্ট বি এক্সট্রা-ভ্যাগাণ্ট মাই বয়, আর একটু ব্রেন প্লে করাবে।

কাকা একটা চুরুট ধরাইয়া তাহাতে ঘন ঘন টান দিতে লাগিলেন।

—আর এই ডানজেন্, এ তো সেকেণ্ড ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডির যোগাড়! কালই একটা ভাল কোআর্টারে বাড়ি দেখবে। বউমার শরীরেও দেখছি একেবারে কিছু নেই! তোর কি হয়েছিল বল্ তো কাকাকে একটিবার জানাতে? কি হয়েছিল?

কি আর জবাব দিব, চুপ করিয়া রহিলাম।

দক্ষিণের দিকে অর্থাৎ রাস্তার পরেই যে আলো বাতাস যুক্ত বড় ঘরখানা সেটাতেই সকলে শুইতাম। সকলকে ঘুম হইতে তুলিয়া কনক সেই ঘরেই কাকার বিছানা করিয়া দিল। বাড়িতে মাত্র তিনখানি তো ঘর; একটা শোয়া বসার ও বাহিরের ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়, অন্যটা ভাঁড়ার ও অন্য নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। বাকীটায় হয় রান্না।

শুইবার আগে কাকা কহিলেন—ওই স্টীল ট্রাঙ্কটায় হাজার চল্লিশেক টাকার নোট আছে, কালই ওটার যা হয় একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

শুইতে সে রাত্রে প্রায় সাড়ে বারটা বাজিয়া গেল।

বন্ধ ঘরের গুমট গরমে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া ওঠে। মাঝে মাঝে এক-আধটা আরসোলা ফড়ফড় করিয়া পাখনা মেলিয়া গায়ের উপর উড়িয়া পড়ে।

কনক কহিল—এই বুঝি তোমার সেই কাকা, যিনি বিয়ের বছর পালিয়ে যান?

—হাঁ! সত্যি লোকটা brainy। কি অসাধ্য সাধনই না করলে, বল দেখি! এক কাপড়ে কপর্দকহীন অবস্থায় বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে—উঃ বাড়িটায় কি গরম! ভদ্রলোকে টিকতে পারে না।

কনক কহিল,—হ্যাঁ, আর কি, ভগবান যখন মুখ তুলে চাইলেনই!

বিবাহিত পনের বছরের জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনী কতই হইল।

হঠাৎ এক সময় গৃহিণী কহিল, আচ্ছা, বোসেদের ছেলেটির সঙ্গে আমাদের রানুর জন্য একটিবার কথা পেড়ে দেখলে হয় না? এখন তো আর টাকার অভাব হবে না?

মনে পড়িল কত দুঃখের মেয়ে আমার ওই রানু বা বাবলি। বিবাহের পাঁচ মাস পরেই কনক যখন অন্তঃসত্ত্বা হইল, কী সংকোচ, কী গভীর বেদনা! ভাবিয়াছিলাম পুত্র হইবে কিন্তু হইল মেয়ে। জন্মের প্রথম মুহূর্তটি হইতেই সে চিরটা কাল অনাদরই কুড়াইয়া আসিয়াছে। একটি দিনের জন্য ভাল করিয়া তাহার সহিত কথা কহি নাই!

রাস্তার গ্যাসপোস্টের আলোর খানিকটা জানালা দিয়া আসিয়া রানুর ঘুমন্ত মুখখানির উপর পড়িয়াছে। সস্নেহে নিঃশব্দে একখানি হাত রানুর কপালে রাখিলাম।

কাকা কহিলেন—ব্যাবসা করবে তা কর, কিন্তু ব্যাবসাতে ব্রেনকে একটু প্লে করানো দরকার বাবা। তা কিসের ব্যবসা করবে স্থির করলে?

—ভাবছি রেঙ্গুন গিয়ে কাঠের ব্যাবসাই করব। আপনি না হয় সেই আগরওয়ালা না কি তার কাছে একটা চিঠি—ইনট্রোডাকশন লেটার—দিয়ে দিন।

—বেশ, বেশ!

যথাসময়ে চিঠি লইয়া রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বিদায় মুহূর্তে কনক কাঁদিতেছিল; কহিলাম—কাঁদ কেন মণি? কত হাজার হাজার টাকা নিয়ে ফিরে আসব। তার পর, সে সুখের দিনে কেউ তো আমরা কাউকে ছেড়ে দূরে থাকব না।

যথাসময়ে রেঙ্গুনে গিয়া ব্যবসা ফাঁদিলাম, জলের মত টাকা আসিতে লাগিল ঝন ঝন ঝন—

ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। রানুর হাত হইতে কাচের গ্লাসটা মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ঠিক এমন সময় বাহির দুয়ারে সজোরে কড়া নাড়িবার শব্দ হইল—খটখট খটাখট। বোধ হয় ঝি আসিয়াছে, কনক দরজা খুলিতে গেল। কিন্তু সহসা যেন ভূত দেখার মত চমকাইয়া পিছু হটিয়া আসিল।

শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িলাম।—কি, কি হ'ল?

গৃহিণী একটি কথারও জবাব না দিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া আমার মুখে দিকে তাকাইয়া রইল। খোলা দরজা দিয়া ওদিককার ঘরের দিকে চোখ পড়িতেই কাঠ হইয়া গেলাম। দুইজন লাল পাগড়িধারী ও একজন পুলিস অফিসার ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া। সমগ্র ঘরটাই জিনিসপত্রে তছনছ করা। বাক্সগুলি সব খোলা, ডালা ভাঙ্গা!

—এদিকে আসুন মশাই!

আচ্ছন্নের মতই আগাইয়া গেলাম।

—সুধীর চৌধুরী আপনার কেউ হন?

—আজ্ঞে।

—বলছিলাম আপনার কোনও আত্মীয়?

—আজ্ঞে, আমার কাকা। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন ঘুলাইয়া আসে। এখনও ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি? চোখদুটি বেশ করিয়া রগড়াইয়া লইলাম।

—ভদ্রলোক পরশু রেঙ্গুন থেকে ফিরে হোটেল প্যালেসে ওঠেন। পাশের রুম থেকে এক বাঙালী মারচেণ্টের হাজার দুই টাকা সমেত এক স্টীল ট্রাঙ্ক সুটকেস প্রভৃতি কাল সন্ধ্যার দিকে চুরি ক'রে এক ট্যাক্সি ক'রে এখানে চ'লে আসে। বুদ্ধিমান লোক নিজের ঘরে নিজের খালি শূন্য বাক্সগুলো তালাবন্ধ ক'রে এসেছে, পাছে কেউ সন্দেহ করে। হোটেলের চাকর বাকরদের ব'লে আসে পার্ক সার্কাসে কে এক তার বোন আছে তার ওখানে কয়েকটা বাক্স রেখে আসতে যাচ্ছে, কেননা কালই আবার তাঁকে বিজিনেসের ব্যাপারে বম্বে যেতে হবে। যাদের বাক্স চুরি গেছে থানায় তারা এজাহার দিয়েছে—নগদ টাকা ও জিনিস নিয়ে প্রায় সাত আট হাজার টাকা তাদের খোয়া গেছে।

চকিতে ঘরের কোণে রক্ষিত দেরাজের দিকে তাকাইলাম। —সব কয়টি টানাই খোলা হাঁ হাঁ করিতেছে। গত দিনের পাওয়া মাইনের সব ক'টি টাকা, স্ত্রীর গায়ের গহনা, দামী রিস্টওআচটা নাই, কিছুই নাই!

—আপনাকেও হালকা ক'রে গেছে তো?

(শেষাংশ ২৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মার্কিন ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়কদ্বয়

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা

বর্তমান যুগের দুজন শক্তিশালী এবং চিন্তাশীল মানুষের কথা নিয়ে সারা পৃথিবীর বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ তর্কবিতর্ক হয়। এ দুজন মানুষই এক একটা বিরাট দেশ নিয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছেন। এঁরা দুজনেই এঁদের স্বদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়। এঁদের একজন হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং আর একজন হচ্ছেন সোভিয়েট

মঃ ষ্ট্যালিন

যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়ক ষ্ট্যালিন। এই দুজন মানুষের সম্বন্ধে সারা ইউরোপ এক উৎসুক দৃষ্টি মেলে থাকে। দেশের মধ্যে এঁরা দুজনে যে দুঃসাহসিক কাজ ক'রে চলেছেন, সেই কাজই এঁদের দেশের বাইরে কোটি কোটি লোককে এঁদের প্রতি আকৃষ্ট ক'রে তুলেছে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট দু-দু-বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে নির্বাচন আসন্ন হ'য়ে পড়েছে, তাতেও তাঁর নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যে পার্টির লোক, সে পার্টির নাম হচ্ছে 'ডিমক্র্যাটিক পার্টি।" এই পার্টি আমেরিকার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পার্টি বললেও অত্যুক্তি হয় না। তা ছাড়া রুজভেল্টের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব একটা বিস্ময়কর ব্যাপার।

সকলেই জানে আমেরিকা ধনকুবেরের দেশ। আমেরিকা ধনকুবেরের দেশ ব'লেই সেখানে ধনকুবেরদেরই সুবিধা সবচেয়ে বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এত বেশী ব্যক্তিগত স্বত্বাবিশিষ্ট ব্যবসা আছে যে, যার দরুন সেখানে রাষ্ট্রকে এক দিক দিয়ে যেমন তার উপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে হয়, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রকে টিঁকে থাকবার জন্য এইসব ব্যক্তিগত স্বত্বাবিশিষ্ট ব্যবসায়ী অর্থাৎ যে ধনিকশ্রেণী, তাদেরই সাহায্য নিতে হয়। এ সাহায্য নেওয়ার পিছনে যে কারণ তা সহজেই বোঝা যায়। 'State is the executive Committee of the Capitalist Class,' এই কথাটাই এখানে প্রযোজ্য।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে মজা হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিগত স্বত্বাবিশিষ্ট ব্যবসায়ীর দল রাষ্ট্রকে চোখ রাঙিয়ে নিজেদের কাজ হাঁসিল ক'রে নেয় অদ্ভুতভাবে। 'Anarchy in production' অর্থাৎ উৎপাদনে অরাজকতা, এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শুধু শিল্পেই নয়, কৃষিজাত দ্রব্যেও এই অরাজকতা দেখতে পাওয়া যায়। আমেরিকায় গম পোড়ানোর ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরাই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। ব্যক্তিগত স্বত্বাবিশিষ্ট ব্যবসায়ীর দল, তারা উৎপাদন বেশী হ'লে কি হয় না হয় তা ভাবে না; তারা শুধু বোঝে মুনাফা। সেই মুনাফার আশায় দিনের পর দিন তারা উৎপাদন বাড়িয়েই চলে। রাষ্ট্রের কিছু বলবার উপায় নেই, কারণ তা হ'লে নূতন রাষ্ট্রপতি হ'তে বেশীক্ষণ দেরি লাগবে না। অথচ খেয়াল মত উৎপাদনের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে উৎপাদন-কারী শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান কমে যেতে বাধ্য, তাতে বেকার সমস্যা দেখা দেয় এবং সংগে সংগে রাষ্ট্রকে বাজার খোঁজার জন্য aggressive ক'রে তোলে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টই সর্বপ্রথম সমস্ত মার্কিন মুলুকের ব্যক্তিগত স্বত্বাবিশিষ্ট ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। তিনি তাঁর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দিয়ে সারা মার্কিন মুলুককে ঢেলে সাজবার বন্দোবস্ত করলেন। জাতির প্রয়োজনের উপর ভিত্তি ক'রে নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (planned economy) দ্বারা তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত বিরাট বৈষম্যকে বিদূরিত করবার চেষ্টা করলেন। তাঁর এই পরিকল্পনার নাম হচ্ছে নিউ ডীল (New deal)। নিউ ডীল প্রচারিত হবার পর থেকে সমস্ত মার্কিন মুলুকে এবং সারা ইউরোপ বিস্ময়ে চমকে উঠল। কমিউনিস্ট প্রতিবাদ প্রচারিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে আমেরিকান ডিমক্র্যাসির প্রতি লোকের একটা মোহ ছিল। সেই ডিমক্র্যাসির দেশে যা কিছু হয়, তা-ই একটা লক্ষ্য করবার বিষয়। দিনের পর দিন তারই জের চ'লে আসছিল। এ ক্ষেত্রে নিউ ডীল সত্যিই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হয়ে দেখা দিল। নিউ ডীল পরিকল্পনা অনুযায়ী সারা মার্কিন মুলুকে একটা পুনর্গঠিত সংঘশক্তির বিকাশ হ'তে লাগল। নূতন নূতন অফিস তৈরী হ'ল, বহু স্টেট রেগুলেশন সমিতি গঠিত হ'ল, বহুদিনের প্রয়োজনানুযায়ী সিভিল সার্ভিসেরও ব্যবস্থা করা হ'ল। তার পর planned economyর ব্যবস্থা তো আছেই।

সমস্ত ইউরোপ তাদের আভিজাত্যের সিংহাসন হ'তে দেখল রুজভেল্টের দুঃসাহস। ভয়ও পেল তারা। রুজভেল্ট কি তবে সোস্যালিস্ট হয়ে গেলেন? বাস্তবিকই যেখানে ধনতান্ত্রিক রীতিনীতির উপর ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্র-গুলির ভিত্তি সেখান থেকে রুজভেল্টকে দেখলে এই কথাই মনে হয়, রুজভেল্ট ইউরোপীয় বিশ্বাসের মূলে সদর্পে কুঠারাঘাত করেছেন। ব্যক্তিগত স্বত্বাবিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের চোখ রাঙিয়ে রাষ্ট্র উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করল, সারা দেশ জুড়ে এই ব্যবস্থাকে চালু করবার জন্য ব্যাপকভাবে পুনর্গঠন শুরু করল, এ কি সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি না হয়ে যায়! H. G. Wells-এর মত অতিবড় individualistও রুজভেল্টের এই নিউ ডীল পরিকল্পনাকে প্রশংসা না ক'রে পারেন নি। তিনি বললেন,

"The effect of the ideas of Roosevelt's 'new deal' is most powerful, and in my opinion they are socialist ideas."

এবার ষ্ট্যালিনের কথায় আসা যাক।

রাশিয়া এমন একটা দেশ যে দেশে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রচলিত পদ্ধতি ও বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়ে তার উপরে নূতন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে তোলা হয়েছে। পৃথিবীর দুটি জাতির মধ্যে সেখানে সর্বত্র একটি জাতির আধিপত্য চলেছে, রাশিয়ায় তাদের আধিপত্য নেই—রাশিয়ায় যাদের আধিপত্য তারা হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অস্পৃশ্য জাতি। তা ছাড়া যে পার্টির হাতে ওখানকার রাষ্ট্রক্ষমতা সেই পার্টি ঐ অস্পৃশ্যদেরই রাজনৈতিক পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টি। স্ট্যালিন হচ্ছেন এই পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি। লেনিনের পর রাশিয়ায় এতখানি জনপ্রিয় মানুষ আর কেউ নেই।

রাশিয়ায় সর্বহারা শ্রেণীর হাতে শাসনব্যবস্থা আছে ব'লে অন্যান্য দেশের সমাজব্যবস্থা দেখে রাশিয়াকে বোঝা যাবে না। জার-শাসিত রাশিয়ার কথা জানলেও বর্তমান রাশিয়াকে জানা যায় না। অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে রাশিয়া গেছে সম্পূর্ণ বদ্‌লে। বর্তমান রাশিয়ার ব্যক্তিগত স্বত্ববিশিষ্ট কোনও ব্যবসা নেই, কৃষকদের ব্যক্তিগত কৃষিক্ষেত্র নেই, শ্রমিকদের সেখানে শিল্পপতিদের কাছে শ্রমশক্তি বিক্রয় ক'রে আস্‌তে হয় না, সেখানে বেকার সমস্যা নেই। ব্যাঙ্ক, জমি, রেল, খনি, কলকারখানা ও সমস্ত বৃহৎ শিল্প সেখানে জাতীয় সম্পত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি (private property) প্রথা সোভিয়েট মুলুকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত। যে planned economyর কথা পূর্বে বলা হয়েছে, জাতির প্রয়োজনের উপর ভিত্তি ক'রে সেই planned economy অনুযায়ী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সকল রকম ব্যবস্থা হয়। অন্যদিকে যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার উচ্ছেদ করা হয়েছে তেমনি তার বদলে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাপকভাবে সংঘক্রিয়াবাদ (Collectivism) গ'ড়ে তোলা হয়েছে। ইউরোপ মুলুকে এই সংঘক্রিয়াবাদকে বিশেষ ভাল চোখে দেখা হয় না, কারণ ব্যক্তিগত ভাবে চিন্তা করতে তাঁরা অভ্যস্ত—সংঘক্রিয়াবাদকে তাই তাঁরা সম্পূর্ণ উলটো মনে করেন। অথচ এই সংঘক্রিয়াবাদ যে কি জিনিস সে সম্বন্ধে স্ট্যালিন বলেন,—

"There should be no such contrast, because Collectivism, Socialism does not deny, but combines individual interests with the interests of the collective. Socialism cannot abstract itself from individual interests. Socialist society alone can most fully satisfy these personal interests. More than that, socialist society alone can firmly safeguard the interests of the individual. In this sense there is no irreconcilable contrast between individualism and socialism."

তবুও ইউরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার এই বিরোধ কেন? এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে ধনতান্ত্রিক রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত মুনফা করার মনোবৃত্তি নিয়ে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গ'ড়ে ওঠে সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই ইউরোপীয় জীবনের একমাত্র উপাস্য। যাই হ'ক, রাশিয়ার সংঘক্রিয়াবাদ অভিনব ব'লেই, সেখানকার কৃষিকার্য অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক উন্নত এবং সমবেত চেষ্টার ফলে অল্প পরিশ্রমে অদ্ভুত ফলও পাওয়া যায়। কারখানায়, বৃহৎ শ্রমশিল্পে এই সংঘক্রিয়াবাদ বিরাট এক এক দল দক্ষ শ্রমিক (skilled labourer) গ'ড়ে তোলে। এতে করে সারা দেশই কৃষি ও শিল্পে উন্নত হয়ে উঠেছে। তাই এই কয়েক বছরের মধ্যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের এই উন্নতি দেখে সারা জগত বিস্ময় প্রকাশ করে।

অতি দ্রুত ঐ সমস্ত কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্যই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তা ম্যাজিকের মত সফল হয়েছে। এজন্য যাঁকে প্রশংসা করা যেতে পারে তিনি হচ্ছেন স্ট্যালিন। এই দূরদর্শী মানুষটি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশকে তাড়াতাড়ি তৈরী করে না ফেললে বিপদে পড়তে হবে। তাই একদিকে, যেসব লোক এই পরিকল্পনার বিরোধী, তাঁদের বিরুদ্ধে স্ট্যালিন সংগ্রাম করেছেন, আর একদিকে দেশকে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য যে সংঘক্রিয়াবাদ, তা একদিনে গ'ড়ে ওঠেনি এবং এত শীঘ্রও গ'ড়ে ওঠবার নয়। রাশিয়ার বিরাট কৃষককুল এবং কুলাক শ্রেণীর জমির উপর যে ব্যক্তিগত স্বত্ব তা তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় নি। ব্যক্তিগত ভাবে তারা যেমন চাষ করে তেমনি চাষ করেছে, সঙ্গে তার পাশাপাশি সরকারী সংঘক্রিয় কৃষিক্ষেত্র (collective firm) প্রস্তুত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত চেষ্টা ও সমবেত চেষ্টার তুলনামূলক অবস্থাটা কৃষকদের চোখের সামনে বাস্তবভাবে ধরা হয়েছে। এ সম্বন্ধে ফিল্‌ম তুলে, প্রচার পত্র বিলি করে কৃষকদের সজ্ঞান ক'রে তোলা হয়েছে। তার পর যখন তারা স্বেচ্ছায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইস্তফা দিতে চেয়েছে তখনই রাষ্ট্র থেকে ব্যক্তিগত প্রথার অবসান করা হয়েছে। এভাবে না করলে অতি সহজেই বোঝা যায় যে কৃষক বিদ্রোহ হয়ে রাশিয়ার সাম্যবাদী গভর্নমেন্টকে উলটে দিত। অথচ এই কয়েক বছরের মধ্যেই এসব সম্পন্ন ক'রে ফেলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে জগত সভায় আপনার আসন ক'রে নিতে হয়েছে। এরই জন্য সমস্ত জগত রাশিয়ার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—দেশটা কি অদ্ভুত! আর কি অদ্ভুত ঐ লোকটা—স্ট্যালিন!

এইবার যদি রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন সম্বন্ধে তুলনামূলক সমালোচনা করা যায় তা হ'লে হয়তো তা অবান্তর হবে না। দুজনেই এক একটা বিরাট দেশকে গ'ড়ে তুল্‌তে ব্যস্ত। তবে অতি সংক্ষেপে এই বললেই চ'লে যাবে যে, রুজভেল্ট সেখানে 'নিউ ডীল' পরিকল্পনা অনুযায়ী সারা দেশকে ঢেলে সাজছেন, স্ট্যালিন সেখানে মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে রাশিয়াকে গ'ড়ে তুল্‌ছেন। রুজভেল্ট ধনতন্ত্রবাদকে ধ্বংস না ক'রেই সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন আর স্ট্যালিন ধনতন্ত্রবাদের ধ্বংসের উপরে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এতে করে দেখা যাচ্ছে রুজভেল্ট ধনতন্ত্রবাদকে ধ্বংস করতে চান না কিন্তু তবুও ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক

(শেষাংশ ২৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যানবাহন নিয়ন্ত্রণের সঙ্কেত

বড় বড় শহরে যেখানে অনেক রাস্তা এসে এক জায়গায় পৌঁছে, সেখানে যদি যানবাহন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকত, তাহলে একদিনেই শহরের হাসপাতালগুলি ভর্তি হয়ে যেত। চালকদের পূর্ব থেকেই সাবধান করে দেবার জন্যে পুলিশ থেকে সঙ্কেত চিহ্ন ঝুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা আছে। পুলিশের আদেশ না পেলে বিপদজনক রাস্তার মোড় কোন চালকই পার হ'তে পারে না। আট দশটি রাস্তার মোড়ে মাত্র একজন পুলিশ বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে যানবাহন অতি সহজেই নিয়ন্ত্রণ করে। পুলিশের আদেশ অমান্য ক'রে বাহাদুরি দেখিয়ে সেখানে গাড়ী চালালেই বিপদ, শুধু একার নয় সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকের। সম্প্রতি শান্তা কাটালিনা দ্বীপে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা রকম সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে। ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। সেখানের যানবাহন চালকেরা এইসব সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখে রাস্তায় গাড়ী চালায়।

ছবির ডানদিকের প্রথমটিতে একটি শামুকের ছবি রয়েছে। যেখানে এই চিহ্ন ঝুলতে দেখা যায়, সেখানে চালকেরা গাড়ীর গতিবেগ খুব কম করে দেয়। শামুকের মত ধীর গতিতে গাড়ী চালাতেই এই চিহ্ন নির্দেশ করে।

কলকাতা শহরের বড় রাস্তাতেও সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা আছে। এতগুলি রাস্তার গাড়ীর উপর নজর রেখে একজন লোকের পক্ষে যান-বাহন নিয়ন্ত্রণ করা কতখানি দায়িত্বজ্ঞান আর কতখানি ধীর বুদ্ধির প্রয়োজন তা একবার ভেবে দেখুন।

বাদ্যযন্ত্র

বাদ্যযন্ত্র ত অনেকেই আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু নিউইয়র্কের জোসেফ স্কিলিংগারের আবিষ্কৃত বাদ্যযন্ত্রের তুলনা মিলে না। মিঃ স্কিলিংগার একজন খ্যাতনামা লেখক। তাঁর রচিত গান এবং গানের সুর সকলেই পছন্দ করে। নব আবিষ্কৃত যন্ত্রটির বিশেষত্ব এই যে, যন্ত্রটির ভিন্ন ভিন্ন কলকব্জার স্থান পরিবর্তন ক'রে প্রায় ৬৫০০০ হাজার বিভিন্ন গানের সুর সহজেই পাওয়া যায়।

মনের আনন্দে জীবজগতের সকলেই প্রায় দু'এক লাইন গান গেয়ে থাকে। কেউ উল্লাসে বিচিত্র সুরে, কেউ বা বিচিত্র রবে। বাদ্যযন্ত্রের অভাবে যাঁরা মনের মত সুর খুঁজে পান না, আশা করি নব আবিষ্কৃত বাদ্যযন্ত্রটি তাঁদের নিরাশ করবে না। তবে আমরা ভাবছি, আরও অনেকের কথা। তারা একবার এর সন্ধান পেলে পৃথিবীকে রসাতলে পাঠিয়ে তবে ছাড়বে।

শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতা

দেখতে দেখতে শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতা সারা দেশের লোককে যেন ভূতে পাওয়ার মত ধরেছে। ছেলে বুড়ো

যান-বাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন সঙ্কেত চিহ্ন

সকলেই সঠিক উত্তর দিয়ে প্রথম পুরস্কার পেয়ে একদিনেই বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখছে। সঠিক শব্দের সন্ধান করতে যথেষ্ট বুদ্ধির দরকার বই কি! কিন্তু কয়জন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান লোকের বুদ্ধির মূল্য দেয়! এক শব্দের পাঁচ ছয় রকম উত্তর বার ক'রে অতি বড় পন্ডিতের মাথাও ঘুলিয়ে দেয়। জিনিষটাকে লটারির চোখে না দেখলে সত্যিই যে এর একটা মূল্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

রক্সবারির মার্টিন স্কুলে 'ক্রস ওয়ার্ড পাজলে'র উত্তর বের করা শেখাবার জন্যে আবার আলাদা ক্লাস আছে। ক্লাসে ছেলেমেয়েরা শব্দ-শৃঙ্খল ধাঁধাঁর উত্তর বের ক'রে রোজ কত নতুন নতুন শব্দ, তার মানে, বানান প্রভৃতি শিখে থাকে। এমনি ক'রে উঁচু ক্লাসে উঠে ছেলে-মেয়েরা বেশ মজার মজার 'ক্রস ওয়ার্ড পাজল'ও তৈরী ক'রে ফেলে। তাদের তৈরী ধাঁধাঁগুলি আবার উচ্চ মূল্যে বিক্রী হয়। বিক্রয়লব্ধ অর্থ কিন্তু স্কুলের ফন্ডে জমা থাকে। সেখানের শিক্ষকেরা বলেন, শব্দ-শৃঙ্খল ধাঁধাঁর ভিতর দিয়ে যে ভাবে নতুন নতুন শব্দ তার অর্থ এবং যথাযথ প্রয়োগ করতে শেখা যায়, ব্যাকরণ পড়েও ঠিক সেভাবে শেখা যায় না। ব্যাকরণের ক্লাসে যতখানি ছেলেমেয়েদের মধ্যে নতুন শব্দ শিখতে গিয়ে বিরক্তির ভাব দেখা যায় তার এক বিন্দুও 'ক্রস ওয়ার্ড পাজলে'র ক্লাসে পাওয়া যায় না। নতুন শব্দ শেখবার উৎসাহ তাদের চতুর্গুণ বেড়ে যায়।

ছেলেমেয়েদের স্কুল কামাই

কোন না কোন অজুহাতে ছেলেমেয়েরা স্কুল কামাই করতে পারলে যেন বেঁচে যায়। যাদের পড়াশুনায় একদম

মন নেই, তারা স্কুলে হাজির দেওয়াটাকে যেন একটা মস্ত বিপদ ভাবে। পূর্বে আমাদের দেশের পাঠশালার গুরুমশায়রা কিভাবে এইসব অশান্ত ছেলেদের শান্ত করতেন, তা এখন পুরাতন কাহিনী হলেও, শুনে কোন্ ছেলের না শরীর কেঁপে উঠে? সামান্য অপরাধের ফলে গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা মেনে নিতে না পেরে বেশীরভাগ ছেলেই স্কুলে হাজিরা দিত না; কিন্তু তাতেও যে রেহাই সহজে পাওয়া যেত না, সে কথা এখন আপনাদের নিকটও পুরাতন। এই কারণে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা চিরদিনই লেখাপড়াকে ভয় করে আসছে। শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যের সম্বন্ধটাও সেই কারণে অন্য দেশের তুলনায় অনেকখানি দূরত্ব রেখে চলেছে। ইউরোপ অঞ্চলে নূতন নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলনের ফলে সেখানের ছেলেমেয়েরা লেড়াপড়াকে ভয়ের চোখে না দেখে সহজভাবে গ্রহণ করেছে। উৎসাহ এবং উদ্যম এখানকার ছেলেমেয়েদের চেয়েও অনেক বেশী। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে, নিউইয়র্ক শহরে প্রতিদিন গড়পড়তায় এক লক্ষ ছেলেমেয়ে স্কুলে হাজির হয় না।

স্কুলের ক্লাসে ছেলে-মেয়েদের শব্দ-শৃঙ্খল ধাঁধাঁ তৈরী করতে শেখান হচ্ছে।

আমাদের দেশের স্কুল কলেজগুলির হাজিরা বই পরীক্ষা ক'রে এভাবের কোন সংবাদ প্রকাশ করতে দেখা যায় নি। একবার চেষ্টা করলে মন্দ কি? পৃথিবীর ইতিহাসে যে একটা রেকর্ড থেকে যাবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মার্কিন ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়কদ্বয়

(২৬৮ পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী। যেহেতু পুরানো প্রথা আপনিই বিলুপ্তির পথে চলেছে সেই হেতু তাকে ধ্বংস করবার প্রয়োজন কি? কিন্তু রাশিয়া সে কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ধনতন্ত্রবাদকে ধ্বংস না করলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যায় না। রুজভেল্ট আজ যেটাকে কার্যকরী করে তুলতে চাইছেন, অর্থাৎ ধনতন্ত্রবাদকে ধ্বংস না করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে চাইছেন, এর একটা খারাপ দিক আছে। যেদিন ধনতন্ত্রবাদ [illegible] ধ্বংসের পথে এগিয়ে আসবে সেদিন তাকে রক্ষা করবার জন্য ধনিক শ্রেণী তার সর্বপ্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে, অর্থাৎ সেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্যাসিজমের অভ্যুদয় হতে পারে। সেইজন্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হলে ধনতন্ত্রবাদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগবেই। তাই হয়তো এ কথা বলা অসংগত হবে না, স্ট্যালিন যেখানে সাম্যবাদী রুজভেল্ট সেখানে স্বপ্নবাদী। তা ছাড়াও নিউ ডীল পরিকল্পনা অনুযায়ী রুজভেল্ট যেখানে planned economy-র সাহায্য নিতে যাবেন মনে করেন সেখানে এই প্রশ্ন যদি তোলা হয়, তাঁর হাতে অর্থাৎ রাষ্ট্রের হাতে কি ব্যাঙ্ক আছে, শিল্প আছে, বড় বড় কারখানা আছে? কিংবা যাদের হাতে এসব আছে তাদের তিনি control করতে পারেন? রুজভেল্ট কি পারেন কোনও শিল্পপতির মুনফা করার আকাঙ্ক্ষা এতটুকু কমাতে? এসব যদি তিনি না পারেন তো তাঁর পক্ষে planned economy-র সাহায্যে যাবতীয় অগ্রগতির স্বপ্ন দেখা একেবারেই বৃথা। অবশ্য এ কথা সত্য যে তিনি নিউ ডীল অনুযায়ী মার্কিন মুলুককে নূতন করে পুনর্গঠন করতে চাইছেন কিন সে পুনর্গঠনের কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই।

"Subjectively, perhaps, these Americans think they are reorganising society; objectively, however they are preserving the present basis of society."।

অন্যদিকে স্ট্যালিন সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশকে গড়ে তুলছেন একজন সুদক্ষ সংগঠনকারীর মত। বাস্তবিক, বর্তমান জগতে এত বড় সংগঠনকারী মানুষ আর নেই বললেই চলে।

ব্রেন

(২৬৬ পৃষ্ঠার পর)

—আমার সর্বনাশ হয়েছে সার্।

—তাই তো শিশিরবাবু, কাকা বলে ঠিক চিনতে পেরেছিলেন তো?...

মাথার মধ্যে কেমন যেন সব অস্পষ্ট হইয়া আসে। একটা অবসাদ, ঝিমঝিম ভাব। ক্ষীণ একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন কানে আসিয়া বাজে—বুঝলে বাবা, একটু ব্রেন-এর প্লে করা দরকার—। ধীরে ধীরে মাটির উপরেই বসিয়া পড়িলাম।

দুধওয়ালা সাইকেলে দুধ লইয়া আসিল নিত্যকার মত; তার সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল ক্রিং ক্রিং। কিন্তু আমার মনে হইল ও যেন বলিতেছে—ব্রেন ব্রেন—।

আজ-কাল

কংগ্রেস বনাম কর্তৃপক্ষ

ভারতবর্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে শাসন-কর্তৃপক্ষের সংঘাত দেখা দিল কি? যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদের ড্রিল নিয়ে ধরপাকড় হয়েছে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক "কওমী সেবাদল"এর পরিচালক শ্রীকেশব দেব মালবীয় এম-এল-এ এবং আর কয়েকজন গত ৩১শে অগস্ট গ্রেপ্তার হয়েছেন। এলাহাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীকেশব দেবকে সেবাদলের ড্রিল ও মার্চ্চ বে-আইনী হচ্ছে বলে' জানিয়েছিলেন; কিন্তু শ্রীকেশব দেব সেবাদলের শিক্ষা বন্ধ করতে রাজী হন নি। এ নিয়ে কানপুরেও এ পর্যন্ত মোট ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র দেব প্রমুখ যে ১২ জন কংগ্রেস নেতাকে বাঙলায় ভারতরক্ষা আইনে আটক করা হয়েছিল তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে ছাড়া হয় নি; পক্ষান্তরে তাঁর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা পুলিশ ফেব্রুয়ারী ও এপ্রিল মাসে বে-আইনী বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে এক মামলা রুজু করেছে। ১১ই সেপ্টেম্বর এই মামলার শুনানী আরম্ভ হবে।

সীমান্তে হাঙ্গামা

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তোচি উপত্যকায় তাপ্পি গ্রামে কিছুকাল যাবৎ হাঙ্গামা চলছে। ৭ই অগস্ট সৈন্যদল ঐ গ্রাম ঘেরাও করে; তখন পাঠানদের সঙ্গে সংঘর্ষে ক্যাপ্টেন রাসেল ও আর একজন ইংরেজ অফিসার নিহত হন। ১৫ই অগস্ট ঐ গ্রামের উপর ১০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য হয়। ১৬ই ও ১৭ই অগস্ট আবার সংঘর্ষ হয়; ফলে ৩ জন ভারতীয় অফিসার ও ৫০ জন 'বিদ্রোহী' নিহত হয় এবং শান্তি স্থাপিত হয়। ২৩শে অগস্ট পাঠানদের গুলীতে বম্বে গ্রেনেডিয়ার দলের ক্যাপ্টেন স্টিভেন্স নিহত হন। বিস্তারিত সংবাদ এখনো পাওয়া যায় নি।

ধাঙগড় ধর্মঘট

কলকাতায় ধাঙগড় ধর্মঘট চলছে। কর্তৃপক্ষ বাইরে থেকে লোক কিছু এনেছেন এবং কিছু ধর্মঘটী কাজে যোগ দিয়েছে। তা দিয়ে রাস্তাগুলি যতটা সম্ভব পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হচ্ছে; কিন্তু সেভাবে বেশী দিন কাজ চালানো দুঃসাধ্য। যদি ধর্মঘট ভাঙে তা হলে অবশ্য অন্য কথা। তবে এখনো ধাঙগড়েরা মোটের উপর শক্ত আছে, যদিও তাদের প্রধান নেতাদের আটক করে' ফেলা হয়েছে।

সিভিক গার্ডেরা খুব পুলিশী উৎসাহ দেখাচ্ছে। পুলিশের মতো গ্রেপ্তারের ক্ষমতা পেয়ে খাকি শার্ট-শর্টস্ পরে' বীরবৃন্দ বেটন হাতে করে' রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে ফিরছে। তারা মাথা পিছু কত পাচ্ছে তা জনসাধারণকে জানানো হয় নি। এ পর্যন্ত ধৃত ৪৫ জন ধাঙগড়কে আদালতে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সোমবারে আরো ১৮ জন ধাঙগড়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের প্রস্তাবগুলির অন্তর্নিহিত নীতিতে, বিশেষত মাইনরিটির দোহাইতে মুসলিম লীগ যে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় স্বাধীনতাকে প্রতিহত করতে পারবে, এই গ্যারাণ্টিতে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। অতএব যে সব মুসলমান যুদ্ধ কমিটিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক তারা এখন যোগ দিতে পারে। তবে বড়লাটের শাসন পরিষদের গঠন ও যুদ্ধ পরামর্শদাতা কমিটি সম্বন্ধে মুসলিম লীগ আরো কিছু আব্দারের পূরণ চান। মোট কথা, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্যে তাঁরা উদ্গ্রীব। কংগ্রেস সহযোগিতার ভাব দেখানয় মুসলিম লীগকে পাল্টা পথ ধরতে হয়েছিল, তাতে প্রভুভক্তি প্রদর্শনে বিঘ্ন ঘট্‌ছিল এবং নানা অসামঞ্জস্য দেখা দিচ্ছিল। এখন কংগ্রেস অন্য পথে যাওয়ায় মুসলিম লীগের সামনে জটিল সমস্যার নিরাকরণ হল এবং তাঁরা প্রভুসেবার কাজে ফিরে আস্‌তে পারলেন।

বে-সরকারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হবে না, এই কথা ধরে নিয়ে মুসলিম লীগ ঐ বাহিনীর দৃঢ় সংগঠন করতে প্রাদেশিক কমিটিগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ভারতে সমরোপকরণ

ভারতবর্ষের জন্যে এবং মধ্য প্রাচ্য ও সুয়েজের পূর্ব অঞ্চলের সৈন্য বাহিনীর জন্যে ভারতে গুলিগোলা ও অন্যান্য সমরোপকরণ উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে উপায় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে স্যার আলেকজাণ্ডার রোজার-এর নেতৃত্বে এক স্পেশ্যাল বৃটিশ মিশন ভারতবর্ষে আস্‌ছেন।

ভাওয়াল মামলা

বিচারপতি বিশ্বাস ও বিচারপতি কস্টেলো ভাওয়াল মামলার আপীলে বাদী সন্ন্যাসীকে ভাওয়ালের মেজকুমার সাব্যস্ত করে' বিবাদী পক্ষের আপীল ডিসমিস করেছেন। বিচারপতি লজ সন্ন্যাসীকে প্রতারক বলেছেন। এ অবস্থায় সন্ন্যাসীর জয় হলেও চূড়ান্ত আদেশ হাইকোর্ট থেকে এখনো দেওয়া হয় নি। কারণ বিচারপতি বিশ্বাস আগেই যুক্তি তুলেছিলেন যে, ইংলণ্ড থেকে প্রেরিত বিচারপতি কস্টেলোর সিদ্ধান্ত রায় বলে' গৃহীত হতে পারে না। পূজার ছুটির পর এ প্রশ্নের মীমাংসা করে চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া হবে।

ইওরোপ

বিমান হানা

১লা সেপ্টেম্বর বর্তমান মহাযুদ্ধের এক বৎসর শেষ হল; কিন্তু এখনো জয়পরাজয়ের লক্ষণ বা নিকট সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বরং সংগ্রাম এখন তীব্রতর হবে বলেই মনে হয়।

বৃটেনের উপর এ সপ্তাহে জার্মান বিমান-হানা বারে অনেক বেড়েছে। জার্মানরা লণ্ডনের উপর এবং বিভিন্ন স্থানের বিমান ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। অন্যান্য শহরেও বোমাবর্ষণ চলছে। লণ্ডনে প্রত্যহই জার্মানরা হানা দিচ্ছে। গত ২৭শে অগস্ট ৬ ঘণ্টা এবং পরদিন ৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট ব্যাপী হানা লণ্ডনে চলে। ৩১শে অগস্ট জার্মানরা লণ্ডনে ছয় বার এবং পরদিন তিন বার হানা দেয়। ২৪শে অগস্ট জার্মান বিমান উপকূলবর্তী র‍্যামসগেট শহরের ১০০০ বাড়ি ধ্বংস করে' দেয়। ২৬শে অগস্ট বৃটেনে বৃহত্তম বিমান হানা হয়—উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত কোণাকুণিভাবে ৫০০ মাইল জুড়ে জার্মান বিমান হানা দেয়। ২৮শে অগস্ট সারারাত্রি ধরে' তারা আক্রমণ চালায়। জার্মানরা বৃটেনের বিমান ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে' দেবার প্রবল চেষ্টা করছে। এই উদ্দেশ্যে তারা বিশেষভাবে কেণ্ট ও টেম্‌স্-এর মোহনায় হানা দিচ্ছে; টেমস্-এর মোহনায় কয়েকটা প্রচণ্ড আকাশ যুদ্ধ হয়ে গেছে। জার্মান আক্রমণে অনেক শহরের জলের পাইপ, গ্যাসের পাইপ প্রভৃতি নষ্ট হয়েছে বলে' জানা যায়।

ইংরেজরাও বার্লিনের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে।

তারা ২৫শে, ২৬শে, ২৮শে ও ২৯শে অগস্ট জার্মান রাজধানীতে যে হানা দিয়েছে তার সংবাদ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া জার্মান অধিকৃত এলাকায় বিমান ঘাঁটি, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, কামান-মণ্ড, রেলওয়ে প্রভৃতির উপর বৃটিশ বিমান বহর বোমা বর্ষণ করেছে। ইংরেজরা বার্লিনের ও অন্যান্য জার্মান শহরের প্রভূত ক্ষতি করেছে বলে দাবী করছে।

ফরাসী উপনিবেশের বিদ্রোহ

ফরাসী মধ্য আফ্রিকার শাদ্ রাজ্যের সৈন্য বাহিনী পেতাঁ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে' জেনারেল দ্য গলের পক্ষে যোগ দিয়েছে। শাদ্-এর পর ফরাসী কঙ্গো ও ক্যামেরুন্স-এর ফরাসী বাহিনীও বিদ্রোহ করে' জার্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পথ অবলম্বন করেছে। সম্প্রতি কয়েকজন বিশিষ্ট ফরাসী সেনাপতিও জেনারেল দ্য গলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

ভিয়েনা বাঁটোয়ারা

ভিয়েনাতে জার্মানী ও ইতালীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাঙ্গারী-রুমানিয়া সমস্যার ফয়সালা হয়েছে এবং তদনুযায়ী উভয় পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ব্যবস্থা হয়েছে যে, হাঙ্গারী ট্রান্সিলভানিয়ার প্রধান শহর ক্লুজ সহ প্রায় ৫০ হাজার বর্গ কিলোমিটার (১ কিলোমিটার ১ মাইলের কিছু কম) ভূখণ্ড পাবে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে হাঙ্গারী এই অঞ্চলের দখল নেবে। রুমানিয়ান কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন যে, জার্মানী ও ইতালী ভিয়েনায় রুমানিয়ান প্রতিনিধির কাছে চরম পত্র দেওয়ায় তাঁরা বাধ্য হয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নেন।

কিন্তু এই বাঁটোয়ারায় রুমানিয়ায় প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বুখারেস্টে এবং ট্রান্সিলভেনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় লোকে সভা মিছিল করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং জার্মান ও ইতালীয় কর্মচারীদের আক্রমণ করবার চেষ্টা করে। রুমানিয়ান গভর্নমেণ্ট সভা মিছিল নিষিদ্ধ করে' দিয়েছেন।

সোভিয়েট সীমান্তে রুমানিয়ান সৈন্যেরা সম্প্রতি আক্রমণাত্মক কাজ করায় সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট রুমানিয়ার কাছে কড়া প্রতিবাদ জানায় এবং রুমানিয়ান সৈন্যেরা সংযত না হলে গুরুতর অবস্থা দেখা দেবে বলে' ভীতি প্রদর্শন করেন।

এ সপ্তাহেও বৃটিশ বিমান বহর খাস ইতালীতে এবং আফ্রিকায় ইতালীয় রাজ্যের বিভিন্ন ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়।

ইন্দোচীন

ইন্দোচীন সম্পর্কে এখনো গুরুতর সংবাদ আসছে। ইন্দোচীনের সমস্ত বন্দর বন্ধ করে' দেওয়া হয়েছে, চীনারা সীমান্তে সামরিক তোড়জোড় করছে এবং দক্ষিণ চীন সমুদ্রে জাপানী নৌবহর তৎপর হয়ে উঠ্ছে। চীনারা বল্‌ছে যে, পেতাঁ গভর্নমেণ্ট জাপানকে সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করছেন।
২।৯।৪০ —ওয়াকিবহাল।

পুস্তক পরিচয়

রাঙ্গামাটীর পথঃ—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

রাঙ্গামাটীর পথ ছাড়িয়া যে সকল নরনারী শহরে আসিয়া কৃত্রিম জীবনযাত্রার পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহাদেরই কয়েকটি নরনারীকে কেন্দ্র করিয়া এই উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। 'রাঙ্গামাটীর পথ' উপন্যাসটি যখন ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল, তখন পাঠকদের নিকট হইতে ইহা সমাদর লাভ করে। আলোচ্য গ্রন্থে নায়িকা অলকার চরিত্রটি অতি সুন্দর ও অভিনব হইয়াছে। অলকা চায় সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা—তাই তাহাকে চিত্র অভিনেত্রীর জীবন বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক সভ্যতার এই কৃত্রিম জীবন তাহার প্রাণে জাগাইয়া তুলিয়াছে ব্যর্থ জীবনের হাহাকার। এই বিস্তৃত সংসারের এক কোণে ছোট একটি নীড় রচনা না করিতে পারার অসমর্থতাই অলকার জীবনের মস্ত বড় ট্রাজিডি। নায়ক বিমলকান্তির পৌরুষবর্জিত চরিত্রে দৃঢ়তার অভাবে অলকার চরিত্রটি হইয়া উঠিয়াছে তেজোদৃপ্ত। বিমলকান্তিকে অলকা সহজেই অধিকার করিতে পারিত। কিন্তু অলকা মায়ায় ঘেরা সংসার চায় না, সে চায় সুন্দর সংসার, যে সংসার প্রেমে ও প্রাণে পরিপূর্ণ। তাই বিমলকে বিভাবরীর হাতে রাখিয়া নিঃশব্দে রাজপথ হইতে সরিয়া আসাটাই তাহার জীবনের সব চেয়ে বড় ব্যর্থতা নয়—কৃত্রিম জীবনের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া হাসিকান্না সুখদুঃখময় সুন্দর সমাজজীবনে আশ্রয় করিয়া লইতে না পারাই তাহার জীবনের ট্রাজিডি। আলোচ্য গ্রন্থের চরিত্রগুলি অবাস্তব এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সহিত পাঠকদের পরিচয় সামান্য। এই দুই কারণে 'অলকা'কে আত্মীয় বলিয়া মনে করা পাঠকদের পক্ষে হয়ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। মামুলী রোম্যাণ্টিসিজম্ মনকে মাঝে মাঝে পীড়িত করে। তবে ভাষা ও রচনার আঙ্গিক সুন্দর। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

ঋতু সংহার (চিত্রে ও কাব্যে)ঃ—শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য বি-এ ও ভবানী দেবী প্রণীত। মূল্য রাজ সংস্করণ ১॥০, সাধারণ সংস্করণ ১০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চাটার্জি এণ্ড সন্স প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়।

মহাকবি কালিদাসের ঋতু সংহার কাব্যের বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থের ভূমিকায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—'মূল কাব্যের বজ্রসমুৎকীর্ণ রত্নরাজীর মধ্য দিয়া সূত্রের মত সঞ্চারিণী বাণী কাব্য সৌন্দর্যে হীন হয় নাই। পটু সংস্করণে তাঁহার নিপুণতা আছে।' লেখক নবীন এবং বর্তমান গ্রন্থখানা তাঁহার প্রথম প্রয়াস। তাঁহার রচনাভঙ্গী আমাদিগকে আশ্চর্যান্বিত করিয়াছে। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই সুন্দর, কয়েকখানা সুন্দর ছবি পুস্তকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

আর্থিক উন্নতি (শ্রাবণ)ঃ—সম্পাদক শ্রীবিনয়কুমার সরকার। প্রতি সংখ্যা ।০ আনা।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও ধনবিজ্ঞান বিষয়ক এই মাসিক পত্রিকাটির আলোচ্য সংখ্যায় 'বাঙলার সম্পদ', 'আর্থিক ভারত', 'দুনিয়ার ধনদৌলত', 'ব্যক্তি ও সঙ্ঘ', 'ফ্রয়েড সম্বন্ধে মতামত' ইত্যাদি বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও আলোচনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। বিশেষ করিয়া বাঙালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্রিকাখানির প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রীশ্রীগীতামৃত লহরীঃ—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কাব্য-তীর্থ প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকট ১৭-বি, শ্রীমোহন লেন, কালীঘাট, কলিকাতা।

সরল ভাষায় গ্রন্থকার গীতার দুরূহ তত্ত্বগুলির আলোচনা করিয়াছেন। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাও এই গ্রন্থ পাঠে গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায় উপলব্ধি করিতে পারিবেন। গীতার গূঢ়ার্থে এমন সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করাতে গ্রন্থকারের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং অনুভূতির তীক্ষ্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের মূল্য অতি সুলভ হইয়াছে। আমরা এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

আয়ুর্বিজ্ঞান সম্মিলনীঃ—চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক—সম্পাদক কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্বেদশাস্ত্রী। বার্ষিক ২॥৵০ আনা, প্রতি সংখ্যা ৵১০, কার্যালয়—১৪নং ডাক্তার জগবন্ধু লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্বিজ্ঞান সম্মিলনীর বর্তমান সংখ্যা প্রবন্ধ গৌরবে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। ডাক্তার সুন্দরীমোহনের যুদ্ধ গ্যাস ও উপদ্রব শান্তি সময়োপযোগী জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী কাব্যব্যাকরণতীর্থের লিখিত পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগের চিকিৎসা প্রবন্ধটি চিকিৎসা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ। কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্বেদশাস্ত্রীর লিখিত বনৌষধি এবং সন্দিগ্ধ ও উপেক্ষিত লতা-গুল্মাদি—বহু জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে। ডাক্তার হরিনাথ ঘোষের শিশু পালন সুন্দর লেখা। এমন পত্রিকার প্রচারে দেশের অনেক কাজ হইবে। আমরা 'আয়ুর্বেদ সম্মিলনী'র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ডাক্তার

নিউ থিয়েটার্সের নূতন চিত্র। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'তিন পুরুষ' কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত। চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকঃ ফণী মজুমদার। সংগীত-পরিচালকঃ পঙ্কজ মল্লিক। আলোকশিল্পীঃ ইউসুফ মুলজী। শব্দযন্ত্রীঃ লোকেন বসু। পটশিল্পীঃ সৌরেন সেন। দৃশ্যসজ্জাকরঃ অনাথ মৈত্র। সম্পাদনা ঃ হরিদাস মহলানবিশ। রসায়নাগারাধ্যক্ষঃ সুবোধ গাঙ্গুলী। ইউনিট্ ব্যবস্থাপকঃ গেলু বড়াল। প্রধান ব্যবস্থাপকঃ পি এন রায়।

গত ৩১শে আগষ্ট '৪০, শনিবার হইতে চিত্রা ও পূর্ণ থিয়েটারে একই সঙ্গে প্রদর্শিত হইতেছে।

নিউ থিয়েটার্সের নূতনতম চিত্র 'ডাক্তার' ভারতীয় সিনেমা-শিল্পের একটি মহৎ পরিকল্পনাকে সার্থক করিবার চেষ্টা করিয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কিছুদিন হইতে ভারতের সিনেমা-শিল্পকে জনকল্যাণ ও লোকশিক্ষার কাজে লাগাইবার জন্য আন্দোলন সুরু হইয়াছিল এবং কাগজে-পত্রে নানা আলোচনা চলিতেছিল। এমন দিনে নিউ থিয়েটার্সের সময়োপযোগী এই কথা-চিত্র 'ডাক্তার'—সিনেমা রূপের কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও আনন্দ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে যে জনসেবার আদর্শ এবং বৃহত্তর মানব-জীবনের লক্ষ্যের দিকে দর্শকসাধারণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে সেজন্য আমরা নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার এবং নবীন পরিচালক ফণী মজুমদারকে অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীযুক্ত ফণী মজুমদারের পরিচালন-কৌশলে শিল্পী-মনের সুন্দর স্বপ্ন চিত্রপটে মনোরমরূপে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রূপবোধ, রসজ্ঞান এবং বিরাট আদর্শ সৃষ্টি করিবার সাহসিকতা সত্যই প্রশংসনীয়। তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ছায়াচিত্রের প্রয়োগ-শিল্পের যে দুইটি প্রধান গুণ কথাচিত্রকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তোলে, যথা,—কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া অব্যাহত সাবলীল গতিভঙ্গির সৃষ্টি করিবার নৈপুণ্য এবং স্রষ্টা শিল্পীর সহজাত সংযম গুণের সাহায্যে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাবিন্যাসের মধ্য দিয়া চরিত্রগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার ক্ষমতা,—তাহার অভাব আমরা এই ছবিতে স্থানে স্থানে লক্ষ্য করিয়াছি। মাঝে মাঝে অনাবশ্যক বড় বড় বক্তৃতার ভারে ছবির গতি ভারাক্রান্ত হইয়াছে। তাই মাঝে মাঝে দেখিতে পাইয়াছি পাত্র-পাত্রীর হৃদয়ের দ্বন্দ্বকে চাপা দিয়া চিকিৎসা, হাসপাতাল, ডাক্তারের কার্যপ্রণালী এবং প্রচারের আন্দোলন বড় হইয়া উঠিয়াছে।

গল্পের শেষ পরিণতি আমাদের অতৃপ্ত রাখিয়া দিয়াছে। পিতার আদর্শের সঙ্গে পুত্রের আদর্শের যে সংঘাত এবং তাহার ফলে পিতা-পুত্রের জীবনে যে করুণ অভিনয় প্রথমে সুরু হইল সেখানে শেষ নাটকীয় মুহূর্তে সত্যনিষ্ঠ পুত্র, দেশপ্রেমিক ডাক্তার অমরনাথ তাহার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করিয়াও স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে একবার শেষ দেখা করিলে হৃদয়-ধর্মকে মহিমান্বিত করিতে পারিত, বিশেষ করিয়া তাহার নিজের পুত্রের কাছে নিজেকে চিরদিনের জন্য গোপন রাখিবার যে নিষ্ঠুর কঠোরতা সে স্বীকার করিয়া লইল তাহা আমাদের অতৃপ্তির মধ্যে রাখিয়া বিদায় দিয়াছে। এই গল্পের প্রথম তিনটি পুরুষ,—পিতা, পুত্র এবং পৌত্র, একটি দৃশ্যে আসিয়া না মিলিলে কাহিনীর সঠিক পরিসমাপ্তি ঘটে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

পরিচালকের নির্দেশে আলোকচিত্রশিল্পী ইউসুফ মুলজী আলোকচিত্রের কাজে অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, স্থানে স্থানে ক্যামেরায় তিনি যে মনোহর মায়ালোক সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সর্বত্র নির্দোষ না হইলেও প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। শব্দযন্ত্রী লোকেন বসু, শব্দধারণে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। পরিস্ফুটনাগারের কাজ ভাল। সম্পাদনা একেবারে নির্দোষ নয়। বহির্দৃশ্যাবলী এই চিত্রের একটি অতুলনীয় সম্পদ। ইতিপূর্বে বাঙলার অন্য কোন চিত্রে বহির্দৃশ্যের এমন সুন্দর সুনিপুণ চিত্র গ্রহণ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

সংগীত পরিচালনা ভাল। কণ্ঠ-সংগীত এবং আবহ-সংগীতে পরিচালক এবং সংগীত-পরিচালকের সিনেমা-সম্মত সুরজ্ঞান প্রমাণিত হইয়াছে।

তিনপুরুষ গল্পের প্রথম পুরুষ,—জমিদার শ্রীসীতানাথ রায় আদর্শনিষ্ঠ, সংরক্ষণশীল অথচ স্নেহময় পিতা। এই চরিত্রে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী অসামান্য নট-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিতীয় পুরুষ,—তাঁহার একমাত্র পুত্র অমরনাথ। পিতৃভক্ত অথচ আদর্শনিষ্ঠ এবং পল্লীপ্রেমিক। দেশের কল্যাণ-কামনায় এবং জাতির দুঃখ মোচনে যে উদার পুরুষের সদাজাগ্রত চিত্ত দুঃখের মধ্যেও অবিচলিত রহিয়াছে সেই পল্লীগ্রামের ডাক্তার অমরনাথের অপূর্ব চরিত্রে শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক নিতান্ত সাধারণ অভিনয় করিয়াছেন। চরিত্রটি তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য এবং সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি, মাত্র সহনীয় অভিনয় করা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন নাই। অথচ এই চরিত্রটি একজন সত্যকার ভাল অভিনেতাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত। নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজক এবং পরিচালকগণ ভবিষ্যতে আর তাঁহাকে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিতে দিলে তাঁহার প্রতিই অবিচার করিবেন বলিয়া আমরা মনে করি। শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক সুকণ্ঠ এবং জনপ্রিয় গায়ক হইলেও মোটেই সত্যকারের অভিনেতা নহেন, এবং একথা বোধকরি বলাই অনাবশ্যক যে সিনেমাতেও চরিত্রাভিনয়ের জন্য সত্যকার অভিনেতার প্রয়োজন আছে।

তৃতীয় পুরুষ, অমরনাথের পুত্র, সীতানাথের অজ্ঞাত-পরিচয় পৌত্র এবং তহার প্রতিপালিত পুত্র সোমনাথ।

(শেষাংশ ২৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙলার সন্তরণ পরিচালনা

বাঙলার সন্তরণ মরসুম শেষ হইতে চলিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাস শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার সকল সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ বন্ধ হইয়া যাইবে। বর্তমানে সকল প্রতিষ্ঠান বার্ষিক সন্তরণ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান লইয়া ব্যস্ত। গত মার্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ সাত মাসকাল কিরূপভাবে সন্তরণ বিষয়টির পরিচালনা করিয়াছে তাহারই প্রমাণ বর্তমানে ঐ সকল সন্তরণ প্রতিষ্ঠান দিতেছে। ইতিমধ্যে যে কয়েকটি প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে তাহার বিভিন্ন বিষয়ের ফলাফল আলোচনা করিলে বাঙলার সাঁতারুগণ গত বৎসর অপেক্ষা বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। একমাত্র হাটখোলা ক্লাবের তরুণ সাঁতারু শ্রীমান শচীন নাগ ভবানীপুর সুইমিং এসোসিয়েশনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ১০০ মিটার সন্তরণ বিষয়ে নূতন ভারতীয় রেকর্ড করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি উক্ত দূরত্ব ১ মিঃ ২২/৫ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়াছেন। গত বৎসর ইনিই উক্ত বিষয় নূতন ভারতীয় রেকর্ড করিয়াছিলেন। সুতরাং এই বৎসরে সন্তরণ বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য ইঁহার যে সন্তরণ মরসুম আরম্ভ হইতেই চেষ্টা ছিল তাহার পরিচয় তিনি দিয়াছেন। এই একটিমাত্র সাঁতারু ছাড়া আর কোন সাঁতারুকে বিশেষ উন্নতি করিতে দেখা যাইতেছে না। অধিকাংশ সন্তরণ বিষয়ের ফলাফল গত বৎসর অপেক্ষা নিম্নস্তরের হইয়াছে। অতএব বাঙলায় সন্তরণ পরিচালনা যে ঠিক মত হইতেছে না ইহা বলিলে কোনরূপ অন্যায় করা হইবে না। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থার দ্বারা সন্তরণের বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতি করিবার জন্য বাঙলার সন্তরণ পরিচালকগণ যে এই বৎসরেও কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সুব্যবস্থা কবে হইবে?

বাঙলার সন্তরণ পরিচালকগণের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, তাঁহারা সুব্যবস্থা করিবেন কবে? গত দশ বৎসর ধরিয়া আমরা প্রতি বৎসর সন্তরণ মরসুমের শেষে "সুব্যবস্থা হয় নাই।" এই যে উক্তি করিয়া আসিতেছি ইহা কি আরও ১০ বৎসর করিতে হইবে? তাঁহাদের কি জ্ঞানচক্ষু কোনদিনই খুলিবে না? তাঁহারা বাঙলার সাঁতারুগণ পৃথিবীর সন্তরণ ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করে, ইহা কি চান না? সন্তরণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা ছাড়াও তাঁহাদের যে কোন ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন আছে ইহা কি তাঁহারা কোনদিনই উপলব্ধি করিবেন না? বাঙলায় যে সময় সন্তরণ পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ঠিক সেই সময়ই জাপানেও হইয়াছে। সেই জাপানের সাঁতারুগণ পৃথিবীর সন্তরণ ক্ষেত্রে গৌরব অর্জন করিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইল অথচ বাঙলার সাঁতারুগণ তাহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে, ইহা চিন্তা করিতেও কি তাঁহাদের লজ্জা বোধ হয় না?

পরিচালনার মধ্যে গণ্ডগোল

বাঙলার সন্তরণ পরিচালকগণ গত তিন বৎসর ধরিয়া একটি যুক্তি দেখান যে, বাঙলার সন্তরণ পরিচালনা লইয়া গণ্ডগোল বর্তমান থাকার জন্যই তাঁহারা কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। এই যুক্তি সাধারণ ব্যায়াম উৎসাহীদের হয়তো সন্তুষ্ট করিতে পারে, কিন্তু আমাদের পারে না। কারণ আমরা জানি বাঙলার সন্তরণ পরিচালনা লইয়া যে গণ্ডগোল বর্তমান আছে তাহা কেবল কতকগুলি স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির জন্যই মিটিতেছে না। ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ যাঁহারা এই গণ্ডগোলের সূত্রপাত করেন তাঁহারা মিটমাটের জন্য যে সকল সর্ত দিয়াছিলেন তাহার সামান্য অদলবদল করিয়া লইলে উক্ত এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ যে আপত্তি করিতেন ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। ইঁহারা ভারতীয় সন্তরণ পরিচালনায় বাঙলার প্রাধান্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। আমাদের অনুমান সত্য কিনা জানি না, তবে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের ও ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের মধ্যে যে সকল পত্রালাপ হইয়াছে তাহার কতকগুলি পাঠ করিয়াই আমাদের এইরূপ ধারণা করিতে হইয়াছে। এই সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও গণ্ডগোলের কারণগুলি বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না যে, এতদিন ধরিয়া ইহা কিরূপে বর্তমান আছে। বাঙলার সাঁতারুগণই বা ইহা কিরূপে বরদাস্ত করিতেছেন? তাঁহারা যদি একত্র হইয়া ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেন তবে এই গণ্ডগোলের অবসান প্রথম বৎসরেই হইত। তাঁহাদের নীরবতাই গণ্ডগোলকারিগণকে এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া গণ্ডগোল চালাইবার সুবিধা দিয়াছে। ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন, ইণ্টার ন্যাশনাল সুইমিং ফেডারেশনের নিকট হইতে ভারতের সন্তরণ পরিচালনার অধিকার লাভ করিয়াছেন অথচ ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন ভারতের সন্তরণ পরিচালনা করিতেছেন, এইরূপ দুইটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব করিতেছে আর বাঙলার সাঁতারুগণ তথা ভারতীয় সাঁতারুগণ নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। এইরূপ দ্বন্দ্ব বর্তমান থাকিলে তাঁহারা যে কোনদিনই আন্তর্জাতিক সন্তরণ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন না ইহা কি তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না? সাঁতারুগণই প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। সুতরাং তাঁহারা যদি বিরুদ্ধতা করেন তবে এই সকল প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব যে থাকিবে না ইহা কি নূতন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে? দীর্ঘ চার বৎসর ধরিয়া যে গণ্ডগোল বর্তমান আছে তাহা আগামী বৎসরে যাহাতে না থাকে তাহার জন্য সাঁতারুগণ এখন হইতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

পৃথিবীর মহিলা সাঁতারুদের ক্রমপর্যায়

ফরাসীর একজন সন্তরণ বিশেষজ্ঞ পৃথিবীর মহিলা সাঁতারুদের এক ক্রমপর্যায় তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। নিম্নে ঐ তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল

১ম	আর হেজার	(ডেনমার্ক)
২য়	আর ভের্নাভিন	(হল্যাণ্ড)
৩য়	এ ষ্টিলজ	(হল্যাণ্ড)
৪র্থ	ওভি পেটার্সন	(ডেনমার্ক)
৫ম	মিস আর্নড	(ডেনমার্ক)
৬ষ্ঠ	জি ক্লাফ্ট্	(ডেনমার্ক)
৭ম	ইউ পোলক	(জার্মানি)
৮ম	বি সোরেনসেন	(ডেনমার্ক)
৯ম	গোয়েণ্ডজিক	(হল্যাণ্ড)
১০ম	জে হ্যারোবয়	(ইংল্যাণ্ড)

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

১ম	আর হেজার	(ডেনমার্ক)
২য়	এফ ক্যারোয়েন	(বেলজিয়াম)
৩য়	এন মার্কী	(আমেরিকা)
৪র্থ	এ হার্ডিন	(আমেরিকা)
৫ম	এ টোমাস্কা	(আমেরিকা)
৬ষ্ঠ	বি হেসার	(আমেরিকা)
৭ম	আর ভেনভিন	(হল্যান্ড)
৮ম	জি ক্রাফ্‌ট্‌	(ডেনমার্ক)
৯ম	মিস গ্রিন্‌	(অস্ট্রেলিয়া)
১০ম	সোল্টজিক্‌	(আমেরিকা)

১০০ মিটার পিঠ সাঁতার

১ম	কর্‌কিন্ট	(হল্যান্ড)
২য়	ভি ফিজিলীন	(হল্যান্ড)
৩য়	ওভি পেটার্সন	(ডেনমার্ক)
৪র্থ	আর হেজার	(ডেনমার্ক)
৫ম	কার্ক মিস্টার	(হল্যান্ড)
৬ষ্ঠ	এন সেনফ্‌	(হল্যান্ড)
৭ম	ব্রুনেস্ট্রম্‌	(ডেনমার্ক)
৮ম	মিস হেভার	(জার্মানি)
৯ম	জ্যাকোভোস্কি	(ডেনমার্ক)
১০ম	জোরগেনসেন	(ডেনমার্ক)

২০০ মিটার বুক সাঁতার

১ম	এম লেন্স্ক	(ব্রেজিল)
২য়	ওয়ালবার্জ	(হল্যান্ড)
৩য়	সোরেনসেন	(ডেনমার্ক)
৪র্থ	ভাইলস্‌লাজার	(জার্মানি)
৫ম	আই স্মিট্‌	(জার্মানি)
৬ষ্ঠ	মিস বার্ল্যান্ড	(হল্যান্ড)
৭ম	মিস হিসিলার	(হল্যান্ড)
৮ম	মিস পিসাইডা	(জার্মানি)
৯ম	ভিডি কার্কোভ	(বেলজিয়াম)
১০ম	মিস স্টোরে	(ইংল্যান্ড)

উপরোক্ত তালিকা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ডেনমার্কের মহিলা সাঁতারুগণ পৃথিবীর সন্তরণ ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ইঁহাদের পরেই হল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি, বেলজিয়াম ও ইংল্যান্ডের স্থান।

মহিলা সাঁতারুদের পৃথিবীর রেকর্ড

মহিলা সাঁতারুদের পৃথিবীর রেকর্ড নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

মিস আর হেজার (ডেনমার্ক)
সময়:—১ মিঃ ৫ ১/১০ সেকেণ্ড

২০০ মিটার বুক সাঁতার

মিস এম লেন্স্ক (ব্রেজিল)
সময়:—২ মিঃ ৫৬ সেকেণ্ড।

১০০ মিটার পিঠ সাঁতার

মিস কোরকিন্ট (হল্যান্ড)
সময়:—১ মিঃ ১০ ৯/১০ সেকেণ্ড।

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

মিস আর হেজার (ডেনমার্ক)
সময়:—৫ মিঃ ১২ ২/১০ সেকেণ্ড।
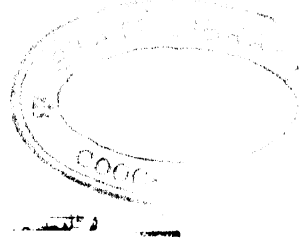
রঙ্গজগৎ

(২৭৩ পৃষ্ঠার পর)

বিলাত-ফেরত ডাক্তার, অমরনাথের আশা, স্বর্গীয়া জননী মায়ার স্বপ্ন, প্রভুভক্ত বৃদ্ধ দয়ালের একমাত্র অবলম্বন, বৃদ্ধ সীতানাথের শেষ আশ্রয়। এই চরিত্রে নবাগত সুদর্শন নটশিল্পী শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রকাশ সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া আমরা মনে করি।

অমরনাথের আদর্শ গৃহিণী মায়ার ভূমিকায় শ্রীমতী পান্নার অভিনয় অনবদ্য হইয়াছে। সোমনাথের প্রিয়া ও পরিণীতা, চঞ্চলা কিশোরী শিবানীর ভূমিকায় নবাগতা অভিনেত্রী শ্রীমতী ভারতী আশ্চর্য সহজ এবং সাবলীল অভিনয়-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। অত্যন্ত উচ্ছল লঘুপ্রকৃতির চরিত্র হইলেও শ্রীমতী ভারতী বিশিষ্ট উজ্জ্বলতায় ফুটিয়া উঠিতে পারিয়াছেন। তাঁহার মুখে রেডিওর সুপরিচিতা গায়িকা ইলা ঘোষের গান দুখানি অপূর্ব হইয়াছে। প্রভুভক্ত স্নেহপ্রবণ ভৃত্য দয়ালের ভূমিকায় শ্রীঅমর মল্লিক, অমরনাথের বন্ধু অক্ষয়বাবুর ভূমিকায় শ্রীশৈলেন চৌধুরী, গ্রাম্য বৃদ্ধ শিরোমণির ভূমিকায় শ্রীইন্দু মুখোপাধ্যায় এবং শিবানীর ছোট ভাই তপনের ভূমিকায় শ্রীমান বুদ্ধদেব সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। ছোট ছোট গ্রাম্য টাইপ চরিত্রে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বোকেন চট্টোপাধ্যায় এবং নরেশ বসুর অভিনয় আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

মোটের উপর 'ডাক্তার' চিত্রটি নানা দিক দিয়া সম্পূর্ণ অভিনব বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং দেশের জনকল্যাণের আদর্শের মধ্য দিয়া নির্মল আনন্দরস পরিবেষণের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা দর্শকসাধারণকে খুশী করিবে বলিয়া আমরা মনে করি।

সমর বার্ত্তা

২৮ অগস্ট।—

বৈকালে কেণ্ট উপকূল ও টেমস নদীর মোহানায় জার্মন বিমানসমূহ প্রবল আক্রমণ চালায়। ব্রিটেনের বিভিন্ন স্থানেও জার্মন বিমানবাহিনী সারারাত্রি বেপরোয়া হামলা চালাইয়াছিল। গত রাত্রে ব্রিটিশ বোমারু বিমান বহর জার্মানি, ইতালি ও ফ্রান্সের প্রধান প্রধান সামরিক কেন্দ্রে আক্রমণ চালায়। জার্মানির প্রধানত কীল উইলহেলমস হ্যাভেনের ডক, কেলস্টারবাখের পাওআর স্টেশন, আগনবুর্গের মেসারস্মিট এয়ারোপ্লেন কারখানা প্রভৃতিই আক্রান্ত হয়। ১ হইতে ৮ অগস্টের মধ্যে ব্রিটেনের ১০৫৫টা বিমান ধ্বংসের জার্মনকৃত এক দাবির প্রতিবাদে ইংরেজদের বিমান বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন, ওই সময়ে সমস্ত রণক্ষেত্রে (ইতালি সুদ্ধ) ইংরেজদের মোটে ২৭৭টা বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে আজ পর্যন্ত মোট ৯৪৩টা বিমান নষ্ট হইয়াছে। বুধবারে জার্মনদের মোট ২৪টা বিমান নষ্ট হইয়াছে।

ব্রিটিশ বেতারে প্রকাশ—সোভিয়েট-রুমানিয়ান সীমান্তে সংঘর্ষের এক অসমর্থিত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দুইপক্ষের ৫০ জন নাকি হতাহত।

২৯ অগস্ট।—

রোমে প্রকাশিত জার্মন নিউজ এজেন্সির সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রে ব্রিটিশ বিমান বহর বার্লিন ও তাহার উপকণ্ঠের উপরে গিয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া হাওয়াই হামলা করে। শহরের কেন্দ্রে বোমা বর্ষণের ফলে অগ্নিকাণ্ড হয়। এই হামলার ফলে ১০ জন নিহত ও ২৮ জন আহত হইয়াছে। লণ্ডনের সরকারী মহলের সংবাদ, বার্লিনের হামলা মাত্র সামরিক লক্ষ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল। জার্মন কর্তৃপক্ষ প্রচার করিতেছেন, তাহা বেসামরিক স্থানে ঘটিয়াছে। ব্রিটেনেও প্রায় সারারাত্রিব্যাপী জার্মন বিমান আক্রমণ ঘটে। লণ্ডনেও ৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট ধরিয়া নাৎসীরা এলোমেলো বোমা নিক্ষেপ করে।

লণ্ডনের ২৮ অগস্টের সংবাদে প্রকাশ, ফ্রান্সের ভিসি গভর্ন-মেণ্ট আজ ফ্রেঞ্চ ক্যামেরুন, উত্তর ক্যালেডোনিয়া এবং আফ্রিকার সাদ এলাকার শাসনকর্তাদিগকে পদচ্যুত করিয়াছেন।

৩০ অগস্ট।—

ব্রিটিশ বোমারু বিমানসমূহ গত রাত্রে বার্লিনে ও বহু শত্রুস্থানে হামলা করিয়া আসিয়াছে। নিউ ইয়র্কের 'দি আমেরিকান' পত্রে বার্লিন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, বার্লিনে কনবুসেরস্ট্রাসে রাস্তার এক স্থানে একটি টাইম বম্ব প্রোথিত হইয়াছে। বোমাটি বিস্ফোরিত হইলে বার্লিনের ভূগর্ভস্থ রেলপথ অচল হইয়া যাইবে। বার্লিনের সরকারী নিউজ এজেন্সির সংবাদ—জার্মন পত্রিকাসমূহে বার্লিন আক্রমণ সম্বন্ধে 'শোণিত লোলুপতা', 'কাপুরুষোচিত কার্য' 'জার্মানির জনসাধারণের প্রাণে ত্রাস বিভীষিকা জাগাইবার জন্য চার্চিলের ধারাবাহিক অভিযান' প্রভৃতি শিরোনামা প্রকাশিত হইতেছে।

আজ প্রাতে বহুসংখ্যক শত্রুপক্ষীয় এয়ারোপ্লেন দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে উপস্থিত হয়। ব্রিটিশ বিমানবাহিনী তাহাদের আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করে। এইসব বিমানের কয়েকটি লণ্ডনের উপর উড়িয়া গিয়া উপদ্রব করিবার চেষ্টা করে; সেখানেও তাহারা বিতাড়ন লাভ করে। শুক্রবার দিন ৪২টা বিমান ধ্বংসের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

বার্লিনের সরকারী নিউজ এজেন্সির সংবাদে প্রকাশ, ভিয়েনায় রুমানিয়া হাঙ্গেরির বিরোধ সম্পর্কে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। জার্মানি ও ইতালি সালিশি করিয়াছেন। এই চুক্তির ফলে রুমানিয়া হাঙ্গেরিকে ট্রানসিলভেনিয়ার ৪ হাজার বর্গকিলোমিটার স্থান ছাড়িয়া দিবে।

৩১ অগস্ট।—

নিউ ইয়র্কের সংবাদ—ফীল্ড মার্শাল গোয়েরিং আজ এয়ারোপ্লেনে লণ্ডনের উপর যান। ওই বিমান ভূপাতিত হয়; মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য লণ্ডনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ব্রিটিশ বিমান বিভাগের একজন অফিসার 'ইহা নিতান্তই অসম্ভব' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন! ব্রিটিশ বিমান বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, গত রাত্রে ব্রিটিশ বিমান বহরের এক শক্তিশালী দল বার্লিনের সামরিক স্থানসমূহে পুনরায় হামলা করিয়াছে। জার্মনরাও টেমস নদীর মোহানা, দক্ষিণ-পূর্ব ইংলাণ্ডে ও লণ্ডনের এক শহরতলিতে হাওয়াই হামলা করিয়াছে। দুই দিনে ১০৮টা জার্মন বিমান ও ৪১টি ব্রিটিশ বিমান বিনষ্ট হইয়াছে।

বেলগ্রেড হইতে লণ্ডনে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ, ৩০ অগস্টের বেলা ছয়টা হইতে বুখারেস্ট-এর সহিত বেলগ্রেডের টেলিফোন যোগাযোগ ছিন্ন হইয়াছে।

১ সেপটেম্বর।—

সমুদ্রে পতিত বৈমানিকদের উদ্ধার জন্য ৬৪টা ক্রস-চিহ্নযুক্ত জাহাজ জার্মনরা ইংলিশ চ্যানেলে ভাসাইবে এবং তাহাদের উপর যেন আক্রমণ চালানো না হয় এই মর্মে জার্মনরা যে প্রস্তাব সুইস গভর্নমেন্টের মারফতে ইংরেজদের নিকট জানাইয়াছিল তাহা ব্রিটেন অগ্রাহ্য করিয়াছে।

রুমানিয়ার অঙ্গচ্ছেদে রুমানিয়ায় দারুণ বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ, কৃষকনেতা শ্রীযুক্ত মানিউ হিটলার ও মুসোলিনির নিকট তার করিয়া এই বাঁটোয়ারা বাতিল করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

২ সেপটেম্বর।—

গত রাত্রে লণ্ডনে বিমান আক্রমণ ঘটে নাই। ফরাসী উপকূলে ইংরেজদের প্রবল বিমান আক্রমণই তাহার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। ইংলাণ্ডের অন্যান্য কয়েক স্থান ও ওয়েলসএর একটি শহরে জার্মনরা হামলা করিয়া গিয়াছে। আজ ভোরবেলা বার্লিনে দীর্ঘকালব্যাপী বিমান আক্রমণের সংকেত ধ্বনি হইতে থাকে। নিউ ইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, বার্লিনের নাৎসী কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে, মিউনিকের উপরে ৪০ মিনিট ব্যাপী আকাশযুদ্ধ হইয়াছে। ভিসির সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটিশ বিমানবহর ফ্রান্সের জার্মন বিমান ঘাঁটি ও ইংলিশ চ্যানেলের ফরাসী উপকূলের বন্দরসমূহের উপর প্রবল হামলা চালাইয়াছিল।

জার্মন নিউজ এজেন্সির নিকট প্রেরিত বুখারেস্টএর এক সংবাদে প্রকাশ ভিয়েনা বাঁটোয়ারায় রুমানিয়ার বিক্ষোভ ক্রমশ প্রবলাকার ধারণ করিতেছে। জার্মনরাও আক্রান্ত হইতেছে। প্রকাশ বৃহস্পতিবার হইতে হাঙ্গেরির সৈন্যদল ট্রানসিলভেনিয়া দখল শুরু করিবে।

৩ সেপ্টেম্বর।—

গতকল্য ওআশিংটনে এই মর্মে এক ইঙ্গ-মার্কিন নৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনকে অবিলম্বে ৫০টা ডেস্ট্রয়ার দিবে। পরিবর্তে ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রকে ৯৯ বৎসরের উত্তর-আমেরিকার সমুদ্রে ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত বিভিন্ন স্থানে কতক-গুলি নৌঘাটি ও বিমানঘাঁটি স্থাপনের সুবিধা দিবে। চুক্তি ছাড়াও ব্রিটেন আমেরিকাকে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও বার্মুদায় ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার দিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট এই দানকে মহানুভবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রুমানিয়ার অঙ্গচ্ছেদের ফলে রুমানিয়ায় সংকট বাড়িয়াই চলিয়াছে। জেনারেল দ্রাগালিনকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। আরও ৩ জন জেনারেল পদত্যাগ করিয়াছেন।

সাইলসএর সংবাদ—ইন্দোচীনের ভিতর দিয়া জাপ সৈন্য-দলকে অগ্রসর হইতে দিবার দাবি সংবলিত জাপানকৃত এক চরম-পত্র ইন্দোচীন অগ্রাহ্য করিয়াছে।

৭ম বর্ষ । শনিবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৪৭ সাল Saturday, 14th September, 1940 ।৪৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙলার কাপড়—

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে বাঙলার তাঁতের কাপড় ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কলিকাতার ওয়েলিংটন স্ট্রীটে কিছুদিন হইল বঙ্গীয় তাঁত শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শনীর উদ্যোক্তৃবর্গের নিকট নিম্নলিখিত আশীর্বাণী প্রেরণ করিয়াছেন—"বাঙলার তাঁত থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে, যথাসম্ভব একান্তভাবে সেই কাপড়ই বাঙালী ব্যবহার করবে বলে যেন পণ করে। একে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা। উপবাসক্লিষ্ট বাঙালীর অন্নপ্রবাহ যদি অন্য প্রদেশের অভিমুখে অনায়াসে যেতে থাকে, তবে মোটের উপর তাতে সমস্ত ভারতেরই ক্ষতি। বাঙালীর ঔদাসীন্যকে ধাক্কা দিয়ে দূর করা চাই। কলিকাতার ও অন্যান্য প্রাদেশিক নগরের মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য হবে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাঙলার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ প্রচার করা এবং বাঙালী যুবকদের মনে সেই উৎসাহ জাগানো, যাতে বিশেষ করে তরুণ বাঙালীরা হাতের ও কলের জিনিস ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়।" স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙলার তাঁতীদের অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছিল; কিন্তু আজ বাঙলার তাঁতীদের ঘরে ঘরে হাহাকার—শান্তিপুর, টাঙ্গাইল প্রভৃতি যে সব স্থানের তাঁতের কাপড়ের আদর ছিল, সেই সব জায়গার তাঁতীরাই আজ দিনরাত খাটিয়া দুই মুঠা ভাত যোগাড় করিতে পারে না। কাপড়ের জন্য বাঙালী টাকা কম খরচ করে না, বিশেষত এই পূজার বাজারে; কিন্তু সে টাকা বাঙালীর হাতে যায় না, যায় বাহিরে। রবীন্দ্রনাথের বাণী বাঙালীকে যদি বাঙলার তাঁতের এবং বাঙলা দেশের কলের কাপড় ব্যবহার করিতে প্রণোদিত করে, তাহা হইলে দরিদ্রের অন্ন জুটিবে এবং দেশের সেই বড় সেবা। শৌখিনতার সঙ্গে সঙ্গে সেবার প্রবৃত্তি বাঙলা দেশে সত্য হইয়া উঠুক।

হক সাহেবের অভিযোগ—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক মহাত্মা গান্ধীর কাছে এক কড়া চিঠি লিখেন। এই চিঠিতে তিনি মহাত্মাজীকে বলেন—কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক রথচক্রের পেষণে কিভাবে অসংখ্য মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন পিষ্ট হইয়াছে, আমি তাহা উদাহরণ দিয়া বহুবার দেখাইয়াছি; অনেক ক্ষেত্রে আপনার মৌনসম্মতিক্রমেই এই সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে।" হক সাহেব অনেক কথাই বলেন এবং যত বলেন, তাহার চেয়ে বেশী কথা ভুলেন এবং ভুলিবার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলকে আক্রমণ করিয়াছেন অনেকবার; কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাঁহার অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে হক সাহেব সেজন্য আপসোসও করিয়াছেন। বেরারের জগদেও হত্যার যে মামলাকে ভিত্তি করিয়া হক সাহেব মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াছিলেন, তাহা যে কত ভিত্তিহীন আকোলার শ্রীযুত বি, এন উদাসীর "আনন্দবাজারে" লিখিত প্রবন্ধেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি ম্যাকলিন, অবশ্য কংগ্রেসী মন্ত্রী নহেন এবং হিন্দুও নহেন। তিনি তাঁহার বিশেষ তদন্তের ফলে লিখেন—"গভর্নমেণ্ট এই মামলায় যে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ইহা সুস্পষ্ট এবং তাঁহারা যে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, জনসাধারণ তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। বস্তুত ইহাও সুস্পষ্ট যে, তাঁহারা যে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূলই হইয়াছিল।"

গান্ধীজীও হক সাহেবের অভিযোগের জবাব দিয়াছেন। তিনি বলেন—এইরূপ বিচার বিভ্রাট ভারতে ইতিপূর্বে আরও ঘটিয়াছে। কিন্তু সেজন্য গভর্নমেণ্টকে কেহ দায়ী করে নাই। মন্ত্রিগণ অভিযোক্তৃ পক্ষের আচরণের

উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, মৌলবী সাহেব তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে কোনরূপ প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই।

হক সাহেব বুঝেন সবই; সুতরাং মহাত্মাজীর কথাতেও যে তিনি বুঝিবেন, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। জাগিয়া যে ঘুমায় তাহাকে জাগাইবে কে?

তরুণের জাগরণ—

লীগপন্থীরা তাঁহাদের উদ্যমের জবাব পাইয়াছেন তরুণদের নিকট হইতে। আমরা ইহা আশা করিয়াছিলাম। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী ছাত্রগণ এক সভা করিয়া এই সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে যে, "মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছাত্রগণ বড়লাটের সর্বশেষ বিবৃতি এবং তৎসম্পর্কে ভারতসচিবের বক্তৃতা পড়িয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে। কংগ্রেস পক্ষ হইতে সহযোগিতার যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, বড়লাট ও ভারতসচিব তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবার ভারতবর্ষের সহজাত অধিকার অস্বীকার করিয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যে মনোবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা কঠোরভাবে তাহার নিন্দা করিতেছি এবং কংগ্রেস সভাপতিকে এই নিশ্চয়তা দিতেছি যে, আসন্ন সংগ্রামে আমরা সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করিব।"

লীগপন্থীরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। এ বিষয়ে তরুণ মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, আলীগড়ের ছাত্রদের গৃহীত প্রস্তাবেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। আমরা পূর্বেই আন্দোলনের মর্মকথা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছি; বলিয়াছি যে, ভারতের স্বাধীনতার আদর্শই তরুণদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে। এ যুগের ইহা দান, ফলে কত সাম্প্রদায়িকতামূলক মনোবৃত্তি তরুণদের প্রবৃত্তির পক্ষে স্বাভাবিক হইতে পারে না। তরুণ স্বার্থের হিসাবের চেয়ে আদর্শকে বড় বুঝে। আলীগড়েও সেই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সেদিন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার আবদুল হালিম কানপুর কলেজের ছাত্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—'পাকিস্থান পরিকল্পনা যেমন অকার্যকর, তেমনই নির্বোধ। কেমন করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করা যায়, বর্তমানে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সম্মুখে তাহাই একমাত্র প্রকৃত সমস্যা।' এবং সেই সমস্যাকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দু-মুসলমান সংহতিবদ্ধ হইয়া উঠিবে। মধ্যযুগীয় 'মনোবৃত্তিগ্রস্ত উচ্চ আদর্শের অনুপ্রেরণাবিহীন স্বার্থান্ধ দলের যত জারিজুরি তরুণদের অন্তরের জ্বলন্ত আবেগে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, আমাদের ইহাই একমাত্র ভরসা।

"বন্দে মাতরম্" বিভীষিকা—

বাঁকুড়া কলেজের কর্তাদিগকে "বন্দে মাতরম্" বিভীষিকা কেন পাইয়া বসিল বুঝা যায় না। কলেজের কর্তৃপক্ষ "বন্দে মাতরম্" সংগীত নিষিদ্ধ করার জন্য কলেজের বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন বন্ধ রাখা হইয়াছে। ছেলেরা কলেজের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়াও কোন ফল পায় নাই। তাঁহারা "বন্দে মাতরম্" গান কিছুতেই বরদাস্ত করিবেন না, ইহার ফলে ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" ভারতের জাতীয় সংগীত। বাঙলার ছেলেদের মনের উপর এই সংগীতের প্রভাব থাকিবে ইহা স্বাভাবিক, শুধু তাহাই নহে, স্বদেশ প্রেম যদি অপরাধের জিনিস না হয়, তাহা হইলে "বন্দে মাতরম্" সংগীতের প্রতি ছাত্রদের তেমন টান থাকা উচিতও বটে। ছাত্রদের তরফ হইতে অপরাধের কোন কাজ হইয়াছে এ কথা কিছুতেই বলা যায় না—"বন্দে মাতরম্" সংগীত নিষিদ্ধ করিয়া কলেজের কর্তৃপক্ষই চাঞ্চল্যের কারণ সৃষ্টি করিয়াছেন। দায়ী তাঁহারাই, ছেলেরা নয়। কলেজের কর্তৃপক্ষের এই রকম অনুচিত একগুঁয়েমির ফলেই অনর্থ দেখা দেয়; অথচ যত দোষ পড়ে গিয়া ছাত্রদের ঘাড়ে। পর পর কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা এমন ব্যাপার দেখিলাম। অনর্থক অশান্তি সৃষ্টি করিবার এই বাতিক বাঙলা দেশের কোন কোন কলেজের কর্তৃপক্ষের অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে এখনও দূর হইল না, ইহাই দুঃখের বিষয়। শুধু তাহাই নয়, দেশবাসীর পক্ষে লজ্জার বিষয়।

বাঙলায় নৌ-নির্মাণ—

মহাকবি কালিদাস নৌ-সংগ্রামে বাঙালীর শৌর্যের পরোক্ষভাবে প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বাঙালীর সেদিন আর ত নাই। এই দুর্দিনে সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙলা দেশে সরকারের সাহায্যে জাহাজ নির্মাণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে সংকল্প গৃহীত হইয়াছে তাহা সুখের বিষয়। অবশ্য বর্তমান বাঙলা সরকারের এদিকে গরজ যতখানি তাহাতে এই সংকল্প অনুযায়ী কাজ কতটা হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। শ্বেতাঙ্গ সদস্যগণ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, কারণ ভারতবাসীদের উদ্যোগে জাহাজী ব্যবসা যদি আরম্ভ হয় এবং সে ব্যবসা যদি সরকারের সাহায্য পায়, তাহা হইলে তাঁহাদের ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। শ্বেতাঙ্গদের এইরূপ মতিগতির জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এমন চেষ্টা এ পর্যন্ত সফল হয় নাই। এবার ভারত সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন; কিন্তু বাঙলা দেশে এই ব্যবসা গড়িয়া উঠে এমন ইচ্ছা তাঁহাদের বোধ হয় নাই। কারণ দেখা যাইতেছে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব এই সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য যখন কলিকাতায় আসেন, তখন শ্বেতাঙ্গ প্রভাবিত কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্টের আপত্তি শুনিয়াই বাঙলা দেশে এই ব্যবসার সুবিধা হইবে না সিদ্ধান্ত করেন এবং তাহার ফলে সিন্ধিয়া কোম্পানিকে যাইতে হয় মাদ্রাজের দিকে। বাণিজ্য সচিব, এই বিষয়ে বাঙলা সরকারের সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ করা পর্যন্ত প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বাঙলার মন্ত্রীদের এই দিকে ঝোঁক কতখানি, ইহা হইতেই বুঝা যাইবে।

লণ্ডনের উপর বোমাবর্ষণ—

লণ্ডনের উপর জার্মানদের উড়োজাহাজের ভীষণ আক্রমণ

আরম্ভ হইয়াছে। গত শনিবার এবং রবিবার এই আক্রমণ যেরূপ তীব্র আকার ধারণ করে, এরূপ কোন দিন ঘটে নাই। শনিবারের আক্রমণের ফলে প্রায় ৪ শত লোক নিহত এবং ১৩ শত হইতে ১৪ শত লোক আহত হয়; রবিবারের আক্রমণ শনিবারের অপেক্ষা প্রবলতর হইলেও হতাহতের সংখ্যা পূর্বদিনের অপেক্ষা কম হয়। প্রকাশ যে, রবিবারের আক্রমণে ৩ শত লোক নিহত এবং ৩ হাজার লোক আহত হইয়াছে। এই আক্রমণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই মনে হয়। কিছুদিন পূর্বে মিঃ চার্চিল বলিয়াছিলেন যে, সেপ্টেম্বর মাসেই যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা ভীষণ হইয়া উঠিবে। সুতরাং হিটলারী আক্রমণের জোর বাড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে। শনিবার এবং রবিবারের আক্রমণের ফলে লণ্ডন শহরের ক্ষতি কম হয় নাই। আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে এই আক্রমণের ভীষণতার কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। জার্মানেরা তাহাদের ক্ষতির দিকে দৃকপাত না করিয়া যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে; কারণ যুদ্ধ বিলম্বিত হইলে অবস্থা নানাদিক হইতে তাহার প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে এমন কারণ রহিয়াছে। সুতরাং কিছুদিন তাহারা খুবই জোর দিবে, লণ্ডন শহরের কোন একটা অঞ্চল জনশূন্য করিয়া তাহারা প্যারাসুট হইতে কিছু সৈন্য নামাইতেও না পারে, এমন নয়; কিন্তু তাহার ফল তাহাদের নিজেদের পক্ষেই মারাত্মক হইবে। সমুদ্রপথে সংযোগসূত্র স্থাপন করিতে না পারিলে বিচ্ছিন্ন সেনাদল, ইংরেজের বিপুল বাহিনীর গুলী বৃষ্টিতে বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, ইহা সুনিশ্চিত। ইংরেজের পক্ষে আজ কঠোর পরীক্ষার দিন আসিয়া পড়িয়াছে। স্পেনীয়েরা একবার ইংলণ্ড আক্রমণের আয়োজন করিয়াছিল, একবার বড় রকমের আয়োজন করেন নেপোলিয়ান; কিন্তু শত্রুপক্ষের অগ্নানল কোনদিন ইংলণ্ডকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আজ ইংলণ্ডের রাজধানীর উপর বোমা বৃষ্টি হইতেছে; কিন্তু ইংরেজ শত্রুপক্ষের আক্রমণে বিচলিত হইবে না। জর্মানির ইংলণ্ড আক্রমণের উদ্যমের ফলাফল কি দাঁড়ায় সত্বরই দেখা যাইবে।

যুদ্ধ ও ভারত—

পশ্চিমে লণ্ডনের উপর আক্রমণে জার্মানেরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। শুনা যায়, ইংলণ্ডের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য জার্মানেরা ৭ শত উড়ো জাহাজ নিযুক্ত করিয়াছে এবং ঐসব উড়ো জাহাজ ফ্রান্সের বা বেলজিয়মের উপকূলবর্তী ঘাঁটি হইতে আসিতেছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। জার্মনদের ক্ষতি যথেষ্ট হইতেছে, অনেক উড়োজাহাজ ভূপাতিত হইতেছে এবং বিমানবীর হতাহত হইতেছে। কিন্তু জার্মানেরা শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেই। তাহারা প্রতি মাসে ৩ হাজার খানা উড়ো জাহাজ তৈয়ার করিতেছে বলিয়া শুনা যায় এবং সম্ভবত সে-সবগুলিই ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য প্রয়োগ করিবে। লণ্ডন শহর চুরমার করাই তাহাদের লক্ষ্য; কারণ এই শহরটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল, কিন্তু লণ্ডন শহর যদি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ও, তাহাতেও যুদ্ধের হেস্তনেস্ত হইবে না। ইহার পরে হইল ভূমধ্যসাগরের কথা। ভূমধ্যসাগর তটে ব্রিটিশের কেন্দ্রশক্তি রহিয়াছে মিশরে। এখানে যদি ইটালি একা থাকে, তাহা হইলে সুয়েজ, মিশর এবং প্যালেস্টাইনে ইংরেজকে সে কাবু করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু জার্মান স্থল সৈন্যদল বলকানের ভিতর দিয়া এসিয়া মাইনরে আসিতে পারে এবং তথা হইতে মিশরে হানা দিতেও চেষ্টা করিতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই দিকে তীব্র যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। ভারতবর্ষকে এই আশঙ্কার বিচার করিতে হইবে, আপাতত তেমন আতঙ্কের কারণ দেখা না গেলেও এমন আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলে ভারতের ৪০ কোটী অধিবাসী স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত এবং ইংরেজের বল সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইত।

ভারতবাসীর সম্মান—

হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাজীউদ্দীন এ বৎসর পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ পান সাহিত্যের নোবেল পুরষ্কার এবং পরে ডাক্তার চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামণ ফিজিক্সের নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। অধ্যাপক রাজীউদ্দীন তৃতীয় ভারতবাসী-যিনি এই পুরষ্কার পাইলেন। দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ দুইবার এই সম্মানে সম্মানিত হইল, ভারতের পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়। আমরা ভারতের এই কৃতী সন্তানকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সমাজ সংস্কর বিধি—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে দুইটি সমাজ সংস্কারমূলক বিল সম্প্রতি উপস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুত মনোমোহন দাস হিন্দু বিধবা বিবাহ বিল এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস পণ-প্রথা নিষেধ বিল পাস করাইতে চাহেন। মনোমোহনবাবুর বিলের উদ্দেশ্য হইল হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহের সম্প্রসারণ করা; তাঁহার বিশ্বাস এই যে, বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন-সম্মত করিলেও হিন্দু সমাজের সর্বস্তরে বিধবা বিবাহ প্রয়োজনানুরূপ প্রচলিত হয় নাই। বিধবাদের বিবাহ আরও বাড়ে তিনি ইহাই চাহেন এবং এজন্য তিনি এই বিধান করিতে চাহেন যে, কোন মৃতদার ব্যক্তি বিধবা ছাড়া কুমারী বিবাহ করিতে পারিবে না; কুমারী বিবাহ করিলে তাহার ছয় মাস পর্যন্ত জেল হইতে পারিবে। হিন্দু সমাজের সর্বস্তরে বিধবাদের বিবাহ আরও প্রচলিত হওয়া উচিত, এই মত আমরাও সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং আমাদের বিশ্বাস এই যে, আমাদের মধ্যে আধুনিকতার যাহারা গর্ব করি, তাহারাও কার্যত এই সংস্কারের সম্মুখীন হইতে চাহিনা। ইহার ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে বিধবা বিবাহ আজও প্রচলিত হইতেছে

না, উচ্চ শ্রেণীরা ওদিকে অগ্রসর না হইবার ফলে অনুন্নত সম্প্রদায়ও বিধবাকে বিবাহ না দেওয়াই সম্ভ্রান্তজনোচিত রীতি বলিয়া মনে করিতেছে। হিন্দু সমাজের উচ্চশ্রেণীকে অধিকতর অগ্রসর হইয়া এই কুসংস্কারকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু বিলে দণ্ডাদেশের যেমন বিধি করা হইয়াছে, তাহা অবাস্তব ও অদ্ভুত রকমের বলিয়াই আমাদের মনে হয়। দ্বিতীয় বিল সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, বিবাহে পণপ্রথা যে নিন্দনীয়, একথা বলেন সকলেই; অথচ নিজের বেলায় সেই দোষের কাজটিই আবার গুণ হইয়া দাঁড়ায়। সমাজে এই নৈতিক দুর্বলতা থাকিতে শুধু আইন করিয়াই ঐ পাপ দূর হইবে না। এ পাপকে দূর করিতে পারে দৃঢ়চেতা তরুণের দল। এই বিলের প্রচারকার্যে সমাজে যদি নৈতিক একটা সাড়া জাগাইতে পারে নির্মম পণপ্রথার বিরুদ্ধে তবে সে হিসাবে ইহার সার্থকতা আছে।

কর্পোরেশন সংহারপর্ব—

কয়েকদিন ধরিয়া বিতর্কের পর গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপাল সংশোধিত বিল মন্ত্রিপক্ষের জোটবাঁধা দলের ভোটের জোরে সিলেক্ট কমিটিতে গিয়াছে। এমনটি ঘটিবে ইহা জানাই ছিল। সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছে, এই সম্পর্কে কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ আবদার রহমান সিদ্দিকীর আচরণ। ঢাকার নবাব সাহেব বিলটি উপস্থিত করিতে গিয়া স্বীকার করেন যে, বিলটি প্রতিক্রিয়াশীল এবং উন্নতির পরিপন্থী। তবুও তাঁহারা বিল পাস করাইবেন কেন? কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব তাঁহারা চাহেন, অর্থাৎ কর্পোরেশনের উপর হইতে জনসাধারণের অধিকার গ্রহণ করায় কর্পোরেশনের যাহারা কর যোগায়, তাঁহারা তাহা লোপ করিবেন, গণতান্ত্রিকতা মানিবেন না, তাঁহার এমন মনোবৃত্তির মূলতত্ত্ব ধরিতে বেগ পাইতে হয় না; কিন্তু কর্পোরেশনের গণতান্ত্রিক অধিকারের মর্যাদা জনসাধারণের অধিকারের মর্যাদা নষ্ট করিবার পক্ষ সমর্থন করিবেন। যিনি কর্পোরেশনের করদাতাদের কৃপায় নির্বাচিত হইয়াছেন সেই মেয়র কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠার পরিচয়ই ইহা নিশ্চয়! সিদ্দিকী সাহেব বলেন, কর্পোরেশনের স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, এই সময়ে কর্পোরেশনের সত্যকার হিত করিতে হইলে উহার সুনাম রক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কর্পোরেশনের স্বাধীনতা লোপ করিয়া তাহাকে গোলামখানায় পরিণত করা কর্পোরেশনের সুনাম রক্ষার পথই বটে! এমন সব যুক্তির অন্তর্নিহিত নির্লজ্জতা আমাদের অন্তরকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। এমন সব কথা শুনিয়া কবি হেমচন্দ্রের উক্তিই আমাদের স্মরণ হয় গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি। সজীব জাতি স্বাধীনতাকেই বড় বলিয়া বুঝে এবং পথের ভুলভ্রান্তি বা দোষত্রুটির জন্য স্বাধীনতাকে বিকাইয়া দেয় না। প্রাণশক্তিই যেখানে পিষ্ট হয়, সেখানে সংশোধনের সকল কথা অবান্তর।

পুলিশের প্রধান কাজ—

কলিকাতা পুলিশের ১৯৩৯ সালের কার্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে প্রকাশ ব্রিটিশের যুদ্ধোদ্যমে বাধা দিবার জন্য "তথাকথিত বামপন্থী"রা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; ইহাদের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন বন্ধ করিবার নিমিত্ত পুলিশ বিশেষভাবে বিব্রত আছে। ঐসব বামপন্থীরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিবার জন্য সকল রকমে চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের পিছনে আবার নাকি রহিয়াছে কমিউনিস্ট দল, তাহারা গণ-বিপ্লব ঘটাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সরকার সদাসর্বদাই বিধিবিহিত শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন এবং তার ফলে মনিবদের মহিমায় মজুরেরা মুগ্ধ হইতেছে। মনিবেরা যেক্ষেত্রে মজুরদের উপর এমন সহানুভূতিসম্পন্ন সেখানে তথাকথিত বামপন্থীদের আন্দোলন আপনা হইতেই নিভিয়া যাইবার কথা। যেভাবে ধরপাকড় এবং খানাতল্লাশী দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে এ সত্য প্রমাণিত হয় না নিশ্চয়ই। ভারত রক্ষার জন্য কলিকাতা পুলিশের এই অত্যধিক উৎসাহ এবং আগ্রহের জন্য কলিকাতাবাসী যদি পুলিশের গুণগান না করে, তবে তাহারা যে অকৃতজ্ঞ এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মনোবিকাশের ছন্দ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্রনাথের বিশ্রাম কক্ষে ক্লাস শুরু হ'ল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষা' বই-এর মনোবিকাশের ছন্দের বিষয় সম্বন্ধে ভূমিকাস্বরূপে বললেন, তিনি অনেক দিন ধ'রে বিভিন্ন গাছের এবং লতার পাতার বৃদ্ধির এবং বিকাশের ছন্দ পর্যবেক্ষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপে সেদিন সংগৃহীত হিমঝুরি গাছের একটি ছোট্ট পাতাসমেত ডাল হাতে তুলে দেখালেন যে ডালে পাতাগুলি একটি বিশেষ রীতি রক্ষা ক'রে বিকশিত হয়েছে। তিনি ওই ডালের পত্রসজ্জার প্রতি উপস্থিত শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে দেখিয়ে দিলেন যে, পাতাগুলি সেই গাছের বিশেষ ছন্দ-নিয়ম রক্ষা ক'রে প্রকাশিত হয়েছে।

এক নম্বর চিত্র দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে, "ক" চিহ্নিত একটি ডালের দুধারে দুটি পত্রের প্রকাশ এবং ছন্দে যতি রক্ষার নিয়মে কিছুদূর পর্যন্ত ফাঁক রক্ষা ক'রে পুনরায় "খ" চিহ্নিত পত্রগুলির প্রকাশ। অবশেষে এক জায়গায় পৌঁছে দুটি পাতার পাশাপাশি থাকার নিয়মের সমাপ্তি ঘটল তৃতীয় একটি পত্রের আগমে। দ্বিতীয় চিত্রটি চামেলির ডালের। এর ডালের পত্র-বিকাশের সজ্জার মূল ছন্দ প্রায় ১নং চিত্রের অনুরূপ। কিন্তু পাতার অঙ্গ গঠনের স্বাতন্ত্র্য আছে এবং স্বাতন্ত্র্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করলে ১নং চিত্রে বর্ণিত পাতা এবং ডালের ছন্দের বৈশিষ্ট্য নজরে পড়বে। ৩নং চিত্রটি করবী ডালের। এর পত্র-বিকাশের ছন্দ এবং যতি পূর্বোক্ত দুটি চিত্রের ডালপাতার অনুরূপ নয়। এর পত্র-বিকাশের সজ্জায় ফাঁক যতি স্বল্পপরিসর অর্থাৎ তাদের মধ্যে ব্যবধান কম।

—অনুলেখক]

মন বিকাশের যে বিভিন্ন ধরনের স্বাভাবিক নিয়মস্বাতন্ত্র্য রয়েছে তাদের মধ্যে বুদ্ধি বিকাশের এবং মনন শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির যেসব কারণ রয়েছে সেগুলিকে দেখতে পারি না, বুঝতে পারি না। ফলে আমাদের হাতে তাদের হতে হয় লাঞ্ছিত এবং তাদের সর্বদিকের উন্নতির পথে আমরা সহায়ক না হয়ে হই অন্তরায়।

সে পুরনো দিনের কথা। শান্তিনিকেতনে শিশুদের শিক্ষাদান কর্তব্যে যখন অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে আমিও আংশিকভাবে যুক্ত ছিলেম তখন আমি এই ছন্দ-নিয়মের সত্যকে মনে রেখে ছেলেদের সব দিক দিয়ে যতটা সম্ভব পর্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা করেছি। তখন আমার স্নেহভাজন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এই বিদ্যালয়ে ছিলেন। তিনি আমেরিকা ইত্যাদি দেশের শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলেন। তাঁর যোগ্যতার কথা ভেবেই তাঁকে বিশেষ ক'রে শিশুদের শিক্ষা দেবার ভার দিয়েছিলাম। এদেশের দুর্ভাগ্য, যাঁরা বিদ্যাদানে পটু, যাঁরা সত্যিকার
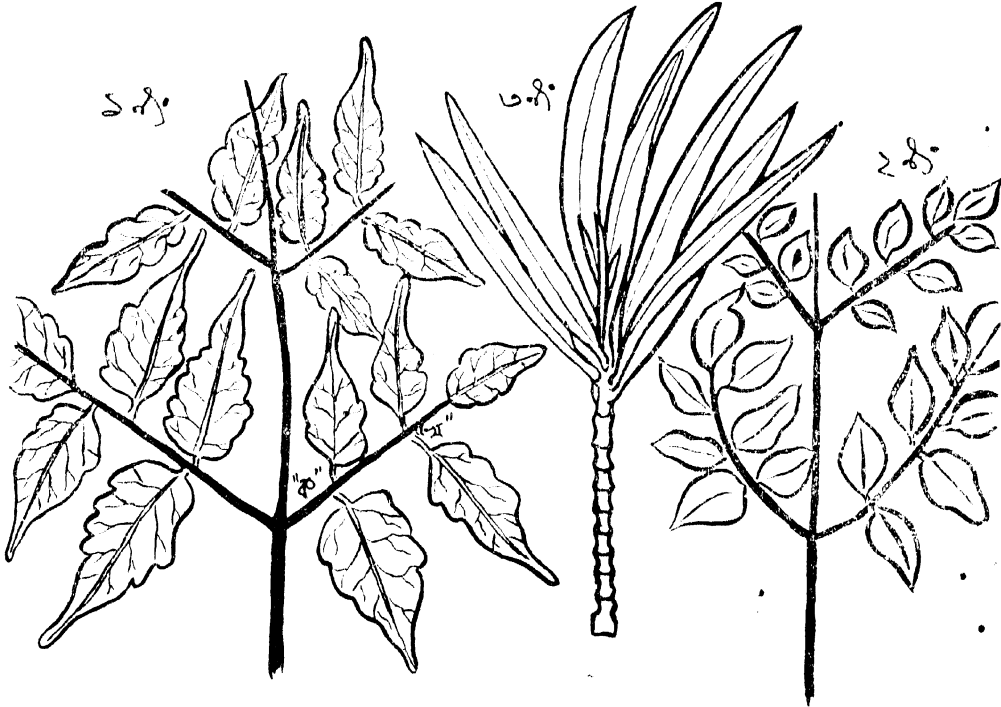
যা কিছু সজীব, যার মধ্যে প্রাণের বেগ রয়েছে তার আত্মপ্রকাশের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় ছন্দে; যা মৃত তার মধ্যে ছন্দের লীলা নেই। ভিন্ন ভিন্ন শিশুদের শিক্ষাদান ব্যাপারে নিজেদের অক্ষমতা বশত, আমরা তাদের দেহের বৃদ্ধি, তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত মনের গতির মধ্যে যে সজীব ছন্দের অর্থাৎ দেহ

বিদ্বান্, যাঁরা বিদ্যাদানের কৌশলকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করেছেন, তাঁরা সকল ক্ষেত্রে না হোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু কিংবা বালকদের শিক্ষাদান কার্যকে নিজেদের ভারী পদমর্যাদার বিরোধী বিষয় বলে গণ্য করেন। ছোট ছেলেদের পড়ানো যেন তাদের মর্যাদার বাইরের বিষয়। শিশু এবং বালকদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব চর্চা করা

তাঁদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে নেই। এ'দের কাছে বালক এবং শিশুদের এত বড় অসম্মান বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়।

সেইজন্যই সন্তোষ যখন বিলাত থেকে ফিরে এলেন তাঁকে শিশুশিক্ষার ভার দিলাম। এ ভার তাঁকে দেবার অন্যতম কারণ ছিল, তিনি আমার কথার যথার্থ সত্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করতেন, গ্রহণ করবার চেষ্টা করতেন। 'সব কিছু জানি সব কিছু বুঝি, নতুন আর কিছু বোঝবার শোনবার প্রয়োজন নেই' এই শ্রেণীর মারাত্মক দুর্বুদ্ধি তাঁর ছিল না। সেইজন্য নিঃসংকোচে তাঁর কাছে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌দের অভিজ্ঞতার কথা, শিক্ষাদান বিষয়, কোথায় কে কি রকমের পরীক্ষার সাধনায় রত আছেন এবং আমি নিজেই বা এ বিষয় কী অনুভব করি, কী বিচার আমার, কী আমি ভাবছি, সব কথাই বলতুম। বিশ্বাস ছিল তিনি সেসব কথাকে তাঁর শক্তি সামর্থ্যানুযায়ী কাজে লাগাবার চেষ্টা করবেন।

আমার বেশ মনে পড়ে আজকের দিনে বিদেশে ইউরোপে বিশিষ্ট মনোবিদেরা এবং শিক্ষাবিদেরা যেসকল দিক্ দিয়ে শিশুশিক্ষার পরীক্ষা করছেন, যেসব প্রণালীকে অবলম্বন করেছেন শিশুদের মানুষ ক'রে তোলবার জন্য, অনেক দিন আগেই এসব বিষয় আমি সন্তোষের কাছে এবং তৎকালীন অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে ইঙ্গিত করেছিলাম। কিন্তু হ'ল না যা এখানে, তাই সফল হচ্ছে অন্য জায়গায়। অথচ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়টি একাধারে বিদ্যালয় এবং বহুজনের দ্বারা গঠিত একটি পরিবারময় গৃহ। এখানে শিক্ষানৈতিক যে পরীক্ষা সহজে সম্ভব, অন্য কোথাও তা সম্ভব কি না জানি না। তবু আমার আশানুরূপ বিশেষ কিছু হয়েছে কিংবা হচ্ছে ব'লে আমি জানি না। যা হয়েছে সেটার মূল্য এদেশের পক্ষে অনেক; কিন্তু এর চেয়ে আরও অনেক বেশী হ'তে পারত। যাক, যা হবার নয় তা নিয়ে আক্ষেপ করা মিছে।

কিন্তু আজ যা হ'ল না, কালকেও তা হ'তে পারবে না এ কথা সত্য নয়। সুতরাং এ বিষয়ে নিরুৎসাহ না হওয়াই উচিত। সন্তোষকে আমি বলেছিলাম ক্লাসে যেসব ছেলেরা আসে, তাদের প্রত্যেকের একটা স্বতন্ত্র রেকর্ড রেখো—কার স্বাস্থ্য কেমন, কে ওজনে কমছে, কে বাড়ছে, কার স্বাভাবিক দেহবিকাশে বুদ্ধিবিকাশে কী কী কারণে বিঘ্ন ঘটছে, কে সর্ববিষয়ে উন্নতি করতে করতে হঠাৎ কেন থমকে যায়—কেন হঠাৎ তার মধ্যে সাময়িক জড়ত্ব, শৈথিল্য আসে, তাদের ওই সব অবাঞ্ছনীয় ভাবের স্থায়িত্ব কত দিন, কে ভালো পড়াশোনা করতে করতে হঠাৎ কেন পিছিয়ে পড়ে, কেই বা বরাবর dull থেকে হঠাৎ কোন্ বয়সের থেকে কোন্ মাসের থেকে এনার্জিটিক এবং বুদ্ধিমান হ'তে শুরু করে; কোন্ ছেলে ক্লাসের কোন্ পর্বে অর্থাৎ যাকে বলে কোন্ আওয়ারে (hour) বেশ চনমনে থাকে অথবা অলস অন্যমনস্ক থাকে ইত্যাদি। এসব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখলে বুঝতে পারা যায় কার মনের এবং জীবনের বিকাশ কি ছন্দে চলে, কার গতির মধ্যে কোথায় বাঁক বা সে বাঁকের ধারা কী, কোথায় চলনে তার যতি। এসব বিষয় ধৈর্যের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা দরকার এবং এই ভাবে পর্যবেক্ষণ অবশ্য তাঁরাই করতে পারেন যাঁরা এসব বিষয়ের গুরুত্বকে মেনে নিয়ে, শিক্ষাকে নিজের জীবনে সত্য ভাবে গ্রহণ করেন। অশিক্ষিত যাঁদের মন তাঁদের দ্বারা এ কাজ হওয়া সম্ভব নয়।

জীবন এবং মনের বিকাশের বিষয় মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্যকে বাদ দিয়ে নয়। দুটোই চলে পাশাপাশি তাল মিলিয়ে। কী বিশেষ কারণে এবং নিয়মে, কেউ দেহে দ্রুত বাড়তে বাড়তে হঠাৎ থামে, অথবা বেঁটে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় বাড়তে থাকে দ্রুত গতিতে, এসব বিষয় জানবার প্রয়োজন আছে। এই জানার ভিতর দিয়েই সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। মানুষের দেহে মনে, কাজে কর্মে, ভাব এবং গতির, জড়ত্বের এবং সজীবতার ক্রিয়া পদ্ধতির লক্ষণসমূহকে যত বিশেষ ভাবে দেখা যাবে, ততই মানব-জীবন-বিকাশের ছন্দ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে ঘটবে আমাদের পরিচয়। এই ছন্দের নিয়মের বৈলক্ষণ্য গাছপালা লতাপাতা ফুলের মধ্যে কোথাও কোথাও দেখা যায়। বাইরে থেকে মনে হয় অহেতুক, কিন্তু তারও অন্তর্নিহিত হেতু থাকতে পারে। কিন্তু ব্যতিক্রম দিয়ে সাধারণ রীতির প্রতি উদাসীন হবার কারণ নেই।

এই প্রসঙ্গে তোমাদের এই কথা জানা দরকার যে, ছন্দে জীবনের এবং সজীবতার সত্যের প্রকাশ, ছন্দে ধরা পড়ে জীবনের জাগ্রত রূপ, ছন্দ দেয় প্রাণের পরিচয়। কাব্য জগতে এই জন্য সর্ব দেশেই, কেউ কারও সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেই কবিরা সব ছন্দের ভিতর দিয়ে বলেছেন তাদের উপলব্ধির বিষয়কে। আমার বিশ্বাস এই জন্যই প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ মধুর। প্রত্যেকটি গাছের প্রত্যেকটি লতার বাণী প্রকাশ করছে আপনাকে ডাল পালা ও পুষ্পের ছন্দে। ছন্দোময় তাদের বাণী, কেন না তারা সজীব। কাব্যের সজীবত্বকে তার প্রাণের মাধুর্যকে প্রকাশ করে ছন্দ। ছন্দের এই তাৎপর্য-বিষয়টি কবি-কল্পনার বিষয় নয়। চোখ দিয়ে এটা দেখবার, কান দিয়ে শোনবার এবং মন দিয়ে বোঝবার বিষয়।

প্রকৃতির রাজ্যে যেমন এক একটি ঋতুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি তরু লতার আত্মপ্রকাশের বেগের এবং আত্মপ্রকাশে ও নিরুদ্যমতার পরিচয় পাওয়া যায়, আমার বিশ্বাস যদি সতর্কতার সঙ্গে বিষয়টির পর্যবেক্ষণ করা হয়, তা'হলে দেখতে পাওয়া যাবে, এক একটি ঋতুর প্রভাব বিভিন্ন মানুষের মন ও দেহের ক্রিয়াকেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চালনা করে। এরকম হওয়াটাই সংগত, না হওয়াটাই আশ্চর্যের বিষয়।*

* অনুলেখক—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

মানুষের ঘর

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীহাসিরাশি দেবী
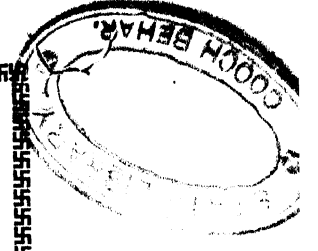
বাড়ি থেকে বার হ'য়ে সে যখন শারদার বাড়িতে এসে প্রবেশ করল সূর্যদেব তখন প্রায় মাথার উপরে উঠেছেন। উঠনের চাতালে ব'সে শারদার বহু পুরাতন চাকর রাম তখন তামাক খাচ্ছিল। সমস্ত বাড়ির নিস্তব্ধতা তার তামাক টানায় শব্দমুখর হয়ে উঠেছে। সরোজ বাড়ির ভিতর এসে দাঁড়াল, একেবারে রামের সামনে। জিজ্ঞাসা করল, "মামাবাবু কোথায় রাম?"

ইতস্তত ক'রে রাম উপরের ঘরটা দেখিয়ে দিতে দ্রুত পায়ে সরোজ এসে দাঁড়াল সেই ঘরের দরজায়। খোলা দরজা দিয়ে দেখলে অবিনাশ এইদিকে পিছন ফিরে টেবিলের উপর নীচু হয়ে ব'সে কি লিখে চলেছে একভাবে। সম্মুখে তার চিরপরিচিত সেই সোডার বোতল, কাচের গ্লাস। পিছনে পদশব্দ শুনে মুখ না ফিরিয়েই অবিনাশ প্রশ্ন করল, "কে বাবা, রামচন্দর?"

দৃঢ়স্বরে সরোজ উত্তর দিলে, "না, আমি সরোজ।"

"সরোজ!" অবিনাশ চমকে মুখ ফেরালে।

সরোজ বললে, "হ্যাঁ, আমি।"

একটু থেমে থেমে অবিনাশ বললে, "তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে সরোজ, নইলে আমাকেই হয়তো যেতে হ'ত তোমার কাছে।"

ব্যাঙ্গের স্বরে সরোজ প্রশ্ন করলে, "কিন্তু কেন, শুনতে পাই না।"

অবিনাশের সম্মুখে এমনভাবে কথা বলা তার পক্ষে এই প্রথম। তাই যত সাহস নিয়েই সে তার কৃতকর্মের জবাব চাইতে আসুক, মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা দুর্বলতা নিরন্তর আঘাত করছিল। অবিনাশ চকিতের জন্য একবার দৃষ্টিপাত করল তার মুখের দিকে, একটু হাসি ভেসে উঠল তার ওষ্ঠাধরে, বললে, "পাবে বই কি, এসেই পড়েছ যখন তখন নিশ্চয় শুনতে পাবে।" ব'লে খাতার উপর ঝুঁকে প'ড়ে কি লিখতে লাগল। যেন তার আরব্ধ কাজ শেষ করছে মাত্র তাই তার মধ্যে কোনও চঞ্চলতা নেই, উত্তেজনাও নেই। শান্ত সে। চিরদিনের মত অটুট স্থৈর্য আজও তাকে ঘিরে আছে।

সরোজ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আবার এক সময়ে মুখ তুলে শান্তস্বরে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলে, "শারদা কোথায়?"

এই প্রশ্নটাই যে সে আজ হ'ক কাল হ'ক করতই, এ কথা সরোজ ঠিকই জেনেছিল। তবু একটু চঞ্চল হয়ে পড়ল সে; মনে পড়ল বড় অভিমানেই শারদা এ কথা অবিনাশকে বলতে বারণ ক'রে গেছে। ব'লে গেছে, 'তাঁকে জানিও সরোজ, যে দিন আমার দ্বারায় তাঁর আর কোনও আশঙ্কার কারণ থাকবে না, সে দিন আমি নিজে থেকেই ফিরব, আমার খোঁজ করতে হবে না।' কথাগুলো তার মনে পড়তেই সে বললে, "আমি জানি না।"

দৃঢ় স্বরে অবিনাশ বললে, "মিথ্যে কথা, তুমিই তাকে নিয়ে গেছ; কোথায় রেখে এসেছ তা কেউ জানে না, কিন্তু আমি জানতে চাই।"—

মুহূর্তের জন্য সরোজের মনে হ'ল অবিনাশ যত দোষেই দোষী হ'ক, শারদাকে মিথ্যা প্রতারিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত করার দোষ তার নেই সত্যই সে দাবি তার আছে, কারণ হয়তো একমাত্র শারদাকেই সে ভালবেসেছে। সরোজের মনটা নরম হয়ে এল, তবু জোর দিয়ে বললে, "যদি না বলি?".

"না বলার হেতু?"

"মামীমা বলতে বারণ ক'রে গেছেন।"

এক মুহূর্তে অবিনাশ যেন নিবে গেল, শুষ্ক মুখে ব'ললে, "বারণ ক'রে গেছে? কিন্তু কেন?

সরোজ আবার শক্ত করলে মনকে, বললে, "কেন তা আমি জানি নে, জানতে চাইও নে; আমি জানতে চাই আপনার কার্যকলাপ, আচার ব্যবহার যে পথে দিন দিন এগিয়ে চলেছে সে পথে চলতে কি সত্যিই বিবেচনার কোনও দরকার হয় না?"

অবিনাশ হাসল; বললে, "বটে? ব্যবহারটা কার প্রতি ব'লে অনুমান করছ?"

"আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি। আপনি যাকে সমাজ, ধর্ম, সাক্ষী রেখে একদিন স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রতি আপনার কি কর্তব্য ছিল, কি কর্তব্য আপনি সম্পন্ন করেছেন, যার জন্যে আজ এই অসময়ে অনিচ্ছায় তাকে মৃত্যু বরণ করতে হচ্ছে?"

"বাঃ, শুনতে মন্দ লাগছে না সরোজ, ব'লে যাও, থামলে কেন।"

সরোজ থেমেছিল সত্য, দুর্নিবার ক্রোধে তার বুকখানা কাঁপছিল থেকে থেকে। মনে হ'লে এক ঘুষিতে অবিনাশের মুখের ওই ব্যঙ্গহাস্যের অবশিষ্ট রেখাটুকুও লুপ্ত ক'রে দেয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে প'ড়ে গেল ইন্দুর আর শারদার সেই বেদনাকাতর মুখ, শান্ত দৃষ্টি। কথা হারিয়ে সে নীরবে তাকিয়ে রইল অবিনাশের মুখের দিকে।

অবিনাশ বললে, "আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি সে যুগের ব্রজেশ্বর, গুরুজনের সামনে চোখ তুলে চাইতেও ভয় কর; কিন্তু এখন দেখছি তা নও, থিয়েটারের বুলি আওড়ানোও বেশ আয়ত্ত আছে। যাক সে কথা, তুমি আমার যে স্ত্রী গ্রহণের কথাটা বলছিলে, তার

আদ্যন্ত জান না, জানলে বলতে না এ কথা। দেখ, মানুষ ভালবাসে একজনকেই, দুজনকে নয়। ইন্দুকেও আমি বিয়ে করেছিলাম তার গরিব মা বাপকে কন্যাদায় থেকে রক্ষা করবার জন্যে, ভালবাসবার জন্যে নয়। আর ইন্দুকে আমি ভরণপোষণের যে শর্তে বিয়ে করেছিলাম, তারও তো ত্রুটি রাখছি নি কিছু! আমার বিপুল অর্থসম্পদ, যার থেকে এক কাণাকড়িও আমি নিই নি, সে সমস্তই তার জন্যে রয়েছে। সমস্তই তার, আমার কিছুর দরকার নেই, আমি চাই নে কিছু।"

একটু থেমে সে আবার বললে, "তুমি জানতে না, তাই জানালাম সমস্তই; এখন আমার উপর তোমার যে ধারণা হয় হ'ক, তাতে আপত্তি করব না।"

তার কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে এল, কিন্তু সরোজের মন তাতে সায় দিলে না। বললে, "কিন্তু সে তো বাইরের দিক, মনের দিক থেকে তাঁকে কি এমন দিয়েছেন যাতে তাঁর সমস্ত জীবন পূর্ণ হয়ে থাকবে?"

অবিনাশ কোনও উত্তর দিতে পারল না এ কথার, কিন্তু আজ যেন মনের এই দিকটায় প্রথম দৃষ্টি পড়তেই তার সমস্ত বুকটা কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে এল ধীরে ধীরে। বেদনাকাতর সুরে বললে, "কিন্তু সে জন্যে আমি আর এ ছাড়া কি করতে পারি?"

ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে অবিনাশের দিকে চেয়ে সরোজ বললে, "আপনি না পারলেও আমাকে পারতে হবে।"

পকেট থেকে সে সেই দিনকার পাওয়া সেই চাকরির অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারখানা বার ক'রে অবিনাশের সামনেই টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললে। বলতে লাগল, "আজ তাকে ঐশ্বর্যের দোহাই দিয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় ফেলে নিশ্চিন্ত মনের ভাববিলাস আপনি করতে পারেন বটে, কিন্তু আমি তা পারি নে। আমি তাকে বাঁচাব, অন্তত চেষ্টাও করব বাঁচাবার, ভাল করবার। তাতে শুধু চাকরি কেন, আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করতেও আমার বাধবে না।"

ঝড়ের বেগে সে ঘর ছেড়ে বার হয়ে গেল। যাবার সময় শুনল অবিনাশ আপন মনে হাসছে। সে হাসি সুখের কি দুঃখের, সান্ত্বনা কি শান্তির, সে বিচার করবার মত মনের অবস্থা তখন সরোজের ছিল না।

২০

বিপিন ভেবেছিল আদু তার কাছে এই বিবাহের জন্য আপত্তি করবে, অন্তত ভাববার মত সময়ও প্রার্থনা করবে সকাতরে; কিন্তু আদু তা করলে না। বরঞ্চ বেশ শান্ত সংযতভাবে ঘরসংসারের কাজ কর্ম, আচার অনুষ্ঠানে যোগদান করলে আগের মত, যাতে বাইরে থেকে তার মনের অবস্থা অনুমান করা তো কারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়, এমন কি বিপিনও যেন কেমন একটা ধাঁধাঁয় প'ড়ে দোল খেতে লাগল। সরোজের সম্বন্ধে আদুর উপরে তার যে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছিল, হয়তো সে ধারণাটা সত্য নয় ভেবে এক দিকে মনে যেমন একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল অন্য দিকে তেমনি কষ্ট বোধ হচ্ছিল তাকে এই কথাটার উপর নির্ভর ক'রে সেদিন অমন কড়া কথা শোনানোয়। স্নেহ বিপিনের মনে হয়তো যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তার মধ্যে বিহ্বলতা ছিল না।

এই বিহ্বলতায় একবার সে শারদার কাছে মেয়েকে রেখে এসে যে ভুল করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত সে আজও পূর্ণ করতে পারে নি, হয়তো পারবেও না; কিন্তু তাই ব'লে জেনে শুনে আর একবার সেই ভুল করতে সে রাজী নয়। এবার তাকে কঠিন হ'তেই হবে। স্নেহান্ধ হয়ে কর্তব্যে ভুল করা শুধু নিজের জীবনেরই শাস্তি নয়, পরলোকগতা আদুর মার আত্মাও যে সে শাস্তি বহন করবে, এ কথা সে স্থির জেনেছিল বলেই উঠে পড়ে লেগেছিল এই বিবাহে। যেন এর কোথাও কোনও একটু আচার অনুষ্ঠানের ফাঁক না থাকে, নিয়মের ব্যতিক্রম না হয়।

বিপিন ভাবছিল সামাজিক আইন কানুনের বন্ধন এই বিবাহ. এ বন্ধন শুধু ইহজন্মেই মিটে যায় না, পরজন্ম পর্যন্ত এর খেই টেনে চলতে হয়; আদুও চলবে। আর তার এই চলায় সৃষ্টি হবে একটি গৃহস্থ পরিবার। গঠিত হবে একটি সুন্দর সংসার।

চোখ বুজে বিপিন দেখে আদুর ভবিষ্যৎ সুখের ঘর, আদুর কোলজোড়া সুন্দর শিশু, শান্তিময় সংসার। সে সংসারের নিয়ম মানে আদুর শিশু পুত্র কন্যা, মানিক, এমন কি বিপিনও।

বিবাহের দিন এসে পড়ে। যথাসর্বস্ব খরচ ক'রে বিপিন ধুমধামের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে, তাই দূরদূরান্ত থেকে এসেছে আত্মীয় কুটুম্ব, বাইরের আমতলা জুড়ে বসেছে সানাই। সানাইয়ের সে বিচিত্র সুরালাপ শুধু আদুকে নয় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে প'ড়ে সকলকে জানাচ্ছিল আজ বিপিনের মেয়ের বিবাহ। তাই কাজের অন্ত নেই; না বিপিনের না অন্নদার।

দিন কেটে চলল।

রৌদ্রদগ্ধ দুপুর। চারিদিকের শুকনো মাটি যেন কাঠের মত ফেটে উঠছে রৌদ্রের তেজে। জলায় জল নেই,—তারই চার পাড় ঘিরে প্রতিধ্বনি তুলছে ঘুঘু আর চাতকদের করুণ বিলাপ। আদু বসেছিল খোলা জানালার সম্মুখে একখানা কাগজ আর দোয়াত কলম নিয়ে। অনেক চেষ্টায় একখানা টিকিট ছাপা খামও কিনিয়ে আনিয়েছিল সে,—কারণ আজ তাকে একখানা চিঠি লিখতে হবে। এ চিঠি এই প্রথম এবং এই শেষ। কিন্তু সরোজকে নয়, ইন্দুকে।

ওই একদিন, একটুখানির দেখাতেই সে দেখেছিল ইন্দুর মুখে চোখে যে লেখা ফুটে উঠেছে সে লেখা তারই প্রতি সমবেদনার, করুণার। হয়তো সে তার ভবিষ্যৎ বুঝেছিল, জেনেছিল অদৃষ্ট তাকে কোথা থেকে কোথায় এনেছে, আবার কোথায় নিয়ে যাবে। শহরে গিয়ে শারদার সম্বন্ধ নিয়ে সে যত লোকের সংশ্রবে এসেছে, সকলকে বাদ দিয়ে সে যেন এই একটি হৃদয়কেই এতটুকু চেনবার সুযোগ পেয়েছিল। আর যাদের দেখেছিল তারা যেন শুধু সমস্যা, শুধু প্রহেলিকা ব'লে মনে হয়েছিল তার কাছে। যে প্রহেলিকা সে প্রাণপণ

শক্তিতে টেনে, ছিঁড়ে শেষ করতে না পেরে আজ বড় ক্লান্ত, অবসন্ন।

হাতের কলমটা নিয়েও কি ভেবে সে নামিয়ে রেখে দিলে, মাথাটা হাতের উপর রেখে তাকাল খোলা জানালার পথে। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ, হয়তো কর্মক্লান্ত গৃহস্থরা নির্জন দুপুরে বিশ্রাম করছে, কিংবা ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। বাইরে বড় রৌদ্র! জানালাটা হাত বাড়িয়ে বন্ধ ক'রে দিতে গিয়ে সে থমকে গেল। পা টিপে টিপে জানালার পাশের বাগান ঘেরা সরু পথে কে আসছে, মানিক না?

হাঁ, মানিকই তো! গভীর বিস্ময়ে, আদু তাকিয়ে রইল সামনের দিকে; তফাত থেকেই হাত নেড়ে তাকে জানালা বন্ধ করতে বারণ ক'রে মানিক এসে দাঁড়াল জানার বাইরে। একেবারে জানালার উপর ঝুঁকে প'ড়ে ডাকলে, "আদু।"

তার কণ্ঠস্বর মৃদু; বোধ হয় বাইরের কোনও লোকেরই কানে যায় না সে ডাক। আদু বললে, "তুমি যে?"

ম্লান হেসে মানিক বললে, "হাঁ, আমিই, আমাকেই আসতে হ'ল হঠাৎ। আসার ইচ্ছে ছিল আরও আগে, কিন্তু সময় ক'রে উঠতে পারি নি। আর চিঠিপত্র লিখেও মনের কথা জানানো আমার কোষ্ঠীতে লেখে নি, তাই নিজেই আসতে হ'ল।"

ভীত সন্ত্রস্ত অন্তরে আদু জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

মানিকের সমস্ত মুখ প্রশান্ত হাসিতে ভ'রে উঠল, বললে, "এই 'কেন'র উত্তর দিতেই তো আসা আদু।" একটু থেমে বললে, "তুমি হয়তো ভাবছ আজ রাত্রেই যে আমার আইনসংগত অধিকারী বলে সাব্যস্ত হবে, তার পক্ষে সকলকে লুকিয়ে এই নিস্তব্ধ দুপুরে কথা বলতে আসা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, কেমন? হয়তো তা তুমি মনে করতে পার, কিন্তু আমি পারি নে। কারণ আমি তোমার সম্বন্ধে লোকে যা বলে তা বিশ্বাস না করলেও কিছু কিছু শুনেছি। নিজের মন দিয়েও বুঝেছি, এক দিন যাকে ভালবাসা যায় সে ভালবাসা ফিরিয়ে নিয়ে আর কোন দিন কাউকে দেওয়া চলে না তবু মানুষে আশা করে শুধু নিজের বোকামিতে।"

চুপ ক'রে গেল সে আদুর মুখের দিকে চেয়ে; যেন সে সেখানে কিছু দেখবার প্রত্যাশা করছে। কিন্তু আদুর মুখে মনের কোনও চাঞ্চল্যই প্রকাশ হ'ল না, স্থির দৃষ্টিতে মানিকের মুখের দিকে তাকিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললে, "কি বলতে এসেছ তুমি? কি বলতে চাও আমায়?"

মানিক জবাব দিলে, "ভয় নেই, বিশেষ তেমন কিছু নয়। আর লোকে যদি দেখেও ফেলে আমায়- এই অবস্থায় এইখানে দাঁড়িয়ে তোমার সংগে কথা বলতে, তাতেও কিছু ভয়ংকর ব্যাপার ঘটবে না; কারণ সকলেই বোঝে, যে আর কয়েক ঘণ্টা পরে স্বামিত্বের অধিকারী হবে সে এমন কিছু গুরুতর কাণ্ড ঘটাবার জন্যে কথা বলতে আসে নি।"

আদুর মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল, কিন্তু কিছু বললে না সে।

মানিক তখনও তাকিয়েছিল আদুর মুখের দিকে, তার বিকৃত মুখভঙ্গী দেখে ব'লে উঠল, "কিন্তু একটা কথা আদু, তুমি মনে ক'রো না যে তোমাকে বিয়ে করব বলেছি ব'লেই তোমায় আমার বিয়ে করতেই হবে। এটা জেন, তোমার সম্বন্ধে—যেসব খবর পেয়েছি তার যুক্তি দেখিয়ে ইচ্ছে করলেই এ বিয়ে ভেংগে দিতে পারি, কিন্তু তা দেব না। তোমায় বিয়ে করব বটে, কিন্তু স্ত্রীর অধিকার তুমি পাবে না; যা আমি দেব, তা শুধু দয়া ক'রেই, দাবি-দাওয়া তোমার থাকবে না এক ফোঁটাও। বল, এতে তুমি রাজী আছ?"

আদু নির্বাক।

বোধ হয় মানিকের মনের এই দিকটার সংগে তার পরিচয় ছিল না, তাই সে চমকে উঠল। মানিক বললে, "আদু, এখনও যা হ'ক ভেবে একটা কিছু উত্তর দাও, নইলে ভবিষ্যৎ বুঝতে পারছ? আমি যদি তোমায় না বিয়ে করি, তখন?"

আদু চোখ বুজল। মানিকের কথার পরই তার চোখের সামনে পর পর কয়েকটা দৃশ্য ভেসে উঠল।—

ছাঁদনাতলায় সে উপবিষ্ট, কিন্তু মানিক উঠে গেল পাশের আসন থেকে। সমস্ত বাড়ির আনন্দ-কলধ্বনি মৃদু আর্তনাদ আর দীর্ঘশ্বাসে পরিবর্তিত হ'ল। বিপিন ছুটে গেল পুকুরের দিকে, এ কলঙ্কিত মুখ আর জন-সমাজে দেখাবে না পণ ক'রে........

আদু শিউরে উঠল একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে।

মানিক বললে, "চেঁচিও না, বাড়ির সবাই জানতে পারবে।"

আদু ব্যাকুল স্বরে ব'লে উঠল, "তাই হবে, তাই হবে; আমায় শুধু দয়া ক'রে বিয়ে কর; আমায় ক্ষমা কর, রক্ষা কর।"

গম্ভীর মুখে মানিক বললে, "বেশ।"

তার পরে সে যে পথ ধ'রে এসেছিল, ধীরে ধীরে সেই পথেই অদৃশ্য হ'ল ঝোপঝাড়ের অন্তরালে। আদুর চোখের সম্মুখে শুধু দুলতে লাগল বাইরের রৌদ্রদগ্ধ আকাশখানা।

ধীরে ধীরে বেলা পড়ে আসছে। গ্রামসীমান্তে মেশা রাঙামাটির পথে তাই চলতে দেখা গেল দু-এক জন পথিককে। আকাশের অন্য পারে রৌদ্র উঠল নিষ্প্রভ হয়ে, ফসল-শূন্য মাঠে তারই আলপনা পড়তে লাগল পর পর। নিস্তব্ধ বাড়ি আবার ধীরে ধীরে কলরবে পূর্ণ হয়ে উঠল, সানাইয়ে আবার আরম্ভ হ'ল সুরালাপ।

দরজা খুলে অন্ন ডাকলে, "আদু।"

আদু উত্তর দিলে। অন্ন বললে, "এখনও ঘুমুচ্ছিস? বেলা যে ওদিকে গড়িয়ে এল, কনে সাজাতে হবে না?"

কনে সাজতে হবে, সত্যই তো, আজ যে তার বিয়ে! যে বিয়ের আশায় সে এত দিন বেঁচেছিল,—রঙিন স্বপ্ন দেখেছিল, আজ সেই বিয়ে!

কিন্তু যাকে ঘিরে তার স্বপ্নের সৃষ্টি, সে কোথায়? কত দূরে? হয়তো আজ আদুকে দেখলে সে চিনতেও পারবে না, কিন্তু আদু যে চোখ দিয়ে তাকে চিনেছে—সেই চোখেই আজও চিনবে; ভবিষ্যতেও চিনতে দেরি হবে না তার। আদুর চোখে জল এল। অনেক দিন অনেক রাতের

অন্ধকারে ঢাকা জমাট বাঁধা জল। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু অন্নর দৃষ্টিকে প্রতারিত করতে পারলে না। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে, "ও কি, কাঁদছিস?"

আদু উত্তর দিলে না। কি জানি কেন অন্ন আজ সে চোখের জলের কারণ নির্দেশ করতে কাউকে ডাকল না, ধীরে ধীরে স'রে এসে ওর মাথায়, মুখে সস্নেহ স্পর্শ ক'রে বললে, "ছি মা, কাঁদতে নেই; এমন শুভদিনে কি চোখের জল ফেলতে আছে রে বোকা মেয়ে? আর মানিকের মত ছেলেকে স্বামীরূপে পাওয়া কয়টা মেয়ের বরাতে মেলে বল তো আদু?"

আদু কোনও উত্তর দিলে না এ কথার; শুধু অন্নর হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে কিছুক্ষণের মত, তার পর তার হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, "বড্ড গরম লাগছে পিসী গাটা কি ধুয়ে আসব ঘাট থেকে?"

অন্নর প্রাণ সমবেদনায় ভ'রে উঠল; বললে, সত্যি, এই গরম, তাতে উপবাস! গা মাথা তো জ্বলবেই। তা না হয় য়া, কিন্তু দেরি করিস নে বেশী, সন্ধ্যায় লগ্ন; তার আগে সব গোছগাছ ক'রে নিতে হবে।"

"না আমি আসছি এখন।"

কুলুঙ্গি থেকে নূতন কেনা সাবানখানা পেড়ে নিয়ে সে হন হন ক'রে এগিয়ে চলল পুকুরের পথে। পথের দুই ধারে আম কাঠালের বাগান। কচু, ঘেঁটু আর আসশ্যাওড়া গাছের সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে লতাগুল্মের বন্ধন তাকে আরও নিবিড় ক'রে তুলেছে।

ওরই নীচে, আশপাশ থেকে দুই-একটা ছোট পাখি, স'রে গেল আদুর সাড়া পেয়ে;

আদু এসে জলে নামল।

কালো, অথই জল; তার স্থির বুকে চারপাশের গাছের ছায়া ঝুঁকে প'ড়ে নিজেদের মুখ দেখছে যেন। ওরই এক দিকে বহুদিনের বাঁধানো ঘাট; ভাঙগা, চুন বালি খসা, বিবর্ণ, —ইট সুরকি খসা, শেওলা পিছল। আদু পা টিপে টিপে জলে নামল। হাঁটু, কোমর, বুক পর্যন্ত গেল জলে ডুবে, তবু ওর এগিয়ে যাবার নিবৃত্তি নেই যেন। নামতে নামতে আদু তাকাল সামনের দিকে, ওই তাকে কে ডাকছে না?— "আয় আয় আদু, আয়।"

এ কণ্ঠস্বর সরোজের নয়, মানিকেরও নয়। এ কণ্ঠস্বর আদু চেনে না, জানে না;—তবু অনুভব করছে তার দুর্নিবার আকর্ষণ। ওই সে জীবনের ওপার থেকে ডাকছে— "আয়, আয়, —ওরে আয়।"

আদু উত্তর দিতে গেল, কিন্তু পারল না। ঠোঁটের উপর পর্যন্ত যেতেই সে একবার হাঁপিয়ে উঠল, একবার হাত দু'খানা উঁচু করে তুলল কোনও আশ্রয়ের আশায় তার পরেই সেখানকার জলে উঠল মাত্র গোটাকয়েক বুদবুদ। আদুর কোনও চিহ্নও আর রইল না সেখানে।

অল্পক্ষণ পরে আদুর খোঁজে এদিক ওদিক ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে দাঁড়াল কয়েকজন লোক। দেখলে পুকুরের জল স্থির, শুধু মাঝখানের এতটুকু জায়গায় ভাসছে লালপাড় নূতন কাপড়ের এতটুকু—যে শাড়ি পরে সে ঘাটে এসেছিল গা ধুতে।

জনকয়েক লোক ডুব দিয়ে আদুকে যখন উপরে তুললে তখন ওর মুখ চোখ বিবর্ণ, সমস্ত গা হিমশীতল। অন্নদা চীৎকার করে উঠল, সমস্ত লোকে হাহাকার করতে লাগল, কিন্তু কাঁদলে না শুধু বিপিন। নিশ্চল মূর্তির মত সে শুধু নিষ্পলক দৃষ্টিতে আদুর মৃত মুখখানার দিকে চেয়ে রইল। বলার মত কথা যেন আজ তার আর কিছু নেই, চোখের জলও ফুরিয়ে গেছে নিঃশেষে।

—শেষ—

দুজনা

(রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ)

তরুণ সরকার

বাংলার বুকে নন্দন হ'তে ভাসা
মধুপ দুজন বেঁধেছিল আসি বাসা;

একে হেথা হ'তে সুধা ল'য়ে ভারে ভারে
ছড়ায়ে দিয়াছে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে,
অপরে ধরার বনে বনে খোঁজ করি'
হেথায় এনেছে অমৃত কলস ভরি'।

বাংলার বনে আঁধারে গোপন থাকি'
দুখানি কমল ধীরে মেলেছিল আঁখি;
একের সুবাসে উতল গোধূলি-বায়,
অপরে ঝরেছে প্রভাত-বায়ুর ঘায়।

স্বপন সাথী

(গান)

শ্রীকান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

স্বপন-পরী আলোর তরী আকাশ-গাঙে বায়।
ফাগুন্ রাতে নয়ন-পাতে স্বপন চুমে যায়॥
ফুলের পরী যূথীর বনে
কুহক ঢালে সঙ্গোপনে;
গন্ধ ভরি' যায় শিহরি বাতাস জ্যোছনায়।
তারার মেয়ে চাঁদের সাথে
গোপন কথা কয়;
কা'র প্রিয়া ঐ দুয়ার-পাশে
প্রদীপ জেলে রয়?
আকাশ আজি ধরায় মাগে;
তোমার লাগি হৃদয় জাগে;
স্বপন-সাথী, শুক্লা রাতি এক্‌লা কাটে, হায়।

পান্থ

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বসু, বি, এ

গ্রাম ছেড়েই পথ।

কিছুতেই তাদের গ্রামে থাকা হল না। সকালবেলা গদাই ছোট ছেলেটির হাত ধরে সাত পুরুষের সোনার ভিটের দিকে একবার তাকিয়ে নিলে। পিছনে অবগুণ্ঠনবতী যুবতী স্ত্রী।

নৈহাটিতে নেমে ভাবলে আপাতত কুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করা যাক। কলে কোনও সুবিধা হবার আশা থাকে, এইখানেই থেকে যাওয়া যাবে। না হ'লে, কাঁচড়াপাড়ায় দেখলে হ'ত কোন সুবিধা হয় কি না।

পাশের গ্রামেই কুঞ্জবাবুর বাড়ি। মাইল দেড়েক তফাত। কুঞ্জবাবু লোক ভাল। দয়ালু। গরিবের মা বাপ। হয়তো কোনও সুবিধা করে দিতে পারেন।

গাছতলায় পটল ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ছোট ছেলেটি মার কাছে ঘুরে ঘুরে খেলা করতে লাগল। ঘোমটা ফাঁক করে পটল বললে, 'জোর ক'রে ধ'রো চেপে।'

মাথা নেড়ে গদাই পিছন ফিরে বলে গেল, 'এসিছি, বাগিয়ে ধরবো বই কি।'

'পটল, ভাগ্যি ভাল' বলেই গদাই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বসে পড়ল। কোঁচার খুঁটটা খুলে হাওয়া খেতে লাগল। ঘাম মুছতে মুছতে বললে, 'কুঞ্জবাবু বললেন, 'নিতে পারি এক্ষুণি! কিন্তু এখন নোব না। সায়েব কিছু বলবে না অবিশ্যি। বাঙালীবাবুদের চোখ টাটাবে। খালি হলেই নোব।'

পটল অস্ফুট সুরে বললে, 'তা হ'লে আবার ভাগ্যি ভাল হল কোন্ খানটায়?'

গদাই হেসে বললে, 'খালি হলেই নেবেন।'

চোখ ঘুরিয়ে পটল বললে, 'ভাত দোব তোকে পোষ মাসে।'

গদাই বিরক্ত হয়ে উঠল, 'আরে, কান পেতে কথাটা শোন্ ছাই, তার পর ছড়া কাটিস। সামনের হপ্তায় খালি হবে।'

পটলের হাসি ধরে না। তা হলে সত্যি কূল পাওয়া গেল।

একটু দূরে রাস্তার ধারে নিরিবিলি ঘাসের উপর পটল বসে রইল। পাশে ছোট ছেলেটি। দুটো লোক আড়চোখে ঘোমটার ভিতর চোখ চালাবার চেষ্টা করে পেছু ফিরে চলে গেল।

'ধরো।' গদাই পটলের হাতে শালপাতার ঠোঙাটি তুলে দিলে। মুড়ি, মুড়কি, ফুলুরি, গজা। গজাগুলো গরম।—'দাও, টাকাটা দাও।'

আঁচল থেকে গাঁট খুলে পটল একটি আধুলি বার করে দিলে। 'তোমরা মায়ে-পোয়ে খাও। আমি দোকানেই জল খেয়ে আসছি, বলে গদাই চলে গেল।

একটু দূরে গেলে অনুচ্চ কণ্ঠে পটল বললে, 'আসবার সময় এক ঘটি জল এনো।'

কুঞ্জবাবু সত্যই দয়ালু। সোমবার থেকে গদাই কাজে 'জয়েন' দিলে। এবেলা পটল দু তরকারি ভাত রেঁধে ফেলেছে। রান্না শেষ করে ছোট বারান্দায় বসে ছেলেটিকে ঘুম পাড়াচ্ছে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে উঠনে।

দেশে তাদের বাড়িতে এতক্ষণ জ্যোৎস্নার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বাড়ির পাশে সেই কাঁঠাল গাছটি। চারিদিক ফাঁকা। দেশে পেটে ভাত না থাক, হাওয়া ছিল; চাঁদের আলো, ঠান্ডা পুকুরের জল ছিল। এই এক হপ্তায় এখানে প্রাণ যেন বেরিয়ে আসছে। দু পাশে যত খোট্টার ভিড়। যেমনি নোংরা, তেমনি অসভ্য। ছোট্ট ঘরটি অন্ধকূপ। প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। দুপুরবেলা মন কেমন করে। কোথায় সেই দত্তপুকুর! ঘাটের পথে ধোপা-বউএর সঙ্গে খোশগল্প। পুঁটির ছেলেটি হয়তো এতক্ষণ উঠনে চাঁদের আলোয় চোখ বুজে ঘুরে ঘুরে কানামাছি খেলছে, টুনী দাওয়ায় বসে গুন-গুন করে গান ধরেছে হয়তো।

শুক্রবারে হপ্তা হল। গদাই সাড়ে তিন টাকা হপ্তা পেলে।—'পটল, বুঝে চ'লো।'

ঘরে ঢুকে গদাই কাপড় ছেড়ে গামছা পরে নিলে। 'জল আগুন কিনে খাওয়া! এ আর দেশ নয়! দুটো ধান সিদ্ধ শুকনো করে শাকটা ডুমুরটা তুলে চালিয়ে দেবে।' একটি বিড়ি ধরিয়ে বললে, 'বাপ বলতেও নেই, মা বলতেও নেই।'

পটল নীরবে সব শুনলে। তার চোখ ছল ছল করে উঠল। চাল না থাকলে সেন-গিন্নীর কাছে দু কাঠা চাল অনায়াসে ধার পাওয়া যায়। শুধু সেন-গিন্নী কেন, সকলেই তাকে মেয়ের মত ভালবাসে। ছোটলোক হলে কি হবে, সকলে বলে, আহা, পটল! সকলেই বলে, কি চালাক চতুর মেয়ে! ভদ্রলোকের মেয়ের কান কেটে দেয়।

মাজা মাজা রং। গড়ন অতি সুশ্রী। প্রচুর স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা। প্রচুর প্রাণশক্তি। চোখ দুটি তার দেখবার মত। ঢুলু ঢুলু টানা কালো চোখ। গদাই বলে, 'তুই ওই ড্যাবড়েবে চোখে চাইলে, মাইরি, বুকের ভিতরটা যেন কেমন কেমন করে।'

অতটি আর ওজন ঠিক নেই। গদাই নিজেই ক দিন তেলে-ঝালে মাছে-মণ্ডায় খরচ করে ফেললে কটি টাকা। বুধবার সকালে পটল বললে, 'পয়সা চাইছ কি আবার? মোটে তো একটি সিকি আছে।'

'একটি সিকি কিরকম?'

'হুঁশ নেই, কদিন খরচটি হচ্ছে কেমন!'

কাল বৃহস্পতি। পরশু হপ্তা হবে। টাকা পেতে সেই সন্ধ্যা। দু দিন এখন চলে কি করে? পটল হাত নেড়ে ম্লান হেসে বললে, 'কুঞ্জবাবুকে বল না। একটি তো টাকা হপ্তা পেলে, দিয়ে দেবে, বলবে।'

'দেখি।'

গদাই সেদিন কাজে বেরিয়ে গেল। কুঞ্জবাবুর হাতে ছিল না। টাকা দিলেন তাঁর সহকর্মী সুধীরবাবু। সুধীরবাবুর মাইনে ছাড়া দু পয়সা উপায় আছে। কুঞ্জবাবু অত্যন্ত সৎ লোক। চটকলে অমন লোক দেখা যায় না। বাইরে শোঁচে গেলে যেখানে চাকরি যায় সেখানে কুঞ্জবাবুর মত প্রাণ দেখা যায় না। গরিবের মা বাপ। সুধীরবাবু ফাইন করেন, কুঞ্জবাবু মকুব করেন। সুতরাং সুধীরবাবুর গাত্রদাহ স্বাভাবিক।

পটল শুনে মাথা নেড়ে বললে, 'ভাল লোক তো! দু টাকাই দিলেন? হ্যাঁ গা?'

'না, এক টাকা।' বলেই গদাই থেমে বললে, 'সুধীরবাবু আমায় এ দেশের কুলী দেখে, ডেকে আলাপ জমালেন।'

পটল নির্লিপ্তের মত বললে, 'ভাল। ওপরওয়ালার নজরে নজরে থাকাই তো ভাল।'

সত্যই সেদিন সুধীরবাবু গদাইএর বাসা দেখতে এলেন। শনিবার হাফ কাজ। তিনটের সময় খাওয়া-দাওয়া শেষ করে

বারান্দায় এক পাশে মাদুরে ছেলেটিকে নিয়ে পটল শুয়ে আছে। ঘুম ঠিক আসে নি। গদাই ঘরের ভিতর অঘোরে ঘুমচ্ছে।

ধড়মড় করে উঠে পটল মাথায় কাপড় টেনে দিলে। ঘরে গদাইকে ঠেলা দিয়ে ডাকলে 'ওগো শুনছ, একটি লোক এয়েছেন, কে দেখ।'

অনেকক্ষণ গল্প করে সুধীর সেদিন চলে গেল। পটল বললে, 'ট্যারা চোখে মিনসেটা যেন গিলে ফেলছে। ওই তোমার সুধীরবাবু?'

'হুঁ। বেশ লোক। দরাজ প্রাণ।'

বছর ঘুরে গেল। আষাঢ়ের রথ এল। ছেলেবেলা থেকেই গদাইএর অভ্যাস রথের সময় একটু আমোদ করে। দেশে থাকলে রস-টস খেয়ে আমোদ হ'ত। গাঁয়েই রথ হয়। রথতলাতেই গরম পাঁপর ভাজা খেয়ে নেশার ঝোঁকে ভজা, সিধু, পাঁচু, নিতাই কি গড়াগড়িটাই করে।

বন্ধুর মধ্যে এখানে রাধারমণ পাঁড়ে আর কাল্লু। রবিবারে রথ পড়ে গেল। ভালই হ'ল। নইলে কাল ছুটি পাওয়া যেত না।

শনিবারে কাল্লু বলে রেখেছে, 'ছুটা লাগাত বেরুব। কি বলিস?'

'হ্যাঁঃ। তা নয় তো কি? দিন দুপুরে ঘুরব কোথা।'

তার পর কাল্লুর কানের কাছে মুখ রেখে গদাই কি যেন বললে।

সন্ধ্যা হয় হয়। সাড়ে ছটার পর কাল্লু আর রাধারমণ ডেকে নিয়ে গেল গদাইকে। পটলের গা ছম ছম করতে লাগল। রাস্তা দিয়ে হল্লা করে যে সব লোক যাতায়াত করছে! মাতাল, হয়তো চোরও আছে, কে জানে।

ছেলেটা গদাইএর সঙ্গে সঙ্গে যাবে যাবে করে সন্ধ্যা থেকে বায়না ধরেছিল। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। পটল সন্ধ্যা থেকে রাত ৯টা অবধি বিছানায় ছটফট করছে।

টুক টুক করে তিনটি টোকা মারতেই পটল কাপড় গুছিয়ে উঠে দরজা খুলে দিলে। ঘরে ঢুকল সুধীর।

মুখের সিগারেট নামিয়ে মুচকে হাসলে। বললে, 'গদাই কোথা?'

পটল গম্ভীর মুখে বললে, 'সন্ধেবেলা রথ দেখতে গেছে।'

সুধীরের চোখে একটি অস্পষ্ট ব্যঙ্গ; 'রাত্তিরবেলা রথ?'

কচমচ করে পান চিবচ্ছে। চোখ রাঙা। মুখে দুর্গন্ধ। পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার করে পটলের দিকে বাড়িয়ে সুধীর বললে, 'কিছু মনে ক'রো না পটল, নাও, হ'লে দিয়ে দিও, তোমাদের টানাটানির কথা আমি সব শুনেছি।'

ঝাপটা দিয়ে পটল তার নোটখানা সরিয়ে দিলে। বললে, 'অমন মাতাল হয়ে এলে আমি তোমাকে কিন্তু বসতে দিতে পারব না।'

সুধীর চলে গেল। নোটটা পড়েই রইল। দরজা বন্ধ করে পটল আর বসতে পারল না। মাথাটা যেন কেমন করছে, সে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

শুক্রবার সকালে গণ্ডগোল হয়ে গেল। গদাই বলে, 'হপ্তা যা পাব, ছোটবাবুকে দোব। একটু একটু করে কতটা টাকা হয়েছে খেয়াল আছে?'

ছেলেটিকে দুম করে মাটিতে বসিয়ে পটল ধমকে উঠল, 'হ'ক দেখা যাবে।' সোজা হয়ে গদাইএর মুখের উপর বললে, 'সব টাকা ওর গব্বে ঢাললে, হপ্তাভোর খাব কি?'

'শুকিয়ে থাকবি, হারামজাদী।' বলে গদাই সোজা বেরিয়ে গেল।

সুধীরবাবুর দেনা পটলের একটা মিষ্টি কথায় হয়তো শোধ হয়ে যায়। গদাইকে সে কথা বোঝায় কে?

আট আনা পয়সা নিয়ে গদাই বাড়ি ফিরল। বললে, 'ওই আট আনায় হপ্তা চালাতে হবে।'

সুধীরের সেই পাঁচ টাকার সাহায্যে গোঁজামিল দিয়ে পটল সে হপ্তাটা চালিয়ে দিলে।

পরের শুক্রবার হপ্তা পেয়ে গদাই আর বাড়ি ফিরল না। রাত্রে পটল আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রইল। কেউ মেরে ধরে ফেললে না তো? সুধীরের চর ওই কালুসর্দারটা! সুধীর নাকি বলেছে খুন করে ফেলবে গদাইকে। লোক আছে হাতে।

বড় ভয় করে। যে জায়গা। গাঁয়ে তো এ সব ছিল না। নষ্ট দুষ্টু মানুষ অবশ্য সব জায়গাতেই আছে। মারামারি খুনোখুনি এইখানেই। এই সেদিন ছটু সিং বলে যে মিস্ত্রীটা থাকে, খুন হতে হতে বেঁচে গেল। তার বউটা না হয় দামালই। হয়তো দুষ্টুও।

পটলের পা জড়িয়ে গদাইএর সে কি কান্না। শনিবারে কলের ছুটি করে তবে সে বিকেলে বাড়ি এসেছে। শুক্রবার রাত কাটিয়েছে অন্যত্র।—'আমি মরে গেছি পটল, তুই আমায় লাথি মার্।'

পটল পা গুটিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলে। কোনও কথার জবাব দিলে না। গদাই অনুতপ্ত সুরে বলেই চলল, 'কাল সামলাতে পারি নি। পড়িচি কালুর পাল্লায়! রস খেয়ে একটু আমোদ করব বলে—একটু বাজার বাগে গেছনু।'

কলে সুধীর ডাক করে পাঠালে গদাইকে। এত টাকা পাওনা। এ হপ্তায় কিছু দিলে না। কবে দেবে সে?

'জুতো মারবেন বাবু, সামনের হপ্তায় না পেলে।'

সুর নাবিয়ে সুধীরবাবু বললেন, 'জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া চলে না, জেনে রেখো।' আড়চোখে একবার গদাইএর দিকে তাকালেন, তার পর কালুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না, কি বল, কালু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, অনিবার্য!'

দু দিন পটল মুখ ভার করে আছে; গদাই আসে, মুখ গোঁজ করে ভাত ধরে দেয়, সামনে দাঁড়ায় না। গদাই বলে, 'বউ একবার তাকা আমার পানে।' মুখ ফিরিয়ে পটল চলে যায়।

কথা না কইলে চলবে কেমন করে? দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সামনের হপ্তাতেও দেনা দিলে খাব কি?'

কদিন পটল কথা কয় নি। আজ পটলের কথায় গদাইএর মুখের কথা হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল; 'কি করব বল? সুধীরবাবুটা চামার! কালুটা একের নম্বর পাজী!'

পটল মেঝের আলুর খোসাগুলো কুড়বার অছিলায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শুনতে লাগল। 'ও বেটা সাপের মুখে চুমো দেবে, ব্যাঙেরও মুখে চুমো দেবে। ওই আমায় মাল খাওয়াতে শেখালে। পয়সা নষ্ট করে দিলে। আবার ওই সুধীরবাবুর পেছন পেছন আমার নামে লাগাচ্ছে।'

হোক কালু পাজী। যার সত্যি সংসারে টান থাকবে সে বদমাইস লোকের সঙ্গে মিশবে কেন? নিজে নষ্ট না হলে, কেউ নষ্ট করতে পারে নাকি। গদাই নিশ্চয় বদলে গেছে। বউ ছেলের উপর আর তেমন টান নেই। সে একটু ঢিলে দিলে এক্ষুণি সংসার ভেঙে যায়। একলা একলা থাকা, কাঙালের মতন সুধীরবাবু আসে। একটু ঢিলে দিলেই তো সুধীরবাবু আরও উঠে আসতে পারে। কেন, অনায়াসে সে তো আরও রাশ ছেড়ে দিতে পারে।

অনেক ভেবে চিন্তে পটল স্থির করলে, সুধীরকে একবার ডেকে পাঠাবে। পটল ডেকেছে শুনলেই সে আসবে। একদিন সে আভাসে ইঙ্গিতে বলে গেছে—সে ভারী ভয়ের কথা। কলকাতায়, মানে—

কথা শুনলে গা শিউরে ওঠে। সোয়ামী পুত্তুর ছেড়ে মেয়েছেলে যায় নাকি এমনি? আসুক সে। সব কথা বাজিয়ে নিতে হবে। সে টাকা ধার দেয় তা হলে সেই জন্যেই নাকি।

খবরটা চাপা ছিল। টেলি এসেছে, সুধীরবাবু হাবড়ায় বদলি। বড়বাবু আর সায়েব ছাড়া খবরটা জানত না কেউ। আজ মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। পটলেরও কানে উঠল কথাটা।

গদাই এসে বললে, 'এইবার সব্বোনাশ! চললেন! যদি বা দায়ে ঘায়ে দেখতেন!'

পটলের চোখটা ভিজে উঠল। থাকতে না পেরে গদাইকে জিজ্ঞাসা করে ফেললে, 'সত্যি যাবেন নাকি?'

'আরে, মণিবাবু বলে গেলেন যে।'

'তা হলে আমাদের টাকাগুলোও তো দিয়ে দিতে হবে?' অসহায়ভাবে পটল প্রশ্ন করে ফেললে।

'তাইতো ভাবছি।' বলে গদাই কোঁচা দিয়ে দাওয়াটা ঝেড়ে বসে পড়ল।

গদাই বাড়ি নেই। হঠাৎ সুধীর এসে বললে, 'চললুম পটল।'

পটল মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। সুধীর বললে, 'ভাবছ কি?'

শুকনো মুখে পটল বললে, 'ভাবনা হচ্ছে, টাকার জন্যে!'

'টাকার ভাবনা?' সুধীর হেসে বললে। তার পর এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে পটলের হাতটা ধরলে, তার পর বলে বসল 'তোমায় টাকার বিছানায় শুইয়ে রাখব পটল।'

পটল ছিটকে সরে গেল। 'পোড়া কপাল! বলে সাতটা টাকা দেনা তাই মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।'

'গদাইএর দেনার কথা বলছ?' সুধীর জিজ্ঞাসা করলে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের দেনা।' মমতা মাখানো যেন 'আমাদের' কথাটিতে।

সুধীর উদাস সুরে বললে, 'মরুক গে! ভারী সাতটা টাকা দেনা। গদাইকে দেশে যেতে ব'লো।'

'কেন?' সোজা চোখের উপর চোখ রেখে উৎসুক কণ্ঠে পটল জিজ্ঞাসা করল।

'কেন কি? তোমার আঁচলেরই তলায় তলায় ঘুরবে নাকি সারা জীবন?'

গলা নীচু করে মুখ ফিরিয়ে পটল বললে, 'আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আজ যে আবার 'আপনার'? পর করে দিচ্ছ পটল?'

পটল কোনও উত্তর দিলে না, বেরিয়ে গেল।

সুধীর বসেই রইল। পটল মিনিট কয়েক পরে ঘরে ঢুকে, বললে, 'রাগ করলেন? অনেক জ্বালাতন করেছি, মাপ করবেন। আমরা ছোটলোক, কি বলতে, কি বলে ফেলি। 'আপনি আমাদের বন্ধু ছিলেন। চলে যাবেন আর মনে থাকবে না।'

সুধীর আবার পটলের হাত ধরে তাকে টেনে তুললে। 'চির-কাল মনে থাকবে পটল। ব্যবস্থাও করেছি। তোমায় ফেলে যাব না।'

পটলের মুখ ফেকাশে হয়ে গেল। শূন্যদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে সরে গেল। সুধীর ডেকে বলে গেল, 'টাকার কথা ভেবো না। ছেড়ে দোবো।'

পটলের প্রবৃত্তি হ'ল না জিজ্ঞাসা করে, কেন। সুধীর শুনিয়ে গেল, শুক্রবারে মাইনে পাওয়ার পর গদাইএর চাকরি খতম হবে। শনিবার সুধীর সকাল আটটার সময় আসবে। পটল যেন তৈরী থাকে। একেবারে সোজা কলকাতা। কথার নড়চড় যেন না হয়।

চাকরি খতম হবে বললেই কিছু কেউ হঠাৎ চাকরি খতম ক'রে বসবে না। কথাটা আর গদাইএর কানে তুলে কাজ নেই। তবে একটু সাবধান করে দেওয়া ভাল।

কিন্তু পটলকে আর কিছু বলতে হ'ল না। গদাই নিজেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'সুধীরবাবুটা অমন চামার জানতুম না।'

'কেন, কি হ'ল?' চোখ কপালে তুলে পটল জিজ্ঞাসা করলে।

'বলে, কাল আমার চাকরি যাবে।'

'কি দোষে?' পটল একটু কঠিনভাবে প্রশ্ন করলে।

'দোষ আবার কি। আমার ঘরের পাটের গাঁট গোলমাল হয়েছে। সবাই বললে, আমি চুরি করে বেচে দিয়েছি।'

'সবাই বললে?' পটল আশ্চর্য হয়ে গেল।

'সব লোক ওর হাতে যে! সুধীর সায়েবের কানে ফিস ফিস করে কি বললে, সায়েব জবাব দিয়ে দিলে।'

পটল একটু বিবেচনা করে বললে, 'যা রটে তার কিছুও বটে। কিছু না কিছু গোলমাল করেছ বই কি।'

'মাইরি, তোর গা ছুঁয়ে বলছি। সব ওদের বানানো কথা।'

'বিশ্বাসই করি না আমি।' বলে পটল মুখ ঘোরালে।

গদাইএর যেমন দিন দিন মতিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে, তাতে মনে হয়, একটু আধটু গোলমাল নিশ্চয় সে করেছে। এতটা সবটাই যে বাজে, পটলের বিশ্বাস হ'ল না। তবু, মিষ্টি করে আবার বললে, 'আচ্ছা তা হলে তুমি কুঞ্জবাবুর কাছে—'

পটলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গদাই বলে উঠল, 'তা কি না গেছি? বললেন, 'কথা থাকবে না গদাই, কথা থাকবে না। তোমার অদেষ্ট!'

'হুঁ।' বলে পটল গালে হাত দিয়ে বসল।

তাহলে সুধীর সত্যই গদাইএর চাকরি খেলে। কালকের দিনটি ওর মেয়াদ। পরশু শনিবার থেকে আবার পথ। হাতে এমন কিছু নেই যে একটি হপ্তা চলে।

গদাই এসে সেদিন ভয়ে বললে, 'পটল, আজ আবার কি হয়েছে শোন্।'

'কি হ'ল আবার?'

'কালু আমায় ছোরা দেখিয়ে বলেছে, 'হুশিয়ার! ডবকা বউ নিয়ে ঘর করিস, জানের মায়া রেখে চলিস।'

পটল চুপ করে গেল। এত দূরে গড়াবে তা সে মনে ভাবেনি।

সন্ধ্যাবেলা, গা ছমছম করছে। কি হতে কি হবে কে জানে। পটল একটা রুপোর দুল বার করে গদাইকে বললে, 'সেকরার দোকানে গলিয়ে আজই বেচে দিয়ে এস।'

'কাল তো হপ্তা পাব। তার পর যা হয় করা যাবে।' পটল প্রবল আপত্তি করে বললে, 'না আজই যাও।'

গদাই বললে, 'এ তুই পেলি কোথা?'

'ও আমার বাপের বাড়ির।'

যেন অন্যমনস্ক হয়ে গদাই বললে, 'বাপের বাড়ির!' কেমন যেন ধোঁকা লাগল মনে।

বাড়ির দরজা বন্ধ করে পটল অপেক্ষা করতে লাগলো, কখন গদাই আসে। কখন আসে, কখন আসে। আর হতচ্ছাড়া ওই ডান চোখটা! কি যে হবে, খালি নাচছে।

আজ তবু মুখ ফুটে গদাইকে জানায় নি, সুধীর তাকে শেষ করে দেবে বলেছে; তার হাতে লোক আছে। তাই হয় নাকি আবার? কে জানে, হতেও পারে। কিন্তু পটলের মন কিছুতেই শান্তি পায় না। কথাটা শোনা পর্যন্ত দারুণ আতঙ্ক তাকে পিষে আছে।

ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে পটল দাওয়ায় বসে অপেক্ষা করছিল। ঝড়ের মত গদাই সদরে ধাক্কা দিলে।

পটল ধড়মড়িয়ে উঠে কপাট খুলেছে কি গদাই দরজার ওপাশ থেকেই ধাঁ করে পটলের গালে একটা চড় কশিয়ে দিলে। তাকে টাল সামলাতে না দিয়েই জুতো সুদ্ধ পায়ে জোরে একটি লাথি। পটল অবাক। চড় খেয়েই সে ঘুরে পড়ছিল। হাঁটুর উপর জুতোর ঘায়ে, দুম কর ঘুরে পড়ে গেল। গদাই মুখে কোনও কথা না বলে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিলে। চুলের মুঠি ধরে রক্ত চক্ষু বড় করে বলে উঠল, 'নচ্ছার, সুধীরবাবুর পেরেমে পড়েছ?'

মাথা ঘুরছে, পটল মুখে কিছু বললে না। গদাই আর একটি চড় বসিয়ে দিয়ে পটলকে সেই অবস্থায় ফেলে বলতে বলতে চলে গেল, 'নাম লেখা দুল নেয়া হয়েছে। সব শুনেছি, হারামজাদী, সব শুনেছি।'

পটল সেইখানেই পড়ে রইল।

বিড় বিড় করে বকতে বকতে গদাই কিছু খেলে না। আলো নিবিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

থাক ও। পটল এই অবস্থাতেই ছুটে চলে যাবে। সুধীর বাবুকে বলবে, 'আমি এসেছি, চল।' পড়ে থাক গদাই। নেমক-হারাম। কাল ওর মাথায় খাঁড়া ঝুলছে তা জানে না।

না। পটল সুধীরবাবুর কাছে যাবে না। এই অবস্থায় পড়ে থাকবে। এসে সে দেখবে, গদাই মেরেছে। কেঁদে তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। তা হলে আর ওকে আস্ত রাখবে না। পটলকে ভাবে কিনা অসতী! উপযুক্ত সাজা হওয়া ওর উচিত। চোখের সামনে সে সুধীরের হাত ধরে চলে যাবে।

ঝির ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে। পটল অভিমানে আর উঠল না। সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝে গদাই একবার উঠে বিছানায় হাত দিয়ে দেখলে, পটল এসে শুয়েছে কি না। না, আসে নি। থাক, তেজ করে পড়ে থাক। ডাকবে না। সেই সকালে খেয়েছে, খিদে পেয়ে গেছে। ওর উপর রাগ করে নিজের পেট কাঁদাবে কেন? আলো জেলে গদাই খেয়ে নিলে। ভাত ঢাকা রাখাই ছিল।

আলো নিভিয়ে বিড়ি ধরিয়ে গদাই বাড়ির কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

খুট্ খুট্ খুট্। ঠিক যেন সদরে শব্দ হল। আকাশে চাঁদ উঠেছে। মাঝে মাঝে একখানা মেঘ ভেসে যাচ্ছে, উঠন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। ওই রান্নাঘরের পিছনে বোধ হয় কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

পটলের ঘুম ভেঙে গেল। ভয়ে সে চোখ চাইতে পারছে না। আজ সন্ধ্যের সময় ডান চোখ নাচছিল মিথ্যে নয়! গদাই তা হলে কালুর ছোরা দেখেছে সত্যি। কাল ওকে খুন করে ফেলবে। ভয়ে উঠন থেকে পটল উঠেও আসতে পারছে না।

আবার খুট্ খুট্ খুট্। হাঁটুতে খচ্ করে ব্যথা লাগল। গদাইএর জুতোর আঘাত। তবুও কোনও রকমে খাড়া হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি পটল ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে গদাইএর বালিশের তলা থেকে দেশলাই বার করে জ্বাললে। নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নিদ্রারত গদাইএর মুখখানি দেখে পটলের বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। ডান চোখ নাচছিল মিথ্যে নয়।

খুট্ খুট্ খুট্

সুধীরের চর রাত্রে ওত পেতে বসে আছে নাকি? সুধীর তার রূপমুগ্ধ। পোড়া কপাল রূপের। পটল ভাবলে। গায়ে ঠেলা দিয়ে চাপা গলায় পটল ডাকলে, 'শুনছ?' গদাই একেবারে গভীর নিদ্রামগ্ন। 'শুনছ?' পটল আবার ডাকলে।

পাশ ফিরে ধড়মড় করে উঠে গদাই বললে, 'কি?'

ফিসফিস করে গদাইএর কানের কাছে মুখ রেখে পটল বললে, বাইরে কিসের শব্দ হচ্ছে! সুধীরের চর বোধ হয়।

'হ্যাঁ' ব'লেই গদাই পাশ ফিরে শুতে গেল।

পটল গদাইএর গলা জড়িয়ে কানের কাছে মুখ রেখে বললে, 'না গো না। কাল তোমায় ওরা মেরে ফেলবে।' টপ টপ ক'রে পটলের চোখের জল গদাইএর গলা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

পটল কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'চল, চ'লে যাই। সব গোছানো আছে।'

গদাই হতভম্বের মত ব'সে রইল। পটলের চোখের জলে প্লাবন নামল—'ছোরা দেখেছিলে মিথ্যে নয়!'

গদাই একবার বলবার চেষ্টা করলে, 'কাল যে হপ্তা!'

'থাক হপ্তা।' পটল ঝড়ের মত তার হাত ধ'রে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলে।

ছেলেটাকে কোলে নিয়ে পটল হারিকেনটা হাতে ক'রে নিলে। গদাই বাক্সটা বগলে নিয়ে বাসন নিতে যাবে, পটল জিজ্ঞাসা করলে, 'খেয়েছ তো?'

'হ্যাঁ। তোমার তো খাওয়া হয় নি?' গদাই লজ্জিত হয়ে প্রশ্ন করলে।

পটলের হাঁটুতে আবার লাগল। একটু মুচকে হেসে বললে, 'ঢের হয়েছে, চল।'

চিকাগোর পথে

(ভ্রমণকাহিনী)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

পৃথিবীর লোক যেমন ভাগ্য নিয়ে মাথা ঘামায় আমেরিকার লোক বিজ্ঞানের এত উন্নত স্তরে উঠেও সেই ভাগ্যের কথা ভোলে নি। যেখানে ভাগ্যের দৌরাত্ম্য সেখানে জুয়া খেলারও প্রাবল্য। বিশ্বমেলাও সে দোষ থেকে বঞ্চিত হয় নি দেখলাম। ছোট ছোট ঘর বেঁধে তাতে জুয়ার সব আড্ডা গাড়া হয়েছে। লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য মাইক্রোফোনের সাহায্যে বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, জুয়াড়ীদের পকেট খালি। যাদের জুয়া খেলার প্রবল ইচ্ছা রয়েছে তাদেরও পয়সায় কুলচ্ছে না। আমেরিকার অর্থ আর সর্বসাধারণের মাঝে ছড়ানো নেই, একত্র হয়েছে। অর্থের ধর্মই তাই। ছোট খাট কয়েকটি জুয়ার আড্ডা দেখে ক্যাবিনে ফিরে এলাম।

পূর্বেই বলেছি আমি 'হিচ হাইক' করতে মনস্থ করেছি। কিন্তু আরও একটু অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কয়েকদিন সাইকেল চড়ব ঠিক ক'রে নিলাম। আমার উদ্দেশ পেয়ে আমার পরিচিত কয়েকজন শ্বেতকায় এরই মাঝে নিগ্রো ক্যাবিনে এসে হাজির হয়েছে। তাদের সঙ্গে কথা হ'ল বাফেলো শহরে গিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। বললাম প্রথমে আমাকে সাদাদের হোটেলে খুঁজতে সেখানে দেখা না পেলে যেন নিগ্রো হোটেলে অনুসন্ধান করে। এই ব'লেই তাদের কাছ থেকে রাত্রির মত বিদায় নিতে হ'ল। কারণ নিগ্রো ক্যাবিনে আমার সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকলে হয়তো তাদের বদনাম হ'তে পারে। আমিও সুখী হলাম, কারণ অনর্থক কথা ব'লে সময় নষ্ট না ক'রে এখন একটু বিশ্রাম করা উচিত।

প্রভাতে উঠে মেলাকে পিছনে রেখে এগিয়ে চললাম। অনেক গ্রাম পথে পড়তে লাগল। মনে হ'ল গ্রাম দেখা উচিত। তাই গ্রামে গ্রামে সময় কাটাতে আরম্ভ করলাম। ইউরোপের অনেক গ্রাম দেখেছি, কিন্তু আমেরিকার গ্রাম অন্য ধরনের। গ্রামে বিজলী বাতি, গ্যাস, গরম ও ঠাণ্ডা জলের কল, আধুনিক স্বাস্থ্যবিধান, পেট্রল স্ট্যাণ্ড, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ক্যাবিন সব বর্তমান। গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং কোলাহলহীন। প্রত্যেক গ্রামে ছোটদের স্কুল এবং বড়দের কলেজ আছে। সব গ্রামই জনবহুল। ছোট গ্রামে শুধু ছোটদেরই স্কুল আছে। আমাদের কলকাতা শহরেও এমন কোনও বাড়ি নেই যার সঙ্গে সেসব গ্রামের স্কুল গৃহের তুলনা করতে পারা যায়। অনেকে বাংলো ক'রে বাস করেন; সেরূপ স্বাস্থ্যবিহিত বাংলো ভারতে কোথাও দেখি নি।

এসব দিক্ দিয়ে গ্রামগুলি বাস্তবিক স্বর্গ। কিন্তু আমার কাছে এক কারণে তা বিশ্রী মনে হ'ল। গ্রামের লোক নিগ্রো এবং হিন্দুকে একই চক্ষে দেখে, সেজন্য কোনও হোটেলে স্থান দেয় না, এমন কি অনেক সময় বিপদ আপদে সাহায্যের কথাও ভুলে যায়। অনেক বক্তৃতা করলে, অনুনয় করলে হয়তো কারও দয়া হয়, নয় তো নিগ্রোদের মতই আমাদেরও সংবর্ধনা হয়ে থাকে। ছোট ছোট গ্রামে নিগ্রোদের থাকার জন্য কোনও ক্যাবিন নেই। এইরকম ছোটখাটো অভাব আমাকে বিব্রত ক'রে তুললে। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল আজই সাইকেলটাকে কোথাও পাঠিয়ে দিই। কিন্তু তা করলাম না, আমি নিগ্রো গৃহস্থের বাড়ি খুঁজে তাদেরই মধ্যে থাকতে লাগলাম। আমার উদ্দেশ্য—অন্তত পক্ষে কয়েকখানা গ্রাম দেখে এ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা ক'রে নেওয়া। সাইকেলে লেখা ছিল "Hindu traveller", তাতে কাগজ এঁটে দিলাম। লোকে আর বুঝতে পারছিল না, আমি কোথাকার লোক। এতে আমার অসুবিধা মোটেই হয় নি। কেউ কোনও প্রশ্ন আমাকে করত না, আপন মনেই চ'লে যেতাম। Binghamtan নামক এক বর্ধিষ্ণু গ্রামের কাছে এসে বেশ বড় এক নিগ্রো-পল্লী পেলাম; এবং তাতে কয়েক দিন থাকব ভেবে একটা হোটেলে স্থান নিলাম।

নিগ্রোদের মধ্যে ব'সে সময় কাটান একটা সংকটের কাজ। এদের মাঝে আমোদপ্রমোদের কথাই হয় বেশী। খেলার কথা নিয়ে তর্কাতর্কির সময় এদের মধ্যে ছুরি আর পিস্তলও চলে। সিনেমার কথাটা বড় ওঠে না, কারণ যতগুলি অভিনেতা অভিনেত্রী নিগ্রোদের মাঝে হয়েছে তাদের কখনও নায়ক নায়িকার অভিনয় করতে দেওয়া হয় না। জো লুইসকে নিয়েই যা তাদের বাহাদুরি। রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতি নিয়ে তারা আলোচনা করতে মোটেই পছন্দ করে না। মাঝে মাঝে ধর্ম নিয়ে বেশ কথাবার্তা হয়। যখনই অবতারদের (prophet) নিয়ে কথা হয় এবং তাদের আদিপুরুষ কে তা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখনই তারা ভগবানের তত্ত্বকথায় ফিরে আসে। তাদের ক্লাবে ব'সে যখন তারা এসব কথা আমার সামনে বলত, আমি নীরব থাকতাম। আমি যে একজন পর্যটক এবং পর্যটকদের কাছে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে, সে ধারণা তাদের মোটেই ছিল না। এদিকে আমি এমন কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না, যাতে ক'রে এদের সঙ্গে কোনও কথা চালাতে পারি।

এমনি, এক দিন কেটে গেল। দ্বিতীয় দিনে ক্লাবে ব'সে একটা বই পড়ছি, এমন সময় বাইরে সাইকেলটা একটি শ্বেতকায়ের চোখে পড়ায় তিনি এসে আমি কোথায় আছি তার সন্ধান করতে লাগলেন। আমার পোশাক দেখে কেউ ধারণা করতে পারত না যে আমি পর্যটক; কারণ আমি মামুলী পোশাক পরতেই ভালবাসতাম এবং এখনও বাসি। সাদা লোকটি অনেক জিজ্ঞাসা ক'রে আমার খোঁজ পেয়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর সঙ্গে কথোপকথন কালে মিনিট দশেকের মধ্যে ক্লাবের হলে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নিয়ে একটা শ্রোতৃমণ্ডলী তৈরি হয়ে গেল। আমি তাদের কথা তাদেরই কাছে বলতে আরম্ভ করলাম।

এখানে আসবার পর, কাল থেকে, আমার যেসব ধারণা হয়েছে তা বলবার পর বললাম, "যাদের পূর্ব ইতিহাস এবং পূর্ব জাতীয় গৌরব ক্ষুণ্ণ তারা কি মানুষ নয়? তারাও নিশ্চয় মানুষ। মানব সমাজে স্থান পেতে হ'লে মানুষের মত কাজ করতে হয়, পরিশ্রমী হ'তে হয়। আপনারা নিগ্রো, তাতে কি আসে যায়? যেভাবে আপনারা হেসে খেলে হালকা বিষয় নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন তাতে আপনাদের কোনও দায়িত্বের বালাই আছে ব'লে মনে হয় না। জার্মানদের পক্ষ নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কত কথাই তো বলতে শুরু করেছেন, তারা কি আপনাদের স্বর্গে পৌঁছে দেবে? আফ্রিকায় ইংরেজ আর জার্মানরা নিগ্রোদের সমান ঘৃণা করে। আমি পরাধীন, সাদাদের দ্বারা ঘৃণিত; আপনাদের কার্যকলাপ দেখে আমারই মাঝে মাঝে আপনাদের ঘৃণা করতে ইচ্ছা হয়। আপনাদের কোনও প্রফেট নেই, নেশন ব'লে এখনও কিছু গ'ড়ে ওঠে নি। কবে নেশন গ'ড়ে উঠবে সে অপেক্ষায় থাকতে গেলে অনেক শতাব্দী চ'লে যাবে। আপনাদের যদি সোজাসুজি এবং এখনই কিছু করবার থাকে তবে এমন এক ব্যবস্থা করুন যাতে গড়নের কাজ আরম্ভ হয়। আপনাদের সামনে কাজের সকল পথ খোলা, আপনারা ইচ্ছা করলেই কাজ শুরু করতে পারেন। অথচ আপনাদের মূল্যবান সময় আপনারা আলস্যে ও বাজে কথায় কাটিয়ে দিচ্ছেন।"

আমার সহজ সরল কথায় এদের মনের পরিবর্তন ঘটেছে ব'লে মনে হ'ল। এরা যাতে ভাল বই পড়তে পায় লাইব্রেরি কর্তৃক তার বন্দোবস্ত হ'ল।

মাসের শেষ। আমাদের দেশেও মাসের শেষ হয়, মাসের

আরম্ভ হয়। আমাদের দেশে এ দুটো সময় শুধু শহরেই অনুভূত হয়, গ্রামের লোক অনেক স্থলে কোন্ মাস এল গেল তার বড় একটা সন্ধান রাখে না। আমেরিকার গ্রামেতে মাসের শেষ হওয়ার সংবাদ সকলকেই রাখতে হয়। ঘরের ভাড়া দেওয়াটা অবশ্যকর্তব্য। গ্রামেতে ভাড়া ইত্যাদি দেবার সাপ্তাহিক প্রথা নাই, আছে মাসিক। মাসের শেষে ভাড়া দিতে না পারলে মালিক এসে পুলিসের সাহায্যে ভাড়াটেকে ঘর থেকে বার ক'রে দেয়। ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে মা পথে এসে দাঁড়িয়েছে, বাবা নূতন ঘরের অন্বেষণে বার হয়েছে, পুলিস আইন বজায় রাখতে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, এরূপ দৃশ্য গ্রামে বিরল নয়। গ্রামের বাসিন্দারা গ্রামের মালিক নয়, Real Estate Owner ব'লে এক রকমের কোম্পানি আছে তারাই হ'ল গ্রামের মালিক। তবে যে মাঝে মাঝে দু-একজনের বাড়ি নেই তা নয়, কিন্তু রিঅ্যাল এস্টেট ওনার কোম্পানিই বর্তমানে আমেরিকার গ্রামে গ্রামে প্রাধান্য লাভ করছে। আমার মনে হয়, এরূপভাবে আর কিছুদিন গেলে আমেরিকার গ্রামগুলি রিঅ্যাল এস্টেট কোম্পানিরই হাতে চ'লে যাবে। গ্রামের লোক হবে হরিজন (proletariate)। ইউরোপীয় দেশগুলিতে প্রোলিটারিয়েটএর সংখ্যাবৃদ্ধি মানে, হয় সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার নয়তো নাৎসীবাদের দমননীতির আওতায় সমাজকে নিয়ে আসা। সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদ অগ্রাহ্য। আমেরিকার গ্রাম দেখে আমার ভয় হল, মনে হ'ল দেশটা এক অন্তর্বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছে।

গ্রামের লোক পরিবর্তনের পথ চেয়ে ব'সে আছে। যে কোনও রকমে যে কোনও পরিবর্তন আসুক না কেন, মনে হয় গ্রামের লোক সাদরে তা গ্রহণ করবে। আমেরিকার মেরুদণ্ড ওআল্‌স্ স্ট্রীটের কর্তারা যে সে সংবাদ রাখেন না, তা নয়, তবে শাক দিয়ে মাছ ঢেকে রাখবার চেষ্টা করেন।

নিগ্রো বাসিন্দাদের মাঝে ঘর ছেড়ে দেওয়া বা নূতন ক'রে ঘর নেওয়ার কোনও চিন্তা নেই। তারা দৈনন্দিন দাস্যবৃত্তি ক'রে কায়ক্লেশে যা পায় তাই দিয়ে ঘরের মালিকের মুখ বন্ধ রেখে খাবার এবং পোশাকের প্রতি দৃষ্টি না রেখেই দিন গুনে যাচ্ছে। একে জীবন বলা যেতে পারে না, একে জীবনমরণের সন্ধিক্ষণ বলা যেতে পারে। এই অবস্থায় থেকেও এরা নিজকে সুখী মনে করে, দিনটা কাটলেই যেন সকল বালাই চুকে গেল মনে করে।

নিগ্রোপল্লী থেকে শ্বেতকায় পল্লীতে যাবার নিমন্ত্রণ হ'ল। নিমন্ত্রণ মানে কথা বলবার এবং কথা শোনবার নিমন্ত্রণ। যখন ওদের পাড়ায় গিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলাম, ওরা দেখলে আমি নিগ্রোদের মত কোনও ভাবভঙ্গী দেখাচ্ছি না, ওদের অন্যান্য মানুষের মতই গণ্য ক'রে কথা বলতে আরম্ভ করেছি, তখন ওদের মাঝে সান্ত্বনা এল, বুঝল হিন্দুস্থানের হিন্দু তাদের সমকক্ষ। মানুষের মন দুর্বলতায় ভরতি। একটু সমবেদনা পেলেই দুর্বল আপন হৃদয়ের দরজা খুলে দেয়। যেখানে তার ক্ষত তা দেখিয়ে দেয়, জিজ্ঞাসা করে প্রতিকারের কথা। সাদা পল্লীর লোক ভবিষ্য যুদ্ধ এবং তার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। পরিবর্তন আসবে কিনা—এই প্রশ্নের উপরেই তারা জোর দিলে বেশী। কিন্তু আমি একজন পর্যটক মাত্র। লোকের দুঃখ কষ্টের কথা শুনতে পারি, হয়তো সমব্যথিতও হ'তে পারি, কিন্তু প্রতিকার করতে পারি না। হয়তো আমি বর্তমান জানি, বর্তমানের ঘটনাবলীর উপর নির্ভর ক'রে ভবিষ্যতের কথা বলতেও পারি, কিন্তু তা কি আমার কর্তব্য?

দেখলাম গ্রামে, নগরে, সর্বত্র সমানভাবে অভাবের আক্রমণ শুরু হয়েছে। যারা পারছে তারা বিদ্রোহী হয়ে তার প্রতিবিধান করেছে, যারা পারে না তারা অসহায় ক্লান্ত বৃদ্ধের মত পথের পাশে দাঁড়িয়ে পথের দৈর্ঘ্যের সংবাদ লোককে জিজ্ঞাসা করে। তবু আমেরিকা ধনকুবেরের দেশ! ধনীর দেশের লোকেরও এরূপ অবস্থা দেখে বাস্তবিক আমার হৃদয় কেঁপে উঠেছিল।

অন্ধ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ

অন্ধ ভিখারী চলেছে পথের পর,
ডাকে যেন তারে কোন্ সে সুদূর দেশ!
শ্রান্ত চরণে গতিবেগ মন্থর,
আলো হারা আঁখি চাহিছে নির্নিমেষ।
তিল তিল গণি' ব'য়ে গেল কতকাল,
পৃথিবী আনিল কত বিচিত্র রূপ,
সে শুধু হেরেছে তমসার কালো জাল,—
তারি মাঝে যেন বিরাজে কী অপরূপ!

মোর আঁখিপাতে এখনো জ্বলিছে আলো,
এখনো মেটেনি পৃথিবী দেখার সাধ;
তবু যেন আর কিছু লাগে নাক ভাল,
মনের নিভৃতে অমানিশা উন্মাদ!
অন্ধের মত আমিও চলেছি পথ,
অমৃত কণ্ঠে ডাকিছে ভবিষ্যৎ।

জীবন

অদ্বৈতকুমার সরকার

তরঙ্গ বিক্ষোভ নাই সে-সমুদ্র দেখিয়াছি হায়!
মৃত্যুর হিমেল স্পর্শে নিষ্পলক নেত্র সম স্থির;
দৃষ্টির তরণী দূরে উদ্‌ভ্রান্ত ভেসে চলে যায়,—
কুলহারা জলরাশি,—ব্যঙ্গরূপ তবু জলধির।

বৈশাখীর ঘটা নাই সে-আকাশ যত দেখিয়াছি,
পটে আঁকা চিরমৌন যেন এক তুলির লিখন;—
শ্রান্ত-শয়ান রচি কিংবা কোনো আলস্য-বিলাসী
তন্দ্রাঘোরে অহোরাত্র মেলিতেছে মুদিছে নয়ন।

জীবনে সংগ্রাম নাই—গতি নাই—নাহি চঞ্চলতা,—
সংস্কার শৃঙ্খলিত সে-জীবন দেখিয়াছি আমি;
সত্য হোক, মিথ্যা হোক মেনে নিয়ে চিরন্তন প্রথা!
নিজেরে করেছে পঙ্গু—জাতিরে করেছে অধোগামী!

গোধূলি রাগ

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীতারাপদ রাহা

ভারতী তখন বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে আঁচলের এক প্রান্ত জড়াইতে জড়াইতে মুখে গানের সুর ও পায়ে মৃদু নৃত্যের তাল আরম্ভ করিয়াছে। শকুন্তলা সে দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিল। ভারতী প্রথমে লক্ষ্য করে নাই, পরে যখন দেখিল, লজ্জা পাইল। কুমারেশ বলিলেন—গান বাজনায় ওর বড় ঝোঁক। ছেলেবেলায় আমারও ঠিক এমনি ধারা ছিল। কোনও নতুন গানের সুর একবার শুনলেই ও ধ'রে ফেলতে পারে!

শকুন্তলা ভারতীর মুখের দিকে তাকাইয়া সস্নেহ হাসি হাসিয়া বলিল—গাও না গানটা ভাল ক'রে।

ভারতী লজ্জায় ঘামিয়া উঠিল,—গান তো আমি জানি না।

—ঐ যে গাইছিলে তুমি!

—ও তো মোটে এক লাইন।

—তুমি মোটে এক লাইনই জান, এইটেই কি সত্যি?

মিথ্যার অভিযোগ শুনিয়া, বিশেষত কুন্তলাদির কাছে, ভারতী কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল—মিথ্যা আমি বলি না, সত্যিই আমি এ গানটার এক লাইনের বেশী জানি না। দাদুর সাথে থিয়েটার শুনতে গিয়ে শুনেছিলাম।

—তবে যে গান গোটা জান সেইটেই গাও। শকুন্তলা ভারতীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল।

কুমারেশ বলিলেন—গাও না, রেকর্ড থেকে যা শিখেছ তাই একটা গাও।

মিথ্যার অভিযোগে ভারতীর তখন মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে, দুই চোখ ছল ছল করিতেছে, ঠোঁট উলটাইয়া সে বলিল—যে গান শুনে শুনে পচা হয়ে গেছে, সে গান আমি কাউকে শোনাতে পারি না।

ভারতীর অভিমান দেখিয়া শকুন্তলা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কুমারেশ বলিলেন—দোষ আমারই, কত দিন থেকে মনে করছি ওর গানের জন্য একজন মাস্টার রেখে দিই, কিন্তু ব্যবস্থা ক'রে উঠতে পারি নি। তুমি তো একটি স্কুল চালাও, মেয়েদের ভাল গান শেখাতে পারে এমন কোনও লোক কি—

শকুন্তলা কোনও উত্তর না দিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

কুমারেশ বলিলেন—অবশ্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে এখনই রাশি রাশি দরখাস্ত এসে হাজির হবে। শুধু উদ্যোগের অভাবে দেওয়া হয় নি, কলকাতা এসে সব দিক গুছিয়ে নিতে পারি নি এখনও।

শকুন্তলা হয়তো বুঝিতে পারিল না, তাহার উত্তর দিবার দেরিতেই কুমারেশের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছে। বলিল—আমি খোঁজ ক'রে দেখব। আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও দেখতে পারেন, যাঁরা আসবেন, তাঁদের একবার একটু দেখে নিলেই হবে।

কিন্তু কুমারেশ আর এ প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে চান না। লজ্জিত সংকুচিত ভারতীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—চল, দিদিকে এইবার তোমার বাগান দেখাবে চল।

ভারতী শকুন্তলার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল, কুমারেশ পিছু পিছু আসিলেন। টবে সযত্নরক্ষিত মল্লিকা গাছে ফুলের মেলা বসিয়াছে; তাহার পাশে অর্ধচক্রাকারে শ্বেতপাথরের বেদী। দরকার হইলে এখানে বসিয়া শীতের সকালে রোদে বসিয়া চা খাওয়া চলে, গ্রীষ্মে চলে সান্ধ্য-সম্মেলন।

সিজন ফ্লাওআরের গাছ দিয়া একটা মস্তবড় K ও B লেখা হইয়াছে; শকুন্তলা বুঝিল এ ভারতীরই কীর্তি।

কুমারেশ বলিলেন—এসব ভারতীর মাথা থেকে বেরিয়েছে।

শকুন্তলা মৃদু হাসিয়া বলিল—সে আমি দেখেই বুঝেছি।

ভারতী চঞ্চল হইয়া উঠিল; —এবার লিখব তিনটি অক্ষর, K B ও S।

শুনিয়া শকুন্তলা ও কুমারেশ দুইজনই হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু সে ক্ষণকাল। কি কথা মনে করিয়া দু'জনের মুখের হাসিই কোথায় মিলাইয়া গেল।

ভারতী ঘুরিয়া ঘুরিয়া তার সযত্নরোপিত ফুলের গাছ দেখাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তার ম্যাগনোলিয়া, তার ক্যালিফর্নিয়ান পপি, প্যানসি তার দুষ্প্রাপ্য গোলাপ। ভারতীর ইচ্ছা শকুন্তলাকে সে প্রত্যেকটি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখায়। স্নিগ্ধ স্মিত হাসি দিয়া শকুন্তলা প্রতিবারই ভারতীকে উৎসাহিত করিতেছিল, কিন্তু কুমারেশ লক্ষ্য করিলেন শকুন্তলা এখন প্রকৃতিস্থ নয়। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই মেয়েটিকে এ বাড়িতে চাএ ডাকিয়া তিনি মোটেই ভাল করেন নাই, লেকে বেড়াইতে বেড়াইতে ইহাকে দূর হইতে দেখাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর কোনও দিন তাহাকে এ বাড়িতে ডাকা হয়তো সংগত হইবে না, তাই তাহার আকর্ষণ, তাহার সৌন্দর্য কুমারেশের কাছে দুর্বার হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, ক্লান্ত শকুন্তলাকে শ্বেত-পাথরের বেদীর উপর বসিতে অনুরোধ করিয়া কুমারেশ ভারতীকে উপরে যাইতে বলিলেন। তাহার পড়িবার সময় হইয়াছে।

কথা। কথা দিয়া মানুষ আপনাকে কতটুকু প্রকাশ করিতে পারিয়াছে? শকুন্তলার পাশের বেদীতে বসিয়া বৃদ্ধ কুমারেশ হয়তো সেদিন ভদ্রতার খাতিরেও আর একটাও

কথা বলিতে পারেন নাই, শকুন্তলা সেদিন পাষাণের বেদীতে বসিয়া হয়তো পাষাণীই হইয়া গিয়াছিল। তবুও সেদিন সন্ধ্যায় নীরবতার ভিতর দিয়াই তাঁহাদের নিকট পরস্পরের যে প্রকাশ ঘটিল তা কথা দিয়া বুঝি তাহারা কেহই এর চেয়ে আপনাকে বেশী প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

(৬)

শকুন্তলাকে এ বাড়িতে আসিতে বলিলে যে কত বড় বেদনা দেওয়া হয়, তাহা কুমারেশ একটি দিনেই বুঝিয়া লইয়াছেন। আর কোনও ওজরেই তাহাকে এ বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা চলে না। অথচ আর কোনও দিনই তাহাকে দেখিতে পাইবেন না, তাহার পাশে বসিয়া তেমনি আর একটিও নীরব সন্ধ্যা কাটাইতে পারিবেন না, এ চিন্তা কুমারেশ সহ্য করিতে পারেন না। বৃদ্ধ হইলেই তাহার জগতের কোনও কিছুর প্রতি মোহ থাকিবে না, এ কথা যে বলে, সে মূর্খ, মানুষের মনের কোনও খবরই তাহার জানা নাই। ভারতীর স্বহস্তরোপিত গাছে ফুল ফোটা দেখিবার জন্য ভারতী যেমন আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, একখানা মুখ দেখিবার জন্য কুমারেশের অন্তর বুঝি তেমনিই অধীর হইয়া ওঠে। কিন্তু ভারতীর মত নিজের আকুলতার কথা বলিবার অধিকার কুমারেশের নাই। সে কথা ফুলের মত নিষ্পাপ হইলেও জগতের লোক শুনিয়া নাক সিঁটকাইবে, বিদ্রূপের কষাঘাতে তাহার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিবে। কুমারেশের আবার নূতন করিয়া সোমেশের উপর রাগ হইল। সে আজ এত বড় একটা ভুল না করিলে শকুন্তলাকে আজ তিনি নিঃসংকোচে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পারিতেন, লোককে দেখাইয়া তাহাকে ভালবাসিবার অধিকার কুমারেশের জন্মিত! ঠাকুরদা নাতবউকে ভালবাসিলে লোকসমাজে সেটা কোনও দিনই দৃষ্টিকটু হইত না।

কিন্তু যে সম্ভাবনা শেষ হইয়া গিয়াছে তাহা লইয়া কুমারেশ আর ভাবিতে চান না। শকুন্তলা প্রায় দুই সপ্তাহ হইল এখান হইতে গিয়াছে, দুই সপ্তাহ আগের একটি সন্ধ্যা কুমারেশের মনে উজ্জ্বল হইয়া আছে; একটি মুহূর্তও সে চিন্তার হাত হইতে কুমারেশ অব্যাহতি পান না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাঁহার মনের এরূপ অবস্থা হইলে তাহার অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কুমারেশ একটা স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিতেন, হয়তো উপায়ও হইত, হয়তো শান্তিও তিনি পাইতেন।

সকালে ঘুম ভাঙিলে বিছানায় শুইয়া কুমারেশ ভাবেন, শকুন্তলা ট্রেতে করিয়া চা ও টোস্ট লইয়া তাহার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; মুখে তার স্মিত হাসি, সকালে স্নান করিয়া ভিজা চুল পিঠের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে; শকুন্তলা নাতবউ হইয়া কুমারেশের ঘরে আসিয়াছে। কুমারেশের তন্দ্রাজড়িত অবস্থায় ভাবনাগুলি অনেক সময় স্পষ্ট রূপ লইতে যায়, দেবপ্রসাদ চা আনিয়া কুমারেশের স্বপ্নজাল ছিন্ন করিয়া ফেলে।

দেবপ্রসাদের আনা চা আজকাল আর কুমারেশকে তৃপ্তি দেয় না। চাএ চুমুক দিতে দিতে কুমারেশ ভাবেন, লোকে শোভা, সৌন্দর্য ও তারুণ্যের পূজা করে জীবনের প্রথম হইতে শেষ দিন পর্যন্ত। বৃদ্ধ তাহার মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে তার তরুণ নাতি নাতনীর মুখের উপর শেষ দৃষ্টিপাত করে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথম দেখে তার মায়ের মুখ—পূর্ণ যৌবনের ফলপ্রসূ মাধুর্য। মা-ই তার একমাত্র ভালবাসার আধার। মা তার যৌবনের সকল স্নেহ দিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তোলেন, তাঁর যৌবনের সকল পুঁজি ফুরাইয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। মানুষ তার এই রিক্ততার দাম দেয় না, দিতে পারে না, তার শাশ্বত সৌন্দর্য-ভিখারী মন আবার নূতন রূপে নূতন ভাবে যৌবনের পূজা করিতে চায়। সেই পূজার জয়গান ফুরাইতে না ফুরাইতে দেখে পুত্র কন্যা নববিকসিত সৌন্দর্যালোকে চোখ আলো করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কালের গতিতে যখন তাহাদের পুঁজি শেষ হইয়া আসে তখন আবার নূতন অতিথি নূতন রূপে মরণ-পথ-যাত্রীর শেষ বাসনা মিটাইতে আসে, বৃদ্ধ বৃদ্ধা তখন নাতি নাতনীর মুখের দিকে চোখ রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাস ফেলিতে চায়। কুমারেশ এ কথার অর্থ বোঝেন যে, মানুষ চিরদিন রূপের পূজারী, সৌন্দর্যের শাশ্বত উপাসক।

এমনি করিয়া বিচার করিয়া কুমারেশ নিজের মনের বর্তমান চিন্তাধারার মাঝে কোনও গ্লানি খুঁজিয়া পান না, সুতরাং শকুন্তলাকে দেখার পথে যে তাঁহার কোনও বাধা নাই এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় হইয়া ওঠেন।

সেদিন দুপুরে দিবানিদ্রার পর তিনি বিছানায় শুইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, সোমেশ একবার লিখিয়াছিল—শকুন্তলা ভাল গান গাহিতে পারে। তাহা হইলে সেদিন গানের মাস্টার ঠিক করিতে বলায় সে যেরূপ স্থির হইয়া গিয়াছিল তাহাতে আমাদের অপমানিত বোধ করার তো কিছুই নাই, বরং তাহারই কাছে অপর লোক ঠিক করিতে বলায় হয়তো তাহাকেই অপমান করা হইয়াছে। কুমারেশের তখনই আবার মনে হইল, কিন্তু এ বাড়িতে টাকা লইয়া ভারতীকে গান শিখাইতে আসিতে বলাই কি শোভন হইত? সে কি তাহাতে রাজী হইত? এই সকল চিন্তার অন্তরালে কুমারেশ মনে মনে একটু খুশীও হইয়া উঠিলেন: এই প্রসঙ্গে শকুন্তলার সহিত শীঘ্রই একবার দেখা করিতে পারিবেন।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে লেকে সান্ধ্য ভ্রমণের পর ভারতীকে বাড়িতে পেঁছাইয়া কুমারেশ শোফারকে গাড়ি এসপ্লানেডে চালাইতে বলিলেন। মাঠ একটু ঘুরিয়া কুমারেশ মার্কেটে আসিয়া দুই চুপড়ি ফল কিনিলেন আর কিছু মিঠাই।

ফিরিবার সময় গাড়ি চলিল ল্যান্সডাউন রোডের পথে। শকুন্তলার বাড়ির সম্মুখে আসিয়া গাড়ি থামিল। কুমারেশ শোফারকে একটি ফলের চুপড়ি লইয়া উপরে আসিতে বলিলেন। দোতালায় ছোট একটা ফ্ল্যাট লইয়া শকুন্তলা থাকে। কুমারেশ ঢুকিতেই দেখিলেন—'শকুন্তলা মিত্র আউট'; তবু তাহার বসিবার ঘর খোলা। চাকরটা সামনেই ছিল, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাকে চান আপনি?

কুমারেশ তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—শকুন্তলা কতক্ষণ পরে আসবেন?

চাকরটা বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়া বলিল—তিনি আর পনের মিনিটের ভিতরেই এসে যাবেন, আপনি ভিতরে গিয়ে বসুন।

শোফারকে ইঙ্গিতে ফলের চুপড়ি ঘরে রাখিয়া গাড়িতে গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ঘরে গিয়া দেখিলেন দুইজন মহিলা শকুন্তলার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে একজন বর্ষীয়সী; দেখিয়াই কুমরেশের মনে হইল কোনও আশ্রম হইতে আসিয়াছেন। আর একজন তরুণী মনে হয় শকুন্তলার ছাত্রীস্থানীয়া। কুমারেশ ঘরে ঢুকিতেই তাঁহারা আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাকে লইয়া গিয়া ভাল আসনে বসাইলেন। ইহাদের ধরন দেখিয়া কুমারেশের মনে হইল, ইঁহারা প্রায়ই এখানে আসিয়া থাকেন। কুমারেশ মৃদু হাসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

ঘরের চারিদিকে একটা বিলাসহীন সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরের দেওয়ালগুলি শকুন্তলার ব্যবহার্য থানের মত সাদা, মনে হয় কয়েক দিন আগে কলি ফিরানো হইয়াছে। কাঠের প্লেন মজবুত কৌচ ও সোফায় মোটা সাদা লংক্লথ মোড়া। ঘরের এক কোণে ডোয়ার্কিনের মার্কা মারা একটা অর্গান। তার পাশে সাদা কভারে ঢাকা একটা টিপয়ের উপর শ্বেত পাথরের একটা ধ্যানী বুদ্ধ। দেওয়ালে কয়েকটি ল্যাণ্ডসকেপের পাশে একখানি বিলাতী ছবি—'হোপ'। জগতের প্রতীকস্বরূপ একটা গোলকের উপর এক চোখ বাঁধা স্ত্রীমূর্তি নিবিষ্ট মনে তারের যন্ত্র বাজাইয়া চলিয়াছে। দেখিবামাত্র কুমারেশের মনে হইল, the idea! মানুষকে কানে কানে আশার মিঠা কথা শুনাইয়া এ-ই তবে মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে।

ঘরে যাহা কিছু দ্রষ্টব্য ছিল তাহা ফুরাইয়া গেল, এইবার হয়তো এই দুইটি মহিলার সঙ্গে কথা বলা আরম্ভ করিতে হইবে। কুমারেশ মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

কুমারেশের দেখা শেষ হইয়াছে দেখিয়া বর্ষীয়সী মহিলাটি তাঁহার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি বুঝি এঁর কোন আত্মীয়?

কুমারেশের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। এরূপ অনাবশ্যক প্রশ্নের কারণ কি? কিন্তু মুখে তাঁহাকে কিছুই বলিতে হইল না; তাহার উত্তর দিবার পূর্বেই শকুন্তলা আসিয়া কুমারেশকে প্রণাম করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—দাদু, কখন এলেন? ভাল?

কুমারেশের মুখের রেখা সহজ হইয়া আসিল।—এই কয়েক মিনিট আগে। ভাল। তুমি ভাল?

সহজ শান্ত হাসিয়া শকুন্তলা বলিল—হাঁ। তার পর নিতান্ত সংকুচিত হইয়া কুমারেশের অতি নিকটে আসিয়া বলিল—আমাকে দু মিনিট ছুটি দিন, আমি এঁদের কাজ শেষ করে আসি।

হাতের কাজ শেষ করিয়া শকুন্তলা নিশ্চিন্তে কথা বলিতে পারিবে জানিয়া কুমারেশ অন্তরে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তিনি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। মহিলা দুজনকে পাশের ঘরে ডাকিয়া কথা বলিতে শকুন্তলার দু মিনিটও লাগিল না। তাহারা চলিয়া গেলে শকুন্তলা কুমারেশের পাশে একটা সোফায় আসিয়া বলিল—এত ফল এনেছেন কেন? —এত আমি কি করব?

কুমারেশ শকুন্তলার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কিছু তোমার ভাইকে পাঠিও।

—ভারতীর জন্য কিছু নিয়ে যান।

—তার জন্য গাড়িতে আছে। বলিয়া কুমারেশ শকুন্তলার মুখের দিকে তাকাইলেন। কতবড় ভুলই যে সোমেশ করিয়াছে; নইলে কুমারেশের শেষ জীবন আজ সার্থক হইয়া উঠিত। যৌবনের উদ্ভ্রান্ত দিনগুলিতে ভুল করিয়াও কি কুমারেশের চোখে এমন একখানি মুখ পড়ে নাই!

কুমারেশের দৃষ্টিতে বুঝি প্রশংসা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছিল—শকুন্তলার মুখ ঈষৎ রক্তিমাভ হইয়া উঠিল।

কুমারেশ বুঝিয়া দৃষ্টি সংযত করিয়া বলিলেন—যাঁরা এসেছিলেন—

শকুন্তলা স্বচ্ছন্দ হইয়া বলিল—হাঁ, ওঁদের পরিচয় তো আপনাকে এখনও দেওয়া হয় নি। ওদের একজন, যিনি বয়সে ছোট, আমার ছাত্রী।

—অতবড় ছাত্রী?

সলজ্জ হাসি হাসিয়া শকুন্তলা বলিল—আমার স্কুলের নয়, গানের ছাত্রী।

কুমারেশ জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিলেন। শকুন্তলা বলিল,—যে পর্যন্ত মানিকের পড়া শেষ না হয় সে পর্যন্ত টুকিটাকি না করলে আমার চলে না।

সহানুভূতিতে কুমারেশের অন্তর ভরিয়া গেল। তা হ'লে নিজের সময় ব'লে তোমার বড় বেশী কিছু নেই ব'লে মনে হচ্ছে?

স্মিত হাসিয়া শকুন্তলা বলিল—বেশী দরকার বোধ করি না।

—আর একজন যিনি এসেছিলেন তিনিও কি কোনও গান সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে?

মাথা নীচু করিয়া শকুন্তলা বলিল—না, ও আমার এক নতুন নেশা।

কুমারেশ কিছু না বুঝিয়া শকুন্তলার মুখের দিকে চাহিলেন। শকুন্তলা বলিল—উনি হচ্ছেন "কল্যাণী অবলাশ্রম"এর সেক্রেটারি; ওখানেও আমি একটু কাজ করি।

কুমারেশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—অবলাশ্রমে? বেশ কিছু মোটা টাকা আদায় ক'রে নেয় বুঝি?

শকুন্তলা হাসিয়া বলিল—মোটা টাকা আমি কোথায় পাব দাদু, মাস অন্তে যৎসামান্য দিয়েই সাহায্য করতে পারি; আমাদের দু ভাই-বোনের খরচ-খরচা বাদে যা বাঁচে।

কুমারেশ বুঝিলেন এই সব কারণেই শকুন্তলাকে গানের টিউইশন করিতে হয়, অন্য কোনরূপ টিউইশন করে কি না

তাই বা কে জানে। তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কুমারেশ জিজ্ঞাসা করিলেন—কাজটা তোমার ভাল লাগে?

শকুন্তলা সহজ আন্তরিকতার স্বরে বলিল—হাঁ।

কিন্তু এসব কাজে প্রায়ই শোনা যায় টাকাগুলির সদ্‌ব্যবহার হয় না, সাধারণের টাকা ব্যক্তিগত ভোগে উড়ে যায়, যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক হয়ে ওঠে।

মৃদু হাসিয়া শকুন্তলা বলিল—জগতের সব বড় আর ভাল কাজের মাঝে একটু আধটু ত্রুটি চিরকালই থাকে, তাই ব'লে—

শকুন্তলা থামিল, হয়তো বলিতে যাইতেছিল, "তাই ব'লে সেটা বাদ দেওয়া যায় না।" কিন্তু তাহা না বলিয়া একটু থামিয়া বলিল—যারা দুর্গতিগ্রস্ত তাদের জন্য কিছু কাজ করতে পারলে বড় আনন্দ হয় দাদু, ভাল মন্দ বুঝি না।

কুমারেশ শকুন্তলার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন শকুন্তলা ভাল মন্দ বেশ ভাল করিয়াই বোঝে, শুধু কুমারেশের কাছে আত্মগোপন করিতেছে। সহায়হীনা বিপন্নার প্রতি ভালবাসায় শকুন্তলার স্বাভাবিক সৌন্দর্যের উপর যেন একটা দিব্যভাবের আভা পড়িয়াছে। শকুন্তলা আবার বলিল—অপরকে সুখী করাই নিজের সুখী হবার উপায়, এ কথাটা কোথায় পড়েছি মনে করতে পারছি না, কিন্তু কথাটা সত্যি নয় কি দাদু?

কুমারেশ শকুন্তলার মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। আপাতত আমাকে একটু খুশী ক'রে তুমি নিজে সুখী হও না কেন?

শকুন্তলা তাকাইল।

কুমারেশ বলিলেন—তুমি ভাল গান করতে পার সে কথা আমার জানা আছে; আর এ বয়সে নাতি নাতনীর কাছে গান শোনবারই আমাদের কথা, কিছু শোনালে সুখী হতাম।

কোন্ কথাটাতে কুমারেশ ঠিক হয়তো বুঝিলেন না কিন্তু দেখিলেন শকুন্তলার মুখ একটু আঁধার হইয়া আসিল। নিজের পরিবর্তনটুকু গোপন করিতে শকুন্তলা বলিয়া উঠিল—এখনই শুনবেন, না আর একদিন?

কুমারেশ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—না, না এখন দরকার নেই, তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত। আর একদিন, আর একদিন আমাদের ওখানে হ'লেই ভাল হয়; ভারতী শুনবে। ভারতীকে বাদ দিয়ে কোনও আনন্দ একা ভোগ করতে আমার ভাল লাগে না।

শকুন্তলা আবার হাসিল। আপনি যেদিন যখন বলবেন, আমি যাব।

কুমারেশ প্রশংসমান দৃষ্টিতে শকুন্তলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শকুন্তলা দৃষ্টি নত করিয়া বলিল—দাদু, এক পেয়ালা কফি দিই?

সহজ প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া কুমারেশ বলিলেন—কফিটা আজকাল সন্ধ্যার দিকে সহ্য হয় না, রাত্রে ঘুম চ'টে যায়।

—কোকো?

—আছে নাকি, আচ্ছা দাও।

শকুন্তলা উঠিয়া ভিতরের দিকে গেল, কুমারেশ সোফায় গা এলাইয়া চোখ বুজিলেন। সোমেশের দুর্মতি না হইলে জীবন আজ মধুময় হইত। শকুন্তলার সেবা প্রতিদিন তিনি স্বচ্ছন্দে প্রাণ ভরিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন। কুমারেশের মনে হইতে লাগিল এমন সৌন্দর্যের মাঝে, প্রেম ও সংগীতের মাঝে মৃত্যুকে বুঝি অতি সহজেই বরণ করিয়া লওয়া যায়। দিনের মৃত্যুতে অস্তাচলের ছবি মনোহর, ভয়ংকর নয়।

জীবনে একমাত্র অনাস্বাদিত অনুভূতির রূপ কল্পনা করিতে করিতে কুমারেশ আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ পেয়ালা ও প্লেটের ঠুন্‌ঠুন্ শব্দে চোখ মেলিয়া দেখেন পাশের টিপয়ে শকুন্তলা কোকো ও ফলের প্লেট রাখিতেছে। ফলের প্লেটের দিকে তাকাইয়া কুমারেশ বলিলেন—ওটা আবার—

শকুন্তলা মধুর হাসিয়া বলিল—ওটা গঙ্গা জলে গঙ্গা-পুজো। রহস্যটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কুমারেশ তার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

(ক্রমশ)
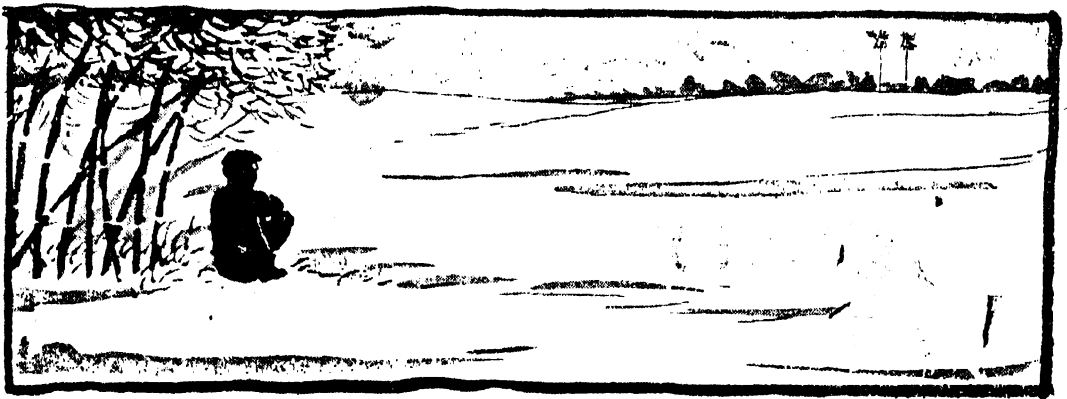
সাহিত্য ও সেবা

সাহিত্যই জাতির প্রধান সম্বল এবং বর্তমানে জাতির সম্মুখে যে সব সমস্যা দেখা দিয়াছে, সাহিত্যের পথেই সহজে এবং সুনিশ্চিতভাবে সেগুলির সমাধান সম্ভব, টাঙ্গাইলের সাহিত্যসংসদে যোগদান করিতে গিয়া আমাদের এই ধারণা আরও দৃঢ় হইয়াছে।

একথা সত্য যে, স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র কাম্য এবং স্বাধীনতা না পাইলে কোন জাতিই মনুষ্যের মত মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। অপর একটি গাছের ছায়াতে, সে ছায়া যতই স্নিগ্ধ এবং শীতল হউক না, সেই ছায়ায় কোন গাছ যেমন বাড়িতে পারে না, সেইরকম পরাধীনতার আঁচেও কখনও জাতি বড় হইতে পারে না। কানাডা কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় তেমন হয় নাই। বিশ্বের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার অবদানক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে কানাডা কিংবা অস্ট্রেলিয়ার দান অতি সামান্য।

সুতরাং কেহ বলিতে পারেন, স্বাধীনতাই প্রথমে প্রয়োজন এবং সেজন্য প্রয়োজন রাজনীতির। রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু রাজনীতির ফলোপধায়কতা নির্ভর করে সাহিত্যের উপর। যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতির মধ্যে রাজনীতিক শক্তির ভিত্তি দৃঢ় হইতে পারে না। আমাদের এই বাঙলাদেশের কথা আলোচনা করিলেই আমরা ঐ যুক্তির মূল্য বুঝিতে পারিব। প্রকৃত-পক্ষে ভারতে স্বাধীনতার আন্দোলন জাগিয়াছে প্রধানত এই
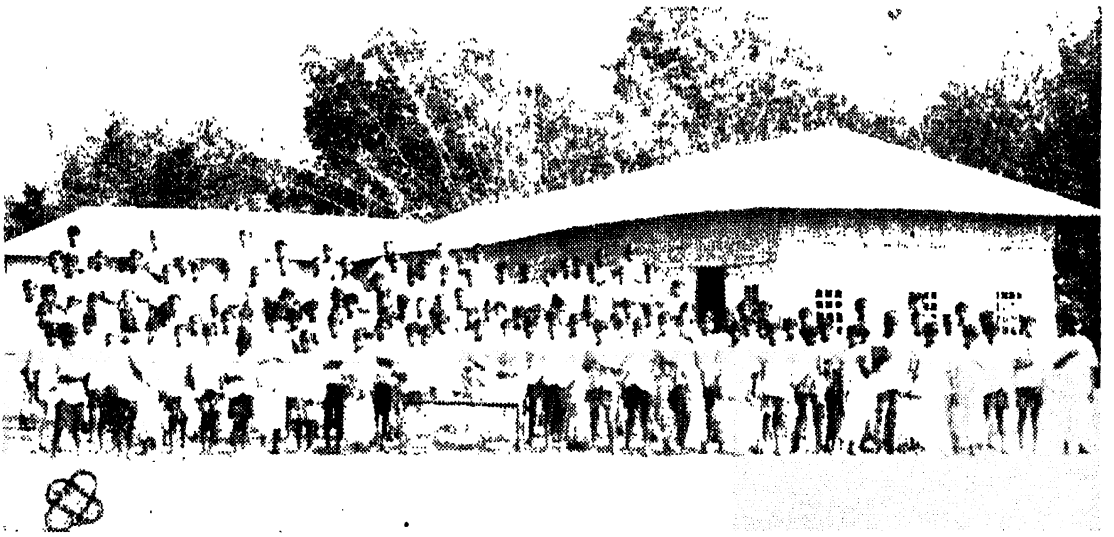
টাঙ্গাইল বিবেকানন্দ শিক্ষা মন্দির

জাতির সভ্যতা এবং সংস্কৃতি পরাধীনতার স্পর্শে সংকুচিত হইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ার কথা বলা যাইতে পারে। কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি ঠিক ভারতের মত পরাধীন নয়, পরাধীনতার একটু আঁচ মাত্র তাহারা পাইয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে তাহাদের পরাধীনতা নাম মাত্র পরাধীনতা, কিন্তু পরাধীনতার সেই আঁচটুকুই তাহাদিগকে কতকটা সংকুচিত করিয়া রাখিয়াছে, অন্য যে কোন স্বাধীন দেশের সঙ্গে তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের সঙ্গে ঐ সব দেশের, বিশেষভাবে কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের জাতি কিংবা ভাষার দিক হইতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ঐ সব দেশের সঙ্গে পার্থক্য কত? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বাঙলা দেশ হইতেই এবং নব জাতীয়তার উদ্বোধন করিয়াছে এই বাঙালী এবং ইতিহাস এ বিষয়ে অভ্রান্ত প্রমাণ দিবে যে, বাঙালী এই শক্তি লাভ করিয়াছে তাহাদের সাহিত্যিকদের সাধনা হইতেই। সাহিত্যের ভিতর দিয়া স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন হয় রামমোহন হইতেই। পরে রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাধনায় সেই স্বদেশপ্রেমের অনল দিগন্তে বিস্তারলাভ করে। সমগ্র ভারত নব জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লয় এই বাঙলা দেশ হইতে। বাঙলার সাহিত্যসাধকগণ—বঙ্গবাণীর বর-পুত্রেরাই, বাঙলার রাজনীতিক জীবনের জন্মদাতা। বাঙলা মায়ের স্বদেশপ্রেমিক সাগ্নিক সাধকগণের মন্ত্রগুরু হইলেন সাহিত্যিকেরাই, অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছেন তাঁহারাই।

এখনও এই সত্যের ব্যতিক্রম হয় নাই, এই আশা এবং

ভরসা আমরা পাইয়া আসিয়াছি টাঙ্গাইলের সাহিত্যিকদের নিকট হইতে। বাঙলাদেশের আজ বড় দুর্দিন, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের নানারূপ অপচেষ্টায় বাঙলার সংহতি শক্তি আজ বিচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছে; বাঙলার সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বাণীর অমল ধবল কমল কুঞ্জে সাম্প্রদায়িকতার হস্তী স্থূলে হস্তাবলেপে আতঙ্কের কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙলার এমন সংকটকালেও টাঙ্গাইলের সাহিত্য সংসদকে কেন্দ্র করিয়া টাঙ্গাইলের হিন্দু এবং মুসলমান সাহিত্যিকগণ মাতৃপূজার যে আদর্শটি উন্মুক্ত রাখিয়াছেন দেখিলাম, তাহাতে আনন্দ হইল, অন্তরে আশা এবং বল বাড়িল।

শরীর তাঁহার রুগ্ন এবং অসুস্থ, কিন্তু এই অসুস্থ শরীরেও সেবাব্রতে তাঁহার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই। এমন প্রাণবান মানুষ বাঙলা দেশে খুবই কম দেখা যায়। উপেন্দ্রবাবুর সকল সেবাব্রতের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে বাণীর সেবা। তাঁহার সাধনার ফলে টাঙ্গাইলের সাহিত্যিক সমাজে সত্যই নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়াছে। সাহিত্যের প্রভাব পড়িতেছে সেখানকার সমাজ এবং রাজনীতিক জীবনে। টাঙ্গাইলের জননায়ক শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ রাজনীতিক তো বটেনই, কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি আছে, তিনি সাহিত্য সংসদের দলে ভিড়িয়া পড়িয়াছেন। টাঙ্গাইলে যিনি সর্বজনপ্রিয়, সেই লেফটন্যাণ্ট মহম্মদ হোসেন চৌধুরী
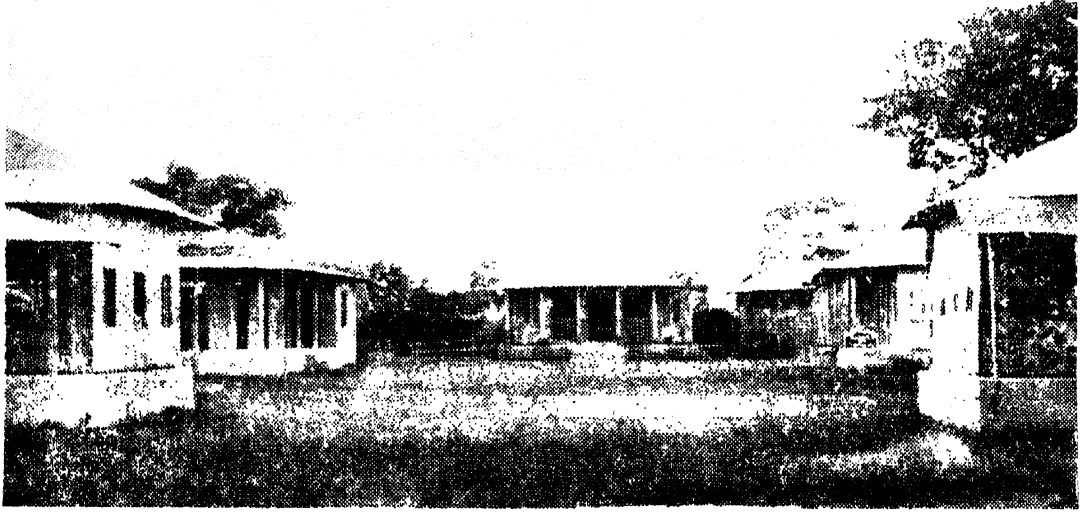
টাঙ্গাইল রামকৃষ্ণ মঠ ও সেবাশ্রম

স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় টাঙ্গাইলে এই সাহিত্য-সংসদের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর প্রতিষ্ঠানটি কিছুদিন ক্ষীণভাবে জীবিত ছিল, পরে ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। ডাক্তার শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় টাঙ্গাইলে গিয়া সেই প্রতিষ্ঠানকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। উপেন্দ্রবাবু বাঙালী সাহিত্যিক সমাজে অপরিচিত নহেন, তিনি বাঙলা দেশের অন্যতম সুসাহিত্যিক, রবিবাসরের একজন উদ্যমশীল সদস্য। এতদিন তিনি কলিকাতাতেই ছিলেন। রবিবাসরের সদস্যগণ এই অমায়িক প্রকৃতির মানুষটির সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুতার সূত্রেই সংবদ্ধ আছেন। উপেন্দ্রবাবু সাহিত্যিক এবং স্বদেশপ্রেমিক। দেশে গিয়া টাঙ্গাইলে তাঁহার স্বদেশবাসীর সেবাব্রতে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই ব্রতে তাঁহার নিষ্ঠা এমন, যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটির তিনি চেয়ারম্যান।

সাহেবও বাণী পূজায় আত্মনিবেদন করিয়াছেন। সাহিত্য সংসদের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল ইঁহারই ভবনে। এমন আতিথ্য, এমন আপ্যায়ন, সকলের উপরে আপনার করিয়া লইবার যে ক্ষমতা চৌধুরী সাহেবের স্বভাবগত, তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

টাঙ্গাইলে তরুণদের মধ্যেও সাহিত্য সাধনার সাড়া পড়িয়াছে, ইহা আরও আশার কথা। সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে প্রবীণে নবীনে, হিন্দু মুসলমানে যে মিলন-মাধুর্য টাঙ্গাইলে উপভোগ করিয়াছি, তাহাতে বাঙলার এই দুর্দিনেও আশার আলোক রেখা অন্তরে জাগিয়াছে। সেবার একটি স্বচ্ছন্দ আবহাওয়া দেখিলাম টাঙ্গাইলে, দেশের সেবা, জাতির সেবা এবং সেই আদর্শের সম্মেলন ক্ষেত্র হইল সাহিত্যের সেবা। টাঙ্গাইলের তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুদিগকে সেই সেবায় নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া থাকিবার কথাই বলিয়া আসিয়াছি। বলিয়াছি, তোমাদের সাহিত্য সাধনার ভিতর দিয়া

লোকসেবার জন্য আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠুক, এ দেশের দুঃখী, দরিদ্র এবং শোষিত অত্যাচারিতের জন্য বেদনার জ্বালা বিস্তার করুক তোমাদের সাহিত্য-সাধনা, যে সব বাঘ ধর্মের নামে মেষের চামড়া পরিয়া মানুষের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে, তোমরা তাহাদের নখদন্ত বাহির করিয়া দেখাও, ইহাই হইল প্রগতি সাহিত্যের রূপ। সেবাপ্রবৃত্তি তোমাদের মধ্যে সত্য হউক এবং তাহাই ধর্ম।

টাঙ্গাইলে রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মঠ সংশিলষ্ট বিবেকানন্দ শিক্ষা মন্দির আর একটি উল্লেখযোগ্য সেবাব্রত। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিষ্ঠাবান্ ভক্ত শ্রীযুক্ত শৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এই সেবাব্রতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। "বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" স্বামীজীর এই ভাগবতী বাণীকে রূপ দিয়াছেন ভক্ত শৌর্যেন্দ্রনাথ এই মঠ এবং বিদ্যালয়ে। টাঙ্গাইলে দুইটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। এই দুইটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অনতিদূরেই মঠের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় চলিতেছে। বিস্তীর্ণ মঠবাড়ী এবং বৃহৎ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। প্রায় তিনশত ছাত্র এই বিদ্যালয়ে পড়ে। শৌর্যদার মুখে শুনিলাম, ছেলেদের মধ্যে অনেকেই অনুন্নত সম্প্রদায়ের এবং বেশীর ভাগই গরীবের ছেলে। অর্ধেক বেতন দিতে হয়, কিন্তু বিনা বেতনে পড়ে এমন ছেলের সংখ্যাই অনেক। ছোট ছোট ছেলেদের কচি মুখে হাসি দেখিয়া বাস্তবিকই আনন্দে প্রাণ ভরিয়া উঠিল' তাহাদের প্রতি এমন আদর যত্ন করা হইতেছে যে, দেখিয়া চোখের জল রাখিতে পারিলাম না। বলিলাম, 'দাদা সত্যই সামান্য সময়ের জন্য এমন সেবা দেখিয়াও আমাদের জীবন ধন্য হইল।' কিন্তু এ নিত্য সেবা চলিবে কিসে! বলিলাম, 'দাদা আপনি ধনী নহেন, এ সেবাব্রত চালাইবেন কেমন করিয়া?' দাদার নিকট হইতে উত্তর আসিল—ঠাকুরের ইচ্ছা। সত্যই এই প্রশ্ন বড় প্রশ্ন। জাতি এমন সেবার মহিমা বুঝে নাই, দুঃখ তো জাতির সেইখানে। স্বামীজীর বীর হৃদয় তাই কাঁদিয়া উঠিয়াছিল সেই অশ্রদ্ধা দেখিয়া এবং মেঘগম্ভীর-কণ্ঠে জাতির দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন বাঙলার সেই তরুণ সন্ন্যাসী। জাতি এখনও এই সেবার মর্যাদা বুঝিবে কি? মর্ত্য জীবনে অমরত্বকে আস্বাদন করিবার এই পথ যে খোলা পথ। এই পথেই আত্মার উন্নতি এবং জাতির উন্নতি, আধ্যাত্মিক মুক্তি এবং রাষ্ট্রীয় মুক্তি—অন্য পথ নাই। দেশে ধনী লোকের অভাব নাই, উদার প্রাণ ব্যক্তিও অনেকে আছেন। টাঙ্গাইল মহকুমাতেও এমন ধনী এবং ধার্মিক না আছেন, ইহা নয়। আমরা আশা করি, তাঁহাদের দৃষ্টি অপূর্ব এই সেবাব্রত—রামকৃষ্ণ মঠ এবং বিদ্যালয়ের দিকে আকৃষ্ট হইবে। বিদ্যাদান সকলের চেয়ে বড় দান। এই দানে তাঁহারা নিজেদের অর্থ নিযুক্ত করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে একান্ত আনন্দের অধিকারী হইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা এবং স্বামীজীর আশীর্বাদ এমন দাতাদের ভিতর দিয়া কাজ করিয়া নর-নারায়ণের এই সেবাব্রত সঞ্জীবিত রাখিবে, আমরা ইহাই আশা করি।

আশাহত

শ্রীশর্মিষ্ঠা সরকার

সাঁঝের আঁধার নামে
কানে কানে কয়ে যায়
মনে মনে ভাবি তবে
প্রিয় কি আসিবে হায়?
বনে বনে কানাকানি
আশা নিরাশার বাণী
একা ঘাটে বসে থাকি
ঢেউ শুধু খেলে যায়।
লুকায় চাঁদের মায়া
কাজল মেঘের পারে,
পথ শুধু খুঁজে মরি
ব্যাকুল নয়নধারে
কত যে লুকানো ব্যথা
জীবনের আকুলতা
দিন যায় তবু তারা
অকথিত রয়ে যায়
ঘাটে আসি' ভিড়ে নাক
তোমার সোনার নায়॥

মেয়েমানুষ

(গল্প)

শ্রীআশালতা সিংহ

স্কুলে ভাল মেয়ে বলিয়া ললিতার খ্যাতি ছিল, কলেজ-জীবনেও তাহার সে খ্যাতি অটুট রহিল। কিন্তু প্রথম-শ্রেণীতে আই-এ পাস করিবার পর অকস্মাৎ একদা তাহার বিবাহ হইয়া গেল। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা প্রকাণ্ড জমিদার। তাঁহাদের অর্থ আছে সে কথার প্রমাণ পাওয়া গেল গায়েহলুদের তত্ত্বে। অসংখ্য জামা কাপড় পুতুল আসবাব গহনাপত্র অন্ততপক্ষে পঞ্চাশটা লোকেও বহিয়া আনিতে পারিল না। প্রতিবেশীর দল ঈর্ষা কাতর নেত্রে চাহিয়া রহিল। ললিতার স্কুল কলেজের বান্ধবীরা প্রাপ্ত জিনিসপত্রের সমালোচনা করিয়া কহিল, "দিয়েছে অনেক, কিন্তু ললিতা তোর শ্বশুর বাড়ির লোকদের টেস্ট নেই। জর্জেটখানার কি ক্যাটকেটে রং দেখেছিস! আর বই কি দিয়েছে দেখি দেখি......ওমা এ যে কুললক্ষ্মী, পতিব্রতা, আর আর্য নারী। হায় হায় তোকে নিয়ে ওরা কি করবে ললিতা? একটি পরম সুপবিত্র আর্য নারী তৈরী করবে বুঝি?"

ললিতার খুড়তুতো বোন রমলা এখনও বেণী দোলাইয়া ডায়োসেসনে পড়িতে যায়। ব্যাপারটা আগাগোড়া তাহার ভাল লাগে নাই। প্রথমটায় মনকে সান্ত্বনা দিয়াছিল, হ'ক বড়লোক তবু তো সেকেলে! কিন্তু জিনিসপত্র এবং কাপড় গহনার ঘটা দেখিয়া সেটুকু সান্ত্বনাও লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সে মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল, "ললিতাদির মত কলেজে পড়া মেয়ে সত্যিই তো আর কিছু ওদের দরকার ছিল না, কিন্তু পাশের চাটুজ্যে জমিদারদের সঙ্গে ওদের চিরকেলে রেষারেষি। চাটুজ্যেরা ম্যাট্রিক পাস বউ করেছে কি না তাই ওরাও টেক্কা দেবার জন্যে আই-এ পাস মেয়ে ঠিক করেছে।"

রমলার সত্যপ্রকাশের ভঙ্গীতে কলেজের মেয়ে-বন্ধুরা আহত হইল। দু-এক জন আবেগক্ষুব্ধ কণ্ঠে এ ধরনের মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে কিছু কিছু বক্তৃতা দিবে ঠিক করিতেছিল কিন্তু তত্ত্বের জিনিসপত্র তুলিয়া রাখিবার জন্য ললিতার মাকে আসিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

মহাসমারোহে বিবাহ শেষ হইয়া গেলে তাহার পরের দিন শ্বশুর বাড়ি যাবার প্রাক্কালে ললিতার মা তাহাকে বলিয়া দিলেন, "খুব সাবধানে, খুব বাধ্য নম্র হয়ে চলবে ওখানে। এতদিন পড়া মুখস্ত ক'রে ফার্স্ট হয়ে এসেছ, সে কাজ সোজা। কিন্তু এবার যেখানে যা করতে যাচ্ছ সে অত সহজ নয়। মুখস্ত বিদ্যায় কুলয় না; ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে থেকো।"

মোটরে স্বামীর পাশে বসিয়া রুমালে চোখ মুছিতে মুছিতে ললিতা মনে মনে কহিল, 'ভগবানের উপর নির্ভর সব জিনিসেই। এই যে আই-এ পরীক্ষার সময় এত ভাল ক'রে পরীক্ষা দিয়েছিলাম তবুও রাস্তা দিয়ে যেতে কোনও মন্দির চোখে পড়লেই প্রণাম করতে হ'ত। কি জানি কি হবে, কি জানি কি হবে ভাব।' সানাই, ব্যাণ্ড, ব্যাগ পাইপ, ঢাক-ঢোল একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। ললিতাদের মোটর হুস করিয়া নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইল। তাহার মা চোখ মুছিয়া ঘরে ফিরিলেন। অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে রমলাও চোখের উপর রুমাল চাপিয়া ধরিল।

ললিতা মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সমস্ত রকম পরিবর্তমান ঘটনাস্রোতে নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে। কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণধী মন ভিতরে ভিতরে সমস্ত বস্তুকেই বিশ্লেষণ করিতে বিচার করিতে ছাড়ে না।

এখানে আসিয়া দু-পাঁচ দিনের মধ্যেই কাপড় পরিবার চুল বাঁধিবার ভঙ্গী সে বদলাইয়া ফেলিল এবং লোকে স্বীকারও করিল যে, আধুনিক ও কলেজে পড়া মেয়ে হইলেও মেয়েটি ঠাণ্ডা, লজ্জা শরম আছে। ললিতার শাশুড়ী ভাবে ভঙ্গীতে চাটুজ্যে গৃহিণীকে যথোচিত রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, তোমাদের চেয়ে আমরা জিতিয়াছি। তোমাদের বউ মোটে ম্যাট্রিক পাস তবু সে হাই হীল জুতা পায়ে দেয়। বাড়িতেও চটি পায়ে ছাড়া চলাফেরা করে না। তোমাদের বউ ব্রাহ্মদের ফ্যাশনে কাপড় পড়ে, আমাদের বউ আই-এ পাস তবু সে আলতা পায়ে সাদাসিধাভাবে কাপড় পরিয়া ঘোমটা দিয়া থাকে। দেখ এইবার!

কাপড় কেমন করিয়া পরিবে, ঘোমটা কতটুকু দিবে এসব বিষয়ে ললিতার তেমন মাথাব্যথা ছিল না; মনে মনে সে বলিত, 'এহ বাহ্য'। এ লইয়া বাদানুবাদ করিয়া সংসারে অশান্তি টানিয়া আনার মত মূঢ়তা যাহারা করে তাহাদের সে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিত। কিন্তু আর একটা দিকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীকে সে অত সহজে বদলাইয়া আনিতে পারে নাই। তাহার ননদ মাধুরী দাদার বিবাহে আসিয়াছে। এই অল্প বয়সে অনেকগুলি ছেলে। আরও জা ননদ সম্পর্কের অনেকেই আসিয়াছেন। তাঁহারা সারাদিন গল্প, তাস খেলা এবং ঘুমে কোনও রকমে কাটাইয়া সেই সবেমাত্র বৈকালিক প্রসাধন সারিয়া গাল-গল্প করিতেছিলেন। মাধুরী একটুখানি সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, "আমাদের ও'রা তো ভিন্ন হয়েছেন। তবুও আমার ভাসুর তাঁর মেয়ে লক্ষ্মীকে আমার কাছে রেখে দিয়েছেন। সেদিন বড়মুখ ক'রে ও'কে বলছিলেন, লক্ষ্মী ছোট বউমার কাছে থাকুক। ও'র কাছে রীতকরণ আচার-ব্যবহার শিখুক, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ওইরকম প্রশংসা নিতে পারবে।"

ললিতাকেও সে সভায় বসিতে হইয়াছিল; সে অবাক হইয়া ভাবিতেছিল কী এমন আচার-ব্যবহার এবং গুণপনা ইহার কাছে লোকে শিখিবার আশা রাখে। মাধুরীর

ছোট ছেলেটির উৎকট আমাশয় হইয়াছে কয়েক দিন হইতে; রোজ ডাক্তার আসিতেছে। কিন্তু মায়ের জলখাবারের থালা হইতে স্বচ্ছন্দে সে সন্দেশ ও আম তুলিয়া লইয়া সমানে খাইতেছে। ললিতা দু-এক বার তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া, মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া থামাইতে না পারিয়া কহিল, "ছোটঠাকুরঝি ওকে অমন ক'রে খেতে দেবেন না। শেষে অসুখটা শক্ত হয়ে দাঁড়াবে।" মাধুরী অসুখে ভোগা ছেলেটার গালে জোরে একটা চড় মারিয়া কহিল, "বাবা রে বাবা, ছেলে নিয়ে একদণ্ড সোয়াস্তি নেই। আপদগুলো মলে বাঁচি। ও রতনের মা, খোকাকে নিয়ে যাও দিকি। এত টাকা খরচ ক'রে এত লোকজন রেখে তবুও কি দু দণ্ড আরাম করবার, মানুষ জনের সঙ্গে কথা কইবার জো আছে!"

রতনের মা ঝি তাড়াতাড়ি আসিয়া রোরুদ্যমান শিশুর হাতে আর একটা আম ও সন্দেশ গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ভুলাইতে ভুলাইতে কহিল, "আমের দিনে ছেলেপুলে দুটো আম খাবে না, কি যে তুমি বল ছোট বউদি। ডাক্তার মুখপোড়ারা অমন বলেই থাকে। তাই ব'লে তাদের কথা শুনে ছেলেপুলের হাতে একটা মিষ্টি এককুচি আম তুলে দিতে পাব না, এ আবার কি গেরো বল দিকি।"

মাধুরী ছেলেটাকে বিদায় দিয়া ততক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া গল্প করিতেছে।—"আমার ভাসুরপোর বউ কিরকম যে বেয়াড়া অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে তা আর তোমায় ব'লে বোঝাব কেমন ক'রে ভাই নিরুদি! আমি শিখিয়ে দিলাম, বউমা, বয়সে তোমার চেয়ে ছোট হ'লেও লক্ষ্মীকে নাম ধ'রে ডেকো না, ঠাকুরঝি বলবে। তিন মিনিট যেতে না যেতেই মেয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, লক্ষ্মী, অ লক্ষ্মী!"

নিরুদিদি সমবেদনার সুরে কহিলেন, "সবাই কি তোমার মত গুণের হয় ভাই না সবাই তোমার মত ব্যবহারের কায়দা-কানুন জানে? এই তো আমাদের দাদা আই-এ পাস বউ এনেছেন, কিন্তু তিনি কি সবদিক দিয়ে তোমার মত হ'তে পারবেন? তা তো কই মনে হয় না।"

এই বলিয়া বিশেষ একপ্রকার মুচকি হাসিয়া নিরুদিদি ললিতার পানে চাহিলেন। ললিতা সংকুচিত এবং বিরক্ত হইল। যদিও বিরক্তি বোধ করিতে তাহার লজ্জা হইতেছিল। নিজের মূল্যের যাচাই কি তাহার অতঃপর এই শ্রেণীর নিরুদিদি, তারিণী পিসী, হরির মা, রতনের মা'র বৈঠকেই নির্ধারিত হইবে চিরদিন?

সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়া ওঠাতে আসর ভঙ্গ হইল। যুদ্ধের খবর জানিবার জন্য খবরের কাগজ পড়িবার একটা অদম্য ইচ্ছা ললিতা সংগোপনে দমন করিয়া রাখিয়াছিল। সন্ধ্যার ফাঁকে কোনও এক অবসরে বাড়ির একটি ছোট ছেলে গোপালকে ডাকিয়া বলিল, "লক্ষ্মীছেলে আজকের খবরের কাগজটা আমাকে একবার দিতে পার? ভারি খুশী হই তা হ'লে।"

গোপাল অবাক হইয়া নূতন বউ-এর দিকে তাকাইয়া রহিল। এ ধরনের প্রার্থনা বাড়ির কোনও মেয়ে আজও তাহার কাছে করে নাই। বড় জোর সে একটা সুপক্ক পেয়ারা, রঙিন চিঠির কাগজ কিংবা বাহারে ছিটের টুকরা গোপাল মাঝে মাঝে লুকাইয়া কিনিয়া আনিয়া অন্তঃপুরে সরবরাহ করিয়াছে। ললিতার অনুরোধে বিব্রত হইয়া সে আমতা আমতা করিয়া কহিল, "খবরের কাগজ, সে তো মামাবাবুর সদরে থাকে, সেখানে যে অনেক লোক, সে আমি কেমন ক'রে—আচ্ছা দেখি চেষ্টা ক'রে।"

সন্ত্রস্ত গোপাল একদৌড়ে সেখান হইতে পালাইয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। সন্ধ্যারতির কাঁসর, ঘণ্টা বাজিতে শুরু করিয়াছে, মন্দির প্রাঙ্গণে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। একজন ঝি আসিয়া বলিল, "নতুন বউদি ঠাকুরবাড়িতে চলুন, মা গেছেন, আরও সবাই গেছেন। আপনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে বললেন।"

ললিতা যখন সেখানে পেঁছিল তখন আরতি আরম্ভ হইয়া গেছে। চরণামৃত গ্রহণ করা এবং শান্তি জল লওয়াও সাঙ্গ হইল। তখন মেয়েরা সেই শান বাঁধানো চাতালে বসিয়া আরাম করিয়া সুখ দুঃখের কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। মৈত্র বাড়ির বড় বউ-এর সূতিকা হইয়াছে, সারিবার আর বড় একটা আশা নাই, সেই লইয়াই আলোচনাটা শুরু হইয়াছিল। মুখুজ্যে গৃহিণী কহিলেন, "তা সময় থাকতে বউমা গেরাহ্যি করলে না'গা। কতদিন আমি দেখেছি জ্বরের উপরেই ঘাটে নাইতে গেছে।" মৈত্র গৃহিণী বলিলেন, "তা অত জানা যাবে বল কেমন ক'রে? গেরস্থ ঘরে পুরনো জ্বর অমন নাইতে খেতেই যায়, এই তো আমরা জানি।"

নিরুদিদি হরিনামের মালা ঘুরাইতেছিলেন, সাক্ষী মালাটা একবার অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তা তো যায়। অমন কত হয় কত যায়, অদেষ্টের লেখা কে খণ্ডাবে বল। ডাক্তারের ওষুধে কি হয়, কিছুই হয় না; মনকে ভোলানো।"

সেই স্বল্পালোক মন্দির-চত্বরে বসিয়া ললিতা অল্পক্ষণের জন্য শিহরিয়া উঠিল। এই সব আলাপ আলোচনার প্রসঙ্গ ধরিয়া যে কথাটা একান্ত স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সেটা এই যে, মূল্য নাই, মূল্য নাই। বাঙালী ঘরে বাঙালী মেয়ের এমন কোনই মূল্য নাই, যাহার জোরে তাহার বাঁচিয়া থাকা বা না থাকা খুব একটা বড় ব্যাপার হইয়া ওঠে। মৈত্রদের বউ-এর অসুখের কথটা সহজেই চুকিল, এবারে দু-এক জনের দৃষ্টি ললিতার উপর পড়িতে শুরু করিল। একজন বলিলেন, "ও মা অমন ক'রে অন্ধকার কোণে একটি চুপ ক'রে ব'সে কেন?" আর একজন বয়ীয়সী ডিঙিগ মারিয়া তাহার মুখের একান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া নিবন্ধ দৃষ্টিতে কি যেন ঠাহর করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে কহিলেন, "সোজা সিঁথিতেই তা হ'লে সিঁদুর পরেছ মা? বেশ করেছ। এস্ত্রী মানুষ, ব্যাঁকা সিঁথেয় সিঁদুর ঠেকালে সোয়ামী পাগল হয়ে যায়, আমাদের শাস্তরে বলে। শাস্তরের কথা তো মিথ্যে নয়।" একটি চৌদ্দ পনের বছরের মেয়ে বিষণ্নমুখে একপাশে বসিয়াছিল। তাহারই সমবয়সী আর একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আনু, তোর সেই উলের সোয়েটারটা কতদূর হ'ল ভাই? নতুন বউদি এসেছেন তাঁর কাছে একটু দেখিয়ে নিস না কেন।"

বিষণ্নমুখী মেয়েটি কহিল, "না আর সেলাই করতে ভাল

লাগে না।" কথা বলা শেষ হইলে সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার অঙ্গিনী হরিদাসী কহিল, "কেন ছেড়ে দিলি? বেশ তো হচ্ছিল।"

আনু ওরফে আন্নাকালী কি করিয়া বুঝাইবে—কেন; আর শুধু সেলাই করিতে নয়, সংসারের আর কিছুতেই তার স্পৃহা নাই। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, তরঙ্গিণী পিসী। তিনি এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে বলিলেন, "তা বেশ হয়েছে আনুর মা। বেটাছেলের আবার বয়স কি, এত দিন পরে যে আনুর বিয়ের ফুল ফুটল সেই সর্বরক্ষে। আমার তো ভাবনায় রাত্রিতে ঘুম হ'ত না মা। সময়ে বিয়ে দিলে যে তিন চার ছেলের মা হ'ত এতদিনে।"

আনুর মা শুষ্কমুখে মাথা নাড়িলেন;—"তোমাদের আশীর্বাদ দিদি।"

নিরুর মা একটু মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "তোমার হবু জামাইএর বয়েস কত হবে সুশীলাদি? তা পঞ্চাশের এদিকেই হবে। তা ছাড়া এখনও বেশ সামর্থ্য আছে, বেশ মোটাসোটা, নয়?"

সুশীলা দিদি অব্যক্ত স্বরে কি বলিলেন বোঝা গেল না। আনু ওরফে আন্নাকালী উঠিয়া সামনের ডোবার ধার দিয়া ধীর মন্থর গতিতে তাহাদের বাড়ির রাস্তায় চলিয়া গেল। ললিতার শাশুড়ী বধূকে হাত ধরিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে মৃদুকণ্ঠে শিখাইয়া দিলেন, "আর সবই একরকম ঠিক হয়েছে কিন্তু সবারই সামনে যখন বসবে তখন ঘোমটা আর একটু টেনে দিও।"

বাড়িতে পৌঁছিয়া শাশুড়ী বধূমাতাকে নিজের ঘরে যাইয়া বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। নিজের ঘরে গিয়া ললিতা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ঘরের সামনের ছাদটায় ভারী চমৎকার চাঁদের আলো পড়িয়াছে, সেখানে গিয়া দাঁড়াইতে লোভ হয়। ছাদে আলিসায় ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলে নীচেকার প্রাঙ্গণের অনেকখানি চোখে পড়ে। ললিতা অন্যমনস্ক হইয়া চাহিয়াছিল, একটা উচ্চ কলরব কানে গেল। কর্তা ও গৃহিণীতে বচসা হইতেছিল। গিন্নীর মতে এক দিনেই মেয়েদের ও পুরুষদের বউভাতের নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, "বারে বারে ওসব ঝঞ্ঝাট আমি ভালোবাসি নে বাপু, যা করবে একদিনেই চুকিয়ে দাও।" কর্তা একটু গরম হইয়া বলিতেছিলেন, "তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাক। তোমার এসব কথায় থাকবার দরকার কি? আর বোঝই বা তুমি কি? বেটাছেলেদের আর মেয়েদের খাওয়ানো এক দিনে হয় নাকি আবার। শহর থেকে সায়েব সুবো কত বন্ধুবান্ধব আসবে আমার। তাদের অনেকের আবার সন্ধেবেলায় একটু ইয়েও চাই। ওই সব বন্দোবস্ত করব, না পাড়ায় পাড়ায় তোমার মেয়েদের ডাকিয়ে জড়ো করব।" গিন্নী আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কর্তা ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "চুপ কর। মেয়েমানুষ হয়েছ, দশ হাত কাপড়েও কোঁচা নেই, সব বিষয়ে বুদ্ধি খাটাতে যেও না।"

ইচ্ছা না থাকিলেও সমস্ত কথাই ললিতার কানে আসিতেছিল। ইহার পর আর চাঁদের আলোয় বেড়াইতে তাহার ভাল লাগিল না। মেয়েমানুষ যে মেয়েমানুষ মাত্র, তাহার অতিরিক্ত আর কিছু নয় এ কথাটা এখানকার বাতাসে আলোতে আকাশে যেন মাখানো রহিয়াছে। প্রত্যেকটি ধূলিবিন্দু পর্যন্ত যেন তারস্বরে এই কথা ঘোষণা করিতেছে। ললিতা সভয়ে একবার চোখ বুজিল। তাহার মুদিত নেত্রের সামনে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনটা ভাসিয়া উঠিল। আর কিছুদিন পরে এখানকার সুশীলা দিদি, নিস্তার পিসী ও নিরুর মায়ের মুখে মুখে তাহার নিজেরও মূল্য একটা যাচাই হইয়া যাইবে নিশ্চয়। তার পর সেই মূল্যহীনা আজিকার মত চাঁদের আলো দেখিয়া আর কি কানায় কানায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে পারিবে? তাহার তখন কি অকস্মাৎ মনে পড়িয়া যাইবে না যে, সে মেয়েমানুষ মাত্র?

ললিতার নিজের ঘরের পাশে একটা বারান্দার পরেই তাহার ননদ মাধুরীর কক্ষ। গোপাল বলিয়া যে ছেলেটিকে সে খবরের কাগজ আনিতে বলিয়াছিল সে খানিকক্ষণ আগে চুপি চুপি আসিয়া বলিয়া গিয়াছিল, কাগজখানা মাধুরী দিদির ঘরে টেবিলের উপর দেখিয়াছে সে। জামাইবাবু হয়তো লইয়া গিয়াছেন।

যুদ্ধের খবরটা কলিকাতায় থাকিতে এমই পড়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, এইসব বিচিত্র দৃশ্যপটের ভিতরেও খবরের কাগজের জন্য সে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। মাধুরীর ঘরের দিকে পা বাড়াইতে শুনিতে পাইল একটা উচ্চ তর্জন। খবরের কাগজের আশা ছাড়িয়া দিয়া অন্ধকার বারান্দাটা অতিক্রম করিয়া সে ফিরিয়া আসিতেছিল, কানে গেল মাধুরী ক্ষীণকণ্ঠে বলিতেছে, "আমিই সরকার মশায়কে দিয়ে কাপড়জোড়াটা আনিয়েছি।"

প্রত্যুত্তরে মোটা রুক্ষ গলায় কে একজন, বোধকরি মাধুরীর স্বামীই হইবেন, বলিয়া উঠিলেন, "কে বলেছিল সর্দারি ক'রে তোমাকে কাপড় আনাতে। জান আমি পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি ছাড়া কাপড় পরি নে, এই চুয়াল্লিশ ইঞ্চির ঠেঁটি কাপড় নিয়ে আমি করব কি? মেয়েমানুষ আছ, মেয়েমানুষের মত থাকলেই তো পার, মোড়লি করতে আস কেন।"

ললিতা সেই প্রায়ান্ধকার বারান্দা পার হইয়া যখন নিজের আলোকোজ্জ্বল কক্ষে ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল তাহার স্বামী একটা চেয়ারে বসিয়া আছেন। তিনি আদর করিয়া শুধাইলেন, "কেমন লাগছে তোমার এখানে?"

ললিতা বলিল, "বেশ লাগছে। আমি যে আর কিছু নই, মেয়েমানুষ মাত্র, সে তত্ত্বটি ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করছি। আশা হয় উপলব্ধি শীঘ্রই আরও প্রগাঢ় হবে।"

ললিতার স্বামী ভাবগদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "ঠিক বলেছ, তুমি যেন সৃষ্টির আদিম নারী আর আমি নারীর চিরন্তন পূজারী আদিম নর। এই চাঁদের আলোর বন্যায় আমার মনেও ওই আইডিয়াটি জাগছে।"

ললিতা একটুখানি হাসিয়া কহিল, "আইডিয়াটি বেশ, আইডিঅ্যাল।"

চুল মাপা যন্ত্র

চুল কি পরিমাণ মোটা হয় তা সঠিকভাবে জানবার জন্যে সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকেরা একটা চুল মাপা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে সকলের চুল কি পরিমাণ মোটা তা সহজেই জানা যায়। মোটা চুলের আদর নেই; বিশেষ ক'রে মেয়েদের কাছে। কোন কারণে চুল মোটা হ'তে আরম্ভ ক'রে শেষে এমন অবস্থায় এসে পড়ে যে, মাথায় তখন
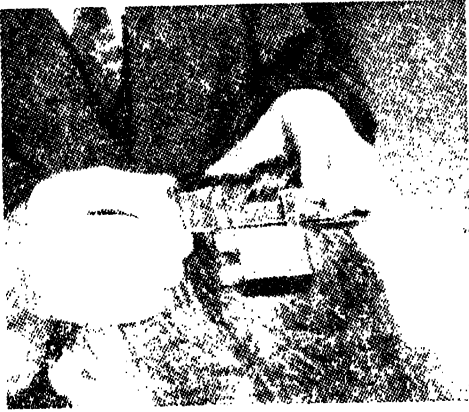
চুল মাপা যন্ত্রের সাহায্যে চুল পরীক্ষা করা হচ্ছে

আর চিরুনি লাগান চলে না। আগে থেকে সাবধান হ'লে চুলের এভাবে মোটা হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। চুল মাপা যন্ত্রের আবিষ্কারে বিলাতী অভিনেত্রীরা খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছেন। কেননা প্রসাধনে তাঁরা যতখানি সচেতন আমরা সারা দেহকে সুস্থ রাখতে ততখানি যত্ন নিই না। অবশ্য অভিনেত্রীদের সবই স্বতন্ত্র। তাঁদের অর্থ এবং উৎসাহ সাধারণের থেকে বহুগুণে বেশী।

সিনেমার ভিড়

সিনেমা বিশেষজ্ঞরা লণ্ডনের সিনেমাগুলির সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে বলেছেন, সেখানে অন্যান্যদিনের তুলনায় শনিবার রাত্রের অভিনয়ে সব থেকে বেশী দর্শকের ভিড় হয়। কমেডি-নাট্য অভিনয় হ'লে সেদিন সবার থেকে বেশী লাভবান হয় চকোলেট ফিরিওয়ালারা। অভিনয় দেখতে দেখতে মনের আনন্দে ছেলে বুড়ো সকলেই প্রচুর পরিমাণে চকোলেট চর্বণ করে। আবার সাধারণ নাটক অভিনয়ের সময়ে চকোলেটওয়ালাদের বাজার মন্দা পড়ে। সেদিনের অভিনয়ে সিগারেট বিক্রী হয় প্রচুর। আমাদের দেশে চকোলেটের প্রচলন হলেও সিনেমা ঘরে দর্শকদের চকোলেট খেতে খুব কম দেখা যায়। আনন্দ, উত্তেজনা অথবা অবসাদ মুহূর্তে কি পরিমাণ পান, বিড়ি বা সিগারেট খরচা হয় তা গবেষণা ক'রে দেখলে মন্দ কি?

পুল তৈরী করতে হ'লে লোহার প্রয়োজনই সব থেকে বেশী। চীন দেশে পিকিনের নিকটস্থ কোন জায়গায় একটি পুল তৈরী হয়েছে পোর্শিলেন দিয়ে। প্রত্যেক পোর্শিলেনের টুকরোগুলি হাতে গড়া, কলকব্জার সাহায্য একেবারে নেওয়া হয়নি।

আমাদের দেশে ছেলেমেয়ের জন্মের পর তার বাপ এক খণ্ড স্বর্ণ অথবা রৌপ্যমুদ্রা দর্শনী দিয়ে প্রথম মুখ দর্শন করে। ল্যাপলাণ্ডে মেয়ে ভূমিষ্ঠ হলে মেয়ের বাপ রেইন জাতীয় একটি হরিণ মেয়েকে উপহার দেয়। এই হরিণ নাকি মেয়ের স্ত্রীধন।

আকাশ মণ্ডলের প্রথম মানচিত্র অঙ্কিত করেছিল চীনেরা। সে ৬০০ খৃষ্টপূর্ব বৎসরের কথা। মানচিত্রে ১৪৬০টি নক্ষত্রের স্থান আছে। মানচিত্রটি প্যারিসের ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। বর্তমান আকাশমণ্ডলের মানচিত্রের আকার যেমন অনেক বেড়ে গেছে, তেমনি শত শত নতুন নক্ষত্রের স্থানও হয়েছে।

মেয়েরাও রাজত্ব চালায় এমন দেশ দু-একটা খোঁজ করলে পাওয়া যায় বই কি! আফ্রিকার জানজিবার দ্বীপে মেয়েরাই সেখানকার সর্বেসর্বা। এ দেশটাকে মেয়েদের রাজত্ব বলা যায়। এখানকার পুরুষরা কি করে জানেন? ছেলেমেয়েদের দোলনা দোলায়, কাঁথার উপর নানা রংএর ফুল তোলে, কাপড় কাচে; সংসারের যাবতীয় কাজ যা অন্য দেশের মেয়েরা করে সে সমস্ত এখানকার পুরুষদের দিয়ে হয়। মেয়েরা দেশ শাসন নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সংসারে মন দেবার সময় কোথায়? হিটলারের হুমকিতে জার্মান মেয়েরা অফিসের কাজে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি সংসারে মন দিতে আরম্ভ করেছে। তবুও কিছুদিন পূর্বে সংবাদ পাওয়া যায়, ১ কোটি ২০ লক্ষ মেয়ে জার্মানির নানা জায়গায় অফিসে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। জার্মানির কোর্টে মেয়ে হাকিমের সংখ্যা কিছুদিন আগেও ছিল শতকরা ৩৬ জন। জার্মান ডাক্তারদের মধ্যে শতকরা ১০ জন ছিল মেয়ে।

সব খবর এখানে এসে পৌঁছয় না—তা না হলে আরও কত গোপনীয় খবর জানা যেত।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার অনেকদিন আগে থেকেই জার্মানির সরকারী দপ্তর থেকে কাগজ বাঁচানোর জন্যে আইন করা হয়। বিনা প্রয়োজনে এক টুকরো কাগজ নষ্ট করবার কারও অধিকার ছিল না। মাথার টুপী কিনে কাগজ দিয়ে মুড়ে নিয়ে যেতে দেখলে ফৌজদারী অপরাধে পড়তে হ'ত।

যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ কাগজের টানাটানি দেখে আমাদের অনেকে আজ কাঁদাকাঁদি লাগিয়ে দিয়েছে। ওদের দেশেও বাদ যায়নি।

চা পানের নেশা যেন সারা পৃথিবীকে গ্রাস করতে বসেছে। বিশেষজ্ঞরা হিসাব ক'রে বলেছেন, ব্রিটেনে প্রতি মিনিটে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কাপ চা পান করা হয়। এ হিসাব কিছু দিন আগেকার। বর্তমানে বিশেষজ্ঞদের হিসাব দেখার উৎসাহও কমে গেছে। এখনকার হিসাবও অবশ্য অন্য রকম।

শব্দশৃঙ্খল ধাঁধার কথা গতবার বলেছি। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে, এবার কাগজে ধাঁধা না ছেপে মুখ মোছা সিল্কের রুমালে ছাপা হয়েছে। অনেক অভিভাবক এ রকম ধাঁধার বিরোধী হওয়ায় ছেলেমেয়েদের মুশকিলে পড়তে হয়। রুমাল তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। তবে অভিভাবকদের হঠাৎ আবির্ভাবে দু-একবার না হয় মুখ মুছে নিয়ে তাঁদের চোখে ধুলো দেওয়া যায়। বারবার ত আর হয় না। রুমালের উপর ধাঁধা বের করেছে আমেরিকা। যুদ্ধ শেষ হলে হয়ত এখানেও আমদানী হতে পারে। এখানের খবর তারা আমাদের থেকে নিশ্চয় বেশী রাখে।

ইটালির অনেক ভদ্রলোক সাধারণ পোস্টকার্ডে ১১,০০০ কথা লিখে চিঠি দিয়েছিলেন। তাঁর থেকে আর কেউ এত বেশী কথা লিখতে পারে নি।

ডাকটিকিটের পিছন দিকে ৬০০ লেখা কথা পাওয়া গেছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য না নিয়েই কথাগুলি বেশ পড়তে পারা যায়।

আমেরিকার লোকই অদ্ভুত!

আমেরিকার মত আজব দেশ আর নেই। একটা না একটা কিছুতে নতুন করে রং ফলান চাই। রাস্তায় তিল ফেলবার যায়গা নেই এত লোক জমেছে। ব্যাপারটা কিছু না হলেও সকলেই আগ্রহ করে উঁকি মেরে যাচ্ছে ভিড়ের মাঝে। যাঁকে দেখতে এত ভিড় জমেছে তিনি কিন্তু জানলার গরাদ ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন—নট্ নড়ন চড়ন। কাগজওয়ালাদের অফিস থেকে ছবিও তুলে নিয়ে গেল। মাথাটা একটু কাত হয়ে থাকায় মুখটা ভাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। একজন ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক অনেক অনুরোধ করেও সব মুখখানা তুলতে পারলে না। এমনিভাবে তিন দিন চুপচাপ না নড়ে চড়ে দাঁড়িয়ে থেকে চারদিনের দিন ভদ্রলোক সিগারেটে একটা আরামের টান মারলেন। চারি দিক থেকে প্রশ্ন আসতে লাগল, ব্যাপার কি! সে প্রশ্নের জবাব দিলেন ভদ্রলোকের এক বন্ধু। উদগ্রীব হয়ে জনতা শুনলে, ভদ্রলোক তিনদিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে বলে বাজী রেখেছিলেন বক্তার সঙ্গে। বক্তা যদিও বাজীতে হেরেছিলেন, তবু খুসী হয়ে বাজীর কথামত বন্ধুকে টাকাটা জনতার সামনেই দিয়েছিলেন।

ছায়াচিত্রে টাকার কথা

আপনারা অনেকেই ছায়াচিত্রে ডাকাতির ঘটনা দেখে থাকবেন। ডাকাতরা যখন বস্তা বস্তা বোঝাই করা টাকা লুট ক'রে নিয়ে যায় তখন কার না লোভ হয় ঐ টাকায় অন্তত কিছু ভাগ বসাতে! টাকার আওয়াজ, টাকার রং, আকার সবই সত্যি টাকার মতনই ত হয়, কিন্তু এদের কোনটিই আসল টাকা নয়! হলিউডের স্টুডিয়োতে এই ধরনের টাকা তৈরী করবার জন্যে একটা টাকশালই খোলা হয়েছে। প্রতিবৎসর সেখানে লক্ষ লক্ষ নকল মুদ্রা তৈয়ার করা হয় ছবিতে ব্যবহার করবার জন্যে। নানা দেশের সামাজিক ছবি তুলতে গিয়ে নানা দেশের মুদ্রাও তৈরী করতে হয়। টাকার যা যা থাকার দরকার সবই আছে, এমনকি দর্শকদের মনে লোভ জাগানর শক্তিটুকু পর্যন্ত, কিন্তু সবই মিছে। যারা এতগুলি টাকা নিয়ে ছবিতে নামে তাদের কেউ কিন্তু একবারও লুব্ধ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকায় না। দস্যু সর্দারের লুব্ধদৃষ্টি বলছেন, সে ত অভিনয়!

হাতীর দৌড়

পাঁচ টন ওজনের 'বুনো' হাতী ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে দৌড়াতে পারে।

পুরাতন মধু

কোন খাদ্যদ্রব্যই বেশী দিন তার স্বাভাবিক সুগন্ধ অথবা স্বাদ বজায় রাখতে পারে না। দুই একদিনের মধ্যে যে সব খাদ্য নষ্ট হয়ে যায়, বর্তমানে তাদের কৃত্রিম উপায়ে প্রায় এক মাসেরও বেশী দিন পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে রেখে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে, ঈজিপ্টের রাজার কবর থেকে যে ৩,০০০ বৎসর পুরাতন মধু পাওয়া গেছে তার স্বাভাবিক সুগন্ধ আজও পর্যন্ত সেইরকম বজায় আছে।

সাহিত্যসংবাদ

ঝরনা সাহিত্য প্রতিযোগিতার ফলাফল

বিগত ৮ই আষাঢ়, ৩২শ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার চন্দননগর ঝরনা সাহিত্য সঙ্ঘের যে প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছিল তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রবন্ধঃ—১ম। "ভারতের বাহিরে হিন্দুধর্মের প্রভাব ও প্রসার"—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চাতরা, শ্রীরামপুর। ২য়। "শরৎ-সাহিত্যে নারী"—শ্রীমতী গৌরী দাশগুপ্তা, ময়মনসিংহ। উল্লেখযোগ্য—"বর্তমান শিক্ষা সমস্যা"—কুমারী অর্পণা চক্রবর্তী, চন্দননগর।

কবিতাঃ—১ম। "বিকাশ"—শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ, কলিকাতা। উল্লেখযোগ্য—"মরম-কাহিনী"—শ্রীঅশোকচন্দ্র ভট্টাচার্য, পূর্ণিয়া।

গল্পঃ—১ম। "রক্তজবা"—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, দিল্লি।

ফটোঃ—১ম। "দীনের হাসি"—শ্রীরামপ্রসাদ সিং, বেহালা, ২৪ পরগনা।

(স্বাঃ) শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার গুঁই, সম্পাদক, ঝরনা সাহিত্য সঙ্ঘ, চন্দননগর।

আজ-কাল

কংগ্রেসের কর্মপন্থা?

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের দাবী সোজাসুজি অগ্রাহ্য করার পর কংগ্রেস-নেতাদের কথার সুর গরম হয়েছে। পণ্ডিত জওহরলাল এলাহাবাদে এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, আলোচনার সময় শেষ হয়েছে, এখন এসেছে দীর্ঘ ও তীব্র সংগ্রামের সময়। তিনি স্বীকার করেছেন যে, গত কয় বৎসরে তাঁরা খানিকটা বিপথেও গিয়েছিলেন। অবশ্য জওহরলালের কথার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা চলে না; কারণ মুখে রাজা-উজীর মেরে তিনি পাইক-বরকন্দাজ মারতেও পিছিয়ে যান, আর দক্ষিণপন্থী দলের অভিমতের বিরুদ্ধে কিছু করবার শক্তি, সাহস বা অভিপ্রায় তাঁর নেই। তবে জওহরলালের এত কড়া সুরে মনে হয়, তিনি যুক্তপ্রদেশে নীচ থেকে সাধারণ কংগ্রেস-কর্মীদের চাপ অনুভব করছেন। সর্দার বল্লভভাই ও মৌলানা আজাদও তাঁদের বক্তৃতায় খানিকটা সংগ্রাম-মুখী ভাব দেখিয়েছেন।

কিন্তু চাণক্য রাজাগোপাল এখনও বৃটিশ গভর্নমেণ্টের উপর বিশ্বাস রেখেছেন, যদিও মিঃ এমেরি কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলে' দিয়েছেন যে, তাঁরা কংগ্রেসের দাবী নিয়ে আর কোনো আলোচনা করবেন না। রাজাগোপাল আপশোষ করে বলেছেন যে, তাঁরা অহিংসা-নীতি ছেড়ে লোক ও সম্পদ্ দিয়ে হিংস্র যুদ্ধে বৃটেনকে সাহায্য করতে রাজী ছিলেন, তবুও বৃটেন তাঁদের আমলে আন্‌ল না।

যাই হোক, বোম্বাইতে ওআর্কিং কমিটির বৈঠকের পর এ-আই-সি-সি'র অধিবেশনে একটা কর্মপন্থা স্থির হবে বলে' শোনা যাচ্ছে। গান্ধীজী খাঁ আব্দুল গফুর [illegible] সঙ্গে সলা-পরামর্শ করছেন। জওহরলাল আভাষ দিয়েছেন [illegible] গান্ধীজীর নেতৃত্বে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ একটা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন হ'তে পারে। তবে স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে যে এখন কোনো বিরোধিতা, যা ব্যাপক আকার নিতে পারে, করা হবে না তা তিনি বলেছেন।

মানবেন্দ্র-নীতি

শ্রীমানবেন্দ্র রায় কংগ্রেস থেকে প্রায় বিতাড়িত হয়েছেন; তাঁকে চূড়ান্ত বিচার সাপেক্ষ সস্‌পেণ্ড করা হয়েছে। এই স্বয়ম্ভু বিপ্লবী নেতা অবস্থাগতিকে ইদানীং আর আত্মপরিচয় চাপা রাখ্‌তে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজস্ব বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আবিষ্কার করতে বাধ্য হলেন যে, বর্তমান যুদ্ধে বৃটেনকে বিনা সর্তে সাহায্য করা বিপ্লবের চরম সার্থকতা। তিনি বিভিন্ন বিবৃতি ও বক্তৃতাতে তাঁর এই মত ব্যক্ত করেন। ফাসিজম্‌-এর বিরুদ্ধে বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে সাহায্য দেবার জন্যে তিনি ইতিমধ্যে একটা নিখিল ভারত দিবস অনুষ্ঠানেরও নির্দেশ দেন। তাঁর এই আচরণ কংগ্রেস-নীতির বিরোধী বলে' যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস তাঁর কৈফিয়ৎ তলব করে। শ্রীমানবেন্দ্র রায় কি কি বিষয়ে তিনি কংগ্রেস-নীতি লঙ্ঘন করেছেন, তার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত চেয়েছেন। তাঁকে পূর্ণ কৈফিয়ৎ দেবার সুযোগ কংগ্রেস কমিটি দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর আচরণ স্পষ্টতই নীতিবিগর্হিত বলে' তাঁকে অবিলম্বে সস্‌পেণ্ড করেছেন। এতে মানবেন্দ্র রায় কংগ্রেস কমিটিকে ফাসিস্ট বলে' অভিহিত করেছেন।

ফাসিজম্‌-বিরোধী দিবস অনুষ্ঠানের সময় কলকাতার পুলিস ও সিভিক গার্ড কয়েকজন রায়পন্থীকে গ্রেপ্তার করে। তাতে স্টেটসম্যান পর্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করেন। রায় সেজন্যে স্টেটস্‌ম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং এই যুদ্ধে তিনি এবং তাঁর চেলারা যে আন্তরিকভাবে বৃটেনের পক্ষে, সে কথাটা কর্তৃপক্ষকে ভালো করে' বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করেছেন।

খাকসার-মিতালী

খাকসার দলের সঙ্গে গভর্নমেণ্টের মিটমাট হয়ে গেছে। খাকসারেরা সরকারী বিধি-বিধান মেনে নিতে স্বীকৃত হয়েছে; গভর্নমেণ্টও তাদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছেন। পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট কারাগারে খাকসার নেতা আল্লামা মাশরিকির কাছে এক দূত পাঠান। মাশরিকি গভর্নমেণ্টের সর্তগুলি মেনে' নিয়েছেন। তবে তাঁদের নাৎসী চর বলায় তিনি অভিমান প্রকাশ করেছেন; পরিশেষে ভারত রক্ষার জন্যে বড়লাটকে ৫০ হাজার খাকসার দিয়ে সাহায্য করবার ইচ্ছা জানিয়েছেন। মুসলিম লীগের মতো খাকসারেরাও খাঁটি পথে ফিরে যাবার সুযোগ পেয়ে সরকার-বিরোধী বিসদৃশ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেল।

ধাঙড় ধর্মঘট

কলকাতায় ধাঙড় ধর্মঘট বন্ধ হয়েছে। ধর্মঘটীরা ৬ই সেপ্টেম্বর প্রতিকূল অবস্থার জন্যে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করে। কর্পোরেশন স্পেশাল কমিটি তাঁদের রিপোর্টে ধাঙড়দের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু এখন তা পূরণ করা যাবে না বলে' মত প্রকাশ করেছেন। ৪ঠা ও ৫ই তারিখে আরও কিছু ধর্মঘটীকে পুলিস ও সিভিক গার্ড গ্রেপ্তার করে।

বর্মা-মন্ত্রিসভা

বর্মার ইউ-পু মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা পরিষদে গত ৭ই অগস্ট ৮১—৩২ ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়। তিন-জন মন্ত্রী ও ছয়জন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ভোট দেন। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই—(১) বর্তমান যুদ্ধে বিনা সর্তে বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে সাহায্য দান; (২) জাতীয়তাবাদ দমনের উদ্দেশ্যে বর্মা রক্ষা আইনে বর্মার নেতাদের ও অন্য লোকদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার; (৩) মন্ত্রিসভার কোন গঠনমূলক নীতি নেই।

* * *

বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদে দুটি বেসরকারী বিল পেশ করা হয়েছে—একটি বিলের বিধান এই যে, কোন হিন্দু বিপত্নীক বিধবা ছাড়া কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করতে পারবেন না; দ্বিতীয় বিলে হিন্দুদের মধ্যে বিবাহের পণপ্রথা বিলোপের বিধান করা হয়েছে। দুটি বিলই জনমত জান্‌বার জন্যে প্রচার করবার ব্যবস্থা হয়েছে।

ইওরোপ

বৃটেনে আকাশযুদ্ধ

বৃটেনের উপর আকাশযুদ্ধ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার দিকে যাচ্ছে। গত শনিবারের আগে পর্যন্ত জার্মানরা তাদের প্রাত্যহিক হানার

প্রধানত চেষ্টা করছিল সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলি ধ্বংস করতে। কিন্তু গত শনিবার থেকে তারা লণ্ডন এবং অন্যান্য শহরের উপর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করেছে। শনিবারের হানায় ৩০৬ জন নিহত ও ১৩৩৭ জন গুরুতর আহত হয়েছে। শনি ও রবি—দুদিনই সমস্ত রাত্রি ধরে' লণ্ডনে আক্রমণ চলেছে। ডক ইয়ার্ডের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, তবে কাজ বন্ধ হয় নি। বাড়ীঘর অনেক ধ্বংস হয়েছে।

ইংরেজরা বলছে যে, জার্মানরা বৃটিশ জঙ্গী বিমানবহরকে ক্ষয় করে' বৃটেনকে বোমারু বিমান দিয়ে আচ্ছন্ন করে' ফেলতে চায়। সেই অবস্থা এলে হিটলার ইংলণ্ড অভিযানের আদেশ দেবেন। এই সঙ্গে এখন জার্মানরা ইংলণ্ডের অসামরিক অধিবাসীদের আতঙ্কগ্রস্ত করতে চায়। সেপ্টেম্বর মাসকে ইংরেজরা সবচেয়ে সঙ্কটপূর্ণ মাস বলে' মনে করছে। তবে তারা জার্মান বিমান আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে বলে' ভরসা করে। দৈনন্দিন হানায় বহু জার্মান বিমানও ধ্বংস হচ্ছে।

সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বৃটেনের আকাশে বিমান-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে জার্মানির পক্ষে এ বৎসর যুদ্ধাবসানের আশা করা অসম্ভব মনে হয়। কারণ তার পরেই প্রচণ্ড শীত পড়বে; তখন বিমান-হানার সুবিধা হবে না। অর্থাৎ যুদ্ধ তাহলে দীর্ঘ যুদ্ধ হবে।

বৃটিশ বিমানবহরও গত ৩রা, ৪ঠা, ৫ই, ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর ক্রমাগত বার্লিনের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। সেখানে বনের মধ্যে লুকানো অস্ত্র কারখানা ও অন্যান্য লক্ষ্যবস্তু তারা জখম করেছে। এক হানায় বার্লিনে অনেক লোক নিহত হয়েছে বলে' জানা যায়। জার্মানির অন্যান্য শহর ও জার্মান এলাকার বহু ঘাঁটির উপরও বৃটিশ বিমানবহর আক্রমণ চালায়।

হিট্‌লার ও চার্চিল

৪ঠা সেপ্টেম্বর হের হিটলার বার্লিনে এক বক্তৃতায় বলেন, বৃটেনের যে দ্রুত পরাজয় ঘট্‌ল না তার কারণ বৃটেনের ভৌগোলিক অবস্থান এবং বাইরে থেকে তার অতি দ্রুত সৈন্য অপসারণ। তিনি ইংরেজদের হুমকি দেন যে, জার্মানরা ইংলণ্ড দখল করবেই। বৃটিশ বিমান রাত্রিতে হানা দিয়ে জার্মানির অসামরিক অধিবাসীদের প্রাণহানি করছে—এই অভিযোগে হিটলার বলেন যে, জার্মান বিমানও প্রত্যহ এর জবাব দিতে আরম্ভ করেছে।

৫ই সেপ্টেম্বর কমন্স সভায় যুদ্ধ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে মিঃ চার্চিল বলেন যে, সেপ্টেম্বরে আকাশযুদ্ধ আরও জোর হবে; তবে বৃটিশ বিমানবহর ও বৃটেনের অধিবাসীরা সেজন্যে প্রস্তুত আছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, হিটলার অভিযানের মতলব ছাড়েন নি; তবে জুলাই মাসের চেয়ে এখন অভিযান অনেক কঠিন হবে। মিঃ চার্চিল বলেন যে, আগস্ট মাসে বিমান-আক্রমণে ইংলণ্ডে মোট ১০৭৫ জন অসামরিক অধিবাসী নিহত হয়েছে। যাদের বাড়ীঘর ও সম্পত্তির ক্ষতি হচ্ছে, সরকার থেকে তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হচ্ছে। শীগ্‌গিরই 'মধ্য প্রাচ্যে জোর লড়াই হবে বলে' তিনি জানান যে, পূর্ব ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহরে সম্প্রতি আরও অনেক জাহাজ পাঠান হয়েছে।

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহর সম্প্রতি ছয়দিন অভিযান চালিয়েছে। ইতালির অধীন দোদেকানীজ দ্বীপপুঞ্জের উপর তারা প্রবল গোলাবর্ষণ করেছে। নৌবহরের বিমান ইতালির অন্যান্য ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়।

বৃটিশ-মার্কিন চুক্তি

গত ২রা সেপ্টেম্বর মার্কিন ও বৃটিশ গবর্নমেণ্টের মধ্যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক চুক্তি হয়ে গেছে। আমেরিকা বৃটেনকে ৫০খানা পুরনো ডেস্ট্রয়ার দেওয়ার বিনিময়ে বাহামা, জ্যামেকা, সেণ্ট লুসিয়া, ত্রিনিদাদ, আণ্টিওয়া ও বৃটিশ গায়ানা—মধ্য ও দক্ষিণ আটলাণ্টিকের এই কয়টি বৃটিশ রাজ্যে নৌ ও বিমানঘাঁটি স্থাপনের জন্য জায়গা ৯৯ বছরের ইজারা পেয়েছে। তা ছাড়া কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষাকার্যের জন্যে উত্তর আটলাণ্টিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিনাসর্তে আভালন উপদ্বীপ, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও বার্মুডায় ঘাঁটি করবার অধিকার পেয়েছে। এক কথায় পশ্চিম গোলার্ধে সমস্ত বৃটিশ রাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে চলে' গেল।

শোনা যাচ্ছে, প্রাচ্য সম্বন্ধে আমেরিকা ও বৃটেনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে। শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়া ও নিউ-জীল্যাণ্ডের সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছে; তবে তার ধারা কি জানা যায় নি। জাপানকে ঠেকাবার জন্যে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট মার্কিন নৌবহরকে সিঙ্গাপুর ঘাঁটি ব্যবহার করতে দিতে নাকি রাজী আছেন। তাহলে প্রশান্ত মহাসাগরের রাজ্যগুলিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে যাবে।

মার্কিন গভর্নমেণ্ট বিরাট সৈন্যবাহিনী, সমর-সম্ভার ও নৌবহর প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ করে' দিয়েছেন।

ইন্দোচীন

ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তির জন্যে এবং মার্কিন গভর্নমেণ্ট এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সতর্ক করায় বোধ হয় জাপান ইন্দোচীনের উপর জবরদস্তি করা সমীচীন মনে করছে না। কারণ প্রথমে খবরে পাওয়া যায় যে, সে ইন্দোচীনকে তার দাবী স্বীকার করবার জন্যে এক চরমপত্র দেয়; কিন্তু পরে খবর আসে যে, সে-চরমপত্র জাপান প্রত্যাহার করেছে। অন্তত এখন আর ইন্দোচীন সম্বন্ধে খুব গুরুতর কোন খবর শোনা যাচ্ছে না।

রুমানিয়া

হাঙ্গারিকে ট্রান্সিলভেনিয়া দেওয়া রুমানিয়ায় যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তা অনেক দূর গড়িয়েছে। বিক্ষোভের ফলে জিগুর্তু মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন এবং জেনারেল আণ্টোনেস্কু মন্ত্রিসভা গঠনের ভার পান। তারপর পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়া হয় এবং রুমানিয়ায় আণ্টোনেস্কু সর্বেসর্বা হন। এই সময় আয়রন গার্ড দল বিদ্রোহ করে। তাদের সঙ্গে নানা জায়গায় পুলিস ও সৈন্যদের সংঘর্ষ হয়।

তারা রাজা ক্যারলের সিংহাসন ত্যাগ দাবী করে এবং আণ্টোনেস্কু সে দাবী সমর্থন করেন। রাজা ক্যারল নিরুপায় হয়ে যুবরাজ মাইকেলকে সিংহাসনে বসিয়ে রুমানিয়া ত্যাগ করেছেন।

জনসাধারণের বিক্ষোভকে অন্য পথে বিক্ষিপ্ত করে' দেবার জন্যেই যে ক্যারলকে নিয়ে এই হৈ-চৈটা করা হ'ল তাতে সন্দেহ নেই। আণ্টোনেস্কু নিজে আয়রন গার্ড দলের লোক; তিনি যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন তাতে জিগুর্তুকে বাদ দিয়ে ঐ মন্ত্রিসভার আর সকলকেই নেওয়া হয়েছে। তাঁদের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় রাজার ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে ক্ষমতা হাতে রাখার চেষ্টাই স্বাভাবিক।

মোট কথা, বড় ফাসিজ্‌মের কাছে ছোট ফাসিজ্‌ম্‌ চড় খেয়ে প্রায় যায়-যায় হয়েছিল। এখন কোনো রকমে সেটা সাম্‌লে ওঠবার চেষ্টা হচ্ছে।

৯-৯-৪০ —ওয়াকিবহাল

রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা

বোম্বাইর রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। কলিকাতা ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং দল এই কাপ বিজয়ী হইয়াছে। বাঙলার দল হিসাবে মহমেডান স্পোর্টিংই হইল সর্বপ্রথম দল, যাহার ভাগ্যে রোভার্স কাপ বিজয়ী হওয়া সম্ভব হইল। ইতিপূর্বে ১৯২৩ সালে মোহনবাগান, ১৯৩৭ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ও ১৯৩৯ সালে হাওড়া জেলা দল রানার্স আপ হইবার সৌভাগ্য অর্জন করে। মহমেডান স্পোর্টিং দলের এই সাফল্য পশ্চিম ভারতে বাঙলা ফুটবল খেলোয়াড়গণের সম্মান বৃদ্ধি করিল। সেই হিসাবে মহমেডান স্পোর্টিং দল বাঙলার সকল ফুটবল উৎসাহী ও খেলোয়াড়ের প্রশংসা দাবী করিতে পারেন।

রোভার্স কাপ ফাইন্যালে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে বাঙ্গালোর মুসলীম দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। খেলার প্রথমার্ধে কোন গোল হয় না। দ্বিতীয়ার্ধের শেষের দিকে একটি গোল করিয়া মহমেডান স্পোর্টিং দল বিজয়ী হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে উক্ত কাপ প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে বাঙ্গালোর মুসলীম দলের সহিতই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয় এবং খেলার দ্বিতীয়ার্ধে একরূপ শেষ সময় অপ্রত্যাশিত গোলে পরাজিত হইতে হয়। সুতরাং মহমেডান স্পোর্টিং দল এই বৎসর বাঙ্গালোর দলকে ঠিক একইভাবে পরাজিত করিয়া ১৯৩৭ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে বলিলে অন্যায় হইবে না। খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক হইয়াছিল। মহমেডান স্পোর্টিং দলের রসিদ এই বিজয়সূচক গোলটি করেন। নিম্নে উভয় দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

মহমেডান স্পোর্টিং দলঃ—আলী হোসেন; সিরাজুদ্দিন, জুম্মা খাঁ; বাচ্চি খাঁ, রসিদ খাঁ, মাসুম; নূর মহম্মদ (ছোট), করিম, রসিদ, সাবু ও রহমন।

বাঙ্গালোর মুসলীম দলঃ—কাদেরভেলু; পিয়ারু, হাবিব; খাদের, মহীউদ্দিন, লক্ষ্মণ; বুসী, রসিদ, ডিকুজ; স্বামীনাথম ও কাদের আলী।

মহমেডান স্পোর্টিং দল কিরূপে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

প্রথম খেলাঃ—মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৮-০ গোলে রয়াল এয়ারফোর্স দলকে পরাজিত করে।

দ্বিতীয় খেলাঃ—মহমেডান স্পোর্টিং ৩—০ গোলে হেভী ব্যাটারীকে পরাজিত করে।

তৃতীয় খেলা বা সেমি-ফাইন্যালে ওয়েলচ রেজিমেণ্ট দলকে মহমেডান ৩—০ গোলে পরাজিত করে।

ফাইন্যালেঃ—বাঙ্গালোর মুসলীম দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে।

রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার ইতিহাস

১৮৯১ সালে সর্বপ্রথম এই প্রতিযোগিতাটি প্রবর্তন করা হয়। ইহার পূর্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৮৯০ সালে এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় ও উরষ্টার রেজিমেণ্ট দল বিজয়ী হয়। তবে সেই বৎসর কাপটি পাওয়া না যাওয়ায় বিজয়ী দলকে প্রদান করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য ঐ বৎসরটি প্রতিযোগিতার প্রথম প্রবর্তন বলিয়া গণ্য করা হয় না। এই প্রতিযোগিতাটি ৫০ বৎসরে পদার্পণ করিল। এই ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে ও বিজয়ী হইয়াছে। ১৯২৭ সালে এই কাপটি নূতনভাবে গঠন করা হয় ও পূর্বের প্রদত্ত কাপটি ফেলিয়া দেওয়া হয়। ১৮৯১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই কাপ বিজয়ীর সম্মান লাভ কেবল গোরা সৈনিক দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৩৭ সালে সর্বপ্রথম বাঙ্গালোর মুসলীম দল এই কাপ বিজয়ী হইয়া সৈনিক দলের একচেটিয়া নাম ঘুচাইয়া দেয়। ১৯৩৮ সালে বাঙ্গালোর মুসলীম দল পুনরায় বিজয়ী হয়। কিন্তু গত বৎসর ২৮নং ফিল্ড ব্রিগেড দল পুনরায় উক্ত কাপ বিজয়ী হইয়া পূর্বের সম্মান পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। এই বৎসর মহমেডান স্পোর্টিং দল রোভার্স কাপ বিজয়ী হওয়ায় সৈনিক দল ঐ সম্মান লাভে বঞ্চিত হইল।

পর পর তিন বৎসর সম্মান লাভ

পর পর তিনবার রোভার্স কাপ যে সকল দল পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

১৯০২, ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালে—**চেসায়ার রেজিমেণ্ট দল।**

১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে—**সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ান মিডলসেক্স রেজিমেণ্ট দল।**

পর পর দুই বৎসর

পর পর দুই বৎসর রোভার্স কাপ বিজয়ী যে সকল দল হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

(১) **উরষ্টার রেজিমেণ্ট দল**—(১৮৯১ ও ১৮৯২ সাল)।

(২) **সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ান রয়াল স্কট**—(১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সাল)।

(৩) **লিষ্টার রেজিমেণ্ট**—(১৯০৯ ও ১৯১০ সাল)।

(৪) **ডারহাম লাইট ইনফ্যাণ্ট্রী**—(১৯২২ ও ১৯২৩ সাল)।

(৫) **কিংস রেজিমেণ্ট**—(১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সাল)।

(৬) **বাঙ্গালোর মুসলীম দল**—(১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সাল)

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয় দলের মধ্যে তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দল ইহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। এইরূপভাবে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের দলকে একত্র করিয়া প্রতিযোগিতার যে ব্যবস্থা হইতেছে, ইহা সর্বপ্রথম। ইতিপূর্বে এইরূপ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল খেলা হইত, তাহা কেবল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দলকে আহ্বানের ফলেই সম্ভব হইত। কোন একটি প্রতিযোগিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দলসমূহ মিলিত হইত না। ১৯৩৬ সালে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। তাহাতে কয়েকটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দল যোগদান করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল ফাইন্যালে বিজয়ী হয়। তাহার পর হঠাৎ কোন বিশেষ কারণে এইরূপ প্রতিযোগিতা আর অনুষ্ঠিত হয় না। তিন বৎসর পরে পুনরায় এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিবেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত "আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সমিতি"। ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় দলকে চারিটি বিভাগীয় বা জোন প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। ঐ সকল বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় যে সকল দল সাফল্য লাভ করিবে, তাহারাই শেষ মীমাংসার খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ব বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই পূর্ব বিভাগের খেলা পাটনায় অনুষ্ঠিত হইবে। উত্তর বিভাগের খেলা দিল্লীতে, মধ্য বিভাগের খেলা ওসমানিয়াতে ও দক্ষিণ বিভাগের খেলা ত্রিবাঙ্কুরে অনুষ্ঠিত হইবে। বিভিন্ন বিভাগে যে সকল দল যোগদান করিবে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

পূর্ব বিভাগঃ—এলাহাবাদ, পাটনা, কাশী, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দল খেলিবে।

উত্তর বিভাগঃ—পাঞ্জাব, দিল্লী, আলীগড়, আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় দল যোগ দিবে।

মধ্য বিভাগঃ—বোম্বাই, নাগপুর, ওসমানিয়া ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় দল।

দক্ষিণ বিভাগঃ—মাদ্রাজ, মহীশূর, আন্নামালাই ও ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয় দল।

যুদ্ধের নূতন পর্ব

(২৮৬ পৃষ্ঠার পর)

দেখিয়া নিরাপদ এবং সুরক্ষিত রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কিছুদিন পূর্বে এই কথা ঘোষণা করেন যে, "ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দিকস্থ সমুদ্র-ভাগে যদি ব্রিটিশ নৌবহরের টিঁকিয়া থাকা কঠিন হইয়া উঠে, তাহা হইলেও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কিছুতেই শত্রুপক্ষের হাতে তাঁহাদের নৌবহর সমর্পণ করিবেন না; কিংবা নৌবহর ডুবাইয়া দিবেন না।" এই ঘোষণার সোজা অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তেমন সংকট যদি দেখা দেয়ই, সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ নৌবহর কানাডায় চলিয়া যাইবে এবং সেখান হইতে সংগ্রাম চালাইবে। এ অবস্থা অবশ্য আনুমানিক মাত্র, তেমন কোন কারণ এখনও ঘটে নাই, তবু সংকল্পের দৃঢ়তা ব্যক্ত করিবার জন্যই ঐ কথা বলা হইয়াছে। হিটলারও কিছুদিন পূর্বে পরিহাসের সুরে বলিয়াছেন, ইংরেজ যদি ভাল চায়, এখনও সন্ধি করুক, যদি সন্ধি না করে, তাহার সমূহ বিপদ ঘটিবে। সে বিপদে চার্চিল সাহেবের অবশ্য ভয়ের কোন কারণ নাই; কারণ তিনি কানাডায় পাড়ি ভিড়াইবেন। কানাডা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্তী। ব্রিটিশ নৌবহরকে কানাডায় যাইতে হইবে, এমন কোন কারণ না দেখা দিলেও কানাডার সঙ্গে ইংলণ্ডের আটলাণ্টিক পথে যোগ রহিয়াছে; এবং কানাডা এই পথে ইংরেজকে সাহায্য করিবে, জার্মানি ইহা দেখিতেছে; সুতরাং কানাডার এই সাহায্যসূত্র ছিন্ন করিবার জন্যও যুদ্ধ আটলাণ্টিক মহাসাগরে বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা ষোল আনাই রহিয়াছে। আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই; কিন্তু তাহা না করিলেও হিটলার স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন যে, আমেরিকা ইংরেজকে সাহায্য করিতেছে, এইরূপ ক্ষেত্রে আমেরিকার উপর আক্রোশ তাঁহার উত্তরোত্তর জমিয়া উঠিতেছে নিশ্চয়ই। সেই আক্রোশ চরিতার্থ করিবার জন্য কোন্ মুহূর্তে কি চাল তিনি চালিবেন, বুঝিবার উপায় নাই। আমেরিকাকে সেজন্য প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে; সুতরাং বর্তমানের এই চুক্তিতে আমেরিকা এবং ইংরেজ উভয় পক্ষেরই স্বার্থ আছে। আমেরিকার হার্স্টের দলের সংবাদপত্রসমূহ তো ডাকহাঁকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, আমেরিকা এখন আর যুদ্ধে নির্লিপ্ত আছে বলা যায় না, যুদ্ধে সে কার্যত নামিয়াই পড়িয়াছে।

আমেরিকার সঙ্গে ইংরেজের এই চুক্তির প্রতিক্রিয়া শুধু আটলাণ্টিকে নয়, প্রশান্ত মহাসাগরে ছড়াইয়া পড়িবে। ইতিমধ্যেই জাপান এইরূপ মনে করিতেছে। সে বলিতেছে, প্রশান্ত মহাসাগরের সম্বন্ধে হয় প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজের সঙ্গে, না হয় অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমেরিকার ঐ ধরনের আর একটা চুক্তি অবিলম্বেই স্বাক্ষরিত হইবে। রাজনীতিকদের অনেকে এই কথা বলিতেছেন যে, ইংরেজ ও আমেরিকার এই জোটের পাল্টা হিসাবে জার্মানি ও ইটালিও জাপানের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে। জাপানের সংবাদপত্রসমূহ বলিতেছে—আমেরিকা ইংরেজের সঙ্গে চুক্তি করিয়া আটলাণ্টিকের পথ নিরাপদ করিয়া লইল, এইবার প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে সে নজর দিবে।

এই চুক্তির পরে প্রশান্ত মহাসাগরে যে কিঞ্চিৎ বীচি-বিক্ষোভ হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইন্দোচীনের সঙ্গে জাপানের আপসে ইহা সূচিত হইতেছে এবং শ্যামদেশের সঙ্গে ইংরেজের অনাক্রমণ চুক্তিতে ইহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ঘটনার গতি কোন্ দিকে যাইবে, এখন ঠিক কিছু বলা যাইতেছে না। তবে এই চুক্তির ফলে যুদ্ধ সহজে মিটিবে না, ইহা সুনিশ্চিত হইল; জার্মানি ইংরেজকে ত্বরিত আক্রমণে কাবু করিয়া ফেলিবে, এই যে আশা করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইল। পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিক হইতেই যুদ্ধের পাল্লার মধ্যে ভারতবর্ষ যে কোন মুহূর্তে পড়িতে পারে, চুক্তি এমন সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে, অন্তত এইটুকু আমরা স্পষ্টই বুঝিতেছি।

সমর বার্ত্তা

৪ সেপটেম্বর।—

বার্লিনের সংবাদ—শীতকালীন সাহায্য আন্দোলনের উদ্‌বোধন করিয়া শ্রীযুক্ত হিটলার বলেন, জার্মানির অন্যান্য শত্রুদের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, ইংলণ্ডের তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভের কারণ—অতিশয় ক্ষিপ্র সৈন্যাপসারণ ও ইংলণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থান। উপসংহারে জগতের 'সাধারণ বুদ্ধি'র নিকট তাঁহার শেষ আবেদনের উল্লেখ করিয়া বলেন 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইব।' তিনি বলিয়াছেন, 'ব্রিটেনের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিতে পারে, 'তোমরা আসিতেছ না কেন?', আমাদের জবাব এই যে, 'ব্যস্ত হইও না, আমরা আসিতেছি'। বিশ্বকে আমরা মুক্তি দান করিবই।'

গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরের উপর জার্মানদের হাওয়াই হামলা অক্ষুণ্ণ আছে। ইংরেজেরা ফরাসী উপকূলে প্রবল গোলা বর্ষণ করিতেছে। জার্মান অধীন নানা স্থানে ও বার্লিনেও দুই দিক হইতে শেষ রাত্রে বিমান আক্রমণ চলিয়াছিল। প্রকাশ, জার্মানদের ৪১টা ও ইংরেজদের ৫টা বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

রুমানিয়ার অঙ্গচ্ছেদে রুমানিয়ায় দেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রকাশমান। মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন, সমর সচিবের উপর মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দেওয়া হইয়াছে। আয়রন গার্ডএর সদস্যেরা আক্রমণ করিয়া কয়েকটি সরকারী ভবন দখল করিবার চেষ্টা করে। সমস্ত টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন।

সিঙ্গাপুরের সংবাদ—ইন্দোচীনের নিকট দত্ত জাপানের চরমপত্র আপাতত প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

৫ সেপটেম্বর।—

আজ কমন্স সভায় বিবৃতি দিতে গিয়া শ্রীযুক্ত চার্চিল বলেন, আমরা যেন মনে না করি যে, জার্মান আক্রমণের আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে; পূর্ব কয়েক মাসের চেয়ে বর্তমানে আমাদের অবস্থা অনেক ভাল; গত জুলাই মাস অপেক্ষাও আমাদের বিমান বাহিনী বর্তমানে অধিকতর শক্তিশালী।

শীতকালীন সাহায্য আন্দোলনের উদ্‌বোধন প্রসঙ্গে প্রদত্ত শ্রীযুক্ত হিটলারেরও বক্তৃতার শেষাংশে আছে, 'আমরা এইসব নৈশ বোম্বেটেদের বোম্বেটেগিরি থামাইয়া দিব। আমাদের দুজনের একজন অবশ্যই খতম হইবে, কিন্তু নাৎসী জার্মানি নয়, সে ইউরোপের শেষ দ্বীপ গ্রেট ব্রিটেন।'

উভয়পক্ষই উভয়ের রাজ্যে আগেরই ন্যায় হাওয়াই হামলা করিয়াছে। ফরাসী উপকূলে উপর্যুপরি তিন রাত্রি ধরিয়া ইংরেজরা বোমা বর্ষণ করিতেছে। ব্রিটিশ সাবমেরিনের টর্পেডোর আঘাতে জার্মান সৈন্যবাহী এক জাহাজ ডুবিয়া যাওয়ায় ৩ হাজারের অধিক যাত্রী ডুবিয়া মরিয়াছে। অন্য পক্ষে দুইটি ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার জলমগ্ন হইয়াছে। বুধবারের আকাশযুদ্ধে ৫৪টা জার্মান বিমান ও ২৭টা ব্রিটিশ বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

রুমানিয়ার সংকট বর্ধিত। রাজা ক্যারল আজ রুমানিয়ার শাসনতন্ত্র স্থগিত করিয়া পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিয়া জেনারেল আন্টোনেস্কুকে ডিক্টেটরী ক্ষমতা প্রদান করেন। হাঙ্গেরীয় বাহিনী ট্রানসিলভেনিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে।

৬ সেপটেম্বর।—

বুখারেস্ট হইতে জার্মান নিউজ এজেন্সির ঘোষণা—রাজা ক্যারল সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র যুবরাজ মাইকেল রাজা হইবেন। জেনারেল আন্টোনেস্কু ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রিদ্বয় এবং আরও অনেক মন্ত্রীকে স্ব স্ব গৃহে অন্তরিত থাকিবার আদেশ দিয়াছেন। দেশের সর্বনাশ ঘটানোর অভিযোগে এক ট্রাইবিউন্যালে ইঁহাদের বিচার হইবে। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা জেনারেল মরুসয়াও পদচ্যুত হইয়াছেন।

ব্রিটেনের নানা স্থানে নাৎসী বিমানের নৈশ আক্রমণ চলিতেছে। টেমস নদীর মোহনায় বিস্তৃত আকাশ জুড়িয়া উভয়পক্ষের বৃহত্তম আকাশযুদ্ধ হইয়াছে। জার্মানরা কেণ্ট এলাকার বিমানঘাঁটির উপরেও আক্রমণ চালাইয়াছিল। প্রকাশ, জার্মান আক্রমণ পূর্বাপেক্ষা তীব্রতর হইয়াছে। অপরপক্ষে ইংরেজরাও বার্লিন, জার্মানি ও ফ্রান্সের নানা শত্রুস্থানে হাওয়াই হামলা চালাইয়াছে। লণ্ডনের ৫ সেপটেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ নৌবাহিনী পাঁচ দিন ধরিয়া পূর্ব ও পশ্চিম ইতালীয় ঘাঁটিগুলিতে প্রবল ও সফল আক্রমণ চালাইয়াছে।

চুংকিংএর ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদ—ফরাসী ইন্দোচীনের তিন স্থানে ১২ হাজার জাপসৈনের অবতরণ প্রস্তাবে ফরাসী ইন্দোচীন সম্মত হইয়াছে।

ইঙ্গ-মার্কিন নৌচুক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া মস্কোর 'প্রভদা' পত্রিকা বলিয়াছেন, বর্তমান যুদ্ধের বর্তন আরও দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হইল।

৭ সেপটেম্বর।—

গতরাত্রে জার্মান বিমানসমূহ উত্তর-পশ্চিম ইংলণ্ডের কোথাও কোথাও হামলা করে, লণ্ডনেও করে। আজ ইংলণ্ডে বিমান আক্রমণের তীব্রতা নাই। কাল ৪৬টা জার্মান ও ১৯টা ব্রিটিশ বিমান নষ্ট হইয়াছে। বার্লিন ও ফরাসী উপকূলেও ইংরেজদের প্রচণ্ড আক্রমণ চলিতেছে।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ দোব্রুজা সম্পর্কে রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। দক্ষিণ দোব্রুজার এক লক্ষ রুমানিয়ানকে এবং উত্তর দোব্রুজার ৪।৫ হাজার বুলগেরিয়ানকে ওই অঞ্চল হইতে বাস উঠাইয়া আনিতে হইবে। ২০ তারিখের পূর্বে বুলগেরিয়ার সৈন্যদল প্রাপ্ত অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আয়রন গার্ড দলের লোকেরা রাজা ক্যারল ও তাঁহার সহযোগীদের বিচার দাবি করিয়া পুস্তিকা বিতরণ করিতেছে।

৮ সেপটেম্বর।—

গত রাত্রে লণ্ডনে বিমান আক্রমণের সতর্কতাসূচক বংশীধ্বনি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা হইতে ভোর সাড়ে তিনটা পর্যন্ত হইতে থাকে। ইহাই শত্রুপক্ষের দীর্ঘতম বিমান আক্রমণ। এ ছাড়া টেমস নদীর উভয় তীরেও বোমা বর্ষিত হইয়াছে। শত্রুপক্ষের ৮৮টা ও ইংরেজদের ২২টা বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। জার্মান হামলায় কাল ৪০০ লোক বিনষ্ট এবং ১৩।১৪ শত লোক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, রাজা ক্যারল ট্রেনযোগে ইতালির মধ্য দিয়া সুইটসারল্যাণ্ডে যাইবার সময় ট্রেনের উপর রাইফেল ও পিস্তলের প্রবল গুলি বর্ষণ হয়।

ওআশিংটনের সংবাদ—জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থায় সিঙ্গাপুর নৌঘাঁটি মার্কিন কর্তৃক ব্যবহৃত হইতে পারে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে ইহা লইয়া আলোচনা চলিতেছে।

৯ সেপটেম্বর।—

লণ্ডনের উপর জার্মান হাওয়াই হামলার তীব্রতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সন্ধ্যা হইতে ভোরবেলা পর্যন্ত ঝাঁকে ঝাঁকে জার্মান এয়ারোপ্লেন পর্যায়ক্রমে আক্রমণ চালাইয়াছে। পুলিসরা অনেক রাস্তা অবরুদ্ধ করিয়াছে। পার্লামেণ্ট-এর আকাশের উপরেও প্রবল আকাশযুদ্ধ হইয়াছে। ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব ও সংকটপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ৯৯টা জার্মান বিমান বিনষ্ট এবং ২৫০জন জার্মান বৈমানিক নিহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইংরেজরাও জার্মান অঞ্চলে ব্যাপক আক্রমণ চালাইয়াছে। হামবুর্গে ৩ ঘণ্টাব্যাপী প্রবল আক্রমণ চলে।

নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ সাবমেরিনের আক্রমণে তিনটি ইতালীয় জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৪ সেপটেম্বর।—

সিমলার সংবাদ—গত ৩০ অগস্টে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একখানা বিমান রাত্রে সমুদ্রে পাহারা দিবার সময় নিরুদ্দেশ হইয়াছে। অনুমান দুর্ঘটনায় বিমানটির সকল আরোহীই মারা গিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল উত্থাপিত হয়। কংগ্রেসী দলের সদস্যরা সিলেক্ট কমিটির সদস্যপদ গ্রহণে অসম্মতি জানাইয়াছেন। প্রকাশ, বর্ধমানের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ মহতাব প্রথমে সিলেক্ট কমিটিতে কাজ করিতে সম্মত হইলেও পরে তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

হলওয়েল সত্যাগ্রহ সম্পর্কে দণ্ডিত ৪জন মহিলা ৩০ অগস্টে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

কলিকাতায় ধাঙগড়দের ধর্মঘট এখনও চলিতেছে। তবে বাহিরের মজুরদের দ্বারা কাজ চালানোয় ধর্মঘটের অসুবিধা বুঝা যায় না।

৫ সেপটেম্বর।—

অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত মোতিলাল ঘোষের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন জন্য আজ সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সভাপতিত্বে অ্যালবার্ট হলে এক স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়।

শ্রীযুক্ত বড়লাটের সাম্প্রতিক বিবৃতি প্রসঙ্গে আজ কমন্স সভায় শ্রীযুক্ত গালচার শ্রীযুক্ত এমেরিকে ভারতের প্রধান প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস শ্রীযুক্ত বড়লাটের বিবৃতি অগ্রাহ্য করিয়াছে বলিয়া এমেরি বিষয়টি নূতনভাবে সমাধানের জন্য বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি না প্রশ্ন করায় উত্তরে এমেরি 'না' বলিয়াছেন।

ভারতরক্ষা আইন।—গোয়ালন্দ, কলিকাতা, আখাউরা, ফেনি, গিরিডি প্রভৃতি নানা স্থানে প্রতাপ প্রবল।

৬ই সেপটেম্বর।—

করপোরেশন শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আহূত এক শ্রমিক সভায় কাল (শনিবার) হইতে ধর্মঘট প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। প্রকাশ, করপোরেশনের শ্রীযুক্ত মেয়র বৃহস্পতিবারে এক সভায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাহারা কাজে যোগদান করিলে কাহাকেও বরখাস্ত করা হইবে না এবং তাহাদের আবাস নির্মাণ জন্য ১৯৩৪ সালে বরাদ্দ ৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করাইবার চেষ্টা করিবেন।

করাচির সংবাদ—শক্কর জেলায় মুসলমানদের গুলিতে আরও একজন মুসলমান নিহত হইয়াছেন।

তমলুক হইতে প্রবল বন্যায় বহু গ্রামের জলমগ্ন হইবার সংবাদ আসিয়াছে। আরামবাগ মহাকুমারও নানা স্থানে বন্যা আসিয়াছে।

৭ সেপটেম্বর।—

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদকল্পে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শ্রীযুক্ত প্রমথরঞ্জন ঠাকুর সিলেক্ট কমিটির পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

নবদ্বীপের শ্রীরাসবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ একটি চক্ষু উৎপাটন করিয়া গুরুদেবের পাদমূলে অর্পণ করিয়াছেন।

দেশভক্ত পণ্ডিত স্বর্গত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সংঘের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত এন কে বসুর সভাপতিত্বে মহাবোধি সোসাইটি হলে এক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়াছে।

শ্রীমতী রাধাদেবী গোয়েঙ্কার সভানেতৃত্বে বড়বাজার সত্যনারায়ণ পার্কের নিকট এক নবগঠিত মণ্ডপে পর্দা নিবারক সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশন শুরু হইয়াছে।

৮ সেপটেম্বর।—

লখ্‌নৌএর সংবাদ—ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজিউদ্দিন পদার্থ বিদ্যায় নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

অদ্য সন্ধ্যায় এলাহাবাদের পুরুষোত্তমদাস টেণ্ডন পার্কে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল বলেন, 'মাত্র একটি পথই এখন দেখা যাইতেছে। তাহা সংগ্রামের পথ। হয়তো এই সংগ্রাম অতি প্রচণ্ড এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। আলোচনা চালাইবার আর সময় নাই।'

ব্রিটিশ লেবার পার্টির কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি ভারতবর্ষের সমস্যা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত এমোরের ডাক্ত এবং শ্রীযুক্ত চার্চিলের মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিয়া 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা উচিত। ভারতীয়েরা যদি অসন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহারা আজ হ'ক কাল হ'ক অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা দমননীতি ডাকিয়া আনিবে। আমরা দমননীতি চালাইলে জগতের নিকট আমরা নিজেদের যে অপকার করিব, তাহা একটা বড় যুদ্ধে পরাজয়ের তুল্য।'

৯ সেপ্টেম্বর।—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র জেলে অগ্নিমান্দ্য ও অনিদ্রায় ভুগিতেছেন। তাঁহার শরীরের ওজন ১৪ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে।

এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয় মানপত্রের উত্তরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় যদি এই পরীক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে প্রস্তুত না করিয়া থাকেন তো বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের শিক্ষা ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ।

বাঁকুড়ার সংবাদ—বাঁকুড়া কলেজের প্রিন্সিপাল বন্দে মাতরম্ সংগীতে আপত্তি করায় ছাত্ররা ১০ সেপ্টেম্বর হইতে ধর্মঘট আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১০ সেপ্টেম্বর।—

আজ ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তীর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত নাজিমুদ্দিন জানান যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে এখন মুক্তি দেওয়া হইবে না।

আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত ভি এন রাজনের এজলাসে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী আনীত মামলার শুনানি আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বসু আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

চার দিনের বিতর্কের পর গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিলের আলোচনা শেষ হইয়াছে। বিরোধী দলের বহু অনুরোধ-উপরোধ ও বিরোধিতা সত্ত্বেও গভর্নমেণ্ট ভোটের জোরে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাইবার প্রস্তাব পাস করাইয়া লইয়াছেন।

বাঙলার শ্রীযুক্ত গভর্নর বঙ্গীয় পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সংশোধন বিল এবং বঙ্গীয় রাজস্ব বিলে সম্মতি দান করিয়াছেন।
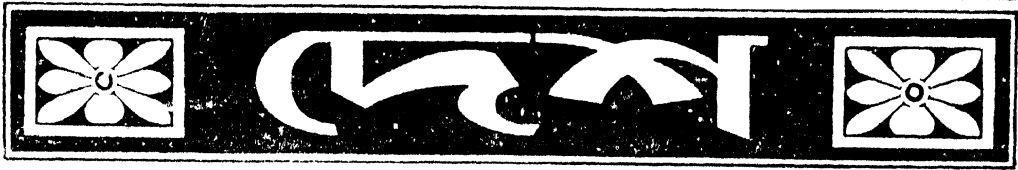
৭ম বর্ষ । শনিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৩৪৭ সাল, Saturday, 21st September, 1940 । ৪৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহাত্মাজীর নেতৃত্ব গ্রহণ—

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী পুনরায় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। মহাত্মাজীকে এই সুবিধা দান করিবার জন্য কংগ্রেসের দিল্লী ও পুণা সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করিতে হইয়াছে, অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় অহিংসার নীতিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির সুবিধার জন্য যুদ্ধ ব্যাপারে সশস্ত্র সাহায্য করিতে রাজী থাকিবার সিদ্ধান্ত কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছিল এবং যখন দেখা গেল যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের প্রস্তাবে রাজী হইলেন না, তখন সে শর্ত কংগ্রেস তুলিয়া লইয়া আবার পুরাপুরি অহিংস ও সর্বতোভাবে যুদ্ধ-বিরোধী হইয়া পড়িল। সুতরাং মহাত্মাজীর সঙ্গে আবার হইয়া গেল মনের মিল। মহাত্মাজী নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মহাত্মাজীর নেতৃত্ব গ্রহণ করাটাই এক্ষেত্রে বড় কথা নয়। যেখানে কাজ নাই সেখানে নেতৃত্বের কোন অর্থ থাকে না—দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী দল কাজের পথ বন্ধ করিয়া যখন হাত গুটাইয়াই ছিলেন, তখন নেতৃত্বের রদবদল বা নেতার ব্যক্তিত্ব বা কৃতিত্ব প্রভাবের কোন প্রশ্নই উঠে না। মহাত্মাজী নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন ভাল কথা; কিন্তু কাজ কিছু হইবে কি? না শুধু সার হইবে কথাবাজী? বোম্বাইয়ের বৈঠকের গৃহীত সঙ্কল্পে বড় বড় কথা অনেক আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাজের কোন নির্দেশই নাই এবং বোধ হয়, সেজন্য গরজও নাই। মহাত্মাজী যে সুদীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতেও কাজের কিছু আভাস পাওয়া কঠিন। তিনি বলেন, "বর্তমানে আমি কি করিব, তাহা আপনাদিগকে বলিতে পারি না। আমি নিজেই উহা অবগত নহি। আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, এরূপ এক ব্যক্তির উপর আপনারা নেতৃত্বভার অর্পণ করিতেছেন, যে নিজেই অন্ধকারে হাতড়াইতেছে। গৃহীত প্রস্তাবে আপোষের বহু অবকাশ রহিয়াছে। আমি এই প্রস্তাব লইয়া বড়লাটের নিকট যাইব এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব যে, বর্তমানের অবস্থায় কংগ্রেসের বিলোপসাধন করা হইবে কি না। আমি বড়লাটকে এ কথাও বলিব যে, অহিংস উপায়ে ভারতকে সমর প্রচেষ্টা হইতে বিরত রাখিবার জন্য আন্দোলন চালাইতে কংগ্রেসকে সুযোগ দান করা হউক।" যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মহাত্মাজী আইন-অমান্যে প্রবৃত্ত হইবেন না। মহাত্মাজীর মুখ্য লক্ষ্য তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে, যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার আন্দোলন অথবা প্যাসিফিস্ট নীতির প্রচার। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কি?

বিশ্বপ্রেমের বাঁধা বুলি—

প্রকৃত প্রস্তাবে বোম্বাইয়ে গৃহীত প্রস্তাবে আবার সেই বিশ্বপ্রেমের আধ্যাত্মিক বুলির আবৃত্তি দেখিতেছি। বোম্বাইয়ে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—"রাষ্ট্রীয় সমিতির নিঃসংশয় বিশ্বাস এই যে, পৃথিবীকে যদি আত্মবিনাশ হইতে এবং বর্বরতার মুখ হইতে ফিরাইয়া লইতে হয়, তাহা হইলে সমস্ত রাষ্ট্রের পক্ষে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ এবং নূতন ও অধিকতর ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। অতএব স্বাধীন ভারত নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিবে এবং নিজে এ বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে অগ্রণী হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।"

দেখা যাইতেছে, ভারতের পক্ষে কি প্রয়োজন, দক্ষিণী-পন্থী কংগ্রেসীরা সে বিষয়টি বড় মনে করেন না। তাঁহারা অনেক উচ্চস্তরের জীব, বিশ্বের জন্যই তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত এবং বিশ্ববাসীকে নিরস্ত্রীকরণের মন্ত্রে দীক্ষিত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অতি মহান্ সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশ্য লইয়া অনেক সাধ্যসাধনাই ত পূর্বে অনেক বড় বড় ব্যক্তিরা করিয়াছেন, আজ কংগ্রেস সেই বড় দলের ধ্বজা ধরিয়া তাঁহাদের অনুদ্‌যাপিত অসাধ্য সাধনের জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আমরা দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্টে পীড়িত ভারতবাসী, রাজনীতিক পরাধীনতার চাপে ওষ্ঠাগত প্রাণ ভারতবাসী, আমাদের গতি কি হইবে, আমরা ভাবিতেছি সেই কথা।

প্রস্তাবের মর্মার্থ—

বোম্বাইয়ের গৃহীত প্রস্তাবের মর্মার্থ আমরা যাহা বুঝিতেছি, তাহা এই যে, দিল্লী ও পুণা প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য ছিল আপোষ,—তাহার উপরে অন্য কিছু ছিল না। আপোষ যখন হইল না, বৃটিশ রাজনীতিকগণ নেহাৎই নির্দয় হইলেন, তখন আর দক্ষিণীদলের কর্তাদের বুদ্ধিতে কুলাইল না। তাঁহারা আবার মহাত্মাজীর আধ্যাত্মিকতার তত্ত্বরাজ্যে গিয়া আশ্রয় খুঁজিতে বাধ্য হইলেন। ফল হইবে কি? বড়লাটের সঙ্গে আবার কয়েক দফা দেখা-সাক্ষাৎ চলিবে, তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ টীকা ভাষ্য বিস্তার শুরু হইবে। কিন্তু এ পক্ষের কাজ হউক না হউক, ও পক্ষের কাজ চলিতেই থাকিবে। গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের বিলোপ চাহেন কি না, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বড়লাট কি উত্তর দিবেন, আমরা তাহা জানিতে ব্যস্ত নহি; কারণ কথার কি প্রয়োজন, কাজেই যেখানে প্রকাশ। কংগ্রেস-কর্মীদের উপর ভারতরক্ষা আইনের যত্রতত্র প্রয়োগের এমন প্রকোপ ভারতের সর্বত্র দেখিয়াও যাঁহারা এমন প্রশ্ন উত্থাপনের দরকার বোধ করেন, আমরা বলিব তাঁহারা জাগিয়া ঘুমাইতে চাহেন। কিন্তু এমন ঘুমে কাজ হাসিল হয় না—আমাদের মতে বোম্বাইয়ের সিদ্ধান্ত কাজের পথ দেখায় নাই।

বন্যাপীড়িতের সাহায্য—

মেদিনীপুর জেলার বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য একটি সাহায্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। উপর্যুপরি বন্যার প্লাবনে মেদিনীপুর, বিশেষভাবে কাঁথি মহকুমার কৃষকের দল ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। দুর্দশার কারণ দূর করিবার উপায় হইল প্লাবন যাহাতে না ঘটে এমন ব্যবস্থা করা; কিন্তু সে ব্যবস্থা করিবে কে? বাঙলা সরকারের চেষ্টা এ পর্যন্ত সফলতা লাভ করে নাই; কারণ এই যে, তেমন চেষ্টা সফল করিতে হইলে যেরূপ অর্থ ব্যবস্থা করা দরকার, বাঙলা সরকার তাহা করেন নাই; সুতরাং প্লাবন ঘটিবে, দুঃখ-দুর্দশাও লোক ভোগ করিবে। কিন্তু দেশের লোকের প্রতি প্রাণের টান যাহাদের আছে তাঁহারা এমন অবস্থায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। নিজের যদি দুই মুষ্টি অন্ন থাকে, তাহা হইলে এক মুষ্টি অন্ন দিয়াও নিরন্নের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। মানুষের দুঃখে কষ্টে যাহার প্রাণে এমন বেদনাবোধ না হয়, তাহাকে মানুষই বলা চলে না। মেদিনীপুরের অনাহারক্লিষ্ট জনগণের মুখে অন্ন জোগাইবার জন্য বাঙলাদেশের সর্বত্র মানবতা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠুক। দরিদ্রের মুখে অন্ন জোগাইয়া দেশবাসী মা আনন্দময়ীর আগমনে তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা করিয়া ধন্য হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পরলোকে ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী—

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর কবি ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ভুজঙ্গধর একজন প্রকৃত সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত গোধূলি, রাকা এবং গীতার কাব্যানুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটা স্বচ্ছ অনাবিল শুচিতার স্পর্শে তাঁহার কবিতাগুলি মাধুর্যলাভ করিয়াছে। বাঙলা সাহিত্যে কবি ভুজঙ্গধরের দান দীর্ঘকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পূজার বাজার—

পূজার বাজার আসিয়াছে। বস্ত্রশিল্প ভারতবর্ষের একটি প্রধান জাতীয় শিল্প। বাঙলা দেশে এই পূজার বাজারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা বেশী টাকার কাপড়ের কেনা বেচা হইয়া থাকে। আমরা বাঙালীকে বাঙলা দেশে প্রস্তুত কাপড় ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এই বাঙলা দেশের বস্ত্রশিল্প একদিন জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু পরাধীনতার অনিবার্য ফলে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে। বিদেশীর অনুগ্রহপুষ্ট বণিকদের প্রতিযোগিতায় বাঙলার সে শিল্প-গৌরব বিনষ্ট হয়। পরে বাঙলা দেশে জাগে স্বদেশী আন্দোলন। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উন্নতির মূলে বাঙালীর দান অনেকখানি রহিয়াছে। বোম্বাইয়ের কলগুলি মাথা তুলিয়া উঠে—বাঙলা দেশের সেই আন্দোলনে। ইহার অনেক পরে বাঙলা দেশে কয়েকটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙলা দেশে সামান্য যে কয়েকটি কল রহিয়াছে, সেগুলির প্রস্তুত অনেক মালও অবিক্রীত থাকিয়া যায়। অথচ বাঙলা দেশের এই সব কলের কাপড় অন্যান্য প্রদেশের কলের কাপড়ের তুলনায় কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে; কিংবা দামও বেশী নয়। বাঙলার এই জাতীয় শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে বাঙালীকে বাঙলা দেশে তৈয়ারী বস্ত্রের উপর জোর দিতে হইবে। বর্তমানের এই পূজার বাজারের সময়টাতেও শুধু বাঙালীরা বাঙলা উৎপাদিত বস্ত্র যদি ক্রয় করেন, তাহা হইলেও বাঙলার বস্ত্রশিল্প অনেকটা সংকট হইতে মুক্ত হইতে পারে। উহা ছাড়া

বাঙলা দেশের তাঁতের কাপড় তো আছেই। বাঙলা দেশের তাঁতের এবং বাঙলা দেশের কলের কাপড় বাঙালী এই প‌ূজার বাজারে ক্রয় করিয়া এই আর্থিক সংকটের দিনে বাঙলার টাকা বাঙলা দেশে রাখিতে সাহায্য করুন।

বাঙলায় সামরিক শিক্ষা—

১৮ বৎসর বয়স হইতে ২৫ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক বাঙালী যুবকদিগের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই দাবি করিয়া একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। বাঙলা সরকার প্রত্যক্ষভাবে এই আলোচনায় যোগদান করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের অন্তরঙ্গ কোয়ালিশনী দল ভোটের জোরে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করিয়া হক মন্ত্রিমণ্ডলীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। কোয়ালিশন দলের কর্ণে স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার নাজিমুদ্দিন যে মন্ত্র প্রদান করেন, তাহাতেই এই ফল ফলে একথা বলা যায়। স্যার নাজিমুদ্দীন বলেন, বর্তমানে সামরিক শিক্ষা পাওয়ার যে ব্যবস্থা আছে, বাঙালীরা তাহারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে না। ডাফরিন ট্রেনিং নৌবাহিনীতে বাঙালী যায় না, দেরাদুনের সামরিক কলেজে বাঙালী ঢুকে না, বিমান বাহিনীতে প্রবেশ করিবার জন্য বাঙালী যুবকদিগের আগ্রহ নাই ইত্যাদি। বাঙালী যুবকদের যদি এমন মনোবৃত্তি সত্যই হইয়া থকে, তাহা হইলে বাঙলার স্বরাষ্ট্রসচিবকে আমরা এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিব যে, তাহার কারণ কি? এ দেশের আমলাতন্ত্র বাঙলার তরুণদিগকে কেবল দাসসুলভ মনোবৃত্তিসম্পন্ন করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন এবং তরুণদের মনুষ্যোচিত সকল কর্মোদ্যমকে আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, বীরোচিত কাজে যেখানে বাঙালী যুবকেরা একটু উৎসাহ দেখাইয়াছে, গোয়েন্দা পুলিশের নজর পড়িয়াছে সেইখানেই। স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে সামরিক স্পৃহার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রহিয়াছে, অথচ বাঙলা দেশে সেই স্বদেশপ্রেম সর্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং এখনও গণ্য না হয়, এমন কথা বলা চলে না। স্বদেশপ্রেমের যে আবহাওয়ার মধ্যে সামরিক বলিষ্ঠ মনোবৃত্তির বিকাশ হয়, বাঙলা দেশে এখনও তাহা নাই। এমন অবস্থায় দোষ হইল কি বাঙলার যুবকদের? স্যার নাজিমুদ্দীন স্বীকার করিয়াছেন যে, সৈন্য বিভাগে প্রবেশ সম্পর্কে অতীতে বাঙালীদের প্রতি যেরূপ আচরণ করা হইয়াছে, তাহাতে বাঙলা সরকারও সন্তুষ্ট নহেন। খুবই ভাল কথা, কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইল এই যে, বাঙলার মন্ত্রীরা নিজেদের দিকে তাকাইয়া দেখুন আগে, বাঙালী যুবকদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম এবং বীরোচিত সাধনার বিরোধী যে মনোবৃত্তি আমলাতন্ত্র হইতে তাঁহারা পাইয়াছেন, তাহা হইতে নিজদিগকে মুক্ত করুন।

অহিংসার আদর্শ—

'অহিংসার আদর্শ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ষড় রিপুকে পরাজিত করিতে হইলে শুধু জীবে দয়া করিলে চলিবে না। এমন একটি লোক যদি পাওয়া যায়, যিনি সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, যিনি প্রত্যেকের প্রতি প্রেম ও কল্যাণ কামনা করেন, যিনি প্রত্যেক কর্মে শুধু প্রেমধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, এমন ব্যক্তি যদি সংসারীও হন, তবুও অন্ততঃপক্ষে আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিব। অপরপক্ষে যদি এমন কেহ থাকেন, যিনি জীবে দয়ার আদর্শ অনুসরণ করেন, অর্থাৎ কীট-পতঙ্গ পিপীলিকাকে খাদ্যদানে পরিতৃপ্ত করেন এবং জীব হত্যা করেন না অথচ হৃদয়ে কাম ক্রোধে পরিপূর্ণ, এমন ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করিবার মত কোন কারণই আমি দেখি না। ইহারা আধ্যাত্মিকতা বিগর্হিত একটি আদর্শের যান্ত্রিক অনুধাবন মাত্র। ইহা আরও গর্হিত। অন্তরের কলঙ্ক প্রচ্ছন্ন করিবার ইহা একটি কপটতার ছদ্মাবরণ মাত্র।" অহিংসার উচ্চতম আদর্শ যে বস্তু তাহা কোন নীতি নহে, সুতরাং রাজনীতিক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য মনুষ্যত্বের যে প্রেরণা রাজনীতির তাহাই প্রাণ। কায়মনোবাক্যে অহিংসার আধ্যাত্মিকতার ভণ্ডামির চেয়ে এই মনুষ্যত্বপ্রণোদিত কর্মময় সাধনার মর্যাদা আমরা অনেক বেশী বলিয়াই মনে করি।

বড়লাট-গান্ধী সাক্ষাৎকার—

'হিন্দু' পত্রের বোম্বাইস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়া বড়লাটের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্রের উত্তর আসিয়াছে এবং বড়লাট গান্ধীজীকে জানাইয়াছেন যে, তিনি যে সময়ে সাক্ষাৎ করিতে চাহিবেন, সেই সময়েই বড়লাট তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। ইহার পর ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে মহাত্মাজী বড়লাটকে তাহা জানাইয়া আর একখানা পত্র লিখিয়াছেন এবং সকলেরই বিশ্বাস যে আগামী সপ্তাহের প্রথম ভাগেই বড়লাট-গান্ধী সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইবে। যুক্তপ্রদেশের গভর্নর স্যার মরিস হ্যালেট সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় নাকি বলেন যে, 'এই সংকটের সময়ে যাহারা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে নহে, তাহাদিগকে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিপক্ষ বলিয়াই ধরা হইবে এবং তাহাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করা হইবে।' মহাত্মাজী বড়লাটের নিকট জানিতে চাহিয়াছেন যে, বড়লাটও ঐ মত পোষণ করেন কি না। অন্তরঙ্গ-তত্ত্বগত এই সব আলোচনা আমরা অবান্তর বলিয়াই মনে করি। বৃটিশজাতির স্বার্থ বৃটিশ জাতি চিরকালই দেখিয়াছে এবং এখনও দেখিবে, ভারত সম্পর্কিত তাহাদের নীতি সম্বন্ধে কোনরূপ ভাববিলাসের স্থান এ পর্যন্ত কোনদিন হয় নাই, এখনও হইবে না।

আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক তত্ত্ব—

স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ দার্শনিক পুরুষ। তিনি সম্প্রতি ইন্দো-পোলিশ এসোসিয়েশনের বক্তৃতায় বলেন,—"পোল্যান্ডের ভূমিটা বিজিত হইলেও পোল্যান্ডের সংস্কৃতিটা নষ্ট হয় নাই। এক দেশ অপর দেশের ভূমিখণ্ড জয় করিতে পারে সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া উহার সংগে সংগে ঐ দেশের আধ্যাত্মিক সম্পদ ও সংস্কৃতিটাও যে বিজিত হইবে, এমন কোন কথা নহে। ভারতবর্ষ তো বহু বহির্বিজয় অভিযানের মাঝ দিয়া চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তজ্জন্য তাহার আধ্যাত্মিক সম্পদ সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই।" রবীন্দ্রনাথও এসোসিয়েশনকে এমনই আশার বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রেরিত বাণীতে বলেন,—"জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণ দ্বারা ইউরোপ দীর্ঘ প্রত্যাশিত সংগ্রামে ব্যাপৃত হওয়ার পর এক বৎসর অতীত হইয়াছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, এরূপ দেশ নাই বলিলেই চলে। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সর্বাপেক্ষা নিরাশ্রয় ও সর্বাপেক্ষা নিরীহ দেশ সর্বাপেক্ষা নিরাশ্রয় ও সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্টভোগ করিতেছে। যুদ্ধের পর তাহাদের অবস্থা যুদ্ধের সময়ের অপেক্ষাও শোচনীয় হইতে পারে। তাহারা ইহা জানিয়া সান্ত্বনা লাভ করুক যে, তাহারা সম্পূর্ণ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায় নাই।" জীবন্ত জাতির পক্ষে এই সব আত্মিক তত্ত্বার্থগত সান্ত্বনা কতটা কার্যকর হইবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ভারতবর্ষ যেদিন অত্যাচারিতকে রক্ষা করিবার জন্য নিজে শক্তিপ্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে, শুধু কথায় নয় কাজে, সেইদিন তাহার মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষিত হইবে। আধিভৌতিক হিসাবে পরাধীন ভারতের যে আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা স্যর রাধাকৃষ্ণণ্ বলিয়াছেন, সেই আধ্যাত্মিক সম্পদ যতদিন পর্যন্ত কর্মে প্রবর্তিত করিবার যোগ্যতা ভারতের না হইতেছে, ততদিন উহার প্রকৃত মূল্য নাই। আধিভৌতিক পরাধীনতা এই দিক হইতে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিকে নষ্ট করিয়া থাকে। আধিভৌতিক স্বাধীনতা যে জাতির নাই, সে জাতির আধ্যাত্মিকতা অকেজো; কারণ আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ এবং তাহার সার্থকতা হইতেছে সেবার ভিতর দিয়া। বিশ্বের সেবায় ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি সার্থকতা লাভ করিবে সেদিন—যেদিন ভারত পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিতে সক্ষম হইবে।

জার্মানির সন্ধির প্রস্তাব—

মিঃ মেনজিস্ কে আমরা জানি না। তিনি অস্ট্রেলিয়া হইতে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, জার্মানি পনেরো দিনের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব করিবে; কিন্তু তিনি এই আশা করেন যে, নাৎসী উপদ্রবের গোড়া উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজ কোন প্রস্তাবই গ্রাহ্য করিবে না। এদিকে কিন্তু ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী বলিতেছেন,—"জার্মানি ইংলন্ড এবং আয়র্লন্ডে হানা দিবার জন্য সাজসজ্জা করিয়া রহিয়াছে এবং সুযোগ পাইবামাত্র সে আক্রমণ করিবে; সুতরাং আমাদিগকে সদা-সর্বদার জন্য হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে।" হিটলার এখন নিজের গর্বে উদ্দীপ্ত হইয়া আছেন। নাৎসী উপদ্রব উৎখাত করিয়া তাঁহার সংগে যদি সন্ধি করিতে হয়, তবে নাৎসীদিগকে কাবু করিতে হইবে, সুতরাং শান্তির দেরি এখনও অনেক। আমাদের ইহাই বিশ্বাস।

পরলোকে সূর্যকুমার সোম—

গত ২রা আশ্বিন, বুধবার ময়মনসিংহের অন্যতম জননায়ক সূর্যকুমার সোম মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। সোম মহাশয় একজন খ্যাতনামা আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি গত ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন। তিনি আজীবন কংগ্রেসের সেবা করিয়াছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক, দেশের জন্য তিনি বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলা দেশ একজন নিষ্ঠাবান দেশকর্মীকে হারাইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই চেষ্টায় তাহার সাফল্য লাভ ঘটিয়াছে বলা যায় না। লিবিয়ার আরব অধিবাসীদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চোখের সম্মুখে থাকিতে ইটালির প্রতি আরব জাতির স্বাভাবিক প্রীতি জন্মিবে ইহা অস্বাভাবিক। তবে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর ইটালি সামরিক শক্তিতে আরব জাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবে এই স্পর্ধা করিতেছে। সম্প্রতি এই সংবাদ আসিয়াছে যে, সিরিয়াতে একদল ইতালীয় প্রতিনিধিদল পৌঁছিয়াছেন। ইঁহারা সিরিয়াস্থ সমগ্র ফরাসী বাহিনীর আত্মসমর্পণ কিংবা নিরস্ত্রীকরণ দাবী করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা বলিতেছেন যে, সিরিয়াতে ইটালিয়ানেরা অবিলম্বে কতকগুলি সামরিক ঘাঁটি বসাইবে। সিরিয়াতে ফরাসীদের এক লক্ষ হইতে দেড় লক্ষ সেনা আছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, সিরিয়ার ফরাসী কর্তৃপক্ষ ইটালির এই দাবী মানিয়া লইবে। পূর্বে তাহারা এই দাবী অস্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু পরে জেনারেল ওয়েগাঁ গিয়া সিরিয়ার কর্তাদিগকে পেত্যাঁ গভর্নমেণ্টের অনুকূলে আনয়ন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, পেত্যাঁ গভর্নমেণ্ট জার্মানদের মর্জি মতই চলিতেছেন। সিরিয়াতে মুসোলিনির দলের এই চেষ্টা যদি সফল হয়, তাহা হইলে ইংরেজের পক্ষে বিশেষ আতঙ্কের কারণ ঘটিবে, প্যালেস্টাইনের নিরাপত্তার বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে। শুধু তাহাই নহে, লোহিত সাগর এবং ভূমধ্যসাগরের মুখে ইটালি জোর বাড়াইতে সুবিধা পাইবে।

ভূমধ্যসাগরের সমস্যার সঙ্গে আরব সমস্যা বিজড়িত রহিয়াছে। এই সমস্যার সঙ্গে স্পেনও আসিয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া গত জুলাই মাসের 'ফরেন এফেয়ার্স' পত্রে মঁসিয়ে চার্লস আদ্রে জুলিয়ে লিখিয়াছেন—'ভূমধ্যসাগরের তটে আরব জাতির সমস্যা উত্তরোত্তর ব্যাপক আকার ধারণ করিবে। শুধু ফরাসী কিংবা ইংরেজই নয়, ইটালি এবং স্পেনও আরব জগতের রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ট-ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। স্পেনের কথাই ধরুন। জেনারেল বিগবেদার যখন স্পেন অধিকৃত মরক্কোর হাই কমিশনার ছিলেন, তখন তিনি ফ্রাঙ্কোর পক্ষ লইয়া লড়াই করিবার জন্য মরক্কো হইতে সেনাদল সংগ্রহ করেন। তিনি ফরাসী এলাকার মধ্যেও অসন্তোষ ছড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখন তিনিই ফ্রাঙ্কোর পররাষ্ট্র সচিব। সুতরাং খুব সম্ভব এখন তিনি জার্মানি এবং ইটালির পক্ষে তাঁহার নীতিকে সম্প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিবেন।" এমন চেষ্টা যে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পক্ষ হইতে চলিতেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। প্রধানত ইটালি এবং জার্মানির জোরেই জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের সাধারণতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং বরাবরই তিনি জার্মানি ও ইটালির পক্ষে। গত জুন মাসে স্পেনের সামরিকদের একটি কমিশন ইটালি এবং জার্মানিতে গমন করে; সম্প্রতি এই মর্মে খবর আসিয়াছে যে, জেনারেল ফ্রাঙ্কো এবং স্পেনের স্বরাষ্ট্রসচিব জার্মান গভর্নমেণ্ট কর্তৃক সম্মিলনে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। মতলব কি? স্পেনের উপকূলভাগে জার্মানির ঘাঁটি বসানই উদ্দেশ্য, না জিব্রাল্টার আক্রমণের জন্য জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে প্ররোচিত করাই এই আমন্ত্রণের মূলে রহিয়াছে।

ভূমধ্যসাগরতটে এবং সিরিয়ায় ইটালির এই কর্মতৎপরতা তুরস্কের পক্ষে নিশ্চয়ই সুবিধাজনক নহে। সিরিয়া যদি স্বাধীনতা লাভ করিত, তুরস্কের আশঙ্কার কারণ ছিল না; কিন্তু সিরিয়া যদি ইটালির কব্জার ভিতরে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে তুরস্কের আতঙ্কের কারণ রহিয়াছে। কারণ ইটালি কিংবা জার্মানি কোন জাতির স্বাধীনতার ধার ধারে না, তাহারা চায় নিজেদের প্রভুত্ব। ইটালি যদি সিরিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আরব জাতির সংহতির সমগ্র প্রচেষ্টা নষ্ট পাইবে। ইটালির এই নূতন চালে তুরস্ক কিরূপ মতিগতি অবলম্বন করিবে, ইহা দেখিবার বিষয়।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, শুধু ইউরোপে উত্তর মহাসাগর কিংবা আটলাণ্টিক সাগরের উপকূলভাগেই নয়, ভূমধ্যসাগরের উপরে সমরাশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই মেঘ পশ্চিম এসিয়ার আকাশ বাতাসকে আচ্ছন্ন করিবার উপক্রম করিয়াছে; ভারতবর্ষও এখন আর নির্লিপ্ত নাই। পশ্চিম আকাশের মেঘ এসিয়ার কোণ পর্যন্ত ঘনাইয়াছে, ওদিকে পূর্বদিকেও কোন্ মুহূর্তে প্রলয়ের গর্জন উঠিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? আমেরিকার সঙ্গে ইংরেজের নৌ-চুক্তির প্রতিক্রিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে ফুটিয়া উঠিতে পারে, একটুও অসম্ভব নয়।

অতৃপ্তি

শ্রীশর্মিষ্ঠা সরকার

সব কিছু দিয়েছিনু তবু ছিল বাকি
সে মোর দেওয়ার নেশা তারে কোথা রাখি?
দিয়েছিনু হাসি গান,
বেদনা ও অভিমান
দখিন হাতেতে তব বেঁধেছিনু রাখি।

বাঁধনে বাঁধি নি প্রিয় রচি নি পথের বাধা
গাহিনু সে মধু গান ছিল যা কণ্ঠে সাধা
স্মৃতি-ভরা ফাল্গুনে
গিয়েছিনু কাল গুনে
অ-দেওয়া আভাস দিনু হৃদয়ে আঁকি।

বড়লাটের ঘোষণায়

রেজাউল করীম এম এ বি এল

কিছুদিন পূর্বে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা লইয়া দেশের চারিদিকে হই-চই পড়িয়া গিয়াছে। লাট সাহেবের বক্তৃতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভারতসচিব মিঃ এমেরি যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহা আরও নিরাশাব্যঞ্জক। ইঁহাদের কাহারও উক্তির মধ্যে ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার ক্ষীণতম অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় নাই, কংগ্রেসের কথা বাদই না হয় দিলাম। কিন্তু মডারেটগণ যাঁহারা বড় কর্তাদের কথার উপর "জী হুজুর" ব্যতীত অন্য কোনও বাক্য উচ্চারণ করেন না, তাঁহারাও হতাশ হইয়াছেন। কিন্তু একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহা আট কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া দাবি করে সেই মুসলিম লীগ আজ লাট সাহেবের বক্তৃতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। আশায় আনন্দে অধীর হইয়া বেসামাল হইয়া গিয়াছে। লাটসাহেব না কি মুসলিম লীগের সমস্ত দাবি স্বীকার করিয়াছেন। তবে আর যায় কোথায়? লাগিয়া যাও মুসলিম উদ্ধার কার্যে! হিন্দুরা মুসলমানকে কোণঠাসা করিতে চায়, কংগ্রেস মুসলমানকে পদানত করিয়া রাখিতে চায়—এই দুঃসময়ে ব্রিটিশ সরকার দয়া-পরবশ হইয়া মুসলমানের দাবি স্বীকার করিয়া লইতেছেন। সুতরাং মুসলমানের পক্ষ হইতে অসহযোগের কোনও কথাই উঠিতে পারে না। সম্প্রতি লাটসাহেবের প্রস্তাব আলোচনা করিবার জন্য মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতির একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। লীগওয়ালারা পরম সন্তোষ সহকারে ঘোষণা করিতেছেন যে, লাটসাহেব তাঁহাদের দাবি মানিয়া লইয়াছেন, লাটসাহেব নাকি বলিয়াছেন যে, মুসলিম লীগের অনুমতি না লইয়া ব্রিটিশ সরকার ভবিষ্যতে কোনও শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন না। তবে তাঁহার বক্তৃতার দু-এক স্থানে শব্দের একটু মারপেঁচ রহিয়া গিয়াছে, পরস্পর আলোচনার পর তাহাও পরিষ্কার হইয়া যাইবে। তখন ব্রিটিশ সরকার যাহা দিতে চান, আর মুসলিম লীগ যাহা পাইতে চায়—এই দুইএর মধ্যে আর কোনও পার্থক্য থাকিবে না। সংগ্রাম নাই, রক্তপাত নাই, বাদ প্রতিবাদ নাই, এমন কি সামান্য একটু আন্দোলন নাই অথচ অনায়াসে দাবি স্বীকৃত হওয়ার এমন দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। যে মহাপুরুষের বুদ্ধির জোরে এমন দুর্লভ রত্ন লাভ হইল সেই মহাত্মা জিন্নাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করা যাক। জগতে ধাপ্পার রাজত্ব আর কতদিন চলিবে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ভারতের বুকে প্রকাশ্য রাজপথে আজিও যে ধাপ্পাবাজি সমান বেগে চলিতেছে তাহার উদাহরণ আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাহা না হইলে লাট সাহেবের ঘোষণার মধ্যে মুসলিম লীগের দাবি স্বীকারের আভাস পাওয়া যাইত না। লাটসাহেব সরল, স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যে কথা বলিয়াছেন তাহা ভাল হইতে পারে মন্দ হইতে পারে, বিবেচনার যোগ্য হইতে পারে অযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মুসলিম লীগের দাবি কেমন করিয়া স্বীকৃত হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

প্রথমে দেখিতে হইবে মুসলিম লীগ কি চাহিয়াছিল আর বড়লাট বাহাদুর কি দিতে চাহিয়াছেন। তাহা হইলে লীগ নেতাদের সজ্ঞান আত্মপ্রবঞ্চনার দিকটা প্রকটিত হইয়া পড়িবে। লীগের বিবিধ দাবির মধ্যে দুইটি দাবি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাহার সহিত সমগ্র ভারতের ইণ্টারিনষ্ট ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রথম দাবি হইতেছে ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্র রচনা করিতে হইলে মুসলিম লীগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনও আইন পরিবর্তন করা চলিবে না। আর দ্বিতীয় দাবি হইতেছে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু বড়লাট বাহাদুর তাঁহার অমূল্য ঘোষণায় লীগের কোন দাবিই স্বীকার করেন নাই। তিনি ও ভারতসচিব পুনঃ-পুন ভারতের জাতীয়তার কথা গালভরা ভাষায় উচ্চারণ করিয়া লীগের পাকিস্থানের দাবির প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপই করিয়াছেন। তাঁহাদের বিভিন্ন উক্তি হইতে এমন একটা অক্ষরও পাওয়া যাইবে না যাহার দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে যে, ব্রিটিশ সরকার পাকিস্থানের দাবি সমর্থন করেন। তবে লীগের সব দাবি মানিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া এত হইচই করিবার কি দরকার ছিল? মুসলমান সমাজকে প্রতারণা করা ব্যতীত ইহার কোনওরূপে সার্থকতা নাই। এইবার মাইনরিটিদের দাবির কথা আলোচনা করা যাক। বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে, দেশের এক শ্রেণীর লোক যদি ভবিষ্যতের শাসনতন্ত্রের কোনও ধারা অগ্রাহ্য করে তবে তাহাদিগকে চটাইয়া সরকার কোনও পরিবর্তন আনয়ন করিবেন না। অর্থাৎ শাসনতন্ত্র রচনার সময় দেশের বিবিধ দলের সর্ববাদিসম্মত প্রস্তাবগুলিই গৃহীত হইবে। সকলে একমত না হইলে কোনও প্রস্তাবই গ্রহণ করা চলিবে না। সত্য বটে এই প্রস্তাব দ্বারা লাটসাহেব মেজরিটিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা মুসলিম লীগের দাবি কেমন করিয়া স্বীকৃত হইল? লীগের মতই গ্রহণ করিবেন এমন কোনও কথা তো তিনি বলেন নাই। লীগের মত যদি অন্য সকল দলের মতের সহিত এক হয় তবেই তাহা গ্রহণ করা চলিবে। কিন্তু লীগের মত যদি অন্য কোনও ক্ষুদ্রদলের মতের সহিত না মিলে বড়লাট ঘোষণার দ্বারা জানাইয়াছেন তাহা হইলে লীগের মত চলিবে না। কারণ বড়লাট হইতেছেন মাইনরিটিদের ন্যাসরক্ষক। লীগ ব্যতীত আরও তো মাইনরিটি আছে, তাহাদেরকে কেমন করিয়া ফেলিবেন? মুসলিম মাইনরিটিদেরকে অগ্রগণ্য করিবেন, এমন কথা বড়লাট বলেন নাই। বিভিন্ন মাইনরিটিদের স্বার্থের মধ্যে সংঘাত হইলে সেখানে কাহারও মত গ্রহণ করা হইবে না, ইহাই হইল লাট সাহেবের ঘোষণার সার কথা। এই ঘোষণার পর লীগের দর্পচূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। কারণ লাটসাহেব প্রকৃত প্রস্তাবে লীগের কোনও প্রস্তাবই স্বীকার করেন নাই। অন্যান্য মাইনরিটি যদি পাকিস্থান গঠনে বাধা দেয় তাহা হইলে বড়লাট বা ভারতসচিব তাহা অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইবেন। মুসলমানের অন্যান্য দাবি সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। সেগুলির জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মতির প্রয়োজন। সরাসরি বড়লাট বা ভারতসচিবের প্রতিশ্রুতিতে তাহা পাইবেন না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে লীগের প্রত্যেক দাবি পূরণের জন্য এদেশেরই লোকের সম্মতি ভিক্ষা করিতে হইবে। নতুবা কোনও দাবি গৃহীত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে লাট সাহেবের ঘোষণা দেখিয়া উৎফুল্ল হইবার কি আছে? শেষ পর্যন্ত যদি দেশের লোকের সম্মতিরই দরকার হয় তাহা হইলে তাহার জন্য আগে হইতে ব্রিটিশ সরকারের দুয়ারে ধরনা দিবার কি দরকার ছিল? আজ মুসলিম লীগ সমাজকে লইয়া যে আত্ম প্রবঞ্চনা আরম্ভ করিয়াছে তাহার শেষ পরিণতি হইতেছে মুসলমানের মনের দাসত্ব। এই মনের দাসত্ব হইতে উদ্ধার না পাইলে মুসলমানের কোনও কল্যাণ হইবে না।

গোধূলি রাগ

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীতারাপদ রাহা

৭

কুমারেশের আমন্ত্রণে শকুন্তলা আবার 'অবসান'এ আসিয়াছে; সঙ্গে আসিয়াছে অবলাশ্রমের একটি ছোট মেয়ে। মেয়েটি ভারতীর সমবয়সী, সম্প্রতি মাতৃহারা হইয়াছে সেইজন্য শকুন্তলার স্নেহ একটু বেশী মাত্রায় লাভ করিয়াছে। অবলাশ্রমে একটি কাজ সারিয়া আসিবার সময় মেয়েটি তাহার সঙ্গ লইয়াছে। আশ্রমের সেক্রেটারির সঙ্গে শকুন্তলার কথাবার্তায় যখন সে শুনিয়াছে, শকুন্তলাদিদি এক বাড়িতে গান গাহিতে যাইতেছেন, তখন হইতে সে আর তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় নাই। মেয়েটির আকৃতি প্রকৃতি রুচি সবই সুন্দর। এ মেয়ে কোনওরূপেই কুমারেশের বিরক্তি উৎপাদন করিবে না জানিয়াই শকুন্তলা সঙ্গে আনিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নাই।

মেয়েটিকে দেখিয়াই কুমারেশ খুশী হইলেন,—বেশ মেয়েটি তো, কার?

শকুন্তলা মেয়েটির পরিচয় দিলেন—নাম ওর শোভা।

মেয়েটির পরিচয় শুনিয়া কুমারেশ শকুন্তলার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, হয়তো তাহার নূতন নেশার কাজটার মানসিক অনুমোদন করিলেন, হয়তো তাহার হৃদয়ের উচ্চতা দেখিয়া তাহাকে নূতন করিয়া আরও সুন্দর দেখিলেন।

শোভার সহিত ভারতীর ভাব হইতে একটুও দেরি হইল না, পাঁচ মিনিট পরেই মনে হইল তাহারা যেন কত দিনের পরিচিত। ভারতী ঘুরিয়া ঘুরিয়া শোভাকে কত-কি দেখাইতে লাগিল। তাহাদের লাইব্রেরি, ছবি, কাকাতুয়া, ফুলের বাগান; তাহাদের অর্গান, যে অর্গানে বসিয়া কুন্তলাদি এখনই গান গাহিবেন।

—কুন্তলাদি? বা রে, কুন্তলা আবার কার নাম?

—কেন এই যে, যাঁর সঙ্গে তুমি এলে!

—উনি তো শকুন্তলাদি।

ভারতী মুরুব্বীয়ানার সুরে বলিল—হ্যাঁ আমরা ওকেই কুন্তলাদি বলি; নাম রেখেছে কাকাতুয়া।

—বা রে! শোভার বিস্ময় আর কাটিতে চাহে না! বিস্ময় কাটিলে শোভা ভারতীকে বলিল—গান শুনেছ ওর?

ভারতী বলিল—না, আজ তো শুনব।

—কি সুন্দর গান ভাই, শুনলে ম'রে যেতে ইচ্ছা করে। আমাদের আশ্রমে ওর নাম রেখেছে—নাইটিঙ্গেল। নাইটিঙ্গেল জান তো? বিলেতের একরকম পাখি; নিঝুম রাতে গান গায়, শুনলে ম'রে যেতে ইচ্ছা করে।

ভারতী হাসিতেছে।

—হাসছ কেন?

—তুমি বারে বারে 'ম'রে যেতে ইচ্ছে করে' বলছ কেন?

শোভা গোপন কথা বলার মত অনুচ্চ স্বরে বলিল—কোনও সুর শুনলেই আমার ম'রে যেতে ইচ্ছা করে।

ভারতী বলিল—ও বুঝেছি তা'লে তুমি কবি?

শোভা বিশেষ গম্ভীর হইয়া কি যেন ভাবিল, তার পর বলিল—না কবি না, কবি হ'তে চাই না আমি, আমি নাচব। নাচবে তুমি? উদয়শংকরের নাচ দেখেছ?

ভারতী বলিল—না।

কি সুন্দর নাচেন ভাই, দেখলেই ম'রে যেতে ইচ্ছা করে। সমীরকাকা একবার মাকে আর আমাকে দেখিয়ে এনেছিলেন।

ভারতী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—কি, হাসছ কেন?

সবতাতেই তোমার ম'রে যেতে ইচ্ছা করে—নাচ দেখেও, তুমি আগে তো বললে গান শুনে!

শোভা যেন একটু অপ্রতিভ হইল।—কিন্তু কি সুন্দর লাগে, জান?

কত সুন্দর লাগে তাহা ভাল করিয়া না বুঝাইতে পারিয়া সে ভারতীকে বলিল, নাচবে তুমি—শকুন্তলাদিদি যখন গান গাইবেন?

ভারতী মুখ আঁধার করিয়া বলিল—আমি জানিনা তো ভাই, কোনও দিন নাচি নি আমি।

—আচ্ছা আমি তোমায় শিখিয়ে দেব, দেখো শকুন্তলা-দিদির গান শুনলেই আপনা থেকে নাচ এসে যাবে।

ভারতী যেন সমস্ত বুঝিয়া ফেলিয়াছে এমনভাবে বলিল—আচ্ছা।

বারান্দায় যেখানে চা খাওয়া হইবে সেখানে কুমারেশ ও শকুন্তলা বসিয়া কি যেন আলোচনা করিয়া চলিয়াছেন। শোভা কুমারেশের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—উনি তোমার দাদু, না?

—হ্যাঁ।

—কি সুন্দর দেখতে! এত সুন্দর বুড়োমানুষ ভাই আমি কোনওদিন দেখি নি।

ভারতী শোভার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আঙুল দিয়ে দেখিও না, দাদু দেখলে রাগ করবেন।

বারান্দায় টেবিলে দেবপ্রসাদ চাএর সরঞ্জাম রাখিয়া গেল। ভারতী ও শোভা উল্লসিত হইয়া উঠিল। এইবার চা, তার পর গান।

কুমারেশ তাহাদের ডাকিলেন। যাইবার সময় শোভা ভারতীর কানে মুখ রাখিয়া বলিল—তা'লে ভাই কথা রইল, গানের সময় তুমি নাচবে কিন্তু আমার সঙ্গে।

মাথা নাড়িয়া ভারতী সম্মতি জানাইল।

আনন্দে শোভা নৃত্যের ছন্দে ছুটিয়া যাইতেছিল ভারতী তাহার হাত ধরিয়া বলিল—নাচ এখনই শুরু করলে নাকি?

শোভা ভারতীর হাতে একটু চাপ দিয়া হাসিল।

চাএর পরে শকুন্তলার গান আরম্ভ হইল। একখানা ইজি চেয়ারে কুমারেশ তাহার শীর্ণ অঙ্গ এলাইয়া দিলেন, শকুন্তলা অর্গানে গিয়া বসিলেন। শোভা ভারতীকে লইয়া নাচিবার জন্য পাশের ঘরে গেল।

শকুন্তলা প্রথমে গাহিল একটা ভীমপলশ্রী।—ফাগুনে আবার বর্ষ পরে কেন আমাকে জ্বালাইতে আসিয়াছে—গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত কাটাইয়াছি কিন্তু এ মধুমাস বুঝি আর কাটিতে চাহে না—মলয় কত দেশ দেশান্তরের উপর দিয়া বহিয়া আসিল, কিন্তু আমার বঁধু কবে আসিবে সে কথা তো বলিল না—সখী, আর আমি কিসের জন্য প্রাণ ধরিব বল!

শকুন্তলার অপূর্ব কণ্ঠস্বরে রাগিণী প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল, কুমারেশ তন্ময় হইয়া শুনিলেন। শোভা ও ভারতী পাশের ঘরে গানের তালে তালে অঙ্গ দোলাইয়া নাচিতেছে, নৃত্যেও বেদনার মূর্ছনা। ভারতী নাচিতে শিখিল কবে?

সংগীতের দিব্য উন্মাদনার মাঝে কুমারেশ উপলব্ধি করিলেন প্রকৃতি যখন নূতন সজ্জায় সাজে, চারিদিকে যখন মাধুর্যের সমারোহ—মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি তখন ব্যর্থতার বেদনায় আর্তনাদ করিয়া ওঠে।—মনোবিদ্যার law of contrast।

এই গানের ভিতরে শকুন্তলার নিজের জীবনের কোনও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকিতে পারে কি না সেকথা না ভাবিয়াই কুমারেশ বলিলেন—থেমো না, আর একখানা গাও—পূরিয়া।

শকুন্তলা আবার গান ধরিল।—

আমার মা, আমার জীবনের আলো ফুরাইয়া আসিয়াছে, চারিদিকে কেবল আঁধার দেখিতেছি। এইবার বুঝি, আঁধার বরণী মা, তোমার আসার সময় হইয়াছে। চন্দ্র তপন তারকা ডুবিয়া গেল, আমার হৃদয় হইতে প্রীতির জোছনা হারাইয়া গেল, এইবার তোমার নিবিড় আঁধারের মাঝে আমার সত্তাকে মিশাইয়া লও।

পূরিয়ার সুরে কুমারেশের মন উদাস হইয়া উঠিল। শোভা ও ভারতী তখন নাচিয়া চলিয়াছে—নৃত্যের মাঝে যেন হংসের মৃত্যু-সংগীতের ছন্দ। কুমারেশের মনে হইতেছিল, মৃত্যু কি এইরূপে আসে না—এমনি সংগীত নৃত্য সৌন্দর্যের মাঝ দিয়া? গান যেমন একটা সুসংগত লয়ে গিয়া শেষ হয়—নৃত্য যেমন সৌন্দর্যের কম্পন তুলিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়, যেমন করিয়া কবি তাহার কবিতার উপসংহার লেখেন তেমনি করিয়া কি আমাদের জীবনের অবসান হয় না?

দিন শেষ হইয়া আসিয়াছিল। শকুন্তলা ধ্যানমগ্ন কুমারেশের দিকে একবার তাকাইয়া অর্গানে দুই হাতে সুরের তরঙ্গ তুলিয়া গাহিল—

দিন অবসান হ'ল
মোর নয়ন হ'তে অস্ত-রবির আলোর আড়াল তোল।
অন্ধকারের বুকের মাঝে
নিত্য আলোর আসন রাজে
সেথায় তোমার হৃদয়খানি খোল।
স্তব্ধ তোমার হৃদয় মাঝে
যেই বাণীটি আপনি বাজে
সে বাণীটি আমার কানে ব'লো॥

গানের শেষে শোভা ও ভারতী ক্লান্ত হইয়া কুমারেশের পাশে আসিয়া বসিল। অর্গানের সামনের রিভলভিং টুল ঘুরাইয়া শকুন্তলা রুমালে মুখের ঘাম মুছিল। পশ্চিম আকাশে কে যেন একরাশ আবির ছড়াইয়া দিয়াছে, অদূরে কৃষ্ণচূড়া গাছ লাল ফুলে একেবারে ছাইয়া গিয়াছে। কুমারেশের অজ্ঞাতে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। কিছুক্ষণ কেহই কোনও কথা কহিতে পারিলেন না।

শোভা ও ভারতীর ফিসফিস করিয়া কথা বলা আরম্ভ হইলে কুমারেশ মৌন ভঙ্গ করিয়া শকুন্তলার দিকে চাহিয়া বলিলেন—আজ আমার আয়ু অন্তত এক বৎসর বেড়ে গেল।

শকুন্তলা সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল—আপনাকে একটুও আনন্দ দিতে পেরেছি, এই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

কুমারেশও কেমন করিয়া যেন হাসিলেন।—তুমি ইচ্ছা করলে এ আনন্দ আমাকে কিছুকাল দিতে পার কুন্তলা।

শকুন্তলা জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল।

প্রথমে একটু বাধোবাধো লাগিতেছিল, কিন্তু কুমারেশ চেষ্টা করিয়া সহজ হইয়া বলিলেন—ভারতীকে গান শেখানোর জন্য নিশ্চিন্তে হাতে তুলে দিতে পারি এমন একটি লোক বহুদিন থেকে খুঁজছি। তুমি যদি কিছুদিন ভারতীকে গান শেখানোর ভার নাও তাহ'লে অন্তত কিছু দিন নিয়মিতভাবে আমি এ আনন্দ লাভ করতে পারি।

ভারতী কথাটা শুনিয়া ছুটিয়া শকুন্তলার পাশে আসিয়া বলিল—কুন্তলাদি, আসবেন। আপনি এলে কি মজাই হবে সত্যি।

চোখের ইঙ্গিতে ভারতীকে নিষেধ করিলে ভারতী সরিয়া গেল। শকুন্তলা কুমারেশের মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন একটু ভাবিল, তার পর স্থিরকণ্ঠে বলিল—আসব আমি।

কুমারেশ শুনিয়া আনন্দিত হইলেন, নিজেকে গোপন করিতে তিনি চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিলেন। কুমারেশের সম্মুখে আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করা উচিত হইবে না জানিয়া ভারতী শোভার হাত ধরিয়া পাশের ঘরে গিয়া খানিকটা বেতালে নাচিয়া লইল।

নির্বিঘ্নে কিছুকাল দেখাশুনা হওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় সকলের মনটাই সাময়িকভাবে খুশী হইয়া উঠিল। শোভা ও ভারতী আবার পাশে আসিয়া বসিয়া অনর্গল বকিয়া চলিল। শোভার ইচ্ছা, শকুন্তলা দিদির সঙ্গে সে আরও এ বাড়িতে আসিবে। ভারতী তাহাতে খুশী। ভারতী গান শিখিলে শোভা তাহার গানের সঙ্গে নাচিবে, এটা তাহাদের গোপন কথা।

উহাদের কাণ্ড দেখিয়া কুমারেশ ও শকুন্তলা হাসিতে লাগিলেন।

সময়ের সুবিধার জন্য কুমারেশ শকুন্তলাকে বলিলেন—তোমার যেদিন সুবিধা হয় এসো, আমরা তোমার চাএর আগে

(শেষাংশ ৩৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চিকাগোর পথে

(ভ্রমণকাহিনী—অনুবৃত্তি)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

গ্রামের মামুলী একটা আবাস পেয়েই মনে হ'ল এমন ক'রে যদি আমি গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াই, তবে আমার সমূহ ক্ষতি হবে। তাই সাইকেলটা ট্রেনযোগে ডিট্রয় পাঠিয়ে দিয়ে 'হিচ হাইক'-এর জন্য প্রস্তুত হলাম। প্রথম দিন আমাকে হিচ হাইকের স্বাদ পেতে হয় নি, কারণ গ্রামবাসীদের উদ্‌যোগে একখানা পুরো মোটরকারেই আমার বাফেলো পর্যন্ত যাবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

গাড়িতে ব'সে চলতে চলতে মনে হ'তে লাগল এ আমার উচিত হচ্ছে না। আমি মহাত্মা পরিচালিত New India অনেক দিন পাঠ করেছিলাম। তাতে আমার হৃদয়ে তাঁর লেখার একটা দাগ পড়েছিল। তাই কেবলই মনে হচ্ছিল গাড়ি থেকে নেমে যাই। এদিকে আরামে ব'সে থাকার সুখ ছাড়তেও মন কেমন করছিল। যাই হ'ক বেলা চারটের সময় মহাত্মার 'নবজীবন'-এরই জয় হ'ল, আমাকে গাড়ি থেকে নামতে হ'ল। আমি আমার নির্ধারিত পথে এলাম। মনে বেশ একটা আনন্দ হ'ল।

আমার সামনে দিয়ে গাড়ি চ'লে যাচ্ছে। অনেকে ভদ্রতা ক'রে তাদের সঙ্গে যাবার জন্য আমার হাত ধ'রে টানছে, কিন্তু আমার মন নানা দ্বন্দ্বে দুলতে লাগল। ভাবতে লাগলাম, মহাত্মাজীর 'নবজীবন'এর প্রভাবটা আমার পক্ষে দুর্বলতা কি না। নিউইয়র্কে অনেক স্পিরিচুঅ্যালিস্টকে গাল দিয়েছি, শেষে কি নিজেই স্পিরিচুঅ্যালিস্ট হ'তে চললাম? ঠিক করলাম আজ আর কোথাও যাওয়া হবে না। উপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ, নীচে শস্যশ্যামল ভূমি। তারই উপর উত্তরের স্নিগ্ধ বাতাস আজ বেশ ভাল ক'রে অনুভব করব।

উত্তরের বাতাস হুহু ক'রে বইছে। বাতাসের স্নিগ্ধতা লুপ্ত হয়ে তাতে শীতের কটুস্পর্শ জেগেছে। ইচ্ছা করলেই 'হিচ হাইক' ক'রে কোনও গ্রামে যেতে পারি, নিগ্রোর মত আচরণ পেতে পারি, শীতের হাত থেকে বাঁচতে পারি; কিন্তু যাব না, এই ছিল আমার প্রবল বাসনা। ক্রমশ রাত বাড়তে লাগল, জোনাকি পোকা আকাশ ছেয়ে ফেললে। আর একটা ইচ্ছা হ'ল; যদি কোনও ডাকাতের দল আসে, তবে তাদের সঙ্গে আজ বন্ধুত্ব করা যাবে। কিন্তু ডাকাত এল না, চোখের সামনে যেন নানারকম উদ্‌ভট বিলাতী ডাকাতির ছবি ভাসতে লাগল। শরীর অবসন্ন বোধ হতে লাগল। ক্রমে জমিরই উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন প্রাতে মলিন মুখে যখন পথে এসে দাঁড়ালাম, তখন একজন আমাকে তার মোটরে বসিয়ে বাফেলোর দিকে অগ্রসর হ'ল। তার মোটরে উঠে তাকে ধন্যবাদও দিই নি, নামবার বেলা কিছু বলিও নি। রাত্রি দুটোর সময় বাফেলোয় পৌঁছে, হোটেলের খোঁজে বার হয়ে বোধ হয় সৌভাগ্যবশতই একটা হোটেলে স্থান পেলাম। স্নান ক'রে খেয়ে বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন নিদ্রাভঙ্গ হ'ল, তখন পরের দিনের বিকাল বেলার তিনটে। হোটেলের মালিক আমাকে জাগায় নি, নিজেই জেগেছিলাম। বিকাল বেলা ফের স্নান এবং খাওয়া সমাপ্ত ক'রে শহর পরিক্রম করতে বার হলাম।

সারাটি বিকাল বেড়িয়ে এসে যখন হোটেলে ফিরলাম, তখন যে ভদ্রলোক আমাকে মোটরে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন, হঠাৎ এসে বললেন, "মহাশয়, আমিই আপনাকে লিফট দিয়েছিলাম; মামুলী ধন্যবাদ দিলেও সুখী হতাম।" আমি আমার উপকারী বন্ধুটিকে কাছে বসিয়ে বললাম, "ধন্যবাদ সারাজীবন কতজনের কাছ থেকে পেয়ে আসছেন, আমার মত লোকের কাছ থেকে যদি নাই পান, তবে দুঃখিত হবার কিছু নেই। এখন বলুন আপনার জন্য যদি কফি আনতে পাঠাই তবে সুখী হবেন কি না।" ভদ্রলোক বললেন, তাঁর নাম জন হার্ট এবং আমাকে তাঁর নাম ধ'রেই ডাকতে অনুমতি দিলেন। আমিও আমার নাম ধ'রে ডাকতে তাঁকে অনুমতি দিলাম। অবশ্য নামটাকে ছোট ক'রে বললাম, 'রাম'। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের বন্ধুত্ব পেকে উঠল এবং মিস্টার হার্ট আমাকে নিয়ে ডিট্রয় পর্যন্ত যাবেন ব'লে স্বীকার করলেন।

মিঃ হার্ট একজন বেকার যুবক। পঁচিশ ডলার (পঁচাত্তর টাকা) খরচ ক'রে একখানা পুরনো মোটরকার কিনেছেন। 'আনন্দবাজার' অফিসে ঢুকলেই প্রায়ই যে একটা মোটর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, বন্ধুর মোটরটা ঠিক সেইরকম। তফাত এই যে, বন্ধুর গাড়িতে একটা রেডিও ফিট করা ছিল। মিস্টার হার্ট-এর সঙ্গে চুক্তি হ'ল আমি মোটরের পেট্রল খরচ বহন করব এবং তিনি মোটর চালাবেন। পথে অন্য যা কিছু খরচ হবে তা দুজনে সমান ভাগে বহন করব।

আমার নিউইয়র্ক-এর বন্ধুগণের সঙ্গে তখনও দেখা হয় নি। মিস্টার হার্টকে বলেছিলাম, হয় তিনি আমার হোটেলে চ'লে আসুন নয় তো আজ থেকে ছয়দিন বাদ দিয়ে সপ্তম দিনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করুন। এর মাঝে আমার নায়গ্রা প্রপাতও দেখা হয়ে যাবে।

মিঃ হার্ট থাকেন Y. M. C. A.-এর বাড়িতে। আমেরিকাতে Y. M. C. A.কে শুধু 'Y' বলা হয়। সেখানে আমার মত ভারতবাসীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেজন্যই আর মিঃ হার্টকে বিরক্ত করতে যাই নি তাদের পবিত্র ইমারতে গিয়ে। কিন্তু চিকাগো সল্টলেক সিটি, স্যানফ্রানসিসকো এবং লস অ্যাঞ্জেলের "Y' দেখবার সুযোগ হয়েছিল। 'Y' এক জাতীয় হোটেল বিশেষ। তাতে পুরুষ মাত্রেই থাকতে পারে। 'Y' দু রকমের। একটা হ'ল শ্বেতকায়দের জন্য অন্যটা হ'ল কালোদের জন্য। ব্যবসায়ের হিসাবে 'Y'এর ব্যবসায় বেশ লাভবান ব্যবসা। 'Y' সম্বন্ধে এর বেশী যদি কিছু বলতে হয়, তবে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরবার সম্ভাবনা। অতএব নীরব থাকাই ভাল।

আমার নিউইয়র্কের সঙ্গীরাও 'Y'এতে থাকত। আমাকে নিগ্রো হোটেলগুলিতে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষটায় সাদা হোটেলে খুঁজতে আরম্ভ ক'রে আমার সাক্ষাৎ পেলে। সে কি আনন্দ। সাদায় কালোয় যে কত অন্তরঙ্গতা জন্মাতে পারে তা তখনই মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলাম। একে অন্তরঙ্গ তায় অনেক দিন পর দেখা। ওরা হাসিতে আর আনন্দে রুমটাকে চীৎকার ক'রে মাথায় তুলেছে। কিন্তু আমি গম্ভীর। আমার কালো মুখে আরও কালিমা লিপ্ত। আমার ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে

হঠাৎ তারা গম্ভীর হয়ে গেল, হয়তো মনে করলে আমি রাগ করেছি। আমার রাগে তাদের একটু ভয়ের কথা ছিল। তারা ঠিক করেছিল আমার একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা করবে। তা থেকে যা আয় হবে তাই দিয়েই কিছুদিন তাদের থাকবার খাবার সংস্থান হবে। তাদের এইরকম দৈন্যের ভাব দেখে আমার খুবই দুঃখ হয়েছিল।

অবশ্য আমার গাম্ভীর্যের কারণ অন্য ছিল। তাদের বললাম, "বন্ধু, আমার ভাবান্তরে আপনাদের চিন্তার কারণ নেই। আমি আজ অন্য কথা ভাবছি। আপনাদের দেশে যেমন নিগ্রোদের প্রতি সামাজিক অত্যাচার হয়, ঠিক সেরূপই আমাদের দেশেও আমাদের অনেকেরই প্রতি সামাজিক অত্যাচার হয়। তার প্রতিকার করবার জন্য মহাত্মা গান্ধী অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু কৃতকার্য হ'তে পারেন নি। কেন জানেন? যাকে আপনারা ডিমক্র্যাসি বলেন, আর আমরা যাকে গণতন্ত্র বলি আসলে তা কিছুই নয়। আপনাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে, কিন্তু আপনারা যে-পর্যন্ত না আমাকে হিন্দু ব'লে আপনাদের সমাজে পরিচয় করে দেবেন সে পর্যন্ত আপনাদের সমাজে আমার স্থান নেই। কি ক'রে এই পাপ পৃথিবী থেকে দূর হয় তাই আমি মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে ভাবি। আমার দেশে আমার স্থান তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর লোকের মাঝেই: যদি আফ্রিকা ও আপনাদের দেশ না পর্যটন করতাম তবে এই সব চিন্তা আমার মাথায় আসত না। মোগল সম্রাট, পাঠান সম্রাট আমাদের দেশ শাসন করেছেন, কিন্তু এখনও তদের বংশধররা সর্বত্র স্পৃশ্য নন। এই বর্বরতায় তারা ভ্রূক্ষেপ করেন নি, চুটিয়ে রাজত্ব করতেই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সে ছিল এক যুগ, এখন নবযুগ এসেছে। এই নবযুগেও, বলতে গেলে নবযুগের অগ্রদূত সভ্য আমেরিকাবাসীদের মধ্যেও ভারতের প্রাচীন বর্বরতা বর্তমান দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।"

ওদের সঙ্গে কথা হ'ল, আমি একা যাব নায়গ্রা ফল্‌স্ দেখতে। নায়গ্রার মত এত বড় একটা পবিব্রাজকের তীর্থেও বর্ণবৈষম্য মানা হয় কি না তা দেখব। পরদিন প্রাতে বাসে গিয়ে বসলাম। যে সকল বাস নায়গ্রায় যায় তাদের 'স্ট্যাণ্ড' শহরের বাইরে। বাস প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর ছাড়ে। ভাড়া কুড়ি সেণ্ট। আমাকে বাসে বসতে দেখে অনেকেই পরের বাসের অপেক্ষায় রইল। আমি একা। এদিকে বাস ছাড়বার সময় হয়ে গেছে কিন্তু আমি ছাড়া অন্য কোনও পাসেঞ্জার নেই। অগত্যা আমাকে নিয়েই বাস ছাড়তে হ'ল। কনডাক্টরকে জিজ্ঞাসা করলাম "আমি একা চলেছি, অন্যান্য যাত্রীরা আমার জন্যেই বাসে বসে নি, সেজন্যে কি আমাকে বেশী কিছু দিতে হবে?" কনডাকটর বললে, "আজকে আপনাদের লোক (মানে নিগ্রো) এদিকে বড় বেশী আসে নি, তাই এমন হয়েছে, নতুবা আমাদের ক্ষতি বড় একটা হয় না। অবশ্য পথে অন্য যাত্রী পাব, তারা আপনার বসার জন্যে কিছুই মনে করবে না। কথাটা শুনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম, কারণ আমার কাছে সামান্য অর্থ ছিল।

পথে অন্যান্য যাত্রী উঠল। কেউ আমার গা ঘেঁসে বসল না। প্রত্যেকটি আসনে দুজন বসা যায়। স্থানাভাবে অনেকে দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু আমার পাশে বসল না। মনে মনে ভাবলাম, বর্বরদের মত বর্বর হয়ে লাভ নেই, আমিই উঠে দাঁড়াই। উঠে দাঁড়ালাম। দুটো বর্বর আমার পরিত্যক্ত স্থান দখল করল। অমনি তাদের গিয়ে বললাম, "that's my place, one of you must vacate।" নীরবে দুজনেই উঠে দাঁড়াল। আমি ফের গিয়ে সিটএ বসলাম, দেখতে লাগলাম হ্রদের জলকল্লোল। বাস্তবিক প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেক সময় মনের অনেক দুঃখ কষ্টের অবসান করে।

একটি বর্ষার সন্ধ্যা

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

'সন্ধ্যার ধারাজল ছন্দে
বীথি আজ ভরা ফুল গন্ধে।
আঁধার কাঁপিছে যেন গগনে
আজিকার এই মেঘ লগনে
জীবন কেন যে পড়ে উছলি।
আকুল বেগের ভারে উথলি,
ফুলিয়া ফুলিয়া যেন চলিছে
পিছনে সকল কিছু দলিছে;
কাঁপায়ে দিগাঙ্গন সঘনে
মেঘেরা ঘুরিছে ঘোলা গগনে!

নির্জনে ব'সে আছি—সন্ধ্যা,
কোথায় ফুটেছে নিশি গন্ধা।
তাহারি সুরভি ভাসে বাতাসে
মন্দার গন্ধেতে মাখা সে
ব'সে আছি চুপচাপ নির্জন,
মন মোর ক্ষণে ক্ষণে উন্মন;
বর্ষার ধারাজল ঝরিছে
কেহ কি আমারে আজি স্মরিছে?

মীমাংসা

(গল্প)

শ্রীসমীর ঘোষ

স্বামী ছিলেন অধ্যাপক মানুষ। জীবনযাপনের দৈনন্দিনতায় বৈচিত্র্য না থাকুক, বিচিত্র ছিল তাঁহার রস সংগ্রহের পন্থা আর সেই রস। বইএর পাতার সঙ্গেই তিনি সমুদ্রের অজ্ঞাতগর্ভে করিতেন সন্তরণ, বইএর পাতার সঙ্গেই তিনি অনন্ত আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে করিতেন বিচরণ। মণিপ্রভা আজ সেই কথাই বারংবার ভাবেন। বিশ্বসংসারের অদ্ভুত ইতিহাস সামাজিকতা আর অভিব্যক্তিবাদেরই মত স্বামীর গড়া সংসারেও অতি অল্পকালের মধ্যে সেই বৈচিত্র্য কেমন করিয়া আসিল!

অপর্ণার কথা ধরা যাক। যখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িতেছে। মণিপ্রভার তখনই একান্ত পরিশ্রম আর প্রচেষ্টায় দেবনাথের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। মণিপ্রভার মনে হইয়াছিল ইহার চেয়ে ভাল পাত্র মেলা আজকাল দুর্লভ, এত দুর্লভ যে তাহাকে বেড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়ার সঙ্গে তুলনা করা চলে। সত্যি মণিপ্রভা ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া যে আশা করিয়াছিলেন তাহা শুধু যে সফলতার মাপকাঠিই ছাড়াইয়া গেল তাহা নয়, আরও অতিরিক্ত কিছু আনিয়া দিল। দেবনাথ শুধু যে অধ্যাপক হইলেন তাহা নয়, অতি অল্প বয়সে সেই কলেজের অধ্যক্ষ হইলেন অনায়াসে। সেই অনায়াস এতই অনায়াস যে, আয়নার ভিতরে ধরা চাঁদের সহিত তাহার তুলনা চলিতে পারে। সেই অনায়াসের বিস্ময়কে দেবনাথ প্রায় অলৌকিক করিল যে উপায়ে তাহা লইয়াই তো অপর্ণার সহিত অনিমার বিরোধ।

মণিপ্রভা বোঝেন অনিমার এই বিরোধ আনিবার কারণ কি। চলতি কথায় অনিমা লোকের কাছে পরিচয় দেয়, ছ মাস সিমলা পাহাড়ে আর ছ মাস দিল্লি ক'রেই তো ভাই বছর কাটে। নেহাত ভাইসরয় বড়দিনেতে কোলকাতায় আসেন তাই বছরান্তে বাংলা দেশটা দেখি আর মাকে বিজয়ার প্রণামটা করতে পাই।

অনিমা অবশ্য মণিপ্রভাকে প্রণাম করে না; না করারই কথা। বড় বড় অফিসার আর অফিসার-গিন্নীদের সহিত হাত-কোলাকুলি সারিতে সারিতে অভ্যাসটা এমন বিশ্রী হইয়া গেছে যে, স্ফীতোদর দেহটা নীচু করিতে অনিমার কষ্টই হয়। মণিপ্রভা কিন্তু তার অতিরিক্ত আরও একটা জিনিস বোঝেন! তাই অনিমা প্রণাম করিবার জন্য নীচু হইবার ক্লেশকর অভিনয়ভঙ্গী করিলেই মণিপ্রভা তাহার দুই কাঁধে হাত দেন, থাক থাক বলিয়া নিজে পা দুই হটিয়া অনিমার দেহ যাহাতে কষ্ট না পায় তাহার ব্যবস্থা করেন। আর সেই সঙ্গে আরও ব্যবস্থা করেন অনিমাকে যাহাতে নীচু হওয়ার অসম্মান না পাইতে হয়। মণিপ্রভা বাধা দিলেও অনিমা যে কেন জোর করে না প্রণাম করিতে সে সম্বন্ধে অনিমা বলে, "মার ওই এক রোগ; প্রণাম করতে গেলেই পেছনে তিন পা ক'রে হ'টে যেতে থাকবেন"; কাজেই, অনিমা মনে মনে নিজের কথা শেষ করে, "সাধাসাধি পোষায় না।" এই কথাগুলির আন্তরিকতা আরও ধরা পড়ে যখন বাংলা দেশ সম্বন্ধেও অনিমা প্রায় ওই একই কথা প্রযুক্ত করে। দিনকতকের জন্য সে বাংলা দেশের নোংরামি আর কুৎসিৎ আচার ব্যবহার দেখিয়া মর্মাহত হয়। কিন্তু তাহার কাছে সব চেয়ে কুৎসিত লাগে বাংলা দেশের লোকগুলোকে। অবশ্য মণিপ্রভা জানেন এ মন্তব্য অনিমার নয়, মন্মথর।

মন্মথ তথা অনিমার সহিত অনুভার বিরোধ এইখানে। অনুভার মতে শুধু বাঙালী নয় সমগ্র ভারতীয়ই এ জন্য অপরাধী। মণিপ্রভা নীরবে বসিয়া অনুভার এই মতের স্রষ্টা ব্যারিস্টার কুমারের দিকে চাহিয়া ভাবেন, এ আরও এক গজ প্রগতিপন্থী। আশ্চর্য হইয়া মণিপ্রভা আরও ভাবেন, না হওয়ার তো কোনও কারণ দেখা যায় না। এ তো তাঁহার পছন্দ দেবনাথ নয় অপর্ণার জন্য, কিংবা মন্মথ নয় তাঁহার স্বামীর পছন্দে অনিমার জন্য; এ হইতেছে অনুভার নিজের জন্য নিজের পছন্দ প্রকৃতপক্ষে স্বয়ংবর হইতে সংগৃহীত।

মণিপ্রভা নিজে বেশ জানেন এই মনোনয়নের ক্ষেত্রাদিতে তাঁহার সহিত সাধারণের পার্থক্য কত বেশী, যদিও কোনও দিন মণিপ্রভা নিজেকে অসাধারণের গণ্ডিতে টানিয়া আনেন নাই। অধ্যাপক মানুষ হইয়া সৌমসুন্দর যতখানি শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাহার চাইতে শান্ততর মণিপ্রভার ব্যক্তিত্ব। সংসারকে তিনি অতি সহজে আপনার করিয়া লইয়াছেন, অথচ তাহার (সেই সংসারের) জটিলতাকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় তিনি দেন নাই আপনার দৈনন্দিন জীবনে। সাধারণ গৃহিণীর সঙ্গে বোধ করি তাঁহার প্রভেদ এইখানে। সে জিনিসটা বেশ প্রতীয়মান হয় যখন দেখি সাধারণ নারীর ঐশ্বর্য আকাঙ্ক্ষাকে নীচু করিয়া নিজের স্বামীর মতন লোক বাছাই করিলেন মণিপ্রভা বড় মেয়ে অপর্ণার জন্য।

অপর্ণার বিয়ের পর অনেক কথা উঠিল মণিপ্রভার বিবেচনা আর বিচারের বিষয় লইয়া। সহজ সাংসারিক মানুষ সৌমসুন্দর সহসা বিচলিত হইয়া মন্মথর সঙ্গে মেজো মেয়ে অনিমার মিলন লাগাইয়া, সাধারণের চোখে উঁচু হইয়াই পরলোকের কোন অস্তিত্ব আছে কি না জানিতে একদিনকার নিরুদ্দেশ যাত্রীর দলে ভিড়িলেন। তার পর অনুভার কথা লইয়া মণিপ্রভা এত নিশ্চিন্ত যে, আত্মীয় এবং পরিচিতেরা এখনও পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে চাহে না, মণিপ্রভার বিনা অনুমতিতেই কুমারের সহিত অনুভা জীবন মিশাইয়াছে।

দুপুরের দিকে যখন কদাচিৎ একান্ত নিরিবিলি অবসর মেলে, মণিপ্রভা ইন্দ্রসেনের জন্য একটা যা হ'ক কিছু বুনিতে বুনিতে হাড়ের চকচকে অথচ ঈষৎ হলদে-সাদা কাঠি দুইটি থামাইয়া সেই কথাই তখন ভাবেন। সৌমসুন্দরের ছিল অনুদ্বেলিত ব্যক্তিত্ব আর মণিপ্রভার নিজের আছে জগতের এককোণে দিনরাত্রিগুলিকে প্রশান্তভাবে অতিবাহনের কামনা। এই দুইএর মধ্যে কেমন করিয়া জাগিয়া উঠিল—শুধু চঞ্চল নয় শব্দমুখর অনুভা, অনিমা? আর তাহাদের বিপরীত পথে দাঁড়াইয়া অপর্ণা দেবনাথের গণ্ডি ভাঙিয়া ইন্দ্রসেনই বা কেমন করিয়া অট্টহাসি ছড়াইয়া মাতিয়া উঠিতেছে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া? শুধু আশ্চর্য লাগে না, তলাইয়া মণিপ্রভা ভাবিয়া দেখেন, পুকুরের মাঝে ঢিল ছুঁড়িয়া দিলে ঢেউ ওঠে, সেই ঢেউ পাড়েও আসিয়া লাগে। কিন্তু সমুদ্রের মাঝে যখন জাহাজ ডুবিয়া যায়, তখন তাহার ঢেউ উপকূলে আসিয়া পৌঁছিবার মত শক্তি পায় না। কিন্তু সেইজন্যেই বোধ হয় সাগর-শৈবাল যাহাদের সমাধি রচিল তাহাদের কথা মানুষের বুকে আঘাত হানিয়া একটা অপরিসীম ক্ষতির বার্তা জানাইয়া চোখের পল্লবে বাষ্পাকুলতার প্রত্যাশা রাখে।

নিজের চিন্তার গতিতে মণিপ্রভা অধিকতর প্রাণময়ী হইয়া আপনার ভিতরে বেশী করিয়া ডুবিয়া যান। হাত হইতে বোনার কাঠি স্খলিত হইয়া মেঝের কার্পেটে পড়ে; মণিপ্রভা ভাবেন; পুকুরের জলে যে ঢিল পড়িল তাহা হইতেছে অনিমা, অনুভা। এ ক্ষতি সহনীয়। কিন্তু সমুদ্রে যে জাহাজ ডুবিল সে কি ইন্দ্রসেন নয়?

জাহাজই ডুবিয়াছে এ বিষয়ে অনিমা মন্মথ অনুভা কুমার একমত। অনিমা স্পষ্ট বলে, "অত ভাল স্কলারের মাথা না বিগড়লে কি আর নন-কো-অপারেশনে যোগ দিয়ে জেলে যায়?

অনুভা মেজদিদিকে সমর্থন করে, "সে আর বলতে? তা হ'লে মিস্টার মিত্র যখন ওর ফর-এ দাঁড়াতে গেলেন, তখন কিনা স্টুপিডের মত বললে, আমার উকিলের কোনও প্রয়োজন নেই। দোষ তো আমি করি নি, আত্মসমর্থন করতে যাব তবে কি জন্যে?"

অসহযোগ করিয়া ইন্দ্রসেন সেবার যখন জেলে যায়, তখন কুমার তাহার পক্ষে দাঁড়াইতে গেলে উপরোক্ত কথাগুলি সে বলিয়াছিল।

এইসব বিষয়ে মণিপ্রভার যে কি মত তাহা কেউ জানে না। অপর্ণা এবং দেবনাথের মত কি তাহা লইয়াও কেহ বিচলিত হয় নাই। তবে যেদিন ইন্দ্রসেন জেলে গেল, সেদিন সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ দেবনাথ যখন অপর্ণার সমভিব্যহারে স্থানীয় কংগ্রেস অফিসে গিয়া দুজনেই নাম লেখাইলেন সেদিন অপর্ণা দেবনাথের এই অলৌকিক কাজ শুধু যে তাহাদের মত প্রচার করিল তাহা নয় অপর্ণার সহিত অনুভা অনিমার বিরোধও আনিয়া দিল।

সেই বিরোধরূপী আবর্তের কেন্দ্র হইলেন মণিপ্রভা। যদিও নিজে তিনি কোনদিন অনিমা, অনুভার আলোচনায় যোগ দেন না— অপর্ণার কোনও কূটনৈতিক তর্কজয়ে সায় দেন না, তথাপি তাঁহারই চারিপাশে চেয়ার আর সোফা আর কাউচ সংগ্রহ করিয়া অনিমা, অনুভা তোলে তর্কের ঝড়, অপর্ণা করে মর্মভেদী সূক্ষ্ম বিদ্রূপ, ইন্দ্রসেন হাসে উচ্চ এবং অট্টহাসি।

অবশ্য ইন্দ্রসেন ব্যতীত মণিপ্রভার অনিমা এবং অনুভার তরফ হইতে দৌহিত্র এবং দৌহিত্রী হিসাবে সুখেন্দু, আইভি ও অরূপ আছে; তবে তাহারা ইন্দ্রসেনের কাছে নিস্প্রভ জ্যোতিঃহীন, যেমন জ্যোতিঃহীন অমাবস্যার রাত্রে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের নিম্নে ঊর্ধ্বমুখী আকাশ-প্রদীপ। উপমা হয়তো আমার ঠিক হইল না, তবুও এটুকু সকলে বোঝে এবং জানে যে দেবনাথের অগাধ পাণ্ডিত্যের অতলস্পর্শী সমুদ্রনিম্নে যেখানে মন্মথ, কুমার হইতে অরূপ পর্যন্ত হাবুডুবু খায়, সেখানে ইন্দ্রসেন প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রবালদ্বীপেরই মতন মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় এবং তাহার পর যে যুক্তির অবতারণা করে, তাহা খণ্ডন করিয়া নিজের ব্যক্তিত্ব অপ্রতিহত রাখিতে দেবনাথকে বেশ পরিশ্রম করিতে হয় মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুগুলি লইয়া। সময় সময় সেই রীতিমত পরিশ্রমও অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারে না।

অনিমা অনেকবার তুলনা করিয়াছে, কিন্তু মনে মনে বিচার শেষে দেখিয়াছে ছয় মাস সিমলা আর ছয় মাস শুষ্ক আবহাওয়াধিকারী দিল্লি সুখেন্দু, আইভির যে দৈহিক উন্নতিসাধন করিয়াছে তাহার চাইতে অনেক বেশী উন্নীত হইতেছে বাংলার মফস্বলের ছেলে ইন্দ্রসেনের দেহ। তাহা ছাড়া ইন্দ্রসেনের ওই তীক্ষ্ম নাসিকা আর চাপা ঠোঁট যেন অনিমা, অনুভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য অবতীর্ণ।

মাপের কাঠিতে বেশী ঝুঁকি ইন্দ্রসেনের উপর পড়িলেও সুখেন্দু, অরূপ বা আইভির সমাদর যে মণিপ্রভার কাছে কম তাহা প্রমাণ করার কোনও উপায় নাই। অপর্ণা কি ভাবে সেটা অবশ্য সঠিকভাবে অবগত নয় কেউই, তবে অনিমা অনুভার বিশ্বাস তাহাদের উপরে মায়ের একটা প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা আছে।

হয়তো বা তাহাই হইবে। কলিকাতার বাড়িতে ভাড়াটে থাকে। মণিপ্রভার বার মাসের সংখ্যা ছ'মাস ছ'মাস করিয়া পূর্ণ হয় অনিমা আর অনুভার গৃহে। বছরে বার দিন যদি মণিপ্রভা অপর্ণার কাছে থকেন, সেটাই তবে বিস্ময় বলিয়া ধরা যায়। আরও বিস্ময় হইতেছে অপর্ণা কখনও অবস্থানের নিমিত্ত কোনও আমন্ত্রণ লিপি বা আহ্বান অন্তত মৌখিকভাবেও প্রেরণ করে না মণিপ্রভার কাছে। কাজেই অনিমা অনুভা মীমাংসা করিয়াছে মণিপ্রভা তাহাদেরই দখলে; এমন কি তাহারা স্থির পর্যন্ত করিয়াছে মণিপ্রভার ব্যক্তিত্ব, সমস্ত স্বত্ব তাহাদের করায়ত্ত বা তাহাদের স্বারা প্রভাবান্বিত।

সেই দখলের তর্কই যেন একদিন উঠিয়াছিল। এক দিকে সুখেন্দু অরূপ আর আইভি অনুভা অনিমা জোট বাঁধিয়া প্রমাণ করিতে লাগিল ব্রিটিশ শাসনের সুব্যবস্থার মহিমার উচ্চতা কত বেশী পরিমাণে অভ্রভেদী আর এক দিকে তীক্ষ্মশ্লেষ আর বিদ্রূপের হাসি নিজের যুক্তিতে মিশাইয়া ইন্দ্রসেন খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া গেল সেই অভ্রভেদী উচ্চতাকে।

আকাশ সেদিন পরিষ্কার; মেঘ নাই; কুয়াশা নাই; আছে শুধু সুদূর বিস্তৃত শান্ত আকাশের নীলিমা আর সেই নীলিমার গায়ে হেলান দিয়া উন্নতশির নীলাভ গিরিশ্রেণীর তুষারমণ্ডিত সাদা চূড়া। অসাধারণ বলিষ্ঠ হাতের তর্জনী তুলিয়া ইন্দ্রসেন লক্ষ্য স্থির করিল সেই পাহাড়চূড়া দেখাইয়া; বলিল, "আকাশে যখন থাকে মেঘ আর যবনিকা বিস্তারকারী কুয়াশা তখনই তো মানুষের মনে হয় ওই পাহাড় চূড়া অভ্রভেদী। কিন্তু আকাশে যখন নেই মেঘ, কুয়াশা গেছে পালিয়ে, তখন যদি আজ সকালের মত আমাদের সতেজ চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ম ক'রে তাকে চালিয়ে দিই ওই দূরের পাহাড়ের চূড়ার সন্ধানে, তা হ'লে আমরা কি দেখি? আমরা দেখি পাহাড়ের শিখর অভ্রভেদী তো নয়ই, অভ্রংলিহও সে নয়। আসল কথা হ'চ্ছে, আমাদের চোখই স্তিমিতজ্যোতি হ'য়ে দেখে মাত্র কয়েক হাজার ফুট উঁচু শৃঙ্গকে অভ্রভেদী হ'তে।

"সেইরকম, হ্যাঁ ঠিক সেইরকমই," এইখানে ইন্দ্রসেন তাহার সতেজ প্রাণচঞ্চল কণ্ঠস্বরকে অসম্ভব শান্ত করিল, "আমরা স্তিমিতজ্যোতি চোখ নিয়ে দেখছি ব্রিটিশ-শাসনের সুব্যবস্থার মহিমার উচ্চতা অভ্রভেদী। কিন্তু আজ যেমন দক্ষিণ-বাতাস লেগে আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেছে ব'লে দেখতে পাচ্ছি পর্বতচূড়ার উচ্চতার পরিমাপ, ঠিক অমনভাবেই কি দেখব না যদি আমরা স্বদেশপ্রেমরূপী চশমা পরি চোখে দক্ষিণ বাতাসরূপী সুশিক্ষায় আমাদের হৃদয় থেকে কুশিক্ষা করি অপসারিত? আমরা দেখব এই যে ব্রিটিশ শাসন ওই পাহাড়ের চূড়ার মতন একটা মিথ্যা অভ্রভেদীর গর্ব নিয়ে উন্নতশির, দেখব সেই মিথ্যা অভ্রভেদী গর্বকে আপনাদের মত জ্যোতিহারা স্তিমিত চোখ দেখছে অত্যুচ্চ অদ্ভুত গৌরবমণ্ডিত। হায় রে, এরা বুঝছে না বণিক-সভ্যতার আড়ম্বরের কুয়াশায় আর মেঘে সকল অত্যাচার আর নিপীড়নের গিরি-গহ্বর অন্তর্হিত, অস্তিত্ব তাদের অবলুপ্ত। কেমন দিদিমা তাই কি নয়?' অদ্ভুত কঠিন স্বরে তাহার সমস্ত কথার শেষে ইন্দ্রসেন মণিপ্রভাকে এই প্রশ্ন করিল।

আশ্চর্য, মণিপ্রভার কাছ হইতে কোনও উত্তর মিলিল না। ইন্দ্রসেন ছাড়া সকলে মনে করিল মণিপ্রভার মনের মত কথা হয় নাই এটা, তাই মণিপ্রভা নির্বাক উত্তরহীন। ইন্দ্রসেন ছাড়া সকলে উঠিয়া গেল নিশ্চিন্তমনে; মণিপ্রভার মতের সহিত তাহাদের মত এক।

সকলে উঠিয়া গেল। ঘরের এক কোণে ইজিচেয়ারে শুইয়া রহিল ইন্দ্রসেন আর ঘরের অপর একটা কোণে চেয়ারে বসিয়া মণিপ্রভা। মণিপ্রভার দেহ শিথিল, চোখ অলস, সুন্দর। ইন্দ্রসেনের দৃষ্টি সে চোখ অনুসরণ করিল। বুঝিল, মণিপ্রভা আপনার চিন্তায় ধ্যানমগ্ন। সত্যই মণিপ্রভা সমাহিত ছিলেন নিজের মধ্যে। তিনি দেখিতেছিলেন পাহাড়ী মেয়েরা কেমন করিয়া অত ভারী বোঝা লইয়া, ছোট ছেলেমেয়ে পিঠে বাঁধিয়া পাহাড় ভাঙিতেছে। তিনি দেখিতেছিলেন কেমন করিয়া রিক্‌শওয়ালা পাহাড়িয়া পথে রিকশ ছুটাইতেছে।

তিনি দেখিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন এই সিমলায় বসিয়া বাঙলার পল্লী আর শহরের কথা। ভাবিতেছিলেন অনেক দিন আগেকার কথা। যখন তিনি এক অতি নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘর হইতে কলেজপড়ুয়া সোমসুন্দরের বউ হন। সে অনেক দিন আগেকার কথা। তখন বাঙালীর চাকরির অভাব ছিল না। তাই কলেজের পড়া শেষ করিয়াই সোমসুন্দর সরকারী কলেজের অধ্যাপক হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আজ? চাকরিই মেলে না। মণিপ্রভা মনে মনে বোঝাপড়া করিতেছিলেন। কেন মেলে না? সে অনেক কথা। কিন্তু যতই কথা হ'ক মণিপ্রভা এটুকু পার্থক্য বেশ বোঝেন যে, মন্মথর উপরের অফিসারের মাহিনা দেড় হাজার আর তাহার সমান দায়িত্ববহনকারী মন্মথর মাহিনা মাত্র ছয় শত। আরও বোধ হয় এই পার্থক্যই আজকাল চাকরি মেলা কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। এই তোলাই বোধ হয় দেড় শত বছরের ব্রিটিশ শাসনের পরিণতি। ইন্দ্রসেনের প্রশ্ন তাই কানে গেলেও মণিপ্রভা কোনও উত্তর দিলেন না। উত্তর দিয়া লাভ কি?

সাধারণ দিনগুলি হইতে একটু বিভিন্ন একটা দিন আজ আসিল! মণিপ্রভা উইল করিলেন। কলিকাতায় তাঁহার তিনখানা বাড়ি, ব্যাঙ্কে তাঁহার নগদ মোটা টাকা। সোমসুন্দর অধ্যাপক মানুষ হইলেও প্রৌঢ়বয়সের সূচনাতেই সংসারী মানুষ হইয়াছিলেন।

মণিপ্রভা উইল করিতেছেন, ইন্দ্রসেন আসিয়া বলিল, 'দিদিমা আমাকে তুমি ওই সব ভার বোঝা দিয়ে তোমার পরকালের মুক্তি কেন।'

মণিপ্রভার পাতলা দুই ঠোঁটে সামান্য হাসি ঝকঝক করিয়া উঠিল, বলিলেন, 'বেশ দাদা। কিন্তু তার আগে বিয়ে ক'রে আমার ইহকালের এই কয়দিনের একটি সঙ্গীর যোগাড় ক'রে দাও।'

ইন্দ্রসেন অট্টহাস্য করিল। আসরস্থিত অনিমা, অনুভা প্রভৃতি মনে করিল, ইন্দ্রসেনের ওই অট্টহাস্যের মতই আপত্তিটা হইবে উচ্চ আর প্রবল। হায় রে, আশা তাহাদের নৈরাশ্যে পরিণত। মণিপ্রভাকে ইন্দ্রসেন সম্বোধন করিল, 'দিদিমা, তোমার সঙ্গীরই যোগাড় হবে আমার কিন্তু বউ যোগাড় হবে না।'

মণিপ্রভা কিছু বলিবার আগেই অনিমা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, 'হ্যাঁ রে ইন্দ্র, সে আবার কেমন ক'রে হ'তে পারে?'

মুখখানা সামান্য ঘুরাইয়া লইয়া ইন্দ্রসেন সুখেন্দুকে বলিল, 'ওহে তুমি তো লজিকের স্টুডেন্ট, ন্যায়শাস্ত্র বোঝ ভাল।'

সুখেন্দু মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ইন্দ্রসেন প্রশ্ন করিল, 'যে মেয়ে দিদিমার পাশেই বাস করতে থাকবে, আমি যখন জেলে থাকব, সে দিদিমারই সঙ্গী ব'নে যাবে, আমার যে বউ হবে না এটা ঠিক?'

সুখেন্দু বলিল, 'কিন্তু আপনি যে মন্ত্র প'ড়ে তাকে বিয়ে ক'রে আনবেন।'

'ঠিক। আমি সে কথাই বলছি', ইন্দ্রসেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, 'বিয়ে আমি করব দিদিমাকে কথামত একটি সঙ্গী দিয়ে বিষয় বদল ক'রে নিতে, আমার বউ করতে নয়।'

অনুভা আইভির কানে কি যেন বলিল, আইভি উষ্ণ হইয়া উঠিল, 'ইন্দ্রদা আপনি কি মেয়েদের এতই তুচ্ছ মনে করেন যে, আপনি বিয়ে করলেই তাদের মধ্যে কেউ কৃতার্থ হ'য়ে যাবে?'

আইভির প্রশ্নে ইন্দ্রসেন হাসিল না, হইল গম্ভীর, বলিল, 'এ প্রশ্নের উত্তর আর একদিন দেব ইভি, আজ এ প্রশ্ন অনুত্থাপিত থাক।'

কেউ কোনও কথা কহিল না। ইন্দ্রসেন উঠিয়া দাঁড়াইল। মণিপ্রভা বলিলেন, 'বস্ দাদা চা করি, খেয়ে যা।'

ইন্দ্রসেন বসিল। চা হইলে, চাএ সে চুমুক দিতে লাগিল। মণিপ্রভা বলিলেন, 'সঙ্গী কিন্তু আমার চাই।'

ইন্দ্রসেন উত্তর করিল, 'বেশ সঙ্গী মিলবে, টাকাও কিন্তু আমার চাই।'

এইবার মণিপ্রভা হাসিলেন, 'সেই সঙ্গী বেছে আনবে তুমি নিজে, অবশ্য সে হবে আমার মনের মত এবং বি এ পাস হওয়া চাই অন্তত।'

ইন্দ্রসেন চমকিয়া উঠিল। সে চমক এত প্রবল যে, পেয়ালার চা পরিধি পার হইয়া কার্পেটে পড়িল। আইভি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মণিপ্রভা নিজের কথা শেষ করিলেন, 'প্রতিমাকে আমার সঙ্গীরূপে চাই।'

'অসম্ভব।' ইন্দ্রসেন চলিয়া গেল।

মণিপ্রভা উইল করিলেন। তিনখানা বাড়ি যথাক্রমে অপর্ণা, অনিমা, অনুভার; নগদ টাকাও সমান তিন ভাগে ভাগ হইল। তবে পালটা শর্ত রহিল যদি তিন মাসের মধ্যে ইন্দ্রসেন প্রতিমাকে বিয়ে করে, তাহা হইলে ইন্দ্রসেনেরই সকল কিছু।

ইন্দ্রসেন হাসিল। সে হাসি কঠিন, রুক্ষ। বাঘের কপিশ চোখে সে হিংস্রতার দীপ্তি জ্বলিয়া উঠে, সেই দীপ্তি ইন্দ্রসেনের উজ্জ্বল চোখে জাগিয়া উঠিল। তবে তাহার মূলগত কারণ ভিন্ন। মণিপ্রভা তাহাকে অনিমা অনুভার দলে ভিড়াইতে চাহেন টাকা ঢালিয়া। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে প্রতিমা। সেদিন পর্যন্ত যে বড়লাটের অভ্যর্থনা সভায় নৃত্য পটিয়সী বলিয়া পরিচিতা হইয়াছে তাহাকে নিজের মতের বিপক্ষে বিয়ে করিবে ইন্দ্রসেন? হাসি পায়। তবে সুখের নয়, মর্মন্তুদ যন্ত্রণার হাসি হাসিতেছে ইন্দ্রসেনের তীক্ষ্ম চক্ষু দুইটি। আজ মণিপ্রভার মতবাদ ইন্দ্রসেন জানিতে পারিল; অনিমা, অনুভা আর তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন মণিপ্রভা। মন্দ না। ইন্দ্রসেন আবার হাসিল, সেই বা কিসে কম? তাহারাও তিনজন, দেবনাথ, অপর্ণা আর ইন্দ্রসেন নিজে। চমৎকার। এইবার কিন্তু ইন্দ্রসেন হাসিল না। মনে আনিতে কষ্ট হয় প্রতিমাও ইহাদের দলে আছে!

অমন তীক্ষ্ম যাহার বুদ্ধি, টানা টানা দুই চোখে যাহার সেই বুদ্ধির বিকাশ, সুন্দর প্রস্ফুট ঠোঁটে যাহার সেই বুদ্ধির আর জীবনশক্তির পরিপোষকতা, ইন্দ্রসেনের ভাবিতে মোটেই ভাল লাগে না, সেও তাহার বিপক্ষের দলে। সে কি ইন্দ্রসেনকে সমর্থন করিবে না?

দুর্বলতা কোথায় ইন্দ্রসেন তাহা বুঝিতে পারে। তবুও যে সবুজ যৌবন অবুঝের মতন আকাশকুসুম ফোটাইতে চায়, কুসুমের রেণুগুলিকে অতিরিক্ত সুরভিত করিয়া, পাপড়িগুলিকে রং-এর বৈচিত্র্যে অতিরিক্ত অনুরঞ্জিত করিয়া, ইন্দ্রসেন বোঝে সেই যৌবনের জল্পনাই প্রতিমার সঙ্গে সেদিন করিয়াছে তর্ক। যে তর্ক মিথ্যা বাক্যবিন্যাসে পরিণত হইয়া গেছে। মেসের পথে চলিতে চলিতে ইন্দ্রসেন অস্ফুট স্বরে নিজেকে বলিল, আমার রক্তে আজও সেই আদিম পুরুষ বর্তমান আছে, যে নারীকে আপন করিয়াছিল যৌবনের কল্পনায় নয়, তাড়নায়—সৃষ্টির আয়োজনে নয়, বিলাসের ব্যবহারে।

ইন্দ্রসেন কয়েক দিন আসে নাই। মণিপ্রভা সেজন্য মোটেই স্নেহাকুল হন নাই। আইভির প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত মোলায়েম মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, 'সে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।'

হয়তো তাহাই হইবে। কিন্তু কাহার সঙ্গে যুদ্ধ আর কিসের জন্য যুদ্ধ তাহা মণিপ্রভা বলিলেন না, মণিপ্রভার সহচরী আর সহবাসীরা তাহা জানিল না। কেহ সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন কাহারও উপর চালাইল না, কারণ তাহাতে ফল মিলিবে অত্যন্ত কম। হয়তো মণিপ্রভা সামান্য হাসিবেন, নয়তো অলস উদাসীন চোখ মেলিয়া ধরিবেন প্রশ্নদাতার কৌতূহলী চক্ষুর উপর। সে আলস্য অসহ্য।

প্রতিমা সেদিন আসিল। আইভির সঙ্গে উপরের পশ্চিমের কোণের ঘরে বসিয়া গল্প চলিতেছিল, এমন সময় মণিপ্রভা অনধিকার প্রবেশ করিলেন। এ কথা ও কথা শেষ হইলে মণিপ্রভা প্রশ্ন করিলেন, 'ইন্দ্রকে তোমার কেমন লাগে প্রতিমা?'

একটু আগে আইভির কাছে সমস্ত পূর্বঘটনা শুনিয়াছে প্রতিমা। সকল কিছু শুনিতে শুনিতে তাহার দুই চক্ষু উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সুন্দর সুগঠিত গৌর কপালে ভ্রূকুটির বলিরেখা জাগিয়াছে। এইবার শ্লেষের হাসি হাসিয়া প্রতিমা উত্তর দিল মণিপ্রভার প্রশ্নের; বলিল, 'তার্কিক ব্যক্তি! সকল কিছু নিজের মতে নামিয়ে আনতে চান।'

মণিপ্রভার চোখের দিকে চাহিয়া প্রতিমা বুঝিল মণিপ্রভা আরও স্পষ্টরূপে প্রতিমার কথা শুনিতে চাহেন। প্রতিমা বলিল, 'লোক হিসাবে খুব ভাল কিন্তু আমার মতের সঙ্গে ওঁর মত মিলবে না।'

'তোমার কি মত প্রতিমা?'

'আমার কোনও মত নেই। তবে ব্যাপারটা কি জানেন, যে সকলকে নিজের মতের নীচে নামিয়ে আনতে চায় তারই বিরুদ্ধে দাঁড়ান আমার স্বভাব।'

'সে বিরুদ্ধবাদীর কাছে যদি তোমার দাঁড়াবার শক্তি না থাকে?'

'তা হ'লেও আমি দাঁড়াবার চেষ্টা অন্তত করব। আমার ব্যক্তিত্বকে আমি নীচু হ'তে দেব না কারও কাছে, সেই ব্যক্তি যদি সত্যপথে চলেন তবুও, কেননা কোনও অসত্য আমি নিজের প্রেরণায় করি নি বা করব না।'

আর কোনও কথা হইল না। কিছু আগে এই ঘরে সুখেন্দু আসিয়াছিল। যে দৃষ্টিতে সে প্রতিমার দিকে চাহিতেছিল, মণিপ্রভার অলস উদাসীন চোখ সেই দৃষ্টির রহস্য অনায়াসে ভেদ করিল।

'তোমরা ব'স।' মণিপ্রভা উঠিয়া গেলেন। বারান্দার কোণের টবে বসান ছোট্ট তুলসী গাছটির গোড়ার মাটি একটা নিড়েন দিয়া আলগা করিয়া দিতে দিতে মণিপ্রভার চোখে পড়িল আইভি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইন্দ্রসেন আসিল। মণিপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁ রে, ক দিন আসিস নি কেন?'

উত্তরে ইন্দ্রসেন অনেকগুলি আবশ্যক অনাবশ্যক কথা কহিয়া গেল। বলিল, 'মনটা বড় খারাপ হয়েছিল দিদিমা। ভাবছিলাম তোমার টাকায় আমার প্রয়োজন নেই, বিয়েও আমাকে দিয়ে করা পোষাবে না। তবে কি জানি কেন মনটা যে খারাপ হ'ল—'

মণিপ্রভার কোলে মাথা রাখিয়া ইন্দ্রসেন শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বড় বড় আকুঞ্চিত চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে মণিপ্রভা বলিলেন, 'যাক গে ওসব কথা। মনটা চাঙ্গা কর্ ইন্দ্র। সুখেন্দুর সঙ্গে প্রতিমার বিয়ে সামনের অঘ্রানে, কোমর বেঁধে খাটতে হবে।'

চোখ বুজান অবস্থাতেই অলস ইন্দ্রসেন বলিল, 'বেশ তো, শুভসংবাদ। নিশ্চয়ই কোমর বেঁধে খাটব।'

মণিপ্রভার পর্যবেক্ষণকারী চক্ষু দেখিল ইন্দ্রসেনের মুখের রং বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হইল না। মণিপ্রভা নিজেকে প্রশ্ন করিলেন, তবে কেন সেদিন ইন্দ্রসেনের হাতের পেয়ালায় চমকের গতি লাগিয়া পেয়ালা ছাপাইয়া চা পড়িয়াছিল?

সে প্রশ্নের উত্তর মণিপ্রভা পাইতেন যদি তিনি ইন্দ্রসেনের বুকের উপরে হাত রাখিতেন।—সমস্ত রক্ত যেন চমক খাইয়া ধমনী হইতে ছিটকাইয়া বাহিরে আসিতেছিল সেই সময়ে যখন ইন্দ্রসেনের সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলী কণ্ঠের স্বরকে করিয়াছে অলস উদাসীন, ধ্যানী বুদ্ধের গম্ভীর নির্লিপ্ততা সারা মুখে মাখাইয়া চক্ষু করিয়াছে নিমীলিত।

বিয়ের দিন সন্ধ্যার সময়ে মণিপ্রভা খবর পাইলেন, রাজদ্রোহের অপরাধে ইন্দ্রসেন গ্রেপ্তার হইয়াছে। পরের দিন জামিনে ইন্দ্রসেন মুক্তি পাইয়া দেখিল, মোটরে বর-কনে রূপে সুখেন্দু-প্রতিমা বসিয়া আছে। মণিপ্রভার আদেশ মত তাহাদের মাঝখানে ইন্দ্রসেন স্থান সংগ্রহ করিল।

গাড়ি রেজিস্টারী অফিসে আসিয়া থামিল। মণিপ্রভা এইবার কায়েমী উইল করিলেন।—তাঁহার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এবং টাকাকড়ি প্রতিমা-সুখেন্দু এবং অরূপ ও আইভির। বিস্মিত হইলেও ইন্দ্রসেন কোনও কথা কহিল না। এইসকল ক্ষেত্রে কোনও কথা কওয়া তাহার স্বভাববিরুদ্ধ।

গাড়ি আবার ছুটিল। মণিপ্রভা বেলতলা রোডে গাড়ি থামাইতে বলিলেন। তার পর কংগ্রেসের আজীবন স্বেচ্ছা-সেবিকা শ্রেণীর দলে নাম লিখাইলেন। মণিপ্রভার পায়ের ধুলা লইতে লইতে ইন্দ্রসেন কিছুতেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, মণিপ্রভা কেমন করিয়া জানিলেন যে, সে মণিপ্রভার সম্পত্তি চাহে নাই, প্রতিমাকে চাহে নাই, চাহিয়াছিল মণিপ্রভাকে; সম্পূর্ণ মণিপ্রভাকে নিজের মতে আনিতে এবং আনিয়া ধরিয়া রাখিতে।

সামরিক বলের মান নির্ণয়

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনও দেশের কেবল অস্ত্র ও জনবলের দ্বারাই সামরিক শক্তি নির্ণীত হয় না, উহার ভৌগোলিক অবস্থানের উপরও তাহা বহুলাংশে নির্ভর করে। সমুদ্র পরিবেষ্টিত ইংলণ্ড তাহার নৌবলের উপর যতখানি নির্ভর করিতে পারে, তিন দিকে স্থল পরিবেষ্টিত জার্মানি তাহা পারে না। এইজন্যই জার্মানির সামরিক নীতি ও সমরসজ্জা ব্রিটেন হইতে স্বতন্ত্র। প্রত্যেক দেশেরই এইরূপ সমরনীতিতে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য এবং সমরসজ্জায় অল্পবিস্তর স্বাতন্ত্র্য বর্তমান।

প্রথমেই বলা যায়, স্থলবাহিনীতে যুদ্ধবিগ্রহের সুবিধার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ডিভিশন সৃষ্টি করা হয়। ডিভিশনে পদাতিক সৈন্য ও তৎসঙ্গে গোলন্দাজ-বাহিনী এবং অন্যান্য সমরসম্ভার থাকে। বিমান বিভাগে ঐরূপ পূর্ণাঙ্গ বিমান-বহরকে বলা হয় স্কোয়াড্রন; তন্মধ্যে বোমারু বিমানই হইল আক্রমণ চালাইবার প্রধান অবলম্বন। নৌবহরে 'ব্যাটলশিপ' বা অতিকায় রণতরীই হইল কেন্দ্রীয় শক্তি; ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার, ডুবোজাহাজ, টর্পেডো বোট প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীর যুদ্ধজাহাজকে উহার সাহায্যকারী হিসাবে গণ্য করা হয়। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, জগতে সকল দেশের নৌবহরে অতিকায় রণতরী নাই; ওইগুলির নির্মাণ এত ব্যয়সাধ্য যে, একমাত্র প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে ওইগুলি নির্মাণ করা দুষ্কর। পৃথিবীর সবগুলি অতিকায় রণতরীর সংখ্যা ষাট-সত্তরখানির বেশী হইবে কি না সন্দেহ।

জনবলকে ভিত্তি করিয়াই সমরায়োজন হয়, কিন্তু কেবল জনবল দিয়া সামরিক শক্তি নিরূপণ করা যায় না। মানুষই যুদ্ধ করে, যন্ত্র কখনও যুদ্ধ করে না, উহা মানুষের হাতে চালিত হয় মাত্র। কিন্তু যন্ত্র যদি না থাকে, মানুষ সেখানে অচল। কাজেই যুদ্ধ চালাইবার জন্য মানুষের হাতে দেওয়া চাই যথোপযুক্ত অস্ত্র।

অস্ত্র ছাড়া মানুষ যুদ্ধ করিতে পারে না, অতএব কোনও দেশের রণশক্তি জনবলের দ্বারা যথার্থ নিরূপিত হয় না, অস্ত্রের পরিমাপও বিশেষভাবেই বিবেচনা করিতে হয়। অস্ত্র নির্মাণ ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পূর্ণাঙ্গের একটি ব্যাটারি গড়িয়া তুলিতে অন্তত দেড় বৎসর সময় লাগে। একটি অতিকায় রণতরী নির্মাণ করিতে প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া যায়। সম্পদ ও সামর্থ্য থাকিলে একসঙ্গে ইহার অনেকগুলি নির্মাণ না করানো যায় এমন নয়, কিন্তু কথা হইল এই যে, ইচ্ছা করিলেই রাতারাতি এইগুলির সংখ্যা বাড়ানো যায় না; আর বিশেষত তেমন সম্পদ বা সামর্থ্যই বা কয়টা রাষ্ট্রের আছে? কাজেই সামরিক শক্তি নিরূপণে হাতের কাছে কাহার কত লোক ও কি পরিমাণ সমরসম্ভার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে, সাধারণত তাহারই হিসাব করা হয়।
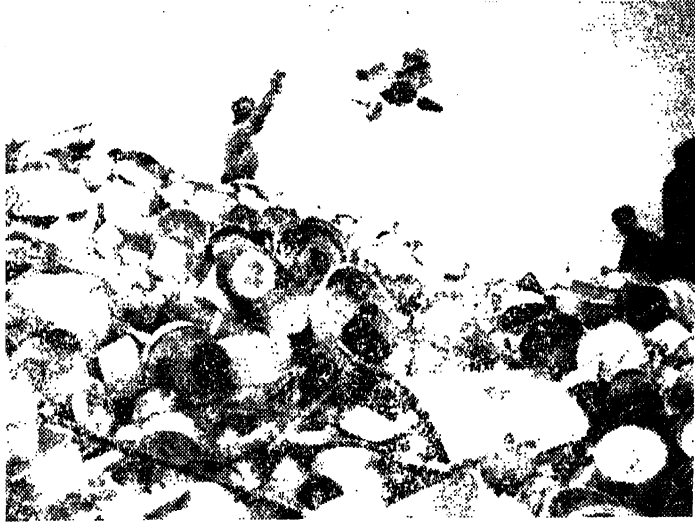
বিমান প্রস্তুতের জন্য ইংলণ্ডের একটি কারখানায় সংগৃহীত অ্যালুমিনিয়াম বাসনের স্তূপ

গত মহাযুদ্ধের পর প্রায় সর্বত্রই স্থলবাহিনীর ডিভিশনগুলি পুনর্গঠিত হয়। একটি ডিভিশনে সাধারণত থাকে পদাতিক বাহিনীর তিনটি রেজিমেণ্ট (ইহার শক্তি নয় ব্যাটেলিয়নের সমান) এবং তৎসঙ্গে নানা শ্রেণীর হালকা কামানবহর। এতদ্‌সহ আরও থাকে অশ্বারোহী, সাঁজোয়া-গাড়ি, এঞ্জিনিয়ার, সংকেতকারী, চিকিৎসক, রসদ সরবরাহ-কারী, সৈন্য এবং যুদ্ধের নানাবিধ সাজ সরঞ্জাম। ডিভিশনের লোক সংখ্যা সাধারণত ষোল হাজার; কাহারও সামান্য কম, কাহারও সামান্য বেশী। এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে। গ্রেট ব্রিটেনের আধুনিক ডিভিশনগুলি তিনটি ব্রিগেড লইয়া গঠিত। তিন ব্রিগেডে থাকে বার ব্যাটেলিয়ন করিয়া পদাতিক। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডিভিশনগুলিতে থাকে চার রেজিমেণ্টে পদাতিক-বাহিনীর বারটি বড় ব্যাটেলিয়ন, দুইটি ব্রিগেড এবং তৎসহ একটি তিন-রেজিমেণ্টী ফিল্ড আর্টিলারি ব্রিগেড। জাপানের ডিভিশনে পদাতিকের সংখ্যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডিভিশনেরই প্রায় সমান, কিন্তু গোলন্দাজের সংখ্যা কিছু কম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন যে, তিন রেজিমেণ্ট পদাতিক ও তৎসহ নানা শ্রেণীর গোলন্দাজ লইয়া গঠিত একটি ফিল্ড আর্টিলারি সমেত ডিভিশন সৃষ্টি করিলে সুবিধা হয় কি না। কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ইহার স্বাভাবিক ডিভিশনগুলির গঠন গত মহাযুদ্ধের আমলের

জার্মান বোমায় বিধ্বস্ত ইংলণ্ডের একটি শহরের দৃশ্য

বৃটেনের নৌ-বিভাগীয় বিমানবহর
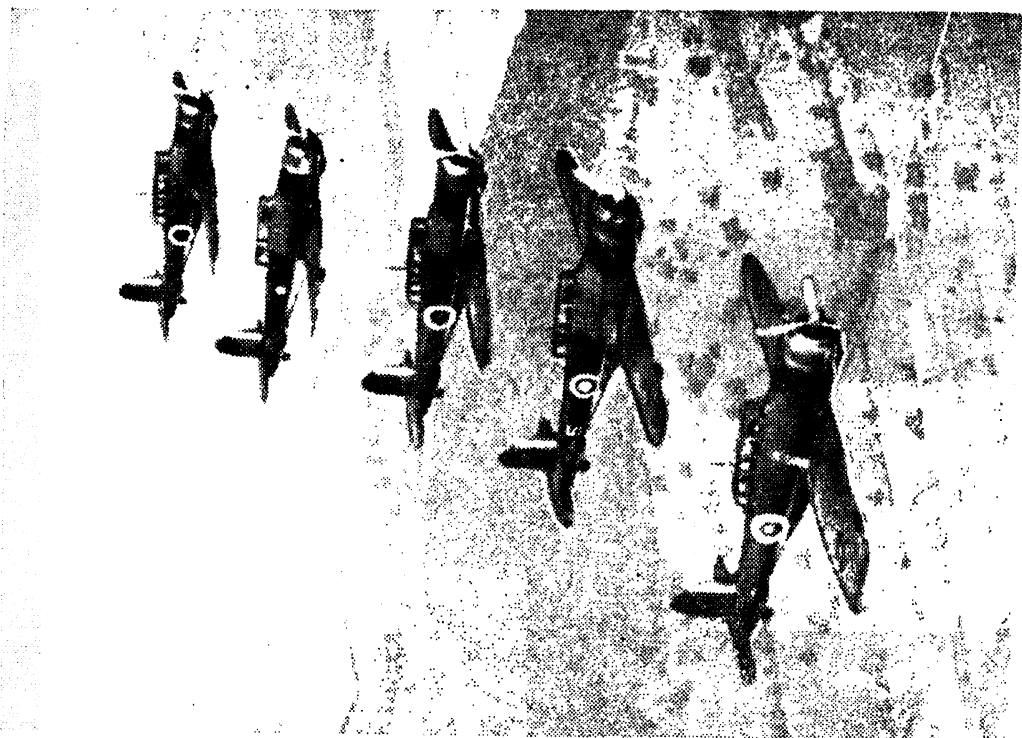
ডিভিশনগুলিরই অনুরূপ রহিয়াছে। উহার অফিসার ও সৈন্য মিলিয়া লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার।

সেনাদলের ডিভিশন গঠনের সময় প্রত্যেক দেশকেই বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হয় উহার গোলাগুলি ছুড়িবার মোট শক্তি ও উহাকে পরিচালনার সুবিধা অসুবিধার কথা। কলেবর বৃদ্ধি করিতে গেলে যেমন পরিচালনায় অসুবিধা হয় তেমনই সৈন্যসংখ্যা বেশী কমাইতে গেলে গোলাগুলি ছুড়িবার মোট শক্তি হ্রাস পায়। এইজন্যই জনবল ও অস্ত্রবলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়া প্রয়োজন অনুসারে ডিভিশন গঠন করিতে হয়।

ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইল বিমানযুদ্ধ। বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রথমেই বিবেচনা করিতে হয় বিপক্ষের বিমানঘাঁটিগুলির দূরত্ব ও বোমারু বিমানগুলির গগন পর্যটনের ক্ষমতা। আধুনিক বোমারু বিমানগুলির গতিবেগ গড়পড়তা ঘণ্টায় ২৫৩ মাইল ধরা যাইতে পারে। বিমানঘাঁটি হইতে ৫ শত মাইল দূরে গিয়া বোমারু বিমানগুলির বোমা ফেলিতে সাধারণত কোনও অসুবিধা হয় না। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে ৫ শত হইতে এক হাজার মাইল দূরে গিয়াও তাহারা আক্রমণ চালাইতে পারে; কিন্তু কতকগুলি স্বতন্ত্র সুবিধা না পাইলে তাহা সম্ভব হয় না।

একটি বোমারু বিমানের যতটা পাল্লা অর্থাৎ যতটা পথ উড়িয়া গিয়া সে ফিরিয়া আসিতে পারে, বোমা বোঝাই অবস্থায় সাধারণত তাহার অর্ধেকের বেশী দূর তাহাকে পাঠানো হয় না। এতদ্ব্যতীত লড়াইয়ের জন্য ঘোরাফেরা করিতে যে সময়টা যায় তাহাও হিসাব করিয়া বাদ দিয়া আক্রমণের জন্য বোমারু বিমানের পাল্লা নির্ণয় করিতে হয়। যুদ্ধের বিমানগুলি খুবই মূল্যবান, কাজেই কথায় কথায় যে-সে কারণে সেগুলি পাঠানো হয় না। পাঠাইবার সময় যথেষ্ট হিসাবনিকাশ করিয়া পাঠানো হয়, যাহাতে সেগুলি ফিরিয়া আসিতে পারে এবং বিপক্ষের আক্রমণের মুখে গিয়া না পড়ে। শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া চুপে চুপে বোমা ফেলিয়া আসিবার জনাই বোমারুগুলি প্রাণপণ চেষ্টা করে, পারত-পক্ষে বিপক্ষের মুখামুখি হয় না।

বোমা ফেলিবার জন্য সবসময় একই বিমান ঘাঁটি হইতে বোমারু বিমান প্রেরিত হয় না। অধিকাংশ সময়ই একাধিক ঘাঁটি হইতে বোমারু বিমান পাঠানো হয় এবং পথে কোথাও মিলিত হইয়া দলবদ্ধভাবে সেগুলি শত্রুর এলাকায় বোমা ফেলিবার জন্য ছোটে। স্পেন-যুদ্ধে বিমান আক্রমণের পরিধি বিস্তারের এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হয়। দেখা যায়, লক্ষ্য স্থানের উপর বোমা ফেলিবার পর যে ঘাঁটি হইতে বোমারু বিমানগুলি উড়িয়া যায় সেখানে ফিরিয়া না আসিয়া অন্য ঘাঁটিতে গিয়া সেগুলির অবতরণ করা অনেক সময় সুবিধার। একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইতে পারে। জার্মানি হইতে সুয়েজ খালের মুখ অনেক দূর। কাজেই জার্মানি হইতে বোমারু বিমানের সেখানে আসিয়া আক্রমণ চালাইয়া পুনরায় জার্মানিতে ফিরিয়া যাওয়া কঠিন, অথচ জার্মানির মিত্রশক্তি ইতালির কোনও বিমান ঘাঁটি নিকটে পাইলে সেখানে গিয়া তাহার অবতরণ করা খুবই সহজ। কাজেই দেখা যায়, এইভাবে পারস্পরিক সহযোগিতায় বিমান আক্রমণের পরিধি বিস্তার করা সম্ভব, তবে সর্বত্র এই সুবিধা নাই বলিয়া সর্বক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নয়।

আধুনিক যুদ্ধে যেসকল বিমান ব্যবহৃত হয় সেগুলির গড়পড়তা ঘণ্টায় গতিবেগ ধরিলে এইরূপ দাঁড়ায়।—বোমারু—২৫০ মাইল, ফাইটার—৩০০ মাইল, পর্যবেক্ষক বিমান—২৫০ মাইল, সৈন্য ও রসদবাহী বিমান—১০০ মাইল। ব্রিটেনের 'স্পিটফায়ার', ফ্রান্সের 'কার্টিস' এবং এবং জার্মানির 'মেসার্সমিট' শ্রেণীর ফাইটার বিমানগুলির গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০০ মাইলের বেশী ধরা হয় না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কোনও দেশের সামরিক গুরুত্ব সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে হইলে সেই দেশের প্রাকৃত-ভূগোল জানা একান্ত দরকার। কেবল অস্ত্রবল ও জনবলের হিসাব দ্বারাই সেই দেশের শক্তির যথার্থ পরিমাপ করা যায় না, ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা অসুবিধার কথাও বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করিতে হয়। সর্বশেষ কথা হইল, যুদ্ধের চরম সাফল্য নির্ভর করে স্থলবাহিনীর উপর; তাহাদিগকেই গিয়া দেশ দখল করিতে হয়। সেখানে সুবিধা নৌশক্তি তাহাদিগকে সেই দেশ দখলে সাহায্য করে। আজকাল বিমানবহরও অবশ্য স্থলবাহিনী বহন করিয়া সুযোগ সুবিধা মত এই কাজে সহায়তা করিতেছে, কিন্তু তাহার প্রধান লক্ষ্য হইল শত্রুর রাজ্যে বিভীষিকা সৃষ্টির দ্বারা স্থলবাহিনীর বিজয় পথকে সুগম করিয়া দেওয়া।

মদন হাজরার নাতি

(গল্প)

শ্রীঅজিতকুমার রায়চৌধুরী

যদু এসে পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ব্যাপার কি? প্রথমটা একটু অবাক্ হ'য়ে গেল নরেশ।

'কি যদু, ব্যাপার কি?'

'আজ্ঞে, আপনার রাজত্বে বাস ক'রে এমনও অপমান সহ্য করতে হবে?' চোখের জল মুছে যদু বললে।

'কে অপমান করলে তোমায়?'

'আবার কে, সেই মুখপোড়া!'

যদু হাজরা কাকে যে মুখপোড়া বলে তা সবাই জানে। সংসারে ওর থাকবার মধ্যে এক ছেলে শ্রীবাস আর তার স্ত্রী হরিদাসী ও শ্রীবাসের ছেলে সুদাম। শ্রীবাস সম্প্রতি মাদারিপুরে যাত্রা দেখে এসে প্রাণপণে উঠে প'ড়ে লেগে গেছে যাতে ওদের গ্রামেও ওই রকম একটা দল খোলা যায়। কিন্তু দল খুলতে গেলে যে পরিমাণ টাকার দরকার তা ওর হাতে নেই, অথচ জানে বাপ যদু হাজরার রাত্রে ঘুম হয় না চোর-ডাকাতের ভয়ে। হরিদাসীকে দিয়ে বাপের কাছে দু-একবার টাকা চেয়ে পায় নি। ইদানীং বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

'তা, তোমার ছেলে যদি তোমায় অপমান করে আমি তার কি করতে পারি?' নরেশ বললে।

'বাঃ, আপনি পারেন না? আচ্ছা ক'রে ধমকে দিন সায়েস্তা হয়ে যাবে। আপনিই বলুন ছোটবাবু, গরিবের ঘোড়া রোগ কেন? যাত্রার দল খুলবেন তিনি এখন তুমি শালা টাকা দিয়ে মর। আমি কি টাকার গাছ পুঁতেছি? তাই বলেছি ব'লে, যা মুখে এল তাই বললে। না হয় মানলুম আমার টাকা আছে, তা সেগুলো কি উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে? বলুন আপনি হক কথা। আমায় বলে কিনা, তুমি বাপ না চামার? শুনুন একবার কথার ছিরি! আরে ছিবাস তুই তো সিদিনকার ছেলে। যদুর বাপ মদনগোপালের নাম না নিয়ে এ জেলার কেও জল খায়? আমি তারই বেটা, তুই আবার তার নাতি, তুই বাপকে বলিস কি না চামার?'

শিরোমণি মশায় বললেন, 'যদু ভাল চাও তো এই বেলা তাড়িয়ে দাও,' কথায় ব'লে—।

'তুমি থাম গোঁসাই। তাড়িয়ে দাও বললেই হ'ল আর কি।'

'আচ্ছা, তুমি শ্রীবাসকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও ওবেলার দিকে।' নরেশ বললে।

'আমার কথায় সে আসবে না ছোটবাবু, আপনার চাকরটাকে পাঠিয়ে দেবেন।'

'আমার পাল্লায় পড়লে বাছাধনকে দু দিনেই সায়েস্তা করতুম।' শিরোমণি বললেন।

'আগে নিজের ঘর সামলাও গোঁসাই, তার পর অপরের দিকে নজর দিও।'

'এখন বাড়ি যাও যদু, মাথা ঠান্ডা কর গে।' নরেশ বললে।

'আর মাথা ঠান্ডা! কুপুত্তুর হ'লে কি আর ঠান্ডায় থাকা যায়। আপদ মরেও না, একদিন কেঁদে কেটে বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে নিশ্চিন্দি থাকতে পারি।'

শিরোমণি বললেন, 'বলা যায় না যদু, ভাঙায় কলেরা লেগেছে বাজিতপুরে আসতে কতক্ষণ? শ্রীবাস দু বেলা বাজার যায়।'

'ছিবাসের কেন কলেরা হবে গোঁসাই? তোমার হরির ও হ'তে পারে?'

নরেশ কৃত্রিম বিরক্তির সঙ্গে বললে, 'কেন যদুকে চটান শিরোমণি মশায়।'

'চটায় কে? আপনার চাকরকে অবিশ্যি পাঠাবেন ছোট-বাবু।' যদু চ'লে গেল।

কাটফাটা রোদ মাথায় ক'রে সমস্ত গ্রামখানা অকারণে যদু ঘুরল। বাড়িতে আর যাবে না, কি হবে গিয়ে? কিন্তু না গেলেই বা চলে কই। পুবের ঘরের সিন্দুকের মধ্যেই তো সকালের আদায়ী সুদের টাকাগুলো রয়েছে। বলা যায় না, আজকালকার ছেলে সব করতে পারে। যদি গিয়ে দেখে সিন্দুক ভাঙা? না, শ্রীবাসের অত সাহস হয় নি। তা ছাড়া শরীরে অত ক্ষমতাও নেই। সেদিনও দু হাতে দু ঘড়া জল আনতে হিমসিম খেয়েছে। আচ্ছা ভেঙেই দেখুক না। সাত বছর জেলের ঘানি টানাব তা হলে।

উঠনে পা দিয়ে বাড়িটা অসম্ভব রকমের ফাঁকা ফাঁকা বোধ হ'ল। বউমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল নাকি? না, ঐ তো রান্নাঘরের দাওয়ায় শুয়ে আছে, সুদাম বসে খেলছে। সুদাম বার কয়েক দাদু, দাদু বলে ডাকল, হরিদাসীও উঠে বসল।

বার দু-এক জিব দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে যদু বললে, 'ছিবাস খেয়ে গেছে?'

'হ্যা, আপনি ছিলেন কোথায় বাবা? চান ক'রে আসুন, বেলা যে গড়িয়ে গেল।'

স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে যদু বলল, 'আর চান করা মা! ছেলে সখ ক'রে একটা দল খুলতে চাইছে তাও টাকার জন্যে হচ্ছে না। শালারা সব ধার নেবার বেলা আছে, শোধ দেবার নামটি নেই। আর দেবেই বা কোত্থেকে? ধান পাট একদম হয় নি, খেতেই পায় না সব। আবার তাও বলি, যাত্র'র দল কি আর ভদ্দর লোকের পোষায়? তুমিই বল বউমা, মদন হাজরার নাতি করবে যাত্রা, লোকে গায়ে থুতু দেবে না? বল, তুমিই বল। যাক গে, শোন, ছোটবাবুর চাকর ছিবাসকে ডাকতে এলে বলো, সে কাঙালি পাড়ায় গেছে। আমার আবার কি খেয়াল হ'ল, ছোটবাবুর কাছে নালিশ ক'রে এলাম। আরে ছেলে বাপের কাছে আবদার করবে না

করবে কি ভিন গাঁয়ের লোকের কাছে? একটু তামাক সেজে আন দিকি বউমা, না থাক গে সে আমিই নিচ্ছি। কিরে বিন্দী, এই তোর সকাল? বলেছিলুম না, একটু তাড়াতাড়ি এসে তেঁতুলগুলো ফেটে দিয়ে যাবি? না, যেমন ঘরের গুলো তেমনি তোরাও, আমায় পাগল ক'রে ছাড়বি। দাদুভাই, মার কাছ থেকে তেলের বাটিটা আনতো। শুক বলে আমার কৃষ্ণ......।' যদু ঘরের মধ্যে গুন গুন করে গান করতে করতে গেল।

সন্ধ্যা বেলায় তাগাদা থেকে বাড়ি ফিরতে যদুর প্রায়ই রাত হয়ে যায়। কুশারীদের বাড়ি ফিরত ত্রিলোচনের বাড়িটা ঘুরে যদু বাজারের উপর দিয়ে বাড়ি আসছিল। মিত্তিরদের বাড়ি থেকে গানের সুরে ভেসে আসছিল, কারা যেন গান করছে; বোধ হয় যাত্রার মহড়া চলেছে! যদু ভাবলে, ফাঁকতালে দূরে দাঁড়িয়ে থেকে শ্রীবাসের অভিনয় দেখা যাক। মিত্তির মশায় তো বলেন, 'শ্রীবাস সুন্দর অ্যাক্টো করে।'

সাবিত্রী-সত্যবানের মহড়া চলছে। শ্রীবাস নিয়েছে সাবিত্রীর ভূমিকা, গয়লাদের ছেলে ভীম যমরাজের। সাবিত্রীরূপিণী শ্রীবাস প্রাণ ভিক্ষা চাইছে যমরাজের কাছে। ভীমের অঙ্গভঙ্গি ঠিক যমরাজের মতন না হ'লেও নেহাৎ খারাপ হচ্ছে না। যাত্রা দলের স্বত্বাধিকারী ও মোশান মাস্টার কেষ্ট মিত্তির পানীয়বিশেষের প্রভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে বলছেন, 'ভীম, পশচার দেখাও......নইলে সব ফেলাট হয়ে যাবে।' মাঝে মাঝে ফরাসের উপর নিজেও ফ্ল্যাট হচ্ছিলেন।

শ্রীবাস চমৎকার অভিনয় করে, বউমাকে না দেখালে চলছে না। মহড়া দেখতে দেখতে যদু বার কয়েক চোখের জল মুছেছিল। শ্রীবাসের অভিনয় দেখে তার মনে হচ্ছিল, সত্যিই যেন পুরাকালের সেই সাবিত্রী গয়লাদের ছেলের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছে।

বাড়িতে গিয়ে হিসেব পত্তর শেষ ক'রে তামাক টানতে টানতে শ্রীবাসের অভিনয়টা যদু ভাবছে। হরিদাসী রান্না করছে, সুদাম কান্না ধরেছে।

'বউমা, রান্না-টান্না ফেলে দিয়ে ছেলেটাকে নেও দেখি, কেঁদে যে খুন হয়ে গেল।'

বউমা যে রান্না থামাল তা টের পাওয়া গেল সশব্দে কড়াই নামাবার আওয়াজে। ছেলেটার পিঠে ঘা কতক পড়ল।

'যতসব চাষাড়ে কাণ্ড। ছেলে পিলে ওরা একটু তো কাঁদাকাটি করবেই। কোলে ওঠার বয়স কি ওর গেছে? তা, সেটা আছে তার যাত্রা নিয়ে আর তুমি আছ তোমার রান্না নিয়ে। এটা এখন মরুক আর বাঁচুক। যাত্রা ক'রে স্বর্গের সিঁড়ি বানাবে সব। কোথায় দু দণ্ড ঘরে স্থির হয়ে বস, তা নয় যতসব—দাও দেখি ওকে। ইশ্, গালটা একেবারে ফুলে ঢোল হয়েছে—এই এই খেলে, সব খেলে—যা যা—নাঃ বেড়ালগুলোও যেন ভয়ডর সব ছেড়ে দিয়েছে। ঢেকে রাখতে পার না? সে বাবুর তো আবার ভাল জিনিসটুকু না হ'লে নাকের তলা দিয়ে ভাত নামতে চায় না। আয় করতে পারে না এক পয়সা, হুঃ। আয় দাদুভাই—মা নয় তো যেন ডাইনী—আয় আয় চাঁদা মামা।'

যদু সুদামকে নিয়ে মিত্তিরদের বাড়িতে হাজির হ'ল। প্রাণভিক্ষার পালা শেষ হয়েছে, সত্যবান বেঁচে উঠেছে। 'মোশান মাস্টার' তখনও স্থানবিশেষের 'মোশান' দেখাতে ব্যস্ত, সব ফ্ল্যাট। যদু ঘরে গিয়ে ঢুকল।

'এস হে হাজরার পো! বুঝলে যদু, ছেলে যা তোমার পাট করে ওঃ—ও না থাকলে সব ফেলাট। তবে আজকে গানটা ভাল গাইতে পারলে না, গলাটা একটু ধরা দেখলাম। তা সেরে যাবে'খন, ও না থাকলে সব ফেলাট। কি রে শালা, বাবার পাট দেখতে এয়েছিস?' সুদামের গাল টিপিলেন কেষ্টবাবু।

'আর গলা ভাঙার দোষ কি। গান টান সব সাধনার জিনিস—না—কি?'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়ই।' ঘাড় নেড়ে কেষ্টবাবু মোশান দিলেন।

'তা আমার কথা কি আর শোনে? পই পই ক'রে বারণ করি ঠাণ্ডা লাগাস নি গলা ধরে। ছিবাস গলায় কাপড়টা জড়া। দাদুভাই, ওই যে কেমন ব্যায়লা, হারমোনি, নাঃ...... আবার ঘুমোয়। আয় রে ছিবাস, রান্না হয়ে গেছে।'

বাজিতপুরের লোক স্বীকার করলে যে, এরকম অ্যাক্টো তারা জীবনে দেখে নি। সাবিত্রীই তাদের মুগ্ধ করেছে বেশী। কি গলা, কি চেহারা, কি অভিনয় শ্রীবাসের। হরিদাসী চিকের আড়ালে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বেনার মা তো স্পষ্টই বললে, 'ক্ষান্তর সঙ্গে ছিবাসের বিয়ে না দেওয়া ভুল হয়েছে।'

চৈত্রের খরতেজে সমস্ত গ্রামখানা যেন পুড়ে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ দুপুরে, যদু দাওয়ায় ব'সে তামাক পাতা কাটছে। হরিচরণের মেজোছেলে কয়েকজন লোক নিয়ে যদুর কাছে এল।

'কাকে চান আপনারা?'

আগন্তুকদের মধ্যে একজন বললে, 'এটা কি যদু হাজরার বাড়ি?'

আজ্ঞে, আমার নামই যদু হাজরা, মশায়দের নিবাস?

আজ্ঞে আমরা মাদারিপুরে থাকি। শ্রীবাসবাবুকে আমাদের যাত্রার দলে এক রাত্তির প্লের জন্যে নিতে এসেছি। গ্রেট ইস্টবেঙ্গল যাত্রা পার্টির নাম শুনেছেন বোধ হয়?'

'ছিবাস যাবে কি ক'রে? ছিবাসের শরীর ভাল নেই। কদিন ধ'রে খালি রাত জাগা চলেছে, আজ চাঁদরদি কাল সদরদি পরশু ভাঙ্গা তরশু শিরঘাড়া, মেহনতের একশেষ।

'বড় হওয়া এক জ্বালা মশায়।'

তার পর কাজের কথা উঠল। আগন্তুকরা নাছোড়-বান্দা, যদুও শ্রীবাসকে ছাড়বে না। হঠাৎ একটা কথা যদুর মাথায় খেলে গেল। এইতালে কিছু আয় করা যাক না কেন? অবশেষে দর হেঁকে বসল। আগন্তুকরা বলল, 'এক রাত্তির প্লের জন্যে খাওয়া ও যাতায়াতের খরচা বাদে আমরা এক টাকার বেশী দেব না।' যদু হেঁকেছে দশ টাকা।

'এক টাকা? এক টাকা মশায় যারা মোট বয় যাত্তার দলে, তারা পায়। বাজিতপুরে সখীরা কত পায় জানেন? দু টাকা। আর আপনি বলছেন সাবিত্রীকে এক টাকা দেবেন। হবে না মশায়, হবে না।'

বিকেলের দিকে শ্রীবাস একথা শুনে রেগে আগুন। এ বাপ নয়, শত্রু। ছেলের উন্নতির অন্তরায় হয়ে যে বাপ দাঁড়ায় এমন কথা শ্রীবাস কোনও দিন শোনে নি। গ্রেট ইস্ট-বেঙ্গল যাত্রাপার্টি থেকে ডাকতে এয়েছিল আর বাবা কিনা...

শ্রীবাস ক্ষেপে উঠল। যদুকে যা মুখে এল তাই বললে।

'তোরই ভালর জন্যে বলা, আমার আর কি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। বলি দুবেলা রাজভোগ আসে কোত্থেকে। দশ টাকা চেয়েছি তাতে কি হয়েছে। পারব না বাপু, তিন শ পঁয়ষট্টি দিন তিনজনের হাতির খোরাক যোগাতে। মাগ ছেলের হাত ধ'রে যেখানে খুশি সেখানে যাও। ওসব যাত্তাফাত্তা করা চলবে না। এটা ভদ্দর লোকের বাড়ি, তাড়িখানা নয়।'

রাত্রে শ্রীবাস বাড়িতে এল না। হরিদাসী যদুকে একবার খোঁজ করবার জন্য বলল। হয়তো মিত্তিরদের বাড়িতে আছে। যদু মুখ খিঁচিয়ে উত্তর দিল, আহা! ওরে পটের বিবিরে। রাত দুপুরে এখন খোঁজ কর কোথায় গেল। কেন, অত যদি ভক্তিছেদ্দা থাকে তবে নিজেই যাও না কেন মিত্তিরদের বাড়িতে। বউ ঠিক থাকলে পুরুষের বাবার সাধ্যি কি এমন উড়নচণ্ডী-পানা ক'রে? তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া। দিন রাত কানের গোড়ায় ভ্যানর ভ্যানর—হুঃ!'

পরদিনও শ্রীবাসের দেখা নেই। গেল কোথায়? এমন তো কোনও দিন হয় না। রাগারাগি এর আগে বহুবার হয়েছে। সেদিনও শ্রীবাস মার খেয়েছে। না, অত বড় ছেলেকে সত্যিই এমনভাবে গালাগালি করা অন্যায়। হয়তো, কলকাতায় গেছে। সুবল মিত্তিরের ছেলে কাল রাত্রে রওনা হয়েছে কলকাতায়, তারই সঙ্গে গেছে বোধ হয়। কিন্তু টাকা পেল কোথায়? সিন্দুকটা একবার খুলে দেখা দরকার।

সিন্দুক খুলে দেখে সামনে যে ছোট থলিটা ছিল সেটা নেই। টাকাগুলো পরশুদিন সুদ বাবদ আদায় করেছিল। যার কাছে একটা পয়সা পাঁজরার সমান তার কাছে পঞ্চাশটা টাকা যে কতখানি তা সহজেই অনুমান করা চলে। যদু মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়ল। হরিদাসী ঘরে এসে ঢুকল। রাগ পড়ল হরিদাসীর উপর।

হারামজাদী, ডাইনী কোথাকার! বল্ সে কোথায়? অমন সোনার চাঁদ ছেলে শেষকালে তোর কথায় সিন্দুক ভেঙে টাকা নিয়ে পালাল, তোকে পুলিসে দেব।'

কথাটা দেখতে দেখতে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। রটিয়েছে বোধ হয় বিন্দী, শিরোমণি মশায় নিজের ছেলে হরিকে থানায় পাঠালেন, নবীন দারোগা তাঁর শিষ্য। যদুকে একটু টানা হেঁচড়ার দরকার। টাকা যে চুরি ক'রে শ্রীবাস পালিয়েছে এটা যদু অবশ্যই স্বীকার করবে। কান টানলেই মাথা আসে। একলা কিছুতেই টাকা চুরি করতে শ্রীবাস সাহস করে নি। সুবলের ছেলে বলাই শ্রীবাসের বন্ধু। র'স, এক ঢিলে দুই পাখি। যদুর আর সুবলের বড় তেল হয়েছিল, এইবারে তেল কিছু খসবে। মোটারকম খরচ না করাতে যদি পারেন তবে শিরোমণি ব্রাহ্মণই নন। রোজই সুদের তাগাদা দেওয়া, এবার সামলাও বাছাধনরা।

দারোগার সঙ্গে শিরোমণিকে দেখে যদু জ্ব'লে উঠল। শিরোমণি আশ্বাস দিয়ে বললে, 'ভয় নেই যদু, নবীন যখন এসেছে তখন আর ভাববার কিছুই নেই। বুঝলে নবীন তো আর যে-সে লোক নয়। মরা মানুষের কাছ থেকে চোরাই মাল বার করে, আর এ না হয় ফেরার হয়েছে।

'কে ফেরার হয়েছে, ছিবাস? না, না, সে তো কলকাতায় গেছে যাত্তা করতে। কেন মিছিমিছি একে কষ্ট দেওয়া।'

শ্রীবাস কিন্তু ফিরল না, এক সপ্তাহের মধ্যে। বাইরে খুব তেজ দেখালেও ভেতরটা যদুর পুড়ে যাচ্ছিল। রাগটা গিয়ে পড়ল হরিদাসীর উপর, যারা টাকা ধারে তাদের উপর। সুদ দেবার নাম নেই, এমন ছোটলোকের মেয়েই ঘরে এনে-ছিলুম, সংসারটা উচ্ছন্নে গেল।'

দিন কয়েক বাদে বলাই ফিরল। জানা গেল, শ্রীবাস তারই সঙ্গে কলকাতায় গেছে, তবে কোথায় যে এখন আছে তা বলাই জানে না। বোধ হয়, গ্রেট বেঙ্গল যাত্রাপার্টিতে শ্রীবাস ঢুকবে।

বছরখানেক ঘুরে গেল। শ্রীবাসের কোনও খবর নেই। হরিদাসীর দিকে তাকাতে পারে না যদু। সুদামটা বাবা বাবা ক'রে অস্থির। যদুর চেহারাটাও ভয়ানক ভেঙে পড়েছে। মেজাজটাও অসম্ভব রকমের খিটখিটে হয়ে উঠেছে। কোনও লোকের সঙ্গে সদ্ভাব নেই। মোশান মাস্টার কেষ্টবাবু আর যাত্রার নাম শুনলেই খেপে ওঠে। যাত্রা কেন করবে ভদ্রলোকের ছেলেরা? শ্রীবাস যাত্রা করে, ছি ছি, মদন হাজরার নাতি করে যাত্রা! গলায় দড়ি জোটে না? মদন হাজরার নাম এ জেলায় কে না জানে? তারই নাতি শ্রীবাস করে যাত্রা, ছি ছি। এতও যদুর কপালে ছিল।

প্রথম প্রথম যদু আশা করেছিল শ্রীবাস ফিরবে, হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেলেই আবার আসবে। কিন্তু দিনের পর দিন গড়িয়ে মাসের সৃষ্টি হ'ল তারপর বছর; আশা নিরাশার দোলায় দুলতে লাগল যদু।

সুদাম চমৎকার গান করে। মোশান মাস্টার যদুকে উপেক্ষা ক'রে সুদামকে দলে টানবার চেষ্টায় ব্যস্ত। সুদামের চহারাটা বেশ, মেয়েছেলের ভূমিকায় খুব ভাল মানাবে। কথাটা যদুর কানে যেতেই সে সুদামকে বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছে। সুদামকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে হবে। যারা খেতে পায় না তারা করবে যাত্রা।

আশা নিরাশার মধ্যে আরও কয়েকটা বছর কাটল। প্রতি মুহূর্তে যদু ভাবতে থাকত, ঐ বুঝি সে আসছে।

সেদিন পিয়ন এসে যদুর একখানা চিঠি দিয়ে গেল। শ্রীবাস চিঠি লিখেছে, সে আসছে। সে আসছে, যদুর শ্রীবাস ফিরে আসছে পরশু, রবিবার দিন। সে ফিরে আসুক, তাকে যাত্রার দল খুলে দেবে শ্রীবাস। মোশান মাস্টারের দলের চাইতেও বড় দল। পরশু আসবে, মাঝে একটা দিন। কালকের

দিনটাকে ডিঙিয়ে পরশু দিনটায় যাওয়া যায় না? যদি হঠাৎ ম'রে যায় যদু? বলা যায় না, যতীনবাবু সকালবেলা ভাল মানুষ ছিল, বিকেলের দিকে দুবার রক্তবমি, তারপরেই বস্ খতম। না না, পরশু দিন অবধি নিশ্চয় বাঁচবে যদু। না, বউমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এই কি যোগিনী সাজবার বয়স? ছেলেটাকে ওই খেলে।

'বউমা, তোমার কি আক্কেল হবে না কোনও দিন। বলি বাড়িতে কি কেও মরেছে যে অমন শুকনো মুখে ব'সে আছ? আজ যদি মারা যাই তবে তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে তা জানি। সোয়ামী পুত্তুর নিয়ে মহা ফুর্তিতে থাকবে। বলি চেহারাটা একবার আরশিতে দেখেছ, সুদাম কোথায়? মাস্টারের বাড়িতে বুঝি? ওই কেষ্টর মাথা যদি বাঁশ দিয়ে না ফাটাই তবে আমার—'

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীবাস। কিন্তু আজ তো আসবার কথা ছিল না। যদু অবাক হয়ে তাকাল শ্রীবাসের দিকে। সে শ্রীবাস নেই, মনে হয় শ্রীবাসের কঙ্কাল। একি চেহারা হয়েছে শ্রীবাসের? তবে কি কোনও রোগ হয়েছে নাকি!

শ্রীবাস এসে ম্লান মুখে যদুকে প্রমাণ ক'রে দাঁড়াল, চোখে তার জল, মুখে রক্তের চিহ্ন মাত্র নেই।

'কাঁদিস নে, এমন চেহারা কি ক'রে হল? অসুখ বিসুখ করেছে নাকি?'

'হাঁ বাবা, ডাক্তার বলেছে যক্ষ্মা, প্রাণের আশা নেই।' শ্রীবাস একটু হাসল।

বাড়ি এসে শ্রীবাস মোটে দশ দিন বেঁচে ছিল। মাঝে মাঝে যেসব ভূমিকায় এতদিন ধ'রে অভিনয় করেছিল সেই সব অংশ আবৃত্তি করছিল। যদুর কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। মোশান মাস্টারকে নিজের মেডেলগুলো সব দিয়ে গেল।

হরিদাসীর কান্না যদুর ভাল লাগে না। কেঁদে লাভ কি? যদু কেন কাঁদবে সেই ছেলের জন্যে যে ছেলে কোনও দিন মুখ তুলে তার দিকে চায় নি? হরিদাসী যে না খেয়ে পড়ে পড়ে কাঁদে তাতে লাভ? আচ্ছা, কেন এমন হয়? ভগবান নাকি দয়াময়, তবে যদুকে নিলেন না কেন? প্রায় সত্তর বছর বয়স হ'তে চলল, সেই কবে জন্মেছে। জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ তার মিটেছে। আহা! বউমার কাঁচা বয়স। শহরে তো বিশ পঁচিশ বছরের আগে বিয়েই হয় না। যাত্রা যা করত শ্রীবাস! তখন যদি একটা দল খুলে দিত। কিন্তু লোকে কি বলবে? মদন হাজরার নাতি হাটের মাঝে ঘোমটা টেনে যাত্রা করে, ছি ছি! করলে বা তাতে ক্ষতি কি? মোশান মাস্টার ঠিকই বলেছে, ছেলেটাকে সেই মেরে ফেললে। টাকার তো যদুর অভাব নেই, তেজারতিতে বেশ পয়সা করেছে। বাপ হয়ে একমাত্র ছেলেকে মেরে ফেলল। দম বন্ধ হয়ে আসছে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। দাওয়ায় কে বসে, শ্রীবাস, না সুদাম?

সুদামই। কিন্তু কি আশ্চর্য মুখের মিল। গিন্নী যখন মারা যায় তখন শ্রীবাস সুদামেরই মতন। সোনার চাঁদ ছেলে ছিল শ্রীবাস, ছেলেটাকে যমের হাতে তুলে দিলে যদু। টাকাই কি যদুর সব।

মনে পড়ে যদুর তার বাপের কথা। যদুর তখনও বিয়ে হয় নি, মদন মৃত্যুশয্যায়। মরবার সময় বারবার ক'রে যদুর হাত দুখানি ধ'রে জানিয়ে গেল, 'বিয়ে করিস বাবা, আমার বংশ যেন তোর পরই লোপ না হয়। বিয়ে করিস বাবা, নইলে ম'রে গিয়েও আমি শান্তি পাব না। বাপের শেষ কথা সে রেখেছিল। বড় আদরের ছেলে ছিল শ্রীবাস। সেদিনকার ছোট ছেলে আজ নিশাতলায় শ্মশানভিটায় ঘুমিয়ে আছে, আকাশে বাতাসে রেণু রেণু হয়ে মিশে আছে। হয়তো স্বর্গের দেবসভায় আজও সে জোড় হাতে প্রাণ ভিক্ষা চাইছে। সুদামকে সে রেখে গেছে প্রতিনিধি। কিন্তু কে জানে যে সুদামা তাকে ফাঁকি দেবে না? সকালে হরিদাসী সুদামের মনের ভাব ব্যক্ত ক'রে যথেষ্ট গালাগালি খেয়েছে। সত্যিই তো কেন সুদামকে সে বাধা দেবে। নিজের জীবনের সব কিছু সাধ আহ্লাদ তো যদু নিশাতলার শ্মশানভিটাতেই শেষ করেছে। বিধবার একমাত্র সন্তান সুদাম, তার উপর যদু জোর খাটাবার কে? যদি সুদামও বাপের মত ফাঁকি দিয়ে চলে যায়। না না, যদু তা হ'তে দেবে না। নিজে পুত্রশোক পেয়েছে নিজের জীবনেরও শেষ হয়ে এসছে। হে স্বর্গগত পিতা, আমার দুর্বলতাকে ক্ষমা কর। মান রাখবার জন্যে বারবার অনুরোধ করে গেছ। এতদিন ধ'রে তা রেখেছি। সেই মান, মিথ্যা মানের জন্যে নিজের ছেলেকে বিসর্জন দিয়েছি, কিন্তু আর নয়। আজ আর তা পারব না, বিধবার একমাত্র সন্তানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজ আর কোনও কথা বলব না। ক্ষতি যা হয়েছে সেটা আমার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাক। আমায় তোমরা ক্ষমা কর।

মিত্তিরদের বাড়িতে তখন মহড়া চলছে সেই সাবিত্রী-সত্যবান বই-এর। সামনের অন্নপূর্ণা পুজোয় যাত্রা হবে। মোশান মাস্টার কেষ্ট মিত্তিরের বয়স হলেও ঠিক মোশান দিয়ে আসছেন বরাবর। সুদামকে নিয়ে যদু ঘরে ঢুকল। সবাই একটু আশ্চর্য হ'ল। ছেলেটা সেদিন মারা গেছে।

কেষ্টবাবু বললেন, 'এস এস, হাজরারপো। কি মনে ক'রে? ব'স, তামাক খাও, গনশা, তামাক আন। তার পর কি ব্যাপার, হঠাৎ ইদিকে?'

'সুদামকে তোমার দলে নাও মাস্টার। চমৎকার গাইতে পারে, বলেও ভাল। সাবিত্রী ওকে মানাবে। ওর বাপ সাবিত্রী সেজে নাম করেছিল তাই—'

অশ্রু এসে তার কণ্ঠ চেপে ধরলে।

মোশান মাস্টার আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। সুদামকে দলে পেলে একহাত দেখে নেওয়া যাবে ভাঙ্গার দলকে। ওদের রানী ভাল গাইতে পারে, ভারী দেমাক ছিল ওদের, এবার দেখা যাবে।

'ওরে ভীম ওঠ, গনসা চট ক'রে হরিকে ডেকে নিয়ে

আয়তো গানের সুরগুলো এখ্খুনি দিয়ে যাক। ওঠরে সুদাম, পাট আরম্ভ কর্। তোর বাপ যা পাট করত! সে ছিল তাই সেবার সাবিত্রী বেড়ে জমেছিল। আর সবের কথা ছেড়েদে, সব ফেলাট।'

মহড়া আরম্ভ হ'ল।

যদু ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল ঠিক সেই জায়গাটায় যেখান থেকে একদিন লুকিয়ে শ্রীবাসের সাবিত্রীর মহড়া দেখেছিল। ঘরের দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে। চোখদুটো জলে ভরতি হয়ে গিয়ে সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসছে। ফরাসের উপর গয়লাদের ছেলের সামনে হাত জোড় ক'রে সত্যবানের প্রাণ ভিক্ষা চাইছে কে? শ্রীবাস, না সুদাম?

গধূলি রাগ

(৩২৮ পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যাশা করব, চা খেয়ে লেকে বেড়িয়ে এসে তুমি গান গাইবে।

শকুন্তলা মৃদু হাসিয়া বলিল—অনির্দেশের মাঝে প্রতিদিন আমি আপনাদের বেঁধে রাখতে চাই না, আমি সোম আর শুক্রবারে আসব, চা'এর আগেই আসব।

কুমারেশ কাজের শৃঙ্খলা চিরদিনই ভালবাসেন, শুধু শকুন্তলার সুবিধার জন্য ওইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। শকুন্তলা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে আসিবেন শুনিয়া মনে মনে খুশী হইয়া উঠিলেন।

ইহার পর এসকল ব্যাপারে যে প্রশ্ন ওঠে তাহা আলোচনা করিয়া কুমারেশ তাহাকে বিপন্ন করিয়া তুলিবেন না, শকুন্তলা তাহা জানেন। অথচ কুমারেশ বিনামূল্যে এ জীবনে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিবেন না, এ কথাও তাহার অজানা নয়। পাছে সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গ উঠিয়া এই গভীর প্রশান্তিটুকু সাময়িকভাবেও নষ্ট হইয়া যায়, তাই শকুন্তলা বলিয়া উঠিল—তা হ'লে আজ উঠি দাদু, রাত হ'ল। শোভাকে আবার আশ্রমে পেঁৗছে দিতে হবে।

কুমারেশের যেন স্বপ্ন ভাঙ্গিল—আঁ তাইতো! এত রাত হয়ে গেল? আচ্ছা, আমি এখনই গাড়ি বার করতে বলছি।

শকুন্তলা গাড়ির কথায় কি যেন বাধা দিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহার আগেই কুমারেশ ড্রাইভারকে তাহার নিজের গাড়িখানা বাহির করিতে বলিলেন।

(ক্রমশ)

জোছনা

শ্রীকান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

নাহি জানি কোন্ স্বপন-পুরে সে,
নাহি জানি কোন্ অজানায়
জ্যোছনা-সায়রে লহরে লহরে
মন-তরী মোর ভেসে যায়!

দখিনা বীণায় এ রুপালী সাঁঝে
কোন্ অলকার গীতি যেন বাজে;
তারি সুরে বুঝি বহিছে জোয়ার
জ্যোছনার নব যমুনায়!

অজানা কাহার প্রাণের কামনা
ফুলে ফুলে যেন শিহরায়;
খনে খনে তারি পরশ বুঝিবা
গালে মোর দোলা দিয়ে যায়।

জ্যোছনা বাহিয়া ছায়াপথ-শেষে
মন-তরী মোর ভিড়িল কি এসে
রূপকাহিনীর মায়াপুরে, যেথা—
প্রিয়া মোর জাগে নিরালায়?

শ্রীনিকেতনে পল্লীস্বাস্থ্য সংগঠন

কালীমোহন ঘোষ

(৫)

শ্রীনিকেতনের পল্লী-স্বাস্থ্য সংগঠন পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের প্রথম স্বাস্থ্যসমিতি গঠিত হয় বাঁধগোড়া গ্রামে। এই গ্রাম বোলপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত। বোলপুর হইতে শ্রীনিকেতন পর্যন্ত জেলাবোর্ডের যে রাস্তা গিয়াছে সে রাস্তার দক্ষিণ ধারে ইহা অবস্থিত।

জেলাবোর্ডের রাস্তার উপরে কয়েকটি ধান চালের আড়ত রহিয়াছে। তাহাকে বাঁধগোড়া বাজার বলে। বাজার হইতে দক্ষিণে একটি গোপথ ছিল। সেই গোপথ পার হইয়া ধানক্ষেতের আল দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে হইত। গ্রামের মধ্যস্থলে যে রাস্তা ছিল তাহা বর্ষাকালে একটি প্রকাণ্ড নালায় পরিণত হইত। নালার দু ধারে বাগান এবং তাহা নালা হইতে প্রায় ৪ হাত উঁচু। সামান্য বর্ষা হইলে রাস্তার উপর দিয়া প্রবল বেগে জলের স্রোত প্রবাহিত হইত। এবং সেই জলরাশি গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে কাঁদরে গিয়া পড়িত। বোলপুর শহর ও বাঁধগোড়া বাজারের ধৌত জল গ্রামের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত। এই জন্য গ্রামের জমিগুলি স্বভাবতই উর্বর। কিন্তু গ্রামের ভিতরটা ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ম্যালেরিয়াই ছিল এই গ্রামের প্রধান শত্রু।

গ্রামে আঠারটি পরিবার বাস করে। ১৯২৬ সালে লোক-সংখ্যা ছিল ২৮০।

গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ১২ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত চেষ্টা করার ফলে বর্তমানে মোট লোকসংখ্যা হইয়াছে ৩৮৭। অর্থাৎ উক্ত গ্রামে এই কয় বৎসরে ২৬টি নূতন পরিবার বাড়িয়াছে। তাহাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ১০৭। [বাঁধগোড়া পল্লী-সংগঠন।—১৩৪৪।]

স্বাস্থ্যোন্নতির কাজ গ্রামে শুরু করিবার পূর্বে গ্রামে বর্ধিত প্লীহার হার ছিল শতকরা ৯০। গ্রামের অধিবাসিগণ ম্যালেরিয়া হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। আমরা সমগ্র গ্রামটি পরিদর্শন করিয়া আসিয়া হতাশ হই। কারণ গ্রামের ভিতরে বাস্তুভিটার চারিপাশে এবং পতিত জমির উপরে এত ঘন জঙ্গল ছিল যে, এক বাড়ি হইতে আর এক বাড়ি দেখা যাইত না।

বনখেজুরের ঝোপ, আঁকরের জঙ্গল এবং বাঁশ বনে গ্রামটি অন্ধকার ছিল। আমরা দুই কারণে প্রথমে হতাশ হই।

১। হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, ৩০ বিঘা জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইলে প্রায় তিন চারি শত টাকার প্রয়োজন। কারণ আঁকড়গাছ এবং খেজুর বন সমূলে উৎপাটন না করিয়া গাছ কাটিয়া দিলে উহা মরে না। মূল উৎপাটন করিবার ব্যয় অত্যন্ত অধিক। বাঁশবন কাটিতে গ্রামের লোকের গুরুতর আপত্তি ছিল।

২। যে রাস্তাটি বর্ষাকালে নালায় পরিণত হয় তাহাকে আরও চওড়া করিয়া উঁচু করিতে হইবে। এবং তাহার দু দিকে দুটি বড় নর্দমা করিয়া তাহার সহিত প্রত্যেক বাড়ির ছোট ছোট নর্দমা যোগ করিয়া দিতে হইবে। অধিবাসিগণ তাহাদের বাগান কাটিয়া রাস্তা চওড়া করিতে এবং নর্দমার জন্য জায়গা দিতে অস্বীকৃত হয়। রাস্তা ও নর্দমার জন্য অন্তত পাঁচ শত টাকার প্রয়োজন। আমাদের শ্রীনিকেতনের আর্থিক স্বচ্ছলতা এমন ছিল না যে, এত অর্থব্যয় করিতে পারি। আমাদের সংগঠন কার্য তখনও এমন রূপ পরিগ্রহ করে নাই, যদ্দ্বারা আমরা জেলাবোর্ড ও গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে কোনও সাহায্য আশা করিতে পারি। তখনও আমাদের দেশে পল্লী-সংগঠন আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হয় নাই। উহার আবশ্যকতা দেশমান্য নেতৃবর্গ অথবা গভর্নমেণ্ট কেহই সম্যক্ উপলব্ধি করেন নাই। রবীন্দ্রনাথই ইহার পথ-প্রদর্শক এবং তাঁহাকে একাই কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

স্বাস্থ্য-সমিতির ডাক্তার কালাজ্বর রুগীদের পরীক্ষা করিতেছেন।

১৩২৬ সালে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ময়মনসিংহের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "আমাদিগকে আবার গ্রামে ফিরিতে হইবে, সেখানে গিয়া দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং ব্যাধির বিরুদ্ধে বীরোচিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। জাতির অন্তর আজ খিন্ন। জাতীয় জীবনের স্রোতধারা শুখাইয়া গিয়াছে। জাতির প্রকৃত মহিমা যদি সত্যই প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহা হইলে, গ্রামগুলির উন্নয়নের ভিতর দিয়া উহা সাধিত হইবে অন্য উপায়ে নহে।" বক্তৃতায় উপসংহারে কবি তাঁহার মর্মস্পর্শী ভাষায় শ্রোতৃবর্গের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিয়া আবেদন করেন, "আমি যদি আপনাদিগকে কোনরূপ আনন্দ দিয়া থাকি, সান্ত্বনা দিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহার পুরস্কারস্বরূপে আমি আপনাদের নিকট ভিক্ষা করিতেছি যে, ভারতের গ্রামগুলির লুপ্ত সৌন্দর্য এবং শান্তির পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিবেন।"

কবি তাঁহার নারায়ণগঞ্জ বক্তৃতায় ছাত্র সমাজকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, "পল্লী আমাদের দেশের [illegible]

যদিও আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এতদিন ধ'রে অনেক বক্তৃতা ক'রে এসেছি, কিন্তু আমরা দেশের যথার্থ এই প্রাণনিকেতন হ'তে দূরেই ছিলুম। দেশকে উন্নত করতে হ'লে এই পল্লীর প্রাণ-নিকেতনেই কর্মের অনুষ্ঠান গ'ড়ে তুলতে হবে।"

১৯২৬ সালে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লায় ভ্রমণকালে তিনি সর্বত্রই বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। পূর্ববঙ্গের সহস্র সহস্র নরনারী বিশেষত তরুণ সমাজ উদ্‌গ্রীবভাবে তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছিল এবং সর্বত্রই তিনি তাঁহার দেশবাসীকে সেদিন পল্লীসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। দেশ তখন এমন ভাবে সাড়া দেয় নাই। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় নেতাগণ হইতে সরকারী মহল সর্বত্রই পল্লী-সংগঠনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ১৫ বছর পূর্বে দেশের এ অবস্থা ছিল না। সেজন্য বাহির হইতে সাহায্য পাইবার কোনও আশা করি নাই। নিজেদের চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া আমরা কাজে প্রবৃত্ত হইলাম। গ্রামবাসীদের অর্থ-ব্যয় করিবার সংগতি নাই কিন্তু অবসর আছে প্রচুর। এই অবসর সময়ে নিজেদের কায়িক পরিশ্রম দ্বারা স্বীয় গ্রামের সেবা করিবার জন্য যদি তাহাদের চিত্তকে জাগরিত করিতে পারি তাহা হইলে সমস্যার সমাধান হইবে।

শ্রীনিকেতনের কর্মিবৃন্দ ছাত্রগণ সহ সেই গ্রামে গিয়া জঙ্গল কাটিতে শুরু করে। গ্রামবাসিগণ দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সঙ্কোচ ঘুচিল না। তাহাদের জড়ত্ব বিদূরিত হইল না। কৃষকগণ নিজের খেতে কোদাল ধরিয়া কাজ করিতে পারে তাহাতে অসম্মান হয় না, কিন্তু যাহাতে সকলের কল্যাণ হইবে সেরূপ লোকহিতকর কাজে কোদাল ধরিতে অপমান বোধ করে। আমরা তাহাদিগকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া বলিলাম যে, আমাদের উপদেশানুযায়ী গ্রামের সকলে সংঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের হিতার্থে জঙ্গল পরিষ্কার, ড্রেন ও রাস্তার কাজ করিবার জন্য যদি প্রস্তুত থাকে তবেই আমরা এ গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইবার জন্য সচেষ্ট হইব।

প্রথমে তাহারা আমাদের এই শর্তে সাড়া দেয় নাই। কিন্তু সেই বৎসর ঐ গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন গ্রামবাসিগণ আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জানায় যে, আমাদের উপদেশানুযায়ী তাহারা কাজ করিতে প্রস্তুত আছে। তখন আমরাও আনন্দের সহিত উক্ত গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রতিকারার্থে প্রবল উদ্যমের সহিত প্রবৃত্ত হই। বৎসরে যে কয়মাস চাষের কাজ থাকে না, সে কয় মাস অধিবাসিগণ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা সমিতির কাজ করিতে লাগিল। তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় গ্রামের যাবতীয় জঙ্গল নির্মূল হইল। বাগান কাটিয়া পুরানো রাস্তাটিকে চওড়া করিয়া পুনঃনির্মাণ করিল। সে রাস্তার দু'পাশ দিয়া নর্দমা কাটিয়া দিল। সে নর্দমা দিয়া জল বাহির হইয়া যাওয়ায় রাস্তার কোনও ক্ষতি হইল না। এভাবে বৃষ্টির সঙ্গে গ্রামের অনাবশ্যক জল কাঁদর দিয়া বাহির হইয়া যাইবার সুব্যবস্থা করা হইল। বৎসরের পর বৎসর গ্রাম-বাসীরা সহস্রাধিক গোগাড়ি করিয়া কাঁকড় ঢালাই করিয়া রাস্তা উঁচু করিল। তাহার ফলে যে রাস্তা বর্ষাকালে নালায় পরিণত হইত সে রাস্তার উপর দিয়া এখন বার মাস মোটর যাতায়াত করিতে পারে।

গ্রামের একটি রাস্তার গ্রামটি প্রায় পরিত্যক্ত

গ্রামের লোকের দ্বারা ২৯টি গর্ত ভরাট করা হয়। ১৯২৬ সালের বর্ধিত প্লীহার হার ছিল শতকরা ৯০, এখন কমিয়া শতকরা ২ হইয়াছে। সংঘবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা ম্যালেরিয়ার গতি-রোধ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হওয়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস জাগিয়াছে। জঙ্গল নালা নর্দমা ডোবা প্রভৃতি দ্বারা যে গ্রাম অত্যন্ত কুৎসিৎ হইয়াছিল সে গ্রামের চেহারা সম্পূর্ণ পরি-বর্তিত হইয়াছে। গ্রামের শ্রী এবং সৌন্দর্য পরিস্ফুট হওয়ায় তাহা গ্রামবাসীদের চিত্তে আনন্দ দান করিয়াছে। গ্রামের যিনি মণ্ডল এবং পল্লী সমিতির সভাপতি, তিনি একদিন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের গ্রামের চেহারাটি অতি কুৎসিৎ ছিল এখন তাহা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। ইহাকে আর আমরা কখনও নষ্ট হইতে দিব না।" এই সমিতি তাহাদের সংঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে ক্রমে ইউনিয়ন বোর্ডের সহযোগিতা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। উক্ত বোর্ড ২টি পাকা কুয়া ও ১টি নলকূপ করিয়া পানীয় জলের অভাব দূর করিয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শ্রীনিকেতনের ডাক্তারখানা বিনুরিতে স্থানান্তরিত করায় বাঁধগোড়ায় ও অন্যান্য স্থানে চিকিৎসকগণের চিকিৎসা করার খুব অসুবিধা উপস্থিত হয়। সেই সময় বাঁধগোড়ার অধিবাসিগণ সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি গঠন করিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে আত্মনির্ভরশীল হইতে সংকল্প করে।

নিজেরা অতিরিক্ত চাঁদার দ্বারা ডাক্তারখানার ঔষধের চালান যোগাড় করে। নিজেদের নির্বাচিত কমিটির অধীনে একজন ডাক্তার নিযুক্ত করেন। শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য সংঘ পরিচালনার ফলে দেখা যায় যে, গ্রামের লোকের চিকিৎসার ব্যয় আশাতীতরূপে কমিয়া গিয়াছে। স্বাস্থ্যসংঘ হইতে সভ্যগণ যে চিকিৎসা পাইয়াছে তাহাতে ১ বৎসরে মোট ব্যয় হইয়াছে ৫১৪।৶০। এই চিকিৎসা যদি সমিতির বাহিরের কোনও পাস করা ডাক্তারের দ্বারা করিতে হইত তাহাতে মোট ব্যয় পড়িত ২১৯৮৶০। অতএব সভ্যগণ ১ বৎসরে ১৬৮৩৮০ আনা চিকিৎসার ব্যয় বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ম্যালেরিয়ার প্রতিনিবার্য বিধিগুলি প্রবর্তনের সহায়তা হইয়াছে।

বর্তমান সময়ে এই সভ্যগণের সংখ্যা ১৭৮। এবং সমিতি গভর্নমেণ্ট ও জনসাধারণের অর্থ সাহায্যে ১টি পাকা ডাক্তারখানা নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের হিসাব নিকাশের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় এই স্বাস্থ্য সমিতির ৩১৪৮৶১৫. লাভ হইয়াছে।

কয়েকটি ম্যালেরিয়া রোগী

বাঁধগোড়ার অধিবাসিগণ ম্যালেরিয়ার প্রতিকারে সমর্থ হইয়া ক্রমে গ্রামে অন্যান্য সমস্যার সমাধানের জন্য অগ্রসর হইল। কৃষি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। সেই হইল কৃষির মূল সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রামবাসিগণ চেষ্টিত হয়। এই কয় বৎসরে ১টি নূতন সেচের পুষ্করিণী খনন এবং আরও ৩টি সেচের পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং দোফসলের জমি বৃদ্ধি পাওয়ায় বৎসরে অন্ততঃ ১ হাজার টাকা আয় বাড়িয়াছে। শ্রীনিকেতন কৃষিক্ষেত্রের সহযোগিতায় নিম্নলিখিত নূতন শস্যের চাষ এই গ্রামে প্রবর্তিত হইয়াছে।

১। পুষা গম
২। দার্জিলিং আলু
৩। ভাষামানিক ধান
৪। ঝিঙাশাল ধান
৫। ২১৩নং কয়েম্বাটোর আক
৬। মতিহারি তামাক।

ম্যালেরিয়ার সহিত আহার্যের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। সেইজন্য আমরা ফল ও শাক সব্জির চাষে বিশেষ উৎসাহ দান করি; পরিবারের শিশুগণ যাহাতে যথেষ্ট ফল আহার করিতে পারে দরিদ্রগণও যাহাতে টাটকা শাক সব্জি উৎপন্ন করিয়া আহার করিতে পায় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। এই জেলায় হনুমান ইহার পরম শত্রু। ইহাদের সংখ্যা অগণিত। ইহারা শাক সব্জির বাগান এবং ফল নিঃশেষে বিনষ্ট করে বলিয়া লোকে এই সকল চাষ প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছে।

আমরা পতিত জমিতে ওল ও আনারসের চাষ প্রবর্তিত করি। তাহা হনুমান অথবা গরু ছাগলে নষ্ট করিতে পারে না। পেঁপে, পেয়ারা, লেবু, কলা, আম, আতা ইত্যাদি বিভিন্ন ফলের চারা আনিয়া প্রতি বৎসর ঐ গ্রামের অধিবাসীদিগকে সরবরাহ করা হয়। হনুমানের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহা বিস্তারলাভ করিতেছে।

শস্যের চাষ সম্বন্ধে আমরা এই নীতি অনুসরণ করি যে, বর্তমান অবস্থার মধ্যেও উন্নত বীজ প্রবর্তন করিয়া যতটা সম্ভব ফলন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করা। এবং শ্রীনিকেতনের কৃষিক্ষেত্রে কোনও নূতন ফসল পরীক্ষা করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইলে গ্রামেও তাহা প্রবর্তন করা। পুষা গম ও তামাকের চাষ এই গ্রামে নূতন প্রবর্তন করা হয়। কৃষকগণ তাহাতে বিশেষ লাভবান হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া দমনে কৃতকার্য হওয়ায় এখন সর্বদিকেই তাহাদের উৎসাহ আসিয়াছে। কৃষি সম্বন্ধেও তাহারা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

শিক্ষা বিষয়ে তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া নাই। দুই বৎসর হইল ৩৫০, টাকা চাঁদা তুলিয়া একটি বিদ্যালয় গৃহ নিজেদের চেষ্টায় নির্মাণ করিয়াছে।

১৯২৬ সালে গ্রামে মোট বালকবালিকা ছিল ৯০টি, তন্মধ্যে ১৬ জন মাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত। সেই স্থলে ১৯৩৭ সালে দেখা যায় যে, ১৭০ জন বালক বালিকার মধ্যে ৮৫ জন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে।

শিল্প।—

বাঁধগোড়ার অধিবাসিগণ শিল্প সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। এই গ্রামে বার ঘর বীরবংশী (আকুড়ে ডোম) বাস করে। ইহারা বাঁশের দ্বারা মোড়া তৈয়ারী করিত। বিক্রি করিবার কোন সুবন্দোবস্ত না থাকায় এই শিল্প মৃতপ্রায় হইয়াছিল। শ্রীনিকেতন শিল্পভবন হইতে বিক্রির ব্যবস্থা করায় এই শিল্প পুনর্জীবিত হইয়াছে।

এই গ্রামের চারপাশে প্রচুর শর হয় সে সকল শর দ্বারা গরিব গৃহস্থরা ঘরের বেড়া তৈয়ারি করে। অজয় নদীর ধারেও প্রচুর শরবন রহিয়াছে, তাহা কোনও কাজে আসে না। শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগ হইতে এই শর দ্বারা মোড়া তৈয়ার করিবার চেষ্টা করা হয়। অর্থব্যয় করিয়া কয়েকটি বীরবংশীদিগকে শরের চেয়ার তৈয়ার করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই পরীক্ষা সফল হইয়াছে। বর্তমানে এই গ্রামের বারটি পরিবার শরের ও বাঁশের মোড়া তৈয়ার করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিয়া কঠোর দারিদ্র্য হইতে রক্ষা পাইয়াছে। চারটি ভদ্রবংশীয় যুবক তাঁত ও চামড়ার কাজ শিক্ষা করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে।

অতএব দেখা যায় যে, স্বাস্থ্যের কাজে সফলতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধেও তাহাদের চেষ্টা জাগ্রত হইয়াছে।

গ্রামে কোনও কাজ করিতে গেলে কর্মীকে প্রথম দেখিতে হইবে, কোন্ সমস্যাটির সর্বাগ্রে সমাধান প্রয়োজন; তার উপর সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। সেই সমস্যার সমাধান হইলে গ্রামবাসীদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিবে। তখন ক্রমে অপরাপর সমস্যা সমাধানের জন্য সেই সংঘবদ্ধ শক্তিকে পরিচালিত করিতে হইবে।

বাঁধগোড়া গ্রামে একটি মুসলমান পাড়া আছে। হিন্দু

(শেষাংশ ৩৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিক্রমপুরের কবিগান

(কবিওয়ালা স্বর্গত কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙলা দেশে এক সময় কবি গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তাহারই ফলে বাঙলা দেশের নানা জেলায় অনেক সুগায়ক ও কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন কবিওয়ালা জন্ম গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেরই কথা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, অনেকেরটা পারেন নাই, এজন্য অনেক প্রতিভাশালী কবি গায়কগণের রচনার সহিত আমরা অপরিচিত রহিয়াছি।

বাঙলা দেশের বিক্রমপুর অঞ্চলেও এক সময়ে কবি গানের অত্যন্ত সমাদর ছিল। সমাদর ছিল বলিয়াই অনেক খ্যাতনামা কবি গায়ক জন্মিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের অনেকের বিষয়ই আমরা জানি না। আমি সম্প্রতি বিক্রমপুরের কবিওয়ালাদের অনেকের জীবনী ও তাঁহাদের রচনা সংগ্রহ করিয়াছি। সে সমুদয় একসঙ্গে প্রকাশ করিতে গেলে এক বিরাট গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

কবি গানের মূলে গীতই হইতেছে সখীসংবাদ। এই সখী-সংবাদের মধ্যে ভোর, গোষ্ঠ, মাথুর প্রভৃতি নানা শ্রেণীর গান থাকে।

বিক্রমপুরের রসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্যামাচরণ বিশ্বাস, অম্বিকাচরণ তপাদার, কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামকানাই ভুঁইমালী (কুকুটিয়া), চণ্ডী ঠাকুর (তেঁতুলিয়া) প্রভৃতি উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ের আরও অনেক প্রসিদ্ধ কবিগায়ক ছিলেন।

গোষ্ঠ সংগীত রচনায় বিক্রমপুরের রসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। আমরা এখানে তাঁহার বিরচিত একটি সংগীত উদ্ধৃত করিতেছি।

রাখাল বলিতেছেন।—

প্রাণের ভাই কানাই গোচারণের সময় তো নাই,
চল চল গৃহে যাই, নিশি হয়েছে।
বনে নানা ভয়, ভাবিয়ে তাই কত যে ভয়
আমার মনে হয়; কি জানি কি ঘটে পাছে সময় ভাল নয়;
নিদারুণ কংসের চরে, সদা বৃন্দাবনে ফিরে,
কখন কি সর্বনাশ করে, তাই ভেবে প্রাণ কাঁদিছে।
তুই বিনে আর ব্রজবাসীর কি ধন আছে।
তোবে না হেরে মা যশোদায়, বৎসহারা গাভীর প্রায়,
পথপানে চেয়ে আছে ভাই, ভাই কানাই!
ভাই রে তুই বিনে মার কেহ নাই।
নয়নের পলকে ভাই রে, মা যশোদা হারায় তোরে,
এখন বুঝি তোরে বিনে প্রাণে বেঁচে নাই।
যত আমার মনেতে লয়, বলিতে বিদরে হৃদয়,
ওরে ভাই কানাই! নিশ্চয় তুই বিনে নন্দালয়ে বিষম বিপদ ঘটেছে!

কবি মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি শ্লেষাত্মক গান বড় সুন্দর। এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। কবি শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

জানি চিন্তামণি, চোরের শিরোমণি, জানি যত গুণ গুণমণি।
বৃন্দাবনে করলে রাধিকার মন চুরি, বসন আর ভূষণ চুরি,
গোপিকার ননী চুরি, গোকুলে নাম চোরা হরি।
তার স্বভাব আছে দেখা, দুদিন হলে অদেখা,
আজ তো নয় নূতন দেখা, তোমার সনে।
চোরের দেশ, চোরের শেষ, এই মধু ভুবনে।
কেবল একা তুমি নও চোর, চোরের আছে মন চোর
কুব্জা এথায়, চোরের শোভা তায়।
চোর রাজ্যে নৃপমণি, রাণীটি চোর হয় তেমনি,
মুনিতে চোর অক্রূর মুনি, চোরের বাসা মথুরায়।
চোরে চোরে হয় মিলন, সুখে বঁধু আছত এখন,
এমন সুখ হয় নাই সখা কোন স্থানে।

বিক্রমপুরের সমুদয় কবি গায়কদের সামান্যভাবে পরিচয় দেওয়াও একটি প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। শুধু দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একজনের রচনার সামান্য দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম। এইবার আমাদের প্রস্তাবিত কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা বলিতেছি।

কৈলাসচন্দ্র বিক্রমপুরের কবিওয়ালাদের শেষ যুগের লোক। আনুমানিক ১২৫৫—৫৬ সালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল মাতুলালয়ে বিক্রমপুরস্থ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রধান তন্তর গ্রামে। ইঁহার মাতামহ ছিলেন রামনিধি চক্রবর্তী আর শক্তি সাধক স্বর্গত অভয়চরণ চক্রবর্তী ও গুরুচরণ চক্রবর্তী ছিলেন মাতুল। পিতার নাম কান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা ছিলেন স্বর্গীয়া শান্তমণি দেবী। কৈলাসচন্দ্র বড় কুলীনের সন্তান, প্রসিদ্ধ বৃন্দাবনের বংশধর। গ্রাম্য পাঠশালা ও বঙ্গ বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়াই তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

কৈলাসচন্দ্রের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি ছিল। তিনি অনেক পাঁচালী ও সংগীত রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সমুদয় আর পাওয়া যায় না।

আমরা অত্যন্ত শ্রম স্বীকার করিয়া কৈলাসচন্দ্রের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পালার অংশ বিশেষ,—যথা সখী সংবাদ, গোষ্ঠ এবং অন্যান্য সংগীতাদি সংগ্রহের প্রয়াস পাইয়াছি। এ স্থলে প্রকাশিত অসম্পূর্ণ রচনা হইতে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি কি কি পালা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তাঁহার সংগতাবলীর মধ্যে 'রাম বনবাস', 'নিমাই সন্ন্যাস' হইতে শুরু করিয়া শ্যামা সংগীত পর্যন্ত বিবিধ বিষয়ের সমাবেশ দেখা যায়।

কৈলাসচন্দ্র শখের কবির দল ও হুলিগানের দল লইয়া বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে গান করিয়া বেড়াইতেন। সে সময়ে তন্তরের বালক ও যুবক অধিকাংশই কৈলাসচন্দ্রের শখের দলের দোহার ছিলেন। বৃদ্ধেরা পর্যন্ত দোলের সময় হুলিগানের আসরে কোমর দোলাইয়া ও করতলে গাল রাখিয়া কৈলাসচন্দ্রের সুরে সুর মিলাইতে মনোযোগী হইতেন।

সেকালের তন্তর নিবাসী স্বর্গগত রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গুণমণি গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুত হেরম্ব-চন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি শিক্ষিত প্রৌঢ় ও যুবকগণ যেমন কৈলাস-চন্দ্রের শখের দলে সাকরেদি করিতেন, গ্রামের অন্যান্য সম্প্রদায়ের বহু নিরক্ষর লোকও তেমনি তাঁহার দলের দোহার ছিল। তন্তরের ৺মাধবচন্দ্র পাল, ৺কালীকৃষ্ণ শীল, ৺রামচরণ মণ্ডল, ৺হরিচরণ দে ও শ্রীরামনারায়ণ দাস প্রভৃতি দলের অন্যতম প্রধান গায়ক শ্রেণীভুক্ত ছিল।

কৈলাসচন্দ্র শ্রীনগরের জমিদার বাড়িতে, বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া গ্রামের শখের কবির দল লইয়া গান করিতে যাইতেন।

বিক্রমপুরের মালদিয়া গ্রামের পরলোকগত মুনসেফ নিত্যানন্দ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়িতে একবার কৈলাসচন্দ্রের দলের গান হয়। প্রতিপক্ষ দলে ছিলেন জোড়াদেউল গ্রাম নিবাসী পরলোকগত সুপণ্ডিত চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য শিক্ষিত

ব্যক্তিগণ। বিপক্ষ দলের প্রশ্ন ছিল বুধ গ্রহের পিতা কে? কৈলাসচন্দ্র নিজ দলের মুখপাত্ররূপে জবাব রচনার মধ্যে অপূর্ব কৌশলে ও ভঙ্গীতে বুধের পিতা চন্দ্র এই ইঙ্গিতের সহিত প্রতিপক্ষীয়দের নিকট বাকী আরও আটটি গ্রহের পিতৃপরিচয় জানিতে চাহিলে প্রতিপক্ষদল একেবারে নিরুত্তর হইয়া পড়িয়াছিলেন। কৈলাসচন্দ্রের এরূপ বাদপ্রতিবাদের মধ্য দিয়া যে রচনাকৌশল প্রকাশিত হইত তাহা শ্রোতৃবর্গের একান্ত উপভোগ্য হইত।

চিত্রবিদ্যাতেও তাঁহার বিলক্ষণ পটুতা ছিল। সে সময়ে তন্তরের অধিবাসিগণের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। শখের অভিনেতৃবর্গ 'রামাভিষেক', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি নাটক অভিনয় করিতেন। ওসব অভিনয়ের দৃশ্যপট অঙ্কিত করিতেন কৈলাসচন্দ্র। তন্তরের 'গলইয়া' মেলা (বৈশাখ মাসের প্রথম তারিখেই সাধারণত অনুষ্ঠিত হয়, কোথাও চৈত্র সংক্রান্তিতেও গলইয়ার মেলা বসিয়া থাকে।) ওই অঞ্চলে একটা দেখিবার মত ছিল। ওই মেলা উপলক্ষে গ্রামের উত্তর প্রান্তস্থিত কুমারপাড়া সংলগ্ন বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যে প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া পুতুল নাচ এবং নানারূপে সং ও তামাশার ব্যবস্থা হইত।

কৈলাসচন্দ্র ছিলেন এই উৎসবের প্রাণ। তিনি নিজের হাতে নানা ছবি আঁকিতেন, রং-বেরং-এর কাগজের দ্বারা বিচিত্র প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া রঙ্গমঞ্চটি সুশোভিত করিতেন—তখন উহা এক অপূর্বশ্রী ধারণ করিত। একবার এই গলইয়া উপলক্ষে কৈলাসচন্দ্র কাগজ দ্বারা একটি কৃত্রিম জাহাজ তৈয়ারি করিয়াও কৌশলক্রমে তাহাতে কল ইত্যাদি সংযোজিত করিয়া ওই পুকুরের জলে চালাইয়াছিলেন। ওই জাহাজ এমন সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছিল যে, দর্শকেরা শতমুখে কৈলাসচন্দ্রের শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কুলীন সন্তান কৈলাসচন্দ্র তিনটি বিবাহ করেন। তাঁহার শেষ দুইটি বিবাহ কাইবাইল গ্রাম নিবাসী শক্তি সাধক স্বর্গত কবি রাজমোহন অম্বুলি মহাশয়ের ভাগিনেয়ীদ্বয়ের সহিত হইয়াছিল। কৈলাসচন্দ্রের পুত্রগণের মধ্যে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র ও কানাইচন্দ্র জীবিত আছেন।

কৈলাসচন্দ্রের সংগীতাদির মধ্যে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির আসরে দাঁড়াইয়া তিনি অজস্র হাস্যরস ও পরিহাস সরস তীব্র শ্লেষ ছড়াইয়াছেন বটে; কিন্তু মায়ের নাম করিতে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভক্তিসরিৎ দুকূল প্লাবিত করিয়া উছলিয়া উঠিত।

"আর কত দিন আছে গো মা, কায়া বদল হবে কি না?
ভেঙ্গেচুরে গেল দেহ, সদাই ভাবি এ ভাবনা!
আমি জানি না সাধন-ভজন, শমন-দমন মায়ের চরণ;
নিজগুণে ক্ষমা ক'রে ত্রাণ করিও মা কৈলাসেরে।"

এই সংগীতের সুরে সুরে মাতৃপদলোলুপ ভক্ত মধুপের যে ব্যাকুলতা ও সরল আত্ম নিবেদন প্রকাশিত হইতেছে তাহাই হইতেছে কৈলাসচন্দ্রের কর্মবহুল জীবনের বৈশিষ্ট্য। বাঙলা ১৩০৬ সালের ৫ই পৌষ, মঙ্গলবার রাত্রিতে দারুণ ওলাউঠা রোগে স্বীয় জন্মভূমি তন্তর গ্রামেই কৈলাসচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। কৈলাসচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে বিক্রমপুরের একজন ভাবুক ও কলাকুশল কবিওয়ালার তিরোধান ঘটিয়াছে।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীযুক্তা মোক্ষদাসুন্দরী দেবী আপনার স্মৃতি হইতে কৈলাসচন্দ্রের সংগীতাবলী উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এই প্রাচীনা মহিলার সাহায্য ব্যতীত এ সমুদয় সংগ্রহ করা অসম্ভব হইত।

কৈলাসচন্দ্রের শিক্ষা দীক্ষা তেমন ছিল না, তথাপি তিনি যেরূপ সুন্দরভাবে সংগীত রচনা করিতে পারিতেন, তাহা পাঠকমাত্রেই সংগৃহীত সংগীতাবলী হইতে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমরা বাল্যকালে কালীপূজা, দুর্গাপূজা, বাসন্তীপূজা উপলক্ষে ধনীব্যক্তিগণের কবি গানের প্রতি সমাদর দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কবি গান শুনিতে হাজার হাজার লোক সমাগত হইত। পরলোকগত স্বনাম প্রসিদ্ধ স্বর্গত রায় অভয়কুমার মিত্র মহোদয়ের বাড়ি রাজাবাড়ি গ্রামে (অধুনা পদ্মার কুক্ষিগত) বর্তমান কামারখাড়া গ্রামে কবি গান শুনিতে দলে দলে নানা শ্রেণীর মুসলমানগণ ও হিন্দুগণ যোগদান করিয়া পূজা ও পার্বণকে কোলাহলপূর্ণ করিয়া তোলে। এইসব শ্রোতাগণের মধ্যে অনেকে কবিগানের মাধুর্য বেশ উপলব্ধি করিয়া থাকে এবং যখন যে দল জয়ী হয় তখন সে দলের হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু দিন দিনই বাঙলায় হিন্দু মুসলমানের মিলিতভাবে উৎসবসমূহে যোগদান যেন হ্রাস পাইয়া আসিতেছে।

আমার এই প্রবন্ধ সম্পর্কে আমি মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের অধ্যাপক তন্তর নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ শাস্ত্রী এম এ মহাশয়ের নিকট ঋণী। তিনি আমার অনুরোধে কৈলাসচন্দ্রের জীবনী ও গানগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। নচেৎ উহা কখনও সংগৃহীত হইত কি না জানি না।

কৈলাসচন্দ্রের রচনার ভাষা সরল ও সরস এবং বক্তব্য বিষয় সুপরিস্ফুট। আমরা সাধ্যানুযায়ী একটি শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিলাম।

রাম রাবণের বিষয়

(মোড়া)

বাক্‌বাদিনী দীনতারিণী কাতরে কর করুণা।
আমি অতি অভাজন, জানি না সাধন ভজন,
আমার কণ্ঠে এসে, নিজদাসে পূরাও মনের বাসনা।
মাগো, পূজব চরণ সদা এই মন, পূরাও মনের বাসনা।
বাক্‌বাদিনী দীনতারিণী কাতরে কর করুণা।

এই সংগীতটিকে প্রারম্ভ গীতি বা মঙ্গলাচরণ বলা যাইতে পারে।

(মোড়া)

ভবনদীর তরঙ্গেতে আতঙ্কে মরি।
আমি কোন্ গুণে পার হবো এবার?
হাল ছেড়েছে মন কাণ্ডারী।
ছয়জনা কুসঙ্গী জুটে, ভরা নাও নিল লুটে
উপায় কি করি?
যদি নিজ গুণে তরাও গুরু তবে পাড়ি দিতে পারি।
ভবনদীর তরঙ্গেতে আতঙ্কে মরি।

মায়া সীতা

নিম্নলিখিত সংগীতে 'মায়া সীতা'র বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

(মোড়া)

কাটিল ইন্দ্রজিতে মায়াসীতে॥
তাই দেখে বানরকুল, হয়ে অতি শোকাকুল।
কেন্দে জানায় রামের সাক্ষাতে। (মরি হায় গো হায়)
সীতা হত্যার কথা শুনি, শোকেতে রামরঘুমণি পড়িল ধরায়।
নয়ন জলে বক্ষঃ ভেসে যায়, পড়িল ধরায়।
কেন্দে বলে কৈগো সীতে, এনে গহন কাননেতে
লঙ্কাতে রাক্ষসের হাতে বিসর্জন দিলাম তোমায়॥
শুনি বিভীষণ শ্রীরামের কাতর বচন, বিনয় বাক্যেতে তখন
কয় বিভীষণ ধরি শ্রীপদে ভেব না বিপদে বিপদভঞ্জন মধুসূদন।
যার নামে দূর হয় জীবের ভব-চিন্তে,
সেই তুমি করছ আজ সীতার চিন্তে?
যে সীতার পাদপদ্ম, ব্রহ্মাদি দেবারাধ্য,
সে সীতা রাক্ষস বধ্য হয় কি কখন?
ধরি শ্রীপদে, ভেব না বিপদে, বিপদভঞ্জন মধুসূদন।
(মরি হায় গো) স্বয়ংলক্ষ্মী, মা জানকী
রাম তুমি তাই না জান কি?

ইন্দ্রজিতের সাধ্য বাকি,
কারতে তার নিধন।
এনে ইন্দ্রজিতে, কাটিল মায়াসীতে,
সে জন্য কেন মিতে কর রোদন?
ধরি শ্রীপদে, ভেব না বিপদে বিপদভঞ্জন মধুসূদন।
কেন মিতে ভাব বাঁস
রাম তোমার প্রেয়সী
বেঁচে আছে অশোক বনে।
পুরুষ তথা যেতে নারে
রক্ষা করে জানকীরে যত রাক্ষসী।
সরমা রূপসী, থাকি দিবানিশি
সেবে তার শ্রীচরণে।
কেন মিতে ভাব বাঁস?

শ্রীরামচন্দ্রকে মহিরাবণের ছলনা

বিভীষণরূপে এল মহিরাবণ।
মায়ায় মোহিত ক'রে
যত ভল্লুক বানরে;
হরি নিল শ্রীরামলক্ষ্মণ।
(মরি হায় গো হায়) না হেরিয়ে রামলক্ষ্মণে
ডেকে বলে বিভীষণে পবন-কুমার।
এ কি রাম ভক্তের ব্যবহার?
ওরে দুষ্ট দুরাচার;
শত্রু থেকে মিত্রভাবে
বিনাশিলে রাম রাঘবে,
এখনি তোর জীবন যাবে;
রক্ষা করে সাধ্য কার?
তখন বিভীষণ শুনি হনুমানের কটুবচন
রামের উদ্দেশে তখন কয় বিভীষণ
এ বিপদ সময় দাসে হ'য়ে নিদয়,
রাম দয়াময় কোথায় র'লে?
দেখ হে বিনা অপরাধে
হনুমান প্রাণে বধে,
মধুসূদন এ বিপদে, স্থান দাও রাঙাপদে বিপদভঞ্জন।
তুমি হও দুর্বলের বল,
নাই আমার অন্য সম্বল;
দেখা দেও হে নীল কমল বিপদকালে।
ধরি শ্রীপদে এ বিপদ সময়,
দাসে হ'য়ে নিদয়
রাম দয়াময় কোথায় র'লে॥
(মরি হায় গো হায়) থাকতেম যদি শত্রুভাবে,
মনে প্রাণে কেন তবে,
ভাবি আনিবার কবে হবে রাবণ সংহার? জানকী উদ্ধার?
তবে কেন ব'লে সূত
বিনাশিলেম নিজ পুত্র?
বধিলেম ইন্দ্রজিতে যেয়ে গুপ্ত যজ্ঞাগার?
তোমায় হরিল মহিরাবণ মায়াবশে,
সে দোষে প্রাণে বিনাশে পবনকুমার।
এ বিপদ সময় দাসে হ'য়ে নিদয় রাম দয়াময় কোথায় রলে?

(ঝুমইর)

আমি জানি না শ্রীচরণ বিনে
সে চরণ সেবি তবে পদে পদে বিপদ কেনে?
যে চরণ পরশ পেয়ে
পাষাণ গেল মানব হ'য়ে, ব্যক্ত ভুবনে।
সে চরণ সেবি বসে ভাবি অকূলে কূল পাইব কেমনে?
জানি না শ্রীচরণ বিনে।

রাম বনবাস

(মোড়া)

ত্যজিয়ে রাজ-আভরণ রাজবসন, বাকল পরি কটিদেশে,
রাম লক্ষ্মণ সীতে রাজার অজ্ঞাতে গেলেন অযোধ্যা হইতে বনবাসে।
রাণী পুত্রশোকে শোকাতুরা
মণিহারা ফণাধরা ভুজঙ্গিণীর প্রায়।
(মরি হায় হায়) ধরায় পড়ি মূর্ছা যায়।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে,
কেঁদে বলে উচ্চৈঃস্বরে
একবার এসে দেখা দেরে তোর অভাগিনী মায়।
শুনি জননী রোদন ধ্বনি
এলেন ভরত স্নেহের খনি
কৌশল্যা রাণী ব'লে তখনি।
(বাছা ভরত রে) আমার কোলে আয় দুঃখের কথা কই তোর কাছে।

(খোসা)

আমার শ্রীরাম পূর্ণশশী,
উদয় হইল আসি অযোধ্যায়, বিরাজিত সর্বদায়
দুঃখ অন্ধকার বিনাশি।
কৈকেয়ী রাহুর প্রায় সে চাঁদ আমার গ্রাস করেছে।
(বাছা ভরত রে) আমার কোলে আয় দুঃখের কথা কই তোর কাছে।
ভরত তোর জননী চণ্ডালিনী
পাপিনী পতিঘাতিনী করলে এই কাজ
আমার মাথায় বাজ হেনেছে॥
ভরতরে কেড়ে নিল রাজবেশ,
গাছের বাকল পরাইয়ে
শিরে জটা বেঁধে দিয়ে
সন্ন্যাসী বেশে সাজাইয়ে রামকে দিল বনবাসে।
এমন সাপিনী পাষাণবুকী বজ্রমুখী
কোন্ প্রাণে রামকে আমার বনে পাঠায়াছে?
বাছা ভরতরে দুঃখের কথা কই তোর কাছে।

(ঝুমইর)

জীবন জ্বলে দারুণ শোকানলে কি দিয়ে শীতল হই?
রাম গিয়াছে বনবাসে,
পতি গেছে স্বর্গবাসে;
(আমি) রব কি আশে?
একবার আয়রে তোরে কোলে নিয়ে জন্মের মত শীতল হই।
জীবন জ্বলে দারুণ দুঃখানলে কি দিয়ে শীতল হই?

(পরচিতান)

কারে রামদাদা বলে ভাই সকলে ডাকিবিরি অযোধ্যা ভুবনে।
এ দুঃখিনীরে ফেলে দুঃখ নীরে
রাম আমার চলে গেছে জন্মের তরে।
বাছার চাঁদবদন আর দেখব না রে
মা কথা আর শুনব না রে অযোধ্যা ভুবনে।
(ভতর রে) শুনেছি জন্মের মতন।
একবার আমায় নিয়ে যারে রামলক্ষ্মণ যথায় বিহারে
নয়নভরে বদন হেরে জুড়াইরে তাপিত জীবন॥
এমন পাপিনী বজ্রমুখী কোন্ প্রাণে রামকে বনে পাঠায়াছে।
ভরত রে আমার কোলে আয় দুঃখের কথা কই তোর কাছে॥

(আগামীবারে সমাপ্য)

মানুষের বাহাদুরী

সাবাস ভাই! সার্কাস খেলোয়াড়দের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পেয়ে উচ্চকণ্ঠে এভাবে দর্শকদের প্রশংসা করতে শুনা গেছে। প্রাচীন ভারতের যাদুকরেরা নাকি মন্ত্রের প্রভাবে একটি মাত্র সরু দড়ির সাহায্যে অনায়াসে আরোহণ করে শূন্যে অদৃশ্য হতেন। সে দৃশ্য অবলোকন করে কে না আশ্চর্য হয়! এখন আর সে সব যাদুকরও নেই আর সে মন্ত্রও কেউ জানে না। কিন্তু মন্ত্র না জানলেও কৌশল করে লোকে এমন সব ঘটনার ছবি তুলে আনে যা ভাবতেও পারা যায় না। নীচের ছবিটিকে

সার্কাসের খেলা

এক ফোটোগ্রাফারের শো-কেসে ঝুলতে দেখে ফুটপাথের উপর ক'দিন ধরে লোকের খুব ভীড় হয়েছিল এই সাহসী খেলোয়াড়টির নাম জানতে। সার্কাসওয়ালারাও ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এসেছিল নিজেদের দলে লোকটাকে টেনে নেবার জন্যে। এ ছাড়া ছবিখানার জন্যে দেশবিদেশ থেকে নাকি এত অর্ডার এসেছিল যে, লোক রেখেও দোকানদার পেরে উঠতে পারে নি। শেষে ছবিটার একদিন আসল পরিচয় দোকানে পাওয়া গেল। ব্যাপারটা আর কিছু নয় নিছক ফোটো তোলার কৌশল। তখন লোকে জানতে পারলে সত্যিই লোকটা আকাশে ঝুলছে না। এত পাবলিসিটির পর দোকানের নাম আর সঙ্গে সঙ্গে যে বিক্রী বেড়ে গিয়েছিল তার খবর না দিলেও চলে।

কুকুরও গাছে উঠে

ডেইজি নামক এক জাতীয় কুকুর ১৭।১৮ ফুট উঁচু গাছে বেশ স্বচ্ছন্দে উঠে যায়। এক বৎসর বয়স থেকে তাদের গাছে ওঠা শেখান হয়। কিন্তু গাছে উঠে শেষে মই কেড়ে নেওয়ার মত অবস্থা

কুকুরের গাছে ওঠা

তাদের হয় আর কি! কুকুর নামতে আর পারে না। উঠা আর নামা দুটোতেই অভ্যস্ত হলে বিপদ ছিল বই কি! তবু কিছু রক্ষা।

পুস্তক পরিচয়

মর্কটিশ্রীৎ:—শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত; রসচক্র সাহিত্য-সংসদ্, ২১-এ, রাজা বসন্ত রায় রোড্, দক্ষিণ কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কৃত্তিবাস রায় কর্তৃক প্রকাশিত; পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৫০; মূল্য—১৸৹ আনা মাত্র।

কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার নবপ্রকাশিত গল্প-সংগ্রহ গ্রন্থ। "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া", "অসমাপ্ত", "প্রণয়-পুরাণ", "প্রেমধাম" ও "একদা বসন্তকালে"—এই পাঁচটি গল্প পুস্তকখানিতে আছে। গ্রন্থখানির নাম "মর্কটিশ্রীৎ" রাখা হইলেও রসপরিবেশনে গল্পগুলি অকিঞ্চিৎকর নয়।

বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরসের ভাণ্ডার অতি সামান্য। এ পর্যন্ত বাঙলা কথাসাহিত্য যত রচিত হইয়াছে, হাস্যরসাত্মক গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা তাহার এক নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র। পরশুরাম, কেদারবাবু, দিবাকর শর্ম্মা বা স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ও অপর দুই একজন লেখকের কয়েকখানি বই ছাড়া উল্লেখযোগ্য হাস্যরসাত্মক গল্প-উপন্যাসের গ্রন্থ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, বাঙালীর জীবনে হাসির অবকাশ খুবই অল্প, এবং এই জন্যই জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিড়ম্বিত, দুর্ভাগ্যক্লিষ্ট বাঙালীর বিরস মুখে যাঁহারা হাসি ফুটাইতে পারেন, তাঁহাদের কৃতিত্ব যে অসাধারণ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া অসমঞ্জবাবু বাঙলা কথা-সাহিত্যের হাস্য-রসের ভাণ্ডার কিয়ৎ পরিমাণে পুষ্ট করিলেন,—এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। অধিকাংশ গল্পেই হাস্যরস চমৎকার জমিয়াছে। ইহাতে পাঠককে জোর করিয়া হাসাইবার চেষ্টা বা উদ্ভট কষ্ট-কল্পনা নাই,—ঘটনার সহজ, সাবলীল ঘাতপ্রতিঘাতেই হাস্যরসধারার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেকটি গল্প নক্সা ধরনের এবং সুখপাঠ্য। অধিকাংশ গল্প সু-অঙ্কিত কৌতুক-চিত্র দ্বারা শোভিত; ইহাতে গ্রন্থখানির চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের দরুন এই কাগজের চড়া বাজারেও এরূপ একখানি সুমুদ্রিত ও চিত্রশোভিত গল্প-গ্রন্থের মূল্য খুব সামান্যই ধার্য্য করা হইয়াছে, বলিতে হইবে।

কৃষ্ণকথা:—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস। মূল্য তিন আনা। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকট—সুতরাগড়, শান্তিপুর।

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয়ের 'কৃষ্ণ-কথা' পড়িয়া আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। লেখক শাস্ত্রদর্শী, সুপণ্ডিত ব্যক্তি; শুধু তাহাই নহে, তিনি একজন প্রকৃত বৈষ্ণব। সাধনালব্ধ অনুভূতি তাঁহার রচনাকে সুমধুর করিয়াছে। কৃষ্ণ-লীলার ভিতরের কথা এমন প্রাঞ্জল ছন্দোবন্দে কীর্তন করিয়া গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে দেশের অনেকের অজ্ঞানতাগত সংস্কার দূর করিয়াছেন। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ডিসকোর্স অব দি স্টাডি অব সংস্কৃট্:—(ইংরাজী), শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস বি-এ প্রণীত। মূল্য তিন আনা। প্রাপ্তিস্থান—সুতরাগড়, শান্তিপুর। লেখক সংস্কৃত ভাষার সমৃদ্ধির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। লেখা সুচিন্তিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ, ভাষা প্রাঞ্জল।

শ্রীশ্রীমদনগোপাল মাহাত্ম্য:—শ্রীভোলানাথ বাণীকণ্ঠ প্রণীত। জীব শিব মিশন, শান্তিপুর। মূল্য দুই আনা।

অদ্বৈত বংশের বিগ্রহ দেবতা শ্রীশ্রীমদনগোপাল দেবের লীলা কবিতায় বর্ণনা করা হইয়াছে। ভাষা সুন্দর এবং সুমধুর। লেখা ভক্তি-রসে অনুভাবিত। ভক্তি-রস-পিপাসুগণ এই পুস্তক পাঠে আনন্দ পাইবেন।

সাহিত্য সংবাদ

গল্প প্রতিযোগিতা

সাঁত্রাগাছি প্রভাতী সঙ্ঘের উদ্যোগে স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে একটি গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গল্পটি হাস্য-রসাত্মক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প সঙ্ঘের সচিত্র মাসিকপত্র প্রভাতীতে প্রকাশিত হইবে ও আগামী পূজার সময় যে সাহিত্য বাসর হইবে তথায় পুরস্কার ঘোষণা ও বিতরণ করা হইবে। ফলাফল "দেশ" পত্রিকায় জানান হইবে। গল্প ফুলস্ক্যাপ কাগজের ১০ পৃষ্ঠার অনধিক ও কাগজের এক পিঠে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া চাই। প্রতিযোগিগণকে একটি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিতে হইবে যে, ইহা তাঁহার মৌলিক রচনা। কোন প্রবেশ মূল্য নাই ও ২৫শে ভাদ্রের মধ্যে লেখা নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছান চাই।

শ্রীশিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, সভাপতি, প্রভাতী সঙ্ঘ, পোঃ সাঁতরাগাছি, হাওড়া।

ছাত্রবাণী প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা

যে কোনও স্কুলের অথবা কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বা ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন।

১। **প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা।** বিষয়—"স্বাধীনতা আন্দোলন ও ছাত্রদল" (বাংলায় লিখিতে হইবে)। পুরস্কার—একটি রৌপ্য পদক।

২। **তর্ক প্রতিযোগিতা।** বিষয়—"রাজনীতি বাদ দিয়া শিক্ষা সম্ভব নয়" (বাংলায় তর্ক হইবে)। পুরস্কার একটি রৌপ্য পদক।

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগীদের স্বীয় প্রবন্ধ, নাম, ঠিকানা, স্কুল বা কলেজ ও শ্রেণীর উল্লেখ সহ এবং বিতর্ক প্রতিযোগীদের নাম, ঠিকানা, স্কুল বা কলেজ ও শ্রেণীর উল্লেখ সহ নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, প্রতিযোগিতা কমিটি, দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্রবাণী, (2nd yr. Science Sec. C. Ashutosh College)।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের শতবার্ষিকী

সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে অমিয় নিমাই চরিতকার পরম ভাগবত বৈষ্ণবাচার্য মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের শতবার্ষিক পূর্তি হওয়ায় শীঘ্রই শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। এই বিরাট কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কবি শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী বি এ, কবিরত্ন সভাপতি ও শ্রীকুঞ্জকিশোর দাস বি এ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন ও একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়াছে। কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে চারিটি রবিবারে ধর্মসভা আহ্বান করিয়া শিশিরকুমারের জীবন-কথা ও বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা ও সুসাহিত্যিক কর্তৃক বিশদভাবে আলোচিত হইবে। ভক্তমণ্ডলীর ও জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর এই প্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করে। সভায় পঠিত হইবার উপযোগী ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ ও কবিতা আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পাদকের নামে ২৭নং আটাপাড়া লেন, পোঃ কাশীপুর, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য বঙ্গের কবি ও সাহিত্যানুরাগী ভক্তবৃন্দকে অনুরোধ জানান যাইতেছে। সভার স্থান, সময় ও কার্যতালিকা সংবাদপত্রে যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে।

(স্বাঃ) শ্রীগোবর্ধন দাস, সম্পাদক, প্রচার বিভাগ।

আজ-কাল

গান্ধীজীর প্রোগ্রাম

গান্ধীজী নিজের আয়ত্তে জাতীয় আন্দোলনের যে পথ আলাদা করে' রেখে মাঝে তাঁর শিষ্যদের দিয়ে বৃটিশ গভর্ন-মেণ্টের সঙ্গে আপোষের শেষ চেষ্টা করিয়ে নিলেন, কংগ্রেস আবার সেই পথে ফিরে গেল। আমরা তখনই বলেছিলাম যে, এই চেষ্টা ব্যর্থ হবে আশঙ্কা করেই গান্ধীজী বাহ্যত নিজেকে পৃথক করে' রেখেছেন, যাতে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব ক্ষুণ্ন না হতে পারে এবং যাতে কংগ্রেস তাঁর দোহাই দিয়ে আবার সংগ্রামের পথে ফিরে আসতে পারে। যাক্, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি (এ আই সি সি) ১৫ই ও ১৬ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই অধিবেশনে এক প্রস্তাবে গান্ধীজীকে আবার একনায়ক পদে অভিষিক্ত করেছেন এবং যে পুণা সিদ্ধান্তে অহিংসা নীতি বিসর্জন দিয়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আপোষের প্রস্তাব করা হয়েছিল তা বাতিল করে' দিয়েছেন।

এই দীর্ঘ প্রস্তাবটি গান্ধীজীরই খস্‌ড়া; কিন্তু প্রস্তাবটি পড়ে' কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বা পরিকল্পনার হদিস্ পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় অধিবেশনে গান্ধীজীর ইংরেজী বক্তৃতায়। প্রস্তাবে শুধু এই অস্পষ্ট কথা আছে—"কংগ্রেস অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত তার নীতি অনুসরণ করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করবে। তবে বর্তমানে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রয়োজন হলে তা জনসাধারণের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রসারিত করার ইচ্ছে কংগ্রেসের নেই।" গান্ধীজী স্পষ্টত এই কথাগুলির ব্যাখ্যাই তাঁর বক্তৃতায় করেছেন। তিনি বলেছেন যে, অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী বলে' কংগ্রেসের পক্ষে নিশ্চয়ই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবার অধিকার আছে; ভারতে যে সমর প্রচেষ্টা চলছে স্বাধীন হলে ভারতে তা চল্‌ত না, অতএব তার বিরোধিতা করতে কংগ্রেস ন্যায়ত অধিকারী। তিনি বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বুঝিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের সেই অধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা চাইবেন। তাঁর ভাষায় "যতক্ষণ সম্পদ ও জনবল সম্পর্কে সমর প্রচেষ্টার সঙ্গে অসহযোগ প্রচার করা চল্‌বে ততক্ষণ আইন অমান্যের প্রয়োজন নেই; কিন্তু সে স্বাধীনতা যদি না থাকে তাহলে চিরতন্ন দাসত্ব ছাড়া স্বাধীনতার কিছু থাক্‌বে না।" গান্ধীজীর এ কথার তাৎপর্য স্পষ্ট।

তবে তিনি ব্যাপক আইন আন্দোলন করবেন না, এ কথাও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন। "আমি সত্যাগ্রহ এড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করব। সত্যাগ্রহ এলে কি আকার নেবে আমি জানি না। কিন্তু আমি জানি যে, আইন অমান্যের গণ-আন্দোলন হবে না, কারণ সে আন্দোলন এ ক্ষেত্রে উপযোগী নয়।"

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় একটা সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিকট ভবিষ্যতে আরম্ভ হতে পারে।

ধরপাকড়

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর গোয়েন্দা পুলিস ভারতরক্ষা আইনে কলকাতায় ও বাঙলার অন্যান্য জায়গায় ব্যাপক ধরপাকড় করেছে। শ্রীপ্রতুল গাঙ্গুলী, শ্রীজ্ঞান মজুমদার এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যান্য বহু কর্মীই প্রধানত গ্রেপ্তার হয়েছেন। তার আগে শ্রীরবি সেন ও শ্রীনরেন্দ্র দাস গ্রেপ্তার হন। এ ছাড়া অন্তরীণ, আটক, বহিষ্কার ইত্যাদি প্রত্যহই বাঙলায় ও অন্য প্রদেশে সমানভাবে চলছে।

কোয়েটার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ, জওহরলাল নেহরু ডাঃ আশ্‌রফ প্রমুখ কংগ্রেস নেতাকে বেলুচি-স্থানে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। লোরালাইতে 'আঞ্জমান-ই-ওয়াতান'-এর (জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান) যে সম্মেলন হবে তাতে তাঁদের যোগ দেবার কথা ছিল।

বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা?

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নমেণ্ট এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, পেশোয়ারের উপর বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা যদি দেখা দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে কারা স্থানান্তরে যেতে চায় তা জান্‌বার জন্য গভর্নমেণ্ট শীগ্‌গিরই বাড়ি বাড়ি খবর নিতে আরম্ভ করবেন। অবশ্য বিপদ এখন কিছু দেখা যাচ্ছে না এই আশ্বাস দিয়ে তাঁরা বলেছেন যে, সব রকম জরুরী অবস্থার জন্যেই প্রস্তুত থাকা উচিত। কি মনে করে' যে কর্তৃপক্ষ এ রকম সাজ-সাজ রব তুললেন বোঝা যায় না।

শক্কর দাঙ্গা

শক্কর দাঙ্গা সম্বন্ধে বিচারপতি ওয়েষ্টনের তদন্তের রিপোর্ট বের হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, মঞ্জিলগা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্যই এই সাংঘাতিক সংঘর্ষে পর্যবসিত হয়। দুই পক্ষের উদারতার অভাবের উল্লেখ করে' তিনি বলেছেন যে, আল্লাবক্স মন্ত্রিসভার টালবাহানার ফলে শেষ পর্যন্ত এই দাঙ্গা বাধে। মুসলিম লীগকে তিনি এইভাবে দায়ী করেছেন যে, মুসলিম লীগ আল্লাবক্স মন্ত্রিসভাকে তাড়িয়ে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে মঞ্জিলগা নিয়ে আন্দোলন সুরু করে। দাঙ্গায় হিন্দুদের বেশী ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন।

ইওরোপ

বৃটেন অভিযানের আয়োজন

জার্মান সৈন্যেরা বৃটেন চড়াও করবার জন্যে তোড়জোড় করছে। গত ১১ই সেপ্টেম্বর মিঃ চার্চিল বেতার বক্তৃতায় এই আয়োজনের একটা আভাস দেন। তিনি বলেন জার্মান বন্দর হাম্বুর্গ থেকে ফরাসী বন্দর ব্রেস্ত পর্যন্ত, এমন কি আরও দক্ষিণের ফরাসী বন্দর পর্যন্ত সমগ্র উপকূলভাগে জার্মান সৈন্য-বাহী বজরা ও অন্যান্য জাহাজ সমবেত হয়েছে এবং উপকূলীয় কামানের আশ্রয়ে এক বন্দর থেকে আর এক বন্দরে চলাচল করছে। ডোভার প্রণালীতেই কর্মতৎপরতা সব চেয়ে বেশী। নরওয়ের বন্দরগুলিতে সৈন্য বহনের তোড়জোড় চলছে। মিঃ চার্চিল বলেন যে, এই অভিযান যে কোনো মুহূর্তে আরম্ভ হতে পারে, বিশেষ করে' আগামী সপ্তাহে অভিযানের সম্ভাবনা খুব বেশী। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, এ অভিযান প্রতিহত করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা বৃটেন করেছে।

ইংলণ্ডের বিপরীত উপকূলে জার্মান জাহাজ সমাবেশ ভেঙে দেবার জন্যে বৃটিশ বিমানবহর ক্রমাগত আক্রমণ চালাচ্ছে। তা'রা কালে, বুলোঞ, ডানকার্ক, দিয়েপ প্রভৃতি বন্দরে প্রবলভাবে বোমা বর্ষণ করছে। মাইলের পর মাইল আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে' খবর পাওয়া যায়। বৃটিশ লঘু নৌবহরও জার্মান বজ্‌রা ও জাহাজের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

বিমান-হানা

এ কয়দিনও জার্মানরা যথারীতি বৃটেনে, বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ডে ও লণ্ডনে হানা দিয়েছে। জার্মানরা চেষ্টা করছে যে, ডোভার ও কেণ্ট অঞ্চলের বিমান ঘাঁটি থেকে বৃটিশ জঙ্গী বিমানকে বিতাড়িত করে' অভিযানের পথ প্রস্তুত করতে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বলছেন, তাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তবে তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, বৃটেনের উপর আকাশ যুদ্ধ এখনো সংকট-জনক অবস্থায় রয়েছে।

লণ্ডনের উপর হানায় জার্মানরা দুদিন বাকিংহাম প্রাসাদের উপর বোমা ফেলেছে। দ্বিতীয়বারের আক্রমণে একটি বোমা রাণীর খাসকামরার মধ্যে পড়ে। রাজারাণী আশ্রয়স্থলে যাওয়ায় অক্ষত থাকেন। বোমার আঘাতে লর্ডসভা-ভবনও কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লণ্ডনের কতকগুলি বিখ্যাত গির্জা, দুইটি মিউজিয়াম ও অন্য কয়েকটি অট্টালিকা ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেণ্ট পল গির্জায় একটি 'সময়-বোমা' পড়েছিল, কিন্তু সেটাকে অনেক-কষ্টে সরিয়ে ফেলায় গির্জাটি বেঁচে গেছে। লণ্ডনের হানায় অনেক লোকের প্রাণহানি হয়েছে।

বৃটিশ বিমানবহরও বারংবার বার্লিনের উপর হানা দিচ্ছে। ১০ই সেপ্টেম্বর নৈশহানায় তারা বোমা মেরে রাইখ্‌ষ্টাগ ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। এ ছাড়া আর্ট একাডেমী, ব্রাণ্ডেনবুর্গ তোরণ ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলিতে বোমার আঘাত লেগেছে।

ইতালীয় সৈন্যের আক্রমণ

ইতালীয় সৈন্যেরা ওদিকে মিশরের মধ্যে প্রবেশ করে' সীমান্তবর্তী সোলুম শহর দখল করেছে এবং মরু অঞ্চলের ভিতর দিয়ে আরও এগিয়ে চলেছে। বৃটিশ-মিশরী কর্তৃপক্ষ বল্‌ছেন যে, ইতালীয়রা যে অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, সে অঞ্চল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ নয়; তবে তাদের অগ্রগতি যদি অভিযানের আকার নেয়, তাহলে মিশর যুদ্ধ ঘোষণা করবে। কিন্তু ইতালীয় সৈন্যদের আক্রমণে অনেকের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে বৃটিশ গোলন্দাজ দল ও বিমানবহর আক্রমণ চালিয়ে ইতালীয়দের বিব্রত করে' রেখেছে।

স্পেনের মনোভাব

জার্মান গভর্নমেণ্টের আমন্ত্রণে স্পেনের স্বরাষ্ট্র সচিব সেনর সুনার বার্লিনে গেছেন। সেখানে তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, স্পেন এখন যুদ্ধে যোগ না দিলেও এ যুদ্ধ সম্পর্কে নিঃস্বার্থ নয়; যখন ঠিক সময় আস্‌বে তখন সে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কর্মক্ষেত্রে নাম্‌বে। স্পেন যে সাম্রাজ্য চায়, এ কথাও তিনি বলেছেন এবং জার্মানি ও ইতালির প্রতি মৈত্রী জানিয়েছেন। তাঁর এ বিবৃতিতে জিব্রাল্টারের উপর দাবী প্রচ্ছন্ন আছে বলেই মনে হয়।

সিরিয়াতে ইতালীয় যুদ্ধ বিরতি কমিশন ফরাসী বাহিনীর নিরস্ত্রীকরণ তত্ত্বাবধানের জন্যে উপস্থিত হয়েছেন। এ নিয়ে নানা খবর প্রচারিত হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, ইতালীয়রা সিরিয়াতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের মতলব করেছে।

পেত্যাঁ গভর্নমেণ্ট

এক খবরে প্রকাশ, পেত্যাঁ গভর্নমেণ্টের কাছে ইতালি দাবী করেছে, উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী সৈন্যদল ভেঙে দিতে হবে এবং জার্মানি দাবী করেছে যে, অনধিকৃত ফ্রান্সের শতকরা ৫৮ ভাগ গৃহপালিত পশুপক্ষী জার্মানিকে দিতে হবে। পেত্যাঁ গভর্নমেণ্ট নাকি এ দাবী অগ্রাহ্য করেছেন, ফলে সমগ্র ফ্রান্সই জার্মানি ও ইতালির দখলে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ফরাসী গেজেটে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ফ্রান্সে জার্মান বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্যে ফরাসী গভর্নমেণ্ট ২৫শে জুন থেকে প্রত্যহ ২ কোটি মার্ক দেবে।

বল্কান সমস্যা

রুমানিয়া ও বল্কান সম্পর্কে গোলমাল এখনো মেটেনি। রুমানিয়ায় আয়রন গার্ডকে একমাত্র দল হিসেবে স্বীকার করে' জেনারেল আণ্টোনেস্কু ফাশিষ্ট ডিক্টেটরী প্রবর্তন করেছেন; কিন্তু বাইরে থেকে সোভিয়েটের চাপ এখনো কমে নি। সোভিয়েট সীমান্তে রুমানিয়ান সৈন্যদের আক্রমণাত্মক কাজ সম্বন্ধে আবার প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং সীমান্তে তার সৈন্য সমাবেশের খবর পাওয়া গেছে। রুমানিয়া সীমান্ত হাঙ্গামার দায়িত্ব সোভিয়েটের উপর চাপিয়েছে, তবে রুমানিয়ান সৈন্যদের উপর কোনোরকম গোলমাল না করবার আদেশ দিয়েছে। হাঙ্গারীও রুমানিয়ার বিরুদ্ধে হাঙ্গারীয়ানদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ করেছে।

এদিকে ভিয়েনায় দানিয়ুব সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে সম্মেলন জার্মানি আহ্বান করেছে সোভিয়েট তাতে অংশ গ্রহণের অধিকার দাবী করেছে। জার্মানি উত্তর দিয়েছে কি না জানা যায় নি।

* * * *

জাপানের এক ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, জাপ বিমান-বাহিনী ২২শে এপ্রিল থেকে ৩৩ বার চুংকিং আক্রমণ করেছে এবং এই সব আক্রমণের ফলে চুংকিং শহরের চার পঞ্চমাংশ ভস্মীভূত হয়েছে।

১৬-৯-৪০ —ওয়াকিবহাল।

উত্তরা চিত্রগৃহে অব্যবস্থা

"**শাপমুক্তি**" দেখিতে গিয়া উত্তরা চিত্রগৃহে যে অব্যবস্থা দেখিয়াছি তাহার উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। প্রথমত, প্রেস প্রিভিউ ও টিকিট বিক্রয় একই দিনে ও একই সময়ে নির্ধারিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রেস প্রিভিউর স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতা অবান্তর বলিয়াই প্রমাণিত হয়। আরও মনে হয়, ব্যবস্থাপকেরা প্রেস সমালোচনার জন্য বিশেষ ব্যগ্র নহেন—এক ইহার বিজ্ঞাপন মূল্য

"বেহুলা" নৃত্যাভিনয়ে মনসার ভূমিকায় কুমারী মঞ্জরী সেন

ছাড়া। দ্বিতীয়ত, অভিনেতা ও অভিনেত্রী সম্মেলনের ফলে আবহাওয়া এতই ভারাক্রান্ত হয় যে ব্যবস্থাপকেরা খোলাখুলিভাবে বৈষম্যমূলক ব্যবহার সুরু করেন। আমরা যে কার্ডখানি পাইয়াছিলাম, তাহাতে একটা সিট নম্বর দেওয়া ছিল। কিন্তু উপস্থিত হইলে কর্তৃপক্ষেরা খুশীমত আসন ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কয়েকখানা আসনে রিজার্ভ চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং 'এখানে নয় মশাই' 'এখানে নয় মশাই' এরূপ একটা আর্তনাদে পর্যন্ত উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ চমকাইয়া উঠিতেছিল। বস্তুত, যে কোনখানে বসাইয়া একটা প্রশংসামূলক বিজ্ঞাপন আদায় করাই যে কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় ও অধিকার এই ধারণাই আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কর্ণপাত করিবার অনাগ্রহ ও নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আশা করি, নিরপেক্ষ প্রেস সমালোচকমাত্রেই উত্তরা চিত্রগৃহের কর্তৃপক্ষের প্রতি এই অব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবেন এবং এইরূপ বৈষম্য ব্যবহারের প্রতিবাদ জানাইবেন।

গ্লোব রঙ্গমঞ্চে নৃত্যনাট্য

আগামী ২৩ ও ২৪এ সেপ্টেম্বর বাণী সংগীত সংঘের ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক উক্ত স্কুলের সাহায্যকল্পে গ্লোব রঙ্গমঞ্চে 'বেহুলা' নৃত্যনাট্যাভিনয়ের আয়োজন হইয়াছে। সম্ভ্রান্তঘরের কয়েকটি মহিলাও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন। কুমারী দীপ্তি সান্যাল, নন্দিতা রায়, রমলা রায়, মীরা সরকার, মঞ্জরী সেন, শ্রীমতী বলিগা, সবিতা চ্যাটার্জি, শীলা চ্যাটার্জি, বাণী চৌধুরী প্রভৃতি এই নৃত্যাভিনয়ের বিভিন্ন অংশে অবতীর্ণা হইবেন।

প্যারাডাইসে—"সন্ত জ্ঞানেশ্বর"

গত শনিবার হইতে প্যারাডাইস সিনেমায় প্রভাতের বহু প্রশংসিত চিত্র 'সন্ত জ্ঞানেশ্বর' প্রদর্শিত হইতেছে। মহারাষ্ট্র দেশের সর্বজনপূজ্য সাধু জ্ঞানেশ্বরের অপূর্ব জীবন-কাহিনী ও সাধনা এই চিত্রে রূপ পাইয়াছে। যশোবন্ত, সাহু মোদক, সুমতি গুপ্তে, মঞ্জু, ভগবৎ, শঙ্কর কুলকর্ণী প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। আগামী সপ্তাহে এই চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীনিকেতনে পল্লীস্বাস্থ্য সংগঠন

(৩৪৫ পৃষ্ঠার পর)

পাড়ার বাহিরে গ্রামের এক প্রান্তে তাহাদের বস্তি। তাহারা কয় বৎসর পল্লী সমিতির কার্যে যোগদান করে নাই। কারণ হিন্দু ও মুসলমান পাড়ার মধ্যে গুরুতর মানসিক ব্যবধান ছিল। চারি বৎসর পরে তাহারা যোগদান করে এবং এই সংগঠন সমিতির ভিতর দিয়াই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদৃঢ় প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই সমবেত চেষ্টার দ্বারা সেচ সমিতি গঠন করিয়া তাহাদের আর্থিক উন্নতির পথ মুক্ত করিয়াছে। বাঁধগোড়া গ্রামের পাশেই মুসলমানপ্রধান কাশীপুর গ্রাম। এই উভয় গ্রামের হিন্দু মুসলমানদের সমবেত চেষ্টায় এই বৎসর নিকটবর্তী রাজনালার উপরে পাকা বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। এবং তদ্দ্বারা আরও তিনশত বিঘা জমিতে সেচের সুব্যবস্থা হইয়াছে। এই সংগঠনমূলক কার্যের সফলতার দ্বারা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, পল্লীগ্রামে তাহাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ এক। সেইজন্য তাহাদের ঐক্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যে কোনও ক্ষুদ্র পল্লীর অঙ্গনে তোমরা যদি যথার্থ দীপ জ্বালিতে পার, তবে তাহা সমগ্র দেশের অন্ধকার দূর করিবে।"

বাঙালী বালিকাদের বাস্কেট বল খেলা

বাস্কেটবল খেলার প্রতি বাঙালী বালিকাগণের উৎসাহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে স্কুলের ছাত্রীগণ হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজের উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাগণ পর্যন্ত এই খেলায় যোগদান করিতেছেন। ইণ্টার স্কুল ও ইণ্টার কলেজ মহিলা বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। অথচ মাত্র ৫ বৎসর পূর্বেও বাস্কেটবল খেলায় বাঙালী বালিকা বা যুবতীগণের এইরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। তখন কেবলমাত্র সরকারের অথবা মিশনারী পরিচালিত বালিকা স্কুল বা কলেজের ছাত্রীগণকে এই খেলায় কখনও কখনও যোগদান করিতে দেখা যাইত। এই সকল মিশনারী স্কুল কলেজে বাস্কেটবল খেলার ব্যবস্থা বহু দিন হইতেই আছে। এই সকল স্কুল ও কলেজের ব্যায়াম পরিচালিকাগণ এই খেলার প্রতি যাহাতে বালিকাগণ আকৃষ্ট হয় ও নিয়মিতভাবে যোগদান করে, তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহারা অনেক সময়ই বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন শোনা গিয়াছে, "বাস্কেটবল খেলার প্রতি বাঙালী বালিকাগণের উৎসাহ কোনদিনই বৃদ্ধি পাইবে না।" কিন্তু তাঁহাদের সেই উক্তি যে বৃথা হইয়াছে, তাহা বর্তমানে তাঁহারাই স্বীকার করেন। তাঁহাদের অনেকেই বর্তমানে বলিয়া থাকেন, "এত অধিক সংখ্যক বাঙালী বালিকা এই খেলা শিক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ততা প্রদর্শন করিতেছে যে, আমাদের শিক্ষা দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হইতেছে।" পাঁচ বৎসরের মধ্যে এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্তন কিরূপে হইল ইহা অনেকেরই কল্পনাতীত; কিন্তু আমরা কোনরূপ আশ্চর্যান্বিত হই নাই। কারণ আমরা জানি এই উৎসাহ বৃদ্ধির মূল কোথায়? খেলার ব্যবস্থা করিলে হয় না, খেলার প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, ইহা বাস্কেটবল খেলাটি বাঙালী বালিকাগণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য যাঁহারা পূর্বে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। তাঁহারা ভাবিয়া ছিলেন প্রথমে খেলা শিক্ষা দিতে হইবে, তাহার পর যখন বহু সংখ্যক ছাত্রী এই খেলা শিক্ষা করিয়াছে দেখা যাইবে তখনই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিলে চলিবে। এইরূপ চিন্তা করা তাঁহাদের যে খুবই অন্যায় হইয়াছিল তাহা নহে। যাঁহারা বিভিন্ন খেলা প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ইহাতে দ্রুত প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাই হইতেছে, একমাত্র উপায় যাহার দ্বারা যে কোন খেলা বা ব্যায়াম ব্যবস্থার দ্রুত প্রসারতা সম্ভব হয়। বাস্কেটবল খেলার প্রতি বর্তমানে বাঙালী বালিকা ও যুবতীগণের যে অভাবনীয় উৎসাহ দেখা যাইতেছে এবং গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে ইহার প্রসার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার মূলেও আছে এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।

ইণ্টার কলেজ বাস্কেট বল খেলা

মহিলা ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস এসোসিয়েশন পরিচালিত ইণ্টার কলেজ হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড চ্যালেঞ্জ বাস্কেট বল প্রতিযোগিতা, বালিকাগণের মধ্যে বাস্কেট বল খেলার উৎসাহ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ, ইহা একরূপ দৃঢ়তার সহিতই বলা চলে। এই প্রতিযোগিতাটি ১৯৩৮ সালে সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বে কলেজের ছাত্রীগণের জন্য বাস্কেট বল খেলার এইরূপ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল না। ইহার পূর্বে যে কয়েকটি বালিকাদের বাস্কেট বল খেলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতো কেবল মহিলা ক্লাব বা স্কুলের ছাত্রীগণ যোগদান করিতে পারিত। এই সকল প্রতিযোগিতায় বাঙালী বালিকাগণ যোগদান করিত না। ১৯৩৮ সালে ইণ্টার কলেজ মহিলা বাস্কেট বল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইলে, অনেকেই ভাবিয়াছিলেন, প্রতিযোগিতা চলিবে না। প্রথম বৎসরে তিনটি কলেজের ছাত্রীগণ যোগদান করিল। তাহার মধ্যে দুইটি বাঙালী পরিচালিত কলেজ। একটি বাঙালী মহিলা কলেজ এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইল। পর বৎসর দেখা গেল, কলিকাতার সকল মহিলা কলেজই যোগদান করিয়াছে। উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণের বাস্কেট বল খেলার সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচারিত হওয়ায়, বাঙলার সর্বত্র বালিকা ও যুবতীগণ এই খেলার প্রতি দৃষ্টি দিলেন। যে যে স্কুল বা কলেজে এই খেলার ব্যবস্থা ছিল, সেই সেই স্কুল ও কলেজের ছাত্রীগণ নিয়মিতভাবে খেলায় যোগ দিতে লাগিলেন। যে যে স্কুল বা কলেজে খেলার ব্যবস্থা ছিল না, সেই সেই স্কুল বা কলেজ ছাত্রীগণের চাপে পড়িয়া খেলার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপ তিন বৎসরের মধ্যে বাস্কেট বল খেলার প্রসার বাঙালী বালিকাগণের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৎসর মহিলা ইণ্টার কলেজ বাস্কেট বল খেলায় মুসলমান যুবতীগণও যোগ দিয়াছেন। সুতরাং দুই এক বৎসরের মধ্যে বাস্কেট বল খেলা বাঙলা দেশের সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের বালিকা ও যুবতীগণকে বিনাদ্বিধায় যোগদান করিতে দেখা যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাস্কেট বল খেলার ইতিহাস

১৮৯১ সালে আমেরিকার ওয়াই এম সি এর এক ব্যায়াম শিক্ষক মিঃ জেমস নেই স্মিথ সর্বপ্রথম এই খেলার প্রবর্তন করেন। তিনিই এই খেলার আবিষ্কারক। শীতের সময় ঘরের মধ্যে ফুটবল বা বেসবল জাতীয় কোন খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না, ইহা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মনের মধ্যে বাস্কেট বল খেলার কৌশল উদয় হয়। তিনি তখন কাল্পনিক খেলাটিকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য ওয়াই এম সি এর ছাত্রগণকে লইয়া খেলিতে আরম্ভ করেন। কয়েকদিন খেলিবার পর নিয়মকানুন গঠন করা সম্ভব হয়। তাহার পর ওয়াই এম সি এর কর্তৃপক্ষগণকে মিঃ স্মিথ তাঁহার পরিকল্পিত খেলার কথা বলিলে, তাঁহারা খুবই আনন্দিত হন ও খেলার প্রসারের ব্যবস্থা করেন। ওয়াই এম সি এর পৃথিবীর সর্বত্রই আড্ডা আছে। এই আড্ডার সাহায্যে এই খেলার প্রসার করা সম্ভব হয়। পুরুষগণের মধ্যেই প্রথম এই খেলা প্রসার লাভ করে। স্ত্রীজাতিও যাহাতে এই খেলায় যোগদান করিতে পারে, তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে ঘন ঘন অনুরোধ আসিতে থাকায়, ওয়াই এম সি এর কর্তৃপক্ষগণ বাস্কেট বল খেলার নিয়মকানুন কিছু পরিবর্তন করিয়া মহিলাদের খেলিবার পক্ষে উপযোগী করিয়া দেন। মহিলাদের বাস্কেট বল খেলিবার নিয়মাবলীর সহিত পুরুষদের বাস্কেট বল খেলার নিয়মাবলীর বিশেষ পার্থক্য নাই। মহিলাদের নিয়মে খেলোয়াড়গণ নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন তাহার বাহিরে যাইবার উপায় নাই। তিন সেকেণ্ডের বেশী বল ধরিয়া রাখিতে পারেন না। ড্রিবল করিবার সময়ই মাত্র বলটি মাটিতে ঠুকিতে পারে। ইহা ছাড়া অন্য সকল নিয়মই পুরুষদের মত।

১০ সেপটেম্বর।—

লণ্ডনের উপর জার্মান হাওয়াই হামলার তীব্রতা আজ নাই। বাস, ট্রাম ও ট্রেন যথারীতি স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করিতেছে, যদিও আজ চারবার বিমান আক্রমণ জ্ঞাপক সংকেতধ্বনি হইয়াছে। মেঘে ঢাকা লণ্ডনের আকাশের উপর আকাশ যুদ্ধের শব্দ পাওয়া যায়। একটা বোমা একটা বড় হোটেলের কাছেই বিস্ফোরিত হয়। শনিবারের হামলায় ৩০৬ জন এবং রবিবারের হামলায় ২৮৬ জন নিহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজরাও গত রাত্রে বার্লিন ও জার্মানির নানা স্থানে বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

পেশোয়ারে বিমান আক্রমণ ঘটিলে কিভাবে সহজে শহরের অধিবাসীদের সরাইয়া দেওয়া যায়, গভর্নমেণ্ট সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন।

১১ সেপটেম্বর।—

ব্রিটিশ বিমান বহর বার্লিনে প্রবল হাওয়াই হামলা করে। রাইখস্ট্যাগ ও পটসডাম রেল স্টেশনে বোমা বর্ষিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইহা বার্লিনে ইংরেজদের প্রচণ্ডতর বিমান আক্রমণ বলিয়া বর্ণিত। জার্মানরাও লণ্ডনে হাওয়াই হামলা করিয়াছে। আজ ৭৯টা জার্মান ও ১৭টা ব্রিটিশ বিমান বিনষ্ট হইয়াছে।

এক বেতার বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত চার্চিল বলিয়াছেন, হামবুর্গ হইতে ব্রেস্ট পর্যন্ত সমস্ত উপকূল জার্মান জাহাজে আচ্ছন্ন হইয়াছে; বিপুল সংখ্যায় জার্মান সৈন্য ব্রিটেন আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত; আগামী সপ্তাহ বা উহার কাছাকাছি সময়কে দেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহ বলিয়া মনে করিতে হইবে; প্রবল আক্রমণ আসন্ন, দেশের নরনারী যেন প্রস্তুত থাকে। তিনি আরও বলেন, হিটলার যে আগুন জ্বালাইয়াছে, উহা ইউরোপ হইতে নাৎসী জার্মানিকেই নিশ্চিহ্ন করিবে।

১২ সেপটেম্বর।—

বার্লিনের উপর ব্রিটিশ বিমান বাহিনী গত রাত্রে প্রবলতম আক্রমণ চালাইয়াছিল। বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ, প্রায় পাঁচ শত জন নিহত ও বহু গৃহ অগ্নিযুক্ত হইয়া ওঠে। ক্যালে, দিয়েপ, বুলোঁ ও অস্টেণ্ডও আক্রান্ত হয়। ফরাসী বন্দরসমূহে স্থিত ও চলমান জার্মান জাহাজ সমূহের উপরেও ইংরেজদের প্রবল আক্রমণ চলিতেছে। প্রকাশ, একটি যোগানদার জাহাজ জলমগ্ন ও দুইটি বিশেষ আহত হইয়াছে।

লণ্ডনে জার্মান আক্রমণের সংবাদ নাই।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, ইতালীয় সৈন্যগণ মিশরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

১৩ সেপটেম্বর।—

আজ বিকালে বিমান আক্রমণের সময় বাকিংহাম প্রাসাদের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রাসাদের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। এ ছাড়া ডাউনিং স্ট্রীটে ও সেণ্টপলস ক্যাথিড্রলের নিকটেও বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইংরেজরাও নানা শত্রুস্থানে ও জার্মান কনভয়এর উপর বোমাবর্ষণ করিতেছে।

বাসল-এর 'ন্যাশন্যাল জাইতুং'তে বার্লিন হইতে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, ফরাসী উপকূলে মার্শাল গোয়েরিংএর সহিত ফিল্ড মার্শাল ফন ব্রাউসিচ আসিয়া যোগদান করিয়াছেন।

ইংরেজরা এয়ারোপ্লেন ধ্বংস করিবার জন্য এক নূতন অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। এক যন্ত্রের দ্বারা বিনা সার্চলাইটের সাহায্যে শত্রুবিমানের অবস্থান নির্ণয় করিয়া 'বক্স ব্যারেজ' নামক একপ্রকার মারণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবে।

কেনিয়া ব্রিটিশ সৈন্যরা শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

১৪ সেপটেম্বর।—

ইংলণ্ডে ও লণ্ডনে পুনরায় জার্মানদের বিমান আক্রমণ হয়। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া আক্রমণ চালাইতে থাকে। লণ্ডনে আজ চারবার বিমান আক্রমণসূচক সংকেত ধ্বনি হয়। জার্মানির ব্রিটেন অভিযানের আয়োজন বিপর্যস্ত করিবার জন্য ব্রিটিশ বোমারু বিমান সমূহে গতকল্য সারারাত্রি বর্লোঁর দক্ষিণ হইতে ডানকার্কএর উত্তর পর্যন্ত সমগ্র ফরাসী উপকূলের বন্দর সমূহে প্রবল হামলা চালাইয়াছে। তা ছাড়া বহু শত্রুস্থানেও ইংরেজরা সফল আক্রমণ চালাইয়াছে।

উত্তর আয়ারলাণ্ডের উপকূলস্থ জাহাজের উপরে জার্মানরা বোমা ফেলিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। একটি শহরেও কয়েকটা আগুনে বোমা পড়ে। উত্তর আয়ারলাণ্ডে ইহাই প্রথম বিমান আক্রমণ।

১৫ সেপটেম্বর।—

ব্রিটেনে ও লণ্ডনে জার্মান হাওয়াই হামলা পূর্ববৎ অল্পাধিক চলিতেছে। প্রকাশ, বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে আজও বোমা পড়িয়াছে। কেহ হতাহত হয় নাই। আজিকার হামলায় ১৬৫টা জার্মানদের ও ৩০টা ইংরেজদের বিমান বিনষ্ট হইয়াছে।

কায়রোর সংবাদ—শত্রুপক্ষ (ইতালি) মিশরের বেওয়ারিশ এলাকায় (সোলুম ও মুসায়েদের দক্ষিণ-পশ্চিম স্থিত এক অঞ্চলে) প্রবেশ করে। ইংরেজদের সাঁজোয়া গাড়ি তাহাদের বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে।

১৬ সেপটেম্বর।—

ইংলাণ্ড ও লণ্ডনে পূর্ববৎ অল্পাধিক জার্মান বিমান আক্রমণ চলিতেছে। বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, মার্শাল গোয়েরিং গত রাত্রে স্বয়ং একটি বোমারু বিমান চালাইয়া লণ্ডনের আকাশে আসিয়াছিলেন। ডোভারে ফ্রান্সের জার্মান কামান হইতে গোলাবর্ষণ হইয়াছে। ইংরেজরাও জার্মানি ও জার্মান অধিকৃত বহু স্থানে হাওয়াই হামলা করিয়াছে। বার্লিন, অ্যাণ্টোয়ার্প ও ক্যালের উপরেও প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছে। লণ্ডনের ইস্তাহার—আজ পর্যন্ত মোট ২১৪৩টা জার্মান বিমান বিনষ্ট হইয়াছে; ব্রিটিশ বিমান হইয়াছে ৪৬০। তন্মধ্যে ২৩৩ জন বৈমানিক প্রাণে বাঁচিয়াছেন।

মেলবোর্ন-এর সংবাদ—অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মেঞ্জিস ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, জার্মানি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে শান্তির এক প্রস্তাব করিবে।

ইটালির সৈন্যদল সোলুম দখল করিয়াছে।

১৭ সেপটেম্বর।—

আজ কমন্স সভায় শ্রীযুক্ত চার্চিল এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, গ্রেট ব্রিটেন আক্রমণ করিবার জন্য জার্মানির জাহাজ প্রভৃতির সমাবেশ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। সুবিধা মনে করিলেই তাহারা ইংলাণ্ড আক্রমণ করিবে। গত রবিবারে ১৮৭টা জার্মান বিমান ধ্বংসের উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি বিশেষভাবে খোঁজ লইয়া জানিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত নহে। এজন্য তিনি রয়েল এয়ার ফোর্সের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এক হইতে পনের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিমান আক্রমণে দুই হাজারের বেশী অসামরিক অধিবাসী নিহত ও আট সহস্রাধিক ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

আজও লণ্ডনে বিমান আক্রমণ জ্ঞাপক সংকেতধ্বনি কয়েকবারই হয়। ডোভার প্রণালীর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য জার্মানির ইংলাণ্ড আক্রমণের অন্তরায় ঘটিয়াছে। ইংলিশ চ্যানেলের উপকূল, বার্লিন, জার্মানি প্রভৃতি বহু স্থানে ইংরেজদের বহুব্যাপক হামলার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকটি জার্মান জাহাজও ডুবিয়াছে ও ঘায়েল হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১১ সেপটেম্বর।—

গত ১১ এপ্রিল কলিকাতার মহম্মদ আলি পার্কে হিন্দীতে একটি বক্তৃতা করার অপরাধে এবং 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ প্রকাশিত 'হিসাব নিকাশের দিন' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের হয়, অতিরিক্ত চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তাহার শুনানি আরম্ভ হইয়াছে। সুভাষচন্দ্র আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বঙ্গীয় দোকান কর্মচারী বিলের প্রথম ছয়টি ধারা বিনা পরিবর্তনে গৃহীত হইয়াছে।

করাচির সংবাদ—সক্কর হাঙ্গামা সম্পর্কে বিচারপতি ওয়েস্টনের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে যে, মঞ্জিলগড় আন্দোলনই সক্কর হাঙ্গামার কারণ।

১২ সেপটেম্বর।—

বাঁকুড়া কলেজ বন্ধ হওয়ায় হোস্টেলের ছাত্ররা অবস্থান ধর্মঘট (stay-in-strike) আরম্ভ করিয়াছেন। ধর্মঘট শান্তিপূর্ণ অবস্থায় চলিতেছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বঙ্গীয় দোকান কর্মচারী বিলটি সকল দলের সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। বাঙলার শ্রীযুক্ত গভর্নরের সম্মতি লাভ করিলেই ইহা আইনএ পরিণত হইবে।

মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্ত আজাদ, শ্রীযুক্ত জওহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বোম্বাইএ সমবেত হইতেছেন। ঘরোয়া আলোচনা চলিতেছে।

১৩ সেপটেম্বর।—

বোম্বাইএ কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে। জানিতে পারা গিয়াছে, মহাত্মা গান্ধী আজিকার বৈঠকে বর্তমান সংকট সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিবৃতি দান করিয়াছেন। প্রকাশ, শ্রীযুক্ত আজাদ ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষের কথামত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকেও নাকি অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে শ্রীমতী অণিমা সেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

সরকারী ঘোষণা—আগামী ১৯ নভেম্বর হইতে নিউ-দিল্লিতে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে স্বর্গত দেশকর্মী যতীন দাসের একাদশ মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

১৪ সেপটেম্বর।—

বোম্বাইএ এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু বলেন, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কংগ্রেস শীঘ্রই কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, তাহা মহাত্মা গান্ধীই নির্ধারিত করিবেন।

বোম্বাইএ কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির অধিবেশন চলিতেছে।

বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বাঙালী বেকারদিগকে চাকরিতে নিয়োগের দাবি জানাইবার জন্য প্রাদেশিক বেকার ফেডারেশনের উদ্যোগে সন্ধ্যায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক জনসভার অধিবেশন হয়।

ভারতরক্ষা আইন।—কলিকাতা, খিদিরপুর, চন্দননগর, বাঁকুড়া, নিউদিল্লি, যশোহর, শ্রীহট্ট, দেরাদুন, কাশী, ফরিদপুর, কুমিল্লা, জামসেদপুর প্রভৃতি নানাস্থানে খানাতল্লাশ, ধরপাকড়, গ্রেপ্তার প্রভৃতি হইয়াছে।

১৫ সেপটেম্বর।—

সিমলার সংবাদ—২১ সেপটেম্বরে বোম্বাইএ হিন্দু মহা-সভার ওআর্কিং কমিটির অধিবেশন হইবে।

ভারতরক্ষা আইন—কলিকাতায় 'ফরোআর্ড ব্লক' পত্রের ম্যানেজার প্রমুখ ২৬ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তা ছাড়া কলিকাতার আরও নানা স্থানে ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সরিষা-বাড়ি, ময়মনসিংহ, মাদারিপুর, ডালটনগঞ্জ, নইনিতাল প্রভৃতি নানা স্থানে উক্ত আইনের প্রতাপ প্রবল।

বি এন রেলের বেনাপুর ও নারায়ণগড় স্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটি রেলওয়ে ক্রসিংএ একটা মোটরবাস একটা এঞ্জিনের উপর আসিয়া পড়ে। ফলে ড্রাইভারসহ পাঁচজন নিহত ও আটজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

আজ বেলা আড়াইটার সময় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠকে উত্থাপিত করিবার জন্য ওআর্কিং কমিটি দিল্লি ও পুনার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া সাতশত শব্দযুক্ত এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। মোটামুটি তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেসের প্রস্তাব ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এমনভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে, ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করিবার কোনও অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই। অতএব জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এই সংকটে রাষ্ট্রীয় সমিতি কংগ্রেসকে পরিচালনা করিবার জন্য মহাত্মাজীকে অনুরোধ করিতেছেন। মহাত্মাজী এই ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন। বলিয়াছেন, এই সংকটকালে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়া ব্রিটেনকে বিব্রত করিতে চান না।

১৬ সেপটেম্বর।—

বোম্বাইএ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন শেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জওহরলাল উত্থাপিত প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত। মহাত্মাজী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাকে আপনারা নায়করূপে স্বীকার করিয়াছেন, অতএব কোনওরূপ আপত্তি উত্থাপন না করিয়া আমার আদেশ আপনাদিগকে পালন করিতে হইবে। বড়লাটের সহিত একটা নিষ্পত্তি না করা পর্যন্ত আইন অমাননা করা আপনাদের কর্তব্য হইবে না।'

শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে আজ সন্ধ্যায় চাঁদপুর সম্মিলনীর উদ্যোগে মহাবোধি সোসাইটি হলে এক জনসভা হয়। বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কালিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদ—ভারতরক্ষা বিধির প্রতিবাদ-কল্পে তেলিচারি নামক স্থানে আহূত এক জনসভায় পুলিস কর্তৃক গুলিবর্ষণ জন্য দুইজন নিহত হইয়াছে। ক্যানোর নামক স্থানে আহূত এক কৃষক সভায় গুলি চালানোর জন্য এক পুলিস ইন্‌সপেক্টরকে উন্মত্ত জনতা ঢিল মারিয়া হত্যা করিয়াছে।

১৭ সেপটেম্বর।—

আজ সন্ধ্যায় চৌরঙ্গীর ওয়াই এম সি এ হলে ইন্দো-পোলিশ অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভার অনুষ্ঠান হয়। সার্ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ সভাপতিত্ব করেন। সভায় রবীন্দ্রনাথের বাণী পঠিত হয়।

বোম্বাইএর সংবাদ—বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার উত্তরে শ্রীযুক্ত বড়-লাট বোম্বাইএর শ্রীযুক্ত গভর্নরের মারফৎ জানাইয়াছেন, যখন খুশি মহাত্মাজী বড়লাটের সহিত দেখা করিতে পারেন।

সিমলার সংবাদ—১৪ ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন বিকালে কালকা অভিমুখে রওনা হইবার পরেই লাইনচ্যুত হওয়ায় এঞ্জিন ও তৃতীয় শ্রেণীর দুইটি গাড়ি লাইনচ্যুত হয়। ড্রাইভার ছাড়া আর কাহারও জীবনহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।
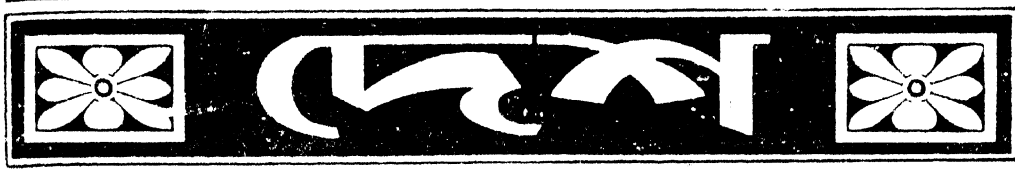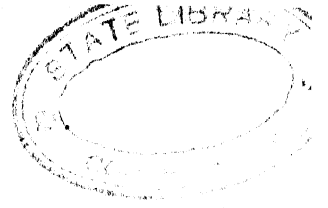
সাময়িক প্রসঙ্গ

৭ম বর্ষ। শনিবার, ১২ই আশ্বিন, ১৩৪৭ সাল Saturday, 28th September, 1940 । ৪৬ সংখ্যা

বড়লাটের রায়—

বড়লাটের সহিত মহাত্মার আর এক দফা সাক্ষাৎকার হইল, জিন্না সাহেবের সঙ্গেও হইয়াছে। মহাত্মাজী পূর্ব হইতেই দেশের লোককে জানাইয়া দিয়াছেন যে, বড়লাটের সঙ্গে তাঁহার এই সাক্ষাৎকারকে দেশের লোক যেন ভুল না বুঝে। তিনি যথেষ্ট বিনয়-নম্র শুদ্ধ অহিংসার ভাব লইয়াই বড়লাটের সঙ্গে দেখা করিবেন, তিনি বড়লাটকে ভয় দেখাইতে যাইবেন না। বড়লাটের ঘোষণার পর হইতে গভর্ণমেন্টের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া গান্ধীজী যে সিদ্ধান্তে পেঁীছিয়াছেন, বড়লাটের নিকট সেগুলি নিবেদন করিবার ফলে বড়লাটের যুক্তি শুনিয়া গান্ধীজী যদি বুঝেন যে, তাঁহার ধারণা ভুল, তাহা হইলে নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কথা উঠিতে পারে না। ইতিমধ্যে বড়লাটের চিত্ত যাহাতে সদয় এবং অনুকূল হয়, সে জন্য মহাত্মাজীর ব্যবস্থা অনুসারে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃপালনী এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। মূঢ় লোকে উহাতে আনুগত্য, তোয়াজ বা মডারেট নীতির পরমতত্ত্বের সন্ধান পাইতে পারে; কিন্তু ইহাই যে সত্য ধর্ম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং ঐ সত্যধর্মের শক্তিতে একদিন বিশ্বপ্রেম ফুটিয়া উঠিবে। এই বিশ্বপ্রেমের প্রাথমিক পাঠ হিসাবে কংগ্রেসকর্মীদিগকে (১) ব্যক্তিগত বা অন্য কোন প্রকার প্রতিরোধ নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে; কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির মর্মার্থ বুঝাইয়া দিবার জন্য সভা আহবান করিতে হইবে। এই সব সভায় পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট বক্তাগণ বক্তৃতা করিবেন; তাঁহাদের আলোচনা কেবল-মাত্র প্রস্তাবের বিষয়বস্তুতে নিবদ্ধ থাকিবে; (৩) কোন প্রাদেশিক দিবস বা মিছিল অথবা হরতাল করা চলিবে না; (৪) কোন প্রকারেই প্রস্তাব ব্যাখ্যা করিবার ছলে রং-রুট সংগ্রহ বিরোধী অথবা যুদ্ধে চাঁদা দানের বিরুদ্ধে কোন প্রচারকার্য করা চলিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কর্তৃপক্ষের চিত্তে করুণার উদ্রেক করিবার জন্য কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দলের চেষ্টায় ত্রুটি নাই। ইহা সত্ত্বেও যে ভারত-রক্ষা আইনের বেড়াজাল ফেলিয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীদিগকে কেন আটক করা হইতেছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। যাহা হউক, ভারতের স্বাধীনতার মত ছোটখাট ব্যাপারের দিকে কংগ্রেসের দক্ষিণী দলের লক্ষ্য আর নাই, প্রেমের দ্বারা বিশ্ব জয়ই তাঁহাদের মূলমন্ত্র। প্রেমের প্রথম পাঠে যদি ব্রিটিশ প্রভুদের মন না গলে, চিন্তা নাই—দ্বিতীয় পাঠের ব্যবস্থা হইবে। বিশ্বজগতকে প্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার এই মহাব্রতের সাধনায় দুই •একশত বৎসরের হিসাবতো কিছুই নয়!

বিনা বিচারে আটকের নীতি—

বিনা বিচারে আটক রাখিবার নীতি বাঙলা মুল্লুককে মৌরসী লইয়া বসিয়াছে। আমলাতন্ত্রের আমলে গোয়েন্দা পুলিশের গুপ্তচরদিগের যে নীতি বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজ তথাকথিত জনপ্রিয় মন্ত্রীদের হাতে সেই নীতির জলুস দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার নাজিমুদ্দিন সে দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যে হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতেই বুঝা যায় এই নীতি ক্রমেই কিরূপ ব্যাপকতা লাভ করিতেছে। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় একটি বিবৃতিতে দেশের লোকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং বাঙলার জনমতকে এদিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। দোষী যে, প্রকাশ্য আদালতের বিচারে দোষ প্রতিপন্ন হইবার পর তাহাকে সাজা দেওয়ার মূলে আইনের মর্যাদা নিহিত থাকে, ইহা আমরা বুঝি; কিন্তু বিনা বিচারে লোককে আটক রাখিবার মূলে ন্যায় বা সুবিচারের কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু এই সব যুক্তির কথা তুলিয়া লাভ নাই,—কর্তার ইচ্ছাতেই কর্ম হইবে

এবং পরাধীনতার পুরস্কারস্বরূপে জাতিকে এমন সব অবিচার ভোগ করিতেই হইবে। দেশের সর্বাঙ্গীণ স্বার্থে জাগ্রত গণশক্তির নিয়ন্ত্রণ যেখানে শাসনতন্ত্রে নাই, সেখানে এমন সব নীতি যুক্তি-নিরপেক্ষভাবে অচল থাকিবে—ইহাই সার কথা।

শিক্ষাবিল ও বিশ্ববিদ্যালয়—

বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল মাধ্যমিক শিক্ষাবিল সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিমত জানিতে চাহিয়াছেন, কৃপার কথা বলিতে হইবে। ভাইস-চ্যান্সেলার মাননীয় খান বাহাদুর আজিজুল হক সিনেট সভায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট বিলটি বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ কমিটি সিনেটের নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিলে সিনেট বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিবেন। কিন্তু তাহা ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয় এইরূপ অভিমত জ্ঞাপনের জন্য ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় চাহিয়াছেন। ভাইস-চ্যান্সেলার ইহাও বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন পর্যন্ত যেসব ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছিলেন, এই বিলের দ্বারা সেই রকম কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে কাড়িয়া লইবার প্রস্তাব হইয়াছে। সুতরাং বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গুরুতর এবং বিশেষভাবে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করাও দরকার। সেজন্য দুই মাস খুব বেশী সময় নহে! কিন্তু এদিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ কর্তৃক এই বিলের সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য যে সিলেক্ট কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিতে বলা হইয়াছে। সুতরা বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে বিলের সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য উপযুক্ত সময় পান, তেমন বিবেচনা বিলের উদ্যোক্তা মন্ত্রীদের ছিল না। থাকিবার কারণই বা কি? জোটবাঁধা দলের দৌলতে তাঁহারাই যখন সুবে বাঙলার কর্তা, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বা সিণ্ডিকেটের ধার ধারিবে তাঁহারা কিসে? মামুলী হিসাবে তাঁহারা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতটা জানিতে চাহিয়াছেন, ইহার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। বাঙলা সরকারের কাছে মাধ্যমিক বিল সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতামত কি মূল্য লাভ করিবে, ইহা হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। সভ্যতা, সংস্কৃতি, পাণ্ডিত্য কোয়ালিশনী দলে ভেড়ার শিঙে পড়িয়া বাঙালীর সকল গর্ব এবার চূর্ণ হইবে এবং জাঁকিয়া উঠিবে হক-মন্ত্রিমণ্ডলের মহিমা।

বাঙালীর স্বদেশী ব্রত—

গত রবিবার কলিকাতার কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে কমার্সিয়াল মিউজিয়ামে বক্তৃতাকালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রা বাঙালীকে বাঙলা দেশে উৎপন্ন শিল্পজাত বিশেষভাবে বাঙলা দেশের মিল এবং তাঁতের কাপড় ব্যবহারের জন্য উপদেশ দান করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আবেগময়ী ভাষায় এই আবেদন দেশের লোকের কাছে করিয়াছেন এবং এ কথা ভাঙ্গিয়াই বলিয়াছেন যে, বাঙালীকে বাঙালীর হাতের জিনিস ব্যবহার করিতে বলিলে তাহাতে প্রাদেশিকতা হয় না; ইহা আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। বাঙলা সহস্র সহস্র শিল্পী এখনও তাঁত-শিল্পকে অবলম্বন করি বাঁচিয়া আছে; সুতরাং বাঙালীর নিকট তাঁত শিল্পে দাবি সকলের আগে। কিন্তু তাঁতের কাপড়ের দ্বারা বাঙলায় বস্ত্রাভাব মিটে না; সুতরাং মিলের কাপড় বাঙালীকে ব্যবহার করিতে হইবে। যাঁহারা মিলের কাপড় ব্যবহার করেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন বাঙলা দেশের মিলের কাপড়ই কিনেন। আজকাল পাড়ের উপর ঝোঁক খুব বেশী হইয়াছে, ফ্যাসানের বাজারে আধুনিকতা থাকিবে না, শৌখীনতা থাকিবে না, সকলে শুদ্ধাচারের নামে বিলাস বর্জন করিতে হইবে, এমন কথা আমরা বলি না। আমাদের নিবেদন এই যে, ক্রেতা বাঙলা দেশের কাপড়কেই যেন প্রাধান্য দেন। বাঙলা দেশে মিলের কাপড় ফ্যাসন-দুরুস্ত পাড়ের দিক হইতে এখ যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। সুতরাং শৌখীনতা বজা রাখিবার জন্য বাঙালীকে বাঙলার বাহিরের কাপড় কিনিতে হইবে, এমন অবস্থা এখন আর নাই।

জাঁদরেল কমিউনিস্ট—

২৪ পরগনার পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির জমিদারী ১৮ জন প্রজাকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়া তাহাদের না মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। বিচার হয় দায়রা আদালতে কারণ অভিযোগ সোজা নয়! বিচারে জুরীরা একমত হই

...দিগকে নির্দোষ বলিয়া খালাস দেন; কিন্তু জমিদারী কোম্পানী ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাঁহারা দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করেন, আপীল অগ্রাহ্য হইয়াছে। ১৮ জন কৃষকের বরাত জোর বলিতে হইবে; কারণ একে অভিযোগ রাজনৈতিক, তাহাতে আবার কমিউনিস্টরূপ মারাত্মক মতবাদের ধূনার গন্ধ, এ ফ্যাসাদ কাটাইয়া বাহির হওয়া সহজ নয়। বাঙলা দেশের যেসব কমিউনিস্টদের পাল্লায় পড়িয়া বাঙলা সরকারকে ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজাল প্রয়োগ করিতে হইতেছে তাহারা এই শ্রেণীর কি না, এই মামলায় এ সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হইবে কিন্তু—বিনা বিচারে আটক রাখিবার নীতি হাতে থাকিতে সে সন্দেহ-সংশয় ভঞ্জনের দায় কর্তাদের নাই।

বোম্বাইএর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য—

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গত রবিবার বাঙলার কংগ্রেসকর্মীদের এক সভায় বোম্বাইতে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন—"ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বর্তমানের প্রশ্ন নয়, এমন কি দেশের স্বাধীনতাও নয়; যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রশ্নই হইল বর্তমানে কংগ্রেসের নিকট প্রথম প্রশ্ন। বোম্বাইতে গৃহীত প্রস্তাব দোধারা করাতের মত। ভারতবাসীরা যুদ্ধে যোগ দিবে কি না দিবে, বড়লাট যদি এ সম্বন্ধে ভারতবাসীদের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত করিবার অধিকারকে স্বীকার করিয়া লন, তাহা হইলে পরোক্ষভাবে নিজেদের ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে ভারতবাসীদের অধিকার স্বীকার করিয়াই লওয়া হইল, আর বড়লাট যদি তাহাতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলেও এই প্রশ্নকে ভিত্তি করিয়া নূতন সংগ্রামের সূত্র পাওয়া যাইবে। সংগ্রামের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বোম্বাইয়ের সিদ্ধান্তের অন্তর্গূঢ়দৃষ্টির এই সূক্ষ্মতায় বাহাদুরি আছে, আমরা স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের কথা এই যে, যুদ্ধ-সম্পর্কিত প্রশ্নটির গুরুত্ব ভারতবাসীদের নিকট হইল ভারতের স্বাধীনতা লইয়া, বিশ্বপ্রেম বা বিশ্ববাসীকে নিরস্ত্র করিবার সঙ্গে উহার কোন সম্পর্ক নাই। বোম্বাইয়ের প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নকে গৌণ করিয়া পাশ্চাত্যের একদল শান্তিবিলাসীদের পচা কথাকে এতদিন পরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বড় করা হইয়াছে। স্বাধীনতার কথা গৌণ করা হইয়াছে। জগতের কাছে এই শুদ্ধশান্তিকামী ভারতের মর্যাদা বাড়িবে না যতটা মর্যাদা বাড়িত স্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষ প্রশ্ন করিয়া একটা বলিষ্ঠ নীতি লইয়া দাঁড়াইলে।

বাঙলায় নূতন ট্যাক্স—

বাঙলার অর্থসচিব বাজেট উপস্থিত করিয়া বাঙলা দেশে কয়েক দফা নূতন ট্যাক্স বসাইতে হইবে এই সুসমাচার ঘোষণা করিয়াছিলেন, তখনই বুঝিয়াছিলাম "যত ইতি পাপং নরোত্তমে চাপং", যত চাপ পড়িবে গিয়া বাঙলা দেশের বিপন্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং গরীবদের উপর। যেরূপ শুনা যাইতেছে, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের আশঙ্কাই কার্যে পরিণত হইবে। শুনিতেছি, ট্যাক্স বসিবে কয়েক দফা, তাহার মধ্যে এক দফা হইবে বিক্রয় ট্যাক্স, অর্থাৎ দোকানদারেরা খুচরা হিসাবে যে মাল বিক্রয় করিবে, তাহার উপর বিক্রয়লব্ধ টাকার উপর এই ট্যাক্স। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে যুদ্ধজনিত এই মহার্ঘের বাজারে মালপত্রের দর যে আরও চড়িবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া, ট্যাক্স আদায়কারী কর্মচারীদের তদ্বির এবং তোয়াজ করিতে দোকানদারদিগকেও দন্ডভোগী হইতে হইবে। ঘুষের সুবিধা হইবে দস্তুরমত। জিনিসের দর ইতিমধ্যেই যথেষ্ট চড়িয়াছে, ইহার উপরে আবার যদি নূতন ট্যাক্সের কল্যাণে আরও চড়ে, তাহা হইলে ধনীর কষ্ট হয়ত কিছু হইবে না, কিন্তু গরীবের ডালভাতওয়ালা মন্ত্রী মহোদয়ের মনে রাখা উচিত যে—তাঁহারা অবশ্য ডালভাতের যোগাড় করিয়াছেন কিন্তু বাঙলা দেশের শতকরা ৮০জন লোকেরই দুইবেলা দস্তুরমত ডালভাতের ব্যবস্থা নাই। প্রস্তাবিত নূতন ট্যাক্স বসিলে দেশের লোকের কষ্টের অবধি থাকিবে না।

মুসলমান ও জাতীয়তা—

শেখ মহম্মদ আবদুল্লা কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদী মুসলমান দলের নেতা। কয়েক বৎসর পূর্বে কাশ্মীরের আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, সুতরাং মুসলমান সমাজের স্বার্থের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইনি সম্প্রতি লুধিয়ানা শহরে আজাদ মুসলিম সম্মেলনে বক্তৃতায় মুসলমানদিগকে এই পরামর্শ দান করিয়াছেন যে, আগে মুসলমান পরে ভারতবাসী এই যুক্তি তাঁহারা যেন অবলম্বন করিয়া না চলেন। তিনি মুসলমানদিগকে অধিক সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগদান করিতে আহ্বান করেন। আমরা আশা করি, মুসলমান সমাজ কাশ্মীরের এই মুসলিম নেতার পরামর্শকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করিবেন। এক ভারত-বর্ষেই মুসলিম জাতির বাস নহে। তুরস্ক, আরব, পারস্য, মিশর, চীন সব দেশেই মুসলমান আছেন এবং সব দেশের মুসলমানেরাই তাঁহাদের জন্মভূমির স্বাধীনতাকে বড় বলিয়া বুঝেন। চীনের মুসলমানদের সঙ্গে ভারতবর্ষের মুসল-মানদের অবস্থার কতকটা তুলনা করা যাইতে পারে। চীনের মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়; কিন্তু চীনের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের খোঁজ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, চীনা মুসলমানেরাই তথাকার স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ-

ভাবে আত্মদান করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। জগতের সর্বত্র মুসলিম সমাজ আজ পরাধীনতার বিরুদ্ধে জাগ্রত, পড়িয়া রহিবে কি ভারতের মুসলিম সমাজ? যে সব মুসলমান নেতা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক-স্বরূপে ভারতের বৈদেশিক পরাধীনতাকে দৃঢ় করিতেছেন, তাঁহারা ভারতের মুসলমানদিগকে মুসলিম জগতের দৃষ্টিতে হেয় করিয়াই তুলিতেছেন। ভারতের তরুণ মুসলমান সম্প্রদায় এই সত্যকে উত্তরোত্তর উপলব্ধি করিতেছেন ইহাই আশার কথা।

ভারতীয় ছাত্রাবাসে বোমা নিক্ষেপ—

নিষ্ঠুরতা এবং নির্বিবেক বর্বরতাই হইল বর্তমান সভ্যজনোচিত যুদ্ধের বিশেষত্ব। লোকক্ষয় যত বেশী করা যায় যাহাতে, তাহাতেই এ যুদ্ধের কৃতিত্ব এবং চমৎকারিত্ব। সেদিন লণ্ডনের গাউয়ার স্ট্রীটস্থ ভারতীয় ছাত্রদের হোস্টেলের উপর জার্মানদের বোমা পড়িয়াছিল। আক্রমণের সময় ৪০জনের অধিক ছাত্র এই হোস্টেলে ছিল; আক্রমণের ফলে একজন বাঙালী ছাত্র নিহত হইয়াছে এবং অনেকজন আহত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সব খবর পাওয়া যায় নাই; জনসাধারণের উদ্বেগ দূর করিবার জন্য এ সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর অবিলম্বে জ্ঞাপন করা উচিত।

খাদির মাহাত্ম্য—

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙলা দেশের তাঁতীদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল; কিন্তু আজ তাহারা নিরন্ন, সমস্ত দিন তাঁত চালাইয়াও দুইবেলা দুই মুঠা ভাতের যোগাড় তাহারা করিতে পারে না। আমরা বাঙলার তাঁতীদের অবস্থার উন্নতি হয়, ইহাই চাই এবং বাঙলার মিলের কাপড়ের কদরও দেখিতে চাই, দেশীয় শিল্প হিসাবে খাদিরও অর্থনৈতিক গুরুত্ব আমরা স্বীকার করি; কিন্তু খাদির আধ্যাত্মিক উন্নতির শক্তিকে আমরা স্বীকার করি না কিংবা চরকা ঠেলিলেই ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ হইবে, এমন ধারণা করিবার মত মানসিক উৎকর্ষ আমরা এখনও লাভ করি নাই। কিন্তু গান্ধীজী সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে সেদিনও বলিয়াছেন, চরকা ও সুতা কাটাই সর্বোত্তম কৃত্য, ইহাই অহিংসা এবং ইহাই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র অস্ত্র, যাহারা চরকায় বিশ্বাসী নহে, আমার সেনা-বিভাগে তাহাদের প্রবেশের অধিকার নাই। গান্ধীজীর ব্যাখ্যাত এই আধ্যাত্মিকতায় তাঁহার ভক্তবৃন্দ গলিয়া পড়িতে পারেন, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মুচকি হাসিয়া উহাকে উপেক্ষাই করিবে। গান্ধীজী তাঁহার আধ্যাত্মিক মহিমার বিলাস ইহাতে উপভোগ করিতে পারেন, কিন্তু দেশের বা জাতির দুঃখকষ্টের বাস্তব সমাধান এ সব সূক্ষ্মতত্ত্বে হইবে না।

ভারতে রজার মিশন—

স্যার আলেকজেণ্ডার রজারের নেতৃত্বে রজার মিশনের ৬ জন প্রতিনিধি এবং ১৬ জন উপদেষ্টা গৌহাটিতে পৌঁছিয়াছেন। ভারতে কি কি সমরোপকরণ কি কি ভাবে প্রস্তুত হইতে পারে, সে বিষয়ে তদন্ত করাই হইল এই মিশনের উদ্দেশ্য। ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া মিশনের সদস্যগণ অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে নয়াদিল্লী, পূর্ব আফ্রিকা, নিউজীল্যাণ্ড, সিংহল, ব্রহ্ম, মালয়, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিদের মিলিত বৈঠকে যোগ দিবেন এবং পরামর্শ করিবেন। এই পরামর্শ সভায় ভারতের কালা আদমীর মধ্যে ঠাঁই পাইয়াছেন, একমাত্র স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ। বলা বাহুল্য, স্যার মহম্মদ জাফরুল্লার সঙ্গে ভারতের জনসাধারণের কোন সম্পর্কই নাই। ভারতে সমরসম্ভার উৎপাদন সম্পর্কিত এত বড় একটা বৈঠক, ভারতবাসীদের সাহায্য পাঠাইবার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রীদের, বিশেষভাবে ভারত সচিবের শুনা যায় এত ব্যাকুলতা, অথচ এই বৈঠকে ভারতের জাতীয়দলের কাহাকেও যোগ দিতে আহ্বানও করা হয় নাই। ভারতবাসীর হাতে ভারতের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিবার মতিগতিরই স্পষ্ট প্রমাণ নয় কি?
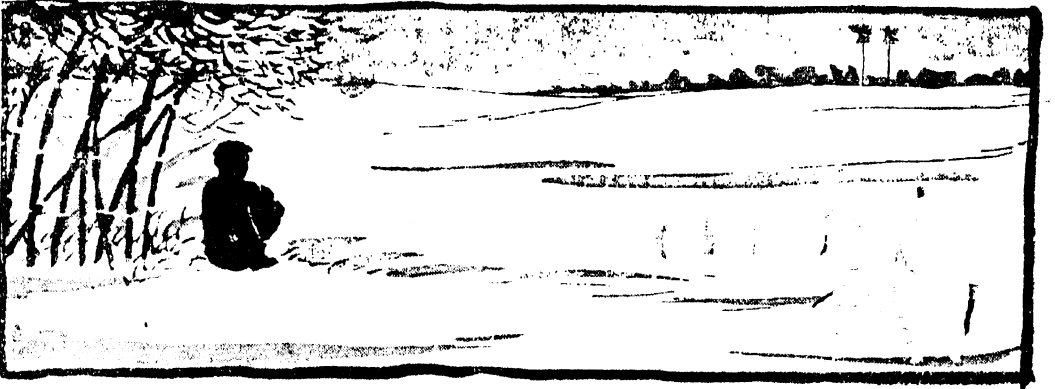
ভারতের পূর্বে ও পশ্চিমে সংগ্রাম

ইটালি যখন ইংরেজ ও ফরাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন মুসোলিনী বলিয়াছিলেন যে, অপর কাহাকেও যুদ্ধের মধ্যে টানিয়া আনিবার ইচ্ছা ইটালির নাই। মুসোলিনী তাঁহার ঘোষণায় বলেন, সুইজারল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, তুরস্ক, মিশর ও ইটালি সকলেই যেন তাঁহার এই কথা শুনিয়া রাখে। মুসোলিনীর সে কথা শুনিতে অবশ্যই কাহারও বাকী ছিল না; কিন্তু ইতিমধ্যেই মুসোলিনী তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। ইটালীয় সেনাদল মিশর আক্রমণ করিয়াছে। প্রথমে তাহারা সোল্লুম নামক স্থানটি দখল করে, ইহার পর আরও কিছুদূরে আগাইয়া আসিয়া সিদিবারানী নামক ছোট ঘাঁটিটা দখল করিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার কোন স্থানেই ইটালীয় সেনাদল বাধা পায় নাই। শুধু তাহাই নহে, ইটালি মিশরের মধ্যে ৬০ মাইল প্রবেশ করা সত্ত্বেও মিশর ইটালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই করে নাই। কিন্তু স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ইটালি অভিযান যখন আরম্ভ করিয়াছে, তখন মিশরের সঙ্গে প্রেম-পরিচয়ের উদ্দেশ্য তাহার নাই। সে সুয়েজ খাল এবং লোহিত সাগরের তীরভাগে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চায়; সুতরাং মিশরকে সংঘর্ষের মধ্যে টানিবার ঝুঁকি সে লইয়াছে। কিন্তু মিশরের গভর্নমেণ্ট এখনও যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই; এই বিষয় লইয়া মতভেদের ফলে অবিলম্বে যাঁহারা যুদ্ধ ঘোষণা করিতে চাহেন, এমন ৪ জন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। বর্তমান মন্ত্রীরা আরও কিছু সময় অবস্থার গতি দেখিয়া তবে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পক্ষপাতী। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে লিবিয়ার সীমানা হইতে আরম্ভ করিয়া মিশরের যে পর্যন্ত স্বল্পজলা মরুভূমি বিস্তৃত হইয়াছে, মিশরের ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ওয়াভেল ইটালীয় সেনা সেই অঞ্চল অতিক্রম করিয়া না আসিলে তাহাদিগকে বাধা দান করিবেন না। জেনারেল ওয়াভেলের অধীনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ ইংরেজ, অস্ট্রেলিয়ান, নিউজীল্যান্ড এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী মিশরে রহিয়াছে। ইটালীয় সেনাদল মার্শা-মাতরু নামক স্থানটির কাছাকাছি আসিলে মিশরের তরফ হইতে তাহাদিগকে বাধা দান করা হইবে। মার্শা-মাতরুকে পশ্চিম দিক হইতে মিশরের তোরণদ্বার বলা হইয়া থাকে। মার্শা-মাতরু সমুদ্রের উপকূলবর্তী ছোট একটি শহর। এই স্থানের প্রধান গুরুত্ব হইল এই যে, এই স্থান হইতে সমুদ্রের ধার দিয়া আলেকজেন্দ্রিয়া পর্যন্ত রেলপথ আছে, তাহা ছাড়া, এখানে প্রচুর পানীয় জল আছে। মিশরের মরু অঞ্চলে ইহা দুর্লভ। সোল্লুম কিংবা সিদি-বারানী কোথায়ও বহুলোকের উপযোগী পানীয় জলের সংস্থান নাই। সুতরাং বিরাট বাহিনী লইয়া সে সব জায়গায় থাকাও কঠিন। মার্শা-মাতরু লিবিয়ার সীমানা হইতে ১৫০ মাইল দূরে। সামরিক বিশেষজ্ঞদের মত এই যে, এই স্থানটি সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ করিতে হইলে অন্তত ১৫ হাজার সেনা লইয়া আসা দরকার। এই ১৫ হাজার সৈন্যকে আনিতে হইলে মরুভূমির ভিতর দিয়া জলের ব্যবস্থা করা সুকঠিন। সৈন্য লইয়া আসিলেই চলিবে না, লড়াই করিয়া জায়গাটা দখল করিতে হইবে। মাসা-মারুত দস্তুরমত সুরক্ষিত স্থান। এই স্থানটি ক্লিওপেট্রা এবং এণ্টনীর গ্রীষ্মাবাস ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।
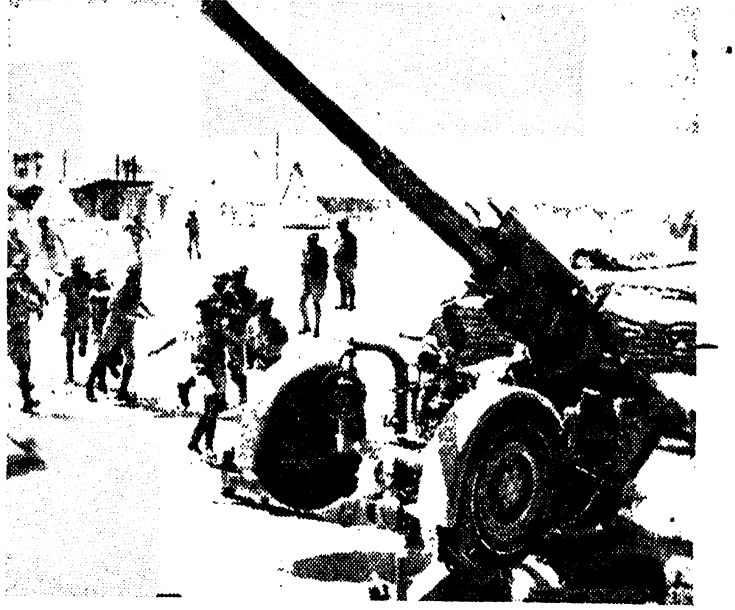
মিশরে মালটার স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনীর আত্মরক্ষার মহড়া

বর্তমান যুদ্ধে সকল শক্তিরই প্রধান সম্বল হইল বিমান-বহর। জার্মানির ন্যায় ইটালিও বিমান বল বাড়াইবার উপর জোর দিয়া আসিয়াছে। যুদ্ধে যোগ দিবার সময় ইটালির ২২ শত উড়োজাহাজ ছিল, এইগুলির মধ্যে দেড় হাজার প্রথম শ্রেণীর। ইটালির বিমানবহরে ৬০ হাজার সেনানী, সাড়ে চার হাজার বিমানচালক এবং দুই হাজার রিজার্ভ সেনা আছে। ইটালিতে আড়াই শত উড়োজাহাজের ঘাঁটী আছে, আর ইটালি অধিকৃত আফ্রিকাতে আছে ৫০টি। সুতরাং মিশরে ইংরেজের যত উড়োজাহাজ আছে, ইটালির উড়োজাহাজের সংখ্যা তার অপেক্ষা বেশী হইবে। কিন্তু ইটালির উড়োজাহাজের

কৃতিত্বের পরিচয় তেমন কিছু পাওয়া যায় নাই। ঘরের কাছে মালটা, কিন্তু সে মালটাতেও ইটালি সুবিধা করিতে পারিতেছে না। ইটালির বিমানবহরের যদি তেমন জোর থাকিত, তবে এতদিন মালটার অবস্থা অন্যরকম হইত।

ইটালির আফ্রিকার এই অভিযানে জার্মানেরা সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা সহজেই বুঝা যাইবে। সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে যে, জার্মানেরা ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার সিনেগালের রাজধানী দাকারে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ফ্রান্সের বর্তমান গভর্নমেণ্টের এমন ক্ষমতা নাই যে, দাকারে জার্মানদের এই চক্রান্তে তাঁহারা বাধা দেন, পক্ষান্তরে, তাঁহারা জার্মানিকে সাহায্য করিতেই বাধ্য হইতেছেন। ফ্রান্সের তুলঁ হইতে সম্প্রতি কয়েকখানা রণতরী দাকারে গিয়াছে, ইহার মূলে জার্মানদের চক্রান্ত আছে বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। পেতাঁ গভর্নমেণ্টের বিরোধী ফ্রান্সের স্বাধীনতার পক্ষপাতী জেনারেল দ্য গল একদল ফরাসী বাহিনী ও ব্রিটিশ বাহিনী সঙ্গে লইয়া দাকারে গিয়াছিলেন, কিন্তু অবস্থা সুবিধার নহে দেখিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।

এসিয়ার পশ্চিম দিকে এবং বলিতে গেলে সামরিক ভারতের পশ্চিম সীমানার অবস্থা এইরূপে জটিল আকার ধারণ করিতেছে। স্পেনের ফ্যাসিস্টপন্থী জঙ্গী নেতাদের সঙ্গে মুসোলিনীর ঘন ঘন মোলাকাৎ চলিতেছে: কেহ কেহ এমন কথা বলিতেছেন যে, জিব্রালটার বন্দর যদি আক্রান্তই হয়, হইবে স্পেনের দ্বারা, মুসোলিনীর দ্বারা নয়। কিন্তু মুসোলিনীর দ্বারাই হউক, আর ফ্রাঙ্কোর দ্বারাই হউক, অবস্থার গুরুত্ব সমানই হইবে, বরং অধিকতর জটিল আকার ধারণ করিবে। ফ্রান্সের পতনের পর এসিয়া এবং আফ্রিকার সামরিক অবস্থার পরিবর্তন কম ঘটে নাই। মুসোলিনীর দলবল সিরিয়ায় নানারূপ চক্রান্ত করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। প্রমাণও তাহার পাওয়া যাইতেছে, দলের পর দল মুসোলিনীর পক্ষের সামরিকগণ সিরিয়াতে যাইতেছে। পূর্বে একদল গিয়াছিল, ইহার পরে আরও নয়জন ইটালিয়ান সিরিয়ার বেইরুটের বৈঠকে যোগ দিবার জন্য তুরস্কের পথে সিরিয়ায় গিয়াছে।

এ তো গেল পশ্চিমের অবস্থা। এ অবস্থার পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। ইংলাণ্ডের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া গেল, সেখানে দুইপক্ষেই সমান তালে লড়াই চলিতেছে।

ইহার পর ভারতের পূর্বদিকের কথা। ইংরেজ ভাষাভাষীদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য ইংলাণ্ডের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যম চলিতেছে; বলা বাহুল্য এই উদ্যম সাহিত্যিক নহে, সম্পূর্ণ সামরিক। ইংরেজে আমেরিকায় চুক্তি হইতেই ইহার সূত্রপাত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, ইংরেজ এবং আমেরিকার যতগুলি উড়োজাহাজ, এবং নৌবহরের ঘাঁটি আছে, যাহাতে উভয় শক্তি এজমালীভাবে সেগুলি ব্যবহার করিতে পারেন, এমন কথা হইতেছে। আমেরিকা ইতিমধ্যেই কানাডার সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেও ঐরূপ চুক্তি হইবে বলিয়া প্রকাশ। ইঙ্গ-আমেরিকার এই মিলনে জাপান চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। জাপানের সংবাদপত্রসমূহ ইহার মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে যে, সিঙ্গাপুরের ঘাঁটি আমেরিকার হাতে দেওয়া হইবে। তাহারা বলিতেছে, ইহা হইলে আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল বুঝিতে হইবে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের তাহাতে আতঙ্কের কারণ সৃষ্টি হইবে। ইংরেজ এবং আমেরিকায় যখন মিলন ঘটিতেছে, তখন জাপানকেও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, জাপান বসিয়া নাই; সামরিক চাতুর্য সেও

মিশরের সীমান্তবর্তী সোল্লুম শহর। এখন ইতালির অধিকৃত

নানাদিক হইতে দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। জাপান জোর করিয়া হিন্দুচীনকে তাহার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইতে বাধ্য করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্যামের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য জাপান উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। শ্যাম এই সুযোগে হিন্দুচীনের উপর নিজেদের দাবি হাঁকিয়াছে। শ্যাম গভর্নমেণ্ট বলিতেছেন যে, ফরাসী অধিকৃত কাম্বোডিয়ায় শ্যামকে কিছু সুবিধা হিন্দুচীনের ফরাসী কর্তৃপক্ষের দেওয়ার বিনিময়ে ১৯০৭ সালে শ্যামের গভর্নমেণ্ট বাত্তামব্যাং নামীয় প্রদেশটি হিন্দুচীনকে দিয়াছিলেন, প্রদেশটি এখন শ্যামকে দিতে হইবে। সামরিক বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, শ্যামের এই দাবির পিছনে জাপানের জাপানকে তুষ্ট রাখিবার মতিগতি অবলম্বন না করিয়া ব্রহ্ম হইতে চীনের পথ বন্ধ না করিতেন, তাহা হইলে চীনা সাধারণতন্ত্রীদের অনেকটা সুবিধা হইত। প্রথমত, হিন্দুচীনের পথ বন্ধ, তারপর ব্রহ্মের পথ বন্ধ হওয়াতে বাহির হইতে চীনা সাধারণতন্ত্রীদের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার উপায় একরূপ বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তিও তাহাদের ক্ষুণ্ণ হয়। সংবাদে প্রকাশ, ইংলণ্ডের ১৩ লক্ষ অধিবাসী ব্রহ্মের পথ চীনের কাছে মুক্ত করিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ আগাগোড়াই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছে; কিন্তু

সাইগন। ইন্দোচীনের একটি শহর

প্ররোচনা আছে। শ্যামদেশে জাপান কিছু সামরিক সুবিধা পাইয়া এখন শ্যামের দাবি সমর্থন করিতেছে। শ্যামদেশ হইতে একদল প্রতিনিধি ইতিমধ্যে মিতালি পাকাইবার জন্য জাপানে গিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়, জাপানের সঙ্গে শ্যামের ঘনিষ্ঠতা কেমন নিবিড় হইতেছে এবং জাপান যদি যোজকের মুখে ঘাঁটি বাঁধিয়া বসে, তাহা হইলে সিঙ্গাপুরের নৌঘাঁটী বিপন্ন হইবে এবং ব্রহ্ম ও ভারতের দিকে জাপানের প্রভাব সম্প্রসারিত হইবে। হিন্দুচীনে জাপানের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হওয়ার অর্থই ভারত সীমান্তে প্রবল একটি শক্তির সান্নিধ্য। হিন্দুচীনে জাপানের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার পক্ষে এক উপায় হইল চীনা সাধারণতন্ত্রীদের শক্তি বৃদ্ধি। জাপান হিন্দুচীনের ভিতর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের মধ্যে ঢুকিবার চেষ্টা হয়ত করিবে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এখন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মতিগতি এ সম্বন্ধে কিরূপ হইবে বুঝিবার উপায় নাই। মোটের উপর দেখা যাইতেছে, ইংরেজী ভাষাভাষীদিগকে একত্র করিবার জন্য যে উদ্যম চলিয়াছে, সামরিক অবস্থার উপর তাহা অনেক প্রভাব বিস্তার করিবে এবং যুদ্ধের নূতন একটা আকার দান করিবে। জার্মানি যত সহজে যুদ্ধ শেষ করিয়া ফেলিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহা সে পারিবে না। যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে এবং এসিয়ার পূর্বদিকেও যে কোন মুহূর্তে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে। তখন জগতের যে কয়েকটি শক্তি এখনও নিরপেক্ষ আছে তাহারা ইহাতে জড়াইয়া পড়িবে। বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার চরম পরীক্ষা হইবে সমরানলে।

টোলের বাড়ি

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য

এদের বাড়িতে পাঁচ-ছয়খানি টোল ছিল একদিন।
সৌম্য মূরতি ছিল কয় ভাই সকলে অধ্যাপক,
নব নব সুরে ঝংকৃত করি বাগ্‌দেবতার বীণ
জ্ঞানবিজ্ঞানে করেছিল যারা জীবনেরে সার্থক।
বহু শাস্ত্রের অধ্যাপনার স্মৃতি শুধু আছে জাগি,
যতগুলি ভাই ততগুলি টোল—বিদ্যার উৎসব—
নানা দিগ্‌দেশ হ'তে ছাত্রেরা জ্ঞানার্জনের লাগি
হেথা গুরুগেহে আসিত একদা তরুণ কিশোর সব।
তর্কবাগীশ-ভিটা মুখরিয়া অধ্যয়নের ধ্বনি
টোলের বাড়ির যশোসৌরভ ছড়াত পল্লীময়,
আজিকে রিক্ত কালের প্রভাবে সেই বিদ্যার খনি
একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি চলি যাও সহৃদয়!
অতীতের সেই গরিমা-উজল দিনগুলি স্মরি স্মরি
হের গো অদূরে ব্যাকুল বকুল পড়িতেছে ঝরি ঝরি।

চৈতন্য পরবর্তী বাউল গান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে সমগ্র বাঙলায় একটা নব যুগের সঞ্চার হইয়াছিল। দুঃখক্লিষ্ট মানুষের মনে শুদ্ধ প্রেমের আনন্দরসের সন্ধান দিবার জন্য শ্রীচৈতন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, ইহাই বৈষ্ণব-ভক্তগণের আন্তরিক বিশ্বাস। প্রেমের লীলা-ধর্মের প্রচার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যে মধুর আনন্দ-লহরীর সৃজন করিয়াছিলেন, তাহার তরঙ্গ প্লাবনে সমগ্র প্রাচ্য ভারত পরিপ্লাবিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্ব-প্রতিভা ছিল অপূর্ব, অতুলনীয়। তাঁহার অসীম ব্যক্তিত্বের প্রভাব বাঙলার ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, সংগীতে বিপুলভাবে কার্যকরী হইয়াছিল। তাঁহার অসীম ব্যক্তিত্বের ফলেই বাঙলা সাহিত্যে অভিনব চরিতাখ্যানগুলির সৃষ্টি হয়। শ্রীচৈতন্যের অল্পকাল-পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের কাব্য শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব লীলা-ধর্মে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। এইসব কাব্যের মধ্যে ভক্তি ও আনন্দের উচ্ছ্বাস জীবন্ত, অমর হইয়া রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর নর্তন, অপূর্ব ভাবাবেশ ও অভিনব লীলাকীর্তন হইতে যে অদ্বিতীয় কীর্তন-নৃত্য সৃষ্ট হইল, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব নিখিল ভারতবর্ষ তথা নিখিল বিশ্ব অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব লীলাধর্ম ও কীর্তন-নৃত্যের প্রভাব বাউল সাধনার উপরও যথেষ্ট কার্যকরী হইয়াছে—চৈতন্য-পরবর্তী বাউল গানগুলির মধ্যে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে।

(১)

বাউল বলে দুই ভাই পরম দয়াল
হেন গৌর নিতাই।
তোমরা জীবের দশা মলিন দেখে
নাম এনেছ গোলক থেকে ভাই॥
তোমরা যারে তারে দাও কোল।
কোল দিয়া বল 'হরিবোল'॥

দুর্দশাপন্ন নরনারীকে আনন্দের সন্ধান দেখাইতে শ্রীগৌরাঙ্গ নামমাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন বিশ্বপ্রেমের রসিক।

(২)

চাঁদ গৌর লীলার বাজারে
অবাক্ যায় হেরে।
সুঁচে ছিদ্র মজার কথা
পার করে গজে বরে॥
ইঁদুরে বিড়ালে সাপে নেউলে।
এক জায়গায় বসত করে একেই মিশালে॥
তা দেখ্যা এক মরা হাঁসে
হাহা 'রাধাগোবিন্দ' রব ছাড়ে।
তার তলে যে বাঁকা নদী
হেমনদীতে প্রেম ঝরে॥

গৌরাঙ্গ-লীলার মাধুর্য অপূর্ব। গৌরাঙ্গ লীলার মৈত্রী-ধর্মের রস আস্বাদন করিয়া মানুষ শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়াছে! এই প্রেমধর্ম নরনারীকে অমৃতলোকের সন্ধান দিয়াছে।

(৩)

এসে এক রসিক পাগল বাধালে গোল
নদ্যার মাঝে দ্যাখরে তোরা।
পাগলের সংগে যাব পাগল হব
হেরব রসের নব গোরা॥
নিতাই পাগল গৌর পাগল
চৈতন্য পাগলের গোড়া।
অদ্বৈত পাগল হয়ে রসে ডুবে
প্রেম এসাছে জাহাজ পোরা॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম-ধর্মের নবীন প্রবর্তক। শ্রীগৌরাঙ্গ রসের সাগর। তিনি মুক্তিকামী, তাই তিনি বিশ্বমানবের মুক্তির জন্য ভক্তির ভিত্তিতে প্রেমলীলা-ধর্মের প্রচার করিয়াছেন।

(৪)

তোরা আয় না প্রেমের বঁড়শী
বইতে যাই প্রেমের পুকুরে।
ঘাটে সাড়ে তিন রতি ঘাটে জ্বলে জ্ঞানের বাতি
নয় শির নয় দরজা খেলে।
রাগের ছিপ ভাবের সুতা সহজে প্রেমে রাধার গাঁথা
তাও যদি মীন গিলে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ গৌর আদি ভক্তবৃন্দ
সময় কালেতে সেই ঘাটেতে মিলে।
গোঁসাই বাউল কয় নবীন রে তোর কিসের ভয়
অনায়াসে মাছ ধর নামে॥

বৈষ্ণব-বাউল চৈতন্য-প্রচারিত প্রেমধর্ম আন্তরিক গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তি-অনুরাগেই শুদ্ধ প্রেম সম্ভব, ইহাতেই পরম পুরুষার্থ লাভ করা যায়। নবীন বাউল যদি ভক্তি-অনুরাগে সাধন ভজন করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষেও পরম পুরুষার্থ লাভ কঠিন নয়।

(৫)

আমি কেমন কর্যা করি বল সত্যের সাধনা।
আমায় সতত চঞ্চল করে রিপু ছয় জনা॥
ঝগড়া করে ছয় রিপুতে,
আমার 'গৌর নাম' দেয় না সাধিতে,
জ্বালিয়া মারে দিন রাতে মতে চলে না।
পঞ্চভূতে করে ঝগড়া,
দিলে ছারখারে সোনার আখড়া,
মানব দেহের মালিক মাকড়া তাও চিনিলাম না॥

গৌর-নাম সাধনাতেই সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ছয় রিপুকে বশীভূত করিয়া প্রেম-ধর্মের অনুশীলন করিলে সত্য, সুন্দর প্রেম-গুরুর সাক্ষাৎ মিলে। বৈষ্ণব-বাউল মুক্তকণ্ঠে গৌরনামের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন।

চৈতন্য-পরবর্তী বাউলদের উপর বৈষ্ণব সাধনার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণেই পড়িয়াছে। চৈতন্য-পরবর্তী বাউলদিগকে আমরা "বৈষ্ণব-বাউল" বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব-বাউলদের দার্শনিক ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় যাহা পাই, তাহা আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বৈষ্ণব-বাউল বলেন যে, দেহতত্ত্বের সাধনায় নরদেহ যখন সিদ্ধ ও শুদ্ধ হয়, তখনই মনে সিদ্ধি ও শুদ্ধির অবস্থা সম্ভব হয়। সেবাই বৈষ্ণব-বাউলের পরম ধর্ম—বাউল কখনই সেবার অধিকার পরিত্যাগ করেন না। বাউল-গুরুর মতে শুদ্ধ সেবা ও আত্মনিবেদনের ফলে মানুষ নরদেহেই চৈতন্য ও চিন্ময়ত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারেন। বৈষ্ণব-বাউল মনে করেন যে, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই। মানুষের মন হইতে যখনই বিষয়াসক্তি বা সুখভোগ আকাঙ্ক্ষা অন্তর্হিত হয়, তখনই দেহ-মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। চৈতন্য-গুরুর নামমাহাত্মে, চৈতন্য-গুরুর নামের মাধুর্যে মানুষের মন যখন ভক্তিতে ও প্রেমরসে অভিষিক্ত হয়, তখন মনে দৈহিক সুখদুঃখের কারণ থাকে না। তখন মনে শুদ্ধ প্রেমানন্দের অমৃত আস্বাদন হইতে থাকে। গুরুর নাম-মাধুর্যের প্রভাবে মানুষ মর্ত্যপ্রভাব হইতে অমৃত রাজ্যের প্রেমানন্দের সন্ধান পায়। বিষয়াসক্তিসম্ভূত আনন্দ অনিত্য ও অসুখেরই রাজ্য—ইহাতে প্রেমরসের নির্মাল্য নাই। চৈতন্য-গুরুর নামমাধুর্যের প্রভাবে এইসব জাগতিক ক্ষণিক আনন্দ হইতে ঊর্ধ্বগতি সম্ভব হয়।

গোধূলি রাগ

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীতারাপদ রাহা

চৈত্র মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি হইতে শকুন্তলা ভারতীকে গান শিখাইতেছে। কুমারেশের জীবনের শেষ দিনগুলির মাঝে যেন একটা আনন্দের বন্যা আসিয়াছে। সে বন্যায় ভাসিয়া ভাসিয়া কুমারেশের মন যেন কোথায় যাইতে চায়, তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার শক্তি যেন কুমারেশ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শকুন্তলা যে যে দিনে আসে, সেই সোম ও শুক্রবারের ধ্যানে সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলি কাটে। নির্দিষ্ট দিনে কুমারেশের গাড়ি গিয়া শকুন্তলাকে চা-এর আগেই লইয়া আসে। তার পর চা খাইয়া তাঁহারা বেড়াইতে যান। কোনও দিন লেকে, কোনও দিন গড়িয়াহাটা ধরিয়া ডায়মণ্ড হারবারের পথে।

সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিবার পর গান আরম্ভ হয়। কুমারেশ দক্ষিণের বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত থাকেন, শকুন্তলা ভারতীকে গান শিখাইতে থাকে। কি অপূর্ব তাহার শিখাইবার ভঙ্গী। মাঝেমাঝে শকুন্তলার কণ্ঠে কুমারেশ এত মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, নাতনীর শিক্ষার কথা ভুলিয়া তিনি বলিয়া ওঠেন—আজ তোমার মাস্টারি করা থাক, আজ তুমি নিজেই একখানা গাও। ও শুনে শিখুক।

শকুন্তলা মধুর হাসিয়া কুমারেশের তৃপ্তির জন্য নিত্য নূতন সুরের ইন্দ্রজাল বোনে। কুমারেশের দুই চোখ বুজিয়া আসে। এই তো স্বর্গ!

স্বাস্থ্য তাহার কত ভাল হইয়া গিয়াছে, যৌবন যেন তাহার আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। নবীন প্রেমিকের মত তিনি সপ্তাহের এই দুটি দিনের প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া কাল কাটান। এই দুটি দিনের অপরাহ্ণ ফিরিয়া পাইলে হৃদয় তাহার কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া ওঠে। কিন্তু বাক্যে বা দৃষ্টিতে সে কথা পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে সে জন্য তাহার সতর্কতার অন্ত নাই। জীবনের এই ধূসর অপরাহ্ণে যদি শকুন্তলার দেখা নাই মিলিত তাহা হইলে—তাহা হইলে তাঁহার জীবনের এই স্বল্পাবশিষ্ট দিনগুলিরও যে কি দুর্গতি হইত সে কথা ভাবিতে কুমারেশ শিহরিয়া ওঠেন। প্রতি সপ্তাহে যখন বিলাতের ডাক আসে, চিঠি খুলিতে তাঁহার হাত কাঁপে; সঙ্গে সঙ্গে বুকও কাঁপিতে থাকে। চিঠিতে হয়তো এমন খবরও থাকিতে পারে যাহার ফলে আর শকুন্তলার সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা তাহার ঘুচিয়া যাইতেও পারে।

চৈত্রের মাঝামাঝি কুমারেশের মন অস্বাভাবিকরূপে খারাপ হইয়া উঠিল। সোমেশের আসিবার সংবাদ এ সপ্তাহে না আসিলেও পর সপ্তাহে আসিবে; সে সপ্তাহও কোনও মতে রক্ষা পাইলে পরের সপ্তাহে অন্তত আসিবার সংবাদ আর না থাকিবে কেন? আসিবার নির্দিষ্ট সংবাদ পাইলেই ঘর বাড়ি আবার নূতন করিয়া সাজাইবার প্রয়োজন হইয়া উঠিবে। তার পর কোন্ এক শুভ মুহূর্তে তাহার বিদেশিনী বধূর হাত ধরিয়া আসিয়া এ বাড়ির অঙ্গন কলহাস্যে মুখর করিয়া তুলিবে। কুমারেশের জীবনে শকুন্তলা দর্শনের অবসান হইবে।

নিতান্ত কষ্টকর হইলেও শেষ ইহার একদিন হইবেই। কুমারেশের মন এ সম্বন্ধে নিশ্চিত সজ্ঞান। কিন্তু শেষ হইবার পূর্বে কুমারেশ তাহাকে কিছু দিতে চান। শকুন্তলা ভারতীকে গান শিখাইয়াছে, তাহার দক্ষিণাস্বরূপ কিছু দিবার কথা কুমারেশের কোনও দিন মনে হয় নাই। সে কুমারেশকে আনন্দ দিয়াছে। প্রতিদানের দিক দিয়া যদি ইহার কোনও বিচারের কথা থাকে, তবে কুমারেশ যাহা দিতে চান তাহা এই আনন্দের প্রতিদানে। কুমারেশের মন চিরকাল হিসাবী, উচ্ছ্বাসের উত্তেজনায় বৈষয়িকতাকে তিনি কোনওদিন বিসর্জন দেন নাই। সোমেশ ও ভারতীর মধ্যে তিনি বাঁচিয়াছেন রক্তের সম্বন্ধে। তাই তাহাদের জন্য ব্যাঙ্কে টাকা জমা হইয়াছে। কুমারেশ হিসাব করিয়া দেখিলেন, এই ভিন্নগোত্রা রক্ত সম্পর্ক শূন্যা শকুন্তলার মধ্যে তাহার নিভৃত মনের গোপন কামনাটি স্বর্ণময় রূপ পাইয়াছে। কুমারেশের কাছে তাহার স্থান কাহারও চেয়ে কম নয়।

'কুমারেশের জীবনান্তে সচ্ছলতায় সোমেশ ও ভারতীর জীবন শতদলের ন্যায় বিকসিত হইয়া উঠিবে চিন্তা করিয়া তিনি যেমন আনন্দ পান, তেমনি বেদনা পান শকুন্তলার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। এই অপরিণামদর্শিনী মেয়েটির নিজের জন্য সঞ্চয় করিবার স্পৃহা একেবারেই নাই, অথচ তাহারই একদিন সোমেশের সহিত এক সঙ্গে কুমারেশের ঐশ্বর্য ভোগ করিবার কথা ছিল। তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য শকুন্তলা এই রিক্ততার ব্রত বাছিয়া লইয়াছে কি না তাহাই বা কে বলিবে। কুমারেশ তাহার নিজের সুবিচার দিয়াই তাঁহার যথা কর্তব্য ঠিক করিয়া ফেলিলেন।

কত টাকা কুমারেশ শকুন্তলাকে দিবেন সেটা সমস্যা নয়, কেমন করিয়া তাহাকে টাকা লইতে রাজী করিবেন সেইটাই হইল বড় সমস্যা। সোমেশের স্ত্রী হইয়া এ বাড়িতে আসিলে তাহার সম্পত্তির যে কোনও অংশ তাহাকে দেওয়া অশোভন হইত না। কিন্তু এখন অতি সামান্য দিতে চাহিলেও হয়তো শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে।

কুমারেশ কেবলই ভাবিতে লাগিলেন।

চৈত্রের শেষাশেষি একদিন গানের পর কুমারেশ অতি বিষণ্ণভাবে শকুন্তলার হাত ধরিয়া বলিলেন—আমার জীবনের শেষে তুমি আমায় অনেক আনন্দই দিলে কুন্তলা।

শকুন্তলা কুমারেশের করুণ মুখের দিকে চাহিয়া ইহার কোনও জবাব খুঁজিয়া পাইল না। কুমারেশ বলিয়া চলিলেন—এত বড় ঋণের ভার আমি বইতে পারব না।

শকুন্তলা কিছু না বুঝিয়া কুমারেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—তুমি আমায় যে আনন্দ দান করেছ তার প্রতিদানে তোমাকে আমি সামান্য কিছু উপহার দিতে চাই। কুমারেশের শীর্ণ কম্পিত অঙ্গুলি শকুন্তলার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল। শকুন্তলা ক্ষণকাল নতমুখ থাকিয়া স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, আপনার যাতে শান্তি হয় করবেন, আমি তাতে বাধা দেব না।

শকুন্তলার মুখের দিকে চাহিয়া কুমারেশ একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার একটা বড় সমস্যার আজ সমাধান হইল।

সেদিন রাত্রে কুমারেশের ভাল ঘুম হইল না। সোমেশ কবে আসিবে সে চিঠি হয়তো এই সপ্তাহেই আসিয়া যাইবে। উইলের কিছু পরিবর্তন করিতে হইলে তাহাও দুই এক দিনের ভিতর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। শকুন্তলাকে দিলেও তাহার পরিমাণ কত হওয়া উচিত? সোমেশ সোমেশের স্ত্রী ও ভারতীকে তিনি যেভাবে অংশ দিয়াছেন, সেভাবে দিলে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী শকুন্তলার ভাগে পড়ে। লোকে যখন শুনিবে, কি মনে করিবে? সোমেশ কি মনে করিবে? না, সোমেশ কিছু মনে করিবে না। সে জানে কুমারেশ দূরে থাকিয়াও একদিন শকুন্তলাকে ভালবাসিতেন; সোমেশের ভুলে কুমারেশের ভালবাসার শেষ হইতে পারে না। কুমারেশ সোমেশের দুর্বুদ্ধিতে উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, মাথাটা কেমন করিয়া আসিল। মাথা বালিশে গুঁজিয়া তিনি ভাবিলেন এ চিন্তা আজ থাক।

কিন্তু না, এ চিন্তা বেশীক্ষণ দূরে ঠেলিয়া রাখা যায় না। কে জানে কালই সোমেশের আসার তার আসিবে না? একটু স্থির হইয়াই কুমারেশ উঠিয়া আলো জ্বালিলেন। ড্রেসিং টেবিল হইতে অডিকোলন লইয়া চোখে মুখে দিলেন, তার পর আলো নিবাইয়া জানালা খুলিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শীতান্তের মৃদু জ্যোৎস্নায় সমস্ত জগৎ ছাইয়া গিয়াছে, রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, আসন্ন বিদায়ের কথা স্মরণ করিয়া মুখ তার ফ্যাকাশে হইয়া উঠিয়াছে। কুমারেশ দেখিলেন শকুন্তলা দাঁড়াইয়া আছে, বাড়ির সীমানার পূর্ব-উত্তর কোণে যেখানটায় একটা দেবদারু গাছ একরাশ সবুজ পাতাওয়ালা দুখানি ডাল মাটিতে অনায়াসে নামাইয়া দিয়াছে, তাহার পাশে পাতার আড়ালে শকুন্তলা দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

প্রভাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কুমারেশের মাথা ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, শকুন্তলাকে আর তিনি দেখিতে পাইলেন না।

ইহার পর বিছানায় শুইয়া যখন নিজের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিবার অবসর হইল, তখন কুমারেশ বুঝিলেন, রাত্রি ভোর হইলে তাঁহার প্রথম কর্তব্য হইবে তাঁহার গৃহ চিকিৎসক মিস্টার ব্যানার্জিকে কল দেওয়া।

পরদিন সকালে টেলিফোনযোগে ভারতীর আহ্বানে ডাক্তার ব্যানার্জি আসিলেন। তাঁহাদের প্রথামত কুমারেশের হাত বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—বিশেষ কিছু নয়, a bit shaky, বিশ্রাম দরকার। উত্তেজনা আসতে পারে এমন কোনও কাজ নয়। দুধের সঙ্গে একটু ভাইনাম গ্যালেসিয়া, একটু ঘুমবার চেষ্টা।

ডাক্তার ব্যানার্জি কুমারেশের চেয়ে অন্তত বিশ বছরের ছোট, প্রায় তাঁর ছেলের বয়সী। কুমারেশ তাহার কাছে প্রাণ খুলিয়া সব কথা বলিতে পারিলেন না, কাহার কাছেই বা বলা যায়! আর কয়েক বৎসর বাঁচিলেই যাহার বয়স আশী পূর্ণ হইবে তাহার মনে কোনও আকাঙ্ক্ষা আছে এ কথায় কেহই সমবেদনা দেখাইবে না। কুমারেশ দুই চোখ বুজিয়া শুধু ডাক্তারের উপদেশে কর্ণপাত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারের কথামত ঔষধও খাইলেন, চোখ বুজিয়া ঘুমাইবারও চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঘুম তাঁহার আসিল না।

দুপুরে একটু সুস্থ বোধ করিলে কুমারেশ নিজেই তাঁহার অ্যাটর্নি মিস্টার তালপাত্রকে ফোন করিলেন, বিকালে অফিস ফেরত তিনি যেন একবার কুমারেশের সঙ্গে দেখা করিয়া যান। বিশেষ জরুরী কাজ।

সন্ধ্যায় মিস্টার তালপত্র আসিলে কুমারেশ দোর বন্ধ করিয়া তাঁহার সহিত নির্জনে কি কথা বলিলেন। ভারতীর কৌতূহল হইলেও দাদুকে সেকথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। বিশেষত দাদু অসুস্থ। কিন্তু যদি সোমেশ বাড়ি থাকিত তবে সে নিঃসন্দেহে আজই বুঝিয়া লইত, সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ এমন একজনকে আজ দান করা হইতেছে ভিন্নগোত্র হইলেও যাহাকে কিছু দিতে পারিলে এখনও সে নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করে।

কুমারেশ বুঝিলেন উইলের পরিবর্তনটুকু আগে করিয়া ভালই হইয়াছে, সোমেশের আগমন সংবাদ আসিয়া গিয়াছে। চিঠি পাওয়া অবধি কুমারেশের শরীর আরও ভাঙিয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলাকে দেখিবার ইচ্ছা যেন আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। শকুন্তলা স্কুলে কখন 'অফিস ওআর্ক' করে কুমারেশের তাহা জানা। কুমারেশ ফোন করিলেন, সন্ধ্যায় শকুন্তলার সময় হইবে কি না। শকুন্তলা কুমারেশের কোনও আহ্বানে কখনও না বলে নাই, উত্তর আসিল—হাঁ।

কুমারেশ শকুন্তলাকে সঙ্গে করিয়া সন্ধ্যায় সিনেমায় যাইতে চান।

শকুন্তলা রাজী।

কুমারেশ অদূর ভবিষ্যতে শকুন্তলাকে আর দেখিতে পাইবেন না, তাহার আগে যতটুকু সম্ভব তাহার সঙ্গ প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিয়া লইতে চান।

নিয়মিত ডাক্তারী ঔষধটা খাইয়া শরীরটা আজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। বিকালে ড্রাইভারকে গাড়ি বাহির করিতে বলিয়া কুমারেশ অডিকোলনে মাথাটা ভাল করিয়া ধুইয়া লইলেন। তার পর রূপার হাতল ওয়ালা ব্রাশে চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে আয়নার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত শরীরটা প্রদীপের একটা শীর্ণ শিখার মত কাঁপিতেছে।

কুমারেশ নিজের চেহারা নিজে দেখিয়া ভয় পাইলেন, তাড়াতাড়ি ব্রাশ স্যরিয়া আয়নার সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু শকুন্তলাকে এখনও তিনি দেখিতে পাইবেন, তাহার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটাইতে পারিবেন, তাহাতেই তাঁহার মনটা অনেক শান্ত হইয়া আসিল।

শকুন্তলার ওখানে গিয়া কুমারেশকে একটুও দেরি করিতে হইল না। শকুন্তলা প্রস্তুত হইয়াই ছিল।

সিনেমায় শকুন্তলাকে পাশে পাইয়া কুমারেশ আনন্দিত হইলেন। কিন্তু আঁধার ঘরে শকুন্তলার মুখ দেখা যায় না, তাঁহার পাওয়া অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। শকুন্তলার অঙ্গের স্পর্শ কুমারেশের অঙ্গে লাগিতেছে, তাঁহার অন্তরের নিভৃত কোণ ইহাতে রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে। কিন্তু কুমারেশ কি করিয়া আজ শকুন্তলাকে সোমেশের আগমনবার্তা জানাইবেন? কুমারেশের শরীর অস্থির হইয়া উঠিল, তিনি ঘামিয়া উঠিলেন।

একবার ভাবিলেন তিনি চিঠি লিখিয়া জানাইবেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল না, সেটা দুর্বলতা; শকুন্তলাকে আজই জানাইতে হইবে—মুখে।

ইনটারভ্যালের সময় আলো জ্বলিলে শকুন্তলা কুমারেশের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু একটু হাসিল। শিশুর হাসি, যেন বলিতে চায় এইবার আবার আমরা আমাদের রাজ্যে ফিরিয়া আসিলাম। কুমারেশ হাসি দিয়া তাহার কোনও জবাব দিলেন না। শকুন্তলা ইহার কোনও কারণ বুঝিল না।

বিরামের শেষে আবার আলো নিবিবার সঙ্গে সঙ্গে কুমারেশ শকুন্তলার একখানা হাত নিজের মুঠির মধ্যে লইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—ওরা আসছে সব।

শকুন্তলা যেন বুঝিতে পারে নাই।

কুমারেশ আবার বলিলেন—আসছে হপ্তাতেই বিলেত থেকে আসছে।

কুমারেশের হাতের মধ্যে শকুন্তলার হাতখানা যেন একবার একটু কাঁপিয়া উঠিল, তার পর কুমারেশ আর কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

তাহাদের চোখের সম্মুখে রোমিও জুলিয়েটের প্রেম-লীলা চলিতে লাগিল। শকুন্তলা যেন একমনে তাহাই দেখিতেছে। পূর্ব প্রসঙ্গ লইয়া সে একটু উচ্চবাচ্যও করিল না।

সিনেমা হইতে ফিরিবার পথে কুমারেশের গাড়ি যখন শকুন্তলার বাড়ির সম্মুখে আসিল, তখন শকুন্তলা নামিল। নামিয়া কি ভাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তার পর হঠাৎ একেবারে কুমারেশের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল।

কুমারেশ এদিক ওদিক একটু চাহিয়া বলিলেন—কই না, লাগে নি তো!

একটা মোটারের হেড লাইট আসিয়া শকুন্তলার মুখখানা হঠাৎ আলোয় স্নান করাইয়া দিয়া গেল। কুমারেশ দেখিলেন, শকুন্তলা কেমন করিয়া যেন হাসিতেছে।

কুমারেশের গাড়ি আবার স্টার্ট দিল। শকুন্তলা কুমারেশের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। । গাড়ি চলিল, কুমারেশ দেখিলেন শকুন্তলা তেমনি করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে। কিছুটা দূরে গিয়াও কুমারেশ একবার ফিরিয়া দেখিলেন শকুন্তলা ঠিক সেইখানে কুমারেশের গতিশীল গাড়ির দিকে চাহিয়া চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

দায়িত্বশীল লোকের উপর যখন কোনও গুরুভার কাজের চাপ থাকে, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে নেশার মত তাহা করিয়া যায়। কতটা যে শ্রান্তি জমিয়াছে, সে বোধ হয় তখন যখন কাজটা শেষ হয়। শকুন্তলার কাছে কথাটা কি করিয়া পাড়িবেন, নিজের মনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া কুমারেশ সেই কথাটাই কয়েক দিন ধরিয়া ভাবিতেছেন। আজ তাহা বলিয়া আসিয়া কুমারেশ বিশেষ দুর্বল বোধ করিতে লাগিলেন। উপরে আসিয়া লাইব্রেরি ঘরের সম্মুখে ইজিচেয়ারে শুইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, শরীরটা যেন অসম্ভব হালকা বোধ হইতেছে। দক্ষিণ হইতে দমকা হাওয়া আসিয়া কুমারেশের মাথায় যেন একটা সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়া গেল। বর্ষা শেষ হইয়া আসিয়াছে। (ক্রমশ)

প্রতীক্ষা

শ্রীসুষমারানী সেন

নিবিড় গগনে নীল মেঘদলে
লুকায় চাঁদের বাতি,
নীরব নিথর আঁধারে কাঁপিছে
ভরা শ্রাবণের রাতি।
আশা পথ চেয়ে কতদিন আর
বিরহে বিধুর নিশা হবে পার
এস তুমি আজি মৃদুল চরণে
মোর জীবনের সাথী।
নীরব নিথর আঁধারে কাঁপিছে
ভরা শ্রাবণের রাতি॥

অলিগুঞ্জিত ফুলবনে বসি
ভরেছিনু ফুল ডালি,
প্রদীপের শিখা মলিন হ'য়েছে
ধোঁয়ায়ে উঠিছে কালি।
আজি এ তিমির রজনীতে তুমি,
এস কুঞ্জের ফুলদল চুমি
তোমারি আশায় প্রেমের আসন
হৃদয়ে রেখেছি পাতি।
নীরব নিথর আঁধারে কাঁপিছে
ভরা শ্রাবণের রাতি॥

বিক্রমপুরের কবিগান

(কবিওয়ালা স্বর্গত কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

[অনুবৃত্তি]

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

লক্ষণের শক্তিশেল

(মোড়া)

ত্যজিয়ে শরাসন ও ভাই লক্ষ্মণ কেন ধরাতে শয়ন?
দেখ হে মেলিয়া নয়ন!
উঠ উঠ লক্ষ্মণ প্রাণের ভাই,
আর যুদ্ধের কার্য্য নাই,
চল্ রে তোরে নিয়ে গৃহে যাই।
যেয়ে জুড়াই সুমিত্রা মায়ের জীবন।
বল্ দেখি ভাই কেমনে তখন
বলব মরেছে তোমার লক্ষ্মণ,
চাঁদ বদনে মা বোল ব'লে আয় রে বাছা ধন।
এ কি ছিল আমার ভাগ্যেতে,
রাবণে হরিল সীতে,
তোরে হারা হলেম যুদ্ধেতে,
দেহেতে কেন রহিল জীবন?
ভাই-হারা প্রাণ রাখিয়ে কি প্রয়োজন?
অনুগামী ছিলি অনুদিন
আজ বুঝি পেয়েছ সুদিন?
একদিনে কি শুধিলি সব রিণ (ঋণ)
(ও ভাই) দয়াহীন হয়ে ত্যজিলি জীবন?
ভাই তাই ছায়ার মতন অবিরত ভ্রমিতি বনে,
কখন রামদাদা বিনে মনোভ্রমে কোন ক্রমে
অগ্রে চলিস নে।
বল্ দেখি তবে কি কারণে
অগ্রগামী হইলি মরণে
মনোভ্রমে কোনক্রমে অগ্রে চলিস নে॥
ভাই বিনে এ ছার জীবন,
আছে কিসের কারণ?
চল জীবনে জীবন দিয়ে শীতল হই॥

সীতার বনবাস

নিরুপায় নিঃসহায় অবলায় ফেলে দেবর কোথায় যাও?
ও দাঁড়াও হে বারেক দাঁড়াও
দাঁড়াও দাঁড়াও লক্ষ্মণ ধানুকি,
ও কাননের ভাব না জানকি?
আমি সে শ্রীরামের জানকী!
ও কার কাছে রেখে যাও, তাই বলে যাও॥

ও নাই কি দয়ামায়া? ভ্রাতৃজায়া কর পরিহার?
ও এই কি দেখি ব্যবহার? বিধি কি গড়েছে
হিয়া পাষাণে তোমার?
মুনি পত্নী করব দরশন,
এই ছিল মনের আকিঞ্চন,
ভাল আজ দেখাইলে তপোবন!
(হায়) জনমের মত বনে ফেলে যাও॥

হইলেম বনবাসী, ভাবি বসি কি হবে উপায়?
আমার প্রাণ কে বাঁচায়?
বনচর চরে বনে প্রাণে কে বাঁচায়?
বল দেবর প্রভুর অভিপ্রায়,
বল কিসে দোষী দাসী ও রাঙ্গাপায়?

বিধি কি গড়েছে হিয়া পাষাণে তোমার?
কেন রহিলে অধোবদনে?
(ও দেবর হে) ভেবনা মনে,
যাব না আর তোমার সনে।
ও শ্রীরামের দোহাই, একবার ফিরে চাও,
ও যদি যাওহে দেবর আমার মাথা খাও।
বিধি কি গড়েছে হিয়া পাষাণে তোমার?

শ্রীকৃষ্ণলীলা ননীচুরি

গোপের ঘরে শ্যাম ননী খেল মনের সুখে।
যত গোপীচয় ধেয়ে যায় নন্দালয় ক্রোধে কয় রাণীর সম্মুখে॥
দেখ এসে নন্দরাণী, তোর নীলমণি ক্ষীরননী খেল সমুদয়।
এত আহ্লাদ ভাল নয়, পরের প্রাণে বল কতই শয়?
সাবধানে রেখ ছেলে, আবার ননী খেতে গেলে,
মানব না রাজপুত্র বলে তোমাকে বলিলাম নিশ্চয়॥

ক্রোধে রাণী কৃষ্ণের করে করিলেন বন্ধন।
নিদারুণ বন্ধনের জ্বালায় কেঁদে বলে কেলেসোনা,
যশোদে গো মা!
সহে না প্রাণে সহে না বন্ধন যন্ত্রণা,
তোর কি দয়া নাই মা?
আর আমাকে বাঁধিস নে মা কই শপথ করি।
মা তোর চরণে ধরি, আর নবনী করিব না চুরি,
ননী খেয়ে হলেম দোষী, আমা হ'তে ননী বেশী,
বেচে আভরণ মোহন বাঁশী, দিব সব ননীর কড়ি॥

মা হ'য়ে বিমাতার মত দেখি আচরণ,
ছেড়ে যাব শ্রীবৃন্দাবন, আর তোকে মা বলিব না।
যশোদে গো মা, সহে না প্রাণে সহে না বন্ধন যন্ত্রণা॥
প্রতিবেশীর ননীর তরে, উদুখলে বাঁধিলি মোরে
ভাবিলি না মনে।
যদি আমার জীবন যায় গো এখন দারুণ বন্ধনে,
ধূলায় লুটে, মাথা কুটে কেঁদে আমায় পাবি না,
যশোদে গো মা!
দয়া নাই হৃদয়ে মা যশোদে জানিলেম আচরণে।
কে কোথায় এমন বন্ধন করে আপন সন্তানে।
সন্তানের মুখ দেখলে পরে আর কি তখন সইতে পারে?
ব্যথা পায় প্রাণে।
আমাকে পরের ননীর তরে বাঁধিলি কোন্ প্রাণে (গো)
দয়া নাই হৃদয়ে মা যশোদে জানিলেম আচরণে॥

পুত্রের প্রতি তোর নাই মমতা নন্দরাণী,
মা বলিয়ে ছেলে কাঁদিলে, মায়ের কোলে নিয়ে,
খেতে দেয় ক্ষীর নবনী।
কত বিনয় ক'রে কাতরে তোর চরণ ধ'রে
করিলাম ক্রন্দন।
ছেড়ে দে করের বন্ধন, শুনলি না মা তুই বা কেমন?
মুনিগণের মুখে শুনি 'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি'
সে বাক্য হয়ে জননী কি জন্য করিলি লঙ্ঘন?
মা হ'য়ে পুত্র ব'লে নাই গো তোর ব্যথা।
বুঝলি না মা তুই সে মমতা,
আর তোকে মা বলিব না।
(যশোদে গো মা) আর তোকে মা বলিব না।

ননী চুরির এই সংগীতটি ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি অতি সুন্দর ও কবিত্বপূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার

মোড়া।

শ্রীরাধার বাসরে অভিসারে যাবেন নটবর।
মনোহর বেশে রাধার বাসরে
যেয়ে শ্যামরায় রাই বলে বাঁশী বাজায়।
শ্রীরাধার প্রেমে মজিয়ে
কেলি করে শ্যাম কালিয়ে,
দুই অঙ্গে এক হয়ে রঙ্গে সুখে নিদ্রা যায়।
এমন সময় ডালে ব'সে ডাকে যত পাখিগণ।
তাই শুনে রাই হয়ে চেতন, কাতরে কয় শ্যামের কাছে।

(খোষা)

গা তোল হে শ্যামশশী, দেখ নিশি প্রভাত হয়েছে।

এখনো তুমি রলে নিদ্রাগত,
তোমাকে আর ডাকব কত,
ওহে প্রাণনাথ।
একাবার চেয়ে দেখ সুখের নিশা হয়েছে প্রভাত।
উদয় হতেছে দিননাথ আর কি ঘুমের সময় আছে?
গা তোল হে শ্যামশশী, দেখ নিশি প্রভাত হয়েছে॥

ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে উড়ে ভ্রমরগণ;
নিশি ভোর জেনে বনে বনে ডাকে পাখিগণ।
এ ত প্রভাতের লক্ষণ।
বকুল বনে কোকিল ডাকে,
সারি গায় শারি শুকে,
ডালে বসি মনের সুখে
ডাকে হীরামন।
মধুর স্বরে গায় কাকাতুয়া প্রভাতীর গান;
কা া রবে কাক করে সুরের আলাপন;
এখন কি রজনী আছে?
গা তোল হে শ্যামশশি, দেখ নিশি প্রভাত হয়েছে॥

(ঝুমইর)

উঠ বংশীধারি, নন্দের ভেরী ঐ বেজে উঠিল।
হারে রে রে কানাইয়ারে বলে রাখাল সব ডাকিল॥
উঠ বংশীধারি, নন্দের ভেরী ঐ বেজে উঠিল।
শ্রীদাম বলে আয়রে কানু, বাজায়ে মোহন বেণু,
গোঠেতে চল, এখন কুঞ্জবাসে নিদ্রাবশে কেমনে রহিবে বল?
উঠ বংশীধারি, নন্দের ভেরী ঐ বেজে উঠিল॥

(মোড়া)

রাধার বাসরে অভিসারে যাবেন ব'লে,
শ্রীনন্দের নন্দন,
চন্দ্রার প্রেমে হয়ে মগন,
কল্লেন যামিনী যাপন।

না হেরি নাগরে, বিন্দেকে রাই কয় কাতরে, কি করি বল?
নন্দের ভেরী বাজিল,
বকুল বনে কোকিল ডাকিল,
তারা গণলাম সারা নিশি,
এল না সে কালশশী,
অস্তাচলে গেল শশী, ঐ দেখ নিশি ভোর হইল।
বৃথা নিশি কুঞ্জে বসি, কল্লাম নিশি জাগরণ।

আশা দিয়ে মদনমোহন দাসীরে করল বঞ্চনা।
বল্ বৃন্দে সখি কেন আমার কমল আঁখি কুঞ্জে এল না।
প্রেমাবেশে কুঞ্জে এসে, শয্যা করি আছি ব'সে,
শ্যাম আসার আশে।
ঐ যে নিশির শেষে, কালভুজঙ্গে দংশিল এসে,
বিনা সখি, হৃষীকেশে, দারুণ বিষে প্রাণ বাঁচে না।
বল্ বৃন্দে সখি কেন আমার কমল-আঁখি কুঞ্জে এল না।

মনের বাসনা আমার পূর্ণ হলো না।
কত যতন করে সাজাইলাম স্তরে স্তরে
মনোহর সব ফুল।
যাতে মত্ত অলিকুল,
জাতি যূথি মালতী বকুল, চম্পক বেল মল্লিকে,
সেউতি গোলাপ শেফালিকে, কেতকী কৃষ্ণকলিকে,
সৌরভে হয় প্রাণ আকুল।
কত কষ্ট করে গেঁথেছি মালা,
(সই গো) দিব বলে বধুর গলায়, দাসীর ভাগ্যে তাই হ'ল না।
বল্ বৃন্দে সখি, কেন আমার কমল-আঁখি কুঞ্জে এল না॥

(ঝুমইর)

ছি ছি একি লজ্জা, ফুলের সজ্জা, দিয়ে আয় গো জলে।
তুলেছি ফুল রাশি রাশি,
সে সকল ফুল হ'ল বাসি,
দুঃখে প্রাণ জ্বলে।
বল্ সখি বিনে কমল-আঁখি কাজ কি বাসি ফুলে?
ছি ছি এ কি লজ্জা, ফুলের সজ্জা দিয়ে আয় গো জলে॥

(পরচিতান্)

সই বনে বনে, ভ্রমণ করি গোপীর সনে;
ঐ দেখ সেই সব ফুলে,
রইতে দিল না গোকুলে, কি করি উপায়?
যেমন শক্তিশেলের প্রায়, গোকুলের ফুল হানিয়া বেড়ায়॥
জাতির জন্য জাতি গেল,
অশোকেতে শোক বাড়িল, গোলাপ এসে প্রলাপ হ'ল,
চাঁপায় হ'ল সর্বনাশ।
কত কষ্ট করে সখি, তুলেছি সব ফুল, সাজাব আজ রসরাজে
দাসীর ভাগ্যে তাই হ'ল না।
বল্ বৃন্দে সখি, কেন আমার কমল-আঁখি কুঞ্জে এল না?

শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ করে, মাথুর নারদ সে ব্রজপুরে
দিলেন নিমন্ত্রণ।
ও যজ্ঞের পত্র পেয়ে অতি ব্যস্ত হয়ে
উপনীত যজ্ঞের ধারে যত গোপ গোপিগণ।
তখন শ্রীনন্দ আর যশোদাকে, দ্বারিগণ সব দ্বারে দেখে
ক্রোধান্বিত হ'ল;
করতে বেত্রাঘাত দ্বারী দাঁড়াইল।

ও নন্দ কাঁদে বসে বসে
পুত্রনিধি দেখবার আশে,
শেষ দশায় বিদেশে এসে,
দ্বারীর হাতে বুঝি প্রাণ হারাই।

তখন শ্রীনন্দেন ঘরণী
যশোমতি রাণী, ধরে দ্বারীর কর,
কেঁদে বলে বিনয় বাক্যে (মরি) মনের খেদে॥

(খোষা)

দ্বারী দ্বার ছেড়ে দে দ্বারে রেখ না আমারে।
কৃষ্ণ শোকের শেল বিঁধেছে রে বক্ষে;
আমি হর পূজিয়ে পুত্র পেলাম,
আদর করে নাম রাখিলাম কানাই আর বলাই।
তারা দুটি ভাই রূপের তুল্য নাই।
যজ্ঞে আসতে কমল-আঁখি, কাল ব'লে দিয়েছে ফাঁকি;
সে কালের আর কদিন বাকী? আমি মৃত্যুসময় দেখে যাই॥

(ঝুমইর)

দ্বার ছাড়্ বাছা দ্বারীরে, আমি একবার তারে দেখে যাই।
পুত্রশোকানল হয়েছে প্রবল
আমি অনেক দিন হয় তারে দেখি নাই।
ছিল ভাগ্যেতে এসে যজ্ঞেতে দ্বারীর হাতে বুঝি প্রাণ হারাই॥
পুত্রশোকানল যেন তুষানল অতি দুঃখে কাল কাটাই।
দ্বার ছাড়্ দ্বারীরে আমি একবার তারে দেখে যাই॥

(মোড়া)

নারদের মন্ত্রণাতে ভুলিল মন।
একদিন সত্যভামা হতে শ্যাম প্রিয়তমা
মনে মনে করিলেন মনন। (মরি হায় গো হায়)
সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণেরে তুলে তুলে ওজন করে
দিয়ে রত্নভার;
নানাবিধ অঙ্গের অলংকার তুল্য হয় না তার॥
অসহ্য ভার প্রকাশ করে
বসে বিশ্বম্ভর রূপ ধারণ ক'রে
পূর্ণব্রহ্ম চূর্ণ করে সত্যভামার অহংকার।
তুলে তুলে অতুল্য ধনে করে ওজন, দেখে রুক্মিণী তখন
ডেকে বলে ও সত্যভামা এখন কর গো ক্ষমা,
নারদ বাক্যে যাস নে ভুলে॥

(খোষা)

যাঁরে ব্রহ্মা আদি দেবগণে মননে ভাবে বসি দিবানিশি,
যাঁর অন্ত যোগে না পায় যোগিঋষি॥
যে দেবারাধ্য ধনে পেলেম গো ভাগ্যগুণে,
তাঁর ওজন করিস কেনে তুলে তুলে।
ও সত্যভামা এখন কর গো ক্ষমা,
নারদ বাক্যে যাস নে ভুলে।
অসাধ্য সাধনে আজ কি কারণে বাধ্য হলে?

(সত্যভামা গো) যাঁর ওজন নাই মহীতলে,
তাঁরে দিলে তুলে তুলে?
কি হবে তোর পরকালে? ভেবে দেখ্ এখন।
বুঝতে নারি তোর কেন এ দুর্মতি,
(ও সত্যভামা) ভাল রাখিলে অখ্যাতি এ ভূমণ্ডলে।

(ঝুমইর)

হইতে শ্যাম সোহাগিনী, জনমের মত কৃষ্ণ নিয়ে যাবে নারদমুনি।
আনিয়ে সে কুবেরের ধন যদি ধনি করিস ওজন, শ্যাম চিন্তামণি।
তুল্য হবে না, কৃষ্ণ নিয়ে যাবে নারদমুনি।
জনমের মতন হলি বুঝি কৃষ্ণধনের কাঙ্গালিনী,
হইতে শ্যাম সোহাগিনী!

(পরচিতান)

নারদের বাক্য ঐক্য করে,
যার নামে হয় যজ্ঞ,
ফলে ফলে চতুর্বর্গ, তুই উৎসর্গ করলি তারে?
(মরি হায় গো হায়) রত্নাকর দস্যু ছিল, যাঁর নামের গুণে বাল্মিক হ'ল;
সিন্ধুজলে ভাসল শিলে যাঁর নামের বলে।
বটপত্রে ভাসিল যখন, প্রলয় হইল তখন।
বৃন্দাবন রক্ষার তরে করে করে গিরিধরে,
মত্ত হয়ে অহংকারে তুচ্ছ করিলি তারে?
বুঝতে নারি তোর কেন হইল এ দুর্মতি?
ভাল রাখিলি অখ্যাতি!
সত্যভামা এখন কর গো ক্ষমা, নারদবাক্যে যাস নে ভুলে॥

(মোড়া)

ননী চুরি করে সাহস বেড়েছে কেলেসোনা!
ও রে রাইকিশোরীর হুকুম জারি বাতিল হবে না।
তোমায় যেমনি ধরিব তেমনি নিব ছেড়ে যাব না।
দেশে দেশে খুঁজে তোমার নাগাল পেলাম না।
ও মথুরায় পড়েছ ধরা,
তোমায় নিয়ে যাব দিয়ে হাতকড়া
ও রে আগে পাছে রাখিব পাহারা, ছেড়ে যাব না।
তোমায় যেমনি ধরিব তেমনি নিব ছেড়ে দিব না।

তোমার প্রতিকূলে হয়েছে ডিক্রিজারি,
ও নিবে শ্যাম, সব নিলাম করি,
ও রে কোথা রবে এই বাবুগিরি
ঘুচে যাবে ছল চাতুরী, কিছুই রবে না।
তোমায় যেমনি ধরিব তেমনি নিব ছেড়ে যাব না॥

(মোড়া)

হাতে গলে বেঁধে নিব যে চোরে ব্রজপুরে,
বুঝতে নারি বাবুগিরি সে কেন করে?
মনে মনে ভেব দেখ শ্যাম রায়,
ও এমন আর শুনেছ কোথায়?
মণি থাকে ভেকের শিরে, যজ্ঞের ঘৃত খায় কুকুরে;
মতির মালা শোভা করে, বানরের গলায়?
ও তোমার সাজ দেখে শ্যাম লাজে মরি হে;
কোন্ লাজে সে পাগ বান্ধে মাথায়?
ওরে দাঁড়কাকের ঠোঁট বাঁধিলে সোনায় কি শোভা করে?

(ঘোষা)

মরি লাজে এমনি সাজে কি তারে?
অমৃতে অসুরের আশা যে প্রকার, ও তেমনি শ্যাম দুরাশা তোমার।
ওরে শিমুলে কি হয় মধুর সঞ্চার?
ওরে নল বিনে শিলা কে ভাষায় লবণ সাগরে?
মরি লাজে এমনি সাজে সাজে কি তারে?

ব্রজবাসী বিন্দেদূতী নাম আমার!
দাসী শ্রীরাধার, ওরে 'বন্ধু তোমার শ্রীচরণে করি নমস্কার।
ওহে চৌর্যবৃত্তি কীর্তি রাখিলে অতি চমৎকার!
ও রসরাজ, কি কাজ করেছ, চুরি ক'রে মধুপুরে এসেছ।
নাই কি তোমার মানাপমান? ব্রজে ছিলে রাধার গৈদান (গদীয়ান)
ওহে গৈদান ক'রে সঁপে দিল ধন!

(ঘোষা)

ওহে এথায় বুঝি কুব্জা গুজী চোরের থলিদার?
চৌর্যবৃত্তি কীর্তি রাখলে অতি চমৎকার!
রাধার প্রেম করজ ক'রে সঁপে দিল ধন!
ও তোমাকে জানিয়ে সুজন।
জানি না শ্যাম তুমি এমন বিশ্বাসঘাতক,
ও শ্রীরাধার প্রেম-কারবার-নাশক?
ও রাধার প্রেম করজ ক'রে এসেছ এথায়,
চৌর্যবৃত্তি কীর্তি রাখিলে অতি চমৎকার॥

মান

(মোড়া)

শ্রীমুখে প্রকাশ ক'রে বল্লে মোরে সে চন্দ্রার প্রেমে মান নাই।
যার প্রেম পরশি হয়েছ দোষী, তার প্রেম কিসে নির্দোষী।
করলে কানাই?
চন্দ্রা কুরূপা নয় সুরূপসী, একদিনের নয় সে প্রেয়সী জানে সকলে।
বঁধু হে ত্রেতার কথা তাই বলি।
বনে দিলে স্বয়ং সীতে, যত্ন ক'রে বাম ভাগেতে।
রেখেছিলে সোনার সীতে, এ ত সেই চন্দ্রাবলী।
যুগে যুগে শ্যাম তোমার প্রেমের ভাগী,
তবে কেন বঁধু মানের অংশ তার হবে না?

(ঘোষা)

মান করলে তার মান, না করলে সমাধান, ভগবান পাবে যন্ত্রণা।
পূর্বে মহেশ্বর ভবানীকে ধরেছিল বক্ষে,
মানিনী হয়ে তাই সুরধুনী উঠিল শিবের মস্তকে।
তেমনি গঙ্গার প্রায় চন্দ্রা যে মাথায় উঠে, কেলেসোনা!
মান করলে তার মান ভগবান পাবে যন্ত্রণা!
মাথে নিতে শ্যাম তারে অন্তরে লজ্জা ভেব না।
বঁধু আপন নারী আপন শিরে, নিতে কি কেউ দোষ ধরে?
তার এই নিদর্শন।
দক্ষযজ্ঞে সতী মরে, মৃতদেহ নিয়ে শিরে
দিবানিশি মহেশ্বরে কাননে করে ভ্রমণ।
যুগে যুগে শ্যাম তোমার প্রেমের ভাগী,
তবে কেন বঁধু মানের অংশ তার হবে না?

(ঝুমইর)

তাইতে বলি সাধের চন্দ্রাবলী রেখ মাথে ক'রে।
চন্দ্রাবলী মানের তরে, যদি তোমার মাথে চড়ে, ফেল না তারে।
বরং শিবের মত মাথে নিয়ে ঘুরবে দেশ দেশান্তরে।
তাইতে বলি সাধের চন্দ্রাবলী রেখ মাথে ক'রে॥
কৈলাস কয়, সময় গেল পাদপদ্মে স্থান দিও কৈলাসেরে॥

অভিমন্যু বধ

(মোড়া)

চক্রব্যূহে অভিমন্যু অর্জুন-তনয়,
পড়ে বিপাকে জীবন-অন্ত সময় দেখে, কৃষ্ণ উদ্দেশ্যে ডেকে কয়!
কোথায় পাণ্ডব-সখা, একবার আমায় দেও হে দেখা, দেবকি-নন্দন,
দেব-আরাধ্য চরণ জন্মের মত করি দরশন।
সপ্তরথী দারুণ শরে, বিনাশে অন্যায় সমরে,
এ বিপদে রক্ষা করে দাসেরে, কে আছে এমন?
তুমি বিনে ত্রিভুবনে, পাণ্ডবের পক্ষে
কে আছে আর উপলক্ষে, রক্ষা করে বিপদকালে।

(ঘোষা)

গললগ্ন-কৃতবাসে, এ প্রার্থনা তব দাসে, ভক্তের ভগবান,
বড় বিপদে পড়ে ডাকি কর পরিত্রাণ,
নতুবা আজ বিনাশে প্রাণ, ঐক্য হয়ে শত্রুদলে।
গোলোকবিহারি, দেখা দেও হে, কৃপা করি নিদানকালে॥
বিপদভঞ্জন মধুসূদন পুরাণে বলে।
পাণ্ডব পুত্রগণে যতুগৃহেতে দাহনে
কৃপা করি বরিষণ করলে বিপদে মোচন॥
মৎস্য দেশে লক্ষ্য ভেদি, লক্ষ রাজা হলো বাদী,
তব গুণে গুণনিধি জয়ী হইল সে মহারণ।
তেমনি সদয় হও দয়াময়, মরণের ভয় হোক জয়,
দিও না ফেলে অধীনেরে শমন-জালে।
গোলোকবিহারী দেখা দাও হে, কৃপা করি নিদান কালে।

(ঝুমইর)

রণে যায় যাবে প্রাণ, ক্ষত্রিয় সন্তান, সেজন্য ভাবি নে।

ও নামে কলঙ্ক রবে তাই ভাবি হে মনে মনে।
রণে যায় যাবে প্রাণ, ক্ষত্রিয় সন্তান সেজন্য ভাবি নে॥
বলবে সব ভূমণ্ডলে, অভিমন্যু অর্জুন ছেলে, কৃষ্ণের ভাগিনে;
সমরে সপ্তরথী নাশে তারে সহায় বিহীনে।
রণে যায় যাবে প্রাণ, ক্ষত্রিয় সন্তান সেজন্য ভাবি নে॥

(পরচিতান)

ওহে পঙ্গুতে লঙ্ঘে গিরি তব কৃপায়।
বাল্মিকীর বাক্য, ত্রেতাযুগে করে সখ্য, গুহক চণ্ডালে, চরণ পায়।
ইন্দ্রের কোপদৃষ্টিতে বিনাশ হ'তে ঝড়বৃষ্টিতে ব্রজবাসিগণ।
তুমি করিলে রক্ষণ করে ধরি গিরি-গোবর্দ্ধন।
শুনেছি হে মার গোচরে, দ্রুপদসুতা দ্রৌপদীরে,
বসনরূপে কৃপা করে করলে লজ্জা নিবারণ।
গোলকবিহারী দেখা দাও হে কৃপা ক'রে নিদানকালে॥

শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম

গোলকবিহারী গোলক ছাড়ি করতে লীলে;
রাক্ষস নাশিতে এসে অযোধ্যাতে কৌশল্যাজঠরে।
বহুদিন পরে পুত্রের বিধুবদন হেরে দশরথ রাজা,
অতি আনন্দিত মনে সদাই করে মঙ্গল আচরণ।
ষষ্ঠীদিনে ষষ্ঠীপূজা পুতে দিলেন জয়ধ্বজা,
ষষ্ঠ মাসে করলেন রাজা অন্নারম্ভের আয়োজন॥
পুরবাসী দিবানিশি আনন্দে ভাসে।

(ঘোষা)

যেয়ে প্রতিবাসীর বাসে বলে রাজমহিষীর দাসী
কেন বিলম্ব দেখতে রামের অন্নারম্ভ চল নগরবাসী॥
গিলা মেথি হরিদ্রাদি, স্নানের দ্রব্য যথাবিধি জলে মাখিয়ে,
তোলা জলে সবে মিলে স্নান করাও যেয়ে;
নয়ন জুড়াব হেরিয়ে সুধামাখা বদন-শশী;
কেন বিলম্ব দেখতে রামের অন্নারম্ভ, চল নগরবাসী।
চল সকলে রাজমহলে যতেক রূপসী।
রাখবেন রাজরাণী পুত্রের নাম রাম রঘুমণি,
করিয়ে শ্রবণ জুড়াইল কান, নামে করে সুধা বরিষণ।
দিব শুভদিনে অন্ন, তোরা করবি এই আশীর্ব্বাদ,
যেন রামের সকল বিপদ্ দূর করে বিপদ্‌ভঞ্জন।
মোদের পথ পানে চেয়ে, বসে আছে রাজ মহিষী,
কেন বিলম্ব দেখতে রামের অন্নারম্ভ চল নগরবাসী॥

(ঝুমইর)

অতি যতন ক'রে শ্রীরামের সাজাইগে সকলে।
চল সবে ত্বরা করে শুভদিন তো যায় গো চলে, চল সকলে।
অতি যতন ক'রে শ্রীরামেরে সাজাইগে সকলে।
সুবর্ণবলয় করে, বাজু দিলে বাহু পরে—কি শোভা করে।
কি বাহার হবে গজমতি হার গলে দিলে গো!
অতি যতন ক'রে, শ্রীরামেরে সাজাইগে সকলে॥

দেহিপদপল্লবমুদারং

কৃষ্ণচরিত্র-গ্রন্থ জয়দেব মনে করে শ্লোক করিল রচন।
পদপল্লব অনুধারণ লিখিতে সন্দেহ অন্তরে;
সে পদ বাকী রেখে গেলেন মুনি নিত্য আহ্নিকে।
জেনে বিবরণ এসে শ্রীমধুসূদন, কল্লেন মুনির সন্দেহ ভঞ্জন।
মনে ভেবে মুখ্যভাবন, দেহিপদপল্লব, স্বহস্তে লিখে মাধব,
গ্রন্থ করিলেন পূরণ।
আহ্নিক অন্তে তপোধন দেখেন গ্রন্থ হয়েছে পূরণ।
তাই দেখে জয়দেব তপোধন পদ্মাকে কয় মনের দুঃখে
এ কি ভাব দেখি।

(ঘোষা)

বল্ গো পদ্মে পদ্মমুখী সুধাই তোমাকে॥
পদপল্লব অনুধারণ, বাকি রেখে গেলাম এখন নিত্য আহ্নিকে॥
বল গো শুনি পদ্মে শ্লোক আমার পূর্ণ করল কে?
শ্রীরাধিকার শ্রীপাদপদ্ম কে লিখলে কৃষ্ণের মস্তকে?
একি ভাব দেখি বল গো পদ্মে পদ্মমুখি সুধাই তোমাকে।
রাধাভক্ত অনুরক্ত এমন শাক্ত কে?
যত যোগি-ঋষি যোগে থেকে দিবানিশি যাঁর অন্ত না পায়,
গঙ্গার উৎপত্তি যাঁর পায়, রাধার চরণ দিল তাঁর মাথায়?
শ্রীরাধাকে গোপের মেয়ে, তারপদে কি সম্পদ পেয়ে,
মুখাপদ ভ্রান্ত হ'য়ে কে লিখ্‌লে এত অন্যায়?
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী যে চক্রপাণি তাঁর মস্তকে শিরোমণি
আয়ান ঘরণী?
একি শুনি দেখি বলগো পদ্মে পদ্মমুখি শুধাই তোমাকে।

(ঝুমইর)

মম ইষ্ট কৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুনি বেদ পুরাণে।
কে করল এত অবিচার, রাধাভক্তি এতই বা কার? ভাবি তাই মনে।
পদ্মে গো একবার জানিস্ যদি বল এখনে।
মম ইষ্ট কৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুনি বেদপুরাণে॥

(পরচিতান)

যাঁর চরণ পরশে পাষাণ মানব হইল।
যাঁর চরণ তরী পার করে ভববারি, অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল।
যে জন ব্রজপুরে তনয়রূপে যশোদারে মা ব'লে ডাকে?
গোপের দুর্দ্দশা দেখে, গিরি ধ'রে করিলেন রক্ষে।
জানি পদ্মে কৃষ্ণ আমার ত্রিগুণ অর্থে গুণে রাধার,
তাঁর মস্তকে পদ রাধার, কি গুণ ধরে আয়ান ঘরণী রাধিকে?
একি ভাব দেখি বলগো পদ্মে পদ্মমুখি শুধাই তোমাকে।

নিমাই সন্ন্যাস

(মোড়া)

ত্যজি গৃহবাস, নিমাই সন্ন্যাস করিতে গ্রহণ,
ভারতীর সনে মিলিতে বাসনা মনে কাটোয়া করিলেন গমন।
শুনে শচীরাণী, পুত্রধনের কাঙ্গালিনী হ'য়ে নদীয়ায়,
যেন পাগলিনীর প্রায় কেঁদে কেঁদে রাজপথে বেড়ায়।
বক্ষঃ ভাসে চক্ষের জলে, কেঁদে বলে উচ্চ রোলে
নিমাই আমার কোথায় র'লে? একবার দেখা দে আমায়।
হৃদে জ্বলে পুত্রশোকে দারুণ হুতাশন।
ধীরে ধীরে রাণী তখন বলে নগরবাসীর কাছে,
বল নগরবাসী, অভাগিনীর নিমাইশশী কোন্‌পথে গেছে?

(ঘোষা)

নিমাই আমার পূর্ণশশী দুঃখ অন্ধকার বিনাশি হইল উদয়।
বাক্য-সুধা বর্ষি জুড়াইত তাপিত হৃদয়।
ভারতী কালরাহু এসে সে চাঁদ আমার গ্রাস করেছে।
বল নগরবাসী অভাগিনীর নিমাই শশী কোন্ পথে গেছে?
নিমাই বিনে ত্রিভুবনে আমার আর কে আছে?
যে দুঃখ অন্তরে জাগে ব্যথিত অন্তরে জানাব কারে?
জানবে কি জন্মান্তরে? বলতে দুঃখ হৃদয় বিদরে।
পুত্রশোকের কেমন বেদন, যাঁর হয়েছে সে জানে কেমন?
দিবানিশি জ্বলে জীবন না হেরে বাপ নিমাইরে।
নিমাই বিনে শূন্য ঘরে রব কেমনে?
জীবন ত্যজিব জীবনে, এ ছার জীবনে কাজ কি আছে?
বল নগরবাসী, অভাগিনীর নিমাইশশী কোন্ পথে গেছে?

(মোড়া)

থাকিস হুঁসিয়ার মতন মন-মহাজন,
মণিপুরে চোরের ভয় হয়েছে।
বিষম চোর সে শমন বেটা, লোকে তারে কয় সিঁদকাটা,
সিঁদ কেটে নিয়ে ধন লুটে নেয় পাছে।
জোয়ান বুড়া নাই তার কাছে, ফাঁদ পেতে সে বসে আছে,
থাকিস্ হুঁশিয়ার মতন মন-মহাজন
মণিপুরে চোরের ভয় হয়েছে॥
সে জাগা ঘরে করে চুরি, কেহ তারে ধরতে নারি।
চুরি করে লুটে নেয় সে অনায়াসে।
ডাকাতি করে দিনদুপুরে, পাহারাদার ঘরে ঘরে,
কোলের ছেলে নিয়ে যায় কেড়ে।
থাকিস্ হুঁশিয়ার মতন মন-মহাজন
মণিপুরে চোরের ভয় হয়েছে।
কৈলাশ কয় মতি রেখ শ্রীচরণে
কালের ভয় যাবে ঘুচে।

আর কতদিন আছে গো মা, কায়া বদল হবে কিনা?
ভেঙ্গে চুরে গেল দেহ, সদাই ভাবি এ ভাবনা।
কৈলাশ কয় ভাঙ্গা দেহে দিয়ে তালি,
রেখেছ মা বাঁশের পেলি দিয়ে তাতে;
উড়ায়ে নিবে ঝড়ে যখন, পড়িব বিষম সংকটে।
আমি জানি না সাধন-ভজন, শমন-দমন মায়ের চরণ;
নিজ গুণে ক্ষমা করে ত্রাণ করিও মা কৈলাশেরে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কৈলাসচন্দ্রের সংগীতাবলী বা পালা কোনটিই সম্পূর্ণ নাই। কিন্তু সুধী পাঠকবর্গ যদি বেশ মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, একজন পল্লীকবি কিরূপ অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন ছিলেন।

(শেষাংশ ৩৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুঃখ

(অনূদিত গল্প)

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বলতে গেলে আমি একরকম ভীষণ অবাক হয়েছিলাম। দশ-বার হাত দূর থেকে চোখ বাঁধা অবস্থায় ওই রকম একটা কাঠের বোর্ডের উপরে যে অনায়াসে ছোট আর ধারাল তীর-গুলোকে ওভাবে ছুঁড়ে ফেলা যায়, আর সেই বোর্ডের গায়ে দুই হাত মেলে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ের মুখের চারপাশে সেই নিক্ষেপে বিনা রক্তপাতে যে একটি সুন্দর তীরের চক্র-চিহ্ন গোল হয়ে গ'ড়ে ওঠে, এ ঘটনা নিজের চোখে দেখেও প্রথমে আমি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নি। কেবলই মনে হয়েছে আমি স্বপ্ন দেখছি, অথবা আমি মন্ত্র-মুগ্ধ, অথবা লোকটা আমাকে যাদু করেছে। কিন্তু এক দিন নয়, দু দিন নয়, পর পর আমি চার দিন ভদ্রলোকের এই খেলা, এই অদ্ভুত তীর নিক্ষেপ দেখলাম। তাঁবুর সামনে যে লোকটি বড় ঢোল দিয়ে খেলা আরম্ভ হবার আগে প্রাণান্তকর চীৎকারে তার ওস্তাদ খেলোয়াড়ের গুণকীর্তন করে সে লোকটিও ভালভাবে লক্ষ্য করেছিলাম, আমার এই তাঁবুতে চতুর্থবারের উপস্থিতিকে সাদরে অভ্যর্থনা করলে। এবং সেই অভ্যর্থনার মধ্যে তার যে একটু আশ্চর্য হওয়ার আভাস ছিল তাও আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। কারণ এ কথা আমি জোর করেই বলতে পারি, এ গ্রামে এমন আর কোনও খেয়ালী লোক ছিল না, যে কি না একটা খেলা দেখবার জন্যে বারবার এইভাবে পয়সা খরচ করে তার শখ মেটাতে পারত—সে খেলা যতই অদ্ভুত আর আশ্চর্য হ'ক না কেন।

সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। সেই অদ্ভুত আর শক্তিশালী তীরন্দাজের সঙ্গে আলাপ আমায় করতেই হবে, যে করে হ'ক। শোনা গেল এবারে নিশানাথের দীর্ঘ এক মাসের মেলায় এই তীরন্দাজটি পুরো মাসটাই এখানে থেকে খেলা দেখাবেন। শোনা গেল আয় তাঁর এই মেলা থেকে নেহাত মন্দ হচ্ছে না।

ঈশ্বর দয়া করলেন। একদিন ভোরবেলা আমার সেই আলাপ করবার সুদুর্লভ সুযোগ এল।

সকালবেলার সাদা আলো তখন নদীর জলে কাঁপছে, পুবের লাল সূর্য একটি রক্তগোলকের মতো ঝক্‌মক করছে ওপারে। নদীর ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ চেয়ে দেখি সামনে সেই ভদ্রলোক। কেমন একটা অপূর্ব অনুভূতিতে আমার সমস্ত শরীর ভরে উঠল, দু হাত তুলে নমস্কার করলাম, বললাম, হঠাৎই নির্বোধের মত বললাম, "চিন্‌তে পারছেন?"

ভদ্রলোকটি দুই হাত জোড় ক'রে তখন প্রতি নমস্কার করছেন, বললেন, "খুব, এদিকে বেড়াতে এসেছিলেন বুঝি?"

বললাম, "হ্যাঁ, আপনি—"

"হ্যাঁ আমিও" ভদ্রলোক আমার মুখের কথা কেড়ে নিলেন, "রোজ সকালে আপনি এদিকেই তো আসেন।"

এবারে আমি রীতিমত গলে গেলাম, আমাকে তা হ'লে উনি বেশ চেনেন, এমন কি আমাকে লক্ষ্য করেছেন কয়েক দিন থেকেই। বললাম, "কিছু মনে করবেন না, আপনার সঙ্গে কয়েকটা দরকারী কথা ছিল আমার—"

"আমার সঙ্গে?" ভদ্রলোক রীতিমত বিস্মিত হলেন মনে হ'ল, "আমার সঙ্গে আপনার কি দরকারী কথা থাকতে পারে?" ব'লে সামান্য একটু হাসলেন, তার পরে একটু হেসে বললেন, "বেশ তো বলুন না।"

"চলুন ওখানে গিয়ে বসি—"

দুজনে ঘাটের সিঁড়ির উপরে এসে বসলাম, তার পরে আস্তে আস্তে আমি বললাম, "বিশেষ কিছু নয়, এই আপনার খেলা সম্বন্ধে আর কি।"

ভদ্রলোক হাসলেন, নিতান্ত উদাসীনভাবে, না হাসলে মানাবে না, শুধু এই জন্যেই যেন, বললেন, "ও—আচ্ছা বলুন।"

বললাম, "আপনার ওই অদ্ভুত খেলা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আশ্চর্য, আমি যতবারই দেখি ততবারই আমার কাছে নতুন লাগে। সত্যি, কি করে আপনি এরকম খেলা শিখলেন?"

তিনি উত্তর দিলেন না, সেইভাবেই আর একবার হাসলেন শুধু।

বললাম, "লোকে কিন্তু আপনার নামে অনেক কিছুই বলে, তারা বলে আপনি না কি ওই কালো কাপড়ের মধ্য থেকে বেশ পরিষ্কার দেখতে পান, আপনার ওই কাপড়ে নাকি ছোট ছোট অনেক ছেঁদা আছে, তাই দিয়ে দেখেন। কেউ বলে আপনি সকলকে মুহূর্তে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেন, আপনি যে কোনো খেলা সামান্যভাবে দেখালেই দর্শকেরা তা অসামান্যভাবে দেখতে পায়। আরও কত কি।"

ভদ্রলোক এবারে একটু জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, "ও এমন কিছু নয়—শুধু দীর্ঘ দিনের অভ্যাস, চেষ্টা করলে আপনিও পারেন।"

এ সরলতায় আমি রীতিমত অভিভূত হ'লাম, ক্রমশ আমাদের আলাপ হয়ে গেল। ভদ্রলোকের নাম নীলকান্ত সুকুল, পলাশডাঙায় বাড়ি। গ্রামে গ্রামে তাঁর এই খেলা দেখিয়ে বেড়ানই বর্তমানে একমাত্র জীবিকা।

ভারি কৃতজ্ঞ বোধ করলাম নিজেকে ওঠবার সময়ে নীলকান্তবাবু তাঁর তাঁবুতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন সেই-দিন। বললেন, "যে ক'দিন আছি, রোজই দেখতে আসবেন, টিকিট কিনবেন না আর—"

মনে মনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। বললাম, "সে কি কথা, আপনার যখন এই জীবিকা—"

"তা হ'ক।" নীলকান্তবাবু হঠাৎ বাধা দিলেন, "না হলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হ'ব কিন্তু।"

হাসলাম; এ কথার আর কি-ই বা উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

নিশানাথের মেলাটা এ বছরে ভাল জমেছিল। কয়েকটা সার্কাস পার্টি ম্যাজিক লণ্ঠন, টকি বায়স্কোপ অনেক কিছু এবারে এসেছিল। কিন্তু সুখের বিষয় নীলকান্তবাবুর খেলাতেও লোক বেশ হতে লাগল। আমি প্রায় রোজই যেতাম, খেলার শেষে তাঁর সঙ্গে গল্প করতাম। কোনওদিন সন্ধ্যার আগে মাঠের পথ ধরে দুজনে বেড়াতে বেরতাম। অনেক কথাই হ'ত; বেশীর ভাগ এই সব অদ্ভুত খেলা সম্বন্ধে। ভদ্রলোককে আমার ভারী ভাল লাগত। ক্রমশ দুজনে যে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছি এটা বুঝতে পারলাম।

একটি সন্ধ্যার ঘটনা আমার মনে পড়ছে। নিশানাথের মেলা তখন শেষ হয়ে এসেছিল, দু-একটা সার্কাস পার্টিও এখান থেকে অন্য গ্রামে চলে গেছে, মেলার ভাঙন অবস্থা আর কি। লোকজনও কম হচ্ছে, আগামী সপ্তাহে মেলা শেষ হবে। নীলকান্তবাবুও চলে যাবেন শুনলাম, হাঁটতে হাঁটতে বললাম, "এবার এখান থেকে চলে যাচ্ছেন নাকি?"

সেইভাবেই হাসলেন, বললেন, "আর কতদিন থাকব বলুন। আপনাদের অনেক পয়সাই তো ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেলাম।"

কথা শুনে আমার খুব হাসি পেল, বললাম, "কি যে যা-তা বলেন। এরকম খেলা এ গ্রামে বোধ হয় আর কখনও আসে নি। আসছে বছরেও আসবেন কিন্তু। হ্যাঁ, আপনার ঠিকানাটা?"

জ্যোৎস্না উঠেছিল। নীলকান্তবাবু এগিয়ে গেলেন, বললেন, "আসুন, ঘাটের এই জায়গাটায় বসা যাক। আপনার কোনও কাজ নেই তো?"

বললাম, "মোটেই না। পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন কেবল আড্ডা দিয়ে বেড়ানো আর ঘুমনো, এই তো কাজ!"

নীলকান্তবাবু হাসলেন, বললেন, "বি-এ দিলেন বুঝি?"

বললাম, "ওই যা হয় একটা। আসুন 'এইখানেই বসি।"

ঘাটের একটা ধাপের একপাশে আমরা বসলাম। পুকুরটা ছোটই, কিন্তু ভারী সুন্দর জল। চাঁদের আলো পড়ে ঢেউগুলো হীরের টুকরোর মতো জ্বলছে। ওপারে নিস্তব্ধ বাঁশঝাড়। মাঝে মাঝে বাতাস সরসর করে বেজে উঠছে, মাথার উপরে ঘন আর নীল আকাশ, কয়েকটা ছেঁড়া মেঘ ভেসে চলেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলাম, তার পরে অনেক দিনের পুরনো প্রসঙ্গ টেনে বললাম, "আমার কিন্তু আপনার কথা মোটেই বিশ্বাস হয় না, শুধু কি অভ্যেস করলেই অত সুন্দরভাবে খেলা দেখানো যায়?"

নীলকান্তবাবু হাসলেন, বললেন, "তা ছাড়া কি। অনেক দিনের প্র্যাকটিস। চেষ্টা করলে মানুষে কি না করতে পারে বলুন?"

বললাম, "তা বটে, এক জীবন দেওয়া ছাড়া।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক", নীলকান্তবাবু অপেক্ষাকৃত একটু গম্ভীর হয়ে উঠলেন মনে হ'ল।

বললাম, "একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না তো?"

নীলকান্তবাবু আমার মুখের দিকে চাইলেন, চোখেতে মাঝে মাঝে তাঁর যে উদাস হয়ে যাওয়ার ভাব লক্ষ্য করতাম, সেই দৃষ্টি নেমে এসেছে দেখলাম, বললেন, "না মা, বলুন না, অত সংকোচ করছেন কেন?"

"মানে, অনধিকার চর্চা কিনা, এ আমার না বলাই উচিত।"

"আহা বলুনেই না—কি হয়েছে তাতে।"

বললাম, "আপনার খেলা দেখাবার সময় বোর্ডের উপরে দুই হাত মেলে দিয়ে যে ভদ্রমহিলাটি দাঁড়ান উনি আপনার—"

"হ্যাঁ, উনি আমার স্ত্রী।" নীলকান্তবাবু অস্বাভাবিক ভাবে গম্ভীর হয়ে উঠলেন। লক্ষ্য করলাম তাঁর সমস্ত চোখে মুখে একটা উত্তেজনার ভাব হঠাৎই ছড়িয়ে পড়ল। আমি একটু ভয়ই পেলাম, মনে হ'ল, এ প্রসঙ্গ না তুললেই ভাল হ'ত বোধ হয়, কিন্তু হাতের ঢিল আর মুখের কথা! আর সময় নেই!

"আপনারা তো আমার এই খেলার এত প্রশংসা করেন," নীলকান্তবাবু ধীরে ধীরে আরম্ভ করলেন, "কিন্তু জানেন না তো আমার এই খেলার জন্যে আমি নিজে কত দুঃখিত।"

ভদ্রলোকের চোখ মুখ ক্রমশঃই লাল হয়ে উঠছে বুঝতে পারলাম। অবাক বিস্ময়ে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, বললেন, "আপনারা বলবেন, 'স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে এই নির্লজ্জ খেলা দেখানোতে একটুও সংকোচ হয় না?' তার উত্তরও আমি সহজে দিতে পারব, বলব, 'অভাব, মশাই অভাব, অভাবে লোকে কি না করে', কিন্তু কেন, কেন যে আমি এভাবে ঘুরে বেড়াই সেই কথাই আপনাকে আজ বলব।" নীলকান্তবাবু আমার কাছে আরও ঘন হয়ে এলেন, "আপনি আমার বন্ধু, আপনি বুঝতে পারবেন, কি নিদারুণ দুঃখে আমি দিনরাত জ্বলছি—।" ভদ্রলোক হঠাৎই চুপ করে গেলেন।

আমি কথা বলতে পারলাম না, নির্বোধের মত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, "আপনি জানেন না, ও আমার কতবড় সর্বনাশ করেছে, ওকে যে কিভাবে শাস্তি দিলে চরম শাস্তি দেওয়া হয়, তা আমি ভেবে পাই না। দেখবেন ওকে একদিন আমি খুন করব। সত্যি সত্যিই খুন করব। আর তা এক ভারী অভিনব উপায়ে, আপনারা বুঝতেও পারবেন না যে ওকে আমিই মেরেছি।" ব'লেই ভদ্রলোক একবার অদ্ভুতভাবে হাসলেন। "আপনারা বরং সমবেদনা জানাবেন, আমার সেই নিদারুণ শোকে সান্ত্বনা দিতে আসবেন আপনারা", নীলকান্তবাবুর গলার শিরা অনেকটা স্ফীত হয়ে উঠেছে, সেই অস্পষ্ট চাঁদের আলোতেও বেশ বোঝা গেল। একটু থেমে বললেন, "জানেন? সেই কায়দাটা কি?

কিছুই নয়, এক দিন খেলা দেখাতে দেখাতে হঠাৎ ওর গলা লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়ব বস্, সব শেষ। মুহূর্তে ও লুটিয়ে পড়বে মাটিতে, রক্তে নরম মাটি ভিজে উঠবে, আর আপনারা ছুটে আসবেন। আপনারা আমায় বোঝাবেন, বলবেন, 'দুর্ঘটনা—এ একটা নিদারুণ দুর্ঘটনা', যা আমার হাতে কোনও দিন ঘটে নি। আমার অব্যর্থ তীর সন্ধানের একটি আকস্মিক ব্যর্থতা এ। লোকেরা, সকলেই জানে আমি আমার স্ত্রীকে কত ভালবাসি; তারা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করবে না যে, আমি ওকে মেরেছি, হত্যা করেছি—আমিই ওকে এই তীর দিয়ে, ওকে দিয়েছি আমি চরম শাস্তি। কেউ এ কথা ভাববে না, সকলেই আমাকে সমবেদনা জানা'বে। ভাবতে পারেন, কল্পনা করতে পারেন, আমার সেই অপূর্ব কৌশল কি সুন্দর, কি সুন্দর উপায়, ভাবতে পারেন আপনি?"

নীলকান্তবাবু রীতিমত উত্তেজিত হয়েছেন লক্ষ্য করলাম, কিন্তু তার পর পরমুহূর্তেই হতাশার গভীর গহ্বর থেকে তিনি যেন কথা কইলেন; বললেন, "কিন্তু তা আর হ'ল না, তা আর হ'ল না এ জীবনে। যতই আমি ওর গলা লক্ষ্য ক'রে তীর ছুঁড়ি না কেন, কিছুতেই লাগবে না, কিছুতেই লাগবে না। ঠিক ওই ভাবে, যেমন দেখেছেন, ওর মুখের চারপাশে গোল হয়ে গিয়ে আটকে থাকবে,—এক ফোঁটা রক্তও ঝরবে না। একটু ব্যথাও সে পাবে না। মেশিন, মেশিন হয়ে গিয়েছে আমার হাত পরমেশবাবু।" ভদ্রলোক চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন যেন।

হতবাক্ হয়ে আমি ব'সে রইলাম, আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল হালকা কাঠের বোর্ডটা আর দুই হাত মেলে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মেয়েটি। কি করুণ আর বিষণ্ণ তার মুখ! ঠক্, ঠক্, ঠক্, ঠক্ এক একটা তীর এসে তার কান ঘেঁষে, চুল ঘেঁষে কাঠের উপরে বিঁধে যাচ্ছে আর মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে স্থির, নিস্পন্দ! জোর করে খানিকটা হাসি টেনে আনতে চেষ্টা করছে তার রক্তহীন মুখে। প্রতি মুহূর্তে বুক তার দুরুদুরু করছে, দর্শকমণ্ডলী অবাকবিস্ময়ে স্তব্ধ। আর মেয়েটি প্রতিবারেই যেন মৃত্যুর হাত থকে বাঁচছে প্রতি-বারের তীর পতনের সঙ্গে। আর তার মুখের চারপাশে গোল হইয়া গ'ড়ে উঠছে একটি চক্রচিহ্ন, একটি সুন্দর, নিটোল চকচকে তীরের বৃত্ত। আর তার পরে সকলের শেষে মেয়েটি দুটি ক্লান্ত হাতে সমস্ত জনমণ্ডলীকে নমস্কার জানিয়ে পর্দার আড়ালে চ'লে যাচ্ছে—অক্ষত!

মুখ তুললাম। নীলকান্তবাবু মাথা নীচু ক'রে ব'সে আছেন। আকাশে আর ছেঁড়া মেঘের টুকরোও নেই, পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় সমস্ত পথ আর ঘাট ভ'রে গিয়েছে, ওপারের বাঁশ-ঝাড়টা বাতাসে আবার সরসর ক'রে বেজে উঠল।*

---

*মোপাসাঁ থেকে

বিক্রমপুরের কবিগান

(৩৭৩ পৃষ্ঠার পর)

কৈলাসচন্দ্রের সংগীতে সেকালের প্রাচীন কবিওয়ালাদের প্রভাব বিদ্যমান আছে, তথাপি তাঁহার মধ্যে স্বাধীন ভাব ও চিন্তা প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে।

যেখানে যে ভাবের ভাষা প্রকাশ আবশ্যক, যেরূপ শব্দ যোজনা করিলে তাহা সরস ও সুন্দর হয়, কৈলাসচন্দ্রের সংগীতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

অভিমন্যু ক্ষত্রিয় সন্তান তাই তিনি বলিতেছেনঃ

রণে যায় যাবে প্রাণ, ক্ষত্রিয় সন্তান সেজন্য ভাবি নে,
বলুবে সবে ভূমণ্ডলে অভিমন্যু অর্জুন ছেলে, কৃষ্ণের ভাগিনে,
সমরে সপ্তরথী নাশে তারে সহায় বিহীন।
রণে যায় যাবে প্রাণ, ক্ষত্রিয় সন্তান সেজন্য ভাবি নে।

এই 'রণে যায় যাবে প্রাণ ক্ষত্রিয় সন্তান তাই ভাবি নে—' একটিমাত্র পঙ্‌ক্তিতে অভিমন্যুর বীরত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে পূর্ববঙ্গের কবি গায়কগণের বিষয় একেবারেই উপেক্ষিত হইয়াছে। অথচ আমরা ষোড়শ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের নানাস্থানের বহু কবি গায়কগণের কবিত্বপূর্ণ কবিতাবলীর পরিচয় পাইতেছি। সে সকলের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা দুই একটি প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। এজন্যই প্রসঙ্গক্রমে আজ একজন কবিওয়ালার সংগীত কয়টি প্রকাশ করিলাম।

বন্ধুবর ভূপতিচরণ যদি আমার অনুরোধে শ্রীযুক্তা মোক্ষদা দেবীর নিকট হইতে এ সমুদয় সংগীত সংগ্রহ না করিয়া পাঠাইতেন—তাহা হইলে চিরদিনের জন্য এই অমূল্য সম্পদ বিলুপ্ত হইত। এজন্য আমি ভূপতিবাবু ও মোক্ষদা দেবীকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

চিকাগোর পথে

(ভ্রমণ কাহিনী—অনুবৃত্তি)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

নায়গ্রা প্রপাত

হ্রদের মাঝে কবি বর্ণিত জলের অভাব। জল ধূসর বর্ণের। হ্রদের তীরে নানা রকমের এলোমেলো বাড়ি ঘর। দেখলেই মনে হয় এদিকে আমেরিকার ইঞ্জিনীয়ারদের সুদৃষ্টি পড়ে নি। এককালে রেড ইণ্ডিয়ানদের অত্যাচার এদিকে বেশই হয়েছিল বলে মনে হয়। রেড ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এককালে যেমন করে গৃহসজ্জা করতে হয়েছিল, তার চিহ্ন এখনও বর্তমান। কেন যে আমেরিকার ইঞ্জিনীয়াররা এদিকে হাত বাড়াতে পারেন নি, তা নিয়ে মনে মনে অনেক ভাবলাম, কিন্তু কিনারা করতে পারলাম না।

বাস ক্রমাগত চল্‌ছে। বাসের গতি ঘণ্টায় মাত্র পনের মাইল। এত আস্তে যাবার কারণ, পর্যটকদের হ্রদের সৌন্দর্য দেখবার সুযোগ করে দেওয়া। বাস কোম্পানি সাধারণের সুবিধার দিকে খুব অবহিত মনে হল। তাঁরা যেমন অর্থ উপার্জন করেন, তেমনি যাত্রীদের সুখ সুবিধার দিকেও তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি। দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। বাস নায়গ্রা শহরের Grayhound Bus Company'র স্টেশনে এসে হাজির হ'ল। নিগ্রো কুলীরা প্রত্যেকের লাগেজ বার ক'রে নিয়ে লাগেজরুমে রাখলে। প্রত্যেকেই লাগেজ রসিদ নিয়ে নিজের নিজের লাগেজ মুক্ত ক'রে যে যার পথ ধরল। আমার কোনও লাগেজ ছিল না তাই আমি পথে এসে দাঁড়ালাম। ইচ্ছা, সর্বপ্রথম রাত্রিকাটাবার জন্য একটা হোটেল ঠিক ক'রে একটু আরাম করি, তার পর নায়গ্রা প্রপাত দেখতে যাই।

নায়গ্রা শহরটাই হ'ল কতকগুলি হোটেল নিয়ে। অনেক হোটেলে গেলাম। সব হোটেলেরই ম্যানেজার স্থান নেই ব'লে আমাকে বিদায় দিলে। তার পর আমি যে হিন্দু তাই ব'লে অনেক হোটেলের ম্যানেজারের কাছে ঘর পাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কেউ আমাকে স্থান দিলে না। অর্থাৎ টাকা দেখিয়েও ঘর পাওয়া সম্ভব হল না। অনেক কষ্ট ক'রে অবশেষে একটা নিগ্রো হোটেল খুজে বার করলাম। হোটেলের মালিক আমাকে পেয়ে বেশ আনন্দিত হ'ল এবং আমার থাকার জন্য একটি রুম দেখিয়ে দিলে।

রুমের ভাড়া প্রত্যেক রাত্রির জন্য দেড় ডলার ক'রে (প্রায় সাড়ে চার টাকা) দিতে হয়েছিল। ঘরের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে একটু আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু মনে হ'ল সাদা এবং কালো হোটেলে কত প্রভেদ। এই ঘরটি যদি শ্বেতকায়দের হোটেলে হ'ত তবে আমাকে দিতে হ'ত মাত্র পঁচিশ সেণ্ট (প্রায় এক টাকা চার আনা)। সাদা হোটেলে লোকজনের আসাযাওয়া সদাসর্বদা থাকে, তাই তারা সস্তায় ঘর ভাড়া দিতে সক্ষম হয়। নিগ্রোদের হোটেলে দৈবাৎ লোক এসে থাকে; তাই তাদের খরচ পোষাবার জন্য বেশী দাম চাইতে হয়। নিগ্রোদের মধ্যে আবার নানারকমভাবে টাকা বাঁচাবার উপায় রয়েছে। রাত্রে যদি একটু গরম থাকে তবে তারা ঘাসের উপর শুয়ে রাত্রি কাটিয়ে দেয়। অনেক সময় তাদের রাত্রি কাটে রেস্তরাঁয়। নিগ্রোদের রেস্তরাঁ এই জন্যই সারা রাত্রি খোলা থাকে। হোটেলের খরচ বাঁচিয়ে লোকে রেস্তরাঁয় সেই টাকা মদের জন্য খরচ করে। যাই হ'ক আমি তো নিগ্রো নই, আমাকে রেস্তরাঁয় রাত্রি কাটাতে হবে না, আমি তা পারবও না।

হোটেলের মালিক আমার পরিচয় পেয়ে বড়ই দুঃখিত হ'ল। সে আমাকে রাত্রে তার রেস্তরাঁয় খাব কি না জিজ্ঞেসা করল। আমি রাজী হলাম না, কারণ সাদা হোটেলের খাবার ভাল এবং সস্তা। উপরন্তু তারা আমাকে রেস্তরাঁয় ঢুকতে নিষেধ করে না। আমাকে রেস্তরাঁয়, প্রবেশ করতে নিষেধ করে না শুনে হোটেলের মালিক একটু আশ্চর্য বোধ করল। আমি তাকে বললাম "তোমরাও যদি আমার মত সাহস ক'রে রেস্তরাঁয় গিয়ে খাবার দিতে আদেশ কর তবে হয়তো তোমরাও পেতে পার। দাবি করবার শক্তির তোমাদের অভাব।" হোটেলের মালিক এ কথার কোনও জবাব দিলে না, শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ভগবানের উপর দোষারোপ করল। আমি আর কোনও কথা না ব'লে নায়গ্রা প্রপাত দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

এই নিগ্রো হোটেলটি হ'ল শহরের বাইরে। তারই কাছে কয়েকখানা বাড়ি আছে তাতে কয়েকটি নিগ্রো পরিবার বাস করে। সোজা পথে গেলে তাদের বাড়ির পাশ কাটিয়ে যেতে হয়। সেই পথে আমার যেতে ইচ্ছা হ'ল। প্রত্যেক বাড়ি ভাল ক'রে দেখলাম; প্রত্যেকটি যেন একটি ভূতের ঘর। লোকজন নেই, দরজা বন্ধ। বাড়ির উপর বড় বড় গাছ ছায়া বিস্তার ক'রে অস্বাস্থ্য বিতরণ করছে। কত স্বাস্থ্য বিভাগের পরিদর্শক এদিকে আসা-যাওয়া করেন, তাদের কারও দৃষ্টি এদিকে পড়ে না। যদিও তাঁরা এরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থান শহরের কাছে থাকা যুক্তি যুক্ত মনে করেণ না, তবুও তাদের ঐ সম্বন্ধে কিছুই বলবার উপায় নেই। পুঁজিবাদী সে নিজের নাক কেটেও অপরের যাত্রা বন্ধ করতে চায়। এই তাদের স্বভাব।

এই জায়গাটি পেরিয়ে গিয়ে ছোট শহরটির একটি পথের পাশে এলাম এবং এক প্যাকেট সিগারেট কেনবার জন্য থামলাম। সিগারেট বিক্রেতা আমার আচার ব্যবহারে নূতন কিছু দেখে আমার প্রতি একটু আকৃষ্ট হয়েছে ব'লে মনে হ'ল; কিন্তু পরে বুঝলাম সে ধারণা ভুল। যাই হ'ক আমি সিগারেট কিনে একটা রেস্তরাঁয় গিয়ে বিশ্রাম করতে বসলাম।

একটু বিশ্রাম ক'রে নায়গ্রা প্রপাত দেখতে বেরিয়ে একেবারে প্রপাতের কাছে এসে পড়লাম। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। কিন্তু বিজলী বাতি চারিদিকে এমন তীক্ষ্ন আলো বিতরণ করছে যে একদম যেন দিনের আলোর মত মনে হচ্ছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রপাতের শোভা দেখলাম। এতক্ষণ দেখেও তৃপ্তি হ'ল না; অনেকক্ষণ পাইচারি করলাম। যতই দেখতে লাগলাম, ততই দেখবার ইচ্ছা হ'তে লাগল। আরও খানিকক্ষণ পাইচারি ক'রে একটা পরিষ্কার স্থানে বসলাম এবং প্রপাতের দিকে চেয়ে রইলাম।

চোখে দেখতে লাগলাম প্রপাত, কাণে শুনতে লাগলাম তার গর্জন। জল পড়ছে তার শব্দ, জল প'ড়ে ঘুরে উপরে উঠছে তার শব্দ, নানা তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতের শব্দ। কী বিচিত্র, কী সুন্দর! অভিভূত মন নিষ্কর্মা হয়, কোনও গভীর চিন্তা তখন মনে আসে না। এ যেন আধোজাগ্রত অবস্থা।

(শেষাংশ ৩৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জন্মদিন

(নাটিকা)

শ্রীপুলকেশ দে সরকার

দৃশ্যোন্মোচন

প্রবেশ ঘর। কেবল কয়েকখানা চেয়ার সাজানো আছে। ভিতরের দিকে একটি দরজা, তাতে একখানা পর্দা ঝুলানো। সেই দরজার ডান পাশে একখানা ব্রাস-প্লেটে লেখা ANIL DHAR । ।OUT।; তাহার ঠিক উপরেই ইলেকট্রিক কলিং বেল; একটি তরুণী প্রবেশ করিল ও চারিদিক চাহিয়া লইয়া বোতামটি টিপিল। তরুণীটি চঞ্চল; হাতে একগোছা ফুল নানা রকমের। একটু অপেক্ষা করিয়া আবার টিপিল

[একটি ছেলের প্রবেশ]

ছেলেটি। কাকে চান?

তরুণী। তুমি এ বাড়ির—

ছেলেটি। চাকর।

তরুণী। আমি মিস্টার ধর—মানে, বাবুকে চাই।

ছেলেটি। বাবু তো—আচ্ছা, বসুন আপনি।

তরুণী। বাবু বাড়ি নেই—

ছেলেটি। মা আছেন।

তরুণী। উহুঁ—বাবু—

[নেপথ্যে—কি রে শ্রীকান্ত?—জনৈকা প্রৌঢ়ার প্রবেশ]

প্রৌঢ়া। কাকে চাই মা?

তরুণী। আপনি বুঝি—

প্রৌঢ়া। হ্যাঁ মা, আমি অনিলের মা। কিছু মনে ক'রো না বাছা, তোমায় যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি ব'লে মনে হ'চ্ছে।

তরুণী। কোথায় দেখবেন?

মা। কখনও রেঙ্গুন গেছ—রেঙ্গুন?

তরুণী। রেঙ্গুন? নাঃ, চিরকাল এই কলকাতায়।

মা। তবে কোথায় যেন—

তরুণী। ওরকম হয়, এমন অনেক familiar face চোখে পড়ে; থাক গে, মিস্টার ধর তবে বাড়ি নেই।

মা। না মা, সেই ভোর সকালে বেরিয়েছে, বলে অনেককে নেমন্তন্ন করতে হবে—আজ তার জন্মদিন কিনা।

তরুণী। তারই তো এই উপহার—

মা। তোমায় বলেছে বুঝি?

তরুণী। না—

মা। তোমরা বুঝি একসঙ্গে পড়—ব'স না, মা, ব'স না, তোমায় বড্ড ভাল লাগছে।

তরুণী। বসব না।

মা। আজ তার জন্মদিন, তাই এই ফুল কিনলে বুঝি?

তরুণী। জন্মদিনের উপহার।

মা। আহা মা বেঁচে থাক, তোমার জন্মদিনও এমনই ফলেফুলে ভ'রে উঠুক!

তরুণী। আমার তো জন্মদিন নেই।

মা। ওকি কথা মা, ছি!

তরুণী। নেই, সত্যি নেই,—

মা। তোমার বয়স কত মা, ভারী কচি মুখখানা।

তরুণী। আমি চলি, এই রইল ফুল।

মা। সে কি! তোমায় সে নিশ্চয় নেমন্তন্ন করেছে প্রীতিভোজে—তোমাকে যে—

তরুণী। আসতেই হবে? কেন?

মা। কেন জানি নে; মনে হচ্ছে নইলে সবই ব্যর্থ হবে, বল মা, আসবে তো?

তরুণী। আপনারা বুঝি রেঙ্গুনে ছিলেন?

মা। কর্তা ওখানেই কাজ করতেন কিনা; তিনি গত হ'লেও ওখানেই ছিলাম। কিন্তু বি-এ পাস করার পর অনিল যখন বললে, চল মা, কলকাতা যাই, তখন আমারও কেমন প্রাণটা হু হু ক'রে উঠল। জন্মভূমির টান কিনা।

তরুণী। অনিলবাবুর জন্ম এদেশেই?

মা। এদেশেই—কিন্তু সে আজ পদ্মার নীচে—

তরুণী। বিক্রমপুর বুঝি?

মা। কি ক'রে জানলে?

তরুণী। বিক্রমপুরীরাই প্রবাসী কিনা।

মা। তোমাদের বাড়ি?—

তরুণী। ঐ রকমই কোথাও হবে, পদ্মায় তলিয়ে গেছে। কিন্তু আমি ছেলেবেলা থেকেই কলকাতায়।

মা। তোমার কে আছেন মা?

তরুণী। বাবা ছিলেন, তাঁকে আমি দেখেছি; ছেলেবেলার কথা—শুনেছি মাও ছিলেন।

মা। আহা!

তরুণী। না ভুল করছেন, আমার বোর্ডিংএর সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কথা যদি সত্য হয়, বাবা খুব গরিব ছিলেন!

মা। সে কি মা, গরিব ব'লে কি বাঁচতে নেই?

তরুণী। কেন?

মা। অমন বলতে নেই, শ্রদ্ধেয় ওঁরা।

তরুণী। শ্রদ্ধেয় ব'লে কি তাঁদের দারিদ্র্যকেও শ্রদ্ধা করতে হবে? যাক গে এসব কথা, আপনার ভাল লাগবে না; কিন্তু শুনে সুখী হবেন, আমি গরিব নই।

মা। ভগবানকে ধন্যবাদ, কি করে?

তরুণী। বাবাকে ধন্যবাদ, তিনি কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন। আর নয়, এখন চলি, প্রীতিভোজ—?

মা। ১টায়—ঠিক ১টায়, এসো কিন্তু।

[তরুণীর প্রস্থান]

শ্রীকান্ত, বাবা, ফুলগুলি নে তো বাবা, নষ্ট করিস নে যেন, তোর তো—এই ফেললি তো একটা, তোদের—

[শ্রীকান্তের প্রস্থান]

খোকাটা সাতসকালে বেরিয়ে গেছে, বাহাদুর ছেলে, এরই মধ্যে কত লোকের সঙ্গে আলাপ করেছে—

[প্রস্থান]

[প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অনিলের প্রবেশ। সুর করিয়া গাহিতে লাগিল—]

Toast for you and Roast for Rest
When I am the host I serve you best

[প্রৌঢ়ার প্রবেশ, অনিল অঙ্গভঙ্গি সহকারে—]

Others are ghosts when I love you most—

মিঃ অনিল ধর ইন্—হ্যাল্লোআ—

মা। শোন্, শোন্।

অনিল। others are ghosts when I love you most—

মা। একটা মেয়ে এসেছিল রে।—

অনিল। ভিখিরী?

মা। না রে।—

অনিল। বুড়ী?

মা। না রে না, বলি শোন্—

অনিল। নাবালিকা?

মা। সোমত্ত মেয়ে রে!

অনিল। say সমর্থ—হাইলি ইণ্টারেস্টিং।

মা। এক গাদা ফুল দিয়ে গেছে—

অনিল। বোকে? —কোআইট ওকে! মাতঃ কিবা নাম তার?

মা। ওঃ যা, সবই জানা হ'ল, নাম তো জানা হয় নি, হ্যাঁ রে শ্রীকান্ত!

অনিল। হা হা হা হা—ঠিক, শ্রীকান্ত—।

মা। [বিব্রতভাবে] কিন্তু যাই বলিস, ভারী সুন্দরী মেয়েটি।

অনিল। সৌন্দর্য?

মা। স্বভাবেও। মনে হয়—

অনিল। আমি বলব মা তোমার মনের কথা?

মা। বল্ তো?

অনিল। 'তোদের দুটিতে বেশ মানাত'।

মা। আশ্চর্য! কি ক'রে বললি?

অনিল। চিরন্তন সমাধান—ছাঁচে ঢালা মার মন। মেয়েরা মেয়েদের দেখলে বিরক্ত হয় বা হিংসাই করে, কিন্তু যেখানে প্রশংসা উথলে ওঠে, সেখানে মেয়েরা তার সেবা পেতে চায়।

মা। নাই বা পেলাম সেবা, তবু তুই সুখী হ।

অনিল। কিন্তু মেয়ে-জামাই দেখে খুশী হয়, চোখের জল ফেলে তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠায় বটে, কিন্তু সে জল কি সবটাই দুঃখের?

মা। কি জানি বাপু, অত কথা কে জানে, প্রাণ কেমন কেমন ক'রে, তাই শুধু বুঝি। তাকে বলেছিস তো?

অনিল। কাকে মা?

মা। সেই মেয়েটাকে রে।

অনিল। কি ক'রে জানব তোমার সেই মেয়েটা কে?

মা। না না, অনিল তাকে বলিস—তাকে বলিস তুই—।

[বিব্রতভাবে প্রস্থান]

অনিল। [জানালার ধারে গিয়া] অশোকা—অশোকা—নিশ্চয়ই অশোকা। স্বপ্নও বাস্তব হয়, মা কি জানেন তার আসাই চাই, সে আসবেই; অশোকা—অশোকা—ম্যাগনেট অ্যান্ড শী মাস্ট কাম! Toast for you and Roast for Rest।

[বলিতে বলিতে প্রস্থান]

দৃশ্যান্তর

মস্তবড় হল-ঘরটায় ডিমের আকারে টেবিল। মা শ্রীকান্তের সাহায্যে টেবিল সাজাইতেছিলেন। অনিল এক-একবার আসিতেছিল আবার চলিয়া যাইতেছিল। কলিং বেলটা বাজিয়া উঠিল

মা। দেখ্ তো, দেখ্ তো, কে এল যেন।

অনিল। [বিপরীত দিক্ হইতে ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বাহিরের দিকে যাইতে যাইতে] ডোণ্ট ওরি মাদার, হোয়েন আই অ্যাম দ্য হোস্ট—

মা। কি ছেলে বাবা, বুকটা কাঁপিয়ে দিয়েছে। সে কি এল নাকি?

[একটি তরুণের সঙ্গে অনিলের প্রবেশ]

অনিল। এই আমার মা। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—বন্দে মাতরম্! আর মা যাহা হইয়াছেন। মা, এর নাম সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবী এম এ, আমার সহপাঠী।

সলিল। আপনাকে দেখে ভারী খুশী হ'লাম।

মা। এস বাবা এস, তোমরা আমার ছেলের মতো, নিজেদের বাড়ির মতো মনে ক'রো।

সলিল। নিশ্চয়ই।

অনিল। চল্, আমার স্টাডি দেখবি।

[প্রস্থান]

[আবার কলিং বেল বাজিতেই অনিল ছুটিয়া আসিল ও বাহিরে চলিয়া গেল]

মা। এবার বুঝি সে এল!

[একটি তরুণীসহ অনিলের প্রবেশ]

অনিল। ইনি আমার জন্মদাত্রী।

[মা মাথা নত করিলেন]

অতি লজ্জাশীলা প্রাচীনা, কিন্তু অপরিসীম স্নেহশীলা; আর মা ইটি মিস নীরজা সোম এলিয়াস বিমি, আমাদের সহপাঠিনী।

নীরজা। আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

মা। বেঁচে থাক মা।

অনিল। আর শিবের মতো কি হবে মা?

নীরজা। যা-ন।

মা। হবে, হবে, তাও হবে।

অনিল। অন্তত যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ আপনাকে সলিল বন্দ্যোর হাতে সঁপে দিয়ে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান]

মা। এই শ্রীকান্ত, এ জায়গায় জল এল কি ক'রে রে? তোদের—

[কলিং বেল; মা নিজেই আগাইয়া যাইতেছিলেন]

এবার সে নিশ্চয়ই আসছে! [অনিলকে দেখিয়া] হ্যাঁ রে অনিল তাকে বলিস নি?

অনিল। কাকে মা?

[বলিতে বলিতে প্রস্থান]

[পরক্ষণেই কায়দা করিয়া পিছন হটিতে হটিতে]—মিস ও মিসেস পুলিন বোস এ হ্যাপি কাপল্—[ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া] আর ইনি আমার—কি মা তুমি?

[আবার কলিং বেল বাজিল; অনিল একটু আগাইয়া গিয়া পিছাইতে পিছাইতে] আ রে চমৎকার কো-ইন্সিডেন্স, হিমাদ্রি আর গৌরী দেবী একই সঙ্গে, সুস্বাগতম্ সুস্বাগতম্ [ঘুরিয়া] ইনি আমার—

[অশোকার প্রবেশ]

মা। অনিল, অনিল!

অনিল। [ঘুরিয়া দেখিয়াই] হ্যাল্লো অশোকা?

মা। [মৃদুস্বরে] অশোকা—অশোকা—

অনিল। তোমাদের দেখাশোনা আর আধা পরিচয় আগেই হয়েছে, কিন্তু মা তোমার নাম জানেন না, অতএব অ্যাটেনশন্, মা, এর নাম অশোকা ধর।

মা। ধর?

অনিল। হ্যাঁ, ও পদবীটা আমাদেরই একচেটিয়া নয়। এস অশোকা, মার্ক, দিস ইজ মাই ফাদার, শুড আই সে-'ওয়াজ'? এনি ওয়ে হিয়ার হি ইজ্ স্ট্যান্ডিং ইরেক্ট অ্যান্ড ম্যাজিস্টিক! রেঙ্গুনের ভদ্রসমাজে তাঁর স্থান ছিল স্বতন্ত্র—নোংরা হাতে তাঁকে ধরাছোঁয়া যেত না। কিন্তু দেখ তো—এদিকে এস, এই শিশুটিকে চিনতে পার কি না?

অশোকা। ইজ ইট ইউ?

অনিল। নো [নিজেকে দেখাইয়া] হিয়ার অ্যাম আই। [উভয়েই হাসিল এবং তাহারা প্রায় অন্য প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে] আর এই তৈলচিত্রটি কার জান?

অশোকা। জানি।

অনিল। জান? বল তো?

অশোকা। মা'র।

অনিল। ভুল হ'বার জো নেই, আজ আমার জন্মদিন, ইনিই আমার গর্ভধারিণী, জন্মদাত্রী। আর ইনি কে বল তো? [বলিয়া তাহার যৌবনকালের একখানা ফটো দেখাইয়া দিল; হলটার এই প্রান্তে কাঠের স্ক্রিনের একটা আড়াল]

অশোকা। চিনি না তো!

অনিল। [ফোটোটাকে লক্ষ্য করিয়া] হতভাগা! সত্যিই চেন না অশোকা, বাট্ নাউ অর নেভার অশোকা! দিস ইজ মাই হোম, মাই মাদার, হার্থ অ্যান্ড মিসেল্ফ, উড ইউ নট—[হাত ধরিল]

অশোকা। [মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া] আজ তোমার জন্মদিন।

অনিল। হ্যাঁ, আমি বাঁচতে চাই—

[হল হইতে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল]

অশোকা। [অনিলের কানে কানে] চল খেয়ে বাঁচি। [উভয়েই হাসিয়া উঠিল]

[হলের ভিতর আসিয়া অনিল পাশের ঘরের দিকে গমনোন্মুখ হইল]

মা। [অশোকাকে] এস মা এস [অশোকা মাকে প্রণাম করিল। অনিল দেখিল এবং প্রস্থান করিল। মা অশোকাকে আশীর্বাদ করিয়া চোখে আঁচল দিলেন। পরমুহূর্তে সকলেই প্রবেশ করিল এবং সামান্য একটু হট্টগোলের মধ্যে সকলেই বসিয়া গেল।]

অনিল। Comrades, a concidence we are by pairs—

সলিল। But perhaps that is the happiest coincidence।

নীরজা। Really, মা, ছেলে আর—

অনিল। বস্! ....[সকলেই হাসিয়া উঠিল] অশোকা যে আমার পাশে এটা কোইন্সিডেন্স বটে, কিন্তু মার ভারী ইচ্ছে—অতএব এটা motivated accident!

নীরজা। কিন্তু আপনি নাকি সন্দেহ নেই; বিদেশ থেকে এসে এক বছরের মধ্যে এমন পাপুলার আমি কাউকে হ'তে দেখি নি।

সলিল। আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

হিমাদ্রি। আমিও।

গৌরী। তার কারণ, money amiability juxtaposed।

অনিল। তোমার ছেলের প্রশংসা হচ্ছে মা।

নীরজা। অশোকা ওঁদের মাঝখানে থেকে যেন হাইফেনের কাজ করছেন।

গৌরী। সত্যি।

মা। তোমরা আর দেরি ক'রো না, পাতে হাত দাও।

সলিল। কেবল পাতে হাত দেব মুখে তুলব না? [সবাই হাসিয়া উঠিল]।

হিমাদ্রি। খাবার সঙ্গে চাটনি—

মা। চাট্নি?

হিমাদ্রি। উহুঁ, ও নয় ও তো প্লেটে আছে দেখছি; আপনি রেঙ্গুনের গল্প বলুন। মেয়েদের মুখে—other side of the shield—আপনি বলুন।

মা। আমি?

পুলিন। আপনারা কত বছর থেকে ওখানে?

মিসেস পুলিন। আপনি কতটুকু ছিলেন তখন?

নীরজা। অনিলবাবুর জন্মের আগে না পরে গেছেন?

মা। উঁ, পরে? না—আগে।

অনিল। জেরার চোটে মা ঘাবড়ে গেছেন।

মা। তবে অনিলের জন্মের সময় অবশ্যি কর্তা রেঙ্গুনেই ছিলেন।

হিমাদ্রি। আর আপনি ছিলেন বাংলায়।

সলিল। তার মানে, অনিলবাবু বাংলার ছেলে।

মা। বাংলার ছেলে।

অনিল। না—না—আমি তোমার ছেলে।

পুলিন। মাংসটা ভারী চমৎকার হয়েছে।

মিসেস পুলিন। আমি মাংসই পছন্দ করি বেশী।

অনিল। Women are carnivorous, if you permit।

নীরজা। Despite so many widows in India।

সলিল। Rightly reported।

অশোকা। ইংরেজীর ঝড়—আমরা কি বাঙালী?

অনিল। আমি বর্মী।

হিমাদ্রি। যদিও বাংলায় জন্ম।

পুলিন। কোথায়?

মিসেস পুলিন। ঠিক ঠিক, কোথায়?

নীরজা। সত্যি, কোথায়?

মা। বিক্রমপুর।

অশোকা। বিক্রমপুর একটা গ্রাম নয়।

মিসেস পুলিন। আমাদের ওতেই যথেষ্ট।

নীরজা। আমরা বিক্রমপুরী নই।

গৌরী। মিস অশোকা ইনটারেস্টেড্?

অশোকা। সারটেনলি।

হিমাদ্রি। পারসনাল আলাপ থাক।

সলিল। But, sir, this is a personal day—and a personal function.........

নীরজা। অনিলবাবুর জন্মদিন।

মিসেস পুলিন। জন্মদিন জন্মস্থান স্মরণ করিয়ে দেয়।

অনিল। I am feeling flattered।

সলিল। Then home—home please।

অনিল। Should I or my mother?

অশোকা। মা-ই বলুন।

অনিল। মা!

মা। বাবা!

অনিল। জন্মভূমি?

মা। বিক্রমপুর—তেলিরবাগ।

অশোকা। তে-লি-র-বা-গ!

[অশোকার হাত লাগিয়া কাচের গেলাস একটা পড়িয়া গেল; মা'র কাপড়ে খানিকটা খাবার]

নীরজা। Dear name—তেলিরবাগ।

সলিল। খোশবাগ, আমবাগ হয়,

হিমাদ্রি। হামবাগও হয়,

গৌরী। আর তেলিরবাগ হবে না?

অশোকা। তেলিরবাগ? No it can't be that name, that's a lie।

পুলিন। Another coincidence perhaps।

মিসেস পুলিন। Before that, অনিলবাবু আপনাদের একমাত্র ছেলে?

নীরজা। Law of heredity, ওঁর বাবাও বোধ করি তাঁর বাবার একমাত্র সন্তান?

মা। না।

অনিল। এক কাকা ছিলেন আমার—পৌরাণিক গল্প—কিন্তু তাঁর মৃত্যুসংবাদ আজও আমরা পাই নি।

অশোকা। তেলিরবাগ!

গৌরী। অব্‌সেসান।

নীরজা। দেখবেন জপমালা করবেন না।

মিসেস পুলিন। তা হলে কিছু মনে করবেন না, অনিলবাবু ওঁরা দুই ভাই।

মা। দুই ভাই।

নীরজা। তা হয়, বিয়ের পর heredity peculiarity may diverge।

পুলিন। আশ্চর্য, অনিলবাবুর জন্মদিন জন্মদাতার নাম একবারও উচ্চারিত হল না।

হিমাদ্রি। সত্যি।

অনিল। পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি—

গৌরী। সেই পিতার নাম?

অনিল। রতিকান্ত ধর।

নীরজা। তার একমাত্র সন্তান—

গৌরী। অনিলকুমার ধর।

পুলিন। জিন্দাবাদ!

মিসেস পুলিন। আজ অনিলবাবুর জন্মদিনে সেই বিস্মৃত—

পুলিন। ইউ মীন, রতিবাবুর ভাই—

হিমাদ্রি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাঁরও আশীর্বাদ—

গৌরী। তাঁরও আশীর্বাদ চাই, তাঁর নাম

নীরজা। Most appropriate authority—

অনিল। মা!

মা। সতীকান্ত।

[বাং—ঝন্‌স্—ঝাড়্—নানাশব্দে টেবিলের জিনিসপত্র অশোকা ভাঙিতে লাগিল]

অশোকা। Lie—that's a lie—that's an insult to my—

অনিল। [ছুটিয়া গিয়া] Your?

অশোকা। Father—my dearest father।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান]

দৃশ্যান্তর

অনিল অনির্দ্দিষ্টভাবে ঘরের একটা থামের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মা ছিলেন আলুলায়িতকুন্তলা—একটা সোফায় হাত রাখিয়া মাথা লুকাইয়া

অনিল। অশোকা! অশোকা! একটা বিশ্বগ্রাসী আত্মহত্যার মতো সমস্ত সৌধ আপনা আপনি তলিয়ে যাচ্ছে। অশোকার পরিচয় স্বাভাবিক পথ বেয়ে এল না, এল বেদনার মধ্য দিয়ে—নর যেখানে চায় নারীকে—কিন্তু সেই অশোকা—[মার দিকে ঘুরিয়া] এ সত্যি, অশোকা আমার খুড়তুতো বোন?

[মা কোন সাড়া দিলেন না]

[অনিল আগাইয়া গিয়া] বল।

মা। [উন্মত্তের মতো] না—না—

অনিল। অশোকার বাবা আমার কাকা নন?

মা। হ্যাঁ—না—না।

অনিল। অসহ্য—পরিচয়ে যদি নিশ্চুপ থাকতে পার নি তবে বল অশোকা—অশোকা—অশোকা আমার—

মা। বোন।

অনিল। হুঁ।

মা। অশোকা যমজ; অশোকার সম্বন্ধে টাকার ব্যবস্থা করে অশোকার ভাইটিকেই কর্তা বেছে নিলেন......

[মা উঠিলেন]

অনিল। চুপ চুপ, তুমি কি বলছ তুমি জান না।

মা। জানি। ওরে অনিল, আমি তোর কেউ নই, অশোকা তোর বোন—সতীকান্ত তোর বাবা—।

[ছুটিয়া বাহিরে গেলেন; অনিল কোনমতে টাল সামলাইয়া চেয়ারটা ধরিল।]

—যবনিকা—

চিকাগোর পথে

(৩৭৭ পৃষ্ঠার পর)

অনেক ক্ষণ ব'সে ব'সে যখন শরীরের প্রত্যঙ্গের রক্ত জমাট হবার উপক্রম করল তখন উঠলাম। নায়গ্রা প্রপাত মনে গভীর রেখাপাত করেছে।

রাত্র অধিক হয়েছে, তাই আমাকে হোটেলে ফিরে আসতে হ'ল। রাত্রে বেশ আরাম ক'রে শোব ভাবছিলাম, কিন্তু ক্রমাগত রেলগাড়ির সান্টিংএর শব্দে আর ঘুম হ'ল না। প্রাতে সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছিল কিন্তু আমার আমেরিকার বন্ধুরা ফিরে আসার দরুন ঘুমে জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিয়ে বার হ'তে হ'ল। কালকের সিগারেট বিক্রেতার কাছে বন্ধুদের হাজির করলাম, এবং যা দেখেছি ও শুনেছি তার বর্ণনা করলাম। তার পর আমরা রেস্তরাঁয় বেশ ক'রে পেট বোঝাই ক'রে আবার নায়গ্রা প্রপাত দেখতে নায়গ্রা প্রপাতের তীরে এলাম।

মানুষ চিন্তা করতে ভালবাসে, কিন্তু উগ্র চিন্তা পছন্দ করে না। যারা শুয়ে শুয়ে উপন্যাস অথবা ভ্রমণকাহিনী পাঠ করে তাদের কাছে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভূতত্ত্বের কথা ব'লে তাদের মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করা অন্যায়। তবুও আমাকে এবার ভূতত্ত্বের কথা বলতেই হবে নতুবা আমার ভ্রমণ কথার সমাপ্তি হবে না।

স্বপ্ন কল্পনা

শ্রীঅনিল দাস

স্বপনের ঘোরে বিলাসিতা আনি ঘরে নেই টাকা কড়ি
ভাঙা ঘরে জল পড়ে,
আকাশের বুকে কুসুম বিছাই সুবর্ণ রথে চড়ি'
সারা দিন রাত দুনয়নে ধারা ঝরে।

পথের দু ধারে প্রাসাদের সারি চারিদিকে কোলাহল
আমি পড়ে নিরালায়,
ধনী ও শোষকে ফুলে ফুলে ওঠে মোর আঁখি ছলছল
আঁখিজলে মোর নিরাশা কাঁদিয়া যায়।

আকাশের চাঁদ উঁকি মারে মোর ভাঙা ঘরে মাঝ রাতে—
অবিরাম চেয়ে থাকি,
সবহারাদের ক্রন্দন জাগে ব্যাকুল পবন সাথে
সারা দেহে তার পরশের রেণু মাখি।

উদয়ের পথে আমি চেয়ে কাঁদি, যবনিকা কাঁদে পিছে,
তারি পাশে কাঁদে কারা?
সাবধানে জ্বালি দীপালির আলো—সে আলোর শিখা মিছে
আলো ও আঁধার কাঁদিছে সংজ্ঞাহারা।

চোখের তারায় স্বপ্ন কুহেলী—দিবানিশি বারমাস
স্বপনের আলো জ্বালি,
আঁধার ঘরের কোণে ব'সে থাকি, বহু দুরাশার আশ
বুকের পাঁজরে যন্ত্রণা দেয় থালি।

স্বপনের ঘোরে সোনাদানা দেখি ঘরে নেই টাকাকড়ি
ভাঙা ঘরে জল পড়ে,
অনাগত দিনে তরুণ নিখিলে কল্পনা মনে গড়ি......
সারা দিন রাত দুনয়নে ধারা ঝরে।

জনসাধারণ কি লোকসংখ্যা হ্রাসের পক্ষপাতী?

শ্রীপ্রফুল্ল বিশ্বাস, এম এ

ভারতের জনসংখ্যা যে ভয়াবহ দ্রুততার সহিত বাড়িয়া চলিয়াছে, সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগরিকেরই কর্তব্য। জনসংখ্যা ১৯২১ সালে ৩১ কোটি হইতে ১৯৩১ সালে ৩৫ কোটি হইয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন যে, এখন ভারতের জনসংখ্যা ৪০ কোটির উপর। এ সমস্যা সম্বন্ধে যত আলোচনা ও অনুসন্ধান হওয়া দরকার, আমরা তাহা করি নাই। সামাজিক ও আর্থিক সমস্যা লইয়া আমরা গবেষণা করি, রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা লইয়া আমরা প্রত্যহ মাথা ঘামাই—কিন্তু এ সকল সমস্যার মূলে যে দেশের জনসংখ্যা, সে সম্বন্ধে আমরা ততটা সচেতন নই। জনসাধারণ ও বিশেষজ্ঞগণের মত গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক সভ্যদেশই তাহাদের নিজের জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই নীতি কার্যকরী করিতে শাসকমণ্ডলী যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে গভর্নমেন্টের একটি সুচিন্তিত মত দূরের কথা, দেশের শিক্ষিত ও ভদ্রসম্প্রদায়েরও এ সম্বন্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট স্বচ্ছ ধারণা নাই। আমাদের দেশে জনসংখ্যা সম্বন্ধে প্রচুর বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের অভাবও যথেষ্ট। পাশ্চাত্য দেশের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের দেশের জনমত সম্বন্ধে কি করিয়া একটি নির্ভরযোগ্য আঁচ পাওয়া যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধেই এই প্রবন্ধে একটু আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু এই জনমতের পরিচয় লাভ করা কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সহজ-সাধ্য নহে, এজন্য সর্বসাধারণের সহযোগিতার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক।

পাশ্চাত্য দেশেও আজ জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় চিন্তারাজ্যে বিপ্লব আসিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ জনবিদ্যাবিশারদ ম্যালথস মনে করিতেন যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করিলে অচিরেই পৃথিবীর খাদ্যসম্ভার লোকসংখ্যার অনুপাতে কমিয়া যাইবে। তখন হয় মহামারীতে মানুষ মরিতে থাকিবে, নতুবা খাদ্যাভাবে লোক দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হইবে। কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। কুজিনস্কি প্রভৃতি লোকবল বিশারদগণ ঠিক উহার বিপরীত নীতিই প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, জন্মহার পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে জন্মহার আর হ্রাস না করিয়া বিশেষজ্ঞগণ শ্বেতজাতীয় লোকদিগকে লোকসংখ্যা বাড়াইবার উপদেশ দিতেছেন। গত ১৬০ বৎসরে শ্বেত মনুষ্যেরা পাঁচগুণ বাড়িয়াছে, কিন্তু অশ্বেত জাতির লোকসংখ্যা আড়াই গুণও বাড়ে নাই।

নিম্নে ইউরোপের জনসংখ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই সকল দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগকে গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জগতের শ্বেত জাতির লোকসংখ্যা ছিল ১৫৫,০০০,০০০, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে উহা দাঁড়াইয়াছে ৭৩০, ০০০,০০০। কিন্তু এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির মুখ্য কারণ জন্মহার বৃদ্ধি নহে। মৃত্যুহার কমিয়াই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ হইয়াছে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে একজন শ্বেত ভদ্রলোকের গড়পড়তা জীবনকাল ছিল ৩০ বৎসর; বর্তমানে উহা বাড়িয়া ৬০ বৎসরে দাঁড়াইয়াছে। মৃত্যুহার যে পরিমাণে কমিয়াছে, জন্ম-হার সেই অনুপাতে বাড়িলে জনসংখ্যা আরও অনেক বাড়িয়া যাইত।

লোকসংখ্যা যে প্রত্যেক দেশে সমঅনুপাতে বাড়ে নাই, ইহার একটি উদাহরণ লওয়া যাউক। ১৭৭০ সালে পৃথিবীতে ইংরেজ জাতির লোকসংখ্যা ছিল ৮,০০০,০০০; আজ ওই সংখ্যা ১০ গুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু ফরাসী জাতির সংখ্যা মাত্র ২৫,০০০,০০০ হইতে ৫০,০০০, ০০০ বাড়িয়াছে। ফরাসী দেশে সন্তান সংখ্যা ইংলণ্ডের অপেক্ষা অনেক পূর্বেই কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দেই আমরা ওই দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের তীব্র সমালোচনা শুনিতে পাই। কিন্তু উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনায় জন্মশাসন কমে নাই, উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রত্যেক ফরাসী পরিবারেই সম্ভবত জন্মশাসন করিতেন। ইউরোপের অন্য কোনও দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ তখনও এমন ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় নাই। ১৮৮০ খৃঃ পর্যন্তও জন্মহার ইউরোপের কোনও দেশেই কমে নাই। ঐ সময় গড়পড়তা পূর্ব ইউরোপের প্রতি পরিবারে ৭.৮টি এবং ফরাসী ব্যতীত অন্যান্য দেশে গড়পড়তা ৫টি সন্তান জন্মগ্রহণ করিত। একমাত্র ফরাসী দেশেই প্রতি পরিবারের সন্তান সংখ্যা ৪-এর নীচে নামিয়া গিয়াছিল।

বিগত ৫০ বৎসরে জন্মহার বিশেষ করিয়া শ্বেত জাতির বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে। ইউরোপে বর্তমানে রাশিয়াতেই জন্মহার সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রতি পরিবারে গড়পড়তা ৫.৬টি করিয়া।

জন্মহার—

দেশের নাম	১৮৮১-৮৫	১৯৩৩
অস্ট্রিয়া	৩২.৯	১৩.৫
বেলজিয়াম	৩০.৯	১৫.৮
বুলগেরিয়া	৩৯.৪	২৭.৭
জেকোস্লোভাকিয়া	৩৫.১	১৮.৩
দেনমার্ক	৩২.৪	১৭.৬
ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	৩৩.৫	১৪.৭
আইরিশ ফ্রী স্টেট	২২.৯	১৯.৫
ফিনল্যাণ্ড	৩৫.৫	১৮.০
জার্মানি	৩৬.৮	১৭.৭
হল্যাণ্ড	৩৪.৮	২০.৪
ইটালি	৩৮.০	২৩.৩
পোলাণ্ড	৪১.৯	২৬.৩
অস্ট্রেলিয়া	৩৫.২	১৬.৭
নিউজিল্যাণ্ড	৩৬.৪	১৬.৫

ইউরোপের সকল দেশেই জন্মহার বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে। ইটালি ও জার্মান গভর্নমেণ্ট এজন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। ইটালিতে অবিবাহিত ও পুত্রহীন পিতাদিগকে অধিক কর দিতে হয়। সাতটির অধিক সন্তানের পিতাকে রাষ্ট্র হইতে অনেক সুবিধা প্রদান করা হয়। বস্তুত নানা প্রকার রাষ্ট্রিক সুবিধা প্রদান করিয়া ইটালিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবল চেষ্টা চলিয়াছে। এখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচার আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এত করিয়াও বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে না। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই আন্দোলন প্রথম আরম্ভের সময় বাৎসরিক জন্মসংখ্যা ছিল ১,০৯৫,০০০, কিন্তু ১৯৩১ হইতে উহা ক্রমাগত কমিয়া আসিয়া ১৯৩৬ দাঁড়াইয়াছে ৯৬০,০০০'তে।

জার্মানিও প্রায় সর্বাংশে ইটালির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছে। অধিকন্তু বিবাহেচ্ছু যুবক-যুবতীকে জার্মানিতে রাষ্ট্র হইতে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা আছে। তবে রাষ্ট্র অপেক্ষা নাগরিক-গণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তির উপরেই জার্মানি অধিক নির্ভর

করিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অত্যাধুনিক উপায় হিসাবে জার্মানি আইনবিগর্হিত প্রজননকেও উৎসাহ দিয়াছে। যাহা হউক, ইটালি ও অন্যান্য দেশ অপেক্ষা জার্মানি এদিকে ভাগ্যবান্। ১৯৩৩ সালের জন্মসংখ্যা ৯৭০,০০০ বাড়িয়া ১৯৩৬ সালে ১,২৪০,০০০ হইয়াছে।

আর এক দিক হইতে আমরা একটি প্রয়োজনীয় ও কৌতুকোদ্দীপক নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারি। যদি প্রতি মায়ের একটি করিয়া কন্যা থাকে, তবে পূর্বতন মাতার অভাব ওই কন্যা অনায়াসেই পূর্ণ করিতে পারে, তাহা হইলে জনসংখ্যাও স্থির থাকিবে। যদি মাতা দুইটি করিয়া কন্যা রাখিয়া যান, তবে জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিবে। অন্যপক্ষে একের অনধিক কন্যা থাকিলে জনসংখ্যা ক্রমেই কমের দিকে নামিতে থাকিবে। এই নিয়মানুসারে দেখা যায় যে, ইউরোপের অধিকাংশ দেশের ভাবী জননীর সংখ্যা একের কমের দিকে চলিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়া, বল্কান উপদ্বীপ ও পূর্ব-ইউরোপের কয়েক দেশ ব্যতীত অধিকাংশ দেশের জনন-হার একের কম।

আমাদের ভারতবর্ষ ও চীন প্রভৃতি পূর্ব দেশে জন্মহার পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা অধিক হইলেও, মৃত্যুহার অত্যন্ত অধিক। জাপানে মৃত্যুহার ও জন্মহার দুইই কমিয়া চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার ইউরোপের অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন তাহার জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গেলে, জনন-হার বাড়াইতে হইবে।

আমরা দেখিয়াছি যে, ১৭৭০ হইতে ১৯৩৩ পর্যন্ত শ্বেত জাতীয় জনসংখ্যা প্রয় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে বর্ণ জাতীর সংখ্যা ৬০০,০০০,০০০ হইতে ১,৪০০,০০০,০০০-য় দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ শ্বেত জাতীয় জনসংখ্যা পৃথিবীর ১/৫ হইতে ১/৩ এ বর্ধিত হইয়াছে।

ইউরোপের এই তথ্যের পশ্চাদ্‌ভূমিতে ভারতীয় জনসমস্যা সম্বন্ধে কতকগুলি সমস্যা ভাবিয়া দেখিবার আছে। প্রথমত, গত দেড়শত বৎসরে শ্বেত জাতির অসম্ভব রকম বংশ বৃদ্ধি সত্ত্বেও তাহারা সমষ্টিগত হিসাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী। সম্প্রতি কয়েক বৎসর পূর্বে এ সম্বন্ধে পার্লামেন্টেও বহু আলোচনা ইত্যাদি হইয়া গিয়াছে। বর্তমান যুগের জনৈক শ্রেষ্ঠ জনবলবিশারদ পণ্ডিত কুজিনিস্কিও জনসংখ্যা হ্রাসের বিপক্ষে। অন্যান্য অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরাও জনসাধারণের নিকট প্রশ্ন করিয়া ও নানা উপায়ে জন্মহার হ্রাসের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। টি এইচ মার্শাল চারটি প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির জবানবন্দী লইয়া এবং ৩৫২ জন পত্রপ্রেরকের পত্রের বিশ্লেষণ করিয়া পারিবারিক জন্মহ্রাসের অনেক কৌতুকজনক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। নর, নারী, বিবাহিত, অবিবাহিত সকলেই এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। এই সমস্ত পত্রের মর্ম হইতে মোটামুটি জন্মনিয়ন্ত্রণের কয়েকটি কারণকে প্রধান বলিয়া মনে হয়। প্রথমত, আর্থিক কারণ, আয়ের স্বল্পতা, চাকরির অস্থায়িত্ব, বেকার, জীবনযাত্রার মান কমিয়া যাওয়া ইত্যাদি নানা কারণে লোকে অধিক সন্তান চাহে না।

দ্বিতীয়ত, পিতামাতার, বিশেষত মাতার নিজের শারীরিক নিরাপত্তার জন্যও কেহ কেহ সন্তান কামনা করেন না। নার্শারি স্কুলের অভাব, নিজেদের ভ্রমণ অথবা আমোদ-প্রমোদের বিঘ্ন উৎপাদনকারী বলিয়া একাধিক পিতামাতা সন্তান জননের বিরোধী।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের উপযুক্ত সহানুভূতির অভাবও অনেকে জানাইয়াছেন। মাধ্যমিক স্কুলে সরকার হইতে পুষ্টিকর খাদ্য প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হয় না। অধিক সন্তানের পিতামাতাদের আয়কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় না। যুদ্ধের সময় তাহাদিগকে কামানের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত অনেকে আরও নানা প্রকার ছোটখাট অভিযোগ করিয়াছেন, তবে তাহাদের অধিকাংশই এই তিন শ্রেণীর যে কোনও একটার ভিতর ফেলা যায়।

গত কয়েক বৎসর হইতে আমাদের দেশেও জনসংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু ভারতের বিরাট জনসংখ্যা যে হারে দ্রুত বর্ধিত হইতেছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে আলোচনা আরও ব্যাপক ও গভীর হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সমস্যার দুইটি দিক আছে। একটি রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ সমষ্টিগত দৃষ্টিকোণ হইতে জনসংখ্যার বিচার। অন্যটি, ব্যক্তিগত পরিবারের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি করা উচিত কি না। প্রথমোক্ত দৃষ্টিকোণ হইতে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া থাকেন, কিন্তু শেষোক্তটির বিচার করিবার ভার জনসাধারণের। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, দেশের জনসংখ্যা বাড়িবে কি কমিবে, তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে দেশের অগণিত জনসাধারণের উপর। এই জনসাধারণের বিবেকবুদ্ধি তাহা অজ্ঞানতা আচ্ছন্ন হইলেও, জনসংখ্যা আলোচনার প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু যতদূর জানা যায়, এ পর্যন্ত আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জনসংখ্যা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মতামত জানিবার কোনও প্রচেষ্টা হয় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের ফলে আমাদের মধ্যে একদল জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। নানা প্রকার ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতি দ্বারাই ইঁহারা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহেন। অন্য পক্ষ ইহার ঘোর বিরোধী, তাঁহাদের মতে ইহা দ্বারা নৈতিক ও দৈহিক ঘোর অনিষ্ট সাধিত হয়। জনবল বিশেষজ্ঞ ও গভর্নমেণ্ট যে নীতিকেই বর্তমান অবস্থায় সুষ্ঠু বলিয়া গ্রহণ করুন না কেন, প্রবল জনমত তাঁহারা কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। কাজেই লোকসমস্যা সমাধান করিতে হইলে, সর্বাগ্রে আমাদের দেশের জনমতের সহিত অপরোক্ষ পরিচয় লাভ করিতে হইবে। এইজন্য আমি সমগ্র দেশবাসীর সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারা যদি নিম্নোক্ত প্রশ্নপত্রটির সমস্তগুলি প্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁহাদের স্বীয় মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া লেখকের নিকট জানান, তবে এ সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুব সহজ হইবে। নারী, বিশেষত, একাধিক সন্তানের জননীগণের মতামতকে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হইবে। প্রশ্নপত্র ব্যতীতও এই সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়েও সুধী জনসাধারণের মতামত সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে অতএব তাঁহারা যেন তাঁহাদের মত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন।

নন্দলাল বসু ও রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী

(কথানুকথন)

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

নন্দলাল বসুর জন্ম হয় ১৮৮২ খৃস্টাব্দের তিন ডিসেম্বর। কাজেই তিনি যখন পূর্ণবয়সের যুবক, তখন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষাধারার বিরাট আন্দোলন দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর জীবনে কোন যোগসূত্র ঘটেছিল কি না—এ কথা জানবার ইচ্ছা অনেকেরই মনে ওঠে। আলোচনা প্রসঙ্গে হঠাৎ একদিন তা জানবার সুযোগ মিলল।

নন্দলাল সেদিন গল্প বলছিলেন, তাঁর সময়ে কলকাতার ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের কি রকম অবস্থা ছিল, সাধারণত কি উদ্দেশ্য নিয়ে ছাত্ররা তখন ভর্তি হত এবং কি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথের একান্ত চেষ্টায় দু-তিনটি ছাত্রকে নিয়ে ভারতীয় শিল্পের কাজ কি ভাবে শুরু হয়েছিল। কথার পিঠে আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, "এই নতুন কাজে অবনীন্দ্রনাথ ও হ্যাভেল সাহেব ছাড়া আর কেউ আপনাদের উৎসাহ দিতেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, সিস্টার নিবেদিতা এবং ডাঃ জগদীশ বোসের কাছ থেকে আমরা খুব উৎসাহ পেয়েছিলুম। সেদিনের কথা আজও বেশ মনে আছে। ইণ্ডিয়ান আর্ট দেখবার জন্যে হঠাৎ একদিন আর্ট স্কুলে এসে হাজির হলেন সিস্টার নিবেদিতা, ডাঃ বোস আর গনেন মহারাজ। নিবেদিতা আমার আঁকা ছবি দেখে খুব খুশী হলেন। তখন দুখানা ছবি ছিল—একখানা কালীমূর্তি আর একখানা দশরথের মৃত্যুশয্যা। তিনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দশরথের মৃত্যুশয্যা' ছবিখানা আমাকে দেবে? আমি তা শুনে তো খুব খুশী। কেউ আমার ছবি নিতে চায়, এর চেয়ে খুশির কথা আর কি আছে? পয়সা কড়ি পাবার কথা তখন মনেই উঠত না। তিনি কালীর ছবিখানা পছন্দ করেন নি। আমি কালীকে কাপড় পরিয়েছিলুম। তিনি বলেছিলেন, কালীর বিষয়ে তুমি বুঝি ভাল করে পড়াশোনা না করে এঁকেছ? পড়ে আবার ভাল করে এঁক। আমার 'দশরথের মৃত্যুশয্যা' ছবিখানা আজও রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে আছে বোধ হয়।

"আরও একটা মজার ঘটনা হয়েছিল।" নন্দলাল বলতে লাগলেন, "পাখার ওপর সিল্কে আমি একটা ছবি এঁকেছিলুম—কৃষ্ণ ও সত্যভামা। সত্যভামার পা ধরে কৃষ্ণ যেন মান ভাঙাচ্ছেন। সেখানা দেখে নিবেদিতা খুব বিচলিত হয়েছিলেন। খুব জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেছিলেন, "এ রকম মেয়েলী ভাবের ছবি কখনো এঁক না, পুরুষ মেয়ের পায়ে ধরবে কি? তুমি বৈষ্ণবদের বিষয় নিয়ে ছবি এঁক না।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনার জীবনে সিস্টার নিবেদিতার কোন প্রভাব পড়েছে বলা যায় কি?"

উত্তরে তিনি বলতে লাগলেন, "প্রভাব মানে তিনি আমাদের উৎসাহ দিতেন। খুব তেজস্বিনী ছিলেন। বলতেন, 'দেখ, একদিন দেশে দেশে এই ইণ্ডিয়ান আর্টের এমন ডিম্যান্ড হবে যে, তোমরা যুগিয়ে উঠতে পারবে না।' তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল। তিনিই আমাদের প্রথম অজন্তায় পাঠান।"

—"কি ভাবে?"

—"লেডি হ্যারিংহ্যাম বলে একজন মহিলা আর্টিস্ট অজন্তায় যান। আমি আর অসিত তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলুম কপির কাজে তাঁকে সাহায্য করতে। দিন পনের পরে ওখানে গিয়ে হাজির হন ডাঃ বোস, সিস্টার নিবেদিতা আর গনেন মহারাজ। তখন আমাদের অবস্থা ভীষণ হয়ে উঠেছে। অজন্তায় খাবার কিছু মিলত না। রোজই প্রায় সামান্য বেগুনের তরকারী হত। খাওয়ার জুত না হওয়ায় আমরা দুজনে তখন দেশে ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম। সিস্টার নিবেদিতা আমাদের কথা শুনে দেশে যেতে বারণ করলেন। কত বোঝালেন, বললেন, 'দেখ, এ তোমাদের শুধু ব্যক্তিগত উপকার হচ্ছে না, একটা সারা দেশের উপকার হচ্ছে। না-হয় তোমরা একটু কষ্ট করেই থেকে যাও।' শেষে তিনি আমাদের দেখাশোনা করার জন্যে অভিভাবক হিসেবে গনেন মহারাজকে রেখে যান। এই অজন্তায় আমার জীবনে প্রথম একটা সংস্কার ভেঙে যায়। হিন্দু হয়ে মুসলমানের হাতে খাব—আপনা থেকে যেন মনে কেমন একটা ভাব আসত। ওখানে আমরা রান্নার জন্যে একটা হিন্দু চাকর রেখেছিলুম। সিস্টার নিবেদিতা বললেন, 'ওর বাজে রান্না খেয়ে তোমাদের কাজ নেই। লেডি হ্যারিংহ্যামের মুসলমান বাবুর্চিই তোমাদের রান্না করে দেবে।' অনেক কষ্টে সেদিন সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলুম।"

শান্তিনিকেতন কলাভবনের সামনের জমিতে যে প্রকাণ্ড ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি আছে, তার পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলুম। যেতে যেতে মাস্টারমশাই একটুখানি দাঁড়ালেন, এপাশে ওপাশে চোখ ফিরিয়ে মূর্তিটিকে দেখতে লাগলেন। তারপর কিছুদূরের ছাতিম গাছের গোড়ায় মাটির তৈরী বসবার বেদীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে একবার দেখা করতে গেছি। তাঁর কাছে ছোট একটা পেতলের ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি ছিল। সেটাকে নিয়ে এসে বললেন, বলতো কার মূর্তি? আমি জবাব দিলুম, কেন, বুদ্ধের মূর্তি। তিনি বললেন, না, হল না। স্বামীজীর মূর্তি। স্বামীজীকে তিনি যেমন গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন, তেমনি স্নেহ করতেন—শুধু দূর থেকে শ্রদ্ধা নয়। স্বামীজী তাঁর গুরু, তাঁর বন্ধু—তাঁর সব ছিলেন। স্বামীজীর কথা প্রায় বলতেন। কখনো কখনো দুঃখ করে বলতেন, তোমরা তাঁকে দেখ নি।"

কথা উঠল, "রামকৃষ্ণ-সাধকদের সঙ্গে আপনার কি খুব মেলামেশা ছিল।"

—"খুব নয়। তবে মাঝে মাঝে তাঁদের কারো কারো কাছে যেতুম। সিস্টার নিবেদিতার মারফৎ গনেন মহারাজের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁর মারফৎ আবার শরৎ মহারাজ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতির সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। তাঁরা দুজনেই চমৎকার লোক ছিলেন। শরৎ মহারাজের কাছে আমি মাঝে মাঝে যেতুম। তখন সন্ধেবেলা উদ্বোধনের বাড়ীতে একটা আড্ডা বসত। নাট্যকার ক্ষিরোদ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অনেকে যেতেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও কয়েকবার সেখানে দেখেছি। সেই আড্ডায় তামাক খেতে খেতে এঁদের সব চমৎকার আলোচনা চলত। আমি এক কোণে বসে চুপ করে শুনতুম। একদিন কথায় কথায় একজন কমবয়সের সন্ন্যাসী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটু কড়া মন্তব্য করেন। তিনি তখন বিদেশে—আমাদের দেশে খুব জোরে চলছে অসহযোগ আন্দোলন। সন্ন্যাসীটি বলেছিলেন, এ সময় কি কবির বিদেশে থাকা শোভা পায়, দেশে ফিরে এই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া কি তাঁর উচিত নয়? তাঁর কথা শেষ হবার আগেই শরৎ মহারাজ ধমকে উঠলেন, বললেন, না, কবির বিষয়ে যা তা বক না। তাঁর জাত আলাদা। তিনি বিশ্বজনের, যখন যেখানে যান সে দেশের কল্যাণের বাণী তাঁর মুখ দিয়ে বার হয়। কোন একটা দেশের গণ্ডী দিয়ে তাঁকে বাঁধা যায় না। লক্ষ্য করেছি, কবির সম্বন্ধে মিশনের অনেকেরই এমনি শ্রদ্ধা।"

নন্দলাল একটু থেমে কি যেন ভেবে নিয়ে আবার শুরু করলেন, "আমাদের কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কেউ কেউ স্বামীজীর সম্বন্ধে যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলেন না। তাঁদের কথা শুনে আমি ভাবি, জলহাওয়ার মত যাঁর দানে আমাদের চারিদিক ভরে আছে, তাঁকে শ্রদ্ধা করি আর না করি, তাতে তাঁর কি এসে যাবে? এই যে ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেকে বলেন, তিনি অশিক্ষিত ছিলেন। যাঁর এক কণা শক্তি পেয়ে চোখের সামনে স্বামীজীর মত মহাপুরুষের সৃষ্টি হতে পারে, তিনি ইংরেজীতে পণ্ডিত ছিলেন কি ছিলেন না, তাতে এসে গেল কি? তোমরা যে বই পড়, তার মধ্যে থাকে কি? চিন্তা তো? এঁদের মত লোকের মাথার মধ্যে যদি সেই চিন্তা থাকে, তবে আর তফাৎ কি রইল? এঁদের মাথা থেকে চিন্তাগুলো কাগজে রেকর্ড করলেই তো বই হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বেলায় তাই তো হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর মুখের কথা নিয়ে মোটা মোটা বই লেখা হচ্ছে।"

প্রশ্ন করলুম, "আপনি কি ছেলে বয়সে রামকৃষ্ণ ভক্তদের গণ্ডীর মধ্যে এসেছিলেন?"

—"না। সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে ওঁদের কারো সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। তবে ওঁদের লেখা বই ছেলে বয়স থেকেই পড়তুম।"

—"শরৎ মহারাজের কি শিল্পের ওপর খুব অনুরাগ ছিল? তাঁর সঙ্গে শিল্প সম্বন্ধে আপনি কি আলোচনা করতেন?" জিজ্ঞাসা করলুম।

নন্দলাল বললেন, "না, ওঁদের কারো সঙ্গে শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ করতুম না। তবে শরৎ মহারাজকে দু একবার কিছু প্রশ্ন করেছিলুম। একবারের কথা বলি। একটি চীনা কবি বলেছেন, চেরী ফুল কি সুন্দর, আমি কত জন্মের পর চেরী ফুল হয়ে জন্মাব? তা প'ড়ে আমি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, এ কেমন করে হল? আমরা তো জানি, ফুল জন্ম পার হয়ে তবে মানুষ জন্ম পাওয়া যায়। কবির প্রার্থনার ঠিক মানে কি? তিনি কি আবার পিছনের দিকে ফিরে যেতে চাইছেন। শরৎ মহারাজ প্রথম দিন কিছু বলেন নি, জবাব দিয়েছিলেন, ভেবে বলব। ঠাকুর বলতেন অবশ্য মানুষের চিন্তাই সব চেয়ে বড় চিন্তা, সেই জন্মই সব চেয়ে বড়। অথচ ইনি চাইছেন ফুল হতে! কিছুদিন পরে আমিই এ সমস্যার একটা সমাধান করে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হই, বলি যিনি ফুল হতে চাইছেন তিনি মানুষই। ফুল মানুষ হতে চায় নি। তা হলে মানুষই শ্রেষ্ঠ—মানুষের পক্ষেই এ চিন্তা করা সম্ভব হয়েছে।

"শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে কয়েকবার শিল্প সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়েছিল। শিল্পী হতে হলে কি গুণ থাকা চাই জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তাতে তিনি বলেছিলেন, দেখ, একবার খাটের নীচে একটা বিড়াল ঝগড়া করছিল, তা দেখে আমিও খাটের কাছে গিয়ে সেই রকম শব্দ করতে লাগলুম, মনে হল, আমি বিড়াল হয়ে গেছি। ভারি মজা হল। এই হল শিল্পীর গূঢ় কথা—বুঝলে?

"স্বামিজীর ভাই শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র দত্তের সঙ্গে শিল্প সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। তাঁর কাছে গেলে তিনি বল তো। আমরা যখন বলতুম, তিনি চুপ করে বসে শুনে যেতেন। তারপর আমাদের কথা শেষ হলে নানা প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে দিয়ে শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। শিল্পের তত্ত্বের দিকটার সম্বন্ধে তাঁর কাছে অনেক শিখেছি। শিল্পী না হয়েও শিল্পের নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় তিনি অনর্গল বলে যেতেন। অবাক হয়ে ভাবতুম, ঠাকুরের শিষ্যরা সত্যিই জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন।

"আর একবার আমার পরম বন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ মশায়ের সঙ্গে রাখাল মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) দেখতে বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়িতে গেছলুম। সঙ্গে আমার আঁকা একটি ছোট রাধার ছবি ছিল, সেটা দেখিয়েছিলুম। এটি শ্রীযুক্ত ও সি গাঙ্গুলীর কাছে আছে। মহারাজ ছবিটি দেখে মাথায় ঠেকালেন, বললেন, রাধার ছবি তো হল না, রাধা যে প্যাগলিনী হবে—সে ভাব তো হয় নি। যা হোক শিল্পের কাজ খুব উঁচুদরের কাজ, দেখ বাবা, মাথাটা ঠিক রেখ। ভাল খাওয়া দাওয়া কর। হাত দিয়ে মাথাটা দেখিয়ে বললেন, তা না হলে.........সব গুলিয়ে যাবে।

"এখন রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা আমায় বড় ভাল বাসেন এবং আমায় তাঁদের আত্মীয়ের মত দেখেন।"

সারা শান্তিনিকেতনের আশ্রম ছেয়ে সন্ধ্যার হাল্কা অন্ধকার নেবে আসছিল। ক্রমশ আমাদের আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে গড়িয়া গেল।

বিশ্বদৃষ্টির বাইরে

শ্রীঅমিয়া সেন

সুলতা প্রাণপণে খাটের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল, কান্নায় তার আকণ্ঠ বুজিয়া আসিতে চাহিতেছিল।

একটি বছর পনেরর মেয়ে তার খাটের পাশে দাঁড়াইয়া দুঃখিতস্বরে কহিল, "তা হ'লে তুমি যেতে পারবে না মাসী?" সুলতা স্বাভাবিক স্বরে উত্তর দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অশ্রুতে স্বর বিকৃত হইয়া গেল। কহিল, "না ডলি, দিদিকে বলবে, তিনি যেন কিছু মনে না করেন, পেটের ব্যথায় আমার শরীর ছিঁড়ে যাচ্ছে।"

ডলির সঙ্গে আরও ৩।৪টি মেয়ে আসিয়াছিল, তার সখী। ডলির বড় বোন মলির বিবাহ আজ। ডলিরা মহিলাদের নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়াছে। ডলিরা বাহির হইয়া গেলে পাশের ঘর হইতে চোরের মত নিঃশব্দে পা ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিল বরুণ।

সুলতা তখনও কাঁদিতেছে। বরুণ আসিয়া অসহায় মুখে তার পাশে বসিল, সুলতা একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, চাহিয়াই পাগলের মত বরুণের কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল "না, না,—আমি আর পারছি না, কিছুতেই আর সইতে পারছি না।"

আত্মগ্লানিতে বরুণের চোখেও জল আসিল, রুদ্ধস্বরে শুধু কহিল, "আমি অপদার্থ লতা, তাই—"

খোকা আর বেবি, ওদের ছেলেমেয়ে দুটি, বাইরে কোথায় যেন খেলা করিতেছিল। তাহারা ঘরে ঢুকিয়াই সহসা পিতা মাতার রোরুদ্যমান অবস্থা দেখিয়া বিষম চমকিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। খোকার বয়স সাত, বেবির তিন।

বরুণ ত্রস্ত হইয়া সুলতাকে কোলের উপর হইতে সরাইয়া দিল। বেবি ছুটিয়া আসিল। ছলছল চোখে বরুণের মুখপানে চাহিয়া কহিল, "বাবা, বাবা, মা কান্‌তে।" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

সুলতা চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। বেবিকে কোলে লইয়া কহিল, "কাঁদছ কেন লক্ষ্মী মেয়ে, খিদে পেয়েছে?"

বেবি মায়ের এই ভাবান্তরে সহসা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মফস্বল টাউনের একেবারে গ্রামঘেঁষা প্রান্তভাগে বরুণের বাড়ি। বরুণের বাবা ব্রজনাথবাবু এই শহরেরই খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে বি এ পাস করিয়া বরুণও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তার পর দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বরুণের বিবাহ দিয়া বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই স্বামী স্ত্রী দুইজনেই সংসারানভিজ্ঞ পুত্র, কিশোরী বধূ ও অবিবাহিতা কনিষ্ঠা কন্যা বিভাকে রাখিয়া পরপারের যাত্রী হইয়াছেন।

দুই হাতে আয় করিলেও ব্রজনাথবাবুর সঞ্চয়বুদ্ধি বা ভবিষ্যৎ চিন্তা ছিল না। সুতরাং তিনি যখন মারা গেলেন, তখন দেখা গেল, একখানি সুন্দর বাড়ি, বাড়ি ভরা মূল্যবান আসবাবপত্র এবং হাজার চারেক নগদ টাকা ছাড়া অতিরিক্ত তিনি কিছু রাখিয়া যান নাই। টাকাটি বিভার বিবাহ উপলক্ষে বরপণ জন্য ধরা ছিল। সে টাকা আর ঘরে ওঠে নাই। অর্ধেকের বেশী গিয়াছে ব্রজনাথবাবু ও তাঁর স্ত্রীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, বাকী দেড় হাজার বিভার বিবাহে পণ স্বরূপেই ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল্যবান আসবাবপত্রগুলিরও অধিকাংশ সেই সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে।

ব্রজনাথবাবুর মেয়ের বিবাহে, ভিতরের অবস্থা যাহাই হউক না কেন, বাহিরে ঘটা না করিলে মান থাকে না। কাজেই সেই বিবাহে বরুণের দেনার পরিমাণও হালকা হয় নাই, দেনা শোধ দিবার জন্য ও খরচ কমাইবার জন্য বরুণ পিতার প্রাসাদতুল্য বাড়ি বিক্রি করিয়া শহরের প্রান্তে একখানা সাধারণ বাসগৃহ কিনিয়া উঠিয়া আসিল। সেই হইতে এই সাত আট বৎসর পর্যন্ত চলিয়াছে তার অসহ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই। কর্মজীবনে বরুণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। সাত বৎসর পর্যন্ত তার শুধু নিয়মিত কোর্টে হাজিরা দেওয়াই সার হইতেছে।

সংসার চালায় সুলতা। তার উপর দিয়া কি যে ঝড় বহিয়া চলিয়াছে, তা বরুণও সব সময়ে জানিতে পারে না। একে একে মূল্যবান আসবাবপত্রগুলি গৃহ হইতে বিদায় লইয়াছে। সুলতার গায়ের গহনাগুলিও প্রায় সবই গিয়াছে। অতি সাধারণ দু-একটি গহনা ছাড়া তার গায়ে আর কিছুই নাই। এইরকম করিয়া সুলতা এতকাল সংসার চালাইয়াছে, লৌকিকতা সামাজিকতা যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বিখ্যাত ব্রজনাথবাবুর পরিবারের ভিতরের শোচনীয় ক্ষয়ের কথা বাহিরে এতকাল কেহ বিশেষ টের পায় নাই। কিন্তু আজ সুলতা একেবারেই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, তাই আজ নিজের বোনঝির বিবাহের নিমন্ত্রণ সে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। সামান্য কিছু যৌতুক দিবার সামর্থ্যও যে তার আজ নাই। অঙ্গের যা আভরণ একটু আধটু আছে, তা দিয়া সামাজিকতা রক্ষা করিতে গেলে, স্বামী সন্তানের মুখে ক্ষুধার সময়ে সুলতা কি তুলিয়া দিবে? এই লজ্জা আজ তার মনে বড় নিদারুণ হইয়াই বাজিতেছিল। দুঃখে ক্ষোভে আত্মগ্লানিতে সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাই যার উপর সে কোনও সময়েই ভরসা করিয়া নির্ভর করে নাই, সেই স্বামীকেই আজ একান্তভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। বেদনাহত চোখ দুটি

তুলিয়া শেষ আশায় সে স্বামীর মুখপানে চাহিয়াছিল, যদি সে কিছু উপায় করিতে পারে? সামাজিকতা বরঞ্চ বর্জন করিতে পারে, কিন্তু ভিক্ষা করিতে সে যে পারে না!

কোর্টের বেলা হইয়া আসিয়াছিল। সুলতা ক্ষণিকের জন্য দেহমন হইতে অবসাদটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ভাতে ভাত বসাইয়া দিল।

বাগানের কাঁচকলা সিদ্ধ আর বেগুন পোড়া দিয়া কয়েক গ্রাস ভাত কোন মতে গলাধঃকরণ করিয়া বরুণ উঠিয়া পড়িল। কিছুদিন হইতে এদের খাওয়ার উপকরণ এই রকমই হইতেছিল। পুকুরপাড়ের সংকীর্ণ জমিটুকুতে সুলতাই উদ্যোগী হইয়া কয়েকটি লঙ্কা, বেগুন, কলাগাছ লাগাইয়াছিল। আজ অসময়ে সেই সংক্ষিপ্ত কৃষিটুকুই তাদের কাজে লাগিতেছে।

কোর্টে যাইবার জন্য বাহির হইয়াও বরুণ কোর্টে গেল না। পথে বাহির হইয়াই তাহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কি লাভ এই নিয়মিত কোর্টে হাজিরা দেওয়ায়? শুধু ব্যর্থতা, শুধু জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা—আত্মার অবমাননা।

চলিতে চলিতে বরুণ জনবিরল একটি দিঘির পাড়ে অশথ গাছের তলায় গিয়া বসিল। মাথা হইতে হ্যাটটা ছুড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল, নিজের গায়ের সাহেবী পরিচ্ছদটির দিকে চাহিয়া বিতৃষ্ণায় তার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। বৃথাই সে এই ভূতের বোঝা এতকাল বহিয়া চলিয়াছে।

দিঘির এপারে এবং ওপারে বহুদূর ব্যাপিয়া মজুরদের বাস। আরও অনেক পরে গ্রাম অঞ্চল। চাষীদের বাসভূমি। সহসা বরুণ বিস্মিত হইয়া দেখিল, চাষী ও মজুরদের সম্মিলিত একটি দল সারিবদ্ধ হইয়া সম্মুখের দিকে আসিতেছে। আরও কাছে আসিলে বরুণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, এরা সব জমিদারের কাছে চলিয়াছে। বন্যা ও রোগের প্রকোপে এবার এরা সবাই হৃতসর্বস্ব। জমিদার যদি এ বছর অন্তত অর্ধেক খাজনাও না মাফ করেন তাহা হইলে এদের মৃত্যু ভিন্ন গতি নাই। তাহারা চলিয়া গেল।

তাহাদের দিকে চাহিয়া বরুণ আড়ষ্ট হইয়া গেল। কাপড় বলিয়া কাহারও পরনেই প্রায় কিছু নাই। এক-এক টুকরা নেকড়ার ফালি দিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছে। কিশোর কৃষকদের মুখের দিকে চাওয়া যায় না। ক্ষুধায় তাহাদের মুখ চুপসাইয়া গিয়াছে, কিন্তু যুবকদের চোখ জ্বলিতেছে নিরুপায় আক্রোশে, তারা যেন ভিতরে ভিতরে ফুঁশিয়া উঠিতেছে। কী শোচনীয় দুর্গতির ইতিহাস এদের সর্বাঙ্গে লেখা! বার মাসে কয়টি দিন এরা পেট ভরিয়া খাইতে পায়? অর্ধাশন, অনশন, দুঃখ দারিদ্র্য আর রোগের সঙ্গে লড়াই করিয়া ইহাদের জীবন কাটে। কিন্তু কোথায় গেল এরা আজ? অভাব যাহাদের ত্রিসীমায় ঘেঁষিতে পায় না, অন্ন যাহাদের কাছে দুর্লভ সামগ্রী নয়, সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে যাহারা প্রাপ্যের মতই গ্রহণ করে, সেই ধনিকের দুয়ারে আবেদন জানাইতে গেল এরা? কিন্তু কতবড় ভুল এ? হায় হায় এ দুর্মতি ওদের কেন হইল?

কিছুক্ষণের জন্য বরুণ নিজের চিন্তা ভুলিয়া গেল। তাহার মানসচক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল ধনিকের দুয়ারে ভিক্ষাপ্রার্থী দরিদ্রের দল। মালিকের দুয়ারে আবেদন প্রার্থী ভৃত্যের দল। কিন্তু কি পাইবে এরা? বরুণ যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইল, বুভুক্ষুদের কোলাহলে জমিদারের আরাম ভাঙিয়া যাইতেছে। পুনঃপুনঃ আদেশ সত্ত্বেও তাহারা চলিয়া যাইতেছে না—তাহারা প্রভুর দর্শন চায়। তার পর?

বেপরোয়া লাঠিবাজি। ওরা শান্তিভঙ্গ করিয়াছে, অসভ্যের মত চীৎকার করিয়াছে, বাড়ি চড়াও করিয়া অন্নের জন্য জুলুম করিয়াছে। ওরা খাইতে পায় না, তাহার জন্য কি মালিক দায়ী? সমস্ত জগত জুড়িয়া চলিয়াছে আজ এই এক অভিনয়। কাহারও বাড়িতে অন্নের গাদা পচিয়া নষ্ট হইতেছে, কেহ আঁস্তাকুড়ের পাত চাটিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। ধনী শিশুর খেলার সরঞ্জাম কিনিতে হাজার টাকা ব্যয় হইয়া যায়, অথচ তাহাদেরই চোখের সামনে কত দরিদ্রের শিশু অন্নাভাবে চিকিৎসাভাবে প্রাণ হারায়। বরুণের মন আপনাতে আপনি ক্রমশ অসহিষ্ণু হইয়া ওঠে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। নহিলে জগত ধ্বংস হইয়া যাইবে। কাহাদের রক্ত শোষণ করিয়া তখন মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণী বাঁচিয়া রহিবে?

কিন্তু কে আনিবে সেই বিপুল পরিবর্তন? যে আনিতে চাহিবে, বুর্জোআরা তাহাকে গলা টিপিয়া খুন করিবে। তাহারা পরিবর্তন চায় না, তাহারা জগতের গতিচক্র এই ভাবেই চালাইয়া যাইবে। দরিদ্রেরা রক্তবীজের ঝাড়, তাহারা মরিবে না, এমনিভাবে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াই তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিবে। ধনিকের বিলাসের উপকরণ যোগাইবে, নিজেদের দেহের রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া নিঙড়াইয়া তাহাদের জন্য মহার্ঘ খাদ্যের সংস্থান করিবে, তার পর নিজেদের হাতে তৈরী, অথচ দুষ্প্রাপ্য সেই খাদ্যের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃত্যুর নিকট আত্মসমর্পণ করিবে।

সূর্য কখন পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। বরুণ একভাবেই জলের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। সহসা একটি লোকের ত্রস্ত পাদক্ষেপে চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। লোকটির চোখে মুখে ভয়ের সুস্পষ্ট ছাপ।

বরুণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?" লোকটি দম লইবার জন্য দাঁড়াইল। এ সেই কৃষক অভিযানকারীদের একজন। নিম্নস্বরে কহিল, "জমিদার কথা শুনলে না বাবু, দারোয়ান দিয়ে লাঠিপেটা করেছে। আমি এক ফাঁকে পালিয়ে এসেছি।" বলিয়াই লোকটি হাঁপাইতে লাগিল।

হ্যাটটি কুড়াইয়া লইয়া বরুণ বাড়ির পথ ধরিল। লোকটির দিকে চাহিতেও তাহার ঘৃণা হইতেছিল। বিপদের সময় সঙ্গীদের ফেলিয়া যে পলাইয়া আসে, সে কুকুরেরও অধম।

কিন্তু, পথ চলিতে চলিতে তাহার এও মনে হইল মানুষের সর্ববিধ অধিকারে যাহারা বঞ্চিত হইয়া আছে, পদাঘাত যাহাদিগকে প্রাপ্যের মতই পিঠ পাতিয়া লইতে বাধ্য করা হয়, তাহাদের মনোবৃত্তি মনুষ্যোচিত থাকাটাই কি সবচেয়ে আশ্চর্য নয়?

বাড়ি আসিয়া বরুণ দেখিল, সুলতা কাঁথামুড়ি দিয়া

শুইয়া আছে। খোকা তার শিয়রে চুপ করিয়া বসিয়া। বেবি অদূরে মাটিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার ঘুমন্ত গায়ে ধূলি কাদা মাখা, হয়তো কাঁদিয়া কাঁদিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বরুণ ধড়াচূড়া না ছাড়িয়াই সুলতার শিয়রে গিয়া ডাকিল, "লতা, উঠবে না? বেলা যে নেই।"

খোকা ছলছল চোখে চাহিয়া কহিল, "মার অসুখ করেছে।"

উদ্‌বিগ্ন মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বরুণ সুলতার মুখের কাপড় সরাইয়া কপালে হাত দিল। জ্বরে গা পুড়িয়া যাইতেছে। ক্ষণিকের জন্য বরুণ অপ্রকৃতিস্থের মত তার জ্বরতপ্ত সুন্দর মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর আত্মসংবরণ করিয়া পোশাক বদলাইয়া বহুদিনের পুরনো হোমিওপ্যাথি গৃহ চিকিৎসার বাক্সটি খুলিয়া লইয়া বসিল।

কত দিন আগের কেনা ঔষধ প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে, আর কেনাও হয় নাই। তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও বরুণ তার প্রয়োজনীয় ঔষধটি পাইল না। বাক্সটি বন্ধ করিয়া সে সুলতার শিয়রে আসিয়া বসিল।

কিছুদিন হইতেই সুলতার শরীরটি বড় খারাপ যাইতেছিল। তার উপর এই খাটুনি, দুশ্চিন্তা। দিন যত গত হইতেছিল, ভবিষ্যৎ ততই বীভৎস মূর্তি ধরিয়া সম্মুখে আসিতেছিল। বরুণ নিষ্পলক দৃষ্টি মেলিয়া তাহার মুখ পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

বেলা শেষ হইল, সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক ঘিরিয়া নামিল, তবু বরুণ উঠিল না। তাহার সমস্ত চৈতন্য ভরিয়া যেন মৃত্যুর পদধ্বনি বাজিতেছিল। আর কি সুলতা বাঁচিবে? যদি না বাঁচে, বরুণ তাহা হইলে কি করিবে? বরুণ কি করিবে তা বরুণ জানে না, সুলতার ভার সে কোনওদিন নেয় নাই, সুলতাই তার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়া এতদিন বরুণের সংসার ধরিয়া রাখিয়াছে, দুই হাত বাড়াইয়া স্বামীকে অশেষ দুর্গতির হাত হইতে প্রাণপণে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

খোকা উঠিয়া ঘরে প্রদীপ জ্বালাইল, এতক্ষণ পরে বেবিও কাঁদিয়া উঠিয়া বসিল। খোকা ছুটিয়া আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র হাত দুইখানি দিয়া রোরুদ্যমান বেবিকে জড়াইয়া ধরিয়া শান্ত করিবার বৃথা প্রয়াস করিতে লাগিল।

এইবার বরুণকে উঠিতে হইল। বেবি ক্ষুধায় কাঁদিতেছে। রান্নাঘরে গিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া ল্যাম্প আনিয়া জ্বালাইতে গিয়া দেখিল, ল্যাম্পএ তেল নাই। তেলের বোতলও খালি। দুইদিন ধরিয়া সুলতা তেল আনাইতে পারে নাই। দোকানী ধারে আর জিনিস দিতে চায় না। ক্ষণকালের জন্য বরুণের চোখ ফাটিয়া জল আসিল। এত অভাব তার সংসারে কিন্তু তার সম্মুখে এত নগ্নভাবে তো ইহা কোনওদিন প্রকাশিত হয় নাই? হাঁড়িতে জল দেওয়া ভাত ছাড়া কিছুই ছিল না। এ ঘর হইতে প্রদীপ লইয়া বরুণ খোকা ও বেবিকে তাহাই নুন দিয়া খাওয়াইয়া ঘরে আসিল।

সুলতা চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে। বরুণ সাগ্রহে কাছে আসিয়া ডাকিল, "লতা!"

সুলতা ক্ষীণস্বরে কহিল, "কোথা গিয়েছিলে?"

"ওদের খাওয়াতে, তুমি একটু ভাল মনে করছ?"

সুলতা সে কথায় কান না দিয়া কহিল, "তুমি কি খাবে? আমিও উঠতে পারছি না।"

"আমি খাব না, আমার খিদে নেই, কিন্তু তুমি কি খাবে? বার্লি আছে ঘরে?" সুলতা হাসিল, মনে মনে ভাবিল, পয়সার জিনিস বিনা প্রয়োজনে ঘরে জমা থাকিবে? কহিল, "না, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ভাতের উপর জ্বর এসেছে, আমি কিছুই খাব না এখন। ভাবছি তোমার জন্য।"

বরুণ কহিল, "আমার একদম খিদে নেই।"

সুলতা নীরবে চোখ বুজিল। বেশী কথা বলিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না, সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা বোধ হইতেছিল।

সাত দিন পরে শেষ রাত্রে সুলতা চোখ মেলিল। শিয়রের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল, "রাত কত! এখনও তুমি বসে আছ?"

বরুণ ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াই রহিল, কোনও কথা কহিল না। সুলতা আবার কহিল, "কথা কইছ না যে? খোকা কই?"

বরুণ বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল, অস্পষ্টস্বরে কহিল, "খোকা ওঘরে ঘুমচ্ছে।"

সুলতা আশ্চর্য হইয়া কহিল, "অন্ধকারে একলা খোকা ওঘরে ঘুমচ্ছে? কী বলছ তুমি!"

বরুণ ব্যাকুল স্বরে কহিল, "বিশ্বাস কর, সে সত্যিই ঘুমচ্ছে।"

সুলতা বিস্মিত হইয়া ক্লান্ত চক্ষে তাহার মুখপানে খানিক তাকাইয়া রহিল। তার পর ক্ষীণ স্বর যথাসাধ্য উচ্চ করিয়া ডাকিল "খোকা, খোকা!"

বরুণ অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, দুই হাত পিছন দিকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ডেক না, তার ঘুম ভেঙে যাবে।"

স্বামীর মুখপানে চাহিয়া সুলতার মাথা কেমন করিয়া উঠিল, বিকারগ্রস্তের মত বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া আবার ডাকিল, "খোকা, খোকা—!"

"তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করছ না?" অসহায়ের মত বরুণ চারিদিকে চাহিল, তার চোখে জল টলটল করিতেছিল, প্রাণপণে নিজেকে সংবৃত করিতে করিতে সে দুর্বল স্বরে কহিল, "তোমার যে ভয়ানক অসুখ করেছিল, তাই খোকাকে এখানে শুতে দিই নি। কিন্তু তোমার গায়ের দিকে একবার চেয়ে দেখ লতা তোমার কানের দুলজোড়া আমি খুলে নিয়েছি, নইলে—" বরুণ একবার থামিল, ঠোঁট দুখানা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কহিল, "নইলে আমরা এ কয়দিন খেতে পাচ্ছিলাম না। আর—আর তোমার গলার হারটুকুও আমি খুলে নিয়েছি, তুমি তখন জ্বরে অজ্ঞান।"

সুলতা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিল,

তীব্রস্বরে কহিল, "আমায় ভোলাচ্ছ? খোকা কই? খোকা?"

বরুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, "খোকা ঘুমচ্ছে।"

অপরিসীম সন্দেহের দোলায় সুলতার রোগদুর্বল বুকখানা অত্যন্ত ধড়ফড় করিতে লাগিল। রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিল, "তুমি—তুমি মিথ্যে বলছ, খোকা নেই।"

বরুণ যেন তাহারই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল, "খোকা নেই—।"

সুলতা কাঁদিয়া বাণবিদ্ধ হরিণীর মত শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। —"কিসে গেল? কবে গেল?"

অশ্রু রুদ্ধ স্বরে বরুণ কহিল, "জলে ডুবে—"

"উঃ, বাপ আমার—!" ক্ষণিকের জন্য ফিরিয়া পাওয়া কণ্ঠ সুলতার চিরদিনের জন্য নীরব হইয়া গেল।

* * *

সুলতার চিতা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া গিয়াছে। তাহার সকল দুঃখ সকল অশান্তি চিতার আগুনে তাহার সঙ্গে ছাই হইয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বেবিকে বুকে চাপিয়া বরুণ একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া বসিয়াছিল।

শ্মশানবন্ধুরা সকলে ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। তাহাকে প্রাণপণ চেষ্টাতেও কেহ উঠাইতে পারে নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তার চোখ দিয়া এক বিন্দু জল পড়ে নাই। বজ্রাহতের মত সে শুধু আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

চার দিন আগে একা একা পুকুরে স্নান করিতে গিয়া খোকা জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। বরুণ তখন সুলতাকে লইয়াই অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। সুলতা যায় যায় অথচ হাতে একটি পয়সা নাই। কয়েক দিন আগে দুল জোড়া বিক্রী করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে টাকা সামান্যই পাইয়াছিল। ঘরের অত্যাবশ্যক কয়েকটা জিনিস কিনিতে ও সুলতার জন্য দুদিন ঔষধ আনিতেই সে টাকা শেষ হইয়া যায়। অনন্যোপায় হইয়া বরুণ জ্বরে অজ্ঞান সুলতার গলা হইতে তার শেষ সম্বল হার ছড়া খুলিয়া লইয়া বিক্রি করিয়াছে। মস্ত বড় লম্বা হার হইতে সুলতাই ইতিপূর্বে টুকরা টুকরা করিয়া বহু খণ্ড কাটিয়া লইয়া বিক্রী করিয়া স্বামী পুত্রের অন্ন সংস্থান করিয়াছিল। সন্তানের মা, খালি গলায় জল খাইতে নাই, সেইজন্য ছোট এক টুকরা গলায় রাখিয়াছিল।

কিন্তু তাহাও বরুণ খুলিয়া লইল। বাধ্য হইয়াই লইল, নহিলে সুলতা বাঁচে না। সুলতা না বাঁচিলে বরুণ বাঁচিবে না, বরুণের ছেলে মেয়ে বাঁচিবে না। হার বিক্রি করিয়া ডাক্তার আনিতে, আবার ডাক্তারের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ আনিতে তাহাকে অত্যন্ত ছুটাছুটি করিতে হইয়াছিল; ঘরের দিকে চাহিবারও অবসর তাহার ছিল না। এই ফাঁকেই খোকা চিরতরে সরিয়া পড়িয়াছে। বরুণ যখন খোঁজ পাইল, তখন খোকার সুকুমার দেহখানি ফুলিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে। সেদিনও বরুণ কাঁদিতে পারে নাই, সুলতার মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া ছিল, তবু সুলতা রহিল না, চলিয়া গেল। কিন্তু যাবার আগে পুত্রশোকের মর্মঘাতী শেল বুকে লইয়া গেল।

ভীরু বরুণ, দুর্বল বরুণ শেষ পর্যন্ত সুলতার কাছে আত্মগোপন করিতে পারিল না—সে যদি আর একটু সুষ্ঠু অভিনয় করিতে পারিত, তাহা হইলে হয়তো সুলতা বাঁচিত।

সন্ধ্যাকাশের রক্ত আভা ক্রমশ দিগন্তের বুকে মিলাইয়া যাইতেছে। বরুণ চিতার দিক হইতে মুখ তুলিয়া সেই দিকে চাহিল, এমনি এক সন্ধ্যায় বরুণ ঘরে ফিরিয়া দেখিয়াছিল, সুলতার জ্বর। সেই সন্ধ্যা আজ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ বরুণ সুলতার চিকিৎসার কথা ভাবিয়া, পথ্যের কথা ভাবিয়া পীড়িত হইতেছে না, সে চলিয়া গিয়াছে। উঃ—এমন অপদার্থেরও জগতে বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন হয়?

বরুণের চোখ জ্বলিয়া উঠিল দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে মনে মনে কহিল, এ অবিচার—ভয়ানক অবিচার! জগতে যাহারা কোনও কাজে লাগিবে না, হাত পা বিদ্যা বুদ্ধি থাকিতেও যাহারা পঙ্গু, তাহারা কেন বাঁচিয়া থাকিয়া পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করিবে!

"মা, মা গো—", বেবি কাঁদিয়া উঠিল।

বরুণ তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল, বুক তাহার জ্বলিয়া যাইতেছে, সে কাঁদিতে পারিতেছে না। সুলতা খোকা সুলতা, এক দিনের জন্যও সে তাহাদের সুখী করিতে পারে নাই, দুঃখের আগুনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া তাহাদের জীবন শেষ হইয়া গেল।

বেবি জাগিয়া বরুণের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, মা কই?"

নির্বাক বরুণ আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। বেবি কি দেখিল সেই জানে। কহিল, "তল বাবা আমলাও দাই।"

"ঠিক বলেছিস্ বেবি, চল্ আমরাও যাই, জগতে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের নয়।"

এতক্ষণ পরে তাহার চোখ ফাটিয়া দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বেদনার ধারা নামিয়া আসিল। সন্ধ্যার বিষণ্ণ পৃথিবী তাহার কানে কানে ডাকিয়া করুণ সুরে তাহারই কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া কহিল, "বেঁচে থাকার অধিকার তোমাদের নেই।"

আজ-কাল

গান্ধীয় অনুশাসন

গান্ধীজী যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্য চালাবার নৈতিক যৌক্তিকতা বোঝাবার জন্যে বড়লাটের কাছে যাচ্ছেন। এই তীর্থযাত্রার সময় নাকি পবিত্র অহিংসা এবং বিনীত আইন-পালনের নিশ্ছিদ্র আবহাওয়া থাকা দরকার। সেজন্যে ওয়ার্কিং কমিটি সমস্ত কংগ্রেস কমিটিকে এবং কংগ্রেসকর্মীকে সর্বপ্রকার আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এই আন্দোলন-বিরতি দ্বারা কংগ্রেসকর্মীদের ডিসিপ্লিনের একটা পরখও হবে। বড়লাটের সঙ্গে তত্ত্বালোচনার পর ডিক্টেটর গান্ধীজী ফিরে এসে তাঁর আদেশ দেবেন।

ডিক্টেটর গান্ধীজীর এই অভিপ্রায় এবং ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব বাহ্যত নৈতিক ভাবাপন্ন হলেও আসলে বাস্তব ভীতির ফলে উদ্ভূত হয়েছে। অটল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে টলাবার জন্যে কংগ্রেস নেতৃমণ্ডলী তথা গান্ধীজী একটা আন্দোলন করবার প্রয়োজন বোধ করছেন; অথচ আন্দোলন এবার তাঁর খুশী মতো থামিয়ে দেবার বাইরে চলে' যেতে পারে এই আশঙ্কা করে' তিনি সেটাকে অতি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখতে চান। সে জন্যে তিনি অনেক আগে থেকেই হিংসা, শৃঙ্খলাহানি, অসাধুতা ইত্যাদি নানা পাপাচারের কথা তুলে অধিকাংশ কর্মীকে আন্দোলন থেকে দূরে রাখবার জমি তৈরী করেছেন। এখন নিজেই নিজেকে প্রায় ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলে' জাহীর করছেন এবং সত্যাগ্রহের জনক ও সেনাপতি হিসেবে সকলের নির্বিচার বশ্যতা দাবী করছেন।

কিন্তু এততেও নিশ্চিন্ততা আসছে না। দুটো ঘটনায় তাঁর ও তাঁর পার্শ্বচরদের মনে নতুন করে' উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমটা ঘটেছে মালাবারে। গত ১৫ই তারিখে সেখানে বড়লাটের বিবৃতির এবং সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে পাঁচ জায়গায় ১৪৪ ধারা অমান্য করে' সভা হয়। কেরল প্রাদেশিক কংগ্রেসের নির্দেশেই এই প্রতিবাদ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। দুই জায়গায় পুলিশ গুলি চালায়, ফলে তিনজন নিহত হয়। জনতার আক্রমণে এক জায়গায় একজন দারোগা ও একজন কনস্টেবল্ মারা যায়। আইন অমান্য না করতে নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন এমনভাবে ১৪৪ ধারা ভাঙা হ'ল সে সম্বন্ধে তদন্ত করার ব্যবস্থা ওয়ার্কিং কমিটি করেছেন। তদন্ত হবে কেবল কংগ্রেসেরই আচরণ সম্বন্ধে।

দ্বিতীয় ঘটনা চলছে জওহরলালজীর স্বভূমি যুক্তপ্রদেশে। সেখানে কংগ্রেস সেবাদলের উপর গভর্ণমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে' নতুন নতুন সেবাদলের শিবির গঠন করা হচ্ছে; ফলে বহু লোক প্রত্যহ গ্রেপ্তার হচ্ছে। এ পর্যন্ত শতাধিক লোককে ধরা হয়েছে। জওহরলালজী এখন গান্ধীজীর দোহাই দিয়ে সেবা-দলকে নিরস্ত হতে বলেছেন এবং যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেসের জরুরী কমিটিও সেইরকম নির্দেশ দিয়েছেন।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, গান্ধীজী তাঁর দোতরফা রাজ-নীতির পক্ষে দেশের মেজাজকে সুবিধাজনক মনে করছেন না। সেই জন্যেই তিনি প্রাণপণে ব্রেক কষছেন। কংগ্রেস-সেক্রেটারী কৃপলানীজী এই মর্মে এক ফতোয়া দিয়েছেন যে, এ-আই-সি-সি ও ওয়ার্কিং কমিটির সদ্যগৃহীত প্রস্তাবগুলো ব্যাখ্যার জন্যে বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটি যে সভা ডাকবে তাতে যেন বাছাই-করা লোক দিয়ে বক্তৃতা দেওয়ানো হয় এবং কোনোক্রমে যুদ্ধবিরোধী কোনো প্রচারকার্য যেন সেখানে না চালানো হয়।

ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োগ

কলকাতায় গত ১৩ই এপ্রিল এক যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রমিকনেতা শ্রীবঙ্কিম মুখার্জী দেড় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

বাঙলায় ভারতরক্ষা আইনের বলে সরকারী দমননীতির প্রসার সম্পর্কে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু এক বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন—জুলাইএর মাঝ পর্যন্ত বাঙলায় ৯৮৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ১২৫ জনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে এবং ৩৮২ জনের উপর অন্যরকম নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে। ভারত-রক্ষা বিধান লঙ্ঘনের জন্যে ৩১৭ জনের কারাদণ্ড হয়েছে। অধিকাংশ আটক ব্যক্তির প্রতি বিচারাধীন আসামীর মতো ব্যবহার করা হচ্ছে; অনেককে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী করা হয়েছে। আটক কাউকেই কোনো ভাতা দেওয়া হবে না বলে' গভর্নমেণ্ট জানিয়েছেন। শ্রীযুক্ত বসু জনসাধারণকে এই ধরপাকড়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করতে আবেদন করেছেন।

পাঞ্জাবে কয়েকজন রাজবন্দী মণ্টগোমেরী জেলে অনশন করেছেন। ৬০ দিন অনশনের পর দুইজনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাঁদের বলপ্রয়োগে খাওয়ানো হয়েছে।

হিন্দু মহাসভা

বোম্বাইতে হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের প্রস্তাবে বড়লাট ও ভারত সচিবের ঘোষণায় ব্যক্ত মুসলিম লীগ তোষণ নীতির তীব্র নিন্দা করেছেন এবং লীগের পাকিস্থান পরিকল্পনায় গভর্নমেণ্টের অনুমোদন নেই একথা ঘোষণা করবার জন্যে দাবী জানিয়েছেন। বড়লাট ডাঃ মুঞ্জেকে সাক্ষাতে আগেই নাকি বলেছেন যে, ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র রচনার সময় মুসলিম লীগ পাকি-স্থান প্রস্তাব আনতে পারে, তাতে তিনি বাধা দেবেন না।

মুসলিম লীগ বড়লাটের শাসন পরিষদে দুটি এবং সমর পরামর্শ পরিষদে পাঁচটি আসন পাবে বলে' হিন্দু মহাসভা দাবী করেছেন যে, এই দুই পরিষদে হিন্দুদের যথাক্রমে ছয়টি ও পনেরটি আসন দিতে হবে।

* * *

পার্লামেণ্টের নতুন আইন অনুযায়ী এক রাজকীয় আদেশে বড়লাটকে জরুরী অবস্থায় বৃটিশ গভর্নমেণ্টের অনুমতি না নিয়েই কাজ চালাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভারতে বিমান আক্রমণ হলে ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে সকাল ৮টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে কিনা গভর্নমেণ্ট জানতে চেয়েছেন।

ইওরোপ

জার্মান অভিযান?

জার্মান অভিযান এখনো বৃটেনের উপর হয় নি। বৃটিশ

বিমানবহর ক্রমাগত জার্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের উপকূলের বন্দরগুলি (যেখান থেকে জার্মানদের অভিযানে যাত্রা করতে হবে) আক্রমণ করছে। এতে যে জার্মান অভিযান-ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এইরকম আক্রমণের মুখে এমন কি, আক্রমণ না চললেও কতদিন জার্মানীর পক্ষে সৈন্য ও সৈন্যবাহী জাহাজ সমবেত করে' রাখা সম্ভব হবে? এদিকে শীতও এসে পড়ল। ইতিমধ্যেই ইংলিশ চ্যানেলে ঝড় উঠছে। অথচ জার্মানী এখনো চুপচাপ। এতে অনেকে সন্দেহ করছে যে, হিটলার হয়তো অভিযান এ বছর স্থগিত রাখলেন।

বৃটেনের উপর বিমান-লড়াই জোর চলছে বটে, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, বৃটেনের প্রচুর ক্ষতি হলেও জার্মানী এখনো বৃটেনের আকাশে বিমান-আধিপত্য স্থাপন করতে পারে নি, অভিযানের পক্ষে যা করা একান্ত প্রয়োজন। মস্কোর এক পত্রিকা লিখেছে যে, শুধু বৃটেনের উপরই জার্মানীর বিমান-আধিপত্য স্থাপন করলে চলবে না, টেম্‌স্ মোহনা ও ডোভার এলাকায় নৌঘাটিগুলির উপরও বিমান-আধিপত্যের প্রয়োজন; কারণ বৃটেনের প্রধান শক্তি হচ্ছে নৌবাহিনী, সে নৌবাহিনী এখনো যুদ্ধে নামে নি।

বিমান আক্রমণ

তবে জার্মান বিমান হানা প্রবলভাবেই চলছে। দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ড ও লণ্ডনই হচ্ছে তার প্রধান লক্ষ্য। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে, সেপ্টেম্বরের প্রথম ১৫ দিনের মধ্যে বোমাবর্ষণে ২০০০ লোক মারা গেছে এবং ৮০০০ লোক আহত হয়েছে। লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রাবাসের উপর বোমা পড়েছে। একটি ছাত্র নিখোঁজ হয়েছে এবং তিনজন সামান্য আহত হয়েছে। ডোভার এলাকায় জার্মানরা আবার গোলাবর্ষণ করেছে।

বৃটিশ বিমানও জার্মানীর বিভিন্ন সামরিক কেন্দ্র ও বার্লিনে হানা দিয়েছে।

ইউরোপীয় কূটনীতি

জার্মান পররাষ্ট্র সচিব হের ফন রিবেণ্ট্রপ রোমে গিয়ে কাউণ্ট চানো ও মুসোলিনীর সঙ্গে সলাপরামর্শ করে' এসেছেন। এ নিয়ে নানারকম জল্পনা কল্পনা চলছে। বোঝা যাচ্ছে, জার্মানী ও ইতালী স্পেনকে যুদ্ধে নামাবার জন্যে খুব চাপ দিচ্ছে। স্পেন যুদ্ধ ঘোষণা করলেই স্পেনে যে সকল জার্মান সৈন্য আছে তারা জিব্রল্টার ছিনিয়ে নেবার জন্যে হানা দেবে। শীতকালে আফ্রিকায় অভিযানও রোম আলোচনার বিষয় হতে পারে। গোয়েরিং-এর পত্রিকা ঘোষণা করেছে যে, আফ্রিকাও ইওরোপের নতুন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। আলোচনা বল্কান নিয়েও হয়ে থাকতে পারে।

বুলগেরিয়ান সৈন্যেরা হস্তান্তরিত দক্ষিণ দোব্রুজা দখল করেছে। অধিবাসীরা তাদের বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। রুমানিয়া ট্রান্সিলভেনিয়ায় হাঙ্গারীয়ানদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ করেছে; হাঙ্গারী সে অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

মিশর ও সিরিয়া

মিশরে ইতালীয় সৈন্যেরা ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। বৃটিশ বিমানবহর এবং সমুদ্র থেকে বৃটিশ নৌবাহিনী তাদের বাধা দিচ্ছে। ইতালীয় আক্রমণ নিয়ে মিশরী মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটেছে। পুরনো মন্ত্রিসভার কয়েকজন মন্ত্রী অবিলম্বে ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু অন্য মন্ত্রীরা একমত না হওয়ায় তাঁরা পদত্যাগ করেন। নতুন মন্ত্রিসভা এখন কিছু না করে' অবস্থা লক্ষ্য করতে চান।

বৃটিশ বিমান ও রণতরী ইতালীয় দোদেকানীজ দ্বীপপুঞ্জের উপর আক্রমণ চালিয়ে যথেষ্ট ক্ষতি করেছে।

ইতালীয় যুদ্ধবিরতি কমিশন সিরিয়াতে যাওয়ায় সিরিয়ার পক্ষে নতুন বিপদের আশংকা দেখা দিয়েছে। ইতালী সিরিয়াকে ফ্রান্সের কাছ থেকে দখল করে' নিতে চায়, এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে। ইরাক গভর্নমেণ্ট এখন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন বলে' জানা যায়। তাঁরা ভিশি গভর্নমেণ্টের কাছে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন যে, সিরিয়ায় নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হোক এবং সিরিয়াবাসীর স্বার্থ যথোচিত রক্ষা করা হোক।

পূর্ব এশিয়া

জাপান গত রবিবার রাত্রি ১২টা পর্যন্ত মেয়াদের এক ৭২ ঘণ্টার চরমপত্র ফরাসী ইন্দোচীনকে দিয়েছিল। কিন্তু চরমপত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সে ইন্দোচীন আক্রমণ করে। ফরাসীরা দুই ঘণ্টাকাল তাদের বাধা দেয়। কিন্তু তারপর সন্ধি হয়ে যায়। জাপ গভর্নমেণ্ট ও ফরাসী গভর্নমেণ্টের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়াতেই এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। চুক্তিতে ফরাসী গভর্নমেণ্ট জাপানের সমস্ত দাবীই কার্যত মেনে নেন "পূর্ব এশিয়ায় নতুন ব্যবস্থা"র জন্যে দরদে। জাপানীরা টংকিং-এ বিমান ঘাঁটি পাবে এবং সে ঘাঁটিগুলি রক্ষার জন্যে ৬০০০ সৈন্য রাখতে পারবে, দক্ষিণ চীন থেকে জাপ সৈন্যেরা একটা নির্দিষ্ট পথে ইন্দোচীনের মধ্য দিয়ে যেতে পারবে এবং হাইফং-এ নির্দিষ্ট-সংখ্যক জাপ সৈন্য অবতরণ ও অবস্থান করতে পারবে।

এই রকম অবস্থা সৃষ্টির আশংকা করে' চীন ইন্দোচীন সীমান্তে বহু সৈন্য মোতায়েন করেছিল; তারা এখনো ইন্দোচীনে প্রবেশ করে নি; তবে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা প্রধান ঘাঁটিগুলো দখল করবার সংকল্প প্রকাশ করেছে। সুতরাং এখনো কিছুকাল ইন্দোচীনে হাঙ্গামা চলবে।

মার্কিন ও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কি করবেন তা জানা যায় নি।

২৩।৯।৪০

—ওয়াকিবহাল

রংগমহলে "মালা রায়"

অনেক চিরন্তন সত্যের মধ্যে একটি সত্য এই যে, রঙ্গালয় জাতীয় জীবনের যথার্থ প্রতিচ্ছবি। কিন্তু আজকালকার বাঙলা থিয়েটারে যে অরাজকতা এবং স্বেচ্ছাচার ক্রমশ দুর্দমনীয়রূপে দেখা দিতেছে, তাহাতে আমরা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উঠিতেছি। যাঁহারা থিয়েটারের ভাগ্যবিধাতা (নাটকনির্বাচক, স্বত্বাধিকারী এবং প্রযোজক- অনেক ক্ষেত্রেই ইঁহারা অভিন্ন), তাঁহারা বারম্বার তাঁহাদের রুচি ও বিচারবোধ সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা করিবার সুযোগ দিতেছেন। কদাচিৎ দুই একখানি নাটক হয়ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, (এবং তাহা নিতান্তই আকস্মিক কারণে) কিন্তু সত্যকার রসিক দর্শক বহুদিন বিশুদ্ধ মনীষা-সঞ্জাত রসোত্তীর্ণ নাট্যাভিনয় দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

বর্তমানে 'রঙমহল' থিয়েটারে **'মালা রায়'** নামে যে তথাকথিত নাটকটি অভিনীত হইতেছে, তাহার কথাবস্তুর মধ্যে অক্ষম লেখকের যে অশিক্ষিত-পটুত্ব বিকৃত কল্প-কামনার লীলা-বিলাস, নাট্যরচনার বর্ণজ্ঞানহীনতা, কাহিনীর গঠন-কৌশলে হাস্যকর দুর্বলতা, কিম্ভূতকিমাকার কতকগুলি অপরিণত চরিত্রের সমাবেশ এবং সস্তা বাহাদুরির পরিচায়ক কদর্য, কুরুচিপূর্ণ সংলাপের পরিচয় পাইয়াছি, তাহা আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছে।

নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনধিকারী এই সব লেখকের এই স্পর্ধিত স্বৈরাচার দমন করিবার কি কোনও উপায় নাই?

মিঃ সেনের জারজ কন্যা মালাকে (যে-মালা নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে মামাবাবু(!) বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিতেছে এবং সর্বশেষ দৃশ্যে নিতান্তই নাট্যকারের খেয়ালে তাঁহাকে বাবারূপে জানিবার পর একটি প্রচণ্ড দেড় পৃষ্ঠা ব্যাপী বক্তৃতা করিয়া বাবাকে গালাগালি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে) পাইবার জন্য তাহার মৃত স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু অপরূপের উন্মত্ত সারমেয়সুলভ কাঙালপনা এই নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দূষিত ক্ষতের মতো ফুটিয়া রহিয়াছে। মাঝে-মাঝে রহস্যকর করিবার হাস্যকর চেষ্টায় অর্থহীনভাবে নিতান্ত অকারণেই একটি বেদেনী আসিয়া মালাকে লইয়া খানিকটা ছিনি-মিনি খেলিয়া চলিয়া গেল। কোথাও নাটকের ক্ষুরধার, অবশ্যম্ভাবী গতিবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই এবং অনিবার্য ঘটনাস্রোত নিয়ন্ত্রিত হয় নাই।

নারীজাতি সম্বন্ধে এমন সব আপত্তিকর সংলাপ এই **'মালা রায়ে'র** পাত্রপাত্রীর মুখে যেখানে সেখানে লেখক দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার অন্তরের বিজাতীয় ঘৃণা ও উন্মত্ত উল্লাস বিকৃতরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বস্তুত, এই **'মালা রায়'** হইয়াছে একটি যৌন-যন্ত্রণা-জর্জরিত জীবনের শ্রদ্ধাহীন, লজ্জাহীন এবং শক্তিহীন অভিব্যক্তি।

এইরূপ কুরুচিপূর্ণ, কুরচিত নাটক যিনি বা যাঁহারা মঞ্চস্থ করিয়াছেন, সেই স্বত্বাধিকারী ও প্রযোজকের যে সামান্যতম রসবোধ নাই, একথা বলা বোধ করি অনাবশ্যক এবং (যদিও পুলিশের আইনকে খুব ন্যাকামিপূর্ণ কৌশলে লেখক ফাঁকি দিতে পারিয়াছেন) সাহিত্যের রুচি ও রসবোধের আদর্শকে ক্ষুন্ন করিয়া এই জাতীয় আরও দুই একখানি নাটক অভিনীত হইলে বাঙলা-রঙ্গালয়ের অবস্থা একেবারে চরমে গিয়া পৌঁছিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লিখিতে হইতেছে যে, **এই 'মালা রায়'** নাটকে জননী, ভগিনী, জায়া ও কন্যার জাতি সম্বন্ধে **যে উদ্ধত** লেখনীর শ্লীলতাহীন রুচিভঙ্গির পরিচয় স্পষ্ট **হইয়া উঠিয়াছে,** তাহাতে সুরুচিসম্পন্ন নির্মলচিত্ত ভদ্র দর্শকমাত্রই মর্মাহত **হইবেন,** এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মালা রায় নাটকই হয় নাই, অন্তত যাহাদের সামান্য বিদ্যা-বুদ্ধি আছে, তাহারা নাটক বলিয়া **ভ্রম করিতেও পারেন না।** এই playটি পূর্বে মঞ্চস্থ হইবার উপক্রম হইয়া **বন্ধ হইয়া যায়** এবং পরে বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় **মঞ্চস্থ হইল।** ইহার পশ্চাতে কোন রহস্য রহিয়াছে, তাহা দর্শকগণ **অভিনয়** দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন। নরেশবাবু **এই** কিম্ভূত-কিমাকার কাহিনীটি যে পরিশ্রম করিয়া playরূপে দাঁড় করিয়াছেন, তাঁহাতে তাহার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পিগণও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তবে "খাতিরের" মাহাত্ম্যে **সকল** চেষ্টা ও পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে।

প্যারাডাইস সিনেমায়—"সাধু জ্ঞানেশ্বর"

ছয় শত বৎসর পূর্বে মহারাষ্ট্র দেশের সর্বজনপূজ্য

"সাধু জ্ঞানেশ্বর" চিত্রে সাহু মোদক

মহাপুরুষ সাধু জ্ঞানেশ্বর প্রেমের বাণী প্রচার করিয়া সমাজের উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্রকে সাম্য ও মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বালক বয়স হইতে সমাজের অত্যাচার দারিদ্র্যের নিপীড়ন ও মানুষের গঞ্জনার মধ্যে সংগ্রামরত একটি জীবন কী ভাবে ভাগবতের অমৃত-বাণী আর হরিনামের জয়গানে সমগ্র

দেশকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই ভক্তিরসাপ্লুত মধুর কাহিনী বালক যশোবন্ত ও যুবক সাহু মোদকের অভিনয় নৈপুণ্যে ও অপূর্ব সংগীত মাধুর্যে এই চিত্রে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সাধু জ্ঞানেশ্বরের শৈশব জীবনের ভূমিকায় যশোবন্তর অভিনয় এই চিত্রের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। অল্প বয়সের এই কিশোর বালকটি অত্যন্ত কঠিন ভূমিকায় সহজ স্বাভাবিক ও প্রাণস্পর্শী অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার বাচনভঙ্গি, ভাব ব্যঞ্জনা ও কণ্ঠমাধুর্য সহজেই মনকে আকর্ষণ করে—কেবল তাহাই নহে, সমবেদনা ও ভক্তিতে নয়ন বাষ্পাকুল হইয়া উঠে। একদিক দিয়া যুবক বয়সে জ্ঞানেশ্বরের ভূমিকায় সাহু মোদকের অভিনয়ের তুলনায় বালক জ্ঞানেশ্বরের ভূমিকায় যশোবন্তের অভিনয় যেমন কঠিন, তেমনি নৈপুণ্যের সহিত তাহা তিনি ফুটাইয়াছেন।

'সাধু জ্ঞানেশ্বর' চিত্রে গানের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি, প্রায় পনেরোটি, কিন্তু কাহিনীর সূত্রটিকে তাহা কোথাও ঢিলা করে নাই। উপরন্তু প্রত্যেকটি গানেই মহারাষ্ট্র দেশীয় পল্লীসংগীতের একটি খাঁটি আমেজ রহিয়াছে বলিয়া আগাগোড়া তাহা মধুর আবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। এই চিত্রে জনতার দৃশ্যগুলি উপভোগ্য। নগরীর পথে ভক্তি-ভাবোন্মত্ত নরনারীর দলে দলে খোল করতাল বাজাইয়া গোপাল-গোবিন্দ গান গাহিয়া চলা, যোগীরাজ চাঙ্গদেবের ভক্তদের শঙ্খ শিঙ্গা ও ডম্বরু বাজাইয়া বিরাট শোভা-যাত্রায় বাহির হওয়া—এই চিত্রটিকে জমাট ও জমকালো করিয়াছে।

কিন্তু এই চিত্রের যে দিকটি আমাদের বিসদৃশ বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা হইতেছে ইহার অলৌকিক ঘটনাগুলি। মাত্র ছয়শত বৎসর পূর্বের কথা, সাধু জ্ঞানেশ্বর ছিলেন আমাদেরই সমাজে আমাদের মতই রক্তমাংসে গড়া মানুষ, সুখ দুঃখ আশা নিরাশার মধ্য দিয়াই বড়ো হইয়াছিলেন। ইহা পৌরাণিক কাহিনী নহে, ইতিহাসের সত্য সাক্ষ্য ইহাতে রহিয়াছে। কিন্তু মহিষের মুখে ভাগবত পাঠ, অথবা ভ্রাতা ভগ্নী সহ জ্ঞানেশ্বরের দেয়ালে বসিয়া শূন্যে উড়িয়া যাওয়া, চাঙ্গদেবের মাটি ফুঁড়িয়া শূন্যে আবির্ভূত হওয়া এবং জ্ঞানেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার পথে বড় বড় গাছগুলির আপনা হইতেই সরিয়া রাস্তা করিয়া দেওয়া—এই সব অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলি এই কাহিনীর রসের দিকটা খর্ব করিয়াছে। অন্ধ ভক্তি ও বিশ্বাস লইয়া যে সকল অশিক্ষিত দর্শক এই ছবি দেখিবেন তাহাদের নিকট এই সব অলৌকিক ঘটনার ক্যামেরা ট্রিকসগুলি প্রচুর হাততালি পাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু রসবোধসম্পন্ন বাঙালী দর্শকবৃন্দ ইহা দেখিয়া উচ্চহাস্য করিবেন মাত্র। চাঙ্গদেব ১৪০০ বৎসরের লোক বলিয়া তাঁহাকে আমাদের বিশ্বাস হয় না; জ্ঞানেশ্বর যে মুহূর্তে মহিষের মুখে ভাগবত পড়াইলেন তখনই তাহাকে আমাদেরই একজন বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না, নিতান্ত অনাত্মীয়র মতই তাঁহাকে অবিশ্বাস্যের কোঠায় ফেলিয়া দিলাম। 'চণ্ডীদাস' চিত্রের কাহিনীতে বাস্তবের যোগ ছিল, অসম্ভব ও অলৌকিক ঘটনায় সে কাহিনী ভারাক্রান্ত করিয়া তোলা হয় নাই বলিয়াই তাহা সকল শ্রেণীর দর্শককে অভিভূত করিতে পারিয়াছিল। 'সাধু জ্ঞানেশ্বর' চিত্রে এই সকল অলৌকিক ঘটনা বাদ দিলে জ্ঞানদেবের প্রতি ভক্তি আমাদের কিছু কম হইত তাহা নহে, উপরন্তু তাঁহাকে আপন আত্মীয়ের মত মনে করিয়া গভীর তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতাম।

সাহিত্য সংবাদ

আবৃত্তি, রচনা ও গল্প প্রতিযোগিতা

আবৃত্তি। সাধারণের জন্য।—রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়' (চয়নিকা ও মহুয়া দ্রষ্টব্য)। ১ম ও ২য় পুরস্কার—যথাক্রমে—ধিমান মেমোরিয়্যাল চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি রৌপ্য পদক। স্কুলের ছাত্রদের জন্য।—রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' (চয়নিকা ও উৎসর্গ দ্রষ্টব্য)। ১ম ও ২য় পুরস্কার—যথাক্রমে আশালতা মেমোরিয়্যাল চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি রৌপ্য পদক।

প্রতিযোগিতার সময় ও স্থান—৩ নভেম্বর বেলা ২টা। কুণ্ডুগড়, ৮২, মুনশী জেলার রহিম লেন (নন্দীবাগান), শালকিয়া, হাওড়া।

রচনা। সাধারণের জন্য।—'ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার পক্ষে বাঙলা ভাষার উপযোগিতা'। ১ম ও ২য় পুরস্কার—যথাক্রমে বসুমতী মেমোরিয়্যাল চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও একটি রৌপ্য পদক। স্কুলের ছাত্রদের জন্য। —'ভারতের উন্নতি সাধনে ছাত্রদের কর্তব্য'। ১ম পুরস্কার—বসন্তকুমারী মেমোরিয়্যাল চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও একটি রৌপ্য পদক, ২য় পুরস্কার—একটি রৌপ্য পদক।

গল্প। সাধারণের জন্য।—একটি ছোট গল্প (ছাত্রদের পাঠোপযোগী)। ১ম পুরস্কার—রায় অতুলচন্দ্র মেমোরিয়্যাল চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি রৌপ্য পদক, ২য় পুরস্কার—পুস্তক।

গল্প কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিয়া ১৫ নভেম্বরের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সম্পাদক, স্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরি,
৩৫৪, জি টি রোড, শালকিয়া পোঃ (হাওড়া)

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের মৃত্যু হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান আর হইবে না এই ধারণাই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের খেলাধুলা পরিচালকগণের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। তাঁহারা সকলেই বলিতেছেন "বার্লিন অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ইহার সমাধি দেওয়া হইয়াছে। জার্মান জাতিই ইহার জন্য দায়ী।" এই কথা কতদূর সত্য তাহা আলোচ্য বিষয় নহে। বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান পুনর্বার হইবার যে সম্ভাবনা খুবই কম এই বিষয় আমাদেরও কোন সন্দেহ নাই। সমস্ত ইউরোপ সমরানলে প্রজ্বলিত। আমেরিকা এই সমরানলে ইন্ধন যোগাইবার জন্য সমরের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতে ব্যস্ত। এশিয়ায় জাপান চীনদেশকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর। আফ্রিকা ইটালীর অত্যাচারে বিপর্যস্ত। ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ ইউরোপের মহাসমরে সাহায্য করিতে ব্যস্ত। বিশ্বভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এই যে জিঘাংসার রূপ মূর্ত হইয়া দেখা দিয়াছে ইহার অবসান যে কবে হইবে কেহই বলিতে পারে না। অবসান হইলেও শীঘ্রই যে সারা পৃথিবীময় বিভিন্ন জাতি ও দেশের জনসাধারণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই। সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা না হইলে বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান হইতে পারে না। ক্যানাডার বিখ্যাত আমেরিকান এ্যাথলীট ও ব্যায়াম শিক্ষক লসন রবার্টসন অতি দুঃখেই সেদিন বলিয়াছেন, "বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান দেখা আর আমাদের ভাগ্যে নাই। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা কেবল এ্যাথলেটিকস্ ও বিভিন্ন ব্যায়াম প্রতিযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। সকল ব্যায়াম প্রতিযোগিতার একত্র সমাবেশ আর হইবে না এই সকল অনুষ্ঠানেও সারা পৃথিবীর ব্যায়ামবীরগণ যোগদান করিবেন না। বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান পুনরায় কবে হইবে বলা খুবই কঠিন। এই বিশ্বব্যাপী সমরানলের ফলে কতকগুলি দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইবে তাহার জন্য বহু বৎসর এই সকল দেশ কোনরূপে বিরাট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে না।" ইহা যদি সত্যই হয় তবে, বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের "মৃত্যু হইয়াছে" এই কথা বলিলে কোনরূপ অন্যায় করা হইবে না।

বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জ্যাক ডেম্পসী

সম্প্রতি আমেরিকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভূতপূর্ব বিশ্ব বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জ্যাক ডেম্পসী পুনরায় ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহার বর্তমান বয়স ৪৫ বৎসর। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি মনে করেন যে বর্তমানের চ্যাম্পিয়ান জো লুইর সহিত লড়িবার মত শক্তি তাঁহার আছে। তিনি মনে করেন বর্তমানের মুষ্টিযোদ্ধাগণ কৌশলের কিছুই জানেন না। দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা সাফল্য অর্জন করিতেছেন। সুতরাং তিনি কৌশলের বলে বর্তমানের মুষ্টিযোদ্ধাগণকে পরাজিত করিতে পারিবেন। তাঁহার এই ধারণা কতদূর সত্য তাহা শীঘ্রই প্রমাণিত হইবে। জো লুইকে তাঁহার বিরুদ্ধে খাড়া করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। জ্যাক ডেম্পসীর ম্যানেজার মিঃ ম্যাক্স ডয়াক্সম্যানের উক্তি হইতে জানা যায় যে, প্রথমেই ডেম্পসী জো লুইর সহিত লড়িবেন না। প্রথমে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর মুষ্টিযোদ্ধাদের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিবেন এবং তাহাতে যদি সাফল্যলাভ করেন তবেই জো লুইর সহিত লড়িতে পারেন। কারণ, জিম জেফ্রিস হঠাৎ জ্যাক জনসনের সহিত দীর্ঘ অবসর গ্রহণের পর লড়িয়া যে ভুল করিয়াছিলেন সেইরূপ ভুল করিবেন না। স্মরণ থাকিবে ১৯২৭ সালে জ্যাক ডেম্পসী ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি জিনি টুনীর নিকট পরাজিত হন। ইহার পর ১৯৩৬ সালে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নির্বাচনের সময় তিনি কয়েকটি প্রদর্শনী মুষ্টিযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ইহা ছাড়া জ্যাক ডেম্পসীকে কোন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে দেখা যায় নাই।

উৎসাহ জাগিল কেন?

জ্যাক ডেম্পসীর ১৩ বৎসর পরে পুনর্বার কেন ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার উৎসাহ জাগিল এই বিষয় এক গল্প শুনিতে পাওয়া হইতেছে। ডেম্পসী একটি মল্লযুদ্ধের রেফারীর কার্য করিতেছিলেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টেক্সাসের ক্লারেন্স লুট্রেল ছিলেন। তিনি ডেম্পসীর নির্দেশের প্রতিবাদ করেন। ফলে লুট্রেলের সহিত ডেম্পসীর কথা কাটাকাটি পরে হাতাহাতি হয়। ইহার পর ডেম্পসী লুট্রেলকে এ্যাটল্যাণ্টায় এক প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় রাউণ্ডেই ভূতলশায়ী করেন লুট্রেল বর্তমানের একজন বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা, সুতরাং তাঁহার শোচনীয় পরাজয় ডেম্পসীর প্রাণে উৎসাহ দান করে ও সেই হইতেই তাঁহার পুনর্বার ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

জ্যাক ডেম্পসী ১৯১৯ সালে জেস ওয়েলার্ডকে পরাজিত করিয়া পৃথিবীর হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হন। ওয়েলার্ডের বহু মুষ্টিযোদ্ধা ডেম্পসীকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। হঠাৎ ১৯২৬ সালে জিনি টুনী জ্যাক ডেম্পসীকে পরাজিত করেন। তাহার পরই ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। জ্যাক জেফ্রিস এগার বৎসর পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, জ্যাক ডেম্পসী ১৩ বৎসর পরে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিবেন বলিয়া অনেকেরই ধারণা।

আই এফ এ ফুটবল দল

বাঙলার ফুটবল পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচিত দল বাঙলার বিভিন্ন জেলায় প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করিতেছেন। প্রতি বৎসরই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য বাঙলার বিভিন্ন জেলার খেলোয়াড়গণকে ক্রীড়াকৌশল শিক্ষা দিতে ও উন্নততর ক্রীড়াকৌশল অর্জনের জন্য উৎসাহ দান করিতে। কিন্তু ফুটবল পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচিত দল সেই উদ্দেশ্য সফল করা দূরে থাকুক পরিচালকমণ্ডলীর মুখে চুনকালি লেপনের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা বিভিন্ন স্থানের খেলার ফলাফল হইতেই অনুমান করা যায়। ফুটবল পরিচালকমণ্ডলী ইহার পর দল নির্বাচন বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিবেন কি?

রংয়ের ধাঁধা

চক্ষু চিকিৎসাবিদদের পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, শতকরা প্রায় ৪জন লোকের চোখে অল্পাবিস্তর রংয়ের ধাঁধাঁ লাগে। বিশেষত অনেক দূর থেকে আসতে আসতে হঠাৎ রংয়ের দিকে তাকালে নাকি এক রংকে অন্য ব'লে মনে হয়। যানবাহন ও লোক চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে বিভিন্ন রংয়ের আলো দিয়ে পথিক ও চালকদের বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হ'য়ে থাকে। পৃথিবীর সব বড় বড় দেশেই এই রকম ব্যবস্থা আছে। ক'লকাতাতেই একাধিক স্থানে এইরকম ভাবেই যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অনেক সময় দেখা গেছে মোটর চালকদের অনেক দূর থেকে জোরে গাড়ি চালিয়ে এসে হঠাৎ রংয়ের দিকে তাকালে রং ধরার একটু অসুবিধা হয়; অবশ্য এরকম চালকের সংখ্যা খুবই কম। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের কোন চক্ষু চিকিৎসক এই অসুবিধা দূর করার জন্য এক রকম চশমার ব্যবস্থা করেছেন। তার ওপর দিকে থাকবে ঘোরলাল ফিল্টার গ্লাস আর নীচের দিকে থাকবে সাধারণ সাদা গ্লাস। অবশ্য কারো যদি চোখ খারাপ থাকে তাহ'লে তার উপযুক্ত পাওয়ারযুক্ত গ্লাস এইখানে দেওয়া যেতে পারে। এখন মোটর চালকরা এই রকম চশমার ভেতর দিয়ে যদি কোন আলো দেখতে পান তাহ'লে তা হয় লাল নয় তো ফিকে হলদে হবে। যার মানে হয় গাড়ি একেবারে বন্ধ করা নয় তো সতর্ক হওয়া। এই রকম চশমা পরলে মোটর চালকদের যথেষ্ট সুবিধা হবে সন্দেহ নেই।

বায়ু কোষের শক্তি সঞ্চয়

বায়ু কোষের শক্তি বাড়াবার জন্য আমেরিকাতে এই নতুন রকমের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। গান গাইতে হ'লে বায়ুকোষের শক্তি বাড়ানোর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তাই গলা সাধবার আগে বায়ুকোষের শক্তি বাড়ানোর জন্য আমেরিকায় সম্প্রতি জনৈক মহিলা দিন ছ'টি ক'রে খেলার বেলুন ফোলান। এতে নাকি তিনি যথেষ্ট উপকারও পেয়েছেন। তা'র মতে এই রকম নিয়মিত বেলুন ফোলানোর ফলে শুধু [illegible] শক্তি সঞ্চয়ই হয় না, সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বরও ভাল হয়।

চোখ খারাপ হওয়ার জন্য যাঁদের সদাসর্বদা চশমা প'রে থাকতে হয় তাঁরা প্রয়োজন হ'লে তাঁদের চশমাকে চমৎকার 'সান্‌গগলস্' করে নিতে পারেন। এসকিমোরা বহুকাল ধ'রে তুষার অন্ধতা (snow blindness) থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এই রকম ব্যবস্থা ক'রে আসছে। ব্যবস্থাটি এমন কিছুই শক্ত নয়। কাল ফটোগ্রাফিক কাগজ থেকে ঠিক চশমার কাগজের মাথা দুটি থেকে ১/১৬ ইঞ্চি চওড়া আর কিছু পরিমাণ লম্বা অংশ বাদ দিয়ে তারপর খুব অল্প পরিমাণ তরল 'গ্লু' দিয়ে চশমার কাচের ওপর লাগিয়ে দিলে চশমাটি চমৎকার 'সানগগলসে' পরিণত হবে। বলা বাহুল্য চোখের কাচের মাপের মত দুটি অংশ কেটে নিতে হবে। এই

বেলুনে ফু' দিয়ে হৃদযন্ত্রের শক্তি বাড়ান হচ্ছে

দোষ নিবারণের জন্য কাচদুটি যে পরিমাণ সাহায্য ক'রছিল তা থেকে একটুকুও বঞ্চিত করবে না।

ছোট ছেলেদের মোটর

সম্প্রতি ছেলেদের একটি মোটর আবিষ্কৃত হয়েছে। মোটরটি ছোট ছেলেরা চালালেও এবং সম্পূর্ণ তাদেরই ব্যবহারের জন্যে হলেও এর ক্ষমতা নিতান্ত কম নয়, সমস্ত দেশ আজ ছোট ছেলেদের যে ধরনের মোটর গাড়িতে ছেয়ে গেছে এটি তা থেকে বিভিন্ন। বাইরের থেকে এর আবরণটি দেখলে অনেকটা 'রেসিং' কারের মত মনে হয়। এর এঞ্জিনটির ক্ষমতা আড়াই 'হর্স পাওয়ারের' (Horse power) এবং ঘণ্টায় ২৫ মাইল পর্যন্ত যাবার ক্ষমতা এটির আছে। রোজ-ভেলীর কার্ল লিউহোল্ড নামে এক ভদ্রলোক এটি তৈরী করেছেন।

সমরবার্তা

১৮ সেপটেম্বর।—

আজ ইংলাণ্ডের উপকূলে প্রবল ঝড়ের মধ্যেও ইংরেজ ও জার্মানির প্রবল আকাশযুদ্ধ হইয়াছে। লণ্ডনে আজ সব লইয়া আটবার বিমান আক্রমণ জ্ঞাপক সংকেত ধ্বনি হয়। ইংরেজরাও জার্মান অধিকৃত বহু অঞ্চলে দিবারাত্র কঠোর ও নিয়মিত হাওয়াই হামলা চালাইতেছে। দুইটি যোগানদার জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

কায়রোর এক ইস্তাহারে প্রকাশ—ইতালীয় সৈন্যদল গতকল্য সন্ধ্যায় সিদি বারানি দখল করিয়াছে।

বাটাভিয়ার রয়টার প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, ডাচ সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার ইন চীফ জেনারেল ভিঙ্কেলমান বার্লিনে মারা গিয়াছেন। ইনি ডাচ সৈন্যদলকে না ভাঙিয়া দিবার অপরাধে হলাণ্ডে জার্মান কর্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন।

বার্লিনের সরকারী নিউজ এজেন্সি ঘোষণা করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত ফন রিবেনট্রপ অল্পকালের জন্য রোম যাত্রা করিয়াছেন।

১৯ সেপটেম্বর।—

ব্রিটেনে জার্মান হাওয়াই হামলার প্রাবল্য আজ কম। উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকণ্ঠে অল্পাধিক বোমা বর্ষিত হইয়াছে। প্রকাশ, ওয়েস্ট এন্ড-এর একটা হোটেলে বোমা পড়ায় মেজর সি জে ব্রুস হে এবং তাঁহার পত্নী মারা গিয়াছেন। মেজর মহাশয় ইরাক সৈনাদলের ইনসপেক্টর ছিলেন। কাল বিপক্ষের ৪৮টা বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। ব্রিটিশ বোমারু বিমান বহর সামনাব্রুক, এরা, হাম, ম্যানহিম, ব্রুসেলস প্রভৃতি স্থানে প্রচণ্ড হামলা শুরু করিয়াছে। ফরাসীর উপকূলভাগ অগ্নিময়। ৭টা বিমান ফিরিয়া আসে নাই।

কায়রোর সংবাদ—ইতালীয় সৈন্যগণ অধিকৃত সিদি বারানি ও সোললুম অঞ্চলে ঘাঁটি দৃঢ় করিতেছে। ব্রিটিশ নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রবল আক্রমণে ইতালীয় সৈন্যদের বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে।

ওআশিংটন হইতে 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, আমেরিকা মাসে ৫০০টা করিয়া সামরিক বিমান ব্রিটেনকে সরবরাহ করিতেছে।

২০ সেপটেম্বর।—

ব্রিটেনে জার্মান বিমান আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস পাইয়াছে। বেলজিয়মের উপকূল হইতে কয়েকটি জার্মান বিমান লণ্ডনের দিকে অগ্রসর হয়। ব্রিটিশ কামান ও ফাইটার বিমান বাহিনী সেগুলিকে বিতাড়িত করে। জার্মান অধিকৃত বহু স্থানে ইংরেজরা প্রবল হাওয়াই হামলা চালাইতেছে।

সিংগাপুরের সংবাদ—জাপ-ফরাসী আলোচনা ভাঙিয়া গিয়াছে, অবস্থা সংকটজনক। প্রকাশ, জাপান নাকি ৭২ ঘণ্টার সময়ে ইন্দোচীনের নিকট এক চরমপত্র দিয়াছে। রবিবার মধ্য-রাত্রে সে সময়ের মেয়াদ শেষ হইবে। সাংহাইএর সংবাদ—জাপ রণতরী হইতে একটি ব্রিটিশ জাহাজে গোলা বর্ষিত হইয়াছে এবং তাহা আটক করা হইয়াছে।

মিশরের অবস্থা অপরিবর্তিত। জার্মান নিউজ এজেন্সির সংবাদ—জার্মান সামরিক কর্তাদের এক নির্দেশে প্রকাশ, জার্মান সৈন্যেরা ইতালীয় সৈন্যদলে কাজ করিতে চাহিলে তাহারা জার্মান সৈন্যদলের সমান সুবিধা পাইবে। ব্রিটিশ নৌবহর কর্তৃক দুইটি ইতালীয় সাবমেরিন ধ্বংসের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

২১ সেপটেম্বর।—

ব্রিটিশ বিমানবহর গত রাত্রে দুই ঝাঁকে হামবুর্গ ও বার্লিনের উপর হামলা করিয়াছে বলিয়া জার্মান রেডিওতে স্বীকৃত হইয়াছে। এ ছাড়া ক্যালে হইতে বর্লো পর্যন্ত সমগ্র ফরাসী উপকূলভাগে ইংরেজদের প্রবল আক্রমণ অব্যাহত আছে। আজ লণ্ডনে কোনও জার্মান বিমান দেখিতে পাওয়া যায় নাই। গত রাত্রে লণ্ডনের পূর্বাঞ্চলে জার্মানরা হামলা করিয়াছে।

নিউইয়র্কের এক সংবাদে প্রকাশ, এক ডাচ বেতারকর্তা কার্ল টের উইলির নিকট জানা গিয়াছে যে, হলাণ্ডের উপকূলে ব্রিটেন অভিযানের মহড়ায় যেসব জার্মান সৈন্য যোগদানে অস্বীকৃত হইতেছে, তাহাদিগকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া জার্মানিতে প্রেরণ করা হইতেছে।

ইন্দোচীনের সংকট ঘনীভূত হইতেছে। চুংকিং হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, দুই লক্ষের অধিক প্রথম শ্রেণীর চীন সৈন্য ইন্দোচীন সীমান্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সীমান্তের সমস্ত সেতু উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

২২ সেপটেম্বর।—

আজও ব্রিটেনে জার্মান বিমান আক্রমণের তেমন সংবাদ নাই। বিকালে দক্ষিণ-পূর্ব লণ্ডনে চারিটি বোমা বর্ষিত হয়। ফরাসী উপকূল হইতে ডোভার এলাকায় দুইবার জার্মানদের গোলাবর্ষণ হয়। অপর পক্ষে ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী শত্রুপক্ষীয় বন্দরসমূহে ব্রিটিশ বিমান বহর দিন রাত অগ্নিবর্ষণ করিতেছে।

টোকিও হইতে ডোমেই এজেন্সির সংবাদে প্রকাশ, প্রশান্ত মহাসাগরের এলাকার ঘাঁটিগুলি রক্ষার জন্য ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্ভাবনা আছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় জাপ সরকারী মহলে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। 'আসাহী সিম্বুন' পত্রিকা এই মন্তব্য করিয়া দেশবাসীকে সতর্ক করিয়াছে যে, ইহাতে বর্তমান মহাসমরে যুক্তরাষ্ট্রের কার্যত যোগদানের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ইতালীয়দের আক্রমণ লইয়া মিশরের মন্ত্রিসভায় মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় চারিজন প্রভাবশালী মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়া-ছেন। তাঁহারা অবিলম্বে যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী।

২৩ সেপটেম্বর।—

সাংহাইএর সংবাদ—জাপান ফরাসী ইন্দোচীনের নিকট ৭২ ঘণ্টার যে চরমপত্র দিয়াছিল, তাহার মেয়াদ শেষ হইবার দুই ঘণ্টা পূর্বেই ফরাসী ইন্দোচীন আক্রমণ করে। দুই ঘণ্টাকাল প্রবল বাধা দান করিবার পর ফরাসীরা এক চুক্তি করায় সংঘর্ষ অবসিত হয়। প্রকাশ, চুক্তিতে জাপানীরা (১) টংকিংএর বিমান ঘাঁটি পাইবে, (২) বিমান ঘাঁটিগুলি রক্ষার জন্য ৬০০০০ সৈন্য রাখিতে পাইবে, (৩) দক্ষিণ চীনের জাপ-সৈন্যেরা ইন্দোচীনের একটা নির্দিষ্ট পথ দিয়ে যাইতে পাইবে, (৪) হাইপংএ নির্দিষ্ট সংখ্যক জাপ সৈন্য অবতরণ ও অবস্থান করিতে পারিবে।

ব্রিটেনে জার্মানদের হাওয়াই হামলা অল্পাধিক বর্তমান। সম্রাট্ শ্রীযুক্ত ষষ্ঠ জর্জ বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে প্রজাপুঞ্জের উদ্দেশে উৎসাহ জানাইয়া এক বেতার বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রদান কালে বিমান আক্রমণের বিপদজ্ঞাপক বংশীধ্বনি হইয়াছিল।

২৪ সেপটেম্বর।—

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, জার্মানরা দাকারকে তাহাদের কর্তৃত্বে আনিবার ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে। দাকারের অধিবাসীরা স্বাধীন ফ্রান্সের সমর্থক। এই কারণে জেনারেল দ গল একদল স্বাধীন ফরাসী বাহিনী লইয়া দাকারএর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অনুবর্তীদের স্বাধীন ফ্রান্সের পতাকাতলে সমবেত হইতে আহ্বান করেন। মনে হয় তিনি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত এক ব্রিটিশ বাহিনীও আছে।

ইংলাণ্ডে জার্মানির হাওয়াই হামলা অল্পাধিক পূর্ববৎ। ইংরেজরা বার্লিনের উপর ব্যাপক ও বহুকালব্যাপী (রাত্রি ১১টা হইতে ভোর পর্যন্ত) বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিল। এ ছাড়া জার্মান অধিকৃত বহু সামরিক অঞ্চলে হাওয়াই হামলা ঘটিয়াছে। নিউ ইয়র্কের 'হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, ইংলিশ চ্যানেলে ইংরেজদের হাওয়াই হামলার ফলে প্রায় ৬০০০০ জার্মান সৈন্য ধ্বংস হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৮ সেপটেম্বর।—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও বিশিষ্ট কংগ্রেস সেবক শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার সোম আজ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল।

আজ বৈকালে কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির বোম্বাই অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ওআর্কিং কমিটি সমুদয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে মহাত্মাজীর নির্দেশ ব্যতীত কোনওরূপে আইন অমাননা বন্ধ করিতে নির্দেশ দিতেছেন।

ভারতরক্ষা আইন—কলিকাতা, হুগলি, খুলনা, চুঁচুড়া প্রভৃতি নানা স্থানে ধরপাকড়, খানাতল্লাশ, কারাদণ্ড, বহিষ্কার প্রভৃতি হইয়াছে।

ঢোলপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, পূর্বে রাজপুতানার মানপুর নামক স্থানে প্রখর রৌদ্র তপ্ত এক পাহাড় হঠাৎ বৃষ্টির ফলে ফাটিয়া যাওয়ায় ১৬ জন শ্রমিক নিহত ও ১২ জন আহত হইয়াছে।

১৯ সেপটেম্বর।—

'ভারতের অচল অবস্থা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বিলাতের 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' বলিয়াছেন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই স্বাধীনতা চাহিয়া থাকে, অথচ প্রার্থিত বস্তু লাভের জন্য তাহারা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছেই আবেদন জানায়। এ অবস্থায় সালিশের দরকার। ভারতে যোগ্য সালিশ না পাওয়া গেলে বিলাত হইতেই কাহাকেও পাঠানো উচিত।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত নাজিম-উদ্দিন বলেন যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে বাঙলা সরকারের আদেশে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, ভারত সরকারের আদেশে নহে, এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা এখন ভারত গভর্নমেণ্টের নাই।

উতকামন্দের সংবাদ—শ্রীযুক্ত গভর্নর ঘোষণা করিয়াছেন যে, পণ্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রমের শ্রীঅরবিন্দ গভর্নরের যুদ্ধ সাহায্য ভাণ্ডারে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি ভাইসরয়ের যুদ্ধ সাহায্য ভাণ্ডারেও ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন। পূর্বে ফ্রান্সেরও জাতীয় রক্ষা তহবিলে তিনি ১০,০০০ ফ্রাঁ দান করিয়াছেন।

ভারতরক্ষা আইন।—নারায়ণগঞ্জ, ২৪ পরগনা, বরাট (হুগলি), শ্রীরামপুর, নিউ দিল্লি প্রভৃতি নানা স্থানে ধরপাকড় প্রভৃতি হইয়াছে।

২০ সেপটেম্বর।—

২৪ পরগনার চক পরান গ্রামের বিপিনচন্দ্র সাঁবুই সপরিবারে ২-৩ দিন উপবাস দিয়া আহারের যোগাড় করিতে না পারিয়া উদ্‌বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

বোম্বাইএ শ্রীযুত আজাদ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট বলিয়াছেন, শ্রীযুত বড়লাটের সঙ্গে মহাত্মাজীর সাক্ষাতের পর আর ওআর্কিং কমিটির অধিবেশনের দরকার হইবে না, মহাত্মাজীকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দেশ দিবার ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। আইন অমানন' কতদিন স্থগিত থাকিবে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, অল্প কয়েক দিনের জন্যই তাহা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

২১ সেপটেম্বর।—

আজ বৈকালে বোম্বাই-এ নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওআর্কিং কমিটির এক জরুরী অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ৫ ঘণ্টা আলোচনার পরও অধিবেশন স্থগিত আছে।

ভারতরক্ষা আইন।—প্রয়োগ ক্রমশ ব্যাপ্ত হইতেছে। কলিকাতার নানা স্থান, আনন্দনগর (হুগলি), শ্রীরামপুর, সিঙ্গুর, চন্দননগর, কুমিল্লা, আগড়তলা, বহরমপুর, চট্টগ্রাম, কির্নাহার (বীরভূম), মিরাট, বৈদ্যবাটী, রাজবাড়ি, বোলপুর, খুলনা প্রভৃতি বহু স্থানের ধরপাকড়, খানাতল্লাশ, বহিষ্কার, কারাদণ্ড প্রভৃতির সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় ভাইস চান্সেলর শ্রীযুক্ত আজিজুল হক জানান যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষাবিল সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত পেশ করিবার জন্য ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

২২ সেপটেম্বর।—

লাহোরের সংবাদে প্রকাশ, এক মাসের অধিককাল হইল অনশন ধর্মঘটে নিরত রাজবন্দী শ্রীযুত কুলবীর সিংকে সম্প্রতি মেয়ো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা সংকটজনক। শ্রীযুক্ত টিকারামও সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে পড়িয়া আছেন।

নদীয়া সম্মিলনীর উদ্যোগে বিডন স্ট্রীটের নদীয়া সম্মিলনী ভবনে বঙ্গবীর কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের ৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওআর্কিং কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, যেহেতু মুসলিম লীগ তাঁহাদের 'দৃঢ়চিত্ততা, প্রতিভা ও বিশ্বাস'এর সহিত ঘোষণা করিয়াছে যে, ভারতকে দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করাই ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান, অতএব হিন্দু মহাসভাও বড়লাটকে এই বলিয়া অনুরোধ করিতেছে যে, তিনি যেন স্পষ্ট ভাষায় বিজ্ঞাপিত করেন—গভর্নমেণ্ট উক্ত প্রস্তাব বা পরিকল্পনা গ্রাহ্য করিবেন না।

ভারতরক্ষা আইন।—প্রতাপ ভারতের সর্বত্র প্রবল।

২৩ সেপটেম্বর।—

রাজনৈতিক দাবি সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব গ্রহণের পর বোম্বাই-এ হিন্দু মহাসভা ওআর্কিং কমিটির তিন দিনের অধি-বেশন শেষ হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বড়লাটের ঘোষণা, শ্রীযুক্ত এমেরির বিবৃতির সমালোচনা করিয়া তাহা অসন্তোষ ও নিরাশা-জনক বলা হইয়াছে।

আসানসোলের নিকটবর্তী কুলটি নামক স্থানে উত্তেজিত এক হিন্দু-মুসলমান জনতার উপর গুলি চালানোর ফলে ৪ জন লোক মারা গিয়াছে। পুলিসরাও আহত। প্রকাশ, এক হিন্দু শোভাযাত্রায় মুসলমানরা বাধা দিবার ফলেই উক্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধে।

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে বিবৃতি প্রকাশের ফলে ভারতরক্ষা আইনে অভিযুক্ত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র দেব মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

পেশোয়ারের সংবাদ—শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর খাঁ কংগ্রেস ওআকিং কমিটি ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য না থাকিবার জন্য যে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

২৪ সেপটেম্বর।—

নিখিল ভারত চরকা সংঘের সহযোগিতায় বিশ্বভারতীর উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে যে খাদি ও পল্লী শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছে, আজ সকালে সিংহ সদনে উড়িষ্যার ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ কানুনগো উহার উদ্‌বোধন করিয়াছেন।

লখ্‌নৌএর সংবাদ—যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কে এন কাটজু একটি সুদীর্ঘ বিবৃতিতে বেরিলির পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত আলেকজাণ্ডারের কাজের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। প্রকাশ, পুলিস কনস্টেবলরা একদল রংরুটকে সঙ্গে লইয়া বেরিলি স্টেশনের দিকে যাত্রা করে। পথে চৌদ্দ বছরের এক বালক তাহাদিগের উদ্দেশে আপত্তিকর ধ্বনি করায় বালকটিকে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট বালকটিকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া নিজই স্বহস্তে আদালতে তাহাকে বেত্রাঘাত করেন।

৭ম বর্ষ] ১৯শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 5th October, 1940. [৪৭ সংখ্যা

মাতৃপূজা

শরতের প্রকৃতি বাঙলার ভাবের রূপ, সারা বৎসর ষড়-ঋতু ভাষা ভাজিয়া এই শরতে যেন সুরের রাজ্যে গিয়া ঢুকে। বহিঃপ্রকৃতির বিভূতি দেয় অন্তর রাজ্যে যোগের সন্ধান। প্রতিবেশের প্রতিঘাত ভুলিয়া বাঙালী অন্তরে আনন্দের স্পর্শ পায়।

ইহাই বাঙালীর পূজার আমোদ। আমাদের কাহারও কাহারও কাছে বিষয় বিচার বড় হইলেও বাঙলা দেশের অনেকের কাছে এই আনন্দ এখনও লুপ্ত হয় নাই। দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত বাঙালী, বুভুক্ষিত বাঙালীও এই পূজার কয়েক দিনের জন্য অন্তত নিজেদের দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া যায়—যুক্তির নিকষ পাষাণে এই আনন্দ অবশ্য টিকে না, ইহা অনেকটা শ্রৌত। বুদ্ধিমান এবং বিবেচক দৈন্যপীড়িত বাঙালীর এই আনন্দ দেখিয়া হয়তো হাসিবেন, ভাবিয়া পাইবেন না, কোন্ সুখে ইহারা আনন্দ করে; কিন্তু ভাব যুক্তিকে মানে না, তাহা অবিতর্ক্য। অথচ ভাবকে ভাষায় ফুটানোই জীবনের স্বরূপ। শারদীয়া প্রকৃতিতে বাঙালী অন্তর্গূঢ় যে ভাবের সন্ধান পায়, জীবনে তাহা ফুটাইয়া সত্য করিবার সাধনা তাহার নাই; সে জিনিস সে হারাইয়াছে। ভাবকে সে স্থায়ী করিবার কৌশল বিস্মৃত হইয়াছে, ভুলিয়াছে সেই যোগ, তাহার ফলে অভাবই তাহার বাড়িয়া চলিয়াছে।

ভাব বিগাঢ় হইলে, তাহা বিগ্রহের আকার ধারণ করে. রস পায় রূপ। বাঙলার সাধকেরা শারদীয়া প্রকৃতির বাণীর আলোকে, সেই অর্থদীপে যে বিগ্রহ দেখিয়াছিলেন, দশভূজা দশপ্রহরণধারিণী দেবী মূর্তিতে তাহাই প্রকট। এই যে আবির্ভাব, এই যে প্রকাশ, ইহাকে তাহারা জাতির সর্বস্তরে কর্মসাধনায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। শারদীয়া দেবীকে তাঁহারা ঘরে ঘরে জননী করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। সকলের যিনি মা, তাঁহাকে বাঙালীর সংসারে আনিয়া বসাইয়া জাতির আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক সকল দুঃখ দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই ত্রিবিধ দুঃখ হরণ যিনি করেন, তিনিই দুর্গা। তিনি রাষ্ট্রী, তিনি সকলের জননী। তাঁহাকে পাইলে আর ভেদ থাকে না, বিরোধ থাকে না—এই অভেদ দর্শনেই আধ্যাত্মিকতা এবং ঐক্যের এই অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই জাতীয়তা। যিনি দুর্গা, তিনি রহিয়াছেন চিতিরূপে এবং তিনিই রহিয়াছেন জাতি রূপে। যাঁহারা তাঁহাকে পায়, তাঁহারা শুধু যে পরপারের সম্বলেই বলীয়ান হয়, ইহা নয়, এই সংসারে এবং সমাজেও তাঁহারা শক্তিশালী হইয়া মানুষের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। ঐহিক জীবনে আনন্দসূত্রের সন্ধান যে না পাইয়াছে, তাহার পারলৌকিক জীবনের কোন প্রতিষ্ঠাই সম্ভব নয়। পরলোকের সকল কথা সবই তাহার পক্ষে শুধু ভাষার কারসাজি মাত্র।

অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের যোগ সাধন করাই তো মানুষের মনুষ্যত্ব। বাঙলার সাধক এই যোগের ব্রহ্মসূত্রটি ছন্দায়িত করিলেন দেবী দশভুজার বিগ্রহ মূর্তিতে। ইন্দ্রিয়ার্থের অসংশয়িত উপপত্তির পথ দেখাইলেন জাতিকে, বলিলেন এই মূর্তিকে প্রাণের রস-ধারার সংযোগে সঞ্জীবিত করিয়া তোল। তোমার ভিতরের চাহিদার তুলনায় বাহিরের যে অনুপপত্তির দৈন্য তাহা দূর হইবে। এই দৈন্যই মৃত্যু, এই দৈন্যই ভয়। ভিতরে বাহিরে যোগ না হইলে ভাব জমে না অথচ ভাবকে আশ্রয় করিয়াই জাতি গড়ে, জাতি ভাঙ্গে; ভাবই শক্তি, শারদীয়া দেবী ভাবময়ী, এই জন্যই তিনি শক্তিময়ী।

কিন্তু এই শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। পরাধীনতার প্রভাবে, বৈদেশিকতার মোহে বাঙালী এই সাধনাকে ভুলিয়া গেল। বোধন না হইতেই মঙ্গলঘট ভাঙিয়া পড়িল। বাঙলায় অন্ধকারের যুগ ঘনাইয়া আসিল। বৈদেশিকতা আসিয়া আঘাত করিল এই ভাব-রাজ্যে, বিভেদকে বড় করিয়া তুলিল, জাতির শক্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলিল অন্তরের যোগের সূত্র হইতে ছিন্ন করিয়া। যিনি শক্তিময়ী, দুর্বলে কি করিতে পারে তাঁহার পূজা? দাসের মনোবৃত্তি লইয়া হয় না দেবীর পূজা। দেবতারা মায়ের পূজার অধিকারী হইয়াছিলেন দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, নিজেদের স্বাতন্ত্র্যে এবং স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া। তাঁহারা বহ্নিকে পুরোগামী করিয়া কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়াছিলেন, মায়ের উদ্বোধন করিয়াছিলেন পরার্থে ভাবনায়, যজ্ঞের আগুন জ্বালাইয়া। যজ্ঞের সেই জ্বালা, পরার্থপ্রাণতার প্রচণ্ড সে প্ররোচনা বাঙলায় আজ কোথায়। যেখানে সেবা সত্য নহে, সেখানে বলির কথা বলা বৃথা। শুধু অনুস্বর ও বিসর্গের উচ্চারণ করিলে কি হইবে, উৎসর্গের উপচার কোথায়?

মায়ের পূজা তবে কি হইবে না। মাকে যে না চিনিয়াছে, না জানিয়াছে, তাঁহার সাধনা সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ বলিয়া না বুঝিয়াছে, তাঁহাদের দুঃখ দূর হইবার নয়। দুর্গতি হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে চাই দুর্গাকে।

দেবীসূক্তের যে তত্ত্ব বাঙালী ভুলিয়া গিয়াছিল, সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিলেন বাঙলার সাধক সন্তান নূতন করিয়া। তিনি দিলেন বাঙালীকে 'বন্দে মাতরম্', এই মহামন্ত্র! ভাবকে বিগ্রহ রূপ দিলেন, জড়কে দিলেন চৈতন্যের রূপ' মৃন্ময়ীকে মন্ত্রের সাধনায় চিন্ময়ী করিবার পথ তিনি দেখাইলেন। দেবীসূক্তের ইহাই তত্ত্ব কথা। দেবতারাও এই তত্ত্বের সাধনা করিয়া দুর্গতি হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। ঋষিরা তত্ত্বদর্শী, এই হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রও ঋষি।

বাঙালীকে যদি বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমের সেই সাধনাতে আবার বসিতে হইবে। দেখিতে হইবে বাঙলার আকাশে বাতাসে বঙ্গভূমির সর্বত্র মায়ের ব্যাপ্তিরূপকে এবং উপলব্ধি করিতে হইবে বাঙলার সকল নরনারীর মধ্যে মায়ের এই চিতি রূপকে। ইহা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। ইহা পৌত্তলিকতা নয়, সাম্প্রদায়িকতা নয়, জড়ের পূজা নয়—ইহাই মাতৃপূজা, ইহাই জাতি রূপে যিনি রহিয়াছেন, চিতিরূপে যিনি রহিয়াছেন এবং আমাদের মধ্যে ব্যাপ্তিরূপে যিনি রহিয়াছেন, তাঁহারই পূজা। এ পূজা করিতে না শিখিলে মানুষ মানুষ হয় না, সে পশুই থাকিয়া যায় এবং পশু যে, পরের দাসত্বই তাহার বিধিলিপি।

বাঙালী, শারদীয়া প্রকৃতির সুরে সুর মিলাইয়া একবার অন্তরের ভিতর ভাব রাজ্যে প্রবেশ কর, বাঙালীর মাটিকে আর মাটি দেখিবে না, জল বায়ুকে আর ভৌতিকরূপে দেখিবে না, অন্তঃহৃদয়ে ইহাদের অপ্রাকৃত রূপ দেখিবে, সে রূপ মাতৃরূপ। দেখিবে সেই রূপে মা সর্বদা তোমাকে আপ্যায়ন করিতেছেন। সেই রূপ যে চোখে দেখে, শক্তি সেই পায়—বাহ্যবিচারের হিসাবনিকাশ তাহাকে বিড়ম্বিত করিতে পারে না; কার্পণ্য তাহার দূর হইয়া যায়। অতর্কিত আনন্দের উদ্বেল উচ্ছ্বাসে তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সহ তেজ ওজঃ বল—সকল শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। সে ঝাঁপাইয়া পড়ে সাধনসমরে 'জয় মা' বলিয়া। যুগে যুগে ভাবময়ী মায়ের মুখ-মাধুরীর এই আকর্ষণে তাঁহার স্নিগ্ধনেত্রপাত-প্রসাদ-মহিমায় ভক্ত সন্তানের দল অসাধ্য সাধন করিয়াছে। বাঙলার ফকির সাধক গাহিয়াছেন—'চোখে দেখে, গায়ে ঠেকে ধুলা আর মাটি, তুই প্রাণ-রসনায় চাইখ্যা দেখ রে রসের সাঁই খাঁটি।' বাঙালী শারদীয়া প্রকৃতির প্রাঙ্গণতলে প্রাণ-রসনায় একবার বাঙলা মায়ের মাধুর্য চাখিয়া দেখ, খাঁটি শক্তির উৎসের সন্ধান তুমি অন্তরে লাভ করিবে। ধুলা আর মাটি সব চিন্ময় হইয়া উঠিবে। মা নিজে বরদা মূর্তিতে আসিয়া দেখা দিবেন, তোমার ভয় থাকিবে না। এই দেবীকে দেখ নাই, চেন নাই, প্রাণ ভরিয়া ডাক নাই বলিয়াই তোমার এত ভয়, পদে পদে বুক ধড়ফড়ানি আর কাঁপুনি। মায়ের স্মৃতিতে, মাতৃমাধুর্যের উন্মাদ করা অনুভূতিতে তোমার সেই ভয় দূর হইবে এবং 'দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ'—সত্যতা উপলব্ধি করিবে তখন এই ঋষি বাক্যের। জগদ্ব্যাপী রণতাণ্ডবের মুহূর্তে মাকে অন্তরে অনুধ্যান করিয়া লও এবং প্রার্থনা কর—তোমার এই খড়্গের খেলা আমাদের শুভের জন্য হউক—শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতাঃ বয়ম্।

লেখা আর আঁকা
তব মনোবিহঙ্গের
এই দুটি পাখা।
ধরণীর ধূলিপথ অন্ত হয় হোক্
আকাশে রহিল মুক্ত তব মুক্তিলোক॥
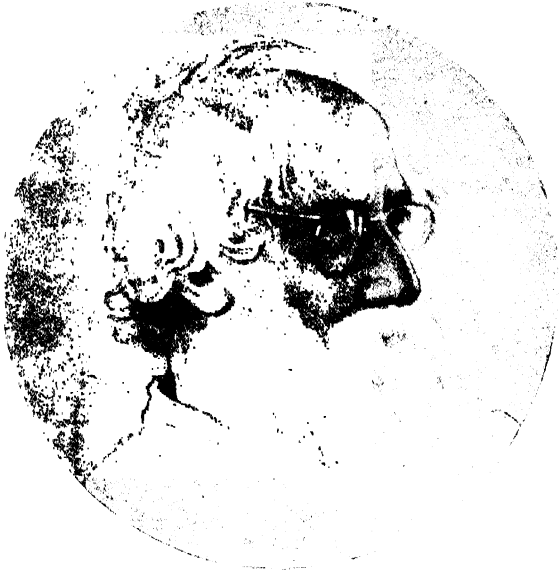
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শেষ সঞ্চয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনান্তবেলায় শেষের ফসল দিলেম তরী পরে
এ পারে কৃষি হোলো সারা
যাব ওপারের ঘাটে।
হংস বলাকা উড়ে যায়
দূরের তীরে তারার আলোয়
তারি ডানার ধ্বনি বাজে মোর অন্তরে,
ভাঁটার নদী ধায় সাগর পানে কলতানে
ভাবনা মোর ভেসে যায় তারি টানে॥
যা কিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয়
সুখ নয় সে দুঃখ সে নয়, নয় সে কামনা
শুনি শুধু মাঝির গান আর দাঁড়ের ধ্বনি তাহার স্বরে।

বন্ধনী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বিবাহ বিনোদ কিছুতেই করিবে না।

সর্বনাশ! এ বলে কি!

বয়স মাত্র পঁচিশ, স্বাস্থ্য ভাল, দেখিতেও চমৎকার, কলিকাতা শহরে নিজের একখানি বাড়ি, চাকরি করে, এক শ টাকা বেতন; তাহার উপর না আছে বাপ-মা, না আছে আত্মীয়স্বজন। অথচ বলে কিনা বিবাহ করিবে না!

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যাঁহারা, তাঁহারা তো অবাক্!

কেহ বলেন, 'রোগ-টোগ আছে।'

কেহ বলেন, 'দাঁও মারতে চায়।'

এমনি করিয়াই কাটিল কিছুদিন।

তাহার পর সে বৎসর তখন বসন্তকাল, কলিকাতা শহরেও কোকিল ডাকিতেছিল, প্রজাপতি উড়িতেছিল এবং শুধু সেই জন্যই কি না জানি না, হঠাৎ একদিন শোনা গেল, বিনোদ বিবাহ করিয়াছে।

বিবাহ করিয়াছে, অথচ বউটি তেমন ভাল নয়, অর্থাৎ সুন্দরী নয়। মনের মিল হইয়াছে কি না কে জানে, কিন্তু নামের মিল হইয়াছে চমৎকার।

বিনোদের নাম বিনোদ, আর তার বউএর নাম বিনোদিনী।

বিনোদ বলে, 'তা হোক। ওর কাছে আমি আর যাব না। থাক ও বাপের বাড়িতে।'

বিনোদিনীর বাপের বাড়ি--কলিকাতার কাছাকাছি ছোট্ট একটি গ্রামে।

বিবাহ হইয়াছে বসন্তকালে, তাহার পরেই আসিল গ্রীষ্ম এবং তাহার পরেই বর্ষা।

কবিরা বলেন, বর্ষায় বিরহিনীদের নাকি বড় কষ্ট হয়। বিনোদের দয়ার শরীর। কষ্ট সে কাহারও সহ্য করিতে পারে না।

সেদিন শনিবার। সকাল-সকাল আপিসের ছুটি। বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে, দেখা গেল, বিনোদ চলিয়াছে স্টেশনের দিকে। তাহার পর কেমন করিয়া না জানি অন্যমনস্কভাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে সে গিয়া দাঁড়াইল বিরহিনী বিনোদিনীর বাপের বাড়ির দরজায়।

চার মাস আগে যাহাকে সুন্দরী বলিয়া মনে হয় নাই, সেদিন বাদলরাত্রে লণ্ঠনের আলোকে তাহাকেই সহসা অসামান্যা সুন্দরী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সারাটা রাত্রি চোখে ঘুম আসিল না। প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত পূর্ণযৌবনা বিনোদিনীকে লইয়া হাসিতে গল্পে রাত্রিটা তাহার কাটিল মন্দ নয়।

পরদিন রবিবার। সকাল হইতে বৃষ্টির বিরাম নাই। খ'ড়ো চালের ছাঁচা গড়াইয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতেছে, আর ঘরের ভিতর খোলা জানলার পাশটিতে বিনোদ আর বিনোদিনী মুখোমুখি শুইয়া। কি আনন্দে যে দিনটা তাহাদের কাটিল তা তাহারাই জানে।

আজিকার রাত্রিটি ফুরাইলেই—বাস্, কাল সোমবার, বিনোদকে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে। কথা যেন তাহাদের আর শেষই হয় না!

বিনোদ হঠাৎ বলিয়া বসিল, 'আচ্ছা বিনোদিনী আমাদের এত সুখ সইবে তো?'

বিনোদিনী বলিল, 'ও কি কথা গো! কেন সইবে না?'

'ধর, আমি যদি হঠাৎ মরে যাই!'

'ছি!' বলিয়া বিনোদিনী দু হাত দিয়া বিনোদের মুখখানা চাপিয়া ধরিল।

বিনোদ বলিল, 'ছাড়!'

বিনোদিনী বলিল, 'বল আর বলবে না?'

'বলব না।'

বিনোদিনী তখন ছাড়িয়া দিল। বলিল, 'না, ও কি কথা! ছি!'

বিনোদ বলিল, 'ভাল তুমি তা হ'লে আমাকে বাস?'

বিনোদের মুখের পানে তাকাইয়া সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া সে মাথা হেঁট করিল।

বিনোদ তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, 'জানি।'

শনিবার আপিস ছুটির পর বিনোদকে আজকাল আর কলিকাতায় দেখা যায় না।

প্রতি শনিবার সে বিনোদিনীর কাছে যায়, রবিবার থাকে, আবার সোমবারে ফিরিয়া আসে।

এমনি করিয়া একটি বৎসর কাটিল।

তাহার পর, দ্বিতীয় বৎসরটাও আরম্ভ হইয়াছিল ঠিক তেমনি করিয়াই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা আর টিকিল না।

বিনোদিনী হইল একটি সন্তানের জননী।

যৌবনের উচ্ছলতা তখন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে।

বিনোদ বলিল, 'চল, এবার কলকাতায় চল।'

কথাটা বিনোদ অনেকবার বলিয়াছে। কেন জানি না, বিনোদিনী কোনওবারেই রাজী হয় নাই। এবার আর সে 'না' বলিতে পারিল না। ছেলে কোলে লইয়া বিনোদিনী তাহার কলিকাতার বাড়িতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ফাঁকা বাড়ি। নিজেই গৃহিণী, নিজেই সব।

রান্না করিবার জন্য বিনোদ একজন লোক ডাকিয়া আনিল, সংসারের কাজ করিবার জন্য একজন ঝি রাখিল। বিনোদিনীর কোনও রকম কষ্ট যাহাতে না হয় বিনোদ তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, দুদিন পরেই দেখা গেল, রাঁধুনী এবং ঝি--দুজনকেই বিনোদিনী ছাড়াইয়া দিয়াছে।

বিনোদ বলিল, 'ওদের ছাড়ালে কেন?'

বিনোদিনী বলিল, 'বাবাঃ! দু দিনেই ওরা আমার ঘর-কন্নার জিনিসপত্র সব ফাঁক করে দেবে। আর তা ছাড়া আমি কি এতই আলসে কুঁড়ে? কি ভেবেছ তুমি?'

বিনোদ ভাবে নাই কিছুই। শুধু ভাবিয়াছে—স্ত্রী তাহার দিবারাত্রি যদি সংসার, ছেলে আর রান্না লইয়াই থাকে, তাহার দিকে সে নজর দিবে কখন?

কিন্তু বিনোদিনীর প্রকৃতিই আলাদা! সে যেন গৃহের গৃহিণী হইয়াই জন্মিয়াছে, স্ত্রী হইতে সে জানে না! মনে হয় ঘর-সংসারের কাজ করিয়াই সে যেন আনন্দ পায় বেশী।

বিনোদের ভাল লাগে না। আপিস হইতে ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াই দেখে, স্ত্রী হয়তো তখন উনান ধরাইয়া রান্না করিতে বসিয়াছে। একটিবার যে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইবে সে অবসর তাহার নাই!

বিনোদ ডাকে, 'ওগো, শোন!'

বিনোদিনী রান্নাঘর হইতে জবাব দেয়, 'শোনবার অবসর এখন আমার নেই। কিছু যদি বলতে হয় তো তুমি এস এই ঘরে, ব'লে যাও।'

বিনোদ চুপ করিয়া থাকে।

খানিক পরে বিনোদিনী বলে, 'চা খাবে?'

'না।'

'খেয়ে এসেছ বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

তাহার পর তাহাদের আর কোনও কথা নাই। রান্না শেষ করিয়া বিনোদিনী এ-ঘরে আসিয়া দেখিল, বিনোদ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

এমনি করিয়াই দিন চলিতে থাকে।

বিনোদ একদিন বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, ছেলেটার জ্বর হইয়াছে।

তৎক্ষণাৎ সে একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল।

বিনোদিনীর এখন আর কথা পর্যন্ত বলিবার অবসর রহিল না। ওদিকে রান্না আর সংসার, এদিকে ছেলে আর ঔষধ।

পনের দিনের পর ছেলে ভাল হইল।

বিনোদিনীর মুখে হাসি ফুটিল। বলিল, 'ছেলের অসুখে মিছিমিছি এতগুলো টাকা খরচ করলে!'

বিনোদ বলিল, 'তার মানে?'

বিনোদিনী বলিল, 'ছেলে কি তোমার ওই ডাক্তারী ওষুধে সেরেছে নাকি? ছেলের জন্যে আমি মা-কালীর কাছে মানত করেছিলাম। ছেলে আমার তাইতে সেরেছে।'

বিনোদ চুপ করিয়া রহিল।

'বিশ্বাস হল না?'

'তা হবে।'

বিনোদিনী বলিল, 'তা হবে নয়। কাল রবিবার। চল কাল সকালে কালীঘাটে গিয়ে মানতটা শোধ করে আসি।'

বিনোদের যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু না গেলেও বিনোদিনী এখনই একটা অনর্থ ঘটাইয়া বসিবে। বাধ্য হইয়া তাহাকে যাইতে হইল।

মানত যৎসামান্যই। খরচ এমন বিশেষ কিছু নয়। সওয়া পাঁচ আনার সন্দেশ, এদিক ওদিক দু-চারটে পয়সা, আর যাওয়া-আসা রিক্‌শা ভাড়া।

গঙ্গাস্নান এবং পূজা শেষ করিয়া সন্দেশের ঠোঙাটি হাতে লইয়া রিক্‌শায় চড়িয়া তাহারা বাড়ি ফিরিতেছিল। মোড়ের মাথায় গাড়ি ঘোড়ার ভিড়ের জন্য রিক্‌শাওয়ালা দাঁড়াইয়া পড়িল। বিনোদের কোলে ছেলে, বিনোদিনীর হাতে সন্দেশের সরা।

ছোট একটি ভিখারী ছেলে রিক্‌শার পাশে আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল।

বিনোদ বলিল, 'দাও না ওই থেকে কিছু!'

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি থেকে?'

'তোমার ওই সরা থেকে। আমার কাছে একটাও পয়সা নেই।'

বিনোদিনী কথাটা যেন শুনতেই পাইল না এমনিভাবে চুপ করিয়া রহিল।

ভিখারী ছেলেটা আবার ডাকিল, 'মা!'

বিনোদ দেখিল, ক্ষুধার্ত ছেলেটার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাহার নিজের কাছে পয়সা নাই। বিনোদ আবার বলিল, 'দাও না!'

বিনোদিনী এবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

ছেলেটি পিছু পিছু ছুটিয়াছে বোধ হয়। বিনোদের একবার কানে আসিয়া বাজিল, 'মা গো!'

তাহার পর রিক্‌শার ঠুং ঠুং শব্দ ছাড়া আর যেন কিছুই সে শুনিতে পাইল না। চোখের সমুখে একফালি রৌদ্রধূসর আকাশ, রাস্তার দু পাশে বড় বড় বাড়ি, মুদির দোকান, স্যাকরার দোকান, পানের দোকান, চাএর দোকান,—সব কিছু পার হইয়া রিক্‌শা যে কখন তাহাদের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বিনোদ কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

বিনোদিনীর ডাকে তাহার চমক ভাঙিল।—'নাম!'

বিনোদ গাড়ি হইতে নামিল।

ঘরে ঢুকিয়া বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে বলিল, 'জানি আমি ঠাকুরদেবতায় তোমার বিশ্বাস নেই, জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলাম। তার ওপর ঠাকুরের প্রসাদের অগ্রভাগ–দেখ তো আবার বলে কিনা এই সরা থেকে রাস্তার ওই ভিখিরীটাকে—নাও, খাও!'

বলিয়া সরা হইতে গোটাকতক সন্দেশ সে বিনোদের হাতের কাছে ধরিয়া দিল।

বিনোদ তাহার মনিব্যাগটা বাহির করিয়া পকেটে রাখিয়া বলিল, 'আসছি।'

'ঠাকুরের প্রসাদ ফেলে? এই অসময়ে? কোথায় যাচ্ছ?'

বিনোদ আবার বলিল, 'আসছি।'

বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

মোড়ের মাথায় যেখানে তাহাদের রিক্‌শাটা দাঁড়াইয়াছিল, বিনোদ সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। এদিক-ওদিক তন্ন তন্ন করিয়া বহুবার খুঁজিল, কিন্তু সেই ভিখারী ছেলেটার দেখা সে পাইল না। ক্ষুধার্ত বালক আবার হয়তো কাহার পিছু পিছু কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

বিনোদিনী তাহার নিজের সংসার আর নিজের ছেলেটি ছাড়া আর কিছুই জানে না। বিনোদ তাহার এই দুরন্ত স্বার্থপরতা বহু দিন লক্ষ্য করিয়াছে। আজ তাহার মনে হইল, সে শুধু স্বার্থসর্বস্ব নয়, নিষ্ঠুরও।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বাড়ি যখন সে ফিরিল, বেলা তখন অনেক হইয়াছে। উনানে আগুন দিয়া বিনোদিনী রান্না করিতে বসিয়াছে, আর ছেলেটা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে।

'নিজে সামলাতে পারে না, তবু একটা লোক রাখবে না!' বলিয়া ছেলেটাকে বিনোদ কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল, 'কি রকম যে স্বভাব কে জানে!'

বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, 'কি বললে?'

ভিখারী ছেলেটাকে না পাইয়া মনের অবস্থা তাহার খারাপ হইয়াই ছিল, তাহার উপর খোকা কিছুতেই চুপ করিতেছে না, বিনোদ বলিল, 'বলছি তোমার মাথা! একটা লোক রাখলে কী এমন—'

কথাটা তাহাকে বিনোদিনী শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'না না ওই যে স্বভাব না কি বললে!'

বিনোদ বলিল, 'হ্যাঁ, বললাম, স্বভাব তোমার ভারী খারাপ।'

বিনোদিনী বলিল, 'হুঁ, শহুরে মেয়ের মত খুব যদি তোমার খরচ করিয়ে দিতে পারতাম, তা হলে স্বভাব আমার ভাল হ'ত তা আমি জানি।—এস খাবে এস।'

বিনোদ খাইতে বসিল। কিন্তু বসিল আর উঠিল। খাইতে সে পারিল না কিছুই।

বিনোদিনী ভাবিল সে রাগ করিয়া খাইল না এবং তাহার জন্য সারাদিন ধরিয়া বিনোদিনীর মনে আর শান্তি রহিল না। ক্রমাগত এই বলিয়া গজগজ করিতে লাগিল, 'আমি সেরকম মেয়ে নই বাবা! স্বামীর একা ঘর পেয়ে দু দিনে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দেব—আমার দ্বারা তা চলবে না। তার জন্যে যদি আমার স্বভাব খারাপ বল তো বল—আমার ভারী বয়েই গেল!'

বিনোদ দেখিল, বাড়িতে আজকাল দুধ আসে না, ঘি আসে না, মাছ আসে না,—নিতান্ত গরিবের মত খাওয়া-দাওয়া চলিতেছে। ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বিনোদিনী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভাল কাপড় জামা আনিয়া দিলে সেসব সে বাক্সে তুলিয়া রাখে। ভাল খাবার আনিয়া দিলে খায় না, বরং পয়সা খরচ হইয়াছে বলিয়া চীৎকার করে।

বিনোদ বলিয়া বলিয়া হয়রান হইয়া গিয়াছে। বেশী কিছু বলিবারও উপায় নাই। বিনোদিনী ভাবে, তাহার বাপ-মা গরিব, স্বামী বোধ হয় তাহারই ইঙ্গিত করিতেছে এবং এই লইয়া শেষ

পর্যন্ত, বিনোদ প্রায়ই লক্ষ্য করিয়াছে, ব্যাপারটা অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া ওঠে।

বিনোদ আজকাল তাই চুপচাপ বাড়িতে ঢোকে, আবার চুপ-চাপ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়। স্বভাবের পরিবর্তন মানুষের হয় না। বিনোদিনীরও হইবে না। তাহা সে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে।

আহারাদির পর সেদিন রাত্রে ঘর-সংসারের কাজকর্ম সারিয়া বিনোদিনী বিনোদের ঘরে ঢুকিল হাসিতে হাসিতে। শুইয়া শুইয়া বিনোদ একটা বই পড়িতেছিল। মুখ তুলিয়া বিনোদিনীর দিকে তাকাইল। মন্দ লাগিল না। এত দিন পরে হয়তো সে তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছে। বিনোদ কি যেন তাহাকে বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বিনোদিনী বলিয়া বসিল, 'দিয়েছি আজ আচ্ছা করে শুনিয়ে!'

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকে?'

বিনোদিনী বলিল, 'ওই যে গো, ও-বাড়ির সেই বউটাকে। রোজ আসবে আর রোজ হাত পাতবে—দিদি, চারটি চিনি দেবে? দুটি আলু দেবে? একটু দুধ দেবে? একটা পান দেবে? কেন, আমি কি দানছত্র খুলেছি নাকি? আজ আমি এমন বলা বলেছি, লজ্জা থাকে তো সাত জন্মে আর চাইবে না।'

বিনোদ বলিল, 'হুঁ।'

আবার সে বইখানা তুলিয়া লইতেছিল, বিনোদিনী বলিল, 'কথাটা বুঝি তোমার ভাল লাগল না।'

বিনোদ বলিল, 'না।'

বিনোদিনী বলিল, 'কেন? না কেন?'

'দিলেই পারতে।'

'রোজ? রোজ চাইবে, আর রোজ দেব?'

কথার জবাব দিতে বিনোদের ভাল লাগিতেছিল না, তাই বোধ হয় অন্যমনস্ক হইয়াই বলিয়া ফেলিল, 'তুমি অত্যন্ত ছোটলোক।'

'ছোটলোক!'

আর যায় কোথা!—'আমি ছোটলোক?'

বিনোদিনী তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিল এবং নিজেই শেষে কাঁদিতে লাগিল, 'আমি ছোটলোক, আমার স্বভাব খারাপ, আমি তোমার সব উড়িয়ে পুড়িয়ে নষ্ট ক'রে দিলাম, আমাকে তোমার ভাল লাগে না, বেশ তা হলে আমি বিদেয় হই, আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে নিজে একটি ভাল দেখে বিয়ে ক'রে সুখে থাক।'

বিনোদও প্রথম দিকে উত্তেজিত হইয়া দু-এক কথা বলিয়াছিল, শেষের দিকে তাহার নীরবতা বিনোদিনীকে যেন আরও বেশী নাচাইয়া তুলিল। বলিল, 'আমি পুরনো হয়ে গেছি কিনা, আর আমাকে তোমার ভাল লাগছে না। কিন্তু এখন আমি মরব না। আমি বাপের বাড়ি গিয়ে বেঁচে থেকে সব দেখব। দেখব কোন্ মেয়ে তোমাকে কত সুখে রাখে!'

বিনোদিনীর একটা কথা বিনোদের বড় সত্য বলিয়া মনে হইল, বিনোদিনী সত্যই হয়তো তাহার কাছে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কিছুদিনের জন্য তাহাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিলে মন্দ হয় না।

সেই ব্যবস্থাই হইয়াছে। বিনোদিনী অনেক দিন বাপের বাড়ি যায় নাই। এইবার কিছুদিনের জন্য সে পল্লীগ্রামে তাহার মা-বাপের কাছে গিয়া থাকিবে। এখন পৌষ মাস। পৌষ মাসে যাইতে নেই। যাইবে মাঘ মাসের প্রথমেই।

কিন্তু বিধাতা হঠাৎ বাধ সাধিলেন। কিছুদিন হইতে বিনোদের মন এবং শরীর দুই-ই খারাপ যাইতেছিল; কিছু খায় না, অথচ খাইবার ইচ্ছা নাই, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, প্রত্যহ সন্ধ্যার দিকে মনে হয় যেন একটু একটু জ্বর হইতেছে, শীত-কালের রাত্রেও ঘাম যে কেন হয় বুঝিতে পারে না।

এতদিন ব্যাপারটা বিনোদ গ্রাহ্যই করে নাই। ভাবিয়াছিল, এ সব ঘটিতেছে শুধু মানসিক দুশ্চিন্তার দরুন। জ্বরটা হঠাৎ একদিন একটু বেশী হওয়ায় সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ডাক্তারের কাছে গেল পরীক্ষা করাইতে।

ডাক্তার বন্ধু। তিন চার দিন ধরিয়া নানা রকম করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'চেঞ্জে যাও।'

বিনোদ বলিল, 'চাকরি?'

ডাক্তার বলিল, 'তা হলে মর।'

বিনোদ একটুখানি হাসিল। বলিল, আমি বুঝতে পেরেছি। আমার টি-বি হয়েছে।'

ডাক্তার বলিল, 'বুঝতেই যদি পেরেছ তো আর কেন?'

বিনোদের বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মাই হইল তাহার! এ রোগে মানুষ বড় একটা বাঁচে না। নিজে তো মরেই, এমন কি কাছে যাহারা থাকে তাহারাও মরিয়া যায়। কিন্তু কেন? এ মারাত্মক ব্যাধি তাহার কেন হইল? ইহার জন্য কি তাহার স্ত্রীই দায়ী? এমনি সব নানান কথা ভাবিতে ভাবিতে বিনোদ বাড়ি ফিরিল। বাড়ি ফিরিয়াই সে তাহার নিজের ঘরে ঢুকিয়া বিনোদিনীকে বলিল, 'এ ঘর থেকে তোমার জিনিসপত্র সব সরিয়ে নিয়ে যাও। এ ঘরে আজ থেকে আমি একা থাকব।'

বিনোদিনী বলিল, 'পারব না। সারাদিন খেটেখুটে এই সব রাজ্যির জিনিসপত্তর আমি এখন টেনে টেনে সরাই! কেন, মাসের তো আর তিনটে দিন বাকী আছে, তিন দিন পরেই তো আপদ বিদেয় হয়ে যাচ্ছে, এই তিনটে দিন আর সইছে না তোমার?'

বিনোদ বলিল, 'থাক্, তবে আমিই ওই সিঁড়ির পাশের ঘরটায় চলে যাচ্ছি।'

বিনোদিনী বলিল, 'আমি তোমার এত বিষ হয়ে গেলাম? এত চক্ষুশূল?'

মুখে কিছু না বলিয়া নিজের বিছানাটা তুলিয়া লইয়া বিনোদ ঘর হইতে চলিয়া গেল।

দোসরা মাঘ বিনোদিনীর যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। বিনোদিনীর ছোট ভাই আসিবে। আসিয়া তাহাদের লইয়া যাইবে। বিনোদ মনে মনে ঠিক করিয়াছে, বিনোদিনীকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া, হয় সে একলা এই বাড়িতেই থাকিবে, আর নয় তো কোথাও কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গায় চলিয়া যাইবে।

বাপের বাড়ি যাইবার আগের দিন বিনোদিনী ঢুকিল বিনোদের ঘরে তাহার সঙ্গে ঝগড়া করিবার জন্য। বলিল, 'তাই ব'লে মনে ক'রো না যে আমি জন্মের মতন চ'লে যাচ্ছি।'

'আবার তুমি আমার ঘরে ঢুকেছ?'—বিনোদ চীৎকার করিয়া বলিতে গেল,—'বেরোও!'

এবং বলিতে গিয়াই কাশি! আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত!

বিনোদিনী কাছে আগাইয়া আসিল। বলিল, 'ও কি! রক্ত?'

বিনোদ বলিল, 'হ্যাঁ, চ'লে যাও এখান থেকে, নইলে তুমিও মরবে।'

বিনোদিনী একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। দুই চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া আসিল। ঠোঁট দুইটা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কি যেন বলিতে গিয়াও বলিতে পারিল না।

বিনোদ বলিল, 'এখনও দাঁড়িয়ে রইলে?'

বিনোদিনী তাহার বিছানার উপর ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল। নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, 'এ বেয়ারাম তোমার কবে থেকে হ'ল?'

বিনোদ বলিল, 'এ ব্যারাম কি, তা তুমি জান?'

বিনোদিনী বলিল, 'জানি।'

'কেমন ক'রে জানলে?'

'আমাদের গাঁয়ের তিনুকাকার হয়েছিল। কেউ তার পাশ ঘেঁষত না। ম'রে গেল।'

শেষের কথাটা বলিতে গিয়া আবার তাহার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

এমন সময় বাহির হইতে কে যেন ডাকিল, 'দিদি!'

ডাক শুনিয়া বিনোদিনী তাকাইয়া দেখিল, তাহার ছোট ভাই হারু দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে নিতে এলি হারু?'

হারু বলিল, 'জামাইবাবু লিখেছেন যে!'

বিনোদিনী বলিল, 'যাওয়া আমার হ'ল না হারু। আমি একখানি চিঠি লিখে দিই। তুই এক্ষুণি বাড়ি চ'লে যা। গিয়ে মাকে আর মেজদাকে পাঠিয়ে দি গে।'

হারু কি যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বিনোদ ডাকিল, 'শোন!'

বিনোদিনী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'কি?'

বিনোদ বলিল, 'ও আবার কি হচ্ছে? সবাইকে মারবে নাকি? তুমি যাও।'

বিনোদিনী বলিল, 'আমি মরব না, তোমার ভয় নেই। মেয়েরা সহজে মরে না। খোকাকে বাঁচাই আগে।'

গ্রাম হইতে বিনোদিনীর মা আসিলেন। মেজদাদা আসিল। ফাঁকা বাড়ি। এই কয়জন মানুষেই আবার গমগম করিতে লাগিল।

মা রহিলেন খোকাকে আগলাইয়া। মেজদা ডাক্তার এবং ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। আর বিনোদিনী কাহারও কোনও নিষেধ-বারণ না শুনিয়া বিনোদের কাছেই পড়িয়া রহিল।

ডাক্তার আসিলে বিনোদিনীকে ঘর হইতে বাহিরে যাইতে হয়। নিউমোথোর‍্যাক্সের সময় থাকিতে দেয় না।

দরজার কাছে সে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ডাক্তারের প্রত্যেকটি কথা উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেখান হইতে কিছুই সে শুনিতে পায় না।

মাসখানেক পরে দেখা গেল, বিনোদের জ্বর বন্ধ হইয়াছে। রক্ত এবং কাশি, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ডাক্তার তখনও আসে। রীতিমত চিকিৎসা চলিতে থাকে। বিনোদিনী কিছুই বুঝিতে পারে না।

একদিন সে তাহার মেজদাদাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাক্তার কি বলে মেজদা? উনি কেমন আছেন?'

মেজদা বলিল, 'ভাল।'

বিনোদিনী বলিল, 'ভাল তো আমি চোখেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু শুনেছি নাকি এ রোগ হ'লে মানুষ বাঁচে না। সেই কথাটা ডাক্তারকে একবার তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার?'

'না, তা আমি পারব না।' বলিয়া মেজদা চলিয়া গেল।

বিনোদিনী খানিকক্ষণ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রোগী দেখিয়া ডাক্তার সেদিন সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছিলেন, লজ্জা শরম পরিত্যাগ করিয়া বিনোদিনী নিজেই তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'উনি কেমন আছেন?'

ডাক্তার বলিলেন, 'ভালই আছেন।'

বিনোদিনী বলিল, 'ও রকম মন-রাখা কথা আমি অনেক শুনেছি। আপনি বলুন—উনি আর কত দিন বাঁচবেন।'

ডাক্তার ঈষৎ হাসিলেন। বলিলেন, 'আপনার স্বামী সেরে গেছেন।'

বিনোদিনী বলিল, 'এ রোগ হ'লে মানুষ সারে?'

ডাক্তার বলিলেন, 'সারে। তাড়াতাড়ি জানতে পারলে নিশ্চয়ই সারে।'

'সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি।'

বিনোদিনী খুশী হইয়া বিনোদের ঘরে গিয়া ঢুকিল। সিঁড়ির পাশেই বিনোদের ঘর। সে যে শুইয়া শুইয়া সব কথা শুনিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। আজকাল মেজাজ তাহার একটুখানি রুক্ষ হইয়া গেছে। বিনোদিনীকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল, 'আর বুঝি সেবা করতে পারছ না?'

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?'

বিনোদ বলিল, 'লজ্জার মাথা খেয়ে ডাক্তারকে তাই জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলে—আমি কবে মরব?'

দাঁতে দাঁত চাপিয়া বিনোদিনী বলিল, 'হ্যাঁ'।

বলিয়াই সে দুম্ দুম্ করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। বুকের ভিতরটা তাহার তোলপাড় করিতে লাগিল। সারা পৃথিবীটা মনে হইল যেন ঘুরিতেছে।—না, না, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। সকলেই তাহাকে স্তোকবাক্য দিয়া ভুলাইতে চায়। এ রোগে মানুষ কখনও বাঁচে না। তাহাদের গ্রামের তিনুকাকাকে সে স্বচক্ষে মরিতে দেখিয়াছে। ময়না-বউএর বাবা মরিয়াছে। সুধীরার দুটি ভাই মরিয়াছে এই রোগে। কাহাকেও সে বাঁচিতে দেখে নাই। ডাক্তার, ঔষধ, পথ্য কিছুই নয়। ডাক্তারের শুধু টাকা লইবার ফন্দি। হরদম তাহাদের টাকা লইতে হয় বলিয়া মুখে তাহারা সান্ত্বনা দেয়—ভাল আছে। শিবের অসাধ্য এই ব্যাধি সারাইবার সাধ্য কাহারও নাই!

বিনোদিনী তাই আশ্রয় লইল দৈবের। নির্বিচারে চলিল ব্রত, উপবাস, পূজা অর্চনা, আর নিজের দেহের উপর অমানুষিক অত্যাচার। সময় নাই—অসময় নাই স্নান, আর ঠাকুরদেবতার কাছে মাথা কুটিয়া কুটিয়া প্রার্থনা!—এই হইল তাহার সারা দিনের কাজ!

মা নিষেধ করিলেন। মেজদা নিষেধ করিল। কিন্তু কাহারও নিষেধ-বারণ সে শুনিল না। এমন কি বিনোদের ঘরে যাওয়া পর্যন্ত সে বন্ধ করিয়া দিল।

বিনোদ এক-এক দিন জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় সে?'

মেজদা বলে, 'ডেকে দেব?'

বিনোদ বলে, 'না, থাক।'

মনে মনেই ঈষৎ হাসিয়া বলে, আরোগ্য-আশাহীন এই পরিচর্যায় নিশ্চয়ই সে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহা ছাড়া নিজের মরিবার ভয় তো একটা আছে! এতদিন পরে হয়তো সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে।

বিনোদকে একদিন ডাক্তার বলিয়া গেলেন, 'আর কোনও ভয় নেই। এবার তুমি চেঞ্জে যাও।'

তাহাই স্থির হইল।

চেঞ্জে যাইবার সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা চলিতেছে, এমন সময় মা আসিয়া বিনোদকে খবর দিলেন, বিনোদিনীর ভয়ানক জ্বর আর কাশি!

আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। সকলেই বুঝিল, তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে। হইবার কথাই।

বিনোদের চেঞ্জে যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। বিনোদিনীর বাপের বাড়ি যাইবার আগের দিন বিনোদও ঠিক এমনি করিয়াই তাহার যাওয়া বন্ধ করিয়াছিল।

ডাক্তার আসিলেন। বিনোদিনীকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গেলেন, 'যক্ষ্মা নয়, নিউমোনিয়া।'

তবু রক্ষা। সকলেই আশ্বস্ত হইল। মা বলিলেন, 'যখন

তখন চান করতে আমি কত বারণ করেছিলাম। কিন্তু বারণ শোনবার মেয়ে ও নয় বাছা।'

যাই হোক, চিকিৎসা চলিতে লাগিল। অক্সিজেন দেওয়া হইল।

এবং কয়েক দিন চিকিৎসার পর, সেদিন সন্ধ্যায় বিনোদিনী অচৈতন্য অবস্থায় ক্রমাগত ভুল বকিতেছিল। বিনোদ শিয়রের পাশে বসিয়া আছে। এদিকে মা দাঁড়াইয়া আছেন তাহার ছেলেটিকে কোলে লইয়া।

বিনোদিনী হঠাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ক্ষীণকণ্ঠে কি যেন বলিতে লাগিল। এমন সে আজ কয়েক দিন ধরিয়া কতই বলিতেছে, সেদিকে কান দেওয়া কেহই প্রয়োজন মনে করিল না। কিন্তু বিনোদ ছিল কাছেই বসিয়া। সে-ই শুধু স্পষ্ট শুনিতে পাইল, বিনোদিনী বলিতেছে, 'আমি ছোটলোক! বড়লোকের মেয়ে একটি এনো। আমি দেখব কোন্ মেয়ে তোমাকে সুখে রাখে।'

তাহার পরেই সব চুপ!

বিনোদ তাহার মুখের পানে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। ডাকিল, 'বিনোদিনী!'

সে-ডাক সে শুনিতে পাইল কি না কে জানে! দেখা গেল, তাহার স্তিমিত দুটি চোখের কোণ বাহিয়া ক্ষীণ দুইটি অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

ডাক্তার ঘন ঘন নাড়ী দেখিতেছিলেন। হঠাৎ এক সময় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'শেষ।'

বিনোদের বাড়িখানি আবার তেমনি আগেকার মতই ফাঁকা। বিনোদিনী চলিয়া গিয়াছে। ছেলেটাকে লইয়া তাহার মাও গ্রামে চলিয়া গিয়াছেন।

বিনোদিনীর সঙ্গে বিনোদের বোধ করি শুধু নামের মিলই হইয়াছিল, মনের মিল হয় নাই। এবং সেই জন্যই কি না জানি না, বিনোদিনীর শেষ অনুরোধ বিনোদ কিছুতেই রক্ষা করিল না।

আবার সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে—বিবাহ সে জীবনে কোনও দিনই করিবে না।

আলপনা

শ্রীসু:—

চিত্রাংকণ : শ্রীঅমলা বসু, শান্তিনিকেতন কলাভবন

আলপনা চিত্রশিল্পের উদ্ভব কবে হয়েছিল তা আজকের দিনে গুনে বলা সম্ভব নয়, তবে এ রীতি যে প্রাচীনতম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আলপনা চিত্রশিল্প একান্তভাবে বাঙলারই লোকশিল্প, এ কথা সত্য নয়। ভারতের নানা প্রদেশে, নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে এর প্রচলন আছে। এ শিল্প বিশেষ করে ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ তাও সত্য নয়। ভারতের বাইরে সভ্য অসভ্য নানা জাতির মধ্যে এই শিল্পরীতির প্রচুর নিদর্শন রয়েছে।

উত্তর ভারতে গ্রামবাসীদের মধ্যে গৃহভিত্তি ও দেওয়ালগাত্র চিত্রশোভিত করার রীতি বহুদিন থেকে চ'লে এসেছে। ছোট-নাগপুরের আদিবাসী যারা, কোল ওঁরাও ও মুণ্ডা—এদের মধ্যে আলপনার চর্চা খুবই প্রচলিত। ঘরের মেঝেতে গিরিমাটি দুধে-মাটি ও আরও নানা রঙিন মাটির রঞ্জক তৈরী ক'রে এরা যে সব চিত্র রচনা করে তা দেখতে যেমন নয়নাভিরাম, শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়েও তা প্রথম শ্রেণীর। এই শিল্পরীতির উৎস খুঁজতে গেলে প্রাক্-ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়ে এসে ঠেকতে হয়।

বাঙলার যে আলপনা শিল্প, তার মধ্যেও আদিম শিল্পরীতির নমুনা সুস্পষ্টভাবে বর্তমান। যুগে যুগে এর মধ্যে নানা নতুন প্রথা ও বিষয়বস্তু যোজিত হয়েছে; কিন্তু আদিম মানুষের শিল্পপ্রাণতার প্রমাণস্বরূপ একটা অতি প্রাচীন রীতি এর মধ্যে আজও জড়িয়ে আছে। আলপনা চিত্রশিল্পকে লোকশিল্প বলা হয়। একে আটপৌরে শিল্প বলা উচিত। অজন্তা, এলোরা, কোনারক কাংড়া উপত্যকা বা আবু পাহাড়ের রীতি ও সার্থকতা ভিন্ন রকমের। এরা অনেকটা কীর্তিস্তম্ভের মত। প্রতিভাবান শিল্পী তাঁর কীর্তি পাথরের স্তূপে ও গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ ক'রে রেখে গেছেন। দশ জনে তাই উপভোগ করেছে শুধু দর্শক হিসাবে। আলপনার চিত্ররীতি এ ধরনের নয়। এর সঙ্গে সংগীতের শিল্পধর্মের তুলনা হ'তে পারে। একজন গুণীর একটি গান শুধু পাঁচজনে শুনে উপভোগ করে না; পাঁচজনে সে গান গেয়েও উপভোগ করে। আলপনাও তেমনি। শুধু কটি দিনের জন্য কয়েকটি প্রহরের জন্য মানুষ টেনে আনে তার মনের সুগুপ্ত শিল্পীকে। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকে কয়েকটি ছবি; তার পরেই তাকে মুছে ফেলা হ'ল। সুতরাং আটপৌরে চিত্রশিল্প ব'লে যদি কিছু থাকে, যাকে অন্নপান বা পরিচ্ছদের মত আমরা অহরহ প্রয়োজন বোধে ব্যবহার করি তা এই আলপনা শিল্প।

কেউ কেউ ব'লে থাকেন, প্রাচীন চিত্রাক্ষরের (heiroglyph) ক্রমবিবর্তন হয়ে নাকি আলপনার সৃষ্টি হয়। ভাষার লিখন রীতিতে যেদিন বর্ণের উদ্ভব হ'ল সেদিন আর চিত্রাক্ষরের বোঝা বইবার কারণ রইল না। কিন্তু পুরাতন কালের সাধনালব্ধ চিত্রাক্ষরকে মানুষ আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে পারল না। চিত্রাক্ষরকে টেনে আনা হ'ল চিত্রের ক্ষেত্রে। তারই রূপের খানিকটা অদল বদল ক'রে যে সরল ও লোকগ্রাহী চিত্রসৃষ্টির প্রথা উদ্ভূত হ'ল তাই না কি আলপনাশিল্পের আদিপুরুষ।

এ অনুমানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ রয়েছে। চিত্রাক্ষর থেকে আলপনা চিত্রের জন্ম, এটা কষ্ট-কল্পনা মাত্র। কেননা চিত্র আগে, অক্ষর পরে। অক্ষর থেকে চিত্রে আসবার কোনও কারণ থাকতে পারে না। প্রাক্-ইতিহাসের মানুষেও ছবি আঁকত। আলপনারও সৃষ্টিকর্তা তাঁরাই। চিত্র থেকে অক্ষরের জন্ম হয়েছে, তার পর অক্ষর তার ভিন্ন পথে উৎকর্ষ অর্জন ক'রে এসেছে।

সুদূর অতীতে আলপনাচিত্রের যে রীতি ছিল আজ তা নেই। কিন্তু নিকট অতীতে যে রীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল আজ তার ব্যতিক্রম হয় নি। অর্থাৎ অনেকদিন শুধু একটা conventionএর অধীনে গতানুগতিকতা ক'রে আসা হয়েছে। এও অনেকটা হিন্দু শিল্প-শাস্ত্রের প্রতিমালক্ষণ অনুসারে মাছিমারা ভাস্কর্য চর্চার মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আজকের আলপনা-শিল্প সুপ্রচলিত বটে, কিন্তু এর রীতি archaic হয়ে গেছে। রীতির উৎকর্ষ অনেকদিন আগেই মন্দীভূত হয়েছে। বাঙলার এই রীতিগত আলপনার কতকগুলি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, এর উপকরণ। এত রঙ থাকতে পিটুলি গুলে একটা অতি দুর্বল সাদা রঙের ব্যবহার। এর মধ্যে অতি দূর ইতিহাসের স্মৃতি প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে সুপ্রাচীন কালের অতি ক্ষীণবুদ্ধি বর্বর মানুষের হাত দেখতে পাওয়া যায়। আঙিনায় গোময় লেপন যেমন বুদ্ধিহীন বর্বর মানুষের রীতি ছিল—যখন মাটি আর জল মিশিয়ে একটা কাদার তাল প্রস্তুত করার মত বুদ্ধি ও প্রতিভা মানুষের ছিল না।

যদিও সাদা রংএর ব্যবহারই আলপনা শিল্পে সব চেয়ে বেশী প্রচলিত, অন্যান্য রংএর ব্যবহার একেবারে নির্বাসিত নয়। মাঘমণ্ডলের ব্রতে রংএর বিচিত্রতা আছে। কিন্তু রংএর নাম শুনলে হাসি পায়; সেগুলো আবার আমাদের সেই অতিবৃদ্ধ পিতৃ-পুরুষদের দারিদ্র সংসারের একটি স্মৃতি জাগিয়ে তোলে—প্রাক্-ইতিহাসের মানুষের নগণ্য শিল্পোকরণ। সবুজ রংএর

জন্য বেলপাতা গুঁড়ো, হলদে রংএর জন্য হলুদ, কালো রংএর জন্য ভুসা, আর লাল রংএর জন্য ইট।

আলপনা চিত্রের টেকনিকের বৈশিষ্ট্য এর রেখাঙ্কনের পদ্ধতিতে। কোথাও রেখার ঋজুতার বালাই নেই। প্রত্যেকটি টান সুবলয়িত—প্রত্যেক ঠাট বর্তুল। এর মধ্যে জ্যামিতিক সৌকর্য কোথাও নেই। শুধু রেখার হিল্লোল কোথাও ঋজু রুক্ষ আঁচড় বা কোণের চিহ্ন নেই। নদী প্রবাহের মত রেখাগুলির মধ্যে এই গতির ছন্দই আলপনা চিত্রের টেকনিকের প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

বাঙলার ব্রত পার্বণের সঙ্গে আলপনা চিত্র একাত্মভাবে সংযুক্ত। এও আলপনা শিল্পের প্রাচীনতার আর একটি প্রমাণ। বাঙলার ব্রতধর্ম বেদ, বেদান্ত, পুরাণ বা তন্ত্র থেকে আসে নি। আদিম বাঙালীর ধর্মোৎসব এই ব্রত। এর আখ্যায়িকাগুলিও প্রাচীন ইতিহাসের টুকরো টুকরো এক একটি বিস্মৃত অধ্যায়।

কিন্তু আলপনা যতদিন প্রতিভার আওতায় ছিল ততদিন এর ক্রমোৎকর্ষ হয়ে এসেছে। তাই দেখতে পাই বাঙলার আলপনায় নানা পৌরাণিক দেবদেবীর ভিড়। আবার মনসা রক্ষাকালীও আছে। এমন কি, বনদেবীর পুজোর কথাও চিত্রে আছে। বনদেবীর ছবি! এ নিকট অতীতেরও ইতিহাস নয়। আলপনা ও ব্রত কত পুরাতন এই তার প্রমাণ। এমন দিন ছিল যখন অরণ্যের মধ্যেই মানুষকে সংসার পাততে হয়েছিল। সেদিন সে পুজো করত বনদেবীকে।

'তারা ব্রতে'র আলপনার মধ্যে আদিম মানুষের কল্পনা-কুশলতার নিদর্শন পাওয়া যায়। পৃথিবীর গাছ-পালা পশু-পাখি ছাড়াও এতে আছে চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্র। আকাশমণ্ডলে যে জ্যোতিষ্করাজ্য প্রতি রাত্রে ফুটে ওঠে তা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনাকে চিরকাল উদ্দীপ্ত করে এসেছে। তারা-ব্রতের আলপনা চিত্রে সৌরজগতের কল্পনালব্ধ একটি প্রতিচ্ছবি দেবার প্রয়াস
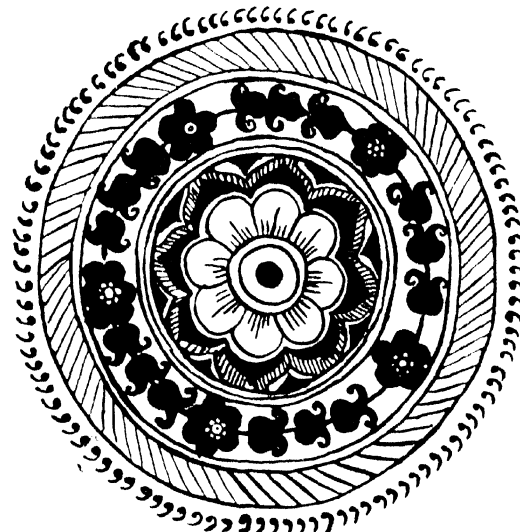
রয়েছে। আলপনাবৃত্তের শীর্ষে স্ফুরিতরশ্মি সূর্যদেব—মধ্যে ষোড়শ নক্ষত্র সমন্বিত বিশ্ব জগৎ আর নিম্নে পূর্ণচন্দ্র।

আলপনার টেকনিকে বৃত্তের স্থান খুব বেশী। প্রত্যেক আলেখ্যতে দেখা যায় একটি বড় বৃত্ত। এই বড় বৃত্তের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ছোট ছোট কয়েকটি বৃত্ত। বৃত্তের পরিধিগুলির মাঝামাঝি যে স্থান তা নানা সূক্ষ্মতর চিত্রকার্যে অলংকৃত।

আলপনা শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এ শিল্পের শিল্পী প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নারী। বর্তমানে অবশ্য কোনও পুরুষকে আলপনাশিল্পে দেখা যায় না। কিন্তু এককালে এ সাধনার বিস্তর পুরুষ সাধক ছিল, এমন অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। যেদিন থেকে পরিবারবন্ধন ও গৃহকর্মের একটা রীতি প্রচলিত হ'ল সেইদিন থেকেই এই শিল্প সাধনায় কর্তব্য মেয়েদের উপরই ন্যস্ত হল; যে কারণে রন্ধন প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি কর্তব্য মেয়েদেরই উপর বিশেষ ক'রে অর্পিত হয়েছে।

ময়মনসিংহ গীতিকায় আমরা কাজলরেখার কাহিনী পড়ি। এককালে মেয়েদের ব্রত নিষ্ঠা ও তার সঙ্গে আলপনানিষ্ঠা কতখানি ছিল কাজলরেখার এ কাহিনীতে তার বর্ণনা আছে।—শালিধানের চাল একরাত্রি আগে ভিজিয়ে রেখে পরদিন পিটুলি ক'রে কাজলরেখা আলপনা আঁকতে বসল। কত ছবি সে আঁকল তার একটা ফিরিস্তিও আছে। মনসা, বনদেবী, শিব-পার্বতী, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, রক্ষাকালী, কার্তিক, গণেশ, রাম-সীতা, পুষ্পক-রথ, সমুদ্র, সূর্য, চন্দ্র; আরও আঁকল গভীর বনের মধ্যে জীর্ণ মন্দিরের ভিতর মৃত রাজকুমারের মূর্তি। বলা বাহুল্য এতগুলি বিষয়-বস্তু যে চিত্রণে ফুটে উঠেছিল তার টেকনিকে নিশ্চয়ই বিচিত্রতাও অজস্র পরিমাণে ছিল। নইলে পিটুলির মত মামুলী একটা উপকরণে এত রসাঢ্য চিত্রাঙ্কন সম্ভব হত না।

এখন প্রশ্ন, আলপনা চিত্রশিল্পের কোনও সার্থকতা আজকের দিনে আছে কি না। আলপনা চিত্রশিল্পের সার্থকতা তো আছেই। এর প্রয়োজন আজকের দিনে আরও বেশী ক'রে উপলব্ধি করবার সময় এসেছে। আজকের দিনের প্রতিভাবান শিল্পীর মহৎ একটি কর্তব্য রয়েছে এই দিকে। আলপনাকে তার প্রাচীন রীতিবন্ধন থেকে মুক্তি দিতে হবে—এর archaic দুর্বলতা ঘুচিয়ে নতুন রূপ দিতে হবে। তার কারণ এতটা লোকময় শিল্প বাঙলায় দ্বিতীয় আর নেই। আলপনাকে যদি নতুনভাবে শিল্প-প্রাণ ক'রে তুলতে পারা যায়, তবে তা জাতিকে মনে প্রাণে শিল্প-প্রবণ ক'রে তুলবে। তাতে জাতির সমষ্টিগত প্রতিভাকে উত্তরোত্তর নব নব সৃষ্টির প্রেরণায় টেনে নিয়ে যাবে। পিটুলি-শ্রদ্ধা ছেড়ে দিয়ে, পেঁচা-পেঁচীর প্রতি অতি-ভক্তি না দেখিয়ে আজ শিল্পীকে গ্রহণ করতে হবে নানা রংএর তুলিকা। তাকে নূতন দৃশ্যবস্তুর অবতারণা করতে হবে, আধুনিক মানুষের কল্পনাকে রূপায়িত করতে হবে।

ব্যবহারিক শিল্পের দিক দিয়ে আলপনার সার্থকতা খুব বেশী। শাল আলোয়ানের শাড়ির পাড়, কার্পেট, জাজিম ও গালিচা, চাএর ট্রে, মৃন্ময় বা দারুময় গৃহোপকরণ এ সব সামগ্রীকে

আলপনা রীতিতে সুশোভিত করা চলতে পারে। এতে সামাজিক ভাবে জাতির রুচির উৎকর্ষ সাধিত হবে।

আলপনা চিত্রশিল্পের কথাপ্রসঙ্গে আর একটা কথা স্বতঃই মনে আসে। ভারতীয় অথবা বঙ্গীয়, কোনও সুপ্রাচীন শিল্প-

রীতি আজ বেঁচে নেই। অজন্তার চিত্রকর যেদিন তার তুলি নামিয়ে রেখে গেছে সেই দিন থেকে সে চিত্ররীতিরও আয়ু ফুরিয়ে গেছে। কোনারক ভুবনেশ্বর গড়েছিল যে ভাস্কর, তারা আজ নেই, তাদের শিল্পরীতিও আজ নেই। নৃত্যে এবং নাট্যেরও এই একই পরিণতি। এ থেকেই মনে সংশয় হয় যে ওই সব শিল্পরীতি দশের মধ্যে কখনও প্রসার লাভ করে নি, অথবা প্রসারের চেষ্টা হয় নি। জাতি ও শিল্পীর মধ্যে একটা আভি-জাত্যের দূরত্ব ছিল। তাই এ শিল্পরীতির পরিণতি যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে। অন্যদিকে দেখতে পাই, আলপনা চিত্র-শিল্প আজও বেঁচে আছে। এর এই প্রাণবত্তার মূলে হ'ল তার লোকময়তা। একটা বিশ্ববিদ্যালয় যা করতে পারে না, আলপনা প্রথা তাই করেছে। শিল্পকে সমাজের রক্তমাংসের ভিতর এমন-ভাবে আত্মস্থ ক'রে নেবার উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায়।

কাজেই আলপনার উৎকর্ষ সাধনের যে কথা বলা হয়েছে, সমস্ত জাতিকে নবতর শিল্পসাধনায় দীক্ষিত করার তা একমাত্র পন্থা। কারণ আমরা বিশ্বাস করি না শিল্পের সার্থকতা শুধু গুটিকয়েক শিল্পীর ব্যক্তিগত কল্পনা স্ফূর্তি বা কয়েকটি রসিকের তৃপ্তি সাধনের জন্য। শুধু রাজরাজড়া, ধনী ও গুণীর স্টুডিও বা বৈঠকখানা, অথবা সরকারী গ্যালারি বা মিউজিয়ম সুশোভিত করার জন্য শিল্প, এ ধারণাকে আমরা আমল দিই না। আলো বাতাসের মত শিল্পকেও আমরা জাতির সম্পদরূপে দেখতে চাই।

আলপনা একদিন এই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অখ্যাতির আড়ালে তাকে অনেকদিন চাপা প'ড়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু তার সজীবতা আজও লুপ্ত হয় নি। আজকের দিনে চারদিকে লোকশিক্ষার বুলি শুনতে পাই। লোককে অ আ ক খ শেখানার জন্য এই বুলি। এতেই গলদঘর্ম হবার উপক্রম। কিন্তু লোক-শিল্প-শিক্ষার যদি প্রয়োজনীয়তা আছে ব'লে মনে করা হয় তবে তাতে এই গলদঘর্ম হবার আশঙ্কা নেই। শিল্প শিক্ষার জন্য সত্যিকারের বিদ্যা ব্যবস্থা আমাদের এই আলপনা প্রথার মধ্যেই রয়েছে।

তবু
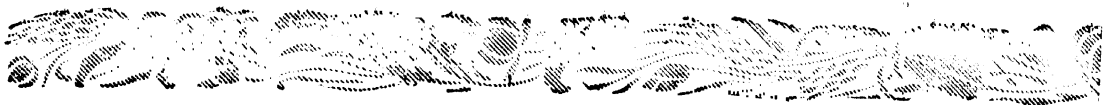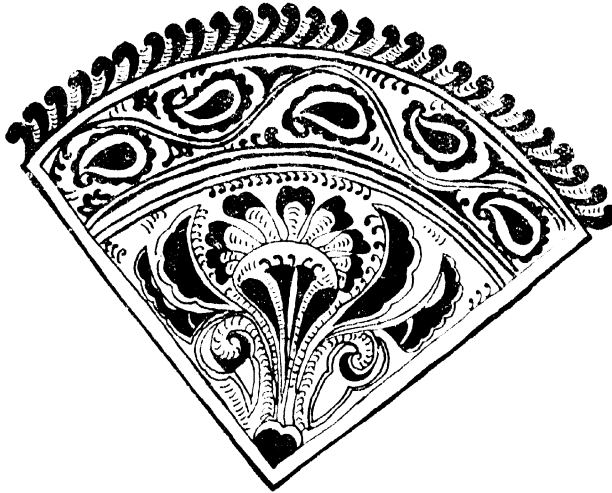
শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

সাধারণতঃ যে সময় আমি উঠি তখনও একটু অন্ধকার থাকে। রাস্তায় কেবল লোক চলাচল শুরু হয়। বর্ষার দিনে আকাশে মেঘেরা ছুটে চলে অবিশ্রান্ত স্রোতে একদিক থেকে দিগন্তরে। সামনের বাড়ির একটা উঁচু বাঁশের উপর একটি শঙ্খচিল গম্ভীর-ভাবে কি যেন ভাবে। চারিপাশের বাড়ির ছাদের আলসেয়, কার্নিসে পায়রাগুলির বক-বকম শুরু হয়ে যায়। আর অসংখ্য পাখি যেন হাওয়ার সমুদ্রে কত বিচিত্র ভঙ্গিতে সাঁতার দিতে থাকে।

একখানা ডেক চেয়ার পেতে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় ছাদে এসে বসি। খবরের কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে যায়। ব'সে ব'সে পড়ি।

তত ভোরে এ-পাড়ায় কেউ ওঠে না। শুধু দেখি, দূরের একটা বাড়ির ছোট ছেলে অত ভোরে উঠে শূন্য দৃষ্টিতে ঘোলাটে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। কিছুদিন হ'ল তার মা মারা গেছে। কে বলেছে, ওই মেঘের ওপারে স্বর্গলোকে তার মা রয়েছে। নিদ্রাহীন শিশু ভোরের আকাশ একটু স্বচ্ছ হ'লেই জানলায় এসে বসে। আশা, মেঘের ওপারে স্বর্গলোক থেকে যদি তার মা তাকে দেখতে পেয়ে একটি বার নেমে আসে, একটি বার তাকে কোলে ক'রে চুমু দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়!

ওই ছেলেটির কাহিনী আমি শুনেছি। চেয়ে চেয়ে ওকে যত দেখি, ততই রহস্যময় মনে হয়। স্বর্গের চেয়েও রহস্যময় ওর চোখ, গভীর, নীলাভ। কেমন যেন ভাসা-ভাসা ওর চোখের দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ নয় কিন্তু স্থির, অচঞ্চল। কারও দিকে যখন চায়, কাকের মত ঘাড় বাঁকিয়ে চায়। কারও কথা ও যেন ঠিক বুঝতে পারে না। কাকেও যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। সমস্ত দিন ও কোথায় থাকে, কি করে জানি না। কিন্তু ওর বয়সী কোনও ছেলের সঙ্গে ওর ভাব নেই। কারও সঙ্গে বড় একটা ও মেশেও না।

সবাই বলে, ছেলেটা পাগল হবে বোধ হয়। এখন থেকেই নাকি তার লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে।

নাম কমল।

কত বয়স হবে? সাত, আট, কি নয়। ফরসা রং, বেশী রোগাও নয়, বেশী মোটাও নয়। পরনে সব সময়েই বোধ একটা রঙিন নিকারবোকার। পায়ে একটা লোহার বালা।

ভারী ইচ্ছা করে ওর সঙ্গে ভাব করতে। ভারী ইচ্ছা করে ওকে জানতে। কিন্তু পাগল ছেলে! আমার দিকে ও বোধ হয় চেয়েই দেখে না। আকাশের দিকেই চেয়ে থাকে। ডাকলে কি ও সাড়া দেবে। যা তন্ময় হয়ে আকাশ দেখে!

একদিন ওকে ডাকলাম।—

খোকন, খোকন, খোকন!

ও সাড়া দিলে না। ফিরে চাইলেই না।

পাগলই বটে!

তবু ওর দিক থেকে কিছুতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারি না। ও যেন আমাকে কেমন ক'রে টানে! ফিকে হয়ে আসে ভোরের মায়া, ফিকে হয়ে আসে উদয়াকাশের বর্ণসুষমা!

সেদিন সকালে আকাশে শুরু হ'ল ঘনঘটা ক'রে মেঘের সমারোহ। কোথা থেকে কালো কালো মেঘ এসে পূর্ব দিকের সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেললে। সেই মেঘের গুরু গুরু কী গর্জন!

জানি প্রভাতের মেঘাড়ম্বর, বৃষ্টি হয়তো হবে না। তবু ভয় হ'ল।

খবরের কাগজ গুটিয়ে উঠতে যাচ্ছি কেবল, এমন সময় ডাক শুনলাম,—উঠছ কেন? ব'স না!

সেই ছেলেটি!

—আমাকে বলছ?

—হ্যাঁ। আর একটু ব'স না।

আমি হাসলাম। বললাম, বৃষ্টি আসছে যে!

—তা হ'ক। তুমি ব'স। নইলে একা আমার ভয় করবে।

তার চোখে কাতর মিনতি। সে কি তবে আমারই ভরসায় অত সকালে উঠে আমারই সাহসে জানলায় একা ব'সে থাকে? আমাকে সে তবে দেখেছে?

মেঘের দিকে একবার চেয়ে আমি আবার ডেক-চেয়ারটায় বসলাম।

দেখলাম, ছেলেটার দৃষ্টি আবার আমার উপর থেকে আকাশে নিবদ্ধ হয়েছে।

বললাম, তুমি ভেতরে যাও না খোকন!

আকাশের দিকে চেয়ে সে শুধু বললে, না।

এ তো বড় আশ্চর্য! নিজেও ও জানলা থেকে নড়বে না, আমাকেও নড়তে দেবে না!

ডাকলাম, খোকন!

সাড়া দিলে না।

—খোকন!

এবারে ও আমার দিকে চাইলে। গম্ভীর ভাবে বললে, আমি খোকন নই, কমল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কমল। তুমি আমাদের বাড়ি আসবে?

—না।

—এস না; চকোলেট দেব, লজেঞ্জ দেব, কত কি দেব। আসবে?

কমল একবার দ্বিধাভরে কি যেন ভাবলে।

বললে, কি ক'রে যাব? দরজা বন্ধ যে!

—বেলা হ'লে যখন দরজা খুলবে, তখন আসবে?

অনেকক্ষণ ভেবে অবশেষে কমল বললে, তোমাদের বাড়ি টিয়া-পাখি আছে?

—আছে।

—যাব তা হ'লে। তুমি এসে নিয়ে যেয়ো।

—তাই যাব। তা হ'লে আসবে তো?

—হুঁ।

অকারণে আমার মনটা খুব খুশী হয়ে উঠল। অথচ কেন? একে নিতান্ত ছোট ছেলে, তায় পাগল! ওর সঙ্গে কি গল্পই বা আমি করতে পারি? হয়তো কোনও গল্পই করব না। আমাদের বাড়ির নতুন আবেষ্টনে এসে হয়তো ও অবাক হয়ে চারিদিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চাইবে। আর আমি ওর বিস্মিত, আশ্চর্য চোখের দিকে চেয়েই খুশী হয়ে উঠব।

তার বেশী আর কি হ'তে পারে?

কালো মেঘের মাথায় মাথায় সোনালী রেখা ফুটে উঠল। দেখতে দেখতে মেঘ কখন উড়ে গেল। সূর্য উঠল, আগুনের পিণ্ডের মত লাল!

আমি ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলাম।

কমলকে আমি নিতে এসেছি শুনে কমলের বাবা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো?

হেসে বললাম, ব্যাপার কিছুই নয়। এমনি বেড়াতে যাবে।

—বেড়াতে? কিন্তু ও কি আপনাকে চেনে?

—চেনে।

—চেনে? ও তো বাড়ি থেকে কোথাও বেরয় না। কি ক'রে চিনবে আপনাকে?

বললাম, সমস্ত কলকাতা শহর যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন আমরা দুটিতে থাকি জেগে। আমি থাকি আমার ছাদে, ও থাকে জানালায়। সেই সূত্রে দুজনে বন্ধুত্ব হয়েছে।

আমি আবদারের ভঙ্গিতে হাসলাম। কিন্তু ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হ'ল, আমার বাড়িতে কমলকে পাঠাতে তাঁর ইচ্ছা নেই।

কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা।

বললাম, আমার বাড়িতে একটা টিয়াপাখি আছে। সেইটে ও দেখতে চায়।

ভদ্রলোক চুপ ক'রে রইলেন।

তার পর বললেন, ও তো কারও সঙ্গে কথা বলে না।

ভদ্রলোক বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। যে ছেলে কারও সঙ্গে কথাই বলে না তার সঙ্গে আমার আলাপ কি ক'রে সম্ভব?

আমিও বিস্মিত হলাম।

বললাম, কারও সঙ্গে কথা বলে না? বাড়ির কারও সঙ্গেও না?

—না।

—আপনার সঙ্গেও না?

—না। ওর মাথাটা ঠিক নেই।

ভদ্রলোক অস্বস্তির সঙ্গে কাশলেন। চশমাটা একবার মুছলেন। তার পর অন্য দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন—

—কি জানেন? ওইটিই আমার ছোট ছেলে। বছরখানেক হ'ল ওর মা মারা যাবার পর থেকেই কেমন যেন—

আমি নিঃশব্দে শুনতে লাগলাম।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন—আর কিছু তো নয়। শুধু ওই জানলায় গিয়ে ব'সে থাকা। কারও সঙ্গে কথা নেই, খেলা নেই, কিছু নেই। শুধু ওই জানলাটিতে নিঃশব্দে ব'সে থাকা। নইলে চেঁচানি, কি অন্য কোনও রকম উৎপাত কিছু নেই।

আমি ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশী হবে না। মুখখানি শীর্ণ, বেচারা গোছের। চোখের চশমাটা মুখের তুলনায় বড় দেখায়। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা।

বললেন, আপনি নিয়ে যেতে চান, যান। কিন্তু আমার মনে হয় ও যাবে না। ওর মায়ের শোবার ঘরখানি ছাড়া আর কোথাও ও যেতে চায় না। সমস্তক্ষণ ও যেন ওর মায়ের প্রতীক্ষা করে। কে বলেছে, ওর মা স্বর্গে আছেন। স্বর্গ মেঘের ওপারে। সেই থেকে ও কেবলই আকাশের দিকে চায়। ওর জন্যে আমার বড় ভয় হয়। মনে হয়—

কি মনে হয় বলতে পারলেন না। আপন মনে একবার শিউরে উঠেই চুপ করলেন।

ডাকলেন, কমল, কমল!

অন্য কে একজন উত্তর দিলে, সে তেতলায়। কেন?

—একবার ডেকে দে তো।

কমল এল। কিন্তু মনে হ'ল ও যেন নিজে আসছে না। আর একজন কেউ ওকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে। আর একজন কে যেন ওর চোখের ভিতর দিয়ে বাঁকা বাঁকা ক'রে চাইছে। সেই দৃষ্টি যেন আমার বুকের ভিতরটা পর্যন্ত ঠাণ্ডা ক'রে দিলে।

হঠাৎ আমার দিকে ওর দৃষ্টি পড়তেই ও ছুটে এসে আমার একটা আঙ্গুল চেপে ধরলে।

বললে, তোমার বাড়ি টিয়া পাখি আছে?

—হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো তোমাকে নিতে এলাম।

কমল আর দ্বিধামাত্র করলে না। বললে, চল।

কমলের বাপের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ও বুঝি টিয়া পাখি খুব ভালোবাসে?

—আজ প্রথম জানলাম। এর আগে ওর মুখে কোনও দিন টিয়া পাখির কথা শুনি নি। আমাদের একটা টিয়া পাখি ছিল বটে, কিন্তু বছর তিনেক হ'ল সেটা মারা গেছে। তার কথা ওর মনে আছে কি না সন্দেহ।

—হয়তো ছিল না। হঠাৎ মনে পড়েছে। কিংবা—

সেইটেই আমার বিশ্বাস। হয়তো যা কিছু এই বাড়ি থেকে হারিয়েছে,—ওর মা, টিয়া পাখি,—তাই আজ ওর স্মৃতির এক জায়গায় এসে জমেছে। ওর মায়ের ছোঁয়া লেগে সব আজ মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

কমল আবার আমার আঙ্গুল ধরে টানলে। বললে, চল, টিয়া পাখি দেখাবে না?

আমি কমলের বাবার দিকে চাইলাম।

তিনি বললেন, নিয়ে যান। কিন্তু বেশীক্ষণ রাখবেন না। হয়তো আপনাকে বিরক্ত করবে।

টিয়া পাখি দেখে কমলের আনন্দ আর ধরে না। কত রকমে তাকে আদর করলে, কত রকমে তাকে মুখ ভেংচালে, আর অনর্গল কত যে বকলে তার ইয়ত্তা নেই।

হঠাৎ একসময় কমল গম্ভীর হয়ে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলে, মা নেই?

—কার মা?

—আমার মা? নেই? আছে? কোথায়?

—তোমার মা তো এখানে নেই কমল।

—আছে। টিয়াপাখি আছে, মা আছে। চল।

আমাকে নিয়ে কমল প্রত্যেকটা ঘর, বারান্দা, চিলেছাদ সমস্ত তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলে। বাড়ির বউদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে কাকে যেন খুঁজলে।

শেষকালে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কে?

—বন্ধু।

—বন্ধু? আমার মা কোথায়?

—স্বর্গে।

—স্বর্গে? টিয়া পাখি যায় নি কেন?

প্রশ্নের পর প্রশ্নে আমি বিব্রত হয়ে উঠলাম। ওর সকল প্রশ্নের যোগসূত্রও খুঁজে পাই না। উত্তর দেব কি?

দেখতে দেখতে কমল ভয়ংকর হয়ে উঠল। তার সমস্ত শরীর ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগল। চোখ লাল হয়ে উঠল। চোয়ালে কেমন একটা দৃঢ়তা এল। অকস্মাৎ সে আমার উপর পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। দাঁতে ক'রে, নখে ক'রে আমার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিলে। যেন বাঘের বাচ্চা! কে তাকে রুখবে?

বাড়িতে মেয়েরা ভয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠল, চাকরগুলো ছুটে এল। বহু কষ্টে সকলে মিলে যখন তাকে বন্দী করলাম, তখন সে শ্রান্ত।

কী তার কান্না! যেন তার সমস্ত ইন্দ্রিয় অসহ্য ক্ষুধায় শকুন-শাবকের মত ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। সে কান্না আমি জীবনে ভুলব না।

পরের ছেলে। তাকে নিয়ে এসে এই অবস্থা! জীবনে এত বেশী লজ্জা আমি আর কখনও পাই নি।

অনেক চেষ্টা করলাম, তাকে শান্ত করতে। কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। অবশেষে তার বাপকে সংবাদ দিতে হ'ল। তিনি এলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। ছেলেটি একেবারে উন্মাদ হয়ে গেল।

তার পরে আর তার কোনও সংবাদই পাই না।

কমলের বাবা আমার উপর অসম্ভব রকম চ'টে গেছেন। তাঁর ধারণা কমলের এই অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। খবর পাওয়া দূরে থাক, তাঁর কাছে গেলে তিনি কথাই কন না। বিরক্তি ভরে মুখ ফিরিয়ে নেন।

সত্যিই তো কী দরকার ছিল আমার পরের ছেলেকে বাড়ি নিয়ে আসা! কে জানে, হয়তো আমি তাকে না নিয়ে এলে সে পাগল হ'তই না। অনুশোচনায় আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল।

কিন্তু উপায় কি? বাপ আমার সঙ্গে কথা বলেন না। ছাদে গিয়ে আর দেখা পাই না। সেই জানালাটা বন্ধ থাকে আজকাল। ওদের বাড়ির চাকরের কাছ থেকে যা সংবাদ পেলাম, তা আরও ভয়ানক! কমলকে আজকাল আর সামলানো যায় না। ছোটদের তো কথাই নেই, বড়দের পর্যন্ত সে ছুটে গিয়ে আক্রমণ করে। কোনও উপায় না দেখে তাকে একটা ছোট ঘরে বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে। সেইখানে তাকে দুটি দুটি ক'রে খেতে দেওয়া হয়। কখনও খায়, কখনও বা খাবার ছোঁয়ও না, আবার কখনও সমস্ত খাবার গায়ে মেখে নৃত্য করে।

দিন রাত্রির মধ্যে কখনও যে ঘুমোয় তা মনে হয় না। সমস্তক্ষণ কেবল চীৎকার করে। কখনও গান গায়, কখনও বক্তৃতা করে, কখনও গাল দেয়। কিন্তু সে কিছু না। যখন কাঁদে তখনই মুশকিল হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক সুরে কেবল ডুকরে ডুকরে কাঁদে। সে কান্নায় বাড়ির কারও চোখ শুকনো থাকে না। তাতে পাষাণও গ'লে যায়, এমনই করুণ।

এমনি অবস্থায় মাস দুই গেল।

একদিন সকালে নীচের ঘরে ব'সে আছি এমন সময় হঠাৎ কমলের বাবা এসে উপস্থিত! ভদ্রলোক এই ক'দিনে যেন ভেঙে গেছেন!

আমি চমকে উঠলাম।

—কি ব্যাপার?

—আপনি একবার আসুন। বাঁচানো তো যাবেই না। তবুও আসুন। আপনাকে দেখবার জন্যে বড্ড ব্যস্ত হয়েছে।

—নিশ্চয়। চলুন, চলুন।

আমি জামাটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়লাম।

ভদ্রলোক চলতে চলতে বললেন, আমরা কেউ কি জানি, আপনাকে ও বন্ধু বলে? শেষে টিয়া পাখির কথা বলাতে মনে হ'ল আপনি। ভাল কথা। টিয়া পাখিটা নিয়ে যাওয়া যায় না?

—কেন যাবে না? খাঁচাসুদ্ধ বেশ ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

—তাহলে......

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন।

বললাম, আপনি চলুন। আমি টিয়া পাখিটা নিয়ে এখুনি আসছি।

টিয়া পাখিটা নিয়ে গেলাম।

বড় একখানা খাটে মস্ত পুরু গদির উপর গদির সঙ্গে মিলিয়ে কমল শুয়ে আছে। গায়ে একখানা চাদর ঢাকা। শীর্ণ, কঙ্কালসার একখানা হাত বেরিয়ে আছে। মুখেও মাংসের চিহ্নমাত্র নেই। দাঁত বেরিয়ে আছে, গাল ভিতরে ঢুকে গেছে। শুধু বড় বড় চোখ দুটো ড্যাবড্যাব করছে।

কে বলবে, এ সেই কমল।

নিঃশব্দে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ওর আর তখন কথা কইবার শক্তি নেই। চোখের দৃষ্টি স্তিমিত।

ভদ্রলোক চীৎকার ক'রে বললেন, কমল, তোমার বন্ধু এসেছেন কমল। চিনতে পারছ না?

এতক্ষণে কমল আমার দিকে চাইলে। একবার আমার দিকে, একবার আমার হাতের টিয়াপাখিটির দিকে। ওর নীলাভ ঠোঁটের কোণে শীর্ণ একটুখানি যেন হাসির রেখা ফুটে উঠল।

ডাকলাম, কমল!

কমল সাড়া দিলে না। এক দৃষ্টে শুধু টিয়া পাখিটির দিকে চেয়ে রইল। তার পরে ধীরে ধীরে শ্রান্তভাবে চোখ বন্ধ করলে।

একটু পরে আবার চোখ মেলতেই বললাম, আমাকে চিনতে পারছ কমল?

—বন্ধু?

—হ্যাঁ।

—টিয়াপাখি?

—এই যে!

—হুঁ।

কমল আবার একটুখানি হাসলে। তার পরে জানালার বাইরে নিঃশব্দে চাইলে।

অনেক দিন পরে জানালাটা আবার খোলা হয়েছে।

এর পরে কমল আর চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র বেঁচে ছিল। পরের দিন সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ওরও চোখে অন্ধকার নেমে এল।

অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা।

তবু ভাবি, ভালই গেছে। ওকে আমরা কেউই বুঝতে পারি নি। আমাদের মধ্যে আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার মানে দুঃখ পাওয়া এবং দুঃখ দেওয়া।

তার চেয়ে—

কলিকাতার প্রাচীনতম কবি রাধাকান্ত মিশ্র ও তাঁহার কাব্য

ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন, এম এ, পি আর এস, পি-এইচ ডি

সম্প্রতি একটি পুঁথিতে এক অজ্ঞাতপূর্ব বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর কবির সন্ধান পাইয়াছি। কবির বাস ছিল কলিকাতায়। কাব্যের রচনাকাল হইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ইহার পূর্বেকার কলিকাতাবাসী কোনও কবির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং আলোচ্য কবিকে খাস কলিকাতা শহরের প্রাচীনতম সাহিত্যস্রষ্টার গৌরব দিতেই হয়।

কলিকাতার প্রাচীন বাসিন্দা কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কুলে কবির জন্ম হয়। নাম রাধাকান্ত মিশ্র। কবির পিতামহের নাম শ্রীবল্লভ (বা বল্লভ) মিশ্র। পিতা রামনাথ মিশ্র, অগ্রজ দেবীরাম মিশ্র। "কৃপা কর আমার অনুজ সর্বজনে" কবির এই প্রার্থনা হইতে বোঝা যায় যে তাঁহার একাধিক ছোট ভাই ছিল। ইহার অধিক কিছু আত্মপরিচয় কবি দেন নাই।

বহুকালাবধি কলিকাতা নিবসতি।
কাশ্যপের বংশ দ্বিজকুলে উতপতি॥
পিতামহ শ্রীবল্লভ মিশ্র মহাশয়।
তাহার তনয় জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ শুভোদয়॥
শ্রীযুক্ত শ্রীরামনাথ মিশ্র খ্যাতনাম।
তার সুত বিখ্যাত শ্রীযুত দেবীরাম॥
তাহার অনুজ দ্বিজ রাধাকান্ত ভণে।
কৃপায় কাতর জন গণ নিজ গণে॥

তৎপরে দেবীমাহাত্ম্য কাব্যরচনার কৈফিয়তে কবি বলিতেছেন যে তাঁহার কাব্যরচনা প্রচেষ্টা পাগলামি মাত্র।—

এ কথা কহিতে বড় লজ্জা ভয় হয়।
শবরূপে যে পদ সেবয়ে মৃত্যুঞ্জয়॥
যাহার চরণরজ ধরিয়া মস্তকে।
সৃজন পালন নাশ করয়ে কৌতুকে॥
আগম নিগম বেদে না হয় প্রকাশ।
সে পদ বাঞ্ছিত করি বলি তব দাস॥
বুঝিলাম মম সম নাহিক পাগল।
কিন্তু তাহা এক বাক্য আছয়ে কুশল॥
পাগলের প্রায় বট আপনি পাগলী।
নিগম পাগল তব পুত্র যত গুলি॥
দাসদাসীগণ যত সকলি পাগল।
পাগলের হাট ঘাট দেখিয়ে সকল॥
অতএব লাজভয় তেজি মহামাই।
মানসে ভরসা অই দাস হইতে চাই॥
এইহেতু নিবেদন করি জগৎমাতা।
কৌতুক করিয়া শুনে পাগলের কথা॥
অতএব পাগল দাসের নিবেদন।
নৌতুন মঙ্গল তব করহ শ্রবণ॥
কৃপা কর আমার অনুজ সর্বজনে।
যথা যথা রহে মম আত্মবন্ধুগণে॥

তাহার পর কবি বলিতেছেন যে তিনি কাব্যের আদর্শ পাইয়াছেন প্রাচীনতর কবিগণের নিকট হইতে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাচীন কবিদের উপর বেশ এক হাত লইয়াছেন। পূর্ববর্তী দেবদেবী মাহাত্ম্যখ্যাপক কবিরা কাব্যরচনায় সাক্ষাৎ হেতু হিসাবে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ নানারূপে দেবতার প্রত্যাদেশের দোহাই দিয়াছেন। আমাদের কবি রাধাকান্ত এই প্রকার প্রত্যাদেশের যথার্থতায় সন্দেহ প্রকাশ ও সেইরূপ অনুগৃহীত কবিদের স্পর্ধায় কটাক্ষ করিয়া এবং শেষে ঐশী শক্তি অজ্ঞেয়তার উপর বরাত দিয়া তাল সামলাইয়া লইয়াছেন।

কবি এই কথা বলিয়াছেন,

আর এক নিবেদন শুন সর্বজন।
প্রাচীন কবির সব কৈরাছি বয়ন॥
কেহ কহে মায়ের হয়্যাছে প্রত্যাদেশ।
কেহ কহে দিলা দেখা ধরি নিজ বেশ॥
কেহ বলে জিহ্বাতে কবিতা দিল লিখি।
কেহ কেহ বলে আমি স্বপনেতে দেখি॥
যে পদ ধিয়ান করি না পান বিধাতা।
মানব হইয়া কেহ কহে হেন কথা॥
কেমনে এমন কথা লইবে হিয়ায়।
কিন্তু সত্য মিথ্যা কিছু কহা নাহি যায়॥
বেদে বলে ভকতবৎসলা মহামায়া।
কে জানিবে কেমন কাহার তরে দয়া॥
আপন সম্বাদ বলি সপুটে বিনয়।
ভজিলে তাহার নাম শক্তি উপজয়॥

তাহার পর রচনাকাল দিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। রচনাকাল হইতেছে ১৬৮৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৬৭-৬৮।

শাকে গ্রহ বসু ঋতু বিধুর গণনে।
এই হেতু হইল গীত প্রকাশ ভুবনে॥
দ্বিজ রাধাকান্ত সদা ভাবে নারায়ণী।
গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল সভে বল হরিধ্বনি।

ভণিতার মধ্যে কাব্যের নাম পাওয়া যায় না; "শ্যামার সংগীত" এই উল্লেখ মাত্র দেখা যায়।

শ্যামার সংগীত দ্বিজ রাধাকান্তে গায়॥

প্রাপ্ত পুঁথিতে কাব্যটির পূর্বাংশ পাওয়া যায় নাই, যদিও বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর প্রায় সবটাই মিলিতেছে। প্রাপ্ত অংশ জাগরণ পালা মাত্র। আরম্ভ এইরূপ,

শ্যামার সংগীত সপ্ত করি সমাপন।
আরম্ভিল রসের সাগর জাগরণ॥
ভাটের ভারতী অতি পিরীতি পাইয়া।
সহচর রাজার কুমারে কহে গিয়া॥
কহে এক ভাট আসি রাজ সন্নিধান।
বীরসিংহ ভূপতি বর্ধমান।
রমা সমা তাহার তনয়া রূপ শুনি।
পরম পণ্ডিতা পণ করাছে আপনি॥
সেই ভর্তা হবে তারে যে পারে বিচারে।
শুনিলাম হারিয়াছে সকল সংসারে॥
ভাটের আশয় লয়া যাইতে তোমায়।
ভূপতির অনুমতি লইল তাহায়॥
শুনিয়া শিশুর হৃদিপুরে পুলকিত।
মরমে মন্মথ মত্ত চিত্ত চঞ্চলিত॥

রাধাকান্তের কাব্যের ভাষা মার্জিত, ভাবও একেবারে গ্রাম্যতা বিবর্জিত। কাহিনী গতানুগতিক হইলেও চরিত্রচিত্রণে নূতনত্ব আছে। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে বিদ্যার ও বিমলা মালিনীর চরিত্র যে কবি কতটা স্বাভাবিক করিতে পারিয়াছেন, তাহা বোঝা যায়। এ বিষয়ে রাধাকান্ত ভারতচন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছেন বলিতে হয়।

সুন্দর বিদ্যার মন্দির হইতে বিমলা মালিনীর গৃহে ফিরিয়াছে। কোটাল সন্দেহ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গোপনে আসিয়াছে। মালিনী দরজা খুলিয়া দিতেই কোটালের খর্পরে পড়িল।

একা বাসে আসি রায় সঙ্গে করি কাল।
কপাট খুলিতে জটে ধরিল কোটাল॥
হুতাশে মালিনী কিছু না দেখি নয়ানে।
উঁকি ঝুঁকি মারে মাগী মন পলায়নে॥

ধরিয়া কোটাল ঠাট বান্ধিল তখনি।
সর্বনাশ কৈরাছিলি হইয়া কুটিনী॥

বিমলা বলিল, তোমাদের কথা তো আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!

বিমলা বোলেন বাপু নিবেদন করি।
কি বোল তোমরা কিছু বুঝিতে না পারি॥
অনাথিনী একাকিনী নাতিটী লইঞা।
কোন মতে কাটা কাল কাটুন কাটিঞা॥
ডাকাচুরি ছিনারী না জানি ভাল মন্দ।
রাজার দোহাই যদি মিছা দোষে বান্ধ॥

কোটাল বলিল, তোমার নাতি রাজকন্যার বস্ত্র পায় কেমন করিয়া?

কোটালিয়া বোলে তোর নাতি কোথা ছিল।
রাজার কন্যার বাস সে কোথা পাইল॥
বিমলা বোলেন সত্য নিবেদন করি।
যেদিন কন্দর্পপূজা করিল সুন্দরী॥
অপূর্ব কুসুমহার দিলাম তাহারে।
তুষ্ট হইয়া বস্ত্রখানি দিয়াছেন মোরে॥
নাতিটী পরিয়া তাহা আপন বসন।
দিয়াছেন কালি সব রজকভরণ॥

বিমলার উত্তরে কথাটি না বলিয়া

হাসিয়া প্রবেশে ঘরে দারুণ কোটাল।
দেখয়ে সুরঙ্গপথ ঢাকা বাঘছাল॥
তখন বিমলা বোলে আর কথা নাই।
এথায় কামিনী ভাবে কি কৈল গোসাঁঞি॥

বিদ্যাসুন্দরের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তাকুল হইয়া

কি জানি প্রাণের নাথে কোন দশা করে।
তত্ত্ব জানিবারে পাঠাইল কমলারে॥
কমলা দেখিয়া গিঞা ছাড়িল নিশ্বাস।
কহে কি কহিব হইয়াছে সর্বনাশ॥

ভণিতায় কবির উপদেশ,

রাধাকান্ত ভণয়ে এখনো হাথে আছে।
আপন কোটাল বটে যাহ তার কাছে॥

মালিনীর গৃহে সুন্দরকে ধরিয়া কোটাল গোঁফে তা দিতে দিতে আস্ফালন করিতে লাগিল।

এইরূপে নিশাচর ধরিয়া তস্করে।
বাম হাথে গোঁফে তা দি কহিছে সুন্দরে॥
বিজয়সিংহের সখা হৈয়াছিলে গিয়া।
নহে কি এতেক দিন ফিরহ বাঁচিয়া॥
এখন কেমন হবে কহরে তস্কর।
হাসিয়া নাগরবর বাখানে বিস্তর।
কৈরাছ যতেক কাজ আমা অন্বেষণে।
তাহাতে চাতুর বট বুঝিয়াছি মনে॥

সহচরী কমলার মুখে সুন্দর ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া বিদ্যা মালিনীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া দেখিল যে সুন্দরের দুই হাত বাঁধা। তখন রাজকন্যা কোটালের নিকট কাতরোক্তি করিতে লাগিল স্বামীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য। শেষে প্রলোভনও দেখাইল।

এথায় রূপসী আইল মালিনীর ঘর।
দেখেন প্রাণের নাথ বান্ধা দুটী কর॥
স্বামীর সংকটে সাধ্বী রাজার নন্দিনী।
কহিছে কোটালে কত সকাতর বাণী॥
মিনতি কহেন বিদ্যা জোড় করি হাত।
দয়া করি দেহ দান দুঃখিনীর নাথ॥
নিজ আভরণ যার অঙ্গে লাগে ভারি।
বিষম বন্ধন তার দেখিতে না পারি॥
চোর নহে রাজার কুমার প্রাণেশ্বর।
বারেক অভাগী পানে চাহ নিশাচর॥
দেখ না প্রাণের নাথে ঘামিয়াছে মুখ।
না পারি দেখিতে বিদরয়ে মোর বুক॥
যদ্যপি শরণাগত শত্রুকুল হয়।
প্রণত জনার কেবা করে অপচয়॥
সংকটে শরণ নিলে শাস্ত্রের বিধান।
নিজ প্রাণ দিয়া তারে করয়ে রক্ষণ॥
যাইবে পুরুষ দশ বসি সর্বকাল।
হেন ধন দিব নাথে ছাড়রে কোটাল॥

কোটাল কর্তব্যপরায়ণ ও চতুর, অনুনয় বিনয় প্রলোভনে ভুলিল না।

করপুটে কোটাল কহেন ক্ষেম মোরে।
তস্কর দুষ্কর অকরণ কর্ম করে॥
যদি ছাড়ি চোরে মোর সবংশে সংহার।
তবে ধন লঞা কেবা খাইবে আমার॥
শুন্যাছি বেদের বাক্য ব্রাহ্মণ বদনে।
আত্মরক্ষা সতত করিবে ধনজনে॥
এমতি কতেক কহি মিনতি করিয়া।
চলিল রজনীচর চোরের লইঞা॥

রাজকন্যা চকিত হইয়া দৌড়াইয়া গিয়া কোটালের পথ আটকাইল এবং সুন্দরকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিল।

ক্ষেণে সচকিত সতী অতি বেগে ধায়।
পথ রাখি বোলে আগে বধরে আমায়॥
নিশি না দেখিয়া যারে না পারি রহিতে।
তাহার বিচ্ছেদে প্রাণ রহিবে কেমতে॥
অভাগীর ভাগ্যে যদি দয়া নৈল তোর।
তিলেক বিলম্ব কর নিবেদন মোর॥
নিরখি নাথের মুখ আগে তেজি প্রাণ।
শেষে যথোচিত নাথে করিহ বিধান॥

এত অনুনয়েও কোন ফল হইল না।

কোটাল কহেন কন্যা করি পরিহার।
বুঝ্যাছি বৌথিত বড় বট গো আমার॥
কাল সর্প পুষ ঘরে আহার জোগায়্যা।
যাইত গোষ্ঠীর প্রাণ যাহার লাগিঞা॥
রাখ গো মিনতি সতী বৈস গিঞা পুরে।
কাল কোপে কোটাল কুপিত কলেবরে॥
হাক ডাক রব স্বর করে সৈন্যগণ।
মার মার কাট কাট করয়ে তর্জন॥
কেহো কোপ করিয়া বন্ধন ধরে টানি।
কেমন কামিনীচোরা জানিব এখনি॥
এমনি কোটাল-ঠাট করিলেক গতি।
হাহা প্রাণনাথ করি কান্দে রূপবতী॥

ভারতচন্দ্রের এবং রামপ্রসাদের কাব্যের মত অলংকারের চটক রাধাকান্তের কাব্যে একেবারেই নাই। তবে সহজ কবিত্বময় বর্ণন-শক্তির পরিচয় যথেষ্টই আছে। কাব্যটি সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইলে আধুনিকপূর্ব বাঙলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যবৃদ্ধি হইবে।

জাগব

বনফুল

১

ত্রিলোচন সরকার অল্প দিন হইল ওকালতি পাস করিয়া আসিয়াছে। তাহার ক্ষুরধার বুদ্ধি, কিন্তু মক্কেল নাই। যত মক্কেলের ভিড় ওই সেকেলে টাক-মাথা শশী হাজরার দ্বারে, যাঁহার রায়বাহাদুর উপাধি, বহুমূত্র ব্যাধি, কদাকার ভুঁড়ি সমস্বরে তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা ঘোষণা করিতেছে। ওই লোকটিরই দ্বারে মক্কেলের ভিড়। ক্ষুধিত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ত্রিলোচন মক্কেলহীন। মুনসেফি এবং বি সি এস উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থমনোরথ হইয়া ত্রিলোচন অবশেষে দালাল হৃদয় বিশ্বাসের কর্মপটুতার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া বসিয়া আছে। হৃদয় বিশ্বাসের অক্লান্ত বিজ্ঞাপনের জোরেই বহু উকিলের ভাগ্যাকাশে নাকি সৌভাগ্যসূর্য সমুদিত হইয়াছেন। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ত্রিলোচনও সূর্যোদয়ের প্রত্যাশায় নিশিযাপন করিতেছিল এমন সময় একটি ঘটনা ঘটিল। পল্লবিত হইয়া যাহা প্রচারিত হইতেছিল তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই,. জগদু এক চপেটাঘাতে তাহার বালক ভৃত্যটিকে হত্যা করিয়াছে, পুলিসে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে এবং সে জেলে গিয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া আছে, একটি কথাও বলিতেছে না। জগদু-হিতৈষী জনকয়েক ভদ্রলোক শশী হাজরার নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত শুনিয়া হাজরা মহাশয় এ মকদ্দমার ভার লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

ত্রিলোচন প্রলুব্ধ হইল। বিশ্বাসের সূর্যোদয় করাইবার অনিশ্চিত ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া আর তাহার কালক্ষেপ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। সে মনস্থ করিল চেষ্টা-চরিত্র করিয়া এই সুযোগটি গ্রহণ করিতে হইবে। সে মালকোঁচা মারিয়া বাইকে আরোহণ করিল, থানায় গেল এবং যোগাড়যন্ত্র করিয়া জেলে জগদুর সম্মুখীন হইল।

২

পুলিস প্রহরীটি একটু সরিয়া যাইতেই নির্বাক জগদু সবাক হইল।

"আপনি আমার হয়ে লড়তে চাইছেন লড়ুন, কিন্তু এখন আমি আপনাকে একটি পয়সাও দিতে পারব না। আমার হাতে এখন কিচ্ছু নেই। আপনি যদি আমাকে বাঁচাতে পারেন, আপনার টাকা আমি পরে দেব।"

"চাকরটাকে সত্যিই তা হ'লে তুমি মেরেছ?"

"হ্যাঁ, মাইনের জন্যে বারবার বিরক্ত করছিল ব'লেই চড়টা মেরেছিলাম।"

জগদু নির্বাক হইল।

ত্রিলোচনও খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, বেশ—"

৩

ত্রিলোচনের কেমন যেন রোখ চড়িয়া গেল, লোকটাকে বাঁচাইতেই হইবে। শশী হাজরাই যে বুদ্ধিমান, অপর সকলে যে গরু এই ভ্রান্ত ধারণাটা লোকের মন হইতে অপসারিত করা প্রয়োজন। তা ছাড়া, এখন না দিক, তাহার প্রাপ্য দক্ষিণা জগদু তাহাকে পরে একদিন দিবেই। এইসব ভবিষ্যৎ ভাবিয়া গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া সে জগদুকে জামিনে খালাস করাইয়া আনিল। কিন্তু পুলিস রিপোর্ট, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের মনোভাব ও সংখ্যা, ডাক্তারের রিপোর্ট প্রভৃতি পর্যালোচনা করিয়া বুদ্ধিমান ত্রিলোচন বুঝিল যে, সোজা পথে চলিলে জগদুর ফাঁসি অনিবার্য। জগদু হত্যা করে নাই ইহা কিছুতেই প্রমাণ করা যাইবে না, প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলে উলটা বিপত্তি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু বুদ্ধি ক্ষুরধার হইলে কোনও না কোনও দিক দিয়া কাটিয়া তাহা একটা পথ বাহির করে। হইলও তাই। ত্রিলোচন জগদুকে উপদেশ দিল, তোমাকে পাগল সাজিতে হইবে।

৪

জগদু পাগল সাজিল।

হাকিম তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি তোমার চাকরকে চড় মেরেছিলে?"

জগদু একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ করিল।

"অয়, অয়,"

তাহার পর খিলখিল করিয়া হাসিয়া হাকিমকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে লাগিল।

সকলে অবাক।

কোর্ট ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করিলেন, "ও কি করছ, হাকিমের সামনে বেআদবি! কথার জবাব দাও, বল, তুমি তোমার চাকরকে মেরেছিলে?"

"অয়, অয়,"

পুনরায় খিলখিল করিয়া হাসিয়া জগদু কোর্ট ইন্সপেক্টরকেও অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

ত্রিলোচন উঠিয়া হাকিমকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হুজুর, আমার মক্কেল বদ্ধ উন্মাদ। উন্মাদ অবস্থাতেই ও চাকরকে মেরে ফেলেছে। আপনি ওর বাড়ির, পাড়ার সবাইকে ডেকে জিগ্গেস করুন বরাবরই ওর মাথার ছিট ছিল, এদানিং ও একেবারে পাগল হয়ে গেছে—"

সাক্ষী সব ঠিক করাই ছিল, তাহারা একবাক্যে আসিয়া বলিল, জগদু পাগল। কোর্ট ইন্সপেক্টর অথবা গভর্নমেণ্টের উকিল জেরা করিয়া তাহাদের বিচলিত করিতে পারিলেন না।

হাকিম তখন আইন-অনুযায়ী জগদুকে মস্তিষ্কবিকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণাধীন করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা দিলেন।

এইরূপ ব্যবস্থাই যে হইবে আইনজ্ঞ ত্রিলোচন তাহা অনুমান করিয়াছিল। কেবল অনুমান করিয়াই নিরস্ত থাকে নাই, একটি বুদ্ধিমান ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে পাগলামির মূল লক্ষণগুলি সম্বন্ধে জগদুকে তালিমও দিয়াছিল।

৫

কিছুদিন পরে বোঝা গেল, জগদু শুধু রগ-চটা নয়

(শেষাংশ ৪১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রবীন্দ্রনাথের নাটক

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের সৃজনী প্রতিভার একটি বৃহৎ অংশ তাঁর নাট্য-সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম যৌবন থেকে শুরু ক'রে, একেবারে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনি অল্পাধিক কুড়িখানা নাটক রচনা করেছেন। দু-একখানি ছাড়া তাঁর কোনও নাটকই বাঙলা রংগমঞ্চে বিশেষ সমাদৃত হয় নি, কিন্তু বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমাভিব্যক্তিতে তাঁর দানের পরিমাণ যে কম নয়, এ কথা সাহিত্যরসিকমাত্রেই স্বীকার করবেন। দুর্ভাগ্য বশত কবির নাট্যসাহিত্য তেমন ক'রে দেশের সমালোচক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি, তাই সে সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য কোনও বইও লেখা হয় নি। বলা বাহুল্য যে, বর্তমান প্রবন্ধ সেই অভাব পূরণ করার জন্যেই লেখা হচ্ছে না—যাতে এদিকে সুধী জনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় তারই প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে মাত্র।

কবির বহুবিস্তৃত নাট্যসাহিত্যকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ ক'রে বেছে নেওয়া যেতে পারে। (বলা বাহুল্য ছক কেটে সাহিত্যের শ্রেণী নির্ণয় কোনও দিনই হতে পারে না, বিশেষত রবীন্দ্র-সাহিত্যের; যার একের সংগে অন্যের আকৃতিতে কিছু মিল থাকলেও, প্রকৃতিতে আগাগোড়াই অমিল। সুতরাং তাঁর কোনও দুখানি বইকে এক লেবেলভুক্ত করা সংগত হয় না। তবু মোট কথার একটা হিসেব হতে পারে।) সেদিক থেকে প্রথম ভাগে পড়ে দ্বন্দ্বনাট্য—প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিসর্জন, রাজা ও রানী, চিত্রাংগদা, নটীর পূজা। দ্বিতীয় ভাগে ব্যংগনাট্য চিরকুমার সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা, গোড়ায় গলদ (শেষ রক্ষা), গৃহ প্রবেশ। তৃতীয় ভাগে রূপক নাট্য—রক্তকরবী, ডাকঘর, ফাল্গুনী, রাজা, অচলায়তন, অরূপ রতন, মুক্তধারা, শারদোৎসব। মায়ার খেলা প্রভৃতি গীতিনাট্যকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা চলে না—ওরা ঠিক নাটক নয়, ওদের বিশিষ্টতা গানে—নাটকীয় আকারটা ওদের গানের মালায় সূত্রের মতো শুধু গ্রন্থনের উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই হল সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের নাট্যগ্রন্থাবলী। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ের নটীর পূজা ছাড়া আর সমস্তই এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের সমস্তই কবির যৌবনের রচনা। পরে এদের কোন-কোনটার কবি পুনর্লিখন করেছেন, যেমন রাজা ও রানীকে তপতী করেছেন, গোড়ায় গলদকে করেছেন শেষরক্ষা। আর তৃতীয় পর্যায়টি সমগ্র-ভাবেই তাঁর পরিণত বয়সের রচনা। এদের জন্ম কবির নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পর, যে সময় থেকে কবির রচনা মিস্টিক পন্থা অনুসরণ করেছে।

এই তিন পর্যায়ের মধ্যে প্রথম দুই পর্যায়ের আমি সবিশেষ অনুরাগী। বাঙলা দেশে অনেক নামজাদা নাটককার হয়েছেন, তাঁদের নাটকও আছে অনেক—কিন্তু বিসর্জন, চিত্রাংগদা, চির-কুমার সভা বা গোড়ায় গলদের মতো বই আমাদের ভাষায় আর লেখা হয় নি। গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক, দ্বিজেন্দ্র-লাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক, অমৃত-লালের রংগনাট্য রংগমঞ্চের দিক থেকে হয়তো অনেক বেশী সার্থক রচনা, কিন্তু সাহিত্যের উচ্চ সমাজে এই সমস্ত বই খুব বড় মর্যাদার দাবি করতে পারে কি না সন্দেহ। এইসব রচনার পাশে রবীন্দ্র-নাথের নাটকগুলিকে দাঁড় করিয়ে দেখলেই এদের সাহিত্যিক কৌলীন্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্য বাঙলা রংগালয়ের প্রচলিত ঐতিহ্য থেকে জন্মায় নি বলেই তা হয়েছে। এরা জন্মেছে কবির অনন্যসাধারণ সৃজনীশক্তির প্রেরণায় আর ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের প্রভাবে।

চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাসের উপর সন্দেহাকুল প্রশ্নের আবির্ভাবে বিসর্জনের যে ট্র্যাজেডি বা জরা-যৌবনের সাময়িক মদিরায় আত্ম-বিস্মৃত প্রেমের স্বপ্নভংগে চিত্রাংগদার যে ট্র্যাজেডি, অনন্যনির্ভর-শীল দাম্পত্য-বন্ধনের মধ্যে নারীর ব্যক্তিত্ববোধের জন্মে রাজা ও রানীর যে ট্র্যাজেডি বা সন্ন্যাসের আপাত কঠোরতার অন্তরালে, মানবীয় হৃদয়দৌর্বল্যের সহসা উদ্ভবে প্রকৃতির প্রতিশোধের যে ট্র্যাজেডি—তা বাঙলার বস্তুধর্মী নাট্যসংসারে একেবারেই অপরিজ্ঞাত। এদের উৎস হচ্ছে ইউরোপীয় ট্র্যাজেডি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডিগুলির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বাইরের সমস্ত ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখেই, অন্তরে অন্তরে কি বিপর্যয়ের ঝড় উঠতে পারে এবং সেই ভাঙনের ধাক্কায় মানুষের জীবনধারায় যে কি শোচনীয় ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে, তাঁর ট্র্যাজেডিগুলিতে তার ভাষা পাওয়া যায়। এদের দ্বন্দ্ব বহিরাংগিক ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব নয়, এদের দ্বন্দ্ব আদর্শের সংগে আদর্শের দ্বন্দ্ব, ভাবের সংগে ভাবের দ্বন্দ্ব। তাই এদের ট্র্যাজেডি বাইরের খুনোখুনি বা রক্তারক্তির অপেক্ষা রাখে না—বাইরে অনেক সময় একটি দীর্ঘশ্বাসেরও অবকাশ থাকে না, অথচ প্রবল ভূমিকম্পে হৃদ্-জগৎ নিঃশব্দে চুরমার হয়ে যায়।

সেক্সপীয়ারের এ ট্র্যাজেডির ভাষা আছে, কিন্তু তাঁর অন্ত-র্দ্বন্দ্ব বহিঃসংঘাতকে অবলম্বন করে। জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে মানুষের ভুল চাল বা অন্যায়পনা তাকে ও তার আবেষ্টনীকে কি ভাবে রূপান্তরিত করে, তিনি তাই দেখিয়েছেন। গোয়েটের দ্বন্দ্বে প্রাকৃতের সংগে অপ্রাকৃতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা তাঁর ট্র্যাজেডিতে অনেকটা যন্ত্রবদ্ধ, অনেকটা প্রাক্‌চিন্তিত। ইবসেনের ট্র্যাজেডি লৌকিক পরিবেশকে আশ্রয় করে, হঠাৎ একটা দীর্ঘদিনপোষিত ফাঁকি ধরা পড়ে যাওয়া বা একটা নিষ্ঠুর সত্য নিবারণ হওয়া বা সেই রকম একটা আকস্মিক ব্যাপারকে উপলক্ষ করে তাঁর ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডি অনেকটা রবীন্দ্র-ট্র্যাজেডির অনুরূপ নৈর্ব্যক্তিক। বিশ্বমানবের মনোবৃত্তির একটা না একটা পর্যায়ের সংগে বিপরীতমুখ একটা না একটা শক্তির সংঘর্ষ নিয়েই এদের ট্র্যাজেডি। বিসর্জন নাটকে জয় সিংহের মৃত্যুর একটা ঘটনা আছে বটে, কিন্তু ওর ট্র্যাজেডি তাতেই নয়। আধ্যাত্মিক প্রভুত্বের সংগে রাষ্ট্রিক প্রভুত্বের যে বিরোধ, তারই শোচনীয় পরিণতিতে হ'ল ওর ট্র্যাজেডি—জয় সিংহ তাতে একটা বুদ্বুদ, অপর্ণা আর একটা—এবং রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্য পরস্পর বিরোধী ভাবের প্রতীক আরও দুটি বুদ্বুদ। রাজা ও রানী বা প্রকৃতির প্রতিশোধের মর্মকথাও এইভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। এখানে বলে রাখা দরকার যে, এগুলি নাটকাকারে লেখা হলেও, কাব্যধর্মের প্রাবল্য এদের নাটকীয় সংস্থানকে হয়তো একটু ক্ষুণ্ণই করেছে। কিন্তু এদের অন্তর্গত যে ট্র্যাজেডি, তা ভাবের ট্র্যাজেডি। চিত্রাংগদার যৌবন ও রূপলাবণ্য অপগত হওয়ার সংগে সংগে অর্জুনের স্বপ্নভংগ হওয়া এবং তা থেকেই উভয়ের দাম্পত্য বন্ধন শিথিল হয়ে যাওয়ার ভিতর দিয়ে প্রচ্ছন্নতঃ একটি তত্ত্বই রূপায়িত হয়েছে, তার এক দিক অর্জুন, অন্য দিক চিত্রাংগদা। এই রকম অন্য তিনখানি নাট্যকাব্যের পাত্র-পাত্রীরাও সকলেই অল্পবিস্তর নৈর্ব্যক্তিক—তারা চিন্তা সমষ্টির এক একটি নিরুপাধিক প্রতিভূস্বরূপ। অর্থাৎ তারা স্ব স্ব রূপে আত্মস্বতন্ত্র চরিত্র নয়, তাদের সকলেরই সত্তার মূলে নিবদ্ধ কবির subjective মনে, তারা কেউ তাঁর ভাবদ্বন্দ্বের এদিক, কেউ ওদিক। তাদের ষোল আনা পরিভ্রমণ কবিকে কেন্দ্র করে, দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নয়। সেই জন্যই খাঁটি জাতের নাটক না বলে আমরা এগুলিকে নাট্যকাব্য আখ্যা দিয়েছি। বিয়র্নসনে বা ইবসেনে কাব্যের অবকাশ কম, শ-তে তো তা নেইই। তা সত্ত্বেও তাঁদের বইকেও খাঁটি জাতের নাটক বলা যায় না। প্রথম দুজনের প্রচারকার্য এবং তৃতীয়ের প্রজ্ঞামূলক কচকচি চরিত্র বিকাশের পক্ষে রীতিমতো বাধা স্বরূপই হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ'দেরই হ'ক, আর রবীন্দ্র-

নাথেরই হ'ক, নাট্যরচনাবলী প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যরূপে গৃহীত হয়েছে, তার কারণ এ'দের দৃষ্টিভঙ্গী ও লিখনপদ্ধতিতে সেই সত্যকার শিল্পীর উৎকর্ষ দেখা যায়, যা স্থায়ী সাহিত্যের কুল-লক্ষণ।

(২)

কিন্তু কমেডিতে কবির নাটকীয় বৈশিষ্ট্য সত্যিই অতুলনীয়। কবির কমেডিগুলিতে কোনও গুরুভার সমস্যা নেই, কোনও তত্ত্ব তথ্য নেই। বাস্তব সংসার থেকে চয়ন করে, কবি এমন কতকগুলি নরনারীকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, যারা রক্তমাংসের মানুষ। বৈকুণ্ঠের খাতার বৈকুণ্ঠ, গোড়ায় গলদের গদাই, চিরকুমার সভার অক্ষয়...কেউই কোনও বাণীর বাহক নয়, তারা বিশ্বমানবের প্রতিনিধি নয়, তারা স্ব স্ব খেয়াল, সংস্কার ও ও অভ্যাস নিয়ে সম্পূর্ণ এক একটি মজার মানুষ। তাদের কথাবার্তা, কাজকর্ম, ভঙ্গীভঙ্গি, সমস্তই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে আহৃত, যদিও প্রাত্যহিকতার মালিন্য নেই তাদের। তারা নিজেদের দুঃখ-সুখের টানা-প'ড়েনে নাটকীয় পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, নিজেরা তারা জানেও না, তারা অন্যকে কি ভাবে হাসাচ্ছে। জেনে হাসালে এগুলো নাটক হত না, হত ফার্স! তাদের চরিত্রের মূলসূত্রগুলি পাঠকের চোখে উদ্ঘাটন করেই কবি আড়াল থেকে বাজিকরের মতো তাদের নাচিয়ে গেছেন, অনেকটা মালয়ার বা শেরিডানের মতো। ঘটনার স্রোতে তারা ছুটে চলেছে, আমরা সেই চলমান জীবনস্রোতের ভিতর দিয়েই তাদের চারিত্রিক বিশেষত্বগুলো চিনে নিই এবং কৌতুক পাই। কবি চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের তা দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি কোথাও, যা সস্তা দরের কমিক লিখিয়ে প্রায়ই করে থাকেন। অবশ্য চিরকুমার সভার হাস্যরস সময় সময় চরিত্র বা ঘটনাকে ছেড়ে কেবলমাত্র শব্দকে ভর করে এবং সেখানে প্রয়োজনের চেয়ে প্রয়াসটা বড় হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু গোড়ায় গলদ বা বৈকুণ্ঠের খাতা, বিশেষত বৈকুণ্ঠের খাতা সংযত মার্জিত, শিষ্ট হাস্যরসের আদর্শ রচনা। হয়তো ওদের সুর একটু বেশী সূক্ষ্ম, মোটা কানের পক্ষে পরিমিত। সেই জন্যেই বোধ করি মঞ্চে এরা খুব জমে না।

কবির তৃতীয় পর্যায়ের নাট্য রচনাবলী সম্বন্ধে আমার ধারণা আজও বেশ স্পষ্টতা লাভ করে নি। রাজা, রক্তকরবী, ফাল্গুনী, ডাকঘর প্রভৃতি পড়তে খুবই ভাল লাগে, শাণিত তরবারির মতো তীক্ষ্ম কথার খেলা চমক লাগায়। কিন্তু মনে হয়, রূপকের গহনে ওদের আখ্যানবস্তুর তন্তুতে মুহূর্তে মুহূর্তে জোট পাকিয়ে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত রূপকের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকছে না, রূপকে ও প্রত্যক্ষে মেলামেশা হয়ে যাচ্ছে, চরিত্রগুলো হচ্ছে নিরবয়ব গতিহীন এবং প্রতিপাদ্য দুর্নিরীক্ষ্য। যে কোনও সিদ্ধান্ত খাড়া করে ওদের উপর আরোপ করা যেতে পারে এবং যে কোনও রহস্য খুঁজে বার করে ওদের উপর চাপানো যেতে পারে। কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে যা ধরা পড়ে না তা খুঁজে বার করে রসোপলব্ধি সম্ভব নয়। তাই মনে হয়, কবির এই পর্যায়ের নাটক সর্বসাধারণের জন্য নয়। বলা বাহুল্য আমরা সেই সাধারণেরই দলভুক্ত।

নন্দিনীকে বা বিশু পাগলাকে, কবিকে বা রাজাকে আমাদের বেশ লাগে। কিন্তু তাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে আমরা সুস্পষ্ট কোনও ব্যঞ্জনার নির্দেশ পাই না। মেটারলিঙ্কের আদর্শে কবি এই নাটকগুলো লিখেছিলেন শুনেছি। মেটারলিঙ্কের সাধারণ নাটকগুলি বিশেষ আনন্দের সঙ্গেই পড়েছি, কিন্তু তাঁর সিম্বলিক নাটক আমার সহ্য হয়নি। যে কোনও 'ইজম'ই থাক তার ভেতর, তা সহজবোধ্য নয়। স্বয়ং টলস্টয়ই তাঁর অর্থ বার করতে হয়রান হয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য সম্বন্ধেও আমরা সশ্রদ্ধ অনাসক্তি জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত হতে চাই। যদিও এ কথা আবার বলব যে, বইগুলো পড়তে খুবই চমৎকার লাগে; কেমন একটা আবছা আবছা ব্যঞ্জনা, সব কিছুর সমবায়ে কেমন একটা অন্তর্গূঢ় লিরিকস্বপ্নের মতো লাগে।

এইখানেই মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের আলোচনা শেষ হল। এর পর কবির আর দুখানি নাটক বেরিয়েছে—তপতী ও বাঁশরি। কবির কাব্যজীবনের শেষপর্বের এই দুটি বই থেকে নাটককার হিসাবে তাঁর সামর্থ্য নিরূপণ করতে বসলে, আমরা অন্যায় করব বলেই তাঁর সময়কালের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করেছি। বাঁশরি পড়লে মনে হয়, কবির লেখনীতে আর সেই ক্ষিপ্রতা, সেই প্রাণবন্ত ভাষার সহজলীলা নেই—তাতে ক্লান্তির ছায়া পড়েছে। রাজা ও রানীর পুনর্লিখন করে তপতী নাটক রচিত হয়েছে, এতে রাজা ও রানীর সেই কাব্য-সুষমা নেই; কিন্তু তার স্থানে সজীব নাটকীয় বৈশিষ্ট্য দানা বেঁধে উঠেছে। তাই এ বইটিকে রবীন্দ্রনাথের লিরিকধর্মী অন্যান্য গদ্য নাটিকার ভিতর বেশ একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়ে চিহ্নিত করা যায়।

জাগব

(৪১৭ পৃষ্ঠার পর)

সুদক্ষ অভিনেতাও বটে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শ্যেন-চক্ষুকেও সে ফাঁকি দিয়াছে, তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন জগু সত্যই উন্মাদ। তাঁহার নামে ঘুষ-সংক্রান্ত যে অপবাদটি প্রচারিত হইল, তাহা সম্ভবত অমূলক, জগুর অভিনয়-কুশলতারই আমরা প্রশংসা করিব।

কারণ যাহাই হউক, ত্রিলোচনের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। জগুর ফাঁসি হইল না। আইনের প্যাঁচে যে দড়িটা তাহার গলায় জড়াইয়াছিল আইনেরই আবার অন্য একটা প্যাঁচে তাহা খুলিয়া গেল। হাকিম হুকুম দিলেন, পাগলা গারদে গিয়া তাহাকে থাকিতে হইবে।

জগু যেন বাঁচিয়া গেল। প্রাসাদোপম পাগলা গারদে গিয়া থাকিতে হইবে! ভাঙা ঘরে একপাল ছেলেমেয়ে, মুখরা স্ত্রী, পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবা, শুচিবায়ুগ্রস্ত পিসীমা, বাতগ্রস্ত মামা, নিত্য অসুখ ও অভাব, বাহিরে গুণ্ডা বাড়িওলা, পচা ড্রেন, বেকার জীবন—এই সমস্ত হইতে মুক্তি!

সুযোগমত ত্রিলোচন একদিন নির্জনে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল, অবশ্য কিছু পয়সা খরচ করিয়া ব্যবস্থাটা করিতে হইল।

বলিল, "ভাই জগু এইবার আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে যাও। তোমাকে তো ফাঁসি থেকে বাঁচিয়ে দিলাম, এইবার আমার ফী-টা, তা ছাড়া কেসটা চালাতে আরও পাঁচরকম খরচ করতে হয়েছে আমাকে গাঁট থেকে, নানা রকম পৈরবি, বুঝছ তো—"

"অয় অয় অয়"

জগু খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং ত্রিলোচনকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে লাগিল।

তীর্থ ফেরত

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

অন্নদাপিসী তীর্থ করিয়া ফিরিলেন। উঠিয়াছিলেন শিয়ালদহে। কথা ছিল কামাখ্যা, প্রয়াগ, পুষ্কর, দ্বারিকাধাম, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, জগন্নাথ—আর এর মধ্যে ছোট বড় যে যে তীর্থ পড়ে সব সারিয়া মাস চারেক পরে ফিরিবেন। আজ মাত্র তের দিনে কামাখ্যা, গয়া আর বৈদ্যনাথধাম হইয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন। এই রকম যে হইবেই জানা কথা, কেহ বিস্মিত হইল না; পিসী যে তেরটা দিন গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে থাকিতে পারিয়াছিলেন এইটেই বরং পরম বিস্ময়কর ঘটনা।

বাড়িতে পেঁীছিবার বোধ হয় আধ ঘণ্টাটাকের মধ্যেই গঙ্গা-স্নানের খাটো কাপড়টা পরিতে দেখিয়া বড়বধূ বলিল, "সমস্ত রাত জেগে গাড়ির ঝাঁকানিতে হা-ক্লান্ত হয়ে রয়েছ মা, আজ না হয় বাড়িতেই তোলা জলে নেয়ে নাও না, এই পোটাক পথ আবার হাঁটা—"

পিসী অল্প হাসিয়া বলিলেন, "সঞ্চয় যত না হ'ক, আসতে না আসতেই খরচ মা?—কতটুকুই বা?—দিয়ে আসি দুটো ডুব।—পাড়ায় এদের সব খবর কি?"

শাশুড়ীর অলক্ষিতে বড়বউ আর সেজোবউ একটু ঠোঁট টিপিয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। নূতন নাতবউ সরযূ এই প্রথম আসিয়াছে, দিদি-শাশুড়ীর তীর্থপ্রত্যাগমন উপলক্ষ করিয়া বলিল সবাই তো বেশ ভালই আছে, না কাকীমা?—দেখন-হাসি-দের সঙ্গে ঘোষালদের যে ঝগড়াটা ছিল সেটাও মিটমাট হয়ে গেছে—দেখন-হাসির সাধে ওরা সবাই খেতে এসেছিল—না বাপু, ঝগড়া আমি একেবারে দেখতে পারি না, কেমন যেন—"

পিসী হঠাৎ যেন অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ওমা, ঝগড়া নাকি আবার কারুর ভাল লাগে!—নে, শিগগির আমার কমণ্ডলুটা কোথায় আছে দে দিকিন—রোদ চড়চড় ক'রে বেড়ে যাচ্ছে। ওরা নিজেই মিটিয়ে নিলে ঝগড়াটা, না—"

সেজো বউ বলিল, "না, রতন ঠাকুরঝি ওপরপড়া হয়ে মিটিয়ে দিলে।"

অন্নদা পিসী বলিলেন, "ভাল করেছে। মুয়ে আগুন, এইটুকু পাড়া তাতে আবার ঘর ঘর ঝগড়া! কটা দিন বাইরে বাইরে ছিলাম, কি তৃপ্তিতে যে কেটেছে! ফিরতে কি মন সরছিল? কেবলই মনে হচ্ছিল গাঁয়ে গিয়ে আবার সেই —এর সঙ্গে ওর মুখ দেখাদেখি নেই, ও ওর বাপান্ত না ক'রে জলস্পর্শ করে না—ওদের দু বাড়ির মাঝখানে দেয়াল উঠেছে—দে না রে কমণ্ডলুটা, আর মালাগাছটাও দিস,—তুমি দেখ তো একবার বড় বউমা—"

নাতবউ একটু আবদার করিল, "আমায়ও নিয়ে চল ঠাকুমা, হ্যাঁ—"

"তুই কাল যাস তখন। কনে বউ, পা টিপে টিপে চলবি—আমি ঝাঁ ক'রে দুটো ডুব দিয়ে আসি।"

পিসী চলিয়া গেলে আবার দুই বউএ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। সেজো বউ ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, "উনি আবার তীর্থ করবেন! গেছি আর কি।"

রেলের ওপারে গঙ্গা। চরকি ঘুরাইয়া রেল পার হইয়া প্রথমেই চাটুজ্যেদের বাড়ি। সদর দরজাটা পার হইলে বাইরের উঠানটা পড়ে। ঝি হারানের মা গরুর জন্য বঁটিতে বিচালি কাটিতেছিল, দেখিয়া কাজ থামাইয়া প্রশ্ন করিল, "ওমা, পিসী যে গো। এই শুনলাম মাসচারেক এসবে নি। দাঁড়াও, একটু পাদকজল নি, তীর্থি ক'রে এলে। কি কি তীর্থি হ'ল পিসীর গা?"

"মুয়ে আগুন, আমার আবার তীর্থি! মন প'ড়ে থাকে তোদের কাছে, এক দণ্ড যে মোনোস্থির করে—তোর হারানে কেমন আছে? জ্বর দেখে গিয়েছিলুম—"

সদর উঠানের ওদিকে অন্দরবাড়ি। রান্নাঘরের জানালা দিয়া সরযূর দেখন-হাসি বলিল, "অনা পিসী যে গো!"

নানাবিধ প্রশ্নে মুখর তিন-চারিটি কৌতুকদীপ্ত মুখ আসিয়া জানালায় জড় হইল।

"আসচি, কেমন আচিস সব?" বলিয়া অন্নদা পিসী অন্দর-বাড়ির দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সরযূর দেখন-হাসির মা ভাঁড়ার ঘর থেকে বাহির হইয়া আসিল। সমবয়সী। পাড়ার বউ, সেই সম্পর্কে ভাজ। বেসনের হাতটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "ফলল তো আমার কথা? মরণ, তুমি আবার তীর্থি করবে! তোর পিসীকে একটা আসন দে না রেণু।"

অন্নদা পিসী বলিলেন, "না আর বসব না বউ, তাড়াতাড়ি দুটো ডুব দিয়ে আসি।—সত্যিই একা একা মন টিকল না। থাকতিস তুই সঙ্গে, আরও গোটাকতক তীর্থ সারতাম। কিন্তু কথা চাপা দিলে শুনব না তো। ঘটা করে সাধ দিলি মেয়ের শত্রুমিত্র পাত পেতে গেল, শুধু—"

পিসী হঠাৎ থামিয়া গেলেন, ছেলেমেয়েরা জড় হইয়াছিল, বলিলেন, "সর্ দিকিন তোরা, ছেলেমানুষেরা সব কথা শোনে না।"

উহারা সরিয়া গেলে গলাটা খাটো করিয়া বলিলেন—"হুঁ, উপযুক্ত হয়েছে। আমি যাবার সময়েই বউমাকে ব'লে গেছলাম—দেখো, রেণুর সাধে কালো বউ যদি ঘোষালগিন্নীকে দিয়ে না পাত পাতায় তো আমার নামে কুকুর পুষো, ও তেমন সেয়ানা মেয়ে নয়। বললে পেত্যয় না যাবি বউ, যখন তোর অমনটা হ'ল আমি ঘোষালগিন্নীর শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিলাম—বলি—একটা শোকের সময় অতি বড় শত্রুতেও একবার এসে পাশে দাঁড়ায়, তা—থাক্, সে সব কথা শুনলে আবার—ঐ যে বললাম—উপযুক্ত হয়েছে, থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দিয়েচিস বউ, আমার শুধু আপসোস রইল গোমড়া-মুখীকে নিজের চোখে বড় বড় মাছের গেরাস তুলতে দেখলাম না।...না, ভাল কথা!—গেরাসের কথায় মনে পড়ে গেল—খাওয়ানোর ব্যবস্থা নাকি দুরকম হয়েছিল বউ?"

চাটুজ্যে গৃহিণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি ঠাকুরঝি!"

"চমকো না, চমকাবার এখনও ঢের বাকি আছে। শুধু খাওয়াবার দুরকম ব্যবস্থা নয়, পরিবেশনেও মুখ দেখাদেখি হয়েছিল।"

চাটুজ্যে গৃহিণী ভীতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কে বললে এ কথা ঠাকুরঝি?

"কে বললে বউকে এখন সেই কথা বল! কে দরদ দেখিয়ে ভাব করাতে—থাক বাপু। কথাটা শুনলাম এসেই, তাই ভাবলাম বউকে একবার ব'লে যাই—আপনভোলা সাদাসিদে মনিষ্যি; দুনিয়াটাকে নিজের মতন ক'রে দেখে...কিন্তু ব্যাগতা করি বউ, আমার নাম করিস নি কারুর কাছে—সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না; নেহাত শুনলাম কথাগুনো—গায়ে লাগল, তাই—"

হঠাৎ কণ্ঠস্বর তুলিয়া সহজভাবে বলিলেন "তা হ'লে তুই যাবি না তো এখন? ভাবলাম, যাই, বউকে ডেকে নি, তা যা ভাঁড়ার নিয়ে পড়েছিস!—ভাঁড়ার ভাঁড়ার করেই মরবি তুই...যাই, সমস্ত রাত জাগা, শরীরটা যেন আর বইচে না।"

চাটুজ্যেবাড়ি থেকে যখন বাহির হইলেন, পিসীর মুখের ভাবটা বেশ প্রসন্ন। দুইটি শিশু বাহিরে কলহের উপক্রম করিতেছিল, মাঝখানে দাঁড়াইয়া মিষ্ট কথায় দুইজনকে ঠাণ্ডা করিলেন; বলিলেন, ঝগড়া মারামারি কি করতে আছে বাপ? ছি—, লক্ষ্মী ছেড়ে যান। কাশী থেকে কাঠের পুতুল এনেছি, নিয়ে এসো আমার কাছ থেকে—ঝগড়া করে না।"

চাটুজ্যে বাড়ি ছাড়াইয়া রাস্তাটা বাঁয়ে ঘুরিয়াছে, তাহার পরেই একটা ফেঁকড়া চৌধুরীপাড়ায় প্রবেশ করিয়াছে। সেটা গঙ্গায় যাওয়ার পথ নয়, অনেক ঘুরিয়া স্টেশনের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

গঙ্গায় যাইবার পথ না হইলেও অন্নদা পিসী পিছনে একবার চাহিয়া লইয়া এই গলিটাতে প্রবেশ করিলেন।

একটু গিয়াই ঘোষালদের বাড়ি।

ঘোষাল গিন্নী এক গোছা পূজার বাসন আর খানিকটা তেঁতুল লইয়া ঘাটে যাইতেছিলেন পিসীকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি যে গো! আজ সকালে বুঝি? মিটল তিথের সাধ?" অল্পেই হাসা রোগ আছে, নথের ঘেরার মধ্যে মুখটি হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

পিসী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুই ঘাটে যাচ্ছিস কি লো বউ, তোর তো বিছানায় প'ড়ে থকবার কথা।"

ঘোষাল গিন্নী সশব্দে হাস্য করিয়া বলিলেন, "মরণ! বিছানায় পড়ে থাকতে গেলাম কেন? তুমি তিথি ঘোরো লম্বা লম্বা পা ফেলে আর ঘোষাল বউ বিছানায় পচুক!"

পিসী যেন ভ্যাবাচাকা লাগিয়া গিয়া উপর দিকে চাহিয়া কি চিন্তা করিলেন একটু, তাহার পর আত্মস্থভাবেই ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন, "তা হ'লে কি ঠাট্টা করলে?—তাই হবে নিশ্চয়, আমারই বোঝবার ভুল হয়েছে।"

ঘোষাল গিন্নী হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "দেখ ঢঙ, এলেন আর আরম্ভ হ'ল! হ্যাঁ গা, শয্যাধরা হয়েছি ব'লে কে ঠাট্টা করলে? জলজ্যান্ত মানুষ, দুবেলা দেখচে লোকে—তা বসবে না একটু?—দাঁড়িয়ে থাকবে—অ্যাদ্দিন পরে তিথি করে ফিরলে—"

"না বসব না বউ, সমস্ত রাত জাগা, শরীর ভাজা ভাজা হয়ে রয়েচে রোদ্দুরও বেড়ে উঠবে চড়চড় করে। তাড়াতাড়ি দুটো ডুব দিয়ে আসি—কিন্তু বলিহারি ঠাট্টা মা, খুরে খুরে নমস্কার সবাইকে। ঠাট্টা শুনলে পেটের মধ্যে হাত পা সেঁদিয়ে যায় ভয়ে! আমি ভাবছি কখন গিয়ে বউএর হাসিহাসি মুখখানা দেখব। আর কি আঁতে ঘা দিয়ে ঠাট্টা বাপু!"

ঘোষাল গিন্নীর হাসিহাসি মুখটা নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল একটু, উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "আঁতে ঘা দিয়ে কি ঠাকুরঝি?"

"থাক সে কথা বউ, ছেলেপুলেগুনো আছে—কেমন বল দিকিন? পান্তীটা অসুখে দেখে গেছলাম—"

"সেরে উঠেছে।"

হাতের বাসনগুলো পাশে শানের বেঞ্চির উপর রাখিয়া ঘোষাল গিন্নী একটু জিদের সহিত বলিলেন, "না, তুমি নুকুচ্ছ ঠাকুরঝি, বলতেই হবে—আমি জানি উঠেচে একটু কথা।"

অন্নদা পিসী গলাটা খাটো করিয়া বলিলেন, "কে বলেছে আমি নাম করতে পারব না বউ,—কিনি দরদ দেখিয়ে তোমাদের মধ্যে ভাব করাতে গেছলেন? রাস্তায় দেখা হল—অপরাধের মধ্যে জিগগেস করলাম—হ্যাঁগা রতন—"

পিসী যেন নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন, আত্মধিক্কারের সহিত বলিলেন, "দেখলে ভীমরতি, বলব না—না, আপনি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল নামটা। বলে ধম্মের কল বাতাসে নড়ে—জিগগেস করলাম—রতন, ঘোষাল গিন্নী আছে কেমন বলতে পারিস?—ঘোষাল গিন্নী তোমার কুপোকাত হয়েছেন। চারটে ভোজ বাদ গেছল, আর লোভ সামলাতে পারেন কি? রেণুর সাথে তাড়াতাড়ি ভাব ক'রে নিয়ে চারটে ভোজের খাওয়া এক সঙ্গে—"

ঘোষাল গিন্নীর মুখটা একেবারে পাঁশুটে হইয়া গেল। যেন অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন, "রতন এই কথা বললে ঠাকুরঝি, রতন?"

পিসী বলিলেন, "তুই মানুষ চিনিস না বউ, সেই জন্যেই তো তোর কথা ভেবে মরি। তিথিই করতে থাকি আর যাই করতে থাকি—মনে হয় আপনভোলা মানুষ—বউটা কার না কার কাছে বোধ হয় অপদস্ত হচ্ছে।"

ঘোষাল গিন্নীর পাঁশুটে মুখটায় আবার রং ফিরিয়া আসিতে লাগিল, কান দুইটা রাঙা হইয়া উঠিল; শুধু প্রশ্ন করিলেন, "রতন ওই কথা বললে?"

পিসী গলাটা একেবারে চাপিয়া আনিলেন, ছোবলমারা গোছের করিয়া হাতটা নাড়িয়া বলিলেন, "শুধু রতনই বলি কেন গো। ঐ চাটুজ্যে গিন্নী—সেধে তো যেতে চায় নি; আত্তিস্য দেখিয়ে ভাব ক'রে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে গেলি একটা মানুষকে, তার পরে ওই কথা?"

ঘোষালগিন্নী বিস্ময়ের উপর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "চাটুজ্যেগিন্নী!"

"ঘোষালদা ঠিকই বলতেন বউ; তুই আর বাড়লি নি, যেমন কনে বউটি এসেছিলি, তেমনিই রয়ে গেলি। মাগী কম নাকি?' গেছলাম কিনা, বলি কদিন পরে এলাম, একবার দেখাটা ক'রে আসি—সে কী চিপটেন কেটে কেটে কথা মা! কী হাসি! —কী ছড়া কাটা!—সেই তো মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি?'—ঠাকুরের শ্রাদ্ধয় মুখ ফিরিয়ে থেকে, এলি কিনা, সাধের খাওয়ার সময়! এটুকু লোভ সামলানো গেল না?"

ঘোষালগিন্নী উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। কনে বউএর সঙ্গে তাঁহার নিজের কোনও যুগে কোনও সাদৃশ্য ছিল কি না সন্দেহ; আর সে-কথা ভুক্তভোগী ঘোষালদার চেয়ে কেউ বেশী জানে না। চাটুজ্যেদের লইয়া পাড়ার অন্তত কুড়ি বাইশখানা ঘর অনায়াসে শুনিতে পারে কণ্ঠস্বরকে এইরকম চড়া পর্দায় বাঁধিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সেধে গিয়েছিলুম? আমায় বলে কি না—সেধে গিয়ে-ছিলুম?—মনে নেই—শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিল?—আন্না-বামনী যাবে সেধে নেমন্তন্ন খেতে?"

অন্নদা পিসী বলিলেন, "চুপ কর্ বউ, লোকে মনে করবে আমি বুঝি তোকে খেপিয়ে দিয়ে গেলুম। মুয়ে আগুন, আমার নিজের বলে মরবার ফুরসৎ নেই—যাই বউ, চুপ কর্—এদিকে রোদটা দেখতে দেখতে চড় চড় ক'রে উঠছে—চাঁদি ফেটে যাচ্ছে মাথার। নে, মাথা গরম করিস নি।"

রোদে অবশ্য চাঁদি ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু গলি হইতে ফিরিয়া অন্নদাগিন্নী যখন সদর রাস্তায় পড়িলেন, তখন তাঁহার মুখটা পূর্বের চেয়েও প্রসন্ন। ঘোষালগিন্নীর গলা ক্রমেই পর্দায় পর্দায় চড়িয়া উঠিতেছে, যখন মোড়টা ফিরিবেন একবার মুড়টা ফিরাইয়া পিসী দেখিলেন চাটুজ্যেগিন্নী ধীরে ধীরে আসিয়া ষষ্ঠীতলায়, গলিটার মাথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিসী তাড়াতাড়ি মোড়টা ফিরিয়া পা চালাইয়া দিলেন।

রাস্তাটা দীনু ঘোষের পুকুরের পাশ দিয়া ঘুরিয়া ডাইনে বুড়ো শিবের ভাঙা মন্দির রাখিয়া আবার মোড় ফিরিয়াছে, তাহার পর সোজা গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গিয়াছে। মন্দিরের সামনেই, রাস্তার অপর দিকে একটা শান বাঁধানো ঘাট। নীচের রানায় চরণ ঘোষের বিধবা বোন বাতাসী একটা কাপড়ে সাবান দিতেছে আর নিজের মনেই কি একটা কথা লইয়া গরগর করিতেছে। মেয়েটাকে পাড়ার সকলেই সাধ্যমত এড়াইয়া চলে বলিয়া সর্বদাই নিঃসঙ্গী থাকে, তবে কখনও নির্বাক থাকে না। বাতাসীর নিয়ম হইতেছে সে বসিয়া কাজই করুক বা উঠিয়া চলাফেরাই করুক পাশে প্রয়োজন

মত একটি দুইটি বা ততোধিক মানুষ রহিয়াছে এরূপ ধরিয়া লইয়া নিজের বক্তব্য বলিয়া চলে। কাল্পনিক মানুষের সহিত বাক্যালাপ যদি বাস্তবিক মনুষ্যে শুনিতে পায়, গ্রাহ্য করে না। কেহ যদি শোনেও তো টুকিতে সাহস করে না।—বাতাসী ডাকসাইটে কুঁদুলী মেয়ে।

কেহ যদি অন্নদা পিসীর মুখের পানে চাহিত, মনে করিত পিসী যেন মেঘ না চাহিতেই জল পাইয়াছেন। বাতাসী মুখ নীচু করিয়া একমনে সাবান দিতেছিল, পিসী মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া একটা গলা খাঁকারি দিলেন।

"অনা পিসী নাকি গো? কখন এলে?"

পিসী দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঘাটের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে, বাতাসী? আমায় কিছু বললি নাকি?

বাতাসী সাবান দেওয়া বন্ধ করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "জিগগেস করছিলাম কখন এলে?—এই শুনলাম তিথি করতে গেছ, এক বচ্ছর এখন আসবে না—জানি না বাপু, কত কথাই যে রটাতে পারে সব, খেয়ে দেয়ে কাজ তো আর নেই।"

বাতাসী হঠাৎ কান খাড়া করিয়া একটু শুনিল, জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোষালগিন্নীর গলা শুনচি না? ওই এক মানুষ, সকাল থেকেই আরম্ভ করেচে। কি ব্যাপার অনাপিসী? তুমি তো ওই দিক দিয়েই আসছ।"

পিসী বলিলেন, "খ্যামা দে বাছা, খাই-দাই গাজন গাই, কারুর কথায় থাকি না। সমস্ত রাত জেগে শরীরটা ভাজা ভাজা হয়ে রয়েছে, ভাবলাম গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি। কে গলা বের করচে, কে ষষ্ঠীতলায় দাঁড়িয়ে কার বেটা পুত কাটছে ওসব খোঁজ রাখি না। তবে একটা কথা আসতে আসতে যেন কানে গেল—কান দিই না তবে 'বাতাসী বাতাসী' করছে শুনে—না, থাক বাছা, আবার ভাববে সবাই—"

বাতাসী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কি কথা, বল পিসী, আমার মড়া মুখ দেখ। আমি জানি বাতাসী সবার বুকে বাঁশ দিয়ে ডলচে; বাতাসীর কেউ ভাল দেখতে পারে না।"

পিসী একবার চারিদিকে চাহিয়া যেন নিতান্ত নিরুপায়ভাবে বাতাসীর মুখের পানে চাহিলেন, তাহার পর আগাইয়া গিয়া গলা খাটো করিয়া বলিলেন, "কড়া দিব্যিটা খপ্ করে দিয়ে বসলি বাতাসী, তোদের যেন কি হয়েছে!—হ্যাঁলা, রেণুর সাধে, ঘোষালগিন্নীর পায়ে ধ'রে সাধাসাধি ক'রে নিয়ে গিয়ে ভাব করাবার তোর এমন কি মাথাব্যথা ধরেছিল? —যশের জায়গা বড়, যশ নিতে গেছলি, এখন সামলা।"

বাতাসী কাপড়টা গুটাইয়া লইয়া পাশের গাদার উপর রাখিয়া দিয়া হাত দুইটা হাঁটুর উপর রাখিয়া সোজা হইয়া বসিল, সুর টানিয়া বলিল, "কী—বাতাসী পায়ে ধরে ভাব করাতে গেছে? —বাতাসী?"

পিসী বলিলেন, "আমি বললাম সে কথা; বললাম সে তো থাকে না বাপু কারুর কথায়, তা থাক বাছা, রোদ এদিকে চড়চাড়িয়ে উঠছে। মাথা গরম করিস নি বাতাসী, ভালর যুগ নয় তো, তোরই দোষ যে লোকের উবকার করতে গেছলি।—আমার নামটা আর করিস নি বাছা, ব্যাগত্তা করি, নেহাত দিব্যি দিয়ে বললি—"

যাইতে যাইতে বলিলেন, "আজ বিকেলে একবার আসবি বাতাসী, বদ্যিনাথের পেসাদ নিয়ে আসবি একটু।"

মোড়ের মাথায় একবার মুখটা ঘুরাইয়া দেখিলেন বাতাসী কাপড়চোপড় সব বাঁ হাতে জড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। পিছন হইতে দেখিতে হইয়াছে যেন একটা ফণাধরা গোখরো সাপের মত।

মোড় ফিরিতেই দেখা হইল রতনের ভাইপো গোবরার সঙ্গে। পিসী প্রশ্ন করিলেন, "তোর পিসী কোথায় রে?"

গোবরা বলিল, "এই মাত্তোর নাইতে গেলেন, গঙ্গায়।"

"মুয়ে আগুন, আমারই সাতপহর বেলা হয়ে গেল, পাঁচ ভূতের পাল্লায় পড়ে যত মনে করি থাকব না এদের কথায়, তা ছাড়বে?" পিসী পা চালাইয়া দিলেন।

রতন স্নান সারিয়া উঠিয়া আসিতেছিল, পিসী চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "ওমা! রতন তুই এখানে?—আর তোর নামে ওদিকে—"

সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা উৎকট উদ্বেগের ভাব ফুটিয়া উঠিল যে, রতন পিসীর ত্বরিত প্রত্যাগমনের কথাটাও তুলিতে ভুলিয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, "কি কথা জেঠাইমা? আমায় নিয়ে কি কথা আবার?"

পিসী বলিলেন, "থাক বাপু, না জানিস ভালই। পিরথিমিতে যে যত কম জানতে পারে সেই তত ভাগ্যিবতী। বাড়ি যা।—তোর মেয়েটা আছে কেমন?"

রতন ব্যাকুল আগ্রহে ধরিয়া বসিল, "না, বলতেই হবে তোমায় জেঠাইমা।"

"এই দেখ বেআড়া জিদ মেয়ের!—তোমার মতন নির্ঝঞ্ঝাট মানুষের কেন গায়ে পড়ে পরের অত উবগার করতে যাওয়া বাছা? ওসব বাই ছাড়।"

"কি উবগার করেছি জেঠাইমা, আমার তো—"

"কি উবগার করেছ তা আমিই কি জানি বাছা? সমস্ত রাত জেগে শরীরটা ভাজা ভাজা হয়ে রয়েছে, মনে করলাম যাই একটা ডুব দিয়ে আসি গঙ্গায়। বড় বউমা বারণও করলে; বলে মা হাক্লান্ত হয়ে রয়েছ, এইখানেই তোলা জলে নেয়ে নাও। না তার কথা কেটে আসতাম, না হত শুনতে।—ষষ্ঠীতলায় এসে দেখি হাট বসে গেছে যেন।—হ্যাঁগা, ব্যাপার কি? কিসের এত গণ্ডগোল এখানে?—কে কার কথা শোনে? সব অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে রয়েছেন। শেষে বাতাসী ছুঁড়ী বললে, রতনদিদি এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে, দুটো বাড়িতে মুখ দেখাদেখি ছিল না, পাড়া ঠাণ্ডা ছিল; নিষ্কম্মা মানুষ ওঁর আর সেটা সহ্য হল না—গেলেন ভাব করাতে—এখন সরে দাঁড়িয়েছে কেন? দেখে যাক এসে—"

রতনের সমস্ত শরীরটা হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। বলিল, "বাতাসী হারামজাদী এই কথা বলেছে?—ছোটলোকের দুটো পয়সা হয়েছে কিনা। আছে সে ষষ্ঠীতলায়?"

অন্নদাপিসী বলিলেন, "থাক না থাক তুমি এখন যেতে পারবে না সেখানে বাছা। —আর আমি বলেছি এ কথা যেন বলতে যেও না ব্যাগত্তা করি, নেহাত তোকে বললে গায়ে লাগল, তাই। তাও বলতুম না, জানি অসইরন সইবার পাত্তোর নোস তুই, শিবুঠাকুরপোরই মেয়ে তো—নেহাত কোট করে বসলি—শুনে তবে ছাড়বি—"

পিসী গলাটা আবার খাটো করিয়া লইলেন, বলিলেন, "তবে বলতেই যখন হল—ওই ঘোষালগিন্নী মাগীই কি কম নাকি?—ভাব করাবার নাম করে নিয়ে গিয়ে কি অপমান করিয়েছিস? গলা বের করে জাহির করে বেড়াচ্ছে—আর চাটুজ্যে গিন্নীকেও নাকি কি সব বলেচিস?—খল, পেটে পেটে জিলিপির প্যাঁচ?—"

তিনজনের অভিযোগে রতন যেন একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল, দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "ওরা এখন আছে সবাই ওখানে জেঠাইমা?"

"না, কেউ নেই; তুমি সোজা বাড়ি যাও। এই কড়কড়ে রোদ্দুর মাথায় করে তোমায় সেখানে যেতে হবে না এখন। তুই বরং দাঁড়া, আমি একটা ডুব দিয়ে উঠে আসছি। খবরদার যাবি নি রতন—"

জলে নামিবার পূর্ব্বে পিসী একবার ঘুরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন ঘাটের কাদা, কাঁকর অগ্রাহ্য করিয়া রতন প্রায় পাগলের মত হন হন করিয়া উঠিয়া যাইতেছে।

স্নান করিয়া অন্নদা পিসী বাঁ হাতে কমণ্ডলু লইয়া এবং

(শেষাংশ ৪৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সহস্র সহস্র নারী নিয়মিতরূপে কামিনীয়া অয়েল ব্যবহারে তাঁহাদের কেশের শোভা ও লাবণ্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহা কেশ ঘন করে, কেশের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ও সৌন্দর্য্যে সজীবতা আনে। অধিকন্তু ইহার সৌরভে মন আনন্দে ভরপুর হয়।

কামিনীয়া অয়েল (রেজিঃ)

প্রতি শিশি ১৲ টাকা। তিন শিশি একত্রে ২৷৷৵০। ভিঃ পিঃ খরচা স্বতন্ত্র। তিন পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইলে ফ্রী নমুনা পাঠান হয়।

অটো দিলবাহার

(রেজিষ্টার্ড)

প্রাচ্যদেশের আনন্দদায়ক সুগন্ধি। চিত্তহারী ও রোমাণ্টিক জিনিষ। দীর্ঘকাল ইহার সুরভি টাট্‌কা থাকে। ½ আউন্স ১৷০, ১ ড্রামের শিশি ৸০। ভিঃ পি খরচা স্বতন্ত্র। এক আনা মূল্যের মেল্টেড কার্ড। ডাকব্যয় বাবদ দুই আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হয়।

কামিনীয়া স্যাণ্ডাল সোপ (রেজিঃ)

বাছাই করা উপাদান ও বিশুদ্ধ চন্দন তৈল দ্বারা প্রস্তুত। ইহার নবনীত ফেনরাজি লোমকূপসমূহ পরিষ্কার করে এবং ত্বক্ রেশমসদৃশ কোমল হয়। ৩ খানির বাক্সের মূল্য ৸৵০। ভিঃ পি খরচা স্বতন্ত্র।

সোল এজেণ্টস্

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল কোং,

২৮৫, জুম্মা মসজিদ, বোম্বাই ২।

ষ্টকিস্টস্ঃ—সিক্‌রি এণ্ড কোং লিঃ,

৫৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আধুনিক জগতে ব্যাংক মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য

দি কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কুষ্টিয়া, বেঙ্গল;

বাঙ্গলার কৃতিসন্তান ও বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব অর্থ সচিব **শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার** মহাশয় গত ২১শে এপ্রিল (১৯৪০) তারিখে উক্ত ব্যাঙ্কের **"আলমডাঙ্গা"** (নদীয়া) শাখার শুভ উদ্বোধন করিয়াছেন।

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

১৯৩৯ সালের কার্য্যের উপর শতকরা ৩৵০ হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

সুদের হার

সেভিংস অমানত	... ...	৩৷০%	বার্ষিক
কারেণ্ট	... ...	২৲%	"

স্থায়ী আমানতের হার লিখিলে জানান হয়

শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র মণ্ডল

চ্যায়ারম্যান।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মৈত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
ম্যানেজার

যব ও বলীদ্বীপের নৃত্যনাট্য

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

আমাদের দেশে যবদ্বীপের নৃত্যাভিনয়—"ওয়াং ওয়ং"এর বিষয়ে অনেকের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু সকলেই শুনেছেন যে, ভারতীয় নৃত্যাভিনয়ের ছাপ তাতে প্রচুর। কিন্তু ঠিক কোন্ দিক থেকে কতটুকু যে তারা গ্রহণ করেছে ভারতবর্ষ থেকে তার আন্দাজ পেলাম, সেখানকার দুইটি বিখ্যাত নাট্য দেখে।

প্রথমটি দেখেছিলাম, "শুরকর্তা", শহরের ছোট রাজা মাংকুনগারোর প্রাসাদে, রাজার গদি আরোহণের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে; দ্বিতীয়টি দেখেছি, "যোগ্যকর্তা"র সুলতানের প্রাসাদে।

এ দুটি নৃত্যনাট্য সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজবাড়ির অভিনেতৃবৃন্দ দ্বারা অভিনীত হয়েছিল। তাতে রাজকন্যা ও রাজকুমারেরা যোগ দিয়েছিলেন। সে-দেশে রাজবাড়ির বিশেষ কোন উৎসব অনুষ্ঠান ছাড়া এত বড় নৃত্যনাট্য এত আড়ম্বরের সঙ্গে সচরাচর দেখা যায় না। সেই কারণে নৃত্যনাট্য বলতে সে-দেশে ঠিক কি বোঝায় তার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সুলতানেরা আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন এই সব নৃত্যনাট্যের মহড়া দেখবার জন্যে। এবং যোগ্যকর্তার সুলতানের সহোদর ভ্রাতা শ্রেষ্ঠ নৃত্যবিশারদ রাজকুমার "তেজোকুসুমো"র আনুকূল্যে ও ঐকান্তিক আগ্রহে এই সব নাচের ভিতরকার ব্যাপার জানবার সুবিধা পেয়েছি।

আদর্শে সেখানকার নৃত্যনাট্য যে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যনাট্যের কাছে ঋণী একথা স্বীকার করতেই হবে। মহাভারত ও রামায়ণ এবং সে-দেশের আধা ঐতিহাসিক প্রাচীন কাব্যকে সুরে তালে ছন্দে রূপ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের দেশের প্রাচীন নৃত্যাভিনয় বলতে আমরা যা বুঝি এদেশে নৃত্যাভিনয় সেই পথেই চলেছে। ভারতের রামায়ণ মহাভারত সে-দেশে গিয়ে সে-দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে বেশ মিশ খাইয়ে নিয়েছে। গল্পে এমন সব চরিত্র দেখি, যাদের ভারতবর্ষের রামায়ণ ও মহাভারতে কখনো দেখা যায় না। অথবা এমন বহু ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছে যা আমাদের দেশের এই দুই মহাকাব্যে আছে বলে আমরা জানি না। যবদ্বীপের নৃত্যনাট্যে রামায়ণের গল্প অভিনীত হয় খুব কম। প্রাধান্য

যবদ্বীপের নৃত্যনাট্যে নমস্কারের ভঙ্গি

সেখানে মহাভারতের গল্পের। এই মহাকাব্যের উপর নির্ভর ক'রে সে-দেশের বহু বিখ্যাত প্রাচীন নৃত্যনাট্য গঠিত। মহাভারতের অর্জুন সে দেশের প্রাচীন নাটকের বিশেষ আদরের চরিত্র। আমাদের দেশে কৃষ্ণকে বৈষ্ণবরা সাহিত্যে যেভাবে গ্রহণ করেছে, অর্জুনের স্থান প্রায় সেই রকমের, অর্জুনকে বাদ দিয়ে খুব কমই প্রাচীন নৃত্যনাট্য রচিত হয়েছে।

আদর্শগত মিল থাকলেও, নৃত্যাভিনয় পদ্ধতিতে ভারতের প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে কোন মিল পাওয়া যায় না। সে-দেশের নৃত্যপদ্ধতি তাদের নিজেদেরই। মনে হ'ল শ্যাম বা ইন্দোচায়না নাচের সঙ্গে যেন তাদের মিল বেশী। প্রাচীন ভারতের মত মুদ্রাভিনয়ের স্থান এদেশে নেই। এদেশের নৃত্যনাট্যে দুটি মাত্র মুদ্রা হাতের আঙুলে ব্যবহৃত হয়, কোন অর্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয়, কেবল আঙুলের ভঙ্গির জন্যে। এই মুদ্রা দুটি যথাক্রমে আমাদের নাট্যশাস্ত্রমতে "কটকামুখ" ও "মুষ্টি" হস্তের অনুরূপ। আর আছে বিভিন্ন ধরনে চাদর ধরবার আঙুলের কায়দা।

ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যনাট্য ছিল গীতিনাট্য। এই গান গাইবার জন্যে একদল আলাদা গায়কের দরকার হয়। এদের নৃত্যনাট্যেও সেই রকমের আলাদা গানবাজনার দল আছে। তাদের উপরেই সমস্ত নাটকটি নির্ভর করে।

আমাদের দেশে কোন কোন প্রাচীন নৃত্যনাট্যে, অভিনয়কালে অভিনেতারা কখনো কথা বলে না। আবার অনেক নাচে অভিনেতারা নিজেরা গান গায় ও কথা বলে। জাভার নৃত্যনাট্যেও সেই প্রথা বর্তমান। "শুরকর্তা"র রাজাদের ওখানে দেখলাম অভিনেতারা সকলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের পাঠ বা কথা গানের সুরে, তালে সুন্দর মিষ্টিগলায় গাইল। কিন্তু যোগ্যকর্তার প্রাসাদে অভিনেতাদের গান গাওয়া নিষেধ। সেখানে তারা কেবল কথা বলে একটি বিশেষ প্রণালীর কৃত্রিম কণ্ঠস্বরে, গান গায় কেবল গায়করা। ভারতের নৃত্যাভিনয়ের মতো গানের সঙ্গে দেহের ভঙ্গিতে কোন সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা এদের নৃত্যনাট্যে একেবারেই নেই। স্থির ও নিশ্চল ভাবে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বা বসে, কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটি সামনের অভিনেতার দিকে সোজা করে বাড়িয়ে দেয়। কথা শেষ হওয়া মাত্রই নামিয়ে

যবদ্বীপের নৃত্যনাট্যে ঘটোৎকচ

নেয়। কেবল বিদূষক ছাড়া আর কোন অভিনেতার অধিকার বা স্বাধীনতা নেই কোন প্রকার অভিনয়োপযোগী মুখভাব প্রকাশ করার। তাদের মুখে থাকবে মুখোশের মতো গম্ভীর অর্থহীন ভাব ও অর্থহীন দৃষ্টি। তারা কান্নার অভিনয়ের সময় মুখ চাদরের আড়ালে ঢেকে দুঃখের ভঙ্গি প্রকাশ করে, কিন্তু সেই অবস্থাতেও মুখের ভাবের পরিবর্তন হবে না।

নৃত্যশাস্ত্রে "নৃত্ত" কথাটি যে অর্থে ব্যবহার হয়, সেই প্রকার ছন্দোবদ্ধ নৃত্যের পরিচয় বেশী নেই। তালের সঙ্গে নাচ থাকে অভিনেতাদের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ প্রস্থান ও যুদ্ধের অভিনয়ের সময় বিশেষ করে। নাটকোক্ত চরিত্রের পদমর্যাদা অনুযায়ী অভিনেতাদের যাওয়া আসার ভঙ্গির পার্থক্য আছে। নাটকের স্ত্রী চরিত্রের চলন অতি কোমল ও মৃদু। নাটকের প্রধান ও আদর্শ স্থানীয় চরিত্রের চলনের সময় পা উ'চুতে তোলা বারণ। এ ছাড়া অন্যান্যদের চলনের মধ্যে শক্তির প্রকাশ খুবই দেখা যায়। পা যতটা সম্ভব উপরে তুলে, হাত ও পা টান করে ছড়িয়ে তালে তালে চলাই হ'ল এই শেষ দলের রীতি। কোমরের দুই পাশের চাদর দুটি হচ্ছে এদের নাচের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস। বিচিত্র রকমের হাতের ভঙ্গিতে তারা চাদরকে নাচের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে নাচের অনেক সৌন্দর্য বাড়িয়েছে।

এদের নাচে ঢেউএর মতো দোলা বা লতানা ভঙ্গি একেবারেই নেই। সবটাই সোজা সোজা ও কাটা কাটা। নাচের মধ্যে কোন তাড়াহুড়োর ভাব নেই, এ নাচের গতি খুব ধীর। কেবল যুদ্ধের সময় নাচ একটু দ্রুত লয়ে চলে। এত ধীর গতির নাচ আমাদের দেশে বিরল।

এদেশে পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস এই নৃত্যনাট্যের কাটা কাটা ও সোজা ধরন তারা পেয়েছে তাদের দেশের প্রাচীন চামড়ার পুতুল নৃত্যকে অবলম্বন করে। এমনকি তাঁরা বলেন সমস্ত "ওয়াং ওয়ং" নৃত্যনাট্য এই পুতুল নাচ থেকেই গঠিত।

যুদ্ধের নাচ এখানকার নৃত্যনাট্যে থাকবে সকলের চেয়ে বেশী। তাতেই নাটকের বেশী সময় নিয়ে নেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর অভিনয় এদেশের কোন নৃত্যাভিনয়ে কখনো দেখা যায় না। প্রথমে প্রবেশ করে দুই পক্ষ দাঁড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথায় পরিচয় করে নিল। বাজনা শুরু হ'লে নানাপ্রকারে পায়ের হাতের, দেহের ও মাথার ভঙ্গি করে পরস্পর পরস্পরকে ঘুরে ঘুরে দেখবে। এর পরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অস্ত্র সজ্জার অভিনয়, তালের সঙ্গে পরস্পরকে পরস্পরে দেখার অভিনয়। অল্পক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিয়ে শুরু করে আক্রমণের পালা। একজন অপর-জনকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় নাচের প্রথায়। পালাবার নাচও বেশ দৃষ্টিমধুর। এদের যুদ্ধেরধ অভিনয়ে দুইপক্ষকেই একবার করে হারতে হয়। পরাজিত পক্ষ বসে পড়লে বিজিত পক্ষ আর তাকে আক্রমণ করবে না। কেবল একস্থানে দাঁড়িয়ে নানাপ্রকার কটুবাক্য দ্বারা তাকে জর্জরিত করবে। এদের সব রকমের যুদ্ধের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত একই পদ্ধতি। সেই নিয়মকে অতিক্রম করার সামথ্য নেই কারো। যুদ্ধের নাচের মধ্যে এলোমেলো ভাব নেই। গল্পের চরিত্রের পার্থক্য অনুযায়ী কিছু কিছু সব নাচেই তফাত আছে। যেমন, যখন বালী সুগ্রীবের যুদ্ধ হয়, তখন নাচে একটু বানরোচিত ভঙ্গির পরিচয় দেখি। কিংবা যখন রাবণের সঙ্গে বালির যুদ্ধ হয়, তখন রাবণের ভঙ্গিতে থাকে খুব একটা শক্তির প্রকাশ। অর্জুন যুদ্ধ করবে খুব মোলায়েম ভাবে। কিন্তু মূলে প্রত্যেক নাচের তাল এক। এই রকমের নিয়ম থাকাতে এদের যুদ্ধের অভিনয়টা একটা সুন্দর নাচে পরিণত হয়ে ওঠে। যুদ্ধের শেষে জয়ী এবং বিজিত পক্ষ উভয়েই নিয়ম মত ধীরে ধীরে প্রস্থান করে।

এই নাট্যের খারাপ পক্ষ বরাবরই রঙ্গভূমির বাঁদিকে দাঁড়াবে, বসবে ও বাঁদিক দিয়ে প্রবেশ ও প্রস্থান করবে। ভালো পক্ষ সব সময় থাকবে ডানদিকে। তাই মহাভারতের গল্পে পাণ্ডবদের

শূরকর্তার প্রাসাদে পুরুষের সাজে নারী নর্তকী

স্থান ডান দিকে ও বাঁদিকে থাকে কৌরবরা। যুদ্ধের পর দুজন দুদিক দিয়ে প্রস্থান করলেও দর্শকরা জানল বাম পক্ষের কি হ'ল। যদি মৃত্যু ঘটে তো সেকথা গায়কদের গানেই বুঝতে পারল, যদি পলায়ন করে সেকথা গায়কই বলে দেবে।

অভিনেতাদের প্রতিবারেই ঠিক প্রবেশের মুখে একবার দর্শকদের দিকে মুখ করে বসে যব দেশীয় প্রাচীন প্রথায় নমস্কার জানাতে হয় এবং প্রস্থানের সময় রঙ্গভূমির শেষপ্রান্তে এসে আর একবার নমস্কার জানিয়ে তবে প্রস্থান করে।

বিদূষকের স্থান এই নৃত্যনাট্যে খুব বড়। বিদূষক ছাড়া নৃত্যনাট্য সম্পূর্ণ নয়। যদিও বাইরে থেকে এদের ভাঁড়ামি দেখে বিদূষক বলেই ভ্রম হয়। আসলে এরা নাটকে প্রধান ও আদর্শ-স্থানীয় চরিত্রের ভৃত্য মাত্র। সংখ্যায় চারজন। পরস্পরের মধ্যে চেহারার কোন মিল নেই। কেউ বে'টে, কেউ মোটা, লম্বা ও রোগা। এদের দেহের সজ্জা স্বভাবতই হাস্যকর হয়ে থাকে। অভিনয় পদ্ধতিতে এদের কোন বাঁধা রীতি নেই, সেদিকে এরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। নৃত্যনাট্যের ধীর, স্থির ও গম্ভীর আবহাওয়াকে বেশ হাল্কা করে রাখে। হাস্যরসের অভিনয়ের জন্যে এরা দর্শকের কাছে বিশেষ প্রিয়।

জাভায় এই বিদূষকদের নিয়ে একটা মতবাদ প্রচলিত আছে যে, যখন হিন্দুরা সংস্কৃতিকে নিয়ে সে দেশে উপস্থিত হয়, তখন সেখানকার অধিবাসীরা বিদ্যা বুদ্ধিতে ছিল অনেক নিকৃষ্ট। তাদের খুশী করবার ইচ্ছায় হিন্দুরা তাদের মহাকাব্যের মধ্যে জাভার কতগুলি খ্যাতনামা প্রাচীন চরিত্রকে ঠাঁই দিল এবং জানিয়ে দিল তারা হিন্দুদের দেবতা শিবের বংশধর। জাভার

অধিবাসীদের কাছে এরা তাদের পূর্ব পুরুষরূপেই পরিচিত। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতে এদের স্থান হ'ল সহায়ক অনুচর হিসাবে। একটু সম্মান পেল এই বলে যে এরা সব সময়ই ন্যায় ও ভালোর দিকেই থাকবে, এরা হাস্যরসের রসিক হলেও এদের বাক্যের মূল্য আছে, এরা বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। অভিনয়কালে এদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও রঙ্গভূমিতে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় তাদের নির্দিষ্ট নিয়মে চলতে হয়। প্রতিবার নমস্কার নির্দিষ্ট প্রথা মত করতেই হবে তার কোন ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই।

গ্যামেলান সংগীত হল সে দেশের সব কিছু নৃত্য গীতের প্রাণ। নৃত্যনাট্যের গান ও নাচ সব ব্যর্থ হয়ে যেত যদি না এই বিরাট সংগীতের সঙ্গে তা যুক্ত থাকত। এই গ্যামেলান সংগীতের সঙ্গে নাচের ছন্দের মিলন অতি সুন্দর।

প্রাচীন নৃত্যনাট্য ওদের কাছে কতখানি শ্রদ্ধার সম্পদ তার কিছু আলোচনা করা যাক। জাভার অধিবাসীরা সকলেই মুসলমান ধর্মাবলম্বী; কিন্তু আচার ব্যবহারে তারা প্রাচীন হিন্দুদের বহু প্রকার পদ্ধতি এখনো বজায় রেখেছে, সুলতানদের পরিবারে ও সেদেশে ধনী প্রাচীন বংশে। নৃত্যকলাও সেই প্রকার একটি প্রাচীন হিন্দুপ্রথা যাকে তারা ত্যাগ করেনি। খুব বেশী পরিবর্তনও আনেনি। যে পুস্তকে নাটক লেখা আছে, সেই পুস্তক তাদের কাছে প্রায় ধর্মগ্রন্থের সমান। রঙ্গভূমিতে আনবার সময় যত্নের সঙ্গে সুন্দর কাপড়ে মুড়ে মাথায় বহন করে আনে। সঙ্গে দুজন থাকে মোমের প্রদীপধারী দুই পাশে। যদিও আলোর কোন প্রয়োজন সে দেশে নেই। এই পুস্তকের পিছনে সারিবেঁধে আসবে গানের ও বাজিয়ের দল, সকলের আগে থাকেন প্রধান কথক। সসম্ভ্রমে, নিঃশব্দে যে যার নির্দিষ্ট স্থানে বসে যায়, একটুও গোলমালের পরিচয় পাওয়া যায় না। গান বাজনার দল সংখ্যায় ত্রিশজনের উপর। বইটি থাকে সুসজ্জিত একটি ছোট চৌকিতে প্রধান কথকদের সামনে। একজন সহকারী কথকও থাকেন। কথকের কাজ হ'ল কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার দ্বারা গল্পের কথা নানাভাবে গেয়ে যাওয়া গানের দলের সঙ্গে। বেশী

শূরকর্তার প্রাসাদে নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

সময় একলাও গাইতে হয়। গানের দল কতকটা কীর্তনের দোহারকিদের মত কাজ করে।

যবদ্বীপের এই প্রাচীন নৃত্যনাট্যের ভাষার নাম "কবি", এই প্রাচীন ভাষার সঙ্গে আধুনিক ভাষার অনেক তফাত। আলোচনাকালে দেখা গেছে প্রতি দশটি শব্দের মধ্যে প্রায় ছয়টি শব্দ সংস্কৃতের সঙ্গে মেলে। এই কবি ভাষার মধ্যে আছে তিনটি ভাগ। নাটকের রাজা বা রাজ পরিবারের লোকেরা নিজেদের মধ্যে এক ভাষায় কথা বলে। রাজারা যখন তাদের চেয়ে নীচুদরের লোকের সঙ্গে কথা বলেন, তখন সে ভাষাও আলাদা। আবার গ্রামের লোক ও ভৃত্যেরা নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা বলে, সে ভাষার সঙ্গে রাজাদের কথার ভাষার অনেক তফাত। শোনা যায়, এখনো জাভার প্রাসাদের ভিতরে এই নিয়মে নাকি কথাবার্তা চলে।

নৃত্যনাট্যের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার কথায় ফিরে আসা যাক। পাছে নৃত্যনাট্যের পবিত্রতার মধ্যে অপবিত্র ভাব উদয় হয় এই আশংকায় দুই সুলতানের প্রাসাদেই স্ত্রী ও পুরুষে একত্র কোন নৃত্যনাট্য হওয়া অসম্ভব। শূরকর্তার প্রাসাদে নৃত্যনাট্যে দেখলাম সব পার্ট স্ত্রীলোকে করছে। যোগ্যকর্তার প্রাসাদে সব পুরুষ। তারা মনে করে স্ত্রীপুরুষের একত্র অভিনয়ে নাচের পবিত্রতা নষ্ট হয়, মন চঞ্চল হতে পারে, তাই এত কড়াকড়ি। দর্শকদের প্রতি নাচিয়েদের দৃষ্টি থাকলে নাচের প্রতি একাগ্রতার হানি হবার ভয়ে পুরুষ নাচিয়েদের নিয়ম তাদের দৃষ্টি থাকবে তার দেহের উচ্চতার তিন মানুষ সমান দূর মাটিতে, মেয়েদের আরও কাছে। তাদের সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও প্রাসাদে এত কড়াকড়ি কেন এ প্রশ্ন অনেকের মনে উঠতে পারে। তার একমাত্র কারণ, এই নৃত্যকলাকে এরা পবিত্ররূপে দেখে থাকে। পাছে এর সেই পবিত্র নির্মল আবহাওয়া কলুষিত হয়ে পড়ে সেই ভয়ে এই ব্যবস্থা সুলতানরা এখনো চালিয়ে আসছেন। কিন্তু সেদেশে সর্বত্রই অন্যান্য সাধারণ নৃত্যনাট্যের মধ্যে স্ত্রীপুরুষে একত্র অভিনয় করতে দেখা যায় সব সময়।

এইবার বলীদ্বীপের নৃত্যাভিনয়ের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। স্বভাবতই যবদ্বীপের কথা উঠলেই লোকে বলী-দ্বীপকে মনে করে। অথচ দুটো দেশের সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃতিগত মিল ছাড়া বাহ্যতঃ আর কোন মিল নেই। ভাষা আলাদা, ধর্ম আলাদা। ধর্মে এরা সব ভারতীয় প্রাচীন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এদের সমাজে নৃত্যগীত শিল্পকলা অতি অবশ্যক বলে সকলে মনে করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন প্রকার অনুষ্ঠানেই এই তিন কলার আবির্ভাব ছাড়া সমাপ্ত নয়।

এদেশে নৃত্যনাট্য প্রায় সবই নিজেদের দেশী গল্পের সঙ্গে যুক্ত। মহাভারতের প্রাধান্য এদেশের নৃত্যনাট্যে খুব কম, কিন্তু রামায়ণকে এখনো সম্পূর্ণ অভিনয় করতে দেখা যায়। রামায়ণের গল্পকে প্রায় বিনা পরিবর্তনে নৃত্যাভিনয় করতে দেখেছি। বলীর অধিবাসীরা ভারতীয় নৃত্যনাট্যের আদর্শে নিজেদের চেষ্টায় অনেক গল্প তৈরী করেছে নিজেদের দেশের পুরাতন কাহিনী অবলম্বনে। যার সঙ্গে ভারতের দুই মহাকাব্যের কোন যোগ নেই।

এদের নৃত্যনাট্যের অভিনয় খুবই স্বাভাবিক। হাসি, কান্না, ক্রোধ আনন্দ ইত্যাদি যাবতীয় মনোভাব চোখে মুখে সর্বদাই প্রকাশ পায়। অভিনেতারা নিজেরাই নাটকের কথা সুরে ও তালে প্রকাশ করে এবং নানাভাবে তালে তালে চলে ফিরে নৃত্য-ভঙ্গিমায় তা অভিনয় করে। যবদ্বীপের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না এবং কোন প্রকার নাচেই জাভার মতো কোন নিয়ম থাকে না। এদের নৃত্যাভিনয়ের আড়ম্বর স্বল্প, কিন্তু প্রাণবান।

বলীদ্বীপের নৃত্যনাট্য রামায়ণে স্ত্রীচরিত্র পুরুষকে অভিনয় করতে দেখেছি। কোন নারী এতে স্থান পায়নি। অথচ বলীতে আর যত প্রকারের সেদেশী গল্পের সঙ্গে নাটক আছে,

আধুনিক রুচি অনুযায়ী সজ্জিত দৃশ্যপটের প্রাচীন প্রথায় যবদ্বীপের নৃত্যনাট্যঃ—
ঘটোৎকচ ও তাহার প্রেমিকা পার্গার্বি

তার সব কটিতেই স্ত্রীপুরুষের একত্র অভিনয় সমর্থন করে। এখানকার সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা জাভা অপেক্ষা অনেক বেশী। অন্যান্য নৃত্যনাট্যে বিশাল দর্শকের সামনে স্বাভাবিক প্রথায় প্রেমিক ও প্রেমিকার নানাপ্রকার প্রেম নিবেদনের অঙ্গভঙ্গি সচরাচরই দেখা যায়, কেউ তাতে আপত্তি করে না।

জাভার নৃত্যনাট্যের প্রথার খুব বেশী পরিবর্তন হয়েছে কি না বলা শক্ত; বেশভূষায় আজকাল আধুনিকতার পরিচয় পাচ্ছি খুব, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে তাদের সৌন্দর্যবোধ যে আজকাল কমে এসেছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। বলীর নৃত্যনাট্যের সাজে অপেক্ষাকৃত উন্নততর সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেয়।

যবদ্বীপে পূর্বে নাটকে বাস্তব দৃশ্যপটের কোন দরকার করত না; আজকাল স্বাভাবিক দৃশ্যপটের প্রতি তাদের আকর্ষণ দেখা দিয়েছে। এই বাস্তব দৃশ্যাবতারণার ফলে ওদের নৃত্যনাট্যগুলি খাপছাড়া দেখতে লাগে। বলীদ্বীপে এখনো পর্যন্ত দৃশ্যপটের আমদানি হয়নি। তারা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নাচতে এখনো ভালোবাসে। এদের নাচের পৃষ্ঠপোষক গ্রামবাসী নিজেরাই. মন্দিরের খোলা প্রাঙ্গণ হ'ল তাদের রঙ্গভূমি। গান বাজনার দলের সংখ্যাও খুব কম। জাভার সুলতানদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় বর্ধিত নৃত্যনাট্যের আড়ম্বরের কাছে এদের আড়ম্বর কিছুই না। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের একদিকে দুটি বাঁশ বেঁধে নারকেলের কচিপাতা দিয়ে একটি গেট তৈরী করে তাতে পরদা ঝুলিয়ে দেয়। পরদার পিছন থেকে গান গাইতে গাইতে অভিনেতা পরদা একটু ফাঁক করে নিজেকে দর্শকদের সামনে প্রকাশ করে ও এগিয়ে আসে নাচের ভঙ্গিতে একটু একটু করে। পরদার পিছনে কোন ঘেরা বা আবরণ থাকে না, পিছনে যারা অপেক্ষা করে তাদের সকলেই দেখতে পায়। কোন কোন নৃত্যাভিনয়ের পিছনে একটি ছোট ঘেরাও দিয়ে দেওয়া হয়, কারণ সেই নাচে প্রধান নর্তককে নৃত্যের পূর্বে দেবতার কাছে একবার পূজা দিয়ে নিতে হয়। সেই পূজা দর্শকদের দেখা বারণ।

বলীদ্বীপের নাচিয়েদের প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় একবারও নমস্কার করতে হয় না। এখানে প্রায় সব অভিনেতাদের নৃত্যাভিনয়ের পদ্ধতি ও ভঙ্গি একই ধরনের, কেবল জন্তু জানোয়ারের সাজে যারা অভিনয় করে, তাদের সেই সব জানোয়ারের নকলে নাচতে হয়। এদের নাচে চাদরের ব্যবহার একেবারেই নেই অথচ জাভায় এইটি হচ্ছে সবচেয়ে দরকারী। বলীদ্বীপের প্রাচীন নাটকের ভাষাও "কবি"। এদের নৃত্যনাট্যের পদ্ধতি একদিক থেকে অনেক নিকৃষ্ট। এরা নতুন নতুন অনেক নাচ তৈরী করেছে যা যবদ্বীপে হয় নি। অথচ প্রাচীন নৃত্যনাট্যের বেলায় তারা নাচের দিক থেকে বিশেষ উন্নতি করবার চেষ্টা করে নি। যবদ্বীপে যে কোন নাচের প্রত্যেকের ভঙ্গিই নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, বলীদ্বীপে তা হয়নি। বলীতে অভিনয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে বেশী, জাভা দিয়েছে নাচের ভঙ্গির প্রতি। বলীর নাচের লয় জাভা অপেক্ষা অনেক দ্রুত।

এই দুই দেশের নৃত্যাভিনয়ে ভালোমন্দ সবই আছে, তবুও মনে বিশেষ আনন্দ পাই, যখন দেখি, কি শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা এই কলাকে দেখেছে। নাচের মধ্যে নিজের আত্মপ্রকাশ বা ব্যাবসাবুদ্ধির মনোবৃত্তি একেবারে দেখা যায় না বলেই আরও সুন্দর লেগেছে। প্রায় সকলেই নাচ শেখে সে কেবল নিজের মনের আনন্দের জন্যে।

আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু বর্তমানে এমন ব্যাপকভাবে কোথাও নৃত্যকলার প্রতি শ্রদ্ধা দেখতে পাই না। বর্তমানে সে চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু আবার সেই ব্যাবসাবুদ্ধি ও নামের মোহই সকলকে পাগল করে তুলছে। সত্যিকার আনন্দের খোরাক হিসাবে এখনো সকলে দেখতে সমর্থ হয় নি।

যাযাবর

সুবোধ ঘোষ

দূর বুদ্ধগয়ার মন্দিরটা উত্তরের দিগ্‌বলয়ে জ্যামিতিক আঁচড়ের মত দাগা। সেখান থেকে জঙ্গলের বুকে বুকে একটানা গড়িয়ে সড়কটা এইখানে এসে পশ্চিমে মোড় ফিরেছে। প্রথমে পরিখার মত আখ আর তিল ক্ষেতের প্রসার; তার পর শহরতলির মেটে বাড়ি—তার পর খাস শহর। মোড়ের কাছে এসে উদ্ভিদরাজ্য তার সীমা হারিয়েছে; শেষ হয়েছে তার বন্যগৌরব। এইখানে আরম্ভ—পুকুর, বাগান, চষাক্ষেত; মানুষের গৃহস্থালি জনতার নমুনা।

মোড়ের দুপাশে ছড়ানো কয়েকটা দোকান আর বাংলো বাড়ি; মাঝে মাঝে শুধু ঘাসফুলে ছাওয়া মেঠো জমির টুকরো টুকরো ব্যবধান। কাছেই পাহাড়ের পায়ের কাছে পল্টনের ছাউনির মত একটা বস্তি। সবই রাজেনবাবুদের জমিদারি। তাঁরা থাকেন সিমলায়।

আমাদের বাড়ির দুপাশে দুটো বাড়ি। পূবের বাড়িটা ছোট, ন টাকা ভাড়া। আগে গালার গুদাম ছিল। পশ্চিমের বাড়িটা বড়, ভাড়া পঞ্চান্ন টাকা। আগে ত্রিহুতের এক জমিদারের পোষা বাইজী থাকত। প্রায় সব বাড়ি কটাই খালি পড়ে আছে।

সন্ধ্যায় একটি আলোও জ্বলে না। ফাঁকা বাড়িগুলো সমাধির মত ঝিমায়। বড় নির্জন। এ নির্জনতার চাপ ভিড়ের চেয়েও কঠোর। হাঁপিয়ে উঠতে হয়। আজ দেড় মাসের মধ্যে একবারও হাসি নি।

মাঝে মাঝে শুধু দূরাগত মোটরবাসের উচ্ছ্বসিত বিলাপ জঙ্গলের লতাগুল্মে গুমরে ওঠে। টেলিগ্রাফের তারগুলো শিউরে বাজতে থাকে। ভরসা হয় এইবার বুঝি কোনও প্রতিবেশী আসছেন।

বই পড়া বন্ধ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোট বাড়িটার দিকে তাকালাম। কারা যেন এসেছে।

পিলপিল করে একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বেরিয়ে এসে জামতলায় দড়িবাঁধা ছাগলটাকে ঘিরে দাঁড়াল। সবকটিরই আদুড় গা, লাল সালুর এক একটা হাফ প্যান্ট পরানো। ছয় থেকে এক বছর বয়সের ছটি হৃষ্টপুষ্ট ফরসা ফরসা মানুষ।

কারা এরা? কোন্ ধৃতরাষ্ট্র আবার এলেন আমার প্রতিবেশী হয়ে? কৌতূহল হল।

সাইকেল থেকে নামলেন নরেনবাবু ওভারসিয়ার, সবে ডিউটি থেকে ফিরছেন। সোলার হ্যাট মাথায়, পরিধানে ঢিলে হাফ প্যান্ট, পায়ে গরম হোস আর বুট, বিবর্ণ আলপাকার গলাবন্ধ কোট; তাতে বড় থলির মত দুটো পকেট—ফুটরুল, ফিতে, ডায়েরি আর কাগজপত্রে বোঝাই। কাঁধে বলরামের লাঙ্গলের মত একটি থিঅডোলাইট ঝোলানো।

নরেনবাবু বললেন—আসুন ভাই আমাদের বাড়িতে। ধড়াচুড়ো ছেড়ে আলাপটা সেরে নিই।

নরেনবাবুর ছেলেমেয়েরা সামনে এসে দাঁড়াল—মণ্টু, পিণ্টু, বাঁশী, বটা, নোনা, তিনু। সব যেন অর্ডার দিয়ে তৈরী—নিখুঁত ছাঁচের স্প্রিং বসানো পুতুলের মত।

নরেনবাবু বেশ বদল করে এলেন। বুঝলাম নরেনবাবু যুবকই, বয়স পঞ্চত্রিশের বেশী নয়। মুখের উপরই শুধু রোদে ঝলসানো একটা তামাটে প্রবীণতার ছাপ পড়েছে; নইলে তিনি গৌরবর্ণ সুপুরুষ।

বললাম—নরেনদা, এই বুঝি আপনার বংশধর বাহিনী?

—এই সব নয়, আরও আছে। কোলেরটি এখন ঘুমিয়ে আছেন। নইলে ওকেও দেখিয়ে দিতাম।

—করেছেন কি নরেনদা!

খুব খানিকটা হেসে নিয়ে নরেনদা বললেন—তোমাদের এই জায়গাটা বেশ জায়গা হে। শহর থেকে দূরে বলেই বেশ। যেমন জল-বাতাস তেমনি জিনিসপত্র। যেমন সরেস তেমনি সস্তা। ধর, খাঁটী দুধ, শহরে থাকলে আর টাকায় সাত সের করে পেতে হত না। না, বেশ জায়গা ভাই।

নরেনদার মুখেই সব শুনলাম। ক বছর ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ, তায় আবার কড়া ডিউটি পড়েছে। সকাল নটায় খেয়ে দেয়ে থিঅডোলাইট কাঁধে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। চার মাইল একটানা প্যাডেল চালিয়ে প্রথমে যেতে হয় চন্দ্রপুরের ক্যাম্পে—রাস্তা মেটাল করা হচ্ছে। সেখানে তদবির শেষ করে শালবনের পথে পথে দু মাইল দক্ষিণে গিয়ে ডাকবাংলোর মেরামত কাজটা দেখেন। সেখান থেকেও দু মাইল পূবে গিয়ে লালবালু নদী। এখানে এখন জরিপ চলছে শুধু, শীঘ্রই পুল তৈরি আরম্ভ হবে। কাজেই বাড়ি ফিরতে কখনও সন্ধ্যা, কখনও রাত হয়ে যায়।

দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নরেনদা হাঁকলেন—সামনে এসেই দিয়ে যাও না। লজ্জা করার কিছু নেই। এ হল ভবানী, আমার এক ক্লাসের বন্ধু মানিকের ছোট ভাই।

দরজার আড়াল ছেড়ে নরেনদার স্ত্রী সামনে বেরিয়ে এলেন। চা-রুটি দিয়ে গেলেন।

বউদিকে দেখে বিস্মিত হলাম সব চেয়ে বেশী। বহু সন্তানবতী বাঙালী মেয়ের তো এমন চেহারা থাকা উচিত নয়। ছবিতে রুশিয়ার মেয়ে পাইলটদের চেহারার ভিতর যে নিটোল স্বাস্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, বউদি যেন তারই প্রতিচ্ছবি।

—যুদ্ধের দরুন জিনিসপত্র কি খুবই মাগ্যি হচ্ছে ভবানী? কিছু খবর টবর রাখ?—নরেনদা প্রশ্ন করলেন।

সে খবর আমি রাখি না, আমার দরকারও নেই। নরেনদার কিন্তু শয়নে স্বপনে এই চিন্তা—বিশ্বভুবনে কোথায় কোন্ জিনিস সস্তা। গদগদ ভাষায় বর্ণনা করলেন—জাহানাবাদের গুড়; ডালটনগঞ্জের বেগুন, মধুপুরের মুর্গি।—কুকুরে ছোঁয় না হে এত সস্তা।

নরেনদার বর্ণনা শুনছি। কল্পনায় তিনি সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড স্বর্গগুলিকে জড়ো করে এক মহামহিম সস্তারাজ্যের ছবি দেখছেন, যেখানে তাঁর এক মাসের মাইনে বাহান্নটি মুদ্রার বিনিময়ে একটা তালুকদারি কেনা অসম্ভব নয়।

যুদ্ধের জন্য জিনিসপত্র মাগ্যি হচ্ছে, নরেনদা সে খবর রাখেন। নরেনদা তাই যুদ্ধের উপর বড় চটা; সঙ্গে সঙ্গে জার্মানদের উপরও বড় চটে গেছেন।

বললেন—এই জার্মানগুলো, বাড়িওয়ালাদের চেয়েও পাজি।

কথাটা কানে বাধল।

ক্রমে আলাপে আলাপে আরও অনেক কিছু জানলাম। গত তিন বছরে নরেনদা নিদেন পঁচিশবার বাসা বদল করেছেন। প্রত্যেক নতুন বাসাতেই প্রথম এসে কটা দিন থাকেন ভাল। অল্প দিনেই উন্মনা হয়ে পড়েন। তার পর হঠাৎ একদিন তাড়াহুড়ো করে তল্পিতল্পা নিয়ে নতুন একটা বাসায় চলে যান। বছরে আট দশবার করে গেরস্থালি গোছাতেই বউদির প্রাণান্ত হয়।

নরেনদা নিজ মুখেই বললেন—শহরে আর কেউ আমাকে বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না।

—কেন বলুন তো?

—কেন? সে কি করে বলি।

—আপনিই বা অত ঘন ঘন বাসা ছাড়েন কেন?

—অসুবিধে হয় তাই ছাড়ি।

—এর আগের বাসাটায় কি অসুবিধে ছিল আপনার?

—সে আর ব'লো না। পাশের বাড়িটা থেকে দিবারাত্র বিশ্রী পোলাওএর গন্ধ আসত।

অবাক হয়ে বললাম—তা হলে এ বাসাটাও হয়তো মাসখানেক পরে ছেড়ে যাবেন, ওই রকম কোনও গন্ধ-টন্ধর জন্য।

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে নরেনদা প্রতিবাদ জানালেন—না, না; এ বাসাটি বেশ। এ জায়গা ছাড়া চলবে না। এইবার খাঁটী জায়গায় এসেছি।

একটু চুপ করে থেকে নরেনদা যেন স্বগত বলে উঠলেন—বাড়ি-ভাড়া-টাড়া কি মানুষে দেয়।

—কথাটা বুঝলাম না নরেনদা। তবে কি ভাড়া না দিয়ে থাকাটাই ভদ্রলোকের পক্ষে...।

নরেনদার যেন হুঁশ হ'ল। অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—আহা, ভুল শুনেছ কেন। বলছি, বাড়িভাড়া কি মানুষে নেয়!

মণ্টুরা সামনের ছোট মাঠটায় জামতলায় খেলছে। ডাকলাম—এই মণ্টু অ্যান্ড কোম্পানি! কাম্ আপ্।

যে যার বয়স আর সামর্থ্য মত সবেগে দৌড়ে এল। বললাম—সব সার বেঁধে দাঁড়াও। ক্যাঙ্গারু ড্রিল শেখাব।

ছেলেমেয়েগুলো অত্যন্ত চটপটে আর ফুর্তিবাজ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ড্রিলটা বেশ সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করে নিল।

—ওয়ান, টু, থ্রী। ড্রিল চলেছে। পরিশ্রমে ঘেমে ওঠা মুখগুলো সব জলে ভেজা সাদা ফুলের মত দেখাচ্ছে। পেশীহীন শরীরের কোমল মাংসল আবরণ ভেদ করে ফুটে উঠছে উচ্ছল রক্তের আভা। শেষে অর্ডার দিলাম—ডিসপার্স!

মণ্টু বললে—আবার কখন ড্রিল হবে কাকা?

—হবে এখন। এবার বাড়ি যাও।

এক ঝাঁক রাজহাঁসের মত মিঠে আওয়াজ করে মণ্টু কোম্পানি চলে গেল। উড়েই গেল যেন মনে হ'ল।

বারান্দায় বসে বই পড়ি। পড়া শেষ হলে আর কোনও কাজ থাকে না। অস্বস্তি মনে হয়। চারদিকে কত নয়নাভিরাম দৃশ্য-বস্তু ছড়িয়ে রয়েছে। দেখলেই হল।

বসে বসে দেখি রাজেনবাবুদের বাগানটা। দেশী বিদেশী ফুল, পাতাবাহারের কুঞ্জ রঙের রূপোল্লাস। হেকার সাহেবের কেনেলটা চোখে পড়ে—চামড়ার পেটি পরানো তাজা তাজা আলসেসিয়ান, টেরিয়ার আর স্প্যানিয়েল। বাবুলালের মেঠাইএর দোকান—স্তূপীকৃত বালুশাই, বরফি আর শোনপাপড়ি। বেলজিয়ান ক্যাথলিক গির্জাটার হলের ভিতরটা স্পষ্ট দেখা যায়—বিচিত্র রূপোর পুলপিট, মূর্তি, প্রদীপ আর কার্পেটপাতা গ্যালারি। লাল ফুলের বোঝা মাথায় কৃষ্ণচূড়াটার তলায় বুড়ো স্মিথের পোলট্রি। পেঁজা তুলোর মত পালকে ভরা ফাঁপানো পুচ্ছ—ঝক্‌ঝকে পুষ্ট পুষ্ট মোরগ আর মুরগী। রোড আইল্যান্ড, অরপিংটন, মিনরকা আর লেগহর্নের রঙিন ঝুঁটির শিহর, সুঠাম গ্রীবাবিলাস আর রক্তজবার মত কানের ঝুমকোর দোলা। এ দেখবার, উপভোগ করবার মত দৃশ্য।

কিন্তু এসব ছাড়িয়ে, সবচেয়ে নয়নাভিরাম—মানুষের কিশলয় মূর্তি ওই নরেনবাবুর ছেলেমেয়েরা যখন একান্ত উৎসাহে জামতলায় খেলে বেড়ায়, পলায়নপর গোসাপের পিছনে দল বেঁধে তাড়া করে, বুড়ো টাট্টু ঘোড়ার কান ধ'রে নির্ভীক আনন্দে বাবুই পাখির মত ঝুলতে থাকে। ওদেরই দেখি বেশী করে।

প্রবল বর্ষা নেমেছে ক'দিন থেকে। নরেনদা বড় দেরি ক'রে ফেরেন। মাঝে মাঝে দেখি লণ্ঠন নিয়ে মণ্টু আর বউদি বৃষ্টি আর অন্ধকারে অস্পষ্ট সড়কের দিকে তাকিয়ে নরেনদার জন্য উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

আজ এখন রাত্রি বারোটা। তবুও মণ্টুরা দাঁড়িয়ে আছে। নরেনদা ফেরেন নি নিশ্চয়। উঠে যেতে হ'ল মণ্টুদের বাড়ি। সত্যিই নরেনদা ফেরেন নি।

বললাম—তাই তো বউদি, রোজ যদি এমন সাংঘাতিক বর্ষা গায়ে মেখে দৌড়োদৌড়ি করেন তাহ'লে—

বউদি বললেন,—তা হ'লে কি?

—একটা অসুখ বিসুখ হয়তো—

—সেদিকে ভদ্রলোক ঠিক আছেন। একটা হাঁচি কাশিও হবে না।

বললাম—তা ছাড়া এত রাত্রে, জংলী পথে......।

কথার মাঝখানেই বৌদি বললেন—ওই শুনুন, দয়া হয়েছে এতক্ষণে।

বৃষ্টির শব্দের মধ্যেই একটা লক্কড় সাইকেলের ঘড়াং ঘড়াং আওয়াজ শোনা গেল। নরেনদা অকস্মাৎ পেঁছে গিয়ে সকলকে উদ্বেগের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিলেন।

বৃষ্টিতে ভিজে সোলার হ্যাটটা দু ইঞ্চি ফুলে গেছে। সাইকেলের কেরিয়ারে বাঁধা একবোঝা কুমড়োর ডাঁটা আর একটা লাউ। বললেন,—ছোট নদীটায় আটকে গেলাম। যা জলের তোড়! তা ছাড়া লাউটার জন্য চন্দ্রপুর হয়ে একবার ঘুরে আসতে হ'ল।

অনুযোগ ক'রে বললাম,—বর্ষার রাত্রে জংলী রাস্তায় অত বেপরোয়া বেড়াবেন না নরেনদা।

সাইকেলের রডে গামছা দিয়ে বাঁধা বন্দুকটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নরেনদা বললেন—আমার এই কালো লাঠিটি যতক্ষণ সঙ্গে ততক্ষণ সত্যিই কিস্‌সু পরোয়া করি না, ভবানী।

আমাকে প্রস্থানোদ্যত দেখে প্রশ্ন করলেন—লাউটা কত হ'ল বল দেখি ভবানীচন্দর?

রাত নিষুতি, স্বপ্ন দেখার সময়; তখন আর লাউএর দাম আলোচনা করবার উৎসাহ আমার নেই। চ'লে আসতে আসতে শুনলাম, নরেনদা নিজেই ব'লে যাচ্ছেন—মাত্র দু পয়সা; যাকে বলে আধ আনা।

মণ্টু কোম্পানিকে ক্যাঙ্গারু ড্রিল শেখানো হয়ে গেছে। এর পর শেখালাম ডংকি জাম্প। এতে পিণ্টুই হ'ল ফার্স্ট। চার বছরের এই ছেলেটা পাঁচ ফুট উঁচু বারান্দা থেকে সোনাচিতার বাচ্চার মত অকুতোভয়ে লাফিয়ে প'ড়ে সত্যিই তাক্ লাগিয়ে দিল।

শেখালাম হরিণ দৌড়। এতে বাঁশী মেয়েটাই ফার্স্ট হ'ল।

দেখে শুনে নরেনদা একদিন বললেন—বেশ জুটেছ যা হ'ক। একে তো ত্যাঁদড়, তার পর তুমি আবার ট্রেনিং দিয়ে ঘাগী ক'রে তুলছ।

—ভাবছেন কি? একদিন গ্রেট বেঙ্গল কলোনি বসবে এখানে। এই তো সবে কাজ আরম্ভ করেছি। যা করছি পরে বুঝবেন।

—পরে কেন? এখুনি খুব বুঝছি। দু সের মাংস আনলাম, চেটেপুটে সব মেরে দিলে তোমার ওই মণ্টু কোম্পানি।

বললাম—তা, কি এমন পাপ করেছে?

—না, পাপ করে নি ঠিকই। তবে......বোঝ না তো ভায়া!

মণ্টুদের নতুন ধরনের একটা স্যালুট শেখাচ্ছি। নরেনদা চেঁচিয়ে ডাক দিলেন—ওদের একবার ছেড়ে দাও তো ভবানী, দরজী এসে ব'সে আছে।

মণ্টুদের সঙ্গে নিয়েই গেলাম। নরেনদা বললেন—দেখছ?

দেখলাম। ভালুকের না কিসের রোঁয়ার একটা লম্বা চওড়া পুরু কম্বল। যেমন খসখসে তেমনি ভারী।

—কি হবে এটা? জিজ্ঞাসা করলাম।

—এটা থেকে সব হবে। মণ্টুদের ছটি ওভারকোট হবে। তা ছাড়া আমারও ফতুয়ার মত একটা কিছু হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

বললাম—কি যাচ্ছেতাই করছেন, নরেনদা। ছেলেগুলোর গায়ের ছাল আর থাকবে না।

—খুব থাকবে, খুব থাকবে। বোঝ না তো ভায়া।

নরেনদা দরজীকে কাজের নির্দেশ দিতে লেগে গেলেন।

শীত এসে পড়েছে। পশ্চিমের বড় বাড়িটাতে কারা এসেছে। আলাপ হ'ল। হাওয়া বদলের জন্য এসেছেন বৃন্দাবনবাবু, তাঁর মা আর তাঁর ছেলে পেঁচো, পিণ্টুদের বয়সী। বৃন্দাবনবাবুর ডিসপেপসিয়া, পেঁচোর রিকেট। বৃন্দাবনবাবুর মা বিপুলাঙ্গী, মেদভারে মন্থর।

বৃন্দাবনবাবু বললেন—তুমি মানিকের ভাই? তা আগে বলতে হয়। তোমাকে তো আত্মীয় ব'লেই ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। যাক.........তেলটা আর ঘিটা, এ যেন খাঁটী হয় ভবানী। এই বন্দোবস্তটা ক'রে দাও। পয়সা লাগুক কিন্তু জিনিস ভাল হওয়া চাই।

মাসীমা অর্থাৎ বৃন্দাবনদার মা বললেন—একটা ভাল গয়লা ঠিক ক'রে দাও বাবা। বাড়িতে দুয়ে দিয়ে যাবে। এবেলা পাঁচ সের ওবেলা তিন সের। একাদশীর দিন আরও দু সের।

—পয়সার জন্যে ভাবি না ভবানী। বাজিয়ে টাকা দেব, বাজিয়ে জিনিস নেব। তোমার বাবাও তো শুনেছি বেশ কিছু রেখে গেছেন। হ্যাঁ, তোমার কাকাই বোধ হয়, একবার ধার চাইতে এসেছিলেন। আর......।

বৃন্দাবনদা তুবড়ির মত কথা ছড়িয়ে চললেন; তার মধ্যে মাত্রার বালাই নেই। উত্তরের জন্য মুহূর্তেকও অপেক্ষা না ক'রে আরম্ভ করলেন,—যাক, দুটো ভাল চাকর, একটা ভাল ধোপা; এ যেন কালকের মধ্যেই যোগাড় হয়ে যায় ভবানী।

মাসীমা বললেন—একটা ভাল ডাক্তারও ঠিক ক'রে দিতে হয় বাবা, পেঁচোর জন্যে। রোজ একবার এসে দেখে যাবে।

বড় বাড়ির মর্জি ফরমাশ খেটে চলেছি। মণ্টুদের সঙ্গে ক দিন দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না। নরেনদার দেখা পাওয়া তো আরও দুষ্কর। কিন্তু জানি ওরা সব ভাল আছে। ভাল থাকাটাই ওদের নিয়ম।

বউদির কোলের ছেলেটার এতদিনে ঠ্যাঙে জোর হয়েছে; ট'লে ট'লে হাঁটে, জোরে হামাও দেয়। মণ্টুরা ওর নাম দিয়েছে—টাইগার।

মাঝে মাঝে রাত্রে দেখতে পাই, মণ্টুরা প্রদীপ জেলে বারান্দায় সতরঞ্চি পেতে পড়তে বসে। টাইগার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে পড়ার ব্যাঘাত করে—প্রদীপ উলটে দেয়। নরেনদা ব'সে ব'সে টাইগারকে সকল নষ্টামিতে উৎসাহ দেন। বউদি এসে প্রতিবাদ করেন।

তবু সুখের কথা। ভদ্রলোক বছরখানেকের ওপর এখানে টিকে গেছেন। শোনা যায়, জায়গার গুণে ক্ষেপা হাতি ঘুমিয়ে পড়ে। এ তো মানুষ।

বড় বাড়ির চাকর রামদুলারকে আড়ালে পেয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁ রে, আট সের দুধ রোজ কে খায় বল্ তো? সবাই তো রুগী।

—বুড়ীমা খায়।

—বাজে বকিস না। ঠিক ঠিক বল্।

—ঝুট কেন বলব বাবু। আমি নিজে দেখিয়েছে—একাদশীকা রোজ এক কড়াহি রস্‌গুল্লা বুড়ীমা একা খেয়ে ফেলিয়েছেন।

মণ্টুদের পুরো দলটি সঙ্গে নিয়ে একদিন চড়াও করলাম মাসীমার বাড়ি।

মাসীমা ছাঁচ থেকে খুলে থালায় সন্দেশ সাজাচ্ছেন। একটা কড়াতে রসগোল্লা ভাসছে, আর একটা জামবাটিতে কানায় কানায় ভরা ক্ষীর।

—এরা আবার কারা? মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন।

—এরা? এরা পৃথিবীর ছেলে। এদের সন্দেশ দিন।

মাসীমা খানিকক্ষণ হাঁ ক'রে তাকিয়ে থেকে বললেন—আহা, বাপ মা নেই বুঝি?

—খাসা বাপ মা রয়েছে, বলেন কি? সন্দেশ দিন।

—কি যে ছেলেমানুষি কর ভবানী! কোন্ ঢঙে কথা বল বুঝতে পারি না বাবা। বলি, কাদের ছেলে এরা?

—নরেনবাবুর। ওই পুবের বাড়িতে যাঁরা থাকেন।

—তা, বউটির তো বড় কষ্ট!

—কষ্ট আবার কিসের?

—কষ্ট নয়? এতগুলো কুচোকাচা সামলানো; মানুষ করা।

—মানুষকে আবার মানুষ কি করবে?

—যা বোঝ না তা নিয়ে কাব্যি ক'রো না বাবা। এক পেঁচোকে নিয়েই বুঝছি কতবড় দায় ভগবান ঠেলে দেছেন মাথার ওপর!

পেঁচোর কথা উঠতেই নজরে পড়ল—ঘরের এক কোণে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পেঁচো।

মানুষের চেহারার এত বড় ট্রাজেডি সহজে চোখে পড়ে না। জিরজিরে হাত পা, বুড়ো বাদুড়ের মত কেশবিরল মাথাটা। চার বছরের একরত্তি এই ছেলেটার ধড়ে কে যেন একটা ঝুনো সংসারীর মুখোশ বসিয়ে দিয়েছে। মায়া হ'ল দেখে। আহা, রোগেই ছেলেটার এহেন দশা করে ছেড়েছে।

কিন্তু পেঁচো এগিয়ে আসছে। হাতে একটা বাঁশের লাঠি। তার উদ্দেশ্যটা খুবই স্পষ্ট; মণ্টুদের খানিকটা খোঁচাতে হবে এই তার মনের বাসনা।

মণ্টু পিণ্টু সকলে সভয়ে স'রে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। বললে—কাকা, মারছে।

মাসীমা কটুকণ্ঠে ঝংকার দিয়ে উঠলেন—কি মিথ্যুক রে বাবা, এই ছেলেগুলো! মারছে? কোথায় মেরেছে?

তার পর সুপ্রচুর আদর-রসে গলা ভিজিয়ে নিয়ে পেঁচোর উদ্দেশ্যে বললেন—যাও, কাগ মেরে এস দাদু। যাও; এদের মারতে নেই।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ব্যাপার ঘ'টে গেল। পেঁচোর করোগেটেড পাঁজরগুলো কেঁপে উঠলো দু তিন বার। তার পরেই একটা চীৎকার ছেড়ে লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে কেশবিরল মাথাটা নির্মমভাবে অবিশ্রান্ত মেঝের উপর ঠুকে যেতে লাগল।

—যা ভেবেছিলাম তাই। তোমরা একটা কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়লে না। এখন সামলাতে গিয়ে প্রাণটা আমার যাক। মাসীমা রাগ ক'রে ব'লে চললেন।

কান্না শুনে বৃন্দাবনদা এলেন। পেঁচোকে বিস্তর আদর অনুনয় ক'রে সুস্থ ক'রে তুললেন। বাঁশের লাঠিটা তুলে নিয়ে একবার মণ্টুর একবার পিণ্টুর পেটে ঠেকিয়ে পেঁচোকে বোঝালেন—হেই মেরেছি। খুব মেরেছি। এইবার চুপ! হ্যাঁ এই যে, পাঁচুবাবু চুপ করেছে। পেঁচো বড় ভাল।

পেঁচো শান্ত হ'ল।

—কাদের ছেলেপিলে হে ভবানী? বৃন্দাবনদা জিজ্ঞাসা করলেন।

—নরেনবাবু ওভারসিয়ারের।

—এতগুলো! কত মাইনে পায় ভদ্রলোক? বৃন্দাবনদা মাত্রাতিরিক্ত বিস্ময়ে কপাল কুঁচকে ফেললেন। এঁর কথাবার্তার রূঢ়তায় সত্যিই রাগ হচ্ছিল। বললাম—মাইনে কমই পায়। বাহান্ন টাকা। তাতে হয়েছে কি?

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বৃন্দাবনদা বললেন—গুলি করা উচিত!

—কাকে?

একটু থতমত খেয়েই যেন বৃন্দাবনদা উত্তর দিলেন—আহা, এদের নয়। এদের নয়। ওই নির্বোধ লোকগুলোকে, প্রকৃত অপরাধী যারা।

আবার খানিকক্ষণ চিন্তাক্লিষ্ট থেকে হঠাৎ মণ্টুদের দিকে সঙ্গিনের মত ছুঁচলো তর্জনীটা তুলে বললেন—এই যে কটা জীব............।

মণ্টুরা সকলেই একটু চমকে উঠল।

.........জানি এরা নির্দোষ, এরা পবিত্র। কিন্তু তবু, ছি ছি, সমাজকে এভাবে ট্যাক্স করা.........।

কোমর-ভাঙা সাপের শানিত হিংসুক দৃষ্টির মত বৃন্দাবনদার চোখ দুটো একবার চিকচিক ক'রে উঠল। বললেন—এর একমাত্র উপায় কি জান? এই লোকগুলোর বহুপিতৃত্বের বাড়াবাড়ি অস্ত্রোপচারে ঠাণ্ডা ক'রে দেওয়া।

বৃন্দাবনদার বক্তব্য শেষ হ'ল। আস্তে আস্তে আবার পুরনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম—এইবার ছেলেদের একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিন মাসীমা।

—থাম বাবা ভবানী। পেঁচোর কানে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। কাল না হয় আর একসময় এদের নিয়ে এসো।

মণ্টুরা অনেকক্ষণ থেকেই বাড়ি যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। বললাম—দাঁড়াও দাঁড়াও, লজ্জা কেন? দিদিমার বাড়ি, সন্দেস টন্দেশ খাও, তার পর যেয়ো।

মাসীমা বললেন—হাঁ, অনেকক্ষণ তো হ'ল। ওদেব মা হয়তো ভাবছে।

—না, না। ভাববে কেন? ভাবনার কি আছে।

—কেমন মা রে বাপু! মাসীমা যেমন বিরক্ত তেমনি হতাশ হয়ে পড়লেন।

বৃন্দাবনদাকে ইংরেজীতে বললাম—পেঁচোকে একটু স্থানান্তরে নিয়ে যান। মাসীমা ছেলেদের মিষ্টিমুখ করাবেন।

এতখানি অধ্যাত্মসাধনার পর মাসীমা অগত্যা বিচলিত হলেন। ভাঁড়ার থেকে শালপাতার ঠোঙায় গোটাকয়েক বাতাসা নিয়ে এসে বললেন—কই গো খোকাখুকীরা, হাত পাত দেখি সব একে একে।

দেখলাম, পিণ্টু মণ্টু বাঁশী প্রত্যেকের হাত কাঁপছে। শঙ্কিত চোখে বার বার তাকাচ্ছে আমার দিকে। তিনু কেঁদেই ফেলল—বাড়ি চল কাকা।

মাসীমা তেতে উঠলেন—বড় বেয়াড়া নরেনবাবু না কার এই ছেলেগুলো। নেবে কি না বলে দাও ভবানী, আমি আর তপস্যে করতে পারব না বাবা।

হঠাৎ, বাতাসার ঠোঙা হাতে মাসীমা তাঁর বিপুল দেহভার নিয়ে থপ থপ ক'রে চোরের মত দৌড়ে স'রে গেলেন। চমকে ফিরে দেখলাম—অদূরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে পেঁচো। এই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ।

পেঁচোর চোখ থেকে বিষের ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে যেন। আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। শশব্যস্তে মণ্টুদের বললাম—আর নয়, চল এবার যাই।

সমস্ত রাত্রিটা ঘুমবার সময় পাই নি একরকম। নরেনদার সঙ্গে ধাই ডাকতে বস্তি বস্তি ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। কাল রাত্রে মণ্টু-ব্রাদারহুডের একটি নূতন সভ্য ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

নরেনদা নিজেই রান্নাবান্না ক'রে আজকের সকালেও বেরিয়ে গেলেন সাইকেল নিয়ে—ডিউটি দিতে। মণ্টুরা অন্য দিনের মত ড্রিল করতে এবেলা আর এল না। ওদের উৎসবে পেয়েছে আজ। কেউ বাসন মাজছে, কেউ দিচ্ছে ঘর ঝাঁট, কেউ বা উনন জেবলে জল গরম করতে ব্যস্ত।

আহার শেষে একটা আরাম নিদ্রার উদ্যোগ করছি। রামদুলার এসে জানাল—মাসীমা ডাকছেন, এখুনি যেতে হবে। একটুও দেরি করলে চলবে না। পেঁচোর অবস্থা খারাপ।

হন্তদন্ত হয়ে পেঁছিলাম বড়বাড়ি। মাসীমা অবসন্নভাবে একটা পাখা হাতে নিয়ে বসে আছেন। প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন—বাবা ভবানী, একবার উঠনে এস আমার সঙ্গে।

আশঙ্কায় বুকটা ছমছম করে উঠল। নিদারুণ কিছু ঘটে যায়নি তো।

—উঠনে? কেন মাসীমা?

—পেঁচো হেগেছে। কি সাংঘাতিক, দেখবে এস। সবুজ সবুজ ফেনা আর কাল ছিবড়ের মত মল। এখুনি ডাক্তারকে খবর দিতে হয় ভবানী।

একটা ন্যাকারের তোড় প্রায় গলা ঠেলে এল। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বললাম—মাপ করবেন মাসীমা। রামদুলারকে পাঠিয়ে দিন। আজ আর আমার সামর্থ্যে কুলবে না কোনও কাজ।

চলে এলাম। এইখানেই বড়বাড়ির সঙ্গে সকল সম্পর্কে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। আর ডাক পড়েনি কখনও।

সড়ক ধরে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর গিয়েছি। নরেনদা সাইকেলের আওয়াজে পথের নিশ্চিন্ত কাঠবিড়ালীগুলোকে সচকিত করে আসছেন।

—থামুন নরেনদা, কোথায় থাকেন আজকাল? নরেনদা থামলেন। কেরিয়ারে বাঁধা একটা পুঁটলি আর হ্যাণ্ডেলে দড়ি দিয়ে ঝোলানো একটা পেতলের ঘটি, তার মুখটা শালপাতা দিয়ে মোড়া।

—কেরিয়ারে কি, নরেনদা?

—আতপচাল! তের পয়সায় দু সের।

—ঘটিতে?

—দুধ।

—খুব রাবড়ি টাবড়ি চালাচ্ছেন বুঝি আজকাল?

—না হে না। রাবড়ি না দুঃস্বপ্ন! গয়লা ব্যাটার ছেলে দুধের দর চড়িয়েছে। বলে, টাকায় চার সেরের বেশী দেবে না। আমিও তেমনি, স্রেফ বন্ধ করে দিয়েছি। মাঝে মাঝে দেহাতে সস্তায় এক আধ সের এই রকম পেয়ে যাই; বাস্।

এ উত্তরের জন্য তৈরী ছিলাম না। এত অকপটে, অক্লেশে যে সোজা কথাগুলো বলে গেলেন নরেনদা তার প্রত্যুত্তর দেওয়া আর সম্ভব হ'ল না।

—যা যুদ্ধের বাজার পড়েছে! বিড় বিড় ক'রে নিজের মনে বকতে বকতে নরেনদা সাইকেলে উঠে চলে গেলেন।

এমন কিছু ঘটেনি। তবু মনের মধ্যে সর্বদা একটা মেঘলা গুমোটের ভার অনুভব করছি। সাইকেলে দুধের ঘটি ঝোলানো নরেনদার ঘর্মাক্ত চেহারাটা থেকে থেকে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে বউদির কোলে ঘুমন্ত পায়রার মত পুঁচকে খোকাটার কথা। মনে পড়ছে স্বাস্থ্যে গড়া লাটিমের মত মণ্টু কোম্পানির কথা।

নরেনদা একটা চটের ছালাকে পাট করে সাইকেলের কেরিয়ারে বাঁধছেন; ডিউটিতে বার হবার উদ্যোগ করছেন। বললেন—চন্দ্রপুরের সাঁওতালদের কাছে মন খানেক সরু চাল আছে। আজ বাগাতে হবে সস্তায়। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কখনও গিয়েছ কি ভবানী—লালবালু নদী?

—না।

—যেয়ো একবার, ভারী সুন্দর জায়গাটা। যেন একটা নতুন জগতের বার্তা শোনাচ্ছেন, এমনিভাবে ব'লে চললেন—সুন্দর জায়গা। পাশের দেহাতে কি না পাওয়া যায়! আর কত সস্তা! ছাগলের দুধই পাওয়া যায় দিন সের পাঁচেক, আর তাও মাত্র পাঁচ আনায়।

......কাছেই একটা বড় বিল—পানিফলে ঠাসা। বাঘা বাঘা মাগুর সব কিলবিল করছে। ধ'রে আনলেই হ'ল।......অড়হরের তো জঙ্গলই প'ড়ে রয়েছে। ওর আর চাষ করতে হয় না। এক ডাল খেতে খেতেই পরমায়ু ফুরিয়ে যায়।

নরেনদা চ'লে গেলেন।

প্রায়ই আজকাল দেখা সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু প্রথম দিনের দেখা সেই উৎফুল্ল মানুষটিকে আর পাই না। সেই প্রাক্‌মানবীয় শ্রমোৎসাহ যেন কতকটা ঢিমে হয়ে এসেছে।

মণ্টু কোম্পানিকে নিয়েও আজকাল অতটা হুটোপাটি করতে মন চায় না। বড় জোর একটা আবৃত্তি, একটা শেয়ালের স্কুল বা ওই রকম কোনও একটা কুঁড়ে খেলার মহড়া দিয়ে ছেড়ে দিই।

হয় আমার চোখের ভুল, নয় ব্যাপারটা সত্যি। মণ্টুদের বেশ রোগা রোগা দেখছি।

একদিন সন্ধ্যায় খবর পেলাম—নোনার জ্বর হয়েছে।

ব'সে ব'সে অনেক কিছু ভাবলাম। ঘটনাগুলো সব কেমন যেন একে একে ছন্দ হারিয়ে চলেছে। আমার গ্রেট বেঙ্গল কলোনির মাথার উপর ক্রমেই জমে উঠছে বড় নোংরা অভিশাপের ঝড়।

নরেনদার ঘরে ঢুকতেই কানে এল—মালিশ, স্রেফ মালিশ ক'রে যাও।

বুকে কফ ঘড়ঘড় করছে, জ্বরে চোখ মুখ লালচে; নোনা চুপ ক'রে শুয়ে আছে। বউদি নোনার বুকে কি একটা মালিশ করছেন।

মাঝখানে প'ড়ে আপত্তি করলাম—ডাক্তার ডাকা উচিত।

নরেনদা বললেন—শোন কথা। হয়েছে তো সর্দিজ্বর, এইবার ডাক্তার এসে নিউমোনিয়া ক'রে দিক।

বললাম—ডাক্তার ডাকছি, পয়সা লাগবে না।

নরেনদার চোখ দুটো জ্বলে উঠল দপ ক'রে। কঠোর শ্লেষাক্ত স্বরে মুখ বাঁকিয়ে বললেন—তুমি কাঁচা নিমপাতা খাবে? পয়সা লাগবে না।

দ'মে গিয়ে বললাম—আচ্ছা, আসি এবার।

নরেনদাও সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ভাষায় সমীহ ক'রে বললেন—হ্যাঁ এস। তবে রাগ ক'রো না। জানই তো, লোকে সারে নিজের গায়ের জোরে আর নাম হয় ডাক্তারের।

ক দিনের মধ্যেই বুঝলাম, নরেনদার কথাটাই সত্য হয়েছে। নোনা সেরে উঠেছে। নরেনদা মাঝে মাঝে গান গাইছেন।

মনটা খুশী ছিল সেদিন—মণ্টুদের নিয়ে হইচই করার উৎসাহটা আবার পেয়ে বসল।

হাঁক দিলাম—এই পিণ্টু। স্ট্যান্ড আপ্। রেলিং-এর ওপর দাঁড়াও। —জাম্প্।

পিণ্টু একবার হাঁটু মুড়ে লাফাতে গিয়েই আবার তাড়াতাড়ি সামলে নিল।

হাঁকলাম—জাম্প্, ডংকি, জাম্প্।

পিণ্টু আবার দম টেনে নিয়ে খানিকক্ষণ পাঁয়তাড়া করল। হাঁটু দুটো বেতালা কেঁপে উঠল বার কয়েক। তার পর লজ্জিত অপ্রস্তুতভাবে চুপ ক'রে দোষীর মত তাকিয়ে রইল।

রাগ চ'ড়ে গেল মাথায়—এ কি হচ্ছে পিণ্টু! কাওয়ার্ড! —জাম্প্!

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল পিণ্টু। বুকটা ওর ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠছে পড়ছে। ছোট ভুরু দুটোর উপর ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শান্ত হয়ে চেয়ারে গিয়ে বসলাম। বললাম—আচ্ছা, নেমে এস। লাফাতে হবে না। —বাড়ি যাও সব।

মনে পড়েছে। আমাদের সাঁওতাল চাকরটা কাঁদতে কাঁদতে যা বলছিল—ক দিনের জ্বরে ম'রে গেছে ওর ছোট্ট একটি ছেলে। ডাইনী আছে ওদের গাঁয়ে। তাকে চিনেও ফেলেছে সে; একদিন এর শোধ তুলবে।

আরণ্য বর্বরতায় লালিত সাঁওতাল ছেলের সংশয়বিকার আজ আমারও যুক্তি রুচি শিক্ষা সব কিছুকে অন্ধকারের মত জড়িয়ে ধরছে—পাকে পাকে। কে জানে, কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়।

বড়বাড়ির খবর অনেকদিন রাখিনি। আমার প্রয়োজন সেখানে অনেক দিনই মিটে গেছে। তবে বৃন্দাবনবাবুরা এখন আর একা নন। একজনের বদলে আজ একটা শহরই তাঁর প্রতিবেশিত্ব করছে। রোজ সন্ধ্যায় বৈঠকখানায় দস্তুরমত জনসমাগম হয়। শহরের সম্ভ্রান্তরাই আসেন—বাইরে দাঁড়ানো গাড়িগুলি থেকেই তার পরিচয় পাই। প্রায়ই নিমন্ত্রিতদের ভুরিভোজনের আনন্দ কোলাহল কানে ভেসে আসে।

—দাঁড়া রামদুলার। কথা আছে।

রামদুলার ঘাড় থেকে চিনির বস্তাটা নামিয়ে দাঁড়াল।

—কবে যাচ্ছে রে তোর বাবুরা?

—এখন এক বছর থাকবেন।

—এক বছর! কেন, কি হ'ল আবার?

—এখন যাবেন কেন? বাবুকা তনদুরুস্তি হচ্ছে, আজকাল আণ্ডা হজম করছেন। পেণ্টোভি মোটায় যাচ্ছে দিনকে দিন!

একটা চিঠি পেলাম। বাড়িওয়ালা রাজেনবাবু সিমলা থেকে আমাকেই লিখেছেন—আমাদের বড়বাড়ির ভাড়াটে বৃন্দাবনবাবুকে আমার নমস্কার জানাবে। যথাসাধ্য ওদের সুখসুবিধার দিকে একটু নজর রাখবে। হাজার হ'ক, প্রতিবেশী।

......আমাদের ছোট বাড়ির ভাড়াটে নরেন ওভারসিয়ার নামে লোকটা সাত মাস ভাড়া বাকী ফেলেছে। চিঠি দিয়ে কোনও উত্তর পাই না। মুরারী উকিলকে দিয়ে যথাশীঘ্র একটা রেণ্ট-সুট ফাইল ক'রে দিও। বেশী বদমাইসি করে তো ইজেক্‌শনের অর্ডার নিও। তোমার উপর সব ভার দিলাম।

অনেক দিন পরে আবার পুরনো দিনের নির্জনতাকেই খুঁজছি সাধ ক'রে। পাশের এই দুটো বাড়িই খালি হয়ে যাক এই মুহূর্তে—এই ধুমায়িত আবহাওয়া একটু পরিচ্ছন্ন হ'ক।

নিঃশব্দে নিঃসঙ্গে কাটছে দিনগুলো। আজকাল নরেনদা যেন বোবা হয়ে গেছেন। কোনও হাঁক ডাক আর শোনা যায় না। বোধ হয় ইচ্ছে ক'রেই একটু গাঢাকা দিয়ে থাকছেন—সেই রকমই মনে হচ্ছে।

বারান্দায় একসঙ্গে অনেকগুলো পায়ের শব্দ বেজে উঠলো। পরদা সরিয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকল—মণ্টু, পিণ্টু, বটা, বাঁশী, নোনা, তিনু এবং টাইগার। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে কিছু প্রশ্ন করার আগেই ওরা চটপট লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। মণ্টু কমান্ড করে হাঁক দিল—স্যালুট।

এক সঙ্গে সাত ভাই বোন সাতটা হাত তুলে স্যালুট জানাল। বেজায় খুশী হয়ে বললাম—কি ব্যাপার তোমাদের?

—আমরা যাচ্ছি।

—যাচ্ছ? কোথায়?

—লালবালু নদী। বাবার ক্যাম্প তৈরী হয়ে গেছে।

আর বিলম্ব না করাই উচিত। স্পষ্ট দ্বিধাহীন ভাষায় বললাম—আচ্ছা এস এবার। ডিসপার্স।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম, যতক্ষণ না বারান্দা থেকে পায়ের শব্দগুলি আবার মিলিয়ে গেল।

ডায়েরিতে লিখে রাখতে হবে।—আজ আমার পরম হারানোর

দিন। একদিনের পাওয়া, এতদিনের পাওনা, গ্রেট বেঙ্গল কলোনির স্বপ্ন—সবই শুধু একটা ফাঁকি রেখে সরে পড়ছে। ভাদ্র মেঘের চটুল ছায়ার মত।

এইবার নরেনদা আসবেন বিদায় নিতে। মুখের কথা বলে যাবেন—অনেক জ্বালিয়ে গেলাম তোমায় ভবানী। চিঠিপত্র দিতে ভুলো না।

পুবে বাতাসের শব্দ স্পন্দন থেমে গেছে মনে হচ্ছে—নিরেট একটা স্তব্ধতা। ধড়ফড় ক'রে উঠে জানালা খুলে তাকালাম।

কার্নিভালের ভাঙা আসরের মত প'ড়ে আছে ছোট বাড়িটা। কোনও মমতার চিহ্ন বালাই নেই সেখানে। দুটো গরু এরই মধ্যে বারান্দায় চ'ড়ে জাবর কাটছে। একটা কুকুর কড়ায় কুলুপ লাগানো দরজার অপরিসর ফাঁকটা দিয়ে মাথা গলিয়ে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে।

—পালিয়েছে লোকটা। বুনো, বেদে, চোর.........।

টেবিলের উপর থেকে রাজেনবাবুর চিঠিটা ছোঁ মেরে তুলে নিলাম, আত্মরক্ষায় বিমূঢ় প্রয়াসের মত। দৌড়ে এসে দাঁড়ালাম সড়কের উপর। কতদূর গেছে ওরা?

বেশী দূর নয়—কদমের সারিটা পর্যন্ত।

মালপত্র বোঝাই গরুর গাড়িটা আগে আগে। পিছনের গাড়িতে বউদি আর মণ্টুরা। পাশে আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে মাথায় সোলার হ্যাট চাপিয়ে নরেনদা চলেছেন।

পুরনো ইতিহাসের একটা ছেঁড়া পাতা উড়ে গেল সম্মুখে—নূতন তৃণভূমির স্বপ্ন দু চোখে, শস্যকণা প্রলুব্ধ যাযাবরের দিকে দিকে পাড়ি। পিছনের যত পরিচয় দু হাতে মুছে ফেলে, যত বন্ধ্যা মাটির ঢেলা অবহেলায় দু পায়ে মাড়িয়ে ওরা একদিন চ'লে যায়। ওরা বাঁধা পড়ে না কোথাও।

তীর্থ ফেরত

(৪২২ পৃষ্ঠার পর)

ডান হাতে মালা জপিতে জপিতে যখন ফিরিলেন, ষষ্ঠীতলায় তখন কান পাতা দায়। গলির মুখের কাছে একটি বড় দলের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঘোষালগিন্নী; ষষ্ঠীতলায় একদিকে বাতাসীর সুপুষ্ট দল, একদিকে রতন, তাহার সঙ্গে তাহার নিজের পাড়ার কয়েকটি মেয়ে, ওদিকে বাড়ির মেয়ে বউ পরিবৃত হইয়া চাটুজ্যেগিন্নী। কে কাহার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে, অথবা কে কাহার সঙ্গে করিতেছে না, বোঝা শক্ত। নথের ঝাঁকানি, বিশ ত্রিশ জোড়া হাতের বিচিত্র ভঙ্গী, কটু এবং কখনও কখনও অশ্রাব্য উক্তিতে ষষ্ঠীতলা গমগম করিতেছে। বাতাসীর কেরামতি একটা দেখিবার জিনিস। সে গাছকোমর বাঁধিয়া একবার ঘোষালগিন্নীর দলের মোহাড়া লইতেছে, সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিয়া হাত পা কোমর মাথা নাড়িয়া চাটুজ্যে গিন্নীকে যথোচিত উত্তর দিতেছে এবং পরক্ষণেই পাশে রতনের দলকে বাক্যবাণে জর্জরিত করিয়া তুলিতেছে।

অন্নদা পিসী আসিতেই সকলেই তাঁহাকে চারিদিক থেকে সাক্ষী মানায় ব্যাপারটা আরও উগ্র হইয়া উঠিল।

পিসী কিন্তু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মালা জপিতে জপিতে স্থির দৃঢ় পদে ভিড়ের মধ্য দিয়া ষষ্ঠীঠাকুরের চাতালের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কমণ্ডলুর জলটি ঠাকুরের মাথায় ঢালিয়া দিয়া আবার নির্বিকারভাবে মালা জপিতে জপিতে বাহির হইয়া গেলেন।
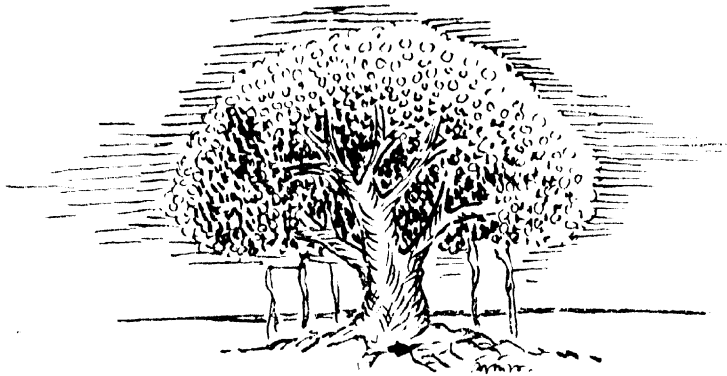
আকাশ বাতাস আলো

শ্রীকানাইলাল মণ্ডল এম-এস-সি

দৃষ্টিকে অতি সংকীর্ণ করেই দেখছি, পৃথিবীর সীমানার বাইরে তা পৌঁছবে না। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে যে আলো, বাতাস ও আকাশের বেশী ক'রে সম্বন্ধ, তার কতকটা নিয়েই এখানে আলোচনা হবে। এই আকাশ বাতাস আলো যে একান্তভাবে পৃথিবীরই, অন্য জগতের নয়, সে কথাটা মনে রাখা আবশ্যক।

পৃথিবীকে যে বায়ুমণ্ডল বেষ্টন ক'রে আছে, ক্রমশ তা ক্ষীণ হয়ে পঞ্চাশ মাইল উপরের আকাশে অস্তিত্ববিহীন হয়েছে বলা চলে। এই বায়ু যদিও ভারে এক ইঞ্চি পুরু ছত্রিশটি দস্তার পাতের সমান, তবু স্বচ্ছ অর্থাৎ আলোর গতিপথে সাধারণভাবে বাধা সৃষ্টি করে না। দূরে আকাশের গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র সূর্য, নক্ষত্রাদি সেইজন্যই স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তা থেকে এই অনুমান যদি করা যায়, বাইরের সমস্ত আলোক পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ ক'রে সোজা এসে তার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে তবে ভুল করা হবে। প্রকৃতপক্ষে বায়ুমণ্ডলের ছোট বড় বস্তুকণা ওই আলোকের উপর নানাভাবে ক্রিয়া ক'রে থাকে। সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার আগে আলোকের প্রকৃতির কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

অন্যান্য রশ্মির মত আলোক রশ্মি তরঙ্গের সমষ্টি। কিসের তরঙ্গ সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সকল রকম তরঙ্গই ছোট বড় নানা আকারের হয়ে থাকে। সমুদ্রের তরঙ্গ যখন খুব বড় হয় শত শত গজ তখন অতিকায় জাহাজকেও সে দোলা দিতে সক্ষম হয়। দৈর্ঘ্যে কয়েক ইঞ্চি মাত্র হ'লে বড় জাহাজ তো দূরের কথা ছোট বোটকেও তার নাড়া দেবার সাধ্য থাকে না। সামুদ্রিক আগাছা প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র জিনিসকেই মাত্র সে আন্দোলিত ক'রে তোলে। আলোক রশ্মিও এমনি ভাবে ছোট বড় আকারের হিসাবে বস্তুকণার উপর ক্রিয়া ক'রে থাকে। বেগনী হ'তে লাল পর্যন্ত যে সাত বর্ণের আলো আছে সেগুলির সমবায়ে সাদা আলোর জন্ম এ কথা প্রায় সকলেই আমরা জানি। এদের মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গ সকলের বড়। এক ইঞ্চি স্থানের মধ্যে তেত্রিশ হাজার লোহিত তরঙ্গ থাকে। বেগনী আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে লাল তরঙ্গের অর্ধেক। তার অর্থ এই যে, ছেষট্টি হাজার বেগনী তরঙ্গ এক ইঞ্চি জায়গা অধিকার করে। হলদে, নীল আদি আর পাঁচ আলোক তরঙ্গ লম্বায় একদিকে লাল, অন্যদিকে বেগনী এই দুই সীমার মাঝে অবস্থিত। লাল আলোর প্রান্তভাগে বর্তমান যে অবলোহিত বা ইনফ্রা-রেড রশ্মি, তার তরঙ্গ লোহিত তরঙ্গের চেয়ে বড়। মানব চক্ষুতে সে সাড়া জাগাতে পারে না কিন্তু ইনফ্রা রেড প্লেটে বেশ ক্রিয়া করে। বেগনীর দূর প্রান্তে আছে অতি বেগনী আলো। রাসায়নিক ক্রিয়াসম্পন্ন এই অদৃশ্য আলোর তরঙ্গ সকল রকম দৃশ্য আলোক তরঙ্গের চেয়ে ছোট। অতিবেগনী পার হয়ে যে-সব আলোর সাক্ষাত মেলে তাদের তরঙ্গ ক্রমে ছোট হয়ে কস্‌মিক রে বা আকাশ রশ্মিতে এসে ছোটর চরম হয়েছে। এক্ষেত্রে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, সাত-রঙা বর্ণালীকে গানের সপ্তকের মত যদি আলোর এক সপ্তক ব'লে ধরা যায় তবে বিজ্ঞানীরা সেরকম চৌষট্টিটা আলোক সপ্তকের বিষয় এ পর্যন্ত জেনেছেন।

সূর্য যে রশ্মি চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় তার মধ্যে প্রায় সকল-রকম আলোক-তরঙ্গ মিশে থাকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে সে সকলই যদি ভেদ করতে সমর্থ হ'ত তবে জীবনের অস্তিত্ব বলতে কিছু ধরাপৃষ্ঠে থাকত না। এটাই প্রথম জানবার কথা। সূর্যের সমস্ত আলোক হঠাৎ যদি বায়ুস্তর ভেদ ক'রে পৃথিবীর উপর এসে পড়ে তবে আমাদের দেহের বর্ণ প্রথমে হবে পাংশুল, পরে কাল। আমাদের মৃত্যু ঘটবে তার পরেই। অতিবেগনী রশ্মির কথা ধরা যাক। পর্যাপ্ত পরিমাণে এই রশ্মি সূর্যদেহ হ'তে বার হয়ে পৃথিবীর পানে আসে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ হ'তে পঁচিশ মাইল উপরের ওজোন স্তরের পর আর অগ্রসর হ'তে পারে না। এই স্তর অতি সূক্ষ্ম, এক ইঞ্চির দু হাজার ভাগের এক ভাগ। তা সত্ত্বেও জীবনের পক্ষে যতটুকু আবশ্যক সেইটুকু বাদে বাকী সকল আলোক ওজোন স্তরে শোষিত হয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এমনসব উপাদানেও তৈরী হ'তে পারত, সূর্যালোক যা অতিক্রম করতে একেবারে অসমর্থ হ'ত। সৌর জগতের কোনও কোনও গ্রহের ক্ষেত্রে ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যগুণে সেগুলির মত আলোক অবরোধকারী বাষ্পমণ্ডলে পৃথিবী ঘেরা নয়। মানুষের চোখও—যে আলোক যথেষ্ট পরিমাণে ধরাপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছয় মাত্র সেই আলোকে সাড়া দেয়। যে আলোক অল্পমাত্রায় পৃথিবী স্পর্শ করে অথবা পরিমাণে বেশী, পৃথিবীর দিকে এলেও তার বায়ুস্তরে বাধা পায় আমাদের চোখে সে আলোক অদৃশ্য।
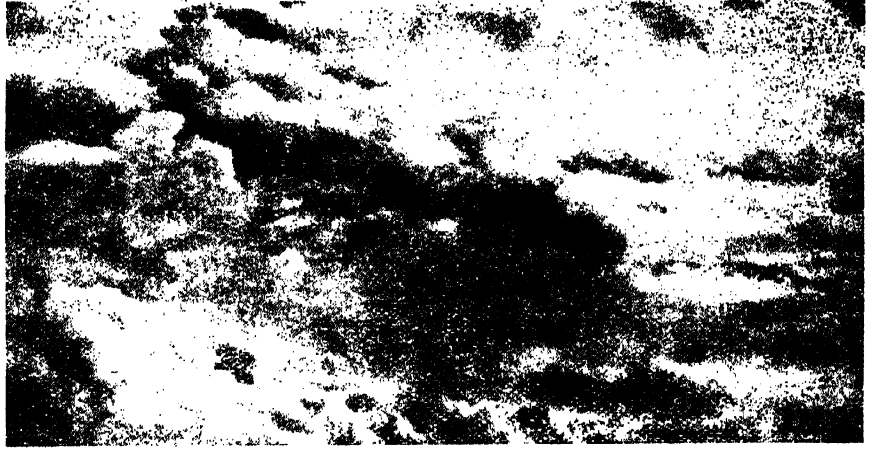
চিরতুষারময় কুমেরুর আকাশের মেঘ

বর্ণালী (spectrum)

মাত্র সাতবর্ণের অতি সংকীর্ণ সীমায় বন্ধ আলোককেই যে মানবচক্ষু দেখে থাকে, উপরে এ কথা বলা হয়েছে। বস্তু বিশেষকে আমরা রঙিন দেখি ব'লেই রংটা বস্তুর মনে করবার কারণ নেই। সূর্যালোকের সাত রং গ্রহণ ক'রে যে বিশেষ রংটি কোনও বস্তু আমাদের চোখে প্রতিফলিত করে বস্তুটিকে আমরা সেই বর্ণের দেখি। নীল বর্ণের জিনিস সাদা সূর্যালোকের নীল ছাড়া অবশিষ্ট ছয় রঙ শোষণ করে, প্রত্যাখ্যাত নীল আলোক আমাদের চোখের নার্ভে নীল রংএর সাড়া জাগায়, বিজ্ঞানের প্রাথমিক ছাত্রদেরও একথা জানতে হয়। নীল আলোর মধ্যে রাখলে নীল বস্তুটি নীল দেখা যাবে কিন্তু অন্য বর্ণের আলোকে তা দেখাবে কৃষ্ণবর্ণ। এর কারণ কি তা আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি। আমাদের জন্ম হয়েছে আলোকের মধ্যে প'ড়ে, আলোর মারফতেই আমরা বিশ্ব জগতের জ্ঞান লাভ করি। একথা সত্য হ'লেও আলোক সম্বন্ধে এই আদিতত্ত্ব আমরা অনেকেই জানি না যে পৃথিবীর আকাশে রংএর যে বিচিত্র খেলা চলতে দেখা যায় তা তার বাতাসের গুণে। এর মধ্যকার বায়ুকণিকা, ধূলি, জলীয় বাষ্প আদি নানা উপাদান সাদা সূর্যালোকের উপর অনেক রকমে ক্রিয়া ক'রে তার বিভিন্ন প্রকার রং ফলিয়ে তোলে। যে আকাশকে আমরা নীল দেখি সে পৃথিবীর আকাশ। তার অর্থ এই যে, পৃথিবীর বায়ুস্তর পার হয়ে গেলে আর আকাশ আমাদের চোখে নীল ঠেকবে না। আকাশ যা গোড়ায় ছিল নীল, সাত মাইল উপরে উঠলে তা হবে গভীর নীল, আট মাইলের পর গাঢ় বেগনী, তের মাইলের উপরে কালো বেগনী তারও পরে কৃষ্ণধূসর, শেষে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ—যেমন ঘোর কালো বাষ্পমণ্ডলহীন চন্দ্রলোকের আকাশ।

আকাশ কেন নীল দেখি? সূর্যের আলোকে তো সাত রং বর্তমান আছে তবে তার নীল অংশটা বেশী ক'রে চোখে পড়ে কেন? কারণ এই।—আমরা যখন উপরের দিকে তাকাই তখন বস্তুত আমরা দৃষ্টি দিয়ে থাকি ধূলি, বায়ু ও জলীয় বাষ্পের কণিকা সমষ্টির দিকে। পূর্বে দেখা গেছে নীলতরঙ্গ লোহিত আলোর তরঙ্গের চেয়ে অনেক ছোট। বাতাসের যেসব কণিকা আলোক বিক্ষিপ্ত করবার কাজে লেগে থাকে তারা আকারে লাল, নীল দুরকম তরঙ্গের চেয়ে ছোট হ'লেও নীল তরঙ্গের বেশী কাছাকাছি আসে। কাজেই নীল আলোককে বিক্ষিপ্ত করবার কাজেই তারা বেশী শক্তির পরিচয় দেয়। বিক্ষিপ্ত নীল আলোকই দৃষ্টিতে নীলের চেতনা জাগায় এবং আমরা ব'লে থাকি আকাশ নীল। বাতাসের কণিকা যত ছোট হয় নীল আলোককে তারা তত বেশী বিক্ষিপ্ত করে, প্রবল বৃষ্টির পর আকাশ বেশী নীল দেখায় এই জন্য যে বড় আকারের ধূলিকণাগুলি তখন ধুয়ে যায় এবং অপেক্ষাকৃত ছোট কণিকা সাদা আলোক বিক্ষিপ্ত করবার কাজে ব্যাপৃত থাকে। একই কারণে সমুদ্রের উপরিভাগ অথবা পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে লক্ষ্য করলে আকাশের ঘনতর নীল রং চোখে পড়ে। ধূলিময় আকাশের পরিচিত আবছায়ায় আছে—তুলনায় যে সকল বস্তুকণার আকার বড় সূর্যালোকের উপর সেইগুলির ক্রিয়া।

সোজা দৃষ্টি দিলে সূর্যকে খুব রক্তবর্ণ দেখায়। সূর্য প্রকৃতই অত লাল নয়। রক্তরশ্মিগুলি এক্ষেত্রে বেশী চোখে পড়ে তার কারণ নীল তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, আমাদের চোখের উপর তার অতি কম অংশই পড়ে। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যকার বায়ু বা ধূলিস্তর যদি কোনও কারণে বিশেষরূপ ঘন হয়, যেমন ঘন অবস্থা তার থাকে সকাল সন্ধ্যায়, সূর্য-রশ্মি যে সময়ে তির্যকভাবে বায়ুমণ্ডল পার হয়, তবে দেখা যাবে সূর্য আরও অনেক বেশী লোহিত হয়ে উঠেছে। ১৮৮৩ সালে এইরকম এক অপরূপ দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। আগ্নেয়গিরি ক্রাকাতোয়ার সেই সময়ে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে এবং উদ্‌গত ভস্মাদিতে আকাশ ছেয়ে যায়। অগ্ন্যুদ্‌গারের স্থান হ'তে এক শ মাইল দূরে পর্যন্ত জায়গা প্রথমে অন্ধকারে সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়েছিল। পরে সমগ্র পৃথিবীতে ধূলির জাল ব্যাপ্ত হয়ে যায়। যে কয়েক মাস আকাশ বাতাস ভস্ম সমাচ্ছন্ন ছিল সে সমস্ত সময়টার জন্য ধরণীর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের শোভা হয়েছিল অবর্ণনীয়।

কুয়াশার ভিতর দিয়ে দৃষ্টিপাত করলে সূর্যের রক্তিম আভা বেড়ে যায় আলোর উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার অনুরূপ ক্রিয়ার জন্য। রাস্তার ল্যাম্পের আলো যত দূর থেকে দেখা যায় ততই বেশী লাল বোধ হয়। মেঘ সাধারণত এত ঘন যে, প্রান্তভাগ ছাড়া তার অপর সমুদয় অংশ সূর্যালোক একেবারে মুছে দেয়। ওই মেঘের কিনারার দিকে দিনের বেলায় আমরা দেখতে পাই রূপালী বা সোনালী আভা এবং দিবাবসানে দেখে থাকি অপূর্ব রক্তরাগ।

বস্তুকণার সংস্পর্শে লাল তরঙ্গ নীল অপেক্ষা কম বিক্ষিপ্ত হয়। দীর্ঘতর অবলোহিত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয় আরও অল্প। কুয়াশাদির মধ্য দিয়ে অবিক্ষিপ্ত অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে আমাদের দৃষ্টি চলত যদি, ইনফ্রা-রেড প্লেটের উপাদান আমাদের চক্ষুর ভিতর বর্তমান থাকত। চক্ষুর গঠনের ত্রুটির জন্য এখন আমাদের ইনফ্রারেড প্লেটের সাহায্য নিতে হচ্ছে, আবছায়ার মধ্য দিয়ে দূরের বস্তু দেখবার জন্য।

বায়ুমণ্ডলের চার ভাগ নাইট্রোজেন এক ভাগ অক্সিজেন প্রধান উপাদান হ'লেও অন্যান্য গ্যাস তার মধ্যে বর্তমান আছে আমরা জানি। সে সকলের মধ্যে বেশী অংশ জলীয় বাষ্পের। অবিশ্রাম মন্থনের ফলে বাতাসের সকল গ্যাস সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত হচ্ছে। কেবল জলীয় বাষ্প ওইভাবে না মিশে সকলের নীচে পড়ছে। সমুদয় উপাদানের মধ্যে বাতাসের জলীয় বাষ্পই শুধু ঘনীভূত হয়ে তরল বিন্দুর আকার ধারণ করতে পারে এবং সেই জন্যই তা পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়ে থাকে বৃষ্টি ও নীহারের আকারে; অক্সিজেন নাইট্রোজেন বা হিলিয়ম আকাশ হতে ওইভাবে বর্ষিত হয় না। বাতাসের প্রবাহে জলীয় বাষ্পের পক্ষে বিন্দুর আকার ধারণ করবার সম্ভাবনা বেশী থাকে ব'লে সাধারণের বিশ্বাস, বায়ু প্রবাহিত হ'লে বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে। বৃষ্টিরূপে যে জল ভূপৃষ্ঠে পড়ে তা পুনরায় উপরে উঠে যায় বটে কিন্তু বেশী ঊর্ধ্বে উঠবার আগেই দ্বিতীয় বায়ুপ্রবাহে আহত হয়ে নিম্নে পড়ে। কাজেই এতে আশ্চর্য বোধ করবার কিছুই নেই যে, জলীয় বাষ্প সমগ্র বায়ুমণ্ডলে সমভাবে ব্যাপ্ত না থেকে কেবল নিম্নস্তরে আবদ্ধ থাকে। সাগর পৃষ্ঠের লেভেলে আশিটি অণুর মধ্যে একটি অণু জলের। কিন্তু সাত মাইলের উপরে অর্থাৎ চলমণ্ডল বা ট্রপোস্ফীয়ারের শীর্ষদেশে ঐ অনুপাত হ্রাস পেয়ে দশ হাজারে একটি মাত্র হয়েছে। এর সোজা অর্থ এই হয়, সকল জলীয় বাষ্প চলমণ্ডলে বিদ্যমান এবং বায়ুর নিম্নস্তরই বৃষ্টি, নীহার ও কুয়াশার ক্ষেত্র। বর্ষণশীল মেঘ কয়েক শ ফিট থেকে এক মাইল বা তারও বেশী উপরে গঠিত হয়। সর্বোচ্চ মেঘ সাধারণত উচ্চতায় পাঁচ ছয় মাইল। চলমণ্ডলের শীর্ষদেশের উপরে কোনও রকমে মেঘের সৃষ্টি হ'তে পারে না আগেই দেখা গেল।

প্রাচীন যুগেও মেঘের আকার এবং গঠন লোকের কৌতূহল উদ্দীপিত করত মনে করা যেতে পারে। থিওফ্রেস্টাস (খৃষ্টপূর্ব ৩৭৩—২৮৬ সাল) রেখাসদৃশ ও কার্পাসবৎ মেঘের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। ওইরূপ পার্থক্য তিনি আকাশের অবস্থা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেঘের প্রকৃত শ্রেণীবিভাগ আরম্ভ হয়। বর্তমানে মেঘের প্রধান যে কয়েক রকম আকার শ্রেণীবিভাগের কাজে স্বীকৃত হয় তাদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) উচ্চ আকাশের মেঘ, তারা গড়ে ৯ হাজার মিটার (৬ মাইলের কিছু কম) উপর আকাশে অবস্থান করে। উচ্চ আকাশের একরকম মেঘের বর্ণ সাদা এবং তা গঠিত হয় সুকোমল ঊর্ণাসদৃশ বহু বিচ্ছিন্ন খণ্ডে। দ্বিতীয় রকম মেঘও প্রায় শ্বেতবর্ণ। সময়ে সময়ে ওই মেঘ আকাশ সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন

ক'রে থাকে এবং কখনও কখনও তন্তুর জালের রূপ ধরে। ওই মেঘই জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করে চন্দ্র ও সূর্যের চারি পাশে।

(২) মধ্য আকাশের মেঘ। এরা সাধারণত তিন হাজার থেকে সাত হাজার মিটার উপরে বিরাজ ক'রে থাকে। মধ্য আকাশের একরকম মেঘ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য গোলাকার খণ্ডে আকাশ বিচিত্রিত করে। ওই সমুদয় খণ্ড মেঘ রেখাশ্রেণীতে অথবা পুঞ্জে পুঞ্জে সজ্জিত থাকে। দ্বিতীয় প্রকার মেঘের খণ্ডগুলি তুলনায় বড়। তাদের বর্ণ সাদা কিংবা ধূসর হয়। এমন ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থায় তারা আকাশে বিরাজ করে যে, প্রায় পরস্পর লগ্ন হয়ে যায়। মাঝ আকাশের তৃতীয় রকমের মেঘ ঘন এবং ধূসর অথবা নীলাভ। বিচ্ছিন্ন এবং পুঞ্জীভূত দুই অবস্থাতেই তাদের আকাশে দেখা যায়।

(৩) নিম্ন আকাশের মেঘ। দুই হাজার মিটার ঊর্ধ্বে এই সকল মেঘ অবস্থান করে। ধূসর বর্ণের যে মেঘ বৃহৎ স্তূপের আকারে গঠিত হয়ে প্রায়ই সমস্ত আকাশ বেষ্টন করে ফেলে তারা বৃষ্টি দান করে না। নিম্ন আকাশের বর্ষণশীল ধূসর বর্ণ মেঘের কোনও আকার নেই। তার প্রান্তভাগ বন্ধুর। বর্ষণশীল মেঘ থেকে ধীরভাবে বৃষ্টি অথবা তুষারপাত ঘটে থাকে। এই মেঘের গায়ে কোনও ছিদ্র থাকলে তার মধ্য দিয়ে উচ্চ আকাশের শুভ্র মেঘ দৃষ্টিগোচর হবেই। বড় এক খণ্ড বর্ষণশীল মেঘের নীচে তার বহু বিচ্ছিন্ন অংশগুলি বিরাজ করতে পারে।

(৪) চতুর্থ রকমের পুঞ্জ মেঘ ঘন। এই মেঘের গুম্বজাকৃতি শীর্ষদেশ ১৮০০ মিটার উচ্চে বর্তমান থাকে। শীর্ষদেশ হ'তে সূক্ষ্ম খণ্ড সকলও উদ্‌গত হয়ে থাকে। পুঞ্জ মেঘের নিম্নের অংশ ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় ১৪০০ মিটার উপরে অবস্থান করে। বিদ্যুন্ময় অথবা বর্ষণশীল পুঞ্জ মেঘ পর্বত, গুম্বজ প্রভৃতির আকারে আবির্ভূত হয়। প্রায়ই তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম আবরণেও ওই মেঘ পরিবেষ্টিত থাকে। ওই মেঘের নিম্নদেশ হ'তে বৃষ্টি, তুষার এবং কখনও কখনও শিলারাশির স্থানীয় বর্ষণ দেখা যায়।

(৫) পঞ্চম শ্রেণীর মেঘকে নিম্ন আকাশের কুয়াশা বলা যেতে পারে। সম-আকারের এই মেঘের সঙ্গে কুয়াশার পার্থক্য এই যে, এই মেঘ কুয়াশার মত ভূমিসংলগ্ন হ'য়ে বিরাজ করে না। হাজার মিটারের নীচের আকাশে গঠিত হয়।

কুয়াশা প্রকৃতপক্ষে মেঘ নয়। কুয়াশার কোনও বিশিষ্ট আকার নেই। কুয়াশা স্থির হ'য়ে আছে মনে হ'লেও সত্যই তা ভূমির উপর এক জায়গায় বিরাজ করে না। ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করতে থাকে। এক রকম কুয়াশা সমুদ্রের উপরেও দেখা যায় (ছবি দ্রষ্টব্য)। ধীর বায়ু এবং কখনও কখনও অপেক্ষাকৃত প্রবল বাতাসের দ্বারা ওই কুয়াশা চালিত হয়। এক এক সময়ে কুয়াশা এত ঘন হয় যে ৫০ মিটার দূরের বস্তুও তার ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করা যায় না। জলে বা স্থলে যেখানেই কুয়াশা উৎপন্ন হক না, বেশী উপর পর্যন্ত তা কোনও সময়ে বিস্তৃত থাকে না। কুয়াশা সাধারণত সাদা এবং ছোট ছোট জলকণায় মেঘেরই মত সৃষ্ট হয়। জলকণায় গঠিত দৃষ্টি অবরোধকারী আকাশের যে অস্বচ্ছ আবরণ কুয়াশা বলে বর্ণিত হয় তা কুয়াশা নয়, মেঘ মাত্র। বায়ুমণ্ডল ঝাপসা দেখলেই তা কুয়াশার কারণে ঘটছে মনে করবার কারণ নেই। ধূলি ও ধোঁয়ায় নীচের বায়ুস্তর অস্বচ্ছ হতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণায় তখন সূর্যরশ্মি প্রতিহত হয়। শহরের কৃষ্ণবর্ণ কুয়াশা অনেক সময়ে ধূম উৎপাদনের ফলে সৃষ্ট হয়। কুহেলিকা বা কুজ্ঝটিকার সঙ্গে সাধারণত কুয়াশার কোনও পার্থক্য করা হয় না। বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু হতে উৎপন্ন ভূমিসংলগ্ন মেঘই কুহেলিকা। মেঘ, কুয়াশা ও কুজ্ঝটিকার মূলে একই জিনিস রয়েছে—ঘনীভূত জলীয় বাষ্প।

বাতাস ঊর্ধ্বে ওঠবার কালে তার চাপ হ্রাস পায়। প্রাকৃতিক নিয়মে তখনই শুধু বাতাস শীতল হয়। শীতের সংস্পর্শে আসবার ফলে জলীয় বাষ্প মেঘে পরিণত হয়। ভূসংলগ্ন মেঘের উৎপত্তি অবশ্য এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। আরও যে এক ক্রিয়ায় মেঘ উৎপন্ন হতে পারে তা হচ্ছে, বিভিন্ন তাপমাত্রার আর্দ্র বায়ুর মিশ্রণ। বায়ুর ধীর প্রবাহে এইরূপ মেশামিশির কার্য সংসাধিত হয়। গতিশীলতা এক্ষেত্রে আবশ্যক। নীচের শীতল জলের সংস্রবে এসে সমুদ্র পৃষ্ঠের বায়ুস্তর শীতল হলে সাধারণত সমুদ্রে কুয়াশার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই ক্রিয়া মাত্র পাতলা এক স্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার সঙ্গে মন্থনগতি যুক্ত হবার ফলেই ক্রমশ শৈত্য ঊর্ধ্বদেশ পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে। গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে বাতাস যখন দ্রুতভাবে উষ্ণ হয়ে ওঠে সেই সময়ে সামুদ্রিক কুয়াশা বেশী দেখা যায়।

বৃষ্টি, তুষার ও শিলাপাত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী আবহবিদ্যার পক্ষে আবশ্যক হলেও সেই কাজ সহজ নয়। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বারিপাতের এমন তারতম্য ঘটে এবং ঋতুর পরিবর্তনে বর্ষণের পরিবর্তন এক ঘণ্টায় মুষল ধারায় যেভাবে প্রভাবান্বিত হয় তাতে ওই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব হয় না। বহু বৎসরের হিসাব হতে গড় হিসাব বার করে পৃথিবীর কম স্থানেই প্রতি বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বৃষ্টিপাতের যে বদল ঘটে তা অনুমান করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের কথা আলাদা, এখানে মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সঙ্গে প্রবল বারিপাত সম্বন্ধ এবং বর্ষা-

জলবায়ু ও আলোকের ক্রিয়ায় উৎপন্ন সূর্যাস্তের দৃশ্য

কালের মধ্যেই তা ঘটবে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের গ্রীনউইচে অক্টোবর, অ্যাবার্ডিনে ডিসেম্বর এবং এডিনবরায় জুলাই মাসে প্রবল বারিপাত হয়। পৃথিবীতে এমন স্থানও আছে যেখানে কোনও সময়েই বৃষ্টিপাত হয় না, কেবল শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে। সুমেরুবৃত্ত এমনই এক প্রদেশ। সুমেরুর শিলাবৃষ্টির সঙ্গে ঝড়-ঝঞ্ঝার সংযোগই তার বিখ্যাত 'ব্লিজার্ড'। তার মধ্যে পড়ে অনেক মেরু-অভিযানকারীই এখন প্রাণ হারিয়েছেন। প্রবল ঝঞ্ঝার সঙ্গে বৃষ্টি সংযোগের এক বিশিষ্ট ব্যাপার উল্লেখ করবার মত। ভূপৃষ্ঠের অতি সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে অতি অল্পকালে কখনও কখনও এরূপ প্রবল ধারায় বর্ষণ ঘটে যে তাতে অকস্মাৎ বন্যা উপস্থিত হয়ে চারিদিকে ধ্বংস সাধন করে। পার্বত্য প্রদেশেই সাধারণত এমন দেখা যায়। এর কারণ ভীষণ ঝড়ের সময় ঊর্ধ্বমুখী বায়ুপ্রবাহে জলকণা সমষ্টি নীচে পতিত হতে অসমর্থ হয়। বায়ুর উচ্চস্তরে তখন তারা অবস্থান করে। পরে কোনও কারণে ঊর্ধ্ব দিকের বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হলে ওই জল এক সঙ্গে নিম্নে পড়ে। পর্বতের গায়ে বাধা পাবার সম্ভাবনা বেশী থাকে বলে পার্বত্য অঞ্চলেই প্রায় ওই রকম ঘটে থাকে। এরূপ বর্ষণের প্রাবল্যের ধারণা করা যাবে দুটি উদাহরণ থেকে। ১৯১১ সালের ২৯শে নভেম্বর পানামার এক স্থানে তিন মিনিটে দুই দশমিক

বিন্দু চার সাত (২·৪৭) ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছিল। ১৯২৬ সালের ৫ই এপ্রিল সান গেব্রিল অঞ্চলে এক মিনিটে এক ইঞ্চিরও বেশী বৃষ্টি পড়ে।

মেঘ ও বৃষ্টির সঙ্গে রামধনু এবং বিদ্যুৎ জড়িত। প্রাচীন কালের গ্রীক ও রোমকরা রামধনুর জন্ম সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন। 'বৃষ্টির দ্বারা সৌর রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে রামধনু উৎপন্ন করে, অ্যারিস্টটল এই কারণ নির্দেশ করেছিলেন। আইজ্যাক নিউটনই প্রথম রামধনু ও তার বর্ণ বৈচিত্র্যের কারণ প্রকৃতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। জলবিন্দু কর্তৃক আলোক রশ্মির প্রতি-সরণে একাধিক রামধনুর জন্ম হয়। জলকণা অতি ক্ষুদ্র হলে রামধনু প্রায় শ্বেতবর্ণ হয়। পর্যবেক্ষক খুব নিকটে অবস্থান করলে ওই রামধনু স্পষ্ট দেখতে পায়। সৌর রশ্মির মত চন্দ্রের আলোকও রামধনু সৃষ্টি করতে পারে। তবে তা এতদূর ক্ষীণ হয় যে তার বিভিন্ন বর্ণকে পৃথক করে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

দুই খণ্ড মেঘ অথবা এক খণ্ড মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ চলবার কালে আলোকের যে ঝলক দৃষ্ট হয় তাই হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিশেষ কোনও ক্রিয়ায় পতনশীল বৃষ্টি, তুষার বা শিলা এক প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তি পেয়ে থাকে এবং বায়ু অথবা ঊর্ধ্ববাহিত ক্ষুদ্র জলকণা বিপরীত রকম বৈদ্যুতিক শক্তি লাভ করে। ক্রমসঞ্চিত বৈদ্যুতিক শক্তি যখন অতিমাত্রায় বেশী হয়ে পড়ে তখনই পজিটিভ বিদ্যুৎ ও নেগেটিভ বিদ্যুতের মধ্যে সংযোগ সাধিত হয়। 'বাঁকা বিদ্যুতে' তড়িৎ প্রবাহের পথ পরিদৃশ্য হয়। 'ব্যাপ্ত বিদ্যুতে' তড়িৎ প্রবাহের পথ দেখা যায় না, বিদ্যুতের আলোকে মেঘমাত্র দেখা যায়। বৃষ্টির সঙ্গে তড়িৎ অতি ধীরে ভূপৃষ্ঠে নীত হয় বলে বারি বর্ষণের সঙ্গে বিদ্যুৎ অন্তর্হিত হয়।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও রামধনু এবং বিদ্যুৎ মানুষের চিত্ত-আকর্ষণের বস্তু হয়ে থাকবে। পৃথিবীর মাটির উপর ডিক্টেটারির কাজে ত্রয়ী শক্তির মিলন দরকার হয়। আকাশের বেলাতেও কি তাই? কবি শেলীর যে "মেঘ" আকাশের উপর কর্তৃত্ব করবার গর্ব প্রকাশ করেছে সে তো সঙ্গীরূপে নিয়েছে দেখা যায় ঝড় ও বিদ্যুৎকে।

পূজার বাজনা — শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

তার ছেলেমেয়েরা কাছে
আসতে চাইত না
তার কারণ প্রত্যুষের
দুর্ব্বলতা
টুকু, এদিকে এস, বলত ইস্কুলে কেমন পড়াশুনা করছ?
বাবা, সন্তোষ আমার জন্য দেরী করছে — এখন যাই, এসে তোমাকে বলব।
'তুমি দিনরাত বক' ব'লেই — ছেলেরা তোমার কাছে আসতে চায় না। তুমি সব সময়েই কেমন ক্লান্ত ও খিটখিটে থাক। তোমার ডাক্তার দেখান উচিত।
ডাক্তারের কাছে —
ডাক্তারবাবু, সব সময়েই দুর্ব্বল মনে হয়। ঘুম থেকে উঠেও ক্লান্তি কাটে না।
আপনার অসুখ হচ্ছে প্রত্যুষের দুর্ব্বলতা। ঘুমন্ত অবস্থায়, আপনার হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও অন্যান্য পেশী-সমূহের কার্য্যে যে শক্তি ব্যয় হয়, সে শক্তির পরিপূরণ হওয়া দরকার। প্রত্যেক রাতে 'হরলিক্স্' খান, শীগ্গিরই পূর্ণশক্তি ফিরে পাবেন।
দুই সপ্তাহ পরে —
'হরলিক্স্' খেয়ে তুমি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে গেছ। ভাগ্যিস্ হরলিক্স্ তোমার খেতেও ভাল লাগে।
দুই মাস পরে —
চড়ুইভাতিতে গিয়ে আমি তোমার পাশে বসবো কিন্তু বাবা—
তোমার ফুটবলটা নিয়ে চল — ওখানে গিয়ে খেলা যাবে।
(স্বগতঃ)— পরিপূর্ণ জীবনীশক্তি পাওয়া কি চমৎকার। হরলিক্স্ এর জন্যই— ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা নতুন করে পেয়েছি।
আপনি কি জড়তা, স্নায়ু দুর্ব্বলতা বা দুঃসহ অবসাদ বোধ করেন? ঘুম থেকে উঠে কি আপনার ক্লান্তি বোধ হয়? "প্রত্যুষের দুর্বলতা" থেকে আত্মরক্ষার জন্য
হরলিক্স্
ব্যবহার করুন! যাতে ঘুম হবে, আর ঘুম থেকে জাগবেন সারাদিনের কাজের উপযোগী পর্য্যাপ্ত শক্তি নিয়ে।
HORLICKS
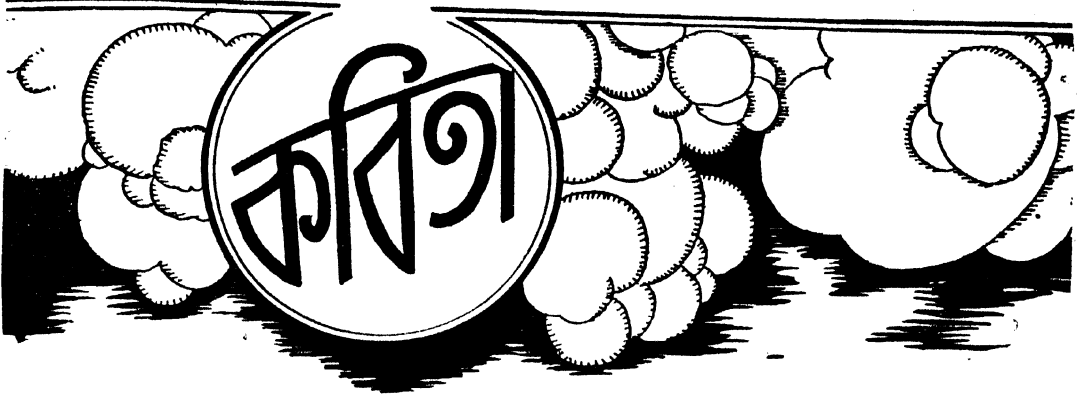
নূতন করিয়া গড়িতে হবে

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

শম্ভু, তোমার হাতের ত্রিশূল পড়েছে কি খ'সে নেশার ঘোরে?
নহিলে হেরিছ বিশ্বের দশা তিন চোখে আজ কেমন ক'রে!
ত্রিজগৎ জানে সংহার কাজে তুমিই প্রতিদ্বন্দ্বিহীন,
জীবের জীবন কটাক্ষপাতে বিনাশ তোমারই ইচ্ছাধীন;
আজ দেখি, তুমি ভাঙ খেয়ে প'ড়ে আছ ভোলানাথ সংজ্ঞাহারা,
দেবতার কাজ দৈত্যে সাধিছে বিশ্ব জুড়িয়া তাহারি সাড়া!

কোথা শংকরী প্রলয়ংকরী তব সংহারকার্য সাথী?
নয়নে স্তিমিত দেব হুতাশন, ললাটে চন্দ্র মন্দভাতি!
জাহ্নবী শুধু জটায় দুলিছে কুলুকুলু-ঘুমপাড়ানী গানে,
দ্বিগুণ আবেশে সিদ্ধির নেশা ঘনতর ঘুমে ঘনায়ে আনে!
ঘুমাও, ঘুমাও দেব আশুতোষ, ঘুমাও হে নীলকণ্ঠ ভোলা,
হে মৃত্যুজিৎ, মৃত্যুপথ কি এতদিনে তবে তোমারও খোলা?

কত-না ব্রহ্মা, কত-না বিষ্ণু কত শিব জলবিম্বপ্রায়
সুকৃতি-অন্তে কারণ সলিলে বিন্দুর মত মিলায়ে যায়!
আজিকে তোমার দশা দেখে শিব ভক্তের মনে শঙ্কা জাগে,
হে বিশ্বনাথ, তোমারও মৃত্যু দেখিব কি এই আঁখির আগে?
সৃষ্টিনাশের শক্তি-সাধনা করে আনজন যায় যে দেখা,
দৈত্যের হাতে ত্রিপুর বিজয়, এও ছিল তব ললাটে লেখা!

হেন পাপ কথা কে শুনিবে কানে, জাগ, জাগ শিব, নয়ন মেল,
বিশ্ববিনাশী সংহার-শূলে সৃষ্টির পাপ মুছিয়ে ফেল;
হিংসার বিষে জীর্ণ এ ধরা,—দেবতা দৈত্য সমান সবে,
প্রলয়ে বিলয় করি এ সৃষ্টি নূতন করিয়া গড়িতে হবে।
জগৎ জুড়িয়া তারই আয়োজন পড়ে যাহা এই ত্রস্ত চোখে,
বিদায়ের আগে দেখে যাই যেন তোমারি রুদ্র নেত্রালোকে।

মোহরাঙ্কিত

—নিশিকান্ত—

প্রশ্ন যদি করে, মা গো, কেউ যদি আজ শুধায়, আমি কার।
মুক্তকণ্ঠে জানিয়ে দেব, এই জীবনে মায়ের অধিকার;
মায়ের আলোর গর্ভ হ'তে জন্মস্বত্ব নিয়ে
চলেছি আজ এই পৃথিবীর পথের উপর দিয়ে;
শোণিতে মোর ধমনীতে, মজ্জায় মজ্জায়
মায়ের অধিকারের ধারা বিচ্ছুরিয়া ধায়;
আমার নিশ্বাসে নিশ্বাসে
মায়ের হৃদয়রক্তকমল সুবাস নিয়ে আসে।

কেউ যদি আজ শুধায়, মাগো, তনুর পরিণতি কোথায় লভি।
মুক্তকণ্ঠে জানিয়ে দেব, আমি তোমার প্রসাদ পুষ্ট কবি;
মায়ের পরমান্ন তৃপ্ত করে আমার ক্ষুধা,
তৃষ্ণা মিটায় মায়ের সরোবরের সলিল সুধা;
মায়ের মাটির আশ্রমে আজ পেয়েছি আশ্রয়,
ঝড়ের রাতে মায়ের কোলের অঞ্চলে নির্ভয়
নির্-দ্বন্দ্ব আমার বেলা;
মার মালঞ্চে ফুলের মত ফোটে আমার খেলা।

মাগো! যদি কেউ শুধায় আজ, স্বপনে মোর কেমনে রং লাগে।
মুক্তকণ্ঠে জানিয়ে দেব, আমার স্বপ্ন তোমার লীলায় জাগে;
অনুরাগের গভীর ঘুমে রঞ্জিয়া রঞ্জিয়া
মায়ের চাঁদের চুমায় ভাসে আমার মেঘের হিয়া;
আমার পাখির পাখায় দোলে মায়ের ইন্দ্রধনু,
মায়ের অরুণরাগে রাঙা মোর গোলাপের তনু;
মায়ের নীলের নীহারিকা
জ্বালে আমার অন্তরে তার উদয়-স্বপ্ন শিখা।

যদি শুধায়, কোথায় পেলাম রূপের ছন্দ, সুরের কলনদী।
মুক্তকণ্ঠে জানিয়ে দেব, আমার মাঝে বহে তোমার গতি;
তোমার অতল-রূপার উৎসে উচ্ছলি মোর ধারা
তোমার সোনার সিন্ধুজলে হয় যে আপনহারা;
মাগো আমি তোমার বীণা, তোমারি ঝংকার
দীপ্তগানের মুক্তমণির বৈভব-সম্ভার;
তুমি রাজ-রাজেন্দ্রাণী!
তোমার মোহরাঙ্কিত মোর মুখের প্রতি বাণী।

দু চোখের হার

শ্রীহেমলতা দেবী

দুটি চোখ দিয়ে মোরে পাঠালে হেথায়,
দুই চোখে দেখে তারে যদি চেনা যায়;
আধা আলো আবছায়া আঁধারে ঢাকে
কোন্ নামে কোন্খানে কাহারে ডাকে
চিনি চিনি করে—থাকে অচেনাই সব
শুনি শুনি বলে—রহে বাণীটি নীরব!
দেখে দেখে চলে তবু নাহি হয় দেখা
ঠেকে ঠেকে যায় পথ, ঠেকে ঠেকে শেখা—
প্রহরী রয়েছে সাথে দুটি বড় চোখ,
চোখে দেখে সব সাধ মিটাবার ঝোঁক।
হায় হায় স'রে যায় দু চোখের দিঠি
অলক্ষ্যে হাসেন বন্ধু, হাসিটুকু মিঠি!
কুশলী, কৌশলে তব, দুচোখের হার
অন্তরে খুলিল বন্ধু মিলনের দ্বার।

বিদায় সন্ধ্যায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ঝিলমের বাঁকা-নদী-আঁকা ছবিখানি ধীরে ধীরে
ম্লান হয়ে আসে আধ জাগরণে স্বপ্নসম......ফিরে
ফিরে চাই শৈলশিখরের পানে—যেথা ঢেউ হয়ে
মেঘের অসাঙ্গ দোলা অফুরন্ত তরঙ্গের লয়ে
নব নব রূপ ধরে।

দীর্ঘচ্ছায়া তরুবীথিকার
কায়া ফলি ছায়া-জল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বার বার।
বিদায়লগ্নের বেলা মনে হয়—জীবনের পথে
সৌন্দর্যের কত রাগ বেজে গেছে আলোছায়া রথে
এমনি অস্তাভ ছন্দে। উন্মুখ আগ্রহে মর্মপুরে
বরণ করেছি যারে—এমনিই স'রে গেছে দূরে।
সুষমা! তোমারে আমি জীবনে চেয়েছি প্রতিদিন।
কামনার গাঢ়বন্ধে রাখিতে পারি নি ধ'রে। লীন
হ'য়ে গেছে অঞ্জলির বন্দী জলসম তব সুধা,
দেখা দিয়ে মরীচিকা সম শুধু বাড়ায়েছে ক্ষুধা—
অধরা দেয় নি ধরা। চুম্বনের পেয়েছি আভাস
অধর বঞ্চিত ভালে। সুনিবিড় হয়েছে পিয়াস।
শুধায়েছি—"প্রশ্নপথে আছে কি নির্ঝর-অঙ্গীকার?
আকুল আশার দোলে জ্যোতির্ময়ী করে কি বিহার?"
কে যেন গেয়েছে গান—"চাওয়ার মন্ত্রের মাঝে প্রিয়
বাঞ্ছিত ঝংকারে কাঁপে শুধু হায়, নেয় নি আজিও
সে-ঝংকার সংগীতের পূর্ণধ্বনি সার্থকতা। তবু
এনেছে সে বহি' অলোকের পূর্বরাগ কভু কভু
অন্তরের অঙ্গুরীয়-অঙ্গীকারে। হয়েছে বাগ্দান,
মেলে নি মিলনসিদ্ধি। তবু জানি—মিলেছে সন্ধান
বেদনারি আন্দোলনে বার বার।

আজি এ প্রণতি
সুরে তাই প্রার্থি : "ওগো প্রার্থনীয়, তোমার আরতি
দীপখানি রেখো মোর বেদনার মন্দিরে জাগায়ে
লক্ষ রূপোৎসব মাঝে। কলোচ্ছ্বাসে রূপেশ্বর পায়ে
রেখো মোরে ধ্যানমৌন। রেখা রঙে গানে আলাপনে
তোমার স্মরণশিখা জ্বলে যেন অনির্বাণ মনে।
যত আকর্ষণলীলা বাহিরের দিকে যায় নিয়ে
ক'রো তব কেন্দ্রমুখী। অচিহ্নিত পথে চিহ্ন দিয়ে
ক'রো ধ্রুবসুখী এ জীবন। উদ্‌ভ্রান্তির ঢেউ দোলে
নিয়ে যেয়ো গভীরের অকল্লোল শান্তিস্নিগ্ধ কোলে।

রাতদুপুর ও সকাল

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

অন্ধকার নিঝুম রাত, বজ্রপাত হ'ল
ঘুমের বুকে চমক লাগে দরজা তবে খোল।
ঝিলিক মারা আলোয় দেখ রাস্তা চলে কোথা,
গুরখা চলে টহল দিয়ে খুকরি নিয়ে ভোঁতা।
নানা রকম শহর-বাড়ি দাঁড়িয়ে সারে সার
নিঝুম সবি, কোথাও বাতি কোথাও অন্ধকার।
আলোর কালো স্তম্ভগুলো ভূতের মতো স্থির,
পাহারা যেন দিচ্ছে এরা বক্ষে রজনীর।
এঁদো গলির খোলার ঘরে হাসির কলধ্বনি
সঙ্গে তারি কেবল বাজে চুড়ির রনরনি।
ঘণ্টা বাজে রাতদুপুরে রিক্‌শ চলে ছুটে
যাত্রী যারা দেখতে তারা নেহাত বিদঘুটে।
নিমতলাতে হরিধ্বনির মুহুর্মুহু বোল,
ঘুমের বুকে চমক লাগে দরজা তবে খোল্।
পাঁচ আইনে রাতের বাবু হাজত ঘরে যান
"প্রাণের পাখি কোথায় গেল" তবুও তিনি গান।

রাত কেটেছে ট্রাম চলেছে, শহর দ্রুত নাড়ি,
ফেরেন বাবু ঘরের পথে পরনে তাঁর শাড়ি।
চক্ষু তাঁহার নেশায় রাঙা গন্ধে ভরা মুখ
লাথিয়ে ভাঙে ঘরের দুয়ার নেশার কত সুখ।
ভাঙে বাবুর নেশারি রং ঘরের দুয়ার আঁটা
গিন্নী ঘরে রাগে বিভোর হাতে তাঁহার ঝাঁটা।
চেঁচামেচির গণ্ডগোলে পাড়ার লোকে জাগে
বাবু বলেন "আর মেরো না ঝাঁটা বেজায় লাগে।"
রাত কেটেছে কাগ জেগেছে, পচা ইঁদুর টানে,
কয়লা ফেলা, গাড়ির চাকা কি সুর বল আনে।
উড়িয়া এসে কল খুলেছে রাস্তা গেল ভিজে
পড়ল চাপা ছাগলছানা গরুর গাড়ির নীচে।
ময়লাটানা মোটরগাড়ি দাঁড়ায় গলির মোড়ে
শহর জুড়ে পচা ঘ্রাণের আশীর্বাদী ওড়ে।
পাঁজর জাগা গরুর পালে গয়লা নিয়ে চলে
দুধ মিশাবে হিসেব ক'রে খাঁটি কলের জলে।
চল্ রে গরু চল্ রে ত্বরা খাঁটি বাবুর বাড়ি

রাত কেটেছে ট্রাম চলেছে শহর দ্রুত নাড়ি।
হাঁক দিয়েছে ঐ যে পথে, "মাখনগুলি চাই
টাটকা তেলের গরম পুরি আলুরদমের কাই।"
রাজপুতানী মাথায় হাঁড়ি বেচে বেড়ায় মউ
স্নানের শেষে কাপড় ছাড়ে ঘাটে নতুন বউ।
তারি পাশে সিঁড়ির ধাপে তিলক কাটে নাকে
ভক্ত সাধু গোঁসাই বাবা আমরা বলি যাকে।
সকাল হ'ল চতুর্দিকে শহর জেগে ওঠে
মাথায় ঝুড়ি সবজি ভরা মেয়ে পুরুষ ছোটে।
জগুবাবুর বাজার বড়, রুই কাতলা জড়
মাছকোটাতে জেলেদের বউ সবার থেকে দড়।
বাসী মাছের খণ্ড কেটে আচ্ছা রকম তাতে
টাটকা মাছের রক্ত ঢালে কাঁকনপরা হাতে।

আজ তবে থাকো

বন্দে আলী মিয়া

মেঘ ম্লান দিন, ব'সে আছি একা
কোনো কাজ নাহি হাতে
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যায় হেরি
আকাশের আঙিনাতে।
তুমি আসিয়াছ মোর ঘরে যদি
আজ তবে থাক প্রিয়া
সাতনরী হার গাঁথিয়া ফুলেতে
দেব গলে পরাইয়া।
তোমার নয়নে তুলি মোর আঁখি
সাধ যায় আজ চেয়ে শুধু থাকি
একটি গোপন কথা গো তোমায়
কহিব অনেক রাতে
মিনতি তোমারে শোন প্রিয়তমা
থাক আজ মোর সাথে।

চেয়ে দেখ দূরে কাশ ফুলগুলো
বাতাসেতে দোল খায়
আজ সারা নিশি শিউলি ঝরিছে
আমাদের আঙিনায়;
এমন দিনেতে আসিয়াছ তুমি
নাহি দিব যেতে আজ
তোমার মনের পরশ লেগেছে
মোর অন্তর মাঝ।
তুমি আর আমি শুধু দুইজন
মোদের ভুবনে রচিব স্বপন,
আজ সারা নিশি ঘুমাব না কভু
ব'সে রব পাশাপাশি
তুমি গান গেয়ো স্বপনের গান
আমি বাজাইব বাঁশি।

বিস্মৃবিষয়ের রোষে

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

দূরে বিস্তার ভূমি পড়ে আছে।—
ঊষর ভস্মে ঢাকা;
জমাট লাভায় ক্ষতবিক্ষত দেহ;
সঙ্গীবিহীন যাত্রীর পায়ে পায়ে
পাথরে পাথরে ব্যথাতুর ধ্বনি বাজে;
প্রখর সূর্যকরে
কুণ্ডলী ক'রে সাপেরা ঘুমায়ে আছে;
আঁধার গুহার ঘরে
শশকের দল নির্ভয়ে ফিরে আসে;—
একদা অতীতকালে
এইখানে ছিল শ্যামশষ্পের দেশ,
হরিৎক্ষেত্রে খেলে যেত সোনা-ঢেউ,
ধেনু রবে হ'ত আকাশ কলমুখর;
এইখানে ছিল প্রাসাদ, রাজোদ্যান,
কত প্রভুদের বিশ্রাম-নিকেতন,
নগরে নগরে সুন্দর সুশোভন;—
একদা কেমনে শেষে
দুর্বার গিরি আপন অগ্নি-মুখে
গৈরিক স্রাব ঢালিল বজ্ররবে,
ধ্বংসের দাপে কাঁপিল সকল ভূমি,
সব—সব হ'ল শেষ;—
আজ দেখি চারিধারে
সকল সৃষ্টি ধ্বংসে পড়ে আছে মহাধ্বংসের তলে।*

* ইটালির কবি লিওপার্ডির একটি কবিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।

নতুন পৃথিবী

শ্রীবিভূতি চৌধুরী

আজিকার পৃথিবীরে মনে হয় নিঃশব্দ জাহাজ।
রাতের সমুদ্রখানি পার হয়ে দুজনে চলেছি যেন আজ
আর এক সাগর-শেষে পাহাড়-কিনারে—
অতলান্ত আঁধারের ঢেউগুলি বাতাসেতে ভাঙিছে দুধারে।
বসে আছি পৃথিবীর জাহাজের ডেকের উপর,
আকাশে উড়িয়া চলে সাদা সাদা মেঘের শহর।
শব্দেরা স্বপ্নের দেহে এলাইয়া দিয়াছে শরীর,
মোদের মন্থর গতি—ভাল লাগে দুই চোখে নক্ষত্রের ভিড়
ঈথরের মহাদেশে নীহারিকা আলোর মিছিল,
মোদেরে ঘিরিয়া আছে আজ শুধু নীল
আঁধারের পীতাভ ইশারা,
আর এক জগত যেন কোথা আছে—পাই তার সাড়া।

নেপচুন, মার্স আর ভেনাসের দেহের কাঁপন
বায়ুর তরঙ্গ সাথে ভেসে আসে—কি যে ভাল—আশ্চর্য কেমন!
গ্রহেরা কক্ষের পথে ছুটে চলে—স্পর্শ করি সে গতির ধার,
মনে হয় কলস্বাস।—নতুন পৃথিবী কোথা হয়তো করিব আবিষ্কার,
রাত্রির সমুদ্র মাঝে নিঃশব্দে চলেছি যেন ভেসে,
মোদের নতুন সূর্য না জানি উঠিবে কোন্ দেশে।
সূর্যের পীতাভ আলো মাখি দুচোখেতে
করিব সমুদ্র-স্নান আজ ভাবি কোন্ সাগরেতে।

তন্দ্রালু রাতের আয়ু বেড়ে চলে—পৃথিবীর ছাতের উপর
ঘুমায় ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ—ঘুমাইছে নিশীথ নগর।
অরণ্যের মতো কি যে দেখা যায় বহুদূরে—মনে হয় ভাসমান দ্বীপ,
রাতের এ অক্টোপাস শত পাকে জড়াইছে—রাত নয় মহা সরীসৃপ!
জাহাজের পাটাতনে ব'সে আছি আমরা দুজন,
সমুদ্রের লোনা স্বাদ রক্তে আজ মিশে যাক, ভিজে যাক এ শরীর মন।
আমরা চলেছি ভেসে—অন্য এক পৃথিবীর হবে আবিষ্কার,
নেপচুন ভেনাসের আলোতে ভরিয়া গেছে আমাদের ক্যাবিন-দুয়ার।

সম্মুখ

শ্রীপ্রফুল্ল সরকার

দীর্ণ পৃথিবী—রক্তিম প্রেত
মৃত সূর্যের ছায়া—
সারা পশ্চিম আকাশ লাল!
সাগরের তীরে পিঙ্গল চিতা-ধূম!
দূর বন্দরে জাহাজে জাহাজে
বিস্ফোরণের বিষণ্ণ মূলতান!
বারুদ-গন্ধী অন্ধকার
দীর্ঘ রাত্রি—সুদীর্ঘ......!

খনির শূন্য বুকে
পাম্পের টান শেষ—
শেষ গাঁইতির ঘা!
মাটি দিল হাড়—
গড়ো মৃত্যুর বাজঃ
পুড়ে হ'ল ছাই
মানুষ—ধানের শিষ!

স্তিমিত শহরে
শুনছ না সাইরেন?
দিগন্তে নামে ভোর!
বোমার আগুনে
নির্মম সম্মুখ!

মরীচিকা

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

আজ মনে পড়ে বলেছিলে তুমি
আবার আসিবে ফুরালে খেলা,
জোয়ার জাগানো পরান মাতানো
মিলন-মুগ্ধ ছন্দ কাঁপানো,
বিহঙ্গগীত মুখরিত ভরা সন্ধ্যাবেলা,
বন-হরিণীর চপল লাস্যে
আবার আসিবে ফুরালে খেলা।

তোমাতে আমাতে যতনে রচিয়া
ভাসায়েছিলাম পাতার ভেলা,
সোনালী কিরণে মৃদু সমীরণে,
কুলুকুলু কল কল্লোল সনে,
তটিনীর বুকে ছিল ফুটন্ত ফুলের মেলা
যৌবন জলতরঙ্গ বুকে
ভাসায়েছিলাম পাতার ভেলা।

সান্ধ্য মেঘের আলুথালু কেশে
আজি পড়ন্ত রোদের মায়া,
পাখির পাখায় বিটপীশাখায়
নানা বরণের মাধুরী মাখায়,
স্মৃতি-মরকত মণিপদ্মের—
মুকুলে কাঁপায় স্বর্ণছায়া,
বিরহ নদীর গৈরিক তটে
শিহরে সান্ধ্য রোদের মায়া।

ঘনাল রাত্রি, তারাদের চোখে
জ্বলে সন্ধানী আলোর শিখা,
আজ কোথা তুমি; নদীতটভূমি—
তরঙ্গদল বৃথা যায় চুমি,
রুক্ষ বালুতে পরশচিহ্ন—
মুছে দিয়ে গেছ হে মরীচিকা,
স্থির গম্ভীর আকাশের চোখে
জ্বলে সন্ধানী আলোর শিখা॥

মানুষ

শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য

শতাব্দীর লোহচক্রে আজো মোরা নিষ্পেষিত মানুষেরা হই নি বিলীন,
আছে পরমায়ু আজো, দীর্ণ পঞ্জরের মাঝে আহত নিশ্বাস বহে ক্ষীণ
এখনো শুনিতে পাবে। কোমল এ রক্ত মাংস কঠিন পাষাণ চেয়ে বুঝি,
বক্ষ 'পরে পাষাণের ভারে নিশ্চিহ্ন হ'ল না তাই আজো কিছু পাবে খুঁজি।
নগরের ধূম্র নভে আমাদের নিষ্প্রভ নয়ন অন্বেষিছে নীল রেখা,
মৃত অরণ্যের স্বপ্নে মোরা ভাবি দূরে দূরে ফাল্গুনের পাই কি না দেখা।
দিনান্তের খেয়াঘাটে রাত্রি লয়ে আঁখি-আগে কাহি আজো ফুরায় নি দিন,
শতাব্দীর লোহ-চক্রে আজো মোরা নিষ্পেষিত মানুষেরা হই নি বিলীন।

জ্বলে যাওয়া কুটীরের রুধিরাক্ত ভস্মস্তূপে দেখিছ না মোরা খেলি ফাগ?
পূর্ণিমার চন্দ্র সাক্ষী, মৃত্যুমুখী আমরাও প্রেয়সীর লভি অনুরাগ।
বিভ্রান্ত বিহ্বলক্ষণে পৃথিবীর ধূলিপথে খুঁজি মোরা যৌবন-সুবাস,
দেখিতে কি পাও? আমাদেরো আছে অভিসার আছে কত প্রেম-অধিবাস!
অকস্মাৎ কোনোদিন অকারণে করি যদি মন-দেয়া-নেয়া মিছে ভুল—
সে কি বল অপরাধ? ঊষার চুম্বন চাহে নাকি ভাঙ্গা ফাটলের ফুল?
হৃত প্রণয়ের বিষে আমরাও হই জেনো জিঘাংসা-প্রমত্ত কালনাগ,
জ্বলে-যাওয়া কুটীরের রুধিরাক্ত ভস্মস্তূপে দেখিছ না মোরা খেলি ফাগ?

স্বর্ণময় ধরিত্রীর অপর্যাপ্ত আদরের নষ্ট শিশু তোমাদের দেখি
হাসি মোরা ধূলিসাৎ বুভুক্ষিত লুব্ধ নর, পরাজয় আমাদের সে কি?
ক্ষীণায়ু পুতুল হয়ে খেলাঘরে কর বাস সংঘাতের ভয়ে কম্পমান,
তৃষা-তীব্র আমরা যে তীক্ষ্ণ তলোয়ার জানি বিষ-রক্ত করিয়াছি পান;
শ্বেত সৌধে মণি-কক্ষে সভ্যতার ভীরু হিয়া স্তিমিত লজ্জায় করে বাস,
আমরা যে কাপালিক দীনতার পাত্র ভরি' পান করি অনন্ত নির্যাস।
অলক্ষ্যের জহুরী সে সত্যের নিকষ পাতি বুঝিয়াছে তোমরা যে মেকী,
স্বর্ণময় ধরিত্রীর অপর্যাপ্ত আদরের নষ্ট শিশু তোমাদের দেখি।

রাত্রি হ'ল দীপান্বিতা, দেখ দীপ্ত শিখা তার—জ্বালিয়াছি মোরা
জ্বলে জ্বলে,
তোমাদের জয়-পথে আলিম্পন দেখিয়াছ রক্ত-রাগে আঁকিয়াছি ব'লে।
দুঃসহ আনন্দ সে যে তোমাদের স্থানু-ভার ধরি মোরা বাসুকির প্রায়
আমাদের চিনিবে না চাহিবে না জানি পাছে পীতদৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে যায়।
পিঞ্জরে পোশাকী পাখি ঐশ্বর্যের খুদ-কণা ওষ্ঠ-পুটে ধরিয়াছ সুখে
অতৃপ্তির অসম্ভব অনাগত সম্ভাবনা রাখি জেনো এই শীর্ণ বুকে,
মোমের প্রদীপ মোরা ফুরায়ে ফতুর নই, রহি তবু যদি যাই গ'লে
রাত্রি হ'ল দীপান্বিতা, দেখ দীপ্ত শিখা তার—জ্বালিয়াছি মোরা
জ্বলে জ্বলে।

চন্দ্রজামাইএর জীবন কথা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রজামাইএর জীবনকথা ইতিহাস নয় কাহিনী। তাঁহার জীবনের যে ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া তাঁহার কথা বলিব সেটি ঘটিয়াছিল উনিশ শ সাত সালে। নভেম্বর মাসে, সতরই নভেম্বর। যাদবপুর অন্নপূর্ণা ড্রামাটিক ক্লাবের অভিনয়ের মধ্যে চন্দ্রকান্ত সুরেন্দ্র গড়াঞীএর গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। সে চপেটাঘাতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরিয়া গেল। আলোকোজ্জ্বল উৎসব মণ্ডপের আলোগুলি যেন নিবিয়া হইয়া গেল অন্ধকার। সুরু গড়াঞী বাপ রে বলিয়া বসিয়া পড়িল।

ম্যানেজার জামাইবাবুর বড় বড় উগ্র চোখ হইতে তখনও যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন—একবার নয় দুবার নয়, অন্তত পাঁচ শো বার বলে দিয়েছি—দেখিয়ে দিয়েছি যে, রাজা বলবে—ওরে, কে আছিস, আমার মালা আন্! একবারে যাবি না, দুবারে না, তিনবারের বার গিয়ে প্রথমেই নমস্কার করবি, তার পর মালাটি রাজার হাতে দিবি, তার পর আবার নমস্কার ক'রে চ'লে আসবি। আর ও বেটা কিনা নমস্কার ক'রে মালা নিজের গলায় প'রে চলে এল!

যাবদপুর অন্নপূর্ণা ড্রামাটিক ক্লাবের অভিনয় হইতেছিল। সুরেন্দ্র গড়াঞী নির্বাক পরিচারকের ভূমিকায় অভিনয় করিতে গিয়া উপরোক্ত কাণ্ডটি করিয়া বসিল। তুলসী কাঠের জপমালাখানি রাজার হাতে দিবার কথা—কিন্তু বিপুল দর্শক সমাবেশের দিকে চাহিয়া তাহার সব ভুল হইয়া গেল। রাজাকে প্রণাম করিয়া মালাখানি নিজের গলায় পরিয়া চলিয়া আসিল। আসিবামাত্র ওই চপেটাঘাত। থিয়েটার ক্লাবের ম্যানেজার—এই গ্রামের জামাই চন্দ্রবাবু একেই গরম মেজাজের মানুষ, তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং আত্মসংবরণ করা তাঁহার অভ্যাস নয়।

রহস্যময় রঙ্গমঞ্চের যবনিকার অন্তরালে সাজঘর—যেখানে সুন্দরী তরুণী রাজবধূ ডাবাহুঁকায় তামাক খায়, অহিংসা ধর্মের প্রচারক—চাঁচর কেশ চৈতন্য চক্ষু মুদিয়া মুরগীর ঠ্যাং চর্বণ করে; ত্রিবিদ্যাসাধনকারী ক্রোধী বিশ্বামিত্র কোমর ঘুরাইয়া নাচে, সীতা যেখানে অতর্কিত রাবণের মুখের সিগারেট কাড়িয়া লইয়া কটাক্ষ হানিয়া দিব্য টানিতে টানিতে অশোক বনে রামের জন্য বিলাপ করিতে যায়, সেই অদ্ভুত দৃশ্যে বিচিত্র চাপা কোলাহল মুখর সাজঘর এক মুহূর্তে স্তম্ভিত এবং স্তব্ধ হইয়া গেল।

সেক্রেটারি সৌরেশবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া সুরেন্দ্রকে ধরিয়া তুলিলেন—ওঠ ওঠ। সুরেন, শুনছিস?

সুরেনের চারিদিক অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান হারায় নাই। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, চোখ দিয়া তখন তাহার দরদর ধারে জল পড়িতেছে।

সেক্রেটারি সৌরেশবাবু তাহাকে ভাল জায়গায় বসাইয়া নিজেই এক কাপ চা আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—খা।

—আজ্ঞে না।

—না নয়, খেতেই হবে তোকে। ওরে মিষ্টি আন্! জলদি!

চাএর কাপটি হাতে লইয়া সুরেন বলিল—না—। আজ্ঞে না। লজ্জায় তাহার মাথা যেন কাটা যাইতেছিল।

চারিটা মিষ্টি চাএর প্লেটে ফেলিয়া দিয়া সৌরেশবাবু বলিলেন—কি করব বল্। জানিস তো বাপু, জামাই আমাদের রাগী মানুষ; বিশেষ থিয়েটারের পার্ট ভুল করলে ওর আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। বলিয়া ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে হাসিয়া সকলকে শুনাইয়া বলিলেন—আমাকে যে চড় মেরেছিল চন্দ্র, সে আমি আজও ভুলতে পারি নি। হরিশ্চন্দ্র প্লেতে চন্দ্র বিশ্বামিত্র, আমি অযোধ্যার মন্ত্রী, আমাদের খেলু সেনাপতি। আমাদের সীনের প্রথমেই বিশ্বামিত্র অযোধ্যার সিংহাসনে ব'সে বলছে,—মন্ত্রী আজ কি কি রাজকার্য আছে। মন্ত্রীর সে মস্ত পার্ট, লম্বা এক ফিরিস্তি দাখিল করবে। কিন্তু আমার তখন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে, সামনেই দেখি দাদা, কেষ্টদাদা, নীলুকাকা—যত মাতব্বর ব'সে রয়েছে। প্রম্পটার বলছে, এক বর্ণও বুঝতে পারছি না; আমি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলাম। চন্দ্র তখন খেপে উঠেছে, আবার বললে—আজ কি কি রাজকার্য আছে মন্ত্রী? আমি এক কথাতে চুকিয়ে দিলাম, আজ আর রাজকার্য কিছুই নেই। ব'লেই চন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে রক্ত জল হয়ে গেল। খেলুকে বললাম, খেলু রাত হয়েছে—চল্ বাড়ি যাই ভাত খাই-গে। বলেই দে চম্পট। চম্পট মানে একেবারে স্টেজ ছেড়ে বাড়িমুখে। কিন্তু কাদা মাখলে কি যমে ছাড়ে। অন্ধকারে চমকে উঠলাম, পেছন থেকে তখন ক্যাঁক ক'রে এসে ধরেছে চন্দ্র। একবারে ঘণ্টা দিয়ে ড্রপ ফেলে পিছনে পিছনে তেড়ে এসেছে। তার পর বুঝলে, দুটি গালে ক'ষে দুটি চড়! বাপ রে বাপ রে সে কি চড়!

ব্যাপারটা সত্যই অনেকটা লঘু হইয়া গেল। সৌরেশবাবু এখানকার জনপ্রিয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পুঁথিগত শিক্ষা না থাকিলেও সংস্কারে আভিজাত্য আছে; যাহার বলে পুরানো তবলার মত সেকেলে একতারা সারেঙ্গ হইতে আধুনিক পিয়ানো পিকলুর সহিত সমানে তাল রাখিয়া চলিতে পারেন। তিনি চন্দ্রবাবুর প্রহারটাকে এমন উপভোগ্য রহস্যের বস্তু করিয়া তুলিলেন যে, প্রহৃত সুরেনের পর্যন্ত সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাবতীয় অভিনেতার দলও হাসিয়া উঠিল। তাহাদের মনে আর বিশেষ একটা গ্লানি ছিল না। কেষ্টচন্দ্র পাত্র নামহীন রাজা-মন্ত্রী-সেনাপতি এবং বড় বড় দূত অর্থাৎ রাজদূতের ভূমিকায় অভিনয় করে—সে বলিল—ওঃ জামাইবাবুর আমাদের সূর্যির তেজ; লাটের খাতির করে না উনি! কিন্তু প্রথম শ্রেণীর অভিনেতারা—যাঁহারা সমাজেও সম্ভ্রান্ত তাঁহারা সকলে গম্ভীর হইয়াই রহিলেন।

নেপাল শী অভিনয় করে না, সীন টানে, ঈষৎ হেঁট হইয়া

হাত জোড় করিয়া তাহার কথা বলা অভ্যাস; অভ্যাস মত ভঙ্গীতে সে বলিল—আমি একবার ভুল সীন ফেলেছিলাম, ব্যস, স্টেজে ঢুকেই জামাইবাবু বেরিয়ে এসে এক লাঠি; বুড়োর পার্ট করছিলেন, হাতে লাঠি ছিল—

নেপালের কথা শেষ হইল না; স্টেজের উইংসের পাশ হইতে জমায়েত অভিনেতা, প্রম্পটার, বান্ধব সকলেই চাপা গলায় চীৎকার করিয়া উঠিল—হাঁ—হাঁ—হাঁ! ছিঁড়ল—ছিঁড়ল। গেল—গেল!

নেপাল ছুটিয়া গিয়া দেখিল একটি 'ডিসকভার সীনে' দেবীর সম্মুখে ধ্যানমগ্ন আবক্ষ শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত কাপালিকের বাহির হইবার কথা ছিল, কিন্তু বন্দোবস্তের ভুলে সম্মুখের দৃশ্যপট ও পিছনের দৃশ্যপটের মধ্যে স্থান এত সংকীর্ণ হইয়াছিল যে, সম্মুখের দৃশ্যপট গুটাইয়া উঠিবার সময় কাপালিকের দীর্ঘ দাড়িখানিকেও গুটাইয়া লইয়া উপরে উঠিতেছে। দাড়ি যাইবার ভয়ে কাপালিক দৃশ্যপটের বাঁশটাকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। উইংসের ফাঁকে দাঁড়াইয়া সকলে বলিতেছে—গেল—গেল! ছিঁড়ল—ছিঁড়ল।

কিন্তু সীনের দড়ি যাহারা টানিতেছে—তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, কেবল বুঝিতেছে দৃশ্যপটের বাঁশটি কিছুতে আটকাইয়াছে। তাহারাও সজোরে টানিতেছে। অবশেষে এক হ্যাঁচকা টান; সঙ্গে সঙ্গে কাপালিকের হাত ছাড়াইয়া দাড়ি সমেত সীন গুটাইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। কাপালিক পাকা লোক, সঙ্গে সঙ্গে তিনি দর্শকদের দিকে পিছন ফিরিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—দাড়ি—জলদি দাড়ি—কাঁচাপাকা!

দোষটা স্টেজ ম্যানেজারের। কিন্তু সে বিচার তখন চলিতেছিল না, তখন সকলে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। কেবল ম্যানেজার চন্দ্রজামাই মাথা হেঁট করিয়া রাগে ফুলিতেছিলেন। স্টেজ ম্যানেজার এখানকার বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি, অভিনেতা হিসাবে তিনি একজন রথী। সেক্রেটারি সৌরেশবাবু তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—ভাই চন্দ্র, তুমি একটু হাস, এমন মুখ গোমড়া করে থেক না।

চন্দ্র জামাই কিছু বলিলেন না, উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পার্ট আছে। তাঁহার ভূমিকার শেষ দৃশ্য। উঠিয়া গিয়া তিনি উইংসের ফাঁকে দাঁড়াইলেন।

সৌরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন—ভয়ানক চটে গেছে। পর পর দুটো খুঁত! তিনি হাসিতে লাগিলেন।

আলোচনাটা হইতেছিল প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাদের দলের মধ্যে। ইন্দ্রচন্দ্র স্থানীয় একজন বলিলেন—চটবারও কিন্তু একটা মাত্রা থাকা উচিত। ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে।

সৌরেশবাবু হাত তুলিয়া ইংগিতে বলিলেন—চুপ! তার পর আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিলেন—চন্দ্র দাঁড়াইয়া আছেন।

তাহাতেই বোধ করি বক্তার জেদ বাড়িয়া গেল, বলিলেন—আই ডোণ্ট কেয়ার। আমি লুকিয়ে বলছি না। সুরু গড়াঞীকে চড় মারা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। তা ছাড়া ওঁর ব্যবহারই ওইরকম! এর একটা প্রতিকার হওয়া দরকার। না হলে কেউ আর পার্ট করবে না। লোকে আসে এখানে আনন্দ করতে, মার খেতে নয়, অপমানিত হতে নয়। আমি এ কথা ওঁর মুখের সামনেই বলব, থিয়েটারের পর মিটিংএ সকলের সামনে কথা তুলব আমি। আমি স্পেয়ার করব না! নিরীহ গরিবদের ওপর এ রীতিমত অত্যাচার। ওরা যদি উল্টে গায়ে হাত তোলে তো কি হয়?

অন্য একজন বলিলেন—এখনই হয়ে যাক না, ডাক না ওঁকে।

চন্দ্র জামাই তখন উইংসের ভিতর হইতেই বক্তৃতা শুরু করিয়া স্টেজে প্রবেশ করিতেছেন। অভিনয় চন্দ্র জামাই ভালই করেন। উচ্চারণ আবৃত্তি সব নিখুঁত নয়, বরং চীৎকারের মাত্রা একটু অতিরিক্তই, তবু এমন প্রাণ দিয়া অভিনয় করার শক্তি দুর্লভ। শেষ দৃশ্যে চন্দ্র জামাইএর প্রাণবন্ত অভিনয়ের গুণে দর্শকেরা অভিভূত হইয়া ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল।

সেক্রেটারি সৌরেশবাবু বলিলেন—চন্দ্র কিন্তু পার্ট করে বাপ্‌ছুটিয়ে। ভাল পার্ট করছে!

ও-দিকে ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল, ড্রপ পড়িতেছে। চতুর্থ অংক শেষ হইয়া গেল।

ইন্দ্রস্থানীয় সভ্যটি ঠোঁট বাঁকাইয়া দিয়া বলিলেন—যাত্রা! ওকে থিয়েটার বলে না।

চন্দ্র জামাই আসিয়া সাজঘরে প্রবেশ করিলেন; একে একে পরচুলা গোঁফ দাড়ি সাজ-পোশাক খুলিয়া ড্রেসারকে বুঝাইয়া দিয়া আপনার জামা-আলোয়ান ছড়ি লইয়া সর্বশেষে এককোণে রক্ষিত ঝকঝকে লণ্ঠনটি তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন, ডাকিলেন—সৌরেশ!

সৌরেশ ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বাধা দিতে গেলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া উঠিবে আশংকায় তিনি নীরব ছিলেন। চন্দ্র জামাই ডাকিতেই তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন—আমাকে ডাকছ?

—হ্যাঁ। আমি চললাম। শেষ অংকটা একটু দেখে শুনে নিও, যেন গোলমাল না হয়, দুর্নাম না হয়!

—সে কি? তুমি চললে কি রকম? আমি ভাবলাম তুমি বাইরে-টাইরে—

—না বাড়ি চললাম। আমি রিজাইন দিলাম। আমাকে তোমরা এর পর থেকে বাদ দিও।

—মানে? না—না—না, চন্দ্র—

বাধা দিয়া চন্দ্র জামাই বলিলেন—মানে আমার বাঙালে গোঁ।

হাসিয়া সৌরেশ বলিলেন—ওঃ ভারী বাঙাল, আমাদের বোনের কাছে তো কেঁচো! চন্দ্র জামাইও হাসিলেন।

সৌরেশ বলিলেন—পাগলামি ক'রো না। এস—এস। তুমি না হলে চলে?

জোড়হাত করিয়া চন্দ্র জামাই বলিলেন—জোড়হাত করছি আমি, সৌরেশ। বলিয়াই তিনি পিছন ফিরিয়া হন হন করিয়া থিয়েটার স্টেজকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

সৌরেশ আর কিছু বলিলেন না। বেশ জানেন চন্দ্র জামাই থিয়েটার ফেলিয়া থাকিতে পারিবে না। তবু মনটা তাঁহার খুঁত খুঁত করিতে লাগিল।

* * * * *

চন্দ্রকান্ত কুলীন সন্তান, ভরদ্বাজ গোত্রীয়, উপাধি মুখো-

পাধ্যায়। কিন্তু এখানে তিনি চন্দ্র জামাই এবং জামাইবাবু। গুরুজনে পরোক্ষে বলেন চন্দ্র জামাই, সাক্ষাতে বলেন চন্দ্র-বাবাজী। সাধারণে বলে জামাইবাবু। এ গ্রামে জামাই অনেক আছেন, বিবাহ করিয়া এই গ্রামে বাস করিয়াছেনও অনেকে, কিন্তু জামাইবাবু বলিতে চন্দ্রকান্তকেই বুঝায়।

অন্য জামাইএরা জামাইবাবু বলিলে ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু চন্দ্রকান্তের কোনও ক্ষোভ নাই। কৌলীন্যের এই অধিকার ও মর্যাদাকে তিনি স্বীকার করেন, এ বিষয়ে অহংকার এবং দাবি তাঁহার অকুণ্ঠিত।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, তখন তাঁহার বয়স ছিল পনের। তখন হইতেই তিনি এই গ্রামে বাস করিতেছেন এবং খাঁটী জামাইরূপেই বাস করিতেছেন। এ বিষয়ে দীক্ষা তাঁহার পিতার নিকট। তাঁহার পিতার বিবাহ ছিল অনেকগুলি, সংখ্যায় কত তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া না গেলেও, হাত-পায়ের আঙুলের হিসাবের যে বহির্ভূত তাহা নিঃসন্দেহ। বাল্যকালে মাতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে থাকিতেন; মধ্যে মধ্যে বাপের সহিত তিনি অন্য মাতুলালয় ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেন। পনের বৎসর বয়সে তিনি নিজেই বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বসবাস আরম্ভ করিয়া দিলেন। উনিশ শো সাত সালেরও ত্রিশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ আঠার শো সাতাত্তর সালের ঘটনা; তখন কৌলীন্যের ঔজ্জ্বল্য মলিন হয় নাই, কিন্তু কয়েকটি অধিকার নিন্দিত হইয়া খর্ব হইতে শুরু করিয়াছে, মৈবারিণীর অঙ্গের হীরকের মত বহু বিবাহিত কুলীন পুত্রও নিন্দিত হইতেছে। চন্দ্রকান্ত সাধ্যমতে নিন্দার কাজ করিতেন না, তিনি এক বিবাহেই সন্তুষ্ট থাকিয়া এখানে বসবাস করিলেন। তাঁহার রীতি-নীতিগুলি তখনকার দিনে পরম প্রশংসার বিষয় ছিল। ভোরে উঠিয়া ঝকঝকে মাজা গাড়ুটি হাতে করিয়া তিনি প্রাতঃকৃত্যে বাহির হইতেন; লোকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে গাড়ুটির দিকে চাহিয়া থাকিত—বহু ভৃত্যের প্রভুর বাড়িতেও পিতলকাঁসার বাসনে এমন উজ্জ্বল দীপ্তি দেখা যায় না। তারপর প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া অতি উচ্চ ও-য়া, ও-য়া শব্দে প্রভাতস্বপ্নাতুর পল্লীবাসীদের জাগাইয়া তুলিয়া মুখ হাত ধোয়া শেষ করিতেন। গুরুজনে ছেলেদের বলিতেন—চন্দ্র জামাইকে গিয়ে দেখ্! ওকে দেখে শেখ্, কি আচার—কি তরিবৎ!

বাড়ি ফিরিয়া চকচকে সুপরিচ্ছন্ন রূপাবাঁধানো হুঁকাটিতে পুরা এক ছিলিম তামাক খাইয়া চন্দ্রকান্ত পরিপাটি করিয়া জামাইএর উপযুক্ত ভব্যতার সহিত কাপড়খানি পরিয়া জামাটি গায়ে দিয়া ঝাড়িয়া মুছিরা জুতাটি পরিয়া ছড়ি হাতে বাহির হইতেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি ছড়ি ব্যবহার করেন। চন্দ্র জামাইএর তখন গ্রামে পরম সমাদর ছিল, বাঙলা দেশের বহু স্থানের পরিচয় তাঁহার নখদর্পণে। এ ছাড়া তাস, পাশা দাবায় তিনি সেই বয়সেই দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক এক সময় তাঁহার এক একটা লইয়াই এক নাগাড় দুই তিন মাস কাটিয়া যাইত; একাদিক্রমে তিন মাস কোনও এক আড্ডায় প্রত্যহ প্রাতে তাস খেলিয়াই তাঁহার কাটিয়া যাইত। হঠাৎ একদিন দেখা যাইত তাঁহাকে কোনও দাবার আড্ডায়। দুই মাস পর একদিন অপর কোনও পাশার আড্ডায় গিয়া উঠিতেন। আবার সম্ভ্রান্ত মজলিসে তিন চার মাস ধরিয়া নিয়মিত গল্পই করিতেন, তখন তাস পাশা দাবার কথায় বলিতেন—ওগুলো হ'ল অত্যন্ত পাজী নেশা। ওসব অল্প স্বল্পই ভাল। কিন্তু তিন চার মাস পরে একদা কোনও আড্ডায় আসিয়া প্রথমে খেলাটা একটু দাঁড়াইয়া দেখিতেন, তার পর তামাক খাইতে বসিতেন; এক সময় দেখা যাইত চন্দ্রকান্ত খেলায় প্রত্যক্ষভাবেই যোগদান করিয়াছেন। লোকে বলিত খেয়াল। কিন্তু সে তাঁহার খেয়াল নয়, এক স্থানে যাইতে যাইতে সহসা একদিন তিনি অনুভব করিতেন যে, গৃহস্বামী এবং মজলিসের লোকেদের ব্যবহারের মধ্যে অমর্যাদার কাঁটা বাহির হইতেছে, অবহেলার ভাব সুপরিস্ফুট। অমনি তিনি উঠিয়া চলিয়া আসিতেন। পরদিন ঘুরিতে ঘুরিতে অন্য একস্থানে গিয়া উঠিতেন।

বেলা বারটার সময় বাড়ি ফিরিয়া তিনি লণ্ঠনটি সাফ করিতে বসিতেন; দু-তিন বছরের পুরানো লণ্ঠন তাঁহার হাতে নূতনের মত ঝকমক করিত। লণ্ঠনের শিখাটি জ্বলিত সুগোল সুডৌল আকারে। তার পর স্নান, স্নান করিয়া নিজে কাপড়খানি সযত্নে কাচিয়া নিজে ঝাড়িয়া মেলিয়া দিতেন, নিজে তুলিতেন। তিন চার দিনের কাপড়ও মনে হইত সদ্য পাটভাঙা। প্রথম দিকে শ্বশুরবাড়ির সকলে অনুযোগ করিতেন—হ্যাঁ বাবা, তোমাকে নাকি নিজে হাতে কাপড় কাচতে হয়?

তিনি কোনও উত্তর দিতেন না, কাপড়ও ছাড়িয়া দিতেন না; তাঁহার উগ্র চোখের দৃষ্টির সম্মুখে আর কেহ কোনও কথা বলিতেও সাহস করিতেন না। স্ত্রী অনুযোগ করিলে হাসিতেন, বলিতেন—এ আমার বাবার উপদেশ।

কাপড়খানি মেলিয়া দিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিতেন—জান, ঘি পিঁড়ে সরু চাল—এগুলো ঘর-জামাইএর পক্ষে যেমন বারণ এগুলোও তেমনি বারণ। আর ছড়ির জন্যে বল, বুড়োর মতন ছড়ি কেন? বিনা ছড়িতে শ্বশুরবাড়ি আমাদের ঢোকা নিষেধ। এ ছড়িটা আমার ঠাকুরদাদার ছড়ি।

খাওয়া-দাওয়ার পর কার্তিক মাস হইতে বৈশাখ পর্যন্ত নিদ্রা; জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত তিনি নিয়মিত হুইল ছিপ হাতে বাহির হইতেন। তাঁহার ন্যায় মৎস শিকারী এ অঞ্চলে বিরল। কিন্তু মালিক না বলিলে কখনও কাহারও পুকুরে ছিপ ফেলেন না। বেশীর ভাগই তিনি শ্বশুরদের সুবৃহৎ সাজার দিঘিতে দুপুর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একদৃষ্টে ফাতনার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন, মাথায় থাকিত একখানি ভিজা গামছা। দিঘিটা প্রকাণ্ড এবং এ দিঘির মাছও না কি প্রকাণ্ড, কিন্তু টাকপড়া মাথার দুচার গাছি দীর্ঘচুলের মত সংখ্যায় বিরল। চন্দ্র জামাই বলিতেন—মারি তো গণ্ডার।

বৎসরে দুই একটা গণ্ডার তিনি মারিতেন। স্ত্রী মাঝে মাঝে বলিতেন—মিছিমিছি কেন দিঘিতে যাও বল তো? ভাল পুকুর দেখে বসলেও তো হয়।

চন্দ্রকান্ত বলিতেন—রাম! পরের পুকুরে কোথায় যাব? মধ্যে মধ্যে তিনি পরের পুকুরেও যান; যাইবার পূর্বে

পুকুরের মালিকের ওখানে গিয়া বসিয়া পাঁচটা গল্প করিতে করিতে বলেন—খুব বড় বড় মাছ করেছ শুনলাম?

মালিক বলে—তেমন আর কি! তবে হ্যাঁ, পাঁচ সাত সের, বার-চৌদ্দ সেরও আছে কিছু।

চন্দ্রজামাই আর কিছু বলেন না। মালিক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলে—তা ধরুন না একদিন।

চন্দ্র জামাই সে দিন সরঞ্জাম করিয়া বাহির হন। ছোট মাছ তিনি মারেন না।

সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া মুখ হাত ধুইয়া লণ্ঠন হাতে তিনি আবার বাহির হন। মাছ পাইলে সে দিন বাহির হইতে বিলম্ব হয়, স্ত্রী মাছ কোটেন, চন্দ্র জামাই দাঁড়াইয়া খানার আকার কিরূপ হইবে উপদেশ দেন, কাহাকে কয়খানা পাঠাইতে হইবে পাঠাইয়া দেন; কিরূপ রান্না হইবে সে উপদেশও দেন। মাছ না পাইলে—এবং সেইটাই বেশী—তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হন।

স্ত্রী বরাবর এক প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, ভালও তো লাগে তোমার?

হাসিয়া চন্দ্রকান্ত বলেন—বেশ কেটে যায়।

চন্দ্রকান্তের স্ত্রী বড় ভাল মেয়ে, সরল শান্ত; কথার গূঢ় অর্থ তিনি বুঝিতে পারেন না। হাসিয়া চন্দ্রকান্ত লণ্ঠন ও ছড়িটি হাতে বাহির হইয়া যান। সন্ধ্যায় গান বাজনার আসর। সুকণ্ঠ না হইলেও চন্দ্রকান্তের কণ্ঠস্বর ভাল, সংগীত বিজ্ঞানেও তাঁহার দখল আছে; তাস পাশা দাবার মতই এক-একটা আসরে এক-এক সময় তিনি নিয়মিত যান আসেন।

চাকরি করিতেও তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ও তাঁহার ধাতে সয় না। সামান্য খুটিনাটিতেই তিনি চাকরিতে জবাব দিয়া দিয়াছেন। কয়েকবারের পর তাঁহাকেও আর কেহ ডাকে না, তিনিও কর্মখালির সংবাদে পা বাহির করেন না।

এ সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই উনিশ শ পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশপ্রেমে অন্য সমস্ত স্থান ডুবু ডুবু হইলেও যাদবপুর একেবারে ভাসিয়া গেল। গঠিত হইল 'বন্দে মাতরম্ থিয়েটার'; তখন থিয়েটারের বাঙলা-নাটুকেদল—নাট্য সম্প্রদায়—নিকেতন ইত্যাদি ভাল কথাগুলি আবিষ্কৃত হয় নাই। ড্রপে ছবি আঁকানো হইল ভারতমাতা চোগা-চাপকান পরিহিত হিন্দু এবং ফেজ পরিহিত মুসলমানের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নীচে লেখা হইল—হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান। গ্রামের যুবকেরা প্রতাপাদিত্যের মহলা আরম্ভ করিয়া দিল। চন্দ্র জামাইও একেবারে যুদ্ধবাদ্যে নর্তনরত যুদ্ধাশ্বের মত আসিয়া যোগ দিলেন। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাও কিছু ছিল। বিবাহের পূর্বে পনের বৎসর বয়স পর্যন্ত নিজের মাতুলালয় মুরশিদাবাদে শখের থিয়েটারে ছেলেবেলা হইতেই নারী ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। এবার তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে প্রতাপাদিত্যে সেনাপতি সূর্যকান্ত এবং হরিশচন্দ্রে বিশ্বামিত্রের ভূমিকা লইয়া মাতিয়া উঠিলেন। পনের বৎসর বিবাহিত জীবনের ঘড়ির কাঁটার মত কর্মপদ্ধতিগুলি সব বদল হইয়া গেল। চন্দ্র জামাই এমনই একটা কিছু যেন চাহিতেছিলেন। সকালে উঠিয়াই পড়ুয়া ছেলের মত বই কাগজ কলম লইয়া তিনি বসিতে আরম্ভ করিলেন। সুন্দর হাতের লেখা; বানান দুই একটা অবশ্য ভুল থাকে, কিন্তু কোনও কথাটি বাদ যায় না, মুক্তার মত হরফে পার্ট লিখিয়া যান। মোটা একখানি বাঁধানো খাতায় সুন্দর করিয়া কাগজ ভাঁজিয়া মোটা হরফে লেখেন শ্রীশ্রীপূজা উপলক্ষে বন্দে মাতরম্ থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত প্রতাপাদিত্য বা বঙ্গের শেষ বীর। তারপর ভূমিকা লিপি এবং পাশে পাশে অভিনেতাদের নাম। শেষে এক নম্বর দূত দশ পৃষ্ঠা হইতে পঁচিশ নম্বর মৃত সৈনিক দুশ পঁচিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রত্যেক ভূমিকা ও অভিনেতার নাম তিনি লিখিয়া রাখেন। একবার অভিনয় শেষ হইলে সঙ্গে সঙ্গে পরের বারের বই নির্বাচিত হইয়া যায়; সেক্রেটারি সৌরেশবাবু বই আনাইয়া চন্দ্রজামাইকে পাঠাইয়া দেন; চন্দ্র-জামাই খাতায় লেখেন...........উপলক্ষে—বন্দে মাতরম্ থিয়েটার—ইত্যাদি। নীচে কমিটি নির্দিষ্ট ভূমিকা বিতরণ অনুযায়ী নকল করিয়া যান। তার পর তিনি দূত সৈনিক চর অনুচরে নম্বর বসাইয়া পৃষ্ঠা চিহ্ন দিয়া চিহ্নিত করিয়া খাতায় লেখেন এবং পাড়ায় পাড়ায় এগুলিকে সংগ্রহ করিতে বাহির হন। কাহার কোন্ সুদর্শন ছেলেটি লেখাপড়া ছাড়িল, তাহার সন্ধান মাস্টারদের পূর্বেই রাখেন। মাস্টার হয়তো খাতায় তাহার নামের পাশে তখনও অনুপস্থিত চিহ্ন দিয়া যাইতেছেন, কিন্তু চন্দ্রজামাইয়ের খাতায় তাহার নাম ততক্ষণে লেখা হইয়া গিয়াছে। প্রতি অপরাহ্নে নিয়মিত জামাইবাবু আসিয়া ডাকেন—খুদীরাম, খুদীরাম!

ডবল সিঁথি চিরিয়া টেরিকাটা সুন্দর খুদীরাম বাহির হইয়া আসে, জামাইবাবু বলেন—যেয়ো যেন সন্ধ্যের সময়।

রাত্রে প্রয়োজন হইলে ঝকঝকে লণ্ঠন হাতে খুদীরামের দুয়ার পর্যন্ত তাহাকে তিনি পৌঁছাইয়া দিয়া যান। প্রায় অন্ধ দুকড়ি চক্রবর্তী ভাল পার্ট করে, তাহাকেও পৌঁছাইয়া দেন নিয়মিত।

দিস্তাখানেক কাগজ লিখিয়া পার্ট নকল শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একদিন সৌরেশ আসিয়া তাঁহাকে ডাকেন—চন্দ্র—চন্দ্র!

—কি খবর? কি খবর? মাছের চারা তৈয়ারি করিতে করিতেই চন্দ্রজামাই বাহির হইয়া আসেন।

—এই চিঠি দেখ ভাই। ও বইটা হ'ল না।

—হ'ল না?

—না। এই দেখ বিমল চিঠি লিখেছে, কলকাতার কারু মত হচ্ছে না ও বইএ। নতুন বই খুলেছে—সেই বই হবে।

—হুঁ। চন্দ্র কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকেন; তার পর সেই চারা হাতেই খাতাপত্রগুলি আনিয়া সৌরেশের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলেন—এই নাও।

পিছাইয়া গিয়া সৌরেশ বলেন—ও নিয়ে আমি কি করব?

—আমি আর পারব না হে! চন্দ্রকান্ত গর্জন করিয়া উঠেন। সৌরেশ হাসেন।

চন্দ্রকান্ত বলেন—এই দেখ হেসো না বলছি! আমি কারও চাকর নই।

সৌরেশ কোনও কথা না বলিয়া দ্রুতপদে সরিয়া পড়েন। অন্যথায় চড় খাইবার আশঙ্কা আছে।

দুই-তিন দিন অথবা সপ্তাহখানেক ধরিয়া আবার আরম্ভ হয় চন্দ্রজামাইএর পূর্ব জীবন; তাস পাশা অথবা দাবার আড্ডায় আবার তাঁহাকে দেখা যায়। কিন্তু সপ্তাহখানেক পরই তিনি নিজেই সৌরেশের ওখানে গিয়া ডাকেন—সৌরেশ!

সৌরেশ সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলেন—এস এস আজই ভাবছিলাম তোমার কাছে যাব।

চন্দ্র প্রশ্ন করেন—বই এল?

—এই নাও। বলিয়া সৌরেশ বই ফেলিয়া দেন, সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট ভূমিকাগুলির বণ্টন-লিপি। একবার দেখিয়া শুনিয়া বই হাতে তিনি উঠিয়া যান। পরদিন সকালে মোট বাঁধানো খাতাটা খুলিয়া পূর্বের পৃষ্ঠার কোণে লেখেন—পোস্টপণ্ড—Postpond'। অনেকবার তাঁহাকে লোকে বানানটার ভুলের কথা বলিয়াছে, কিন্তু তিনি ঐ বানানই লেখেন, বলেন—ওতেই আমার দিন চলে যাবে।

তার পর আবার লেখেন—উপলক্ষে ইত্যাদি। আবার পাড়ায় পাড়ায় বাহির হন সংবাদ দিতে। আবার দিস্তা পরিমাণ কাগজে লিখিয়া চলেন পার্টের পর পার্ট।

ক্রমে একদা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে থিয়েটার দেখাইবার উপলক্ষে 'বন্দে মাতরম্ থিয়েটার' নাম মুছিয়া লেখা হইল 'অন্নপূর্ণা থিয়েটার'; ছবির নীচেকার লেখা বাণী মুছিয়া দেওয়া হইল। ওই ছবির নীচে কি লেখা হইবে ভাবিয়া না পাইয়া জায়গাটা খালিই রাখা হইল। সাহেব আসার গোল-মালে অতিপরিচিত "একা প্রাণ কয়জনারে" গানটাও মনে পড়িল না। চন্দ্রজামাই সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; তিনি মহা উৎসাহে সকাল হইতে রাত্রি বারটা পর্যন্ত অবিরাম খাটিয়া ফিরিলেন। প্রথম দিন বেশ অভিনয় হইয়া গেল; দ্বিতীয় রাত্রে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল। চন্দ্রজামাই থিয়েটার ভাঙিবার পূর্বেই বাহির হইয়া বাড়ি চলিয়া গেলেন। বাড়ি বন্ধ ছিল, সকলেই অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন; চন্দ্রজামাই দরজার পাশেই বাঁধানো দাওয়াটির উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পরদিন থিয়েটার উপলক্ষে প্রীতিভোজন। পুরাতন বন্দে মাতরম্ থিয়েটারের এটি বরাদ্দ ছিল, নূতন অন্নপূর্ণা থিয়েটারেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার কারণ নাই। ইহার মধ্যেও চন্দ্রজামাইএর বিশেষ একটি অংশ ছিল। তিনি মাংস রান্না করিতেন। সকালে উঠিয়াই কথাটা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। নিমন্ত্রণ নিশ্চয়ই আসিবে; কিন্তু তিনি কি করিয়া সেখানে যাইবেন? ছি! না-গেলেও কেলেঙ্কারির সীমা থাকিবে না! লোকের পর লোক, ডাকাডাকি, হাঁকা-হাঁকি! শ্বশুরবাড়িও আজ তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। গত রাত্রির ঘটনায় যে অমর্যাদা তাঁহার হইয়াছে, সে এই শ্বশুরের গ্রামের লোকের দ্বারাই হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল—আর কেহ কোনও দিন তাঁহাকে বলে না—হ্যাঁ বাবা তোমাকে নাকি নিজে হাতে কাপড় কাচতে হয়!

ছড়িটি হাতে করিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন—থিয়েটারের প্রধান-শিফ্টার স্বর্ণকার নেপাল শীএর দোকানে আসিয়া ডাকিলেন—নেপাল!

—জামাইবাবু? সন্ত্রস্ত হইয়া নেপাল আসিয়া মোড়া পাতিয়া দিল। তাড়াতাড়ি তামাক সাজিতে বসিল। তামাক সাজিয়া হুঁকায় জল সাজিয়া তাঁহার হাতে দিয়া নেপাল বলিল—কাল রাত্রে—

—কালকের কথা থাক নেপাল। ও আমি চুকিয়ে দিয়েছি।

—ওরে বাপ রে! তাই হয় জামাইবাবু?

কঠিন দৃষ্টিতে চন্দ্রজামাই নেপালের দিকে চাহিলেন, বলিলেন—তোর এখানে আসা আমার অপরাধ হয়েছে। তিনি উঠিলেন। নেপাল জোড়হাত করিয়া বলিল—হেঁই জামাই-বাবু দোহাই আপনার!

নেপালের চোখ সত্য সত্যই ছল ছল করিতেছিল, চন্দ্র-বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিলেন, কিছুক্ষণ নীরবে তামাক খাইয়া আঙুল হইতে আংটিটি খুলিয়া বলিলেন—দেখ্ তো রে কি ওজন আছে?

নেপাল ওজন করিয়া দেখিল, জামাইবাবু বলিলেন—গোটা দশেক টাকা হবে?

নেপাল মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল—বেশী হবে আজ্ঞে। চোদ্দ টাকা সাত আনা হচ্ছে।

—নিতে পারবি তুই?

—আজ্ঞে? আর প্রশ্ন করিতে নেপালের সাহস হইল না।

—টাকা কিন্তু আমার এখুনি চাই। আজই চারটের ট্রেন ধরতে হবে আমাকে!

—কোথায় যাবেন? কই কিছুতো—; নেপাল সভয়ে চুপ করিল।

হাসিয়া চন্দ্রজামাই বলিলেন—অনেক জায়গা যেতে হবে রে। মামারা অনেক দিন থেকে লিখছেন। সেখানে একটা বাড়িও আমার আছে, মাতামহ দিয়ে গিয়েছেন। তা ছাড়া কলকাতাও একবার যাব। সৎ-ভাই আছে, অনেক-দিন তাকে দেখি নি। এখানে থেকে আপনার জনকে যে আর মনেই পড়ে না রে!

বাড়িতে বলিলেন—জরুরী কাজ। চিঠি আসিয়াছে।

চিঠি যে কেহ দেখিতে চাহিবে না, সে তিনি জানিতেন। যে চাহিবে সে পড়িতে জানে না। যে কোনও চিঠি তাহাকে পড়িয়া শুনাইলেই চলিবে। শুনাইলেনও তাই।—

"তুমি পত্র পাঠ চলিয়া আসিবে। তোমার ঘরখানির কোনও ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন।"

বাড়িতেই গরুর গাড়ি ছিল, আট মাইল দূরে স্টেশন। বেলা বারটায় ছইএর ভিতর হইতে বুক পর্যন্ত বাহির করিয়া চন্দ্রকান্ত চলিয়াছিলেন। খানিকটা যাইতেই দেখা হইল সম্বন্ধী স্থানীয় বনবিহারীর সঙ্গে, সে প্রশ্ন করিল—ওই, জামাই কোথা যাবে গো?

হাসিয়া জামাই বলিলেন—চিরকালই কি তোমাদের গোয়ালে বাঁধা থাকব হে? তার পর বলিলেন—মুরশিদাবাদ যাচ্ছি ভাই।

কি বিপদ, গয়ারাম ঘোষাল দাঁড়াইয়া। গয়ারামও প্রশ্ন করিল—আপনি আবার কোথায় গো?

গম্ভীরভাবে চন্দ্রজামাই বলিলেন—লাহোর।

গাড়িটা আসিয়া বাজারে পড়িল। দু পাশে পরিচিত দোকানদারের দল। ইহারা বড় খাতির করে জামাইবাবুকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহার দূত চর অনুচর এবং সেনা বাহিনীর অন্তর্গত। সকলেই উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল—জামাইবাবু, কোথায় যাবেন?

হাসিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন—চললাম বাপু দিন-কতকের জন্যে।

—কবে ফিরবেন?

—কি ক'রে বলছি বল? এখুনি কি হবে কেউ বলতে পারে?

জামাইবাবুর রসিকতা ভাবিয়া তাহারা হাসিতে লাগিল।

দুকড়ি চোখে ভাল দেখিতে পায় না, একরূপ অন্ধই; কিন্তু থিয়েটারে তাহার গভীর অনুরাগ; চেহারাও ভাল, পার্টও সে করে চমৎকার। শুনিয়া শুনিয়া সে ভূমিকা আয়ত্ত করে; সে তাঁহার নিজের হাতে গড়া অভিনেতা। নিত্য নিয়মিত তাহার হাত ধরিয়া বাড়ি আনিয়া দিয়া গিয়াছেন। সে বাড়ির বাহিরে বসিয়াছিল, কিন্তু ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য দেখিতে পায় নাই; তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—দুকড়ি, আমি চললাম হে!

—কে, জামাইবাবু? দুকড়ির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

—হ্যাঁ। একটু মুরশিদাবাদ যাচ্ছি!

দেখা হইল না কেবল সুরু গড়াঞীএর সঙ্গে। একভাবে অনেকক্ষণ থাকিয়া অস্বস্তি বোধ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া একবার ভাল করিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ঠিক সেই সময়টুকুর মধ্যেই সুরুর দোকান পার হইয়া গিয়াছে! ইহার পরই স্কুল, ডাক্তারখানা, থিয়েটারের স্টেজ। চন্দ্রজামাই ইচ্ছা করিয়াই আত্মগোপন করিয়া শুইয়া পড়িলেন। মাস্টারের দলটিকে তিনি সহ্য করিতে পারেন না। উহাদের দৃষ্টির মধ্যে একটা অবহেলা আছে। তা ছাড়া স্টেজের সম্মুখে এখন জটলা চলিতেছে—কে কেমন অভিনয় করিয়াছে তাহারই আলোচনা।

মন্থর গমনে গাড়িটা চলিয়াছিল। গাড়ির মধ্যে চন্দ্রজামাই নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়াছিলেন। চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ট্রেন। এখন?—কারে বাঁধা রুপার কুরুভাইজার ঘড়িটা বাহির করিয়া ডালা খুলিয়া দেখিলেন—বারটা কুড়ি। এখনও পুরা চারঘণ্টা পঁচিশ মিনিট। ঘণ্টায় দুই মাইল গেলেও পঁচিশ মিনিট সময় থাকিবে। কিন্তু দুই মাইলের বেশীই যাইবে ঘণ্টায়। ট্রেনটা নলহাটি পেঁছিবে সাড়ে আটটায়। ওখান হইতে ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন কখন ছাড়িবে জানা নাই, তবে একটার এদিকে নয়। ভরসার মধ্যে ট্রেনখানা দাঁড়াইয়া থাকে, শুইতে পাওয়া যাইবে। ভোর বেলায় খাগড়াঘাট, তার পর ফেরি নৌকা। ওখান হইতে শেয়াবে একখানা গাড়ি। চারি আনাই যথেষ্ট। মামাদের ওখানে পেঁছিতে বেলা আটটা।

চন্দ্রজামাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। মাতামহ নাই; মামাও গত হইয়াছেন; মামী আছেন, অনেক বৃদ্ধা হইয়াছেন। জিহ্বা এবং কণ্ঠ এখনও তেমনই সবল আছে কি না কে জানে। প্রণাম করিলেই তিনি বলিবেন—কি মনে করে গো? ঘরের দখল রাখতে নাকি? মধ্যে একবার চন্দ্রকান্ত গেলে তিনি এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। কোনও বাড়ি মাতামহ তাহাকে দিয়া যান নাই; দিয়া গিয়াছেন একখানি ঘর।

মামাতো ভাইরা বলিবে—তাই তো! একটা খবর দিয়ে তো আসতে হয়! ঘরটায় এখন—এ শুচ্ছে! আর হঠাৎই বা এলে কেন?

চন্দ্রজামাই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—ওরে ফ্যালা! একবার দাঁড়া তো!

গাড়ি হইতে নামিয়া তিনি একটা গাছতলায় বসিলেন। বলিলেন—দাঁড়া বাবা, গাড়ির মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। এখনও অনেক দেরি আছে। গরু দুটোকে দুটো খড় দে!

কলিকাতায় গেলে কি হয়? ভাইএর কাছে? ভ্রাতৃবধূটির রসনা ক্ষুরধার! তবে কোথায় যাইবেন? কোথায় তাঁহার স্থান? সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়া উঠিল শ্বশুরবাড়ির কথা।

না—না—না। পাগলের মত ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া মনে মনে তিনি উচ্চারণ করিলেন—না—না—না। আজ তিনি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছেন—সেখানে মানুষের মর্যাদাও আর কেহ তাঁহাকে দেয় না। যাহারা দেয় তাহারাও তাঁহারই মত অমর্যাদার পাত্র। ওই নেপাল শী, কেষ্টচন্দ্র পাত্র, দুকড়ি চক্রবর্তী, খুদীরাম সাহা, ওই সুরেন্দ্র গড়াঞী!

নাঃ, লোকটাকে মারা উচিত হয় নাই। কিন্তু তিনি তো তাহাকে অপমান করিবার জন্য মারেন নাই! সে ভুল করিল কেন? এত করিয়া শিখাইয়া শেষে মালাটা নিজের গলায় পরিয়া ফিরিল! ইস্ কি খুঁতটাই করিয়া দিল! একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি শূন্যমনে চাহিয়া রহিলেন।

থাকিতে থাকিতে আবার মূল চিন্তাটা তাঁহার মনে নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। কিন্তু কেন? এ অবহেলা অমর্যাদা কেন? অশিক্ষিত বলিয়া? অশিক্ষিত তো অনেকে আছে। তবে তাহারা ধনীর সন্তান! বেকার বলিয়া? বেকারও তো অনেক! তাহারা পৈতৃক অন্নপুষ্ট এইমাত্র। তবে তো একমাত্র অপরাধ ঘরজামাই বলিয়াই? কিন্তু তাহাতে তাঁহার অপরাধ কি? তিনি যখন ঘরজামাই হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন তখন তো পরম সমাদর করিয়াছিল ইহারা। শুধু ইহারা কেন? গোটা বাঙলা দেশময় সম্মান ছিল। বহু বিবাহের নিন্দা তখন হইয়াছিল; সে তো তিনি করেন নাই! তবে? এখন ঘরজামাইএর যুগ গিয়াছে, যুগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। আজ তাঁহার আপনার জন পর হইয়া গিয়াছে, পোষা মানুষের মত বসিয়া বসিয়া খাইয়া কর্মক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে, আজ তিনি কি করিবেন?

ফ্যালা ডাকিল—জামাইবাবু!

—অ্যাঁ?

—ট্যানের দের হ'য়ে যেছে গো!

—হ্যাঁ।

আবার তিনি গাড়িতে উঠিলেন। বিস্তীর্ণ পৃথিবীতেও কি তাঁহার স্থান হইবে না। কিন্তু কোথায়? গাড়ি মন্থর-গমনে চলিল। ফ্যালা গরু দুইটাকে তাড়া দিল—অ'-ই! অ'-ই!

—নেপাল!

পরদিন প্রভাতেই নেপাল দেখিল জামাইবাবু। স্মিত-বিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল—জামাইবাবু?

—ট্রেন ফেল হয়ে গেল। আবার ট্রেন আজ বিকেলে, চব্বিশ ঘণ্টা কি বসে থাকা যায়?

—বাবাঃ! পরক্ষণেই নেপাল চিন্তিত হইয়া বলিল—আবার আজ সেই আট মাইল—ওই এক বিপদ হয়েছে।

—নাঃ। কিছুদিন পরেই যাব। তামাক সাজ দেখি।

নেপাল তামাক সাজিতে বসিল। চন্দ্রজামাই আবার বলিলেন—আর ভেবে দেখলাম কি জানিস, গিয়েই বা করব কি? ঘর ভাঙছেন মা-গঙ্গা। সে কি রোখবার ক্ষমতা মানুষের? টাকা কটাই বাজে খরচ।

নেপাল হুঁকা হাতে দিল। চন্দ্রবাবু বলিলেন—সুরুকে একবার ডাকবি তো নেপাল!

নেপাল এতক্ষণে বলিল—সুরু বড় দুঃখু করছিল জামাইবাবু; বলে—আমার জন্যে জামাইবাবু—! অথচ সুরু কিছু মনে করে নাই। নিজেই বললে—মাস্টারে ছেলেকে মারে না!

—তুই একবার ডাকবি তাকে। তোর এইখানে।

—ডাকব। বাবুরাও আপনার কাছে—

বাধা দিয়া চন্দ্রবাবু বলিলেন—থাক নেপাল।

পরদিন সুরু গড়াঞী আসিলে তিনি বলিতে কিছুই পারিলেন না, জামাই মর্যাদায় বাধিল, কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সুরু তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিল।

জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত, তিন মাস পূর্বে পর্যন্ত, নেপালের ওখানেই তাঁহার সকাল সন্ধ্যা কাটিয়াছে।

* * * *

চন্দ্র জামাইএর থিয়েটার-জীবনের কথা এইখানেই শেষ। কিন্তু সম্পূর্ণ জীবন কথার আরও খানিকটা আছে। উপরের অংশটুকু আমি লিখিয়াছিলাম, অন্নপূর্ণা ড্রামাটিক ক্লাব কর্তৃক বিজ্ঞাপিত চন্দ্রকান্ত স্মৃতি সভায় পড়িবার জন্য। চন্দ্রজামাইএর জীবনের বাকিটুকু সেখানে পাঠের অধিকার ছিল না। কারণ বন্দে মাতরম্ থিয়েটারের সমাধি মন্দির অন্নপূর্ণা ড্রামাটিক ক্লাবে রাজনৈতিক কোনও কিছু প্রবেশের অধিকার নাই।

চন্দ্রজামাই শেষ কালে অসহযোগ আন্দোলনে জেলে গিয়াছিলেন। সেদিনের কথা এখনও আমার মনে আছে।

পুলিসে জনকয়েক ভলেণ্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করিলে কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি হিসাবে আমি তাহাদের মালা পরাইয়া বিদায় দিতে গিয়া আপসোস করিয়া ফিরিলাম—আমি কেন গ্রেপ্তার হইলাম না! গ্রামের নরনারী ভাঙিয়া আসিল—ফুলের মালা, খই, শাঁখ, বাকী কিছু রহিল না। বেকার যুবক কয়টির জয়ধ্বনি একেবারে আকাশ স্পর্শ করিল।

পরদিন চন্দ্রজামাই কংগ্রেস কমিটির আপিসে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন—একবার এলাম তোমার কাছে।

চন্দ্রজামাই আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। আমি সসম্ভ্রমে বলিলাম—বলুন।

—আমি তোমাদের কাজে যোগ দিতে চাই।

আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে বলিলাম এই বয়সে;—

হাসিয়া চন্দ্র জামাই প্রশ্ন করিলেন—যুদ্ধের মত বয়সের কোনও নিয়ম আছে নাকি তোমাদের?

—না—তবে----।

—তবে আর আপত্তি ক'রো না শিবু।

অনেক বুঝাইলাম—কিন্তু কোনও মতেই শুনিলেন না চন্দ্রজামাই। অবশেষে একদিন তিনি গ্রেপ্তার হইলেন। আমি তাঁহার পূর্বেই গ্রেপ্তার হইয়াছিলাম। আমি চোখে দেখি নাই তবে নেপাল হইতে ভদ্র সমাজ পর্যন্ত সকলেই যে সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ। জেলগেটে যখন তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম, তখন তাঁহার মুখে স্মিত হাসি, গলায় ফুলের মালার বোঝা। উঁচু মাথায় তিনি জেলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সে মুখের ছবি জীবনে ভুলিব না। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি অভিবাদন করিয়া বলিলেন—বন্দে মাতরম্!

তাহার পর জেলে তিনি অনেক কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু সেকথা ঘটনায় পরিণত কাহিনী নয়।

জেল হইতে বাহির হইয়াই চন্দ্রজামাই মারা যান।

অন্নপূর্ণা ড্রামাটিক ক্লাব কর্তৃক বিজ্ঞাপিত স্মৃতি সভায় কিন্তু চন্দ্রজামাইএর জীবনকথা আমার পড়া হয় নাই। সভায় সংক্ষেপে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নাট্য সাহিত্যে হাস্য রসের একটা জোর আলোচনায় সভা জমিয়া উঠিয়াছিল।
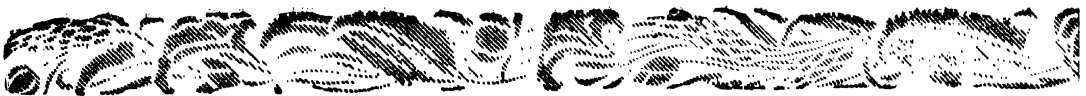
আধুনিক যুদ্ধে বেতার

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বেতার আধুনিক যুদ্ধের এক অপরিহার্য অঙ্গ। যুদ্ধে কত কার্য যে ইহা দ্বারা সাধিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতি যুদ্ধ জাহাজে থাকে বেতারযন্ত্র; অপার সমুদ্রবক্ষে থাকিয়াও ইহার সাহায্যে জাহাজগুলির সংবাদ আদানপ্রদানে কোনও অসুবিধা হয় না। ডুবোজাহাজগুলিও বেতারযন্ত্র বক্ষে ধারণ করিয়াই যত্রতত্র বিচরণ করে; বিপদে পড়িলে বেতার সাহায্যে স্বপক্ষকে সংবাদ জানায়। আকাশে বিমান ওড়ে, তাহার কক্ষে থাকে বেতারযন্ত্র। শত্রুর সমরায়োজনের চিত্র গৃহীত হয় বেতারে। প্যারাশুট-সৈন্যেরা ভূতলে অবতরণ করে সঙ্গে এক একটি বেতারযন্ত্র লইয়া। যান্ত্রিক বাহিনীর সম্মুখদিকে মোটর-সাইকেল-আরোহী সৈন্যদের সঙ্গে থাকে বেতারযন্ত্র; বিপদের ইঙ্গিত পাইলেই সংকেতে তাহারা পশ্চাৎ দিকস্থ বাহিনীকে সংবাদ দেয়। এতদ্‌ব্যতীত প্রত্যেক

একটি ক্রুজার ট্যাঙ্কের মধ্যে বেতারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যান্ত্রিক বাহিনীর সঙ্গেই থাকে বেতারযন্ত্রবাহী গাড়ি। বেতারে সেনানায়কগণ আদেশ ও নির্দেশ দেন, কূটনৈতিকগণ যুদ্ধের প্রচারকার্য চালান। বিংশ শতাব্দীতে বেতার রণদেবতার অন্যতম প্রধান বাহন।

যুদ্ধের সময় বেতার যে কি করিতে পারে, কয়েকটি উদাহরণ দিলে তাহা বুঝা যাইবে। বেতার সকলেই ব্যবহার করে, কিন্তু ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানি উহার সাহায্যে যেমন তাহার কার্যোদ্ধার করে, তেমন আর কেহ পারে নাই। যুদ্ধ বাধিবার পর যে সকল দেশ জার্মানির কবলে পড়ে তাহার প্রায় সবগুলিতেই জার্মানি বেতারের বিশেষ সাহায্য লয়। সকল দেশের বিবরণ দিয়া ফিরিস্তি লম্বা করিয়া লাভ নাই, একমাত্র পোল্যাণ্ডের কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিলেই ব্যাপারটা উপলব্ধি হইবে।

পোল্যাণ্ডে জার্মানি নানা কৌশলে বেতার সাহায্যে প্রচারকার্য চালাইয়াছিল যুদ্ধের বহু পূর্বেই। তার পর যুদ্ধের সময় পূর্ণমাত্রায় সে উহার সুযোগ গ্রহণ করে। পোল্যাণ্ডবাসীরা যখন প্রবল বিক্রমে তাহাদের রাজধানী ওআর-স রক্ষায় নিযুক্ত তখন বেতারে এক অপরিচিত কণ্ঠে বলিতে শোনা গেল—ওআর-স বাসীরা যেন জার্মানদিগকে বাধাদানে নিরস্ত হয়। তাহার মুখে একেবারে খাঁটী পোলভাষা, আবার সে কখন বেতারে বলিবে তাহার সময়টিও সে বলিতে ছাড়িল না। কিন্তু পুনরায় বলার সুযোগ আর তাহার হইল না; পোল্যাণ্ডের গোয়েন্দারা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। দেখা গেল, ওআর-স নগরীর উপকণ্ঠে একটি গুপ্ত জার্মান বেতার ঘাঁটি বসানো হইয়াছে। সেখান হইতেই পোলদিগকে ঐভাবে বিভ্রান্ত করা হইতেছিল।

প্রাগা শহরের উপকণ্ঠেও একটি হ্রস্বতরঙ্গের জার্মান বেতার-প্রেরকযন্ত্র পাওয়া যায়। উহা ছিল একজন জার্মান গুপ্তচরেরই বাড়িতে। উক্ত গুপ্তচর পোল পরিচয়ে বহুদিন যাবৎ পোল্যাণ্ডে অবস্থান করিতেছিল। যত দিন পোল্যাণ্ডে যুদ্ধ চলিয়াছিল, তত দিন তাহার বাড়ি হইতে উক্ত বেতারযন্ত্র সাহায্যে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া এবং নানাভাবে গুজব রটাইয়া পোলদিগের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করা হইত। যুদ্ধ বাধিবার পূর্বে এই গুপ্তচর একজন সাধু ব্যবসায়ী হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিল। পোল্যাণ্ডের পরম স্বদেশভক্ত বলিয়া সে নিজের পরিচয় দিত।

পোল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে জার্মান গুপ্তচরেরা যাইয়া নানাভাবে ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছিল। বিশেষ করিয়া বেতারযন্ত্রের ব্যবসাটা যেন তাহাদের একটু বেশী রকম জমিয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সুযোগ সুবিধামত পোল্যাণ্ডের বেতারযন্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট যন্ত্রের উৎকর্ষের জন্য দুই একটি জার্মান কলকব্জা ব্যবহারের পরামর্শ দিত। পরামর্শে ফলও ফলিল। জার্মানির কোনও এক বিশিষ্ট বেতারযন্ত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পোল্যাণ্ডের সামরিক বিভাগ হইতে ওই সকল কলকব্জার ফরমাশ পাইল। মালগুলি সরবরাহ করা হইল এবং জার্মানরা সেই সুযোগে জানিয়া লইল, পোল্যাণ্ডে কি কি ধরনের কতগুলি বেতার প্রেরকযন্ত্র কোথায় কোথায় আছে। জার্মানির গুপ্তচর বিভাগের খুবই সুবিধা হইয়া গেল।

পোল্যাণ্ডবাসী জার্মানদিগকে বেতার গ্রাহক ও প্রেরক দুই প্রকার যন্ত্রই সরবরাহ করা হইল। তৎসাহায্যে তাহারা অনবরত ভীতিপূর্ণ মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া পোলদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করিতে লাগিল। শক্তিশালী প্রেরকযন্ত্রগুলি বসানো হইল বড় বড় শহরের উপকণ্ঠে। জার্মানির সেনাপতিমণ্ডল ও জার্মান বিমান-

বিভাগের সহিত থাকিত সেগুলির যোগসূত্র। পোলদের ঘরের কোণেই গাড়িল তাহাদের শত্রুরা আস্তানা।

তাহারা সেখানে বসিয়া মিথ্যা প্রচারকার্য তো চালাইতই, অপর
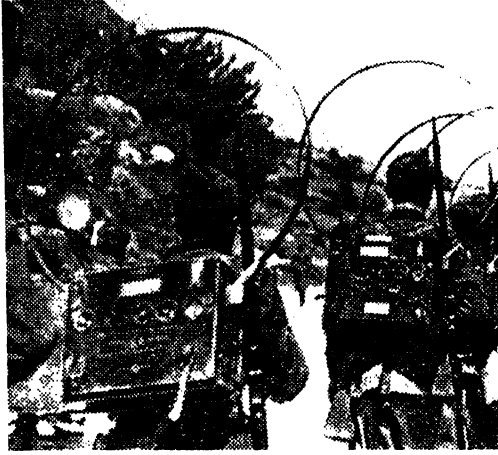
সৈনাদল পোর্টেবল রেডিও সেট পৃষ্ঠে বহন করিতেছে। ইহা আবিসিনিয়াতে প্রথম ব্যবহৃত হয়।

দিকে পোল্যান্ডের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলির সংবাদ তাহারা স্বপক্ষকে পাঠাইত। অনেক গুপ্ত স্থানের কথা তাহারা ফাঁস করিয়া দিল; ফলে জার্মান বিমান বাহিনী চালাইল সেগুলির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ। বনে জঙ্গলে পোল্যান্ডের এমন কতকগুলি ট্যাঙ্ক লুক্কায়িত ছিল যেগুলি আকাশ হইতে দেখা একেবারেই অসম্ভব। জার্মান গুপ্ত বেতারঘাঁটিগুলি হইতেই সেগুলির সন্ধান দেওয়া হয় এবং তদনুসারে জার্মান বোমারু বিমান আসিয়া সেগুলির উপর বোমা ফেলে। বেতারে না বলিলে সেগুলির সন্ধান পাওয়া জার্মান বৈমানিকদের পক্ষে দুষ্করই ছিল।

পোল্যান্ডের কোনও শহর জার্মানদের হস্তগত হইবার পরই সর্বপ্রথম তাহাদের কাজ ছিল সেখানকার বেতারঘাঁটির পোল কর্মচারীদিগকে সরাইয়া সেই স্থলে এমন সব জার্মান নিয়োগ করা হইত যাহারা পোল ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারে। তার পর পোল-ঘাঁটিগুলির সহিত জার্মান ঘাঁটিসমূহের যোগাযোগ স্থাপন করা হইত।

এইভাবে সমগ্র পোল্যান্ডে জার্মানরা তাহাদের অভিযানকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য নানাপ্রকারে বেতারের সাহায্য লয়। জার্মানির 'ব্লিট্‌জ্‌ক্রীগ' বা ঝটিতি-যুদ্ধে বেতার একটি প্রধান অবলম্বন।

যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেতারকে কাজে লাগাইবার আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বায়ুমণ্ডলের খোঁজখবর রাখা যুদ্ধের সময় অনেক কারণেই দরকার। বিমান প্রেরণ, লম্বা পাল্লার কামান দাগা, সমুদ্রবক্ষে জাহাজ চলাচল প্রভৃতি নানা প্রয়োজনে আবহতত্ত্ব না জানিলে চলে না। ভূতলে বসিয়া নির্ঝঞ্ঝাটে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরের এই খবর লইবার জন্য বিজ্ঞানীরা এক নূতন কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। আকাশে বেতার-বেলুন উড়াইয়া তাঁহারা বায়ুমণ্ডলের অবস্থা জানিয়া লন।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। আবহ-ঘাঁটিগুলি হইতে ছোট ছোট সব বেলুন বহু ঊর্ধ্বে উড়াইয়া দেওয়া হয়। বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরের চাপ ও তাপ পরীক্ষার জন্য উক্ত বেলুনগুলিতে হ্রস্ব তরঙ্গের বেতার-প্রেরকযন্ত্র সংযোজিত থাকে। বেতারযন্ত্রের সঙ্গে যে তাপমানযন্ত্র ও চাপমানযন্ত্র থাকে তাহার প্রতিটি ক্রিয়া ভূতলস্থ বেতার-গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়ে। আবহতত্ত্ববিদ্‌গণ ভূতলে বসিয়াই বুঝিতে পারেন বায়ুমণ্ডলের কোন্ স্তরের চাপ ও তাপ কত। সঙ্গে সঙ্গেই সেই তাপ ও চাপের চার্ট প্রস্তুত করা হয়।

বায়ুমণ্ডলের একটা নির্দিষ্ট লোকে উঠিলেই বেলুনগুলি ফাটিয়া যায়। বেলুন ফাটিলেই একটি ছোট প্যারাশুট খুলিয়া যায় এবং সেই প্যারাশুটটি তখন বেতারযন্ত্রটিকে লইয়া ভূতলে অবতরণ করে। প্যারাশুট সাহায্যে ভূতলে নামে বলিয়া বেতার-যন্ত্রের কোনও ক্ষতি হয় না। যাহারা এই বেতারযন্ত্র কুড়াইয়া আবহ-ঘাঁটিতে জমা দেয় তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

ইউরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অন্তরীক্ষে বিমান এবং স্থলে ট্যাঙ্কবহর বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে। অবিরাম গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যে এইসকল চলন্ত লৌহদুর্গের অভ্যন্তরে বসিয়া এইগুলিকে সুশৃঙ্খল অবস্থায় পরিচালনা করাও কম বিস্ময়কর ব্যাপার নয়! নৌবহরে যেমন 'ফ্ল্যাগশিপ' হইতে নিশান দেখাইয়া বিভিন্ন রণ-পোতকে নির্দেশ দেওয়া হয়, ট্যাঙ্কবহরেও তেমনই নিশান সাহায্যে সংকেত করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যুদ্ধ যেখানে প্রচণ্ডভাবে চলে সেখানে নিশান দেখাইয়া সংকেত করা চলে না; বিশেষত ট্যাঙ্কগুলি যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে তখন সংকেত করার একমাত্র উপায় হইল বেতার।

ট্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ স্কোয়াড্রনে বিভক্ত থাকে। বার চৌদ্দটি ট্যাঙ্ক লইয়া এক একটি স্কোয়াড্রন গঠিত হয়। প্রতি স্কোয়াড্রনের জন্য এক একজন নায়ক থাকেন। তাঁহারই আদেশ অনুসারে ট্যাঙ্কগুলি চালিত হয়। সেই আদেশ বিভিন্ন ট্যাঙ্কে পৌঁছাইবার জন্য দরকার হয় নিশান বা বেতারের। নায়কের ট্যাঙ্কে এই কাজের জন্য একজন চীফ অপারেটর থাকেন। তিনি স্কোয়াড্রনের বিভিন্ন ট্যাঙ্কে সাংকেতিক উপায়ে নায়কের নির্দেশ পৌঁছাইয়া দেন এবং তদনুসারে ট্যাঙ্কগুলি সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে থাকে। তাঁহার কাজের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

প্রত্যেক ট্যাঙ্কেই একটি করিয়া উৎকৃষ্ট বেতারযন্ত্র থাকে। যুদ্ধের সময় চোট লাগিয়া বেতার যন্ত্রগুলি বিগড়াইয়া না যায় তজ্জন্য ঐগুলি রবারের উপর বসানো হয়। এতদ্ব্যতীত আরও এমন সব বৈজ্ঞানিক কৌশল আছে যাহাতে ট্যাঙ্কের গায়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগিলেও সেই আঘাত যাইয়া বেতারযন্ত্রে তেমনভাবে পৌঁছায় না।

মোটর বাইকের পিছনে রেডিও সেট।

অত্যন্ত দৃঢ়মন না হইলে কেহ ট্যাঙ্কে বেতারযন্ত্রচালকের কাজ করিতে পারে না। বাহিরের ঘটনাবলীর প্রতি দ্রূক্ষেপ করিবার অবসর তাহার নাই; বেতারযন্ত্রের কাছে নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া তাহাকে কাজ করিতে হয়। লৌহদানবের উদরে বসিয়া তাহার একমাত্র কর্তব্য হইল নায়কের নির্দেশ শ্রবণ ও বার্তা প্রেরণ।

মাঝে মাঝে ইহাদিগকে কিরূপ বিপদে পড়িতে হয় নিম্নের ঘটনাটি হইতেই তাহা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

কিছুদিন পূর্বে ফ্রান্সের সোম অঞ্চলে জার্মনবাহিনীর সহিত মিত্রশক্তির যখন লড়াই হয়, তখন মিত্রপক্ষের একটি ক্রুজার ট্যাংক তাহার দল ছাড়া হইয়া পড়ে। তিনটি জার্মন ট্যাংক তাহার
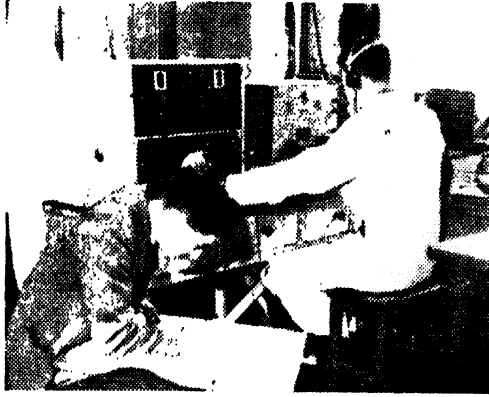
বেতার যন্ত্রে আবহাওয়া সংবাদ সংগ্রহ করা হইতেছে

উপর আক্রমণ চালায়। ক্রুজার ট্যাংকটি বিপক্ষের তিনটি ট্যাংকের সহিত একসঙ্গে না লড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এক একটির সহিত লড়িতে থাকে। কিছুকাল পর জার্মনদের বড় ট্যাংকটি অকেজো হইয়া পড়ে এবং দ্বিতীয়টিও খোঁড়াইতে আরম্ভ করে। ক্রুজার ট্যাংকটিরও বিপদ কম হয় না; শত্রুর গুলিতে উহার একজন চালক নিহত হয়। একমাত্র অক্ষতদেহে থাকে তখন ট্যাংকের সিগন্যালার বা বেতারযন্ত্রচালক। সে তখন তাহার আসন ত্যাগ করিয়া ট্যাংক-চালকের আসনে যায় এবং বেপরোয়া হইয়া বিপক্ষের মধ্য দিয়াই ট্যাংকটিকে চালাইয়া দেয়। একজন আহত সহকর্মীর সাহায্যে সে জার্মনির তৃতীয় ট্যাংকটিকেও কাবু করে এবং বিপক্ষের মোটর-সাইকেল আরোহী একদল সৈন্যকে অতিক্রম করিয়া একটি পরিখা পার হয় এবং অবশেষে যাইয়া স্বপক্ষে পেঁছায়। ট্যাংকটির এক দিকের চাকা অর্ধেকটা ছুটিয়া যায় এবং শত্রুর গুলিতে উহার বর্মাবৃত দেহে বহু ছিদ্র হয়।

কাজেই দেখা যায় ট্যাংকের বেতারযন্ত্রচালকদের কেবল সিগন্যালারের কাজ করিলেই চলে না, দরকার হইলে ট্যাংকচালকের কাজও করিতে হয়।

বেতার সাহায্যে বিমানগুলিও কম কাজ করে না; পর্যবেক্ষক বিমানগুলি উড়িয়া উড়িয়া শত্রুর গতিবিধির সমস্ত সংবাদ স্বপক্ষের সামরিক ঘাঁটিতে পাঠায়। তাহাদের সংকেতের উপর নির্ভর করিয়াই অনেক সময় লক্ষ্য স্থির করা হয় এবং তদনুসারে গোলন্দাজগণ দূরপাল্লার কামান দাগে।

যুদ্ধকে বেতার ভবিষ্যতে কোথায় লইয়া যাইবে ঠিক নাই। বেতারে বিমান চালাইবার চেষ্টা চলিয়াছে; একদিন হয়তো রেল, স্টীমার মোটরগাড়ি প্রভৃতি যাবতীয় যানবাহনই বেতারে চালিত হইবে। সেইদিন যুদ্ধে মানুষে মানুষে মুখোমুখি হইবার বিন্দু-মাত্রও সম্ভাবনা থাকিবে না; শত সহস্র মাইল দূরে বসিয়া বেতার সাহায্যে একে অন্যের প্রতি মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করিবে। কে জানে সেই দিন মানুষের হাতে ধরা দিবার জন্য আকুলিবিকুলি করিতেছে কি না!

বিপত্নীক

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

(গল্প)

যদুনাথ মুখুজ্যে এতদিনে লাঠি ধরলেন। তবু সোজা হয়ে বুক টান ক'রে চলাফেরা করার দিন তাঁর শেষ হয় নি। এখনও তিনি শক্ত রয়েছেন। অন্তত নিজে তা-ই মনে করেন।

গৃহিণী কাদম্বিনী কিন্তু কাবু হয়ে পড়েছেন অনেক আগেই। তা বয়েসও তো বড় কম হ'ল না। আজ ঘরে তাঁর নাতি নাতনীই ডজন দেড়েক।

যদুনাথ মুখুজ্যের তিরিক্ষি মেজাজে সারা সংসার যেন তটস্থ। অবশ্য আর সকলের সঙ্গে চলায় বলায় তিনি ঠিক তেমনটিই আছেন। বুড়ো বুড়ো ছেলেদের আজও বাসায় ফিরতে একটু রাত হ'লে চঞ্চল হয়ে ওঠেন; মেয়েদের চিঠি পেতে দু দিন দেরি হয়ে গেলে চিন্তিত হন আগেরই মত; পুত্রবধূদের অসুখবিসুখ হ'লে বাড়ি সুদ্ধ যেন মাথায় ক'রে তোলেন; নাতি আর নাতনীদের আবদারে আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েও হৃষ্ট থাকেন সর্বক্ষণ।—এ দুনিয়ায় যত অপরাধ করেছেন শুধু বাড়ির গৃহিণী। সত্যই, সময় নেই অসময় নেই কাদম্বিনীর উপর যদুনাথ মুখুজ্যে মারমুখ হয়েই আছেন।

বয়েস হ'লে নাকি মেজাজটা হয় রুক্ষ। কথাটা নেহাত মিথ্যা নয়। তার উপর মাঝে মাঝে দেখা দেয় বাতের ব্যথা। সে কথাও বিবেচনা করতে হয়! তাই ব'লে এত?

ইদানীং কথার পৃষ্ঠে কথা বলতে গৃহিণীও শুরু করেছেন। কত আর সহ্য করা যায়! ঘর ভরতি নাতি আর নাতনী, ছেলে আর ছেলের বউরা—চুপ ক'রে থাকারও একটা সীমা আছে। এই বুড়ো বয়েসে সবার সামনে যা মুখে আসে তাই ব'লেই পার পেয়ে যাবে নাকি!

ফলে, বুড়োবুড়ীর ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। দেখে শুনে সব কিছুই গা-সওয়া হয়ে যায়। তাই বাড়ির লোক ও নিয়ে এখন আর মাথা ঘামায় না।

বড় ছেলে সুধীনের সূক্ষ্ম বুদ্ধির সুনাম আছে। একদিন স্ত্রীকে রাত্রিবেলা জলের মত বুঝিয়ে দিলেন, "আসলে কি জান! বাবা আমাদের আর তেমন আপন মনে করেন না। তাঁর রাগবার অধিকার আছে শুধু মায়েরই উপর। দেখছ না, যত ঝড়-ঝাপটা যাচ্ছে মায়ের উপর দিয়েই।"

বিজয়া মনে মনে বলল, তা মাও তো বড় কম যান না—অবশ্য মুখে জানাল, "কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা থাকা চাই তো।"

"বুড়ো বয়সে অমন হয়েই থাকে। কথায় বলে না, বুড়ো হ'লে আবার ছেলেমানুষ হয়।"

"ছেলেমানুষ কি গো, এ যে মেয়ে মানুষের বাড়া! 'বুড়ী' 'মুখপুড়ী' 'রাক্ষুসী'—পুরুষ মানুষের মুখে এ আবার কেমনধারা কথা? আর তোমরাও হয়েছ সব নির্বিকার পরমব্রহ্ম। মা কাল বিকেলে ব'সে ব'সে চোখের জল ফেলছিলেন।—তোমরা কেউ কিচ্ছু ব'লো না বাবাকে।"

"খেপেছ! তাতে হবে হিতে বিপরীত।"

সেদিন বিকেলে।

মেজো ছেলের মেজো মেয়ে টুনী—ঠাকুরদার বড় আদরের নাতনী, এসে ধ'রে বসল, "দাদু, অনেক দিন আমাদের পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাও নি। চল আজ।"

বার কয়েক আপত্তি জানিয়ে যদুনাথ রাজী হন। বললেন, "ডাক্ সবাইকে—টুলু, বুলু, মিণ্টু, ময়নাদের ডেকে নিয়ে আয়।"

কাদম্বিনী বিপুল দেহভার নিয়ে মেঝের উপর থাবড়ি খেয়ে ব'সে সন্ধ্যা প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছিলেন। নাতনীকে পিছু ডাকেন, "এই টুনী, তোদের সাহস তো বড় কম নয়। দু-দুটো বড় রাস্তা পার হতে হয় তা জানিস? তোদের এত-গুলোকে সামলাবে কে শুনি?"

"তা নিয়ে আর একজনের অত মাথা বাথা কেন।"—যদুনাথও বললেন পরোক্ষ কায়দায়।

টুনী এখন দৃষ্টির আড়ালে। তবু কাদম্বিনী গলা ছেড়ে বলতে থাকেন, "টুনী, ভজুয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাস। নইলে—"

"নইলে তোমার চোদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধের কাজ বাকী থাকবে," যদুনাথ এবার ঝাঁজিয়ে উঠলেন, "সবতাতেই বাড়াবাড়ি। নিজে যেমন জবুথবু হয়ে ঘরে বসে থাকবে, সবাই যেন তাই।"

"হুঁ, একদিন পড়ুক একজন মোটর চাপা, বুঝবে তখন! নিজেকে কে দেখবে তার নেই ঠিক, সে আবার একপাল ছেলে-মেয়ে সামলাবে। তবেই হয়েছে।"

যদুনাথ আরও চটে যান। ঝকঝকে বাঁধানো দাঁতে স্ত্রীকে ভেঙচে ওঠেন, "না, লোক আর বাইরে বেরুবে কেন, ওর মতো রাতদিন মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে কেবল পান চিববে।"

"অঃ! কত আমি বসে বসে খাই," কাদম্বিনীও ফোঁস ক'রে ওঠেন। একটাও দাঁত না থাকায় মুখ ঝামটা দিতে ভরসা পান না। বলে চললেন, "রাতদিন খেটে রক্ত উঠে মরি, আর বলে কিনা— চোখের মাথা খেয়ে বসেছ, দেখবে আর কোত্থেকে?"

"মুটকী বুড়ী!"

ও-ঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে সেজো বউ মুখে আঁচল চাপা দেয়। রাগে আর লজ্জায় কাদম্বিনীর সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। তিড়বিড় করে উঠলেন, "আজ আর যেন বাড়ি ফিরে এসো না, রাস্তায় লরি চাপা প'ড়ো।—মুখের এতটুকু লাগাম নেই! ছেলের বউ মুখে আঁচল তুলে হাসে। মান অপমানের জ্ঞানটা পর্যন্ত নেই।"

ছেলেপিলের দল কলরব করে ঠাকুরদাকে ঘিরে দাঁড়ায়।

"আমি তোদের নিয়ে যেতে পারব না," যদুনাথ নাতি-নাতনীদের উপলক্ষ করে বলেন, "ঐ ধুমসী বুড়ীর সঙ্গে যা—সে-ই তোদের বেড়িয়ে আনবে। আমাকে কোথাও একটু বেরুতে দেখলে ওর চোখ টাটায়।"

"আমি ধুমসী, আমি মুটকী! ভগবান আছেন না?—এক পা তো বাতে ধরেছে, সারা অঙ্গ অসাড় হয়ে থাকবে, বলে রাখছি।"

কথাগ্লো গৃহকর্তার কানে গেল না। হইচই করে সিঁড়ির পথটা মাথায় তুলে শিশ্পাল তখন নীচে নামছে।

কাদম্বিনী নিষ্ফল আক্রোশে গজ গজ করতে থাকেন।

সন্ধ্যাবেলা আবার তেমনি হইচই করে শিশ্বাহিনী বাসায় ফেরে।

যদ্নাথ ম্খুজ্যের ম্খে হাসি, ব্কে গর্ব। সারা সংসার নিয়ে ঘ্রে বেড়িয়ে আসতে আজও কোনও ভজ্য়ার দরকার হয় না।

কিন্তু গ্প্ত কথাটা ব্যক্ত হতে দেরি হল না। বড় ছেলের ঘরের মেজো নাতনীটি ঠাকুরমার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলতে থাকে, "ঠাক্মা! দাদ্ আজ আর একটু হলে লাঠি পিছলে পড়ে গেছল আর কি!"

বিজয়া চাপা গলায় মেয়েকে ধমকে ওঠে, "চুপ কর্ ম্খ-প্ড়ী! তোর দাদ্ আসছে!"

"কি বলছিস রে মেজো গিন্নী?" যদ্নাথ এক গাল হেসে এগিয়ে আসেন।

বোকা মেয়ে নীল্ কথাটা ম্খের উপরেই বলে ফেললে, "হ্যাঁ দাদ্, তুমি ফুটপাথে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলে না?"

"দ্র পাগলী!"

"মিথ্যে বলো না দাদ্! টুনীদিও দেখেছে, ডাক তাকে।" কাদম্বিনী অমনি মন্তব্য শ্র্ করলেন, "তা আমি আগেই জানতুম।—নিজে যায় ক্ষেতি নেই, কিন্তু এই কলকাতার রাস্তায় কচিকাঁচাগ্লো নিয়ে একদিন একটা অনর্থ ঘটিয়ে তবে ছাড়বে!"

"হ্ঁ, তোমার মতো প্তুপ্তু করে ঘরে বসে থাকব কি না! কুঁড়ের বাদশা।"

"দ্যাখো, রাতদিন অমন গতরের খোঁটা দিয়ে কথা ব'লো [illegible], বলে রাখছি।"

"গতর কি আর আছে? শ্য়ে বসে খেয়ে খেয়ে অসাড় হয়ে গেছে। একটু নড়ে চড়ে বসতে যেন পয়সা খরচ হয়। দিনের পর দিন ফুলছ কি সাধে!"

"ভাল হবে না বলছি। ছেলেরা আমার বড় হয়েছে। ঘর ভর্তি আজ নাতি নাতনী। ভয় করে কথা বলবার দিন আর নেই জেনো।"

"ইডিয়ট!"—যদ্নাথ বকবক করতে করতে চলে গেলেন নিজের ঘরে।

এমন খণ্ডয্দ্ধ প্রায়ই বাধে।

দ্রে দ্রে ব্ড়ো ব্ড়ী থাকেন বেশ। ম্খোম্খি হলেই যত গণ্ডগোল। কি কথায় কি কথা এসে পড়ে। শ্র্ হয় গর্জন আর বর্ষণ। তবে দ্ দণ্ড বাদেই আকাশ আবার পরিষ্কার হয়, এই যা রক্ষা।

রাত্রিবেলা বারান্দায় সবাই খেতে বসেছে। যদ্নাথের অর্ধেক খাওয়া হতে না হতেই টুনী তার ঠাকুরদার সঙ্গে খেতে ব'সে যায়।

ভোজনেরও যে ওজন আছে সে কথা লোকটা ভুলে গেলেও বাড়ির লোকের তো ভাল মন্দের ভয়ডর আছে! বউমারা তো লজ্জায় কিছ্ বলে না। তাই লজ্জার মাথা খেয়ে কাদম্বিনীকেই অবস্থা অন্সারে ব্যবস্থা করতে হয়।

নীল্কে শিখিয়ে রেখেছিলেন, ঠাকুরদার পাতে মাছ পড়তেই সে যেন গিয়ে বসে পড়ে আজ। মান্ষটার ইলিশ মাছ খেলে কেন যেন সহ্য হয় না।

যদ্নাথ খ্শী হলেন না ক্ষ্ণ্ণ হলেন, বোঝা যায় না। হেসেই বললেন, "তুই এখনও ঘ্ম্সনি দিদিমণি?—আয়, বস্ এসে, শত খেলেও আমার সঙ্গে বসে এক গাল না খেলে তোর পেটে খিদে থাকে!"

এক গ্রাস কি, মেয়েটা অনেক গ্রাসই খেয়ে নেয়। শেষকালে দ্ধ-ভাতেরও অর্ধেকের বেশীই গোগ্রাসে গিলে অবশিষ্ট দ্ধেরও সবটাই প্রায় চোঁ চোঁ ক'রে টেনে নিতে চায়। যদ্নাথ-বাব্র আর সহ্য হয় না। নাতনীর ম্খ থেকে দ্ধের বাটি সরিয়ে নিয়ে বাকিটুকু নিজের ম্খের কাছে ধরবেন, এমন সময় কাদম্বিনী টিপ্পনী কাটলেন, "বাবা, নোলা কম নয়। ওইটুকুন্ দ্ধ নিজে আর নাই-বা খেলে।"

সর্বনাশ! যদ্নাথ দ্ধস্দ্ধ বাটিটা থালার উপর ফেলে দিলেন ঝনাৎ ক'রে। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। আচমন করতেও ভুলে গেছেন। দ্পদাপ করে কলতলা গিয়ে তড়পাতে লাগলেন, "আর কোনও দিন আমার খাওয়ার কাছে বসবে তো তোমার চোদ্দ প্র্ষের মাথা খাও। আমার নাওয়া-খাওয়া, চলাফেরা সবতাতেই ওর হাত দেওয়া চাই। ধ্মসী নিজের বেলা ষোল আনা ব্ঝে নেয়, যত ইয়ে আমার বেলা।"

বারান্দার সমবেত চাপা হাসি থামতেই মেজো ছেলে যতীন বললে, "সত্যি, এ তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি মা। খেতে খেতে উঠিয়ে দিলে তো!"

"হ্ঁ, উঠিয়ে দিলাম না আরও কিছ্। পেট ব্ঝি ওঁর ভরেনি ভেবেছিস। তার ওপর আজ ওই এক বাটি ঘন দ্ধ খেলে আর রক্ষে ছিল।—বিকেল থেকে তিনবার গেছে পায়খানায়।"

ছোট ছেলে মহীন হেসে ওঠে, "তাই ব'লে অস্খ তো আর করে নি।"

"অস্খ হ'লে ব্ঝি বলে কাউকে। ল্কিয়ে রাখে। সহ্য করতে পারে না যখন, অত নোলা কেন? পরে ঠেলা সামলাতে বউমাদের প্রাণান্ত।—তোদের আর কি, বাইরে বাইরেই থাকিস কি না।"

খেয়ে উঠে বড় ছেলে স্ধীন গেল বাবার ঘরে—তাঁকে ঠাণ্ডা করতে। নইলে রাত দ্প্র অবধি চলবে এর জের।

কাদম্বিনীও গিয়ে কর্তার ঘরের চৌকাঠের আড়ালে দাঁড়ান। কাজটা আজ ভাল করেন নি ব্ঝতে পেরে একটু যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছেন। একটু র্ষ্টও হয়েছেন প্ত্রবধ্দের উপর। ব্ড়ো হ'লে লোকের খাবার লোভ অমন হয়ই। তাই ব'লে বাড়িস্দ্ধ লোক হাসবে নাকি! এতটুকু লঘ্গ্র্ জ্ঞান নেই!

যদ্নাথ তখনও ঝাঁজিয়ে চলেছেন, "আমায় তোরা কাশী যাবার ব্যবস্থা ক'রে দে। ওর সঙ্গে এক বাড়িতে আর আমি থাকব না। শেষকালে একটা খ্নোখ্নি হয়ে যাবে।"

"তার চেয়ে আমাকেই তোরা কাশী পাঠিয়ে দে না রে। সংসারের আপদ বালাই দূর হয়ে যাক", বলতে বলতে কাদম্বিনী অন্তরাল থেকে মৃদুহাস্যে এবার ঘরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন।

যদুনাথ মুখুজ্যে আবার জ্বলে উঠলেন। কিন্তু গৃহিণীর সহাস্য মুখখানির দিকে তাকিয়েই তাঁর ক্রোধটা যেন খোঁড়া হয়ে পড়ে। একটা বোবা ঘৃণায় সর্বাঙ্গ রিরি করতে থাকে। ফোকলা বুড়ী! শুঁটকী মাছের মত তোবড়ানো গাল। একটা ছুঁচিবাইএর ডিপো! প্রাণ গেলেও দাঁত বাঁধাবে না—জাত যাবে।

"তুমি আবার এখানে এলে কেন মা?—একটা না একটা কেলেঙ্কারি না বাধালে রাত্তিরে ঘুম হয় না তোমাদের", সুধীন মাকে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলল।

আর যায় কোথায়! দেখতে দেখতে চোখের জল গণ্ড বেয়ে নামতে থাকে। কাদম্বিনী ফুঁপিয়ে চললেন, "একজন মুখ দিয়ে সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে মারছে, এবার তোরাও বা ছেড়ে দিবি কেন!"

যদুনাথ মুখুজ্যে এবার কিন্তু হেসে ওঠেন। গৃহিণী কিবা অপরূপ! হাসলে মনে হয় কাঁদে, আর কাঁদিলে পায় হাসি।

সুধীন কণ্ঠস্বর মোলায়েম ক'রে বলল, "তুমি নিজের ঘরে যাও না গো, এখানে এসেছ কেন।"

"তোর মার আজকাল মাথা খারাপ হয়েছে। ভালো বললেও মন্দ শোনে। দেখছিস না, ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ ক'রে কাঁদে কেবল।" ব'লেই গৃহকর্তা নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে থাকেন।

"মাথা খারাপ হয়েছে আমার না কার তা ভগবানই জানেন। —হাসি বেরিয়ে যাবে। অত সহ্য কেউ করবে না—যদ্দিন আমি আছি মনের সুখে তদ্দিনই চোটপাট ক'রে নাও। পরের ঘরের মেয়েরা এখনই হেনস্ত করতে পারলে ছাড়ে না"—বলতে বলতে গৃহিণী বাইরে চলে যান।

পুত্রও হাসি চেপে নিজের ঘরে যেতে যেতে ভাবে—দুজনেই সমান!

পরদিন সকালে বড়বউ জিজ্ঞাসা করে, "মা, চিংড়ি মাছ দিয়ে পুঁই চচ্চড়ি রাঁধব আজ?"

"আমি তার কি জানি গো।"

"তুমি জানো না মানে?"

"এ সংসারের আমি আর কে! কদিনই বা আছি। তোমাদের সংসার, যা ভাল বোঝ কর।"

পুত্রবধূ হেসে ওঠে, "তোমারও মাথা খারাপ হ'ল নাকি? বল না, পুঁই চচ্চড়ি এবেলাই হবে তো? ছোট্ ঠাকুরপো ভালবাসে।"

আর ভালবাসেন কাদম্বিনী। সেকথা বুদ্ধিমতী বিজয়া বলতে আর পারে না।

"এবেলা থাক বউমা।" কাদম্বিনী মুখের মধ্যে খানিক ছ্যাঁচা পান ছেড়ে দিয়ে বললেন, "আজ সকাল থেকেই মেজাজ চ'ড়ে আছে, দেখছ না! পাতে আজ পুঁইডাঁটা দেখলে আমার আর রক্ষে রাখবে না।"

পুঁইশাক খেতে কাদম্বিনী সত্যি ভালবাসেন। আর, এ-ও সত্য, যদুনাথ তা দু চক্ষে দেখতে পারেন না। গৃহকর্তা ভেটকী মাছ পেলে খুশী হয়ে ওঠেন, গৃহিণী ও বস্তু পাতেও নিতে চান না। একজন চা খান ধীরে ধীরে—গরম থেকে ঠাণ্ডা, আর একজনের কাছে তা গরম গরম না হ'লে খাওয়া না-খাওয়া সমান।

দেখে শুনে পুত্রবধূরা ভেবেই পায় না—মিলের চেয়ে অমিল যাদের এত বেশী সেই তেল আর জল এত কাল মিশ খেয়ে ছিল কেমন ক'রে। ছোট বউ অমিয়া তো শাশুড়ীকে কথার ছলে প্রশ্ন ক'রেই বসল, "আচ্ছা মা, তুমি কি চিরটাকাল পুঁইশাক আর বেলে মাছ মুখে দাও নি তবে? মনের সাধ মনেই রেখেছ?"

"তা কেন গো বউমা। ওর যত আদিখ্যেতা এই বুড়ো বয়েসে। শোন তবে"—কাদম্বিনী সবিস্তারে ব'লে যান। নারায়ণগঞ্জ থাকতে বউমাদের শ্বশুর নিজের হাতে বাজার থেকে কতদিন বেলে মাছ নিয়ে আসতেন। নিজে অবশ্য পছন্দ করেন না কোনও কালেই। রংপুরে বদলি হ'ল যেবার, পুঁই শাক কি সস্তা সেখানে! সেসব কথা বলতে বলতে কাদম্বিনী পানের পিক ফেলে নেন বার পাঁচেক।

ওদিকে তখন পড়ার ঘর আজ সরগরম। মাস্টার মশায় চ'লে গেছেন। শুরু হয়েছে খুনসুড়ি।

ছেলেমেয়েগুলো ঠাকুরদার কাছে পড়া জিজ্ঞাসা করছে না ছাই!

"'এ ফ্যাট ক্যাট' মানে কি ঠাকুরদা?"

"একটা মোটা বেড়াল।"

শম্ভু ও-কথার অর্থ জানে। তবু আবার প্রশ্ন করে, "'ফ্যাট' মানে তা হলে মোটা?"

"হ্যাঁ রে।—তোর ঠাকুরমার মতো।"

নাতি হো হো ক'রে হেসে ওঠে, "ঠাকমাকে ব'লে দেব কিন্তু।"

নীলু ঘাড় বাঁকিয়ে দাদার বই-এর বিড়ালের ছবিটা দেখে নিয়ে বললে, "হ'ল না দাদু, ওর যে ধারাল দাঁত।—ঠাক্‌মার তো দাঁত নেই।"

মিণ্টু আর একটা ত্রুটি ধরে, "ঠাক্‌মার বুঝি বেড়ালটার মতো গোঁফ আছে?"

"আছে বই কি!"

"দূর বোকা।" ছ বছরের নাতনী ঠাকুরদার বুদ্ধির উপর কটাক্ষ করে।

"গোঁফ আছে; ভাল ক'রে দেখিস আজ," ব'লে যদুনাথ মুখুজ্যে নিজের নাকের নীচে ও গালের কাছে আঙুল টেনে বুঝিয়ে দিলেন, "দেখিস নি, ছোট বড় কালো কালো ভাঁজ। গোঁফের মত দেখতে নয়?"

"হ্যাঁ দাদু! আমিও দেখেছি," সায় দেয় শ্রীমতী বুলু। তার এখনও পড়ার বয়স হয়নি—এসেছে আজ পড়া-পড়া খেলতে।

ঘণ্টা খানিক বাদে রান্নাঘরের কাছের ছোট্ট বারান্দাটায় সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! বউমারা যার যার ছেলে মেয়েকে যতই চোখ রাঙায়, তারা কিন্তু ততই উৎসাহিত হয়ে নৃত্য

জুড়ে দেয়—ঠাকুমার গোঁফ আছে রে।—ঠাকুমা, তাকাও ইদিকে, দেখি তোমার গোঁফজোড়া!"

"অসভ্য পাজী ছেলে" ব'লে বড়বউ হাতপাখাটা নিয়ে সবার মধ্যে নিজের ছেলেকে তেড়ে আসতেই কাদম্বিনী মাঝ-পথে তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়ান, "বউমা, তুমি পাগল না খেপা। ওরা বলছে বলুক না। দিদি-নাতিদের মধ্যে তোমরা কেন?" ব'লেই সর্বজ্যেষ্ঠ নাতি শম্ভুকে উদ্দেশ ক'রে ব'লে উঠলেন, "এ রে মিনসে, এতই যদি আমায় অপছন্দ তোর, বেশ তো—ঘরেই আছে তোর—"

কথাটা শেষ করবার আগেই শ্রীমতী নীলু তার ঠাকুরমাকে চিমটি কেটে দেয়।

"আচ্ছা; দাদাকে পছন্দ না হয়, ঠাকুরদা রয়েছে তো! কন্দর্পকান্তি কার্তিক ঠাকুর লো! বেতো রুগীর পায়ে রাত-দিন হাত বুলোবি তায় আর লজ্জা কিসের এত।"

এই উপভোগ্য রসিকতার মাঝখানে শ্রীমান্ ভ্যাবল ঠাকুরমার কানের কাছে ফিসফিস ক'রে কি কথা বলতেই অমনি তিনি গলা এক পরদা চড়িয়ে দিলেন, "তা আমি আগেই জানি। অত ঘন দুধ সহ্য হবে কেন!—দেখলে তো, বড়বউ, কাল কি একটু বলেছি তাই নিয়ে কত কাণ্ডই করল।"

কাদম্বিনী উঠে দাঁড়ান বাথরুমের উদ্দেশে। আর বউমারাও পিছু নিল দুষ্টু ছেলেমেয়েগুলোকে সামলাবার জন্য।

বাথরুমের মধ্যে তখন কাপড়কাচার শব্দ।

কাদম্বিনী শুরু করলেন, "বাড়িতে কি কাপড় জামা কাচার আর লোক নেই? ছেড়ে রাখলেই তো হয়।"

ভিতর থেকে যদুনাথ সদম্ভে জানিয়ে দিলেন, "কেন রাখব? এখনও আমার হাত পা আছে। একখানা বাসী কাপড় তা ভা-রী একটা কাজ। পরের ঘাড়ে কাজ ফেলে রেখে তোমার মতো নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা আমি দু চক্ষে দেখতে পারি নে।"

টুনীটা বড্ড ফাজিল। ডাকল, "ও দাদু!"

ভেতর থেকে সাড়া দেন যদুনাথ "কেন রে দিদিমণি?"

"বাইরে এস না। কাপড় রেখে দাও। মা ধুয়ে দেবে 'খন—সাবান দিয়ে ভাল ক'রে কাচতে হবে তো!"

আর ধৈর্যের বাঁধ আটকে রাখা গেল না। এক সঙ্গে এতগুলো কণ্ঠের হাসি বোমার মতো ফেটে পড়ল বাথরুমের বাইরে।

পরক্ষণেই যদুনাথ এক হাতে সাবান আর এক হাতে নিংড়নো কাপড় নিয়ে দুয়ার খুলে বার হয়ে এলেন অগ্নিশর্মা হয়ে।

ছেলেপিলেদের হাসি তখনও থামে নি।

ক্রোধে যদুনাথের হাত দুটো কাঁপছে। কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "তোরা এত হাসছিস কেন, শুনি?"

"হাসবে না তো কি! তুমি অমন কাণ্ড করবে, আর ওরা সব ছুঁচ-সুতোয় মুখ সেলাই ক'রে থাকবে বুঝি?" কাদম্বিনী সহাস্যে ব'লে গেলেন, "তোমার ভীমরতি ধরেছে; নইলে কাল রাত্তিরে এইটুকু দুধ নিয়ে—"

কাদম্বিনী কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না। এক কোণে পড়ে ছিল একটা ভাঙা পুরনো ছাতা। সাবান আর ভিজে কাপড় মেঝের উপর ফেলে দিয়ে স্থান কাল পাত্রের কথা বিস্মৃত হয়ে বৃদ্ধ যদুনাথ রুষে ফুঁসে তেড়ে এলেন গৃহিণীর দিকে।

তার পর বাড়িতে একটা হই চই কেলেঙ্কারি কাণ্ড। নাতি আর নাতনীরা ঠাকুরদাকে ঘিরে ধ'রে নিয়ে যায় তাঁর শোবার ঘরে। পুত্রবধূরাও শাশুড়ীকে মাটি থেকে তুলে টেনে বড় ঘরে নিয়ে গেল।

কাদম্বিনী ফুলে ফুলে কাঁদছেন। এও কপালে ছিল! সারা জীবন সসম্মানে কাটিয়ে এসে শেষকালে আজ একঘর নাতি, নাতনী ও পুত্রবধূর চোখের সামনে কি না গায়ে হাত! হায় ভগবান।

আজ আর দাম্পত্য কলহ নয়, একেবারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ঘটনা গড়াল অনেক দূর। আপস-মীমাংসার আশা সুদূরপরাহত।

যদুনাথ মুখুজ্যে দোতলা ছেড়ে বৈঠকখানার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। জীবনে আর উপরে উঠবেন না। বালিশ বিছানা, ক্যাশবাক্স, মায় গুড়গুড়িটা পর্যন্ত নীচে আনিয়ে নিয়েছেন। যত দিন বেঁচে আছেন, ঐ ডাইনী বুড়ীর মুখ-দর্শন আর করবেন না। নাওয়া-খাওয়া, ঘুমনো—সবই নীচে হবে। শুধু কি এই! ভজুয়াকে ডেকে হুকুম দিলেন, "দেওয়াল থেকে ওই ফোটোটা পেড়ে উপরে রেখে আয়।" ওই বড় গ্রুপ-ফোটোর মধ্যে বউমাদের মাঝখানে ব'সে আছেন গত বছরের কাদম্বিনী। যদুনাথ চোখ ফিরিয়ে নেন। যেন তিন দিনের জলভোটা মড়া ডাঙায় এসে ঠেকেছে।

উপরের ঘরে কাদম্বিনীও কখনও গ'র্জে, কখনও ব'র্ষে চলেছেন। সে কি শেয়াল কুকুর নাকি? কেন? কিসের জন্য? তাঁর তিন-তিনটি রোজগারে ছেলে আজও বেঁচে আছে। আজ কাদম্বিনী একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ছাড়বে। আপিস থেকে ছেলেরা আসুক বাড়ি! গায়ে হাত তোলার প্রতিকার আজ চাই-ই চাই।

সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে ছেলেরা যার যার স্ত্রী মারফৎ শুনল সব আদ্যোপান্ত। কেউ বললে—মারই দোষ, কেউ বললে—বাবার। ছোট ছেলে, রাসভারী। সারা দিন কলম পিষে এসে এখন আর ভাল লাগে না এসব কেলেঙ্কারি।

কাদম্বিনী বাক্স বিছানা বেঁধে রেখেছেন—আজই কাশী যাবেন। সম্পর্কিত পিসশাশুড়ীর ঘরের এক ভাসুরপোকে খবর পাঠিয়েছেন তাকে তৈরী হয়ে আসতে। ছেলেরা মাসোহারা না দেয়, কাশীতে দশ দুয়ারে মেগে খাবেন। এই পাপ পুরীতে আর নয়। ঢের হয়েছে।

কাদম্বিনী সত্যই আর কাশী যাচ্ছেন না, একথা বেশ বুঝেও পুত্রবধূরা সাধ্যসাধনা করতে আসে। শাশুড়ী ঝংকার দিয়ে ওঠেন, "মাথার দিব্বি রইল—আমায় ফিরিও না তোমরা।" বলতে বলতে কাদম্বিনীর কণ্ঠস্বর ভারাক্রান্ত হ'য়ে আসে, "কোন্ সুখে আর সংসার করব, শুনি?—ছেলেরা আজ সব কথা শুনেও একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করল না। মাকে মারুক ধরুক, তাদের আর কি! এখন সব হাত-পা গজিয়েছে, বড় হয়েছে—মা বেটীর আর কি দরকার।" ঝর ঝর ক'রে কাঁদতে থাকেন কাদম্বিনী।

(শেষাংশ ৪৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দি গ্লোব নার্শরী

প্রদর্শণী গৃহ-কলেজষ্ট্রীট মার্কেট (টাওয়ার ব্লক)

— গ্লোব নার্শরীর উৎকৃষ্ট বীজ—

—সবে মাত্র আমদানী হইয়াছে—

নাম	তোলা
বাঁধাকপি	
গ্লোব গ্লোরী	১৲
নারিকেলী	॥০
ফ্লোরিডা হেডার	॥৵০
একষ্ট্রা আর্লি এক্সপ্রেস	১৲
মাউণ্টেনহেড ড্রামহেড	১৲
ব্রান্সউইক	।৵০
রেড ড্রামহেড	৸০
চিনাকপি	।৵০
বারমেসে	৸০
বোরিকোল	॥০
ব্রাসেলস্ স্প্রাউট	॥০
ফুলকপি	
গ্লোবল আর্লি, লেট	২৲
গ্লোব বেটার	১॥০
প্রাইজকুইন	১৲
ওয়ালচিরাণ	৸০
কাশীর জলদি ও নাবী	॥০
ব্রোকোলী	৸০
ওলকপি	
সাদা, লাল বা সবুজ	॥০
গোলিয়াথ	॥০
মিশ্রিত	॥০
বীট	
লাল গোল	।০
ইজিপসিয়ান	।০
ইক্লিপস	।০
গাজর	
লং অরেঞ্জ	।০
অক্সহার্ট	।০
রাক্ষুসে	।০
শালগম	
ফ্লাটডাচ	।০
রেড টপ	।০
রাক্ষুসে	।০

নাম	তোলা
লেটুস	
বিগবোষ্টন	।০
টমথাম্ব	।০
প্যারিস কস	।০
বারমেসে	।০
মূলা	
বোম্বাই ১নং (সের ৫৲)	৵০
কাঁথির (সের ৪৲)	৵০
লাল লম্বা, সাদা লম্বা	৵০
লাল গোল	৶০
সিলেশিয়ান	৶০
চাইনিজ রোজ	৶০
রাক্ষুসে (জাপানি)	।৵০
মগরী	৵০
বেগুন	
মুক্তকেশী	।০
বারমেসে	৶০
রামনগর	৸০
/৬ সেরা	৸০
ব্ল্যাক বিউটী	॥০
লঙ্কা	
চাইনিজ জায়েণ্ট	॥০
পাটনাই	৴০
সূর্য্যমণি	॥০
পেঁয়াজ	
রাক্ষুসে	।৵০
আর্লিরেড	।৵০
বোম্বাই (সের ৫॥০)	৵০
পাটনাই (সের ৫॥০)	৵০
টম্যাটো	
ম্যাচলেশ	।৵০
পারফেকসান	৸০
কাঁকুড়	৴০
কাঁকড়ি	৴০
চালকুমড়া	৴০

নাম	তোলা
খরমুজা	
লক্ষ্ণৌ	৵০
রাক্ষুসে	॥০
সর্দ্দা	।৵০
খেঁড়ো বীরভূমের	।০
তামাক	
হিংলী	।০
মতিহারী	।০
রংপুর	৸০
গুজরাটী	৸০
আমেরিকান	৸০
তরমুজ	
রাক্ষুসে	॥০
আইসক্রিম	॥০
গোয়ালন্দ	৴০
ভগলপুর	।৵০
পামকিন	
রাক্ষুসে	।৵০
ক্রুকনেক	।০
ম্যামথ কিং	।৵০
রাই চাইনিজ	৵০
মটর	
ওলন্দা সের ১॥০	৴০
দার্জ্জিলিং " ১॥০	৴০
চ্যাম্পিয়ান " ৩৲	৴০
আমেরিকান " ৩৲	৴০
টেলিগ্রাফ " ৩৲	৴০
পাইলট " ৩৲	৴০
টমাসল্যাক্সটন ৩৲	৴০
পেঁপে	
রাঁচি	১৲
রাক্ষুসে, লঙ্কাদ্বীপ	১৲
সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্গালোর	১৲
বোম্বাই	।০

নাম	তোলা
স্কোয়াস	
রাক্ষুসে	।৵০
ম্যারো	।৵০
বুস	।০
সিলেরী	
সাদা, লাল	।০
হলদে, সবুজ	।৵০
সীম	
আলতাপাটী	৵০
সবুজ	৵০
ভ্যালর	৴০
সাদা	৵০
হাতিকান	৵০
বীন	
ক্যানেডিয়ান	৴০
ষ্ট্রীংলেশ	৴০
লংপড	৴০
গাওয়ার	৵০
আর্টিচোক	।৵০
লীক	৵০
পার্সনিপ	৵০
শাক পালম (সের ১॥০)	৴০
বিলাতী পালম	৵০
টক পালম	।০
কাটোয়ার ডাঁটা	।০
কনকানটে	৴০
পুঁইশাক	৴০
এসপ্যারাগাস	।০
স্পিনাচ	৵০
ব্লুমসডেল	৶০

আলু ও পটল মূলের জন্য আবেদন করুন।

মরশুমী ফুল বীজ ১২ রকম ১২ প্যাকেট—২৲ টাকা মাত্র।

দি গ্লোব নার্শারী

প্রদর্শনী গৃহ-কলেজষ্ট্রীট মার্কেট (টাওয়ার ব্লক)

সুবিখ্যাত চারা ও কলম।

নাম	প্রত্যেক
আম	
আলফান্সো	২৲
বোম্বাই ভুতো	৸০
বারমেসে (তেফলা)	৸০
দোফলা	৸০
লতানে	॥০
গোলাপখাস	৸০
গোপালভোগ	৸৵০
হিমসাগর	১৲
দশেরী (লক্ষ্ণৌ)	২৲
কাঁচামিঠে	১৲
ল্যাংড়া কাশীর	১৲
সফেদা (লক্ষ্ণৌ)	২॥০
সিপিয়া	৸০
মালদহ	৸০
তোতাপুরী	২৲
কিষেণভোগ	১৲
আতা	৵০
আঙ্গুর লম্বা বা গোল	।০
আনারস	
দেশী	৵০
কুইন	।৵০
রাক্ষুসে	৸০
সিঙ্গাপুর	৸০
আপেল	৸০
আমড়া বিলাতী	।০
কমলালেবু	
দার্জ্জিলিং	॥০
নাগপুর	৸০
শ্রীহট্ট	॥০
কাশীর	॥০
কলা বীটজবা	।৵০
„ দুধসাগর	৸০
„ বোম্বাই	॥০
„ কাবুলী	।৵০
„ কানাইবাঁশী	॥০
„ মর্ত্তমান	।৵০

নাম	প্রত্যেক
কাঁঠাল	
খাজা	৶০
নেও (গিলা)	৵০
কালজাম বড়	৵০
করমচা চীনের	৶০
কামরাঙ্গা	
চীনের বা দেশী	॥০
কুল নারিকেলী	॥০
ঐ কাশীর	।৵০
ঐ বোম্বাই	।৵০
খর্জ্জুর	
আরব বা কলসে	॥০
গোলাপজাম বড়	।০
চালতা চারা	৵০
ঐ লতানে	।০
জামরুল সাদা	।০
ঐ লাল	।০
জলপাই বড়	।৵০
ডালিম পাটনাই	।০
নারিকেল	
দেশী ১নং (শত ৩০৲)	।৵০
সিঙ্গাপুর সিংহল	২৲
ন্যাশপাতী	
পেশোয়ারী	॥০
নোনা দেশী	৵০
ঐ বিলাতী	।৵০
পীচ আগ্রাই	।৵০
পেয়ারা কাশীর	।০
ঐ এলাহাবাদ	।০
ফিগ	
বড়পাতা	॥০
ছোটপাতা	।০
বাদাম	
কাজু বা হিজলী	৵০
চেরাপাতা	।০

নাম	প্রত্যেক
বাতাবীলেবু	
লাল	।০
সাদা	।০
চীনের	॥০
কলসে	।৵০
বেদানা পেশোয়ারী	৸০
বেল রংপুর	।০
লকেট আগ্রাই	।৵০
লিচু	
মজঃফরপুর ১নং	।৵০
বেদানা	৸০
বোম্বাই	।০
গ্রীণ	॥০
লেবু	
কাগজী দেশী (শত ১৫৲)	৶০
„ চীনের	।০
„ বারমেসে	।৵০
পাতি (শত ২০৲)	।০
„ বারমেসে	॥০
সরবতী	।০
এলাচি	।৵০
সপেটা বড় জাতীয়	॥০
সুপারী	
মাঝারী (শত ৭৲)	৵০
মসলার গাছ	
এলাচ ছোট বা বড়	।০
কর্পূর	॥০
কাবাবচিনি	।৵০
খদির	।৵০
গোলমরিচ	।৵০
তেজপাতা	।৵০
দারুচিনি	।৵০
লবঙ্গ	॥০
হিং	।০
পিপুল (কাটিং ২০৲ মণ)	৵০
চন্দন শ্বেত	॥০
ইউক্যালিপটাস	।৵৲

নাম	প্রত্যেক
বিবিধ ফুল গাছ	
অশোক	৵০
কলকে সাদা ও লাল	।৵০
গন্ধরাজ ডবল	৵০
টগর	৵০
বকফুল সাদা পদ্ম	।৵০
বকফুল লাল পদ্ম	।০
স্থলপদ্ম	৵০
চামেলী	।০
নবমল্লিকা	।০
জেসমিন	।০
যুঁই স্বর্ণ	।৵০
যুঁই ডবল	৵০
বেল রাই	।০
বেল মতিয়া	৵০
ম্যাগ্নোলিয়া	
গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা	২॥০
চাঁপা	
স্বর্ণ	৶০
শ্বেত (চিনের)	॥০
জবা	
সাদা ডবল	।০
নীল ডবল	।৵০
পাটকিলা	।৵০
সপ্তমুখী	।০
তম্বুরে	।০
হলদে	।০
করবী	
সাদা ডবল	।০
লাল পদ্ম	৶০
রঙ্গন	
এ্যালবা (সাদা)	॥০
কলিরাই (হলদে)	৵০
রোজিয়া (গোলাপী)	।৵০

☞ **আমেরিকান সব্জী বীজ** ১২ রকম ১২ প্যাকেট—১৲ টাকা মাত্র।

গোপীনাথ গুঁই

শ্রীসজনীকান্ত দাস

মোজেইক-বনিয়াদে পড়েছে কালের কশাঘাত,
মেঝেতে বসিয়া আছি কীটজীর্ণ কার্পেট-আসনে,
পশমেতে "আশীর্বাদ" অর্ধেক পোকায় গেছে খেয়ে।
অতি স্বচ্ছ কূপোদক টলমল রূপার গেলাসে,
তুবড়িয়া গেছে তবু নামী ধাতু ঝকঝক করে;
বসিয়াছি স-জাঁকজমকে।
আমি গোপীনাথ গুঁই ভাঙা লোহা-লক্কড়ের কাজে
বিপুল মুনফা লভি ফে'দেছি এগারখানা বাড়ি,
দুটি ব্যাঙ্ক, তিনখানা সুবৃহৎ ঢালাই কারখানা
পাঁচ-হাজারী কাঠা এই কলিকাতা শহরের বুকে।
এসেছিনু শূন্য হাতে একদিন বোঁচকা-সম্বল—
মাত্র সেদিনের কথা, কুমিল্লার চাঁদপুর হ'তে;
তার পর ধাপে ধাপে উঠিয়াছি, তার ইতিহাস
আজ তো সবাই জানে, দীর্ঘতর হয় প্রতিদিন
সে কাহিনী চমৎকার। দুই পাতা বিজ্ঞাপন-লোভে
সকল সংবাদপত্রে বার হ'ল আমার জীবনী,
শুধুই সচিত্র নয়, শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখকের লেখা;
পড়িয়া নিজেই আমি বনিয়াছি বহুত তাজ্জব;
অত্যাশ্চর্য জীবনীর দাম মাত্র একশত টাকা।
নেতৃবৃন্দ দফে দফে দিয়াছেন আশীর্বাদ মোরে,
উচ্চ রাজপুরুষেরা জানালেন ফেলিসিটেশন্‌স্‌,
ডক্টরের দানে ধন্য বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়,
বলাই বাহুল্য মোর উচ্চ রাজ-খেতাবের কথা।

আমি গোপীনাথ গুঁই কি করেছি আমি শুধু জানি।
নারী, গাড়ি, বাড়ি আদি যেখানে যেটিতে পড়ে চোখ
সেটিই সংগ্রহ করি স্বর্ণ আর রৌপ্যের দাপটে;
মানুষের দারিদ্র্য ও লোভ মাত্র সহায় আমার।
জাগে ক্ষুধা দেহে মনে, দালালেরা ছোটে লোভে লোভে,
কভু নহি ব্যর্থকাম, বাড়ে শুধু দালালির হার।
আমারে ঠকাতে চায়, জানে না সে অর্থগৃধ্নুদল
ঠকা আর জেতা মোর জীবনের এই মাত্র খেলা—
হার জিত উভয়ই সমান।
ঊর্ধ্বগতি সুনিশ্চিত ব্যাবসাতে নাকি আকর্ষণ,
চলে তাহা রোলারের বেগে—
সম্মুখে সকল বাধা আপন ওজনে পিষে যায়।
সহস্র বিকারে মোর উত্তেজনা শান্তি খুঁজে মরে,
রজনীর অন্ধকারে খেলা মোর রহে যে গোপন।

সুনিবিড় তমিস্রায় নিদ্রাহীন লালায়িত চোখে
দেখি যে আকাশখানা তারাহারে শোভিছে সুন্দর;
চাঁদ ঢ'লে পড়িয়াছে, খণ্ড লঘু মেঘ ভেসে যায়,
ওড়ে নিশাচর পাখি। মনে কি বিষাদ জাগে মোর?
নীতি ধর্মকথা ভেবে অনুভবি বিবেক-দংশন?
ধর্ম? ভেবে হাসি পায়, হায় ধর্ম, তোমার শাসন—
কুবেরের মানদণ্ডে চলে পাপপুণ্যের বিচার।

মনে পড়ে একদিন আমি ছিনু গ্রামের দুলাল,
আমি গোপীনাথ গুঁই পাঠশালে পাঠ সাঙ্গ করি
জমিদার-কাছারিতে চেক আর দলিলাদি লিখে
বৃদ্ধা জননীর হাতে কটি টাকা দিতাম তুলিয়া।
মাতা ও পুত্রের অন্ন নিরুদ্বেগে হ'ত যে তাতেই;
আসিত ক্ষেতের ধান, হাঁড়ি কয় ডাল একো গুড়—

সরল জীবনযাত্রা, ছাতা আর লণ্ঠন বিলাস,
চলিত জীবন মম লঘুপক্ষ পাখির পাখায়।
সুখের নাহি-কো শেষ, বিয়ে হ'ল পাশের গাঁয়েতে,
ঘরে এল কনেবউ, ভাঙা ঘরে চাঁদের কিরণ;
মায়ামন্ত্রবলে যেন রাত্রি মোর স্বপনময় হ'ল,
ছুটে গেল দিনগুলি সম্রাটের রাজৈশ্চর্য নিয়ে।

আজ মনে পড়িতেছে ললিতার মুখের হাসিটি—
লক্ষ মুদ্রা বিনিময়ে সে হাসি দেখিতে নাহি পাব,
আমি গোপীনাথ গুঁই, বহু লক্ষ মুদ্রার মালিক।
সুখের বাসরঘরে ছিদ্রপথে পশে কালসাপ,
পাপিষ্ঠের পাপচক্রে জলাশয়ে মিলাল সে হাসি,
অকালে মরিল সতী, লম্পটের লোলুপ পরশে,
অকরুণ আত্মঘাতে—সহস্র বর্ষের সংস্কার!
মিথ্যা চৌর্য অপরাধে আমারে আটক করে জেলে
জমিদার শক্তিমান, ঈশ্বরের মর্ত্য প্রতিনিধি;
আঁধার কুটিরে মোর জননী মরিল কে'দে কে'দে—
এইটুকু ভাগ্য তাঁর শেষ কান্না হয় নি দেখিতে।

ধর্ম? হায় ধর্ম, তুমি দরিদ্রে রাখ নি সেইদিন,
আমার কবল হ'তে আপনারে নারিবে রাখিতে।

বাহিরিনু জেল হ'তে বিদ্রোহ যে করিনু ঘোষণা
তোমার বিরুদ্ধে ধর্ম, সাধনা হইল মোর শুরু,
—দেখিতে পেতাম যদি ললিতার মত মুখখানি
হয়তো বিদ্রোহ মোর শেষ হ'ত নয়নের জলে।

তার পর—এক দিকে শঠ আমি, কুবেরের চর—
বিষকুম্ভ পয়োমুখ ছুরি হানি বিশ্বাসের বুকে,
বাহিরে পরার্থ চিন্তা—স্বার্থ দুষ্ট পঙ্কিল অন্তর,
সহজ প্রত্যয়ী জনে হত্যা করি অকুণ্ঠ আঘাতে।
অন্যদিকে শয়তান, পিশাচের নিষ্ঠুর কিংকর,
মৃত্যুরে না ডরি কভু, ঘৃণা লজ্জা পাপবোধ নাই;
উচ্চপাপ-সাধনায় প্রকাশ্যে করি না ক্ষুদ্র পাপ—
সতর্ক হইতে কভু দিব না যে অসতর্ক জনে।
সমাজের ঘেয়ো গায়ে মুহুর্মুহু ছিটাই লবণ—
আমার পাপের ঘায়ে মোর ধর্ম করে আর্তনাদ,
টুঁটি টিপে মারিয়াছি তারে।

পত্রিকার পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে সচিত্র আমার জয়গান—
আমি গোপীনাথ গুঁই, লক্ষ টাকা মাসিক মুনফা।
শহরের সন্নিকটে ব'সে আছি বিদীর্ণ প্রাসাদে;
পুরাতন রাজবাড়ি, লাগিয়াছে অলক্ষ্মীর ছোঁয়া—
মোজেইক-বনিয়াদে লেগেছে কালের কশাঘাত;
মেঝেতে বসিয়া আছি কীটজীর্ণ কার্পেট-আসনে।
দালাল দিয়েছে খোঁজ বাড়িখানা হইবে বিক্রয়;
বাড়িছাড়া আরো কিছু সুগোপন দিয়েছে সন্ধান—
আসিয়াছি রক্তলোভে ব'সে আছি তারি প্রতীক্ষায়।
জলতলে শ্বাসরুদ্ধ ললিতার ম্লানমুখখানি
আকাশে ভাসিছে যেন, ক্ষণে ক্ষণে ঘটিতেছে ভুল।

ব'সে আছি ব্যগ্র প্রতীক্ষায়—
প্রাচীন বনেদী বংশ ছিন্ন কাল-চক্র-আবর্তনে,
শতখণ্ডে হেথা হোথা খুঁজিতেছে চরমবিলোপ।

তারই একখণ্ড হেথা কায়ক্লেশে বাঁধিয়াছে বাসা,
বজ্রাহত বনস্পতি, পুরাতন পৈতৃক প্রাসাদে;
বিপত্নীক পিতা আর বিধবা যুবতী কন্যা তার,
পরমা সুন্দরী সে যে, হুঁসিয়ার দালালের কথা।
যত মূল্য লাগে দিব, প্রাসাদে প্রাসাদজীবী করি
পিতারে রাখিব বাঁধি—তার পরে মন্মথের জয়!
অত্যাচার? পশুশক্তি সে আমার যথেষ্টই আছে,
আমি গোপীনাথ গুঁই, শহরের শ্রেষ্ঠ নাগরিক;
উচ্চ রাজপুরুষেরা জোড়হস্ত গরুড়ের মত
প্রত্যহ সন্ধ্যায় প্রাতে আমারে সেলাম করি যায়,
লোলুপ লালসে বসে দৈনন্দিন খানার টেবিলে,
চাকরের মত রহে আমার করুণা-কণা যাচি।
করেছি চূড়ান্ত "না" যে জলজ্যান্ত বহু স্পষ্ট "হাঁ"কে।
অত্যাচার? দয়া বল মোর—
যা খুঁজিবে তাই পাবে বজ্রাহত বিশেশ্বর বসু,
দৈন্য আর ঋণ ভারে জর্জরিত বিপন্ন বনেদী;
পুরাতন বাড়িখানা যথামূল্যে খরিদ করিয়া
কন্যামূল্যে রেখে দিব চিরদিন তাহারই জিম্মায়।

চুকেছে কাজের কথা, গৃহকর্তা জানান মিনতি,
কিছু জলযোগ করি যেতে হবে দীনের নিবাসে।
জল যে হয়েছে দেওয়া ঝকঝকে রূপার গেলাসে
যোগ আসি পেঁছে নি তখনো।
দালাল পিতারে লয়ে গিয়েছে চৌহদ্দি পরিমাপে।
আমি গোপীনাথ গুঁই, কন্যার প্রতীক্ষা একা কার।
চাতক হইয়া উঠি—অগ্নিশিখা নিবিড় তিমিরে
ধীরে ধীরে পশে যেন সচল নারীর মূর্তি ধরি;
বিধবার বেশ-ভস্ম ভেদ করি অগ্নি অনির্বাণ
আমারে ছুঁইয়া গেল, চিত্ত মোর করে আর্তনাদ।
কি করিব, কি বলিব, ক্ষণকাল বুঝিতে পারি না।
অগ্নি কথা কয়। বলে, শ্রীমতী অণিমা মোর নাম,
শুনেছি দীনের প্রতি আপনার দয়া সীমাহীন,
এ দীনার লউন প্রণাম।

অগ্নিমুখে স্তুতি শুনি মনে মনে উঠিনু শিহরি,
হাসিলাম ম্লান হাসি, বলিলাম, ব্যবসায়ী আমি,
মূল্যপণে বেচি কিনি, চেষ্টা করি দিতে ন্যায্য দাম,
ব্যবসায়ে নাহি সাজে অকারণ দাক্ষিণ্য-মহিমা।

ত্রস্তপদে কাছে এল দ্বিধাহীন শ্রীমতী অণিমা,
খাবারের থালা নয়, একটি এটাচিকেস হাতে—
বলিল, সময় নাই; সামান্য মিনতি মোর আছে,
আপনি মহৎ জন, একমাত্র আশ্রয় আজিকে।
আমি অতি অসহায়; মোর এই সম্পত্তিটুকুরে
সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে সংগোপনে হইবে রাখিতে।
সবিস্ময়ে চাহিলাম তার পানে প্রশ্নাতুর চোখে।
স্থিরকণ্ঠে বলিল অণিমা,
শুনেছি আজিকে হবে পুলিসের শুভ-আগমন
ভগ্নজীর্ণ এ প্রাসাদে, এরি 'পরে তাহাদের লোভ—
সহজ বিশ্বাস করি আপনারে সঁপিয়া দিলাম।

ধরিনু এটাচিকেস, কি কথা যে বলিতে গেলাম
আজ তা পড়ে না মনে, পদশব্দে হলাম চকিত,
পাশের দরজা দিয়ে পশিলেন বিশেশ্বরবাবু
দালাল তাহার সাথে হাঁকিলেন, কোথায় অণি মা,
যদুরের খুদকুঁড় এখনও কি হয় নি সংগ্রহ?

থাক্ থাক্, তাড়া কেন।—শুষ্ককণ্ঠে আমি বলিলাম।
খাবারের থালি হাতে প্রবেশিল তখনই অণিমা
সসংকোচে ভয়ে ভয়ে। মনে হ'ল আর কোনো মেয়ে,
কিছু আগে যে আসিয়া মোরে দিয়ে গেল গুরুভার
এ যেন সেজন নয়; অন্তরালে দাঁড়াল অণিমা।

কাজ শেষ হ'ল মোর, পাকা দেখা তাও হ'ল শেষ;
"আবার আসিব" বলি স-দালাল ফিরিয়া এলাম,
সযত্নে সিন্দুকে তুলে রাখিলাম গচ্ছিত বস্তুরে।
অনুমানে বুঝিলাম মূল্যবান কি তাহাতে আছে—
খুলিয়া দেখি নি আমি, প্রয়োজন বুঝি নাই তার।
জ্বলন্ত আগুন ছুঁয়ে চিত্ত মোর জ্বলিছে তৃষ্ণায়,
নিমেষে বিলুপ্ত হ'ল সব পূর্ব সম্ভোগের স্মৃতি
ছেলেখেলা করিয়াছি বরফের শয্যাসঙ্গী হয়ে;
আগুন, আগুন চাই, জ্বলে পুড়ে খাক হ'তে চাই,
ভস্মীভূত এ শ্মশানে অগ্নিশিখা ক্বচিৎ দেখি যে!

সেই দিন হ'তে মোর ধ্যানজ্ঞান আগুনবিলাস;
যাই আসি কথা কই পিতাসহ, কন্যা আসে কাছে,
সঠিক সুযোগ খুঁজি থাবা পাতি প্রতীক্ষা বাঘের!
আগুন বরফ জল—যাই হোক স্বরূপ তাহার,
থাকে না গোপন কভু পুরুষের উদগ্র কামনা
নারী-প্রকৃতির কাছে; অণিমার মুখে ম্লান হাসি—
সাপের ছোবল থেকে পাথরেতে প্রতিহত হয়ে
পাথর তবুও শুনি বিষে জর্জরিত হয়ে যায়।

সপ্তাহান্তে শুনিলাম পুলিসের সদম্ভ প্রবেশ,
পায় নাই কিছু সেথা তন্নতন্ন সন্ধান করিয়া
তবু নিয়ে গেছে ধ'রে অণিমাকে—বিধবা অণিমা।
সভীত সজল চক্ষে কহিলেন বিশেশ্বর বসু,
ভাগ্য মোর, তা না হ'লে দুধ কলা দিয়ে কালসাপ
স্বেচ্ছায় পুষিব কেন, সংসর্গজ দোষ গুণ হয়।
কালসাপ?—হুংকারিয়া উঠিলাম কেন তা জানি না—
আমি গোপীনাথ গুঁই, মনে হ'ল গিয়াছি ঠকিয়া—
অমনি পড়িল মনে মারণাস্ত্র আমারি নিকটে।
বলিলাম, সব কথা খুলিয়া বলিতে মোরে হবে;
বিহিত করিতে পারি সত্য যদি প্রয়োজন বুঝি।
বিশেশ্বর বসু বলিলেন—
অণির স্বামীর বন্ধু নরেন্দ্রপ্রতাপ তার নাম,
মাঝে মাঝে আসে যায়, যেন কালবৈশাখীর ঝড়
দেশের মুক্তির লাগি সুনিভৃত সাধনা তাদের
অণিমা প্রধান ভক্ত দেশকর্মী নরেন্দ্রগুরুর,
আরো আছে অনেকেই।
কেন আসে কেন যায়, আজো তাহা বুঝিতে পারি না,
অভিমানী মেয়েটার মুখ চেয়ে সব সহ্য করি;
দেশগত প্রাণ তার, দেশমাতৃকার মুক্তি লাগি
সমর্পিল আপনারে, বিধবার স্বদেশ সম্বল।

মিথ্যা কথা! অকস্মাৎ আর্তকণ্ঠে গর্জি উঠিলাম—
ভ্রষ্টা আপনার মেয়ে, নরেন্দ্রপ্রতাপ শয়তান;
আমি জানি সবিশেষ শয়তানের ভাণ্ডিতে শয়তানি।

অকারণ উত্তেজনা, লজ্জা হ'ল, দেখিলাম চেয়ে
কন্যাহারা বিশেশ্বর জোড় হস্তে কাঁপিছে সম্মুখে;
ললিতার মুখখানি কেন জানি মনে প'ড়ে গেল।

প্রশ্নে প্রশ্নে জানিলাম, নরেন্দ্রপ্রতাপ হেথা নাই,
অণিমা বলিয়া গেছে, আসিবে সে এই শনিবারে,
পুলিস পাহারারত, বাঁচাইতে হইবে তাহারে।
আমি গোপীনাথ গুঁই বহু প্ল্যানে ফেঁদেছি ব্যাবসা,
চকিতে অনেক প্ল্যান খেলে গেল মগজে আমার।
বলিলাম, ভয় নাই, অণিরে আনিব মুক্ত করি।

কি করিনু, অঘটন ঘটাইনু সে কোন্ কৌশলে—
পুলিসের হাত হ'তে মোর হাতে আসিল অণিমা;
কন্যারে ছাড়িয়া তারা নিয়ে গেল পিতা বিশ্বেশ্বরে।

সঙ্গীহীন ভগ্নপুরী, অণিমারে রক্ষা করি আমি,
লম্পটের সপ্রতিভ লজ্জাহীন হাসিখানি মুখে
নিবেদন করিনু একদা—
আমি ঘোর বস্তুবাদী, বস্তুমূল্যে কাজ ক'রে থাকি,
বস্তুমূল্যে বাঁচাইতে পারি আমি নরেন্দ্রপ্রতাপে।
অণিমা উঠিল হাসি। শান্তকণ্ঠে বলিল সহজে,
তার এই দেহখানা, মূল্য তার সামান্য অতীব—
এর বিনিময়ে যদি মুক্তি পায় নরেন্দ্রপ্রতাপ,
প্রস্তুত সে রয়েছে সর্বদা।
চমকিয়া উঠিলাম, এতখানি করি নি প্রত্যাশা,
চকিতে হইল মনে, এই আত্মসমর্পণ পিছে
আছে কোনো গূঢ়তর পলাতকা দুর্বুদ্ধি নারীর;
ললিতার আত্মহত্যা কালো কৃষ্ণ-সায়রের জলে।

মোজেইক-বনিয়াদে লেগেছে কালের কশাঘাত,
পালঙ্কে শুইয়া আছি দুগ্ধফেননিভ শয্যাখানা;
অণিমা বসেছে কাছে—বৈদান্তিক আত্মসমর্পণ;
আমি গোপীনাথ গুঁই, মাংসলোভী লোলুপ মার্জার
ইঁদুরে পাইয়া কাছে চিরন্তন খেলা ভুলিয়াছি।
ভয় লজ্জা অনুকম্পা—কেন কি যে জাগিতেছে মনে।
বাহিরে পাহারা দেয় পুলিসেরা গোপন পোশাকে,
সদর করিছে রক্ষা মোর ভৃত্য গুর্খা দ্বারবান।
প্রখর দিনের রৌদ্র, কক্ষে তবু নিশীথ তিমির,
আর্তকণ্ঠে কা কা করে আলিসায় এক জোড়া কাক;
বিহ্বল অলস চোখে অণিমার মুখপানে চেয়ে
মনে হ'ল বহু দূরে, নাগালের বাহিরে সে আছে।
মনে মনে ভয় হ'ল, বলিলাম, কাছে এস অণি।
অণিমা দাঁড়াল উঠি, বলিল, মায়ের এই ঘর।

শিহরিয়া উঠিলাম, আমি প্রৌঢ় গোপীনাথ গুঁই,
লোহা লক্কড়ের কাজে প্রাণ যার ইস্পাত-কঠিন,
নারীর ক্রন্দন, বাধা, আত্মদান—সমভোগ্য যার।
লজ্জা হ'ল, উঠিলাম অর্থহীন অট্টহাসি হেসে,
বলিলামণ শুন অণি দেবী,
গচ্ছিত বস্তুর তব আমি কিন্তু রেখেছি মর্যাদা,
মর্যাদা রাখিতে চাই দেশপ্রাণ তোমার গুরুর,
নরেন্দ্রপ্রতাপ যার নাম। মূল্যপ্রার্থী ব্যবসায়ী,
নাহি জানি কোন্ ভাবে নিজে তুমি ঋণমুক্ত হবে—
তোমার কর্তব্য তুমি জান।
জানি, জানি, জানি তাহা।—ধীর কণ্ঠে বলিল অণিমা,
জীবন মৃত্যুর মাঝে কতটুকু ব্যবধান জানি,
জন্মগত এ দেহ-সংস্কার, তার মূল্য কতটুকু
তাও আমি জানি। জানি আরো—অনেক অধিক মূল্যে
কিনিতে হইবে মোর জননীর লুপ্ত স্বাধীনতা।
এ পার হইতে তাই সহজ বিশ্বাসে পারি যেতে
ওই পারে, দেহ দিয়ে যদি হয় কাজ জননীর
এ দেহ তাঁহারই; আপনার—। থামিল অণিমা।

অপূর্ব নারীর মূর্তি দেখিলাম অস্পষ্ট আলোকে,
সুনিবিড় অন্ধকারে অচঞ্চল প্রদীপের শিখা—
স্থির বিদ্যুল্লতা যেন ঘন কৃষ্ণ প্রাবৃট্ আকাশে।
সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট আমি,
প্রবল তাড়িত শক্তি সঞ্চারিল শিরায় শিরায়;
অণিমা ডাকিল কারে, এস এস নরেন্দ্রপ্রতাপ।
নরেন্দ্রপ্রতাপ? আমি রুদ্ধদৃষ্টি দেখিলাম চেয়ে
আগুনের শিখা যেন স্পর্শ করে আগুন শিখায়।
চমকিয়া উঠিলাম, কোথা হ'তে এল জাদুকর,
আবির্ভাব যেন তার মোজেইক মেঝেখানা ফুঁড়ে!
শহরের বাহিরেতে প্রহরীবেষ্টিত এই পুরী,
তার মাঝখানে অতি অসম্ভব এই আবির্ভাব!

দেখিলাম, কম্পমান ঊর্ধ্বমুখী অচঞ্চল শিখা,
ঝড়ে কি পড়িবে নুয়ে নিরাশ্রয় বেতসের লতা!
আমি গোপীনাথ গুঁই, অকস্মাৎ কি ঘটিবে জানি—
সবিস্ময় দৃষ্টি মেলি চাহিলাম অণিমার পানে।

হাস্যমুখে কাছে আসি হাতজুড়ে নমস্কার করি
আমারে করিয়া লক্ষ্য কহিলেন নরেন্দ্রপ্রতাপ,
আপনার জয়গান শুনিয়াছি অণিমার মুখে;
আমার সময় নাই, আসিয়াছি এই শেষ বার,
অদূরে নিশ্চিত মৃত্যু প্রতীক্ষা করিছে মোর লাগি।
পিছু লইয়াছে তারা, অবিলম্বে আসিবে হেথায়
তার পূর্বে পলাইয়া অণিমারে বাঁচাইতে চাই।
অণিমারে ভালবাসি, ভালবাসিয়াছি চিরদিন,
কিন্তু তারো চেয়ে প্রিয় হতভাগ্য স্বদেশ আমার।
একথা বুঝাতে তারে কোনদিন পারি নাই আমি—
দেহপ্রেম ক্ষণিকের, দেশপ্রেম সত্য চিরদিন।
নিরাশ্রয়া এই নারী, সঁপিলাম আপনার হাতে।
অগাধ সম্পত্তি তব শুনিয়াছি অণিমার কাছে,
যদি তার কিছু অংশ তারে দেন দুর্গত সেবায়;
কাজ ভালবাসে অণি, পরপারে শান্তি পাব আমি।
নমস্কার। অণিমারে লক্ষ্য করি নরেন্দ্রপ্রতাপ
কহিলেন, যাই অণি। তারপরে ঊর্ধ্বে হাত তুলি
আশীর্বাদ করিল নারীরে। নারী নিল পদধূলি।
আমি গোপীনাথ গুঁই স্তব্ধ দৃষ্টি দেখিলাম চেয়ে
নিমিষে মিলায়ে গেল চলমান বিদ্যুতের শিখা।

মোজেইক-বনিয়াদে পড়েছে কালের কশাঘাত,
পালঙ্কে পড়িয়া নারী, দুগ্ধফেননিভ শয্যাখানি
অবিরল জলধারে উপাধান গিয়াছে ভিজিয়া।
ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে। ডাকিলাম স্নেহরুদ্ধ স্বরে,
উঠ অণি, ডাকিতেছে হতভাগ্য দেশের সেবক
আমি গোপীনাথ গুঁই। ধীরে ধীরে উঠিল অণিমা।

ধীরে ধীরে আমি উঠিলাম। চারিটি শব্দের মাঝে
জীবনের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে রহিল লিখিত।
প্রণাম করিয়া চলি অগ্নিশিখা নরেন্দ্রপ্রতাপে
হাত ধরি আগে আগে পথ চলে শ্রীমতী অণিমা।

মোজেইক-বনিয়াদে কাল-কশাঘাত গেছে মুছে,
কীটজীর্ণ আসনের "আশীর্বাদ" জবল জবল করে।
আমি গোপীনাথ গুই দীনহীন দেশের সেবক—
জলতলে ললিতার দীর্ঘশ্বাসে ফুটেছে কমল।

বিপত্নীক

(৪৫৪ পৃষ্ঠার পর)

খাওয়া-দাওয়ার পর সুধীন আর যতীন দু ভাই বাবাকে বোঝাতে যায় নীচের ঘরে। যদুনাথ অচল অটল।

"এবার ওপরে চল বাবা!—নীচের ঘরটা বড্ড ড্যাম্প!"

"দেখ্ সুধী, বেশী বাড়াবাড়ি করিস নি ব'লে রাখছি। এর পর বাড়ির বাইরেই চ'লে যাব—আজও আমার হাত-পা আছে। দরকার হ'লে আবার চাকরি করবার ক্ষমতাও আছে আমার, জেনে রাখিস।"

নিরাশ হয়ে ছেলেরা যার যার ঘরে ফিরে যায়। পিস-শাশুড়ীর ঘরের সেই ভাসুরপোটি দোরগোড়া থেকেই ফিরে গেছেন বহুক্ষণ। কাদম্বিনী তা জানেন না। অগত্যা বিস্তর সাধ্যসাধনার পর পোড়া পেটে দু মুঠো দিয়ে একপাল নাতি নাতনী নিয়ে যথাস্থানে শুয়ে পড়লেন দুঃখে আর অভিমানে।

নীচের ঘরে যদুনাথ মুখুজ্যের রাগ অনেকটা প'ড়ে এসেছে। তবু আলো জবালিয়ে ব'সেই আছেন।

[illegible] নাতনীটি আর কারও কাছে শোয় না। অনেক আগেই নীচে নেমে এসেছে ঠাকুরদার কাছে। বিরক্ত হয়ে ডাকল, "দাদু এবার শোবে এস।"

যদুনাথ আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েন। নীচের ঘরটা কি এমন খারাপ? দোতলার সঙ্গে আর তিনি সংস্রব রাখবেন না। ঐ ফোক্‌লা বুড়ীর মুখ দেখলে আর তার মরাকান্না শুনলে জোয়ানেরও পরমায়ু ক'মে যায়!

উপরে কাদম্বিনীর গলা শোনা যায়—"ও বড়বউমা, শুয়ে পড়েছ নাকি? —বারান্দার আলোটা একবার জবালিয়ে দাও না, মিণ্টুকে কলঘরে নিয়ে যাচ্ছি।"

মিণ্টুটা ওর বাবার মতোই পেটরোগা হয়েছে। যদুনাথের স্পষ্ট মনে পড়ে—ছোটবেলায় সুধীনকে নিয়ে কতদিন রাত-দুপুরে বাইরে যেতে হ'ত তার মাকেও।

সেই কাদম্বিনী!......

একসঙ্গে যেন খণ্ড অখণ্ড অসংখ্য অগুণ্তি নানা যন্ত্রের এক 'অর্কেস্ট্রা' ওঠে বেজে। কাঁথি, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, শ্রীরামপুর—আরও কত জায়গা ঘুরে যদুনাথের মাথার মধ্যে নৃত্য শুরু ক'রে দেয় গোটা জীবনটা।.........

"দাদু!"

চমক ভেঙে যদুনাথ বলেন, "তুই এখনও ঘুমস নি দিদিমণি?"

"না।"

"ডাকছিস কেন?"

"ঠাক্‌মা বড্ড কেঁদেছে আজ।"

"কাঁদুক।" যদুনাথ আবার গরম হয়ে ওঠেন, "আর পাকামো না ক'রে তুই এবার ঘুমো দিকি নি মেয়ে!"

পাহাড়ের গুহার ছাদ হইতে ঝাড়ের ন্যায় একরকম প্রস্তরখণ্ড নীচের দিকে ঝুলিতে দেখা যায়। এই রকম পাথরকে ইংরেজীতে বলা হয় stalagmite। অস্ট্রেলিয়ার stalagmite বিখ্যাত। বহু ভ্রমণকারী এখানে ভ্রমণ করিতে আসিয়া থাকে। অস্ট্রেলিয়ার এই stalagmiteএর গুহার সৌন্দর্য নাকি অদ্ভুত।

ব্রহ্মদেশের মৌলমিন শহরের কাছে খাইওনগু গুহাতে stalagimite আছে, তাহা আমার দেখার সুযোগ হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালের পূজার ছুটি, রেঙ্গুনে বেড়াইতে আসিয়াছি। শহরের এদিক ওদিক ঘোরা, পোয়ে নাচ দেখা এবং সোয়ে ডাগন প্যাগোডাতে বার কয়েক যাওয়া হইয়া গিয়াছে। মৌলমিন শহর রেঙ্গুন হইতে বেশী দূরে নহে; মৌলমিন নাকি ব্রহ্মদেশের মধ্যে একটি রমণীয় শহর। ছোট্ট শহর, জনসংখ্যা ষাট হাজারেরও কিছু বেশী।

সন্ধ্যার পর রেঙ্গুনের গাড়িতে উঠিলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা, বেশী লোক নাই। চোর হইতে সাবধান থাকিবার নোটিস গাড়িতে লটকানো। কাচের জানালা আঁটিয়া দিলাম; অপরিচিত দেশ, তাতে আবার রাত্রি, একটু ভয় ভয় করিতেছিল। আধ ঘুমে, আধ জাগরণে রাত কাটিয়া যাইতে লাগিল। কিরকম দেশের ভিতর দিয়া আমাদের গাড়ি যাইতেছিল, বোঝার উপায় ছিল না, তবে ম্লান চন্দ্রালোকে মাঝে মাঝে অনচ্ছ পর্বতমালা দেখা যাইতেছিল।

প্রত্যুষে মার্তাবানে পেঁাছিলাম। মার্তাবান রেলপথের শেষ স্টেশন। রেঙ্গুন হইতে ১১ ঘণ্টায় ১৬৯ মাইল দূরে আসিয়াছি। মার্তাবান আমার দেখা হয় নাই। এ শহর ব্রহ্মদেশের একটি বাণিজ্যকেন্দ্র এবং বহু প্রাচীন কাল হইতেই পটারির জন্য বিখ্যাত। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে আরবদেশীয় পরিব্রাজক ইবন বাটুটা এ স্থান পরিদর্শন করেন।

মার্তাবান স্টেশন নদীর উপর। এখানে ফেরি স্টীমার অপেক্ষা করিতেছিল। আধ ঘণ্টা নদীপথে চলিলে মৌলমিনে পেঁাছানো যাইবে। ছোট্ট স্টীমার; গোয়ালন্দের স্টীমার হইতে অনেক ছোট। ব্রহ্মদেশে কয়লা পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় প্রচুর কাঠ। তাই এখানে দেখিলাম স্টীমারে কয়লার ব্যবহার নাই, কাঠের ব্যবহার। যদিও এ নদী পদ্মার মত অত চওড়া নয়, তবুও খুব প্রশস্ত। এক দিকে দেখি নারিকেলের সারি চলিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে, অন্য দিকে পাহাড়। সূর্যোদয়। পাহাড়ের আড়াল হইতে সহস্রশীর্ষ মরীচিমালীর উদয় হইতেছে। নদীর নীল জলে রাঙা আভা পড়িয়াছে। বীচিমালা আলোকে নৃত্য করিতেছে। একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাস, উপভোগ্য।

ধন্য আমি হেরিতেছি প্রভাতের আলো
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো।

জাহাজের দোতলা ডেক হইতে রেলিংএর ধারে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম, নদীপথে মোটে তো আধ ঘণ্টা সময়; যদি আরও কিছু দীর্ঘ সময় এই পথে কাটানো যাইত।

মৌলমিনে স্টীমার পেঁাছিল। একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিলাম। এক ব্রহ্মদেশীয় ভদ্রলোকের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। রেঙ্গুনের একজন বাঙালী উকিল আমাকে পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। মৌলমিনে দু-তিনজন বাঙালী আছেন, তাঁহাদের বাড়ি না উঠিয়া ব্রহ্মদেশীয়ের বাড়িতে আমার উঠিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। ভদ্রলোক আমাকে খুব আতিথেয়তার সঙ্গে গ্রহণ করিলেন। ইনি একজন ধনী ব্যবসায়ী, সেগুন বন এবং ধান-জমির মালিক। অনেক হাতিও তাঁর আছে।

দোতলা বাড়ি। একতলায় কাঠের পার্টিশন দেওয়া একটা কুঠরি আমার জন্য নির্দিষ্ট হইল। ভদ্রলোকের বৈঠকখানা এবং শয়নঘর দোতলায়। রাত্রে কৌচ, চেয়ার ইত্যাদি দেওয়ালের দিকে সরাইয়া দিয়া, মেঝেতে বিছানা পাতিয়া পরিবারের সকলেই এক ঘরেই শয়ন করিয়া থাকেন। একদিকে আবার এই ঘরের মধ্যেই
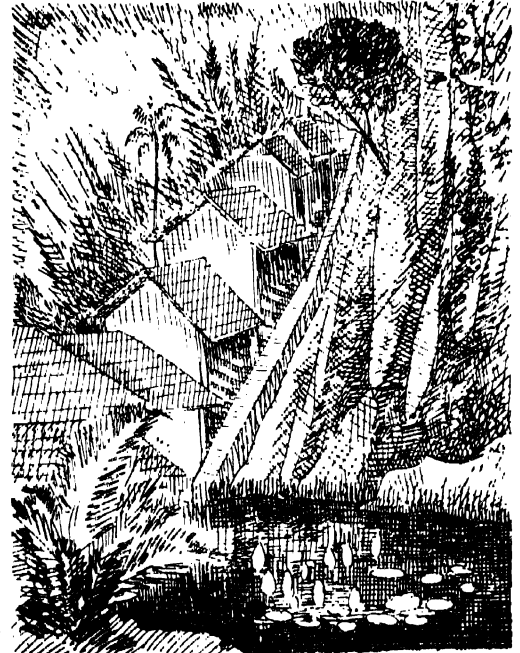
গুহা পথের সিঁড়ি

কাঠের বেড়া দেওয়া একটা প্রকোষ্ঠ আছে, তার কোনও জানালা নাই, শুধু এক দরজা আছে। দম্পতীযুগ এই প্রকোষ্ঠে থাকেন। রেঙ্গুনে আরও বর্মীর বাড়িতে এ রকম ব্যবস্থা দেখিয়াছি।

৩ নভেম্বর।—স্নান সারিয়া চা পান করিয়া ভ্রমণে বাহির হইলাম। গৃহকর্তা তাঁহার দুইজন কেরানীকে আমার সঙ্গে দিয়া দিলেন পথ প্রদর্শকের কাজ করার জন্য। একজন দুই-চারিটা ইংরেজী শব্দ জানেন, কোনও রকমে কাজ চালানো যায়।

শহরের বাহিরে পাহাড়; সুদৃশ্য বৌদ্ধবিহার আছে। সেখানে চলিলাম। বিহারে মনোরম কাঠের কাজ। বর্মী শিল্পীরা সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত। বিহারে বৃহৎ ব্রোঞ্জের ঘণ্টা ঝুলানো আছে। পাহাড় হইতে দূরের দৃশ্যাবলী খুবই সুন্দর। অরণ্যের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া রূপালী চাদরের মত নদী বহিয়া

গুহার ভিতর হইতে বাহিরের দৃশ্য

গিয়াছে। নদীর মাঝে দ্বীপ দেখা যাইতেছে। পাহাড়ের নীচে মৌলমিন শহরের ঘর বাড়ি। সবুজ রংএর মাঝে লাল রংএর টালির ছাদ মনোরম। শহরের পরে সবুজ প্রান্তর, দূরে দিকচক্রবালে পর্বতশ্রেণী। ঘন নীল এবং ঘন সবুজ হইতে পর্বতশ্রেণী ক্রমে ক্রমে ফিকা নীলে পরিণত হইয়াছে। সবুজ এবং নীল রংএর মনোহর সমাবেশ। প্রদর্শক আঙ্গুলে দিয়া দেখাইয়া দিলেন, ওই দূরে খাইওনগু পাহাড়, কাল আমরা সেখানে বেড়াইতে যাইব।

ব্রহ্মদেশীয়ের বাড়িতে আমার আহারাদির কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, সে বিষয়ে জানিবার ঔৎসুক্য কাহারও কাহারও হইতে পারে। গৃহস্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মদেশীয় আহার আমার চলিবে কি না, না চলিলে ভারতীয় আহারের বন্দোবস্ত করিবেন। আমি বলিলাম, ব্রহ্মদেশে যখন বেড়াইতে আসিয়াছি, এখানকার খাদ্যই খাইব; অন্য আহারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে না।

আহারের সময়, টেবিলে আহার্য সাজাইয়া দিয়া ভৃত্য দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল; আমি টেবিলে একা। ব্রহ্মদেশে সম্ভবত আতিথেয়তার এই রীতি, একলা খাইতে হয়। ভারতবর্ষে যেমন গৃহস্বামী অতিথির আহারের সময় উপস্থিত থাকেন এবং বলেন, এটা খান, ওটা খান, ব্রহ্মদেশে সম্ভবত সেরূপ রীতি নাই।

ভাত, ডাল, তরকারি, মাছের একটা কিছু, মাছ ভাজা, ডিমের কারি। ডিমের কারিটা দেখিলাম আমাদের দেশীয় জিনিস। ভারতীয় মুসলমানদের হোটেল হইতে হয়তো ক্রয় করা। অন্য জিনিসগুলি বর্মী রীতিতে প্রস্তুত, অর্থাৎ ব্রহ্মদেশের স্বনামখ্যাত 'নাপ্পি' ইহার ভিতর আছে। বাঙলার শিশুরাও ইহার মহিমা জানে—'বর্মার নাপ্পিতে বাপ রে কি গন্ধ'। তবে কি না যতটা ইহার দুর্নাম, জিনিসটা ততটা দুর্নামের ভাগী নহে। যদিও আমি ডিমের কারির উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিয়াছিলাম, তবে সব জিনিসই কিছু কিছু খাইয়া দেখিয়াছি। রান্নার সময় ইহার (নাপ্পি) গন্ধ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, রাস্তা দিয়া হাঁটিলেই টের পাওয়া যায়। কিন্তু রান্না হইয়া গেলে গন্ধের উগ্রতা তেমন থাকে না। এক রকম হাঁড়ির মধ্যে অনেক দিন রাখা হয়; সমস্ত পচিয়া গলিয়া গেলে, কাঁটা বাছিয়া ফেলা হয়। জিনিসটা তখন হয় ঘিএর মত এক তরল পদার্থ। সকল প্রকার ব্যঞ্জনে এই পদার্থ মসলার মত ব্যবহার করা হয়।

৪ নভেম্বর।—চা পান করিয়া খাইওনগু পাহাড়ে যাত্রা করিলাম। ট্যাক্সি, নৌকা, গরুর গাড়ি,—এই তিন প্রকার যানে যাইতে হইবে, পাহাড়ের পাদদেশে। সারাদিনের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া ছয় টাকা। গৃহস্বামীর লোকেরা গাড়ি ঠিক করিয়া দিলেন, তাঁহাদের পরিচিত গাড়ি। নদীর তীর পর্যন্ত গাড়ি চলিল; সন্ধ্যাকালে আমার ফিরিয়া আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে; কারণ এখানে ফিরতি পথে কোনও যান পাওয়া যাইবে না। সেজন্য সমগ্র দিনের জন্য গাড়ি ভাড়া করিতে হইয়াছে।

নৌকাঘাটে অনেক শামপান। তিনগলুইওয়ালা ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত নৌকা। দরদস্তুর করিয়া একখানা নৌকা ভাড়া করা গেল। ট্যাক্সির এক ছোকরা আমার সঙ্গে চলিল নৌকায়, দোভাষীর কাজ চালাইতে। ছোকরা অল্প অল্প হিন্দী জানে।

নদীর ভিতর একটি দ্বীপ আছে, যেমন আসামে ব্রহ্মপুত্র নদীতে উমানন্দ দ্বীপ। এই দ্বীপে এক বৌদ্ধ বিহার আছে, প্রথমে সেখানেই চলিলাম। নৌকার মাঝীকে মনে করিয়াছিলাম বর্মী, কারণ বর্মা ভাষায় সে কথা বলে এবং সে রকম পোশাক। কিন্তু নৌকার ছইএ দৃষ্টি পড়াতে দেখিলাম, বটতলার ছাপা বাঙলা পুঁথি 'গোলেবকাওলি।' প্রাচীন মুসলমানী বাঙলার কবিতার বই। মাঝীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একি? বাঙলা কিতাব দেখি, তুমি কি বাঙালী?" মাঝী উত্তর করিল, "আমি চাটগাঁওর মুসলমান।"

ব্রহ্মদেশের নদীতে আমি বাঙালী মাঝীর নৌকায় চলিতেছি, ইহা আমার কাছে বেশ মজার ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। এদিকে কলিকাতায় দেখি, গঙ্গার মাঝী সব হিন্দুস্থানী, শহরের ধোবা, নাপিত, মিস্ত্রী, কুলী সব হিন্দুস্থানী। রেঙ্গুনে দেখিয়াছি, ধোপা, নাপিত চট্টগ্রামের লোক। চাএর দোকানও দেখিয়াছি চট্টগ্রামের মুসলমানের। ব্রহ্মদেশে বহুসংখ্যক চট্টগ্রামের লোক নানাভাবে রোজগার করিতেছে, ইহা তাহাদের জীবনীশক্তির পরিচয় দিতেছে। ব্রহ্মদেশের আদমসুমারিতে তাহারা 'চিটাগোনিয়ান' নামে পরিচিত, তাহাদের বাঙালী বলিয়া পরিচয় নাই। চট্টগ্রামবাসীদের যাহাতে বাঙালী বলিয়া লেখা হয়, এরূপ আন্দোলন হইয়াছে।

নদীর ভিতরে ছোট্ট দ্বীপটি, বেশ সুন্দর। অনেক নারিকেল গাছ। দ্বীপে বিহারাধিপতি সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হইল; তিনি সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। তবে, তাঁহার সঙ্গে কোনও আলাপ করিতে পারি নাই। সেই ছোকরাটি দোভাষীর কাজ চালাইয়াছে। মধ্যাহ্নের আহার বৌদ্ধ বিহারে জুটিল। ভোরে মৌলমিন হইতে চা খাইয়া বাহির হইয়াছি, পথে আর কোথাও আহার জোটার সম্ভাবনা ছিল না।

নদীর ওপারে নৌকা ভিড়িল, এবার গরুর গাড়ির পালা। গরুর গাড়ি চলিল ধানখেতের ভিতর দিয়া, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র

গ্রাম। জীর্ণগৃহ দেখিয়া মনে হয়, বর্মীরা বড় নিঃস্ব। পথে এক জায়গায় এক বৃদ্ধা যাইতেছিল, তাহার মাথায় ঝুড়িতে তালের পাটালি গুড়। ছোকরাটি কিছু লইল, রাস্তায় খাওয়ার জন্য। দাম দিতে চাহিলে কিছুতেই লইল না, বলিল, বৃদ্ধা গাড়োয়ানের মাতা।

পাহাড়ের কাছাকাছি আসিলে দেখা যায়, পথের ধারে দুই সারিতে সুদীর্ঘ তাল গাছ। মাঝে মাঝে তালের গুড় অথবা তাড়ি প্রস্তুত হইতেছে।

খাইওনগু পাহাড় কতকটা কূর্মাকৃতি, চীনাছবির পাহাড়ের মত। বেশী উঁচু নয়, গাছপালা বেশী নাই। পাহাড়ের পাদদেশে ছোট জলাশয়, পদ্মফুল ফুটিয়া আছে। গোটাকয়েক কাঠের কুটীর জলাশয়ের উপর, যাত্রীদের বিশ্রাম করার জন্য। কাঠের পাটাতনের ফাঁক দিয়া জল দেখা যায়। চতুর্দিক নীরব জনমানবহীন। চড়ুইভাতি করিয়া, গল্পগুজব করিয়া, ছুটির দিন কাটাইয়া দেওয়ার আদর্শস্থল। মনে হয়, চীনা চিত্রকরেরা যেন এই রকম পরিবেশের ভিতরেই ছবি আঁকিয়াছে।

পর্বতের গুহা দর্শকদের জন্য সুরক্ষিত এবং পরিষ্কৃত। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম, সিঁড়ির উপরে দোচালা ছাদ আছে, যেমন রেঙ্গুনের সোয়েডাগন প্যাগোডায় উঠিতে সিঁড়ির উপর ছাদ দেখা যায়।

গুহার ভিতরে ছাদ হইতে পাথর খণ্ড, যেন ঝাড়ের ন্যায় ঝুলিতেছে। মনে হয় যেন রূপকথার দেশে আসিয়া পড়িয়াছি, পাতালে নাগলোকে। গুহার নানা শাখা প্রশাখা আছে। কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার, কোথাও সুড়ঙ্গ পথে হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হয়। কোথাও পথ এত সরু যে, প্রায় শুইয়া শুইয়া সরীসৃপের মত চলিতে হয়। অবশ্য ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি ময়লা করিয়া এপথে যাওয়ার আমার ভরসা হয় নাই। এক এক জায়গায় ভয় হয়, বুকটা যেন একটু দুরদুর করে, গুহার কোনও ফাটল হইতে যদি এক সাপ বাহির হইয়া পড়ে! সঙ্গে ওই ছোকরাটি এবং গরুর গাড়ির গাড়োয়ান পথপ্রদর্শকের কাজ করিতেছে।

এই গুহায় নানা বুদ্ধমূর্তি আছে। নানা আকারের; খুব ছোট হইতে খুব বৃহদাকার। উপবিষ্ট, দণ্ডায়মান ও শায়িত মূর্তি। বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীরা এখানে মাঝে মাঝে আসিয়া থাকে, কাজেই গুহাটি পরিচ্ছন্ন।

ফিরিবার সময় দেখি, গুহামুখে কয়েকটি বুদ্ধমূর্তির

প্যাগোডাতে ফুলওয়ালী

সম্মুখে আমার গাড়োয়ান দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতেছে, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'।

গুহামুখ হইতে বাহিরে তাকাইলাম। সবুজ, সবুজ। তালের সারির ভিতর হইতে মরকত মণির মত সবুজ ধান-খেত দেখা যাইতেছে। চোখ যেন সবুজের স্নিগ্ধতায় ডুবিয়া যায়, কী অপূর্ব শোভা!
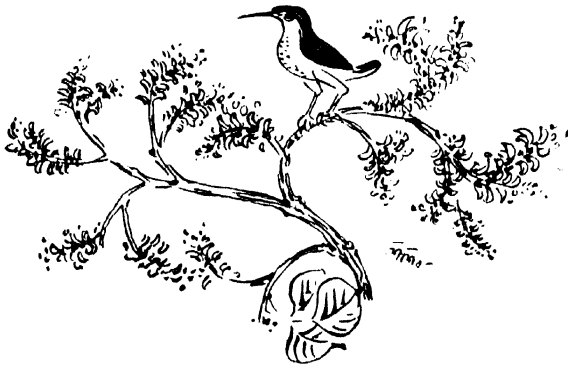
শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখুজ্যেদের বড় বউ সুশীলার ঘুমটা একটু বেশী। এখানে 'একটু' অর্থে 'বিলক্ষণ'। দুই ছেলের মা হইলে কি হয়, সন্ধ্যার পর ঘুমের ঝোঁকে সে আর চোখে কানে দেখিতে পায় না। দিনের বেলায় সুশীলা বাড়ির আর পাঁচজনের মতই খাটে খোটে, কিন্তু রাত আটটার পর সে অন্য মানুষ। তখন তাহার দ্বারা কাজের চেয়ে অকাজ হইয়া যায় বেশী। ঘুমের ঘোরে তখন যে সে কি করিতে পারে আর কি না পারে, তাহা একমাত্র বিধাতাপুরুষই বলিতে পারেন। তখন তাহাকে রাঁধিতে দিলে পায়সে চিনির বদলে লঙ্কাবাটা দিতে তাহার বাধে না; পরিবেশন করিতে বলিলে একজনের পাতে থালা-সুদ্ধ তরকারি ঢালিয়া দিয়া আর একজনের পাতে হাতাটা রাখিয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া আসিতে পারে। বিছানা করিতে বলিলে অর্ধেক বিছানা না পাতিয়াই সে সেইখানে শুইয়া সারা রাত ঘুমাইতে পারে।

একবার শাশুড়ী বলিলেন, "বউমা, যাও তো, এই আনাজের খোলাগুলো গোয়ালে গরুটাকে দিয়ে এস তো।" সেটা ছিল ছুটির দিন, কুটনা কুটিতে সন্ধ্যা পার হইয়াছিল। সুশীলার তখন ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল, সে গামলায় ভরিয়া আনাজের খোলা লইয়া কুটনার ঘর হইতে বাহির হইল। শাশুড়ীর চোখের আড়াল হইবার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যাইতে হইবে, কী করিতে হইবে কিছুই তাহার মনে রহিল না, যন্ত্রচালিতের মত সে গিয়া ঢুকিল বৈঠকখানায়। ঘরে আলো জ্বলিতেছে, সুশীলার শ্বশুর সূর্যকুমারবাবু টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া মকদ্দমার কাগজপত্র দেখিতেছেন, তিন-চার জন সম্ভ্রান্ত মক্কেল চারিপাশে বসিয়া। কোনওদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সুশীলা গিয়া গামলাসুদ্ধ আনাজ-খোসা দুম্‌ করিয়া টেবিলের উপর বসাইয়া দিল। শ্বশুর স্তম্ভিত হইয়া পুত্রবধূর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ কি? এখানে এসব কি হবে?"

পুত্রবধূ অম্লানবদনে বলিল, "মা পাঠিয়ে দিলেন।"

শ্বশুর অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বলিলেন, "তুমি ভিতরে যাও, আমি যাচ্ছি।"

নিমেষের মধ্যে সুশীলার চটকা ভাঙিয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি গামলা তুলিয়া লইয়া পালাইল। সূর্যকুমারবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "গিন্নীর যত বয়েস বাড়ছে, তত রাগ বাড়ছে। আজ নিজে বাজারে গেছলুম। মাছ পছন্দ মত পেলুম না, তাই আর আনি নি। গিন্নীর এদিকে মাছ না হ'লে চলে না, সে কথা মনেই ছিল না। তাই রসিকতা ক'রে ঝিকে দিয়ে আনাজের খোসাগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন। দেখি, অবিনাশকে ব'লে দিই, কাল যাতে একটা বড় দেখে মাছ আনে। মানভঞ্জন করতে করতেই জীবনটা গেল।"

সূর্যকুমারবাবু নিজের রসিকতায় খুশী হইয়া নিজেই হাসিতে লাগিলেন, অগত্যা মক্কেলদেরও হাসিতে হইল। কিন্তু কেহই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। সুশীলার চেহারা দেখিয়া দাসী বলিয়া ভুল করিবার কোনও কারণ ছিল না। জিতেনবাবু বলিলেন, "আমার পুকুরে মাছ থাকতে আপনাকে মাছ কিনতে হবে কেন? কাল সকালে পাঠিয়ে দেব খন।"

সেদিন সুশীলার নির্যাতন একটু অতিরিক্তই হইয়াছিল। তার পরও শাশুড়ী সাত দিন তাহার সহিত কথা কন নাই, কিন্তু শ্বশুর জিতেনবাবুর প্রেরিত বিরাট রুই মাছের মুড়াটির সদ্‌ব্যবহার করিয়া আদেশ দিয়াছিলেন, সন্ধ্যার পর সুশীলাকে যেন কেহ কোনও কাজের ভার না দেয়। এ আদেশটা দেওয়া হইয়াছিল অভিমানের বশেই, কিন্তু সুশীলার ইহাতে শাপে বর হইল। প্রথম প্রথম দিন কতক সন্ধ্যার পর সে চোখে লঙ্কার হাত ঘষিয়া, কাটা আঙুলের ডগায় নুন মাখিয়া এবং অন্যান্য বহুবিধ সম্ভব ও অসম্ভব উপায়ে জাগিয়া থাকিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন তাহার চক্ষুলজ্জাও চলিয়া গিয়াছে, মেজাজও কিছু তীক্ষ্ন হইয়া উঠিয়াছে। বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে পাঁচজন আসিলে সে একটু সাবধান হয়, কিন্তু গোলমাল বেশী দিন চলিলে তাহার ধৈর্যের এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের বাঁধ ভাঙিয়া যায়, সে বেপরোয়া হইয়া উঠে।

পল্লীগ্রামের চিরাচরিত প্রথানুসারে সুশীলার বিবাহ অল্প বয়সেই হইয়াছিল। সে তখন সবে তেরয় পা দিয়াছে। চন্দ্রকুমারের বয়সও মোটে সতের, সে কেবলমাত্র ম্যাট্রিক পাস করিয়া কলেজে ঢুকিয়াছে। ফুলশয্যার রাত্রে যখন চারিদিক নিষুতি হইল এবং বর নববধূর সঙ্গে একটু নিভৃত আলাপের সুযোগ পাইল ততক্ষণে সুশীলা অঘোরে ঘুমাইতেছে। চন্দ্রকুমার তাহাকে অনেকবার আস্তে আস্তে ডাকিল, তার পর ধীরে ধীরে এবং পরে ক্রমশ জোরে জোরে ঠেলা দিল, তার পর পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিল। শেষে কিছুতেই কিছু করিতে না পারিয়া বেশ জোরে একটা চিমটি কাটিল। সুশীলা এতক্ষণ দুই চারিটা অস্পষ্ট "উঃ, আঃ, কেন বিরক্ত করছ" প্রভৃতি ছোটখাটো বাক্যব্যয় করিয়াছিল, এইবার আর তাহাও করিল না। বিনা বাক্যব্যয়ে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া স্বামীর গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের একটি চড় বসাইয়া দিল। বয়সের তুলনায় তাহার কবজির জোর কিছু বেশীই ছিল, আর সেই তুলনায় চন্দ্রকুমারের গালটি ছিল অতিরিক্ত নরম। সে

ক্ষীণজীবী ভাল মানুষ, স্কুলে পড়াশোনায় ভাল ছিল বলিয়া শিক্ষকেরা এবং বাড়িতে চিররুগ্ন বলিয়া বাপ মা কখনও তাহার গায়ে হাত তুলিতেন না, পত্নীর এই আকস্মিক প্রণয় নিবেদনের জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বেচারী সশব্দে ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আত্মীয়া এবং প্রতিবেশিনীর দল, যাঁহারা অনেক আশা করিয়া আড়ি পাতিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই ঠেলাঠেলি করিয়া অনেক কষ্টে দরজা খুলাইলেন।

সুশীলা তখন কাঁচা ঘুম ভাঙ্গায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, হাত তুলিয়া বলিতেছে, "লজ্জা করে না? খোকা! চ্যাঁচালে ফের মারব।"

আত্মীয়ার দল তাড়াতাড়ি মাঝে পড়িয়া চন্দ্রকুমারকে উদ্ধার করিলেন। সেও চোখের জল মুছিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, জীবনে সে আর সুশীলার মুখ দেখিবে না। জীবনের অর্থ অবশ্য তিন মাস, অর্থাৎ শাশুড়ী ভয় পাইয়া সুশীলাকে বাপের বাড়ি পাঠাইবার পর যত দিন আনেন নাই ততদিন। কিন্তু ইহার পর হইতে সাধ্যপক্ষে চন্দ্রকুমার ঘুমন্ত পত্নীকে জাগাই-বার চেষ্টা করিত না, এমন কি মাঝরাত্রে ছেলে কাঁদিলেও না। সেক্ষেত্রে বেশী বিপদ দেখিলে সে চুপচাপ দরজা খুলিয়া সরিয়া পড়িত, বাড়ির লোক আসিয়া দেখিত ছেলে পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছে আর সুশীলা পাশে শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। প্রথম প্রথম ইহা লইয়া রাগারাগি হইত, সুশীলাকে বকুনি খাইতে হইত।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরঘরে ভাতের হাঁড়ি লইয়া গিয়া, জলের গ্লাসে ডাল ঢালিয়া দিয়া এবং অন্যান্য নানা বিচিত্র অকীর্তি করিয়া সে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মেজো দেওর নক্ষত্রের বিবাহের পর উপস্থিত আর একজন কাজের লোক বাড়িয়াছে, তাহার ঘুটমাও লোকের গা-সহা হইয়া গিয়াছে; সুতরাং সুশীলাকে আর কেহ কিছু বলে না। কেবল বড় খোকার রাত্রে বায়না বেশী বলিয়া সে শাশুড়ীর ঘরে আশ্রয় পাইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "ও খুনে বউকে বিশ্বাস নেই, ও ঘুমের ঘোরে ছেলে খুন করতে পারে।"

সুশীলার মেজ ননদ থাকিতেন রাওলপিণ্ডিতে। তাঁহার স্বামীর ছুটি না থাকায় এবং অসুখবিসুখের জন্য আসিবার সুবিধা না হওয়ায় চন্দ্রকুমারের বিবাহের সময় তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তার পরেও নানা কারণে পাঁচ বৎসর তাঁহারা দেশে আসেন নাই; সম্প্রতি অনেক দিনের পাওনা ছুটি জমা করিয়া তাঁহারা কয়েক মাসের জন্য বাড়ি ফিরিয়াছেন। বাপের বাড়িতে পা দিবার এক ঘণ্টার মধ্যেই ননদ ভাজে খুব ভাব হইয়া গেল। সুমিত্রা সুশীলার চেয়ে বছর ছয়েকের বড়, তাঁহার ছোট ছেলেটির অন্নপ্রাশনে সুশীলাকে মাথার দিব্য দিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া তিনি শ্বশুর বাড়ি চলিয়া গেলেন। রাজশাহি জেলার একটি অজ পাড়াগাঁয়ে তাঁহার শ্বশুরবাড়ি।

অন্নপ্রাশনের পূর্বদিন সূর্যকুমারবাবুর জ্বর হইল, অগত্যা সুশীলার শাশুড়ীও নাতির অন্নপ্রাশনে যাইতে পারিলেন না। নক্ষত্র কলিকাতায় কলেজে পড়ে, তাহার স্ত্রী বাপের বাড়ি গিয়াছে। অগত্যা তত্ত্বের জিনিসপত্র এবং টাকাকড়ি সঙ্গে দিয়া শাশুড়ী বড় ছেলে ও বড় বউকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পাঠাইলেন।

সুশীলা সারা দিন খুব খাটিল, দশ হাত বাহির করিয়া খাটিল। ননদের শাশুড়ী শ্বশুর নাই, কাজকর্ম করিবার লোকেরও অভাব। তিনি কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ভাজের হাতে ভাঁড়ারের চাবি এবং সমস্ত কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। সন্ধ্যা সাতটার পর মধ্যাহ্নভোজনের পালা শেষ হইলে পাড়ার নারী ও পুরুষ নিমন্ত্রিতেরা যখন বিদায় লইলেন তখন আর সুশীলার শরীর বহিতেছে না। সে বলিল, "ঠাকুরঝি, আমি ভাই এবার কিন্তু একটু শোব। শরীরটা যেন কেমন করছে!"

মেজ ঠাকুরঝির তখনও সুশীলার ঘুমের সহিত পরিচয় ছিল না, তিনি ভয় পাইয়া বলিলেন, "যা খাটুনি খেটেছ সারাদিন! কিছু অসুখবিসুখ করে নি তো? ভালয় ভালয় —" বলিতে বলিতে তিনি ভ্রাতৃজায়ার ললাটে হাত দিয়া দেখিলেন।

সুশীলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, না, তেমন কিছু নয়, এমনি শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে। আজ আর কিছু খাব না।"

সুমিত্রা বলিলেন, "না খেলে আরও শরীর খারাপ করবে। তা তুমি বরং ততক্ষণ আমার ঘরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নাওগে, আমি খাবার সময় তোমায় ডাকব 'খন। লোক তো আর বেশী বাকী নেই, এবার যে কজন খাবে সে আমিই সামলে নিতে

সে দুধে চুমুক দিতে আরম্ভ করিল

পারব। তুমি বরং একটি উপকার কর, আমার ছোট জাএর ছেলে দুটো আর আমার ছেলেটা ওই ঘরে ঘুমচ্ছে; ঝিকে বলি, তোমার খোকাকেও ওই ঘরে দিয়ে আসুক। তুমি একটু নজর রেখো আর দুধ গরম হলে ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব, সবকটাকে এক এক বাটি গিলিয়ে দিও। আমার কাজ সেরে যেতে দেরি হবে অনেক।"

সুশীলা বলিল, "বেশ তো, তুমি পাঠিয়ে দিও।"

সে দ্রুতপদে হাই চাপিতে চাপিতে দোতলায় উঠিল এবং মেজ ননদের বিছানায় আসিয়া ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার পর এক মিনিটের মধ্যেই তাহার মাঝরাত্রি।

সুমিত্রার ঝি প্রথমত সুশীলার ছেলেকে শোয়াইয়া দিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে সে আবার একটা জামবাটি করিয়া

প্রায় দুই সের দুধ গরম করিয়া আনিয়া তাহাকে ডাকাডাকি ও ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। সুশীলা জড়িতচক্ষে একবার চাহিয়া দেখিল; বলিল, "রেখে যাও না বাপু, আমি খাইয়ে দেব এখন ঠিক সময়ে।"

ঝিয়ের তখন অনেক কাজ বাকী, তাহার দাঁড়াইবার সময় ছিল না, সে কর্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে পাছে দুধটা বিড়ালে খায় বলিয়া একটা থালা আনিয়া জামবাটির দুধটা ঢাকা দিল এবং ছোট বাটি ও ঝিনুক তাহার পাশে গুছাইয়া রাখিয়া গেল। সুশীলাও তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিল অর্থাৎ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে লাগিল।

আটটা বাজিল, নয়টা বাজিল , দশটা বাজিল। প্রথমে সুমিত্রার ছোট জাএর ছোট ছেলেটা উঠিয়া খুঁতখুঁত করিতে লাগিল, তার পর সুশীলার বড় ছেলে জাগিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিল। তার পর সুমিত্রার ছোট ছেলে এবং তাঁহার ছোট জাএর বড় ছেলেও ফোঁপাইতে আরম্ভ করিল। সকলেরই বিছানা ভেজা, সকলেরই পেটে ক্ষুধার জ্বালা! ফোঁপানি ক্রমে ক্রন্দনে দাঁড়াইল, ক্রন্দন চীৎকারে দাঁড়াইল, চীৎকারের সুর পঞ্চম হইতে সপ্তমে উঠিল। সমবেত শিশুকণ্ঠের আর্তনাদে বাড়ির লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

সুমিত্রা ভাঁড়ার ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, তাঁহার ছোট জা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন, বাড়ির ঝি চাকর আত্মীয় প্রতিবেশী বিপদে সহানুভূতি জানাইতে অর্থাৎ মজা দেখিতে ছুটিয়া আসিল। সকলেই আসিয়া অবাক! সুমিত্রা সুশীলাকে নাড়া দিয়া বলিলেন, "কি ঘুম বাপু তোমার বড় বউ! ছেলেগুলো বাড়ি মাথায় করছে, আমি বলি পড়ে গেল, না, পুড়ে গেল! এখনও ওদের খেতে দাও নি? নাও, ওঠো, খাইয়ে দাও ওগুলোকে। দুধ তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। আমার এখনও অনেক কাজ বাকী, আমাদের খেতে সেই একটা বাজবে। ফের শোয়! ওঠ ভাই, লক্ষ্মীটি।"

সুমিত্রার ঠেলাঠেলিতে সুশীলার ঘুমটা বোধ হয় একটু পাতলা হইয়া আসিয়াছিল, সে উঠিয়া বসিয়াছিল। সুমিত্রার শেষবারের ঝাঁকানিটাতে সে শুইতে গিয়াও দ্বিতীয়বার শুইতে পারিল না, বিরক্তভাবে চাহিল। জামবাটির ঢাকা সরাইয়া বলিল, "বাবাঃ, আর পারি না, রোজ রোজ এত বিরক্তও করতে পার তোমরা!" বলিতে বলিতে দুই হাতে জামবাটিটা তুলিয়া ধরিয়া মুখখানা যতদূর সম্ভব বিকৃত করিয়া সে দুধে চুমুক দিতে আরম্ভ করিল।

"ও মা, বড় বউ!"—সুমিত্রার মুখের কথা মুখেই রহিল, তিনি কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন। এক নিঃশ্বাসে কোঁৎ কোঁৎ করিয়া দুই সের দুধ নিঃশেষ করিয়া সুশীলা হাঁফ ছাড়িল। বলিল, "হ'ল, আশ মিটল তোমাদের? এত জ্বালাতনও করতে পার!"

"সত্যি!" সুমিত্রা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বাড়ির সমস্ত দুধ পায়স শেষ হইয়া গিয়াছে, রাত্রে মাথা খুঁড়িলেও আর এক ছটাকও দুধ পাওয়া যাইবে না। চারিটি অবোধ শিশু ক্ষুধায় অধীর হইয়া চীৎকার করিতেছে। সুমিত্রা বলিলেন, "সত্যি, বড় অন্যায় ওদের।"

সকাল ৯-৩০
ওঃ! অসহ্য মাথার যন্ত্রণা!
সকাল ৯-৪০
আঃ! সারিডন খেয়ে যন্ত্রণা দূর হ'ল!
Saridon ANALGESIC TABLETS
সারিডন
সকল প্রকার বেদনা দূর করে

সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর চোখ

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

সকল জাতির কাব্যেই নারীর রূপ লইয়া বড় বাড়াবাড়ি দেখা যায়। কবি নারীকে সবটা মানবী বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন না বলিয়াই এই বিপত্তি। তাঁহাদের মতে নারীর অর্ধেকটা মাত্র মানবী বাকী অর্ধেকটা কল্পনা।

অর্ধেক মানবী হইলেও রক্ষা ছিল। কিন্তু কার্যত তাহা হয় নাই। সাধারণ মানবের কাছে নারী ষোল আনাই নারী। কিন্তু কবিদের কাব্যে নারীর অন্তত তের চৌদ্দ আনা অংশ কল্পনা।

তাই মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া কত যে কথা কাটাকাটি হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আবহমানকাল ধরিয়া এই প্রলাপ চলিয়া আসিতেছে, অনন্তকালেও তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে না। কেবল ভঙ্গীটার পার্থক্য হইবে মাত্র। দুদিন আগে যাহার চোখ দেখিয়া কবি ইন্দীবরলোচন বলিয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, দুদিন পরে আর একজন কবি তাহাদেরই স্বজাতির আর একজনের সেই রকমই দুটি চোখ দেখিয়া 'স্টীল নীল' চক্ষু বলিয়া মৌলিকতা দেখাইতেছেন।

স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনা করিতে বলিলে কবিগণ যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। উপমার প্রসঙ্গে চাঁদ, তারা, সমুদ্র, পর্বত, নীলোৎপল, অপরাজিতা, হরিণ, খঞ্জন, চকোর, পুঁটিমাছ, ডালিম, তেলাকুচা, কলার গাছ, শকুনির কান, হাতির শুঁড় (এবং আজিকার যুগে আপেল, নাইটিঙ্গেল, রেশম, স্টীল, ব্রোঞ্জ) প্রভৃতি দেখা-অদেখা জানা-অজানা সম্ভব-অসম্ভব যে কোনও বস্তুর অবতারণা করিতে কবিদের কিছুমাত্র বাধে না। শাস্ত্র তাঁহাদের সহায়। আমরা ঈর্ষা করিয়া কি করিব? নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ।

কবিরা শুধু যে সৃষ্টিকার্যে দক্ষ তাহা নয়, দৃষ্টিকার্যেও তাঁহাদের নৈপুণ্য অনন্যসাধারণ। অতএব 'প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ লাগি' বলিয়াই তাঁহারা নিরস্ত হন না। অঙ্গগুলির বিস্তারিত বিবরণ দিয়া তবে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। সংস্কৃত সাহিত্য হইতে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন দিব।

বর্তমান প্রবন্ধে সর্বাঙ্গের স্থান নাই। তাই আমাদের উদ্দেশ্যের পরিসরকে যথাসম্ভব সংকুচিত করিয়া দুইটি চক্ষুর মধ্যেই নিবদ্ধ করিয়াছি।

চক্ষুর প্রতি পক্ষপাতের কারণ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে চিরকুমার সভার রসিকের উক্তি উদ্ধার করিতে হয়।—

"চোখ দুটির মত এমন আশ্চর্য সৃষ্টি আর কিছু হয় নি। শরীরের মধ্যে মন যদি কোথাও প্রত্যক্ষ বাস করে, সে ওই চোখের উপরে।"

সংস্কৃত কবি তরুণীর দুটি নয়নকে "নিঃসীম-শোভা-সৌভাগ্যম্" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—

নিঃসীম-শোভাসৌভাগ্যং
নতাঙ্গ্যা নয়নদ্বয়ম্।
অন্যোন্যালোকনানন্দ
বিরহাদিব চঞ্চলম্॥

রবীন্দ্রনাথকৃত বাঙলা অনুবাদটি নিম্নে দেওয়া হইল।—

আনতাঙ্গী বালিকার
শোভা সৌভাগ্যের সার
নয়নযুগল।
না দেখিয়া পরস্পরে
তাই কি বিরহভরে
হয়েছে চঞ্চল॥

নয়ন যুগলের চাঞ্চল্য অনেক অকবিকেও যখন চঞ্চল করিয়া তোলে, তখন কবিদের যে বিচলিত করিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এই চাঞ্চল্য প্রকাশের জন্য তাঁহারা আকাশের খঞ্জন, অরণ্যের হরিণ, সরোবরের শফরী প্রভৃতির শরণাপন্ন হইয়াছেন।

মুখারবিন্দোপরিভাগসংস্থং
নেত্রদ্বয়ং খঞ্জনমামনন্তি।

মুখপদ্মের উপরিভাগে স্থাপিত চক্ষু দুইটিকে দুইটি খঞ্জন বলিয়া বোধ হয়।

আবার কেহ বলিলেন,—

চলদ্ভৃঙ্গমিবাম্ভোজ
মধীরনয়নং মুখম্।

চঞ্চল নয়ন বিভূষিত মুখখানি দেখিলে মনে হয় যেন শতদলের উপর ভ্রমর উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিতেছে।

আবার কেহ বা কান্তাদেহকে সরোবর কল্পনা করিয়া নেত্রদ্বয়কে শফরী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বাহূ দ্বৌ চ মৃণালমাস্যকমলং
লাবণ্যলীলাজলং
শ্রোণী তীর্থশিলাচ নেত্রশফরী—
ধম্মিল্লশৈবালকম্। ইত্যাদি

নারীর নয়ন বর্ণনা করিতে হরিণাঙ্গনাকেই বেশীর ভাগ স্মরণ করা হইয়াছে।

আমনন্তি পিকবধূরিব
পশ্যতি হরিণীব। ইত্যাদি

কোকিলের মত মধুর বচন এবং হরিণীর ন্যায় চঞ্চল দৃষ্টিবিভ্রম।

মধুরঃ সুধাবদধরঃ
পল্লবতুল্যোতিপেলবঃ পাণিঃ।
চকিতমৃগলোচনাভ্যাং
সদৃশী চপলে লোচনে তস্যাঃ॥

অমৃতের ন্যায় মধুর তাহার অধর, পল্লবের ন্যায় কোমল তাহার করতল, চকিত মৃগের লোচনের ন্যায় চঞ্চল তাহার নয়নযুগল।

অচকিত মৃগের নয়ন চাঞ্চল্য যথেষ্ট বিবেচিত হয় নাই বলিয়া চকিত মৃগের অবতারণা করা হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে চকিত হরিণীর উল্লেখ সুপ্রচুর।—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা
পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী
প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ॥

কিন্তু এই চঞ্চল দৃষ্টি কে কাহার নিকট হইতে লইয়াছে? সে একটা সমস্যা। কবি চিন্তা করিয়া এ সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছেন না।—

প্রবাতনীলোৎপল-নির্বিশেষম্
অধীরবিপ্রেক্ষিত মায়তক্ষ্যা।
তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্য
স্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ॥

সমীরান্দোলিত নীলোৎপলের ন্যায় বিশালনয়নার এই যে চঞ্চল দৃষ্টি, ইহার মূল অধিকারী কে? মৃগাঙ্গণগণের নিকট হইতে ইনি পাইয়াছেন, না মৃগাঙ্গণারাই ইঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে?

এ সংশয় অনেকের মনেই উদিত হইয়াছে।—

ঋণীকৃতা কিং হরিণীভিরাসীদ্
অস্যাঃ সকাশান্নয়নদ্বয়শ্রীঃ।

হরিণীগণই কি তাঁহার নিকট হইতে লোচনশ্রী ঋণ করিয়াছে? না কি?

কুমারসম্ভবে কালিদাস এ সংশয় নিরাকৃত করিয়াছেন।—

পুনর্গ্রহীতুং নিয়মস্থয়া তয়া
দ্বয়েপি নিক্ষেপ ইবার্পিতং দ্বয়ম্।
লতাসু তন্বীষু বিলাসচেষ্টিতং
বিলোলদৃষ্টং হরিণাঙ্গনাসু চ॥

ব্রতধারিণী পার্বতী যেন কোমল লতিকার কাছে তাঁহার বিলাসভঙ্গিমা এবং হরিণাঙ্গনাদের কাছে তাঁহার বিলোল দৃষ্টি

জমা রাখিলেন। ব্রত সমাপন হইলে এই দুইটি সম্পত্তি আবার তিনি ফিরাইয়া লইবেন। এখানে স্পষ্টই বুঝা গেল লোল-দৃষ্টির মূল অধিকারী কে।

এ তো গেল চাঞ্চল্যের কথা। কিন্তু চাঞ্চল্যই তো সব নয়। নয়নের পক্ষে লাবণ্যের আবশ্যকতা চাঞ্চল্য হইতেও অধিক। তাই কবি কল্পনা করিয়াছেন।—

যদিস্যান্মণ্ডলে সক্ত
মিন্দোরিন্দীবরদ্বয়ম্।
তদোপমীয়তে তস্যা
বদনং চারুলোচনম্॥

চন্দ্রমণ্ডলে যদি যুগল নীলোৎপল স্থাপন করা যায়, তবেই তাহার অম্লান মুখশ্রী এবং চারুলোচন শোভার তুলনা দেওয়া সম্ভব।

ব্যাধত্ত ধাতা মুখপদ্ম যস্যাঃ
সম্রাজমম্ভোজকুলে খিলেঽপি।
সরোজরাজৌ সৃজতোদসীয়াং
নেত্রাভিধেয়াবত এব সেবাম্॥

অম্ভোজকুলে মুখপদ্মই যখন সম্রাটের আসন অধিকার করিয়া বসে, তখন চক্ষু দুইটি যে সামন্তরাজ হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি।

বহত্যস্যা দৃষ্টির্বিকচ নবনীলোৎপলতুলাম্।
অখণ্ডস্যাভিখ্যাং বদনমিদমিন্দোঃ কলয়তি॥

প্রস্ফুট নব নীলোৎপলের ন্যায় স্নিগ্ধ তাহার দৃষ্টি। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুভ্র সুন্দর তাহার আননশ্রী।

দৃষ্টিকে শুধু নীলোৎপলের সহিত তুলিত করিয়াই কবি খুশী হন নাই। তিনি দেখিয়াছেন, নীলেন্দীবরনয়নার দৃষ্টি যেখানে যেখানে পড়ে, সেখানে সেখানে নীলপদ্মের বৃষ্টি হইতে থাকে।

যতো যতো স্যা নিপতন্তি দৃষ্টয়
স্ততস্ততঃ শ্যামসরোজবৃষ্টয়ঃ।

কিন্তু ইহাতেও কবির পরিতৃপ্তি হইল না। নীলোৎপল যতই সুন্দর হউক না কেন, বরাঙ্গনার লোচনের সহিত তাহার কোনও প্রকার সামঞ্জস্য কল্পনা করাই চলে না। অবশ্য বিধাতা একদিন রমণীর নয়নের সহিত উপমা দেওয়ার জন্যই ইন্দীবরের সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

ইন্দীবরং লোচনয়োস্তুলায়ৈ
নির্মায় যত্নেন বিধিঃ কদাচিৎ।
অতুল্যতাং বীক্ষ্য ততো রজাংসি (১)
নিক্ষিপ্য চিক্ষেপ স পঙ্কমধ্যে॥

বিধাতা যখন দেখিলেন, লোচনের সহিত নীলপদ্মের কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই, তখন তিনি উহাতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পঙ্কমধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

মন্মথদেবের তূণে অনেক শর। তাহার মধ্যে নারীর কটাক্ষই চূড়ান্ত শক্তিশালী। এই শর যদি কার্যসাধনে অপারগ হয়, তাহা হইলে বেচারা পুষ্পধনুর আর লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকে না। কাজেই এই ব্রহ্মাস্ত্রটিকে সর্বদা যথোচিতভাবে শান দিয়া রাখিতে হয়।

সন্মার্গে তাবদাস্তে প্রভবতি পুরুষ
স্তাবদেবেন্দ্রিয়াণাং
লজ্জাং তাবদ্বিধত্তে বিনয়মপিসমা
লম্বতে তাবদেব।
ভ্রূচাপাকৃষ্টমুক্তাঃ শ্রবণপথজুষো
নীলপক্ষ্মাণ এতে
যাবল্লীলাবতীনাং হৃদি ন ধৃতিমুষো
দৃষ্টিবাণাঃ পতন্তি॥

লজ্জা, বিনয়, সাধুতা প্রভৃতি পুরুষের যাহা কিছু গুণ সবই ততক্ষণ পর্যন্ত স্থির থাকে, যতক্ষণ না লীলাবতী কামিনীর ধৈর্যনাশী দৃষ্টিবান হৃদয়ে পতিত হয়।

যত্র যত্র চলতে শনৈঃ শনৈঃ
সুভ্রুবো নয়নকোণবিভ্রমঃ।
তত্র তত্র শতপত্রধোরণী
তোরণীভবতি পুষ্পধন্বনঃ॥

বিলাসবতীর নয়নযুগলের কটাক্ষ যে যে স্থান স্পর্শ করে, সেই সেই স্থানে পুষ্পধনুর পদ্মতোরণ নির্মিত হয়।

কেহ কেহ আবার নারীর ভ্রূলতাকে মদনের কার্মুক বলিতে রাজী নহেন। তাঁহাদের মতে নারীর চক্ষু নীলোৎপল এবং ভ্রূলতা যেন সেই নীলপদ্মের উপর স্থাপিত ভ্রমর পঙ্‌ক্তি।

কামকার্মুকতয়া কথয়ন্তি
ভ্রূলতাং মম পুনর্মতমন্যৎ।
লোচনাম্বুরুহয়োরুপরিস্থং
ভৃঙ্গশাবকততিদ্বয়মেতৎ॥

কাহারও কাহারও মতে নারীর ভ্রূলতা এবং মদনের পুষ্পধনু—ইহাদের মধ্যে তুলনাই চলে না।

তস্যাঃ শলাকাঞ্জন নির্মিতেব
কান্তি ভ্রুবোরায়তলেখয়োর্যা।
তাং বীক্ষ্য লীলাচতুরামনঙ্গঃ
স্বচাপসৌন্দর্যমদং মুমোচ॥

আয়তলোচনার যে ভ্রূলতাযুগল তাহা দেখিলে মনে হয়, কেহ যেন অঞ্জনশলাকা দিয়া তাহা অঙ্কিত করিয়াছে। এতদিন মদনদেবের ধারণা ছিল সৌন্দর্যে তাঁহার পুষ্পধনু অদ্বিতীয়, কিন্তু এই ভ্রূধনুর সৌন্দর্য দেখিয়া তাঁহার সে গর্ব চূর্ণ হইয়াছে।

খঞ্জনগঞ্জন, ইন্দীবরগর্বহর, নিঃসীমশোভাসৌভাগ্য যে লোচনযুগল তাহাও অমণ্ডিত থাকিতে পায় না। যাহা স্বভাবতঃই সুন্দর, তাহার ভূষণে প্রয়োজন কি? কবি তাই বলিতেছেন—

লোচনে হরিণগর্বমোচনে
মা বিদূষয় নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ
কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতঃ॥

"হরিণগর্বমোচন লোচনে
কাজল দিয়ো না সরলে।
এমনি তো বাণ নাশ করে প্রাণ
কি কাজ লেপিয়া গরলে?"

[রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ]

আমরাও বলি তাহার আর কাজ নাই। যদি অঞ্জন লাগাইতেই হয় তো কজ্জলে কি প্রয়োজন? একটি বিন্দু অশ্রু হইলেই দিব্য কাজ চলিয়া যাইবে।

"অলকে কুসুম না দিও
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিও।
কাজলবিহীন সজলনয়নে
হৃদয় দুয়ারে ঘা দিও।"

(১) রাজাংসি শব্দের দুই অর্থ,—ধূলি ও পুষ্পরেণু।

ঘূর্ণি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রমশ দূরে চক্রবালে বন্দরের আলো অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া আসিল। তার পরেই নারন্ধ্র অন্ধকার এবং অতলস্পর্শ জলধারা ছাড়া দক্ষিণে বামে কোনও কিছু আর দেখিবার রহিল না। উজানের মুখে সিরসির করিয়া খানিকটা বাতাস দিতেছিল বটে, কিন্তু মন্থর স্রোতে নৌকা সামনের দিকে অগ্রসর হইয়াই চলিল। পদ্মার উপর দিয়া কোনাকোনি পাড়ি জমাইলে লক্ষ্মীপুরের বাজার; সেখান হইতে কুমারহাটির খাল বাহিয়া আরও কয়েক ঘণ্টার পথ। অর্থাৎ বাড়ি পৌঁছিতে সেই সকাল হইয়া যাইবে।

বিশাল পদ্মা আর অনন্ত আকাশ—মাঝখানে অন্ধকারে একটি ছেদহীন আবরণ যেন একটা সীমাহীন অখণ্ডতায় ইহাদের একাকার করিয়া দিয়াছে। দাঁড় টানিবার এবং ফেলিবার নিয়মিত ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কালো জলে জলতরঙ্গ বাজাইয়া নৌকা কোন্ একটা অনির্দেশ লক্ষ্যের পানে আগাইয়া চলিয়াছে। কপালের উপর হাত রাখিয়া চোখের দৃষ্টি একাগ্র তীক্ষ্ণ করিয়া চাহিলেও এপারে ওপারে একটি গাছপালা বা আলোর আভাস চোখে পড়ে না। এ বৎসর বান হইয়াছে অস্বাভাবিক এবং প্রমত্ত পদ্মা আত্ম-বিস্তারের সময় যেন মাত্রা রাখিতে চায় নাই। মাঝীরা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই পাড়ি জমাইয়াছে—একবার ওপারের তীর ধরিতে পারিলে যেমন করিয়া হ'ক লক্ষ্মীপুরের বাজার খুঁজিয়া নেওয়া শক্ত হইবে না।

যে দুইজন দাঁড় টানিতেছিল, তাহাদের একজন বলিল, "একটু সামলে চলিস ভাই, বড় পাকটা কাছেই আছে।"

হাল হইতে উত্তর আসিল, "ভয় নেই, টেনে যা। সে আরও ঢের দক্ষিণে—অনেক নীচে।"

ছইএর বাহিরে বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে মথুর ঘোষাল অনেক কথাই ভাবিতেছিল। কতদিন পরে বিদেশ হইতে দেশে ফিরিতেছে সে—আত্মীয় পরিজনেরা তাহাকে দেখিয়া যে কী পরিমাণে আনন্দিত হইবে, সে কথা কল্পনা করিয়াও সে পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই তাহার ভাবনায় বাধা পড়িয়া গেল। অন্ধকারে তাকাইয়া তাকাইয়া দৃষ্টি এতক্ষণে অনেকটা স্বচ্ছ হইয়া গেছে; তা ছাড়া নক্ষত্রখচিত আকাশের ছায়া পদ্মার ঘোলাটে জলে প্রতিফলিত হইয়া একটা তরল আলোক-দীপ্তির মত যেন গতিশীল জলের উপর নাচিতেছিল। সেই আলোকে মথুর দেখিয়া বলিল,—"একখানা নৌকো আসছে না এদিকে?"

পিছন ফিরিয়া যাহারা দাঁড় টানিতেছিল তাহারা দেখে নাই, কিন্তু হালের মাঝী লক্ষ্য করিয়াছিল। সন্দিগ্ধ হইয়া কহিল, "হাঁ, একখানা বড় নৌকো আসছে কর্তা। কিন্তু আলো নেই কেন? এই রাত্তিরে গাঙ্ পাড়ি দিচ্ছে অথচ—" দ্বিধাগ্রস্ত মুখে সে থামিয়া গেল।

ভয়ে এবং সংশয়ে মথুর ঘোষালের গলা ও বুক শুকাইয়া উঠিল।

"হাঁ রে, এ তল্লাটে ভয় নেই তো কোনও রকম?"

"নেই তা কি ক'রে বলব কর্তা। জল-পুলিস ঘুরে বেড়ায় বটে, কিন্তু দু-চারটে ডাকাতির খবর তো হামেশাই পাওয়া যায়।"

—"বলিস কি রে!" ভয়ে মথুরের প্রায় কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম। রাত্রির এই স্নিগ্ধতাভরা শীতল বাতাসেও তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। ভাঙা গলায় কহিল, "হাঁক ডাক করব?"

যে দুইজন দাঁড় টানিতেছিল, তাহারা দাঁড় বন্ধ করিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বসিল। একজন নীরসভাবে কহিল, "এত রাত্তিরে মাঝ-নদীতে হাঁকাহাঁকি ক'রে লাভ নেই কর্তা। এ বড় বিষম জায়গা। ধারে কাছে দু-একখানা এক-মাল্লাই থাকলেও এখন তারা কিছুতেই ভিড়বে না।"

হালের মাঝীর রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল, "চইর বাগিয়ে ধর মকবুল। যদি ডাকাতই হয়—"

মকবুল সংক্ষেপে শান্ত স্বরে উত্তর দিল, "খেপেছ ইয়াকুব চাচা!"

বাস্তবিক, তাহাদের স্বার্থ বা ইহাতে কতটুকু! তাহাদের অতি দীন, ছিন্ন জীর্ণ দুই চারটি তৈজসপত্র যে কাহাকেও দস্যুতার লোভে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারে সে কথা বিশ্বাস করিবার নয়। অনর্থক পরের জন্য লড়িতে গিয়া তাহারা মৃত্যু ডাকিয়া আনিবে কেন!

ইতিমধ্যেই ছিপের মত দীর্ঘ আকারের একখানা কালো নৌকা তাহাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে—জলের উপর দিয়া তাহা উড়িয়া আসিতেছে যেন। মকবুল হাঁকিয়া কহিল, "নৌকা সামাল—আপন ডাইন।"

আপন ডাইনে নৌকা সামলাইবার কোনও গরজ কিন্তু তাহাদের দেখা গেল না। তাহার পরিবর্তে কর্কশ গলায় প্রশ্ন আসিল, "ভাড়া কোথাকার?"

ইয়াকুব উত্তর দিল, "কুমারহাটি।"

"কুমারহাটি? বেশ, বেশ। তা একটু তামাক খাওয়াতে পার মিয়া?"

মকবুল চড়া সুরে বলিল, "না তামাক আমাদের নেই।"

ও নৌকা হইতে জবাব আসিল, "আছে দাদা, আছে। কেন কথা বাড়াচ্ছ, ভাল মানুষের মতো হুঁকোটা বাড়িয়ে দাও, এক ছিলিম টেনেই নিই।"

খট্-খট্-খটাৎ—ও নৌকা সোজা আসিয়া এ নৌকার গায়ে ভিড়িয়া গেল।

ইয়াকুব গর্জিয়া কহিল, "গায়ে এসে পড়লে যে! তফাত যাও—তামাক আমরা খাইনে, হুঁকো-টুকো আমাদের নৌকায় হবে না।"

—"থাম হে সম্মুন্দী, আস্তে। ভাল কথায় তো দেবার পাত্তর নও, বাঁকা আঙ্গুলেই ঘি ওঠাতে হবে। আচ্ছা, তামাক তোমাদের দিতে হবে না, আমরা নিজেরাই খুঁজে নিচ্ছি।"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা আর অবকাশ দিল না। মুহূর্তে তিন চারজন প্রায় এক সঙ্গেই এই নৌকায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। একটা প্রচণ্ড দোলা খাইয়া নৌকাটা ঠিক হইতে না হইতেই ইহারা দেখিতে পাইল ঠিক চোখের সামনেই একখানা প্রকাণ্ড রামদার তীক্ষ্ণধার উজ্জ্বল দেহ এবং তিন-চার খানা সড়কির ক্ষুধার্ত ফলক অন্ধকারের মধ্যে ঝকিয়া উঠিতেছে। মনে হইল যেন পদ্মার অতল জল ফুঁড়িয়া একদল প্রেতমূর্তি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সকলের আগে যে ছিল, সে বিশাল বাবরি নাচাইয়া এবং রামদা খানাকে বার কয়েক মাথার উপরে ভাঁজিয়া লইয়া কহিল, "ভাল চাও তো বের ক'রে দাও সব। একটু সাড়া শব্দ ক'রেছ কি টুকরো টুকরো ক'রে নদীর জলে ভাসিয়ে দেব।"

মথুর অস্ফুটভাবে কি একটা হাউমাউ করিয়া উঠিতে গেল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই সে অনুভব করিল, তাহার ঠিক হৃৎপিণ্ডের উপরটিতে বুকের চামড়ায় আলপিনের মত তীক্ষ্ণ মৃদু অনুভূতি—ল্যাজার একটি দীর্ঘ ফলক অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণভাবে জায়গাটি স্পর্শ করিয়া আছে।

"চুপ! নইলে এক্ষুনি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে ফেলব।"

মথুর বলির পাঁঠার মত কাঁপিতে লাগিল। লুট-পাট শুরু হইয়া গেল। বাক্স বিছানা হইতে আরম্ভ করিয়া জার্মান সিলভারের পান খাইবার ছোট কৌটাটি অবধি তাহারা লইতে ভুলিল না। স্পর্শ করিল না শুধু মাঝীদের ছেঁড়া বিছানা, গোটা দুই লোহার কড়াই এবং তিন-চার খানা কলাইকরা এনামেলের থালা।

মাঝীরা গলুইএর উপর পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ মকবুল যেন সচেতন হইয়া উঠিল, সন্ত্রস্ত স্বরে প্রশ্ন করিল, "জলে এত টান কিসের ইয়াকুব চাচা?"

টান! এতক্ষণে সেদিকে সকলের খেয়াল হইল। সত্যিই তো, প্রবল একটা স্রোতের টানে নৌকা দু'খানা যেন ঝড়ের পালে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ টান স্বাভাবিক নয়, পদ্মার স্রোত হইতে এ স্রোত অনেক প্রখর!

সমস্ত অবস্থাটাই যেন এক মুহূর্তে বিবর্তিত হইয়া গেল। রামদা লইয়া যে এতক্ষণ ইহাদের শাসাইতেছিল, তাহার হাত হইতে উদ্যত অস্ত্র নামিয়া আসিল। ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে সে কহিল, "বড় পাকের টান!"

বড় পাকের টান! পদ্মার উত্তরাঞ্চলে সে পাকের খ্যাতি কে না শুনিয়াছে! চুম্বক যেমন একটা অনিবার্য আকর্ষণে লোহাকে কাছে টানিয়া আনে, তেমনি এই বড় পাকও বহু দূরে হইতে নৌকা বা যা কিছু পায়, সকলের অজ্ঞাতেই নিজের বুভুক্ষু জলচক্রের মধ্যে সেগুলিকে গ্রাস করিতে লইয়া আসে। সাপের চোখের মত তাহার আকর্ষণ প্রভাব, হুঁশিয়ার মাঝিরা দূরে হইতেই সে প্রভাব অনুভব করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে; যাহারা পারে না, তাহারা সে অনিবার্য নিষ্ঠুর আকর্ষণে মোহমুগ্ধের মত ছুটিয়া আসে, বিশাল ঘূর্ণি প্রচণ্ড কয়েকটি আবর্তে কয়েকবার তাহাদের ঘুরাইয়াই শোঁ করিয়া নিজের অতল গর্ভে তলাইয়া লয়—জলের উপরে কোনও খানে এতটুকু চিহ্ন রাখিয়া যায় না। তাহার পরে হয়তো দুমাইল দূরে একটা বাঁকের মুখে কয়েকটা দেহ বা একখানা উবুড় করা নৌকা ভাসিয়া ওঠে। নিয়তির মতই ইহা দুর্বার, নির্মম এবং অপ্রতিহত। এই পাকের টানে একবার পড়িলে কোনও মাঝীর সাধ্য নাই যে নৌকা বা প্রাণ বাঁচাইয়া ঘরে আনিতে পারে।

ডাকাতির উত্তেজনাতেই হ'ক বা নিজেদের অজ্ঞাতেই হ'ক, কোন্ অশুভক্ষণে যে নৌকা পাকের টানের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা ইহারা বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিল যখন, তখন আর সময় ছিল না। নৌকার গায়ে আঘাত করিয়া পদ্মার জল ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ক্রূর হাসির মত বাজিতে লাগিল। শিকারীরও শিকারী আছে—মানুষের পশুশক্তিকে আয়ত্ত করিতে প্রকৃতির কয়েক মুহূর্তের বেশী প্রয়োজন করে না।

লুটের মাল যেমন ছিল পড়িয়া রহিল, সড়কি, বল্লম, রামদা ফেলিয়া দুই দলেই প্রাণপণে দাঁড় টানিতে লাগিল। উজানমুখী যে বাতাসটুকু এতক্ষণ বহিতেছিল, কোন্ সময় তাহা পড়িয়া গেছে, সুতরাং পাল খাটানো অসম্ভব; আশপাশে কোথাও তীরের আভাস নাই যে গুণটানা চলে। একমাত্র দাঁড়, হাল এবং বৈঠার উপরে আশ্রয় করিয়াই নৌকার গতি ফিরাইতে হইবে, কিন্তু জলের অপরাজেয় আকর্ষণের কাছে সে চেষ্টা একান্তই অবান্তব।

নৌকা বাঁচিবে না—নৌকা বাঁচিতেই পারে না। ঝুপ ঝাপ করিয়া সব জলে ঝাপাইয়া পড়িল, কোনও মতে বাহুবলে যদি আত্মরক্ষা করা যায়, যদি কোথাও চড়া বা অন্য কিছুর আকস্মিক একটা আশ্রয় জুটিয়া যায়! নৌকা দু'খানা তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাদের উপর বসিয়া থাকা মানেই অনিবার্য মৃত্যু।

* * * * * *

জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল বটে, কিন্তু স্রোতের প্রবল টানে কে যে কোন্ দিকে বুদ্বুদের মত নিশ্চিহ্ন হইল, তাহার আর হদিস মিলিল না। সে আকর্ষণে মথুর ঘোষালও কুটার মত ঘূর্ণির রাক্ষস গর্ভের দিকে ভাসিয়া চলিল। মনে হইতে লাগিল, পিছন হইতে মৃত্যু দূতের দল শত শত শীতল হাত বাড়াইয়া তাহাকে পাতালের অন্ধকারে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে—ক্ষমা নাই, করুণা নাই। জলের গর্জন ক্রমশঃই একটা ক্রুদ্ধ জন্তুর ক্রমপরিস্ফুটমান আক্রোশধ্বনির মত বাড়িয়া উঠিতেছে, আহ্বানকারী মৃত্যুচক্র আর কত দূরে?

সহসা জলের মধ্যে স্থির হইয়া থাকা কী একটা শক্ত জিনিসে মথুরের পা বাধিয়া গেল। দুহাতে সেটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সে অনুভব করিল, পাড় ভাঙিয়া পড়া একটা নারিকেল গাছের আশ্রয় সে পাইয়াছে। পাড় কবে ভাঙিয়াছে, পদ্মা তীরের সীমানা কত-দূরে সরাইয়া নিয়াছে ঠিক নাই, তবুও নাতি-গভীর জলে, স্রোতের প্রবল টান উপেক্ষা করিয়াও কেবলমাত্র মাথাটুকু জাগাইয়া নারিকেল গাছটা এখনও দাঁড়াইয়া আছে, হয়তো এই মুহূর্তে তাহাকে আশ্রয় দিবার প্রয়োজন বলিয়াই।

পিঠের উপর দিয়া খরস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, আশ্রয় পাইলেও মথুর অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে, বাহুতে যে প্রচুর শক্তি আছে, তাও নয়। আর একটু দুর্বল হইয়া পড়িলেই নিঃসংশয়ে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে নদীর করুণার মুখে।

অবশিষ্ট শক্তিটুকু একত্র করিয়া মথুর বহু কষ্টে নারিকেল গাছের আগায় আসিয়া পৌঁছিল। জল হইতে মাথাটি হাত তিনেক মাত্র উপরে; কিন্তু পাতা বা ডগা বলিতে বিশেষ কিছুই এখন অবশিষ্ট নাই। কালক্রমে শুকাইয়া শুকাইয়া তাহারা পদ্মার জলে ঝরিয়া পড়িয়াছে, শুধু দুএকটা শুকনো ডাঁটা ন্যাড়া মাথাটার শ্রীবর্ধন করিতেছে মাত্র।

নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ ঘিরিয়া এতক্ষণ অন্ধকারের যে উৎসব চলিতেছিল, এই মুহূর্তে তাহা যেন ফিকা হইয়া আসিতেছে। ভাঙা ভাঙা কয়েক টুকরা মেঘের আড়াল হইতে এতক্ষণে চাঁদ উঠিল। খণ্ড চাঁদ, অনুজ্জ্বল আলো, তবু সেই ম্লান করুণ আলোয় পদ্মার এই নিশীথ রূপটাকে আরও রহস্যময়, আরও ভয়ংকর বোধ হইতে লাগিল। নারিকেল গাছটা স্রোতের বেগে থরথর করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে, দীর্ঘ-দিন বর্ষার জলে ডুবিয়া থাকিয়া তাহার দাঁড়াইবার শক্তিও কমিয়া আসিতেছে। ক্রমশ। তিল-তিল করিয়া তলার মাটি ক্ষইয়া যাইতেছে, যে কোনও সময়েই নিঃশেষে উপড়াইয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু সে-সব কথা ভাবিবার অবকাশ মথুরের এখন ছিল না। শেষ অবলম্বনটুকুকে জড়াইয়া ধরিয়া সে মূর্ছাতুরের মত পড়িয়া রহিল।

বোধ হয় পাঁচ মিনিটও নয়। হঠাৎ সে টের পাইল নারিকেল গাছটায় আর একটা জোর ঝাঁকুনি লাগিয়াছে। চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া আর একটি মানুষ তাহারই মত এই গাছটিকে অবলম্বন করিয়াছে। তাহার সমস্ত শরীরটাই জলের মধ্যে—ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথা এবং দু'খানি বাহু কেবল জলের উপর ভাসিতেছে।

তাহাকে দেখিয়া এত দুঃখের মধ্যেও খানিকটা বিস্ময় ও কৌতুকের হাসি মথুরের মুখে ভাসিয়া উঠিল। রামদা ঘুরাইয়া এই লোকটাই না শাসাইতেছিল তাহাদের? এত-ক্ষণ জলে ভিজিলেও তাহাকে চেনা যায়, দীর্ঘ জুলপি এবং সে ঝাঁকড়া বাবরি একবার যে দেখিয়াছে, সে আর সহজে ভুলিবে না। দশ মিনিটের মধ্যেই তাহার বীর-পরাক্রম চুপসিয়া কী হইয়া গিয়াছে! ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মথুর সশব্দে হাসিয়া ফেলিল।

হাসির শব্দে লোকটা চোখ তুলিয়া উপরের দিকে চাহিল এবং চাঁদের আলোয় জামা-জোড়া আঁটা মথুর ঘোষালকে সে শুধু দেখিল না, চিনিলও।

"ওঃ, আগে থেকেই তুমি এখানে এসে জুটেছ!"

সমস্ত ভয় এবং আতঙ্ক—মরণের একে-বারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মথুরের মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছিল; এমন কি, সময়োচিত এক ধরনের প্রসন্নতাতেও তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিতেছিল যেন।

মথুর শ্লেষ করিয়া কহিল, "সেও তোমাদেরই দয়ায়। কিন্তু যাত্রা তোমাদেরও শুভ হয় নি আজকে।"

বাবরি কয়কে মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বড় রকমের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

পদ্মার প্রবল কলকল্লোলে সে নিশ্বাস মথুর শুনিতে পাইল না।

"হুঁ, সেটা ঠিক। পুলিসের হাতে কয়েকবার পড়েছি, কিন্তু এমন বিপদে আর কখনও পড়ি নি।"

মথুর হাসিয়া কহিল, "দোষ কিন্তু আমাদের নয়।"

"না।" লোকটা হিংস্রভাবে দাঁত দিয়া ঠোঁটটাকে কামড়াইতে লাগিল। "কাল পূর্ণ হয়েছিল আর কি। ধর্মের ঢাক হাওয়ায় বাজে কিনা। বউ কতবার বলেছে এমন কাজ আর ক'রো না, এত পাপ ধর্মে সইবে না। সে কথা যদি তখন কানে তুলতাম, তা হ'লে কি এমন অপঘাতে মরতে হয়!"

আশ্চর্য,—এই মুহূর্তে তাহার কণ্ঠস্বরে কী কাতরতাই না প্রকাশ পাইল। বাহির হইতে যতখানি কঠোর বলিয়াই মনে হ'ক, সাধারণের চাইতে দুর্বলতা তো ইহাদের কোন অংশেই কম নয়। বরঞ্চ এমন একটা আকস্মিক আবেগে লোকটার কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল যে, মথুর রীতিমত বিস্ময় বোধ করিল।

সে বলিয়াই চলিল, "আষাঢ় মাসে যখন বৌ মরে গেল, তখনই ভেবেছিলুম এ কাজ ছেড়ে দেব। জমি-জিরেত যা আছে, তাতে ক'রেই বেশ চলে যাবে। কিন্তু হতভাগা হিরুই নানান্ খানা ক'রে টেনে নিয়ে এল, বললে, চল্ কালাচাঁদ, চল্—"

বোঝা গেল, লোকটির নাম কালাচাঁদ। কিন্তু মথুরের মনে হইল, চাঁদের জায়গায় পাহাড় বসাইয়া দিলেই নামটা তাহাকে মানাইত ভাল।

জল হইতে খানিকটা উপরে উঠিবার চেষ্টা সে করিল, কিন্তু বসিবার জায়গা কোথাও নাই। বৃষ্টি-বাদলে শ্যাওলা পড়িয়া গাছটা পিছল হইয়া আছে, প্রতি মুহূর্তেই হাত ফস্‌কাইয়া যাইতে চায়। আগায় ভাল জায়গাটি মথুর অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, কালাচাঁদ একবার ঈর্ষাতুর চোখে সেদিকে চাহিল। পা দুইখানা তাহার তখনও জলের মধ্যে—পদ্মার তীক্ষ্ণ স্রোত সুতীব্র বেগে তাহার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে; হাতের মুষ্টি একটু শিথিল হইলেই টানিয়া লইয়া যাইবে অদূরবর্তী ঘূর্ণির ফেনায়িত প্রচণ্ড আবর্তের মাঝখানে।

কালাচাঁদ আবার কহিল, "তোমার বাড়ি তো কুমারহাটি, না?"

মথুর বলিল, "হুঁ।"

"আমার বাড়ি হল রায়পুরা। একই দেশের মানুষ তা হ'লে।"

"তা বই কি। না হ'লে আর সর্বনাশ করতে আসবে কেন?"

জ্যোৎস্না আরও একটু উজ্জ্বল হইলে দেখা যাইত, সত্য সত্যই এক ধরনের লজ্জায় কালাচাঁদের কালো মুখ বেগুনে হইয়া উঠিয়াছে।

"ও কথা ব'লে আর লজ্জা দিও না। এখন আমাদের দু'জনেরই এক দশা। তোমার নামটি কি?"

মথুর নাম বলিল।

"ব্রাহ্মণ?" কালাচাঁদ এক হাত জিব কাটিয়া কহিল, "ব্রহ্মত্ব লুট করতে গিয়েছিলুম, তাইতেই বুঝি এ দশা ঘটল ঠাকুর।"

"আর কখনও বুঝি ব্রহ্মত্ব লুট কর নি?"

"না জেনে ক বার করেছি জানিনে, কিন্তু জানিতে একবার মাত্তর করেছিলুম। আর তার ছ মাস বাদেই তো বউ মরল। পাপ কখনও চাপা থাকে না বাবাঠাকুর, ফল তার ভুগতেই হয়। ব্রাহ্মণ—ওরেঃ বাপ্-রে, সাক্ষাৎ আগুন!"

ব্রাহ্মণ-ভক্তির চোট দেখিয়া ঘোষাল মুগ্ধ হইয়া গেল। অথচ মাত্র আধঘণ্টা আগেই রামদা বাগাইয়া এই লোকটাই যে তাহাকে কাটিতে আসিতেছিল, সে কথা এখন কে বিশ্বাস করিবে!

তার পর খানিকক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। কালো আকাশ আর কালো জল—খানিকটা কাক-জ্যোৎস্না যেন তাহাদের মাঝখানে কুয়াশার একটা পর্দার মত দুলিতেছে। পাখার শব্দ বাজাইয়া গোটা কয়েক বাদুড় উড়িয়া চলিয়াছে, মরা জ্যোৎস্নায় তাহাদের ছায়া পদ্মার উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। নীচে জলের অবিশ্রাম গতি—সময়ের প্রবাহ-ধারার সঙ্গে সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন কলরোলে বহিয়া চলিয়াছে, যেন সময়ের প্রান্ত রেখায় না পেঁীছিয়া সে ধারা আর থামিবে না। কাল যেমন তাহার বিরামবিহীন গতিচ্ছন্দে সম্মুখে যাহা কিছু পায়, তাহাকেই ভাঙিয়া চুরিয়া অগ্রসর হয়, তেমনি করিয়া কীর্তিনাশা পদ্মাও এই স্রোতে ছুটিয়া চলিয়াছে, তীরে তীরে তাহার ফেনার অট্টহাসি আর তরঙ্গের সংঘাত যেন ধ্বংসের উল্লাস জাগাইতেছে।

মানুষের দেহ মন,—দুইটা বস্তুকেই বিচিত্র বলিতে হইবে। এমন অবস্থার মধ্যেও মথুরের যেন ঝিম্ ধরিয়া আসিতেছিল, চট্ করিয়া তাহার চটকা ভাঙিয়া গেল, সত্য সত্যই সে ঝিমাইতেছে নাকি! একবার হাত খুলিয়া পড়িয়া গেলেই আর দেখিতে হইবে না—একটি আকর্ষণে পদ্মা একেবারে পনের ষোল হাত দূরে টানিয়া লইয়া যাইবে। তখন ফিরিয়া আবার এই আশ্রয়টির কাছে আসা সামর্থ্যের বাহিরে।

চোখ মেলিয়া মথুর চাহিয়া দেখিল, তেমনি জলের মধ্যে আধখানা দেহ ডুবাইয়া কালাচাঁদ প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। চাঁদ তখন আরও একটু উপরে উঠিয়াছে—প্রায় মাথার উপর। সেই আলোয় মথুর আরও স্পষ্ট করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল, মনে হইল যেন একটা শিথিল ক্লান্তি তাহার সমস্ত দেহ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ হে?"

ক্লিষ্ট স্বরে কালাচাঁদ উত্তর দিল, "ভাল নেই ঠাকুর মশাই। জলে পড়বার আগেই কেমন একটা চোট্ পেয়েছিলুম, ভিজে ভিজে আর জোর পাচ্ছি নে গায়ে। বেশীক্ষণ হাত দিয়ে যে ধ'রে রাখতে পারব এমন ভরসা নেই।"

"ওপরে উঠতে পারবে?"

উপরে দুইজনের জায়গা হইবার কথা নয়, তবু এই পরম বিপদের মুহূর্তে একান্ত শত্রুও কেমন করিয়া যেন মথুরের সমবেদনা আকর্ষণ করিয়া বসিল। শুধু আকর্ষণ করিল যে তাহাই নয়, সে নিজের আশ্রয়ের অর্ধেকটুকুও এখন কালাচাঁদকে ভাগ করিয়া দিতে চায়।

কিন্তু অবস্থাচক্রে কেমন করিয়া যেন সে উদারতা কালাচাঁদকে আসিয়াও স্পর্শ করিয়াছে।

"না ঠাকুর মশাই, দুজনার জায়গা হবে না ওখানে। তা ছাড়া শরীরে এমন বল নেই যে, আর একটুও উঠে আসতে পারি। হাত পা আমার সব অসাড় হয়ে যাচ্ছে।"

"তা হ'লে?"

"আর উপায় নেই ঠাকুর মশাই, মরণ আমার ঘনিয়ে এসেছে। তার আগে—"

ঝর—ঝর—ঝরাং—

কোথা হইতে একটা প্রচণ্ড শব্দ মুহূর্তে চারদিক মুখর করিয়া তুলিল। পদ্মা ভাঙিতেছে—ভাঙিয়া চলিয়াছে। মানুষের নীড়, মানুষের সর্বস্ব। কোথায় যেন মস্ত একটা ধ্বংস নামিল। সাপের মত ক্রূর কুটিল জলরেখা, খলের মত দাঁত দিয়া মাটি কাটিতে থাকে, সকলের অগোচরে মাইলের পর মাইল জুড়িয়া মাটির বনিয়াদকে দংশনে দংশনে একেবারে ঝাঁঝরা করিয়া দেয়। তার পর একদিন নিষুতি মধ্যরাত্রে, অসহায় মানুষ যখন সর্বংসহা ধরণীর উপর সমস্ত বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া পরম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করিতেছে, তখন অকস্মাৎ টলমল করিয়া আকাশ বাতাস টলিয়া ওঠে। পরক্ষণেই ভাঙনের একটা রুদ্র গর্জন। সকালে উঠিয়া দেখা যায়, ঘর নাই, বাড়ি নাই, মানুষের বসতির চিহ্নটি অবধি নাই—দিক্ দিগন্তব্যাপী জল আর জল।

ঝর—ঝর—ঝরাং—

পদ্মা ভাঙিতেছে, আরও ভাঙিতেছে। ওই শব্দটা যেন পৃথিবীর একটানা একটা কান্নার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে—মরণের রাক্ষস মুষ্টির নীচে অসহায় শিশুর অন্তিম আর্তনাদ।

(শেষাংশ ৪৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সুন্দরবনের লৌকিক দেবতা

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

ছত্রভোগ হইতে নৌকাযোগে শ্রীচৈতন্যদেবের উড়িষ্যা-যাত্রা প্রসঙ্গে প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে "চৈতন্য ভাগবত"-কার বৃন্দাবন দাস সুন্দরবন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,

কূলেতে উঠিলে বাঘে লৈয়া সে পলায়।
জলেতে পড়িলে সে কুম্ভীরে ধরি খায়॥

বিগত চারি শত বৎসরে বাঙলা দেশ তথা সুন্দরবনের বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিন্তু সুন্দরবনের ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের দৌরাত্ম্য ঠিক সমভাবেই বর্তমান আছে। আজও যাহারা সুন্দরবনে চাষ-আবাদ করিতে অথবা কাঠ কাটিতে যায়, তাহাদিগকে পদে পদে বাঘ ও কুমিরের ভয়ে সতর্ক থাকিতে হয়। সুন্দরবনের কৃষক ও কাঠুরিয়াগণ কেবলমাত্র বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া এই ভীষণ শত্রুর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। ইহাদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাই তাহারা বহু দেবদেবী ও পীরপয়গম্বরের শরণাপন্ন হয়। হরিঠাকুর, মহাদেব, মনসা, রক্ষাকালী, ওলাবিবি প্রভৃতি পৌরাণিক ও গ্রাম্য দেবদেবীগণ ব্যতীত সুন্দরবনের কৃষক ও কাঠুরিয়াগণের দ্বারা পূজিত কয়েকজন লৌকিক দেবতাও আছেন। ইঁহাদের মধ্যে গাজী, দক্ষিণরায় ও বনবিবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সুন্দরবনেরই বিশিষ্ট বনদেবতা; সুন্দরবন ও নিকটবর্তী অঞ্চলের বাহিরে ইঁহাদের বড় একটা প্রভাব নাই। কিন্তু সুন্দরবনের বনরাজ্যে ইঁহাদের অপ্রতিহত প্রতাপ, সুন্দরবনে ইঁহারা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের নিকট হইতেই পূজা প্রাপ্ত হন।

গাজী ও দক্ষিণরায় মূলত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহাদের অদ্ভুত কার্যকলাপ পরে ইঁহাদিগকে বন-দেবতার পদে উন্নীত করিয়াছে। বনবিবি মুসলমান পল্লী কবিগণের দ্বারা সৃষ্ট সম্পূর্ণ অবাস্তব চরিত্র। সম্ভবত দক্ষিণরায়ের প্রাধান্য খর্ব করিবার জন্যই বনবিবির উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছিল।

গাজী, দক্ষিণরায় ও বনবিবির সম্বন্ধে একাধিক মুসলমান গ্রাম্য কবির রচিত "কেচ্ছা" বা কাহিনীর পুঁথি দেখিতে পাওয়া যায়। আড়াই শত বৎসরেরও অধিক পূর্বে কলিকাতার নিকটবর্তী নিমতা গ্রাম নিবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব কবি কৃষ্ণরাম দাস "রায়মঙ্গল" নামে দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্যসূচক এক কাব্য বা পাঁচালি রচনা করেন। তাঁহার লেখা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পূর্বে মাধব আচার্য নামে অপর এক কবি দক্ষিণরায়ের গীত রচনা করেন। কিন্তু তাহা দক্ষিণরায়ের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি কবি কৃষ্ণরামকে স্বপ্নাদেশ দিয়া তাঁহার দ্বারা নূতন করিয়া নিজের মাহাত্ম্য লেখান এবং কবিকে বর দেন—

তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে॥

পুঁথি ও পাঁচালির মধ্যে বহু অবান্তর বিষয়, অতিরঞ্জন ও অসংগতি দৃষ্ট হয়। উহা বাদ দিলে গাজী, দক্ষিণরায় ও বনবিবির উপাখ্যান সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত করা যাইতে পারে।

বিরাটনগরের অধিপতি সেকেন্দর শাহ প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু নৃপতি বলিরাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যা অজুপাসুন্দরীর পাণি গ্রহণ করেন। পরাজিত বলিরাজা পাতালপুরীতে গিয়া আশ্রয় লন। অজুপার গর্ভে সেকেন্দরের জুলহাস নামে এক পুত্র জন্মে। কিশোর-বয়স্ক জুলহাস একদা মৃগয়া করিতে গিয়া এক মৃগের অনুসরণে পাতালপুরীতে প্রবিষ্ট ও নিরুদ্দিষ্ট হন। পুত্রশোকার্তা অজুপা সমুদ্রস্নান করিতে গিয়া এক কাষ্ঠপেটিকার মধ্যে একটি পরম সুন্দর বালককে প্রাপ্ত হন এবং তাহাকে পুত্রের ন্যায় লালনপালন করিতে থাকেন। এই পুত্রই পরে কালু শাহা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কালু যখন শিশু সেই সময়ে সেকেন্দরের দ্বিতীয় পুত্র বড়খাঁ গাজী বা গাজী শাহা জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই কালু ও গাজীর মধ্যে বিশেষ প্রণয় জন্মে এবং অতি অল্প বয়সেই উভয়ে সাধনভজনের দ্বারা ঈশ্বরের কৃপালাভ করিয়া অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। সেকেন্দর শাহ তরুণবয়স্ক গাজীকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে সংকল্প করিলে গাজী পিতৃদত্ত রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়া স্বীয় অভিন্নহৃদয় বন্ধু কালুর সহিত ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন এবং নানাস্থান ঘুরিয়া বাঙলা দেশের ভাটি অঞ্চল বা সুন্দরবনে আসিয়া উপস্থিত হন। গাজীর অলৌকিক প্রভাবে সুন্দরবনের বাঘ ও কুমির তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে।

সাত বৎসর সুন্দরবনে রাজত্ব করিবার পর কালুকে সঙ্গে লইয়া গাজী পুনরায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য বহির্গত হন এবং শ্রীরামরাজার রাজধানী ছাপাইনগরে আসিয়া—"জিকির" ছাড়েন। তাঁহার অলৌকিক প্রভাবের কথা শুনিয়া শ্রীরামরাজা বিনা যুদ্ধে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং কলমা পড়িয়া সবংশে মুসলমান হন।

ছাপাইনগর হইতে গাজী প্রথমত সোনাপুর ও পরে তথা হইতে ব্রাহ্মণরাজা মুকুটরায়ের রাজধানী ব্রাহ্মণনগরে গমন করেন। মুকুটরায় অতি শক্তিশালী রাজা ছিলেন; তাঁহার সাতটি বীরপুত্র ও চম্পাবতী নামে একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। শিবানুচর দক্ষিণরায় মুকুটরায়ের রাজ্যরক্ষক ছিলেন। প্রয়োজন হইলে দক্ষিণরায় স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মুকুটরায়ের শত্রুর বিনাশ সাধন করিতেন। দক্ষিণরায়ের ভরসায় মুকুটরায় কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না, বিশেষত বিধর্মী মুসলমানের উপর তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। "সাত ভাইএর বোন" চম্পার অপরূপ সৌন্দর্যের কথা শুনিয়া গাজী শাহা তাহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হন এবং কালুর দ্বারা রাজা মুকুটরায়ের নিকট এই প্রস্তাব করিয়া পাঠান। এই প্রস্তাবে মুকুটরায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং কালুকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন। দক্ষিণরায়ের বিক্রমের কথা গাজীর অজ্ঞাত ছিল না। তিনি বুঝিতে পারেন যে, এখানে সহজে কার্যোদ্ধার হইবে না। তখন তিনি সুন্দরবনে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার ব্যাঘ্র-বাহিনীকে লইয়া অতি গুপ্তভাবে আসিয়া ব্রাহ্মণনগর আক্রমণ করেন।

কেন্দোয়া বাঘ সেই বাঘের সরদার।
রাক্ষস ধরিয়া খায় এত জোর তার॥
বেড়া ভাঙ্গা বাঘ সাজে রাগেতে ভরিয়া।
অসুর পাইলে ফেলে আহার করিয়া॥

এইরূপ "বায়ান্ন হাজার" বাঘ আসিয়া ব্রাহ্মণনগর অবরোধ করে। ব্যাঘ্রবাহিনীর বিক্রমে মুকুটরায়ের সেনা ছত্রভঙ্গ হইলে মহাবীর দক্ষিণরায় স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তাঁহার হস্তে ব্যাঘ্র সেনার অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটে। তখন গাজীর সহিত তাঁহার তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কোনও কোনও পুঁথি-লেখকের মতে এই যুদ্ধে দক্ষিণরায় অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন, কিন্তু পাঁচালি হইতে জানিতে পারা যায় যে, দক্ষিণরায়ের বীরত্বে প্রীত হইয়া গাজী শাহা তাঁহার সহিত "মিতালি" করেন এবং স্বীয় অধিকারভুক্ত সুন্দরবনের একাংশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। "বনবিবির জহুরানামা" নামক পুঁথি অনুসারে দক্ষিণরায়ের সহিত গাজীর "দোস্তালি" বা বন্ধুত্বের কথাই সমর্থিত হয়।

দক্ষিণরায় রণে বিরত হইবার পর সপুত্র রাজা মুকুটরায় গাজীর সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া সপরিবারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। চম্পাবতীকে বিবাহ করিয়া গাজী কারামুক্ত কালুর সহিত স্ব-রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করেন এবং পথে আরও কয়েকটি অদ্ভুত কার্য সম্পন্ন করিয়া পাতালপুরী হইতে স্বীয় নিরুদ্দেশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জুলহাসের উদ্ধারসাধন করত তাঁহাকে পিতামাতার নিকট প্রেরণ করেন।

যে সময়ে গাজী ও দক্ষিণরায় সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশে আধিপত্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে মদিনা হইতে বনবিবি স্বীয় যমজ ভ্রাতা জঙ্গলিকে সঙ্গে করিয়া ভাটি অঞ্চলে আগমন করেন। প্রথমত বনবিবি কলিকাতার অনতিদূরবর্তী ভাঙ্গড় নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথাকার রাজা ভাঙ্গড় শাহার নিকট দক্ষিণরায়ের অমানুষিক অত্যাচারের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দমন করিবার জন্য তাঁহার রাজ্য কেঁদোখালিতে গিয়া হুংকার ছাড়েন। দক্ষিণরায় এই নবাগত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রণসাজে সজ্জিত হইতেছেন এমন সময়ে তাঁহার মাতা নারায়ণী তাঁহাকে গিয়া বলেন যে, স্ত্রীলোকের সহিত বীরপুরুষের যুদ্ধ শোভা পায় না, তিনি নিজে গিয়াই বনবিবিকে দূর করিয়া দিয়া আসিবেন। বনবিবির সহিত যুদ্ধে নারায়ণীর পরাজয় ঘটিলেও বনবিবি তাঁহার সহিত সখীত্ব স্থাপন করেন এবং দক্ষিণরায়ের রাজ্য ছাড়িয়া গিয়া সুন্দরবনের এক অনাবাদী অঞ্চলে নিজের নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

যে ঘটনার জন্য বনবিবি সমগ্র সুন্দরবন বা আঠার ভাটির অধীশ্বরী বলিয়া স্বীকৃত হন তাহা এইরূপ। গাজী ও দক্ষিণরায় নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত "নজরানা" বা উপঢৌকন না দিয়া কেহ তাঁহাদিগের এলাকার কাঠ কাটিতে অথবা মধু, মোম ও খাঁড়ি লবণ সংগ্রহ করিতে পারিবে না। এই প্রথা হইতেই উত্তরকালে গাজী ও দক্ষিণরায়ের পূজার সৃষ্টি হয়। দক্ষিণরায় ছিলেন কেঁদোখালির অধীশ্বর। কেঁদো শব্দের দ্বারা সুন্দরবনের বিখ্যাত "রয়্যাল টাইগার"কে বুঝায়। সুতরাং সুন্দরবনের সর্বাপেক্ষা ভীষণ ব্যাঘ্র দক্ষিণরায়েরই অধীন ছিল। সময়ে সময়ে দক্ষিণরায়ের আদেশে কাঠুরিয়া এবং মধুর মহালকারগণকে তাঁহার ব্যাঘ্রের আহারের জন্য নরবলি দিতে হইত।

একবার ধনা নামক জনৈক মধু ব্যবসায়ী দক্ষিণরায়ের আদেশে দুখে নামক এক অনাথ বালককে নরবলি দিবার উপক্রম করিলে দুখে "বনের মা বনবিবি"র নাম লইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। তখন বনবিবি স্বীয় বীরভ্রাতা জংগলিশাকে পাঠাইয়া দক্ষিণরায়ের কবল হইতে দুখিনীর পুত্র দুখেকে উদ্ধার করেন। ইহাতে দক্ষিণরায়ের সহিত তাঁহার নূতন করিয়া বিবাদ বাধে। দৈববলে বলী জংগলিশার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দক্ষিণরায় স্বীয় বন্ধু বড়খাঁ গাজীর দরবারে গিয়া উপস্থিত হন।

বসে আছেন বড়খাঁ গাজী কালু দোস্ত জোড়া।
সামনেতে সাত বাঘ রহিয়াছে খাড়া॥
হিংগুল বরণ তনু সোনার শামিয়ানা।
নূরের পুতুল মত শরীর কাঁচা সোনা॥

বড়খাঁ গাজী বনবিবির শক্তির কথা অবগত ছিলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় বনবিবির সহিত দক্ষিণরায়ের আপস রফা হয়। দক্ষিণরায় তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করেন এবং আঠার ভাটির অধীশ্বরী বলিয়া মানিয়া লন। বনবিবির কথামত দক্ষিণরায় প্রতিজ্ঞা করেন যে,

বনেতে আসিয়া যে বা মা বলে ডাকিবে।
আমা হৈতে হিংসা তার কদাচ না হবে॥

পুঁথি ও পাঁচালিতে বর্ণিত উপরোক্ত লৌকিক কাহিনীর মধ্যে ইতিহাসের যে ক্ষীণ সূত্র আছে এখন আমরা তাহারই অনুসরণ করিব।

রুকনুদ্দিন কয়কাউস (১২৯২ খৃী—১৩১৫ খৃী) যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সেই সময়ে প্রসিদ্ধ মুসলমান ধর্মপ্রচারক উলুগ-ই-আজম জাফর খাঁ বাহরাম ইৎগীন বা পীর জাফর খাঁ গাজী পশ্চিম বঙ্গের তৎকালীন শ্রেষ্ঠস্থান সপ্তগ্রাম জয় করিয়া নিকটবর্তী ত্রিবেণীতে একটি বৃহৎ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ১২৯৫ খৃীষ্টাব্দের ঘটনা। আজও ত্রিবেণীতে জাফর খাঁর মসজিদের ভগ্নাবশেষ ও তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। জাফর খাঁ সপ্তগ্রামের যে হিন্দু রাজাকে পরাজিত করেন তাঁহার বিশেষ বিবরণ এতাবৎ কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই। এই জাফর খাঁ গাজীর পুত্রের নাম বরখান গাজী। ইনিও পিতার ন্যায় মুসলমান ধর্মপ্রচারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং বাঙলার নানা স্থানে, বিশেষত দক্ষিণ অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রবাদ যে, বরখান গাজী জনৈক হিন্দু নৃপতিকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। রহিম ও করিম গাজী নামক ইঁহার দুই পুত্রও মুসলমান ধর্ম প্রচারে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। বস্তুত জাফর খাঁ গাজী ও তদ্‌বংশীয়দের দ্বারাই পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে মুসলমান ধর্মের বিশেষ বিস্তৃতি ঘটে। যিনি বলপূর্বক বিধর্মীকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিতে পারেন তাঁহারই উপাধি গাজী। জাফর খাঁর বংশীয় গাজীগণের বল প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাস ও জনপ্রবাদের মধ্যে পাওয়া যায়। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে বরখান গাজী ভাটি অঞ্চলের বা সুন্দরবনের অধিপতি দক্ষিণরায়ের সহিত প্রথমে যুদ্ধে লিপ্ত ও পরে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৩১৩ খৃীষ্টাব্দে বরখান গাজীর মৃত্যু হয় (গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা)।

ইহা হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে, লোকসাহিত্যে বর্ণিত বড় খাঁ গাজী ও জাফর খাঁ গাজীর পুত্র বরখান গাজী একই ব্যক্তি। বরখান গাজীর কীর্তিকলাপ অতিরঞ্জিত হইয়া লোকসাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। গাথা অনুসারে বড় খাঁ গাজী সেকেন্দর শাহের পুত্র, কিন্তু ইতিহাস বর্ণিত বরখান গাজীর পিতার নাম জাফর খাঁ গাজী। আমাদের মনে হয় যে, অজ্ঞ গ্রাম্য কবিগণ জাফর খাঁকেই সেকেন্দর শাহে পরিণত করিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার ভারতীয় সাহিত্যে "সেকেন্দর" নামেই পরিচিত। গৌড়ের পাঠান সুলতানগণের মধ্যেও একাধিক সেকেন্দর শাহ নাম দেখা যায়। সেকেন্দর নামটির সহিত বীরত্বের স্মৃতি বিশেষভাবে বিজড়িত। সুতরাং গাথা-সাহিত্যে জাফর খাঁ নামটির পরিবর্তে সেকেন্দর শাহা নামের ব্যবহার বিশেষ অসংগত নহে বলিয়াই অনুমিত হয়। উপাখ্যান অনুসারে সেকেন্দর বিরাটনগরের অধিপতি। এই বিরাটনগর কোথায় অবস্থিত তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই। হয়তো এই নামটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নাও হইতে পারে। প্রাচীন সপ্তগ্রাম, হরিদ্রাপুর, গোবিন্দপুর, কৃষ্ণপুর, চন্দনপুর প্রভৃতি সাতটি বর্ধিষ্ণু পল্লী লইয়া গঠিত এক বিশাল বা বিরাট নগর ছিল। জাফর খাঁ এই বিরাট নগর জয় করেন। উপাখ্যানে সপ্তগ্রামই যে বিরাটনগর নামে বর্ণিত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করা বোধ হয় নিতান্ত কল্পনা মাত্র নহে। আরও অনুমিত হয়, জাফর খাঁ যে হিন্দুরাজাকে পরাজিত করিয়া সপ্তগ্রাম অধিকার করেন তিনিই উপাখ্যানভাগে বলিরাজা নামে বর্ণিত হইয়াছেন। পরাজিত বলিরাজা পাতালপুরীতে গিয়া আশ্রয় লন। এই পাতালপুরী কোথায়? আমাদের মনে হয় সাগরদ্বীপ বা তাহার নিকটবর্তী সুন্দরবনের কোনও গভীর অরণ্য প্রদেশই এই পাতালপুরী। সাগরদ্বীপে স্মরণাতীত কাল হইতে কপিলাশ্রম অবস্থিত। পুরাণ ও প্রবাদ অনুসারে এই স্থানেই পাতালপুরী ও এখানেই কপিলের শাপে সগরের পুত্রগণ ভস্মীভূত হইয়াছিল। অধুনা নির্জনপ্রায় সাগরদ্বীপে যে এক সময়ে বহু লোকের বসতি ছিল ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। জাফর খাঁ কর্তৃক পরাজিত সপ্তগ্রামের অজ্ঞাতনামা হিন্দু নৃপতি সম্ভবত সুন্দরবনের এই প্রান্তভাগে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে সুযোগ মত তিনি প্রতিহিংসা বশে জাফর খাঁএর কোন প্রিয়পাত্রকে এই বন অঞ্চলে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন এবং বরখান গাজী সম্ভবত তাহার উদ্ধার সাধন করেন। মৃগয়া করিতে গিয়া জলহাসের পাতাল-পুরীতে নিরুদ্দেশ হওয়া ও গাজী কর্তৃক তাঁহার উদ্ধারের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে কি না কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে?

গাজী প্রথমে যে শ্রীরামরাজার রাজধানী ছাপাইনগরে যান উহা যশোহর জেলায় অবস্থিত। যশোহর শহর হইতে দশ মাইল উত্তরে অবস্থিত বারবাজার নামে একটি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন স্থান আছে। ইহার নিকটে প্রায় তিন-চার মাইল স্থান জুড়িয়া বহু দিঘি ও ইষ্টকস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার বাদুড়গাছা নামক মৌজায় শ্রীরাম-রাজার দিঘি নামে একটি নাতিবৃহৎ দিঘি আছে এবং নিকটেই শ্রীরাম-রাজার গড়খাই নামে পরিচিত প্রাচীন গড়ের চিহ্নও রহিয়াছে। বাদুড়-গাছার এক অংশকে এখনও তথাকার প্রাচীন অধিবাসিগণ ছাপাইনগর নামে অভিহিত করেন। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মতে এখানে শ্রীরাম নামক এক কায়স্থ ভূস্বামীর বাস ছিল। জনৈক গাজীর অত্যাচারে তাঁহার রাজ্য ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় এবং তিনি সপরিবারে মুসলমান হইতে বাধ্য হন। কেবল তাঁহার একটিমাত্র শিশু পুত্র কোনরূপে পলাইয়া গিয়া স্বধর্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এই গাজী বরখান গাজী কি না তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

আখ্যায়িকায় বর্ণিত মুকুট রায়ের রাজধানী ব্রাহ্মণনগরও যশোহর জেলার অন্তর্গত। যশোহর জেলায় অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র ঝিকরগাছার অদূরে কপোতাক্ষ নদের পূর্বতীরে লাউজানি নামে একটি গ্রাম আছে। এককালে এই গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়া হরিহর নদও প্রবাহিত হইত। এই স্থানের প্রাচীন নাম ছিল ব্রাহ্মণনগর। হোসেন শাহ যখন গৌড়ের অধিপতি ((১৪৯৪ খৃঃ—১৫২৫ খৃঃ) তখন এই স্থানে মুকুটরায় নামে একজন ব্রাহ্মণ ভূস্বামী স্বাধীন রাজার ন্যায় বাস করিতেন। প্রবাদ অনুসারে শিবানুচররূপে বর্ণিত মহাবীর দক্ষিণ রায় মুকুটরায়ের জ্ঞাতি প্রভাকর রায়ের পুত্র ছিলেন। 'গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় বলেন যে, জাফর খাঁর পুত্র গাজী আঠার ভাটির অধীশ্বর দক্ষিণরায়ের সহিত প্রথমে বিবাদ ও পরে সন্ধি করেন। ইহা যদি সত্য হয়, তবে এই দক্ষিণ রায় ও মুকুটরায়ের সেনাপতি দক্ষিণরায় একই ব্যক্তি হইতে পারেন না এবং গাজী উপাধিধারী যে ব্যক্তি মুকুটরায়ের রাজ্য ধ্বংস করেন তিনি ও বরখান গাজী একই লোক হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ ইঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কালের ব্যবধান প্রায় দুই শত বৎসর। যাহা হউক, মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধেই যে মুকুটরায়ের পতন ঘটে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মুকুটরায়ের সপ্তপুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কামদেব কোনওরূপে পালাইয়া গিয়া গোবর-ডাঙ্গার নিকটবর্তী চারঘাট নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনিও পরে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করেন এবং পীর ঠাকুরবর নামে বিখ্যাত হন। তিনি প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। চারঘাটে তাঁহার সমাধি ও তদুপরি নির্মিত মসজিদ আজিও বর্তমান আছে। গাজী যে ব্যাঘ্র বাহিনীর সাহায্যে ব্রাহ্মণনগর জয় করেন ঐতিহাসিক স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে উহারা প্রকৃত ব্যাঘ্র নহে, সুন্দরবনের আদিম অধিবাসী কোনও অসভ্য জাতীয় লোকবিশেষ। চণ্ডভণ্ড নামে সুন্দরবনবাসী একটি আদিম জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত গাজী ইহাদিগকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং ইহাদেরই সাহায্যে বাঙলার বিভিন্ন স্থানে বিজয় অভিযান পরিচালিত করেন। সুন্দরবনবাসী এই অসম-সাহসিক নরব্যাঘ্রগণই কবির কল্পনায় সত্যকার ব্যাঘ্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ভাটি প্রদেশ বা সুন্দরবন অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম প্রচারক একাধিক গাজী ও পীরের সন্ধান পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে হাড়োয়ার গোড়াই গাজী বা পীর গোরাচাঁদ, ঘুটিয়ারি শরিফের মোবরা গাজী, বারাসতের পীর একদিল শাহ প্রভৃতির নাম সমধিক বিখ্যাত। ইঁহাদের বিস্তৃত পরিচয় এই প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নহে। অনুমিত হয় যে, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন গাজীগণের কার্যকলাপ পল্লীকবিগণ কর্তৃক বরখান গাজীর চরিত্রে আরোপিত হইয়া তাঁহাকেই গাথা সাহিত্যের নায়কত্ব প্রদান করিয়াছে। এখনও দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের বহু স্থলে সাজসজ্জা সহকারে পাঁচালি ও কথকতার ছন্দে গাজীর গীতের পালা অভিনীত হইয়া থাকে।

বনবিবির চরিত্র যে কাল্পনিক তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের কোনও কোনও স্থানে, বিশেষত ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ মধুপুরের জঙ্গলের নিকটবর্তী অনেক পল্লীতে বনদুর্গা নামক এক গ্রাম্য দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। বনবিবি বনদুর্গারই মুসলমানী রূপ কি না তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

গাজী ও দক্ষিণ রায় অন্যূন সাত শত বৎসর পূর্বে সশরীরে বর্তমান থাকিয়া সুন্দরবনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিগত সপ্ত শতাব্দীর মধ্যে জগতের বহু রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও কেহ তাঁহাদিগকে সুন্দরবনের অরণ্যরাজ্য হইতে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে নাই। লোকান্তরের পর তাঁহারা বনদেবতার পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আজও নিত্য বহু ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। সুন্দরবনের নিকটবর্তী প্রায় অতি প্রাচীন গ্রামে গাজীর আস্তানা ও দক্ষিণ রায়ের স্থান বা মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বারুইপুরের নিকটবর্তী ধপধপি গ্রামে দক্ষিণরায়ের একটি সুন্দর মন্দির আছে। প্রাচীন ছত্রভোগের নিকটবর্তী (মথুরাপুর থানা) খাড়ি গ্রামেও অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে দক্ষিণরায়ের একটি অশ্বারূঢ় বীরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কোনও কোনও স্থানে দক্ষিণরায়ের কেবল ছিন্ন মস্তকের পূজা হইতেও দেখা যায়। দক্ষিণরায়ের পূর্ণাবয়ব বিগ্রহ কোথাও ব্যাঘ্রারূঢ়, কোথাও অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন, আবার কোথাও বা ভূমিতে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট। সর্বত্রই তাঁহার বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তি; তাঁহার এক হস্তে বন্দুক ও অপর হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ, কটিদেশে শাণিত ছুরিকা, পৃষ্ঠে ধনু ও বাণপূর্ণ তূণীর। তাঁহার গুম্ফদ্বয় আকর্ণবিস্তৃত, চক্ষু রক্তবর্ণ ও মস্তকে 'বীরপাগ' শোভিত। সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদেবতার রূপকল্পনা দক্ষিণরায়ের বীরমূর্তির মধ্যে অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

(৪৬৯ পৃষ্ঠার পর)

কালাচাঁদ কহিল, "তুমি আমার দেশের মানুষ ঠাকুর মশাই, মরবার আগে তোমার কাছে একটা নিবেদন জানাতে চাই।"

মথুর বেদনা বোধ করিয়া কহিল, "বালাই, মরবে কেন? আর তিন চার ঘণ্টার বেশী রাত্তির নেই, এর মধ্যে যদি কোনও বড় জাহাজ এসে পড়ে তো ভালোই, নইলে দিনের বেলা যে ক'রে হ'ক উপায় একটা হবেই।"

"তিন চার ঘণ্টা!" কালাচাঁদ ম্লানভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আমার হয়ে এসেছে। যে ক'টা কথা তোমায় বলবার আছে, এই ফাঁকেই তা ব'লে নিই। সংসারে থাকবার মধ্যে আছে মা-মরা একটা বার বছরের ছেলে, তা ছাড়া তিনকূলে আর সব শত্তুর। হাতের কাছে তোমাকে ছাড়া এখন আর কাউকে পাই নে বাবাঠাকুর। তুমি রায়পুরা গিয়ে কালাচাঁদ দুলের ঘর খুঁজলেই লোক আমার বাড়ি তোমায় চিনিয়ে দেবে। তুমি আমার ছেলেকে এই গেঁজেটা দিও, এর মধ্যে কয়েক ভরি সোনা আর খানকতক মোহর আছে। তা' ছাড়া তাকে ব'লো উত্তরের পোঁতায়—"

মথুর হাত বাড়াইয়া গেঁজেটা তুলিয়া লইল।

—"উত্তরের পোঁতায় এক ঘটি—"

কিন্তু কথাটাও আর শেষ হইল না। এক হাতে গেঁজেটা বাড়াইয়া দিতে গিয়া শিথিল দুর্বল বাঁ হাতখানি কালাচাঁদের নারিকেল গাছের গা হইতে পিছলাইয়া গেল। পরক্ষণেই ঝপাং করিয়া একটা শব্দ হইল। মথুর ঘোষাল বিস্ফারিত চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, পদ্মার প্রবল কালো স্রোতে কালাচাঁদের ঝাঁকড়া মাথাটা একবার ভাসিয়া উঠিয়াই পরক্ষণে মিলাইয়া গেল। যাইবার আগে তাহার সমস্ত বিশ্বাস এমন একজনকেই সে ন্যস্ত করিয়া গেল, মাত্র দু ঘণ্টা আগেই দরকার হইলে অত্যন্ত অনায়াসে যাহাকে খুন করিতে তাহার বাধিত না।

বিশাল পদ্মা। তীক্ষ্ণ স্রোত, হাতের কাছে যাহা কিছু পায় তাহাকেই টানিয়া লয় ঘূর্ণির অতল বিশাল গর্ভে। তীরে তীরে ভাঙা-গড়ার বিচিত্র লীলা। পৃথিবীকে ভাঙিয়া সে নূতন করিয়া রচিতে পারে—হয়তো মানুষের মনকেও।

সকালের যাত্রিবাহী স্টীমার এস এস এম আসিয়া মথুরকে উদ্ধার করিল।
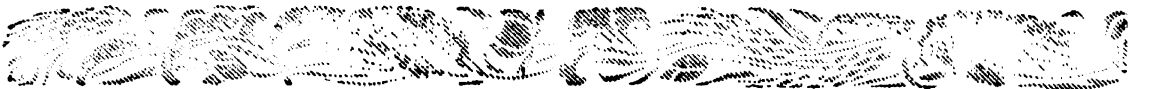
চিত্রশিল্পীর সাধনা

সান্তের মধ্যে অনন্তের বাণী জাগাইয়া তোলা ব্যক্তির মধ্য দিয়া অব্যক্তের বাঁশি শুনানই হইতেছে শিল্পীর সাধনা। মানুষ সব আনন্দ পায় অনুধ্যানে অর্থাৎ সসীমকে অন্তরের অসীম রাজ্যে মননের মাধুর্য সম্প্রসারিত করিয়া। শিল্পী তাঁহার সাধনায় বস্তুর অন্তরস্পর্শী প্রসাদকে ফুটাইয়া তোলেন। জড়ের ভিতরকার সুপ্ত চিৎ-শক্তিকে তিনি মানুষের অন্তরের দিকে সঞ্চরণশীল করিয়া দেন। স্থূলের মধ্যে দেখাইয়াছেন সূক্ষ্মের ব্যাপ্তিধর্মকে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সাধনায় জড়ে হয় প্রাণের প্রতিষ্ঠা এবং মানুষ পায় সেই জন্য রস।

অবনীন্দ্রনাথের সাধনার ফলে বাঙলার চিত্র শিল্পে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের তুলিকা জড়কে দিয়াছে চিন্ময় রূপ। বাঙলার আধুনিক চিত্রশিল্পের সাধকগণ অবনীন্দ্রনাথের সাধনার সেই যোগসূত্রকে অনুশীলন করিয়া বাঙলার চিত্রশিল্পে নানা সুর এবং নানা ছন্দ ফুটাইয়া তুলিতেছেন। অবনীন্দ্রনাথের সাধনা ভারতের চিত্রসাধনায় নূতন যুগের উদ্বোধন করিয়াছে।

আজ বাঙলার চিত্রসাধনার গৌরব দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যাহাদের চিত্রশিল্প এইরূপ গৌরব লাভ করিয়াছে, কলিকাতা কর্পোরেশনের মিউজিয়মের কিউরেটার শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নামও তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের বাহিরে না হইলেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহার চিত্রশিল্প খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার "বিশ্ব", "মা" প্রভৃতি চিত্রগুলি সর্বত্র

আলেয়া

মা

বিশ্ব

প্রতীক্ষা

বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে পাঠক তাঁহার অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্রের প্রতিলিপি দেখিতে পাইবেন।

"বিশ্ব" চিত্রখানিতে দেখান হইতেছে স্রষ্টার গভীর অনুধ্যানে বিশ্বে কিভাবে রূপ রস গন্ধ ছন্দায়িত হইয়া উঠিতেছে। ভাগবতে সৃষ্টি তত্ত্বের কথা এই ছবিখানা স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্রহ্মা যখন কিভাবে সৃষ্টি ফুটাইয়া তুলিবেন সন্ধান পাইতেছিলেন না, তখন দৈববাণী হইল, ব্রহ্মা তুমি তপস্যা কর, তপস্যার প্রভাবে অন্তর জগতে চলিয়া যাও, সেখানে বিশ্বের রস রূপ তুমি দেখিতে পাইবে, সেই রূপ বাহিরে ফুটাইয়া তোল। বিশ্বজননী গভীর অনুধ্যানের সাহায্যে বিশ্বকে রূপ দিতেছেন। চিত্রকর জননীর মুখে অপূর্ব দক্ষতা সহকারে গূঢ় এবং গভীর সেই অন্তর সাধনাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"মা" চিত্রখানিকে শিল্পী মায়ের অধর ওষ্ঠ এবং গালের অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি রেখার টানে মাতৃমাধুর্যকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। মায়ের আপ্যায়নের অভয়ত্ব সমগ্র চিত্রখানিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ধাত্রিত্ব বা মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা এই অভয়ত্বের মধ্যে এবং সেই অভয়ত্বের মূলে থাকে ভাব, প্রেম, স্নেহ। সে প্রেম বা স্নেহের স্বভাব হইল ত্যাগ। নিজের সুখ বা স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা এবং ত্যাগের আকুলতাকে শিল্পী মায়ের এলায়িত অবগুণ্ঠনে অতি সূক্ষ্মভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভারতীয় মাতৃ-পরিকল্পনার একটা বিশিষ্টতা এই চিত্রখানির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

'প্রতীক্ষা' চিত্রখানিতে রিয়ালিস্টিক টান বেশী, কিন্তু স্থূলরূপে অন্তরের আকুলতাকে চাপা দেয় নাই, শিথিল কবরীর বিন্যাসভঙ্গীতে প্রতীক্ষমান নেত্রের ভাষার আভাস পাওয়া যাইতেছে। চোখ কোন দূরতর দেশে গিয়া অভীষ্টের সন্ধান করিতেছে। যে ছন্দটি মনে জাগিয়াছে সমগ্র দেহে সেই ছন্দের আন্দোলন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীযুত রায় পুরোপুরি রিয়ালিস্টও নহেন, কিংবা আইডিয়ালিস্টও নহেন, তাঁহার শিল্পের ধরন এই দুইএর সংযোগ সূত্র ধরিয়া চলিয়াছে। তিনি বাঙলার একজন কৃতী চিত্রশিল্পী, কয়েকখানা চিত্রই সে পরিচয় প্রদান করিবে।

৭ম বর্ষ] ২রা কার্তিক, শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 19th October, 1940 [৪৮ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিজয়ার অভিবাদন—

শারদীয় অবকাশের পর আমরা "দেশে"র গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, পাঠিকা সকলকে আমাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। যে জাতি স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার বিজয় কোথায়, আর কবেই বা তাহার বিজয়া, পদে পদে তাহার পরাজয়। বিজয়ার দিনে পরাজয়ের এই বেদনা, আজ এই বিজিত জাতির নিজেদের মধ্যে শত্রু মিত্র সকলকে যদি আপন করিতে পারে, তবে সত্যকার বিজয়ার দিন অদূরবর্তী হইবে ইহাই আমাদের একমাত্র আশা। বিজয়ার অভিবাদনের ভিতরে এই আশা একান্ত হইয়া উঠিয়া কর্তব্য যতই কঠোর এবং ভীষণ হউক না কেন, সেই কর্তব্য সাধনে আমাদের অন্তরে শক্তি দান করুক। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আকর্ষণে বর্তমান পথের কণ্টকের আঘাতে আমরা যেন বিচলিত না হই।

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক—

পূজার অবকাশের পর প্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল, ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন। তিন দিন ধরিয়া এই অধিবেশন হইয়াছে। মহাত্মাজীই যখন সর্বেসর্বা, তখন এরূপ দীর্ঘ অধিবেশনের কি প্রয়োজন ছিল বুঝা যায় না। তবে অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য করিবার যে পরিকল্পনা মহাত্মা গান্ধী করিয়াছেন, তদনুযায়ী কাজ হইবে। মহাত্মা গান্ধীর বাছাই করা এবং তাঁহার মতে শুদ্ধ অহিংসাচারিস্বরূপে সাব্যস্ত স্বল্পসংখ্যক সত্যাগ্রহী সত্যাগ্রহ করিবেন। কর্মী হিসাবে সত্যাগ্রহীর বিচার হইবে না, কিংবা নেতা ব্যক্তিরাও সত্যাগ্রহী হইতে পারিবেন না, অনাবিল অহিংসার উর্ধ্বতম স্তরে যিনি উঠিয়াছেন, তিনিই হইবেন এমন সত্যাগ্রহী। শুনা যাইতেছে, শ্রীবিনোদ ভাবে নামক একজন ওয়ার্ধার আশ্রমবাসীর নাম উঠিয়াছে প্রথম সত্যাগ্রহীস্বরূপে। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, প্রতিপক্ষের মনে দয়ার ভাব উদ্রেক করার চেষ্টাই হইবে সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য এবং এই সদয় মনোবৃত্তি উদ্রেকের উপযোগী আনুষ্ঠানিকতারও ত্রুটি হইবে না। এ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি প্রদান, বড়লাটের নিকট বিজ্ঞপ্তি, শুধু তাহাই নয় এ ব্যাপারেও মহাত্মাজীর আর এক দফা অনশন ব্রত—এ সবই যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির এই নৈতিক মহিমা কতটা কার্যকর হইবে ইহা সন্দেহের বিষয়। ব্যক্তির নৈতিক মহিমা যত বড়ই হউক, আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাঁহার যতই তীক্ষ্ন হউক, সমষ্টির সঙ্গে যদি তাঁহার যোগ না থাকে, এবং শুধু আধ্যাত্মিক তত্ত্বরাজ্যে সূক্ষ্ম নিষ্ক্রীয় যোগ নহে, সে যোগ যদি সমষ্টিকে আশ্রয় করিয়া কর্মে প্রবর্তিত না হয়, তবে বাস্তব রাজনীতির দিক দিয়া তাহার কোন মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ব্যক্তির তেমন কাজ মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে সাময়িকভাবে একটু নাড়া দিতে পারে; কিন্তু দেশের স্বাধীনতা তাহাতে আসে না।

শরৎচন্দ্রের প্রতি দণ্ড—

বাঙালীর প্রধান দোষ হইল এই যে, বাঙালীর হাজার গুণ থাকিলেও স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একটা অপ্রতিরুদ্ধ অনুপ্রাণনা বাঙলার স্বদেশপ্রেমিকদের অন্তরে রহিয়াছে এবং এ জিনিসটি যেমন একান্তভাবে বাঙলায় আছে, এমনভাবে ভারতের কোন প্রদেশে আছে কিনা সন্দেহ। এই যে অনুপ্রাণনা, এ জিনিস নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না, এ চায় কাজ; কিন্তু বল্লভীদল পরিচালিত কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী কমিটি বলিষ্ঠ নীতি লইয়া কাজের পথে অগ্রসর হইতে নারাজ। ইঁহাদের এই মতিগতির সঙ্গে সায় যোগাইতে না পারিয়া সুভাষচন্দ্র দণ্ডিত হইয়াছেন। কিন্তু আক্রোশ তাহাতেও মিটে নাই, সুভাষচন্দ্রকে দাবাইয়া রাখিয়া নিজেদের গোঁ বজায় রাখিবার জন্য বল্লভীদল ত্রিপুরীতে যে প্রচেষ্টার

অবতীর্ণ হন, তাহার অন্তর্নিহিত হীনতা উন্মুক্ত হইবার পরও আক্কেল তাঁহাদের হয় না, বল্লভীদলের বাঙালী-বিদ্বেষ অধিকতর নির্লজ্জ হইয়াই উঠে এবং এতদিনে শরৎচন্দ্রের উপরও সেই বিদ্বেষ দণ্ডবিধানের আকারে প্রকটিত হইয়াছে। যে বাঙলাদেশ কংগ্রেসের উদ্বোধন করে এবং যে বাঙলাদেশের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণ হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া রক্ত দিয়া করিয়াছে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, সেই বাঙলাদেশের স্বার্থের প্রতি নির্মম উপেক্ষা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পরিচালিত পার্লামেণ্টারী কমিটির একটি বড় বিশিষ্টতা। সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র এই দুইজনকে কংগ্রেস হইতে অপসারিত করিলে বাঙলা হইতে স্বাধীনভাবে কথা বলিবার আর কেহ থাকিল না, বল্লভীদলের জোট নিষ্কণ্টক হইল, ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু বল্লভীদলের সঙ্গে রাগ করিয়া বাঙালী আত্মহত্যা করিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, কংগ্রেসের প্রাণশক্তি হইল স্বাধীনতার প্রেরণা; সেই প্রাণশক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া কংগ্রেসকে একটি আধ্যাত্মিকতার আখড়ায় পরিণত করিতে দিতেও বাঙালী পারে না। সুতরাং সুভাষচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রকে পার্লামেণ্টারী কমিটি দণ্ডিত করিলেও কংগ্রেসের আদর্শ অব্যাহত রাখিবার জন্য বাঙলার কংগ্রেসী আন্দোলনের পুরোভাগে তাঁহাদিগকে থাকিতে হইবেই। হক মন্ত্রিমণ্ডল যে সময় সুসজ্জিত মারণাস্ত্র লইয়া বাঙলার জাতীয়তাকে বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই সময় শরৎচন্দ্রকে আইন-সভা হইতে অপসারিত হইতে দেওয়া চলে না। বাঙলার জনমত তাঁহার অনুকূলে থাকিবেই, রাজনীতিবোধে জাগ্রত বাঙলা, স্বাধীনতার আদর্শে উদ্দীপ্ত বাঙলা তাঁহার অনুসরণ করিবেই। কংগ্রেসের প্রকৃত স্বার্থ বিজড়িত রহিয়াছে নেতা-স্বরূপে শরৎচন্দ্রের কর্মোদ্যমের উপর। ওয়ার্কিং কমিটি যে আদেশই দিন না কেন, বাঙালী কংগ্রেসের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। বল্লভীদলের অহমিকার তুষ্টির চেয়ে বাঙালীর কাছে কংগ্রেসের আদর্শ অনেক বড় এবং সেই আদর্শের মর্যাদা অটুট রাখিবার জন্যই আমরা বলিব যে, বাঙলার এই দুঃসময়ে বল্লভীদলের নির্দেশ পদদলিত করাই শরৎচন্দ্রের পক্ষে কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য—

রবীন্দ্রনাথ এখনও রোগমুক্ত হইয়া উঠেন নাই; কবির পীড়ার সংবাদে দেশের সর্বত্র দারুণ উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। গুরুতর শারীরিক অস্বস্তির মধ্যেও কবি যখনই একটু উপশম বোধ করিয়াছেন, তখনই বর্তমানে মানুষের মর্যাদার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছে, তজ্জন্য বেদনা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি সেদিনও রোগশয্যা হইতে বলিয়াছেন, "আমরা চেঙ্গিস খাঁর বাহিনীকে বর্বর বলিয়া থাকি, কিন্তু আজ তথাকথিত সভ্য জাতিরা আমাদের চক্ষের সম্মুখে মনুষ্য জাতির প্রতি যে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে, ভয়ঙ্কর মোঙ্গলেরাও সেরূপ বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হয় নাই। পাশ্চাত্যের লোকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে সভ্যতা ও মনুষ্য-মর্যাদা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার মূল্যে আজ তাহারা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। তাহাদের এই ব্যর্থতা আমার মনে দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া রহিয়াছে। আমি পরিষ্কারভাবে বুঝিতেছি, এ ব্যর্থতার কারণ হইতেছে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার পরিচালনায় নৈতিক আদর্শকে অস্বীকার এবং লোকের এই বিশ্বাস যে, সমস্ত জিনিসই নির্ধারিত হয় বাহ্য ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা যাহা মানুষে বুদ্ধি বা শক্তি প্রয়োগে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।" হীন স্বার্থ ও অহমিকার আসুরিকতায় উপদ্রুত জগতে রবীন্দ্রনাথ ভারতের ঋষিদের বাণী এখনও শুনাইতেছেন। বিশ্বজগতের কল্যাণের জন্য ভগবান রবীন্দ্রনাথকে রোগমুক্ত এবং দীর্ঘজীবী করুন, ইহাই আমাদের কামনা। রবীন্দ্রনাথের রোগমুক্তির জন্য উদ্বেগের ভিতর দিয়া মানবতার মর্যাদা বুদ্ধির পরিচয়ই পাওয়া গিয়াছে। অন্ধকারের মধ্যে ইহাও আশার আলোকরেখা বলিতে হইবে।

কলঙ্কের কথা—

বোম্বাই শহরে আগত কতকগুলি অষ্ট্রেলিয়ান সৈনিকের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সম্বন্ধে 'হরিজন' পত্রে মহাত্মা গান্ধী যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সৈন্যদের বিরুদ্ধে জনৈক পত্রপ্রেরক কতকগুলি অভিযোগ করিয়াছেন। সবগুলি অভিযোগ উল্লেখ না করিয়া আমরা কয়েকটি দিলাম, ইহাতেই পাঠকবর্গ অভিযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অভিযোগ এই যে,—(১) 'একজন সৈনিক একটি গুজরাটী বালিকাকে ধরে এবং প্রকাশ্য রাস্তার উপর তাহাকে তাহার সহিত বলনাচের ধরনে নৃত্য করিতে বাধ্য করে। অপরাপর সাতজন সৈনিক তাহাদের উভয়কে ঘিরিয়া আমোদ প্রমোদ করে।' (২) 'একজন সৈনিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের একটি বালিকার গালে কামড়াইয়া দেয় এবং তাহাকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পরিত্যাগ করে।' (৩) 'চারজন সৈনিককে প্রিন্স অব ওয়েলস যাদুঘরের নিকট একটি স্ত্রীলোককে টানিয়া লইয়া যাইতে দেখা যায়।' এই সব ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে বড়লাটের নিকট মহাত্মাজী দরবার করিয়াছেন। দরবারের ফল কি হইবে জানি না, তবে তৎপূর্বে আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগিতেছে যে, বোম্বাই শহরে কি মানুষ নাই? মানুষ থাকিলে, সত্যই যদি এমন ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা ঘটিতে পারিত না। মহাত্মাজীও বলিয়াছেন,—"বালিকাদিগকে যে বর্বরতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহার প্রতিরোধ করিতে জনসাধারণ কি করিয়াছেন? বোম্বাইয়ের কংগ্রেস কমিটিই বা কি করিয়াছেন? রাস্তার লোকেরাই বা কি করিয়াছেন?" নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য চেতনা বোধ যাহাদের মধ্যে নাই, তাহাদের মনুষ্যত্ব নাই এবং যাহারা মানুষ নহে পশুত্বের পীড়ন তাহাদিগকে সহ্য করিতেই হইবে; প্রবলের কর্তব্যবুদ্ধি তাহাদিগকে কতটা পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে?

মৌখিক অহিংসা—

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঝা গত ১৪ই অক্টোবর মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "ইহা কি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় নয় যে, সামরিক ঐতিহ্যের লীলাভূমি ভারতবর্ষে যখন শৌর্য-বীর্যের একান্ত আবশ্যক তখনই সেখানে অহিংসার নীতি মানুষকে এতখানি পাইয়া বসিয়াছে যে সহস্র সহস্র লোক তৎপ্রতি অন্তত মৌখিক সহানুভূতি দেখাইতেছে।" তিনি যুবকদিগকে আরও বলেন, "জীবনের উচ্চাদর্শ শান্তি এবং সেই শান্তির জন্য প্রত্যেক যুবকেরই চেষ্টিত হওয়া উচিত; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ঘটনাবর্ত ও মানব প্রকৃতির দৌর্বল্যগুলির সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। শান্তি এবং সংগ্রাম উভয়ের জন্যই প্রস্তুত থাকা দরকার। আত্মরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ও জাতিগত সামর্থ্য থাকা যুবকদের একান্ত আবশ্যক।" ডাঃ ঝা যে কথা বলিয়াছেন তাহার গুরুত্ব আমরা স্বীকার করি। অহিংস নীতির দোহাই দিয়া আমরা ভীরুতাকে অন্তরে পাকাইয়া তুলিতেছি কিনা ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বিশেষ দুঃখের কথা এই যে, অহিংস নীতির উচ্চাদর্শ জীবনে কয়জনে লাভ করিতে পারিতেছেন জানি না; কিন্তু অহিংস নীতির গোঁড়ামি দেখাইতে গিয়া দৈহিক বলচর্চাকে পর্যন্ত উপেক্ষণীয় বিষয় করিয়া তুলিয়া জাতিকে নৈতিক অধোগতির দিকেই লইয়া যাওয়া হইতেছে। অহিংসা দুর্বলের জিনিস নয়; দেহের বল যাহার নাই, মনের বলও তাহার থাকিতে পারে না এবং মনস্বিতাই অহিংসার ভিত্তি।

আমেরিকা ও জাপান—

বলকানের সমস্যা ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। জার্মান সেনা রুমেনিয়ার মধ্যে ঢুকিয়া রুমেনিয়া দখল করিয়াছে, এখন গ্রীসের দিকে, নাকি তাহাদের রোখ। জার্মানি ইটালির সঙ্গে যোগ দিয়া এবার এশিয়া মাইনর এবং আফ্রিকা ও সুয়েজ খালের দিকে জোর দিতে প্রয়াসী হইয়াছে। তুরস্ক এবং গ্রীস এই সমস্যায় কি করিবে বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না। এদিকে ইংরেজরা ব্রহ্মের পথ উন্মুক্ত করিবার পর হইতে জাপানের মতিগতি সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ করিতেছেন। জার্মানির সঙ্গে জাপানের চুক্তি রহিয়াছে। এবার কি জাপান সেই চুক্তির মর্যাদা রক্ষার জন্য তাহার 'নব এশিয়া' গঠনের নীতি সম্প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাপকতর সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবে? চীন ও জাপানে যে সব মার্কিন বাস করে, তাহাদিগকে দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই সঙ্গে এই সংবাদও প্রচারিত হইয়াছে যে, বর্তমান মাসের শেষভাগে লণ্ডনস্থ জাপানী ব্যাপারীরা সকলে লণ্ডন ত্যাগ করিবেন। রুষিয়া কি করিবে, কেহই এ পর্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মস্কোস্থ জাপ-মন্ত্রী যেমন রুষ পররাষ্ট্র-সচিব মলোটভের সঙ্গে মোলাকাৎ করিতেছেন, তেমনই ব্রিটিশ দূত স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের সঙ্গেও তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ চলিতেছে। পূর্ব এশিয়ার অবস্থার বিপর্যয় নির্ভর করিতেছে আমেরিকা ও জাপানের মতিগতির উপর—প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজের মতিগতির উপর নয়। আমেরিকা যে সুর ধরিবে, ইংরেজও তাহাতে সায় দিবে। এখন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টই প্রথম চাল চালেন, না জাপ প্রধান মন্ত্রী মাৎসুকা প্রথম চাল চালেন, ইহা দেখিবার বিষয়। মোটের উপর ইহা বুঝা যাইতেছে যে, আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন পর্ব না কাটিয়া যাওয়া পর্যন্ত আমেরিকা সুনির্দিষ্টভাবে কোন নীতি গ্রহণ করিবে না এবং অন্তত এক পক্ষকালের মধ্যে আমেরিকার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই।

ভারতের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততা—

কমন্স সভায় ভারতের সম্বন্ধে আবার একটা প্রশ্ন উঠিয়াছিল, প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে নূতন কিছুই বলিবার নাই, অর্থাৎ বড়লাট এ সম্বন্ধে শেষ যে জবাব দিয়াছেন তাহাই চরম। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই বড়লাটের প্রস্তাবিত শাসন পরিষদ এবং সমর পরিষদে যোগদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু দেখা যাইতেছে ভারত সচিব এই দুই প্রতিষ্ঠানের কোনটিকেই গুরুত্বের মধ্যে আনেন না এবং ভারতের সহযোগিতা পাইতে হইলে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের কোনটিরই সহযোগিতা একান্ত মনে করেন না। দুর্বলের অবস্থা এমনই হয়। বিপন্ন ইসলামের জিগির তুলিয়া যাহারা জাতির সংহতি শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিতেছেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তি যদি হীন স্বার্থপরতার দ্বারা একান্ত বিকৃত এবং দাস্যভাবে প্রভাবিত না হইত, তাহা হইলে অনেক আগেই এ সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান হইত এবং অপরের নিকট হইতে প্রকৃত মর্যাদা পাইতে হইলে যে পথ একমাত্র পথ, সেই জাতীয় সংহতির পথ তাঁহারা অবলম্বন করিতেন।

মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি—

মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্ধার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন, "আপনারা ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করুন এবং দেখুন কি ঘটে। যদি আপনাদের বিচারবুদ্ধি আমার কার্যক্রম কোনমতে অনুমোদন না করে, তাহা হইলে আপনারা কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া নিজেদের অভিপ্রায় অনুসারে জনমত গঠনের জন্য চেষ্টা করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কে বলিতে পারে যে,

শুধু ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে নহে, পরন্তু পৃথিবীর যুদ্ধরত জাতিগুলির মধ্যেও আমি শান্তিস্থাপনের যন্ত্র-স্বরূপ হইব না?" পৃথিবীর যুদ্ধরত জাতিদের মধ্যে শান্তিস্থাপন অতি বড় কথা। আমাদের মাথায় সে পরিকল্পনা ঢুকে না, বুদ্ধ, চৈতন্যও তাহা পারেন নাই; মহাত্মাজীর কৃপায় তাহা সম্ভব হয়, খুবই ভাল; কিন্তু আমরা পরাধীনতাপীড়িত ভারতের সাধারণ লোক, আমরা চাই দেশের স্বাধীনতা। মহাত্মা গান্ধী নিজেই বলিতেছেন, ঘটনার গতি কিরূপ হইবে, তাহা নিজেও তিনি জানেন না; এমন অবস্থায় ঘটনার গতি লক্ষ্য করা ছাড়া অন্য কিছু বলিবার থাকিতে পারে না।

সিন্ধু সুক্কুরে অনাচার—

সিন্ধু প্রদেশে হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, যে কোন সভ্য দেশে তাহা বিরল বলিতে হইবে। হিন্দুকে গুলী করিয়া খুন করা কিছুদিন হইতে দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিপন্ন হিন্দুরা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া রাজপুতানা, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু সিন্ধুর মুসলিম লীগ সম্প্রতি এক ইস্তাহার জারি করিয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দুদের উপর অত্যাচার বা নির্যাতন ঐ সব কিছুই নয়, ঐ সব সংবাদ হিন্দু সংবাদপত্রগুলির কারসাজি মাত্র। স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় যে কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, মুসলমানের সেজন্য কোন দোষ নাই, দোষী সিন্ধুর মুষ্টি-মেয় সংখ্যাল্প হিন্দুরা। হিন্দুদেরই দুষ্টামির এ সব ফল। সাম্প্রদায়িক অন্ধতায় প্রপীড়িত সিন্ধুতে মুসলিম লীগের এই ইস্তাহারের ফল যে কিরূপ বিষময় হইবে, সকলেই বুঝিতে পারেন। হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে বিদ্বেষের এই প্ররোচনা স্থির মস্তিষ্ক কোন ব্যক্তিদের যে প্রদত্ত হইতে পারে, ইহা আমাদের কল্পনার অতীত। অথচ সিন্ধুর এই মুসলিম লীগই আবার ঐ সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, সিন্ধুতে শান্তি স্থাপনের জন্য তাঁহারা হিন্দু নেতাদের সহযোগিতা আহ্বান করিবেন। নির্লজ্জতা এবং ধৃষ্টতার চরম নিদর্শন বলিতে হইবে।

মেদিনীপুর ও বীরভূম—

মেদিনীপুরে ও বীরভূমে নিদারুণ অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মেদিনীপুরের অন্নকষ্ট পীড়িত লোকদের সাহায্য করিবার জন্য আবেগময়ী ভাষায় দেশবাসীর নিকট আবেদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, —"মেদিনীপুরের স্থান বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। যে অসংখ্য নিরীহ ও শান্ত জনসাধারণ তাহাদের বুকের রক্ত দান করিয়া বাঙলার তথা ভারতের পরাধীনতার ইতিহাসকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের জন্য এই ভিক্ষার আহ্বানে আপনারা যথাসাধ্য সাড়া দিবেন।" আচার্য রায়ের এই আকুল আহ্বান দেশবাসীর অন্তর স্পর্শ করিবে এবং তাঁহারা আর্তের উদ্ধারে অগ্রসর হইবেন, আমরা এইরূপ আশা করি।

পরলোকে পঞ্চানন তর্করত্ন—

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে বারাণসীধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মধ্যে ইদানীং তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। তিনি বহু শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন, প্রগাঢ় ছিল তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং ভারতের সর্বত্র পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন। তর্করত্ন মহাশয় বহু শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বাঙলা ভাষা সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার এই ঋণ চিরকাল বাঙালী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। সামাজিক বিষয়ে আমাদের সঙ্গে তাঁহার মতের মিল না থাকিলেও স্বধর্মনিষ্ঠার ভিতর দিয়া স্বাদেশিকতা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিশিষ্ট যে মর্যাদাবুদ্ধি এই বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণের অন্তরে উদ্দীপ্ত ছিল, সেজন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করিতাম। নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াও তাঁহার এই স্বাদেশিকতার অপরাধেই তাঁহাকে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কিছুদিন কারাগারে বাস করিতে হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে হিন্দু সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম এ এবং অন্যান্য পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রেসিডেন্সী জেলে দুর্গা পূজা—বিসর্জনের উদ্দেশ্যে বন্ধুদের হস্তে দেওয়ার পূর্বে জেলের অভ্যন্তরে অবস্থিত দেবী প্রতিমা।
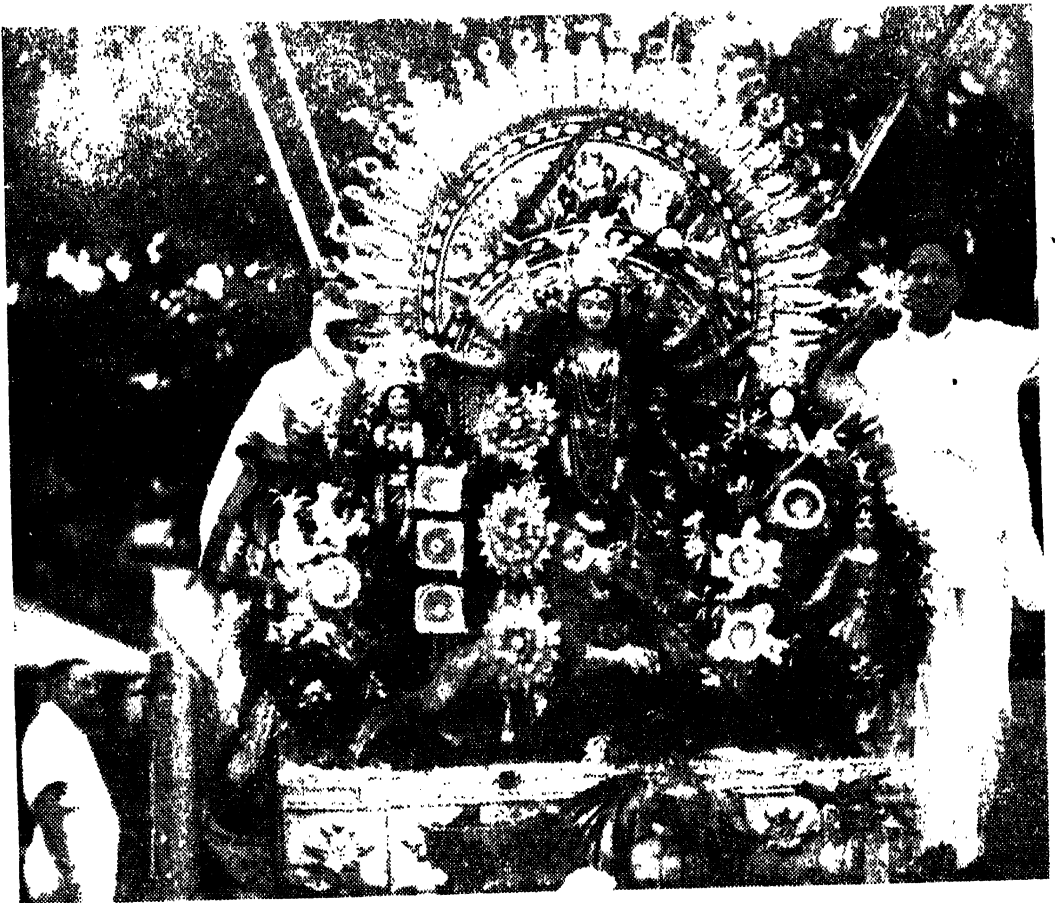
শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পূজা উৎসবের প্রেসিডেন্সী জেলের দুর্গা প্রতিমা।

মিথ্যা সংবাদ প্রেরণে বিপদ

বিনা কারণে কাহাকেও অপদস্থ করা অনেকের অভ্যাস। কোন কোন সময়ে এ অভ্যাসকে উপেক্ষা করা যায় কিন্তু বিনা কারণে দমকলের ঘণ্টা বাজিয়ে তাদের বিরক্ত করাটা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। কথায় আছে 'স্বভাব যায় না মলে।' এক শ্রেণীর লোক কোন কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানকে নানাভাবে অপদস্থ ক'রে আমোদ পায়। এভাবে মিথ্যা সংবাদ পেয়ে সব থেকে দমকল কর্তৃপক্ষদের অপদস্থ হ'তে দেখে আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক মিথ্যাসংবাদ প্রেরকদের ধরবার এক চমৎকার কল তৈয়ার করেছেন। দমকল অফিসে খবর পাঠাতে হ'লে এই নতুন যন্ত্রের ভিতরের হাতলটা ঘুরাতে হয় একটা বাক্সের মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে। ঘণ্টার হাতলটা ঘুরালেই সঙ্গে সঙ্গে সংবাদদাতার হাতে হাত কড়া পড়ে যায়। পালাবার আর কোন উপায় থাকে না। সংবাদ পেয়ে দমকল অফিস থেকে দমকল এসে হাজির হয়। আগুনের সংবাদ সত্য হ'লে সংবাদদাতার মুক্তি তা না হলে কড়া সাজা। প্রথম যেদিন এই নতুন কলের চলন হ'ল সেদিন বহু লোকই মিথ্যা সংবাদ দিয়ে ধরা পড়েছিল। তবে প্রথম দিনেই নাকি তাদের সাবধান করেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল—কড়া সাজা আর দেওয়া হয়নি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরীসৃপ

প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবজন্তুদের অতিকায় বংশধরেরা একেবারে লোপ পেতে বসলেও এখনও তাদের দু' একটাকে পাওয়া যায়। লণ্ডন পশুশালায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরীসৃপ বংশের একজোড়া সরীসৃপ সংরক্ষিত আছে। এদের নাম কোমেডো ড্রাগন। যবদ্বীপের এক দ্বীপের মধ্যে পাওয়া যায়। কোমেডো ড্রাগনের দৈহিক গঠন কুমিরের মতনই। প্রাণীতত্ত্ববিদেরা বলেন, পৃথিবী থেকে এ শ্রেণীর জীব ক্রমশ লোপ পেতে বসেছে। তাই পশুশালার কর্তৃপক্ষেরা সরীসৃপ যুগলকে বিশেষ যত্নে লালন পালন করছেন। এতখানি খাতিরের কথা ভাবলে কার না হিংসা হয় বলুন।

পুতুলের কবিতা লেখা

কবিতা লেখার উৎসাহ বাঙলা দেশের তরুণ তরুণীদের যতখানি ততখানি নাকি অন্য কোন দেশে নেই। সেটাও নাকি জল মাটির গুণে। তবে ফ্রান্সের একশত বৎসরের পুরাতন স্প্রীংএর পুতুলের সঙ্গে আর কারও তুলনা হয় না। পুতুলের কলে দম দিলে পুতুল পেন্সিল দিয়ে কবিতা লিখে যায়, ছবি আঁকে, শেষে মাথা নীচু ক'রে দর্শকদের অভিবাদন জানায়। আবার মাঝে মাঝে দর্শকের দিকে চোখ ঘুরিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করে। পুতুলটি বর্তমানে অবস্থান করছে ফ্রাঙ্কলিন ইন্সটিটিউটে। মিঃ জন ডবলু ব্রক তাঁর বাবার কাছ থেকে উপহার পেয়ে ইন্সটিটিউটে দান করেছেন। পুতুলটি কেনা হয় ১৮৭০ খৃস্টাব্দে।

প্রকৃতির খেয়ালে গাছের ডাল এক অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করেছে

পনীরের চাকা

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। জার্মানের কোন এক পনীর কারখানার মিস্ত্রীরা পনীরের চাকা প্রস্তুত করে বিভিন্ন দেশের রাস্তার উপর চাকা চালিয়ে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেছে। অন্যান্য শক্ত ধাতুর তৈরী চাকার মতই পনীরের চাকাটি স্বাভাবিকভাবে রাস্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়।

নকল চৌকীদার

রাত্রিকালে বড় বড় কারখানা চৌকী দেবার জন্যে অনেক রক্ষীর প্রয়োজন হয়। জীবজন্তুদের হাত থেকে শাকসব্জীর মাঠ রক্ষার জন্যে যেমন করে নকল মানুষ কিম্বা অদ্ভুত ধরণের জন্তু তৈরী করে দেওয়া হয়, সম্প্রতি ভার্জিনিয়ার কোন কারখানায় চৌকী দেবার জন্যে রাত্রিকালে সেইভাবে নকল মানুষ তৈরী করে কারখানা চৌকী দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রক্ষীকে নকল বলে কেউ বুঝতে পারে না, এমনভাবে তাকে তৈরী করা হয়েছে। মাঝে মাঝে একটু নড়েচড়ে রক্ষী আবার তার উপস্থিতি জানায়।

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

[১]

বর্তমানকালের সামান্য একটু সুযোগের অভাবে আগামীকালের অনেকখানি সুবিধা মানুষের হাতছাড়া হইয়া যায়, ইহা মানবজীবনের অতি সাধারণ ঘটনা। ঠিক এমনই একটা বিয়োগান্ত ব্যাপার ঘটিয়া গেল অমলের জীবনে, যেদিন দেশ হইতে একটা টেলিগ্রাম আসিয়া পেঁৗছিল। টেলিগ্রামটি খুব সংক্ষিপ্ত, কারণ শব্দের নির্দিষ্ট সংখ্যাকে লঙ্ঘন না করিবার একটা অদম্য চেষ্টা তাহার মধ্যে ছিল, সুতরাং 'অন্নদা মরিতেছে। এস।' এইটুকু ছাড়া তাহার ভিতর হইতে আর কোনও সংবাদই সংগ্রহ করা গেল না।

কিন্তু ওইটুকু সংবাদই যথেষ্ট। অন্নদা অমলের মাসী, ছেলেবেলায় তিনিই অমলকে মানুষ করিয়াছিলেন। স্নেহও যথেষ্ট করেন। তাহার মাসতুতো ভাইএরা যে টেলিগ্রামের কয়েক আনা পয়সা খরচা করিয়াছেন, তাহা ও-পক্ষের অনেকখানি ভাড়াতেই; এবং হয়তো শেষ সময় উপস্থিত হইতে পারিলে কিছু পাওয়াও যাইত। কিন্তু, অমল ভাবিয়া দেখিল, দেশে পেঁৗছিতে গেলে দু'টাকা এগার আনা শুধু ট্রেন ভাড়াই লাগে, তাহা ছাড়া আরও অন্তত দুই-চারি আনা সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। সে জায়গায় আছে তাহার কাছে মাত্র সতেরটি পয়সা। মাসীর আশা সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত ত্যাগ করিল।

আর যাহাই হউক, অমলের অবস্থাটা ঠিক ঈর্ষার বস্তু নয়। দেশের কথা ভাবা সে ছাড়িয়া দিয়াছে, কারণ সেখানে ফিরিবার আর পথ নাই। বাবা আছেন, মাও আছেন এবং সাধারণ বাঙালীর সংসারের মত ভাইবোনেরও অভাব নাই। কিন্তু অভাব একটা বড়রকমের আছে, সেটা অবশ্য বলাই বাহুল্য, টাকার। বাবা গ্রামের 'মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের' তৃতীয় শিক্ষক। মাহিনা ত্রিশ বৎসরে বাইশে পেঁৗছিয়াছে, অবশ্য সই করিতে হয় ত্রিশ টাকার রসিদে। জমি জায়গা যৎসামান্য আছে, তাহার ব্যয় আয়ের অপেক্ষা বিশেষ কম নয়। সুতরাং ম্যাট্রিক পাস করার পরই অমলের বাবা যদি তাহার জন্য উক্ত 'মধ্য ইংরেজী'তেই আর একটি মাস্টারির ব্যবস্থা করেন তো অন্যায় কিছু হয় না; বরং ভবিষ্যতের দিকে চাহিলে, ভবিষ্যৎ কেন সেটা অমলের বর্তমানই, খুবই ভাল ব্যবস্থা। হয়তো এতদিনে অমল বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া বসিতে পারিত, হয়তো বা ছেলেমেয়ের দোহাই দিয়া সেক্রেটারিবাবুকে ধরিয়া পড়িলে তাহার কুড়ি টাকা মাহিনা বাড়িয়া একুশ টাকাও হইয়া যাইত।

কিন্তু অমলের এ ব্যবস্থা ভাল লাগে নাই, যেমন ভাল কথা অনেকেরই ভাল লাগে না। তাই সে একদা বাপের অতি-কষ্টে জমানো টাকার মধ্য হইতে তিয়াত্তরটি টাকা মাত্র সম্বল করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল। তিয়াত্তরটি টাকা অবশ্য তিয়াত্তর পয়সায় পেঁৗছিতে অনেকখানি সময় লাগে নাই, কিন্তু অমলের অদৃষ্টক্রমে দশ টাকা মাহিনার একটি টিউইশন ইতিমধ্যেই সে পাইয়াছিল। পাঁচটি ছেলেমেয়ে, সকালে ঘণ্টা দুই করিয়া পড়াইতে হয়।

তার পর বিস্তর চেষ্টা করিয়াও সে আর একটিও কাজ জুটাইতে পারে নাই। টিউইশন করিয়া পড়াশুনা করিবার আশা তো সে অনেককালই ছাড়িয়া দিয়াছে, এখন ভাত জুটাইবার আশা ছাড়া ভিন্ন আশা নাই।

ইতিমধ্যে পূর্বেকার মেসের অনেকগুলি টাকা বাকী পড়ায় সে-মেস ছাড়িতে অমল বাধ্য হইয়াছে। এবারে বুদ্ধির কাজ করিয়া সুদ্ধ চার টাকা দিয়া একটি সীট ভাড়া লইয়াছিল, আহারাদি দুই পয়সার ভাত, এক পয়সার দাল হিসাবে নগদা হোটেলেই সারিত। কিন্তু তাহাতে গ্রাস চলিলেও আচ্ছাদন চলে না, অথচ আচ্ছাদনটাও প্রয়োজন। সুতরাং একখানা কাপড়, একটা জামা ও একজোড়া চটি কিনিতেই হইল, আর তাহাতে খরচও পড়িল প্রায় চার টাকা। ফলে এ মাসে সীট রেণ্ট বাবদ ম্যানেজারকে সে এক টাকার বেশী আর দিয়া উঠিতে পারে নাই। মেসের ম্যানেজার প্রকারান্তরে সীট ছাড়িয়া দিতেই বলিয়াছেন, কিন্তু উপায় নাই বলিয়াই সে চোখ কান বুজিয়া পড়িয়া আছে, বাঁকা কথার সরল অর্থ বুঝিবার চেষ্টা মাত্র করিতেছে না।

আরও একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে অমল টেলিগ্রামের কাগজখানা গুটি পাকাইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অত্যন্ত ময়লা বিছানাটাতেই শুইয়া পড়িল। সাবানের অভাবে বিছানাটা বহুকাল পরিষ্কার হয় নাই, অথচ সেটা এতই ময়লা হইয়াছে যে, পাশের সীটের ভদ্রলোকটি তাহার দিকে চাহিলেই অমলের মনে হইত যে বিশেষ করিয়া তিনি তাহার বিছানাটার দিকেই চাহিতেছেন। সতেরটা পয়সা আজও হাতে আছে সত্য, কিন্তু মাহিনা পাইবার তখনও তিনদিন দেরি। ধার করার চেষ্টা সে অনেকদিনই ছাড়িয়াছে, মেসে কেহ কাহাকেও ধার দেয় না, চারটি পয়সা চাহিলেও হয় খালি মনিব্যাগ দেখায়, নয় তো সে যে এইমাত্র নিজেই পাশের ঘরে পয়সা ধার করিতে গিয়াছিল, শপথ করিয়া এই সংবাদটি ঘোষণা করে।

ভাগ্যে সে যেখানে পড়ায় তাহারা নিয়মিত দু তারিখে মাহিনাটা দেয়! কিন্তু তাতেই বা সুবিধা কি। দশ টাকার মধ্যে অন্তত পাঁচটি টাকা এ মাসে ম্যানেজারকে দিতেই হইবে। বাকী থাকে পাঁচ; তাহারই মধ্যে তেল, সাবান, নাপিত, সব আছে। তবু ধোপার খরচা নাই। এমনই হিসাব করিলে মাথা খারাপ হইয়া যায়, অথচ আরও একখানা কাপড় না কিনিলেও লজ্জা নিবারণ হয় না।

অর্থ উপার্জনের যত রকম পন্থা আছে, সবগুলিই সে

ভাবিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু কোনটাতেই কিছু সুবিধা হয় নাই। এক পকেট-কাটা ছাড়া আর সব ব্যবসাতেই মূলধনের প্রয়োজন হয়, যেটার একান্ত অভাব তার। আর পকেটমার হওয়ার মত যথেষ্ট 'স্মার্ট'ও সে নয়, এই তাহার বিশ্বাস। টাকা কেহ দেয় না বটে, কিন্তু উপদেশ দেওয়ার লোকের অভাব নাই। পাশের সীটের কার্তিকবাবু প্রায়ই বলেন, "ওহে, একটা টাকা তুমি বিশ্বাস ক'রে আমার হাতে দিয়ে দেখ দেখি, কাল এসে পাঁচটি টাকা পকেটে দিয়ে যাব।"

কার্তিকবাবু কাজ করেন যেন কী একটা সরকারী অফিসে, কিন্তু সেটা তাঁহার গৌণ ব্যাপার। মুখ্য পেশা তাঁহার জুয়া খেলা। ঘোড়দৌড়ের মাঠের যাবতীয় সংবাদ তাঁহার কণ্ঠস্থ। —কোন্ ঘোড়ার নাকের মধ্যে কবে ঘা হইয়াছিল, কোন্ ঘোড়া দৌড়ের সময় একবারও নাক ঝাড়ে না, এসব সংবাদ তাঁহার ডায়েরিতে নোট করা আছে। কবে 'সানস্টার' তিন পায়ে দৌড়িয়া ডার্বি জিতিয়াছিল আর কবে গৌরীশংকর কুয়াশার সুযোগে বিচারকদের চোখে ধুলা দিয়াছিল, এই সব সরস কাহিনী প্রত্যহই আহারের সময় তিনি সকলকে শোনান। মেসের অনেককে 'সিওর টিপ'ও তিনি মধ্যে মধ্যে দিয়া থাকেন, তবে তাহাতে প্রায় কেহই বিচলিত হয় না।

স্ত্রী পুত্র কার্তিকবাবুর আছে, কিন্তু সে তাঁর দাদার উপর বরাত দেওয়া। মাঝে মাঝে দেখা দিতে যান বটে, তবে সে দৈবাৎ। শনিবার হইলে মাঠ আছে, মাঠের ফেরত ট্রামভাড়া পর্যন্ত থাকে না, দেশে যাইবার ট্রেনভাড়া তো দূরের কথা। যেসব শনিবারে কোনও মাঠে কিছু থাকে না, কিংবা সহসা কিছু পকেটে আসিয়া যায়, সেইসব শনিবারে তিনি বাড়ি যান। যাইবার সময় ছেলেমেয়েদের জন্য খাবার, স্ত্রীর জন্য সাবান এবং দাদার ছেলেমেয়েদের জন্য খেলনা—এ তাঁহার কখনও লইতে ভুল হয় না এবং প্রতিবারেই প্রতিশ্রুতি দিয়া আসেন যে, এইবার ফিরিয়াই তিনি একটি বাসা ঠিক করিবেন। এসব কথা অবশ্য শোনা কার্তিকবাবুর কাছেই।

কার্তিকবাবুর পাশে আর এক ভদ্রলোক থাকেন, অবিনাশ-বাবু। মাথাটি ওলের মত কামানো, গলায় কণ্ঠি, নাকে তিলক, এককথায় ঘোর বৈষ্ণব। কফ্ দেওয়া জামা এবং স্প্রিংএর জুতা পরেন। খুব উঁচু বংশ, মহারাজা প্রতাপাদিত্যের আমলে তাঁহার পূর্বপুরুষেরা জমিদার ছিলেন। তাহারই কিছু অংশ লইয়া প্রায় সেই সময় হইতেই মামলা চলিতেছে, যা হ'ক একটা কিছু হেস্তনেস্ত হইয়া গেলেই তিনি অমলকে সেরেস্তায় একটা চাকরি দিবেন—একথা তিনি প্রায়ই বলেন। কিন্তু এখন কি আর তাঁহার কিছু করিবার সাধ্য আছে? তিনি যে মরমে মরিয়া আছেন।

দোতালার কোণের ঘরের নগেনবাবু বলেন, "ওহে আইনটা প'ড়ে ফেল কোনওরকম ক'রে, তার পর নিদেন দরখাস্ত লিখেও দৈনিক দশ গণ্ডা বার গণ্ডা পয়সা কামাতে পারবে।"

তিনি নিজেও উকিল। কিন্তু ওই 'কোনওরকম'টা যে কি তাহা বলিতে পারেন না। পয়সাকড়ি সম্বন্ধে তাঁহার কথা না ভাবাই ভাল; প্রত্যহ মেসে ফিরিয়া ট্রাঙ্ক হইতে টাকার গেঁজেটা বাহির করিয়া গনিয়া দেখেন যে, কত পয়সা ইতিমধ্যে চুরি গেল। রাস্তায় বাহির হইলে সারাক্ষণ একটা হাত বুক-পকেটে দিয়া রাখিতে হয়, বলা বাহুল্য 'পার্স'টা তাঁহার ঐ পকেটেই থাকে। জবাকুসুম তেলের শিশিতে কাগজ কাটিয়া দাগ করা আছে, প্রত্যহ সকালে-বিকালে গনিয়া দেখেন যে, কেহ চুরি করিয়া মাখিল কি না। তৎসত্ত্বেও প্রায় বলেন, "আর একটা ট্রাঙ্ক না কিনলে নয়, এইসব খুচরো জিনিসগুলো যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা ঠিক নয়।

নগেনবাবুর চাএর নেশার কথাটা মনে পড়িলে অতিরিক্ত দুঃখের মধ্যেও অমলের হাসি পায়। ভদ্রলোক ভোরবেলা উঠিয়াই লক্ষ্য করেন কোন্ ঘরে চা তৈয়ারি হইতেছে, কিংবা চাকরকে কে পয়সা দিয়া বাজারে পাঠাইতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই ঘরে গিয়া হাজির হন এবং অনুরোধ করিলেই বলেন, "তাই তো আবার চা দেবে? আচ্ছা দাও, কম ক'রে কিন্তু। চা-টা বেশী খাওয়া ঠিক নয়।"

নগেনবাবুর ঘরে অপর ভদ্রলোকটি কী যেন গালভরা তাঁহার নাম, অমলের কিছুতেই মনে থাকে না, একটু বেশী-রকমের ভোজনপ্রিয়। কিন্তু নগেনবাবুর জন্য প্রায়ই তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হয়। আহার্য সম্মুখে দেখিলেই নগেনবাবুর দৃষ্টি নাকি এত লোলুপ হইয়া ওঠে যে তখন তাঁহাকে ভাগ না দিয়া থাকা যায় না। নগেনবাবুর চা খাইতে যাওয়ার ফুরসতে কোনওরকমে স্টোভ জ্বালিয়া ভদ্রলোক একটু হালুয়া কিংবা দুখানা মামলেট করিয়া খান, কিন্তু তাও এক-একদিন নগেনবাবু ইতিমধ্যেই চা শেষ করিয়া চিলের মত আসিয়া পড়েন। ভদ্রলোক প্রায়ই আফসোস করিয়া অমলের কাছে বলেন, "খেয়ে সুখ নেই মশাই, বলেন কি! এমন জায়গাতে মানুষ থাকে?"

এই মেসে একটিই মাত্র লোক আছে, যাহার কাছে পয়সা ধার চাওয়ার আশা দুরাশা হইত না, যদি না তাহার অবস্থাও প্রায় অমলের সমান হইত। ছেলেটির নাম ইন্দু, স্কটিশ চার্চে পড়ে। একটা গোটা দশেক টাকার স্কলারশিপ ও আরও একটা দশ-বার টাকার টিউইশন সম্বল করিয়া সে কলেজে পড়িতেছে। তেতলার চিলের ঘরটিতে সে কোনওরকমে মাথা গুঁজিয়া থাকে এবং অতি কষ্টে বাহিরের সম্ভ্রম এবং ভিতরের প্রয়োজনের তাগিদ বজায় রাখে। তবুও ইহারই মধ্যে এক একদিন সে অমলকে নিজের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া মুড়ি ও ছোলার ছাতু এক জায়গায় মাখিয়া খাইতে বসে এবং লেখাপড়ার কথা আলোচনা করে। এক-একদিন দেশ হইতে আরও দরিদ্র এক মামা তাহার সংবাদ লইতে আসেন, সঙ্গে প্রায়ই নারিকেলের নাড়ু বা চন্দ্রপুলি থাকে। সে সব দিনে গুটি দুই নাড়ু বা চন্দ্রপুলি কাগজে মুড়িয়া কোন্ এক ফাঁকে সে অমলের কাছে পেঁছাইয়া দিয়া যায়। এই একটিমাত্র ছেলের কাছেই নিজের দারিদ্র্যের ঠিক স্বরূপটা প্রকাশ করিতে অমল কোনওদিন লজ্জাবোধ করে নাই, তবে যতদূর জানা আছে, এ মাসে তাহার অবস্থাও রীতিমত শোচনীয়, সুতরাং পয়সা-কড়ি চাওয়ার কথা ভাবাই চলে না।

তবুও খানিকটা চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবার পর অমল

উঠিয়া তাহারই উদ্দেশে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। একটু আগেই ইন্দু উপরে উঠিয়াছে, তাহা সে জানিত। অন্তত মিনিট দশেক তাহার সহিত গল্প করিলেও মনটা সুস্থ হইতে পারে, এই আশায় সে বাহির হইল। উপরের সিঁড়ির কোণেই যে ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল তিনি নগেনবাবুদের পাশের ঘরে থাকেন, নাম শৈলেনবাবু। ছোট ছোট চোখ এবং বড় বড় দাঁত, মুখের দিকে চাহিলে প্রথমেই এই দুটো জিনিস চোখে পড়ে। মাথার অধিকাংশ স্থানই কেশবিরল তবু তাহাতেই মহাভৃঙ্গরাজ ঘষিতে তাঁহার পুরা এক ঘণ্টা সময় লাগে। তখনও মাথায় তিনি তেলই ঘষিতেছিলেন, অমলকে দেখিয়া কহিলেন, "এই যে অমলবাবু, চুপ ক'রে শুয়েছিলেন বুঝি? আমি ভেবেই পাই না মশাই যে আপনার মত ইয়ং ম্যান কি ক'রে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকেন। খাটুন মশায়, খাটুন। যা হ'ক একটা কিছু নিয়ে পরিশ্রম করুন। Time is money। অমূল্য সময়কে অর্থে রূপান্তরিত করুন, পয়সা কি আর এমনি আসে?"

এসব কথার জবাব অমল প্রথম প্রথম দিবার চেষ্টা যে করে নাই এমন নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝিয়াছিল যে, শৈলেনবাবু সেই শ্রেণীর লোক, যাঁহারা শুধু উপদেশ দিবার আনন্দেই উপদেশ দেন, এমন কি না দিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং এখন সে আর জবাব দেয় না। আজও সে তাই পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিয়া গেল। উঠিতে উঠিতে শুনিল যে তখনও পিছনে শৈলেনবাবু অলসতার উপর বক্তৃতা দিয়া চলিয়াছেন।

ইন্দুর ঘরে ঢুকিয়া অমল সোজা তাহার বিছানাটার উপর শুইয়া পড়িল। ইন্দু মুখ তুলিয়া চাহিল বটে, কিন্তু ভয়ে কোনও প্রশ্ন করিল না, পাছে খুব অপ্রিয় কিছু শুনিতে হয়। একটু পরে অমলই কথা কহিল। "আর তো পারি না ভাই ইন্দুবাবু। দেশে ফিরে গেলে সেই মাস্টারিটা পাব এমন সম্ভাবনা যদি থাকত তা হ'লে আমি পায়ে হেঁটেই দেশে চ'লে যেতুম, এমনি আমার অবস্থা!"

ইন্দু সভয়ে কহিল, "ফ্রেশ কিছু হ'ল নাকি?"

অমল জবাব দিল, "হ'ল না সেইটেই তো অসহ্য। কিছুই হচ্ছেন না যে।" আর একটু থামিয়া কহিল, "বিছানাটার এমন অবস্থা হয়েছে যে, কেবলই আমার মনে হয়, বারান্দা দিয়ে যত লোক যাচ্ছে সকলকারই নজর আমার বিছানাটার ওপর।"

ইন্দু একটু যেন অপ্রস্তুতভাবে কহিল, "আমার কাছে যে কাপড় কাচা সাবানটা আছে, তাতে খুব না হ'ক, খানিকটা ফরসা হবে বোধ হয়, একবার চেষ্টা করে দেখলেন না কেন?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অমল কহিল, "তা না হয় দেখব, আর দেখতেই হবে; কিন্তু এমন জোড়াতালি দিয়ে আর ক'দিন চলবে? কিছুতেই যেন আর কুল-কিনারা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

ইন্দু সহসা লাফাইয়া উঠিল, কহিল, "আচ্ছা অমলবাবু, আসুন না একটা কাজ করা যাক।"

ইন্দুর প্ল্যানগুলি সাধারণত কোন্ শ্রেণীর তাহা অমলের জানা ছিল, সুতরাং সে একটু সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি বলুন দেখি?"

ততক্ষণে ইন্দু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, জবাব দিল, "আমরা তো রোজ ভোরবেলা বেড়াতে যাই, সেই সময়টা যদি খবরের কাগজ বেচি তা হ'লে কি হয়?"

অমল কিছুক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তার মানে?.........খবরের কাগজ?"

তাহার বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া ইন্দু একটু দমিয়া গেল, ভয়ে ভয়ে কহিল, "হ্যাঁ, তাতে দোষ কি?"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অমল কহিল, "দোষ অবশ্যি কিছু নেই, কিন্তু আপনি তা পারবেনই বা কেন, আর আপনার দরকারই বা কি? তা ছাড়া ধরুন আপনার কলেজের বন্ধুরা যদি কোনও দিন দেখেই ফেলে? তা হ'লে কি আপনি কলেজে কোনওদিন মুখ দেখাতে পারবেন?"

ইন্দু জবাব দিল, "তা বটে। কিন্তু কলেজের বন্ধুরা তো সবই এইদিকের, আমরা যদি একটু অন্যত্র যাই? ধরুন, ধর্মতলা, কিংবা চৌরঙ্গি, কিংবা ভবানীপুরে? তা ছাড়া টাকার আমারও দরকার, সত্যিই দরকার। কি কষ্টে যে আছি তা আর কি বলব। চলুন দু'জনেই যাওয়া যাক।"

অমল কহিল, "হ্যাঁ দু'জনে দুদিকে গেলে হয় বটে।"

বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি ইন্দু কহিল, "না, না, দুদিকে নয়। একটা মোড়েই দুজনকে থাকতে হবে। নইলে নার্ভাস হয়ে পড়ব, কাজ হবে না। এখন নতুন তো! আপনাকে দেখে আমি ভরসা করব, আপনি আমাকে দেখে বুক বাঁধবেন, তবেই তো হবে।"

অমল কহিল, "কিন্তু পড়াশুনো? আমার না হয় ও বালাই নেই, আপনার তো আছে।"

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, "সে ঠিক হবে'খন। সকালে ঘণ্টা দুই ক'রে খাটলে কি ক্ষতি হবে? রাত্তিরে পুষিয়ে নেব এখন।"

অমল চোখ বুজিয়া খানিকক্ষণ ভাবিয়া কহিল, "তা না হয় হ'ল, টাকাটা? অবস্থা তো আমাদের দুজনেরই সমান, টাকাটা কোথা থেকে আসবে ইন্দুবাবু? অন্তত দু-তিন টাকা মূলধনও তো চাই।"

এই প্রবল ধাক্কাটা সামলাইতে ইন্দুর কিছু দেরি লাগিল। তাহার ক্যাশের অবস্থা অমলেরই মত, হয়তো সামান্য কিছু বেশী; কিন্তু আনা আষ্টেক পয়সা যাহাদের সম্বল তাহাদের কাছে দু-তিন টাকা মূলধন লিমিটেড্ কোম্পানির মঞ্জুরীকৃত মূলধনের মতই দুরাশা মাত্র। বেচারী অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অমলও প্রথম যখন কথাটা বলিয়াছিল তখনও পর্যন্ত মনে একটা ক্ষীণ আশার আভাস ছিল যে, হয়তো এ সমস্যার মীমাংসাও একটা কিছু ইন্দু করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু বহুক্ষণ ওদিক হইতে কোনও সাড়া শব্দ না আসায় সে হতাশ হইয়া আবার চোখ বুজিল। অর্থাৎ অন্ধকার কিছুক্ষণ পূর্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনিই রহিল।

(শেষাংশ ৪৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রবীন্দ্রনাথ ও জর্জিয়ান কবিগণ

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত ভিন্ন ভিন্ন কবির ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ভিক্টর হুগো বলিয়াছিলেন,

"The poets are a long line of gentlemen with their hands in each other's pockets."

শ্রেষ্ঠ কবিদের চিন্তাধারা চালিত হয় একপথে সেই জন্য এক-জন কবির কাব্যের সহিত অপর কবির ভাবসাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় উহা যেন এক কবি কর্তৃক অপর কবির কাব্য হইতে আহৃত। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় যে ধরনের কল্পনা বর্তমান তাহার সহিত ইংরেজী সাহিত্যের শেলি, বায়রন, কীটস, ওআর্ডসওআর্থ, সুইনবার্ন, টেনিসন প্রভৃতি রোমাণ্টিক ও ভিক্টোরিয়া যুগের কবিদের কল্পনা সাদৃশ্য তো আছেই। কিন্তু কয়েকজন আধুনিক-তম ইংরেজ কবির কল্পনাদর্শের সহিত রবীন্দ্রনাথের কল্পনাদর্শের অভিন্নতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের মনটি অতি আধুনিক।

রোমাণ্টিক ও ভিকটোরিয়া যুগের কবিগণ কবির পূর্বজ; কবি বাল্যে ও যৌবনে তাঁহাদের কাব্য অনুশীলন করিয়াছিলেন। সুতরাং ওই যুগের কবিদের ভাব অজ্ঞাতসারে কবির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া কবির কাব্যে অনেক স্থলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের কয়েকজন জর্জিয়ান কবির এমন কতকগুলি রচনা আছে যাহা রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতার বহু পরে রচিত, অথচ উহার সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব-সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতাটি রচিত হয় ১৩০২ সালের ১লা মাঘ, অর্থাৎ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। এই কবিতায় কবি দেখাইয়া-ছেন যে, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য সকল প্রয়োজনের বাহিরে, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি সত্তামাত্র, সে সৌন্দর্য অনবদ্য, তাহা পবিত্র, তাহা স্বর্গীয়, তাহা দেবীত্বের আত্মপ্রকাশ। অচ্ছোদ সরসী নীরএ বিশ্বের সকল সৌন্দর্য দিয়া গড়া এক অনুপমা সুন্দরী নারী-মূর্তি স্নান করিতেছিল। তাহার চারিদিকে সুন্দর আবেষ্টন—সেই সুন্দর আবেষ্টনের মধ্যে ঐ নারীমূর্তি অধিষ্ঠিত। সেখানে প্রেমের ও সৌন্দর্যের সকল উপকরণই বিরাজ করিতেছিল। তরুতলে বকুলের রাশি ঝরিয়া পড়িতেছিল, কোকিলের কুহু-তানে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, অদূরে সরো-বর প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী কলনৃত্যে মাণিক্য কিংকিণী বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে বহিয়া চলিয়াছিল, আকাশে হংস-বলাকা উড়িয়া চলিয়াছিল কৈলাসের পানে, স্নিগ্ধ সুগন্ধে চারিদিক সুবাসিত হইয়াছিল। সুতরাং এইরূপ স্থানে মদনের স্বভাবতই আবির্ভাব হয়। কিন্তু এখানে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া কামদেব তাঁহার প্রভাব বিস্তারে অক্ষম। মদন এখানে পরাজিত। এই রমণীর অনুপম রূপ কামনাকে জাগায় না, মনকে পাগল করিয়া দেয় না, বরং অনির্বচনীয় এক আনন্দে মনকে ভরিয়া দেয়।

সৌন্দর্য দেখিলেই মানবের মনে ভোগ বিলাসের বাসনা উপস্থিত হয়। কিন্তু যিনি সকল সৌন্দর্যের আদি সৌন্দর্য, যিনি ইটার্নাল বিউটি, তাঁহাকে দেখিলে লোভ ও বাসনা অন্তর্হিত হয়, তাঁহার দর্শনে চিত্ত নিমেষহীন হইয়া যায়, মনে তৃপ্তি ও ভক্তির উদয় হয়। সেইজন্য মদনদেব প্রথমে সেই সুন্দরী রমণীর প্রতি পুষ্পের শর সন্ধান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে সৌন্দর্যের মহিমান্বিত গম্ভীর মূর্তি যখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল তখন তিনি সৌন্দর্যের সেই নগ্নমূর্তির মহিমার সম্মুখে অবনত হইয়া আপনার ধনুর্বাণ তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলেন।—

নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি'। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রশান্ত বয়ানে।
... ...

নারীর চরম সৌন্দর্য প্রকাশে মদন পরাভূত হইয়াছে। কারণ সম্পূর্ণ সৌন্দর্য কখনও কামনার বশে আসে না।

"Highest aesthetic pleasure is a pleasure without interest."

১৯১৩-১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত একটি জর্জিয়ান কবিতার মধ্যে অনুরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কবিতাটির নাম Children of Love, রচয়িতা হ্যারল্ড মনরো। উক্ত কবিতাটিতে কবি বর্ণনা করিয়াছেন যে, শিশু মদন যীশুখৃষ্টকে দেখিয়া তাহার বাণ আঘাত করিল। ইহাতে যীশুর হৃদয় বিদ্ধ হইয়া রক্তপাত হইল, তাঁহার চক্ষে অশ্রুধারা ঝরিল। তথাপি তিনি মদনকে কিছু বলিলেন না, বা কোনও তিরস্কার করিলেন না। ইহাতে মদন বিস্মিত হইয়া তাঁহার কাছে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সে বলিল, 'ভাই, তুমি আমার ধনুর্বাণ লইয়া আমাকে মার।' কিন্তু যীশু অশ্রুমোচন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন, মদন বিস্ময়ে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতায় পবিত্র স্বর্গীয় সৌন্দর্যের কাছে মদন পরাজয় লাভ করিয়াছে, আর হ্যারল্ড মনরোর "Children of Love" কবিতায় পবিত্র স্বর্গীয় প্রেমের কাছে কামনা বাসনা পরাভূত হইয়াছে।

'উর্বশী' কবিতায় (১৮৯৫) রবীন্দ্রনাথ অবিনশ্বর অনবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যের জয়গান করিয়াছেন। ইংরেজ কবি জেম্‌স্ এলরয় ফ্লেকারও (১৮৮৪-১৯১৫) তাঁহার 'দি গোল্ডেন জার্নি টু সমরকন্দ' নামক কবিতায় বলিয়াছেন—"Beauty lives though lilies die"।

চিত্রা কাব্যের 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি রচিত হয় ১৪ই মাঘ ১৩০০ অর্থাৎ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। এই কবিতাটি কবির সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর সহিত অথবা তাঁহার মানসপ্রিয়ার সহিত অভিনব মিলন-সঙ্গীত। সমগ্র জগতের সম্মুখে কবি যতই সামান্য হীন অথবা নগণ্য হউন না কেন তিনি তাঁহার প্রিয়ার নিকটে রাজার তুল্য সমা-দরের পাত্র। এই মানসপ্রিয়াই কবির ললাটে রাজটীকা পরান। তাই কবি উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার প্রিয়াকে বলেন—

তুমি মোরে করেছ সম্রাট।
তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব মুকুট।

কবির নিজের দীনতা, হীনতা, ক্ষীণতা, ক্ষুদ্রতা প্রভৃতি তাঁহার মানসপ্রিয়ার প্রসাদে অপরূপ হইয়া ওঠে। কবি অনুভব করেন যে, তাঁহার সহিত তাঁহার মানসপ্রিয়ার মিলনের মধ্য দিয়া যেন অতীত যুগের প্রেমিক প্রেমিকাদের সুখ দুঃখ মিশ্রিত কাহিনী রূপায়িত হইয়া উঠে। মানসপ্রিয়াকে ভালবাসিয়া সেই প্রেমের নিবিড়তায় তিনি যেন বিশ্বের সমস্ত প্রেমউৎফুল্ল এবং বিরহম্লান হৃদয়ের ভাষার সন্ধান পাইয়াছেন। অরণ্যে নল-দময়ন্তীর নির্জন ভ্রমণ, বিরহকাতরা শকুন্তলার করপদ্মদললীন ম্লান মুখশশী, পুরুরবার বিরহব্যথা, মহাশ্বেতার মহেশবন্দনা, প্রেমবার্তা কহিবার ছলে সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোলে ফাল্গুনীর প্রেমচুম্বন এবং হর-পার্বতীর আবেগ-গভীর প্রেম আলাপন এ সবই কবির কাছে যেন সুস্পষ্ট।

এই কবিতাটির সহিত ১৯১৮-১৯ সালের মধ্যে রচিত নিম্ন-লিখিত জর্জিয়ান কবিতাটি তুলনীয়।

Few are my books, but my small few have told
Of many a lovely dame that lived of old ;
And they have made me see those fatal charms
Of Helen, which brought Troy so many harms ;
And lovely Venus, when she stood so white

Close to her husband's forge in its red light.
I have seen Dian's beauty in my dreams,
When she had trained her looks in all the streams
She crossed to Latmos and Endymion.
And Cleopetra's eyes, that hour they shone
The brighter for a pearl she drank to prove
How poor it was compared to her rich love:
But when I look on thee, love, thou dost give
Substance to those fine ghosts, and make them live.
W. H. Davis, "Lovely Dames."

এখানে ইংরেজ কবি বলিয়াছেন যে, অতীতকালে আবির্ভূত বিভিন্ন প্রেমিক প্রেমিকার আনন্দোল্লাস এবং মিলনানন্দ তিনি অনুভব করেন তাঁহার মানসীর মধ্যে—তাঁহার মানসপ্রিয়ার মধ্যে কবি যেন হেলেন, ভেনাস, ডায়না, ক্লিওপেট্রা প্রভৃতি অনুপমা সুন্দরীদের প্রেম প্রত্যক্ষ করেন।

মানসীর 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় (১২৯৬ সাল, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ) রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, প্রেম নিত্য, প্রত্যেক প্রেমিক তাহার প্রেমিকাকে যেন যুগে যুগে ভালবাসিয়া আসিয়াছে। যুগে যুগান্তরে প্রত্যেক প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমের পুনরভিনয়ই হইতেছে।—

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শত রূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
... ...
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হ'তে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে মিলন মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য নূতন সাজে।

এই ভাবই কল্পনার 'স্বপ্ন' কবিতায় সুপরিস্ফুট। সেখানেও কবি তাঁহার জন্মজন্মান্তরের প্রেয়সীকে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন এবং অনুভব করিয়াছেন যে, বর্তমান হইতে অতীতে ও ভবিষ্যতে কবির সহিত কবিপ্রিয়ার অভিসার চলিবে—এ অভিসারের আরম্ভ অনাদি-কালে এবং ইহার শেষ কোথাও নাই,—এ প্রেম অশেষ।

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে।
—কল্পনা-স্বপ্ন

অ্যালফ্রেড নয়েস নামক জর্জিয়ান কবির "দি প্রোগ্রেস অব লাভ" নামক কবিতায় অনুরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। জর্জিয়ান কবি অ্যালফ্রেড নয়েসের জন্ম ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁহার প্রথম কবিতা "The Loam of Years" প্রকাশিত হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে।

In other worlds I loved you, long ago:
Love that hath no beginning, hath no end.
—Alfred Noyes, "The Progress of Love."

ইংরেজ কবি অ্যালফ্রেড নয়েসও রবীন্দ্রনাথের মত এখানে অনুভব করিয়াছেন যে, প্রেম নিত্য, অনাদি অনন্ত এবং সকল দেশের মাঝে সকল কালে কবি-প্রিয়া বর্তমান ছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ১৪০০ সাল কবিতায় (১৩০২ সাল, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) কল্পনা করিতেছেন যে, "আজি হ'তে শত বর্ষ পরে"র পাঠকেরা কিভাবে তাঁহার কাব্যের রসগ্রহণ করিবে। তখন ষড়ঋতুর সৌন্দর্য বদলাইয়া যাইবে এবং অন্য কবির দ্বারা সে সৌন্দর্য হয়তো ভিন্নরূপে বর্ণিত হইবে। তথাপি আজ বসন্তাগমে কবির মনে যে আনন্দ-হিল্লোল জাগিয়াছে সেই আনন্দ তিনি ভবিষ্যৎকালীন শত বৎসর পরের পাঠক ও কবির উদ্দেশে পাঠাইয়া দিবার জন্য উৎসুক।

আজি হতে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি' আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে
আজি হতে শত বর্ষ পরে।
আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ,
অনুরাগে সিক্ত করি' পারিব কি পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হতে শত বর্ষ পরে।
... ...
আজি হতে শত বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে।
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তার করে
আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্মরে,
আজি হতে শত বর্ষ পরে।

ইহার সহিত ইংরেজ কবি জেমস এলরয় ফ্লেকারের "To A Poet A Thousand Years Hence" নামক কবিতাটি তুলনীয়।

I who am dead a thousand years,
And wrote this sweet archaic song,
Send you my words for messengers
The way I shall not pass along.
* * * *
O friend unseen, unborn, unknown,
Student of our sweet English tongue,
Read out my words at night alone:
I was a poet, I was young.
Since I can never see your face,
And never shake you by the hand,
I send my soul through time and space
To greet you. You will understand.
—James Elroy Flecker (1884-1915).

কল্পনার "অশেষ" কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালে অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনদেবতার আহ্বান শুনিতে পাইয়াছেন। জীবনসন্ধ্যায় সকল কাজ সাঙ্গ করিয়া কবি যখন বিশ্রামোন্মুখ তখন নূতন কল্পনা-রাজ্যে প্রধাবিত হওয়ার জন্য জীবনদেবতার ব্যাকুল আহ্বান আসিয়া পৌঁছিয়াছে কবির কাছে।

আবার আহ্বান।
যত কিছু ছিল কাজ সাঙ্গ তো করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান।
জাগায়ে মাধবী বন চ'লে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যুষ নবীন।
প্রখর পিপাসা হানি' পুষ্পের শিশির টানি'
গেছে মধ্যদিন।
মাঠের পশ্চিম শেষে অপরাহ্ন ম্লান হেসে
হোলো অবসান।
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে
তবুও আহ্বান।

জীবনদেবতার এই আহ্বানে কবি আর শেষ পর্যন্ত বিশ্রাম করিতে পারেন নাই। তিনি পুনরায় তাঁহার কাব্যবীণায় নব নব ধ্বনি তুলিয়াছেন; উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া তিনি বলিয়া উঠিয়াছেন—

তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব রানী
হে মহিমাময়ী।

ইহার সহিত ১৮১৮-১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত নিম্নলিখিত জর্জিয়ান কবিতাটি তুলনীয়।

Old and alone, sit we,
Caged, riddle-rid men ;
Lost to earth's 'Listen' and 'See'
Thought's 'Wherefore?' and 'When'.

Only far memories stray
Of a past once lovely, but now
Wasted and faded away,
Like green leaves from the bough.

Vast broods the silence of night,
The ruinous moon
Lifts on our faces her light,
Whence all dreaming is gone.

We speak not ; trembles each head ;
In their sockets our eyes are still ;
Desire as cold as the dead ;
Without wonder or will.

And, one with a lanthorn, draws near,
At clash with the moon in our eyes ;
'Where art thou?' he asks. 'I am here',
One by one we arise.

And none lifts a hand to withhold
A friend from the touch of that fee:
Heart cries unto heart. 'Thou art old'.
Yet reluctant, we go.

—The Old men, Walter de la Mare.

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতায় (১৩০০ সাল, ইং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রচিত) জীবনদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে তিনি কবিকে কোন্ নিরুদ্দেশ পথে কোথায় লইয়া যাইতেছেন।

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী।
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী
তুমি হাসো শুধু মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি',
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন কোণে।
কী আছে হোথায়, চলেছি কিসের অন্বেষণে॥

ইংরেজ কবি ফ্রান্সিস ব্রেট ইয়ঙের মনেও এইরূপ নিরুদ্দেশ যাত্রার অনুভূতি জাগিয়াছে তাই তিনি তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে প্রশ্ন করিয়াছেন।

Whither, O my sweet mistress, Must I follow thee?
For when I hear thy distant footfall nearing,
And want on thy appearing,
Lo my lips are silent: no words come to me.

* * * *

Whither, O divine mistress, must I then follow thee?
Is it only in love .... Say is it only in death
That the Spirit blossometh,
And words that may match my vision shall
come to me ?

'Invocation'—Francis Brett Young,
(Georgian Poetry, 1918-19).

কবিতাটি ১৯১৮-১৯ সালের মধ্যে রচিত।

বলাকার "নবীন" কবিতাটিতে (১৩২১ সাল, খৃঃ ১৯১৪) রবীন্দ্রনাথ নবীনের জয়গান গাহিয়াছেন। নবীন কোনওরূপ বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া নিজের নবীনত্বের অমর্যাদা করিবে না আপদ বিপদ দেখিয়া নবীনের প্রাণে ভয়সঞ্চার হয় না। বিপদ আপদ এবং বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলাতেই সে নিজের জীবনকে সার্থক মনে করে।

আপদ আছে, জানি আঘাত আছে
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে,

জর্জিয়ান কবি অ্যালফ্রেড নয়েসও নবীনের এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

Never was mine that easy faithless hope
Which makes all life one flowery slope
To Heaven Mine be the vast assaults of doom,
Trumpets, defeats, red anguish, age-long strife,
Ten million deaths, ten million gates to life,
The insurgent heart that bursts the tomb.

বিভিন্ন কবির কাব্যে এইরূপ ভাবসাদৃশ্য দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন সময়ে কবিগণ আবির্ভূত হইলেও তাঁহারা একই ভাবের ভাবুক, তাঁহাদের কল্পনা একই পথে চালিত হয়।

মনে ছিল আশা

(৪৮৩ পৃষ্ঠার পর)

নীচের তলায় কয়েকটি বাবুর আস্ফালনের শব্দ শোনা যাইতেছিল। তাহার সহিত পাশের বাড়ির পোষা কোকিলটার ভাঙাভাঙা আওয়াজ মিশিয়া এক বিচিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। সেইদিকে খানিকটা কান পাতিয়া থাকিবার পর সহসা ইন্দু কথা কহিল; বলিল, "আচ্ছা, সন্ধানে কোনও মহাজন আছে? গহনা বাঁধা রেখে টাকা ধার দেবে?"

অমল বিস্মিত হইয়া জবাব দিল, "না, কিন্তু কেন?"

ইন্দু একটুখানি সলজ্জভবে হাসিয়া কহিল, "আংটিটায় এখন আর কিছু নেই বটে, কিন্তু এককালে ওটা খাঁটী সোনাই ছিল। শুধু সোনার দামে বিক্রী হ'লেও অন্তত ছ-সাত টাকা দাম হবে। অবশ্য বিক্রী করার আমার ইচ্ছে নেই কারণ মা ওটা অনেক কষ্টেই গড়িয়ে দিলেন, তবে বাঁধা রেখে যদি গোটাদুই টাকাও পাওয়া যেত তো মন্দ হ'ত না।"

অমল কহিল, "তার পর? টাকাটা শোধ হবে কি করে?"

ইন্দু বলিল, "কেন, কগজ বেচে কি কিছুই হবে না? আর না হয় যেমন ক'রে হ'ক শোধ করব।"

একটু ভাবিয়া অমল কহিল, "কি জানি, আমার ছাত্রদের বাড়ি জিগ্‌গেস করলে হয়তো হদিস্ পাওয়া যায়।"

ইন্দু বইটা মুড়িয়া রখিয়া কহিল, "তা হ'লে চলুন এখনই যাওয়া যাক। আমার ক্লাস সেই বারটায়, এখনও ঢের সময় আছে।"

অমলও "চলুন" বলিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার পর তাহার সেই অতি মলিন জামাটাই গায়ে চড়াইয়া মেস সুদ্ধ লোকের দৃষ্টি এড়াইবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল। (ক্রমশ)

গোধূলিরাগ

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীতারাপদ রাহা

কয়েক দিন ধরিয়া বাড়ী ঘর নূতন করিয়া সাজান শুরু হইয়াছে। পরদিন কুমারেশ তাহার কিছু কিছু দেখাশুনা করিতে গেলেন, ভালো লাগিল না। অথচ কয়েক মাস আগে তাঁহার যে মন ছিল তাহাতে তাঁহার এ কাজ ভাল লাগিবারই কথা। আজ তাঁহার মনে হইল তাঁহার নিজের রক্ত যাহার শরীরে প্রবাহিত হইতেছে, সেই আজ তাঁর মনের সবটুকু শান্তি তাঁর অন্তিমের সম্বলটুকু নষ্ট করিতে আসিতেছে। সোমেশের ভুলের কথা মনে করিয়া আবার তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, তিনি লাইব্রেরি ঘরে আসিয়া সোফায় দেহ এলাইয়া দিলেন।

আজ শকুন্তলার আসিবার দিন, এই একটি কথা শুধু তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল, আর একটি দিনও ত শকুন্তলার সঙ্গ তিনি নির্বিবাদে ভোগ করিতে পারিবেন। কুমারেশ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কখন দিন শেষ হইবে অপরাহ্ন আসিবে, সেই ভাবনায় তাঁহার দিন কাটিল। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তিনি ড্রাইভারকে পাঠাইলেন। শুধু এই সন্ধ্যাটিই তো? শকুন্তলা কি আর মনে করিবে।

আচ্ছা শকুন্তলা কি ভাবে?—কুমারেশ এতদিন পর ভাবিতে বসিলেন—শকুন্তলা কি ভাবে? আমার এই বয়সে তাহাকে দেখিবার জন্য এই ব্যাকুলতাকে কি ভাবে দেখে সে? ভাবিয়া ফল নাই, কুমারেশ দেখিলেন, ভাবিয়া ফল নাই। অন্য ভাবে দেখিলেও যাহা হইতে কুমারেশের নিষ্কৃতি ছিল না, অতিশয় ভালভাবে দেখিলেও আজ যাহা শেষ করিতে হইবে তাহা মন্দ হইলেও আজ ভাবিয়া লাভ কি। বিশেষত শকুন্তলা ইহার সদর্থই লইয়াছে, নইলে আকার ইঙ্গিতে একদিন না একদিন তার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়া যাইত। কুমারেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সহসা বুকের বাঁ দিক হইতে একটা ব্যথা উঠিয়া সারা বুকে ছড়াইয়া গেল, কুমারেশ দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিলেন। দাঁড় হইতে কাকাতুয়া ডাকিয়া উঠিল—দাদু ও দাদু, কি হ'ল?

ব্যথাটা এমন কিছু নয়, তখনই কমিয়া গেল। বুকে হাত রাখিয়া কুমারেশ শুধু নিজের বুকের স্পন্দনগুলি অনুভব করিলেন। অতি ছোট ছোট ধাপ, কিন্তু তাহাই বাহিয়া বাহিয়া কুমারেশের জীবন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দিকে আগাইয়া যাইতেছে। আজ আর ইহাতে কুমারেশের দুঃখ নাই, ঘড়িটির টিক টিক শব্দের মত ইহা ক্রমে শকুন্তলার সহিত মিলনের মুহূর্তটিকে সন্নিকট করিয়া দিতেছে। কুমারেশ ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, শকুন্তলার আসিবার আর কয়েক মিনিট মাত্র বাকী।

ভারতী কয়েকবার কুমারেশের সমুখ দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে—সেও যেন শকুন্তলার আসিবার প্রতীক্ষায় ছটফট করিতেছে। সহসা কুমারেশ যেন কানে গাড়ির শব্দ পাইলেন। হাঁ—এই ত গাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে। কুমারেশের বুকের স্পন্দন দ্রুত হইল—এইবার শকুন্তলা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে—কুমারেশ চোখ বুজিয়া তাহার স্মিত হাসিটুকু পর্যন্ত যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

সিঁড়ি দিয়া কে যেন আসিতেছে। কিন্তু এ-ত শকুন্তলার পায়ের শব্দ নয়! সভয়ে চোখ মেলিতেই ড্রাইভার সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, হাতে একখানা চিঠি।

তবে আসিল না!

ড্রাইভার আবার সেলাম করিয়া নীচে নামিয়া গেল। কম্পিত হস্তে কুমারেশ চিঠি খুলিলেন। শকুন্তলা লিখিয়াছে—

দাদু,

আপনার কাছে কিছুক্ষণ থাকতে পারার আনন্দ আমারও কম নয়, কিন্তু তবুও সে আনন্দ আমি জীবনে আর লাভ করতে পাব না, আপনাদের ওখানে আর আমি যেতে পারব না। কথাটা কালই আমার ব'লে দেওয়া উচিত ছিল। বলতে পারি নি, সে আমার নিজেরই দুর্বলতা। সে জন্য মাফ চাই।

আপনার কাছ থেকে যা পেয়েছি—এত স্নেহ আমি জীবনে কারও কাছ থেকে পেয়েছি ব'লে মনে করতে পারি না। এদিক দিয়ে জীবন আমার ধন্য হয়ে গেছে। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইতি—আপনার স্নেহের শকুন্তলা।

পুনশ্চ।—আপনার শরীর তত ভাল যাচ্ছে ব'লে মনে হয় না, আসছে গ্রীষ্মকালটা সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিলে ভাল হয় মনে করি। সুতরাং শহরে আর ছুটোছুটি করবেন না, এই অনুরোধ। আপনার নাতি ও নাতবউ দু-একদিনের মধ্যে এসে যাবেন, আশা করি নিঃসঙ্গতা আর আপনাকে পীড়ন করবে না। আপনি আমার প্রতি যে স্নেহ দেখিয়েছেন তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ।

কুমারেশের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বৃদ্ধকে কেউ দয়া করে না। তাহার প্রয়োজন অপ্রয়োজনের হিসাব অপরেই রাখিতে চায়, তাহার হাতে কেউ দেয় না। মৃত্যুর পদধ্বনি যে প্রতি পলে শুনিতেছে, ভাবিতেছে আর আশঙ্কা করিতেছে, ভয় ভুলিয়া থাকিতে তাহাকে নূতন নেশায় মন দিতে দেয় না। এ কথা তিনি কাহাকে বুঝাইবেন যে, শকুন্তলা তাহার মৃত্যু ভুলাইয়া রাখিয়াছিল? মৃত্যুর সহিত জীবনের ব্যবধান যে প্রতি মুহূর্তে হ্রাস পাইয়া শূন্যের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে সে কথা আমরা ভুলিয়া থাকি নতুবা মানুষের বাঁচা অসম্ভব হয়।

কুমারেশ মহাকালের গর্জন যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, বিরাট পর্বতাকার আঁধারের ঢেউ যেন বর্তুলাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, চন্দ্র সূর্য জগৎ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।

পাশে টিপয়ে দেবপ্রসাদ চা রাখিয়া গেল, কুমারেশ সে দিকে চাহিয়া দেখিলেন না। টেবিলের উপরে স্থাপিত তার বৈকালিক বর্মা চুরুট তেমনই পড়িয়া রহিল, তিনি স্পর্শ করিলেন না। ভারতী যখন কাছে আসিয়া তাঁহার চাএর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তখন চা জুড়াইয়া একেবারে শরবৎ হইয়া গিয়াছে। ভারতীর তাগিদে দেবপ্রসাদ আবার গরম চা দিয়া গেলে কুমারেশ তাহা পান করিয়া কলম লইয়া বসিলেন। আজ শকুন্তলার অভাবে কুমারেশের যে কী কষ্ট হইতেছে সে কথা সত্য করিয়া লিখিলে হয়ত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু সেকথা লেখা যায় না। পরপারের খেয়ায় পা দিয়া এ আকাঙ্ক্ষার কথা লিখিয়া নিজের ভিক্ষুকবৃত্তির পরিচয় কুমারেশ প্রকাশ করিতে পারেন না। তবু তিনি লিখিলেন—

বৃদ্ধের কোন কিছু চাহিতে নাই, আশা করিতে নাই, এ কথা তুমি স্মরণ করাইয়া না দিলেও আমি জানি। এ সত্ত্বেও তুমি আমাকে আমার জীবনের চরম দুর্দশার দিনে যে আনন্দ দিয়াছ, শান্তি দিয়াছ সেজন্য তোমাকে আমি প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করি। আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আর একজনকে আনন্দ দিয়াছ। সে ভারতী। দুঃখ সেও কম পাইল না। তুমি ইচ্ছা করিলে এ আনন্দ তাহাকে আরও দুই দিন দিতে পারিতে—উহাদের আসিতে আরও দুই দিন দেরি আছে। কিন্তু তোমার আত্মসম্মানে হাত রাখিয়া ভারতীকে এ আনন্দ দিতে অনুরোধ করি না।

আমার নিজের কিছু চাহিতে নাই। আর দু'দিন বাঁচিতে চাওয়ার যার অধিকার নাই তাহার আবার নূতন করিয়া আনন্দ চাওয়া নিতান্তই হাস্যকর।

চিঠিখানা লিখিয়া কুমারেশ একটু ভাবিলেন, একটু ইতস্তত করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কি ভাবিয়া দ্রুত খামে পুরিয়া শকুন্তলার ঠিকানা লিখিয়া 'রিং' করিলেন। দেবপ্রসাদ আসিলে কুমারেশ চিঠিখানা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—চিঠিখানা এক্ষুণি ডাকবাক্সে ফেলে আয়।

কুমারেশের অস্বাভাবিক উত্তেজিত মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেবপ্রসাদ চিঠি লইয়া চলিয়া গেল। কুমারেশ নিঃশব্দে চেয়ারে আসিয়া বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

সেদিন রাত্রে কুমারেশের ভাল ঘুম হইল না। যেটুকু ঘুমাইলেন তাহার মধ্যেও তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেনঃ—

তাঁহার যেন তন্দ্রা আসিতেছিল, হঠাৎ উচ্চ বজ্রনিনাদে তাঁহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। দূরে এক সঙ্গে যেন শত শত বজ্রনাদ হইতেছে; সেই সঙ্গে সেই শব্দ ছাপাইয়া যেন বাঁশী বাজিতে শুরু করিল। জগতের সমস্ত দৃশ্য লুপ্ত হইয়া যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কণায় পর্যবসিত হইল, যেন জ্যোতির কুয়াসা। একটি ক্ষীণ জ্যোতি ডিম্বাকারে বাড়িতে বাড়িতে আট-দশ ফুট হইল। তাহার মধ্যে শকুন্তলা। এক অদ্ভুত হাসি হাসিয়া যেন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। কুমারেশ ছুটিয়া ধরিতে গেলেন, অমনি শকুন্তলা ধীরে ধীরে কুয়াশায় মিলাইয়া গেল। চারিদিকের বজ্রনাদ যেন বিকট অট্টহাস্যে পরিণত হইল। কুমারেশের বুক ব্যথা করিতেছে, তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন। সহসা এক জ্যোতিষ্কণায় শকুন্তলার মুখ জাগিয়া উঠিল। কি সুন্দর কি অপরূপ ম্লান মুখ! কি আকর্ষণময় তার দৃষ্টি! কুমারেশ দুই হাত বাড়াইয়া সেই দিকে ধাবিত হইলেন।

উত্তেজনায় কুমারেশের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে।

ভারতী ছেলেমানুষ হইলেও সকালে কুমারেশের চোখ-মুখ দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভারতীর উদ্বেগ দেখিয়া দেবপ্রসাদ ডাক্তার ডাকিতে গেল। ভারতী কুমারেশের পাশে বসিয়া কেবলই কুন্তলা দিদির উপর রাগ করিতে লাগিল।

যথাসময়ে ডাক্তার আসিলেন। যথারীতি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—বিশেষ কিছু নয় শারীরিক অবসাদ। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি তাই। সকাল সকাল স্নানাহার করে বিশ্রাম করুন ঠিক হয়ে যাবে।

বিজ্ঞ ডাক্তারের মুখের দিকে কুমারেশ একবার তাকাইয়া দেখিলেন।

ভারতীর তাগিদে কুমারেশ সেদিন সাড়ে নয়টার স্নান করিতে যাইবেন, এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। ভারতী ছুটিয়া গেল।

—হ্যালো, কে, কুন্তলা দি? তবু ভাল—স্নান করতে যাচ্ছেন—না, শরীর তত ভাল নয়, দু দিন খুব খারাপ, ডাক্তারবাবু এইমাত্র গেলেন। —হাঁ ওষুধ দিয়ে গেছেন—কি আর বলবেন, বললেন সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম করতে। —কি বলব তাঁকে? —আপনি আসবেন? কখন?—কি? চার না পাঁচ?—পাঁচটায়?—ও। —আচ্ছা। —না আপনি এলেই এক সঙ্গে চা খাব।

কুমারেশ কান পাতিয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন, ভারতী কাছে আসিলে নিজে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। ভারতীই বলিল—দিদি আসছেন পাঁচটায়, এইখানে এসে চা খাবেন।

কুমারেশ ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বেশ! সমস্ত শরীর তাঁহার শীতান্তের শুকনা পাতার মত কাঁপিতে লাগিল।

কুমারেশ খাইতে বসিয়া সেদিন দুই এক গ্রাসের বেশী খাইতে পারিলেন না, ভারতীর জবরদস্তিতে শেষে শুধু আধ বাটি দুধে চুমুক দিলেন।

দুপুরে বিশ্রাম করিতে কুমারেশ বিছানায় শুইয়া চোখ বুজিলেন। ভারতী তাহার মাথায় হাতে পায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কুমারেশ ঘুমাইয়াছেন মনে করিয়া ভারতী ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া

চলিয়া গেল। দাদু অসুস্থ, সেদিনের বৈকালিক চা-এর তদবির তাহাকেই করিতে হইবে। কুন্তলাদি আসিবেন।

ভারতী চলিয়া গেলে কুমারেশ চোখ মেলিয়া দেখিলেন, একটা বাজিতে পনের—এখনও চার ঘণ্টা পনের মিনিট দেরি। কুমারেশ আবার চোখ বুজিয়া পাশ ফিরিলেন।

ভারতী মাঝে মাঝে পা টিপিয়া দেখিয়া যাইতেছিল—দাদু আজ অনেক ঘুমাইতেছেন। তাহার মনটা হালকা হইয়া আসিল। সে নিজে হাতে দক্ষিণের বারান্দায় চা-এর টেবিল সাজাইল, বসন্তের শেষে আজ যেন সত্যই গ্রীষ্মের হাওয়ার আভাস মিলিতেছে। এই বারান্দায় বসিয়া তাহারা আজ অনেক রাত পর্যন্ত কুন্তলাদির সঙ্গে গল্প করিবে। বেলা পড়িয়া আসিতেছে, ভারতী কাঁচি লইয়া নিজে হাতে ফুল আনিতে বাগানে গেল।

কুমারেশ যখন বিছানা হইতে উঠিলেন তখন চারটা বাজিতে কয়েক মিনিট মাত্র দেরি। দক্ষিণের বারান্দায় ভারতীর কৃত চা-এর আয়োজন দেখিয়া খুশী হইলেন। শকুন্তলাকে প্রথম অভ্যর্থনার দিনও ভারতীর ঠিক এমনি উৎসাহ দেখা গিয়াছিল।

দুই দিন ক্ষৌরকার্য হয় নাই, কুমারেশ স্নানের ঘরে গেলেন। শেভ করিবার সময় আয়নায় দেখিলেন, কুমারেশের শীর্ণ মুখ আরও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখে যেন রক্তের লেশমাত্র নাই, চোখ দুটি নিষ্প্রভ। মাথা ঘুরিয়া উঠিল, কুমারেশ অডিকোলনের শিশিটা লইতে হাত বাড়াইলেন। হাত উঠিতে চায় না, পা দুইটি ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পাশেই একখানা টুল ছিল, কুমারেশ তাহাতে গিয়া বসিলেন। একটু সুস্থ হইলে হাতে মুখে সাবান দিলেন। মাথায় আর একটু অডিকোলন দিয়া তোয়ালে দিয়া হাত মুখ মুছিলেন। আর একটুখানি সামর্থ্য, তাহা হইলেই শকুন্তলা আসিয়া যাইবে। নবজীবন লাভ হইবে তাঁহার, আর একটুখানি সাহস।

স্নানের ঘর হইতে আসিয়া কুমারেশের একটু শীত বোধ হইতে লাগিল, জামা কাপড় ছাড়িয়া একটা রামপুরী চাদরে তিনি গা ঢাকিলেন।

লাইব্রেরী ঘরে আসিয়া চাদরে পা ঢাকিয়া যখন তিনি সোফায় গা এলাইয়া দিলেন তখন পাঁচটা বাজিতে পনের মিনিট মাত্র দেরি। ভারতী শকুন্তলার প্রত্যুদ্‌গমনের জন্য নীচে নামিয়া গিয়াছে। কুমারেশের নিকট হইতে হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়ে বসিয়া কাকাতুয়া তাহার বৈকালিক পেস্তা খাইয়া ঝিমাইতেছে। আর পনের মিনিট পর শকুন্তলা আসিবে; কুমারেশ ঘড়ির দিকে তাকাইলেন—এই তো কয়েক সেকেন্ড কাটিয়া গেল, আর ১৪ মিঃ কয়েক সেকেন্ড। তার পর শকুন্তলা আসিবে, কুমারেশ তাহাকে দেখিতে পাইবেন, কুমারেশের সকল জ্বালা অন্তত আজিকার মত জুড়াইয়া যাইবে। সে শান্তির কথা মনে করিয়া কুমারেশের চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। স্নানান্তের কম্পমান পা দুটি হাত দুটি রামপুরী চাদরের নীচে ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া গেল। মাথাটা তাঁহার সোফার পিছনে ঈষৎ হেলিয়া পড়িল। কুমারেশের দিকে চাহিয়া দাঁড় হইতে কাকাতুয়াটা হঠাৎ এক বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই ভীষণ অস্বাভাবিক শব্দে ভারতী ও দেবপ্রসাদ ত্রস্তে নীচে হইতে ছুটিয়া আসিল।

শকুন্তলা আরও দশ মিনিট পরে আসিবে।

(শেষ)

রাতের কবিতা

শ্রীমহেন্দ্র নাথ

রজনী গভীর হ'ল ধূলিক্লিন্ন ধোঁয়াটে আকাশ,
হেথা হোথা দেখা যায় মিট্‌মিটে দু-চারিটি তারা;
ধূঁয়া কুয়াশায় মাঠে জ'মে ওঠে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
দুঃস্বপ্নে ঘুমায় বুঝি ভুঁইফোড় গলির কিনারা।

দুঃস্বপ্নে ঘুমায় আর মসীজীবী কেরানীর দল,
হয়তো চমকি ওঠে অনাগত জীবনের ডাকে;
বন্ধ্যা পৃথিবী মাঝে একমাত্র চাকরি সম্বল,
শিয়রে মৃত্যুর দূত সুপ্ত চোখে বিভীষিকা আঁকে।

ফুটপাথে ভিখারীরা অর্ধনগ্ন অস্থিচর্মসার
এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার চরম বিকাশ;
ব্রিটিশ শাসনে মোরা খাসা নেই কে বলিবে আর,
অর্থগৃধ্নু বণিকের ওঠে তবু ঘন নাভিশ্বাস।

যান্ত্রিক সভ্যতা যুগে ঘুম নেই রোটারি যন্ত্রের,
বিশ্বের খবর দিবে প্রাত্যহিক চা'র মজলিসে;
হয়তো সন্ধান দিবে দূরাগত আগামী কালের
না হয় দেখাবে পথ স্বাধীনতা লাভ হবে কিসে।

চিৎপুরে দেখা যায় ক্যাডিলক বুইকের ভিড়
জড়িত কণ্ঠের সুর ভেসে আসে দ্রাক্ষাকুঞ্জ হ'তে;
বিডন স্কোয়ার পাশে জরাজীর্ণ এক মুসাফির
শুধু জল পিয়ে পিয়ে বেঁচে যেন আছে কোনো মতে।

যুদ্ধের বাজারে আজ জমিয়াছে বড় কোলাহল
লাভের সুযোগ হেন বণিকেরা আর পাবে কবে;
শ্রমজীবী যাক ম'রে, বেঁচে থাক্ বুর্জোয়ার দল
দেহপসারিনী ওরা ওদেরো যে বাঁচিতেই হবে!

হে উদ্‌ভ্রান্ত নাগরিক, ঊর্ধ্বদিকে চাহ একবার
রুদ্রের বজ্রাগ্নি শিখা অহর্নিশি জ্বলিছে ভীষণ;
বাতাসের গতিবেগে কান পেতে শোনো আরবার
বিপ্লবের জয়গান—যুগান্তের প্রলয় স্পন্দন।

সর্বহারা শ্রমজীবী, দূর করো তন্দ্রার জড়িমা,
তুমি যে রচিবে বন্ধু পৃথিবীর নব ইতিহাস;
সৃষ্টির প্রাচুর্য মাঝে জীবনের সীমাহীন সীমা
আজিকার রাত্রি শেষে লভিবে যে বিশাল বিকাশ।

অন্ধকূপ হত্যার অলীক কাহিনী

রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল

বাঙলার শেষ স্বাধীন নৃপতি নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে লোকলোচনের সম্মুখে বিকৃতভাবে চিত্রিত করিবার কত চেষ্টাই না হইয়াছে। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কত যে মিথ্যা কাহিনী রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার অত্যাচারের কাহিনী দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়াছে, কত না নাটকীয় ছন্দে তাঁহার স্বভাব চরিত্রের উপর কুৎসিত ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাহারা এই সব কাহিনী বিশ্বাস করিয়াছে তাহারা শিহরিয়া বলিয়া উঠিয়াছে, "সিরাজ এত পামর!" আর যাহারা বিশ্বাস করে নাই, তাহরা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "এত মিথ্যা কেন উদ্ভাসিত হইল?"

সিরাজ দেবতা ছিলেন না, তিনি পামরও ছিলেন না। আর দশজন স্বেচ্ছাচারী রাজার মত তাঁহার দোষ গুণ উভয়ই ছিল। সিরাজকে একরূপে বিনাযুদ্ধে পরাজিত করিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ ভারতে আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম করিয়া লয়। তাই একটা inferiority complexএর তাড়নায় তাঁহারা সিরাজকে হেয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যেন ক্লাইবের কোন কাজকেই সমর্থনের অযোগ্য বলিয়া কেহ মনে না করিতে পারে। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও সিরাজকে বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত করিতে পারেন নাই; অথবা তাঁহার চরিত্রের মহৎ দিকটা গোপন রাখিতে পারেন নাই। আজ সিরাজ দেশবাসীর নিকট আদৃত, স্বাধীন বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব বলিয়া সর্বত্র সম্মানিত। যে যুগে দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সামান্য সুবিধার লোভে দেশদ্রোহিতা করিতে কাতর হয় নাই, সেই যুগে সিরাজ বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী ও স্বার্থপর চাটুকারদের দ্বারা পরিবৃত থাকিয়াও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, বিদেশী লেখকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে তাহার অধিকাংশই মিথ্যা ও বিদ্বেষপরায়ণ লেখকদের কপোলকল্পিত কাহিনীমাত্র। যে অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে আজ প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহা সর্বৈব মিথ্যা। এতদিন আমাদের তরুণমতি যুবকগণ এই মিথ্যা কাহিনীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। আজ তাহারা শিখিয়াছে যে, অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী সর্বৈব মিথ্যা। কি কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ করিব।

মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিল। ধ্বংসমুখী মোগল সাম্রাজ্যের শক্তি ও ক্ষমতা নানা ঘটনা স্রোতের প্রভাবে বিচূর্ণ হইয়া গেল। কেন্দ্রীয় শাসকগণের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া প্রাদেশিক

হলওয়েল মনুমেণ্ট

শাসনকর্তাগণ—যাহারা এতদিন মোগলের নামে শাসন করিতেন—তাঁহারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন এবং উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। দক্ষিণে আসফজা হায়দরাবাদে স্বাধীন রাজ্য গঠন করিলেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা সাআদাৎ খাঁও স্বাধীন হইয়া পড়িলেন। বাঙলার শাসনকর্তা নবাব আলিবর্দি খাঁ এ সুযোগ ছাড়িলেন না। তিনি বাঙলায় স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিলেন। তবে কতকগুলি বিষয়ে দিল্লির সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা নবাব পদে বৃত হইলেন। সিরাজ

তেজস্বী, স্বাধীনচেতা ও স্বদেশভক্ত যুবক ছিলেন। বয়স তাঁহার মাত্র ২৩ কি ২৪। সেই সময় ইংরেজ বণিকগণ বাঙলার বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য করিত এবং বড় বড় কুঠি নির্মাণ করিয়া স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিত। নূতন নবাবের অল্প বয়স দেখিয়া ইংরেজ মনে করিল এ তো বালক, ইহাকে বশ করিতে কতক্ষণ! প্রথম প্রথম ইংরেজ বণিকগণ নবাবকে ফাঁকি দিয়া বেশ স্বচ্ছন্দভাবে ব্যবসায় চালাইতে লাগিল।

ইংরেজ ব্যতীত আরও অনেক বণিকদল ছিল, কিন্তু ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছিল। সিরাজের সিংহাসনারোহণের পর ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারিগণ বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধাগুলির অপব্যবহার করিতে লাগিল। ইহাতে নবাব ইংরেজগণের উপর ভয়ানক চটিয়া গেলেন। ইংরেজগণ ইহাতে একটুও অনুতপ্ত না হইয়া আরও নানাবিধ দুর্ব্যবহার দ্বারা নবাবকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। এই সময় কৃষ্ণদাস নামক জনৈক ব্যক্তির উপর নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কৃষ্ণদাস নবাবের আক্রোশ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইংরেজদের নিকট আশ্রয় লয়। নবাব জানিতে পারিয়া ইংরেজদিগকে তাহাকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করেন। কিন্তু ইংরেজগণ নবাবের নিষেধে কর্ণপাত করিল না। ইংরেজদের সহিত নবাবের মনোবিবাদ দানা বাঁধিতে লাগিল। ইহার কিছু দিন পরে ফরাসীদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা দিল। এই সুযোগে ইংরেজগণ নূতন নূতন দুর্গ নির্মাণ করিতে লাগিল এবং পুরাতন দুর্গের সংস্কার করিতে মনোনিবেশ করিল। কিন্তু পূর্ব যুক্তি অনুসারে এইরূপ বিধি বন্ধ ছিল যে, নূতন দুর্গ নির্মাণ অথবা পুরাতন দুর্গ সংস্কার করিতে হইলে নবাবের অনুমতি লইতে হইবে। কারণ দুর্গ নির্মাণের অধিকার সার্বভৌম অধিকার। কোনও অধীন ব্যক্তিকে কোনও স্বাধীন নৃপতি এই অধিকার দিতে পারে না। এই সংবাদ প্রাপ্তমাত্র নবাব ইংরেজদিগকে দুর্গ নির্মাণ করিতে নিষেধ করিলেন কিন্তু ইংরেজগণ তাহা শুনিল না। সুতরাং নবাব ইংরেজদের এই হঠকারিতা নিবারণ করিবার জন্য সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ হইতে অগ্রসর হইয়া অনায়াসে ইংরেজদের কাশিমবাজারের কুঠি দখল করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কলিকাতা জয় করিতে তাঁহাকে বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। ১৭৫৬ সালের ২০শে জুন রবিবার কলিকাতার দুর্গ ফোর্ট উইলিয়ম নবাবের হস্তগত হয়।

এরূপ কথিত আছে যে, নবাব ইংরেজদের উপর এরূপ রাগিয়াছিলেন যে, তাহাদের পরাজয়ের পর আদেশ দিলেন, যেসব ইংরেজ ধৃত হইয়াছে (সংখ্যায় তাহারা ১৪৬ জন) তাহাদিগকে একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পুরিয়া রাখা হউক। তাহারা নবাবের আদেশে জুন মাসের দারুণ গ্রীষ্মে সেই গৃহে সমস্ত রাত্রি আবদ্ধ হইয়া থাকিল। প্রাতঃকালে যখন সেই ঘরের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল তখন দেখা গেল যে, ১৪৬জনের মাত্র ২৩জন প্রাণে রক্ষা

জে জেড্ হলওয়েল

পাইয়াছে। এই ২৩ জনের মধ্যে হলওয়েল সাহেবও একজন। এই ঘটনা ইতিহাসে অন্ধকূপ হত্যা বলিয়া বর্ণিত আছে। এক্ষণে কথা হইতেছে, এই ঘটনার মূলে কোনও ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না। নবাব কি এতই পাষণ্ড ছিলেন যে, তিনি মানুষের প্রাণের কোনওরূপ মূল্য স্বীকার না করিয়া এইরূপ কঠোর আদেশ দিয়াছিলেন যাহার ফলে শতাধিক লোক নির্মমভাবে নিহত হইয়াছিল? এ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। একদল লোক এই ঘটনাকে একেবারেই অস্বীকার করেন কিন্তু অন্যদল এই ঘটনার প্রতিটি বর্ণ বিশ্বাস করিয়া নবাবের অত্যাচারের প্রকৃতিটা বিশ্বের দরবারে প্রকাশ করিতে চান। আবার তৃতীয় দল বলেন যে, ঘটনাটি সত্য, কিন্তু ইহাতে নবাবের কোনও দোষ নাই। নবাব এরূপ কোনও আদেশ দেন নাই। ইহা তাঁহার কতকগুলি দায়িত্বহীন কর্মচারীর দ্বারা হইয়াছিল। নবাব এ বিষয়ে কোনও অনুমতি দেন নাই অথবা তিনি ইহার কোনও সংবাদও রাখিতেন

না। আজ আমরা একবার বিচার করিয়া দেখিব অন্ধকূপ হত্যার মূলে কোনও সত্যতা আছে কি না।

অন্ধকূপ হত্যার বিষয়টি ভালরূপে বিচার করিতে গেলে দেখা যাইবে সমগ্র ঘটনাটি মাত্র একজনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহার 'সাক্ষ্য সত্য হইলে সমস্তই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কিন্তু তাহা মিথ্যা ও অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে সমস্ত ঘটনাটি ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীর জন্য হলওয়েলের সাক্ষ্যই প্রধান সাক্ষ্য। এই হলওয়েলের সাক্ষ্যকে একবার মাত্র সন্দেহ কর, দেখিবে অন্ধকূপের সমস্ত কাহিনী অলীক বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু হলওয়েলের সাক্ষ্যের সত্যতার উপর কেন সন্দেহের রেখাপাত করিতে যাইব? সাক্ষীদের সংখ্যার উপর সাক্ষ্যের মর্যাদা নির্ভর করে না। যদি একটি সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় তবে তাহাকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু হলওয়েলের সাক্ষ্যকে সন্দেহ করিবার কতকগুলি যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে। এইরূপ একটি যেসব কাগজপত্র ও সরকারী চিঠিপত্র পাঠানো হইয়াছিল। (২) যাহারা সেই সময় কলিকাতায় ছিলেন অথবা সিরাজের কলিকাতা আক্রমণের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন তাঁহারা যেসব বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। (৩) ফরাসী ও ওলন্দাজগণ যেসব বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন। এই ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে সরকারী বিবরণগুলির মূল্যই অধিক। কারণ এগুলি বহু অনুসন্ধান করিয়া ও বহু দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লিখিত। ব্যক্তিগতভাবে যেসব বিবরণ লেখা হয় তাহাদের মূল্য অনেকসময় সংস্কার ও ব্যক্তিগত মত দ্বারা হ্রাস পাইয়া থাকে। সে যুগের এই শ্রেণীর বিবরণগুলি পরস্পরবিরোধী মত দ্বারা পরিপূর্ণ। সুতরাং এগুলি সর্বত্র প্রমাণযোগ্য নহে। আর ফরাসী ও ওলন্দাজগণের বিবরণও অনেকটা শূন্য কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া লিখিত। কারণ তাঁহারা তখন ঘটনাস্থল হইতে বহুদূরে ছিলেন। কোনও ঘটনাই চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ তাঁহাদের হয় নাই। সুতরাং সর্বাপেক্ষা

হলওয়েল মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহীগণ

ঘটনা যদি সত্যই সংঘটিত হইত তাহা হইলে সমসাময়িক যুগের অন্যান্য লোকের তাহা না জানিবার কোনও কারণই থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখি যে, সমসাময়িক বহু ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না। সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে কিছুই লেখেন নাই। "সিরূল মুতাক্ষারিন"এর লেখক গোলাম হোসেন ইংরেজদের এক তাঁবেদার লেখক ছিলেন। তিনি বহুস্থানে সিরাজের বহু কার্যের নিন্দা করিয়াছেন। অথচ তিনি অন্ধকূপ হত্যা সম্বন্ধে একদম নীরব। অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন যে, গোলাম হোসেন মুসলমান ছিলেন, কাজেই পাছে সিরাজের উপর কলঙ্কের রেখাপাত হয় সেইজন্য তিনি এই ঘটনাটি বাদ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোথাও সিরাজের কলঙ্ক-কথা গোপন করিতে প্রয়াস পান নাই।

এখানেও গোপন করিবার কোনও কারণই থাকিতে পারে না। আচ্ছা না হয় গোলাম হোসেনের কথা বাদই দিলাম। কিন্তু সে যুগের ইংরেজ ও ফরাসী লেখকগণ যেসব বিবরণী কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে সত্য তথ্য নির্ণয় করা অসম্ভব হইবে। এই সব কাগজপত্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।—(১) ফলতার ইংরেজ কাউন্সিলের পক্ষ হইতে

মূল্যবান দলিল হইতেছে ইংরেজ কর্মচারীদের সরকারী বিবরণ। এইগুলির মূল্যই সর্বাধিক। এই সব সরকারী দলিলপত্রকে সামনে রাখিয়া আমরা অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীকে বিচার করিয়া দেখিব। ১৮ ফিট লম্বা ও ১৪ ফিট চওড়া ক্ষুদ্র একটি গৃহে কেমন করিয়া ১৪৬ জন মানুষকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, ইহা গণিত শাস্ত্রের কোনও হিসাবে সম্ভব হইতে পারে কি না সে বিচার আজ করিব না। কেবল সমসাময়িক কাগজপত্রের উপর নির্ভর করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, অন্ধকূপ হত্যার ঘটনা একেবারে মিথ্যা।

সিরাজ কেন কাশিমবাজার দখল করিয়া কলিকাতা অবরোধ করিতে অগ্রসর হন তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ১৭৫৬ সালে কলিকাতা অধিকারের পর নবাবের হস্তে বহু ইংরেজ বন্দী হয় এবং তাহাদের মধ্যে হলওয়েল সাহেব যে একজন ছিলেন তাহা কেহই অস্বীকার করে না। নবাবের কলিকাতা অধিকারের পর নবাব ও ফলতার ইংরেজ কাউন্সিলের মধ্যে পত্রালাপ হয়। এই সময় সদ্য অন্ধকূপ হত্যার মত লোমহর্ষণ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইংরেজদের মেজাজ খুব উগ্র থাকিবার কথা। কিন্তু নবাবকে লিখিত ইংরেজদের পত্রে এরূপ উগ্র মেজাজের আভাস পর্যন্ত নাই। এইসব পত্র, অন্যান্য প্রস্তাব ও রিপোর্ট সেই

সময়কার অবস্থা অবগত হইবার পক্ষে বিশেষ দরকারী জিনিস। কিন্তু এই পত্রে বা কোনও কাগজে অথবা রিপোর্টে ও প্রস্তাবে অন্ধকূপ হত্যার ঘটনা সম্বন্ধে আভাসে ইঙ্গিতেও কোনও উল্লেখ নাই। ফরাসীগণ নবাবের কলিকাতা অবরোধের সংবাদ ২১শে জুন প্রাপ্ত হয়। চন্দননগরের ফরাসী কাউন্সিলের পক্ষ হইতে এই মর্মে একটি পত্র লেখা হয়,—"আমরা শুনিলাম যে নবাব গতকল্য ৫টার সময় কলিকাতা কুঠি অধিকার করিয়াছেন। যেসব ইংরাজ পলায়ন করিতে পারে নাই এবং যাহারা কোনও বাধা দেয় নাই, নবাবের লোক তাহাদিগকে লুঠ করিয়া লইয়াছে কিন্তু কাহাকেও প্রাণে মারে নাই।" (Hill. Vol. I. Page 23)। ৫ই জুলাই তারিখে হুগলির ওলন্দাজ কাউন্সিল বাটাভিয়ার সুপ্রিম কাউন্সিলকে এইভাবে পত্র দেন।—সকলেই বিশ্বাস করিত ভার কাহার উপর ন্যস্ত হইতে পারে এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। কাউন্সিল চারিজন লোকের নাম প্রস্তাব করে, যথা, মানিকচাঁদ, রায়দুর্লভ, গোলাম হোসেন খাঁ এবং খোজা ওআজিদ। কাউন্সিল তাহাদের নিম্নতম কর্মচারীদের নিকট এই আদেশ জারি করে যে, তাহারা যেন কিছুতেই নবাবের জাহাজের কর্মচারীদের সহিত কলহ না করে। কাউন্সিল নবাবের অন্যান্য কর্মচারীদের অনুরোধ করিল, তাঁহারা যেন কোম্পানির উপর সদয় ব্যবহার করিবার জন্য নবাবকে প্রভাবান্বিত করেন এবং এরূপ চেষ্টা করেন যেন ইংরেজগণ তাহাদের কুঠি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে, কল্পিত অন্ধকূপ হত্যার লোমহর্ষণ স্মৃতি কোম্পানির কর্মচারীর প্রত্যেককে এই সময় বিদগ্ধ করিতেছিল। অথচ তাহারা বিভিন্ন পত্রে ও প্রস্তাবে এ
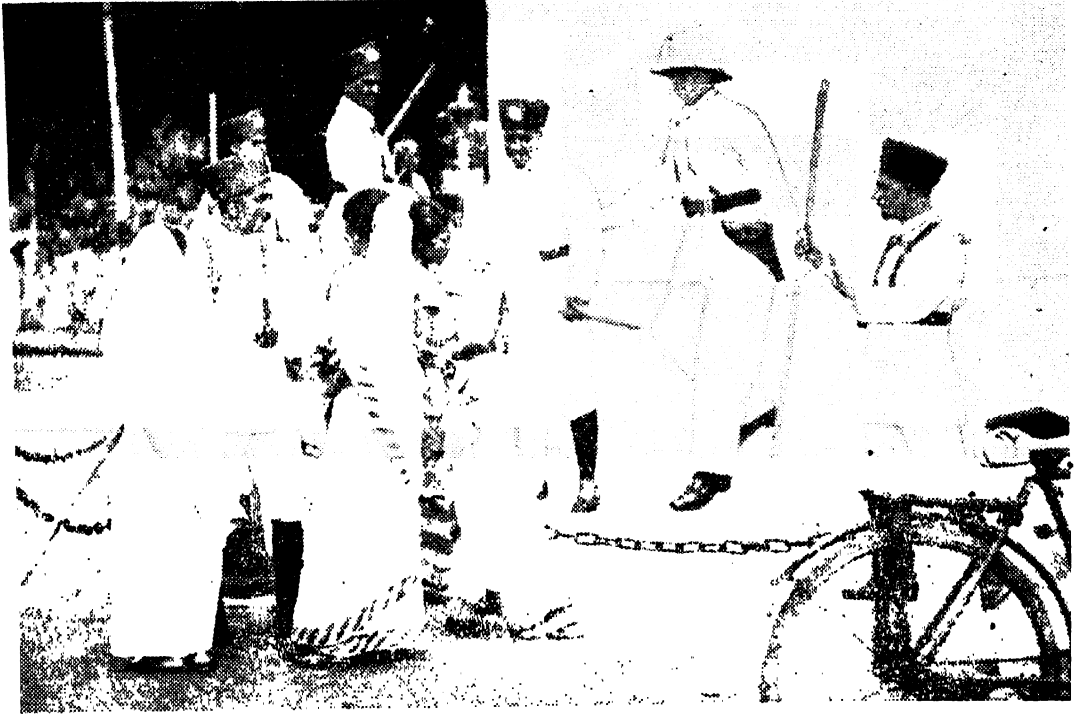
পুলিশ কর্তৃক মহিলা সত্যাগ্রহীগণকে আটক

যে, নবাব কলিকাতা নগরকে চূর্ণ করিয়া দিবেন। ইংরেজগণ নবাবের বিরুদ্ধে তিন দিন যুদ্ধ করে, তাহাদের একদল নদীপথে পলায়ন করে এবং যাহারা যুদ্ধে মারা যায় নাই তাহারা নবাবের নিকট বন্দী হয়। কলিকাতার দুর্গ ধ্বংস হইয়াছে, দোকান পাট লুঠপাট করা হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই আক্রমণের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত আছে কিন্তু কোন্ বন্দীকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে এরূপ কথা এই রিপোর্টের কোথাও নাই। (Hill. Vol. I. P. 54)।

নবাবের কলিকাতা আক্রমণের কারণে ইংরেজদের মধ্যে যে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কেহই অস্বীকার করে না। এই সময় ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করিবার জন্য ৬ই জুলাই ফলতার কাউন্সিল পরামর্শ করিবার জন্য ওআটস ও কলেটকে পত্র দিলেন। কি ভাবে নবাবের নিকট আবেদন করিয়া কলিকাতা পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া যাইতে পারে তাহা তাহাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিল। নবাবের নিকট ডেপুটেশন পাঠাইবার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আভাস ইঙ্গিত করে নাই। অথবা নবাবের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করে নাই। বরং নবাবের আদেশ অমান্য করিয়া নিজেরাই যে অপরাধ করিয়াছে তাহাদের এই সময়কার প্রত্যেক আচরণ হইতে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। সর্বোপরি তাহারা নবাবের অনুগ্রহ লাভের জন্য সর্বদাই আগ্রহ দেখাইয়াছে। ওআটস্ ও কলেট বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজগণ নবাবের আদেশ মানে নাই বলিয়াই তাহাদের উপর নবাব আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। সুতরাং কলিকাতা আক্রমণের পূর্বে ইংরেজের সহিত নবাবের একটা মিটমাট হইয়া গেলে নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিতেন না, অথবা ইংরেজগণ কলিকাতা হইতে বিতাড়িত হইত না। তাহারা নিজেদের বিপদ নিজেরাই টানিয়া আনিয়াছিল।

ওআটস্ ও কলেট ৮ই জুলাই ফলতার কাউন্সিলকে লিখিলেন, "নবাব যদি ইংরেজদিগকে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দেন এবং সেখানে পুনরায় বসতি স্থাপন করিতে দেন, তাহা হইলেও আমাদের ভয় হয় যে, ইতিপূর্বে আমরা বাণিজ্যের যে

সব বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা বোধ হয় আর পাইব না এবং যদিই বা তাহা পাই তবে তাহা এরূপ হীনতা-জনক শর্তে স্বীকার করিয়া পাইতে হইবে, যে হয়তো আমরা তাহাতে সম্মত হইব না।" এই পত্রের কোথাও অন্ধকূপ হত্যার আভাসমাত্র নাই। এই পত্র এরূপভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহাতে মনে হইবে, অন্ধকূপ সম্বন্ধে কোনও ঘটনার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। বরং ইংরাজেরাই যে দোষী তাহা স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। নবাব যদি দয়া করেন তবেই ভাল—সমস্ত পত্রের ইহাই হইতেছে সারমর্ম। অতঃপর ফলতার কাউন্সিল ১৩ই জুলাই মাদ্রাজে একটা পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে নবাবের কলিকাতা অধিকারের বিবরণ সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। এই পত্রে অনুরোধ করা হয় যেন অ্যাডমিরাল ওআটসনকে তাঁহার জাহাজ সহ ইংরেজদের উদ্ধার করিবার জন্য অবিলম্বে প্রেরিত হয়। এই পত্রে ইংরেজদের শোচনীয় দুঃখের কথা ও অসহায় অবস্থার কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অন্ধকূপ হত্যার আভাসমাত্র নাই। পরবর্তী যুগের রচা কাহিনীর উল্লেখ পূর্ববর্তী যুগের দালিলপত্রে কেমন করিয়া থাকিবে? অথচ আমাদিগকে এই অলীক কাহিনী গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছে।

নবাবের কলিকাতা আক্রমণের পর যে সব দুর্ঘটনা হইয়াছিল তাহা কোর্ট অব ডিরেক্টারকে অবগত করাইবার জন্য ১৭ই সেপ্টেম্বর বিলাতে একটি পত্র প্রেরিত হয়। অন্যান্য সদস্যদের সহিত হলওয়েল সাহেবও এই পত্র স্বাক্ষরিত করেন। ঠিক কি কি বিষয়ে পত্র লেখা হইবে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য কাউন্সিলের দায়িত্বপূর্ণ লোকের উপর ভার দেওয়া হয়। নবাবকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার কোনও সুযোগ তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই। সামান্য ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিতেও তাঁহারা ইতস্তত করেন নাই। কিন্তু যে ঘটনার অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না তাহা উদ্ভাবন করিবার মত উপস্থিত বুদ্ধি তখন কাহারও হয় নাই। তাই এই পত্রে অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী স্থান পায় নাই। ইহাতে কলিকাতা অবরোধের কথা আছে, নবাব যে কিভাবে ইংরেজদের কুঠি লুণ্ঠন করে তাহার বিবরণ আছে। কিভাবে দুর্গ আত্ম-সমর্পণ করে এবং অধিকারের পর নবাবের লোক কি আচরণ করিয়াছে তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু নাই শুধু অন্ধকূপ হত্যার কথা, যে ঘটনা সব ঘটনার শ্রেষ্ঠ ঘটনা। অথচ এই পত্র হলওয়েলের ফলতা আগমনের পরে লিখিত হয়। সভ্যগণ সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিয়াছেন, সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়াছেন, তার পর কোর্ট অব ডিরেক্টারকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন। যদি অন্ধকূপ হত্যার কথা তাঁহাদের জানা থাকিত তাহা হইলে এমন সংবাদ উপরের বড় কর্তাদের নিকট গোপন রাখিবার কোনও কারণই থাকিতে পারে না। বরং সবিস্তারে লিখিবার আবশ্যকতাই অধিক ছিল।

কলিকাতার পতনের অব্যবহিত পরেই নবাব মাদ্রাজ কাউন্সিলের পিগটকে একটি পত্র লিখলেন। এই পত্রে তিনি কলিকাতা পতনের জন্য ড্রেককে দায়ী করেন। এবং নবাব দৃঢ়তা সহকারে বলেন যে, কোম্পানির ব্যবসায় বাণিজ্যে হস্ত-ক্ষেপ করিবার তাঁহার কোনও অভিপ্রায় নাই। তিনি ইংরেজদের সহিত শান্তি চাহেন, যুদ্ধ চাহেন না। কিন্তু নবাবের এই আপস মনোবৃত্তিকে তাঁহার দুর্বলতা মনে করিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে গোপনে সমরায়োজন করিতে লাগিল। যুদ্ধ চালাইবার জন্য তাহারা ক্লাইভকে স্থলভাগের ও ওআটসনকে জলভাগের নেতৃত্ব প্রদান করিয়া বাঙলায় প্রেরণ করিল। সুতরাং ইংরেজদের যুদ্ধায়োজন আরম্ভ হইল। কিন্তু এই সময় যুদ্ধ পরিহার করিবার জন্য মাদ্রাজের সিলেক্ট কমিটি কলিকাতার সিলেক্ট কমিটির নিকট একটা পত্র দিল। এই পত্রে এই মর্মে অনুরোধ করা হইয়াছিল যে কোম্পানির কর্মচারিগণ যেন সর্ব-প্রকারে নবাবের সহিত ঝগড়া পরিহার করে। যুক্তিস্বরূপে এই বলা হইয়াছিল যে, বর্তমানে যুদ্ধ করা খুব লাভজনক নয়, ইহাতে ইংরেজদেরই বেশী ক্ষতি হইতে পারে। সুতরাং পারত-পক্ষে যুদ্ধ পরিত্যাগ করাই উচিত। কিন্তু এই পত্রে অন্ধকূপের কোনও সংকেত নাই। কোম্পানির অসুবিধা, লোকক্ষয়, ব্যবসায়ের অনিষ্ট এই সব কারণই উল্লিখিত হইয়াছে। অন্ধকূপের ঘটনা বিশ্বাস করিলে তাঁহারা কখনই এইভাবে পত্র দিতেন না। অন্ততঃপক্ষে এই সময়ের মধ্যে মাদ্রাজে যে এই অলীক কাহিনীর বিবরণ পোঁছায় নাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

ওআটসন ও ক্লাইভ বাঙলায় আসেন নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য। কিন্তু তাঁহারা কলিকাতা আসিয়াই নবাবের সহিত শান্তির কথাবার্তা আরম্ভ করেন। ১৭ই ডিসেম্বর ওআটসন নবাবকে একটি পত্র দিলেন, তাহাতে তিনি পূর্বের অধিকার ও সুবিধাগুলি প্রার্থনা করিলেন এবং বিগত যুদ্ধে ইংরেজদের যে অনিষ্ট হইয়াছে তাহার ও যে লোকক্ষয় হইয়াছে তাহার ন্যায়সংগত ক্ষতিপূরণ দাবি করিলেন। ক্লাইভও নবাবকে একটি স্বতন্ত্র পত্র দিলেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন যে, কোম্পানির কতকগুলি কর্মচারী নির্দয়ভাবে নিহত হইয়াছে। কিন্তু এই দুই পত্রে অন্ধকূপ হত্যার কোনও উল্লেখ নাই, ইহার কোনও আভাস পর্যন্ত নাই। নবাব তাঁহাদের পত্রের কোনও উত্তর দিলেন না। এই অবসরে ওআটসন ও ক্লাইভ কলিকাতায় নবাবের অধিকৃত অঞ্চল অধিকার করিয়া বসিলেন। নবাবের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করিতে গেলেন তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়া ফোর্ট উইলিয়ামের কাউন্সিল এইভাবে ঘোষণা প্রচার করেন।—"ইতিপূর্বে নবাব কোনও কারণ না দর্শাইয়া কলিকাতা আক্রমণ করেন, আমাদের কুঠি অবরোধ করেন, দুর্গ অধিকার করিয়া লন, কোম্পানির ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করেন এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। আমাদের অনেক কর্মচারীকে বধ করেন এবং অনেক লোককে বিতাড়িত করিয়া দেন।" কি আশ্চর্যের বিষয়, নবাবের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করিবার সময় কাহারও মনে কি অন্ধকূপ হত্যার কথা একবারও উদিত হয় নাই? নবাবের বিরুদ্ধে বিবিধ অভিযোগ আনিবার এই তো সুযোগ। এ সুযোগ কেন হেলায় পরিত্যক্ত হইল? কারণ সে সময় এই ঘটনার কোনও অস্তিত্বই ছিল না।

এই সময় ক্লাইভ জগৎশেঠকে কোম্পানির পক্ষ হইতে নবাবের নিকট সুপারিশ করিতে বলেন। ইহার উত্তরে জগৎশেঠ বলেন যে, কেন ইংরেজগণ বিনা কারণে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন? বর্তমান যুদ্ধ করিবার কোনও কারণই উপস্থিত হয় নাই। ক্লাইভ অনায়াসে অন্ধকূপের কথা উল্লেখ করিতে পারিতেন। কিন্তু তখনও যে সে কাহিনীর সৃষ্টি হয় নাই। অতঃপর নবাব নিজেই ওআটসনকে ২৩শে জানুআরি তারিখে পত্র দিলেন। তিনি বলিলেন, যদি ইংরেজগণ ড্রেকের পরিবর্তে অন্য কাউকে "চীফ" নিযুক্ত করে, তাহা হইলে ইংরেজ-দের সমস্ত অধিকার প্রত্যর্পণ করিয়া দিবেন। ড্রেকের উপর নবাবের বিরক্তির কারণ এই যে, ড্রেক নবাবের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া নবাব ও কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে কতকগুলি চিঠিপত্র লেখালিখি হয়, পরে ৯ই ফেব্রুআরি তারিখে নবাবের সহিত ইংরেজদের একটা সন্ধি হয়। এই সন্ধির চুক্তিগুলি অতি মূল্যবান দলিল। নবাবের কলিকাতা আক্রমণের সময় কোম্পানির যে সব ক্ষতি হয়, নবাব তাহার ক্ষতি-পূরণ করেন। এই ক্ষতির তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় কোম্পানির কর্মচারিগণ অন্ধকূপে নিহত ১২৩ জন ইংরেজদের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। কারণ এই চুক্তিপত্রে অন্ধকূপ হত্যার কোনও উল্লেখ নাই। কোম্পানির যেসব কুঠি নবাবের লোক

অধিকার করে, তাহা ফেরত দেওয়া হয়। কোম্পানির কর্মচারীদেরও তাহাদের অনুগত লোকদের যে সব টাকাকাড়ি ধন সম্পত্তি নবাবের লোক লুণ্ঠন করিয়া লয়, তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে নবাব স্বীকৃত হন, কিন্তু অন্ধকূপে যাহারা আত্মবলিদান করে, তাহাদের ক্ষতিপূরণের দাবি কেন করা হইল না? নবাব শুনুন আর নাই শুনুন, অন্তত দাবি করিতে দোষ ছিল কি? এই ঘটনার অস্তিত্ব থাকিলে ইংরেজগণ ক্ষতিপূরণের দাবি করিতে ছাড়িত না। উপরে যে সন্ধির কথা বলা হইল, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নবাবের সহিত ইংরেজদের স্থায়ী সন্ধিস্থাপন। কিন্তু সন্ধিপত্রের মসী শুষ্ক হইবামাত্র কোম্পানির কর্মচারিগণ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া তাহাদের অভিপ্রেত লোককে নবাব করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। সুতরাং ইংরেজ কর্মচারিগণ নবাবের বিরুদ্ধে নানাবিধ মিথ্যা কাহিনী রচনা করিতে লাগিল। এই সময় অনেকেই অন্ধকূপের কথা ঢাকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া বাড়াইয়া তুলিল। কিন্তু মজার কথা এই যে, তখনও সরকারী কাগজপত্রে এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ স্থান পায় নাই।

ফরাসীদের দলিলপত্র অনুসন্ধান করিলেও তাহার মধ্যে অন্ধকূপ হত্যার সমর্থক কোনও প্রমাণ পাওয়া যাইবে না। নবাবের কলিকাতা অবরোধের কথা চন্দননগরের ফরাসী কুঠিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফরাসীদের দলিল পত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, "নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিলেন। যাহারা পলাইতে পারে নাই, কিন্তু কোনও বাধা দেয় নাই, তাহাদের সম্পত্তিও লুঠিয়া লওয়া হয়। কিন্তু তাহাদিগকে প্রাণে মারা হয় নাই।" ওআট্স্ ও কলেট প্রথমে কলিকাতায় নবাবের সহিত ছিলেন। তাঁহারা যে প্রথম রিপোর্ট দেন, তাহাতে অন্ধকূপের কথার উল্লেখ ছিল না। এই রিপোর্ট ২রা জুলাই ব্রিটিশ কাউন্সিলে প্রেরিত হয়। পরে অপরের নিকট শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অন্ধকূপের কাহিনী প্রচার করেন। First information reportএর যতটা মূল্য আছে, দ্বিতীয় রিপোর্টের মূল্য ততটা নাই। এখানেই বা সেই নিয়ম কেন খাটিবে না? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র হলওয়েল ব্যতীত কেহই অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীটা বিশ্বাস করে নাই। প্রাথমিক রিপোর্টে ইহার উল্লেখই নাই। আর যে যে স্থানে উল্লেখ আছে, তাহা সেই একই উৎস হইতে আগত হইয়াছে।

হলওয়েল সাহেব হুগলি নদীর উপর মুর্শিদাবাদে নীত হইবার পথে এই গল্প প্রচার করেন। আর তিনিই ইহার রচয়িতা। এবং যাহারা পরে এই সংবাদ বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারা সর্বপ্রথম তাঁহারই নিকট শ্রবণ করিয়াছে। পরে ফরাসী এবং ওলন্দাজগণ যে এই কাহিনী বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহাও সেই হলওয়েলের কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া। হুগলি ও চন্দননগরে কলিকাতা হইতে বহু পলাতক ইংরেজ আসিয়া জুটিয়াছিল, তাহারা এই দুর্ঘটনার বিন্দুবিসর্গ জানিত না। পরে হলওয়েলের কাহিনী শ্রবণ করিয়া এই অলীক ঘটনায় বিশ্বাস করে। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন আকারে এই গল্প শ্রবণ করিয়াছিল এবং নিজেদের লোকের মধ্যে প্রচার করিয়াছিল। এইরূপে ইহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু কোথাও ঘটনার মধ্যে সংগতি ও সামঞ্জস্য থাকে নাই। যাহারা এই বিষয়ে গল্প বলিয়াছেন, অথবা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হলওয়েল ব্যতীত কেহই ঘটনাটি চাক্ষুষ দর্শন করেন নাই। যে ২৩ জন লোক বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই কি তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিবার অবসর পান নাই?

সত্যের মূর্তি বিভিন্ন হইতে পারে না। সত্য সকল সময়েই সত্য। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী হলওয়েল সাহেব অন্ধকূপের ব্যাপারটিকে যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কথায় সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। হলওয়েলের বর্ণনা সকল সময় একরূপ নহে। তিনি এক স্থানে যাহা বলিয়াছেন, অন্য স্থানে তাহার বিপরীত কথা বলিয়াছেন। একটার সহিত অন্যটার মিল দৃষ্ট হইবে না। ১৭ই জুলাই তিনি বোম্বাই কাউন্সিলে যে পত্র দেন, তাহাতে আবদ্ধ লোকের সংখ্যা দিয়াছেন ১৬৫ হইতে ১৭০ পর্যন্ত। তিনি লিখিয়াছেন যে, ইহাদিগকে একটা ছোট ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহার মধ্যে মাত্র ১৬ জন প্রাণে বাঁচে এবং অবশিষ্ট লোকগুলি শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা যায়। জীবিতদের মধ্যে তাঁহার নিজ নাম সহ আটজনের নাম উল্লেখ করেন। আর মৃতদের মধ্যে সাতজনের নাম উল্লেখ করেন। অবশিষ্টদের নাম

মনুমেণ্ট অপসারণের পরের দৃশ্য

তিনি করিতে পারেন নাই। ইহার কিছুদিন পরে তিনি ফরাসী কুঠির মিস্টার ল-কে অন্য প্রকার সংখ্যার তালিকা দেন। তখন তিনি বলেন, যে ১৬০ জনকে আবদ্ধ করা হয়, তাহাদের মধ্যে ১১০ জনকে মৃত অবস্থায় বাহির করা হয়। তাহা হইলে রক্ষা পাইতেছে ৫০ জন। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছেন যে, মাত্র ১৬ জন রক্ষা পাইয়াছে। ল সাহেবকে তিনি আরও বলেন, সমস্ত রাত্রি আমাদের লোকজন এই অন্ধ গৃহে আবদ্ধ ছিল, আর নবাবের লোকগণ দ্বারের মধ্য দিয়া আমাদের প্রতি গুলি করিতে ছিল।

ইহার পর হলওয়েল ৩রা অগস্ট তারিখে সেণ্ট জর্জ দুর্গের কাউন্সিলের নিকট তৃতীয় রিপোর্ট দেন। এই রিপোর্টে বলেন যে, অন্ধকূপে যে সব লোককে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহাদের সংখ্যা একটু বেশী করিয়া বলিয়াছি, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত সংখ্যা হইবে ১৪৬ জন, আর মারা যায় ১২৬ জন। হলওয়েলের কথার মধ্যে যে নানা অসংগতি রহিয়া গিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যে কাহিনীতে এত গরমিল, এত পরিবর্তন, এত পরস্পরবিরোধী তথ্য আছে, তাহাকে নিশ্চয় বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। গল্পটিকে রচনা করিয়া তিনি স্বদেশের পথে জাহাজের উপর তাঁহার বিখ্যাত বই লিখিয়া ফেলেন। কিন্তু

(শেষাংশ ৪৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পট পরিবর্তন

শ্রীআশালতা সিংহ

পাশের ছোট একতলা বাড়িটা ভাড়া দিব বলিয়াই তৈরি করাইয়াছিলাম। শেষ হওয়া মাত্র বেশ একঘর ভাল ভাড়াটে যোগাড় হইয়া গেল। ভদ্রলোক আবগারি বিভাগের দারোগা। বেশ রাশভারী ভারিক্কি চেহারা। সঙ্গে ফ্যামিলি আছে। নানা জিনিসপত্র বোঝাই দিয়া দুখানা গরুর গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল দ্বারের সম্মুখে। আমার স্ত্রী স্বভাবতঃই কিছু বেশীমাত্রায় কৌতূহলী এবং মিশুক স্বভাবের। তিনি ছাদের আলিসার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নবাগতদের জীবনবৃত্তান্তের অধ্যায় যতটুকু পারেন আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় ছিলেন। একটুখানি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "না, ওদের গিন্নী বড় সেকেলে নিশ্চয়: খালি দেখছি ধামা কুলো বঁটি বাসন হাঁড়িকুড়ি এই সবই বোঝাই হয়ে আসছে।"

ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, "কিন্তু প্রাণধারণের পক্ষে ও জিনিসগুলি অপরিহার্য। আমার তো মনে হয়, তোমাদের ওই কারিপাউডার আর গ্যাস চুল্লির চেয়ে ওই সেকেলে জিনিসগুলির সাহায্যেই ঢের বেশী সুখাদ্য তৈরী হয়। আমার এক দূর সম্পর্কের পিসীমা নারকেল কোরা দিয়ে এমন সুন্দর সুক্তানি রাঁধতেন, দেশের বাড়িতে কতদিন আগে খেয়েছিলাম, এখনও ভুলতে পারি নি।"

গৃহিণীর মুখ গম্ভীর হইয়া গেল, বলিলেন, "সে জানি, আমার কোনও গুণই তুমি দেখতে পাও না। কিন্তু একটা কথা মশায়কে স্মরণ করিয়ে দিই, কেবল রসনার আস্বাদনের জন্যেই খাওয়া নয়। প্রত্যেকটি খাবারের মধ্যে কতটুকু ভিটামিন আছে, কেমন ক'রে রাঁধলে তা শরীরের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হবে, খাবারের এসব সায়েন্টিফিক ভ্যালু সেকেলে মেয়েরা মোটেই বোঝে না।"

ব্যাপার সুবিধা নয় দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।

দু-এক দিন পর, তিথিটা ঠিক মনে নাই, আকাশে জ্যোৎস্নার ফিনিক দিয়াছে। ছাদে মাদুর পাতিয়া বসিয়াছিলাম, হঠাৎ পাশের বাড়িতে চাপা নারী কণ্ঠের গুমরাইয়া গুমরাইয়া কান্নার ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমাদের ভাড়াটে বাড়িটা আমাদের বসতবাড়ির এতই সংলগ্ন যে, এক বাড়ি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যাপার কি জানিবার জন্য অনুসন্ধিৎসু হইতেই স্ত্রী কহিলেন, "আহা বউটির উপর ওর স্বামী বড় অত্যাচার করে। ছেলেমানুষ দ্বিতীয় পক্ষের বউ, বয়সে একেবারেই বেমানান। উনিশ-কুড়ি বছরের ছোট হবে বউটি তার স্বামীর চেয়ে। এখনও বেচারা রাত্রিতে স্বামীর ঘরে যেতে চায় না, হয়তো ভয়ে হয়তো বা লজ্জায়। শাশুড়ী ওকে মেরে ধ'রে ঘরে দিয়ে আসে। কাল দুপুরে এসেছিল আমার কাছে বেড়াতে, তের চোদ্দ বছর বয়স হবে। আহা মুখখানি এত কচি কচি, দেখলে মায়া করে। গালে পাঁচ আঙুলের দাগ ব'সে রয়েছে এখনও, নিশ্চয় কেউ খুব জোরে মেরেছে।"

শুনিতে শুনিতে বিমনা হইয়া গেলাম। সংসারে এমন ঘটনা চারিদিকে অহরহ ঘটিতেছে। বউএর শাশুড়ী এবং স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে বউটির উপরেও রাগ হইল কম নয়। বলিলাম, "রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনটা তোমার মনে আছে তো—'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে'? তুমি এখনই যে কাহিনী শোনালে তাতে বউদেরও কম দোষ দেখি না। ওরা অন্যায় সহ্য ক'রে ক'রে অনেক ভাল লোককেও দুষ্কৃতিকারী হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ এনে দিয়েছে। যেমন অতিবড় বিশ্বাসী চাকরবাকরের হাতেও সংসারের সর্বস্ব ছেড়ে দিলে তাকে চুরি করতে প্রলোভিত করা হয়।"

উত্তরে স্ত্রী তর্কের সুরে কহিলেন, "তোমরা তো সর্বদাই মেয়েদের দোষ দেখ। ওই ছোট একরত্তি মেয়েটার দোষ কোন্ খানটায় বল দেখি? বিয়ের সময় তার কি মত নেওয়া হয়েছিল? অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার মত শিক্ষা কোনওদিন এক মুহূর্তের জন্যেও কি ওরা পায়?"

আর তর্ক করিতে প্রবৃত্তি হইল না, কিন্তু একটা করুণ কান্নার সুরে জ্যোৎস্নার সমস্ত সৌন্দর্য এবং মাদকতা নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

ইহার পর হইতে আমাদের ছাদের আনন্দ আর অবশিষ্ট রহিল না। আগে সময় পাইলেই এবং দিনান্তের স্নিগ্ধ বাতাসটুকু বহিতে শুরু করিলেই ছাদে মাদুর পাতিয়া বসিতাম। কোনও আয়োজন না করিয়া ঘরোয়া উৎসবে আমাদের এই নিভৃত ছাদটুকুর মাধুর্য এতদিন অক্ষয় হইয়া ছিল। কিন্তু আজকাল এখানে বসিলেই পাশের বাড়ির বউএর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কোনওদিন একটা ভীত করুণ আর্ত-কণ্ঠের ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যায়। কোনওদিন একটা সতেজ প্রভুত্বব্যঞ্জক সুরের আস্ফালন শোনা যায়। পাশেই যেখানে একজনের উপর গভীরতম অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতেছে সেখানে নিজেরা চাঁদের আলোয় মুগ্ধ হইতে পারিতাম না। ছোটখাট কথা, অল্প একটু হাসি এবং অনেকখানি নীরব মুগ্ধতায় খচিত হইয়া ছাদে এতদিন যে আনন্দলোক সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা ভাঙিয়া গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যায় স্ত্রী বলিলেন, "চল আজ ছাদে যাই। বাঁচা গেল, পাশের বাড়ির সে ভদ্রলোক বদলি হয়ে কাল পূর্নিয়া চ'লে গেছেন।"

তাহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম, কহিলাম, "ওরা যায় বা থাকুক তোমার তাতে কী যায় আসে?"

কিন্তু অনেকখানি যে যায় আসে তাহা সেদিন অনেককাল পরে ছাদে মাদুর পাতিয়া বসিয়া অনুভব করিলাম। আজ মাথার উপরকার কালো আকাশে নক্ষত্রের প্রশান্ত আলো এবং

পরিপূর্ণ নিঃশব্দতা মনের উপর শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দিয়া গেল। কোন সঙ্গিন সমস্যা বা অত্যাচারের নিষ্ঠুরতা তাহা আবৃত করিয়া ধরিল না। মানব সমাজের সমস্ত জটিলতা, অন্যায় এবং সকল বিধি বিধানের ঊর্ধ্বে যে প্রশান্তির গভীর সমুদ্র, বহুদিন পর আজ তাহারই স্বাদ পাইলাম।

(২)

সে ভদ্রলোকের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। জীবনের পরিবর্তনশীল স্রোতে কত ঘটনা আসিল এবং পুনরায় সরিয়া গেল, এই পাঁচ বছরে কত কি দেখিলাম এবং কত কি ভুলিলাম তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আমাদের ভাড়াটে বাড়িতে এতদিন একজন প্রফেসর থাকিতেন, সম্প্রতি তিনি নিজের বাড়ি করিয়া উঠিয়া গিয়াছেন। বাড়িটা খালি পড়িয়াছিল।

ইংরেজী মাসের প্রথম তারিখ হইতেই আবার ভাড়াটে জুটিয়া গেল। কে একজন গভর্নমেণ্ট অফিসার আসিবেন। বন্ধুরা বলিল, "তোমার ওই বাড়িটার পয় আছে। তৈরী হয়ে অবধি এক দিনের জন্যেও ভাড়া বন্ধ নেই।"

কে আসিয়াছে অত খোঁজ লই নাই। সকালবেলায় চা দিতে আসিয়া স্ত্রী হাসি হাসি মুখে কহিলেন, পাশের বাড়িটায় কে এসেছে জান, সেই যে বছর পাঁচেক আগে এক আবগারি দারোগা তার স্ত্রীকে নিয়ে মাকে নিয়ে কিছুদিন ছিল, তারাই এসেছে আবার বদলি হয়ে। এবারে আরও পদোন্নতি হয়েছে, মাইনেও বেশী। বউটি আমাকে এখনও ভোলে নি, সকালে জানালা খুলে কত গল্প করছিল। বাড়িটা দোতলা হয়েছে ব'লে ভারী খুশী; বল্লে, ভাগ্যে এমন বাড়িটি পেয়েছি।"

কহিলাম, "বিশেষ সুখবর ব'লে তো মনে হচ্ছে না। আগের বারে যে নমুনা দেখেছি, এমন প্রতিবেশী যন্ত্রণাদায়ক। ওরা চলে গিয়েছিল ব'লে তুমিও খুশী হয়েছিলে।"

স্ত্রী হাসিলেন, "না গো তা নয়। যা মনে করছ তা নয়। এবারে পট-পরিবর্তন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীই এখন সর্বেসর্বা। গায়ে গয়না আর ধরে না দেখলাম। স্বামী এখন ওরই কথায় ওঠেন বসেন। হাতে একটা মিনে করা এমন সুন্দর আর্মলেট দেখলাম! আমাকে অমনই আর্মলেট গড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু। কালই আমি প্যাটার্নটা চেয়ে আনব। যা-তা একটা ওজর দেখিয়ে না বলতে পাবে না।"

পট-পরিবর্তনের নমুনা শীঘ্রই পাইলাম। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক এখন প্রায়ই সকালে আসেন। কেমন আছেন, কি বৃত্তান্ত, ইলিশ মাছের দর কত—ইত্যাকার গল্পগাছা করিয়া যান। সেদিন সকালবেলাকার চাএর আসরে মিনতি করিয়া কহিলেন, "আপনাদের ভরসাতেই তো এ পাড়াতে থাকা, একটা বামুন দেখে দেন মশায়। আমার বামুন বেটা ঝিএর সঙ্গে কোঁদল ক'রে আজ সাতদিন হ'ল পালিয়েছে। যা কষ্টে সংসার চলছে সে আমিই জানি। আমার স্ত্রীর খেটে খেটে হাড় কালি, সুন্দর রং আগুন তাতে কালো হয়ে গেছে। মা আছেন, তা তাঁকে দিয়ে সংসারের কুটোগাছটি নড়বে না। নিজের বাত নিয়ে শশব্যস্ত। একটা কাজ তাঁকে দিয়ে পাবার উপায় নেই। ওঁকে নিয়েই সে বেচারার আরও খাটুনি।"

মনের আবেগে ভদ্রলোক হয়তো আরও কত কি বলিয়া যাইতেন, আমি রামভজনকে ডাকিয়া একজন ঠাকুর খুঁজিয়া দিবার আদেশ করিলাম। কৃতজ্ঞতায় তিনি গদগদ হইয়া উঠিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় স্ত্রীর কাছে গল্পটা করিতেই তিনি একটু অন্যমনস্ক হইয়া বলিলেন, "মানুষের জীবনে কতই না পরিবর্তন হয়, বছর পাঁচেক আগেকার একটা দিনের কথা মনে পড়ে, একদিন ওই বউটি স্বামীর ঘরে যাবার ভয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এসে আমার পালঙের তলায় ঢুকেছিল। ওর শাশুড়ী এসে চুল ধ'রে নিয়ে গেল।"

গোপালবাবুর সুবিপুল উদর এবং মেদবহুল চেহারা ও বিপন্নভঙ্গীতে রাঁধুনী খুঁজিয়া দিবার মিনতি মনে পড়ায় হাসি পাইল। যে শাশুড়ী একদিন চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার ভাগ্যেও যে পট উত্তোলিত হইয়া দৃশ্যান্তর আসিয়া পড়িয়াছে সে কথারও আভাস পাইলাম। গোপালবাবু সেদিন রাত্রি এগারটায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কহিলেন, "মশায় এপাড়ার একজন ভাল ডাক্তারের নাম বলুন দেখি, আর তাঁর বাড়ি কোন্‌দিকে কাইণ্ডলি যদি একটু দেখিয়ে দেন, নতুন জায়গা, জানিনে তো কিছুই। আমার মায়ের হাঁপানিটা আবার খুব চাগিয়েছে। তার সঙ্গে খুব জবর।"

পাড়ার বিনয় ডাক্তারের বাড়ি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম তাঁহাকে। বিনয়বাবু যেমন ভদ্র, তেমনি চিকিৎসাতেও তাঁহার হাতযশ আছে। গোপালবাবু আমাকে মিনতি করিয়া কহিলেন "চলুন না মশায় আপনি সুদ্ধ একবার আমার বাসায়। বিদেশে একা, হাত পা আসছে না।"

ডাক্তারের মোটরেই আমরা তিনজন চলিলাম।

গোপালবাবুর বাড়িতে সিঁড়িতে একটা লণ্ঠন টিমটিম করিয়া জ্বলিতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম পুরী। সিঁড়ির উপর দিয়া উঠিতেই বাঁ পাশের ঘরটায় একজনের অস্ফুট কাতরোক্তি শোনা গেল। গোপালবাবুর বুড়ী মা একা মেঝেতে শুইয়া চীৎকার করিতেছেন, স্বর প্রায় বাহির হয় না এতই দুর্বল। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "ডবল নিউমোনিয়া হয়েছে, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। শক্ত রোগ। কি হবে বলা যায় না।"

তিনি দামী দামী অনেক ঔষধ ও ইনজেকসনের ব্যবস্থা-পত্র লিখিলেন। সঙ্গে টাকা লইয়া লোক আসিলে তিনি আজ রাত্রেই সিংহ ফার্মেসির দোকান হইতে সমস্ত আনাইয়া ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিলেন। গোপালবাবু ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিয়া টাকা আনিতে বাহিরে গেলেন।

অনেকক্ষণ হইতে লক্ষ্য করিতেছিলাম দ্বারের প্রান্তে চাবির গোছা ঝনঝন করিয়া কে যেন অসহিষ্ণু ইঙ্গিত করিতেছে। সম্ভবত গোপালবাবুর স্ত্রী হইবেন। এখন দ্বারের অন্তরাল হইতে একটা ক্রুদ্ধ চাপা গর্জন শুনিলাম,—"ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও খেপলে নাকি? এই রাত্রিতেই দাও ওঁকে চল্লিশ টাকা বার ক'রে ওষুধের জন্যে! বুড়ীর যেটুকু বা প্রাণ আছে তাও ফুঁড়ে ফুঁড়ে বার ক'রে দিক আর কি।

এখন ওঁর ওষুধ গঙ্গাজল আর সেবা। চাও তো একটু হরিনাম কর, দুদণ্ড স্থির হয়ে কাছে ব'স। নাও নাও, ডাক্তার ফাক্তার সরিয়ে দাও, ওঁর কাছে যেয়ে একটু বসি গে। তোমার চেয়ে ঠাকরুনের ধাত আমি বেশী বুঝি। সেকেলে মানুষ, ফোঁড়াফুঁড়িকে যমের মত ভয় করেন। তোমার ও চল্লিশ টাকার ইনজেকশন দেখলে বুড়ী ভয়েই ম'রে যাবে। ডাক্তারগুলোর আর কি, যাতে দু পয়সা হয়।"

গোপালবাবু সুবোধ বালকের মত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "ইয়ে এই বুঝলেন কিনা, সেকেলে মানুষ, ম্লেচ্ছাচার একেবারেই পছন্দ করেন না। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধই সহজে খেতে চান না উনি, অত ইনজেকশন নিতে রাজী হবেন না। জোর ক'রে দিতে গেলে উলটো ফল হবে ব'লে ভয় হয়।"

দ্বারের বাহিরের তর্জন গর্জন আমার মত ডাক্তারেরও কানে গিয়াছিল, তিনি বৃদ্ধার ম্লান নিষ্প্রভ চেহারা, শয়নের তুলা বার করা বালিশ ও ছেঁড়া মাদুরের দিকে চাহিয়া গম্ভীরমুখে কহিলেন, "তা হ'লে বিপিনবাবুকে একবার সকালে কল দেবেন। এদিকে ভাল হোমিওপ্যাথ ব'লে তাঁর সুখ্যাতি আছে।"

"তাই দেব, আমার স্ত্রীও তাই বলছিলেন, বুড়ো বয়সে অনর্থক ওঁকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফোঁড়াফুঁড়ি না ক'রে হোমিওপ্যাথির ব্যবস্থা করাই ভাল।" বলিয়া গোপালবাবু আর একবার ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সহসা তাঁহার স্মরণ হইল ডাক্তারের ফীএর টাকাটাও স্ত্রীর কাছে চাহিয়া আনা হয় নাই। আর একবার দ্বারের বাহিরে তর্জন শোনা গেল—"হোমিওপ্যাথির কথাটা এখনও বুড়ো মিন্সের মাথায় আসে নি। শুধু শুধু এই রাত্তিরে লক্ষ্মীবারে সিন্দুক খুলে ঝনাৎ ক'রে চারটে টাকা ফীজ বার ক'রে দাও। সেইকালেই বলেছিলাম, ওগো হোমিওপ্যাথ কর। গঙ্গাজলে এক ফোঁটা ওষুধ দিয়ে টুক ক'রে খাইয়ে দেওয়া চলবে। ধর্ম বজায় রইল, পরলোক বজায় রইল, চিকিচ্ছেও হ'ল। টাকার শ্রাদ্ধও হ'ল না। তা শুনবে ক্যানে, গরীবের কথা বাসী হ'লে মিষ্টি লাগে। যাই বল বাপু এই লক্ষ্মীবারে আমাকে কেটে ফেললেও আমি ভররাত্তিরে সিন্দুক খুলে টাকা বার করতে পারব না।"

চঞ্চলা কমলাকে যিনি এইরূপ নানা বিধি নিষেধের কঠোর বাঁধনে আজও গৃহে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী সহধর্মিণীর দিকে সপ্রেম নয়নে শ্রদ্ধাভরে চাহিতে চাহিতে মাথা চুলকাইয়া তাই তো তাই তো করিতে করিতে গোপাল-বাবু পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "গোপালবাবু অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এক পাড়াতেই থাকি, বন্ধুর মত আপনার মাকে একবার দেখে গেলাম, ফী নেব না।"

গোপালবাবুর স্থূল মুখখানি কৃতজ্ঞতায় চকচকে হইয়া উঠিল। বহির্দ্বার পর্যন্ত আগাইয়া দিতে আসিয়া কহিলেন, "তা হ'লে এই পরামর্শই ঠিক রইল। হোমিওপ্যাথিই চলুক, আপনিও কাইণ্ডলি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন। বিধবা বুড়োমানুষ, শুচিবাই ক'রে এলোপ্যাথি ওষুধ খেতে না চাইলেও আপনাদের মতামতের একটা মূল্য আছে বই কি।"

মোটরে আসিতে আসিতে ভাবিতেছিলাম, সেদিন সে কতকাল আগে ঐ বউটির উল্লেখে ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিলাম, অত্যাচারীর সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারিতার উপরেও আমার রাগ কম হয় না। কেননা তারা চুপ করিয়া সহ্য করিয়া করিয়া দুষ্কৃতিকারীর স্পর্ধাকে বাড়াইয়া তোলে। আজ বুঝিতে পারিলাম তাহা নয়। প্রতিশোধ তারা ঠিক সময়েই নেয়। নির্যাতিতা যে অন্যায় একদিন অশ্রুপূর্ণ চোখে নিতান্ত নিরুপায়ের মত সহ্য করিয়াছিল, তাহারই বিষ স্নায়ু শিরা মজ্জায় মিশিয়া গেছে এ সংসারের। আজ সেই বিষের অন্য রূপে অন্য আকারে উদ্‌গিরণ হইতেছে।

ডাক্তারবাবু আমাকে নামাইয়া দিয়া নিজের বাড়ির পথ ধরিলেন। যখন নামিতেছি তখন শুধু বিষণ্নমুখে একবার স্বগতোক্তি করিলেন, "আশ্চর্য!"

আমি কিন্তু পাঁচবছর আগেকার কথা জানিতাম বলিয়া আশ্চর্য হইতে পারিলাম না। সংসারে এমনই সব নিদারুণ প্রতিক্রিয়াজনিত পট-পরিবর্তনের উৎসটা যে কোথায় শুধু তাহারই যেন একটুখানি দিশা পাইলাম।

অন্ধকূপ হত্যার অলীক কাহিনী

(৪৯৫ পৃষ্ঠার পর)

তাঁহার বিবরণ এত মিথ্যা কথায় পরিপূর্ণ যে, তাহা বিশ্বাস করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না। একটু যত্নসহকারে পড়িলে তাঁহার মিথ্যা বিবরণটির স্বরূপ বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না।

অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী আগাগোড়া মিথ্যা। অথচ কয়েক যুগ ধরিয়া আমাদিগকে এই মিথ্যা কাহিনীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। বহুদিন পরে মিথ্যা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে এবং কালের দুরন্ত ভেদ করিয়া সত্য জয়যুক্ত হইয়াছে। এতদিন একটা মিথ্যা ঘটনাকে বিশ্বাস করিয়া বিশ্ব যে নবাবকে অভিসম্পাত দিয়াছে, আজ সত্য তথ্য আবিষ্কার হওয়ায় আজ হইতে সেই হতভাগ্য নবাব জগৎবাসীর শ্রদ্ধা ভাজন হইতে থাকিবেন।

চিকাগোর পথে

(ভ্রমণকাহিনী—অনুবৃত্তি)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

নায়াগ্রা প্রপাত

এই পৃথিবীতে দুটি বড় বড় প্রপাত আছে। প্রত্যেকটিকে দেখবার জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী দেশ বিদেশ থেকে এসে থাকে। একটির নাম নায়াগ্রা অপরটির নাম ভিক্টোরিয়া। দুই প্রপাতই আমি দেখেছি, দুইই এক ধরনের। তবে ঋতুর প্রভাবে স্রোতের প্রখরতার কমিবেশি হয়ে থাকে। নায়াগ্রা প্রপাতে যখন বন্যার জল আসে তখনকার অবস্থা চোখে না দেখলে ছবি দেখে কিছুই বোঝা যায় না। জল সে আসছে বহুদূর হ'তে। বহুদূর হ'তে জল আসার জন্য স্রোত তীব্র হয়ে ওঠে। তার পর সেই প্রবল জলধারা একসঙ্গে দেড়শত ফুট নীচে প'ড়ে যে ভীষণ শব্দের সৃষ্টি করে তা সত্যই বর্ণনাতীত।

ভিক্টোরিয়া প্রপাতের জল পড়া অন্য ধরনের। ছোট ছোট নদী নালা বয়ে জল আসছে। তার পর চলছে এক সমতল ভূমির উপর দিয়ে। সেই সমতল ভূমির উপর বাঁদর লাফাচ্ছে, ছাগল ঘাস খাচ্ছে, এমন কি চড়াই পাখিও কখনও কখনও ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জল খাচ্ছে। এখানে নায়াগ্রা এবং ভিক্টোরিয়ায় অনেক প্রভেদ। আবার বর্ষার সময় ভিক্টোরিয়ার জল যখন পর্বত থেকে নীচে নেমে আসতে থাকে, তখন বাস্তবিক সে এক ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

নায়াগ্রা প্রপাতের দুই দিকে বিস্তীর্ণ ভূমি। উভয় দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যায় তা শস্যশ্যামলা ও সমতল। নায়াগ্রা প্রপাতের অবস্থা দেখে অনেকে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কারণ যেখানে প্রপাতের ঠিক শুরু সেখানে পাথর ধসতে ও খইতে আরম্ভ হয়েছে। ভয় এই যে, এই ক্ষয় নিবারণ না করলে কালক্রমে নায়াগ্রা আর প্রপাত থাকবে না, হয়ে যাবে নদী। কানাডা এবং ইউনাইটেড স্টেটস পৃথিবীর সৌন্দর্যের এমন একটি নিদর্শনকে হারাতে চায় না। যে রকম শুনলাম আর বুঝলাম তাতে মনে হয় নায়াগ্রা প্রপাত যদি বেশী দিন প্রপাতরূপে বাঁচে তবে আর একশত বৎসর। নায়াগ্রা প্রপাতকে বাঁচাবার একটি মাত্র উপায় আছে। সাময়িকভাবে তার জলধারার গতি পরিবর্তিত ক'রে যে সকল স্থান তার ভাঙতে আরম্ভ করেছে সেই সব স্থান সরিয়ে দিয়ে যদি নূতন ক'রে সিমেণ্ট দিয়ে সব বাঁধিয়ে ফেলা হয়, তবে হয়তো নায়াগ্রা প্রপাত অনেক দিন বাঁচবে। ইউনাইটেড স্টেটেই এরূপ আর একটা প্রপাত ছিল, যার জলধারা প্রাকৃতিক উপায়ে স'রে যাওয়ায় সেই প্রপাত এখন শুকনো নদীতে পরিণত হয়েছে।

নায়াগ্রা প্রপাতের জল যেখানে সোজা হয়ে পড়ছে সেখানকার গভীরতা মাত্র একশত পঞ্চাশ ফিট। এই স্থান থেকে নীচের দিকে তিন মাইল পর্যন্ত আমি গেছি এবং দেখেছি জলের গভীরতা কমেছে। অনেক স্থানে মাছের পর্যন্ত চলাচল শুরু হয়েছে দেখলাম। আমার ইচ্ছা ছিল আরও দেখি, কিন্তু তা আর দেখা হয় নি। ক্যানাডা ও ইউনাইটেড স্টেটস উভয় সরকার হ'তেই আমাকে অনেক সময় চ'লে যেতে হ'ত। তার পর সময় ভাল নয়, এইরূপ দেখাশোনা ক'রে বেড়াবার অনুমতিও পেতাম কি না সন্দেহ। সিনেমায় নায়াগ্রা প্রপাতের দৃশ্যাবলী বেশ সুন্দর ক'রে দেখানো হয়। সাধারণ জ্ঞান লাভার্থে তা যথেষ্ট ব'লে মনে করি।

আমার মন দিয়ে নায়াগ্রা প্রপাত দেখা দেখে বন্ধুরা বিস্ময় প্রকাশ করল। বন্ধুদের বললাম, আদিম যুগে এসব দেখেই লোকে ভয় পেত; নানা কথা ও কাহিনীর সৃষ্টি ক'রে কুসংস্কার প্রচার করত। বললাম, কৌতূহল আর বিস্ময়ের জন্যই এমন ক'রে নায়াগ্রা প্রপাত দেখলাম।

জাহাজে ক'রে নায়াগ্রা প্রপাতের কাছে গিয়ে দেখবার ব্যবস্থা আছে। হঠাৎ মনে হ'ল একটু মজা করা যাক। বললাম, "আপনারা এখানে একটু দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি জাহাজের টিকিট কিনব, দেখব বিক্রি করে কি না।" তাঁরা বললেন, "টিকিট নিশ্চয় পাবেন, তবে নিগ্রো ব'লে হয়তো কোথাও বসতে দেবে না।" যাই হ'ক, একখানা টিকিট কিনলাম এবং জাহাজের একটা সীটে গিয়ে বসলাম। বাপ রে! কত লোক আমার প্রতি যে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তার আর ইয়ত্তা নেই। সবাইএরই দৃষ্টি যেন বলতে চায়, "উঠে যা কালো ভূত।" প্রত্যেকের দৃষ্টিতে আমার প্রতি ঘৃণাসূচক একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। আমি তাদের দেখেও না দেখবার ভান ক'রে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

জাহাজটা পূর্ণ শক্তিতে স্রোতের প্রতিকূলে প্রপাতের কাছে এগিয়ে চলছে। দুদিকে জলের ভয়ানক শব্দে কান পাতা দায়। প্রপাতের জল বেগে নীচে প'ড়ে আবার উপরে উঠছে; তাতে বৃষ্টির এবং কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথম প্রথম কুয়াশা, তার পর প্রবল বৃষ্টিতে আমাদের ওভার কোট ভিজিয়ে দিচ্ছিল। ওভার কোট আমাদের নয়, জাহাজের সম্পত্তি, প্রত্যেক যাত্রীকে দেওয়া হয়। জলে ভিজতে ভিজতে জল প্রপাত দেখলাম। মনে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হ'তে লাগল। তার পরই দৃষ্টি পড়ল—বাঁদিকে। এযে পাহাড় ভাঙছে। হয়তো একদিন এই বিখ্যাত প্রপাত নদীতে পরিণত হবে। যাই হ'ক তার এখন অনেক দেরি।

নায়াগ্রা প্রপাত দেখে অনেকের কবিত্ব আসে। অনেকে সুন্দর বই লেখে। সেই বইএর খুব কাটতি হয়। আমি প্রপাতে এসে সুখী হয়েছিলাম বটে, কিন্তু এক বিষয়ে একটা কাঁটা মনের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে ছিল। ওই যে কতকগুলি চোখ, ঘৃণার বশবর্তী হয়ে আমার দিকে ক্রমাগত চাইছে তাতে মন অসুস্থ বোধ না ক'রে পারে না। এত শিক্ষা দীক্ষাতেও কেন যে এদের মনের ঘৃণ্য ঘৃণার ভাব দূর হয় না, তা আমি কোনও মতেই ভেবে পাই না। আমার চামড়াটার কালো রংএর জন্য যে আমি দায়ী নই, শিক্ষিতদের তো তা বোঝা উচিত। এই মনোভাবের লোক সব দেশেই আছে বটে, কিন্তু এই দেশেই যেন বেশী। জানি না এদের মনের পরিবর্তন কি ক'রে আসবে। এরূপ লোকের পাল্লায় এ জীবনে অনেক বার এসেছি এবং তৎক্ষণাৎ এদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেছি।

প্রপাত দেখা সমাপ্ত হ'লে ফের যখন আমেরিকান বন্ধুদের সঙ্গে মিশলাম এবং আমার মনের ভাব প্রকাশ করলাম, তখন তারা বলল, যতদিন পুঁজিবাদ এই পৃথিবীতে বর্তমান থাকবে ততদিন এই পাশবতাও থাকবে। তাদের কথা শুনে সুখী হই নি। আজও বুঝতে পারি না, সত্যই এই পুঁজিবাদ পৃথিবী হ'তে বিদায় নেবে কি না।

ছোট শহরটাতে (নায়াগ্রা) এসে টহল দিতে লাগলাম। আমার মত একটা কালো লোককে সাদা লোক সমাদর ক'রে নানা স্থানে নিয়ে বেড়াচ্ছে দেখে অনেকেরই মনে হয়তো কোনওরূপ সন্দেহ উঠেছিল। তাই অনেকেই আমার পিছনে এসে সঙ্গীদের আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করছিল। যখন লোকে জানল আমি একজন হিন্দু তখন অনেকেই যেন নিশ্চিন্ত হ'ল। আমার মনে হ'ল যদি আমি নিগ্রো হতাম তবে না জানি আজ আমার কি দুর্দশা হ'ত। আমার বিশ্বাস, আমার চর্মের কৃপায় নিশ্চয়ই আমার পর্যটন অচল হয়ে যেত। নায়াগ্রা শহরে দেখবার মত বিশেষ কিছু নেই। শুনলাম কয়েক রকম বেশ্যালয় আছে। পৃথিবীর সর্বত্র এক ধরনের লোক আছে যারা পরিবর্তনকামী। পরিবর্তনের

জন্য তারা দধীচির মত হাড় দিতেও প্রস্তুত। এরূপ দধীচির সংখ্যা আমেরিকায় সাদা লোকদের মাঝেও কম নয়। এদের অদম্য তেজ, এদের আপনহারা অবস্থা, এদের কর্মতৎপরতা দেখলে অবাক হ'তে হয়। এরা না খেয়ে আছে, কাপড় নেই বললেও চলে, অথচ ওদের চোখে আগুন জ্বলে। বর্তমানে (জানুআরি ১৯৪০) আমেরিকায় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে তা দেখে আমার হাসি পায়। প্রজ্বলিত অগ্নিকে ওভাবে কি ধামাচাপা দেওয়া যায়? কমিউনিস্টরাই সত্যকার পরিবর্তনকামী।

বাফেলো হ'তে ডিট্রয় পর্যন্ত অনেক মোটর রোড আছে। তার মাঝে সোজা পথ হ'ল ক্যানাডা হয়ে। ক্যানাডা হয়ে যেতে হলে পরিচয়পত্রের দরকার। পরিচয়পত্র নানারূপ হয়, মোটরকার লাইসেন্স, কাজের সার্টিফিকেট ইত্যাদি। কিন্তু ক্যানেডিয়ান সরকার তার উপরেও আর একটা পরিচয়পত্র চান। যেমন, আমাদের দেশে আছে Postal identification। আমার মনে হয় ভারতের পোস্ট অফিস যেরূপ সহজে পরিচয়পত্র দিয়ে থাকেন, এরূপ ভাবে কেউ কোনও পরিচয়পত্র দিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু আমেরিকায় পরিচয়পত্র পেতে হ'লে পনের মিনিট মাত্র সময় লাগে। নিজের দুখানা ফোটো নিয়ে যে কোনও পুলিস স্টেশনে হাজির হলেই হ'ল। পুলিস সর্বসাধারণের চাকর। তাকে দেখতে হয় ফোটো দুটো ওই লোকের কি না, তার মুখে কিংবা প্রকাশ্য স্থানে কোনও দাগ আছে কি না। এ দুটো দেখেই সরকারী পরিচয়পত্র দিয়ে দেওয়া হয়। ভারতের পুলিসের প্রবচনতুল্য অশিষ্ট ব্যবহারে অভ্যস্ত আমরা, আমেরিকার পুলিসের শিষ্ট ও সুন্দর ব্যবহারে বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারি না। সত্য, কি সুন্দর সদ্‌ব্যবহার আমেরিকার পুলিসের! আমার সঙ্গীদের পরিচয়পত্র এক ঘণ্টার মধ্যে হয়ে গেল। তার পর আমরা চললাম গ্রেহাউন্ড বাস কোম্পানির বাসকে পিছনে রেখে। হাই ওয়েতে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে গাড়ি চালাবার অধিকার আছে। কিন্তু আমাদের গাড়ি চলেছে ঘণ্টায় সত্তর-আশি মাইল ক'রে। গাড়ি চলছে তো চলছে। মাঝে মাঝে ঈটস্ (Eats) অর্থাৎ রেস্তরাঁ আছে।

ঈটস ঘরগুলিতে কোনও পারিপাট্য নেই, বিজলী বাতির ছড়াছড়ি নেই। দোকানী প্রায় স্থানেই পুরুষ। পুরুষগুলি শুষ্ক বদনে দণ্ডায়মান। দেখলে মনে হয়, হাসবার শক্তি ওদের লোপ পেয়েছে; সব সময়েই যেন সন্ত্রস্ত। কিন্তু, সুযোগ পেলেই দুর্বলের উপর হুমকি-হামকি করতে ছাড়ে না। আমার পাসপোর্ট বেশ ভাল ক'রেই পরীক্ষা করা হচ্ছিল, কিন্তু সঙ্গীদের সেরূপ কিছুই হচ্ছিল না। ব্রিটিশ হয়ে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পেয়ে কলোনিঅ্যাল লোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয় আজ তা ভাল ক'রে বুঝলাম। পূর্বে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দেও একবার বুঝেছিলাম। তখনকার কথা মনে ছিল না, এখন ফের নূতন ক'রে মনে হ'ল।

গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে যেতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ড্রাইভার সঙ্গীকে ব'লে গাড়ি থামিয়ে লক্ষ্মীছাড়া গ্রামগুলি দেখতে লাগলাম। খড়ের ঘর, খড়ে পূর্ণ, চারদিকে কোনওরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার লক্ষণ নেই। হয়তো গত এক মাস যাবৎ এদিকে কেউ আসেই নি। গরুতে খড় খেয়েছে, খড় চারিদিকে এলোমেলো হয়ে ছড়ানো। ইঁদুর তাতে বেশ বড় বড় গর্ত করেছে। গরু মাঠে আপন মনে চরছে, তাদের ভাল জলের কোনও বন্দোবস্ত নেই। শূকরগুলি আপন মনে দৌড়চ্ছে, শুচ্ছে, মনে হয় যেন তাদের কেউ দেখবারও নেই। গৃহস্থের ঘর অপরিষ্কার। কোথাও ভেঙ্গে পড়েছে, কোথাও প্রখর সূর্যালোক টালিহীন ছাদের ফোকর দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি মারছে। ইলেকট্রিক দেখলাম না, বোধ হয় মোমবাতিই ব্যবহৃত হয়। কৃষক কাঙ্গাল হয়ে পথে দাঁড়িয়েছে। কৃষকপত্নী ম্লান মুখে নত ক'রে সেলাইএর কাজে রত! আমেরিকার লোক দেখে ক্যানাডার লোকের মনের কোনওরূপ পরিবর্তন হচ্ছে দেখলাম না।

গ্রামে যুবক-যুবতীর দল মদ্দীখানার দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। হাসছে বটে, কিন্তু সে হাসি কেমন যেন অভাবের হাসি। যুবকদের স্বাস্থ্যশ্রী অনুজ্জ্বল। কিন্তু কেন? ক্যানাডার লোক কি এতই দরিদ্র যে ছেলেপিলেদের স্বাস্থ্যবিধান পর্যন্ত করতে পারে না? আমার মনে হয় তারা যা পায় তাতে তাদের অভাব মোচন হয় না। হতশ্রী গ্রাম আর দেখতে ইচ্ছা হ'ল না। সঙ্গীদের বললাম আর গ্রামে গাড়ি থামিও না। আমরা আর কোথাও থামি নি, সারা দিন গাড়ি চালিয়ে সন্ধ্যায় উইণ্ডসর নামক স্থানে এসে পৌঁছলাম।

উইণ্ডসর শহর। পথ ঘাট লণ্ডনের মত আঁকাবাঁকা। তত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। লোকের চলাচল মাঝমাঝি। যারা পথে চলছে, তাদের মুখ দেখলে মনে হয় তারা চিন্তিত। হাসির তো কথাই নেই। বেশীক্ষণ এরূপ পুঁজিবাদী শহরে থাকতে ইচ্ছা হ'ল না। একটি রেস্তরাঁয় সামান্য পানাহার ক'রে এক সুড়ঙ্গ পথে চললাম। সুড়ঙ্গের উপরে হ্রদের জল। সুড়ঙ্গ-পথটি বেশ সুন্দর ক'রে গড়া হয়েছে। দুখানা মোটর স্বচ্ছন্দে আসা-যাওয়া করতে পারে। পথটির দৈর্ঘ্য অন্তত আড়াই মাইল হবে ব'লে মনে হ'ল। এরূপ সুড়ঙ্গ-পথ তৈরি করতে অনেক টাকা লেগেছে সন্দেহ নেই, অবশ্য সর্বসাধারণের অশেষ সুবিধা হয়েছে।

ওপারে ডিট্রয়। প্রকাণ্ড নগরী। এখানে আসার পর পাসপোর্ট পরীক্ষা হ'ল। এই পরীক্ষায় আমাকে একটুও কষ্ট পেতে হয় নি। তবে ইমিগ্রেশন অফিসর আমার বন্ধুদের একটু যেন ধমকে কথা বললেন। কিন্তু তাদের তাতে গ্রাহ্যই নেই; উল্টে ধমক দিয়ে বললে, "You guies are too fat, yeah?" ইমিগ্রেশন অফিসর ওদের কথা শুনেই চুপ। কেননা ওই expressionটাই খাঁটী আমেরিকান। ওদের কথা কাটাকাটি শুনে আমার মনে হ'ল, ওরা বেশ ভাল ক'রেই জানে, কি ক'রে সরকারী চাকরবাকরদের শিক্ষা দিতে হয়। আমাদের লগেজ পরীক্ষার পর আমাদের ছেড়ে দেওয়া হ'ল। আমার বন্ধুরা আমাকে একটা হোটেলে রেখে সেই রাত্রেই চিকাগোর দিকে রওনা হ'ল। পথে শুনেছিল চিকাগোতে অনেক কাজ খালি পড়েছে।

পুরাসংগ্রহ

শ্রীঅখিল নিয়োগী
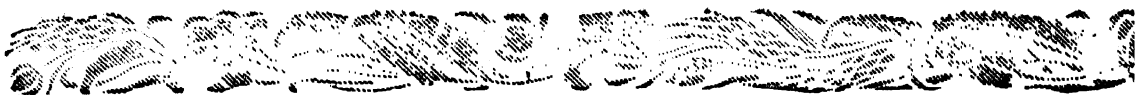
অঘোরচন্দ্র আঁশ ভাগ্যান্বেষী যুবক। সম্প্রতি বেকার। বেকার এইজন্য যে সম্প্রতি শিল্প-বিদ্যালয়ের পাঠ তার শেষ হয়েছে, কিন্তু কোনও রকম উপজীবিকা সে খুঁজে পায় নি।

প্রত্যহ সকালবেলা পরামানিকদের অনুকরণে একটি কাঠের বাক্সে তুলি ও রং ভরতি ক'রে সে বেরয় এবং পরিচিত অপরিচিত দোকান ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহে জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়ায় তাঁদের কোনও রকম ছবি আঁকাবার প্রয়োজন আছে কি না।

কিন্তু ভদ্রলোকদের কথা চিরদিনই এক থাকে, কাজেই অঘোরচন্দ্র প্রত্যহ প্রত্যেক জায়গা থেকে একই রকম জবাব পায়। সে জবাবটি যে কী আশা করি আপনারা সকলেই তা আঁচ করে নিতে পেরেছেন।

সেদিন অতি প্রত্যুষে রওনা হ'তে গলির মোড়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁকে 'পরামানিক' ব'লেই ডেকে বসেছিলেন। সেই থেকে অঘোরচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করেছে যে এবার আর কখনও সে সকালে বেরবে না, বেরবে দুপুরবেলা। তখন 'মিড-ডে'—সস্তা ভাড়ায় ট্রামে অনেক দূর চ'লে যাওয়া যাবে এবং ফিরতি মুখে হেঁটে হেঁটে সব দোকানে চলবে তার যাচাইএর কাজ।

সেদিন বিকেল তিনটে প'য়ত্রিশ মিনিটে ছাতাওয়ালা গলির মোড়ে হঠাৎ অঘোরচন্দ্রের বরাত ফিরে গেল।

ব্যাপার আর কিছুই নয়, এক বেনে ভদ্রলোক নতুন সিঁদুরের দোকান দিয়েছেন। চীনে সিঁদুর, দেশী সিঁদুর, কাশীর সিঁদুর, এমনি আরও কত-কি লেবেল মারা। উঠবি তো ওঠ্ অঘোরচন্দ্র আঁশ সেই দোকানেই গিয়ে উঠেছে।

নবীন শিল্পীর মুখে সব কথা শুনে সুতোয় বাঁধা চশমার ফাঁক দিয়ে তাকে একবার নিরীক্ষণ ক'রে দোকানের মালিক বললেন, "তা বাবাজী, আমায় যদি একটি গণেশের মূর্তি এঁকে দাও তো দোকানে বাঁধিয়ে রাখি।"

দর দস্তুরের কথা উঠতে ভদ্রলোক আর একবার চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, "কতই আর নেবে বাবাজী, বাজারে তো গণেশের পট অঢেল পাওয়া যায়। তবে তুমি ভদ্রলোকের ছেলে আমার দোকানে এসেছ; আজকেই প্রথম দোকানটা খুলেছি, তাই তোমায় একেবারে বিমুখ করব না। পুরো চার গণ্ডা পয়সাই নিও।"

শুনে অঘোরচন্দ্র খানিকটা গুম হয়ে রইল। তার পর ভেবে দেখলে, চার দিন হ'ল সে 'মিড-ডে ফেয়ারে' বেরচ্ছে; তাতে খরচ হয়েছে নগদ আটটি পয়সা। অথচ আয়ের পথে তো শূন্য! হাতের লক্ষ্মী ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই পাশের ভাঙা টুলটায় ব'সে প'ড়ে বললে আচ্ছা ওই সাড়ে চার আনাই দেবেন, ফিরতি মুখে সিনেমা দেখা যাবে 'খন।" সঙ্গে সঙ্গে সে তার সেই আদি ও অকৃত্রিম কাঠের বাক্সটি খুলে কাজ শুরু ক'রে দিলে।

গণেশ মূর্তি যখন আঁকা শেষ হ'ল তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। ছবিখানা দোকানের মালিকের হাত-বাক্সের উপর ফেলে দিয়ে বললে, "শিগ্‌গির আমায় পয়সা দিন; এক্ষুনি গিয়ে আবার সিনেমার টিকিট কাটতে হবে তো!"

তরুণ শিল্পীর সেদিনকার সেই সাড়ে চার আনা আয় দেখে অলক্ষ্যে বিধাতা একটু মুচকি হাসলেন কি না সে কথা কে বলতে পারে!

এর পরই শুরু হ'ল ১৯১৪ সালের পৃথিবীর যুদ্ধ।

ছবি আঁকার কাজ যা-ও একটু-আধটু চলছিল রং আর কাগজের দাম চ'ড়ে যেতে সেটুকুও গেল বেমালুম বন্ধ হয়ে।

অঘোরচন্দ্রের মামা কুমিল্লা থেকে চিঠি লিখলেন, 'যুদ্ধের বাজারে আমার ভুসির ব্যবসা অত্যন্ত ফেঁপে উঠেছে,.........তুলি আর রং ফেলে দিয়ে যাতে দু পয়সা হয় সেই দিকেই তোমার এখন নজর দেওয়া উচিত। এই সেদিনও দিদি কত দুঃখ ক'রে আমায় চিঠি লিখেছেন।'

সুতরাং স্থির হ'ল অঘোরচন্দ্রের মামা কুমিল্লা থেকে পাঠাবেন ভুসি, আর অঘোরচন্দ্র সেই মাল কলকাতা থেকে যুদ্ধে চালান দেবে।

লক্ষ্মী যখন সদয় হন, তখন বোধ করি ধুলো মুঠি ধরলে সোনা মুঠি হয়েই ফিরে আসে।

অঘোরচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। দু বছরের ভিতর বাড়ি হ'ল, গাড়ি হ'ল, ব্যাঙ্কে জমল মোটা টাকা আর ব্যবসায়ী মহলে হ'ল অসীম প্রতিপত্তি।

'মিড-ডে ফেয়ার' দু পয়সায় গিয়ে অঘোরচন্দ্র যে সব অঞ্চলে ঢুঁ মেরে বেড়াতেন, সেইখান দিয়ে আজকাল তার 'রোলস্' সোঁ করে নিঃশব্দে চলে যায়! কল্পনাবিলাসী অঘোরচন্দ্র চক্ষু মুদে ধূম পান করতে করতে তা মিষ্টি আমেজের সঙ্গে মৃদু হাস্যে উপভোগ করেন!

ক্রমে ব্যাঙ্কে যখন জমার অঙ্ক আরও ফেঁপে উঠল, ব্যবসায়ের হাল ভাইএর হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন।

অঘোরচন্দ্রের শিল্পী-মন আজও ম'রে যায় নি। যে সাধনায় তিনি জীবনে সফলকাম হ'তে পারেন নি, অবসর কালে তাই হ'ল তাঁর একমাত্র নেশা। তবে সে নেশা তিনি নিজে হাতে তুলি ধ'রে চরিতার্থ করতে পারলেন না; তাই শুরু করলেন তিনি প্রাচীন চিত্র সংগ্রহ।

কোথা থেকে খবর পাওয়া গেল মাদ্রাজের এক শিল্পীর গৃহে অজন্তার একখানি চিত্রের অনুলিপি পাওয়া গেছে, অনুলিপিখানি নাকি অনেক দিনের প্রাচীন। অমনি অঘোরচন্দ্র চাপলেন মাদ্রাজ মেলে এবং বহু টাকা ব্যয় ক'রে কিনে নিয়ে এলেন সেই অনুলিপি। তার শৌখিন ড্রইং রুমের শোভা বর্ধন করল সেই চিত্রখানি।

খবর পেয়ে প্রাচীন চিত্র সংগ্রাহকের দল মধুর সন্ধানে ধীরে ধীরে এসে অঘোরচন্দ্রের চারি পাশে গুঞ্জন শুরু ক'রে দিলে।

ফলে জমতে লাগল রাশি রাশি ছবি। কোনওটি মিশর থেকে এসেছে, পিরামিডের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন-চিত্র। যে প্রধান কারিগরের কল্পনায় পিরামিড রূপ লাভ করেছিল—চিত্রখানি নাকি তারই নিজের হাতের আঁকা। চিত্রখানির প্রাচীনত্ব ও গুরুত্ব বোধে মূল্যও অনেকটা সেই অনুপাতেই দিতে হয়েছিল। আর একখানি চিত্র এল র‍্যাফেলের আঁকা। মাতৃ মূর্তিকে রূপদানের আগে তিনি যে কাগজখানিতে খসড়া তৈরী করেছিলেন এটি সেই 'রাফ স্কেচ'। ইতালির এক কৃষক পরিবারের কাছে নাকি ছবিটি ছিল।

এ ছাড়া রুশিয়ার শেষ জারের প্রতিকৃতি, ফ্রান্সের ব্যাস্টাইলের পতন, ম্যাগনা চার্টার সই করবার ছবি, আকবরের হোলি খেলার চিত্র প্রভৃতি কত যে দুষ্প্রাপ্য রত্ন সংগৃহীত হ'তে লাগল তার আর ইয়ত্তা নেই।

বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিষ্ঠান অঘোরচন্দ্রের এই শিল্পপ্রীতির জন্য তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করলেন এবং তরুণ বাঙলার শিল্পিদল তাঁর জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করে ফেললেন।

যে সকল প্রাচীন চিত্র অঘোরচন্দ্রের চিত্রশালায় সংগৃহীত হ'ল তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিধারী একজন গবেষক ছাত্রকে নিযুক্ত করা হ'ল। সমস্ত

পৃথিবীর শিল্প জগতের ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই ইতিহাস রচনা করতে হবে। কাজেই একজন গবেষকের কাজ নয়। সুতরাং কামসকাটকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরও কয়েকজন গবেষক ছাত্র চেয়ে পাঠানো হ'ল। তার পর বিপুল উদ্যমে শুরু হ'ল ইতিহাস রচনা।

অঘোরচন্দ্র স্থির করলেন এই ইতিহাস রচনা শেষ হ'লে তিনি এমন একটি দুষ্প্রাপ্য চিত্রশালার উদ্বোধন করবেন জগতে যার জুড়ি মিলবে না।

কাগজে কাগজে এই সংবাদ বিঘোষিত হ'ল। শিল্পজগতে এত বড় প্রত্নবিৎ আর জন্মায় নি, কোনও কোনও সংবাদপত্র এ ইঙ্গিত করতেও দ্বিধা বোধ করলেন না।

ইনদুলুদু চিত্র ভবনের সভাপতি যে এই চিত্রশালার দ্বারোদ্-ঘাটন করবেন সে সংবাদটিও চিত্র সংবলিত হয়ে কলানুরাগী মাত্রেরই মনকে রসাল করে তুললে।

অবশেষে এল একদিন সেই বহু প্রতীক্ষিত দিবস। অঘোর-চন্দ্র অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে বাগানে পায়চারি করতে করতে চিন্তা করে দেখলেন, আজ তাঁর জীবন সার্থক। যদিও ভুসির ব্যবসায়ে তিনি বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েছেন, তথাপি জগতে শিল্প-কলার জন্য এমন কিছু করে গেলেন যার জন্য তাঁর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে না হক অন্তত ব্রোঞ্জের অক্ষরে চির-কাল জ্বলজ্বল করতে থাকবে।

একটু সকাল সকাল স্নানাহার শেষ ক'রে তাঁকে প্রদর্শনী ভবনে উপস্থিত থাকতে হবে। যদিও নিজে হাতে তাঁকে কিছুই করতে হয় না, তবু আজকের দিনে তাঁর উপস্থিতির অনেকখানি দাম আছে।

যথাযোগ্য সাজ-পোশাক পরিধান করে তিনি গাড়িতে উঠতে যাবেন, এমন সময় একজন প্রতিষ্ঠাবান প্রাচীন চিত্র-সংগ্রাহক এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এসেই স্মিতহাস্যে বললেন, মিস্টার আঁশ, আজ আপনার চিত্রশালার উদ্বোধনের দিন। তাই আজ আমি আপনার কাছে এমন একখানি চিত্র নিয়ে এসেছি যার তুল্য প্রাচীন চিত্র আপনার গোটা চিত্রভবনে নেই।"

মিঃ আঁশ কৌতূহলী হলেন। বললেন, "আপনি বলছেন এই কথা।"

বিশেষ জোর দিয়ে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আমি বলছি এই কথা। আর বলছি আপনার মত প্রত্নবিৎকে। ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে চিত্রখানি মহাভারতের যুগে চিত্রিত। এ সম্পর্কে অতি শীঘ্রই বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ প্রবন্ধ লিখিবেন। কিন্তু আমি আপনাকে অনুরোধ করি চিত্রখানি ক্রয় করতে। আপনিই এই চিত্রাধিকারী হবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।

আঁশ মহাশয়ের শিরায় শিরায় যেন শিহরন জেগে উঠল। মহাভারতের যুগের চিত্র! কেউ কখনও যা হাতে করা দূরে থাক কল্পনাও করতে পারে নি। লাখ টাকার একখানি চেক লিখে দিয়ে অঘোরচন্দ্র ছবিখানি গ্রহণ করলেন।

বিকেলে উৎসবে যাবার মুখে তিনি অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে চিত্রখানি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

কিন্তু একি!

এযে তাঁরই হাতের আঁকা......সিঁদুরের দোকানের সেই গণেশ মূর্তি! তিন স্তর ময়লা জমে আজ তাই প্রাচীন ও মহার্ঘ হয়ে উঠেছে। এই ছবিখানির জন্য একদা তিনি উপার্জন করেছিলেন নগদ সাড়ে চার আনা। আজ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সেই অমূল্য রত্ন তাঁর হাতে এসে পড়েছে! অঘোরচন্দ্রের মাথা ঘুরতে লাগল। তবে কি তাঁর সমস্ত সংগ্রহই এই পর্যায়ের?

খানিক বাদে তিনি সোফারকে ডেকে হাওড়া স্টেশনের দিকে গাড়ি চালাতে আদেশ দিলেন।

পরদিন সকালবেলাকার সংবাদপত্রগুলিতে এই ধরনের সংবাদ বার হ'ল—"মিস্টার অঘোরচন্দ্র আঁশ কোনও অনিবার্য কারণে তাঁহার চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন স্থগিত রাখিয়াছেন। গতকল্য রাত্রের গাড়িতে তিনি হরিদ্বার অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় বাকী জীবন তিনি গঙ্গাতীরেই অবস্থান করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন।"

দানব ও দেবতা

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

নরের মাঝারে যে দেবতা আছ জাগো তুমি আজ জাগো,
নরের মাঝারে যে দানব আছে তারি সাথে তুমি লাগো।
দানবের হাতে লৌহ-মুষল, কটিদেশে তরবারি,
ছুঁড়েছে অগ্নি-গোলক সে জন চৌদিকে প্রাণহারী।
লোহিত নয়ন হইতে তাহার ছুটে মৃত্যুর বাণ,
মুষ্টিতে তার ভীষণ নখর দংশিতে আগুয়ান।
শ্বাস-রোধকারী বিষম বাষ্পে ছেয়েছে সে ধরাতল,
তারি আগমন-শঙ্কায় কাঁপে শিশু ও নারীর দল।
তারি হুঙ্কারে থর থর কাঁপে আকাশ বাতাস বন,
সুন্দরী ধরা কুশ্রী করিতে তারি ভীম আলোড়ন।
এই দানবের রক্তের লোভ, তারি বিত্তের লোভ,
ভূমি-হরণের ব্যগ্রতা তার কে করিবে আজি লোপ?
কে মহামানব আসিবে বল না কোথা পাব তার দেখা?
তার চেয়ে প্রতি মানব মাঝারে যে দেবতা আছে ঢাকা,
ঢাকা যে রয়েছে লোভের তলায় হিংসার আবরণে,
লোভ হিংসার জাল ছিঁড়ি' আজ তোল তারে প্রাণপণে।
নরে নরে আজ নরক নেহারি' মুদ্রিত করি' আঁখি
অন্তর-তলে ধেয়ানের বলে দেবতারে তোল ডাকি'—
সুপ্ত যে দেব স্বার্থের চাপে কুটিল কর্মতলে;
দেবতা হইতে পারে প্রতি নর শুভ ইচ্ছার বলে।
বড় দেব নয়, মহাদেব নয়, নরদেব শুধু হও,
নরে নরে শুধু হাতে হাতে ধ'রে শুভ কাজে রত হও।
হেসে শুধু বল, এ মহীতে আছে সকলের তরে ঠাঁই,
বিধাতার দেওয়া আলো বায়ু জলে কাড়াকাড়ি কিছু নাই।
তোমার অন্ন, আমার অন্ন, তোমার আমার মাটি
বিশাল ধরণী হেসে হেসে দেয়, কেন তবে কাটাকাটি?
হাস্যে প্রণয়ে আরামে সকলে যদি রহে গলাগলি,
যদি কিছু দেয় আপন অন্ন নিরন্নে 'আহা' বলি',
তা হ'লেই হবে দেবতার লীলা দেবতা হইবে নর,
রবিকর সম হাসির আলোকে ভরিবে ধরার ঘর।
সেই আলো চাই, ওরে সেই আলো, হাসির প্রেমের আলো,
তাতেই ঘুচিবে সকল আঁধার ঘুচিবে মনের কালো।
সে আলোক হেরি' মানব-দানব মাথা ক'রে নেবে নীচু,
তাহার মুষল আর তরবারি ফিরিবে না কারো পিছু।
প্রতি নর মাঝে আজিকে জাগুক সেই দেবতার হাসি,
পঙ্কিল আর শঙ্কিল ধরা সুষমায় উদ্ভাসি'।

ডাবলিনের স্মৃতি

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ডাবলিনের কথা লিখতে গিয়ে অনেক কথাই আজ মনে পড়ছে। যে "স্বর্গভূমি" হতে বিদায় নিয়ে এসেছি, অমঙ্গলের আশঙ্কা তার আকাশ অন্ধকার করেছে, সে বেদনাই আজ বড় ক'রে বাজছে। অকল্যাণ যখন এসেই পড়ে তখন আর ভাবনা কিছু থাকে না। সর্বপ্রকার বিপ্লব ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার যে সঞ্চয় রয়েছে তারও তখন খোঁজ মিলে। অনাগত বিপদের কাঁটা মনে বিঁধে থাকে, প্রতি পদে মনের স্থৈর্য ও প্রশান্তিকে ক্ষুণ্ণ করে। 'মাদারের' কথা মনে পড়ছে, তাঁর স্নিগ্ধ, শুভ্রললাটে চিন্তার রেখা পড়েছে। নিজের জন্য নয়। তাঁর বাবা আইরীশ বিপ্লবের শহীদ। সাহসের তাঁর অন্ত নেই। কিন্তু আশ্চর্য, নিজের জীবনে যে মানুষ মৃত্যুকে তুচ্ছ করে, আশ্রিত প্রিয়জনের ভাবনা তাকে কি পরিমাণ চঞ্চল করতে পারে! মাদারের স্নেহ সত্যিই আমার আশ্চর্য ব'লে বোধ হ'ত। আর যাই থাক, স্নেহ ওদেশে সত্যিই দুষ্প্রাপ্য।

গতির পরেই ধনতান্ত্রিক জীবনে যদি কোন সত্যের উল্লেখ করতে হয় তবে বলব অনিশ্চয়তা। জীবনের অনিবার্য ক্ষণ-স্থায়িত্বের কথা তুলছি না। সংকীর্ণতর অর্থে, ইউরোপে ধন, জন, জীবন কিছুই নিশ্চিত নয়। অমন আবেষ্টনী স্নেহের বিকাশ-লাভের অনুকূল নয়। জীবনের কোন আবেষ্টনীই স্নেহের অনুকূল কি না সেটা ভাববার বিষয়। শিশুমনের উন্মেষের জন্য স্নেহের উত্তাপের আবশ্যক। একথা জানি। কিন্তু সে-প্রয়োজনে কতটুকু স্নেহের দরকার? পাখীরও অপত্যস্নেহ রয়েছে। কিন্তু পক্ষিশাবক যেদিন উড়তে শেখে, নিজের আহার সংগ্রহের শক্তি অর্জন করে, সেইদিন থেকেই কি মায়ের সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক ছেদন হয় না? একথা কি ভুল যে স্নেহের আতিশয্য প্রতি পদে গৃহের চৌকাঠের সঙ্গে আমাদের বাঁধে, জীবনসংগ্রামে প্রবৃদ্ধ না ক'রে বৃহত্তর জীবনের প্রতি আমাদের বিমুখ করে? জানি। তবুও স্নেহের সুশীতল বারির তৃষ্ণা অনুভব করি। স্নেহের সুকোমল আঁচলের তলায় যে মানুষ হয়েছে, স্নেহের মোহন, পরম লোভনীয় স্পর্শটুকু সে কেমন করে ভুলবে? এজন্যই বলি আমাদের দিয়ে কিছু হবে না। এমন মানুষ গড়ে তুলতে হবে স্নেহ যাদের বীর্যকে হরণ করে নি।

একথা বোধ হয় সত্য যে, হিংসার কলুষমুক্ত সমাজ যেদিন গড়ে উঠবে, জীবনসংগ্রামের কঠোরতা যেদিন জীবনকে এমনভাবে ঔদার্য বঞ্চিত করবে না, সেদিন বোধ হয় সংসারে স্নেহের স্থান হবে। সে স্নেহের কি রূপ হবে সেকথা আজ বলতে পারি না।

ওদেশে যৌনজীবন রয়েছে, "প্রেম" রয়েছে; আমাদের দেশে যৌনজীবন রয়েছে, কিন্তু "প্রেম" নেই; স্নেহ ওদেশ অপেক্ষা এদেশে অনেক সুলভ এই আমার ধারণা। প্রেম শব্দটি আমি লঘু অর্থে ব্যবহার করছি, ফ্লার্টেশন ও কোর্টশিপে যা রূপলাভ করে। অমন চপলতার এক লোভনীয় সৌন্দর্য রয়েছে তা চোখে দেখেছি। ইউরোপীয় জীবনে সৌন্দর্য ও ছন্দ রয়েছে। কোর্টশিপের দ্বারা বরবধূ নির্বাচনের প্রথা তার একটি প্রধান কারণ, এই আমার বিশ্বাস। প্রেম ও যৌন ব্যাপার এক নয়, এ আমরা ধারণা করতে পারি না। প্রেমের ছলাকলার আমাদের চক্ষে কেবল একটিমাত্র অর্থই আছে। কিন্তু ঐ ধারণা ভুল। যৌনপ্রকাশ যেখানে নেই, (যৌন শব্দটি অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করছি) প্রেম সেখানে অহরহ আত্মপ্রকাশ করছে। অমন প্রেমের প্রচারের বিরুদ্ধে একটি গুরুযুক্তি রয়েছে একথা জানি। মনোবিদ্যার ভাষায়, প্রেমের পথে কেবলমাত্র আবেগের (emotion) নিষ্কাশই (catharsis) হয় না, উত্তেজনাও (stimulation) ঘটে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে বয়ঃপ্রাপ্তির দীর্ঘকাল পরে এদেশে বিবাহের প্রচলন হয়েছে। নিবৃত্তিমার্গ কোন কাজের কথা নয়। তাছাড়া নিবৃত্তিমার্গের অন্তরালে সহজ জিনিস মনের কালিতে যে ভূত সেজে বিজনে বিচরণ করছে সে কথাও ত আমরা না জানি না।

প্রেম জীবনের চারুপ্রকাশ। দেশে তার বহুল প্রবর্তন আবশ্যক।

যৌনজীবনের প্রতি ওদের মনোভাবের কথাও উল্লেখ করা দরকার। জনৈক সাহিত্যিক একবার লিখেছিলেন, ওরা পাঁকে নামে, কিন্তু পাঁক ওদের স্পর্শ করে না। কথাটা সত্য, যদিও স্মরণ রাখতে হবে খ্রীশ্চানসুলভ মনোভাব নিয়েই পাঁক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আসল কথা, ইউরোপে প্রগতিশীল ব্যক্তিরা যৌন-পরিতৃপ্তিকে পাঁক কিম্বা পাপ বলে বিবেচনা করেন না। সংযমের আবশ্যকতাকে অস্বীকার করছি না। সংযমের প্রয়োজন থাকবেই। সহজ সরল যুক্তির উপর হবে সে সংযমের ভিত্তি। কিন্তু সে মন্দিরে ধর্মের অপদেবতার প্রবেশের পথ নেই। ইউরোপে যৌন-পরিতৃপ্তির স্রোত বয়ে যাচ্ছে একথা সত্য। সেটা তত মারাত্মক নয়। আমি মনে করি, বণিকস্বার্থে সিনেমা, বিজ্ঞাপন ও নভেলের দ্বারা প্রবৃত্তির যে অহরহ উত্তেজনা ঘটছে সেটা অধিকতর মারাত্মক। যেটা অল্পে ভাল, অত্যধিক পরিবেশনে সেটাই বিষ হয়ে উঠে। কিন্তু ইউরোপ একপ্রকার বাড়াবাড়ি করছে বলে আমরা অন্যপ্রকার বাড়াবাড়ি করব এটা যুক্তি নয়। ইউরোপের আবহাওয়ায় কিছুকাল বাস করলে পর অনুভব করা যায় আমাদের গুরুত্বদানেই আসলে যৌন ব্যাপার গুরু হয়ে উঠেছে। বস্তুগত বিচারে, ক্ষুন্নিবৃত্তির মতই যৌনপরিতৃপ্তির সহজ রূপ। যে বাধা, যে ভারে আমরা নিমজ্জমান হয়েছি তা জীবনের নয়, মনের।

ডাবলিনের সুন্দর, প্রশস্ত রাস্তাগুলি চোখে ভাসছে। ডাবলিনের সমুদ্রধার, তার পাহাড়ও। একদিনকার কথা মনে পড়ছে। সমুদ্র সেদিন শান্ত ছিল। দেখলাম—অনন্ত ধূ ধূ জলরাশি। মৃত্যুর মতই সে সমুদ্রের রূপ। অটুট প্রশান্তি—অতলস্পর্শী রহস্য! ইচ্ছে হোল সে সমুদ্রের ধারে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত প্রস্তররাশির উপর শুয়ে আমি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করি। সে ত মৃত্যু নয়—সে হবে মহামিলন।

মরণের কথা বলতে আরেক দিনের কথাও মনে হচ্ছে যেদিন ডাবলিনের গোরস্থানে গিয়েছিলাম। অনেকেই সেখানে ঘুমিয়ে আছেন—দেখতে পেলাম। প্রসিদ্ধ অভিনেতা ব্যারি ফ্যালেগনের স্মারকলিপির উপর লেখা আছে—"After Life's fitful fever he sleeps well." একটি কবরের নীচে কয়েকজন খ্রীশ্চান পুরোহিত ঘুমিয়ে রয়েছেন। আমার সঙ্গী ছিলেন গোঁড়া খ্রীশ্চান লারেন্স। তিনি সেখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার ভাল লাগল না, আমি এগিয়ে গেলাম। মনে হোল মৃত্যুর পূর্বেই জীবনকে যাঁরা অস্বীকার করেছেন তাঁদের আবার মৃত্যু কি? প্রেম, বাসনা ও বেদনার মধ্যেই ত জীবনের হৃদস্পন্দন। প্রেমকে যে তুচ্ছ করেছে, বাসনাকে যে জীবন মূক করেছে, বেদনাকে যে জীবন অতিক্রম করেছে—মৃত্যুর মন্দিরে দাঁড়িয়ে সে জীবনের পূজো করা চলে না। জীবনের মোহ ও কোলাহলে যে স্থল ধূমায়িত—নিজেদের জীবনের দ্বারা যাঁরা মৃত্যুর বার্তা সেখানে প্রচার করেন —তাঁরা প্রণম্য। কিন্তু মৃত্যু যেখানে আপন অদৃশ্য পক্ষপুট বিস্তার করেছে—সেখানে এঁদের স্থান কোথায়? জীবনের সঙ্গে তুলনা করেই "শেষের দিন" ভয়ংকর, সুন্দর—জীবন্মৃতের সঙ্গে তুলনা করে নয়। তাই আমি ভালবাসি দেখতে যে ফুল অকালে ঝরে পড়েছে, কুঁড়ি নয়, ফুল—আলোবাতাসের সঙ্গে সবে তার ছোঁওয়াছুঁয়ি, কানাকানি সুরু হয়েছে।

মনে পড়ে বহরমপুরে একটি কবরের কথা। একটি সুন্দর বধূ—বয়স তার চব্বিশ বৎসর—এক সমাধিপ্রস্তরের নীচে ঘুমিয়ে

রয়েছেন। মৃত্যু তাঁর কঠিন হয়েছিল, জীবন থেকে মৃত্যুর পথ সহজ নয়, কিন্তু মরণের ক্রোড়ে সে জীবন শান্তিলাভ করেছে, সৌন্দর্যলাভ করেছে। যে জীবন সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করেছে—তার জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। কবি বলেছেন,—"জন্মিলে মরিতে হবে"—এ যেন সেই মৃত্যু, জীবনের স্বাভাবিক, ক্রমিক পরিসমাপ্তি। কিন্তু ঝোড়ো বাতাসে যখন একটি ফুল অকালে বৃন্তচ্যুত হয়, তখন বেদনাবোধ করি, কিন্তু মুগ্ধও হই। জীবনের রহস্য, মৃত্যুর বিস্ময় মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

ও'কোনোলের একটি বন্ধুর সমাধিশিলার উপর লেখা আছে—"Love is stronger than death"। নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম অন্তরের ইচ্ছাতিরিক্ত অন্য কোন বার্তা কি এই উক্তিতে আছে? দুর্বারগতিতে আমরা ভালবাসি, প্রেমে আমরা বাস্তবকে অতিক্রম করি, মহান সুন্দর স্বপ্ন রচনা করি—কিন্তু মৃত্যুর পথে সে স্বপ্নময় স্পর্ধা কি ধূলিসাৎ হয় না? কিম্বা, মৃত্যুকে অতিক্রম করে কি মিলনের অমৃতলোক রয়েছে? কেউ কি জানে? তবু আমরা আশা ছাড়ি না, আশা করে চলি। বাস্তব যদিবা বিমুখ হয়, আশাও লুপ্ত হলে আমরা বাঁচব কি করে?

লেক্রেয়ারের সঙ্গে ডাবলিনের প্রান্তে এক পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম সে কথা আজ মনে পড়ছে। পাহাড়ের চূড়ার কাছে এক সাবেকি, পুরানো চায়ের দোকান। আমরা দুজনে সেখানে ঢুকলাম। ভেতরে একটি তরুণ ও তরুণী ছিল। তরুণীটি আমাদের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করল। বললে, টেগোরের কবিতা পড়েছে। কবিতায় রহস্যের ছোঁয়াচ তার খুব ভাল লাগে। সেই মেয়েটি ও লেক্রেয়ার প্রায় দুঘণ্টা ধরে ব্যালে নৃত্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করল। তাদের আলোচনা যখন শেষ হল তখন সূর্য অস্ত গিয়েছে। পাহাড়ের চূড়া থেকে সেদিন আর ডাবলিন দেখা হোল না।

ঐ দেশের মেয়েদের অমন সহজ, অকুণ্ঠিত আচরণ ভারী ভাল লাগে। ক্ষিপ্র, সাবলীল ওদের গতি। কিন্তু তবু মনে হয়, লাবণ্যের ওদের কিছু অভাব। জীবন সংগ্রামের আঁচ যেন ওদের বড় বেশী স্পর্শ করেছে। কিন্তু ঐ বিচারের বিশেষ মূল্য নেই। বৃহত্তর জীবন থেকে আমাদের মেয়েরা বঞ্চিত। বাহিরের উদার আলোর পরশও তারা লাভ করে নি, আলোর তপ্ত ছোঁয়াচের বেদনার খবরও তারা জানে না। মুক্ত জীবনের বিচারের মাপকাঠি তারা হতে পারে না।

রায়েনের কথা বলি। তার বয়স বছর ছাব্বিশ হবে। ছোটবেলা থেকে ব্যবসায় করছে; কিন্তু তবুও হৃদয়ের উদারতা হারায় নি। একদিন বললে, "আমি ভালবাসি গান, গ্রাম, কুকুর এবং মজলিশ।" আগুনের ধারে বসে আমরা রোজ সন্ধ্যার সময় গল্প করতাম, সব কিছুতেই, শিক্ষা ও মনোবিদ্যায় পর্যন্ত ওর উৎসাহ ছিল, সুতরাং কোন পক্ষেরই গল্পের বিষয়ের ও আগ্রহের অভাব ঘটত না। বন্ধু যদিচ বলেছেন অনুরাগ ও আসক্তিই দুঃখের মূল, তবু ভাবি অনুরাগই যদি না থাকবে তবে পূর্ণতা ও আনন্দই বা জীবনে আসবে কোন্ পথে? রুশো লিখেছেন—"জীবনে যে কিছুই ভালবাসে না, আমিত বুঝি না, তার পক্ষে কেমন করে সুখী হওয়া সম্ভব।" বলা চলতে পারে aesthetic আনন্দ পূর্বর্তী কোন অনুরাগের উপর নির্ভর করে না। ঐ উক্তিতে কিঞ্চিৎ সত্যতা আছে। কিন্তু তবু বলব aesthetic বোধ যার রয়েছে, ক্রমশ aesthetic অনুরাগও তার জন্মাবে জানি, অমন অনুরাগ আর ইনস্টিংক্ট—উৎসারিত অনুরাগের মধ্যে এক গুরুতর পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি, আমাদের ইচ্ছাধীন, দ্বিতীয়টি মূলত অবশ্যক। আহারে যত আনন্দই পাই না কেন, তার আদেশের রাজকীয় ভঙ্গি আমাদের পীড়িত করে। অতএব ক্ষেত্রবিশেষে, আহার যখন দুর্লভ, ঐ আসক্তি আনন্দের পরিবর্তে দুঃখের কারণ হয়। তবু মনে হয় ঐ সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে যে নিবৃত্তপন্থী হয়, শান্তি পেলেও জীবনের আনন্দ হতে সে বঞ্চিত হবে। আহারের দৃষ্টান্ত বিচার্য নয়। তার তাগাদা ও পুষ্টির প্রশ্ন এমনভাবে জড়িত যে অনাহারে থাকবার চেষ্টা কেউই করে না। তার প্রয়োজন বুদ্ধ নিজেও স্বীকার করেছেন। প্রেমের কথা উত্থাপন করা যাক। প্রেমশূন্য জীবন বিচ্ছেদবেদনা, দারিদ্র্য ও দুর্ভাবনা হতে মুক্ত। তথাপি যদি বলি প্রেমের জীবন প্রেমশূন্য জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তবে কি ভুল হবে? প্রেমের পথই জীবনের গভীরতা ও পূর্ণতার পথ—টমাস মানের এ উক্তি দার্শনিকোপলব্ধি: প্রেম প্রেমিকের চক্ষে জীবনকে অর্থপূর্ণ করে। জীবনের কোন অর্থই যদি না পাই, শেষ পর্যন্ত "বাঁচবার আনন্দ" রয়েছে। সে আনন্দ নিভৃত প্রেমের স্রোতস্বিনীর কাছে অধিকাংশ ঋণী এ কথা কে অস্বীকার করবে? প্রেমে যে বেদনা রয়েছে, তারও দরকার আছে; জীবনের যা স্বরূপ তাও কেবলমাত্র আনন্দ নয়। গ্যেটে লিখেছেন, নির্নিমেষে যে পূর্বাচলের দিকে তাকিয়ে থাকে সূর্যোদয় দেখবার জন্য, ললাটের ঘর্মের দ্বারা যে আহারের সংস্থান করে, আত্মাকে, সত্যকে সেইত জেনেছে।

রায়েনের জীবনে উৎসাহের অভাব নেই। ঐ দেশের লোকেরা বেঁচে আছে। শনিবারের ছুটি পেলেই ওরা ছোটে গ্রামে, কেউ বা যায় নাচে, কেউ সিনেমায়। আমাদের দেশে যারা রেশ খেলে, তাদের মত "মন্দভাগ্য" লোক আর নেই; সমাজের ঘৃণার ফলে শেষপর্যন্ত তারা মন্দ ভাগ্যই হয়ে দাঁড়ায়। রেশ খেলে, তবুও ভাল লোক—ঐ দেশেই দেখেছি।

ডাবলিনের কথা বেশী বলা হল না। অনেক কথাই বলার আছে। কিন্তু নিজের চিন্তাস্রোতে আমি বারবার হারিয়ে যাচ্ছি। আজ এইখান থেকেই বিদায় নিলুম।

আজ-কাল

কংগ্রেসের হালচাল

গত তিন সপ্তাহের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, বৈঠক ও সিদ্ধান্তে কংগ্রেসের নেতৃত্ব শ্রদ্ধেয় কোনো রূপ গ্রহণ করেনি। ধরতে গেলে অবস্থা আগের মতোই রয়ে গেছে। সেই আপোষের আগ্রহ, সেই গণ-আন্দোলনের ভয়, সংগ্রামের ভাব দেখিয়ে সেই সব দিক বজায় রাখার নীতি এখনো অটুট রয়েছে। বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজী দুই দিন কথাবার্তা বলেন; কিন্তু তাঁর অহিংস যুক্তি বড়লাটকে টলাতে পারেনি। বড়লাট তাঁকে জানিয়ে দেন যে, ভারতবাসীকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সমরপ্রচেষ্টা ব্যাহত হবে; অতএব গান্ধীজীর প্রার্থিত অধিকার তিনি দিতে পারেন না। এর উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "কংগ্রেস এখনো বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সমরপ্রচেষ্টায় বিরত করতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু মানব জাতির এই সংকটমুহূর্তে কংগ্রেস তার মূলনীতি অস্বীকার করে' ঐ কর্মনীতি আঁকড়ে থাকতে পারে না। কংগ্রেসকে যদি মরতে হয় তাহলে সে তার বিশ্বাস ঘোষণা করতে করতেই মরবে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা একমত হতে পারলাম না, এটা দুর্ভাগ্যের কথা। কিন্তু আমি এই আশা আঁকড়ে থাকব যে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কংগ্রেসের মতামতের সঙ্গে সমঞ্জসভাবে তাঁদের নীতি কার্যক্ষেত্রে অনুসরণ করা সম্ভব হবে।"

এরপর ওয়ার্দ্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়েছে এবং তাঁরা গান্ধীজীর ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের প্ল্যান অনুমোদন করেছেন।

শোনা যাচ্ছে, গান্ধীজী তাঁর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটির কোনো সদস্যকে যোগ্য মনে করেন নি; বিনোদ ভবে নামে তাঁর এক সন্ন্যাসীপ্রতিম আশ্রমবাসী প্রথম সত্যাগ্রহী হিসেবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতাদানে অবতীর্ণ হবেন। আর আন্দোলন আরম্ভের আগে গান্ধীজী তাঁর প্ল্যানটা বড়লাটকে জানাবেন।

গান্ধীজী সকলকে জানিয়ে রেখেছেন যে, তাঁকে সম্ভবত আর একবার অনশন করতে হবে। তবে অবশ্য ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করে' থাকবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

বাঙলা পার্লামেণ্টারী কংগ্রেস দলের নেতা হয়েও শ্রীশরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেসের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে' দলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন, এই অভিযোগে নিখিল ভারত কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সাব কমিটি বাঙলা পার্লামেণ্টারী কংগ্রেস দল থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করেছেন এবং তাঁকে ব্যবস্থা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করতে বলেছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস নেতাদের এই কাজে বাঙলায় বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

মুসলিম লীগের গোঁসা

মুসলিম লীগকে বড়লাটের শাসন পরিষদে দুইটি আসন এবং সমর পরামর্শ পরিষদে পাঁচটি আসন দেবার যে প্রস্তাব বড়লাট করেছিলেন, মুসলিম লীগ কাউন্সিল তা অগ্রাহ্য করেছেন। জনাব জিন্না সাহেব রোমাঞ্চকর এক বক্তৃতায় বলেছেন, "মনে হচ্ছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ছাড়বার কোনো মতলব নেই। এই রকম প্রস্তাব করে' তাঁরা ৯ কোটি মুসলমানের (যারা একটা জাতি) সঙ্গে ছেলেখেলা করছেন। নানা দলের সঙ্গে বড়লাট যে দীর্ঘ আলোচনা চালাচ্ছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, ইংরেজরা এখনো প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক চালাতে চান। আমরা এ অবস্থা মেনে নেব না।"

সিন্ধুতে হিন্দু-নিধন

সিন্ধুতে হিন্দুদের হত্যা করবার জন্যে একদল মুসলমান তৎপর হয়েছে। তাদের গুপ্ত ও অতর্কিত আক্রমণে এ পর্যন্ত বহু নিরপরাধ হিন্দু প্রাণ হারিয়েছে। এই সব মুসলমানকে দমন করা আশু প্রয়োজন। অথচ এখনো তাদের বীভৎস হত্যালীলা ক্ষান্ত হ'ল না। এ অসহায় অবস্থার কি কোনো প্রতিকার নেই?

রবীন্দ্রনাথ

কবি রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং-এ হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এখানে কয়েকদিন তাঁর অবস্থা সংকটজনক থাকে, তারপর ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু ১২ই অক্টোবর আবার তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। এখন অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা যাচ্ছে; তবে বিপদ এখনো কাটে নি।

আন্তর্জাতিক

যুদ্ধের অবস্থা

গত তিন সপ্তাহে যুদ্ধের অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি। বৃটেন ও জার্মান-অধিকৃত এলাকার উপর পারস্পরিক বিমান-হানা সমভাবেই চলছে, বরং বলা যায় বৃটিশ আক্রমণ হারে বেড়েছে। লণ্ডন এখনো জার্মান আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য রয়েছে। সেখানে সেণ্ট পল গির্জা ও ক্যাণ্টারবেরি গির্জা বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লণ্ডনে ও অন্যান্য শহরে বাড়ী ঘর যথেষ্ট নষ্ট হচ্ছে এবং লোকজনের প্রাণহানি ঘটছে। মিঃ চার্চিল ৮ই অক্টোবর কমন্স সভায় এক বিবৃতিতে বলেন যে, এপর্যন্ত বৃটেনে জার্মান বিমান-আক্রমণে মোট সাড়ে আট হাজার লোক নিহত ও তেরো হাজার লোক আহত হয়েছে। ইংরেজরা প্রায় প্রত্যহ চ্যানেল ও উত্তর-সাগর উপকূলে জার্মান অভিযান-বন্দরগুলির উপর বোমা বর্ষণ করছে। বার্লিনে অনেকবার বৃটিশ বিমান হানা দিয়েছে। লণ্ডন এলাকা থেকে যেমন সমস্ত নারী ও শিশু অন্যত্র সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, বার্লিন থেকেও নাকি তেমনি নারী শিশু বৃদ্ধ স্থানান্তরিত করবার আয়োজন হচ্ছে। জার্মানির অন্যান্য শ্রমশিল্প-কেন্দ্র ও সামরিক ঘাঁটির উপরও বারবার বোমা বর্ষণ করা হয়েছে।

পূর্ব আফ্রিকায় যুদ্ধও একরকম অচল অবস্থাতেই রয়েছে। মিশরে ইতালীয় বাহিনী সিদি বারানি থেকে অগ্রসর হয়েছে ব'লে' কোনো খবর পাওয়া যায় নি। উভয় পক্ষ থেকে পরস্পরের ঘাঁটির উপর বিমান আক্রমণ চলছে।

দাকারের ঘটনা

ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার দাকার বন্দর আটলাণ্টিকের একটা প্রধান ঘাঁটি। এই বন্দর দখল করতে পারলে আটলাণ্টিক অবরোধে বৃটেনের তথা আমেরিকার খুব সুবিধে হয়। আর জার্মানরা দখল করলে তাদেরও সমপরিমাণ লাভ। জার্মানরা এই বন্দরে আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছে জেনে জেনারেল দ্য গলের নেতৃত্বে এক ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী দাকার চড়াও করে। কিন্তু তার আগে তিনটি ফরাসী ক্রুজার জিব্রল্টারের মধ্য দিয়ে সেখানে গিয়ে পেঁছেছিল। ভিশি গবর্ণমেণ্টের আদেশে দাকারে উপকূলীয় ব্যাটারি ও ঐ ক্রুজারগুলি জেনারেল দ্য গলকে বাধা দেয়; ফলে তীব্র একটা সংঘর্ষ হয় এবং শেষ পর্যন্ত জেনারেল দ্য গল লড়াই থামিয়ে চলে' আসেন। ফরাসী ক্রুজারগুলির গতিবিধি সম্পর্কে প্রথমে সরকারী বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে, জিব্রল্টার দিয়ে তাদের গমনে বাধা দেওয়া হয় নি এই কারণে যে, জার্মান-অধিকৃত বন্দর গন্তব্যস্থান না হলে ফরাসী রণতরীর গতিবিধিতে বাধা দেওয়া বৃটিশ নীতি নয়; কিন্তু মিঃ চার্চিল তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে, বৃটিশ নৌ কর্তৃপক্ষ ভুল করে' ফরাসী ক্রুজারগুলিকে ছেড়ে দেয় এবং এ ভুলের জন্যে যারা দায়ী তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। দাকার ঘটনার প্রতিশোধে ফরাসী বিমানবহর দুইদিন জিব্রল্টারে প্রবল বোমাবর্ষণ করেছিল।

জেনারেল দ্য গল এখন বৃটেনের সমর্থক ফরাসী ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকা ও ক্যামেরুন্স পরিদর্শনে গেছেন।

বল্কানে নতুন পরিস্থিতি

এ তিন সপ্তাহে কূটনীতির ক্ষেত্রে কিন্তু বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। প্রধান দুটি হচ্ছে—রুমানিয়ায় জার্মান সৈন্যদের ঘাঁটি স্থাপন এবং জার্মানি, ইতালি ও জাপানের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি।

গত ৪ঠা অক্টোবর ব্রেনার গিরিবর্ত্মে হিটলার ও মুসোলিনীর বৈঠক হয়। তারপর থেকেই বল্কানে এক্সিসের কর্মতৎপরতা দেখা যাচ্ছে। সেনাপতি দলসহ ত্রিশ হাজার জার্মান সৈন্য রুমানিয়ায় প্রবেশ করেছে। রুমানিয়ার আয়রন গার্ড গবর্ণমেণ্ট তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে। তারা প্রধান প্রধান কেন্দ্রে এবং তৈলখনি অঞ্চলে গিয়ে ঘাঁটি করেছে। এ অবস্থায় রুমানিয়ার স্বাধীনতা কতটুকু বজায় আছে সেটা গবেষণার বিষয়। সরকারীভাবে রুমানিয়া ও জার্মানি বলেছে যে, রুমানিয়ার সৈন্যবাহিনীকে সামরিক শিক্ষাদানই হচ্ছে জার্মানবাহিনীর আগমনের উদ্দেশ্য। ইতালি বলেছে যে, রুমানিয়ার তেল জার্মানি ও ইতালীর পক্ষে একান্ত দরকার এবং সেই তৈলখনি রক্ষা করতে হবে। এ অবস্থায় স্বভাবতই বৃটেনের সঙ্গে রুমানিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন হবার উপক্রম হয়েছে। রুমানিয়ানরাও ইংরেজদের উপর দুর্ব্যবহার করছে; এক রাজদূত ছাড়া প্রায় সমস্ত ইংরেজ রুমানিয়া থেকে চলে' আসছে।

বল্কানের এই সব ব্যাপার নিয়ে নানারকম জল্পনা কল্পনা চলছে ও গুজব রটছে। তবে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, সমস্ত ব্যাপারের লক্ষ্য হচ্ছে ইংলণ্ড। রুমানিয়ার তৈলখনির উপর বৃটিশ বিমান-আক্রমণের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করা অথবা বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে গ্রীস বা তুরস্ককে পদানত করে সুয়েজ চড়াও করা রুমানিয়ায় জার্মান আধিপত্যের তাৎপর্য। অবশ্য এ থেকে দুটো জিনিষ পরোক্ষে স্বীকৃত হয়। প্রথমতঃ, ইংলণ্ড জয় করা জার্মানি সহজ বোধ করছে না এবং দীর্ঘ যুদ্ধের জন্যে সে প্রস্তুত হচ্ছে; দ্বিতীয়ত, স্পেন নানা কারণে নিশ্চয়ই এখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চায় নি, সেজন্যে জিব্রল্টার দখলের বদলে সুয়েজ দখলে মনোনিবেশ করতে হচ্ছে এবং মিশরের মধ্য দিয়ে সুয়েজ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া খুব সুবিধাজনক হবে না বলে' জার্মানি ও ইতালি আর একটা পথ খুঁজছে।

সুদূর প্রাচ্যের বিরোধ

জার্মানি, ইতালি ও জাপানের চুক্তির স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে তফাৎ রাখা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এখন বৃটেনকে প্রচুর সমরোপকরণ দিয়ে এবং স্বেচ্ছা সৈন্য জুগিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করছে। এদিকে ইন্দোচীন জাপানের কবলিত হওয়ার পর জাপানকে আর বাড়তে না দেওয়ার অভিপ্রায় আমেরিকার ভাবে প্রকাশ পায়। আমেরিকা অবশ্য হস্তক্ষেপ না করে' পারে না। কারণ ইওরোপ ও আফ্রিকা যদি জার্মানি-ইতালির গ্রাসে যায়, আর পূর্বে এশিয়া যায় জাপানের কবলে তাহলে মার্কিণ পুঁজি খাটবে কোথায়? সেইজন্যে আমেরিকা একদিকে বৃটেন ও অন্যদিকে চীনকে সাহায্য দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে থাকে, অবশ্য আত্মরক্ষা ও গণতন্ত্রের নামে। কিন্তু আমেরিকাকে ঠেকানোই যদি ত্রিশক্তি চুক্তির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে তা ব্যর্থ হয়েছে বলতে হবে। এর ফলে বরং বৃটিশ-মার্কিণ ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছে। উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে ক্রমাগত সলা-পরামর্শ চলছে। প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণ নৌবাহিনীকে পুরোপুরি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং আমেরিকা কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে অতি দ্রুত বিপুল অস্ত্রসজ্জা করছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, চীন ও বৃটেনকে তাঁরা যথাসম্ভব সাহায্য করতে থাকবেনই, কেউ বাধা দিতে পারবে না। মার্কিণ সমর্থনে বৃটেন জাপানকে জানিয়ে দিয়েছে সে বর্মা-চীন রাস্তা এবার খুলে দেবে, জাপানের সঙ্গে তিন মাস মেয়াদের যে চুক্তি ছিল ১৭ই অক্টোবরের পর আর তার আয়ুবৃদ্ধি করা হবে না। এই সব দেখে জাপানের সুর কিছু নরম হয়ে গেছে বলে' মনে হয়। জাপ পররাষ্ট্র-সচিব বার বার বলেছেন যে, আমেরিকার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধানোর অভিপ্রায় তাঁদের আদৌ নেই। চীন এই সময় তার লড়াই চালাবার সংকল্প আবার ঘোষণা করেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন

দুই দিকের এই অবস্থার সোভিয়েট ইউনিয়নই হয়েছে ভারকেন্দ্রস্বরূপ। দুই পক্ষ থেকে তার তোয়াজ চলছে। ত্রিশক্তির চুক্তির একটা ধারাই করা হয়েছে তাকে তুষ্ট রাখবার জন্যে, যাতে বলা হয়েছে যে, এ চুক্তি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হবে না। জার্মানি ও জাপান সোভিয়েটের কাছ থেকে এ চুক্তির সমর্থন পাবার জন্যে চেষ্টা করছে। পক্ষান্তরে আমেরিকা ফিনল্যাণ্ড-সংঘর্ষের সময় প্রযুক্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে প্রচুর টাকার যন্ত্রপাতি সোভিয়েটকে সরবরাহ করছে। বৃটিশ দূত স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ও মঃ মলোটোভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' আলোচনা করছেন। বল্কান সম্বন্ধেও জার্মান পত্রিকা সোভিয়েটের কাছ থেকে ভরসা চাচ্ছে। এ অবস্থায় কৃষ্ণসাগরে জার্মান সাবমেরিন পাঠানোর সংবাদ মিথ্যে বলেই মনে হয়। পক্ষান্তরে তুরস্ক ও যুগোস্লাভিয়া (বুলগেরিয়ার কথা কিছু জানা যায় নি) বেশী করে' সোভিয়েট রক্ষণাবেক্ষণে যাবার লক্ষণ দেখাচ্ছে। সোভিয়েট কিন্তু কোনো পক্ষে এখন ভিড়বে না। সোভিয়েট পত্রিকাগুলি ইতিমধ্যে একাধিকবার ঘোষণা করেছে যে, সোভিয়েট বর্তমান বিরোধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে কৃতসংকল্প।

চেম্বারলেনের প্রস্থান

মিঃ চেম্বারলেন শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে মন্ত্রিসভা এবং রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব ত্যাগ করেছেন। মিঃ চার্চিল বৃটিশ রক্ষণশীল দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন।

১৪।১০।৪০। —ওয়াকিবহাল

বাঙলার সিনেমা প্রতিষ্ঠান ও নাট্যালোক সংশ্লিষ্ট বন্ধুবর্গকে আমরা বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। চিত্রসমালোচকরূপে পাঠকবর্গ ও জনসাধারণের প্রতি সুবিচার করিতে গিয়া সিনেমা ব্যবসায়ীদের প্রতি অবিচার করিয়াছি—অর্থাৎ ন্যায় ও নিষ্ঠার সহিত সমালোচনা করিতে গিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রিয় সত্যকথা বলার দরুণ তাহাদের অপ্রিয়ভাজন হইতে হইয়াছে। কিন্তু বৎসরের এই একটি দিন মিলনের দিন, এই দিনটিকে আমরা আমাদের মনের পূর্ব সঞ্চিত রাগ দ্বেষ ও আবর্জনা দ্বারা যেন আবিল করিয়া না তুলি। শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ অন্তরে আমরা পুনর্বার সকলকে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি।

* * *

নিরপেক্ষ সমালোচনার প্রয়োজন আছে। সিনেমা-শিল্প যাহাতে সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট না হয়, তজ্জন্য মাঝে মাঝে সমালোচকদের নির্মম হইতে হয়, কিন্তু সে সমালোচনাকে ধ্বংসমূলক মনে করিয়া সমালোচককে শিল্পের অনিষ্টকামী ও শত্রু বলিয়া প্রচার করা সিনেমা ব্যবসায়ীদের ঔদার্যের পরিচয় দেয় না। কারণ, সমালোচনার ধর্মই হইতেছে সুগঠনের সহযোগিতা করা; সমালোচনার ফলে কোন বস্তুর ধ্বংস সাধিত হইলে মনে করা যাইতে পারে যে, সেবস্তুটি চোরাবালির উপর দাঁড়াইয়াছিল।

কোন কোন চিত্রনির্মাতা নিজেদের অতি সাধারণ জিনিসকে অসাধারণ বলিয়া জাহির করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন এবং শুধু তাহাই নহে, বাজারে যাহাতে এই সব জিনিস শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লয় তাহার জন্য বস্তুমূলক সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিয়া সমালোচকদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ হরণ করা হয়। ফলে যে সমালোচনা বাহির হয় তাহার স্তুতিবাদ চিত্রনির্মাতার কর্ণে মধুর বলিয়া মনে হইলেও পাঠক ও দর্শকগণের বিশ্বাস সমালোচকদের হারাইতে হয়।

চিত্র পরিচয়

রূপবাণী—"অমর গীতি"

ফিল্ম কর্পোরেশনের নূতন চিত্র **"অমর গীতি"** পূজার পূর্ব হইতে রূপবাণী চিত্রগৃহে সাফল্যের সহিত চলিতেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পটভূমিকায় একটি প্রেমকাহিনী লইয়া এই ছবিটি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন ছায়া, অহীন্দ্র, সাবিত্রী, প্রমোদ, তুলসী লাহিড়ী, ভানু রায়, সত্য মুখার্জি, বোকেন চট্টো, নিভাননী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত হীরেন বসু ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন এবং শব্দযন্ত্রীর কাজ করিয়াছেন মধু শীল। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও শচীন দেববর্মণ সংগীত পরিচালনা করিয়াছেন।

জ্যোতি—"হিন্দুস্থান হামারা"

৩২নং ধর্মতলা স্ট্রীটস্থ "রূবী" সিনেমা সম্প্রতি "জ্যোতি" সিনেমায় রূপান্তরিত হইয়াছে। "জ্যোতি"র প্রথম উদ্বোধন হয় ফিল্ম কর্পোরেশনের নূতন হিন্দী সামাজিক চিত্র **"হিন্দুস্থান হামারা"** চিত্র প্রদর্শনের দ্বারা। মেসার্স কপূরচাঁদ লিঃ ও মানসাটা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের যুগ্ম পরিচালনায় এই চিত্রগৃহটি পরিচালিত হইতেছে। এই চিত্রখানি সম্প্রতি পাঞ্জাব সরকার কর্তৃক পাঞ্জাব প্রদেশে প্রদর্শন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বাঙলায়ও শীঘ্রই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। এই চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন পদ্মা, যমুনা, নান্দ্রেকার, গোপ, শিবদাসানী, শ্যাম দুলারী প্রভৃতি।

কমলা টকীজের সামাজিক চিত্র "রাজকুমারের নির্বাসনে" শ্রীমতী চন্দ্রাবতী। ছবিটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে।

লণ্ডনে জার্মান বোমারু বিমানের ধ্বংসস্তূপ
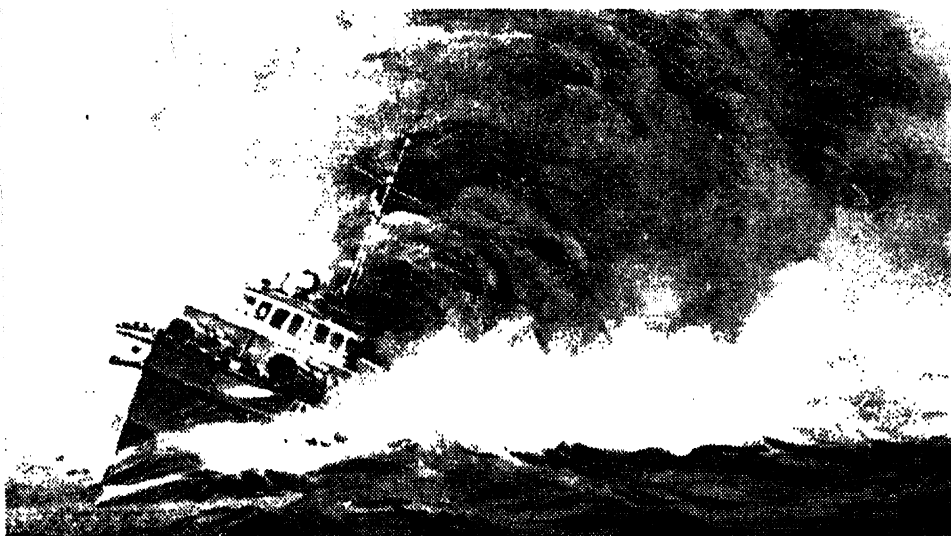
মাঝ দরিয়ায় জার্মান 'ই-বোট' ধূম্রজাল বিস্তার করিয়া বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে

বাঙলার অ্যাথলেটিকস পরিচালনা

বাঙলার অ্যাথলেটিকস মরসুম আগতপ্রায়। নবেম্বর মাসের প্রথম হইতেই বাঙলার সর্বত্র অ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের বিপুল উৎসাহ দেখা দিবে। বড় বড় শহর হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট ছোট গ্রামেরও মধ্যে অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার অভাব হইবে না। প্রতি বৎসর বাঙলার সর্বত্র অ্যাথলেটিকস বিষয়ের এইরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এইরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনুযায়ী বাঙালী অ্যাথলীটগণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে না। বাঙলার প্রতিনিধি নির্বাচনের যখন পালা পড়ে, তখন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অ্যাথলীটগণকে বাঙলার সুনাম রক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়। গত বিশ বৎসর ধরিয়া এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায় নাই। বাঙালী অ্যাথলীটগণ এতই নির্বোধ ও অসহায় যে, ইহার প্রতিবাদ বা এই নিয়ম পরিবর্তনের জন্য কোনরূপ আন্দোলন করে নাই। এমন কি গত ১০।১২ বৎসর ধরিয়া আমরা এই বিষয়ে বাঙালী অ্যাথলীটগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছি। কেন যে আমাদের এই ব্যর্থতা, তাহার প্রকৃত তথ্য এখনও পর্যন্ত জানিতে বা বুঝিতে পারি নাই। তবে ইহাতে আমাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই। কারণ আমরা জানি, একদিন না একদিন বাঙালী অ্যাথলীটগণ আমাদের কথায় সাড়া দিবে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অ্যাথলীটগণ যাহাতে বাঙলার সম্মান রক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। অপমানজনক অবস্থার তখনই পরিবর্তন দেখা দিবে।

বাঙালী অ্যাথলীটগণের উৎসাহ যে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ অপেক্ষা কম, ইহা অনেকেরই ধারণা হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। তবে কেন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অ্যাথলীটগণ বাঙালী অ্যাথলীটগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছে? এই প্রশ্ন অনেক ব্যায়াম উৎসাহীর মনে জাগিতে পারে। ইহাদের প্রশ্নের উত্তরে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ইহা কেবল সম্ভব হইয়াছে শিক্ষাপদ্ধতির জন্য। বাঙালী উৎসাহী অ্যাথলীটগণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যে সকল শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহার কোনওরূপ সাহায্য পায় না। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ বিলাতী মিশনারি পরিচালিত স্কুল কলেজে পাঠ করিয়া ঐ সকল স্কুলের বৈদেশিক অভিজ্ঞ ব্যায়াম শিক্ষক বা পরিচালকগণের নিকট বিভিন্ন অ্যাথলেটিকসের ক্রমোন্নতি করিবার আধুনিক কৌশলসমূহ শিক্ষা করিতে পারে। এই জন্যই তাহারা অ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন বিষয়ে বাঙালিগণ অপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শণ করিতে পারে।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত অ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা যে বাঙালী উৎসাহী অ্যাথলীটগণের আছে, ইহা আমরা প্রতি বৎসরই বলি আসিতেছি। কিন্তু বাঙলা দেশের অ্যাথলেটিকস পরিচালকগণ এতই জ্ঞানহীন যে, আমাদের এই উক্তি তাঁহাদের কো[illegible] বিচলিত করিতে পারে নাই। বিভিন্ন অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেই বাঙালী অ্যাথলীটগণ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা। শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া যে উন্নতি কোনরূপেই সম্ভব নহে, ইহা তাঁহাদের ধারণাতীত। নিয়মিত দৌড়, ঝাঁপ করিলেই কৃতিত্ব অর্জন করা যায়, ইহাই হইল তাঁহাদের বিশ্বাস। এইজন্য তাঁহাদের অনেক সময় উৎসাহী বাঙালী অ্যাথলীটগণকে বলিতে শোনা যায়, "নিয়মিতভাবে অভ্যাস কর তবেই তোমার উন্নতি হইবে।" অভ্যাস করিলে কিছু উন্নতি হয় ইহা সকলেই জানে তবে তাহাতে অভাবনীয় কৃতিত্ব অর্জন করা যায় না। ইহার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান-সম্মত ধারাবাহিক শিক্ষা অনুসরণ করা। এই সকল শিক্ষার পদ্ধতি যাঁহারা প্রচলন করিয়াছেন তাঁহারা নিজ সুনাম প্রতিষ্ঠার জন্য বা কোন খেয়াল চরিতার্থতার জন্য করেন নাই, বিশ্ব ক্রীড়া ক্ষেত্রে অ্যাথলেটিকস বিষয়ে দেশের অ্যাথলীটগণের সুনাম যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্যই তাঁহাদের বহু বৎসর বহু গবেষণার পর এই সকল ব্যবস্থা স্থির করিতে হইয়াছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেশের অ্যাথলীটগণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবে না, অপরাপর দেশের অ্যাথলীটগণের নিকট পরাজিত হইবে এই অপমানজনক অবস্থা হইতে অ্যাথলীটগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই তাঁহাদের বিভিন্ন বিষয়ের ক্রমোন্নতি করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের অ্যাথলেটিকস পরিচালকগণ এতই জাতীয়তাবোধহীন যে, এই সকল পদ্ধতি দেশের অ্যাথলীটগণের মধ্যে যাহাতে প্রচারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করেন নাই। ইহার ফলে হইয়াছে বাঙলার অ্যাথলীটগণ এই সকল শিক্ষাপদ্ধতি হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজ নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে পরাজিত ও অপমানিত হইতেছেন।

কবে ব্যবস্থা হইবে?

অ্যাথলেটিক মরসুমের পূর্বে সেইজন্য আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে, কবে শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে? বাঙালী উৎসাহী এ্যাথলীটগণ কি চিরকাল এইরূপ অপমানজনক অবস্থার মধ্যে থাকিবে? তাঁহাদিগের উন্নতির উপায় কি কোনদিনই হইবে না? পরিচালকগণের জ্ঞানচক্ষু কি কোনদিনই খুলিবে না? অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অ্যাথলীটগণকে বাঙলার প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে দিতে কি কোনদিনই তাঁহাদের লজ্জা বোধ হইবে না? বাঙলার সুনাম কি ভারতীয় অ্যাথলেটিকস ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে না? পরিচালকগণের এই উদাসীনতা দূর করিতে কি বাঙালী অ্যাথলীটগণ অগ্রসর হইবেন না? বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বাঙালী অ্যাথলীটগণকে কি অপমানজনক অবস্থার মধ্যেই দেখিতে হইবে?

সমর বার্ত্তা

৫ অক্টোবর।—

লণ্ডন এলাকায় আজও কতকগুলি বোমা বর্ষিত হয়। ক্ষতির পরিমাণ সামান্য। তবে দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলের দুইটি শহরে বোমা বর্ষণের ফলে কয়েকটি বসতবাটী ধংস ও অনেকগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কেন্টের উপকূলেও আজ তিন ঘণ্টাব্যাপী আকাশযুদ্ধ হইয়াছে।

ব্রিটিশ ডাকবাহী জাহাজ 'হাইল্যাণ্ড পেট্রিয়ট' আটলাণ্টিকে জার্ম্মন টর্পেডোর আক্রমণে নিমজ্জিত হইয়াছে। মেক্সিকোর অদূরে এক ক্যানাডিয়ান ক্রুজার 'উইজার' নামক এক জার্ম্মন মালবাহী জাহাজকে আটক করিয়াছে।

৭ অক্টোবর।—

কাল লণ্ডন তথা ইংলাণ্ড রজনী সর্ব্বাপেক্ষা নীরব ছিল, আজ পুনরায় আকাশযুদ্ধ শুরু হইয়াছে। কেণ্টের উপকূলভাগেই এই আক্রমণ প্রবল ছিল। লণ্ডনেও কয়েকটা বোমা ফেলিয়া কয়েকটা জার্ম্মন বিমান দ্রুতগতি পলায়ন করে। স্বাস্থ্য সচিব শ্রীযুক্ত ম্যালকম লণ্ডন এলাকা হইতে জনাপসারণের একটি নূতন পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ইংরেজরাও দিবাভাগেই শত্রু অধিকৃত বহু স্থানে বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিল।

টোকিওর সংবাদ—প্রাদেশিক গভর্নরদের এক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জাপ পররাষ্ট্র সচিব শ্রীযুক্ত মাৎসুওকা বলেন, ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় ইহা সূচিত হয় না যে, জাপানও ইউরোপীয় যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে। তিনি আরও বলেন, মার্শাল চিয়াং কাইশেককে সাহায্য করিতে যে শক্তিই অগ্রসর হউক না কেন, জাপান তাহাকে প্রবলভাবে বাধা দান করিবে।

বার্লিনের কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল আনটোনেস্কুকে প্রদত্ত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির শর্তানুযায়ী জার্ম্মনরা রুমানিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে।

৯ অক্টোবর।—

সাংহাইএর এক সংবাদে প্রকাশ, ইজারায় লব্ধ ব্রিটিশ দ্বীপ লিউকুংটাও দ্বীপের আশপাশে অনেক জাপানী জাহাজের আবির্ভাবে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। আরও প্রকাশ, জাপানীরা ব্রিটিশ নৌ-কর্তৃপক্ষকে তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি সরাইয়া লইতে বলিয়াছেন।

ব্রিটেনের নানা স্থানে ও লণ্ডনে জার্ম্মনদের বিমানবাহিনী হামলা করিয়া গিয়াছে। আজ লণ্ডনের কমন্স সভায় স্বাস্থ্য-সচিব শ্রীযুক্ত ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড জানান যে, বিমান আক্রমণে গৃহহীনদের আশ্রয় দিবার জন্য ব্যবস্থা সচিবের দপ্তর হইতে অনেক ঘরের যোগাড় করিয়া রাখা হইয়াছে। ব্রিটিশ বিমান-বাহিনী জার্ম্মনি ও জার্ম্মন অধিকৃত এলাকায় দিবারাত্রব্যাপী অভিযান চালাইয়াছে।

১১ অক্টোবর।—

লণ্ডন এলাকায় নাৎসী বিমানবাহিনীর ব্যাপক আক্রমণ চলিয়াছে। দুই দিনে প্রায় চল্লিশটি বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোরক ও আগুনে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ক্যাণ্টারবেরি গির্জা ও 'টাইমস' পত্রিকার সম্পাদকীয় ও পরিচালন বিভাগের দপ্তরখানা ভারী বোমার বিস্ফোরণে ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে পত্রিকা প্রকাশের কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। শ্রীযুক্ত চার্চিল এজন্য কর্তৃপক্ষকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত বেলগ্রেডের সংবাদে প্রকাশ, কৃষ্ণসাগরে চারিটি জার্ম্মন সাবমেরিন কর্ম্মতৎপর হইয়াছে। জার্ম্মন সাবমেরিন-সমূহকে বিভিন্ন দলে ভাগ করিয়া দানিয়ুব তীরবর্তী গালাজ বন্দরে প্রেরণ করা হইতেছে বলিয়াও সংবাদ রটিয়াছে।

রুমানিয়ার ব্রিটিশ রাজদূত সার রেজিনাল্ড হোর জার্ম্মন সৈন্যদের রুমানিয়া প্রবেশ সম্পর্কে রুমানিয়ার মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া প্রধান মন্ত্রী আনটোনেস্কুকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ব্রিটেন ও রুমানিয়ার সম্পর্ক সংকটজনক অবস্থায় উপনীত। যেসব ব্রিটন রুমানিয়া ত্যাগে ইচ্ছুক ব্রিটিশ দৌত্য বিভাগ অবিলম্বে তাহাদিগকে রুমানিয়া ত্যাগের নির্দেশ দিয়াছেন।

১২ অক্টোবর।—

গত রাত্রে ডোভার প্রণালীর উভয় তীর হইতে ব্রিটিশ ও জার্ম্মন কামান হইতে যুগপৎ কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া গোলাবর্ষিত হইতে থাকে। আজও লণ্ডনের উপর জার্ম্মনদের বিমান আক্রমণ হয়। চারটি জার্ম্মন ও একটি ব্রিটিশ বিমান নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। লণ্ডনের ১১ অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি লণ্ডনের একটি ভারতীয় ছাত্রাবাসে বোমা পড়ে; কেহই হতাহত হন নাই। জার্ম্মনি ও জার্ম্মন এলাকায় আগেরই মত ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর হামলা বর্তমান আছে। অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুর সহিত বার্লিনের বিদ্যুৎ উৎপাদক কেন্দ্র, গ্যাস ওআর্কস, বিমান নির্ম্মাণ কারখানা ও রেলওয়ে মালগুদামের উপর আক্রমণ চলিতেছে।

বুদাপেস্টের সংবাদ—হাঙ্গেরি-রুমানিয়া বিরোধ মিটাইয়া দিবার জন্য গভর্নমেণ্ট জার্ম্মনি ও ইতালির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করিয়াছেন বলিয়া এখানে এক ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে।

দক্ষিণ আনহুয়ে প্রদেশে ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ তীরে জাপানীদের সহিত ছয় দিন ব্যাপী সংগ্রামে চীনাদের জয়লাভের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ, প্রায় সাত হাজার জাপ সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

১৩ অক্টোবর।—

বুখারেস্টের ১২ অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, রুমানিয়ায় বিশ হাজার জার্ম্মন সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে। এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, রুমানিয়ানদের নূতন রণকৌশল শিক্ষা দিবার জনাই তাহাদের আগমন হইয়াছে। এই সৈন্যবাহিনীকে জেনারেল আন্টোনেস্কু সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

রোম রেডিওর সংবাদে মালটার নৌযুদ্ধে একটি ইতালীয় ডেস্ট্রয়ার ও দুইটি টর্পেডো বোট খোয়া গিয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

ডেটেনের সংবাদ—এক বেতার বক্তৃতায় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট প্রতিশ্রুতি দেন যে, সমগ্র পশ্চিম গোলার্দ্ধ রক্ষার জন্য মার্কিন নৌ ও বিমান বাহিনী নিয়োজিত করা হইবে। তিনি ইহাও বলেন যে, যুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে থাকিবে।

১৪ অক্টোবর।—

কৃষ্ণসাগর উপকূলের এক সোভিয়েট বন্দর হইতে কনস্টাঞ্জায় আগত এক ব্যক্তির নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, উক্ত বন্দরের সরকারী মহলের বিশ্বাস, জার্ম্মনরা রুমানিয়ার মধ্য দিয়া গ্রীসের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের আয়োজন করিতেছে। সোভিয়েট গভর্ন্মেণ্টও বেসারেবিয়ায় বহু ডিভিসন সৈন্য, কামান ইত্যাদি সমবেত করিয়াছেন। ব্রিটিশ প্রজারা বুখারেস্ট ত্যাগ করিয়াছে।

বার্লিন-রোম-টোকিও চুক্তি সম্বন্ধে মস্কোর বিখ্যাত সংবাদ পত্রগুলি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছে যে, সোভিয়েটের নিরপেক্ষতা নীতি অব্যাহত থাকিবে।

১৫ অক্টোবর।—

আজ সকাল হইতেই ঝাঁকে ঝাঁকে জার্ম্মন বিমান লণ্ডনে পৌঁছিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর প্রচেষ্টায় তাহারা দূরীভূত হয়। সোমবার রাত্রে অবশ্য জার্ম্মন বিমানবহর লণ্ডন অঞ্চলে বেপরোয়া বোমা বর্ষণ করিয়াছে। এই হামলায় নয়টি জার্ম্মন ও দশটি ব্রিটিশ বিমান নষ্ট হইয়াছে। সোমবার রাত্রে ব্রিটিশ বিমানবহরও বার্লিনে প্রবল হামলা চালায়। জার্ম্মন হাইকমাণ্ডের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটেন বিমান বহরের আক্রমণে লা-হাভর ও ডাচ এলাকার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৫ অক্টোবর।—

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য উন্নতির পথে।

প্রেসিডেন্সী জেলের কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে জেলের মধ্যে দুর্গাপূজা করিবার অনুমতি দেওয়ায় শ্রীযুক্ত বসুর আত্মীয়গণ একটি দুর্গা প্রতিমা জেলে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ভারতরক্ষা আইন।—কলিকাতা, বর্ধমান, মনিকগঞ্জ, ঢাকা, ২৪ পরগনা, কুমিল্লা প্রভৃতি নানা স্থানে ধরপাকড় খানাতল্লাশ ইত্যাদি চলিয়াছে। অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমন্ত-কুমার বসু, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী ও পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানী শ্রীরামপুর মহকুমা হাকিমের এজলাসে চলিতেছে।

৭ অক্টোবর।—

ভারতরক্ষা আইন।—কুমিল্লা, আগড়তলা, শ্রীরামপুর, চট্টগ্রাম, পেশোয়ার প্রভৃতি নানা স্থানে ধরপাকড় খানাতল্লাস ইত্যাদি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই আজ বৈকালে ওয়ার্ধা যাত্রা করিবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কবি তাঁহার মারফত মহাত্মাজীকে তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া পাঠাইয়াছেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত দেশাইকে সুভাষ-চন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলেন, এই দেখাশুনায় কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন বলিয়া মহাত্মাজীর ইচ্ছানুসারেই তিনি সুভাষচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

৯ অক্টোবর।—

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত আবুল কালাম আজাদ অ্যাসো-সিয়েটেড প্রেসকে জানাইয়াছেন যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি সাব্ কমিটি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ওই দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত উইনস্টন চার্চিল সর্ব দলের সম্মতিক্রমে পার্লামেণ্টের রক্ষণশীল দলের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী এবং প্রেসিডেন্সী জেলের অন্যান্য রাজবন্দীরা বিপুল সমারোহে দুর্গা-পূজা করিয়াছেন।

১১ অক্টোবর।—

রবীন্দ্রনাথের শারীরিক তাপ ও আনুষঙ্গিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আজ প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টাকাল আলোচনার পর ওআর্কিং কমিটির অধিবেশন মুলতবি থাকে। জানা গিয়াছে, কেন্দ্রীয় পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস যোগদান করিবে কি না এ সম্বন্ধে প্রথমত শ্রীযুক্ত আজাদ ও ভুলাভাই দেশাই-এর মধ্যে আলোচনা হইবে; পরে ওআর্কিং কমিটির বৈঠকেও এ বিষয়ে আলোচনা হইতে পারে।

নিখিল ভারত মোমিন নওজোয়ান সংঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত মহিউদ্দিন বার-অ্যাট-ল গত বুধবারে ডেহরি-অন-সোনে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাদানপ্রসঙ্গে সাড়ে চারি কোটি মোমিনের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, মুসলিম লীগের প্রতি তাঁহাদের আস্থা নাই, মুসলিম লীগ তাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব করে না।

'মাদার ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকের লেখিকা শ্রীমতী ক্যাথারিন মেয়ো নিউইয়র্কের ফোর্ড হিল্‌স্‌এ মারা গিয়াছেন।

১২ অক্টোবর।—

রবীন্দ্রনাথের শরীরের তাপ কিছু বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ উদ্বেগের সঞ্চার ঘটিয়াছে।

আজও কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির ৫ ঘণ্টাব্যাপী অধিবেশনে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট ও পরবর্তী কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মহাত্মাজীর পরিকল্পনা আগামীকাল প্রকাশিত হইবে। গুজব—সত্যাগ্রহ শুরু করিবার জন্য তিনি যে কয়জনকে বাছাই করিয়াছেন তিনি নিজেও তাঁহাদের একজন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর প্রতি কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের দণ্ড-বিধান সম্বন্ধে তীব্র নিন্দা করিয়া শ্রীযুক্ত বি সি চ্যাটার্জি, ডাক্তার চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতরক্ষা আইন।—লাহোর, শ্রীরামপুর, শেরপুর টাউন প্রভৃতি স্থানে নিষেধাজ্ঞা বিচার প্রভৃতি হইয়াছে।

১৩ অক্টোবর।—

রবীন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থা পূর্ববৎ। অবসাদের লক্ষণ এখনও বর্তমান। তবে আজ পূর্বাপেক্ষা অধিক পথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য করিবার যে পরিকল্পনা মহাত্মা গান্ধী রচনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণত অনুমোদনের পর আজ অপরাহ্নে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কেবল মহাত্মাজীরই নির্বাচিত সত্যাগ্রহী এইরূপ সত্যাগ্রহ করিতে পারিবে। এই পরিকল্পনা লইয়া মহাত্মাজী ও শ্রীযুক্ত আজাদের মধ্যে যে মতভেদ ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে শ্রীযুক্ত আজাদ সভা-পতিত্ব পর্যন্ত ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ-ভাবে দূর হইয়াছে।

চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম ক্লাব ও চট্টগ্রাম যুব ফেডারেশনের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রতি কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১৪ অক্টোবর।—

রবীন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থা আজ একটু উন্নতির দিকে। তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়া আজ নেপালের মহারাজা, ডাক্তার জেম্‌স্ ও মিসেস কাজিন্স, রাঁবাও রাজকুমার, শ্রীমতী রুথওলৎসে, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার শ্রীযুক্ত টি জি কেদার প্রমুখ বহু ব্যক্তি তার করিয়াছেন। ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের পেতালিঙ্গ নামক স্থানে বৌদ্ধ মন্দিরসমূহে রবীন্দ্রনাথের আরোগ্য প্রার্থনায় পূজাপাঠ আরম্ভ হইয়াছে।

সিন্ধুতে হিন্দুখুন আন্দোলনের ফলে করাচির খোরোনায়ে তালুকে আরও দুইজন হিন্দু নিহত হইলেন।

সিন্ধুর শিক্ষা সচিব শ্রীযুক্ত জি এন সইয়দ ২২ অক্টোবরের মধ্যেই পদত্যাগ করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

১৫ অক্টোবর।—

আজ এক বিবৃতিতে মহাত্মাজী শ্রীযুক্ত বিনোদ ভাবেকে প্রথম সত্যাগ্রহীরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। বলিয়াছেন ইহাই মহাত্মাজী কর্তৃক পরিচালিত শেষ সত্যাগ্রহ হইবে। তিনি নিজে সত্যাগ্রহী হইবেন না। আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, 'সত্যাগ্রহ বৃহস্পতিবারে ওয়ার্ধায় আরম্ভ হইবে। জানা গিয়াছে, শ্রীযুক্ত ভাবে স্বাধীন মত (প্রধানত যুদ্ধবিরোধী মত) প্রকাশের অধিকার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলে তিনি জেলে অনশন আরম্ভ করিবেন। অপর সকলে তখন তাঁহাকে অনুসরণ করিবেন। সত্যাগ্রহ বর্তমানে মাত্র মহাত্মাজী কর্তৃক নির্বাচিত ২৫ জনেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।' সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার পূর্বে মহাত্মাজী সত্যাগ্রহ সভার স্থান ও সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইবেন।

রবীন্দ্রনাথ আজ আগের চেয়ে ভাল আছেন। কলিকাতার লর্ড বিশপ আজ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

পুস্তক পরিচয়

বাঙলা ও বাঙালী—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—রসচক্র সাহিত্য সংসদ, ১১এ রাজা বসন্ত রায় রোড, দক্ষিণ কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বাঙলা দেশে সর্বজনবিদিত। বাঙলা দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক অবস্থা, বিশেষভাবে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয় যতটা চিন্তা করিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে দেশের লোককে চিন্তিত করিবার জন্য লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন, তাহার তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। নদী বিপ্লবে বাঙলা দেশ আজ কিরূপ বিপর্যস্ত, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহা দেখাইয়াছেন এবং এই বিপর্যয় হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার প্রতিও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি তিনি বারংবার আকৃষ্ট করিয়াছেন। তিনি একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক পুরুষ, দেশের সম্বন্ধে তিনি অন্তরের দরদ দিয়া ভাবেন এবং দেশের দুর্দশার প্রতীকারের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নির্ণয়ে চিন্তাশক্তিকে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। বর্তমান গ্রন্থখানি তাঁহার সেই অনুধ্যানের ফল। বাঙলার আর্থিক ও সামাজিক অধোগতিকে কিভাবে রুদ্ধ করা যায়, ইহাই হইল আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থে বাক্‌সর্বস্ব রাজনীতিকতার উচ্ছ্বাস নাই, আছে প্রকৃত কাজের কথা, বাস্তবিক এবং বৈজ্ঞানিকভাবে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বিচক্ষণতা এবং বহুদর্শিতা সহকারে প্রকৃত ব্যাধির নির্ণয় ও প্রতীকারের পন্থার সুচিন্তিত নির্দেশ। দেশের কথা বলিতে সত্যকার যাহা বুঝায়, বর্তমান গ্রন্থে আছে সেই জিনিস। দেশের সম্বন্ধে, বাঙালী জাতির সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা ভাবনা করেন, তাঁহারা সকলেই এই পুস্তক পাঠে পরম উপকৃত হইবেন।

সাধনা—সম্পাদক ঃ—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চৌধুরী। ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। প্রতি সংখ্যা ৵০।

সাহিত্য সেবার একনিষ্ঠ প্রয়াস এই পত্রিকাখানির সম্পাদনায় সুপরিস্ফুট। লেখকগণ খ্যাতনামা না হইলেও লেখনীর ক্ষমতার সাক্ষ্য দেয়। আলোচ্য সংখ্যায় লিখিয়াছেন—শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীশান্তি চক্রবর্তী, আশালতা দেবী, শ্রীঅমরনাথ গুপ্ত, শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। অমরা পত্রিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅরবিন্দ (জীবন কথা)—শ্রীপ্রমোদকুমার সেন। আর্য পাবলিশিং হাউস, ৬৩নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

প্রমোদবাবুর হাত বেশ পাকা, তাঁহার লেখায় মুন্সিয়ানা আছে, অল্প-বয়স্ক বালক বালিকাদের জন্য তাঁহার এই বইখানি লেখা ; সরল ভাষায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর এই জীবনকথা পাঠে ছেলেমেয়েদের চিত্ত উন্নত হইবে। শ্রীঅরবিন্দের বৈচিত্র্যময় জীবনকথা, প্রমোদবাবুর পাকাহাতের পরিবেশন, ছেলেমেয়েরা এমন বই পাইলে খুশী হইবে নিশ্চয়ই।

শনি-রবি-সোম (উপন্যাস)—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক চিত্রা পাবলিশিং কোং হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

বাঙলা সাহিত্যে দ্বিজেনবাবু নবাগত হইলেও ইতিমধ্যে ইঁহার অনেকগুলি গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান উপন্যাসের বিষয় বস্তু পল্লী ও শহরের অঙ্গাঙ্গীভাব সম্পর্ক। শহর প্রবাসী চাকরিজীবীদের যেভাবে দৈনন্দিন জীবন কাটে, যে ভাবে তাহারা কলিকাতার জনরোলে ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া মানুষ হয় তাহা লেখক সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

তরুণ লেখকের অনেকগুলি দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বইখানি বাঙালী পাঠক সমাজে আদৃত বলিয়া মনে হয়। বইখানি আগাগোড়া জমিয়াছে ভাল। ছাপা, বাঁধাই ভাল হইয়াছে।

৭ম বর্ষ] ৯ই কার্তিক শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 26th October, 1940. [৪৯ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীবিনোবার সত্যাগ্রহ—

সত্যাগ্রহের পঞ্চম দিবসের প্রভাতে শ্রীযুত বিনোবা ভাবে গ্রেপ্তার হন, ওয়ার্ধার ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে তিনি তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। শ্রীবিনোবা চারি দিন বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহার বক্তৃতার সবটা আমরা পাই নাই। পাইবার জন্য বিশেষ কোন আগ্রহ বা না পাওয়ার জন্য বড় কিছু আপসোসও যে স্বাধীনতাকামী ভারতের ছিল

ইহা মনে হয় না। গ্রেপ্তার হইবার পূর্ব্ব দিনও শ্রীবিনোবা এই প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার ভাষা যেন মধুর হইতে মধুর, মোলায়েম এবং মৃদু হইতে মৃদুতর হয়। তাঁহার কথার মধ্যে তিক্ততার লেশমাত্র না থাকে ভগবান তাঁহাকে যেন এমন শক্তি দেন। এমন মধুর, মোলায়েম ভাষায় ওয়ার্ধার সুদূর পল্লীর কোন নিভৃত অঞ্চলে শ্রীবিনোবার বক্তৃতা কর্তৃপক্ষকে কেন বিচলিত করিল বুঝা কঠিন। শ্রীবিনোবার পরে কে সত্যাগ্রহী হইবেন জানা যায় নাই। মহাত্মাজী জানাইয়া দিয়াছেন যে, সেজন্য তাড়াহুড়া তিনি করিবেন না। যাঁহারা অহিংসার প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ চরকা ও খদ্দরে বিশ্বাসী নহেন এবং যাঁহারা অহিংসার সুস্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ অস্পৃশ্যতা বর্জন ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনে বিশ্বাসী নহেন, এরূপ কোন ব্যক্তিকে তিনি ডাকিবেনই না। শ্রীবিনোবার সত্যাগ্রহের ফল মাপিতে চাহেন মহাত্মাজী চরকা ও খাদি, অহিংসা প্রভৃতি বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক মনোভাব দেশের লোকের মধ্যে বিস্তারের পরিমাপে। মহাত্মাজী এই উপায়কে অসাধারণ উপায় নিজেই বলিতেছেন; তাঁহার মতে ইহার ফলে ইউরোপে এবং পৃথিবীর সমস্ত অশ্বেত জাতিগুলির মধ্যে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এ সমস্তই ব্যক্তির অনুভূতিলব্ধ ভাবরাজ্যের ব্যাপার। সকলে এ দৃষ্টি পায় না কিন্তু রাজনীতির কাজ সমষ্টির স্থূলে স্বার্থকে জড়াইয়া। সুতরাং গান্ধীজীর এই ধরনের আধ্যাত্মিকতা সাধারণের পক্ষে প্রহেলিকাবৎ। অহিংসার এমন ঊর্ধ্ব স্তরে মানুষকে তুলিবার ব্রত যিনি লইয়াছেন, বাস্তব দুঃখে প্রপীড়িত একটা পরাধীন জাতির রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্য নেতৃত্ব করা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা বলিয়াই আমরা মনে করি।

মহাত্মার নীতিতে কৌশল—

মহাত্মাজীর সকল কার্যের মধ্যেই রাজনীতির গূঢ় উদ্দেশ্য ধরিতে পারেন, এমন দিব্যদৃষ্টি যাঁহাদের আছে তাঁহারা বলিতেছেন, মহাত্মাজীর অবলম্বিত নীতির মহিমা তোমরা বুঝিতেছ না, উহার মধ্যে বড় একটা রাজনীতিক চাল রহিয়াছে। মহাত্মাজী নিজে অবশ্য এই কূট কৌশলের কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু তবু আমরা কৌশলটি ধরিবার চেষ্টা কম করি নাই। তাহাতে আমরা এটুকু বুঝিয়াছি যে, যে মানুষ যত নরম, মোলায়েম, অন্য কথায় নিতান্ত নিরীহ হইয়াছে সেই সত্যাগ্রহের উপযোগী।

এমন মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখিলে অতি বড় পাষাণ যাহাদের অন্তঃকরণ তাহারাও গলিয়া পড়িবে আর সেই দয়ার গুণে অধিকারকে স্বীকার করিবে। মহাত্মাজী নিজে এই কথাই সেদিন বলিয়াছেন। তিনি বলেন, জেল ভর্তি করা আমার উদ্দেশ্য নয়, চোর ডাকাতের দ্বারা জেল ভর্তি হইয়াই আছে। সত্যাগ্রহ করিতে হইলে শ্রীবিনোবার ন্যায় খাদি তকলিতে নিষ্ঠাবান এবং শুদ্ধ অহিংসাচারী হওয়া দরকার। আধ্যাত্মিক ভাষ্য করিলে এই উক্তির তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, প্রতিপক্ষের অন্তরে দয়ার ভাব জাগাইবার ন্যায় নম্রতা এবং দীনতাই সত্যাগ্রহে প্রধান শক্তি। নেহাৎ ভাল মানুষের কষ্ট হইতেছে, এমন দেখিয়া মানুষের পশু প্রবৃত্তি লোপ পাইয়া তাহার স্বরূপানুবর্ত্তী মানবতা স্ফুরিত হইবে ইহা মহাত্মাজীর বিশ্বাস। কিন্তু জগতের ইতিহাস ইহার সত্যতায় সাক্ষ্য দেয় না। পোল্যান্ড, আবিসিনিয়ায় নিরীহের অশ্রুধারা কম বহে নাই; কিন্তু পশুবল নির্মমভাবে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। শুদ্ধ প্রেমিকের বেদনার সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পন্দন বিশ্বজগতের মধ্যে সাড়া হয়ত দিতেছে, কিন্তু সে সাড়া আদর্শরূপে মুষ্টিমেয়কেই উচ্চ মানবতার দিকে আকর্ষণ করে, বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে সে সাড়া সম্প্রসারিত হইয়া আকস্মিক কোন পরিবর্তন ঘটাইবে সমষ্টি মানব এখনও এমন উচ্চ স্তরে উঠে নাই। প্রেমিকের বেদনাকে রূঢ়তায় মনের কোণে চাপা দিয়া পশুশক্তি জগতে কাজ করিতেছে এবং আরও কতদিন করিবে কেহ বলিতে পারে না। মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহের নীতি মুষ্টিমেয় ভাবুক এবং অধ্যাত্মবাদীদের দৃষ্টিতে মহাত্মাজীকে শ্রদ্ধার্হ করিয়া তুলিতে পারে বড় জোর এই পর্যন্ত। মহাত্মাজী এমন শ্রদ্ধার ভিখারী নহেন, তাহা আমরা জানি; ফল দাঁড়ায় যাহা তাহাই বলিতেছি। এই দিক হইতেই বলিব মহাত্মাজীর এই নীতির প্রয়োগপদ্ধতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে ভারতের রাজনীতিক স্বাধীনতার কোন সম্পর্ক নাই, অবশ্য ভারতের সমস্যা এত ব্যাপক যে, এ নীতিরও ব্যাখ্যা ভাষ্য করিয়া পরোক্ষে দাঁড় করান যায় অনেক কিছুই; কিন্তু কংগ্রেসের লক্ষ্য প্রত্যক্ষভাবে ভারতের স্বাধীনতা।

কংগ্রেস কি করিবে—

কংগ্রেস তবে কি করিবে? মহাত্মাজী তবু তো একটা আধ্যাত্মিক সুর চড়াইয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতের মতদ্বৈধকে জগতের মরমীদের মর্মদেশে জিয়াইয়া দিতেছেন। অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বন করিলে যে কংগ্রেস মরিয়াই যাইবে, কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, এমন কথা যাঁহারা বলিতেছেন, তাঁহাদের উক্তি আমরা সমর্থন করিতে পারি না। কোন প্রতিষ্ঠান মরে তখনই যখন তাহার আদর্শ নষ্ট হয়। কংগ্রেসের আদর্শ আধ্যাত্মিকতা জগতে প্রচার করা নহে, তাহা হইল ভারতের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। মহাত্মার নীতির ফলে স্বাধীনতার সেই লক্ষ্য যদি পরোক্ষ হইয়া বাস্তব স্বার্থের সংযোগ ছাড়িয়া অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম রাজ্যের রহস্যে নিহিত হয়, তাহা হইলেই কংগ্রেস মরিবে। আধ্যাত্মিকতার অনুভবপ্রবণ মহাপুরুষদের দ্বারা যদি ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইত তবেই মহাত্মার এই নীতির সার্থকতা কংগ্রেসের দিক হইতে কিছু থাকিত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বস্তুতান্ত্রিক স্থূল বিষয়ী ব্যক্তিদের দ্বারা, সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার বেদনা তাহাদিগকে বিচলিত করিবে, এমন আশা করা বৃথা।

সত্যাগ্রহের দার্শনিকতা—

মহাত্মা গান্ধী মানুষের ঐকান্তিক মহত্ত্বে বিশ্বাসী। সমবেদনাকে জাগ্রত করিয়া স্বার্থসংস্কারসমাচ্ছন্ন জড়ত্বের পর্দাটা কাটিয়া ফেলিতে পারিলেই সে আপন মহত্ত্বে জাগ্রত হইবে এবং সত্যকে স্বীকার করিয়া লইবে আত্যন্তিক ঔচিত্য-বোধের বিকাশে, মহাত্মাজীর এই বিশ্বাস। সত্যাগ্রহের অন্তর্নিহিত এই দার্শনিকতা মহাত্মাজী আজ যেমন সূক্ষ্মতাত্ত্বিকতার স্তরে লইয়া তুলিয়াছেন, এতদিন পর্যন্ত তেমন করেন নাই। তাঁহার এতদিনকার সত্যাগ্রহের মূলে জনসমষ্টির স্থূল ক্রিয়াত্মক একটা দিক থাকিত। সেই স্থূল কাজের এমন একটা দিক থাকিত, যাহা অহিংসার খাত ধরিয়া উঠিলেও প্রবলের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এখন তাহা আর নাই—বরং তাহার বিপরীত সুরই তিনি ধরিয়াছেন। চরকা ও খাদির প্রচার-মূল্য ইহাতে আছে আমরা স্বীকার করি; কিন্তু জনকয়েকের তৃণাদপি সুনীচতার সূক্ষ্ম তারের টানে জগৎ হইতে হিংসা বিদ্বেষ উঠিয়া যাইবে এবং ফাউ স্বরূপে ভারতের স্বাধীনতাটাও আসিবে—এমন পন্থার বৈজ্ঞানিকতা আমাদের মত স্থূলবুদ্ধির লোকের বুদ্ধির অগম্য। সোজাসুজি মডারেটী আবেদন-নিবেদন, কাঁদাকাটি ইহা আমরা বুঝি; কিন্তু মহাত্মাজীর এই পন্থার অন্য কোন বিশিষ্ট মূল্য যে রাজনীতির দিক হইতে আছে ইহা বুঝি না।

বাঙলার জবাব—

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে সর্দার বল্লভাচারী পরিচালিত কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী কমিটি যে দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন, বাঙলাদেশ তাহার জবাব দিয়াছে এবং সমুচিতভাবেই দিয়াছে। বাঙলার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মিগণ এবং বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিসমূহ তীব্র ভাষায় উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বাঙলার সর্বত্র বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। এড হকী দল এবং বল্লভাচারী রীতির সমর্থকগণের সাহসে কুলাইতেছে না যে, এই প্রবল জনমতের সম্মুখীন হন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, বাঙলার জনমত আর এই ধরনের জবরদস্তি বরদাস্ত করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। বল্লভাচারীর জোটবাঁধা দলই কংগ্রেস নহেন, তাঁহাদের হাতে পড়িয়া কংগ্রেসের আদর্শ বিনষ্ট হইতেই বসিয়াছে। কংগ্রেসকে প্রাণশক্তি দিয়াছে এই বাঙলা, কংগ্রেসের আদর্শের অমর্যাদা বাঙালী বরদাস্ত করিবে না। ভারতের স্বাধীনতার সাধনাকে

সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সুদৃঢ় সংকল্পশীলতার সঙ্গেই আজ বাঙলা অগ্রসর হইবে।

শিক্ষা বিলে সুবুদ্ধি—

খবরটা কতদূর সত্য আমাদের সন্দেহ আছে। তবে শুনিতেছি যে, বাঙলা সরকার নাকি মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী পক্ষীয় সদস্যদিগকে লইয়া একটি সভা করিবেন ঠিক করিয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষা বিল সম্বন্ধে যে সব মতামত পাইয়াছেন, সেই সব মতামতের সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া উভয় পক্ষের সম্মত একটা সিদ্ধান্তে পেঁছানই নাকি এই সভার উদ্দেশ্য হইবে। এমন বৈঠক হইতে পারে, অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু বৈঠক করিলেই সব হইবে না। শিক্ষা বিলের অন্তর্নিহিত অনিষ্টকারিতার সংস্কার করিবার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করিয়া বৈঠক ডাকিলে, তবে তাহার সার্থকতা থাকিতে পারে। শিক্ষা বিল সম্বন্ধে বাঙলার জনমত জানিতে বাকী নাই। দেশের শিক্ষাব্রতীমাত্রেই উহার বিরুদ্ধতা করিয়াছেন এবং ব্যাপক প্রতিবাদের আকারে বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অভিব্যক্ত হইয়াছে। হক মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে জোটবাঁধা দল রহিয়াছে। ভোটের দিক হইতে তাঁহারা নিরাপদ, শিক্ষার স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া ভোটের দিকে তাকাইয়া যদি বৈঠক করা হয় তবে তেমন বৈঠক না করাই ভাল। আর শিক্ষার স্বার্থের দিকে তাকাইয়া যদি বৈঠক আহ্বান করা হয়, তাহা হইলে বিলটি প্রত্যাহার করাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে এবং বিলের বিরোধীপক্ষ যে সব প্রস্তাব করিবেন, তাহাতে দাঁড়াইবে তাহাই। দুই একটি ধারার পরিবর্তন করিলেই বিলের অনিষ্টকারিতা দূর হইবে না। উহার আগাগোড়া বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থবাদীদের সন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া শিক্ষার প্রকৃত স্বার্থ দেখিয়া কাজ করিবার মত তেমন সাহস মন্ত্রীদের আছে কি?

কারণ কি—

বিচারাধীন বন্দীকে অপরাধী বলিয়া আইনের দৃষ্টিতে গণ্য করা হয় না; কিন্তু আমলাতান্ত্রিক আমলে রাজনীতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এদেশে চোর-ডাকাতেরও অধম বলিয়া একদিন গণ্য করা হইত—এখন দেখিতেছি হক মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে ভারতরক্ষা আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিও সেইরূপ আচরণ হইতেছে। শ্রীরামপুরের ছাত্রনেতা শ্রীযুক্ত গৌর গাঙ্গুলীকে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। ভারতরক্ষা আইনের যখন অভিযোগ, তখন গাঙ্গুলী মহাশয় সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতির জীব হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? সুতরাং তাঁহার হাতে হাতকড়া লাগান হয়, কিন্তু জ্বরে তিনি যখন শয্যাশায়ী অবস্থায় শ্রীরামপুর হাসপাতালে তখনও খাটের সঙ্গে তাঁহার হাতে হাতকড়া দিয়া তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিবার তাৎপর্য কি? জ্বরে শয্যাগত যে, সে ভারতরক্ষার এমন কি বিপর্যয় ঘটাইতে পারিবে, যাহার জন্য এই আশঙ্কা! বিচারাধীন বন্দীর প্রতি এমন ব্যবহার অস্বাভাবিক, পীড়িত অবস্থায় শয্যাশায়ী লোককে এইভাবে রাখা নিষ্ঠুরতা, আমরা জিজ্ঞাসা করি এইরূপ আইন বিগর্হিত এবং নিষ্ঠুর আচরণের জন্য দায়ী কে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপর্যয় আশঙ্কায় উদ্বেলিত কোন্ চিত্তের উৎকট আগ্রহাতিশয্যের এই পরিণতি? বাঙলার স্বরাষ্ট্রসচিব সার নাজিমউদ্দীন অবিলম্বে এসম্বন্ধে তদন্ত করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন আমরা এখনও এই আশা করিতেছি। আইনের মর্যাদা রক্ষার নামে আইন ভঙ্গ করিবার অধিকার বাঙলা দেশে রেওয়াজ হইবে কি না স্বরাষ্ট্রসচিব মহোদয়ের এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত।

বর্ধমানে বিসর্জনে বাধা—

বর্ধমানে গত বৎসর দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন লইয়া একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ বৎসরও সেই সমস্যা দেখা দিয়াছে। এবারও প্রতিমা বিসর্জন এ পর্যন্ত হয় নাই। পূজার উদ্যোক্তাগণ যথারীতি লাইসেন্স লইতে প্রস্তুত ছিলেন। মসজিদে প্রার্থনার নির্দিষ্ট সময় বাদ দিয়া বিজয়ার শোভাযাত্রা বাহির করিতেও তাঁহারা রাজী ছিলেন; কিন্তু সরকারপক্ষ তাহাতে সম্মত নহেন। সরকার পক্ষ চাহেন যে, যে পথে মসজিদ আছে সে পথ দিয়া প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা হইতেই পারিবে না। মুসলমানদের ধর্মানুষ্ঠান যাহাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য রাজপথ দিয়া গতিবিধির অধিকার সাময়িকভাবে সঙ্কুচিত করিতে হিন্দুরা রাজী ছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে সে অধিকার সঙ্কোচে সন্তুষ্ট নহেন, রাজপথ বিশেষে হিন্দুর অবাধ গতির অধিকার তাঁহারা স্থায়ীভাবে খর্ব করিতে চাহেন। বাঙলা সরকারের এই নীতি অদ্ভূত এবং অভিনব। পথ বিশেষে মসজিদ আছে বলিয়াই সে পথ দিয়া কখনই শোভাযাত্রাসহ যাওয়া যাইবে না, এই মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি বিংশ শতাব্দীতে অচল। এই অদ্ভূত বিধান কেবল হিন্দু নহে, সকল সম্প্রদায়ের মনেই প্রতিকূলতা জাগাইবে। এমন নীতির প্রতিবাদ করিবে সকলেই। পাকিস্থান প্রস্তাব এখনও শূন্যে ঝুলিতেছে। হক মন্ত্রিমণ্ডল যদি আজ সেই প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত নীতি, অর্থাৎ মুসলমানের এক রাজ্য, হিন্দুর অন্য রাজ্য, মুসলমানের এক পথ, হিন্দুর অন্য পথ, এমন নীতি কার্যে পরিণত করিতে চাহেন, তাহার প্রতিক্রিয়া ব্যাপক আকার ধারণ করিবে। বাঙলা সরকারের বুঝা উচিত যে, হিন্দু এবং মুসলমান দুইয়েরই স্বার্থ, অধিকার আছে যে দেশে সেই দেশে তাঁহারা রহিয়াছেন এবং উভয়ের স্বার্থ এবং অধিকার বজায় রাখিয়াই তাঁহাদিগকে চলিতে হইবে। হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানের গুরুত্ব মুসলমানের চেয়ে কম কিছু নয়। মুসলমান পক্ষের গোঁড়ামি অসঙ্গতভাবে প্রশ্রয় পাইলে হিন্দুদের যে অন্যায় উৎপীড়ন হইবে, দেশের কোন কল্যাণকামীই তাহা সমর্থন করিবে না। হক মন্ত্রিমণ্ডল সুবে বাঙলার কর্তৃত্বের মোহে এ সত্য বিস্মৃত হইবেন না, ইহাই আমরা আশা করি।

ভারতীয় সমস্যা ও বড়লাট—

ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য বড়লাট লর্ড লিনলিথগো যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমেরিকার 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্র তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ভারতের জাতীয়তাবাদীরা এই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, ভারতের যখন স্বাধীনতা নাই, গণতন্ত্রও নাই, তখন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য ব্রিটেন যে যুদ্ধে লিপ্ত, তাহাতে আমাদের সাহায্য করিবার কি কারণ আছে? বহু বৎসর হইতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের জন্য ভারতবর্ষ দাবি করিয়া আসিতেছে, কিন্তু সে প্রস্তাব কেবল পিছাইয়াই দিতেছে। আজ ইটালি সোমালিল্যান্ড দখল করিয়াছে, এডেনে শত্রুর আশঙ্কা প্রবল, এ সময় ভারতের সাহায্যের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। লর্ড লিনলিথগোর উক্তির পরে ভারতের সাহায্যের আশা খুব আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে না।" আমেরিকার একখানা বিশিষ্ট সংবাদপত্র যে মত প্রকাশ করিতেছেন, ব্রিটিশ রাজনীতিক ধুরন্ধরেরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য—

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের অবস্থা দিন দিনই উন্নতি লাভ করিতেছে এই সংবাদে দেশের সর্বত্র আস্বস্তি দেখা দিয়াছে। দুর্বলতা এখনও খুবই আছে, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলে তিনি অচিরেই পূর্ব স্বাস্থ্য লাভ করিবেন এবং তাঁহাকে কলিকাতার বাহিরে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে লওয়া হইবে, চিকিৎসকগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙলার সম্পদ নহেন, তিনি বিশ্বমানবের সম্পদস্বরূপ—তিনি পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া বাঙলার সেবা করুন এবং বিশ্বমানব সংস্কৃতিকে নিজের অবদানে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলুন। বর্তমান পশুবলে প্রপীড়িত জগতে তাঁহার ন্যায় মনীষীর জীবন সঞ্জীবনী রসধারা সঞ্চার করিবে।

আধ্যাত্মিকতা ও রাজনীতি—

কিছুদিন হইল, কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, সেবাধর্মই চরম আধ্যাত্মিকতা। ধর্মের দোহাই আমরা অনেকেই দিই; সেবাধর্মরূপ স্রোতস্বিনীর প্রবাহ এ দেশে অতি মন্দ। ধর্ম কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানের নামে মাত্র দাঁড়াইয়াছে। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেন, বর্তমান যুগে শাস্ত্রমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সময়ের উপযোগী করিয়া সেবাধর্মকে স্থাপন করিয়া আমাদের শাস্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে। মানব সেবার ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক জীবনীশক্তি এই মৃত জাতির মধ্যে বহাইবার বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন বাঙলার বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। সভাপতি স্বরূপে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, স্বামীজীর নির্দ্ধারিত পথে ভারতে জাতীয় পুনরুত্থান সম্পূর্ণ সম্ভব। আমাদের নিজেদের বলিতে হইলে আমরা বলিব উহাই একমাত্র পথ। রাজনীতির বড় বড় সূত্র আওড়াইলে চলিবে না, দেশের দীন দরিদ্র, উপেক্ষিতের বেদনা আমাদের মধ্যে যাহাতে সত্য হইয়া উঠিবে, ভারতের রাজনীতিক মুক্তির পথ আসিবে সেই আধ্যাত্মিকতার পথে। সেই গভীর সমবেদনাকেই আমরা বলিব আধ্যাত্মিকতা। ইহাকে অবশ্য অন্য নাম দিলে ক্ষতি নাই; কিন্তু প্রয়োজন সেই জিনিসের। আজ বন্যাপীড়িত মেদিনীপুর হইতে লক্ষ লক্ষ নর নারীর করুণ আর্তনাদ উঠিয়াছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আকুল কণ্ঠে দেশবাসীর নিকট আর্তের রক্ষার জন্য অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। আমাদের আধ্যাত্মিকতা সার্থক হউক এই সেবাধর্মের ভিতর দিয়া। যাহার যথাসাধ্য দরিদ্রকে রক্ষার জন্য প্রদান করুন। দেশের দরিদ্রের এই বেদনা গভীর হইলে তবে আসিবে স্বাধীনতা। আমরা বুঝিব যে, এই দুঃখকষ্ট হইতে দেশবাসীকে স্থায়ীভাবে মুক্ত করিতে হইলে আবশ্যক স্বাধীনতার। ত্যাগ ব্যতীত স্বাধীনতা আসে না এবং সেই চরম ত্যাগের ভিত্তি হইল আত্মীয়তার একান্ত অনুভূতি, ধার করা রাজনীতির সূত্র সেক্ষেত্রে বড় নয়। পথ আপনা হইতেই পাওয়া যায় যদি থাকে প্রকৃত প্রেম, প্রগাঢ় ভালবাসা; অল্প কথায় স্বার্থের সংকীর্ণ দৃষ্টি ছাড়িয়া ধার্মিকতা তখনই আমাদের আর কথায় ফাঁকা থাকিবে না, আত্মায় তাহা হইবে প্রতিষ্ঠিত।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ্রাস—

যুদ্ধের প্রারম্ভেই সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে, সেগুলি এত ব্যাপক যে, সেগুলির প্রয়োগের দ্বারাই যে কোন সংবাদপত্রকে দলন করা যাইতে পারে। সংবাদপত্রের প্রকাশ্য বস্তুর উপর খবরদারি করিবার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের আগেও ছিল, সম্প্রতি ভারত গভর্নমেণ্ট ভারত রক্ষা আইন সংশোধক দুইটি ধারায় এই ক্ষমতা আরও ব্যাপক করিয়াছেন। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহ এবার নিরঙ্কুশভাবে যে কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ্য সকল বস্তু গভর্নমেণ্টের তদারকির জন্য দাখিল করিবার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন। অধিকার যেখানে ব্যাপক এবং অবাধ সেখানে তাহার অপপ্রয়োগ হইবার সম্ভাবনা ষোল আনা রহিয়াছে। এইরূপ অবাধ ক্ষমতা প্রবর্তনের ফলে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কার্যের সমালোচনার অধিকার সংবাদপত্রগুলির ক্ষুণ্ণ হইল একথা বলিলে ভুল বলা হইবে না। এমন ব্যাপক বিধানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি সন্দিগ্ধ থাকেন, তবে তাঁহাদের মতে বেফাঁস এমন বিষয় বাহির করা তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন হইবে না। এই অবস্থায় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখাই অসম্ভব হইয়া উঠিবে। সেগুলিকে সরকারী বুলেটিন হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

বলকান হইতে কোন্ দিকে?

অন্য কেহ নহে, স্বয়ং ব্রিটিশ সমর-সচিব মিঃ ইডেন মিশরে গিয়া মধ্য প্রাচ্যের প্রধান সেনাপতি জেনারেল স্যার্ আর্চিবল্ড ওয়াভেলের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ফিরিলেন। মিঃ এডেনের এই মিশর গমনের গুরুত্ব আছে স্বীকার করিতেই হইবে এবং ইতালি ও জার্মানির ভবিষ্যৎ রণনীতির সহিত এই গুরুত্ব বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। ইংলণ্ডে জার্মান বিমান বহরের অভিযান এবং ব্রিটিশ বিমান বহর কর্তৃক জার্মানিতে অভিযান, যুদ্ধের এই গুরুত্বের দিকটা ছাড়া বল্কানে জার্মানির নীতি বর্তমান সংকট জটিল করিয়া তুলিয়াছে। জার্মানি রুমেনিয়া দখল করিয়া লইয়াছে। শীত-কাল আসিয়া পড়িল; কুয়াসা প্রভৃতির জন্য ইংলণ্ডে বিমান আক্রমণে জোর দেওয়া সহজ হইবে না; অথচ হিটলার যে অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বসিয়া থাকবার উপায় নাই। জার্মান রণ-নীতি সে ধাঁচেরই নয়। নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া হিটলার ভূমধ্য-সাগরের দিকে এইবার দৃষ্টি দিয়াছেন। তিনি জানেন যে, এই ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগ এবং সমুদ্রপথ দিয়া ব্রিটিশ জাতির সাম্রাজ্য স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার লক্ষ্য হইল মিশর এবং এসিয়ার পশ্চিম সীমার দেশসমূহ। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য হিটলার তিনটি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, প্রথম বলকানের ভিতর দিয়া এসিয়ার উপকূল-ভাগে প্রবেশ, দ্বিতীয় জিব্রাল্টার দখল করিয়া স্পেনীয় এবং ফরাসী অধিকৃত মরক্কোর ভিতর দিয়া আফ্রিকায় হানা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য হিটলার প্রয়োজন হইলে পোল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সকে যেভাবে দখল করিয়াছেন, সেইভাবে প্রতিবাসী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের নিরপেক্ষতাকে ভঙ্গ করিতে দ্বিধা করিবেন না, একথা বলাই বাহুল্য। উত্তর আফ্রিকায় জার্মান অভিযান করিবার আড়াআড়ি পথ হইবে জিব্রাল্টার দখল করা; এ পথে পড়িবে স্পেন; কিন্তু স্পেনের অবস্থা এমন নয় যে সে জার্মানিকে বাধা দিতে পারে। স্পেনের বর্তমান ডিরেক্টর জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মতিগতি তো বরাবরই জার্মানি এবং ইতালির পক্ষে আছেই। এতদিন পরে ক্যাটালোনিয়ার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট কম্পানিসের ন্যায় বিশিষ্ট রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীকে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর হাতে ফ্রান্সের ভিচি গভর্নমেন্ট সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে যে জার্মানির চাপে পড়িয়াই—ইহা বেশ বুঝা যায়। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর হাতে পড়িয়া কম্পানিসকে প্রাণ দিতে হইয়াছে। যে ফরাসী এতদিন মানবের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় মতকে মর্যাদা দিয়াছে, তাহার এমন দুর্দশায় কাহার না দুঃখ হয়। স্পেনের সঙ্গে হিটলারের খাতির আছেই; এবং দরকার হইলে ফ্রান্স হইতে তিনি স্পেনের ভিতর দিয়া জিব্রাল্টারের দিকে সেনা পাঠাইতে পারেন। জিব্রাল্টারের সঙ্কীর্ণ জলপথ পাড়ি দিয়া জার্মান সেনা যদি উত্তর আফ্রিকায় প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে, একদিকে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলস্থ ফ্রান্সের সিনেগালস্থ ডাকার তাহারা হাত করিতে পারিবে। ডাকার

নৌ এবং বিমান বহরের ভাল ঘাঁটি। এই জায়গা দখল করিলে হিটলার ব্রিটিশের নৌ-গতিবিধি আতঙ্কিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন। তাহা ছাড়া জার্মান বাহিনী ফরাসী মরক্কোর ভিতর দিয়া তাহা হইলে লিবিয়া এবং মিশরের দিকে অভিযানের সুবিধা করিবে। অবশ্য হিটলারের এই উদ্যম কার্যে পরিণত করিতে হইলে ভূমধ্যসাগরস্থ ব্রিটিশ নৌ-বহর, জিব্রাল্টারের সামরিক ব্যূহ এসব বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু সে সব অন্তরায়ের সম্মুখীন হইয়াই হিটলার এই উদ্যমে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন বোধ করিতে পারেন।

মিশর আক্রমণের দিকে ঝোঁক জার্মানির ষোল আনাই আছে। আপাতত কিছু দিন হইল মিশরের দিকে ইতালির অগ্রগতি স্থগিত আছে; কিন্তু ইহা হইতে এমন বুঝা যায় না যে, তাহারা সে চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে। করাচী হইতে ৪ শত মাইল দূরে পারস্য উপসাগরের বাহেরিণ দ্বীপে ইতালির বিমানবীরেরা বোমা ফেলিয়াছে। সম্ভবত

তাহারা যেটুকু আগাইয়াছে সেটুকু পর্যন্ত পথ-ঘাট পাকা করিয়া লইতেছে। জার্মানি এই কার্যে ইতালিকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। জার্মানি ইতালি হইতে লিবিয়ায় আসিতে পারে, এবং লিবিয়ায় ইতালিয়ানদের সঙ্গে যোগ দিয়া জিব্রাল্টারের দিকে না গিয়াও মিশর আক্রমণে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু এইভাবে লিবিয়ায় না গিয়াও সিসিলি হইতে ফরাসী অধিকৃত টিউনিসে সেনা নামাইতে পারে। ভিচি গভর্নমেন্ট তো তাহার হাতের মুঠার মধ্যে। মার্শাল গ্রাৎসিয়ানিকে লিবিয়া হইতে মুসোলিনি সরাইবেন শুনিতেছি। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ব্রেনার গিরিসঙ্কটে কিছুদিন পূর্বে হিটলারের সঙ্গে মুসোলিনির যে মুলাকাত হয়, তিনি তখন মিশরের দিকে ইতালির অভিযানের শৈথিল্যের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। একদিকে ইতালির উপর ভর দিয়া উত্তর আফ্রিকায় অভিযান, অন্য দিকে বলকানের ভিতর দিয়া বুলগেরিয়া দখল করিয়া গ্রীসকে কোণঠাসা করিয়া সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আরব প্রভৃতি স্থানে প্রভাব বিস্তার করা, হিটলারের এমন সঙ্কল্প আছে। অবস্থার এই সব গুরুত্বের দিক বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যেই যে মিঃ ইডেন মিশরে গিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিশর এখনও জার্মানি বা ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই, ইহার কারণ যাহাই থাকুক, ইংরেজ মিশরে জার্মানি বা ইতালি প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে দিতে পারে না এবং ইঙ্গ-মিশর চুক্তি অনুসারে মিশরে ইংরেজ সামরিক রক্ষা ব্যবস্থা করিবার অধিকারও রাখিয়াছে।

ইতালি হইতে যে খবর আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, ট্রেন বোঝাই জার্মান সৈন্য ইতালি হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়াছে। তাহারা লিবিয়ার দিকে যাইতেছে বলিয়া সামরিক বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস। 'আনন্দবাজার পত্রিকার' নিজস্ব সংবাদদাতা বলিতেছেন, এই সেনাদলের উদ্দেশ্য হয় মিশরে অভিযান চালানো, নয়, টিউনিস ও আলজিরিয়ার মধ্য দিয়া আফ্রিকার উপকূলে সেই সকল ঘাঁটি দখল করা যেগুলি আমেরিকার বিরুদ্ধে জার্মানি ও ইতালির আত্মরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লিবিয়াতে ইতালির যে সব সৈন্য আছে মিশরে ব্রিটিশের সম্মুখীন হইবার মত শক্তি তাহাদের আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন না। প্রথমত মিশরে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই চালাইতে হইলে ভাল মোটরচালিত সুদৃঢ় সাঁজোয়া গাড়ির বহর এবং উপযুক্ত বিমানবহর আবশ্যক। কিন্তু জার্মানেরা যদি লিবিয়ায় ঢুকিতে পারে, তাহা হইলে ইতালীর সেনাদলের এই ত্রুটী তাহারা পরিপূরণ করিতে চেষ্টা করিবে। ইতালীয় সেনাদলের ঐ ত্রুটী যে আছে তাহা বেশই বুঝা যায়। কারণ তাহা না হইলে ঝটিকার গতিতে তাহারা মিশরের উপর হানা দিতে চেষ্টা করিত। ইতালি হইতে জার্মান সেনাদলের লিবিয়াতে অবতরণের পক্ষে ভূমধ্যসাগরস্থিত ব্রিটিশ নৌবহর বাধা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে; কিন্তু একেবারে জার্মানদের গতি রুদ্ধ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। লিবিয়াতে অনেকগুলি বন্দর আছে, মিশরের বিমানবহরের ঘাঁটি হইতে সেইসব বন্দরে হানা দিবার সুবিধা নাই; জার্মানেরা সেইসব বন্দরে অবতরণের চেষ্টা করিবে। তাহা ছাড়া ছোট হউক, আর বড়ই হউক, ভূমধ্যসাগরে ইতালির একটা নৌবহর রহিয়াছে, এই নৌবহর সেনাদলের অবতরণের স্থান হইতে ব্রিটিশ নৌবহরের তৎপরতা অন্য দিকে নিযুক্ত রাখিবার নীতি হয়ত অবলম্বন করিবে। বলকানের দিকে জার্মানির কর্মতৎপরতার রকমফের করিয়াও ব্রিটিশ নৌবহর এবং বিমানবহরের দৃষ্টি অন্য দিকে আকৃষ্ট রাখিবার চেষ্টা চলিতে পারে। জার্মানি যদি লিবিয়াতে ঢুকিতে পারে, তবে খুব সম্ভব তাহার দ্রুতচালিত সাঁজোয়া গাড়ির বহর মিশর আক্রমণের জন্য প্রয়োগ করিবে। তার পর, শীতের জন্য কিংবা ইংলন্ডের আত্মরক্ষার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সহজে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া জার্মানি তাহার বিমানবহরও এই সীমান্তে বেশী করিয়া নিযুক্ত করিতে পারে, তখন আমরা হল্যান্ড কিংবা বেলজিয়মের ন্যায় উত্তর আফ্রিকায়ও জার্মানির সৈন্যবাহী বিমানবহর এবং প্যারাসুটীদের তৎপরতার কথা শুনিতে পারি; কারণ ইংলন্ডে এই অস্ত্রপ্রয়োগ যতটা বিপজ্জনক, টিউনিস, আলজিরিয়া প্রভৃতি স্থানে তত নয়। মিশরেও জার্মানির এ বিষয়ে ইংলন্ডের চেয়ে বেশী সুবিধা হইবে। কারণ, ইংলন্ডে সর্বত্র গতিবিধির যেমন সুবিধা আছে, মিশরে তাহা নাই। মিশরে গতিবিধির একমাত্র উপায় হইল রেলপথ। ইংলন্ডে প্রহরীবাহিনী যেমন সর্বত্র সজাগ আছে, মিশরে তেমন রাখা সম্ভব নয়; সুতরাং মিশরে উড়োজাহাজযোগে সেনা নামানো অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

অবস্থা যতই ঘোরালো হউক, তুরস্কের বিরুদ্ধতা করিয়া যে জার্মানেরা বলকানের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে, ইহা মনে হয় না, অবশ্য যদি তাহারা এ কাজে রুষিয়ার উস্কানি পায় তবে সে কথা স্বতন্ত্র। যে পর্যন্ত রুষিয়ার সঙ্গে জার্মানির নীতি অধিকতর অনুকূলতাপূর্ণ না হয়, সে পর্যন্ত জার্মানি তুরস্কের বিরুদ্ধে সৈন্যবল প্রয়োগ না করিয়া বলকানের অবস্থা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা রাজনীতিক চাতুর্যপূর্ণভাবে তুরস্ককে না চটাইয়া কাজ হাসিল করিতে চেষ্টা করিবে।

ইংলন্ডের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবী মিঃ ভার্নন বার্টলেট 'নিউজ ক্রনিকেল' পত্রে লিখিয়াছেন—'রুমানিয়াতে জার্মানির অভিযানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এই যে, এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তের দিকে ইতালি ও জার্মানির হানার প্রথম উদ্যম, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং ব্রেনার পার্বত্য পথে মুসোলিনি ও হিটলারের যখন মিলন হয়, তখনই উভয়ের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। ইতালির সৈন্যও জার্মান সেনানায়কদের নিয়ন্ত্রণে রুমানিয়াতে গিয়াছে। তুরস্ক যাহাতে বলকানে একা হইয়া পড়ে এবং গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন ছিন্ন করিতে বাধ্য হয়, জার্মান-ইতালির এমন মতলবও এই উদ্যমের পিছনে রহিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং ইংলন্ডের বিরুদ্ধে শীতকালের সংগ্রাম জার্মানি ও ইতালি চালাইতে চাহিতেছে যে নীতিকে আশ্রয় করিয়া রুমানিয়ায় অভিযান তাহারই পরিচায়ক। মুসোলিনি এবং হিটলার হয়ত স্থির

বুঝিয়াছেন যে, নিকট প্রাচীতে সাফল্যের সহিত হানা দিতে পারিলে জার্মানির বিরুদ্ধে ইংরেজ যে ঘরবন্দী নীতি অবলম্বন করিয়াছে তাহা দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং শুধু তাহাই নহে, ঐ নীতি মধ্য প্রাচীতে সম্প্রসারিত করিতে যদি পারা যায়, তাহা হইলে ব্রিটিশের গতিবিধির পথ সংকটাপন্ন হইবে এবং সেইভাবে ইতালি ও জার্মানি ইংরেজকে ঘরবন্দী করিয়া ফেলিতে পারিবে।'

এই তো গেল ত্রিশক্তি সন্ধির দুই দোস্ত, ইতালি ও জার্মানির যোগসাজশে ভবিষ্যৎ অবস্থা কি দাঁড়াইতে পারে তাহার একটা অনুমান এবং এসিয়ার পশ্চিম প্রান্ত ও আফ্রিকার সম্পর্কে এ ব্যাপার। ত্রিশক্তির অপর দোস্ত জাপানের অবস্থাটা কি একবার দেখা যাউক। গত ৩০শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার রাত্রি হইতে ব্রহ্ম-চীন রাস্তা দিয়া মাল চলাচল আবার আরম্ভ হইয়াছে। একমাস আগে এ সম্বন্ধে জাপানের সুর যেমন ছিল, তেমন নাই। সে এখন বলিতেছে যে, ঐ রাস্তা খুলিয়া দেওয়ার গুরুত্ব বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু ইহা যে তাহার মনের কথা নয়, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমেরিকার মতিগতি বুঝিয়াই সে একথা বলিতে বাধ্য হইতেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন দুইজন, রুজভেল্ট এবং উইলকি। রুজভেল্ট ডেমোক্রাট এবং উইলকি রিপাবলিক্যান। ইঁহারা দুইজনই বলিতেছেন যে, ইঁহারা দুইজনেই ইংরেজের পক্ষ সমর্থন করিবেন। এখনও সন্দেহজনক রহিয়াছে রুষিয়ার মতিগতি। জার্মানি রুষিয়াকে দলে টানিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। রুষ-জার্মান অর্থনৈতিক সন্ধির আলোচনাতেই ইহা বুঝা যায়।

ভিয়েনা হইতে লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, জার্মানি সোভিয়েটকে দিয়া এমন একটি প্রকাশ্য ঘোষণা করাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, যে ঘোষণায় সোভিয়েট ইউরোপে জার্মানি ও ইতালির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইবে এবং বলিবে যে, জার্মানি ও ইতালির রাজ্যবিস্তারে হস্তক্ষেপের ইচ্ছা তাহার নাই। বার্লিনে সকলের ধারণা এই যে, ইহার বিনিময়ে জার্মানি ও ইতালি ভারত মহাসাগরের দিকে সোভিয়েটের যে কোন রাজ্যখণ্ড অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে রাজী আছে। রুষিয়া তুরস্কের সম্বন্ধে ক্রমেই অধিক আগ্রহ দেখাইতেছে। শীঘ্রই সোভিয়েট-তুর্কী সামরিক চুক্তি হইবে বলিয়া জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে; কিন্তু একথা মনে করিবার কারণ আছে যে, তুরস্ক যুদ্ধের সময় দার্দেনেলিস প্রণালীর কর্তৃত্ব সোভিয়েটকে ছাড়িয়া না দিলে সোভিয়েট কোন চুক্তিতে রাজী হইবে না। মোটের উপর রুষিয়ার নীতি সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে যে, রুষিয়া জার্মানিকে যেমন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে, ইউরোপের অন্য শক্তিকেও তার চেয়ে কম সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে না। বর্তমান যুদ্ধে সে একটা চাতুর্য অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। তাহা এই যে, প্রত্যক্ষভাবে কোন পক্ষে নিজকে জড়িত না করিয়া যতটা সম্ভব, নির্বিবাদে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা। ফিনল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ড ও বেসারেবিয়াতে আমরা এই নীতির পরিচয় পাইয়াছি, বলকান সম্বন্ধেও রুষিয়া সেইরূপ নীতিই অবলম্বন করিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। ধনতান্ত্রিক শক্তিদের ধ্বংসমূলক বিগ্রহের ভিতর দিয়া নিজকে সুদৃঢ় করিয়া লইবার নীতিই হইল বর্তমানে রুষিয়ার নীতি। এইজন্য কাহারও সে শত্রুও নহে, আবার কাহারও সে মিত্রও নহে, এইরূপ মনোভাব লইয়া সে চলিতেছে।

আমেরিকাও দেখা যাইতেছে রুষিয়ার সম্বন্ধে মত বদলাইয়া ফেলিয়াছে। আজ কয়েক বৎসর হইল যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্ট সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যের কল-কব্জা আটক রাখিয়াছিলেন; জাহাজ রুষিয়ায় যাইতে দেন নাই। এখন সেই মালের উপর হইতে নিষেধ বিধি তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, আমেরিকা হইতে রুষিয়া কতকগুলি অন্য সমরোপকরণও লইতে পারিবে। রুষিয়ার মতিগতিই যদি জার্মানি ঘেঁষাই হইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ পক্ষপাতী রুজভেল্ট কর্তৃত্বাধীন মার্কিন গভর্নমেণ্ট কিছুতেই রাজী হইত না। এই সব বিবেচনাই জাপান জঙ্গী মেজাজ ঠাণ্ডা রাখিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বল্কানে রুষিয়ার সৈন্য প্রবেশ করিলে জনৈক বৃদ্ধা কর্তৃক সম্বর্ধিত

লাস

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ভোররাত্রে দেখা ভুলিয়ে-যাওয়া স্বপ্নের মত আজও অতীতের অনেক কথা বংশীর মনে পড়ে। আর তাহার বুকে ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস। কয়েক মুহূর্তের জন্য আজও বংশী কেমন যেন হইয়া যায়। কিন্তু তাহা অল্পকাল মাত্র; পর মুহূর্তেই তাহার হাসি পায়।

কে একজন একবার বংশীকে বলিয়াছিল, 'দুঃখের সময় ভগবানকে ডাকিস বংশী, সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে'। আজ সে লোকটাকে পাইলে বংশী একবার দেখিয়া লইত। এত বড় মিথ্যা কথা তাহাকে কেহ আর কখনও বলে নাই।

একদিন বংশী এ কথা মানিয়াছিল, সমস্ত অন্তর দিয়া ভগবানকে ডাকিয়াছিল সে। কিন্তু ওটা করিয়া বংশীর সময় নষ্ট হইয়াছিল কেবল। কিছুই ফল হইল না, মানদা মরিয়া গেল।

মানদা অর্থাৎ বংশীর বউ। বড় কষ্ট পাইয়া মরিয়াছে বেচারা। কি একটা সুকঠিন রোগ হইয়াছিল তাহার। দিনরাত দারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া মরিয়াছে সে। ঔষধ নাই, ডাক্তার নাই, খাওয়া নাই এমন কি ছেলেটাও কাছে নাই। ছেলেটাকে বার বার দেখিতে চাহিয়াছিল মানদা।

'ওগো', কাতর কন্ঠস্বর মানদার।

'এই যে,' বংশী বিষণ্ণ।

'গোপাল এল না?'

বুকের মধ্যে ছোট একটা নিশ্বাস চাপিয়া বংশী বাহিরে চাহিয়া বলিল, 'এই এল ব'লে'।

'কই এল? কোথায় এল? কেন গেল? বল বল—' চোখ বড় করিয়া মানদা উঠিতে চেষ্টা করিল।

'ও কি কর?' ঘাবড়াইয়া গেছে বংশী।

'গোপাল কই—আমার গোপাল—?'

'আসবে, আসবে—।'

'আসবে? কি বললে? অ্যাঁ? ওই তো এসেছে। আয় আয়, কোথায় ছিলে বাবা এতদিন? গোপাল, গোপাল—' বস্ এইখানেই শেষ। মানদার চোখের তারা দুইটি স্থির হইয়া গেল।

একটা ছেলে ছিল বংশীর—গোপাল। ছেলেটি যাত্রা লইয়াই মাতিয়া থাকিত। কাজকর্মের ধার মাড়াইত না, এখানে-সেখানে যাত্রা করিয়াই বেড়াইত শুধু।

মানদা এই যাত্রা করাটা বিশেষ পছন্দ করিত না। পুরুষ মানুষের ওসব কি বাপু! তার চেয়ে খেতের কাজ ঢের ভাল। তাহা না করিয়া মুখে রং মাখিয়া হইহই করা—। বংশীও মানদার কথাটা সমর্থন করিত। এই লইয়া গোপালের সঙ্গে ঝগড়া তাহাদের প্রায়ই হইত। গোপাল তৈরী ছেলে। মা বাপের কথা সে ভুলিয়াও গ্রাহ্য করিত না। এবং সব সময় কানের কাছে তাহাদের এই প্যান্‌প্যানানি অসহ্য বোধ হওয়াতে কোনও যাত্রার দলে যোগ দিয়া সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন গ্রাম ছাড়িয়া গেল।

বংশী ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। আজকাল-কার ছেলেদের মাথাটা অমন গরম হইয়াই থাকে, দু দিন পরে আবার আপনিই সব ঠিক হইয়া ঠান্ডা হয়। গোপালও লেজ গুটাইয়া যথাসময়ে ফিরিবে। সুতরাং চিন্তার কোনও কারণ নাই।

মানদা প্রথমে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিল। হাজার হইলেও মেয়ে মানুষ তো! বংশী অনেক বুঝাইয়াছিল তাহাকে। মানদাও বুঝিয়াছিল অবশেষে। তার পর গোপালের অপেক্ষা করিয়া করিয়া একদিন সে মরিয়া গেল।

গোপাল ফিরিল না।

একথা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে বংশীর বউ অমন করিয়া শুকাইয়া মরিবে। কিসের অভাব ছিল বংশীর! গোলা ভরা ধান ছিল, ভাল জমি ছিল, ঘর ছিল, এমন কি একটা বাচ্চা চাকরও ছিল।

কিন্তু কোথা হইতে কি হইয়া গেল যেন, জাদুকর গ্রামকে জাদু করিল; বসিল সিমেন্টের কারখানা। মহাসমারোহে ধুঁয়া উড়িল আকাশে। খেতের কাজ ফেলিয়া সকলে যোগ দিল কারখানার কাজে। প্রত্যহ মাহিনা পাইবে! ফসল না হইলে উপবাস করিতে হয় গ্রামবাসীর। এবার তাহাদের ভয় ঘুচিল।

এ কথা অতি সত্য যে বংশী প্রথমে কারখানাকে ভাল-বাসিয়াছিল। এ যেন নূতন জীবন। কিন্তু খুব অল্প দিনেই তাহার সে ভালবাসার অবসান হইল; জীবন হইয়া উঠিল তিক্ত বিষাক্ত। ঘরের মধ্যে, আগুনের পাশে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। কি অমানুষিক পরিশ্রম! এর চেয়ে খোলা আকাশের নীচে খেতের স্বাধীন কাজ ঢের ভাল। কিন্তু কোথায় খেত! অযত্নে সব ধ্বংসের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তার পর আরম্ভ হইল ধর্মঘট। কয়েকজন সহুরে বাবু আসিয়া বংশীদের অনেক কিছু বুঝাইল। মাতিয়া উঠিল বংশী। কিন্তু ধর্মঘটের যখন অবসান হইল তখন দেখা গেল কেবল বংশীরই চাকরি গিয়াছে।

এইবার বংশীর মাথায় বাজ পড়িল যেন। কি করিয়া তাহার সংসার চলিবে? বউকে কি খাইতে দিবে সে? অনেক চেষ্টা করিয়াও কারখানার কাজটা আর পাওয়া গেল না। অবশেষে মানদার মৃত্যুতে বংশীর সুবিধাই হইল বলিতে হইবে। এখন বংশীকে ভাবিতে হইবে শুধু একটি লোকের খাইবার ভাবনা অর্থাৎ তাহার নিজের।

এই সময় ছেলেটা কাছে থাকিলে অনেক সুবিধা হইত। একটা অবলম্বন তো! এখন কি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে বংশী? কাহার মুখ চাহিয়া পরিশ্রম করিবে? কাহার জন্য করিবে সঞ্চয়? মাঝে মাঝে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে বংশীর। অশান্তিতে মন ভরিয়া ওঠে।

দারুণ দারিদ্র্য বংশীকে জ্বালাইয়া অন্তরের সমস্ত

(শেষাংশ ৫৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অসুখ

শ্রীনিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুতেই কিছু হইল না।

বাড়িতে কাহারও মনে শান্তি নাই। স্বয়ং গিন্নী হইতে ছোট ছেলে মেয়েরা অবধি সদা মুখ ভার করিয়া আছে, বাড়ি ভরিয়া বিরাজ করিতেছে একটা অশান্তির বিমর্ষতা। ঠিকা চাকর কেষ্ট অবধি সন্তর্পণে বটুয়া খুলিয়া পান মুখে দেয়, একবার বিমলার নজরে পড়িলে আর রক্ষা নাই। কর্তার অসুখ অথচ সকলে পান খাইবে এবং তাহারই সম্মুখে তাজা ঠোঁট লইয়া হাসিয়া বেড়াইবে ইহা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করিবেন না।

আজ এগার দিন। এই এগার দিন পূর্বে এক বর্ষা-সন্ধ্যায় সর্দি হওয়ায় কম্ফর্টার জড়াইয়া অখিল শুইয়াছিল! সেই শোওয়াই শোওয়া, আজও আরোগ্য হইয়া উঠিতে পারিল না। অবশ্য পারিবার উপায়ও নাই। বিমলার কড়া নিষেধ এতটুকু নড়া চলিবে না, শুধু দরকার হইলে মুখ ফুটিয়া বলিতে হইবে, পাশ ফিরিব। বিমলা কেষ্টকে ডাকিয়া আনে, পিনা বুড়ি পাশে আসিয়া দাঁড়ায় এবং সকলে ধরা-ধরি করিয়া কোনওক্রমে পাশ ফিরাইয়া দেয় মাত্র। গোঁয়ার-তুমিতে কাজ নাই, হার্ট যা উইক! একটু কিছু হইতে কতক্ষণ?

কালী, মনসা, শিব, নারায়ণ, কোনও দেবতারই মানত বাকী থাকে নাই। কাহারও পাঁঠা, কাহারও দুধ কলা, কাহারও বা আড়াই সের চিনির ভোগ। আর ইহা ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা বিমলা তো চক্ষু বুজিয়া গুরুনাম জপ করিতেছেই। প্রাণ ভরিয়া ডাকিতেছে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে, অন্তরের আকুল মিনতি জানাইতেছে বারংবার।—প্রভু, স্বামী-ভিক্ষা দাও এ অনাথিনীকে, নহিলে এ অবলার কি গতি হইবে প্রভু?

কিন্তু প্রভু বুঝি শুনিলেন না। তাই শয়নে স্বপনে এমন কি অখিলের শিয়রে বসিয়াও বিমলা আজ কদিন ক্ষণে ক্ষণে আঁতকাইয়া উঠিতেছে তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। একপাল নাবালক শিশু সন্তান লইয়া অতঃপর কোথায় দাঁড়াইবে সে? সম্বলের মধ্যে তো শ্বশুরের ওই ভিটাটুকু, তাও অন্যান্য শরিকেরা আড়াল হইতে এমন লোলুপ চোখে চাহিয়া আছে যে—বিমলা শিহরিয়া উঠিল। সে চোখকে প্রসন্ন করিতে হইলে এ ঘরখানা হইতে সবসুদ্ধ নামিয়া দাঁড়াইতে হয়। অবলা নারী, কেমন করিয়া সে যুঝিবে উহাদের সঙ্গে?

এই কথাই বিমলা আজ এগার দিন ভাবিতেছে।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হইয়াই কিনা এত ফেসাদ, এত অনর্থ! প্রথম পক্ষের ছেলেরা তবু উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার বাছারা তো মাত্র দুধের শিশু বলিলেই চলে। বড় ছেলে পিনা, এই আষাঢ়ে দশে পড়িল, মামলা-মকদ্দমার কিই বা বোঝে সে? উহারা জায়গা জমি সব হইতে বাছাদের দুধের মাছির মত উড়াইয়া ছাড়িবে।

তাই প্রাণ মন ঢালিয়া চলিতেছে সেবা পরিচর্যা। স্বামীকে তার যে বাঁচাইতেই হইবে। অখিল বার্লি খাইতে চায় না, কিন্তু বিমলা শুনিবে না সে কথা। পথ্যের দিকে রোগীকে কোনওদিন আশকারা দিবে না সে। হইল না, হয় সর্দি কিন্তু উহা হইতে খারাপ হইতে কতক্ষণ? আর ওই যে ঘোরালো দৃষ্টি, ওই যে থাকিয়া থাকিয়া হাই তোলা, ওই দাঁত দিয়া নখ খুঁটিবার ইচ্ছা এবং বারংবার আঙুল মটকাই-বার চেষ্টা, ইহা কিছুতেই ভাল রোগের লক্ষণ নয়; সে হলপ করিয়া বলিতে পারে। বিমলা প্রত্যহ তিন বার শাঁখা ধোয়া জল খায়, রোগীর বেআড়াপনা যথাসাধ্য সামলাইয়া রাখে এবং অষ্টপ্রহর গুরু নাম জপ করে। একটা লোকই যে মরিবে তাহা তো নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সকলকেই যে পথে বসাইয়া যাইবে!

বিমলার চোখের সামনে ধু ধু করিয়া উঠিল একটা বিস্তীর্ণ মরুভূমি। প্রখর রৌদ্রে খাঁ খাঁ করা বালু রাশি কি বিকট ও ভয়ংকরই না দেখাইতেছে!

চক্ষু দুইটা তো অবিরামই অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াই আছে, আঁচলটা ঘন ঘন ওঠানামা করিতেছে। একবার একটু অসতর্ক হইতেই টপ্ করিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল অখিলের গালের উপর। অখিল চমকাইয়া উঠিল, চোখ বুজিয়াই কহিল, "জল কিসের বিমলা, গরম ঠেকছে যে।"

ততক্ষণে আঁচলে সে চক্ষু মার্জনা করিয়াছে। বিমলা শশব্যস্তে কহিল, "ও তোমার রেণুর কীর্তি, একটু ছিটকে লাগবে বোধ হয়। কোলে শোওয়া রয়েছে কিনা।"

যাহাকে বলে প্রত্যুৎপন্নমতি। বিমলা নিজের উপস্থিত-বুদ্ধিকে তারিফ না করিয়া পারিল না। অশ্রুজল অমঙ্গলের চিহ্ন, তাহা সে বলিবে কেমন করিয়া?

অখিল আবার বলিল, "ওগো আজ কি বার বলতে পার?"

কিন্তু বিমলা আর প্রশ্রয় দিবে না, ধমকের সুরে কহিল, "বিষ্যুৎবার। কিন্তু বার বার কথা বলতে তোমাকে যে নিষেধ করছি, কিছুতেই কানে তুলবে না বুঝি? ওগো, তুমি কি আমাকে—"

বিমলা ভাঙিয়া পড়িল, কত আর মানুষে সহ্য করিতে পারে? নড়িবে চড়িবে, কথা বলিবে, নিজে যে রোগী কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। একটা অঘটন না ঘটাইয়া ছাড়িবে না শেষ পর্যন্ত। বিমলা ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল এক সুদূর অতীতের কথা, বিমলার বয়স তখন মোটে সাত বৎসর। সাজিয়া-গুজিয়া সে বাহির হইয়াছিল ঠাকুর দেখিতে। বিমলার মনে আছে চিনিদির ইপক মেকিং শাড়িটা সে পরিয়াছিল, বুকে শোভা পাইতেছিল তাহার জড়োয়ার নেকলেস, কানে দুলাইয়াছিল এক জোড়া হাঁস-দুল। আয়নার সামনে দাঁড়াইতে নিজেকে কি চমৎকারই না দেখাইতেছিল সেদিন। এমন সময় পিছন হইতে মা আসিলেন, ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি রে সাজ হচ্ছে বুঝি?" বিমলা লজ্জা পাইয়াছিল, কিন্তু মা আরও আগাইয়া আসিয়া তার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "এত শখের ঘটা বিধবা না হ'য়ে থাকিস শেষ কালে।"

বিধবা কথাটার একটা অস্পষ্ট অর্থ তখন সে জানিত কিন্তু বড় হইয়া কথাটা যত সে চিন্তা করিয়াছে, বুকটা

তাহার ততই তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে। কেন যে মানুষ অমন সৃষ্টিছাড়া রসিকতা করিয়া থাকে, তাহারাই জানে। বিরক্তিতে বিমলার নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া আসিল।

অখিল বলিল, "আর কথা বলব না এই প্রতিজ্ঞা করছি। কিন্তু তুমি কাঁদছ বিমলা?"

আবার সেই কথা। বিমলা নিমেষে প্রকৃতিস্থ হইল, বলিল, "কই না তো? তবে বুকে একটা ব্যাথা উঠেছিল কি না তাই একটু—"

অখিল কহিল, "সেই জন্যেই তো বলি, একটু শোও গিয়ে তুমি। আমাকে একটু নিরালায় ঘুমতে দাও। এই মুখে চাবি দিলাম, আর কথা বলছি নে," বলিয়া সে ঠোঁটের কাছে আঙুল উঠাইয়া চাবি ঘুরাইবার ভঙ্গী করিল।

বিমলা এক মুহূর্ত গুম হইয়া বসিয়া রহিল। পরে মশারির বাহিরে গিয়াই অভিমানে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল! অখিল তাহাকে কাছে থাকিতে দিবে না, কেবল ছল ছুতা করিয়া বাহিরে যাইতে বলিবে। কি সে অপরাধ করিল যে স্বামীর পরিচর্যা হইতেও তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে? দুরন্ত কান্নার আবেগে বিমলার বুকটা পিষিয়া যাইতে লাগিল।

আজ তিন দিন ঐ বার্লি পড়িয়া আছে, এতটুকু স্পর্শ করে নাই। অখিল নেবু ভালবাসে, তাই সে তো প্রায় এক ডালা নেবু যোগাড় করিয়া আনাইয়াছে। তাল মিছরি ওই বয়ামে ভরা রহিয়াছে, ওই হরলিক্সের শিশি, অথচ কিছুই খাইবে না সে। এমন করিয়াই কি না খাইয়া মরিবে লোকটা? কাঁদিতে কাঁদিতে বিমলা বেণুকে ঘুম পাড়াইতে গেল।

রাত্রি কম হয় নাই। বায়স্কোপের ডায়নামো-ঘরের শব্দটা থামিয়াছে, ওপাশের পাইস-হোটেলের কলরব বন্ধ হইয়াছে অনেকক্ষণ, খালি থাকিয়া থাকিয়া থালা-বাসন ধুইবার দুই-একটা ঠুংঠাং শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। বাহিরে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে চমৎকার, জানালার ফাঁক দিয়া এক ঝলক মশারির গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। বিমলা উন্মনা হইয়া উঠিল, তাহার অশান্ত অস্থির মনটার মধ্যে কে যেন মুহূর্তে একটা শান্ত স্নিগ্ধতার প্রলেপ বুলাইয়া দিল, অর্থহীন ম্লান দৃষ্টি মেলিয়া সে বাহিরে চাহিয়া রহিল।

একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, সহসা বিমলা চমকাইয়া উঠিল। আবার, আবার সেই শব্দ!

কিন্তু কিসের এ শব্দ? আজ ক দিন ধরিয়া প্রতি রাত্রেই সে শুনিয়া আসিতেছে এই বিশিষ্ট শব্দ, অখিলের বিছানা হইতে আগত এই খুটখুট শব্দটার কোনও অর্থই সে করিতে পারে না। বিমলা লক্ষ্য করিয়াছে যতক্ষণ সে শিয়রে জাগিয়া থাকে ততক্ষণ কিছুরই সাড়া নাই, একটু সরিলেই অমনি পূর্ণোদ্যমে খুটখুট কুড়মুড় এই শব্দ চলিবে। ঘরের মাঝখানে চৌকি, আশপাশে এমন কিছু নাই যে ইঁদুরে কাটিবে, তাহা হইলে?

বিমলার বুকে কে যেন ধড়াস করিয়া এক ঘা হাতুড়ি বসাইয়া দিল। ছোটকালে গল্পে শুনিয়াছে হাড় মুড়মুড়ি বেয়ারামের কথা, একটু নড়াচড়া করিলেই হাড়-গোড় মুড়মুড়াইয়া ভাঙিয়া যায়। ইহা কি তবে তাই? আজ তিন দিন সে কিছুই খায় নাই, আহারেই বা এমন অরুচি কেন? ডাক্তার কবিরাজ কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, অথচ সে নিজ কানে প্রতি রাত্রেই শুনিতেছে এই মুড়মুড় শব্দ, যেন হাড়ে হাড়ে বাধিয়া ভিতর হইতে কুড়মুড় করিয়া শব্দ উঠিতেছে।

বিমলা শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে ভাবনায় তাহার সমস্ত শরীর যেন আচ্ছন্ন পঙ্গু হইয়া গেল। প্রাণপণ করিয়া সে একাগ্রচিত্তে গুরুনাম জপিতে লাগিল। শব্দ ওদিকে সমানে চলিতেছে।

অতি ভোরে বিমলা আজ শয্যাত্যাগ করিল, স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিল, পরে ডালি সাজাইয়া চলিল কালীবাড়ি পূজা দিতে। স্বামীর আরোগ্যের জন্য আজ সে ধরনা দিয়া থাকিবে। পতিব্রতা পতি তরে প্রাণ ত্যজে অকাতরে, আর দুদণ্ড ধরনা তো কোন্ ছার!

কিন্তু বেণু গোলমাল বাধাইল। পূজার ডালি হইতে একটা আপেল লইয়া সে যে কোন্ ফাঁকে চৌকির নীচে ঢুকিয়াছে তাহা কেহ ঠিক পায় নাই। যখন পাইল, আপেল তখন পরম শান্তিতে বেণুর উদরে ঘুমাইতেছে।—কিন্তু আবার সেই শব্দ!

বিমলা বিস্ময়-চকিত হইয়া কান পাতিয়া রহিল। শব্দটা অত্যন্ত পরিচিত অথচ এবার আসিতেছে যেন চৌকির নীচ হইতে। উদ্‌গ্রীব কৌতূহলে বিমলা উঁকি দিয়া দেখিল বেণু একান্ত মনোযোগে কি খুঁটিয়া মুখে দিতেছে। বেণুর হাত ধরিয়া টানিতেই ঝরঝর করিয়া কি কতকগুলো পড়িয়া গেল, বিমলা তুলিয়া দেখিল, চিনাবাদাম।

চিনাবাদাম? এক মুহূর্তে একটা তীব্র সন্দেহে বিমলার সমস্ত মনটা ভরিয়া গেল, এখানে এত চিনাবাদাম আসিল কি করিয়া? বিমলা আরও আগাইয়া আসিল এবং কি মনে করিয়া মশারিটা তুলিতেই সহসা অবাক কাণ্ড! রোগী তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং হুড়মুড় করিয়া নামিয়া ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বাহির হইবার সে বেগে তোশকটা উলটাইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে নীচে হইতে ঝরঝর করিয়া পড়িয়া গেল একরাশ চিনাবাদাম আর মটর ভাজা—সারা মেঝেটা ততক্ষণ ছত্রাকার!

বিমলার মনে হইল জাগিয়া জাগিয়া সে স্বপ্ন দেখিতেছে! স্তূপীকৃত বাদামের খোসা আর ওই উলটানো তোশক সকলই যেন অলীক অর্থহীন, ওই যে এগার দিনের রোগী অমন সুস্থ লাফে বীরের মতো পালাইয়া গেল, ইহা যেন সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। শূন্য শয্যাটার দিকে সে শুধু ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

তথাপি সেই আচ্ছন্ন চৈতন্যের মধ্য হইতেও একটা কথা ঝিলিক মারিয়া তাহাকে পরম আশ্বস্ত করিয়া গেল।—শব্দটা তবে হাড়ের নয় দাঁতের। কুড়মুড় করিয়া যাহা ভাঙিয়াছে তাহা তবে দেহের অস্থি নয়, বাদাম আর মটর ভাজা! কেষ্টকে দিয়াই এই সব আনানো হইয়াছে তাহা হইলে! শাঁখা সমেত হাতখানা তাহার অলক্ষ্যে কখন কপালে আসিয়া ঠেকিল।

আদমসুমারি

শ্রীকমলচন্দ্র নাগ

বহু প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর সর্বত্র লোকগণনার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং নানাভাবেই উহা সম্পন্ন হইত। মিশর, পারস্য, চীন, রোম এমন কি সুদূর অতীতে গ্রীসের রাজ্যসমূহেও আদমসুমারি হইত বলিয়া শুনা যায়। তখন অবশ্য এখনকার মত শৃঙ্খলিত ভাবে গণনা হইত না, কোনওরূপে রাজ্যের রাজস্ব ও ধনোৎপাদনের উপায়সমূহের একটা আনুমানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য তাহা করা হইত। রাজ্যে রাজ্যে তখন যুদ্ধ লাগিয়াই থাকিত, এজন্য সৈন্যবলের খবরাখবর এবং তাহাদের রসদ, রাজস্ব এবং ভূমির পরিমাণ ইত্যাদির অল্পবিস্তর বিবরণ লওয়া হইত। বস্তুত রাজ্যের জন্যই উহা করা হইত, সমাজের সহিত তাহার বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল না। আজকাল যেমন লোকগণনা ব্যতীত বহুবিধ সামাজিক তথ্য, কৃষিশিল্প বা কলকারখানা প্রভৃতির বিবরণও গৃহীত হইয়া থাকে, পূর্বে কেবল শস্যসম্পদের হিসাব ও করস্থাপনের জন্যই গণনা হইত। ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে যখন দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন প্রত্যেক গৃহস্থের লোকসংখ্যা হিসাব করিয়া এক এক খানি খাতা রাখা হইত এবং উহাতে লিপিবদ্ধ জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ধরিয়া মধ্যে মধ্যে উহার মোট সমষ্টি প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা ছিল। পারস্যদেশে তথাকার কর নির্দিষ্ট করিবার জন্যই মাঝে মাঝে আদমসুমারি করা হইত। চীনদেশেও ঠিক প্রাচীনকালের মত দেশের রাজস্ব ও সামরিক ব্যয়াদির একটা আনুমানিক তথ্য লইবার জন্য লোকগণনা হইত।

তবে আদমসুমারির উন্নত প্রক্রিয়ায় ও উদ্দেশ্যে আরম্ভ হয় প্রথমে রোম রাজ্যে। সার্ভিয়াস টুলিয়াস নামক এক ভদ্রলোক এই নব ধারায় আদমসুমারি করার খসড়া রচনা করেন। তখন স্থির হয়, অতঃপর পাঁচ বৎসর অন্তে একবার করিয়া লোকগণনা হইবে এবং উক্ত গণনায় প্রত্যেক পরিবারের লোকজন বাদে তাহাদের জোতজমি, গবাদি পশু, আশ্রিত ও কৃতদাসসমূহও গণনা করা হইবে। আদমসুমারির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লোকসংখ্যার মোট সমষ্টিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর কিরূপ কার্যক্ষমতা, কি কি ব্যবসায়ে তাহারা অভ্যস্থ ও অভিজ্ঞ এবং তাহাদের প্রত্যেকের কিরূপ অর্থাগমের উপায় আছে, তাহাই বিশদরূপে অনুসন্ধান করা। ইহাতে দেশের লোক যথেষ্ট পরিমাণে সহযোগিতা করিত। কিন্তু পরে দেখা গেল উহা cess বা কর স্থাপনের উদ্দেশ্যেই প্রবর্তন করা হইয়াছে। সেজন্য ইহা বরাবর রাজস্ব বিভাগেই পেশ করা হইত, সাধারণে বড় একটা খবর পাইত না।

ইহার পর অনেক দিন গত হয়। আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে বর্তমান প্রথায় আদমসুমারির প্রাথমিক কার্য শুরু হয়। সুইডেন কাজ শুরু করে এবং নির্দেশ দেয় প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে যেখানে পাদরীদের বাস আছে সেখানেই উক্ত অঞ্চলের জন্মমৃত্যুবিবাহাদির বিশদ বিবরণ লিখিয়া রাখিতে হইবে। ফরাসী রাজ্যে ঠিক অনুরূপ একটি আদেশ জারি হয়। সেখানকার প্রতি পল্লীতে যাহা কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটিবে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া মাঝে মাঝে উহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে হইবে। ইহার কিছু পূর্বে নয়া ফরাসীতে প্রত্যেক পরিবারে যুগপৎ গণনা কার্যের সূত্রপাত হয়। পূর্বাপর সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিলে বর্তমান প্রথায় আদমসুমারির উহাই প্রথম প্রচলন বলিয়া মনে হয়।

তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে আদমসুমারি সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে এবং ক্রমশই উহা আরও নির্ভুল করিবার চেষ্টা হইতেছে। বিভিন্ন দেশের সংখ্যাতত্ত্বজ্ঞেরা সিদ্ধান্ত করিয়া দুইটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। আদমসুমারিকে যাহাতে সাধারণের কল্যাণপ্রদ ও নির্ভরযোগ্য করিয়া তুলিতে পারা যায় তার চেষ্টা করা এবং বিভিন্ন পল্লীর গণনা বিশ্লেষণপূর্বক তুলনামূলক আলোচনা করা—যাহাতে টের পাওয়া যায় কাহারা কোন্ বিষয়ে অগ্রসর অথবা কাহারা কোথায় পশ্চাদপদ। যেমনই দেখা গেল, কোনও শ্রেণীর লোকসংখ্যা যথেষ্ট অথচ তাহাদের মধ্যে কোনওরূপ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা নাই, তখনই সেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। তবে এ কথা সত্য যে, অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিয়োগ করিলেই বা প্রশ্নপত্রের জবাব লিখনটুকু গৃহস্বামীর হাতে ছাড়িয়া দিলেই উহা নির্ভুল অথবা সন্তোষজনক হয় না। যেখানে দেশের বার আনার অধিক লোক পল্লীবাসী যেখানকার অধিকাংশ লোকই শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত, সেখানে সমুদয় বিবরণ লইতে হইলে সাধারণ শ্রেণীর লোকই নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় যাহারা প্রাণ খুলিয়া মিশিয়া যাবতীয় জ্ঞাতব্য জানিয়া লইতে পারেন। কারণ এমনও দেখা গিয়াছে যে, প্রথম প্রশ্নটি শুনিয়াই গণনাকারী আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে না, করিবার প্রয়োজনও মনে করে না। তবে এ সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি ক্রমশ তিরোহিত হইয়া আদমসুমারির যথার্থ উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সফল করিয়া তুলিতেছে।

ইংলণ্ডে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম লোকগণনা করিবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু অধিকাংশ লোকই উহাকে 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, শত্রুপক্ষকে সুবিধা দান' ইত্যাদি বলিয়া নানা অজুহাতে সে চেষ্টা পণ্ড করিয়া দেয়। ইহার বহুদিন পরে এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ম্যালথসের গুটি কয়েক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের এদিকে দৃষ্টি পড়ে এবং সকলে বিশেষ সচেতন হইয়া ওঠে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে উহা বিনা বিরোধিতায় চালু করা হয়। গণনার জন্য প্রথমে কোনওরূপ কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হয় নাই, শুধু পাদরীরা তাঁহাদের নিজ নিজ পল্লীর সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জাতীয় মহাসভায় (পার্লামেণ্ট) দাখিল করিতেন এবং তথাকার শান্তি রক্ষা এবং শাসন বিভাগের উচ্চতন কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে গণনা কার্য হইত। প্রশ্নপত্রে প্রতি পরিবারের লোকসংখ্যা, তাহাদের পেশা, উহা চাষবাস না ব্যবসায় না অন্য কিছু, তাহা স্পষ্ট করিয়া জানিয়া লওয়া হইত। কিন্তু ইহাতে সুফল না পাওয়ায় পরবর্তী লোকগণনায় প্রত্যেকের পেশা বাদ দিয়া পারিবারিক জীবিকা মাত্র তালিকাভুক্ত করা হইত এবং বসতবাটীসমূহ উহার কতকগুলি অধিকৃত কতকগুলি নির্মাণ অধীন তাহাও ধরা হইত। যাহারা সে দেশে জন্মগ্রহণ করে এবং যাহারা বিদেশ হইতে সেখানে বসবাস করিতে যায়, তাহাদের পৃথক বিবরণ লওয়া হইত। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে, গণনাকারীরা নিজেরা প্রশ্নপত্র পূরণ না করিয়া গৃহস্বামীর হাতে উহার দায়িত্ব ছাড়িয়া দিত যাহাতে তাঁহারা ধীরে সুস্থে বিবেচনা করিয়া জবাবগুলি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। ইহার পর দশ বৎসর অন্তে নিয়মমত আদমসুমারি হইয়া আসিয়াছে, প্রত্যেকবারেই কিছু কিছু রদবদল করা হইয়াছে। মূক বধির ও অন্ধদের গণনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বাড়ির যিনি অভিভাবক বা অভিভাবিকা তাঁহার সহিত পরিবারের অন্যান্যজনের সম্বন্ধ কি, দেশের সর্বত্র ধর্মস্থানগুলি ও তথায় লোকজনের যাতায়াত কিরূপ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার আয়োজন হইয়াছে। যাহারা কোনওরূপ জীবিকা ব্যতিরেকেই কোনও সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া দিন নির্বাহ করে, যাহারা জীবিকা অর্জন করে, তাহারা স্বাধীনভাবে

না পরের অধীনে থাকিয়া তাহা করে উহারও বিবরণী লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৮৯১ সালে ওয়েলসে যে লোকগণনা হয় উহা হইতে ইংলণ্ডের লোকগণনার বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না। যাহারা সে-দেশীয় ভাষায় কথা কহিত বা ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিত, তাহাদের গণনায় ধরা হইত; কিন্তু শিশুরা কোন্ ভাষায় কথা বলে উহা লইয়া বিপত্তি উপস্থিত হয়। তখন স্থির হয়, অতঃপর তিন বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুদের বাদ দিয়া গণনা হইবে। ওয়েলস্-এর লোকগণনার বিশেষত্ব এই যে সেখানকার বাড়িগুলি সম্বন্ধেও বিশেষভাবে গণনা করা হয়। যেমন, প্রত্যেক বাড়িতে কয়জন করিয়া বাস করে, দিনে কয়জন রাত্রে কয়জন থাকে, কতদিন কতকগুলি খালি পড়িয়া থাকে ইত্যাদি। যাহারা জাতিতে ইংরেজ বা ওয়েলস অথচ 'বিদেশে' জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং পরে তথায় বসবাস করিতে আসিয়াছে, তাহাদের পৃথক বিবরণ লওয়া হয়।

স্কটল্যাণ্ডের লোকগণনাও ওই একরূপ, তবে প্রকৃতপক্ষে সুশৃঙ্খলভাবে লোকগণনা শুরু হয় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে। প্রথমে আদালতের শেরিফের তত্ত্বাবধানে উক্ত গণনা হইত, পরে ইংলণ্ডের ন্যায় একটি বিশেষ কমিটি গঠন করিয়া উহার হস্তেই সব দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া দেওয়া হয়।

কানাডায় ১৬৬৪ সালে প্রথম আদমসুমারিতে যাহারা তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে ও যাহারা বিদেশ হইতে কোনও কার্য-গতিকে আসিয়া পড়ে তাহাদেরও সংখ্যা লইবার ব্যবস্থা হয়। স্ত্রী পুরুষ সংখ্যা তাহাদের নাগরিক অবস্থা ও ব্যবসায় বা জীবিকা ইত্যাদির বিবরণ লওয়া হয়। পরে জীবিকার ধারাটির পরিবর্তে কৃষি কর্ম দ্বারা ধনোৎপাদন করিতে সচেষ্ট হইবার জন্য নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ইহার নিমিত্ত দেশের আভ্যন্তর অবস্থা, শস্যসম্পদ প্রভৃতির বিশদ তথ্য লওয়া হয়। যাহারা কল-কারখানায় কাজ করে তাহাদের মজুরি ও পরিশ্রমের হার, যাহারা বেকার তাহারা সাময়িক না বহুদিনগত বেকার তাহারও বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এজন্য তথায় অন্যূন দশ এগারটি প্রশ্নপত্র প্রস্তুত হয়, উহাতে কিঞ্চিদধিক পাঁচ শ' পঞ্চাশটি প্রশ্ন নিবদ্ধ থাকে এবং সেগুলির বেশীর ভাগ কৃষি, কলকারখানা ও ব্যবসায় সম্পর্কেই। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কৃষি ও কলকারখানা, শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমস্ত কার্যাদি তত্ত্বাবধান করেন। কানাডায় অধিকসংখ্যক লোক বিদেশ হইতে আসিয়া বসবাস করে বলিয়া প্রত্যেক পিতামাতার জন্মস্থান লিপিবদ্ধ করা হয় এবং গণনার দিন যাঁহারা কোনও কারণে উপস্থিত হইতে না পারেন, তাঁহাদের মোট সমষ্টিতে ধরিয়া লওয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে কানাডা বৃটিশ অধিকৃত হইলেও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গণনা-প্রথা এখানে অনুসরণ করা হয়।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ১৮৭১ সালে যে আদমসুমারি প্রবর্তিত হয়, উহা যুক্তরাজ্যের প্রথা অনুসারে চালিত হয়। সমগ্র দেশকে ছোট ছোট ব্লকে বিভক্ত করিয়া পৃথকভাবে গণনা করা হয়। তবে প্রত্যেক স্থানেই লক্ষ্য থাকে যাহাতে প্রশ্নপত্র বিশেষ সহজ ও সর্বজনীন হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত শ্রমিকেরা সেখানে যায় তাহাদের বিশদ বিবরণ আদম-সুমারির রিপোর্টে লিপিবদ্ধ থাকে।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে ইংলণ্ডের অনুসৃত প্রথা পালন করা হয়। তবে দেশের ও সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া তদনুসারে তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। এখানকার গণনার বিশেষত্ব, পূর্বাহ্ণে প্রশ্নপত্র বিতরণ করিয়া পরে ধীরে সুস্থে ফিরাইয়া লওয়া হয়। কোনও কোনও স্থানে পুলিসবাহিনীকে নিয়োগ করা হয়, নতুবা এ কার্যের জন্য স্বতন্ত্রভাবে নিযুক্ত কর্মচারীরাই উহা নির্বাহ করিয়া থাকে। আরও একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, গণনা আরম্ভের পূর্বে তথাকার মাতব্বর শ্রেণীর ব্যক্তিরা ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা করিয়া একটা পরিকল্পনা খাড়া করিয়া লন যাহাতে ইহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারা যায়। ধর্ম-সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহ গৃহস্বামীর ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

সিংহলের লোকগণনাকে ভারতের লোকগণনারই সমতুল্য বলা যাইতে পারে; উভয় দেশের লোকজনের যাওয়া আসা হয় বলিয়া একই দিনে উভয় স্থানেই গণনা হইয়া থাকে। এখানেও পূর্বে প্রশ্নপত্র বিলি করিয়া পরে উহা ফিরাইয়া লওয়া হয়।

জার্মানিতে বহুদিন হইতেই আদমসুমারির প্রচলন ছিল, তবে প্রজাদের দেয় রাজস্বের হার তিন বৎসর অন্তর বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত একটা আনুমানিক তথ্য লওয়া হইত। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে সুইডেনএ যে লোকগণনা প্রবর্তন করা হয়, উহা প্রথমে ফিনল্যাণ্ড এবং আরও পরে নরওয়েতে চালু করা হয়। বৃহত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে রাশিয়াই সর্বশেষে আদমসুমারি আরম্ভ করে। প্রথমে রাজস্ব, সৈন্যবল ও শাসন-সংক্রান্ত খবরাখবরের জন্য গণনা কার্য হইত, কিন্তু উহা তেমন ফলপ্রসূ না হওয়ায় শেষে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সুসংহত ধারায় আদমসুমারি আরম্ভ হয়।

কিন্তু সব দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রকেই বর্তমান আদমসুমারির উৎপত্তি স্থল বলা যাইতে পারে। অধ্যাপক ফন মায়ার যথার্থই বলিয়াছেন যে, যদি 'আদমসুমারি' যথা অর্থে কোথাও কৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা যুক্ত-রাষ্ট্রেই, অন্য কোথাও নহে। এত বিশাল ও বিস্তৃত জনপদ, এত বিচিত্র ও ছত্রিশ জাতি অধিবাসিত মহাদেশের গণনা কার্য কি করিয়া এমন সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিতরূপে সম্পাদিত হয় ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এইজন্যই সেই ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে যে নীতিতে আদমসুমারির সূত্রপাত হয়, আজ পৃথিবীর তিন পঞ্চমাংশের লোকগণনা সেই নীতি অনুসারেই হইতেছে। আমেরিকার গণনায় প্রথম হইতে কৃষি কার্য, শিল্প বাণিজ্য ও কলকারখানার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তথ্য লইয়া উহাকে আরও ব্যাপক আরও উন্নত করিবার চেষ্টা হইতেছে। আদমসুমারির সুবিধার জন্য ও ইহা নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রস্তুত হয় এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সকল দিক বিবেচনা করিয়া ওই সকলকে তথ্যবহুল করিবার ব্যবস্থা হয়। ইহার পর আদম-সুমারি-সংক্রান্ত আইন রচিত হয় এবং ইহার স্থায়ী অফিস গঠিত হয়। ইহাতে সর্বত্রই আদমসুমারি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ফলে, পরবর্তী সময়ে যে লোকগণনা হয়, তাহার রিপোর্ট প্রস্তুত হইলে দেখা যায় এত ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রণালীতে লোকগণনা ও রাষ্ট্রের সমুদয় তথ্য সংগ্রহ পৃথিবীর কুত্রাপি হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি শিল্প, কলকারখানা প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ে এত খুঁটিনাটি ও সযত্ন পরীক্ষা করা হইয়াছে যাহার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আজ বিশ্বের শিল্প কেন্দ্রগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এবং ইহা সম্ভব হইয়াছে শুধু সুনিয়ন্ত্রিত ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় আদমসুমারি প্রবর্তনের ফলে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ গণনা কার্যে বৈদ্যুতিক হস্তের প্রচলন। যুক্তরাষ্ট্রের মত বিশাল মহাদেশে এত বিস্তৃত পদ্ধতিতে লোকগণনার হিসাব করিতে গেলে গণনাকারীও যেমন অসংখ্য দরকার, তেমনি প্রভূত সময়েরও প্রয়োজন। তাই বিদ্যুৎ যন্ত্রের সাহায্যে গণনা কার্যের হিসাবাদি সম্পাদিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আমেরিকার লোকগণনার ব্যয়ভারও অত্যন্ত বেশী—সর্বাপেক্ষা বেশী। নিম্নে উহার একটি আভাস দেওয়া হইল।—

সন	মোট সমষ্টি। ডলারের হিসাব	শতকরা গড়পড়তা। ডলারের হিসাব
১৭৯০	৪৪,৩৭৭	১·১২
১৮০০	৬৬,১০৯	১·২৪
১৮১০	১১৮,৪৪৫	২·৪৬
১৮২০	২০৮,৫২৬	২·১৬
১৮৩০	৩৭৮,৫৪৫	২·৯৪
১৮৪০	৮৩৩,৩৭১	৪·৮৮
১৮৫০	১,৪২৩,৩৫১	৬·১৩
১৮৬০	১,৯৬৯,৩৭৭	৬·২৬
১৮৭০	৩,৪২১,১৯৮	৮·৮৭
১৮৮০	৫,৭৯০,৬৭৮	১১·৪৮
১৮৯০	১১,৫৪৭,১২৭	১৮·৩৩
১৯০০	১৬,১১৬,৯৩৬	২১·১৬

ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আদমসুমারিকে জাতীয় জীবনে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাইবার নিমিত্ত শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। ইংলণ্ডেও যথেষ্ট ব্যয় করা হয়, তবে ইহার তুলনায় তাহা বৎসামান্য। যুক্তরাষ্ট্রে গণনাকারীদের ও অফিসের কর্মচারীদের প্রচুর পরিমাণে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, সেই তুলনায় ইংলণ্ডে প্রত্যেক পরিবারে বয়স্থ লোকদিগকে বিনা পারিশ্রমিকে গণনা কার্যে সহযোগিতা করিতে হয়।*

আরও এক কারণে আদমসুমারি এত অধিক কার্যকরী হইয়া উঠিয়াছে। আদমসুমারি কমিটি প্রতি দশ বৎসর অন্তে ইহার গণনা কার্যের বিবরণী ছাড়াও সমাজ ও রাষ্ট্রের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রায়ই জনসাধারণে প্রকাশ করিয়া থাকেন। বস্ত্র বয়নের জন্য কার্পাস তুলা পেঁজা যুক্তরাষ্ট্রে একটি বড় উপজীবিকা। সেই কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি, পরিশ্রমের হার, রাস্তাঘাট, আলো ও স্বাস্থ্য, জন্মমৃত্যু, আতুর আশ্রম হাসপাতাল প্রভৃতি দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে তাঁহারা নিয়মিত সংবাদ প্রচার করিয়া এগুলিকে সাধারণের মধ্যে পরিচিত করাইতে চেষ্টা করেন।

ভারতবর্ষে আদমসুমারির সূত্রপাত হয় ১৮৭২ সালে। ইহারও পূর্বে লোকগণনা হইত, কিন্তু তখন না ছিল কোন প্রশ্নপত্র না ছিল তারিখ বা অন্য কিছু। অবশেষে ১৮৭২ সালে লর্ড রিপন ইহাকে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তিতে আনিয়া সুনিয়ন্ত্রিতপদ্ধতিতে গণনা আরম্ভ করেন। ইহা তাঁহার অন্যান্য সৎকর্মসমূহের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতবর্ষে লোকগণনায় অন্যান্য দেশ অপেক্ষা স্বভাবতই কিছু অসুবিধা ঘটে। একে ব্যয় সংক্ষেপ করা হয় তায় শতকরা পাঁচ সাত জনের বেশী লিখিতে পড়িতে জানে না। ফলে, আদমসুমারির উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে কেহ বিশেষ আগ্রহান্বিত নহে। অপর পক্ষে যাহারা গণনা কার্য করে, তাহারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না বলিয়া তেমন উৎসাহ বোধ করে না। তা ছাড়া, তাহাদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতা তো আছেই। কাজেকাজেই দেশের বার আনা অংশের অনুন্নত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের বিশেষ তথ্য সংগৃহীত হয় না। এখানে লিখন পঠনক্ষম লোক বেশী নাই বলিয়া এরূপ বিরাট গণনা সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয় না। এই কারণে প্রত্যেক প্রদেশের মহকুমা, থানা অথবা ইউনিয়ন এবং নগরস্থিত ওআর্ড ছোট ছোট ব্লকে বিভক্ত করিয়া উহা এক-একজন কর্মচারীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং নিয়ম করা হয়, প্রথমে উক্ত কর্মচারী একটি প্রাথমিক গণনা করিবে এবং উহাকেই ভিত্তি করিয়া যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এক রাত্রিতে সমস্ত গণনাকারীরা পুনরায় তাহাদের স্ব স্ব এলাকা পরিদর্শন করিবে। যদি দেখা যায় পূর্বগণিত প্রাথমিক তালিকার কেহ অনুপস্থিত আছে তাহা হইলে তাহাকে বাদ দিয়া দেওয়া হয় এবং নূতন আগন্তুকদের তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রত্যেক ব্লকে ৩০০ জন পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। এই এক রাত্রির গণনার কালে বিশেষ কেহ বাদ যায় না; আবার দুইবার গণনাও হয় না। কারণ দুইবার গণনা করাইতে গেলে পূর্বস্থানে প্রাথমিক তালিকা হইতে একবার নাম কাটা পড়িবে। অতএব ফল একই অসিবে। এইরূপে গণনা করাইতে গেলে, অন্তত এক লক্ষ লোকের প্রয়োজন হইয়া থাকে এবং গণনার প্রশ্নপত্রসমূহ বাছাই করা হিসাব করা প্রভৃতি কার্যেও উহার একদশমাংশ লোকের দরকার হয়। তবে শেষোক্ত সংখ্যাটি সংগ্রহ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। অফিসের ও পৌরপ্রতিষ্ঠানের কেরানীবৃন্দ, গ্রামের আদমসুমারির লিপিকারগণ কার্য করিয়া থাকেন। যদিও ইহাতে কাজগুলি সুসম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় না, তথাপি মাঝে মাঝে বেশ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোকেরও সাহায্য পাওয়া যায়। ইহাদের হাতখরচা ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া হয় না এবং কার্যশেষে স্থানীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী লিখিত এক-একখানি ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ১৯০১ সালের আদমসুমারি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সে বৎসর অভূতপূর্ব তৎপরতার ফলে মাত্র পনের দিন বাদেই ইহার ফলাফল প্রকাশিত হয়, তবে প্রাথমিক গণনা ও 'শেষরাত্রি'র গণনার মধ্যে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকে। ভারতে আদমসুমারির প্রশ্নপত্র অন্যূন কুড়িটি ভাষায় লেখা হয় এবং প্রশ্নগুলি যথাসম্ভব সহজ করিয়া ব্যক্ত করা হয়। স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা, বয়স, নাগরিক অথবা গ্রাম্য অবস্থা, জন্মস্থান, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গতিবিধি, শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবিকা, স্বাস্থ্য, মাতৃভাষা, জাতিধর্ম, জাত ইত্যাদি। (আগামীবারে সমাপ্য)

* "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" হইতে গৃহীত।
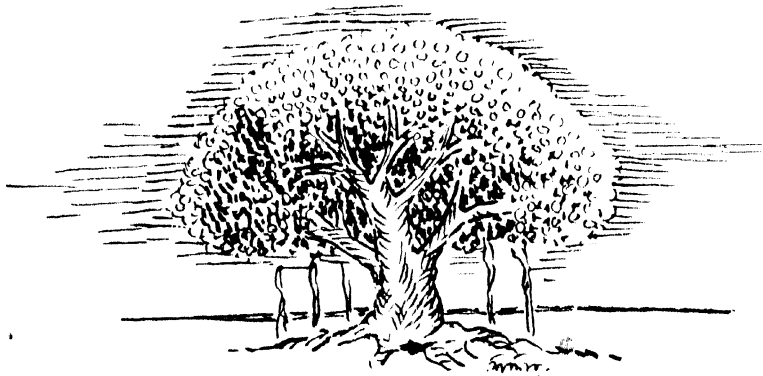
মনে ছিল আশা

(উপন্যাস)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

[২]

অমল যেখানে ছেলে পড়াইত সেই বংশের অর্থের খ্যাতি এককালে খুবই ছিল। বাহিরের বৃহদাকার থামগুলি ভগ্নপ্রায় হইলেও এখনও তাহারা সেই খ্যাতির সাক্ষ্য দিতেছে। প্রকাণ্ড বাড়ি অনেকগুলি শরিক; এবং সকলেই কিছু কিছু উপার্জন করে। কিন্তু এমন কিছু করে না যাহাতে ঐ বৃহদায়তন বাড়িটিকে সারানো চলে। হয়তো কোনও কোনও শরিকের হাতে সামান্য কিছু আছে, কিন্তু সে পয়সা তাঁহারা পাঁচ ভূতের সম্পত্তিতে খরচ করিতে প্রস্তুত নন। সুতরাং বাড়িটি আজও সেই ভগ্নুর অবস্থায় দাঁড়াইয়া অতীতের গৌরব এবং বর্তমানের লজ্জা ঘোষণা করিতেছে।

অমলের আহ্বানে ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন একটি পাঁচহাতী ধুতি পরিয়া তেল মাখিতে মাখিতে। অফিসের সময় হইয়াছে, সুতরাং ভ্রূ কুঞ্চিত।

"আরে মাস্টার যে! কি খবর বলুন দেখি?"

অমল বিনীতভাবে কহিল, "একটা সোনার আংটি রেখে গোটা দুই টাকা ধার দিতে পারেন? আপনার কাছে সুবিধে না হ'লে যদি আর কাউকে ব'লে দেওয়াতে পারেন তা হ'লেও ভাল হয়।"

ভদ্রলোক অকারণ পেটে হাত ঘষিতে ঘষিতে মুহূর্ত কয়েক ছোট ছোট চোখ মেলিয়া অমলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর কহিলেন, "বেশভূষার তো ওই ছিরি, অবস্থাও শুনেছি অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ, তবে আবার রেসের শখ কেন?"

মুহূর্তে যেন অমলের কান হইতে আগুন ছুটিতে লাগিল। ইন্দুর অবস্থাও কল্পনা না করাই ভাল; কিন্তু তবুও অমল প্রাণপণে সংযত হইয়া জবাব দিল, "আজ্ঞে, রেস নয়।"

ভেংচি কাটিয়া ভদ্রলোক কহিলেন, "আজ্ঞে না, রেস নয়! আজ শনিবার; আংটি বাঁধা রেখে টাকা ধার করতে এসেছেন কি জন্যে শুনি? হয় রেস, নয় শ্বশুরবাড়ি, নইলে শনিবারে গয়না বাঁধা রেখে কেউ টাকা ধার করে? শ্বশুরবাড়িও তো নেই শুনেছি,—তবে?"

অমল প্রায় মরিয়া হইয়া জবাব দিল, "আমার এই বন্ধুটির বিশেষ দরকার, যদি দিতে পারেন তো দিন, আমার আর অপেক্ষা করবার সময় নেই।"

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর হঠাৎ আশ্চর্য রকম নরম হইয়া গেল। পেটে তেল ঘষা মিনিটখানেকের জন্য বন্ধ রাখিয়া একবার ইন্দুর আপাদমস্তক চোখ বুলাইয়া লইলেন, তারপর কহিলেন, "তা আমি খারাপ কথাটা কি বলেছি? আজকাল ওই ক'রে সবাই উচ্ছন্নয় যাচ্ছে তাই একটু সাবধান ক'রে দিচ্ছিলুম—তা টাকা আপনাকে না হয় দিচ্ছি, কিন্তু ওসব আংটি ফাংটিতে আমার দরকার নেই।"

সামান্য একটু বিদ্রূপের সুরে অমল কহিল, "না, না আংটিটা নিয়েই রাখুন, যদি পালিয়ে যাই?"

ভদ্রলোক আবার উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, "ওসব ঠাট্টা-তামাশা বোঝবার মত বয়স আমার হয়েছে, ওসব আমি বুঝি। টাকার দরকার থাকে তো নিয়ে যান, আংটি বাঁধা রাখতে আমি পারব না। টাকা ধার দেওয়া আমার পেশা নয়।"

তাহার পর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই প্রাণপণে চেঁচাইতে শুরু করিলেন, "পচা, এই পচা, হতভাগা মরেছ? ডাকাত পড়লে শুনতে পাও না?"

ভিতর হইতে প্রায় সমান সুরেই জবাব আসিল, "কি হয়েছে কি? আমি কি বাতাসে উড়ে যাব নাকি? কি চাই?"

ভদ্রলোক দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিলেন, "দেখেছেন আঁটকুড়ীর ব্যাটার তেজ দেখছেন?—ওগো নবাব পুত্তুর, শিগগির তোমার মায়ের কাছ থেকে দুটো টাকা চেয়ে এনে মাস্টার মশাইকে দাও!—আমার নাম করে চাইবি বুঝেছিস?"

তার পর অমলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "টাকাটা নিয়ে যাবেন, আমার চান করার টাইম পেরিয়ে গেল আমি চললুম।—শালা ছোটসাহেব এবার বিলেত থেকে ফিরে এসে ইস্তক যা পেছনে লেগেছে, একটি মিনিট লেট হবার জো নেই।"

অল্পক্ষণ পরেই ভিতর হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতে লাগিল, "নিয়ে গেলি তাড়াতাড়ি? বাবুরা আবার হয়তো এক্ষুনি রাগ করে চলেই যাবেন। এক কড়ার মুরোদ নেই, পাছাভরা ঝাল আছে খুব!—ইঃ!"

ইন্দুর মুখ লাল হইতে ক্রমশ পাংশুবর্ণ ধারণ করিতেছিল। অমল তাহার দিকে চাহিতেই সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "চলুন অমলবাবু, অন্য জায়গায় যাই, এখান থেকে টাকা নিয়ে দরকার নেই।"

অমল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "এইতেই নার্ভাস হচ্ছেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাগজ বেচবেন কি করে?"

ইন্দু সহসা জবাব দিতে পারিল না। ইতিমধ্যে পচা আসিয়া অমলের হাতে টাকা দুইটি দিয়া গেল। রাস্তায় নামিয়া অমল আংটি ইন্দুর হাতে দিয়া কহিল, "এটা রেখে দিন তা হলে, ভালই হল, আপনার মায়ের আংটিটা বাঁধা পড়ল না।"

ইন্দু একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "কিন্তু আংটিটা আর কোথাও বাঁধা রেখে আর দুটো টাকা নিলে হত না?"

আশ্চর্য হইয়া অমল কহিল, "কেন?"

ইন্দু জবাব দিল, "টাকা দুটো ইনি এমনিই দিলেন যখন, তখন আপনার মাইনে থেকেই কেটে নেবেন তো? আপনি কি করে আপনার সব খরচ চালাবেন?"

অমল একটু ভাবিয়া জবাব দিল, "বোধ হয় তা করবে না, ঠিক সে প্রকৃতির লোক নয়। আর যদিই করে, আমরা দু-এক দিনের মধ্যে কি আর এ দুটো টাকা তুলে নিতে পারব না?"

ইন্দু চুপ করিয়া রহিল, বোধ করি তাহার উৎসাহ ইতি-মধ্যেই কমিয়া আসিয়াছিল। অমল তাহা লক্ষ্য করিয়া খানিক পরে কহিল, "আপনি এরই মধ্যে যেন দমে গেছেন বলে মনে হচ্ছে। দেখুন, এখনও সময় আছে।"

ইন্দু প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, শেষ পর্যন্ত আমি দেখবই।"

তখন অমল আর কোনও কথা না কহিয়া সোজা বড়-বাজারের রাস্তা ধরিল। কারণ স্থির হইল যে প্রথম প্রথম এক রকমের কাগজ লইয়া চেষ্টা করাই উচিত এবং তাহা আনন্দ-বাজার পত্রিকা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আনন্দবাজার অফিসে টাকা দুইটি জমা দিয়া বাহির হইয়াই ইন্দু কহিল, "তা হলে কাল রাত তিনটেয় উঠতে হবে, কি বলুন?"

অমল কহিল, "না, সাড়ে চারটেয় উঠলেই হবে, এখানে তো পাঁচটার আগে কাগজ দেবে না।"

ইন্দু বাধা দিয়া কহিল, "না না, আপনি বুঝছেন না; ভয়ানক ভিড় হবে, শেষকালে খোট্টাদের ভিড় ঠেলে আমরা কাগজ নিতেই পারব না। তা ছাড়া এতটা পথ হেঁটে যেতে হবে তো?"

আরও অনেক আলোচনার পর দুইজনে মেসে ফিরিল; উত্তেজনায় সেদিন দিন রাত্রির মধ্যে ইন্দু একবারও বই খুলিতে পারিল না। অমলেরও সারা রাত ঘুম হইল না। দুইজনেই রাত্রি সাড়ে চারটার সময় বাহির হইয়া পড়িল এবং কম্পিত বক্ষে আনন্দবাজারের অফিসে উপস্থিত হইল। পথে কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলিল না, দুজনেরই মনে বোধ করি এমন অবস্থা যে টাকা দুইটির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া যেন পলাইতে পারিলেই তাহারা বাঁচে।

কাগজের অফিসে গিয়াও দেখে সে এক বিশ্রী কান্ড। ঠেলাঠেলি, মারামারি, যত হিন্দুস্থানীর গোলমাল। তাহার মধ্যে শার্টপরা বাঙালী যুবকের অগ্রসর হওয়াই মুশকিল। প্রায় আধ ঘণ্টা তাহাদের একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল, কেহ যে বক্র কটাক্ষ বা পরিহাস করিল না এমন নয়, কিন্তু তখন আর উপায় কি। অবশেষে একটি হিন্দু-স্থানীরই দয়া হইল, সে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কি চাহি বাবু আপনাদের?"

অমল ঢোঁক গিলিয়া শুষ্ককণ্ঠ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে করিতে কথাটার জবাব দিল। লোকটি একটু হাসিয়া কহিল, "কাগজ কি আপনিরা বিচ্‌তে পারেন বাবুজী, কেন মিছিমিছি তকলিফ করেন?"

অমল বলিল, "তবুও একটু চেষ্টা না করলে তো চলবে না।"

সে কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা আপনি দাঁড়ান, হামি দেখছি।"

সে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই অমলদের কাগজ বাহির করিয়া দিল। অমল ও ইন্দু তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাড়াতাড়ি রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু ততক্ষণেই আকাশ বেশ ফরসা হইয়া গিয়াছে, এমন কি কাগজ বিক্রিও শুরু হইয়াছে। সেই দিবালোকের মধ্য দিয়া প্রথমত কাগজ বহিয়া লইয়া যাওয়াই কঠিন, তাহার উপর গন্তব্যস্থানে পেৌঁছিতে বেলা হইলে কাগজ বিক্রীই বা হইবে কখন? দুজনে যথাসম্ভব সত্বর পা চালাইয়া চলিল। অত-গুলি কাগজ ঢাকিয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব সুতরাং কোনও মতে ঘাড় নীচু করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল।

চৌরঙ্গি পার হইয়া যখন তাহারা ভবানীপুরে পড়িল, তখন প্রায় সাতটা। লোকজন রীতিমত রাস্তা চলিতে শুরু করিয়াছে, হিন্দুস্থানী কাগজওয়ালারা ছুটাছুটি করিয়া কাগজ বেচিতেছে, ট্রাম ও বাসের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিতেছে, যাত্রীদের পিছনে পিছনে তাড়া করিতেছে, কেহ বা তারস্বরে চিৎকার করিতেছে।

প্রথম দুটি তিনটি মোড় তাহারা ফেলিয়া চলিয়া গেল এই ভরসায় যে হয়তো আগে কাগজওয়ালা অপেক্ষাকৃত কম; কিন্তু কিছু দূরে গিয়াই বুঝিল সর্বত্রই সমান।

তখন অমল কহিল, "আর গিয়ে লাভ নেই ইন্দুবাবু, আসুন এখানেই আরম্ভ করি।"

কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া ইন্দুর মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছে, সে যেন আর কোনও মতেই ঘাড় তুলিতে পারে না। শুষ্ক-কণ্ঠে কি বলিতে গেল তাহাও স্পষ্ট বোঝা গেল না। তাহার কপালে ঘাম দেখা দিল।

এধারে অমলের অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। সে কিছুতেই ট্রাম বা বাসের কাছে গিয়া কাগজ দেখাইতে পারিল না। এ শহর তাহার জন্মভূমি নয়, এখানে পরিচিতের সংখ্যা অতি অল্প, তাহাকে কাগজ বেচিতে দেখিয়া বিস্মিত হইবে এমন লোক কেহ নাই বলিলেই চলে, তথাপি বিশ্বের সমস্ত লজ্জা যেন আজ তাহার মাথায় চাপিয়া বসিতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ একটা থামের পাশে কাগজগুলি উঁচু করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু কোনও ক্রেতাই তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না।

মিনিট পনের পরে অমল কহিল, "ইন্দুবাবু, বেলা বেড়ে যাচ্ছে, আসুন দুজনেই একসঙ্গে বাসগুলোতে কাগজ দেখাই।"

ইন্দু একবার ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলিয়া রাস্তার দিকে চাহিল, তার পর কোনও মতে বুকে সাহস সঞ্চয় করিয়া অমলের সহিত নামিয়া আসিল। কিন্তু ঠিক যে মুহূর্তে একটা বাস আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য গতি মন্থর করিল সেই মুহূর্তেই সে পিছাইয়া যতটা সম্ভব অমলের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সব সহপাঠী ও তাহাদের আত্মীয় স্বজনের মুখগুলি মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহাদের ভবানীপুরের দিকে বাসে চড়িয়া আসিবার সহস্র সম্ভাবনার কথা তাহার মাথার মধ্যে ভিড় করিতে লাগিল। ফলে তাহার বুক ঢিপঢিপ করিতে লাগিল, ঘামে কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গেল।

অমলও বাসের কাছে গেল বটে, কিন্তু ঘাড় নীচু করিয়া

একখানা কাগজ একটা জানালার দিকে মেলিয়া ধরা ছাড়া আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। ভদ্রসন্তান দেখিয়া এক ভদ্রলোক দুইটি হিন্দুস্থানী কাগজওয়ালার প্রসারিত হস্ত ঠেলিয়া দিয়া তাহারই হাত হইতে কাগজখানি টানিয়া লইলেন এবং একটি দুআনি বাহির করিয়া কহিলেন, "ফেরত দাও শিগগির।"

অমল বিষম বিব্রত হইয়া মূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পকেটে একটি পয়সা নাই। বাস ততক্ষণে ছাড়িয়া দিয়াছে। ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "পয়সা নেই? তা হ'লে আর কি হবে, কাগজ নিয়ে নাও তোমার।" বলিয়া চলন্ত বাস হইতে কাগজখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কাগজটা ফুটপাথের ধারে নরদমার উপরে গিয়া পড়িল। অমল লজ্জায় মুখ-চোখ লাল করিয়া কাগজখানা তুলিয়া লইল; কিন্তু মানসিক ধিক্কারে তাহার দেহ তখন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আর একখানি বাস সঙ্গেসঙ্গেই আসিয়া পড়া সত্ত্বেও সে কাগজ বেচিবার চেষ্টামাত্র করিল না।

একটি হিন্দুস্থানী কাগজওয়ালা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "বাবু, ইয়ে আপলোগ্‌কা কাম নেহি; হমকো সব দে দিজিয়ে, হম এক-এক পয়সা করকে দাম দে দেগা।"

ইন্দু ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মাথা না তুলিয়াই কহিল, "অমলবাবু, চলুন বাসায় ফিরি, এ আমি কিছুতেই পারব না।"

তাহার গলায় কান্নার সুর!

অমলেরও কথা কহিবার মত অবস্থা ছিল না। সে তখন অশিক্ষিত কাগজওয়ালা ও সমবেত দুই-চারিজন পথিকের কৌতুকের দৃষ্টি হইতে কোনও মতে ছুটিয়া পালাইয়া যাইতে পারিলে বাঁচে। পয়সা উপার্জ্জন না হয়, আত্মহত্যার পথ তো কেহ ঘোচায় নাই! তাহার দুই কান দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল।

কাগজওয়ালাটা নিজেই কাগজ গনিয়া পয়সা হিসাব করিয়া দিল, সেগুলি দেখিবার বা গনিবার চেষ্টা না করিয়া অমল ও ইন্দু প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসেই মেসের পথ ধরিল।

[৩]

পথে কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিল না। দৈহিক ক্লান্তি পরাজয়ের গ্লানি, নৈরাশ্য ও লোকসানের চিন্তা দুজনকেই রীতিমত মোহ্যমান করিয়া দিয়াছিল।

মেসের সামনে আসিয়া ইন্দুই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, "আপনার বিশেষ দরকার বলছিলেন, ওই ভাঙ্গা পয়সাগুলো আপনিই রেখে দিন, পরে যখন আপনার সুসময় আসবে দেবেন। আর ও দুটো টাকা আমি যেমন করে পারি শোধ করে দেব।"

তাহার পর উত্তরের অবসর মাত্র না দিয়া সে নিজের ঘরে উঠিয়া গেল। অমলেরও তখন উত্তর দিবার মত অবস্থা নয়। এই পয়সাগুলি কিছুতেই তাহার এভাবে লওয়া উচিত নয় তাহা সে অনুভব করিলেও পয়সাগুলি সে ছাড়িতে পারিল না। কোনও মতে ক্লান্ত পা দুইটা টানিয়া লইয়া নিজের বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। কাল ইন্দুর উৎসাহে এবং প্ররোচনায় যেটুকু আশার আলো দেখা দিয়াছিল আজ তাহা আরও অনেকখানি অন্ধকার করিয়া দিয়া নিবিয়া গেল। ভদ্রসন্তানের এই মুখোশটা না খুলিয়া ফেলিলে তাহাদের দ্বারা ওসব কাজ হইবে না, কাজেই অনর্থক ওসব চেষ্টা করিয়া লাভ নাই তাহা সে আজ পরিষ্কার বুঝিল।

মেসের ঠাকুর কি একটা কাজে উপরে উঠিতেছিল। অমলের ঘরের সামনে আসিয়া তাহার অতিশয় শুষ্ক ও মলিন মুখ দেখিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। তখন মেসের প্রায় সকলেই বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, নীচে শুধু ঝি ও চাকরের কলহের একটা শব্দ হইতেছে, তা ছাড়া সমস্ত বাড়িটাই নির্জ্জন। ঠাকুর মিনিটখানেক ইতস্তত করিয়া ডাকিল, 'বাবু'।

অমল চোখ মেলিয়া ঠাকুরকে দেখিয়া রীতিমত বিস্মিত হইয়া গেল। কহিল, 'কি গো, ঠাকুর?'

ঠাকুর একবার মাথাটা চুলকাইয়া লইয়া কহিল, "ভাত-তরকারি অনেক বেঁচেছে বাবু, আপনি যদি বাইরে থেকে খেয়ে না এসে থাকেন তো এইখানেই খেয়ে নিন না। ফেলা যাবে বই তো না।"

অন্তত ছয়টি পয়সা বাঁচিয়া যায় বটে। কিন্তু অমলের ভিতরকার ভদ্রসন্তান ধিক্কার দিয়া উঠিল। সে যথাসাধ্য লজ্জা গোপন করিয়া স্বাভাবিক সুরে কহিল, "ঠাকুর আজ যে আমার শনিবারের উপোস আজ তো খাবার জো নেই।"

ঠাকুর কহিল "ওঃ, তাই মুখ শুকনো দেখাচ্ছে। তা বাবু, গ্রহ ফাঁড়াকে তুষ্ট রাখা ভাল। ওঁয়ারাই দুঃখু দেবার মূল কিনা।"

ঠাকুর নামিয়া গেল। অমলের দুইকান অপমানে তখনও জ্বালা করিতেছে। এই লোকটি যে নিতান্ত দয়া করিয়াই ভাত-তরকারির প্রাচুর্য্যের কাহিনী তাহাতে শুনাইল, তাহাতে সংশয়মাত্র ছিল না। এত দিন এই মেসে আছে, প্রথম সহানুভূতির কথা সে শুনিল অশিক্ষিত পাচকের কাছে। ভদ্রলোকের চেয়ে ইহারা ভাল।

অনেক দিক দিয়াই ভাল। খাওয়া ও দশ টাকা মাহিনা তো এই ঠাকুরই পায়। ইহা ছাড়া গামছা, জলখাবার, তামাকের খরচা ধোপা, নাপিত সমস্তই মেসের। নীচের ঘরে শুইতে হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতিই বা কি? সীটরেণ্ট দিয়াই বা সে কি সুখে আছে?

অমল অকস্মাৎ সোজা হইয়া বসিল। তাহার নিমীলিত চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল। যে পথে চলিয়াছে সে পথে তো কোথাও কোনও আশার আলো দেখা যায় না। এই দীর্ঘ দিনের চেষ্টার পরে সে আজ ক্লান্ত, অবসন্ন। বেশ তো এই ভদ্রসন্তানের মুখোশ ঘুচাইয়া দিয়াই দেখা যাক ফল কি হয়।

বাল্যকালে অমল বেশী মায়ের কাছে-কাছেই থাকিত, অনেক দিন তাঁহাকে রন্ধনে সাহায্যও করিতে হইয়াছে; মোটা-মুটি রান্নার ব্যাপার সে খানিকটা জানে। ছেলে ঠ্যাঙ্গানোর অপেক্ষা এ কাজ অনেক বেশী আরাম দায়ক।

অমল নূতন প্ল্যানের উত্তেজনায় আর বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিল।

এখান হইতে অনেক দূরে পরিচিত সমস্ত গণ্ডীর বাহিরে সে নূতন করিয়া জীবনযাত্রা শুরু করিবে; অদৃষ্টের কাছে সে মাথা নোয়াইবে না, কোনমতেই না!

তিন দিনের দিন সে মাহিনা পাইল। মাহিনার টাকা হইতে সে দুইটি টাকা কাটাইয়া দিতে গেল, কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই রাজী হইলেন না। কহিলেন, "মাস্টার, সবইতো বুঝি, মাইনে তো এই দশ টাকা। এক সঙ্গে দুটো টাকা কাটিয়ে দিতে গেলে গায়ে লাগবে। দেবেন'খন পরে পশ্চাতে, সুবিধে মত।"

অগত্যা অমলকে কথাটা ভাঙ্গিতে হইল। সে মাথা নীচু করিয়া কহিল, "হয়তো আমি কলকাতা থেকে চ'লে যেতে পারি।"

ভদ্রলোক একরকম ঠেলিয়াই তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন, "বেশ, বেশ, তাই হবে। আমার ওই অকাল-কুষ্মাণ্ড ছেলেকে পড়াতে সে কী মেহনত তা তো আমি জানি। বুঝব যে ওই দুটো টাকা আপনাকে সন্দেশ খেতে দিলুম। এখন টাকাটা পাচ্ছেন নিয়ে বাড়ি যান,—অত সাধুপনা কেন?"

অমল আর দ্বিরুক্তি করিল না। সাধুপনা দেখাইবার শক্তি বা প্রবৃত্তি, কিছুই তাহার ছিল না। সে মেসে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যেই কাগজ বিক্রির ফেরত পয়সা হইতে অত্যাবশ্যক কাপড়-জামা সে কাচাইয়া লইয়াছিল; অবশ্য সে বেশীও নয়। পাশের সীটের ভদ্রলোক কাগজ কিনিতেন, তাঁহারই সেলফ্ হইতে একখানা পুরাতন কাগজ টানিয়া লইয়া খান তিন চার পুরাতন কাপড়জামা জড়াইয়া লইল, তাহার পর ইন্দুকে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল। কাগজ ও খাম সে সংগ্রহই করিয়া আনিয়াছিল।

ইন্দুবাবু,

এভাবে আর কিছুতেই চলল না; নতুন চেষ্টায় চললুম। ব'লে যাওয়া সম্ভব হ'ল না কারণ মেসের অনেক পাওনা রইল। সে টাকা দিতে গেলে এখনই ভিক্ষায় বেরতে হবে নইলে উপবাস। যদি সম্ভব হয় তো এর পরে পাঠিয়ে দেব। আপনার সে টাকা দুটি আমি শোধ ক'রে এসেছি; তার জন্য কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা করবেন না। তবে যদি আপনার কিছু দেয় আছে ব'লে মনে করেন তো রাঘব ঠাকুরকে চার আনা পয়সা আমার নাম ক'রে দেবেন। নমস্কার। ইতি—

খামের মধ্যে কাগজখানি আঁটিয়া ঠিকানা লিখিয়া চুপি-চুপি মেসের লেটার বক্সে ফেলিয়া দিল। খুব সম্ভব ইন্দু এখন তাহার ঘরেই আছে, হয়তো পড়িতেছে; কিন্তু তাহার সহিত মুখোমুখি দেখা না করাই ভাল।

তখন আটটা বাজিয়াছে। দুই একজন ফিরিয়াছেন বটে কিন্তু বহু লোকই এখনও বাহিরে। ঠাকুর-চাকররা রান্নাঘরে ব্যস্ত। খবরের কাগজে জড়ানো প্যাকেটটি হাতে করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে সে চুপি চুপি বাহির হইয়া পড়িল। একবার বাহিরে দাঁড়াইয়া মেসের দিকে চাহিয়া লইল তার পর ধরিল সোজা হাওড়ার পথ।

ইচ্ছা করিয়াই সে ময়লা কাপড়জামা পরিয়াছিল; কারণ ভদ্রসন্তান বলিয়া পরিচয় সে আর দিবে না। উচ্চবংশ এবং শিক্ষার সম্মান রাখিবার জন্য এই তো সে প্রাণান্ত করিল. আর ও পরিচয়ে কাজ নাই। (ক্রমশ)

কসাইখানা

শ্রীসুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত

মানুষের এই সমস্ত পৃথিবী এ যেন কসাইখানা,
মূঢ় নাস্তিক দুরাশা তাড়িত হে মন-বিহঙ্গম
প্রান্তিক নীল গগনে চাহিছ কেন বা মেলিতে ডানা?
মাথার উপরে দেখ চোখ মেলে উদ্যত বল্লম।

অনাদি কালের কলুষ জমানো কুটিল অন্ধকারে
ধাঁধানো চোখের সমুখে দুলিছে আশার তীক্ষ্ণ ছুরি,
আসা ও যাওয়ার অবিরাম দোলে দিনে দিনে বারে বারে,
জীবনের পথে হয়ে গেছে হায় কত না হৃদয় চুরি।
বিরাট ব্যবসা কাঁচা মাংসের চলেছে দুনিয়া জুড়ে,
লাল রক্তের ললাটিকা পরা আরক্ত সন্ধ্যা,
কসাইখানায় ফসল ফলে না যত কেন মর খুঁড়ে,
মনের জমিনও মরুভূর মত হয়ে গেছে বন্ধ্যা।

লোনা রক্তের জমাট গন্ধে পৃথিবী হয়েছে ভারী,
ক্রোরাধ ছুরিতে নিমেষে নিমেষে লাগে ঘন সংঘাত
আর্তগলার ব্যথা চিৎকার ধ্বনিত একটি বারই,
আঁখি পল্লবে নামে তার পরে গভীর নিষুতি রাত।
দিবস রাত্রে সারা পৃথিবীটা জ্বলে জ্বলে ছারখার,
হাজার হাজার ক্ষুধিত চোখের আশার আগুনে ভাই,
আকাশে সাগরে আলোকে আঁধারে শুধু তারি হাহাকার
গলাটি বাড়ায়ে রয়েছি দাঁড়ায়ে অন্য উপায় নাই।

কালীদাসের কালে প্রসাধন

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ, বি এল

জাতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ বা কৃষ্টির বিবর্তনের সঙ্গে দেশে দেশে যুগে যুগে নারীর সজ্জা ও রূপবিলাসের তারতম্য দেখা যায়। এই রূপ চর্চার ক্রমোন্নতি হয়েছে অথবা অবনতি ঘটেছে তা বলা দুষ্কর। কারণ, দেখা যায় যে একযুগের পরিত্যক্ত ও রুচি বিগর্হিত অলংকার বা রূপসজ্জার সামগ্রী তার বহু পরের কালেও যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। রুচি নিত্যই বদলায়, বিশেষ করে নারীর ব্যবহার্য দ্রব্যে। তবে কুরুচি ও সুরুচি একান্ত তুলনামূলক বোধে, কোনও কালের রুচিকে কোনওরূপ বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে না।

বিজ্ঞান ও তৎসম্পর্কিত চারুকলার নিত্য উন্নতি সাধিত হচ্ছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, শেষ ভিকটোরিয়ান যুগের ভারতীয় মহিলাদের বিলাতী অনুকরণশীলতা অধুনা প্রায় বিলুপ্ত। কেশে বেশে অলংকারে সাজসজ্জায় আজিকার বাঙালী তরুণী ভারতীয় কৃষ্টির দ্বারা অনুশাসিত। এটা আনন্দের কথা এই জন্যে যে, যদি জাতি নিজের সংস্কৃতি ও আদর্শের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে তাকে ত্যাগ করে তা হ'লে জাতির জীবনে তার চেয়ে বড় দুর্দিন আর নেই।

কালিদাসের কালে অর্থাৎ যখন পাশ্চাত্য জগতের মেয়েরা রঙিন ঘেরাটোপে নিজেদের বরতনু আচ্ছাদিত ক'রে শ্লাঘা বোধ করতেন, সেই কালিদাসের যুগের প্রসাধন ও নারীসজ্জার বিশদ বিবরণ পড়লে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। আজ সুরুচিসম্পন্ন তরুণীর ড্রেসিং টেবিলে যে-যে প্রসাধন সামগ্রী সজ্জিত থাকে, ভিন্ন আকারে ও রূপভেদে প্রায় তার সকলগুলিই কালিদাসের কালের বরাঙ্গনাদের পেটিকায় সুসজ্জিত থাকত। শুধু দেহসজ্জার প্রকরণ নয়, স্নান প্রভৃতিও সেইকালে একটা অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গসজ্জার রীতি ব'লে গণ্য হ'ত। 'মেঘদূত' প্রভৃতিতে অনেক স্থানে 'তোয়ক্রীড়া' অর্থাৎ জলকেলির উল্লেখ দেখে মনে হয় যে, হয়তো সেকালে অবগাহন স্নানই বেশী প্রচলিত ছিল। কিন্তু স্নানের ঘর, অর্থাৎ 'বাথরুম' জাতীয় একটি ঘর সেকালের সমাজেও যে বর্তমান ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 'কুমারসম্ভব'এ আমরা পাই যে, গিরিরাজ হিমালয়ের বাটীতেও এইরূপ স্নানঘর ছিল। উমাকে বিবাহকালে যখন সুসজ্জিত করা হয়, ঠিক তার পূর্বে পুরনারীরা তাঁকে এই 'চতুঃস্তম্ভ-সমন্বিত' স্নানগৃহে নিয়ে যান। স্নানের পারিপাট্য সম্বন্ধে পুর-যুবতীদের অনেক বিধান ছিল। মেঘদূতের 'পূর্বমেঘ'এ আমরা 'ধারাযন্ত্র' অর্থাৎ আধুনিক 'শাওয়ার বাথের' বিশেষ উল্লেখ দেখি।

স্নানের সময় দেহ মার্জনা প্রভৃতির বিবরণ থেকে সেকালের শারীরতত্ত্বের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কেশে সুগন্ধি তেল ব্যবহারের বিশেষ প্রচলন ছিল। গায়ে তেল মাখা আজকাল একটু রুচিবিগর্হিত হ'লেও সেকালে তার প্রচুর ব্যবহার ছিল। কারণ 'কুমারসম্ভব'এ আমরা দেখতে পাই যে, উমার স্নানের সময় তাঁর তৈলসিক্ত দেহ থেকে 'লোধ্ররেণু' দিয়ে মেজে তেলটুকু তুলে ফেলা হয়েছিল। পরে **'কালেয়'** নামক একটি সুগন্ধি অঙ্গরাগ দিয়ে তাঁর গা ঘ'ষে স্নান করানো হয়।

স্নানের পরে আজকাল শৌখিন নারীরা পাউডার প্রভৃতি ব্যবহারে দেহের আর্দ্রতা দূর ক'রে থাকেন। কিন্তু সেকালে এই পাউডার প্রয়োগের পূর্বে আর একটি উপকরণ ব্যবহার করা হ'ত। সেটি হ'ল 'ধূপোষ্ণণা ত্যাজিতমার্দ্রভাবং' অর্থাৎ ঈষদুষ্ণ সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ার তাপে শরীরের ভিজে ভাবটি দূর করা। তার পর 'শুক্লাগুরু' অর্থাৎ শ্বেত অগরু ও পীত গোরোচনা দিয়ে দেহ মার্জনার প্রথা ছিল। বিদেশী অনুকরণে যে শ্বেত পাউডার শ্বেত মুখের 'ক্রীম' অথবা শ্বেত স্নো এখানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার বর্ণ হিসাবে শ্বেতকায়া পাশ্চাত্য রমণীর দেহে মুখে প্রযুক্ত হ'লেও কনকবরণী ভারতীয়ার বর্ণ সৌষ্ঠবের পক্ষে তা যথোপযুক্ত নয়। রূপদক্ষেরা এর বিচার ক'রে দেখবেন।

তার পর মুখে 'লোধ্ররেণু' অথবা কোনও সুগন্ধি অন্য ফুলের পরাগ মাখা নিয়ম ছিল। ভিজে চুল শুকনো হ'ত 'কেশ সংস্কার ধূম'এ। ধূপের সাথে অন্য কোনও গন্ধ দ্রব্যের ধুঁয়ায় চুল শুকানো ছিল পুরসুন্দরীদের ব্যসন। চোখে 'কালাঞ্জন' অর্থাৎ কালো অঞ্জন প'রে কালিদাসের কালের সুন্দরীরা তাদের ভ্রূভঙ্গীবিলাসে পুরুষদের মনে বিভ্রম জাগাত। আজ 'লিপস্টিক' নূতন ব্যবহার করছেন ভেবে নিলে আধুনিক তরুণীদের পক্ষে একটু ভুল করা হবে। সেকালেও এই এই জিনিসের ব্যবহার ছিল। কপালে 'তিলক' অথবা নানা কারুকল্পনার চিত্রিত 'টিপ' পরতে কালিদাসের কালে রমণীরা ভুলতেন না। 'অলক্তে' (আলতায়) পদযুগল রঞ্জিত করতে সেকালের রমণী একালের মতই সুদক্ষা ছিলেন। কেশপরিচর্যার অন্ত ছিল না। কবির সকল গ্রন্থে অনেক স্থানে 'নার্যাঃ' অর্থাৎ প্রসাধিকা নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা কে বা এদের বিশদ বিবরণ কোথাও নেই, তবে একথা স্থির যে, সে যুগে প্রসাধনকলা খুবই সমৃদ্ধ হয়েছিল। এবং সে বিষয়ে বিশেষ পটুতাসম্পন্ন এক শ্রেণীর নারীর অস্তিত্ব থাকা খুব আশ্চর্য নয়। কেশের 'চূড়াপাশ' অর্থাৎ খোঁপায়, 'সীমন্তে' অর্থাৎ সিঁথিতে চুলের বিনুনি প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন ফুল ব্যবহার করা হ'ত।

> হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
> নীতা লোধ্রপ্রসররজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
> চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
> সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

অর্থাৎ হস্তে লীলাকমল অলকে কুন্দকলি লোধ্ররেণু মাখার জন্য মুখ পাণ্ডুবর্ণ খোঁপায় গোঁজা কুরুবক, কর্ণে দোদুল্য-

মান শিরীষ ফুল ও সিঁথিতে লম্বমান কদম্ব। এই ছিল পুরনারীদের শৌখিন বেশ।

এ ছাড়া বিবাহকালে উমার কর্ণে আমরা 'যবপ্ররোহ' অর্থাৎ নূতন যবের শিষ গোঁজা দেখতে পাই। মনে হয়, সেটা বিবাহকালীন সজ্জার একটি অঙ্গ। কর্ণে কুন্ডলের স্থানে 'দন্তপত্রক' অর্থাৎ ফোটা কুন্দ ফুলের উল্লেখ দেখা যায়। বোধ হয় 'চারু কর্ণে' শিরীষ ফুল অথবা কুন্দ ফুল ঋতুভেদে ও রুচিভেদে ব্যবহৃত হ'ত।

অলংকারের মধ্যে গলার মুক্তামালা ও অন্যান্য হারের প্রচলন ছিল। কর্ণে নানা আকৃতির কুন্ডল এবং উজ্জ্বল স্বর্ণমন্ডিত কুন্ডল খুব আদরের সামগ্রী ছিল। এ ছাড়া একটু লম্বা ধরনের 'অবতংস' বা লম্বা কানের দুলের মত কোনওরূপে কর্ণাভরণ খুব ব্যবহৃত হ'ত। কারণ সাধারণত 'মেঘদূত' প্রভৃতি পড়লে মনে হয় বুঝিবা কানে ফুল ব্যবহারেরই নিয়ম ছিল। কিন্তু তা নয়। উমা যখন মাথা নীচু করে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করছিলেন তখন তাঁর কানের কুন্ডল খুলে প'ড়ে যায়। কুমারীদের মধ্যে কানে কুন্ডল ধারণের প্রথা যে খুব চালিত ছিল তা এর থেকে বোঝা যায়। এ ছাড়া হাতে অর্থাৎ কব্জিতে ও উপরের হাতে নানারূপ রত্নখচিত আভরণের উল্লেখ পাই। সেগুলি যে খুবই উজ্জ্বল হ'ত ও তার পালিশ যে খুবই উঁচুদরের ছিল তার প্রমাণ আমরা যেখানে এই 'বলয়কুলিশ' অথবা 'রত্নচ্ছায়া খচিত বলিভিঃ'র বিবরণ দেখি, সেইখানেই পাই। তবে একটি জিনিসের প্রচলন আজকাল আর দেখতে পাওয়া যায় না। সেটি 'শিঞ্জাবলয়' অর্থাৎ যে বালা ঝুনঝুন ক'রে বাজে। এই বালার উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। কালিদাসের কালের বিলাসিনীরা এই মৃদু বাজনার খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ কোমরে বাঁধবার 'রশনা'র সম্বন্ধেও আমরা 'ক্বনিত রশনা'র উল্লেখ দেখি। হয়তো পুরাতন 'গোট' ধরনের কোনও অলংকার থেকে এই রকম মৃদু ঝংকার হ'ত। আজ-কাল এই অলংকারটিরও আর প্রচলন নেই। যদিও আশা করা যায়, তৎকালীন তরুণীদের মত আজকালকার তরুণীরাও শ্রোণীভারে অলসগমনা।

পায়ে "শিঞ্জানূপুরে"এর বহুলে প্রচার ছিল ব'লেই মনে হয়। পরিধেয় শাড়ির রং যে বহু প্রকার হ'ত তা কয়েকটি উপমা থেকেই বোঝা যায়। "বালার্ক অরুণ" অর্থাৎ সকাল বেলার সূর্যের মত রং, নদীর নীল জলের রং, বেত্রবনের মত হলদে রং প্রভৃতি থেকে কত রকমের শাড়ি সে সময় ব্যবহৃত হ'ত তা বোঝা যায়। এইসব প্রসাধন সামগ্রী বাদে প্রসাধনের উপকরণ প্রভৃতিও সে সময় অতিশয় সুলভ ছিল। নানারূপ দর্পণ, স্বর্ণমুকুর প্রভৃতির উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, আয়নার ব্যবহার সে যুগে খুব বেশীই ছিল। কালিদাসের কালের প্রসাধনের এই ইতিবৃত্তের সঙ্গে আজকালকার প্রসাধন সম্ভারের তুলনা করলে অনেক রূপভেদ অথবা যুগোপযোগী পরিবর্তন হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু মুখ্যত সকল উপকরণ ও সামগ্রী যে একই আছে তা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই।

নারী

শ্রীশশাঙ্ককুমার পাত্র

জীবনের পথে দেখা দাও তুমি রহস্যময়ী নারী
কত শত রূপে, আজিও তোমারে তবু না বুঝিতে পারি।
শতবার দিই তোমারে ঘিরিয়া শত ছন্দের বাঁধ,
শত রকমেতে হেরিয়া তোমারে মেটে না আঁখির সাধ।
অন্তর-ভরা ব্যাকুলতা নিয়ে খুঁজি ও হৃদয়-তল
বার বার আমি হইয়াছি নারী হতাশায় নিষ্ফল।

প্রথম যেদিন অসহায় আমি অতি ধীরে চুপে চুপে
পশিনু হে নারী জঠরে তোমার ক্ষুদ্র সে ভ্রূণরূপে,
ছিল নাকো জ্ঞান, ছিল না চেতনা, মহাসুপ্তির মোহে
ছিলাম ঘুমায়ে, সে সময়ে তুমি অশেষ কষ্ট স'হে
নিজের দেহের রক্ত ও রসে দশ মাস দশ দিন
বিধাতার মত গড়িয়া তুলেছ আমার জীবন-বীণ।

তার পরে যবে মেলিনু নয়ন এই ধরণীর বুকে,
মাতা হ'য়ে তুমি বুকের পীযূষ ঢালিয়া দিয়াছ মুখে।
পরায়েছ টিপ কপালে আমার সাধিয়া চন্দ্রলেখা,
পরম স্নেহেতে দিয়েছ নয়নে কালো কাজলের রেখা।
কোলেতে দোলায়ে শুনায়েছ কত ঘুম পাড়ানির গান,
কবিতা হইয়া হৃদয়ে বিরাজে সেই সুমধুর তান।

কৈশোরে মোর বোন হয়ে তুমি ফিরিয়াছ সাথে সাথে,
আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে দিবসে মধুর রাতে।
বিছানায় শুয়ে শুনায়েছ কত তেপান্তরের গাথা,
দুয়োরানীমার দুঃখে ভিজেছে দুটি নয়নের পাতা।
রণে সুনিপুণ সাহসী বীরের সাহসে ভরেছে বুক,
ভূতের গল্প শুনিয়া আবার কেঁপেছি ঢাকিয়া মুখ।

প্রিয়া হয়ে তুমি যৌবনে মোর এসেছিলে একদিন,
নয়নে নয়ন রাখিয়া রজনী কেটেছে নিদ্রাহীন।
করে কর রাখি' অধরে অধর পান করিয়াছি সুধা।
বুকে বুক চাপি গেল কত কাল তবু মিটিল না ক্ষুধা।
রভসে কাটিল কত মধুরাতি, ঘুচিল না ক্ষুধা।
নারীর হৃদয় আজো মোর কাছে মহা রহস্যময়।

প্রৌঢ় বয়সে কন্যার বেশে আসিয়াছ পুনরায়,
কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি দেখি যদি চেনা যায়!
কচি মুখখানি তুলে ধ'রে তাই খুঁজি হৃদয়ের ভাষা,
বক্ষের মাঝে আত্মা কহিছে, 'মূঢ় রে মিথ্যা আশা!
দেবী মহামায়া আপন লীলায় রমণীর রূপ ধরে,
কেমনে রে তুই প্রবেশ করিবি তাহাদের অন্তরে!'

থাক্ তবে থাক্ ও হৃদয় নিয়ে মিছে করা টানাটানি,
যেটুকু পেয়েছি সেটুকু পরম লাভ ব'লে যেন মানি।
গাছে ফোটে ফুল, সবারে সে করে সুগন্ধ বিতরণ,
আপন করিতে যে তোলে সে ফুল, ভুল করে সেই জন;
অতি আপনার করিবার ভুলে হারাতে চাহি না, নারী।
থাকো কাছে কাছে মুখে লয়ে হাসি বুকে লয়ে প্রেমঝারি।

সন্ধান

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

অনেক কষ্টে চাকরীটি মিলিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পাশ করিবার পর প্রায় বছর তিনেক গোয়াঘুরি করিতেছি। আবেদনপত্র কত যে লিখিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অনেক চিঠিরই জবাব আসে নাই। যে দু-একটির বা আসিয়াছিল, তাহাদের নির্দেশমত দেখা করিতে গিয়া এমন কি পরীক্ষা দিয়াও কোনও ফল হয় নাই। বাড়ির লোকে আমার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিলেন। পাড়ার লোক আমার দিকে আঙুল দেখাইয়া অপরকে বলিতেন, "এই দেখ, বি এ পাশ ক'রে ঘরে ব'সে আছে।" আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইলে ভয় পাইতাম, তিন বছর ধরিয়া সকলের মুখেই সেই এক প্রশ্ন, "হ্যাঁ রে, কিছু হ'ল?" লজ্জা ঢাকিবার উদ্দেশ্যে, মাথা উঁচু করিয়া বলিতাম, "না।" উত্তর আসিত, "তা জানি। যে দিন কাল পড়েছে, সহজে কি কিছু হবে? পয়সা খরচ ক'রে মিথ্যে বি-এ পাশ করা।"

এতদিনে তাহাদের প্রশ্নের জবাব মিলিল। আমার শিক্ষকতা—মাহিনা মাসিক ত্রিশটি মুদ্রা।

কলিকাতা হইতে বেশী দূরে নয়, তবু মফস্বলের শহর। সেই শহরের জমিদার শহরের প্রান্তে প্রকাণ্ড জমির উপর স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জাতিকে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই চেষ্টা। চাকরির সন্ধান পাইয়া হেড মাস্টারমশাইএর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি সব কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইংরেজী পড়াতে পারবেন?"

"কোন্ ক্লাসে?"

"ধরুন পঞ্চম মানে।"

"ওঃ, নীচেকার ক্লাসে!" বি এতে আমার ইংরেজী অনার্স ছিল। আমার কণ্ঠে মৃদু তাচ্ছিল্যের রেশ। মুখে ভাসিয়া উঠিল অহংবোধের অস্পষ্ট রেখা।

"তা থাক।" হেড মাস্টারমশাই ব্যঙ্গের সুরে জবাব দিলেন। "আজকালকার অনেক বি এ অনার্সই দেখলুম।"

আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। মুখে আসিল বলি, 'তা হ'লে বি এ পাস খুঁজেছেন কেন? এমন লোক তো আছেন যাঁরা বি এ পাশ না হ'লেও বেশ ভাল ইংরেজী পড়াতে পারেন; তাঁদের চাকরি দিন না।' এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর এত বিতৃষ্ণা, অথচ ডিগ্রীর মোহও মরিতে চায় না। কিন্তু গরিবের সম্মানবোধ প্রকাশ করিতে যাওয়ায় বিপদ আছে। তাই ভিতরের চাপ ভিতরেই চাপিয়া বলিলাম, "পরীক্ষা ক'রে দেখুন।"

"পরীক্ষা কি করব মশাই? পাশ যখন করেছেন জানি জিজ্ঞাসা করলেই শেলি, বায়রন, ওআর্ডস্‌ওআর্থ এখুনি আওড়ে দেবেন। কিন্তু ছেলেদের দুটো কথা স্পষ্ট ক'রে বোঝাতে পারবেন কি? তাই জানতে চাই। শুধু কি বোঝানো, আপনাকে আচারে ব্যবহারে আদর্শ স্থানীয় হ'তে হবে। আমাদের স্কুল সাধারণ স্কুল নয়। এর নাম চিত্তরঞ্জন বিদ্যাপীঠ। জমিদার মাখমবাবু দেশবন্ধুর শিষ্য ছিলেন। জাতকে গড়ে তোলবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র পেয়ে ইনি এই স্কুল স্থাপন করেছেন। জলের মত টাকা ঢেলেছেন। তাই আমরা যাকে তাকে নিই না। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনি শিক্ষকবৃত্তি যে নিচ্ছেন—কেন?"

"জবাব দিলাম, পেটের দায়ে।"

"অ্যাঁ, বলেন কি!" হঠাৎ তাঁহার স্বর চড়িয়া উঠিল; "মনের মধ্যে এতটুকু আদর্শবাদিতা নেই, আপনি আসছেন মাস্টারি করতে? দেখুন, আপনাকে মাখমবাবু নিজে পছন্দ ক'রে যখন পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমি ফিরিয়ে দেব না। কিন্তু সাত দিন আপনাকে ট্রায়েল দিতে হবে। অবশ্য এ-কটা দিনের টাকা পাবেন।"

তথাস্তু। সাত দিনের অন্নের সংস্থান তো হইল।

আমার কথা শুনিয়া হেড মাস্টার মশাইএর মুখখানা একটু মলিন হইয়া গেল। আমি রাজী হইব, বোধ হয় তিনি ইহা আশা করেন নাই। বলিলেন, "আচ্ছা, কাল থেকে কাজে যোগ দেবেন।"

পরের দিন যথাসময়ে আসিতেই তিনি তাঁহার কামরায় লইয়া গিয়া বলিলেন, "দেখুন, আজ থেকে আপনি যে কাজের ভার পাচ্ছেন, তা অতি মহৎ, অতি উচ্চ। আপনার হাতে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি একপাল ছেলের ভবিষ্যৎ। তাদের উপর নির্ভর করছে আমাদের দেশের সব কিছু। তাদের সঙ্গে মিশবেন, তাদের ভালবাসবেন, তাদের মনের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করবেন। কাল আপনি বলেছিলেন, পেটের দায়ে এই প্রফেশন নিচ্ছেন, তা শুনে বড় দুঃখ পেয়েছিলুম। আপনাদের মত যুবকেরা অন্নের লোভে যদি এ কাজ নেন, তবে জাতির আর আশা কোথায়? নিজেকে ভুলে যান, নিজের স্বার্থ জাতির স্বার্থে দান করুন। হ্যাঁ, একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের স্কুলে মারপিঠের আইন নেই। ছেলেদের আমরা শিবজ্ঞানে সেবা করি। এ ব্রত বড় কঠিন ব্রত। তবু যদি মাইনের দিকে না তাকিয়ে কাজ করেন, তবে দেখবেন এমন মধুর আর কিছু নেই।"

শিবজ্ঞানে সেবা! মনের মধ্যে ব্যঙ্গের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখা যায় না; তবু কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিলাম, "যা বললেন সেই মত কাজ করবার চেষ্টা করব।" এক রাত্রের মধ্যে অনেকটা চালাক হইয়া গিয়াছিলাম। ত্রিশটি টাকা উপার্জনের এত বড় সুযোগ হারাইলে হয়তো দুর্নিবার অনশনই অদৃষ্টে ঘটিবে। তাহার চেয়ে না-হয় একটু আদর্শবাদিতা ও স্বার্থত্যাগের ভানই করিলাম।

ছুটির পর বাসায় ফিরিয়া এক কাপ চা লইয়া বসিয়াছি। মাথাটা তখনো টিপটিপ করিতেছে। পাঁচটা ঘণ্টা যেন কাটিয়াছে দৈত্যদানবের দেশে। আগে ভাবিতাম, মাস্টারি কাজ খুবই সহজ। আজ একদিনেই বুঝিলাম, ইহার চেয়ে চটের কলে বয়লারের অসহ্য উত্তাপের মধ্যে কাজ করাও বাঞ্ছনীয়। তাহাতে হয়তো গায়ের রক্ত এমনভাবে মাথায় ওঠে না। পঞ্চম শ্রেণীতে সব কয়টি বাছা বাছা দুষ্টু ছেলে। তাদের ক্লাসে পড়াইতে হইয়াছে তিন ঘণ্টা।

স্কুলের সীমার মধ্যেই মাস্টারমশাইদের বাসা। সামনে প্রকাণ্ড খোলা মাঠ। তার একপ্রান্তে কিছুদূরে সারি সারি দেবদারুর বন। সবেমাত্র কচি কচি হাল্কা পাতা ডালে ডালে মাথা তুলিয়াছে। তাহার উপর রোদের শেষ আভার রেশটুকু আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহারই দিকে তাকাইয়া মাঝে মাঝে চাএর বাটিতে চুমুক দিতেছিলাম। এমন সময় পাশের বাড়ির রঘুবাবু আসিয়া হাজির হইলেন। তিনিও স্কুলের শিক্ষক। আজ প্রথম তাঁহার সহিত পরিচয় হইয়াছে। লোকটি যেন গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইতে চান। যেন কি এক অভিসন্ধি তাঁহার মুখে চোখে উঁকি মারিতেছে। নাঃ, এমন সন্দিগ্ধ মন লইয়া চলিবে না। শিক্ষকতা যখন লইয়াছি, এইবার একটু আদর্শবাদী হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সকালে হেড মাস্টারমশাইএর উপদেশ মনে পড়িল। রঘুবাবুকে এক বাটি চা করিয়া দিলাম। মুখোমুখি বসিয়া প্রথম আলাপের সাবধানতাসংকুল কথাবার্তা চলিতে লাগিল। আস্তে আস্তে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ঘন হইয়া উঠিল।

কথায় কথায় রঘুবাবু বলিলেন, "এই তো প্রথম মাস্টারি, না এর আগে কোথাও কাজ করেছেন?"

"না, জীবনে এই প্রথম জীবিকা উপার্জন।"

"আজ কেমন লাগল? খুব ভাল, না? আপনারা ইয়ংমেন, আইডিয়ালিজ্‌মের প্রেরণায় এই পেশা নিয়েছেন, ভাল লাগবেই তো।"

"কি জানি কিসের প্রেরণায় এ চাকরি নিয়েছি, কিন্তু আজ সারা দিন কুরুক্ষেত্রের মাঠে কেটেছে মশাই।"

"ও, ছেলেরা ক্লাসে বুঝি বড় গোলমাল করেছিল?" এক নিমেষে তার মুখের ভোল বদলাইয়া গেল। এতক্ষণ তিনি যেন মাপিয়া মাপিয়া কথা বলিতেছিলেন, এবার তাহার মুখ দিয়া সহজ বুলি বাহির হইল। বলিতে লাগিলেন, "জানি, হেড মাস্টারমশাইএর পিসতুতো ভাই বি এ পাশ ক'রে বসে আছে। আপনার চাকরীটা তাকে দেবারই ঠিক করেছিলেন এমন সময় আপনি কোথা থেকে উড়ে এলেন। নেহাত বড়কর্তার সুপারিশ ছিল তাই। তা এখন আপনাকে জব্দ তো করতে হবে, তাই পঞ্চম আর তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াতে দিয়েছেন। স্কুলের যত বাছা বাছা দুষ্টু ছেলের দল ওই পঞ্চম শ্রেণীতে। আগে ও ক্লাসে পড়াত সুখেন। ও হেডুর ডান হাত কিনা, পেয়ারের লোক। তাই অকারণে রুটিন বদলে আপনার হাতে দেওয়া হ'ল যত পাজী বেআড়া ছেলের দলকে।"

"তাই নাকি?"

"তা নয়তো আবার কি। আপনি নতুন লোক। সব কথা বলব না। থাকুন, ক্রমশ নিজেই সব বুঝতে পারবেন। তবে এই সাতটা দিন দাদা চুপচাপ ক'রে কাটিয়ে দিন, হেডুর পিসতুতো ভাই যেন না আসে। তা হ'লে আমাদের এখানে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে। একে একে ওর নিজের লোকে বিদ্যাপীঠ ভ'রে গেল। আমরা ক'টি প্রাণী আর কত ওর বিরুদ্ধে যুঝব? জানেন, ও কত বড় শয়তান?"

"কি রকম?" ভিতরের নিরাসক্তি চাপা দিবার চেষ্টায় ঔৎসুক্যের ভান করিলাম।

"ওই যে সুখেন, ও আর আমি একসঙ্গে এখানে আসি আজ আট বছর হয়ে গেল। ও আজ কত পায় জানেন? পঁচাশি টাকা। আর আমি কত, আন্দাজ করুন তো?"

"কি জানি, এক দিন তো মাত্র এখানে কাজ করলুম। আমার কোনও ধারণা নেই।"

"না না, তা তো বটেই। এক দিনেই আর সব জানতে পারবেন কেমন করে।" প্রশ্নটি করা যে কত বড় ভুল হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া ভদ্রলোক নিজেকে সামলাইয়া নেন। বলেন, "মোটে ষাটটি টাকা পাই। কত বড় অবিচার বলুন। মাখমবাবু সাধারণ জমিদারের মতন নন, লোক খুব ভাল, খুব বুদ্ধদার। তিনি সত্যিসত্যিই চান, আমাদের বিদ্যাপীঠ ভারতবর্ষের মধ্যে একটি আদর্শ স্কুল হ'ক। কিন্তু যে শয়তানের হাতে পড়েছেন! হেডু জানেন কেবল দুটি জিনিস– খোশামোদ করা আর কান ভাঙ্গানো। আমাদের নামে কেবল মাখমবাবুকে বলছেন, এ কিছু নয়, ও কিছু নয়। কেমন মুখোশ প'রে থাকেন, যেন কত বড় মহাপ্রাণ লোক। ভাল কথা, আজ আপনাকে কোনও উপদেশ দেন নি—মানুষ গড়া, ত্যাগের মহত্ত্ব, শিক্ষকের কঠিন দায়িত্ব ইত্যাদি বড় বড় বুলি?"

"হ্যাঁ, বলছিলেন, ছেলেদের ভালবাসবেন, তাদের সঙ্গে মিশবেন। এ বড় মহৎ ব্রত।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, মহৎ ব্রত!" রঘুবাবু খিঁচাইয়া উঠিলেন যেন হেড মাস্টারমশাই তাঁহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বলিলেন, "রেখে দিন ও-সব কথা। সব ভণ্ডামি মশাই, সব ভণ্ডামি। কেবল নাম কিনব আবার খবরের কাগজে ছবি ছাপব। মাখমবাবু থেকে শুরু ক'রে সব শিয়ালের এক ডাক দাদা,--দেশ, জাত, আর মানুষ গড়া! আরে নিজেদের আগে গ'ড়ে তোল্।"

চাএর বাটিতে মুখ তুলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিলাম, এখানে চাকরি করা সহজ নহে। নানা দিকে চোখ রাখিয়া কাজ করিতে হইবে।

ভদ্রলোক চা শেষ করিয়া বাটিটা মেঝের উপর রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, "হেডুর অত প্রতাপ কেন জানেন? খুব পার্বলিসিটি করতে পারেন। মাখমবাবু অ্যাসেমব্লিতে দাঁড়ান, কংগ্রেসের বড় নেতা। গান্ধীজী কলকাতায় এলে আগে তাঁকে ডেকে পাঠান। এ সব সম্ভব হয়েছে এক দিক থেকে হেডুর জন্যেই। আজ এলাহাবাদ, কাল বোম্বাই- শহরে শহরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে ওর আর জোড়া নেই। তাই মাখমবাবুর ওঁকে না হ'লে চলে না। আমাদের যদুবাবুর ওপর কত বড় অবিচার জানেন? তাঁর চাকরি তের বছর হয়ে গেল। অতবড় বিদ্বান্, চরিত্রবান্ লোক নেই। অথচ তিনি অ্যাসিসট্যান্ট হেড মাস্টারও হ'তে পারলেন না। হ'ল কে? না সেদিনের এম এ পাস করা ছোকরা অরবিন্দ। ওযে হেডুর ছাত্র ছিল। যেমন মাস্টার তেমনি তার ছাত্র। ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে? হয় নি? হ'লে দেখবেন দুজনের এক ডাক, কেবল বড় বড় বুলি, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। দু বছর হ'ল এসেছেন, এর মধ্যেই যেন ধরাকে সরা দেখছেন। উনি আবার হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট। জানেন ওদের কীর্তি? সুপারিনটেনডেন্টএর কাজ আমাকেই দেয়া হবে, সব ঠিকঠাক। মাখমবাবু পর্যন্ত রাজী। এমন সময় হেডু গিয়ে বললে, 'না, আমার অরবিন্দকেই এ ভার দিই। ছেলেদের ভালবাসতে ওর মতন আমিও পারব না। রঘুবাবু ভাল হ'ক কিন্তু বড় গম্ভীর, ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারেন না'। আরে, ওসব ন্যাকামি ক'রে আমাদের ভোলানো যায়! ছেলেদের ভালবাসা মানে কি জানেন?" রঘুবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন।

আমি ঘাড় তুলিয়া চাহিয়া রহিলাম, ভাবটা যেন, না আপনিই বলুন।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "যত চেংড়া, বজ্জাত ছেলেদের সঙ্গে ইয়ার্কি তামাশা ক'রে নিজের দল গড়া। অরবিন্দকে যদি সত্যি সত্যি কোনও ছেলে মানত তা হ'লে তো বাঁচতুম। ওর সঙ্গে সঙ্গে তারা রাতদিন ঘুরছে, মাথায় উঠছে, গায়ে পড়ছে। আর দেশ বিদেশে খবর যাচ্ছে, এমন মাস্টার পাওয়া যায় না, ছাত্র ছাড়া জীবনে আর কিছু জানে না। আবার কত বড় ভণ্ডামি মশাই, বললে, 'এ কাজের জন্যে মাইনে চাই না। অ্যাসিসটেন্ট হেড মাস্টার হিসেবে যা পাই তাই আমার যথেষ্ট'। আহা, আমাকে যদি কাজটা দিত! মাসে মাসে পনেরটা টাকা মশাই। মেয়েটি বড় হচ্ছে, বছর চারেক বাদে বিয়ে দিতেই হবে। ভেবেছিলুম, মাসে মাসে ওই টাকা জমিয়ে বিয়ে দেব। তা কথায় বলে, ম্যান প্রোপোজেস, গড ডিসপোজেস।"

দুই এক দিন পরে যদুবাবুর সহিতও আলাপ হইল। তিনি আরও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ; যত কথা মুখে বলেন তাহার চেয়ে বেশী ইঙ্গিতে প্রকাশ করেন। বলিলেন, "আজ তৃতীয় ঘণ্টায় পঞ্চম শ্রেণীতে আপনি পড়াচ্ছিলেন?"

জবাব দিলাম, "হ্যাঁ। কেন বলুন তো?"

"না, বিশেষ কিছু না। পাশের ঘরে তখন আমি পড়াচ্ছিলুম।"

বেশ, কিন্তু তাহার সহিত আগেকার প্রশ্নের কি মিল আছে খুঁজিয়া পাইলাম না তাই জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহার চোখের দিকে তাকাইলাম। তিনি একটু বাঁকা হাসি মুখে টানিয়া কথা শেষ করিলেন, "ওঘরে একটু বেশী হইচই হচ্ছিল।"

"হ্যাঁ, এখানকার ছেলেগুলো বড় দুষ্টু। কিছুতে থামিয়ে রাখা যায় না।"

"ফস্ ক'রে এমন কথা বললেন! ইয়ং ম্যান—হুঁ।" একটু থামিয়া বলিলেন; "শিখুন, দুনিয়ার সব কথা মুখ ফুটে বলতে নেই। জানেন না, এ যে আদর্শ বিদ্যাপীঠের আদর্শ ছাত্রের দল।

ওদের 'দুষ্টু বলা!" চোখের দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল হালকা আমাশার ভাব, ভিতরে ব্যঙ্গের তীক্ষ্মতা।

কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। এইরূপে লোকের সহিত আলাপ জমাইবার অভ্যাস আমার ছিল না। তিনি আঙুল-গুলো মটকাইয়া লইয়া বলিলেন, "আঙুলগুলো টনটন করছে। সারাদিন খড়ি দিয়ে বোর্ডে অঙ্ক কষা মশাই। খেটে খেটে প্রাণ-পাত কিন্তু কে তা লক্ষ্য করছে? কোনও প্রতিদান আছে? পণ্ডশ্রম। ছাত্রেরাই কি শিখতে চায়? সব মাথায় উঠছে। আগে এমন ছিল না; আজ তের বছর চাকরি করছি। এখান থেকে একটা ধমক দিলে ওই ওখানকার ছেলের পিলে চমকে যেত। এখন নতুন সুপারিনটেনডেন্ট এসেছেন, নতুন নতুন বিলিতী কায়দা। ভালবাসা দিয়ে হৃদয় জয়! আরে লোহার তালকে পুড়িয়ে হাতুড়ি দিয়ে না মারলে কি লাঙল তৈরি হয়! হ্যাঁ, আপনার ক্লাসে কে গোলমাল করছিল অত?"

"একজন নয়, একদল।"

"আহা দলের পাণ্ডা তো আছে।"

"চেনেন আপনি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের সবাইকে? মধুসূদন বলে ছেলেটি, ওঃ এত বড় বজ্জাত ছেলে জীবনে কখনও দেখি নি। বলেছিলুম 'ভয়েস চেঞ্জ করে বল, আই হ্যাভ বাট্ এ বুক'। তা কি করলে জানেন? একবার খুব মোটা গলায় চেঁচিয়ে উঠে বললে, 'আই হ্যাভ বাট্ এ বুক'। সঙ্গে সঙ্গে আর একবার সরু মিহি গলায় আস্তে আস্তে বললে, 'আই হ্যাভ বাট্ এ বুক'। সেই পুরানো দুষ্টুমি। বললুম, 'দেখবে মেরে হাড় ভেঙে দেব?' বললে, 'স্কুলের জমির মধ্যে মারবার আইন নেই স্যার'।"

"বটে, এক কাজ করবেন। ওর কান দুটো ধরে মাটি থেকে ওপরে তুলে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেবেন। তা হলে তো আর মারাও হবে না, স্কুলের মাটি ছোঁয়াও হবে না। কে জানেন ও? আমাদের পূজ্যপাদ হেড মাস্টারমশাইএর শালা। নচ্ছার, পাজী, হতভাগা। গেল মশাই স্কুলটা গেল যত অপোগণ্ডদের ভণ্ডামিতে। ছেলেটি আবার আমাদের শ্রীঅরবিন্দের প্রধান চেলা। ওর নামে কিছু বলতে যান অমনি ছাত্রসখা সুপারিনটেনডেণ্ট মশাই হাঁ হাঁ করে তেড়ে আসবেন। ছেলেরা দুষ্টু হবে না তো কি হবে? মধুর আমার মনটা বড় ভাল।"

স্কুলের পরিচালনার ভিতরকার রহস্যের সহিত এমনি করিয়া পরিচয় হয়।

দেখিতে দেখিতে ছয় দিন কাটিয়া গেল। ছয় দিনের মধ্যেই পাগল হইবার শামিল হইয়াছি। ক্লাস কিছুতেই ম্যানেজ করিতে পারি না। ছেলের দল অকারণে হাসে, কাশে, মারামারি করে। গরম পড়িয়াছিল বলিয়া মাঝে মাঝে গাছের তলায় ক্লাস বসিত। কখনও কখনও দেখি খেয়াল মত তাহারা গাছে চড়িয়া বসিয়া থাকে। ধমক দিলেও নামে না। এক সঙ্গে সকলে কথা বলিয়া ওঠে। একজনকে কাছে ডাকিলে দশজন ছুটিয়া আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়ায়। শৃঙ্খলাবোধ তাহাদের কণামাত্র শেখানো হয় নাই। মানা করিলে শোনে না, বকিলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকে তার পর আবার যে-কে-সেই। আবার বকিলে মুখের ওপর চোপরা করে। কথায় কথায় তর্ক ওঠায়, বলে 'আমাদের বুঝিয়ে দিন, এ কাজ কেন অন্যায়'। অন্যায়কে অন্যায় বলিয়াই জানি—কেন অন্যায় তাহা নিজেকে কোনদিন নিজেই জিজ্ঞাসা করি নাই তো এই অকালপাকা নবযৌবনের হাওয়ালাগা অবাধ্য ছাত্রদের কি বুঝাইব। মাঝে মাঝে দার্শনিকের মত মনের মধ্যে মেজাজ আনিবার চেষ্টা করিতাম। ভাবিতাম, যৌবনের জোয়ার হঠাৎ যখন দেহে মনে আসে তখন এমনই হয়। মন্দ কি এ। আমারই চার পাশে নিয়ত ছুটিয়া ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে সাগরের যত দুরন্ত ঢেউএর দল, ইহাদের জীবনের সহজ ছন্দের গতিতে বাধা দিয়া লাভ কি? কিন্তু ক্ষণপরেই কাহারও কথায় বা ব্যবহারে আবার রুক্ষ হইয়া উঠিতাম, তত্ত্বের আশ্রয়ে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা নিমেষে শেষ হইয়া যাইত।

নাঃ, আর আশা রহিল না। চাকরি থাকিবে না নিশ্চয়ই। রাত্রে ঘরে বসিয়া সামান্য যাহা কিছু ছিল টিনের সুটকেসে গুছাইয়া লইলাম। মনে মনে হাসি পাইল, মাত্র সাত দিনের জন্যে এসব না বাহির করিলেই হইত। সামনের মাঠ হইতে হু হু করিয়া বাতাস আসিতেছিল। ছয় দিনেই জায়গাটার উপর যেন মায়া পড়িয়া গিয়াছে। অদৃষ্টে নাই, কে রাখিবে! হিসাব করিয়া দেখিলাম, সাত টাকা পাইব। বাড়ি যাইবার গাড়িভাড়া এখানকার খাই-খরচ বাদ দিয়া হাতে তিন টাকা সাড়ে বার আনা থাকিবে। বেশ, সাত দিন তো তবু নিজের উপায় করা অন্ন খাইতে পাইলাম।

পরের দিন যথাসময়ে হেড মাস্টারমশাই ডাকিয়া বলিলেন, "কেমন আছেন? দু দিন বড় ব্যস্ত ছিলুম, আপনার দেখা পাই নি তো। আজ ফোর্থ পিরিয়েডে আপনার ছুটি আছে, আসবেন আমার ঘরে। দু-একটা কথা হবে।"

কথা আর দুটো কেন—একটাই—'চাই না'। সাদা ভাষায় সোজা করিয়া বলিলেই হইত, ইহার জন্য এত ঢাকাঢাকির দরকার কি। মনের মধ্যে ব্যর্থতার ভার লইয়া যথাসময়ে হাজির হইতেই তিনি বলিলেন, "কাজ ভাল লাগছে? ছেলেরা আপনার যে খুব সুখ্যাতি করছে মশাই। মন দিয়ে কাজ করুন, আনন্দ পাবেন। তবে একটা কথা বলি। বয়সে অনেক বড়, কিছু মনে করবেন না। আপনার পড়াবার পদ্ধতি বেশ নতুন বটে তবে বেশী নূতনত্বের দিকে যাবেন না। ওসব ওপর ওপর রাখবেন। কোনও লোক ভিজিট করতে এলে আলোচনা করবেন। কিন্তু, তা তুমি যাই বল অরবিন্দ—" পাশের টেবিলে অ্যাসিসস্টান্ট হেড মাস্টার বসিয়া-ছিলেন, তাঁহার দিকে ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টি ফিরাইয়া আমার উদ্দেশ্যে কথা শেষ করলেন, "সনাতন প্রথাই মশাই সব চেয়ে ভাল।"

যাক, চাকরিটা থাকিয়া গেল। কিন্তু মাস কয়েক পরে মনে হইল, না থাকিলেও বিশেষ দুঃখিত হইতাম না। এ কাজ অসহ্য, যে কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষে একান্ত অসহ্য। বিশেষত, ঐ মধুসূদন, হেড মাস্টার মশাইএর আত্মীয়, যদুবাবু ঠিকই বলিয়া-ছিলেন, পাজি, নচ্ছার, হতভাগা। তাহার তুলনা নাই। একদিন রাগের মাথায় এক কাণ্ড করিয়া বসিলাম। মাখমবাবুর কাছে লিখিতভাবে আবেদন করিলাম, উহাকে স্কুল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হক।

তিনি জমিদার মানুষ, মিষ্টি কথা বলেন কিন্তু মনের কথা সহজ করিয়া খুলিয়া বলেন না। আমাকে একদিন চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। এ-কথা সে-কথা নানা কথার পর আসল কথার সূত্রপাত হইল। বলিলেন, "দেখুন, ছেলে বয়সে আমাদের মাস্টার মশাইরা মনে করতেন আমরা যেন কাঁচা লোহার পাত, হাতুড়ি দিয়ে না পিটলে তা দিয়ে কিছু গড়া যায় না। আজকের মানুষ আপনারা আপনারা জানেন, ছোট ছেলেদের প্রাণ চারা গাছের মত। তাতে স্বাধীনতার রোদ, আনন্দের হাওয়া লাগাতে হয়। তবেই সে বাড়ে। পিঁজরের মতন হাঁড়ির মধ্যে পুরে বন্ধ করে রাখলে তার বাড় হয় না। ছেলেদের মন প্রাণময় তাই সদাই চঞ্চল। বাধা দিয়ে তা পঙ্গু করা উচিত নয়। ভাল-বাসুন, ছেলের সঙ্গে ছেলে হয়ে তার মনের মধ্যে সজীবতাকে বাড়িয়ে তুলুন। তবে তো সে জীবনের বড় বড় বাধায় ভয় পাবে না, নিঃশঙ্কে এগিয়ে যেতে পারবে। এই তো আজকালকার মত। আমাদের স্কুলে সেই মত আমরা কাজ করছি।"

হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। যত সব আদর্শবাদিতার পুঞ্জীভূত ভাবুকতা একত্রে জড় হইয়াছে। ভাবালুতার ধোঁয়ায় আমরা একে অন্ধ, তাহার উপর যদি আহাম্মকি জুড়িয়া বসে তাহা

হইলে আর পরিত্রাণ নাই। দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইলাম। কাজের চেয়ে ইহারা ভড়ং বেশী ভালবাসে তাই নূতন নূতন পাগলামি ইহাদের মগজ হইতে উদ্ভূত হয়। নিজেকে লইয়া নিজের মধ্যে যাহাদের ভণ্ডামির অন্ত নাই তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার কি থাকিতে পারে।

আরও রাগ হইল অরবিন্দবাবুর কথায়। একদিন আমার বাড়িতে আসিয়া 'আলোচনা' জমাইয়া তুলিলেন। কথায় কথায় বলিলেন, "দেখুন, আপনার যে সমস্যা একদিন আমারও জীবনে সেই সমস্যা এসেছিল। এখানে আসার আগে। তখন রাজপুরুষদের দয়ায় বছর চারেক জেল খাটার পর সবেমাত্র বাইরে এসেছি। কি করি, শহরের স্কুলে চাকরি নিলুম গা ঢাকা দিয়ে। ঠিক আপনারই মত অভিজ্ঞতা। তার পর হঠাৎ একদিন চোখ খুলে যায়। মেঘ থেকে বাজ পড়ে সত্যি, তা বলে মেঘে শুধু বাজই নেই, জলও আছে। ছেলেদের কাছ থেকে আমরা নানা অত্যাচার পাই বটে, কিন্তু একদিন যখন তাদের মনের সত্যিকার সন্ধান পাবেন, তখন দেখবেন অদ্ভুত সেই হীরের খনি। আমাদের দেশে, শুধু আমাদের দেশে কেন সব দেশেই, শিক্ষকের কাজে টাকাও নেই, সম্মানও নেই। কিছুই, শুধু আছে এই ছোট ছোট প্রাণের কোণে হীরের খনি।"

অসহ্য বড় বড় বুলির রং দিয়া নিজেদের অযোগ্যতা চাপা দিবার চেষ্টা। অরবিন্দবাবুর সঙ্গে কোনও দিন ভাল ব্যবহার করিতে পারি নাই। বদুবাবুদের কথা শুনিয়া শুনিয়া কেমন যেন প্রথম হইতেই তাঁহার উপর একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া, স্কুলের মধ্যে একমাত্র তাঁহাকেই ছেলেরা সত্যি ভালবাসে। ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতাম না। তাঁহার সাফল্য আমাদের ব্যর্থতা হৃদয়ের প্রান্তে প্রান্তে মিথ্যা রোষের উদ্রেক করিত। তাই অরবিন্দবাবুর কথাগুলি মনে হইল যেন পৃষ্ঠপোষকতা করিবার চেষ্টা। ভাল লাগিল না। মনের রাগ মনে চাপিয়া অল্প কথায় আলোচনা শেষ করিলাম।

ইতিমধ্যে পূজার ছুটিতে বাড়ি গিয়াছিলাম। বাবা আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ক্লাসে পড়াস, ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসে?"

"না, ফিফ্‌থ ক্লাসে।"

"হা, এত টাকা খরচ করে বি এ পাস করলি এই করতে? আমাদের স্কুলে হরকুমারবাবু ফিফ্‌থ ক্লাসে পড়াতেন। তিনি এনট্রান্স পাসও ছিলেন না। আর ওখানে ফিরে যাস নি। বরং আমাদের বৈঠকখানায় একটা পাঠশালা খুলে বস্।"

আর বেশী কথা হইল না। তাহার পরদিন হইতে বাবার ব্যবহারটা যেন বেশ একটু রুক্ষ বোধ হইল। গ্রাজুয়েট ছেলের সম্বন্ধে তাঁহার গৌরববোধ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বোধ হয়।

পাশের বাড়ির পড়শী ভানুখুড়ো জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা কত টাকা মাইনে হল রে?"

"ত্রিশ।"

"অ্যাঁ, কি বললি, ত্রিশ টাকা? না না মিথ্যে কথা।" সংসারের হালচাল তিনি যেন কিছুই জানেন না এমনই ভাব দেখাইলেন।

বলিলাম, "হ্যাঁ, ত্রিশ টাকা।"

"বলিস কি রে! তিনি ছোট একটি নিঃশব্দ হাসি মুখে টানিয়া মন্তব্য করিলেন, "সিদ্ধেশ্বর বোসের নাতি তুই--আমাদের গেরামের মুখউজ্জ্বল করা ছেলে। তুই কিনা ত্রিশ টাকার ম্যাষ্টার হলি? মাস্টার শব্দটা তিনি তাচ্ছিল্যভরে বিকৃত করিয়া উচ্চারণ করিলেন। বলিলেন, "এর চেয়ে আমাদের পুণ্য ধোবা যে বেশী উপায় করে রে।"

সেইদিন হইতে ভাবিতেছিলাম এ চাকরি ছাড়িয়া দিব। সংসারে কোথাও মাস্টারের সম্মান নাই। পুরাকালে হয়তো ছিল—থাক। পুরাকালে আমি বাঁচিয়া নাই। সেকালে রামরাজত্ব ছিল তাহাতে আজকে আমার কি আসিয়া যাইবে? বাঙলা দেশের গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে শিক্ষকেরা আজ ছাত্রদের করুণার পাত্র, অভিভাবকদের তাচ্ছিল্যের বস্তু, কর্তৃপক্ষের আজ্ঞাবহ দাস। জীবন আমাদের দুর্বিষহ। ইহার মধ্যে ছাত্রদের ছোট ছোট প্রাণের কোণে হীরার খনির সন্ধান? ক্রূর ব্যঙ্গে আমার ভিতরটা অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

মনের মধ্যে সেই চিন্তা ক্রমশ প্রখর হইতে লাগিল। অশান্তিতে ভিতরটা ভরিয়া গেল। মধুসূদনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া কোনও ফল হইল না, শুধু অপমান সংগ্রহ করিলাম। এই আত্মসম্মান বিক্রয় করা টাকা দিয়া নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়া লাভ কি? পৃথিবীতে আমাদের লইয়া কোন্ অপটু দেবতার সৃষ্টিলীলা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে? ক্রমশ প্রশ্ন জটিলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সংসারে আমাদের বাঁচিয়া থাকার আদৌ প্রয়োজন কি? যে গ্রহের তাপ নিভিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে, গতি থামিয়া স্থাণু হইয়া উঠিয়াছে, আকাশে আকাশে তাহার স্থিতির আর কোনও সার্থকতা আছে কি?

মাস দুই পরে হঠাৎ একখানা চিঠি পাইলাম, একটি ইংরেজ সওদাগরী অফিসে কেরানীর কাজ পাইয়াছি। আমার এক আত্মীয় সেই অফিসে কাজ করেন। বাঁচা গেল। বুকের মধ্যে কে যেন মরে-যাওয়া প্রাণে আবার প্রাণ ফিরাইয়া দিল। আমি কাজে ইস্তফা দিলাম। নানা অনুরোধ আসিল, ভালবাসার দোহাই দিয়া আপত্তি উঠিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও কথা শুনিলাম না।

সকালে সাড়ে সাতটায় গাড়ি। যাইবার আগে একবার পরিচিত সকলের কাছে শেষ বিদায় লইলাম। চা খাইয়া বাহির হইলাম। শরীরটা আজ যেন নিতান্তই হালকা হইয়া গিয়াছে। পায়ের চলনে আসিয়াছে আনন্দের চাঞ্চল্য। প্রথমেই দেখা হইল বদুবাবুর সঙ্গে। বলিলেন, "তা হলে সত্যিই চললেন?"

বিনয় করিয়া বলিলাম, "কি করি।"

"বেশ যান। আপনারা ভাগ্যবান পুরুষ, আমরা চিরদিন পড়ে রইলুম এই পিঁজরেপোলে।" এক টুকরো দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বুক হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বদুবাবু বিদায় জানাইলেন, বলিলেন, "শেষকালে কেরানীগিরিই?—হুঁ। তা হোক, অন্তত উন্নতির আশা আছে। মনে রাখবেন তো?"

"নিশ্চয়ই। আপনাদের কথা ভুলতে পারি?" মামুলী জবাব দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তার বাঁকের মুখে আসিতেই হঠাৎ দূরে দিগন্তের আকাশ চোখে পড়িল। চমৎকার এই জায়গাটি। মাখমবাবুর রুচির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। মনের মধ্যে বেদনার একটা টুকরা জাগিয়া উঠিল। কত দিন তো এই উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রকৃতির বুকে কাটিল। এখানের উদার আকাশ আর খোলা মাঠের হাওয়ার সঙ্গী হইয়া পড়িয়াছিলাম; মনে হইল, ইহাদের সহিত যেন একটা আত্মীয়তার বন্ধন ঘটিয়াছিল—আজ বিদায়ের সময় তাহারা ডাকিতেছে। যদি আবার কখনও এখানে ফিরিয়া আসি আজকের অধিকার সেদিন আর থাকিবে না। ইহাকেই কি বলে 'যাবার বেলায় পিছু ডাকে'? বেশ, যাইবার আগে একটু ভাবালুতা করিয়া লইলে ক্ষতি কি। নিজেই নিজেকে উপহাস করিয়া বলিলাম।

অরবিন্দবাবু দুই দিন আগে বাহিরে গিয়াছিলেন। হয়তো আজও ফিরিয়া আসেন নাই। তাই তাঁহার বাসায় সকলের শেষে হাজির হইলাম। তিনি ছিলেন, বন্ধুর মত সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিলেন। বলিলেন, "কাল ছাত্রেরা আপনার ফেয়ারওয়েল সভার ব্যবস্থা করেছিল, আপনি নাকি তাতে রাজী হন নি? ওরা মনে বড় কষ্ট পেয়েছে। আমি ছিলুম না, থাকলে আপনার কোনও আপত্তি শুনতুম না, টেনে নিয়ে আসতুম। জানেন, ছেলেরা

আপনাকে ছাড়তে রাজী নয়। মধু তো কাল রাত্তিরে কেঁদে ফেললে, বললে, 'আমারই জন্যে স্যার উনি চলে যাচ্ছেন'। মধুই তো ফেয়ারওয়েল সভার সব যোগাড় করেছে। ওকে ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বলে যাবেন।"

"তাই নাকি? একটা গল্প মনে পড়ল। এক অফিসের বড়-বাবু বেজায় অত্যাচারী, কেউ তাকে দেখতে পারে না। সকলে পিছনে গালাগালি দেয়। ভদ্রলোক একদিন তাদের মন পাবার জন্যে ডেকে বললেন, 'জানেন, আপনারা আমার পিছনে গালাগালি দেন, কেউ আমাকে দেখতে পারেন না। কিন্তু এর আগে যে অফিসে কাজ করতুম সেখানকার বাবুরা আমাকে এত ভালবাসতেন যে আসবার সময় আমায় রুপোর ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর কথা শুনে এ অফিসের কেরানীরা সকলে একসংগে চেঁচিয়ে উঠল, 'আজ্ঞে আপনি যদি অফিস ছেড়ে দেন তা হলে আমরা আপনাকে সোনার ঘড়ি উপহার দেব।' মধুসূদনের দেখছি আমার ওপর সেই রকম অনুরাগ হয়েছে।"

"না, না, ভাই। ছেলেদের মনের মধ্যে সত্যিই আপনি জায়গা পেয়েছেন। তারা আপনাকে ভালবাসে। ওরা যে ছোট, ওদের প্রকৃতি যে বুনোদের মত। তাই ওরা ভালবাসা প্রকাশও করে বুনোদের মত। আপনি এ কাজ ছেড়ে দিয়ে ভাল করলেন না। কেরানীগিরির কাজে কি আনন্দ আছে ভাই? একটানা সেই মামুলি হিসেব লেখা টাকা আনা পাইএর যোগ। আমাদের এ কাজে কিন্তু সৃষ্টির আনন্দ ছিল। নিজের হাতে ছোট ছোট মনকে গড়ে তোলা। এ তো ছেলেকে শুধু বই দিয়ে লেখাপড়া শেখানো নয়—এ যে প্রাণ দিয়ে প্রাণ জাগানো!" বিরক্তিভরে আলোচনা মধ্য পথেই শেষ করিয়া বিদায় লইলাম। আর আদর্শ-বাদিতার কারবার ভাল লাগে না।

বাসায় ফিরিতেই অবাক হইয়া গেলাম। মধুসূদন আমার ঘরে ঢুকিয়া সুটকেসটা লইয়া চাবি খুলিবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। চোর—চোর! সব বিদ্যাই এই বয়সে হইয়াছে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, চাবি-কাঠি ঠিক আছে। বোধ হয়, খুলিবার অবসর পায় নাই। তবু সাবধানতার মার নাই। ভিতরে ব্যাগ ছিল, খুলিয়া দেখিলাম, টাকা ঠিক আছে। যাক্ এই মুহূর্তে দুর্গা দুর্গা বলিয়া এই পাপপুরী হইতে শুভযাত্রা করা যাক। শেষ মুহূর্তে টাকা কয়টা খুব বাঁচিয়া গিয়াছে। ছোট ছোট প্রাণের কোণে হীরের খনির সন্ধানই বটে!

যথাসময়ে বাড়ি আসিয়া হাজির হইলাম। বাবা মা খুশী হইলেন, এতদিনে তাঁহাদের গ্র্যাজুয়েট ছেলে একটা মানুষের মত কাজ পাইয়াছে।

সকালে উঠিয়া মনটা কেমন খালি খালি মনে হইতে লাগিল। তার পরদিন অফিসে যোগদান করিবার তারিখ, সেদিনটা ছুটি। হাতে কোনও কাজ নাই। ক্ষণে ক্ষণে মনটা থমকিয়া উঠিতে লাগিল, অভ্যাস মত প্রহরে প্রহরে স্কুলের কাজের ঘণ্টা কানে আসিয়া বাজিতেছে না? ছেলেদের কোলাহল চিরদিনের জন্যে নিবিয়া গিয়াছে, বাড়ির আশপাশে কোনও কোলাহল নাই, থাকিলে একটু ভাল হইত। চারিদিক কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা, ভীষণ চুপ-চাপ। এত চুপচাপ কি মানুষের সহ্য হয়। আমার পুরাতন, পরিচিত বাড়ি, গ্রাম, সমাজ যেন বদলাইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র কিছুদিন আগেও যে বেশ আরামে দিন কাটাইয়া গিয়াছি তাহা আর বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

বাড়িতে মন বসিতেছে না। অকারণে এখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে কি খুঁজছিস, কিছু হারিয়েছে?"

জবাব দিলাম, 'না।'

শেষে সুটকেসটা লইয়া পড়িলাম। একে একে কাপড়-জামা বাহির করিতে লাগিলাম। আমার ঘরের আলমারিতে তুলিয়া রাখিব। হঠাৎ চোখে পড়িল কাপড়ের পাটের মধ্যে লুকানো একটি চামড়ার ব্যাগ। স্কুলের ছেলেদের হাতের তৈয়ারী। তাহার মধ্যে কাগজ আঁটিয়া নাম সই করিয়াছে পঞ্চম শ্রেণীর সমস্ত ছাত্র, উপরে লিখিয়া দিয়াছে, 'বিদায় নমস্কার'। বাঃ, বেশ বেশ। হঠাৎ ভিতরে হাত দিয়া দেখিলাম, আর একটি কাগজের টুকরা। খুলিয়া দেখি, তাহাতে ছবি আঁকা। একটি ছেলে নত হইয়া নমস্কার করিতেছে, তাতে নীচেয় ইংরেজীতে লেখা, 'প্লিজ রিমেম-বার ইওর এভার ডিসওবিডিয়েন্ট স্টুডেন্ট মধুসূদন'। ডিসওবি-ডিয়েন্ট বানানটা ভুল হইয়াছে। মধুর কাছে ইহার চেয়ে বেশী আশা করা যায় না। কিন্তু ছবিটা আঁকিয়াছে ভাল; উহার ছবির প্রশংসা অরবিন্দবাবুর কাছে অনেকবার শুনিয়াছিলাম। অকস্মাৎ চোখে জল আসিয়া পড়িল, ছেলেটা তাহা হইলে নিতান্ত শয়তান নয়, বুকের মধ্যে মানুষের প্রাণ না থাকিলে কে এইভাবে অনুতাপ প্রকাশ করিতে পারে? তাহাকে চোর ভাবিয়া কত অপরাধই না করিয়াছি! মনে হইল, উহার দুষ্টামি স্বভাবের নয়, বয়সের; তা ছোট ঝরনার দুরন্ত চাঞ্চল্য মাত্র। সামান্য কয়েকটি শব্দ, পটু-হাতের কয়েকটি রেখা আঁকা, তাহাদের মারফত চোখের সামনে খুলিয়া গেল একটি কচি প্রাণের তাজা হীরার খনির সন্ধান।

সিকিমের কথা

অধ্যাপক অনিলকৃষ্ণ সরকার, এম এস-সি

সমতল বাঙলার উত্তরে দার্জিলিং পাহাড়। তার উত্তরে সিকিম রাজ্যের অভ্রভেদী অদ্রিমালা। এ সবই হিমালয়ের অংশ। সিকেমের উত্তরে তিব্বতের মালভূমি, ১৪-১৫ হাজার ফুট উঁচু। হিমালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী এই মালভূমির দক্ষিণ দিকে প্রাচীরের ন্যায় অবস্থিত। এই প্রাচীরের পশ্চিম প্রান্তে এভারেস্ট (২৯০০২ ফুট), মধ্যস্থলে চোমিয়োমো ডংখিয়া এবং পূর্ব প্রান্তে ও ভুটানের উত্তরে অবস্থিত চুমলারি (২৪০০০ ফুট)। এভারেস্ট ও চোমিয়োমো শৃঙ্গের মধ্যস্থলে ছর্টেননিমা গিরিসংকট বা পাস। এখান থেকে দক্ষিণ দিকে একটি গিরিশ্রেণী পানিঘাটা পর্যন্ত প্রসারিত। এই গিরিশ্রেণীর শীর্ষ রেখায় কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮১৪৬ ফুট), কাব্রু (২৪০০২ ফুট) অবস্থিত এবং শেষপ্রান্তের নাম শিংলিলা গিরিশ্রেণী। ইহা সিকিম ও দার্জ্জিলিংএর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

ডংখিয়া থেকে দক্ষিণে আর একটি গিরিশ্রেণী প্রসারিত। তার উত্তরাংশের নাম ডংখিয়া, মধ্যাংশ চোল পর্বত, আর দক্ষিণে নিম্পোচি (১৪৫২০ ফুট) শৃঙ্গ। তার পরেই উহা রামশাইএর নিকট ডুয়ার্সের সমতল ভূমির কাছে নেমে এসেছে। ডংখিয়া-চোল গিরিশ্রেণী সিকিম রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত।

কাঞ্চন-শিংলিলা গিরিশ্রেণীর পশ্চিম গাত্রের হিমবাহ (glacier) এবং বৃষ্টি ধোয়ানি তম্বর (কুশীর উপনদী) ও মহানন্দায় গড়িয়ে পড়ছে। আর পূর্ব প্রান্তের ধোয়ানি লাচুং তিস্তায় পড়ছে। সুতরাং এ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জল বা ধোয়ানি বিভাগ রেখা (water-parting)।

আর ডংখিয়া চোল-নিম্পোচির গিরিশ্রেণীর পশ্চিম গাত্রের ধোয়ানি লাচুং-তিস্তায় এবং পূর্ব গড়ানের ধোয়ানি চুম্বি-তোর্সায় পড়ছে।

কাঞ্চন-শিংলিলা গিরিশ্রেণীর উত্তরাংশের উপর স্তম্ভাকার বিরাট পিণ্ড স্থাপিত। তার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮১৪৬ ফুট)। তার আশেপাশে ২০।২২ হাজার ফুট উঁচু আরও অনেকগুলি শৃঙ্গ আছে। যথা পশ্চিমে নেপালে, মধ্যে জন্নু (২৫৩০০ ফুট) বা কুম্ভকর্ণ। কাঞ্চনজঙ্ঘা ও জন্নুর উত্তর ঢালুতে কাঞ্চনজঙ্ঘা হিমবাহ নির্গত। কাঞ্চনজঙ্ঘার ঠিক দক্ষিণে কাব্রু (২৪০০২ ফুট)। কাব্রুর ঠিক পূর্ব পশ্চিম (২২০১০ ফুট)। কাঞ্চনজঙ্ঘার ঠিক পূর্বে যথাক্রমে সিম্ভু (২২,৩৬০ ফুট) এবং সিনিয়লচুম (২২৬২০ ফুট)।

এবারে প্রধান প্রধান গ্লেসিয়ার বা হিমবাহগুলির অবস্থান নির্দেশ করব। নেপালের মধ্যে জন্নু ও কাব্রু শৃঙ্গের মধ্যস্থলে এয়ালুং হিমবাহ। তার পূর্বে সিকিম রাজ্যের কাব্রু এবং পান্দিমের মধ্যস্থলে গুইচালা (১৬,৪০০ ফুট) পাস বা গিরিসংকট। কাব্রু-গুইচালা-পান্দিম রেখার উত্তরে এবং কাঞ্চন-সিম্ভু-রেখার দক্ষিণে টালুং হিমবাহ পূর্ব-দক্ষিণমুখী। কাঞ্চনজঙ্ঘা-সিম্ভু-সিনিয়লচুম রেখার উত্তরে পূর্বমুখী জেমু হিমবাহ। আর কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তরের ঢালু বয়েলোনক হিমবাহ অবতরণ করেছে। তার পর তা দক্ষিণ দিকে ঘুরে গিয়ে লাচেন-তিস্তায় অবতরণ করেছে। এইগুলির সমষ্টি হল কাঞ্চনজঙ্ঘা নামক বিরাট পাষাণপিণ্ড। স্তম্ভাকার এই বিরাট পিণ্ডটি স্তরে স্তরে একটা গ্যালারি সৃষ্টি করে নীচে নেমে গিয়েছে।

তিস্তা নদী কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ডংখিয়া চোল পর্বত মধ্যস্থ একটা সুগভীর ফাটলের খাদ দিয়ে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হচ্ছে।

পশ্চিমে কাঞ্চনজঙ্ঘা-শিংলিলা এবং পূর্বে ডংখিয়া চোল গিরিশ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বিত অনেকগুলি গৌণ ভূধরশ্রেণী বিস্তৃত। সেগুলি সাধারণত ১০-১২ হাজার ফুটের কম উঁচু।

সিকিমের দক্ষিণাংশ একটা খোল সদৃশ্য। এর উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা পিণ্ড, পশ্চিমে শিংলিলা এবং পূর্বে চোল গিরিশ্রেণী। এই খোলের তলদেশ তরঙ্গায়িত শৈলশ্রেণী দ্বারা গঠিত। তার মধ্যে

১২০০০ ফুট উপরে অবস্থিত লাচেন ভূমিতে চমরী গাই
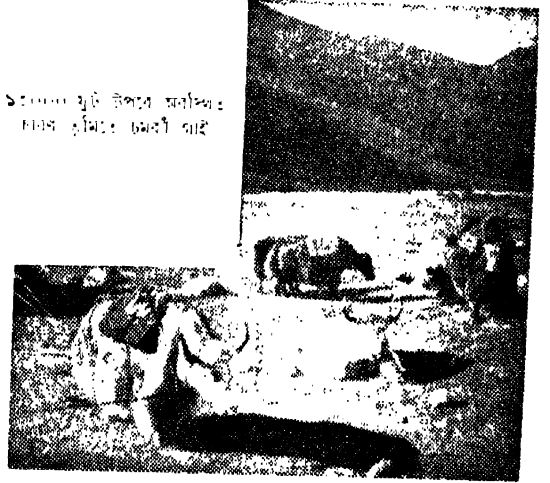
আবার পূর্বমুখী কয়েকটা ফাটল আছে। তাদের মধ্য দিয়ে তিস্তার উপনদীগুলি পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়ে তিস্তায় মিলিত হয়েছে। এই উপনদীগুলির উত্তরে টালুং। কাব্রু ও পান্দিমগিরি রেখার দক্ষিণে যথাক্রমে রাঠোং ও রোংবি, কুলহাইত ও রমম। তারা দার্জিলিং শহরের উত্তরে মিলিত হয়ে বড় রঙ্গিত নামে পূর্ব-মুখে বয়ে গিয়ে কালিম্পং শহরের পশ্চিমে তিস্তার সঙ্গে একত্র হয়েছে। আর টালুং নদী পূর্বমুখী হয়ে এসে গ্যাংটকের উত্তরে তিস্তায় মিলিত হয়েছে। তার উত্তরে যথাক্রমে জেমু ও লোনক নদী পূর্ব-দক্ষিণমুখী হয়ে এসে লাচেনে পড়েছে।

সিকিমের উত্তর-পূর্বস্থিত চোমিয়োমো (২২৪৩০ ফুট) ও কাঞ্চনঝাউ (২২,৭০০ ফুট) ও ডংখিয়া পর্বত। তাদের অবনমনে স্থিত হিমবাহগুলির জল দ্বারা লাচেন ও লাচুং নদী পুষ্ট হয়েছে। তারা দক্ষিণমুখী হয়ে এসে চুংথাঙের (৫৩৫০ ফুট) নিকট একত্র মিলিত হয়ে তিস্তা নাম ধারণ করেছে। সেখান থেকে তিস্তা প্রায় সোজা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে সিবকের নিকট বাঙলার সমতল ভূমিতে প্রবেশ করেছে।

দক্ষিণ সিকিমের খোল এবং উত্তর-পূর্ব সিকিমের ফাটলের তলদেশস্থ শৈলশ্রেণীগুলির উচ্চতা সাধারণত ১২০০০ ফুটের কম। ১২০০০ ফুটের নিম্নস্থ শৈল-গাত্রসমূহ শ্যামল বনানী, ডালাকাটা (terraced) ধান্যক্ষেত্র, কমলালেবুর বাগান প্রভৃতি দ্বারা শোভিত। আর এ সবের মধ্যে মধ্যে স্থিত পূর্ণস্ফীত পার্বত্য নির্ঝরগুলি তাদের তুমুল কলরব দ্বারা উপত্যকাগর্ভ সর্বদা ঝংকৃত করে রেখেছে। উদ্দাম তাদের গতিবেগ। পাষাণ ঠুকে ফোয়ারা ছিটিয়ে প্রপাতের মাথা থেকে নিরন্তর তারা আছড়ে পড়ছে। আবার পড়তে না পড়তে ভগ্ন পাষাণ নুড়ির ভগ্ন সোপানের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে ত্বরিতবেগে লতাপাতার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এই হল সিকিমের স্থানবিবরণ বা topography।

১২০০০ ফুট উপরের পাহাড়ের গাত্রদেশ বৃক্ষবিরল ও

সুবিস্তৃত তৃণক্ষেত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। সেগুলি গো মেষের উপযুক্ত চারণভূমি। তার মধ্যে ছোট ছোট ঝাউ, খর্ব বংশগুচ্ছ, আর রডোডেনড্রন কুঞ্জ অবস্থিত। জুন মাসে ১২০০০ ফুট থেকে ১৬০০০ ফুট পর্যন্ত পর্বত গাত্রের বরফ ও তুষার গ'লে যায়। তখন পাষাণ গাত্রের সর্বত্র শেওলার মধ্যে নানা অত্যুজ্জ্বল রংএর ফুল ফুটে ওঠে। ১৬০০০ ফুট উপরের গিরিগাত্র চিরহিম-মণ্ডিত।

১২০০০ ফুট নিম্নের শৈলগাত্র থেকে ক্রমশ নীচের দিকে লোকালয় আরম্ভ হয়েছে। তার উপরে উত্তর ও পূর্বে সিকিমে কদাচিৎ পশুচারক এবং ভুটিয়া তীর্থযাত্রী ও স্বার্থবাহগণ ছোট ছোট দলে চমরী গাই এবং অশ্বতর নিয়ে যাতায়াত করে। এই হ'ল সিকিম রাজ্যের সাধারণ দৃশ্য।

এভারেস্ট চোমিয়মো-ডংখিয়া-চুমুলগিরি গিরিশ্রেণীর উত্তরে প্রায় ১০০ মাইল প্রশস্ত ঈষৎ আন্দোলিত তিব্বতের মালভূমি। এর খাদগুলি পূর্বপশ্চিমে প্রায় ৭০০ মাইল লম্বা। তার উত্তরে ব্রহ্মপুত্র। এই খাদসদৃশ ঈষৎ ঢালু মালভূমির মধ্য দিয়ে যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মত চাকাওয়ালা মোটর সহজেই যাতায়াত করতে পারে। পশ্চিম প্রান্তে কারাকোরম ও কিউনলুন পর্বতের সংযোগস্থল অবস্থিত। এই সংযোগস্থলের ভিতর দিয়ে প্রায় ৫০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে যাবার পর পামির মালভূমির উপরে উপনীত হওয়া যায়। এই পামিরের উপর দিয়ে রুশিয়া সম্প্রতি একটি highway বা মোটরযানের উপযোগী রাস্তা তৈরি শেষ করেছে। চুংকিন থেকে রুশগামী ও লাসিও এবং ইন্দোচীন হ'তে চুংকিনগামী রাস্তা যত অল্প সময়ে খোলা সম্ভব হয়েছে, উক্ত পামির-ব্রহ্মপুত্র পথ তার চেয়ে অল্প সময়ে নির্মাণ সম্ভবপর। এই পথের পূর্ব প্রান্তে আবার দুই-তিন শত মাইল প্রশস্ত একটা ব্যবধান আছে। তার মধ্য দিয়ে সালউইন, মেকং প্রভৃতির গভীর খাদ ও উচ্চ গিরিশ্রেণী বর্তমান। তার পরেই লাসিও-চুংকিনগামী পথ।

ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরাংশে তিব্বতের বেওয়ারিশ এলাকা (Noman's land) ও চ্যাং নামীয় অতিশীতল মালভূমি। তা সমুদ্রবক্ষ হ'তে ১৭-১৮ হাজার ফুট উঁচু। তার উপর দিয়ে যাযাবর-শ্রেণীর দস্যু তস্করের উপদ্রবে কোনও বণিক বা তীর্থযাত্রীর দল সচরাচর চলাফেরা করে না। তার উত্তরেই সোভিয়েট চীন। লালচীনে আজ চুটে ও চিয়াং কাইসেক হাতে হাত মিলিয়ে বিরাট ভাবে নূতন চীন জাতি সংগঠনে ব্যাপৃত।

আর উত্তর তিব্বতীয় পথের পূর্ব প্রান্ত হ'তে ২-৩ শত মাইল দূরে অবস্থিত য়ুনান প্রদেশে আধিপত্য বিস্তারে জাপান আজ ব্যগ্র।

তিব্বতের অধিবাসী সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। তার মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কোনও ধনোৎপাদন করে না। মঠবাসী হয়ে অপর দুই তৃতীয়াংশের উপার্জিত শ্রমে জীবন ধারণ করে। এমন অবস্থায় পশ্চিম বা উত্তর থেকেও তিব্বতের যাযাবর ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্যবাদ বিস্তৃত হ'তে পারে। অথবা পূর্বদিক থেকে জাপানী প্রভাবও বিস্তৃত হ'তে পারে। চীন সমেত সমগ্র মোঙ্গলীয় বা পীত জাতিগুলিকে এক শাসনতন্ত্রের অধীনে আনয়ন করাই জাপানীদের লক্ষ্য।

সিকিম ও ভুটানে জনসংখ্যা যথাক্রমে ১০৯০০০ এবং দুই লক্ষ। সিকিমে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভুটিয়া ও লেপচাদের সংখ্যা ১৫ হাজার; ভুটানে ভুটিয়া সংখ্যা বোধ হয় দেড় লক্ষ। সিকিমে নেপালীদের সংখ্যা ৯৫ হাজার এবং ভুটানে সম্ভবত ৫০ হাজার। এরা উভয়ে কৃষ্টিসংস্পর্শহেতু ভারতীয় হিন্দু সমাজের নিকটতর আত্মীয়। আর নেপালীরা রক্ত হিসাবে মোঙ্গলীয় ও উত্তর-ভারতীয় জাতির সংমিশ্রণে গঠিত। কিন্তু সিকিম এবং ভুটানে বাঙালীদের স্থান নেই। সিকিম হ'তে বাঙালী কর্মচারী, ডাক্তার, শিক্ষক ও সমাজসেবী বিতাড়িত। এ ভাবে সিকিমকে ভারতীয় সমাজ থেকে পৃথক ক'রে রাখবারই ব্যবস্থা হয়েছে এবং উপরোক্ত অভারতীয় প্রভাবসমূহ প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। সত্য বটে, সিকিমের বাজারে বাজারে মারোয়াড়ী ব্যাপারী (সংখ্যা ৫০০) ও যথেষ্ট নেপালী বাসিন্দা আছে। কিন্তু এরা স্থানীয় অধিবাসীদিগের মনের রাজ্যে কোনও প্রভাব খাটিয়ে তাদের ভারতীয় জাতির দিকে আকর্ষণ করতে পারে না। বাঙালী যেখানে যায়, সেখানেই তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য ইংরেজী স্কুল খোলে, লাইব্রেরি চালায়, থিয়েটার ও কীর্তন করে, খবরের কাগজ পড়ে এবং স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনা করে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই সব প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের উপকারিতা গ্রহণে পশ্চাৎপদ হয়

সিকিম হিমালয়ে ১৭,৫০০ ফুট ঊর্ধ্বে অবস্থিত গিরিসংকট ও হিমবাহ (glacier)

না। কোন প্রবাসস্থানের অর্ধেক বাঙালীরা আচার ব্যবহার বিষয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতি ছুৎমার্গ অবলম্বন করে চলে; আর অর্ধেক খাওয়া ও খেলাধুলা দ্বারা অবাধভাবে স্থানীয় অধিবাসী-দের সহিত মেলামেশা করে। এতদ্দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীদিগকে ভারতীয় করণের দিকেই তাদের প্রভাব নিয়োজিত হয়। আর বাঙালী প্রভাব বিতাড়ন দ্বারা এসব ক্ষেত্রে কাদের প্রভাব বিস্তৃত হবে, তা বাঙালী বিদ্বেষীদের চিন্তা করা উচিত।

সিকিমে কোনও আধুনিক আন্দোলন হয় নি। দার্জিলিং জেলায় স্থানীয় নেপালীরা কংগ্রেস ও সমাজসেবা আন্দোলন অল্প অল্প আরম্ভ করেছে। সিকিমের অধিবাসীদের মন-প্রাচীনকালের মতই প্রায় আছে। তবে বলা যেতে পারে কোনওরূপ বিশেষ রূপ না নিয়েই আধুনিক ভাবের বারতা ধীরে ধীরে তাদের দ্বারে দ্বারে উপনীত হচ্ছে। প্রাচীনকালের যে মনোভাব সিকিমবাসীদের আজও বর্তমান তা জানতে হ'লে সিকিমের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়।

প্রাচীনকালে লেপচারা সিকিমের একমাত্র অধিবাসী ও অধিপতি

ছিল। এই লেপচারা বড় বা বোদো জাতির অন্তর্ভুক্ত। কোঁচ, মেচ, কাছাড়ী, গারো এবং নেপালের লিম্বু, মগর প্রভৃতি কিরাতগণও এই বড় জাতির অন্তর্ভুক্ত।

তিব্বত, কামরূপ, ভুটান প্রভৃতি অঞ্চলে তান্ত্রিকবাদ বিশেষভাবে প্রচলিত। এজন্য আমার মনে হয় বর্তমান তিব্বতের লোকসমাজে একটা প্রাচীন স্তর বর্তমান আছে, যারা বড় জাতির আর এক শাখা। মহাভারতের যুগে তাদের কিন্নর বলা হ'ত। বুদ্ধের সমসাময়িককালের লিচ্ছবি এবং বর্তমান যুগের কিরাত, সেরপা ও লেপচা ওই বিরাট বড় জাতির শাখা। লেপচা ও সেরপা জাতিদের চেহারায় উত্তর ভারতীয় ছাপ ভুটিয়াদের চেয়ে বেশী ব'লে মনে হয়। আশা করি, ভাষা ও নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন।

কাঞ্চনজঙ্ঘার দক্ষিণে গুইচালা গিরিসংকট (১৬,৪০০ ফুট)

প্রথম চীন সম্রাট সিহোয়াংতি (খ্রীঃ পূঃ ২৪৬-২১০) হূনে বা মোঙ্গলীদিগকে চীন থেকে পশ্চিমে ও দক্ষিণে বিতাড়িত করেন। আমার আরও একটি অনুমান, এই সময়ে মোঙ্গলীয় যাযাবরগণ ১৭-১৮ হাজার ফুট উঁচু উত্তর তিব্বতের চ্যাং মালভূমি অতিক্রমপূর্বক পূর্বোক্ত কিন্নর উপজাতিকে পরাভূত করে। তার পর উহাদের সহিত রক্তসংমিশ্রণ দ্বারা বর্তমান ভুটিয়া বা তিব্বতীয় জাতিতে পরিণত হয়েছে।

খ্রীঃ পূঃ ১০০ বৎসরের কাছাকাছি সময়ে তিব্বত প্রথম চীনাদের দ্বারা বিজিত হয়। তার পর তিব্বত পুনরায় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি ও রাজ্যে বিভক্ত থাকে। অতঃপর স্রংসেন গোম্পা নামক এক তিব্বতীয় সম্রাট সমগ্র তিব্বত এক শাসনাধীনে আনয়ন করেন। তিনি নেপাল ও চীন জয়পূর্বক ওই দুই দেশের দুই রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তারা উভয়ে সম্রাটকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে উদ্‌বুদ্ধ করেন। এই শতাব্দীতে উড়িষ্যার এক রাজপুত্র এবং সাভারের রাজজামাতা ভিক্ষুরূপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের নিমিত্ত তিব্বতে আসেন। তাঁর নাম গুরু পেমা বা গুরু পদ্মসম্ভব। তিনি নেপাল, তিব্বত, ভুটান এবং সম্ভবত সিকিমেও লাল টুপিধারী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। এই সম্প্রদায়ের লামাগণ (ভিক্ষু) বিবাহ করতে পারে।

সেই প্রাচীনকাল থেকেই সিকিমের লেপচা রাজবংশের সঙ্গে তিব্বত, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের রাজবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল। এবং তিব্বতের শক্তিশালী রাজাদের প্রভাবে সিকিমের লেপচারা তিব্বতীয় ধর্ম, আচারব্যবহার ইত্যাদি গ্রহণ করতে থাকে। সিকিমের রাজবংশ কোশলরাজ প্রসেনজিতের বংশধর ব'লে আত্মপরিচয় দেয়।

অতঃপর একাদশ শতাব্দীতে বিক্রমপুরের অধিবাসী দীপংকর বা অতীশ নেপাল, তিব্বত, সিকিম ও ভুটানে আর একটি ধর্মান্দোলন আনয়ন করেন। তিনি পীত টুপিধারী অবিবাহিত লামা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। সিকিম ভুটিয়াদের অধিকাংশ এই সম্প্রদায়ের অনুগামী। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায়ের তিব্বতীয়গণ সিকিমের রাজশক্তি হস্তগত করে এবং দলে দলে উপনিবেশ স্থাপন করে। সেই থেকে লেপচারা নির্ঝর নির্ঝরিণীর পাশে নির্জন উপত্যকায় ২।৪টি পরিবারে সংঘবদ্ধ হয়ে একত্রে বাস করতে বাধ্য হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পেংচুনামগে কর্তৃক সিকিমের বর্তমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল সিকিমের পশ্চিমাংশ অধিকার করে। সম্ভবত এই সময়ে লেপচাগণ নেপালীদিগকে সাহায্য করে এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকেও পরবর্তী কালে বাধা দেয়। এজন্য নেপালে লেপচারা গোমাংসভোজী হয়েও জলাচরণীয়।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই নেপালের গুরুং, মগর প্রভৃতি বড় জাতির শাখাদিগকে দলে দলে সিকিম দার্জিলিংএ উপনিবেশ স্থাপনে অনুমতি দেওয়া হয়। সেই থেকে তারা সিকিম, দার্জিলিং, ভুটান ছেয়ে ফেলতে আরম্ভ করেছে।

১৮৫০, ১৮৬০, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সিকিম ও তিব্বতের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। তার পর সিকিম ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অনুগত হয়ে পড়ে। বর্তমান রাজবংশ তিব্বতীয় ব'লে আত্মপরিচয় দেয়। কিন্তু সিকিমের লেপচা ও তিব্বতীয় অভিজাত বংশের মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় নেপাল সিকিম ও ভুটানকে নিজ রাজ্যভুক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছিল।

সিকিম ও তিব্বতের বর্তমান লেখ্য ভাষা এক, কিন্তু কথ্যভাষা পৃথক। অক্ষরও এক, বরং প্রাচীন ভারতীয় অক্ষরজাত। কিন্তু ভাষা হিসাবে তা চীনা ভাষার সগোত্র। চীনা অক্ষর ভারতজাত নয়। যদি সিহোয়াংতি রাজবংশ মন্দারিণ নামক শিক্ষিত রাজপুরুষ সম্প্রদায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা নিয়োগ প্রথা প্রবর্তিত না করতেন, তবে প্রাচীন ভারতীয় অক্ষরই চীন ও জাপানে প্রচলিত হ'ত।

বর্তমানে সিকিমের ভুটিয়ারা উত্তরে লাচেন ও লাচুং উপত্যকায় প্রায় যাযাবররূপেই বাস করে। কিছু কিছু আপেলের বাগান তারা সেই অঞ্চলে করেছে। গাংটক বা গান্দুক থেকে দক্ষিণে সমুদয় অংশ নেপালী বসতিপূর্ণ। নেপালীরা পাহাড়ের গায়ে ডালা কেটে ধান, জোয়ার, ভুট্টা, আলু, বড় এলাচ আর কাল মাটিতে কমলা নেবুর গাছ প্রভৃতির আবাদ করে; গো-পালনও করে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণীও তাদের মধ্যে বর্তমান। অসবর্ণ বিবাহ ব্যাপারে বেশী বাধা নেই।

ভুটিয়া জমিদাররা কাজী নামে পরিচিত এবং অনেক পাহাড়ের তারা মালিক। এ ছাড়া সরকারী চাকরে লামা, পশম ব্যবসায়ী এবং ভেড়া ও চমরী গাইয়ের পালক বিক্রেতারূপেও তারা জীবিকা অর্জন করে থাকে। নেপালীদের মধ্যেও কাজী বা জমিদার আছে; একজন দারভাঙ্গা জেলা থেকে আগত বিহারী কাজীও আছেন। কিন্তু বাঙালী কাজী বা চাষী কেউই নেই। কালিম্পং ও

দার্জিলিংএ কমলা ও কপি খেতের মালিক এবং ডেয়ারি ব্যবসায়ী রূপে দু-একজন বাঙালী আছেন। বিগত কয়েক শত বৎসরে বাঙালী মধ্যবিত্ত বা শ্রমিকগণ বাঙলার উত্তর অঞ্চলে কোনও উপনিবেশ স্থাপন করতে চেষ্টা করে নি।

সিকিম ও তিব্বতের সাধারণ লামা ভিক্ষুগণ খন্তাল ও ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে পথ চলে। আর

ওমে গুরু পেমে হুং
পেমে গুরু ওমে হুং

ব'লে মালা জপ করে। বহু ভুটিয়া ভেড়া, চমরী গাইএর মাখন, পশম, কম্বল প্রভৃতি বেচতে বেচতে দার্জিলিং জেলা পর্যন্ত নেমে আসে। মৃগনাভি, শিলাজতু প্রভৃতি মূল্যবান সামগ্রী পরিহিত আলখাল্লার মধ্যেই রাখে।

অরুণ। দক্ষিণ তিব্বতের মালভূমি থেকে এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘার মাঝখানে একটা ফাঁক দেখা যায়। তা প্রায় ৯০ মাইল প্রশস্ত। তার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ তিব্বতের মালভূমি ধৌত ক'রে অরুণ দক্ষিণ মুখে নেপালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। নেপালস্থিত তম্বর নদী কুশীর আর একটি উপনদী। এই নদী অরুণের খাদ এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত। এই তম্বর কাঞ্চনজঙ্ঘা শিংলিলা গিরিশ্রেণীর পশ্চিম গাত্র ধৌত ক'রে নিয়ে যাচ্ছে।

শিলিগুড়ির ঈষৎ উত্তর-পশ্চিমে পাণিঘাটা। তা সমতল তরাইএ অবস্থিত। এখান থেকেই শিংলিলা পাহাড় আরম্ভ হয়েছে। এর পশ্চিমে মেচি—মহানদীর একটি উপনদী। মেচি নদী দার্জিলিং ও নেপালের সীমান্ত বেয়ে প্রায় ১০।১২ মাইল উত্তর দিকে প্রসারিত। পাণিঘাটা থেকে শিংলিলার শীর্ষরেখা

ক্যাংলা গিরিসংকট

ধ'রে প্রায় কুড়ি মাইল উত্তরে যাবার পর সীমানা বস্তি। এটি দার্জিলিং ও নেপাল সীমান্তের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও বাজার। সীমানার তিন মাইল পূর্বে সুকিয়া নামে একটি বিরাট গঞ্জ। সুকিয়া থেকে মোটরগামী রাস্তা দিয়ে ছয় মাইল গেলে ঘুম রেল স্টেশন। শিলিগুড়ি-দার্জিলিং মোটর রাস্তার সহিত ওর যোগাযোগ আছে। সীমানা থেকে পশ্চিমে নেপাল মধ্যে অবস্থিত ধানকুটা ও ইলাম বাজার। ইলাম তম্বর তীরে অবস্থিত। দুই তিন দিনে অশ্বারোহণ বা পদব্রজে পৌঁছানো যায়। সীমানা হ'তে শিংলিলা শীর্ষরেখায় যথাক্রমে টোঙলু (১০০৭৪ ফুট), সান্দকফু (১১৯২৯ ফুট) এবং ফালুট (১১৮১১ ফুট)। এদের পরস্পরের ব্যবধান এক দিনমানের পথ। এগুলি দার্জিলিং জেলার মধ্যে বটে, তবে ঠিক সীমান্তে অবস্থিত। টোঙলু থেকে ইলাম প্রায় কুড়ি মাইল পশ্চিমে ও নিম্নদেশে অবস্থিত। সোনাদাস্থিত ডেয়ারির বাঙালী মালিকরা এই অঞ্চলের চতুষ্পার্শ্ববর্তী নেপাল ও দার্জিলিংএ আপনাদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছেন।

ফালুট থেকে ৬½ মাইল উত্তরে যাবার পর চিয়াভঞ্জন। এ

গৃহী ও কৃষক ভুটিয়াদের উচ্চাভিলাষ লামা হওয়া। লালটুপী পরিহিত বিবাহিত লামারা হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণদের মত পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী এবং সমাজে বেশ সম্মান লাভ ক'রে থাকে। আর পীত টুপী ধারী লামারা মঠ বা গোম্পার অধিবাসী ও অবিবাহিত। কিন্তু তীর্থ ও ব্যবসায় উপলক্ষে তারা খুব ভ্রমণ ক'রে থাকে। ভুটিয়ারা এজন্য আধুনিক সভ্যতার উপকারিতা গ্রহণে উদাসীন এবং লামারা বাধাপ্রদানকারী। ভুটিয়ারা সাধারণ কার্যকলাপ সম্বন্ধেও উদাসীন ও অলস। কিন্তু তাদের প্রতিবেশী নেপালীরা নাতিশীতোষ্ণ গিরিগাত্রে এবং নদীর দুই পাশে শস্য-ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের সহিত কোদাল চালিয়ে কৃষিকার্য ক'রে থাকে। এজন্য সিকিম, দার্জিলিং ও ভুটানে তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

এবারে সিকিমের সংগে নেপাল-তিব্বতের সংযোগকারী গিরি-সংকট (লা) বা 'পাস'গুলির বিবরণ দেব।

শিলিগুড়ির নিকট দিয়ে মহানদী প্রবাহিত। যা মহানন্দা নামে গৌড়ের কাছ দিয়ে গঙ্গায় পড়েছে। তার পশ্চিমে কুশী, গঙ্গার আর এক উপনদী। কুশীর উত্তরস্থিত উপনদীর নাম

নেপাল, সিকিম ও দার্জিলিংএর সংযোগস্থল। এর উত্তরে অল্প কয়েক মাইল পরেই কাঞ্চনজঙ্ঘা পিণ্ডের উপরিস্থিত বরফ প্রদেশ। সেখানকার পাহাড়গুলির ঢালুতে ছোট ছোট বস্তি মাত্র আছে। কিন্তু চিয়াভঞ্জনের ঠিক পূর্ব থেকে সিকিমের জনবহুল (নেপালী বসতিপূর্ণ) অঞ্চল। এখান থেকে পূর্বগামী পথে ডেণ্টাম, কেজিং প্রভৃতি বর্ধিষ্ণু বাজার সিকিমের মধ্যে অবস্থিত। আর একটি পথ এখান থেকে পশ্চিমে নেপালের মধ্যাংশে (তুষারাবৃত অঞ্চলে নয়) অবতরণ করেছে। অপর একটি হাঁটা-পথ সোজা উত্তর দিকে শিংলিলার শীর্ষরেখা ধ'রে পোঙরি (১৩১৪০ ফুট, সিকিম) অভিমুখে চ'লে গেছে।

চিয়াভঞ্জনের উত্তরস্থ পাস বা গিরিসংকটগুলি তুষারমণ্ডলে অবস্থিত এবং তা সিকিম ও নেপালের সংযোগ সাধন করেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা সিকিম ও নেপাল সীমান্তে অবস্থিত। এর দক্ষিণে ক্যাংলা নামো সংকটই (Kangla namo pass) প্রধান। উহা নেপাল-সিকিম সীমান্তে অবস্থিত এবং উহার উচ্চতা ১৮২৮০ ফুট। এর উত্তরে রাঠোং নদীর উৎপত্তিস্থল রাঠোং হিমবাহ। এই হিমবাহের ঊর্ধ্বে ও উত্তরে কাব্রু (২৪০০২ ফুট) ও পন্দিম শৃঙ্গ (২২০১০ ফুট)। এদের উত্তর ঢালুতে টালুং হিমবাহ অবস্থিত। রাঠোং থেকে টালুং হিমবাহের খাদে যেতে হ'লে গুই-চালা সংকট (১৬৪০০ ফুট) অতিক্রম করতে হয়। তার উত্তরেই প্রায় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রসারিত সরল রেখায় কাঞ্চনজঙ্ঘা, সিম্ভু, সিনিয়লচুম শৃঙ্গত্রয় অবস্থিত।

বড়রঙ্গীত নদীর ঊর্ধ্বাংশের নাম রাঠোং। এই রাঠোং উপত্যকায় পেমিয়ঙ্গি ও সুন (৬,০০০ ফুট) এবং জোঙরী (১৩,১৪০ ফুট) অবস্থিত। ওকসুন থেকে তিন দিনে ক্যাংলা নামো সংকট অতিক্রম ক'রে পঞ্চম দিনে নেপালের এয়ালুং উপত্যকায় পৌঁছানো যায়। তার পর উত্তর-পশ্চিমে যাবার পর কাম্বাচেন সংকট পার হ'য়ে আরও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ওয়ালাঞ্চুন (Wallanchoon, ১৬৭৫৬ ফুট) উপত্যকায় উপনীত হওয়া যায়। তার কিছু উত্তরে ক্যাংলাচেন (১৭০০০ ফুট) সংকট নেপাল-তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত। ওয়ালাঞ্চুন থেকে তিন দিনে ক্যাংলাচেন সংকটে পৌঁছানো যায়। তার পর তিব্বতের সিগাস্তি প্রদেশ। এই পথ দিয়ে পূর্বে সিগাস্তি থেকে সিকিমের পেমিয়ঙ্গি অঞ্চলে লবণ আসত। হুকার, ফ্রেসফিল্ড ও হোয়াইট মহাশয়গণ নেপালের এই অঞ্চল মোটামুটি জরিপ করেছেন। আর বিগত এভারেস্ট অভিযানের সময় নেপাল-তিব্বতের সীমান্ত অঞ্চল জরিপ করা হয়েছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তরে জেমু ও লোনক হিমবাহ। লোনকের ঠিক উত্তরে ছর্টেননিমা গিরিসংকট সিকিম-তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত। এই সংকট দিয়ে শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বতে গুপ্তভাবে প্রবেশ করেন। তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘার দক্ষিণ দিয়ে নেপালে প্রবেশ করেন; তারপর কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে ১৬।১৭ হাজার ফুট উঁচু অঞ্চল অতিক্রম করতে করতে ওই ছর্টেননিমা পাস বা গিরিসংকটে উপনীত হন। এর প্রায় তিরিশ বৎসর পরে বিগত মহাসমরের সময় তাঁর ছেলে শ্রীযুক্ত প্রবোধ-চন্দ্র দাস মহাশয় জেমু হিমবাহ দিয়ে উপরে উঠে কাঞ্চনজঙ্ঘার পূর্ব পাশ দিয়ে গুইচালা সংকটে উপনীত হন।

কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর-পূর্ব দিকে চোমিয়োমো (২২,৪৩০ ফুট) শৃঙ্গ। তারও উত্তরে নাকুলা (১৮১৮৬ ফুট), কোংরালামো প্রভৃতি কয়েকটি সংকট। লাচেন থেকে তিন চার দিনে এই সংকট-গুলি অতিক্রম করবার পর আর এক দিনে তিব্বতস্থিত কাম্পাজঙ্গে (জঙ্গকেল্লা) উপস্থিত হওয়া যায়। তার উত্তরে সিগাস্তি শহর।

চোমিয়োমোর পূর্বে কাঞ্চনঝাউ (২২৭০০ ফুট) শৃঙ্গ ও ডংখিয়া। ডংখিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ পৌহুনরি (২৩১৮০ ফুট) সিকিম-চুম্বি সীমান্তে অবস্থিত। এই ডংখিয়া দক্ষিণ দিকে চোল গিরিশ্রেণীরূপে প্রসারিত। ডংখিয়া চোল গিরিশ্রেণীর পশ্চিমে লাচুং (তিস্তার অপর উপনদী) আর পূর্ব দিকে চুম্বি তোর্সা নদী। তিব্বতে চুম্বি, ভুটানে আমোচু, ডুয়ার্সে তোর্সা এবং কোচবিহারে ধরলা একই নদীর নাম।

লাচেন উপত্যকা থেকে লাচুং উপত্যকায় আসতে হ'লে কাঞ্চনঝাউয়ের উত্তর পার্শ্ব বেড়ে এসে ডংখিয়া লা সংকট অতিক্রম করতে হয়। ডংখিয়া লা (১৮২০০ ফুট) সিকিমের মধ্যেই অবস্থিত। ইহা কাঞ্চনঝাউ এবং ডংখিয়া গিরিশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। ডংখিয়া সংকটের উত্তরাঞ্চলে হিমবাহসেবিত অনেক তাল বা হ্রদ আছে। নরওয়ে-সুইডেনের তুষারসেবিত তাল থেকে যেভাবে বিজলীশক্তি আহরিত হয়, এখানেও সেরূপ হ'তে পারে।

লাচেন উপত্যকা থেকে কোংরানামো সংকট পথে তিব্বত-গামী ট্রাম বা রেলপথ প্রসারিত করা সম্ভব। আল্পস পর্বতভেদী টানেলের ন্যায় এই পথে টানেল খননেরও দরকার হ'তে পারে। এর উত্তরস্থ সিগাস্তি প্রদেশে তিব্বত মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী পশম উৎপন্ন হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মূল তিব্বত অভিযানের পূর্বে ধাঁধা দেবার জন্য ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এই পথে ভারত গভর্নমেণ্ট একটি গৌণ অভিযান প্রেরণ করেন।

লাচুং বাজার থেকে পূর্ব দিকে ঘোরালা সংকট (১৭০০০ ফুট) বর্তমান। তার দক্ষিণে যথাক্রমে ইয়াকলা (১৪৪০০ ফুট) নাথুলা (১৪৪০০ ফুট) প্রভৃতি সংকট চোল পর্বতের শীর্ষরেখায় অবস্থিত। এগুলি সিকিম রাজধানী গ্যাংটক থেকে পূর্বে অবস্থিত। এদের দক্ষিণে জেলেপ লা (১৪৪০০ ফুট), পেমবেরিংগো, ব্যাথালা ও ডোকালা ওই চোল শীর্ষরেখায় অবস্থিত। এদের উপর দিয়ে পথগুলি চোল পর্বত অতিক্রম ক'রে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকায় প্রবেশ করেছে। তার পর দক্ষিণে নিম্পোচি শৃঙ্গ (১৪,৫২৩ ফুট)। এ সিকিম, চুম্বি ও ভুটানের সংযোগস্থল। নিম্পোচির পূর্বে ও দক্ষিণে ভুটান এবং পশ্চিমে সিকিম।

চুম্বি উপত্যকা একটা ফালির মতন সিকিম ও ভুটান রাজ্য-দ্বয়কে পৃথক্ করেছে, কিন্তু এ দেশ সাধারণ শাসন ব্যাপারে তিব্বতের অধীন। চুম্বির উত্তরে ফারিজঙ্গ (১৪০০০ ফুট), তার উত্তরে চুমলারি (২৪০০০ ফুট) শৃঙ্গ। এভারেস্ট, চোমিয়োমো, চুমলারি পিণ্ডগুলি হিমালয়ের উত্তর শ্রেণীতে অবস্থিত।

যখন অধিরাষ্ট্রীয় (international) রেষারেষি মিটে যাবে, তখন মনে হয়, তোর্সা-চুম্বি এবং তিস্তা-লাচেন হয়ে দুটি রেলপথ তিব্বত পর্যন্ত প্রসারিত হবে। আর পাণিঘাটা ফালুট-ছর্টেননিমা-সিগাস্তি এবং রাম্মসাই-নিম্পোচি-জেলেপ-ফারি-সিয়াংসি এই দুই গিরি শীর্ষরেখায় বিমানবর্ত্মের ঘাঁটি, অথবা মোটর বা রেলপথ নির্মিত হবে।

নিম্পোচি শৃঙ্গ এবং জেলেপ-লিংচুর দক্ষিণাংশ ধৌত ক'রে যাচ্ছে জলঢক্কা নদী। এ হ'ল তোর্সা-ধরলার আর একটি উপনদী। এই জলঢক্কা নদীই কালিম্পং মহকুমাকে ভুটান পাহাড় থেকে পৃথক্ করেছে। ভুটানের মধ্যে ভাল বাজার বা রাস্তাঘাট নেই, সেজন্য লোকজনের বিশেষ চলাচল নেই। ভুটানের প্রধান মন্ত্রী কালিম্পংয়ে থাকেন। তাঁরা প্রধানত ডুয়ার্স দিয়েই দক্ষিণ ভুটানে গমনাগমন করেন। আর জেলেপ পাশ ও ফারিজঙ্গ হ'য়ে পারো শহর প্রভৃতি উত্তর ভুটানের শহরগুলিতে যাবার রাস্তা আছে। সুতরাং সিকিম-দার্জিলিং থেকে ভুটানে যাবার সংকট-গুলি উল্লেখযোগ্য নয়।

লাস

(৫২০ পৃষ্ঠার পর)

কোমলতাটুকু গ্রাস করিয়াছে। আজ আর কিছু নাই, শুধু ছাই। আগুন দেখিয়াছ কখনও? সুন্দর সাজানো গৃহে যখন আগুন লাগে? যখন নিমেষে নিঃশেষে সমস্ত ভস্ম হইয়া যায়? বংশীর অন্তরেও সেই আগুন লাগিয়াছিল।

ভগবানকে ডাক! বংশী হাসে। এ সমস্ত কথা শুনিলে তাহার সারা শরীর জ্বলিয়া যায়। অনাহারে, অনিদ্রায়, অশান্তিতে যখন গুমরিয়া গুমরিয়া জ্বলিবে, তখন ডাকিও একবার সেই লোকটাকে; দেখি কেমন করিয়া তোমার দুঃখ দূর হয়। ও সব কথা ভাবিতেই ভাল লাগে। কে কবে শুনিয়াছে ভগবান দুঃখ দূর করে? তোমার দুঃখ দূর করিবে তুমি নিজে, পরিশ্রম করিতে হইবে তোমাকে—চুরি, খুন, যাহাই হউক। তাহা না করিয়া দরজায় খিল দিয়া ভগবানের কাছে কাঁদা। যত বাজে কথা। তুমিই সব, বংশী ভাবে। দেহ তোমার, পরিশ্রম তোমার, শক্তি তোমার। কোথায় ভগবান? উহা নিজেকে সান্ত্বনা দিবার এক অলস অর্থহীন কল্পনা মাত্র।

বংশী এ কথা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া নয়, হয়তো বাধ্য হইয়াই। শুরু হইয়াছে তাহার জীবনের নূতন অধ্যায়। স্ত্রী, পুত্র মরুক সব; তুমি তো আছ। এ পৃথিবীতে কেহ কাহারও নয়। আজ বংশী জীবনের কাজ বাছিয়া লইয়াছে। তাহাকে শুধু বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, যেমন করিয়াই হউক।

রাত্রে প্রস্তুত হইয়া বংশী বাহির হয়। ছোরা একটা সব সময় সঙ্গে রাখে সে। প্রয়োজন হইলে চালাইতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিবে না। না না, হাত তাহার একটুও কাঁপিবে না, নিশ্চিন্ত থাক। আজ কি তাহার দয়া মায়া আছে নাকি? রক্ত মাংস? কিছুই নাই। মানদা যদি আজ মরিত তবে কি সে চোখের জল ফেলিত? এক ফোঁটাও নয়। ছেলেটার কথা সে ভুলিয়াও ভাবে না। যাক যাক, সব যাক্। তবু বংশীকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। সে বংশী কি আছে?

চুরি করিতে সে অদ্বিতীয়। ছোরা দেখাইয়া নিরীহ লোকের টাকা, পয়সা, আংটি, বোতাম বিনা দ্বিধায় সে ছিনাইয়া লয়। বাঁচিয়া থাকিতে হইবে তো! তাই বলিতেছিলাম সে বংশী আর নাই। এ নূতন বংশী। বলিতে পার সংগ্রাম-সমৃদ্ধ তাহার জীবন, বলিতে পার সে মৃতপ্রায়।

রাত্রি গভীর। আকাশে কয়েকটা তারা ফুটিয়াছে। গ্রাম নিঃশব্দ। কোনও কলরব কানে আসে না। স্টেশনের কাছে দাঁড়াইয়া বংশী। এইমাত্র একটা ট্রেন থামিয়াছে। বংশী শিকারের আশায় প্রতীক্ষা-কাতর।

সুটকেস হাতে কে একজন প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আসিয়া একবার হাঁ করিয়া এদিক ওদিক চাহিল। যাক সন্ধান মিলিল অবশেষে। বংশী প্রস্তুত হইয়া লইল। লোকটা পথ চলিতে লাগিল। এক মুহূর্তেই বুঝা যায় এ নূতন আসিল এখানে। খুব সাবধানে বংশী তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

সুযোগ মিলিল একসময়। লোকটা বোকার মত চলিতেছে। এ দিকটায় কাহারও বাড়ি নাই, একেবারে নির্জন। চিৎকার করিলেও কেহ শুনিতে পাইবে না।

'এই বের কর,' বংশী শিকারের মুখোমুখি দাঁড়াইল।

লোকটা ভয়ানক চমকাইয়া উঠিল, 'কি বের করব?'

'টাকা পয়সা—ওই বাক্স—'

আগন্তুক নিজের অবস্থা বুঝিল এবার, বুঝিল কাহার হাতে সে পড়িয়াছে। তাহার ভয় কিন্তু উড়িয়া গেল খুব সহজেই। একজন গেঁয়ো বাটপাড়কেও শেষে ভয় করিতে হইবে নাকি?

'ভাগ্ এখান থেকে,' সে রুখিয়া উঠিল।

'মরবি ছোকরা, খুন ক'রে ফেলব।'

লোকটা ধাক্কা মারিল বংশীকে, 'যা যাঃ—।'

'কী!' বংশীর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, 'দাঁড়া শালা—।'

'খবরদার!' লোকটা বংশীর হাত চাপিয়া ধরিল।

এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া লইল বংশী। জোর আছে তাহার। এইবার সে বাহির করিল ছোরা।

'টাকা দিবি কি না?'

'মারব এক ঘুসি,' লোকটা একটু ঘাবড়াইয়া গেছে যেন।

'দিবি কি না?' বংশীর চোখে জ্বালা।

আগন্তুক বংশীর গলা চাপিয়া ধরিল।

রাগে বংশী কাঁপিয়া উঠিল। আর রক্ষা নাই। প্রচন্ড পদাঘাত করিল সে লোকটিকে, দূরে ছিটকাইয়া পড়িল আগন্তুক। ঝাঁপাইয়া পড়িল বংশী তাহার উপর, বিঁধাইয়া দিল তীক্ষ্ণ ছোরা তাহার বুকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র আর্তনাদ, তার পর একেবারে চুপ। ক্ষিপ্রহস্তে কাজ গুছাইয়া রাতের অন্ধকারে বংশী গা ঢাকা দিল।

পুলিস আসিল লাস তদন্ত করিতে। জানা গেল বংশী যাহাকে খুন করিয়াছে সে গোপাল, তাহার নিজেরই ছেলে। অনেক দিন পর সে গ্রামে ফিরিতেছিল।

জন্তুদের আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র

মানুষের আবির্ভাব হবার বহুপূর্বেই ধরাপৃষ্ঠ বহু শ্রেণীর শক্তিশালী বন্য জীবজন্তু দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। বর্তমানকালের জীবজন্তুরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবজন্তুদের বংশধর হলেও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের আয়তনের তুলনায় দৈহিক শক্তিও যথেষ্ট হারিয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবজন্তুদের দাপটে আদিম মনুষ্য-সমাজকে বিপর্যস্ত হয়ে সর্বদাই আকস্মিক আক্রমণের জন্য ব্যর্থ করতে বহুদিন ধরে গবেষণা করতে হয়েছিল—সে ইতিহাস সহস্র সহস্র বৎসরের। নখ-দন্তের অধিকারী হয়েও মানুষ বিড়াল জাতীয় পশুদের কাছে কম অসহায় নয়। বিড়াল জাতীয় সকল পশুই সুতীক্ষ্ম নখগুলিকে কিভাবে থাবার মধ্যে থেকে সুকৌশলে প্রকাশ ক'রে শত্রুর উপর আক্রমণ চালায় তা দর্শকের পক্ষে আনন্দদায়ক হলেও শিকারীর পক্ষে যে কতখানি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরই বোধগম্য। প্রয়োজনের সময়ে এই শ্রেণীর পশুরা নখগুলিকে সুরক্ষিত

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অদ্ভুত জীব র‍্যাম-ফোরাইংকাস জেম্মিঙ্গি। পাখীর মতো ডানা, এর দু'দিকের মাপ কুড়ি ফিটেরও বেশী। এদের দাঁত আর জানোয়ারের মত ল্যাজ ছিল।
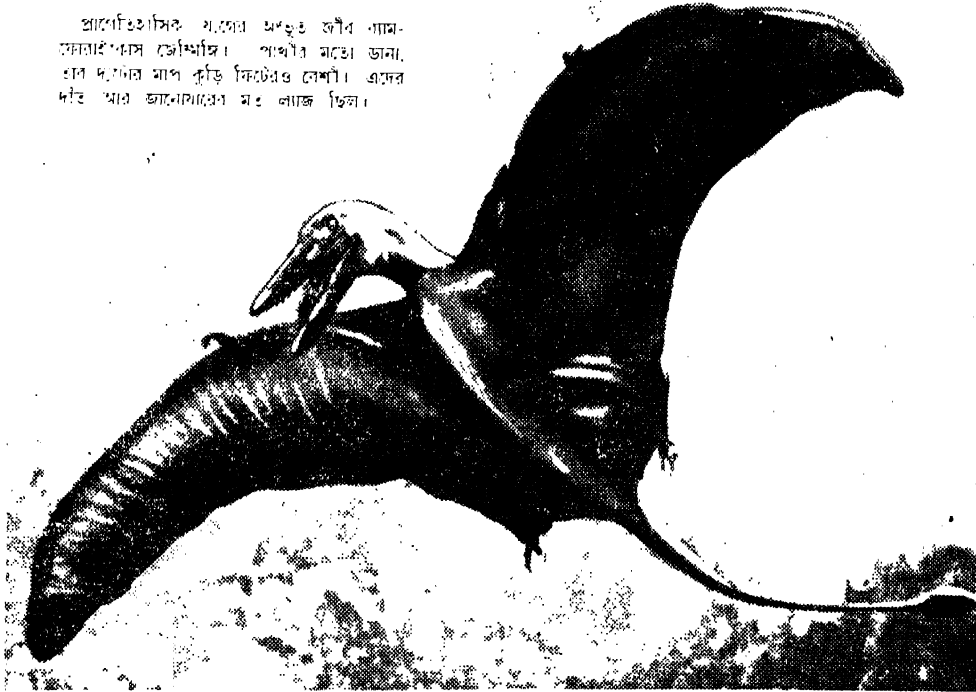
প্রস্তুত হয়ে থাকতে হ'ত। মানুষ আজ বিজ্ঞানের প্রভাবে বহুশত প্রকার মারণাস্ত্রের সন্ধান পেয়েছে, কোন কোন জীবের দৈহিক শক্তির তুলনায় দুর্বল হ'লেও আজ তারা অসহায় নয়। একদিন যারা মানুষের উপর আধিপত্য চালিয়েছে তাদের বংশধরেরা পূর্বপুরুষদের বহুদিনের অর্জিত সম্মান, শক্তি সমস্তই হারাতে বসেছে। প্রকৃতিজাত আসুরিক শক্তি, সুঠাম দৈহিক গঠন, আত্মরক্ষা ও শত্রু আক্রমণের উপযোগী অস্ত্র, যথা, সুতীক্ষ্ম নখ-দন্ত, কঠিন দেহ-আবরণ প্রভৃতি সকলই মানুষের উপর প্রভুত্ব করতে বন্য পশুদের যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছে। পশুরা কেবল অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত নয়, প্রত্যেকই নিজ নিজ ক্ষুদ্র অথবা প্রচন্ড শক্তিতে নানারূপ সুকৌশল কিভাবে প্রয়োগ করে তা আলোচনার যোগ্য। মানুষকে সেই সমস্ত অস্ত্রের প্রতিরোধক অস্ত্র আবিষ্কার করতে এবং কৌশল খাপ থেকে প্রকাশ করে নতুবা গোপনে রাখে। অস্ত্রের তীক্ষ্মতা রক্ষার জন্যই এতখানি যত্ন ও সাবধানতার প্রয়োজন হয়। ভালুকের নখ কিন্তু উন্মুক্ত অবস্থার মধ্যে থেকেও স্বাভাবিক তীক্ষ্মতা হারায় না। সুতীক্ষ্ম দীর্ঘ নখযুক্ত থাবার প্রচন্ড আক্রমণ শিকারের পক্ষে যতখানি মারাত্মক বলশালী মুষ্টিযোদ্ধার একটা ঘুষিও ততখানি নয়। প্রধানত দাঁতই পশুদের আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অস্ত্র। হায়নার সুতীক্ষ্ম দন্তরাজি বৃহৎ ষণ্ডেরও কঠিন অস্থিকে স্বচ্ছন্দে চর্বণ করতে সক্ষম হয়। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বলশালী মাংসাশী পশুরা সুদৃঢ় দন্তের অধিকারী থাকায় শিকারের যে কোন কঠিন আবরণকে ভেদ করে আহারের সুবিধা করে নেয়।

হস্তী, ওয়ালরাস, বন্যবরাহ প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর জন্তুর সুবৃহৎ দন্ত থাকে। এরূপ বৃহৎ দন্ত প্রধানত দন্ত

অধিকারীর পাদদেশস্থ শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, ভূতলশায়ী শত্রুর প্রাণহরণে বিশ্বস্ত বন্ধুর মতনই সাহায্য করে। শূকর জাতির স্ত্রী ও পুরুষের উপর এবং নিম্নভাগের চোয়ালে বৃহৎ দন্তের আবির্ভাব হয়। তবে প্রকৃতির নিয়মানুসারে স্ত্রী শূকরের দন্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। 'ওয়ালরাস' নামক একজাতীয় পশু তাদের বৃহৎ দন্তের সাহায্যে সময়ে সময়ে ছোট ছোট নৌকাকে উল্টাইয়া ফেলে। ১৯১৫ সালে লণ্ডনের পশুশালার বাৎসরিক মিলন উৎসবে স্যার এডমণ্ড লজার 'ওয়ালরাস'-এর একজোড়া দাঁত প্রদর্শন করেন। প্রত্যেকটি দাঁত লম্বায় ৩৬½ ইঞ্চি, উভয়ের ওজন ২১½ পাউণ্ড। কস্তুরী, চীনের জোলো হরিণ এবং আরও কয়েক জাতীয় হরিণ বৃহৎ দন্তের অধিকারী। কস্তুরী হরিণের দাঁতই সুপরিপুষ্ট। দাঁত ব্যতীত হরিণের বিচিত্র আকারের শিং হরিণের দৈহিক সৌন্দর্য যেমন বৃদ্ধি করে তেমনি শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে। শিংযুক্ত সকল পশুই নানা প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করে। শিংয়ের গঠনবৈচিত্র্য এবং বর্ণভেদও দেখা যায়। সজারু সূচাগ্র লোমরাশির আবরণে শত্রুর আক্রমণ যেভাবে প্রতিরোধ করে তা দর্শনীয়। কুমীর ও কাঙ্গারুর লাঙ্গুলের আক্রমণ মারাত্মক। খুরযুক্ত পশুরা খুর দ্বারা শত্রুদের আক্রমণ চালায়। ঘোড়া, গাধা, হরিণ প্রভৃতি পদাঘাতে শত্রুদের আক্রমণ থেকে বিরত করে। জিরাফ কেবল পদাঘাতে পারদর্শী নয়, নিজের মাথাকেও অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। লণ্ডনের পশুশালায় একটি জিরাফ দর্শকের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে শত্রুর প্রতি মস্তক চালনা করে। সৌভাগ্যক্রমে জিরাফের সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় এক কাষ্ঠফলককে প্রতিরুদ্ধ হওয়ায়। এই ঘটনার পর কাষ্ঠফলকে এক গভীর চিহ্নের আবির্ভাব হয়। নিরীহ পশুদের নিরর্থক বিরক্ত করার ফল কি তা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জিরাফ ঘরের সন্নিকটস্থ যায়গায় ঐ ক্ষতবিক্ষত কাষ্ঠফলকটি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পক্ষী-জাতীয় কেউ কেউ সুতীক্ষ্ন নখ, সুপটু পক্ষ দ্বারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় যত্নবান থাকে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ জীব-জন্তুর বাস তাতে প্রধান প্রধান পশুপক্ষীরা কিভাবে আত্ম-রক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করে তার বিবরণ দেওয়াও সম্ভব নয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তু ডাইনোসরের বংশধর সেরাটোসরাস নাসিকোর্নিস জীব

পৃথিবীর বৃহত্তম বাতিদান

নিউইয়র্ক শহরের আন্তর্জাতিক সংগীত ভবনে একটি বাতিদান তৈরী হয়েছে। প্রায় একশতজনেরও উপর কারিগর নয় মাস অবিরাম কাজ চালিয়ে বাতিদানটির নির্মাণ কার্য শেষ করেছে। বাতিদানটির ওজন ১৭৫ মণেরও উপর। আর তার ব্যাস ২০ ফুট। পৃথিবীর মধ্যে এটিকেই বৃহত্তম বাতিদান বলা চলে।

আজ-কাল

সত্যাগ্রহের গতি ও প্রকৃতি

গত বৃহস্পতিবার, (১৭ই অক্টোবর) গান্ধীজীর নির্বাচিত প্রথম সত্যাগ্রহী শ্রীবিনোবা ভাবে ওয়ার্ধা থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্তী পানোর গ্রামে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। সত্যাগ্রহ আরম্ভের পূর্বে গান্ধীজী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে তিনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের মহিমা ও প্রথম সত্যাগ্রহী শ্রীভাবের নির্বাচন-যোগ্যতার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কে জানে, তিনি (গান্ধীজী) হয়তো কেবল ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যেই নয়, সমস্ত যুধ্যমান জাতির মধ্যেই শান্তি স্থাপনের যন্ত্রস্বরূপ হবেন। তাঁর মতে এক ব্যক্তি আইন অমান্য করলো, কি বহু ব্যক্তি আইন অমান্য করলো, সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। (গণ-আন্দোলন ঠেকিয়ে রাখতে হলে এরূপ অযুক্তিকে যুক্তিরূপে দাঁড় করানো ছাড়া উপায় কি?) যা বিবেচ্য, তা হ'ল সত্যাগ্রহের বিশুদ্ধতা। তবে তিনি নিজে সত্যাগ্রহ করে বিশুদ্ধ সত্যাগ্রহের আদর্শ স্থাপন করছেন না কেন, এই প্রশ্ন নিজেই তুলে তিনি উত্তরে বলেছেন যে, তাঁকে কারারুদ্ধ করলে কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত বিব্রত হ'তে হবে। তাই তিনি নিজে তা থেকে বিরত আছেন। অবশ্য কি করে যে কি হবে, তা তিনি নিজেও জানেন না। কিন্তু তাতে তাঁর কোন দুশ্চিন্তা নাই, কারণ তিনি বলেন, "আমার সম্পূর্ণ নির্ভরতা ভগবানের উপর। এক পদক্ষেপই আমার পক্ষে যথেষ্ট। যখন সময় হবে, তখন তারপর কি করতে হবে, তা তিনিই আমাকে বুঝিয়ে দেবেন।" কিন্তু যা তাঁর নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় বলে তিনি স্বীকার করছেন, তার সম্বন্ধেই অবিশ্বাসীদের তিনি বলছেন,—"ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা কর। দেখ কি ঘটে।"

শ্রীবিনোবা ভাবের যোগ্যতার যে দীর্ঘ ফিরিস্তি গান্ধীজী দিয়েছেন, তার সংক্ষিপ্ত মর্ম হ'ল, তিনি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত; আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই তিনি তার সঙ্গে যুক্ত আছেন; তিনি আশ্রমে ধাঙরের কাজ থেকে আরম্ভ করে পাচকের কাজ পর্যন্ত করেছেন, তিনি চরকা ও তকলি কাটায় অসামান্য পারদর্শী; তিনি অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িক একতা, চরকার শক্তি ও স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী, তিনি কুষ্ঠ চিকিৎসা সম্বন্ধে ও চরকাকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদান সম্বন্ধে দু'খানা বই লিখেছেন; তিনি মনে প্রাণে যুদ্ধবিরোধী। কথিত গুণসম্পন্ন সত্যাগ্রহীকে দিয়ে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি মনে করেন, এই তাঁর শেষ আইন অমান্য আন্দোলন। কাজেই একে তিনি যথাসম্ভব দোষমুক্ত রাখতে চান।

এ হেন আধার অবলম্বন করেও গান্ধীজী নিতান্ত পার্থিব জগতে কোন্ ভোজবাজির চমক লাগাবেন তা না বুঝেও এ পর্যন্ত যা ঘটেছে, নীচে তার বিবরণ দেওয়া গেল। পানোরে প্রথম সভায় বিনোবার উল্লেখযোগ্য উক্তি হল, কংগ্রেস নৈতিক কারণে গ্রেট ব্রিটেনকে যুদ্ধে সাহায্য করতে পারে না। (আমরা অবশ্য ভেবেছিলাম, কারণটি রাজনীতিক, কারণ কংগ্রেস যে 'নীতিধর্মপ্রচারিণী সভা' একথাটা আমাদের জানা ছিল না)। তারপর সুরগাঁও, সেলু ও দেওলিতে পর পর তিন দিন বক্তৃতা দেওয়ার পর পঞ্চম দিনের প্রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাঁর তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

শ্রীভাবের গ্রেপ্তারের পর গান্ধীজী যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে বলেছেন,—"এর পর কাকে পাঠান হবে, এখন তা আমার বিবেচ্য নয়। আমি এখন দেখতে চাই, বিনোবার কারাদণ্ডে লক্ষ লক্ষ লোকের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়—কত লোকের তিনি প্রতিনিধি। যাঁরা হিংসা, যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও নাৎসীবাদে বিশ্বাসী, বিনোবা তাঁদের প্রতিনিধি নন। অস্পৃশ্যতার প্রতি যাঁদের অনুরাগ আছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য যাঁরা অসম্ভব বলে মনে করেন, যাঁরা চরকা কিম্বা অন্যান্য পল্লীশিল্প প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী নন বলে ছয় লক্ষ গ্রামের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী নন, তাঁদেরও বিনোবাকে কোনো প্রয়োজন নাই। তাঁদের বিচারে বিনোবা নিশ্চয়ই ভারতের রাজনীতিক, আর্থিক ও সামাজিক অগ্রগতির পরিপন্থী।" গান্ধীজী একটা কথার উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। যাঁরা গান্ধীজীর সত্যাগ্রহী তুরীয়াবাদে বিশ্বাসী নন, বিনোবা তাঁদেরও প্রতিনিধি নন এবং তাঁরাই দেশের অধিকাংশ।

বোম্বাইয়ে ঝড়

গত ১৬ই অক্টোবর, বুধবার বোম্বাইয়ের উপর দিয়ে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত যতটা জানা গেছে, তাতে প্রায় ৮০০ লোকের প্রাণহানি হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে আন্দাজ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দুর্গতদের সম্বন্ধে যথাযথ তদন্তের ও সাহায্যের ব্যবস্থা করছেন। গভর্ণমেণ্টও সাহায্যের জন্য তহবিল খুলেছেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর প্রতি নিখিল ভারত কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সাব কমিটি যে শাস্তিবিধান করেছেন, গত বৃহস্পতিবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সভার এক জরুরী অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। সভায় পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির কার্যের তীব্র নিন্দা ক'রে ও শ্রীযুত বসুর নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাছাড়া বহু জনসভায়ও পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির আচরণে বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে এবং শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয়েছে। বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও সাব-কমিটির ব্যবহারের নিন্দা করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা এখন অনেক ভাল। তিনি বিপন্মুক্ত বলেই মনে হয়।

এম্পায়ার ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্স

অস্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, মালয় প্রমুখ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাচ্য দেশসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে নয়াদিল্লীতে এক সম্মেলনের অধিবেশন হবে। এই সম্মেলনের সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ আর্থিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত বলে মনে হয়। ভারত গবর্মেণ্ট তাঁর প্রতিনিধিদের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করবার জন্য সতেরজন ভারতবাসীকে আমন্ত্রণ করেছেন। তাঁদের অধিকাংশই নাকি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। প্রকাশ, ভারত গবর্মেণ্ট প্রতিনিধিদের জন্য কুড়িটি বিভিন্ন স্মারকলিপি তৈরী করেছেন। তাতে ভারতে যে সামরিক মাল তৈরী হয়, সে সম্বন্ধে অধিকতর উন্নতির যে সম্ভাবনা আছে এবং ভারতে যে যে কাঁচা মাল পাওয়া যায়, তার বিস্তৃত বিবরণ আছে। ২৩শে অক্টোবর প্রতিনিধি দলের নেতাদের ও সেক্রেটারীদের এক সম্মেলন হবে। তাতে ঐ সকল স্মারকলিপি সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। ২৫শে অক্টোবর নয়াদিল্লীতে বড়লাট কনফারেন্সের উদ্বোধন করবেন। বড়লাটের বক্তৃতার পর কনফারেন্সের কার্যাদি গোপন বৈঠকে আলোচিত হবে।

ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার

এ সপ্তাহেও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাঞ্জাব থেকে সম্প্রতি আটজন রাজবন্দীকে দেউলী বন্দীশালাতে পাঠান হয়েছে। এঁদের নিয়ে পাঞ্জাব থেকে দেউলীতে মোট ৫৪ জন রাজবন্দীকে পাঠান হল।

সিন্ধুতে হিন্দু খুন

সিন্ধুতে হিন্দু খুনের নিবৃত্তি সাধন এখনও সম্ভব হয় নি। সিন্ধুর অমরকোট তালুকের সুফি গ্রামে বাজারের মধ্যে এক ব্যক্তিকে কুঠার দিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে সংবাদ এসেছে। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার এই শোচনীয় অক্ষমতার জন্য দায়ী কে?

আন্তর্জাতিক

ইংলণ্ড ও জার্মানি

সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রায় একরূপে ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে ইংলণ্ড ও জার্মানির যুদ্ধের ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। প্রায় প্রত্যহই পারস্পরিক বিমান হানা, কোন দিন একটু বেশি কোন দিন কম। জার্মান বিমান থেকে গত মঙ্গলবার রাত্রিতে (১৫ই অক্টোবর) লণ্ডনের উপর প্রায় ২০০ টন (প্রায় ৬ হাজার মণ) বোমা বর্ষিত হয় এবং ২৫০টি বিমান এই আক্রমণ চালায় বলে রয়টার সংবাদ দিয়েছে। তাতে বসতবাড়ি, শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের বাড়িঘর ও জনপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়েছে বলে প্রকাশ। তা ছাড়া অন্যান্য দিনও জার্মান বিমান ইংলণ্ডের নানা স্থানে হানা দিয়েছে এবং কোন কোন দিন বেশ তীব্রভাবেই। অন্যান্য দিনের আক্রমণে হোটেল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ইমারত, দোকানপাট, ইয়ংমেন ক্রিশ্চান এসোসিয়েশনের বাড়ি প্রভৃতির ক্ষতি হয়েছে, কিছু লোকও মারা গেছে। আক্রমণ করতে গিয়ে কয়েকখানি জার্মান বিমানও ধ্বংস হয়েছে। অপর দিকে, ব্রিটিশ বিমানবহর বার্লিনে এবং স্টেটিন, বোলন, নিসার্গ প্রভৃতি স্থানের তৈলের কারখানা ও কিয়েল ডকের উপর আক্রমণ চালায়। ইংলিশ চ্যানেলের জার্মান অধিকৃত বন্দরগুলির উপরও ব্রিটিশ বিমানগুলি আক্রমণ চালিয়েছিল বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। জার্মানির জেনারেল পোস্ট অফিস, গ্যাস কারখানা প্রভৃতির গুরুতর ক্ষতি হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। তা ছাড়া গত রবিবার (২০শে অক্টোবর) ডোভার অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ কামান ও ফরাসী উপকূল থেকে জার্মান কামানগুলির মধ্যে প্রায় দু'ঘণ্টা ব্যাপী লড়াই চলে. আর ১৮ই অক্টোবর (শুক্রবার) ইংলিশ চ্যানেলে জার্মান ও ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর মধ্যে নৌযুদ্ধ হয়। সরকারীভাবে ঘোষিত হয়েছে যে সেপ্টেম্বর মাসে বিমান আক্রমণে গ্রেট ব্রিটেনে ৩০৭৭ জন বে-সামরিক পুরুষ ও ৩১৮৩ জন স্ত্রীলোক নিহত এবং ৫৪০৯ জন পুরুষ ও ৪৫৩১ জন স্ত্রীলোক আহত হয়েছে। তা ছাড়া ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক বালকবালিকা নিহত হয়েছে ৬৯৪ জন এবং আহত হয়েছে ৬৭৫ জন। ব্রিটেনের এখন যুদ্ধের জন্য প্রত্যহ ৯০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হচ্ছে বলে অর্থসচিব স্যার কিংসলী উড জানিয়েছেন।

সুদূর প্রাচ্যের ঘনঘটা

জাপানের সঙ্গে চীন-ব্রহ্ম পথ বন্ধ রাখবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে চুক্তি করেছিলেন বৃহস্পতিবার (১৭ই অক্টোবর) মধ্যরাত্রিতে সেই চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। তারপর থেকেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট চীন-ব্রহ্ম পথ খুলে দেন। বলা বাহুল্য, এই পথ খুলে দেওয়াতে চীনের পক্ষে সমরসম্ভার আমদানীর সুবিধা হবে। জাপান চীন-ব্রহ্ম পথের উপর বোমাবর্ষণ করে পথটাকে অকেজো করে ফেলবার চেষ্টা করছে। হংকং ও চীনের মধ্যে মাল রপ্তানি সম্পর্কে যে বাধা ছিল হংকং গবর্ণমেণ্ট গত বৃহস্পতি-বার মধ্যরাত্রি থেকে তা' তুলে দিয়েছেন। তাতে গ্যাসোলিন, তৈল, রেলওয়ে সরঞ্জাম প্রভৃতির রপ্তানিতে কোন বাধা থাকবে না। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলী রপ্তানি সম্পর্কে বাধা এখনও বহালই রয়ে গেল।

ত্রিশক্তি চুক্তির পর প্রশান্ত মহাসাগরে ও সুদূর প্রাচ্যে জাপানের শক্তি খর্ব করবার জন্য আমেরিকা মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাতে ব্রিটিশও বলভরসা পেয়েছে অনেকখানি। ব্রিটিশ যে নিশ্চিন্ত মনে চীন-ব্রহ্ম পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে, তা' অনেকটা আমেরিকার ঘনিষ্ঠতার উপর নির্ভর করেও বটে। অবশ্য আমেরিকা যে নিঃস্বার্থ পরোপকার-বুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে এ করছে না তা বলাই বাহুল্য। তার আত্মরক্ষা ও মর্যাদা বজায় রাখবার জন্যই এ তাকে করতে হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে ২ কোটি ৫ লক্ষ ডলার ঋণ দেয়। শীঘ্রই আরও ৫ কোটি ডলার ঋণ চীনকে দেওয়া হবে বলে অনেকে মনে করেন। তা ছাড়া কতকগুলি জঙ্গী বিমান দিয়েও চীনকে সাহায্য করার সম্ভাবনা আছে। এদিকে ডাচ ইণ্ডিজের "আমেরিকান নেদার-ল্যাণ্ডস্ ব্রিটিশ অয়েল কোম্পানী"কে জাপান তার যত তৈল প্রয়োজন তার শতকরা ৪০ ভাগ সরবরাহ করতে বাধ্য করেছে বলে যে সংবাদ 'নিউইয়র্ক টাইমস' দিয়েছে, তাতে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই পরিমাণ তৈল পেলে জাপান অনেকদিন পর্যন্ত তৈল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে। সুদূর প্রাচ্য থেকে মার্কিন আশ্রয়প্রার্থীদের স্বদেশে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের এবং সৈন্যদল বৃদ্ধির তোড়জোড়ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবলভাবে চলেছে।

বল্কানের অবস্থা

বল্কানের অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এ সপ্তাহে বিশেষ কিছু হয়নি। জার্মানির মতলব কি সে সম্বন্ধে এখনও নানারকম জল্পনা-কল্পনা চলছে। বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়ে গ্রীস ও তুরস্ককে পর্যুদস্ত করে প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই জার্মানির লক্ষ্য বলে অনেকে মনে করছেন। হিটলারের পক্ষে এ কাজ করা যদি সম্ভবপর হয় তবে তার ফল কি দাঁড়াবে সে সম্বন্ধে লর্ড লয়েডের কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, হিটলারের পূর্বাভিমুখী অভিযানের হুমকীর পিছনে যে বিপদাশঙ্কা আছে, সে সম্বন্ধে কারো মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকা উচিত নয়। তিনি আরও বলেন যে, জার্মান বিমানবাহিনীর সহায়তায় ইতালীয়গণের অভিযান যদি সফল হয়, তা হলে ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেনের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের বল্কানী বন্ধুদেরও ভাগ্য বিপর্যয় হবে।

আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া

শীতের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায়ও যে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি হবে এ আশঙ্কা অনেকেই করছেন। ইতালি এদিকে আগে থেকেই অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, জার্মানও এদিকে ক্রমেই বেশি করে নজর দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এণ্টনি ইডেন সম্প্রতি মিশরে গিয়ে রাজা ফারুকের সঙ্গে দেখা করেছেন। গত বৃহস্পতিবার তিনি জেরুজেলামে গিয়ে পৌঁছেছেন। আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে ভাল-ভাবে প্রস্তুত হওয়ার ব্যবস্থা করাই তাঁর এ পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য। বলে মনে হয়।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও পূজার কয়েকটি দিন কলিকাতা শহর যে আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে নগরীর ছায়াচিত্র গৃহ ও রঙ্গমঞ্চে রসপিপাসু দর্শকমণ্ডলীর বিপুল সমাগমে। শহরের নির্দোষ আনন্দলাভের একমাত্র উপকরণ ছায়াচিত্র গৃহ তাই বাঙালী বৎসরের এই একটি সময়ে দলে দলে সেখানে ভিড় জমায় এবং বেপরোয়াভাবে পয়সা খরচ করে। এ বৎসরের পূজায় যে কয়খানি বাঙলা ছায়াচিত্র দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহার মধ্যে 'ব্যবধান,' 'শাপমুক্তি', 'অমরগীতি' ও 'ডাক্তার' অন্যতম। কিন্তু একমাত্র ডাক্তার ব্যতীত অন্য কোন চিত্রে কি আদর্শে, কি পরিচালনায় কোনো বিশিষ্ট রূপ অথবা উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ আনন্দ-পিপাসু জনসাধারণের ছায়াচিত্র দর্শনের আগ্রহে এই ছবিগুলিও বেশ দু' পয়সা করিয়া লইয়াছে। ব্যবধান ও শাপমুক্তির কথাই বলিতেছি—অমরগীতি নহে, কারণ অমরগীতি এখনও আমাদের দেখিবার সুযোগ হয় নাই। ব্যবধান ও শাপমুক্তি ছবি দুইটিতে মনে হয় লক্ষ্য-ভ্রষ্ট পরিচালক অসহায়ভাবে অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া মরিতেছেন। ডাক্তার চিত্রের বলিষ্ঠ রূপ, মহান্ আদর্শ এবং বাঙলার সত্যিকারের জীবনের একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখিয়া মনে হয় যে, পরিচালক বাঙলার পথভ্রষ্ট সিনেমার পথ যেন আবার খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

'ব্যবধান' চিত্রটিকে নষ্ট করিয়াছে অস্পষ্ট শব্দগ্রহণ আর কুনির্বাচিত অভিনেতার দল। সংলাপে এবং কাহিনীর কাঠামোর সৌন্দর্যে চিত্রটির যে প্রতিশ্রুতি ছিল, কু-অভিনয়ে এবং ঘটনার কু-পরিবেশনে তা প্রতি পদে ব্যাহত হইয়াছে।

শ্রীভারতলক্ষ্মীর 'ঠিকাদার' চিত্রে শ্রীমতী রেণুকা রায়। চিত্রখানি শীঘ্রই চিত্রায় মুক্তিলাভ করিবে

'শাপমুক্তি' ছবিটিতে গল্প-জ্ঞান সম্বন্ধে পরিচালকের ত্রুটি ধরা পড়ে। একটি হিন্দী ছবির গল্পকে বাঙলার মাটিতে আনিয়া বসাইবার ভার পরি-চালকের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু গল্পটি হাতে লইয়া আগেকার দুইটি ছবির কথাই হয়ত তাঁহার পর পর মনে হইতেছিল—'মুক্তি'র ভাঁড়ামি আর 'দেবদাসে'র মদ খাওয়াকে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন মাত্র। দেবদাসে ছিল একটি চিতা, এখানে তিনটি চিতা জ্বালাইয়াছেন। ছবিটি দেখিয়া আমাদের বারবার মনে হইতেছিল, 'দেবদাসে'র প্রমথেশ বড়ুয়া আর বাঁচিয়া নাই—'শাপমুক্তি'র প্রমথেশ তো তাঁহার প্রেতাত্মা।

একমাত্র 'ডাক্তার' ছবিটি দেখিয়া তৃপ্তি পাওয়া যায়, কারণ সিনেমার গতি ও ছন্দের সহিত কাহিনীর রূপ ও রস একত্রে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং নায়কের কু-নির্দেশিত অভিনয় সত্ত্বেও গল্পের সুষ্ঠু প্রাণবন্ততা ও পরিচালকের সূক্ষ্ম সহানুভূতি চিত্রটিকে সাফল্যের পথে লইয়া গিয়াছে।

এই তিনটি ছবির প্রধান ত্রুটিই যা আমাদের চোখে পড়ে তা হইতেছে অভিনয়ের দিকের ত্রুটি। সেট, বহির্দৃশ্যাবলী, শব্দগ্রহণ ও ক্যামেরার কাজে উন্নতির নিদর্শন পাওয়া যায়—কিন্তু অভিনয়ের দিকটি অত্যন্ত উপেক্ষিত বলিয়াই মনে

হইল। সুন্দর নায়ক নাই, সুন্দরী নায়িকারও অভাব। যদিও বা খুঁজিয়া সংগ্রহ করা হইল তাহাদের অভিনয়ে পৌরুষের আভাষ নাই, আড়ষ্টতা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। তৈরী অভিনেতা যে দু-একজন রহিয়াছেন তাহাদের বহু বৎসর ধরিয়া বহুবার দেখিয়া দেখিয়া প্রায় অরুচি ধরিয়াছে। নূতন অভিনেতাদের একটি গলদ লক্ষ্য করিয়াছি যে, গল্পের ঘটনার প্রতিক্রিয়া তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের অভিনয় দর্শকের মনকে নাড়া দিতে পারে না। এই কারণে নূতন অভিনেতা ও অভিনেতৃ গড়িয়া তোলার প্রয়োজনকে আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং তাহা সিনেমা প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যক্তিগত চেষ্টায় সম্ভব নহে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মিলিত চেষ্টায় কোন ট্রেনিং কলেজ গঠনের দ্বারাই নূতন অভিনেতা সৃষ্টির সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

নিউ থিয়েটার্সের '**নর্ত্তকী**' চিত্রে
শ্রীমতী লীলা দেশাই
পরিচালনা করিতেছেন
দেবকী বসু

বোম্বাই আজ বাঙলাকে গ্রাস করিতে উদ্যত। বাঙলার বুকের উপর বসিয়া বোম্বাইয়ের হিন্দী ছবিগুলি মাসের পর মাস যেভাবে পয়সা লুটিতেছে, তাহাতে চিত্রজগতেও বাঙলার আসন টলটলায়মান তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙালীর উপার্জ্জনের যে বড় পথটি ছায়াচিত্র শিল্পের মধ্য দিয়ে প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছিল তাহা আজ আগাছায় পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। আমাদের এই শোচনীয় অবস্থার সম্যক উপলব্ধি যে সিনেমা ব্যবসায়ীরা করিতেছেন না তাহা নহে, উপলব্ধি করিয়াও তাঁহারা নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন। এই জড়তা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য কালক্ষেপ না করিয়া সমবেত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ইহার প্রতিকার করা, নতুবা বাঙালীর উপার্জ্জনের একটি দিক নানা বিপদের মাঝেও যে দীপ তুলিয়া ধরিয়াছে তাহাও নির্ব্বাপিত হইবে।

গল্প ও টেকনিক
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সিনেমার টেক্‌নিক্‌ বলতে আমার মতে মাত্র দুটি টেকনিক। একটি যন্ত্র ব্যবহারের টেকনিক, আর একটি গল্প ব্যবহারের টেক্‌নিক্‌। আজকাল প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, যন্ত্র ব্যবহারের টেক্‌নিক্‌টা অনেকেই আয়ত্ব করে' ফেলেছেন। আয়ত্ব করতে পারেন নি শুধু গল্প ব্যবহারের টেক্‌নিক্‌টি।

অথচ গল্প ছাড়া সিনেমা আর কিছুই যখন বলে না, তখন গল্পটিই আসল। এই গল্পটিকে প্রকাশ করবার জন্যই তার যন্ত্রপাতি যা-কিছু সব।

সিনেমার নিজস্ব একটি ধর্ম আছে। সে ধর্মটি তার গতি এবং ছন্দ।

আবার গল্পেরও একটি ধর্ম আছে। সে ধর্ম তার রূপ ও রস।

এই দুয়েরই ধর্ম বজায় রেখে দুইকে এক করাই সিনেমাশিল্পীর সব-চেয়ে বড় কাজ।

অথচ প্রায়ই দেখি, এই দুইকে এক করার দুরূহ কর্ম করতে গিয়ে সিনেমার চিত্র-নাট্যকারেরা সর্বপ্রথমেই গল্পটিরই ধর্ম নষ্ট করে' বসেন। এ যে তাঁরা ইচ্ছে করে' করেন তা' নয়, অজান্তে না জেনেই করে' ফেলেন।

আর সেই জন্যই আমাদের দেশে দেখা যায়, যতগুলি গল্প সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে, কোনটিই তার স্বধর্ম রক্ষা করে' চলতে পারেনি। এবং তার ফলে কোনও গল্পই রূপে রসে সঞ্জীবিত হয়ে দর্শক সাধারণের মনে তার চিরস্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি।

আমাদের সিনেমার চিত্র-পরি-চালকদের পক্ষে এ বড় কম লজ্জার কথা নয়। গল্প তাঁরা বাইরে থেকে নির্বাচনই করুন, কিম্বা নিজেরাই রচনা করুন, কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু এইটুকু তাঁরা যেন সর্বদাই মনে রাখেন—গল্প রচনা একটা যা' তা' খামখেয়ালী ব্যাপার নয়, একেও হৃদয় দিয়ে সৃষ্টি করতে হয়—এও বস্তু সৃষ্টির মতই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন। জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর মধ্যে প্রকাশের যে একটা দুরন্ত আবেগ আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করছি, সেই একই আবেগ গল্প-লেখকের মনোবৃত্তির মধ্যে অলক্ষ্যে কাজ করতে থাকে, তাই সেখানে এতটুকু ভুলচুক হলেই আগাগোড়া সব যায় গোলমাল হ'য়ে, কোনও কিছুর মধ্যেই কার্যকারণ সম্বন্ধ আর খুঁজে পাওয়া যায় না, রূপ ও রস বিকাশের প্রণালী যায় রুদ্ধ হয়ে।

তাই আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করছি—শুধু একই কারণে সিনেমার রসসৃষ্টির আবেদন দর্শকসাধারণের কাছে ধীরে ধীরে ক'মে আসছে। বাঙলাদেশের যে-সব কৃতী সাহিত্য-সেবী তাঁদের আজীবনের সাধনা এবং বিধিদত্ত ক্ষমতা দিয়ে কথা-সাহিত্যকে যে মর্যাদা দান করেছেন, আজ সিনেমা-রচিত গল্পগুলি তাঁদের সে সাধনালব্ধ আদর্শকে যে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুন্ন করছে, সেকথা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।

নিউ থিয়েটার্সের 'পরিচয়' চিত্রে সাইগল ও কাননবালা। চিত্রখানি নীতিন বসু পরিচালনা করিতেছেন

গতি ও ছন্দধর্মী সিনেমার রূপ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং শিক্ষা যাঁদের সম্পূর্ণ হয়নি, তাঁদের কথা আমি বলতে চাই না। দেশের কল্যাণের জন্য অন্তত তাঁদের এই আপাতস্বার্থ পরিত্যাগ করে' সিনেমার রাজ্য থেকে চিরদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করাই উচিত।

আমার অভিযোগ এবং অভিমান শুধু তাঁদের ওপর—যাঁরা সিনেমার যন্ত্র ব্যবহারের টেকনিককে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছেন, গতি ও ছন্দমুখী এই সিনেমা যাঁদের নিত্য ধ্যান ও ধারণার বস্তু, তাঁরা কেন তাঁদের সাধনালব্ধ এই শক্তির অপব্যবহার করে' নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের অকল্যাণ করছেন!

—রূপবাণী

বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাথলেটিকস পরীক্ষা

গত কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-মঙ্গল সমিতির পরিচালকগণ কলেজের ছাত্রগণের জন্য অ্যাথলেটিকসের কতকগুলি বিষয়ের এক পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। এই পরীক্ষা সাধারণত অ্যাথলেটিকসের মরসুমের সময় অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদপত্র মারফৎ এই পরীক্ষা সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যে সকল কলেজের ছাত্রগণ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাঁহাদের অ্যাথলেটিকসের কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হয়। এই পরীক্ষার আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে যে, অ্যাথলেটিকসের যে সকল বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তাহার সময় বা দূরত্ব বা উচ্চতা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ঐ নির্দিষ্ট সময়, দূরত্ব বা উচ্চতার যে সকল ছাত্র সাফল্য অর্জন করেন তাহাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। প্রথম বৎসরে এই পরীক্ষায় বিভিন্ন কলেজের বহু ছাত্র যোগদান করিয়াছিল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সকল কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু গত দুই তিন বৎসর হইতে এই পরীক্ষায় খুব কম সংখ্যকই ছাত্র যোগদান করিতেছে এবং বিভিন্ন কলেজের ছাত্রগণের মধ্যেও উৎসাহের বিশেষ অভাব দেখা যাইতেছে। ছাত্রমঙ্গল সমিতির পরিচালকগণ ইহাতে বড়ই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে অ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জনের জন্য উৎসাহিত হয় এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অথচ ছাত্রগণ ইহা গ্রহণ করিল না, ইহা চিন্তা করিয়া পরিচালকগণ ব্যথিত হইয়াছেন। তাঁহারা শোনা যাইতেছে এই বৎসর হইতে আর এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন না।

প্রথম বৎসরেই বুঝিয়াছিলাম

ছাত্রমঙ্গল সমিতির পরিচালিত 'অ্যাথলেটিকস পরীক্ষা' ব্যবস্থার পরিণতি যে উক্তরূপ হইতে তাহা আমরা প্রথম বৎসরেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেইজন্য আমরা পরিচালকগণকে সেই সময়েই সাবধান করিয়াছিলাম এই বলিয়া যে, তাঁহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে যদি তাঁহারা পরীক্ষার ব্যবস্থার সহিত অ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা না করেন। কেবল শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই হইবে না বিভিন্ন কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে এই শিক্ষার ও পরীক্ষার বিষয় ভাল করিয়া জানিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু ছাত্রমঙ্গল সমিতির পরিচালকগণ নূতন ব্যবস্থা করিয়া আত্মসুখে এতই বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আমাদের সাবধান বাণী তাঁহাদের অন্তরে কোনওরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারিল না। পরবর্তী বৎসরে যখন প্রথম বৎসর অপেক্ষা অল্প সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় যোগদান করিল তখন পুনরায় আমরা পরিচালকগণকে সতর্ক করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরিচালকগণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। ইহার ফলে বর্তমানে তাঁহাদের সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাঁহারা এতই হতাশ হইয়াছেন যে, পরীক্ষার ব্যবস্থা পর্যন্ত তুলিয়া দিবার মনস্থ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে

নৈরাশ্যজনক অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে পরিচালকগণ এখনও যদি অ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন বিষয়ের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পরিচালকগণের বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। ময়দানে নিজস্ব খেলার মাঠ আছে। অ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন বিষয়ের জন্য যে সামান্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহাও তাঁহাদের মজুত আছে। এমন কি শিক্ষা দিবার মত অভিজ্ঞ ব্যায়াম শিক্ষকও তাঁহাদের আছে। সুতরাং এই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে তাঁহাদের কেবল সংবাদপত্র মারফৎ উৎসাহপূর্ণ ভাষায় প্রচার করিতে হইবে যে, শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছেন। বাঙালী অ্যাথলেটিকগণের ক্রমাবনতির পথ রোধ করিবার জন্যই তাঁহারা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যে কোনও কলেজের ছাত্র এই শিক্ষা ব্যবস্থার সাহায্য পাইবেন। কোনও কলেজের যদি নিজস্ব ব্যায়াম শিক্ষক থাকে, তবে সেই ব্যায়াম শিক্ষককে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষা দিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন, যাহাতে সেই কলেজের ছাত্রগণ শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত না হয়। এইরূপভাবে প্রচার করিলে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ছাত্রমঙ্গল সমিতির প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই দেখা যাইবে যে, দলে দলে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রগণ অ্যাথলেটিকসের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতেছেন।

এই অভিনব ব্যবস্থার সূত্র কোথায়?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল সমিতির পরিচালকগণ যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার প্রথম প্রবর্তনকারী সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল আছে। এই বিষয়ের প্রবর্তনকারীদের ক্রমিক ইতিহাস আলোচনা করিলে কৌতূহলাক্রান্ত সকলেই বিশেষ আনন্দ পাইবেন; কারণ তাঁহারা এই আলোচনার মধ্য দিয়া জানিতে পারিবেন যে, কেন এইরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থার কথা ব্যায়াম পরিচালকগণের অন্তরে জাগে; তাঁহাদের উদ্দেশ্য বা কি, ইহার প্রয়োজনীয়তাই বা কতখানি। আগামী সপ্তাহ হইতে ধারাবাহিকরূপে আমরা এই বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিব। এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে পাঠকবর্গকে আমরা এইটুকু বলিতে চাই যে, অ্যাথলেটিক টেস্ট বা পরীক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্তন কয়েক বৎসর হইল হইয়াছে। ইহার প্রথম প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা হয় ১৯১৩ সালে এবং তাহার ব্যবস্থা করেন আমেরিকার ন্যাশন্যাল রিক্রিয়েশন এসোসিয়েশন। বর্তমানে প্লেগ্রাউণ্ড ও রিক্রিয়েশন এসোসিয়েশন নামে পরিচিত। ইহাদের পরীক্ষার নাম হয় অ্যাথলেটিক ব্যাজ টেস্ট ফর বয়েজ। ১৯১৬ সালে অ্যাথলেটিক ব্যাজ টেস্ট ফর গার্লস প্রবর্তন করা হয়।

সমর বার্ত্তা

১৬ অক্টোবর।—

বেসরকারী ভাবে বলা হইয়াছে যে, গত রাত্রে লণ্ডনে প্রায় ২০০ টন বোমা পড়িয়াছে। গত রাত্রির জার্মান বিমান আক্রমণ খুব তীব্র হইয়াছিল। প্রধানত বসতবাটী ও শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের বাড়িঘরের ক্ষতি হইয়াছে। তবে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকের মত ক্ষতি অত বেশী হয় নাই। খবরের কাগজ, চিঠি, দুধ, মাখন ইত্যাদি বিলি ও ট্রেন চলাচল অব্যাহত আছে। গত রাত্রে ব্রিটিশ বিমান বহরও কিল ও হামবুর্গের নৌঘাঁটির উপর সফল আক্রমণ চালাইয়াছিল। জার্মানি ও তদধিকৃত অঞ্চলেও ব্যাপক আক্রমণ চালানো হইয়াছে।

লণ্ডনের নৌবিভাগীয় ইস্তাহারে প্রকাশ, সিসিলির প্রায় আশি মাইল দক্ষিণ পূর্বে তিনটি ইতালীয় ডেস্ট্রয়ারের সন্ধান পাইয়া ব্রিটিশ ক্রুজার "এজাক্স" আক্রমণ চালাইয়া দুইটিকে ডুবাইয়া দিয়াছে।

প্যারিস বেতার—ফ্রান্সের জার্মান কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন, যে ইংরেজকে আশ্রয় দান করিবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। ইংরেজ বলিতে ডোমিনিয়ন ও কলোনির অধিবাসিগণকেও বুঝাইবে।

১৭ অক্টোবর।—

গত রাত্রি শান্তিতে অতিবাহিত হইবার পর আজ সকালে পুনরায় জার্মান বিমানবাহিনী লণ্ডন অঞ্চল চড়াও করে। রাজধানীর নিকটবর্তী হইলে ব্রিটিশ জঙ্গী বিমানসমূহ উহার গতিরোধ করে। দক্ষিণপূর্ব উপকূলবর্তী একটি শহরে বোমা বর্ষণের ফলে একটি ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতি হয়। নৌবিভাগের ইস্তাহারে প্রকাশ, দুইটি রক্ষী জাহাজসহ তিনটি জার্মান যোগানদার জাহাজকে ব্রিটিশ নৌবহর কর্তৃক ধ্বংস করা হইয়াছে। জার্মানির নানাস্থানে, বিশেষত কিলে প্রবল বিমান আক্রমণ চালানো হইয়াছিল।

কাটালোনিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট লুই কম্পানিসকে স্পেনের এক কারাগারে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। স্পেন যুদ্ধের সময় বার্সিলোনা রক্ষার জন্য ইনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কোর অভ্যুত্থানে ইনি ফ্রান্সে পলাতক হন। ফ্রান্সে জার্মান অধিকার বিস্তৃত হইলে ইনি বন্দী হইয়া স্পেনে নীত হইয়াছিলেন।

ব্রিটিশ সমর সচিব শ্রীযুক্ত অ্যাণ্টনী ইডেন মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সেনাপতি জেনারেল সার্ আর্চিবল্ডের সহিত আলোচনার জন্য মিশরে গিয়াছেন।

১৮ অক্টোবর।—

আজ ব্রিটেনে জার্মান বিমান আক্রমণ কম। কাল ইংলিশ চ্যানেলে জার্মান ও ব্রিটিশ নৌবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। জার্মান নৌবহর ছত্রভঙ্গ হইয়া ব্রেস্টের দিকে পলায়ন করে। জার্মানিতে ইংরেজদের হাওয়াই হামলা অপেক্ষাকৃত বেশী। প্রকাশ, বার্লিনের জেনারেল পোস্ট অফিস, রণসামগ্রী তৈরির কারখানা ও প্রধান গ্যাস কারখানা গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত। সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, সেপটেম্বর মাসে জার্মান বিমান আক্রমণের ফলে ব্রিটেনে ৬৯৫৪জন অসামরিক ব্যক্তি নিহত ও ১০৬১৫জন গুরুতর আহত হইয়াছে।

চীনে যুদ্ধসামগ্রী আমদানির জন্য চীন-ব্রহ্ম পথ পুনরায় খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ সকালে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া প্রায় পাঁচ শত লরি চীনে রওনা হইবে। এই পথ উন্মুক্ত হওয়ায় চীনা ও মার্কিন সংবাদপত্রসমূহে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা লণ্ডন হইতে তারে জানাইয়াছেন, উত্তর ইতালি হইতে প্রাপ্ত পাকা খবরে প্রকাশ—ট্রেন বোঝাই জার্মান সৈন্য ইতালি হইয়া লিবিয়া অভিমুখে যাইতেছে। ব্রিটিশ শক্তিকে ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্রে ঘায়েল করাই নাকি ইতালি ও জার্মানির উদ্দেশ্য।

১৯ অক্টোবর।—

আজ ইংলণ্ডে জার্মান বিমান আক্রমণ মন্দ। দিনের বেলায় কয়েকটি জার্মান বিমান বাজপাখির মত মেঘের আড়াল হইতে দ্রুত আসিয়া এখানে-ওখানে কয়েকটা বোমা ফেলিয়া গিয়াছে। ইংরাজেরাও বহু শত্রুস্থানে সফল হাওয়াই হামলা চালাইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

চুংকিং-এর সংবাদ—ব্রহ্ম-চীন পথ খুলিয়া দিবার পর ১২ ঘণ্টা না কাটিতেই জাপানীরা ছত্রিশটা বিমান হইতে রাস্তার বিভিন্ন স্থানে বোমা বর্ষণ করিয়াছে। প্রকাশ, চীনারা এজন্য স্থানে স্থানে রাস্তা মেরামতের মালমসলা ও বিমানধ্বংসী কামান মজুত রাখিতেছে।

আফ্রিকার যুদ্ধে ইংরেজদেরই সংবাদ অনুকূল। কাইরোর সংবাদ, এক আশ্রয়প্রার্থী বোঝাই ট্রেনে ইতালীয়রা বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

নিউইয়র্কের সংবাদ—জার্মানদের গুপ্ত 'স্বাধীনতা' বেতার কেন্দ্র পুনরায় প্রচারকার্য শুরু করিয়াছে।

২০ অক্টোবর।—

দুপুরের ঠিক পূর্বে ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী বিভিন্ন বন্দর হইতে ব্রিটিশদের দূরপাল্লার কামান গর্জন করিতে থাকে। ফরাসী উপকূলে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পতিত হইতেছে। ফ্রান্স হইতে পালটা জবাবও আসিতেছে। জার্মান ও ইংলাণ্ড উভয় রাজ্যে উভয়ের হাওয়াই হামলা ঘটিয়াছে।

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত চুংকিং-এর একটি সংবাদে প্রকাশ, ফরাসী ইন্দোচীন সীমান্তে চীন জাপানে প্রবল যুদ্ধ বাধিয়াছে। চীনাদের অবস্থা অনুকূল।

বলকানে নাৎসী সাবমেরিন সমাবেশের সংবাদ বুখারেস্টে অস্বীকৃত হইয়াছে।

এক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ—সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট দুইখানা নোট পাঠাইয়া জার্মানিকে বলকানে তাহার মতলবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন।

২১ অক্টোবর।—

ব্রিটেনে জার্মান বিমান আক্রমণ অপেক্ষাকৃত বেশী। লণ্ডনের মার্কিন দূতাবাস ক্ষতিগ্রস্ত। ওয়াই এম সি-এর বাড়ি বিধ্বস্ত, দশজন লোক নিহত। ইংরেজরাও জার্মানি ও বার্লিনে প্রবল আক্রমণ করিয়াছে। নিউইয়র্কের সংবাদপত্রগুলি বলিতেছে, গত রাত্রের আক্রমণই প্রবলতম আক্রমণ।

চীন-ব্রহ্ম পথে জাপানীরা বিমান আক্রমণ চালাইয়াছে। কতকগুলি সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত চার্চিল এক বেতার বক্তৃতায় ফরাসীদের বলিয়াছেন, 'হিটলার প্রতিশোধ কামনায় সমগ্র ফরাসী জাতিকেই উচ্ছেদ করিতে চান, তাহাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিলোপ সাধন করিতে চান। আমি আশ্বাস দিতেছি, জয়লাভের ফল আমরা ফরাসীর সহিত ভাগ করিয়া লইব।......যুদ্ধে জয়লাভ না করা পর্যন্ত আমরা থামিব না, ইউরোপকে নাৎসী প্রাধান্য হইতে মুক্ত করিতে আমরা দৃঢ়সংকল্প।'

২২ অক্টোবর।—

ব্রিটেনের নানাস্থানে অল্পাধিক জার্মান বিমান আক্রমণ ঘটিয়াছে। জার্মান কামান হইতে বোমা বর্ষণের ফলে ডোভার অঞ্চলে কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। লণ্ডনও আক্রান্ত হইয়াছিল। সোমবার দিনে ও রাত্রিতে জার্মানির নানাস্থানে ইংরেজরা হাওয়াই হামলা করিয়াছে। ২১ অক্টোবরের সংবাদ বার্লিন ও রোম নগরীতেও ইংরেজরা বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিল।

রোম ও টোকিওর বেতারবার্তায় প্রকাশ, শ্যামের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইন্দো-চীনের সীমান্ত সম্পর্কে একটা বোঝাপড়া না হইলে শ্যাম যুদ্ধঘোষণা করিতে প্রস্তুত।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৬ অক্টোবর।—

রবীন্দ্রনাথ আগেকার চেয়ে সুস্থ আছেন। শরীরের তাপ অনেক কমিয়াছে। পথ্যের পরিমাণও বাড়িয়াছে। তবে খুব দুর্বল।

গতকাল বৈকাল হইতে বোম্বাই-এর উপর দিয়া প্রবল ঝটিকাবর্ত বহিতেছে। তিন শত দেশী নৌকার কিছু ডুবিয়াছে, কিছু ভাঙ্গিয়াছে, কিছু অল্প ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। একটি নরউইজান জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। প্রায় ১১জন মানুষ মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। দমকল ও অ্যাম্বুলেন্সের লোকজন ব্যস্ত।

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক মনোনীত প্রথম সত্যাগ্রহী শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার ব্যক্ত করিবার জন্য কাল বেলা আটটার সময় পাউনারে (ওয়ার্ধা) সত্যাগ্রহ করিবেন।

মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ পরিকল্পনা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া এলাহাবাদে এক বিবৃতিতে পণ্ডিত জওহরলালজী বলিয়াছেন, "কংগ্রেস তথা ভারতবাসীদের কঠোর অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই পরীক্ষা আগত। অধীর বা অধৈর্য হইলে চলিবে না। এজন্য সতর্কভাবে আমাদিগকে বর্ণে বর্ণে মহাত্মাজীর নির্দেশ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে।"

১৭ অক্টোবর।—

বৃহস্পতিবার সকালে পানোরে প্রায় তিন শত লোকের এক সভায় যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা দিয়া শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন। বক্তৃতায় তিনি প্রধানত যুদ্ধে কোনওরূপে যোগ না দেওয়া বা সাহায্যদান না করিবারই কথা বলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভাল আছেন। চুংকিং গভর্নমেণ্ট বিশ্বভারতীর চীনা ভবনের মারফত তার পাঠাইয়াছেন যে—আপনার অসুস্থতার সংবাদে অতিমাত্র দুঃখিত। সত্বর আরোগ্যলাভ করুন ইহাই কামনা।

বোম্বাইএর সাইক্লোনের ফলে বহু ব্যক্তির হতাহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। প্রায় এক শত জেলে ডুবিয়া মরিয়াছে। সমুদ্রতীরে ২২টা মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। গাছ চাপা পড়িয়া কয়েকজন মরিয়াছে। 'লাঞ্চ' ভাঙ্গিয়াছে, জাহাজ ডুবিয়াছে। প্রকাশ, এরূপ প্রবল ঝটিকাবর্ত বোম্বাইএ কখনও হয় নাই।

১৮ অক্টোবর।—

সত্যাগ্রহ সংবাদ।—শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবে আজও সকালে এক জনসভায় এক ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা করিয়াছেন। মহাত্মাজী আরও যে ২৪জন সত্যাগ্রহীর তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, প্রকাশ, তাহাতে দুইজন মহিলাও আছেন। মহাত্মাজীর উপস্থিত নির্দেশ এই যে, উক্ত সত্যাগ্রহীরা এবং কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির সভ্যেরা কোনও সত্যাগ্রহ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

রবীন্দ্রনাথ আগের চেয়ে ভাল আছেন।

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ফজলুল হক চুনারে এক জনসভায় বলিয়াছেন, মুসলিম লীগ যদিও ব্রিটিশের সমর প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে অসম্মত কিন্তু মুসলমানেরা ব্যক্তিগতভাবে সে ব্যাপারে সাহায্য করিবে।

বোম্বাইএর ঝটিকায় প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা মূলধনের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

সিন্ধুতে হিন্দু খুনে আন্দোলনের ফলস্বরূপ অমরকোটের সুফি গ্রামে আর এক ব্যক্তি নিহত হইয়াছেন।

১৯ অক্টোবর।—

সত্যাগ্রহ সংবাদ।—শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবে ওয়ার্ধা হইতে দশ মাইল দূরে সেলু গ্রামে এক সত্যাগ্রহ সভায় তাঁহার তৃতীয় যুদ্ধ-বিরোধী বক্তৃতা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ভাল আছেন।

আজ সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অমরাবতী (মধ্যপ্রদেশ) বেরার প্রাদেশিক হিন্দুসভা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছে।

বোম্বাইএর ঝড়ে নিহতদের আরও ২০টি দেহ বোম্বাইএর সমুদ্রতটে পাওয়া গিয়াছে।

বীরভূমে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।

২০ অক্টোবর।—

সত্যাগ্রহ সংবাদ।—শ্রীযুক্ত ভাবে আজ ওয়ার্ধা হইতে দশ মাইল দূরবর্তী দেউলিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ৪র্থ বক্তৃতা করিয়াছেন।

'দেশ'এর অষ্টম বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের রাজনৈতিক সমস্যামূলক নূতন উপন্যাস "প্রহেলিকা" ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

—'দেশ' সম্পাদক

বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের অবলম্বিত শাস্তি ব্যবস্থার প্রতিবাদকল্পে নিখিল ভারত যুবসংঘের উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কলিকাতার নাগরিকদের এক বিরাট জনসভা হয়। সর্দার শার্দুল সিং কবিশের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাঙলার নানা স্থানে অনুষ্ঠিত এইরূপ সভার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত কে এফ নরিম্যান এক বিবৃতি দিয়া মহাত্মাজীর বর্তমান সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে পর্বতের মূষিক প্রসব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

২১ অক্টোবর।—

দেউলির (মধ্যপ্রদেশ) সংবাদ, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পঞ্চম দিবসে, রবিবার রাত্রি সাড়ে তিনটায় ভারতরক্ষা আইনে শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। জেলেই তাঁহার বিচার হইয়াছে। তিন দফা অভিযোগে তিনি তিন মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তিনটি দণ্ডই এক সঙ্গে চলিবে। এই উপলক্ষে মহাত্মাজী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে প্রধানত কংগ্রেসকর্মীদের ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়া বলা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত ভাবের কারাগমনে দেশের প্রতিক্রিয়া দেখিয়া তবে তিনি অন্য সত্যাগ্রহী প্রেরণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদকল্পে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে অ্যালবার্ট হলে আজ এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়াছে।

২২ অক্টোবর।—

সত্যাগ্রহ সংবাদ।—শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবেকে নাগপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠানো হইয়াছে। পরবর্তী সত্যাগ্রহী কে হইবেন তাহা এখনও মহাত্মাজীর বিবেচনাধীন।

সিন্ধুর হিন্দু খুন আন্দোলন এখনও সমান। করাচির সংবাদ—সিন্ধুর হিন্দু মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিছলদাস ভাজিরানির বাসস্থানে গুলি বর্ষিত হইয়াছে। এ ছাড়া সক্কর জেলার জাহানপুর গ্রামে আজ সাতটি হত্যাকাণ্ড হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড যে অনাচার করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ কল্পে বাগবাজার মেটাল ইয়ার্ডে শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার এম এল এ মহাশয়ার সভানেতৃত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এক বুলেটিন প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বর্তমানে বিপন্মুক্ত হইলেন।
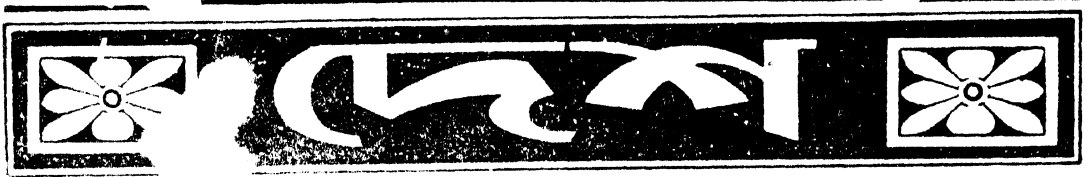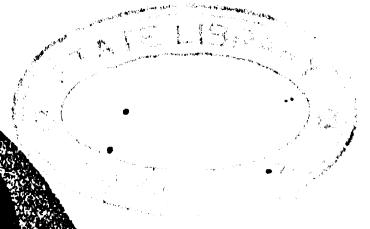
৭ম বর্ষ ।   ১৬ই কার্তিক, শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 2nd November, 1940   । ৫০ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

অনুপ্রেরণা ও আন্তরিকতা—

গত ২৫শে অক্টোবর বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ইস্টার্ন গ্রুপ কনফারেন্সের উদ্বোধন করিয়াছেন। বৈঠকের উদ্বোধন করিতে গিয়া বড়লাট বলেন, "গ্রেট ব্রিটেন যখন বীরত্বের সহিত শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হইয়াছে, তখন তাহার প্রাচ্যের স্বজাতি ও সহযোগী জাতিসমূহ জয়লাভের ও পররাষ্ট্র গ্রাসের পিপাসাকে দমন করিয়া আক্রমণের মনোবৃত্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতেছে। এই পরিকল্পনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যে সকল সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছে, আভ্যন্তর ত্রুটির দরুনই তাহা হইয়াছে। বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত ব্রিটিশ যৌথ রাষ্ট্রের অদৃষ্টে তাহা নাও হইতে পারে। এই রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে যে সকল ব্রিটিশ আছে, ইহা তাহাদের বংশগত দায় এবং যে সকল সহযোগী জাতি আছে, আমরা যে আদর্শ অব্যাহত রাখিবার জন্য লড়াই করিতেছি, তাহারাও সেই জিনিস হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিবে।" বড়লাট ইংরেজ এবং তাহাদের সহযোগী জাতি—ব্রিটিশ যৌথ রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ব্রিটিশ জাতির সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্ত দেশসমূহকেই ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বা যৌথরাষ্ট্রের সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। আমরা ভারতবাসীরা সেই অধিকার এখনও পাই নাই। তবু বড়লাটের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, তিনি আমাদিগকে সহযোগী জাতিদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। বড়লাট বাহাদুর ব্রিটিশ এবং তাহার সহযোগী জাতিসমূহের কর্মবিভাগও নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রিটিশের কর্তব্য হইবে ব্রিটিশের স্বজাতি এবং সহযোগী জাতিসমূহের যাহাতে জয়লাভ হয়, তাহা করা এবং পররাষ্ট্র গ্রাসের পিপাসাকে দমন করিয়া আক্রমণের মনোবৃত্তিকে ধ্বংস করিবার আদর্শকে বজায় রাখা। এই আদর্শের ক্ষেত্রে তাহারা কুলীন, এ দায় তাহাদের বংশগত। তাঁহারা এই বংশগত দায় বজায় রাখিবার জন্য কাজ করিলে সহযোগী আমরা ভারতবাসী শ্রেণীর জাতিরা তাহাদের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিব। ইংরেজের কাজ গুরুগিরি, আমরা তাহাদের শিষ্যস্থানীয়। সবই স্বীকার্য, কিন্তু স্বাধীনতার যে আদর্শের বংশগত দায় ইংরেজের রহিয়াছে, সেই আদর্শের অনুপ্রেরণা আমরা সহযোগী জাতি আমাদের মধ্যে একান্ত করিতে হইলে আমাদের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত ছিল। বড়লাট বাহাদুর স্বীকার করিয়াছেন যে—"রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য আছে; কিন্তু স্বাধীনতার প্রতি আস্থায় আমরা এক।" রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য স্বাধীনতার প্রতি আস্থাকে কার্যত স্বাধীনতাকে স্বীকার করায় বাধা সৃষ্টি করিতেছে—দূরদর্শিতার অভাব হইল এইখানে। ব্রিটিশ জাতি অপর জাতির স্বাধীনতায় আস্থাবান, এ কথা এক এবং কার্যত স্বাধীনতা পাওয়া অন্য কথা। স্বাধীন জাতিই অপরের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে।

পণপ্রথা নিবারণ বিল—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে পণপ্রথা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিল উপস্থিত করিয়াছেন। এই বিলের বিধান এই যে, বরপক্ষ কন্যাপক্ষের নিকট হইতে ৫১ টাকার বেশী টাকা বা অন্যভাবে বরপণ লইতে

পারিবেন না। যদি কেহ এই বিধান ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে তাহার দুই বৎসর জেল এবং হাজার টাকা জরিমানা হইতে পারিবে। তাহা ছাড়া নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী যদি কেহ পণ লন, কন্যাপক্ষ মাসিক দশ টাকা হারে সুদসহ সে টাকা ফেরৎ পাইবেন। পণপ্রথা অতি নিষ্ঠুর ও নিন্দনীয়, অত্যন্ত অভদ্র প্রথা, এই কুপ্রথার উচ্ছেদ আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। কিন্তু আমরা চাই গোড়াকার বিষ একেবারে উৎখাত করিতে। সমাজের সুস্থ চেতনাবুদ্ধি এমন বর্বরাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া একেবারে এই জঘন্য প্রথাকে চূর্ণ করে, আমরা ইহাই চাই। বিশ্বাস মহাশয় যে বিল করিতে চাহিতেছেন, অর্থগৃধ্নুর দলের উদ্দেশ্য সিদ্ধি উহাতে আটকাইবে বলিয়া মনে হয় না। বিশ্বাস মহাশয়, স্বেচ্ছায় যৌতুকস্বরূপে দানকে দণ্ডার্হ করিতে চাহেন নাই, করিতে পারেনও না। এই স্বেচ্ছায় দানের আড়ালেও বর বেচার ব্যবসা বেশ চলিবে। যৌতুকস্বরূপে দান এবং পণস্বরূপে দান ধড়িবাজদের কায়দায় ইহা পৃথক করা কঠিন হইবে। বরপক্ষ কন্যাপক্ষের উপর চাপ দিবে, পণের নামে টাকা না লইয়া যৌতুকের নামে টাকা ও গহনা আদায় করিবে। নামটা হইবে ভিন্ন, কিন্তু কাজটা চলিবে সমান। সুতরাং এ পথ পথ নয়, পণ প্রথাটা নিন্দনীয়, শুধু আইনের খাতায় এই কথাটা লেখা থাকিবে মাত্র। এই প্রথা দূরে করিবার একমাত্র উপায় হইল বাঙলার তরুণদের এই বর্বরতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মনোভাবের জাগরণ। যে সব তরুণেরা সাম্য, প্রগতি, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি বড় বড় কথা বলে, তাহারা পণ আদায় করিবার বেলায় তাহাতেই সায় দিতেছে, তরুণদের চিত্তের এই দৈন্য যতদিন না যাইবে, ততদিন এই পাপ-ব্যবসা বাঙলাদেশকে পীড়া দিবেই এবং দেশের পাতিত্বও পাকা থাকিবে। মনু বলিয়াছেন,—তং দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী। যে দেশে এই বিংশ শতাব্দীতেও বর বেচার ব্যবসা চলে, সে দেশ যে পতিত তাহাতে সন্দেহ কি? সে দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার গর্ব করা বৃথা।

ভারতের রাজা-মহারাজা—

গত ১৯শে অক্টোবর গোয়ালিয়র রাজ্যে সর্বজনীন সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য শ্রীযুত ব্রিজলাল বিয়ানী সভাপতিস্বরূপে তাঁহার অভিভাষণে বলেন, আমাদের দেশের রাজা-মহারাজারা একদিন সূর্য এবং চন্দ্রবংশের কুলোজ্জ্বলকারী পুরুষ ছিলেন। ভারতবর্ষকে পরাধীনতার বন্ধনে আবদ্ধ রাখিবার পক্ষে সহযোগিতা না করিয়া যদি মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তাঁহারা তৎপর হন এবং সেজন্য আবশ্যক হইলে আনন্দের সঙ্গে আত্মবিলোপ করিয়া দিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে এখনও তাঁহারা তাঁহাদের প্রাচীন গৌরবের অধিকারী হইতে পারেন। এ দেশের রাজা-মহারাজা অতীতে কি ছিলেন, সে কথা লইয়া আলোচনা করিয়া এখন বিশেষ কিছুই লাভ নাই। বর্তমানে ভারতের স্বাধীনতার অনুকূলতা না করিয়া তাঁহাদের তরফ হইতে প্রধানত যে প্রতিকূলতাই আসিয়া থাকে, ইহাই মূলে সত্য কথা। রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে নিজেদের স্বেচ্ছাচারকে একটু ক্ষুন্ন করিয়া প্রজাদের কোন অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপনই যাঁহারা বরদাস্ত করিয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহারা সহযোগিতা করিবেন ভারতের রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতার আন্দোলনের, এমন আশা করা যায় না। রাজা মহারাজাদের শক্তি প্রজাদেরই দৌলতে, প্রজারা এই সত্যটির সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে যদি সচেতন করিতে পারে, তবে যদি বর্তমানের প্রগতিবিরোধী মতিগতির পরিবর্তন করিতে তাঁহারা বাধ্য হন, তৎপূর্বে নহে।

বিহারে বাঙলা ভাষা—

বিহারের যে সব স্কুলে বাঙালী ছাত্রদের সংখ্যা পর্যাপ্ত আছে, সেই সব স্কুলে বাঙলা ভাষার সাহায্যে সকল বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য বিহারের বাঙালীদের পক্ষ হইতে দাবি করা হইয়াছিল, কিন্তু ব্যয়বাহুল্যের অজুহাতে বিহার গভর্নমেণ্ট সে দাবি অগ্রাহ্য করেন। সম্প্রতি বিহার গভর্নমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে যে, হিন্দুস্থানীতে যে সব ছাত্র পরীক্ষা দিতে পারিবে না, তাহারা যাহাতে তাহাদের নিজেদের মাতৃভাষা কিংবা ইংরেজীতে পরীক্ষা দিতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবিধানের এরূপভাবে সংস্কার সাধন করা হইবে। বাঙালীদের দাবিটা যে এতদিন পরে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয় বলিতে হইবে; কিন্তু এই ব্যবস্থাই যথেষ্ট নহে। বাঙলা ভাষায় শিক্ষালাভ করিবার পক্ষে বাঙালী ছাত্রদের যে সব অসুবিধা রহিয়াছে, সেগুলিও দূর করা দরকার। নানারূপে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া পরোক্ষভাবে বাঙলা ভাষাকে দাবাইয়া হিন্দুস্থানীকে প্রাধান্য দিবার প্রয়াস যতদিন পর্যন্ত বিহারে চলিবে, বাঙালীরা ততদিন পর্যন্ত সন্তুষ্ট হইবে না। বাঙালী শিক্ষকদিগকে বিতাড়ন করিবার যে নীতি বিহারে চলিতেছে, এই প্রসঙ্গে সে কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে সব বিদ্যালয়ে বাঙালী ছাত্রছাত্রী আছে, সেই সব বিদ্যালয়ে যথেষ্টসংখ্যক বাঙালী শিক্ষক রাখিতে হইবে। বাঙলা ভাষায় পরীক্ষা দিবার সুবিধা কাগজেপত্রে রাখিয়া কার্যত ছেলেদের উপর চাপ দিয়া বাঙলা ভাষা শিক্ষালাভের যদি অন্তরায় সৃষ্টি করাই চলিতে থাকে, তবে নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবিধানের সংস্কারে বাঙালী সমাজ সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না।

উন্নতি কোন্ দিকে—

বাঙলা সরকারের ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের এই রিপোর্টে

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার মোটের উপর কতকটা উন্নতি দেখা যাইতেছে। আমরা সাধারণ লোকেরা সরকারী এই উক্তির রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিব না। কিন্তু উন্নতি যে হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রিপোর্টে ছাপার অক্ষরে তাহা লেখা রহিয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, বাঙলা দেশের সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীদের মজুরি কমিয়া গিয়াছে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যা অত্যন্তই প্রবল। কুটীর-শিল্পের কারবার অচল হইয়া পড়িয়াছে বলিলেই হয়। বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইনের ফলে গ্রামে টাকা-পয়সা কর্জ পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে, [illegible] সেটেলমেণ্ট বোর্ডগুলির ঢিমেতেতালা গতিতে যে [illegible] সম্ভেছে, তাহার ফলে যে সব সুবিধা লো[illegible] [illegible]ন হইতে [illegible]উচিত ছিল, [illegible]হা হইতেছে না। [illegible] চড়া ছি[illegible]. [illegible]কিন্তু পাট হাতে রাখিবার সামর্থ্যের অভাবে কৃষকেরা চড়া দামের সুবিধা ষোল আনা ভোগ করিতে পারে নই। সরকারী এই সব বিবৃতি খতাইয়া দেখাইলেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন, উন্নতি কোন্ দিকে হইতেছে। দুঃখ যাহা অন্ন আর বস্ত্রের!

পরলোকে ডাক্তার বারিদবরণ—

ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙলা দেশ একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসককে হারাইল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ডাক্তার বারিদবরণ অগ্রণীর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি কেবল চিকিৎসক হিসাবেই বড় ছিলেন না, নানা শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞানানুশীলন তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ব্রত ছিল। স্বদেশীয় যুগে বঙ্গের নব জাতীয়তার আন্দোলনে যাঁহারা যোগদান করিয়া বিশিষ্টতা অর্জন করেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ডাক্তার বারিদবরণ পরহিতব্রত, ধর্ম-নিষ্ঠ, উদার প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

জার্মানির নূতন চক্রান্ত—

ইতালির সেনাদল গ্রীসে প্রবেশ করিয়াছে। ভূমধ্যসাগরের সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিল। পূর্ব নির্ধারিত নীতির ইহা পরিণতি; এই প্রসঙ্গে হিটলারের সঙ্গে মার্শাল পেত্যাঁ এবং জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দেখা সাক্ষাৎ এবং আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ। পেত্যাঁ গভর্নমেণ্ট হিটলারের প্রস্তাবে রাজী হইবেন না, প্রথমে এই রকম কথা শুনা গিয়াছিল; কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ফ্রান্স বর্তমানে যেমন অবস্থায় পতিত, তাহাতে হিটলারের প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। হিটলারের সঙ্গে আলোচনার ফলে মার্শাল পেত্যাঁ নিম্নলিখিত শর্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছেঃ—(১) আলসাস লোরান প্রদেশ জার্মানিকে দেওয়া হইবে; (২) নিস শহর সমেত রিভিয়েরা অঞ্চলের খানিকটা ইতালিকে দিতে হইবে; (৩) ফরাসী এবং ইতালির মধ্যে টিউনিস ভাগাভাগি হইবে; (৪) ফরাসী এবং স্পেন মরক্কো ভাগাভাগি করিয়া লইবে; (৫) সিরিয়া এবং উত্তর আফ্রিকাতে অবস্থিত ফরাসী বাহিনী মিশর আক্রমণে ইতালির ব্যূহ রক্ষা করিবে। ভূমধ্যসাগরের দিকে ইংরেজের উপর চাপ দিবার জন্যই হিটলারের এই আয়োজন। পেত্যাঁ তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু হিটলারের হাতে পেত্যাঁ গভর্নমেণ্টের এই আত্মসমর্পণের প্রতিক্রিয়া ফ্রান্সের উপনিবেশসমূহে কিরূপ হইবে বুঝা যাইতেছে না। তবে ইহা ঠিক যে, ইহার পর ফ্রান্সের যে নৌবহর অবশিষ্ট আছে, সেগুলি জার্মানির পক্ষে কাজ করিবে। হিটলার এই চুক্তির ফলে ফ্রান্সকে কিছু কিছু সুবিধা ছাড়িয়া দিবেন ইহা নিশ্চয়। ভূমধ্যসাগরে এবং আফ্রিকার উপকূলভাগে এতদিন পর্যন্ত ইতালি একা জার্মানির পক্ষে ছিল, এখন ফরাসীও তাহার সঙ্গে যোগ দিল; ইহার ফলে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলভাগ দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে বৃটিশের নৌ-গতিবিধি বিঘ্নসঙ্কুল করিবার চেষ্টা হইবে। সিরিয়া হইতে, লোহিত সাগরের দিকে ইতালি যাহাতে সংগ্রামে জোর পায়—এই চুক্তির উদ্দেশ্য তাহাও আছে। জেনারেল ফ্রাঙ্কো কি করিবেন, এখনও জানা যায় নাই। তবে তাঁহার ভগিনীপতি স্পেনের পররাষ্ট্র সচিব সেনর সুনার হিটলারেরই পক্ষপাতী, ইহা জানা গিয়াছে। ফ্রান্সের সঙ্গে নূতন চুক্তিতে স্পেনকে প্রলোভিত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে।

জাপানের নীতি—

পূর্বদিকে ত্রিশক্তির দোস্ত জাপান নূতন নীতি অবলম্বনের চেষ্টায় আছে। জাপান চীনের সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহার দৃষ্টি দেখা যাই-তেছে, ওলন্দাজ অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জ, ইণ্ডোচায়না প্রভৃতির দিকে বেশী। ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত হইবার পর হইতে ইংরেজের সঙ্গে জাপানের মনোবিবাদ বাড়িয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। জাপান দেখিতেছে, এই চীনের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইতে লিপ্ত থাকিতে গেলে তাহার সুবিধা নাই, বরং অসুবিধাই বাড়িবে। এখন চীনের সঙ্গে লড়াই করার অর্থ দাঁড়াইবে—ইংরেজ, আমেরিকা এবং চীন এই তিনের সঙ্গে লড়াই; কারণ এতদিন পর্যন্ত ইংরেজ ও আমেরিকা চীনের যতটা পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছিল, ইহার পর তাহার চেয়ে পৃষ্ঠপোষকতা বেশী করিবে। চীনের কাছে জাপান সন্ধির যে সব শর্ত দিয়াছিল, চীনের জাতীয় দল তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন; কিন্তু ইহার পরও জাপান সন্ধির চেষ্টা হইতে

নিবৃত্ত হইবে না। জাপান চীনের কাছে সম্প্রতি যে শর্ত দিয়াছে, তাহা পূর্বের চেয়ে অনেক নরম। জাপানের সমর-নীতিজ্ঞগণ মনে করিতেছেন যে, চীনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিলে জার্মানির সঙ্গে চুক্তির সুবিধাটা তাঁহারা ভোগ করিতে পারিবেন না। চীনের সঙ্গে গোল মিটাইয়া ফেলিয়া জাপান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর চাপ দিতে চেষ্টা করিবে কি না, ইহাই বর্তমানে তাহার চিন্তনীয় বিষয় হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

সুভাষচন্দ্রের নির্বাচন—

ঢাকা অমুসলমান নির্বাচন কেন্দ্র হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীযুত অঘোরবন্ধু গুহ এবং শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদার ইঁহারা এই কেন্দ্র হইতে নির্বাচনপ্রার্থী ছিলেন, তাঁহারা সানন্দে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করেন। সুভাষচন্দ্রের এই নির্বাচনে ইহাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে, সুভাষচন্দ্র বাঙলা দেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননায়ক। বল্লভাচারী প্রভাবিত কংগ্রেসের দক্ষিণী দল সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন, তাহার জবাব দিল বাঙলা এই নির্বাচনের ভিতর দিয়া, আর জবাব দিল বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল, যাঁহারা সুভাষচন্দ্রকে আটক রাখিয়াছেন, তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির।

যুদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে ভারতসচিব—

যুদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা এ পর্যন্ত যত কথা বলিয়াছেন, সব ধোঁয়া সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছুই নয়; কংগ্রেস চাহিয়াছিল আসল কাজের কথা;; কিন্তু সব কর্তাই কথার তুবড়ী ফাটাইবার বেলায় বাদ দেন সেই আসল কথাটা। সেদিন ভারতসচিব যুদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে যে আওয়াজ করিয়াছেন, তাহা [illegible] গোড়া এইরূপ অন্তঃসার-শূন্য। তিনি ব[illegible] [illegible]বনের ন্যায় স্বাধীনতার যে প্রাথমিক [illegible] আধি[illegible] [illegible]সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট হইতে সং[illegible] [illegible]তর যে [illegible] স্বীকৃত হওয়া উচিত এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের পাশাপাশি ছোট রাষ্ট্রগুলির শান্তিতে বাস করিবার যে অধিকার আছে, তাহা ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই আমরা চাই।" যত দায়, কেবল ইউরোপের জন্যই আমরা এশিয়াবাসী ভারতের লোক ব্রিটেনের যুদ্ধাদর্শে আমাদের স্থান কোথায়! মহাযুদ্ধে ইউরোপের পতিতদেরই উদ্ধার হইবে, ইউরোপের বাহিরের পরাধীন জাতিসমূহের কোন আশা-ভরসা নাই, ভারতসচিবের উক্তির ভাষ্য হইল ইহাই। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মুখ হইতে এমন ভাষ্য অনেক দিন আমরা পাইয়াছি, নূতন করিয়া দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

জোছনা হাসির প্লাবন নেমেছে

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ, এম এ

বাদলের ধারা ঝ'রে হ'ল সারা, সারা হ'ল ঝ'রে ঝ'রে;
জ্যোছনাহাসির প্লাবন নেমেছে দীরঘ দিবস পরে।
মহুয়ামদির অধীন পরানে
খুশির বাঁশরী বাজে ক্ষণে ক্ষণে,
আলো-আঁধারের লুকোচুরি চলে বাহির ভুবনে ঘরে।
বকুল ছড়ানো আজি এই নিশি যাপি গো কেমন ক'রে॥

মধু স্মরণের রাঙা রাখি বাঁধা চাঁপাকরবীর হাতে;
কাজল মাখিয়া নারিকেল বীথি চকোরীর সাথে মাতে।
নীলবেলাভূমে লঘু মেঘদল
নৃত্যে ছন্দে কল-উচ্ছল,
এপারে নাহি যে ঘুম নাহি আজ শেফালীর আঁখিপাতে।
ভুলে যাও কথা আজ রাতে সখী ভুলে যাও আজ রাতে॥

অনাদি কালের মত্ত বাসনা আকুল পিয়াস নিয়া
আকাশ ছেয়েছে শ্যামা ধরণীর শান্ত শীতল হিয়া;
প্রীতি-আশ্লেষে চুম্বনে শত
দোঁহা বিহ্বল তন্দ্রাবনত,—
রহি রহি ওঠে সে-সুখ আবেশে হৃদয় গুঞ্জরিয়া।
তব দেহে পাই দেহাতীতে মোর পাই নে তোমারে প্রিয়া॥

প্রাণ মন তব তনু-সৌরভে বিস্ময়ে ডুবে রয়,
ছায়ারে রাতের ছায়ায় ছায়ায় লাগে আরো মায়াময়।
কণ্ঠলগ্ন তব ভুজযুগ
ভোলায় নিমেষে কোটি কোটি যুগ,
তব চাহনিতে শিরায় শিরায় লাভার প্রবাহ বয়।
তোমার পরশে মর্মর-শিলা শিহরায় কথা কয়॥

তবু নাচে মন বন-মর্মরে ঝরনার কলনাদে;
ধেয়ানমৌন অসীম সুন্দর বাঁধে মোরে নানা ছাঁদে।
তব চাঁদমুখ হৃদয়ে ধরিয়া
দেখেছি চাঁদেরে জীবন ভরিয়া,
আজো নিশি কাটে তেমনি নেহারি সেই অনুপম চাঁদে।
রূপের পিয়াসী পরান আমার রূপের লাগিয়া কাঁদে॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জনে বিজ্ঞানীদের দান

শ্রীসুধীরকুমার বসু

বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে এইরূপ একটা অভিযোগ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, গবেষণাগারের বাহিরের জগৎ সম্পর্কে তাঁহারা একান্তই উদাসীন ও নির্লিপ্ত, তাঁহাদের গবেষণালব্ধ ফল কাহার হাতে পড়িয়া কিভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। বিভিন্ন দেশের স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রনায়কগণ নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে তাই অনেক সময় এই সমস্ত গবেষণার ফলকে বেপরোয়াভাবে প্রয়োগ করিবার সুবিধা পা[illegible] থাকেন। বহুক্ষেত্রে বিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রনায়কদের হা[illegible] কাজ করেন মাত্র। আজ সারা দুনিয়া[illegible] চলিতেছে ও গোলা-বারুদের ধ[illegible] ক[illegible] য়া উঠিয়াছে সেই মারণযজ্ঞের অন[illegible] বিজ্ঞানী[illegible] যে পরোক্ষ দায়িত্ব রহিয়াছে, সে-কথা অবশ্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না। গবেষণাগারের বাহিরে আসিয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা রক্ষার দাবির প্রতি দেশ বিদেশের বিজ্ঞানিগণ যদি মনোযোগী হইতেন, তবে তাঁহারা যে ক্ষমতালিপ্সু রাষ্ট্রনায়কগণের উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যে মনীষা ধ্বংস ও সৃষ্টির কাজে এমন সহায় হইতে পারে, তাহা যে সভ্যতাকেও নূতন পথে পরিচালিত করিতে পারিত তাহা আশা করা অন্যায় নহে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বীয় মনীষার প্রভাবে জগতকে অভিভূত করিয়াছেন, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ আন্দোলন করিয়াছেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরূপ বিজ্ঞানীর দৃষ্টান্ত খুব বেশী মিলে না বটে, কিন্তু এক্ষেত্রেও যে কয়েকজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর সন্ধান পাওয়া যায়, জগতের ইতিহাসে আজও তাঁহারা অমর হইয়া রহিয়াছেন। আমি এ স্থলে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জনে যে কয়েকজন বিজ্ঞানী বিশেষভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের কথাই আলোচনা করিব। মার্কিন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা বিশেষভাবে যোগ দিয়াছিলেন, ও যাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নে স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী প্রথম রচিত হয়, তাঁহাদের মধ্যে আমরা কয়েকজন বিজ্ঞানীরই সন্ধান পাইয়া থাকি। যে তরুণ বিজ্ঞানী ঘোষণা বাণীটির প্রথম মুসাবিদা করেন তিনি টমাস্ জেফারসন। যিনি উক্ত ঘোষণাবাণী সংশোধনপূর্বক জনসমাজে প্রচার করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নব যুগের সূচনা করেন, তিনি স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। বিজ্ঞান জগতে ফ্র্যাঙ্কলিনের সমসাময়িক অতি অল্প বিজ্ঞানীই এরূপ যশের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে ইনিই সর্বপ্রথম স্বাধীনতা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়া মার্কিনে নবযুগের প্রবর্তন করেন। রাষ্ট্রের তরফ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে পরে যে বিজ্ঞান সমিতি গঠিত হয়, ফ্রাঙ্কলিন তাহারও প্রথম প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হন। ফ্র্যাঙ্কলিন ও জেফারসন ব্যতীত আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী সে সময় গবেষণাগারের বাইরে আসিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন; কংগ্রেসের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া স্বাধীনতার ঘোষণা বাণীতে স্বাক্ষর করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইতে ইঁহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই।

একটা জাতিকে যাঁহারা গঠন করেন, তাঁহারা শুধু রাজনীতির চর্চাই করেন না। তাঁহাদের সর্বতোমুখী প্রতিভা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মনীষার পরিচয় তাই আমরা বহুক্ষেত্রেই পাইয়া থাকি। তড়িৎ-বিজ্ঞানে তাঁহার বিবিধ পরীক্ষার কথা বিজ্ঞানের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। ঝড়বাদলে নৈসর্গিক বিদ্যুতের কিরূপ তারতম্য ঘটে এবং

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন

আবহাওয়ার উপরেই বা তাহাদের প্রভাব কিরূপ বিস্তৃত হয়, ফ্র্যাঙ্কলিন তৎসম্পর্কে যে সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন, দেশ-বিদেশের আবহাওয়া-বিভাগসমূহ আজও তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া থাকেন। বায়ুমণ্ডলস্থ বিদ্যুতের অস্তিত্ব নির্ণয়ে আকাশে ঘুড়ি উড়াইয়া তিনি যে সমস্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন, বিজ্ঞানের ছাত্রগণ বহুদিন তাহা বিস্ময়ের সহিত স্মরণ করিবে সন্দেহ নাই। বজ্র ও বিদ্যুৎ হইতে সুরম্য প্রাসাদ অট্টালিকা প্রভৃতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে লোহার "সূচাগ্র" দণ্ড ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা বর্তমানে সচরাচর দৃষ্ট হয়, তাহা ফ্র্যাঙ্কলিনেরই পরীক্ষার ফল। তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা দূর হইতে গোলা বারুদ উড়াইবার যে কৌশল বর্তমানে খনিতে ও অন্যান্য "ব্লাস্টিং অপারেশন"এ ব্যবহৃত হয় তাহাও সর্বপ্রথম ফ্র্যাঙ্কলিনই নির্দেশ করেন। এতদ্ব্যতীত "রোটারি প্রিণ্টিং প্রেস" "বাই-ফোকাল" কাচ, "ফ্র্যাঙ্কলিন স্টোভ" প্রভৃতির আবিষ্কার ফ্র্যাঙ্কলিনকে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের পর্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

টমাস জেফারসনও শিল্পের বিস্তার কল্পে এরূপ বহু

যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করেন যাহা দ্বারা মানুষের শ্রমের লাঘব ঘটিয়াছে। তাঁহার আবিষ্কৃত এক প্রকার লাঙ্গলের ফলা কৃষিকাজের বিশেষ সৌকর্যবিধান করিয়াছে। ইহা দ্বারা জমি কর্ষণ ও কর্ষিত মাটি বিধ্বস্ত করণের কাজ একযোগে চলে বলিয়া উহা কৃষকের নিকট বিশেষ আদর লাভ করে। পুরোদস্তুর বিজ্ঞানী না হইলেও জেফারসন প্রাচীন পৃথিবীর জীবজন্তু সম্পর্কে গবেষণা করিতে পছন্দ করিতেন এবং এ সম্পর্কে তাঁহার কতকগুলি মৌলিক গবেষণা বিজ্ঞানিগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া থাকেন। প্রাগৈতিহাসিক আমেরিকায় এক প্রকার বিরাট "গেছো জন্তু" বাস করিত বলিয়া জানা যায়। জেফারসনই উহা প্রথম আবিষ্কার করেন। তাই উহা আজও Megalonyx Jeffersoni নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

জেফারসন যাহা সঠিক বুঝিতেন, জোরের সহিত তাহা প্রচার করিতে কোনও দিনই কুণ্ঠিত হন নাই। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী প্রাণীতত্ত্ববিদ্ কাউণ্ট দ বাফোঁ একবার এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, ইউরোপের তুলনায় আমেরিকা মহাদেশের জীবজন্তু আয়তনে অনেক ছোট হয়, তাহাদের রকমফেরও অনেক কম। জেফারসন তাঁহার Notes on Virginia নামক নিবন্ধে ১৭৮২ অব্দে এ সম্পর্কে বহু তথ্য সন্নিবেশ করিয়া বাফোঁর বক্তব্য বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হন নাই, আমেরিকার প্রাচীন ও বর্তমান বহু প্রাণীর প্রস্তরীভূত দেহ ও হাড় সংগ্রহ করিয়া তিনি উহা বাফোঁর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কোন বিষয় সত্য বলিয়া বুঝিলে এমনি জোরের সহিতই তাহা তিনি প্রচার ও প্রমাণ করিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠাও এই গুণেই সম্ভবপর হইয়া উঠে। পরবর্তীকালে তিনি তাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পদও অলংকৃত করিতে সমর্থ হন।

আমেরিকার স্বাধীনতার প্রস্তাবের সমর্থক আর একজন বিজ্ঞানী রোজার শারম্যান। স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী রচনার নিমিত্ত কংগ্রেস কর্তৃক পাঁচজনকে লইয়া যে কমিটি গঠিত হয়, ইনি তাহার একজন সদস্য ছিলেন। শারম্যানের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ উৎসাহ ছিল এবং বর্ষপঞ্জী রচনার উদ্দেশ্যে তিনি বহুতর পরীক্ষা ও গণনা করিয়াছিলেন। গণতন্ত্রের যে আহ্বান মার্কিন জনগণকে বিশেষভাবে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল তাহাতে সে সময়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে অতি অল্প লোকই সেই আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতে পারিয়াছিলেন। গবেষণাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠের মধ্যেও আন্দোলনের ঢেউ প্রবেশ করিয়া বিজ্ঞানীদের সচকিত করিয়া তুলিতে ছাড়ে নাই। তাই মার্কিন স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর নামও জড়িত দেখিতে পাই। ডাঃ জোসিয়া বার্টলেট, বেঞ্জামিন রাস্ প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা এই আন্দোলনে বিশেষভাবে যোগদান করেন। মার্কিন স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী যাঁহারা স্বাক্ষর করেন, প্রেসিডেণ্ট হ্যানককের নামের পরেই তাহাতে জোসিয়া বার্টলেটের নামের স্বাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। ডাঃ বার্টলেটের চেষ্টাতেই পরবর্তীকালে "নিউ হামসায়ার স্টেট মেডিক্যাল সোসাইটি" গঠিত হয়। ডাঃ বার্টলেট এই সমিতির প্রথম সভাপতি ছিলেন। [illegible] আরও চারিজন স্বাধীনতার ঘোষণাপ[illegible]ধ্যে বেঞ্জামিন রাসের নাম পূর্বেই [illegible] [illegible]মিন রাসই যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম [illegible] ব্যাধি স[illegible] গবেষণার প্রবর্তন করেন। পানদোষ বংশপরম্পরায় যথার্থই কোনও প্রভাব বিস্তার করে কি না, পচনশীল দন্তের জন্য শরীরের অন্যান্য অংশ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এসমস্ত বহু বিষয়ে তাঁহার মৌলিক গবেষণা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

বিজ্ঞান-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি রাজনীতি ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ইহারা সে সময় নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মার্কিনের স্বাধীনতার সংগ্রামে বিজ্ঞানীরা যেভাবে সহায়তা করিয়াছেন, আজ গণতন্ত্রের আদর্শ বজায় রাখিতে হইলে সর্বদেশের বিজ্ঞানীদের এমনিভাবেই অগ্রসর হইয়া সম্মিলিতভাবে বলিতে হইবে, "আমাদের আবিষ্কারগুলির তোমরা এমন করিয়া পররাজ্য হরণে ব্যবহার করিতে পারিবে না। বিজ্ঞানের আবিষ্কার জগতের উন্নতি সাধনের জন্য মাত্র, পরস্পর হানাহানি ও পরস্পরকে ধ্বংস করিবার জন্য নহে। প্রত্যেক জাতিকে তাহার স্বাধিকার দিয়া আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে।"

জগতের চিন্তাশীল বিজ্ঞানিগণ সংঘবদ্ধ হইয়া এরূপ দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতে না পারিলে সভ্যতার ভবিষ্যৎ যে একান্তই নৈরাশ্যজনক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

সমুদ্রের তলদেশে মাছের যান্ত্রিক যুদ্ধ

সমুদ্রের অতল তলদেশের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাঁরা সেখানকার বহু রহস্যপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। সমুদ্রে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করতে একটি ছোট মাছের আত্মগোপনের উপযুক্ত সামুদ্রিক উদ্ভিদ কিম্বা পাথরের গর্তেরও চিহ্ন পাওয়া যায় না। চারিপাশে কেবল জল আর সেই বিশাল জলরাশির উপর [illegible] একটি মাছকে স্থিরভাবে বিশ্রাম করতে [illegible] মাছটি কতখানি দুর্বল, অসহ[illegible] বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে, তা বু[illegible] সময় [illegible] জগতে দুর্বলের জীবন প্রতি পদে পদে বিপদগ্রস্ত, সহস্র সহস্র শোকাবহ ঘটনার আবির্ভাব হয় তাদের জীবন যাত্রায়—এমনি এক একটি ঘটনার আবর্তে পড়ে তাদের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু যতখানি আমরা তাদের ক্ষুদ্র, অসহায়, দুর্বল ভাবি, ঠিক ততখানি নয়। ক্ষুদ্র হলেও প্রকৃতির করুণায় তারা নানা কৌশলে তাদের আকার ও শক্তির তুলনায় অতি বৃহৎ জীব জগতের মধ্যে থেকে নিজেদের বংশ রক্ষা করে আসছে। সকল জীবজন্তুদের নিকট তাদের আত্মসমর্পণ করে মৃত্যু বরণ করতে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে এরূপ শোচনীয় মৃত্যুরও যথেষ্ট প্রয়োজন।

সমুদ্রের তলদেশে বৃহদাকার জীবের মধ্যে থেকে কি কৌশলে ছোট আকারের মাছ আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকে, তা আমাদের কাছে একদিন সত্যই রহস্যপূর্ণ ছিল। আমরা ভাবি আমরা বুদ্ধিমান সবথেকে বেশী। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে আত্মরক্ষা এবং শত্রুপক্ষ আক্রমণের জন্য বিষাক্ত গ্যাস, ধূম্রজাল, বৈদ্যুতিক শক্তি ও আলো ব্যবহার করে আমরা আবিষ্কারক হিসাবে গর্ব অনুভব করি। কিন্তু এই সব বৈজ্ঞানিক কৌশল আমাদের আবিষ্কারের বহু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে থেকে সামুদ্রিক জীবেরা শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করতে এবং শিকারকে নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে আনতে ব্যবহার করে আসছে। তাদের আত্মগোপনের কৌশল, শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করে পাল্টা আক্রমণে শত্রুর প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ—এ সমস্তই আমাদের প্রথমে বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল; মানুষের বুদ্ধির প্রসারতা আছে, তারা বহুদিন ধরে গবেষণা করে তাদের কৌশলের কথা জানতে পেরেছে। আজ সেই সব কৌশল আয়ত্ত করে আমরা আমাদের স্বজাতির উপর ব্যবহার চালিয়েছি।

টিকটিকির বাচ্চা নয়! ডিম থেকে কুমীরের বংশধরেরা পৃথিবীর আলো পেয়ে চোখ মেলে চেয়েছে

মাছের আত্মরক্ষার কৌশল কিভাবে চলছে, তা বলতে গেলে প্রথমে 'হার-রিং' মাছের কথা মনে পড়ে। এই জাতীয় মাছ আকারে যেমন ছোট আত্মরক্ষায় সেই রকম দুর্বল এবং অসহায়। শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করতে দাঁত কিম্বা অন্য কোন অস্ত্র নেই; এমন কি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোন বিষাক্ত কিছু প্রস্তুত করবার কৌশলও এদের জানা নেই। অথচ পৃথিবী জুড়ে শত্রু আছে অসংখ্য। 'হার-রিং' খেতে সুস্বাদু, সুতরাং এদের চাহিদা যথেষ্ট। শত্রুপুরীর মধ্যে বাস করে কিভাবে এরা বংশ রক্ষা করে জানেন? প্রকৃতির এক অদ্ভুত শক্তিতে 'হার-রিং' স্ত্রী মাছ আকারে ক্ষুদ্র হলেও এককালীন ৪০,০০০ ডিম প্রসব করতে সক্ষম হয়। শত শত শোকাবহ ঘটনার সম্মুখীন হয়েও তাদের বংশরক্ষার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। সামুদ্রিক 'ক্যাট ফিস' হার-রিং জাতীয় মাছের মত অসংখ্য ডিম প্রসব করতে পারে না।

একেকালীন মাত্র দু'ডজন ডিম প্রসব করেই এরা নিজেদের বৃহৎ বংশকে রক্ষা করে চলেছে। ডিমের আকার মার্বেলের গুলির মত; সামুদ্রিক বহু জীবের লোলুপ দৃষ্টি এদের উপর নিবদ্ধ রয়েছে। সেই কারণে পুরুষ ক্যাট্ ফিস অতি সতর্কের সঙ্গে ডিমগুলিকে মুখের মধ্যে রেখে শত্রুর আক্রমণ থেকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের রক্ষা করে। মুখের মধ্যেই ডিমগুলি থেকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের আবির্ভাব হয়। পুরুষ 'ক্যাট্ ফিসের' সন্তানপ্রীতির তুলনা নেই। সন্তানেরা আত্মনির্ভরশীল না হওয়া পর্যন্ত নিজের তত্ত্বাবধানে সর্বদাই রাখে। কোন শত্রুর নিঃশঙ্ক আগমনের সংবাদ পেলেই পুরুষ ক্যাটফিস অদ্ভুত সঙ্কেতে সন্তানদের ডেকে এনে মুখের মধ্যে আশ্রয় দেয়।

কয়েক জাতীয় মাছ আবার 'বহুরূপী'। গিরগিটি জাতীয় 'বহুরূপী' জীবের কথা হয়ত আপনারা জানেন। 'বহুরূপী' সত্য সত্যই নিজের গায়ের রং পরিবর্তন করতে পারে না। তারা যখনই যে কোন রংয়ের সংস্পর্শে আসে তখনই তারা সেই রংয়ে রূপান্তরিত হয়। তাদের গায়ের চামড়া একপ্রকার স্বচ্ছ আঁশ দ্বারা আবৃত থাকায় অতি সহজেই সব রকম রং তাদের আঁশের উপর প্রতিফলিত হয়।

মাছও শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থানে এসে আত্মগোপন করে। একাজ তারা অতি তৎপরতার সঙ্গে শেষ করে। ম্যাকারেল এবং 'হার-রিং' মাছের পেটের রং রূপালী। আর পিঠের উপরিভাগের রং গাঢ় সবুজ।

যখন এরা ভীষণ প্রকৃতির মাছের তাড়া খায় তখনই সমুদ্রের তীরের দিকে ছুটে যায়। সেখানের অল্প জলের নিকটের বালির সঙ্গে পেটের রূপালী রংয়ের একরকম মিল খেয়ে যায় যে শিকারী আর শিকারের খোঁজ পায় না।

শরীরের উপরিভাগের গাঢ় সবুজ রং সমুদ্রের রংয়ের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ায় সামুদ্রিক মাংসাশী পাখীদের চোখকে তারা সহজেই ফাঁকি দিতে পারে। কোই, চ্যাং, মাগুর প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর মাছের গায়ের রং তাদের আত্মরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই শ্রেণীর মাছ পাঁকের সঙ্গে এমন সহজভাবে আত্মগোপন করে যে, শত্রুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও পরাজয় স্বীকার করে। সমুদ্রে 'বেলুন' নামে একরকম মাছ পাওয়া যায়। জলে 'বেলুন মাছ' অতি মন্থর গতিতে চলাফেরা করে,—তাদের দেখলে অতি নিরীহ বলেই মনে হয়। কিন্তু জল থেকে ডাঙ্গায় তুললেই এদের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বেলুন মাছ' মাটিতে এসেই ঠিক ফুটবলের মত ফুলে উঠে। একটা মানুষের সমস্ত ভার সে এঅবস্থায় অতি অনায়াসেই বহন করতে পারে, শরীরের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে জলের মধ্যে 'বেলুন মাছ' বায়ুর পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে শরীর ভর্তি ক'রে রাখে। শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করতেই তারা এ ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

কয়েক শ্রেণীর মাছ এক প্রকার বিষাক্ত লালার সাহায্যে শত্রুদের প্রাণ হরণ করে। আমরা শঙ্কর মাছের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত আছি। শঙ্কর মাছের দীর্ঘ সুদৃঢ় ল্যাজের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজ নয়। 'ষ্টিংগারী' নামে এক-জাতীয় মাছ বিষাক্ত লালা দ্বারা শত্রুদের ঘায়েল করে। এই জাতীয় মাছের ল্যাজ চাবুকের মত লম্বা। ল্যাজের উপরিভাগে ধারাল কাঁটাগুলি বিশ্বাসী প্রহরীর মত সুসজ্জিত। এই কাঁটা ফুটিয়ে 'ষ্টিংগারী' শত্রুদের শরীরে বিষাক্ত লালা ঢেলে দেয়। সার্ক মাছের লম্বা ল্যাজের শক্তি ভয়াবহ। সময়ে সময়ে সার্ক মাছ ল্যাজের দাপটে নৌকা কিম্বা বড় বড় মাছকে কাবু করে ফেলে। [illegible] মাছের স্বভাব হিংস্র প্রকৃতির। স্কুইড মাছ [illegible] ধারাব[illegible]লের পর্দা সৃষ্টি করতে সক্ষম! শত্রু[illegible] স্কুইড জলের উপরিভাগে গাঢ় [illegible]র মেঘ [illegible]। আত্মগোপনের নিরাপদ স্থানের খোঁজ করে। শত্রু সেই গাঢ় কাল মেঘ অতিক্রম ক'রে শিকারের সন্ধান সহজে পায় না; জলের উপর আলো যেখানে প্রচুর পরিমাণে প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ জলের ধারেই এইরূপ কৌশল বিশেষ ফলপ্রদ। সমুদ্রের গভীর তলদেশে কয়েক জাতীয় মাছের সন্ধান পাওয়া যায়, তারা কালো মেঘের জাল সৃষ্টি না করে, উজ্জ্বল আলোর মেঘ সৃষ্টি করে শত্রুপক্ষের চোখেতে ধাঁধা লাগায়। কোন কোন মাছ তড়িৎশক্তির প্রবাহে শত্রুদের অকর্মণ্য করে আত্মরক্ষা করে। দক্ষিণ এ্যাটলাণ্টিকের জলেতে বৈদ্যুতিক শক্তিবাহী 'টর্পেডো' ইল প্রভৃতি সেখানকার অধিবাসীদের নিকট বিশেষ পরিচিত। এমাজন, নাইল নদীতেও কয়েক শ্রেণীর মাছ শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলো প্রস্তুত করে জলের তলদেশে আলো রাজ্যের সৃষ্টি করে। সেই আলোতে ভুলে যে সব জীবের সমাবেশ হয়, তাদের সমাধি হয় ঐ সব মাছের বৃহৎ উদরের মধ্যে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, কোন কোন মাছ ৩০০ ভোল্ট পরিমাণ বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। জীব-জগতে বহু প্রাণী আছে, যারা দুর্বল এবং ক্ষুদ্র। কিন্তু তারা আত্মরক্ষার জন্য জগতের আর সব প্রাণীদের আক্রমণকে এমন সব কৌশলে ব্যর্থ করে, যা ভাবলে বিস্ময়াবিষ্ট হ'তে হয়।

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিয়া অমল কিন্তু রীতিমত দ্বিধায় পড়িল। পশ্চিমে যেখানে হউক্ চলিয়া যাইবে এবং সেখানকার বাঙালী অধিবাসীদের কাছে বাঙালী পাচক বলিয়া পরিচয় দিবে এই ছিল তাহার ইচ্ছা; কিন্তু সে পশ্চিমটি যে ঠিক কোথায় হইবে তাহা এখনও সে ভাবিয়া দেখে নাই। খুব বেশী শহরের নামও তাহার জানা নাই; পাটনা কাশী এলাহাবাদ এইগুলিরই নাম সে সচরাচর শুনিয়া থাকে। কোথায় বেশী বাঙালী, তাহাও ভাল জানা নাই। তবে মনে হয় কাশী [illegible]

তাহার মনে [illegible] মাত্র দশটি টাকা আছে। সে দি [illegible] । একেবারে হাতখালি করা উচি[illegible] কারণ [illegible] এই যে কাজ পাওয়া যাইবে তাহারই বা ঠিক কি। এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে ব্যাকুলভাবে এদিক-ওদিক চাহিতেছে, এমন সময় নজর পড়িল একদিকে বড় করিয়া Enquiry Office লেখা রহিয়াছে। সে আস্তে আস্তে সেইখানেই উপস্থিত হইল।

তিনচারিটি লোক তখন যথেষ্ট হুড়োহুড়ি করিতেছে।—

"ও মশাই, আন্দুলের গাড়ি কটায়?"

"পুরুলিয়ার গাড়ি ক নম্বর প্ল্যাটফর্ম মশাই?"

"আচ্ছা, নাগপুরের গাড়ির কটায় arrival বলতে পারেন?"

তাহারই মধ্যে কষ্টে মাথা গলাইয়া সে প্রশ্ন করিল, "পাটনার ভাড়া কত বলতে পারেন মশাই?"

বার-তিনেক প্রশ্নটি আবৃত্তি করার পর জবাব আসিল, "পাটনা সিটি না জংশন?"

কী বিপদ! অমল খানিকটা ইতস্তত করিয়া কহিল, "আজ্ঞে বাঁকিপুর।"

বাঁকিপুরের নামটা সহসা মনে পড়িয়া গেল; কোথায় যেন শুনিয়াছিল বাঁকিপুর জায়গাটাই পাটনার মধ্যে বড়।

"বাঁকিপুর, ও, পাটনা জংশন! চার টাকা তের আনা।— হাঁ, মেচাদা লোকাল? দশ নম্বর। বর্ধমান যাবার গাড়ি? এগার নম্বরে,—যাও না, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

বলা বাহুল্য শেষোক্ত ধমকটি অমলকেই দেওয়া হইল। তখন অমল ভয়ে ভয়ে ঢোঁক গিলিয়া কহিল, "কাশীর ভাড়া কত?"

লোকটি যেন এক পাক নাচিয়া লইল, তার পর কহিল, "কোথায় যাবে তাই এখনও ঠিক কর নি, খামকা ভাড়া জিগ্গেস করতে এসেছ? এতগুলো লোক জবাব পাচ্ছে না তুমি মিছি মিছি ভিড় বাড়াচ্ছ কেন বাপু, স'রে যাও, আমাদের এখন রসিকতা করবার সময় নেই।"

সেইখানেই এক বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি কহিলেন, "বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছ বুঝি হে? কই এসতো এদিকে দেখি!"

ভয়ে অমলের কপালে ঘাম দেখা দিল। সে মৃদুস্বরে "আজ্ঞে না" বলিয়াই ভিড়ের মধ্যে সরিয়া পড়িল। তাহার পর মরিয়া হইয়া তিন-চারটি মেমসাহেবের মুখ নাড়া খাইয়া এবং বহু হিন্দুস্থানী বেয়ারার কনুই-এর গুঁতা খাইয়া পাটনা জংশনের টিকিটই একখানা কিনিয়া ফেলিল। কিন্তু গাড়ি কোথায় এবং কটায়? সে প্রশ্ন করিতে গেলেও আবার ওই রগ-চটা বাবুগুলির কাছে যাইতে হয়; কিন্তু তাহাতে সে একান্ত নারাজ। অগত্যা সে রেল কোম্পানির জামা পরা লোক দেখিয়া দেখিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম জনতিনেক লোকের কাছে জবাব পাওয়া গেল না বটে কিন্তু তাহার পরই একজন দয়া করিয়া বলিয়া দিল, চার নম্বরে যে গাড়ি আছে সেটি পাটনা জংশন পর্যন্তই যাইবে এবং ছাড়িবারও মাত্র আর আধ ঘণ্টা দেরি আছে।

এই প্রথম অমল হাওড়া স্টেশনে আসিয়াছে। এই বিপুল জনতা এবং বিরাট কোলাহলে তাহার মাথার মধ্যে যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতেছিল। এতবড় স্টেশন এই কলিকাতায় আছে তাহা এতদিন কলিকাতাতে থাকিয়াও সে কখনও অনুমান করিতে পারে নাই। খানিকটা বৃথা ঘুরিয়া আর একজনকে প্রশ্ন করিল, "মশাই চার নম্বর প্লাটফর্মটা কোথায় বলতে পারেন?"

সে একবার তাহার আপাদমস্তক চোখ বুলাইয়া লইল তার পর কহিল, "ওই ওদিকে। টিকিট কিনতে হবে না? দিন না কেটে এনে দিই। এই ভিড়ের মধ্যে আপনি কি কিনতে পারবেন? আমিও পাটনা যাব কিনা।"

এই আত্মীয়তার অর্থ অমল বুঝিল। এরূপ জুয়া-চুরির বহু বিবরণই সে শুনিয়াছে। সে মুচকি হাসিয়া কহিল, "না টিকিট আমার কেনা আছে; আপনি অন্য লোক দেখুন।"

সে কি ভাবিল কে জানে, হাসি চাপিতে চাপিতে চলিয়া গেল। অমল ভিড় ঠেলিয়া কোনও মতে চার নম্বরের গেট পর্যন্ত পৌঁছিল, কিন্তু খাঁচার মত দ্বারের মধ্য দিয়া পার হইতে গিয়া ভয়ংকর গোলমাল বাধিল। পিছন হইতে একটি অর্বাচীন হিন্দুস্থানী ধাক্কা দিয়া সামনে ঠেলিয়া দিল। ফলে সামনের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। খিঁচাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "চোখে দেখতে পাও না ছোকরা?" মানুষের গায়ের ওপর এসে পড় কেন? তুমি টিকিট কিনেছ, আমরা কিনি নি?"

ভদ্রলোক ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়াই আস্ফালন করিতে লাগিলেন, ফলে পিছন হইতে আরও ধাক্কা আসিতে লাগিল অমলের উপর, সে কোনও মতে তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া এক ফাঁক দিয়া গলিয়া ভিতরে গেল বটে, কিন্তু কিছু দূর গিয়াই বুক পকেটে হাত দিয়া দেখিল, যে টাকা কয়টি নাই, ইতিমধ্যেই কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল, ললাটে ঘাম দেখা দিল। ভাল করিয়া সব পকেটগুলি দেখিল। পাশের পকেটে খুচরা পয়সাগুলি ছিল, গুনিয়া দেখিল সেই তের আনা পয়সাই আছে। হাতের মধ্যে টিকিটটি ধরা ছিল বলিয়া সেইটি বাঁচিয়া গিয়াছে।

যে পথে সে প্লাটফর্মে ঢুকিয়াছিল সেই পথটি তন্ন তন্ন

করিয়া খুঁজিল, যদি কোথাও পড়িয়া গিয়া থাকে। ফটকের কাছে গিয়াও ভিড়ের মধ্যে যতটা সম্ভব পায়ের ফাঁক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। অহার পর ব্যাকুলভাবে ঠিক পাশেই যে টিকিট কলেক্টারটি ছিল, তাহাকে কহিল, "আমার পকেট মারা গেছে, এইমাত্র।"

সে একটুও বিচলিত না হইয়া প্রশ্ন করিল, "কত ছিল?"

অমল জবাব দিল, "পাঁচ টাকা।"

সে তাচ্ছিল্যের সুরে কহিল, "ও সরি। সাবধান করে রাখতে না পারলেই যায়।"

আর একটি টিকিট কলেক্টার ইতিমধ্যে আসিয়া জুটিল। তার পর আও একটি।

"কি হয়েছে সান্ডেল?"

আগেকার টিকেট বাবুটি জবাব দিল, "এঁর পকেট মারা গেছে।"

"কত টাকা?"

"পাঁচ টাকা।"

প্রশ্নকর্তা একবার অমলের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া কহিল, "নতুন বুঝি কলকাতায়?"

অমল কতকটা ভয়ে ভয়ে জবাব দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা হলে হবেই। ওরকম হামেশাই হচ্ছে, একটু সাবধান রাখতে হয়, টাকাকড়ি।"

তৃতীয় ব্যক্তিটি চুপ করিয়াছিল এতক্ষণ, এইবার আড়-চোখে চাহিয়া বলিয়া বসিল, "টাকা ছিল তো পকেটে?"

সান্ডেল কৃত্রিম ভর্ৎসনার স্বরে জবাব দিল, "ওয়েল ওয়েল, দ্যাট্স ব্যাড।"

"ভদ্রলোক টিকিট কিনেছেন দেখছ, টাকা ছিল না বলতে চাও? যাই হোক ইফ ইউ লাইক, পুলিসে ইনফর্ম করতে পারেন, তবে তাতে যে ফল হবে, এমন কোনও অ্যাশুর‍্যান্স দিতে পারি না।"

অমল সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। পুলিসে সংবাদ দিলে ফল যে কি হইবে তা তাহার জানাই ছিল, মিছামিছি পাটনার ট্রেণটিও হয়তো চলিয়া যাইবে। ইহারই মধ্যে ফিরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনাটা সে মনে মনে ভাবিয়া লইল; কিন্তু মেসের ম্যানেজারের ক্রুদ্ধ মুখ, অন্যান্য অধিবাসীদের বিদ্রূপের দৃষ্টি মনে পড়িয়া সে চিন্তা সে একেবারেই ত্যাগ করিল। তা ছাড়া খাইবেই বা কি? আরও এক মাস কাটিবার পূর্বে মাহিনা পাইবার সম্ভাবনা নাই! ভিক্ষা যদি করিতে হয় বিদেশে গিয়া করাই ভাল।

অগত্যা সে অবসন্ন মনে ট্রেণের দিকেই অগ্রসর হইল। কিন্তু ট্রেণের অবস্থা দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল। থার্ড ক্লাস কামরাগুলি মানুষে ও মালে বালিসে তুলা ঠাসার মত বোঝাই হইয়া আছে; এবং প্রত্যেক গাড়ির দ্বারের সামনে তখনও রীতিমত মারামারি চলিতেছে। সে এদিকের ট্রেণে কখনও আসে নাই, নহিলে বুঝিত যে যতগুলি লোক যাইবে, ঠিক ততগুলি কিংবা আরও বেশী লোক তাহাদের তুলিয়া দিতে আসিয়াছে, সুতরাং কোনও রকমে পথের গন্ডীটা ছাড়াইতে পারিলে ভিতরে বসিবার স্থান মিলিতে পারে।

অবশ্য সে যে কোথাও উঠিবার চেষ্টা করিল না, তাহা নয় কিন্তু কোথাও বপুমান পাঞ্জাবী, কোথাও ষণ্ডামর্ক হিন্দুস্থানী, কোথাওবা হাফপ্যাণ্ট পরিহিত বাঙালীরা পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কোনও অর্বাচীন উঠিবার চেষ্টা মাত্র করিলেই তাঁহারা চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া বলিতেছেন, "আরে, কাঁহা উঠতা হয়, দেখতা নেই হামলোক খাড়া হোকে যাতা হয়?"

কেহ হয়তো বিনয় করিয়া বলিতেছে, "থোড়া উঠনে দিজিয়ে, হামলোক খাড়া হোকে জায়গা।"

তাহার জবাবে ধাক্কা দিয়া তাহাদের সরাইয়া দিয়া জানানো হইতেছে যে, খাড়া হোনেকো ভি জায়গা নেহি, কেয়া বাউরা আদমী হয় ই সব! বাত [illegible]।

যাহারা কোনও [illegible] করিতে পারিতেছে তাহারা গাড়িতে [illegible] যাইতেছে এবং প্রবেশ পথ রো[illegible]জটি[illegible]ত হইতে বুঝিয়া লইয়া কিছুক্ষণ পূর্বেকার সমধর্মীদের চক্ষু দ্বিগুণ রক্তবর্ণ করিয়া তাড়না করিতেছে।

যাহাই হউক, বার চারেক সমস্ত ট্রেনের সামনেটা ঘুরিয়া আসিয়া প্রায় ট্রেন ছাড়িবার পূর্ব মুহূর্তে একটা গাড়িতে সে মরিয়া হইয়া উঠিয়া পড়িল।

সামনের লোকগুলি যথারীতি হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। কেহ কহিল, "দরজাটা খুলতে দিলে কেন?" কেহ কহিল, "ওধারে দেদার গাড়ি খালি পড়ে আছে, সেখানে কেউ যাবে না!" কেহবা বলিল, "চড়ছেন কোথায় মশাই, মাথার ওপর বসে যাবেন?" কেহ বিশুদ্ধ হিন্দী বাত ছাড়িল, "নিকাল দেও না উসকো।"

কিন্তু অমল তখন উঠিয়া পড়িয়াছে। কোনও রকমে কনুইএর গুঁতা দিয়া উঠিয়া ঠেলিয়া-ঠুলিয়া একটু জায়গা করিয়া লইয়া সে দাঁড়াইল। ততক্ষণে ট্রেনও ছাড়িয়া দিয়াছে। কামরাটি বড়, সেই অনুপাতে লোকও কম নয়। ওধারের দুটি বেঞ্চের মাঝে খানিকটা জায়গা মাল বোঝাই করিয়া তাহার উপর বিছানা বিছাইয়া জনকতক মারোয়াড়ী মহিলা পুত্র-কন্যা লইয়া বসিয়াছেন। সকলেরই মুখে ঘোমটা কিন্তু বুক ও পেটের অনেকখানিই অনাবৃত। তাঁহাদের পুরুষগুলি বেঞ্চি দুইটির সামনের দিকে বসিয়া মহড়া সামলাইতেছেন, অর্থাৎ ভিতরের স্থানে কেহ যাহাতে নজর না দেয় সে সম্বন্ধে নানা প্রচেষ্টা করিতেছেন। তিন চারিটিতে মিলিয়া বৃদ্ধ যুবা নির্বিশেষে গাঁজা খাইতেছে এবং অবিরাম বকিতেছে। কামরার মধ্যে অন্য অধিবাসী আছে কি না এবং কি তাহাদের অবস্থা সে সম্বন্ধে কোনও দুশ্চিন্তা তাহাদের নাই, প্রত্যেকেই অপরকে নিজের বক্তব্য দ্রুত কণ্ঠে বলিয়া যাইতেছে।

তাহাদের পাশের বেঞ্চ জোড়াটিকে কয়েকটি গুজরাটি মালপত্র লইয়া বহু আগে হইতে দখল করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি কাবুলী হুড়মুড় করিয়া তাহাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; ফলে একজনের রসগোল্লার হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে এবং আর একজনের ফাইবারের সুটকেস যে আকৃতি ধারণ করিয়াছে তাহার বর্ণনা না করাই ভাল। উভয়পক্ষই হিন্দীতে ঝগড়া চালাইতে গিয়া বিপন্ন হওয়ায় বিবাদটা প্রায় হাতাহাতির কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এধারের ছোট বেঞ্চগুলির দুইটিতে কয়েকটি পশ্চিমা মুসলমান প্রচুর মালপত্র এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময় মলিন কাপড়-চোপড় লইয়া উঠিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই একটা ন্যাকড়া বিছাইয়া খবরের কাগজে জড়ানো মোটা রুটি কাঁচা রসুন সহযোগে খাইতে শুরু করিয়াছে। আর দুটিমাত্র বেঞ্চির একটিতে গুটি দুই শিখ ও জনদুই সাঁওতাল অতিকষ্টে ঠাসাঠাসি করিয়া কোনও মতে বসিয়াছে এবং আর একটি একজন বাঙালী ভদ্রলোক স্ত্রী ও কন্যা লইয়া দখল করিয়াছেন। মধ্যের স্থানটি গমনাগমনের, একে মাল বোঝাই তাহার উপর জন পাঁচ ছয় বাঙালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ভিতরের আবহাওয়াকে অন্ধকূপ করিয়া তুলিয়াছেন।

বলা বাহুল্য গা[illegible] তাহার আভ্যন্তর অবস্থাটা দেখিয়া লইতে অম[illegible]গল না। কাবুলীদের গাত্রবাসের সৌ[illegible] গন্ধ সমস্তটা মিলিয়া ভিতরের[illegible] এমন[illegible]রিয়া তুলিয়াছে যে, মিনিটখানেকের মধ্যেই তাহার গা বমি বমি করিতে লাগিল। সে বারকতক এদিক ওদিক চাহিয়া নড়িবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া ঠিক দ্বারের পানেই বাঙালী ভদ্রলোকটির বেঞ্চে যে ইঞ্চি তিনেক স্থান ছিল সেইখানে কোনওমতে অঙ্গ ঠেকাইয়া বসিয়া পড়িল।

ভদ্রলোক গৃহিণীকে কোণ দিয়া মেয়েটিকে মধ্যে শোয়াইয়া নিজে শেষের দিকে বসিয়া বেঞ্চটাকে একরম রিজার্ভ করিয়াই লইয়াছিলেন; সহসা এই উপদ্রবে তিনি দারুণ চটিয়া গেলেন। মুখ চোখ রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, "কি রকম অসভ্য লোক হে তুমি ছোকরা? বলা কওয়া নেই, ভদ্রলোকের মেয়েছেলেদের ঘাড়ের ওপর এসে বস?"

অমল যদিও হাওড়া স্টেশন এবং পশ্চিমের গাড়ি ইতিপূর্বে কখনও চোখে দেখে নাই, তাহার হতভম্ব হইয়া যাওয়ারই কথা, কিন্তু গত এক ঘণ্টাকালে উপর্যুপরি লাঞ্ছনায় সে মরিয়া হইয়া গিয়াছিল, ইতিমধ্যেই বুঝিয়াছিল যে, এই কঠিন স্থানে বিনয়ের ঠাঁই নাই, এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় চোখ রাঙানির জোরে।

সে জবাব দিল, "আপনি কি মেয়েছেলে? কই সে রকম তো মনে হয় না।"

ভদ্রলোক প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, উচ্চৈঃস্বরে জবাব দিলেন, "কী আমাকে আবার ঠাট্টা? ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জান না? এ বেঞ্চে মেয়েছেলে নেই?"

অমল এবার রীতিমত ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, "মেয়েছেলে আছে তো কি হয়েছে? তাকে আড়াল করে আপনি তো বসে আছেন। তাতেও কি ছোঁয়াচ লাগে? অতই যদি সম্ভ্রম বোধ তো মেয়ে গাড়িতে দেন নি কেন?"

ভদ্রলোক রাগের চোটে এবার তোৎলা হইয়া গেলেন, "কহিলেন, তু—তুমি কার স—সঙ্গে ক—কথা কইছ, জান? অসভ্য, জানোয়ার কোথাকার!"

অমল জবাব দিল, "তা জানিনে, তবে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই নন! আপনি আমাকে 'তুমি' বলেন কোন্ সাহসে? আমিও থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনেছি আপনিও তাই। আমি আপনার কাছে ভিক্ষেও চাই নি, চাকরিও করি না, তবে কোন্ অধিকারে আমায় 'তুমি' বলছেন শুনি?"

গাড়ির লোকেরা মজার গন্ধ পাইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। এমন কি ওধারের গুজরাটী ও কাবুলীর বিবাদও যেন এই গোলমালে দ্রুত মিটিয়া আসিল। ভদ্রলোকটি কিন্তু এইবার কিছু দমিয়া গেলেন। সহসা তাঁহার মুখে কথা জোগাইল না, প্রায় মিনিটখানেক অমলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি অন্য পথ ধরিলেন, কহিলেন, "জান আমি বঙ্গবাসী কলেজের প্রফেসর?"

অমল কখনও বঙ্গবাসী কলেজের অঙ্গণে পর্যন্ত পা দেয় নাই, কিন্তু কি রকম তাহার মাথায় রোখ চাপিয়া গেল কে জানে সে জোর করিয়া কহিল, "মিছে কথা। আমি নিজে বঙ্গবাসী কলেজে পড়ি, আপনাকে সেখানে কখনও দেখি নি।"

সে ভদ্রলোক এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, ভাবিয়াছিলেন যে, এতবড় কথার পরে আর ছোঁড়াটা কথা কহিতে পারিবে না। এইবার তিনি রীতিমত নরম হইয়া গেলেন। একটু পরে ঢোক গিলিয়া কহিলেন, "আমি ঠিক নই, তবে আমার দাদার ভায়রা ভাই ও কলেজে পড়ায় এটা তো সত্যি কথা!"

অমল অতিকষ্টে হাসি দমন করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনিও আর কথা কহিলেন না।

গাড়ি হু হু করিয়া একটির পর একটি স্টেশন ফেলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহারই মধ্য দিয়া বাঙলার বাঁশঝাড়, কুটীর ও পানাপুকুরের যেটুকু ছবি চোখে পড়িতেছিল, অমল একদৃষ্টে তাহা যেন পান করিতেছিল। দেশ ছাড়িবার পর বহু দিন এ দৃশ্য আর তার নজরে পড়ে নাই, আজ এতদিন পরে যদিবা তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, নিজের অবস্থার কথা। সহায়-সম্বলহীন হইয়া সে অকূলে ভাসিল, বহুদিন হয়তো বা চিরকালেরই জন্য সে এই চিরপরিচিত বাঙলাদেশকে ছাড়িয়া চলিল; হয়তো আর কখনই এই সবুজ কলাগাছের পাতা, এই নারিকেলের বন এই নিবিড় শ্যামলতা সে এমন করিয়া দেখিতে পাইবে না।

[৪]

বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বোধ করি তন্দ্রাই আসিয়াছিল সহসা চমক ভাঙিল পাশের ভদ্রলোকটির ডাকে।—

"ও মশাই, শুনছেন?"

মশাই? তবে কি সে ভুল শুনিতেছে? অমল বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, জবাব দিতে পারিল না।

তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "রাগের মাথায় কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি ভাই, রাগ করবেন না যেন।"

অমলের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না; কিন্তু তবুও সে যতদূর সম্ভব মনোভাব দমন করিয়া সৌজন্য দেখাইয়া কহিল, "না না, সে কি কথা। ও-সব মনে ক'রে সঙ্কোচ বোধ করবেন না।"

তিনি গলার স্বর অকারণে খাটো করিয়া কহিলেন, "আমার নাম শ্রীভবেশচন্দ্র দাস ঘোষ, মহাশয়ের নাম?"

অমল নাম বলিল। তিনি কহিলেন, "ব্রাহ্মণ? প্রাতঃপ্রণাম। আপনার বসতে বোধ হয় খুবই কষ্ট হচ্ছে. একটু স'রে এসে ভাল ক'রে বসুন!"

বলা বাহুল্য, অমল এ সুযোগের অসদ্‌ব্যবহার করিল না। সে যতটা স্থান অধিকার করিয়া বসা সম্ভব, ততটই দখল করিল। একটু পরে ভবেশবাবু কহিলেন, "কত দূর যাওয়া হবে?"

"পাটনা। আপনি?"

"আমি যাব দারভাঙ্গা। মোকামাঘাটে নামব। সেখানে আমার মামাশ্বশুর থাকেন, মহারাজের দপ্তরের বড় চাকরে।

অমল বুঝিল এইদিকে তাহার একটু দুর্বলতা আছে: সে চুপ করিয়া রহিল এবং মনে মনে প্রাণপণে ভবেশবাবুর ভাব পরিবর্তনের কারণ চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ তাহাকে ভাবিতে হইল না, একটু পরে ভদ্রলোক নিজেই কারণটা ব্যক্ত করিলেন। গলা নীচু করিয়া চুপিচুপি কহিলেন, "আচ্ছা, ওই কাবলীগুলো কিরকম ক'রে চাইছে দেখেছেন আমার দিকে? ওরা ডাকাত নয়তো?"

অমল বিস্মিত হইয়া জবাব দিল, "ডাকাত? ডাকাত কেন হবে? আর হ'লেই বা আপনার দিকে বিশেষ ক'রে চাইবে কেন?"

তিনি আরও ফিসফিস করিয়া কহিলেন, "কারণ আছে; আমার কাছে অনেকগুলো টাকা রয়েছে, প্রায় চারশ' টাকা।"

অমল মৃদু হাসিয়া কহিল, "চার শ' টাকার জন্যে কেউ ডাকাতি করে না, অন্তত ট্রেনে।"

"না, করে না! জানেন, পঁচিশটা টাকার জন্যে ডাকাতি করে?"

আর কথা না বাড়াইয়া অমল কহিল, "তা ছাড়া আমরা একগাড়ি লোক রয়েছি, ডাকাতি অমনি করলেই হ'ল?"

ভবেশবাবু অগত্যা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু একটু পরেই আবার কহিলেন, "এক্সারসাইজ করেন?"

অমল কহিল, "না। কিন্তু এমনিই গায়ে যথেষ্ট জোর আছে।"

"ছাই আছে! ও জোরে কিছু হয় না। পারবেন কাবলের সঙ্গে লড়াই করতে? ওই ক'রেই তো বাঙালী জাতটা মরতে বসেছে।"

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ! তার পর সহসা বাহুমূলে সজোর চিমটি খাইয়া অমল সচকিত হইয়া উঠিল। ভবেশবাবু ফিসফিস করিয়া কহিলেন, "মশাই, সামনের বেঞ্চির মোচলমানগুলো কি ক'রে চাইছে এদিকে দেখছেন? নিশ্চয় ওদের ওই কাবলেগুলোর সঙ্গে ষড় আছে।

ওপাশের বেঞ্চির মুসলমানগুলি সত্যই এদিকে চাহিতেছিল, কিন্তু সে ভবেশবাবুর জন্য নয়। ভবেশবাবুর দিকেই বর্ধমান স্টেশনের প্লাটফর্ম পড়িয়াছিল, তাহাদের দৃষ্টি ছিল প্লাটফর্মের উপর অসংখ্য ফেরিওয়ালার খাদ্য-সম্ভারের দিকে।

অমল সেই কথাই ভবেশবাবুকে বুঝাইতে গেল। কিন্তু তিনি তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে যখন সত্যসত্যই তাহারা জনতিনেক একটা মিঠাইওয়ালা ডাকিয়া যাত্রী মারফৎ মিহিদানা কিনিল, তখন তিনি অগত্যা চুপ করিলেন।

ক্রমশ রাত্রি গভীর হইল, গাড়ি শুদ্ধ সব ঢুলিতে শুরু করিয়াছে, অমলও বসিয়া বসিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; গাড়ি কখন যে আসানসোলের কাছাকাছি আসিয়াছিল, তাহা সে টের পায় নাই, সহসা এক প্রবল ঝাঁকুনিতে সে উঠিয়া বসিল, এবারেও ভবেশবাবু!

"মশাই দেখছেন একবার কাণ্ডখানা! সবাই ঘুমুচ্ছে, আর ও ব্যাটা ড্যাব ড্যা[illegible] রয়েছে আমার দিকে। তবু আপনি বলবে[illegible]য়?"

অমল চা[illegible] একটি কাবলীর বোধ করি ঘু[illegible]াই, [illegible]দেরই দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। এবার সে বিরক্ত হইয়া কহিল, "কেন মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন আপনি; বলছি তো যে ডাকাতি করা অত সহজ নয়!"

ভবেশবাবু তাহার ঝাঁজ লক্ষ্য করিয়া আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু সেটা যে ক্ষণিক, তাহা অল্পক্ষণ পরেই বোঝা গেল। ততক্ষণে আসানসোল স্টেশনে গাড়ি আসিয়াছে, ভবেশবাবু প্লাটফর্মের দিকে মুখ বাহির করিয়া একাগ্র-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। একটু পরেই একজন টিকিট কলেক্টরকে দেখিয়া রীতিমত চেঁচামেচি করিয়া উঠিলেন, "ও মশাই শুনছেন, ও মশাই—"

টিকিট কলেক্টরটি কাছে আসিতে কহিলেন, "মশাই এ গাড়িতে একদল ডাকাত যাচ্ছে, পুলিশে ইনফর্ম করুন।"

টিকিট কলেক্টর ভদ্রলোক অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ডাকাত? বলেন কি! কি ক'রে জানলেন? কিছু নিয়েছে?"

ভবেশবাবু কহিলেন, "নেয় নি কিছু, কিন্তু নেবার চেষ্টা করছে। আমার কাছে অনেকগুলো টাকা আছে, সেই-জন্য ওরা দল পাকিয়ে এই গাড়িতেই উঠেছে, বার বার আমার দিকে চাইছে, আর নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে।"

টিকেট কলেক্টর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অমলের দিকে চাইতে সে ভবেশবাবুর অলক্ষ্যে নিজের মাথাটা দেখাইয়া দিল। তিনি ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "থাক এখনও কিছু নেয়নি তো? আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন. ডাকাতি যখন করবে, তখন গার্ডকে জানাবেন কিম্বা পরের স্টেশনের মাস্টারকে—চাইকি চেন ধ'রেও টানতে পারেন।"

তিনি চলিয়া গেলেন। ভবেশবাবু কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, "সব ব্যাটাদের নামে রিপোর্ট ক'রে দেব। তা নইলে জব্দ হবে না। পাবলিকের টাকা খেয়ে পাবলিককেই হেনস্তা—?"

অমল এবার তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া পুনরায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল। এবার ঘুম ভাঙ্গিল একেবারে মোকামা-

ঘাটে। তখন সকাল হইয়াছে, ভবেশবাবু মালপত্র বারবার গুনিয়া মুটের মাথায় চাপাইতেছেন। চারিদিকে কোলাহল, বহু লোক নামিতেছে, উঠিতেছে। ভবেশবাবুরও রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যেন ভয় ডর সব চলিয়া গিয়াছে; তিনি প্রচুর হাঁক ডাক করিতেছেন। অমল চোখ মেলিয়া চাহিতেই একেবারে আত্মীয়তার সুরে কহিলেন, "তুমি এবার বেশ হাত-পা মেলে ব'স ভাই, সারা রাত কষ্ট হয়েছে।"

তাহার পর সহসা ফিরিয়া কহিলেন, "পাটনায় কি জন্যে যাচ্ছ বললে না তো?"

অমল একটুখানি ইতস্তত করিল, তাহার পর কথাটা বলিয়াই ফেলিল, "আজ্ঞে, কাজকর্মের চেষ্টায়।"

তখন ভবেশবাব [illegible] পড়িয়াছেন। তিনি মুখ ফিরাইয়া কহিলে [illegible] দমকুঁয়ায় আমার এক ভায়রা আছেন [illegible] র, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পা [illegible] তাঁর [illegible]

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। ততক্ষণে তাহার কামরা অনেক খালি হইয়া গিয়াছে; হাত-পা মেলিয়া সে শুইয়া পড়িল। বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া তাহার মেরুদণ্ডে যন্ত্রণা শুরু হইয়াছে, হাত-পা কনকন করিতেছে,—শুইয়া একটু আরাম হইল বটে, কিন্তু ঘুম আর আসিল না। গত রাত্রের সামান্য খাদ্য বহুক্ষণ পরিপাক হইয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় এখন যেন তাহার নাড়ীতে পাক দিতেছে। কিন্তু পকেটে সামান্য কয়েক আনা পয়সা সম্বল, খাবার কিনিয়া খাইতে তাহার সাহস হইল না। পাটনায় গিয়া কোথায় আশ্রয় পাইবে, কত দিনে পাইবে কিছুই জানা নাই, কোনও পরিচিত লোক পর্যন্ত সেখানে নাই। কাজ যদি না জোটে তো সত্যসত্যই ভিক্ষা করিতে হইবে, কিম্বা শেষ পর্যন্ত নাটকীয়ভাবে আত্মহত্যা।

এমনিই সব এলোমেলো কথা ভাবিতে ভাবিতে কোন্ এক সময়ে দেখা গেল গাড়ি পাটনা জংশনে আসিয়া থামিয়াছে। অমলের এই প্রথম বিদেশে আসা নয়, কলিকাতায় যেদিন প্রথম আসে, সেদিনই সে অভিজ্ঞতা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও সে খানিকটা বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। চারি-দিকের এই অপরিচিত জনতা আজ তাহার চোখে একান্ত নির্মম বলিয়া মনে হইল। ইহাদের কাছ হইতে কোনও প্রকার দয়া মায়া পাইবার আশা যেন তাহার নাই।

মিনিট পাঁচেক পরে সে অবশিষ্ট যাত্রীদের পিছনে পিছনে পুল পার হইয়া স্টেশনের বাহিরে আসিল। তার পর এক্কাওয়ালা ও বাসওয়ালাদের ভিড় ঠেলিয়া শেষ পর্যন্ত শহরেও পৌঁছিল। জন তিন-চার লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া কদমকুঁয়ার পথ ঠিক করিয়া জানিয়া লইল। সেখানে গিয়াই যে কি করিবে, কোথায় কাহার কাছে কি সাহায্য চাহিবে, সে ধারণা তাহার মাথার মধ্যে ছিল না—কিন্তু তবুও এই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে যাহা হউক একটিমাত্র লোকের সন্ধান যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন সেইটিকেই সে প্রাণপণে অবলম্বন করিল।

কদমকুঁয়ার ভুবনবাবুর বাসা খুব অপরিচিত নহে, একটি ভদ্রলোককে প্রশ্ন করিবামাত্র তিনি বলিয়া দিলেন। সে কম্পিতবক্ষে বাড়িটির বাহিরে আসিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। সাধারণ একটি দোতলা বাড়ি, সম্মুখে একটুখানি মাত্র হাতা। কিন্তু ইতস্তত করা তাহার সেজন্য নয়, বাগানের সামনেই বারান্দায় খুবসম্ভব গৃহস্বামী বসিয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। প্রথমে গিয়াই কি বলিবে, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না। অন্য কোনও সাহায্যের কথা বলিবে না সোজা-সুজি চাকরির কথা পাড়িবে, মিনিট খানেক সেই কথা চিন্তা করিয়া শেষে একপ্রকার মরিয়া হইয়াই ঢুকিয়া পড়িল।

অত্যন্ত ক্ষীণজীবী একটি ভদ্রলোক, দেখিলেই মনে হয়, বছর ত্রিশেকের ডিসপেপসিয়া তাঁহার দেহে পোষা আছে, নাকে চশমা লাগাইয়া একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া কাগজ পড়িতেছেন। অমল শুষ্কমুখে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইবামাত্র তিনি কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কোন্ সাবজেক্টে ফেল করেছ? এত দেরিই বা কেন?"

অমল প্রথমটা কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আজ্ঞে ফেল তো করি নি।"

ভুবনবাবু অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। কহিলেন, "ফেল কর নি কিরকম? একজামিনাররা সব অমনি অমনি ফেল করিয়ে দিলে বুঝি? হিংসে ক'রে?"

অমল আরও আশ্চর্য হইয়া গেল। বার-কতক ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "তাঁরাও ফেল করান নি তো!"

ভুবনবাবু ধমক দিয়া বলিলেন, "ইডিয়ট! তুমিও ফেল কর নি, একজামিনাররা ফেল করিয়ে দেন নি, তবে তুমি আবার ভর্তি হ'তে এসেছ কেন শুনি?"

অমল ঘামিয়া নাহিয়া উঠিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহার সৌভাগ্যক্রমে ওধারের চিকের পর্দাটা সরিয়া গিয়া প্রবেশ করিলেন, ভুবনবাবুর স্ত্রী। মাস্টার মহাশয় যেমন রোগা, তাঁহার গৃহিণী তেমনি মোটা। অমল মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, অন্তত সাড়ে তিন মনের কম হইবে না। গৌরবর্ণ, মুখশ্রী ভাল, চশমার মধ্য দিয়া চোখ দুটি ডাগরই দেখায়, কিন্তু বিপুল মেদভারে তাঁহার সমস্ত শ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভদ্রমহিলার ধোপদস্ত শাড়ির দিকে চাহিলে মনে হয় না যে, কখনও তিনি নড়িয়া কোনও কাজ করেন, কিন্তু গলার সুর তাঁহার সর্বদাই ক্লান্ত, কথা শুনিলে বোধ হয় সারাদিন ধরিয়া বিশ্বের সমস্ত কাজ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে ওই একটিমাত্র মানুষকে!

তিনি কহিলেন, তোমার যত বয়স বাড়ছে, তত ভীমরতি ধরছে নাকি? দুনিয়ার সব মানুষ কি তোমার কাছে আসে শুধু ইস্কুলের কাজ? খামকা একটি লোককে ধমকাচ্ছ কেন? কি কাজে, কেন এসেছে খোঁজ কর আগে! ......খালি ইস্কুল, আর ইস্কুল! তোমার ইস্কুলের জন্যে আমার আত্মহত্যা করতে হবে, এ আমি বেশ জানি!"

আঘাত পাইবামাত্র মুহূর্তে মধ্যে কচ্ছপ যেমন হাত-পা গুটাইয়া খোলার মধ্যে প্রবেশ করে, স্ত্রী বাহির হওয়া মাত্র

(শেষাংশ ৫৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এপিডেমিক ড্রপসি

শ্রীসতীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম এস-সি

[illegible] শতাব্দীর আরম্ভ হইতে বেরিবেরি বলিয়া [illegible] ভারতবর্ষে সংহারলীলা চালাইয়া আসিতেছে [illegible] বেরিবেরির নহে। এই রোগের স্বরূপ নির্ণয় [illegible] হইয়া বহু গবেষণা হইবার পর সম্প্রতি এই রোগকে [illegible] মিক ড্রপসি (শোথ রোগবিশেষ) বলাই স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এপিডেমিক ড্রপসি পুরাতন রোগ কিন্তু বেরিবেরি বহু প্রাচীন রোগ এবং ইহাদের লক্ষণে আংশিক সামঞ্জস্য থাকায় এপিডেমিক ড্রপসির প্রকৃত অস্তিত্ব ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরা পড়ে নাই। ১৮২৬ সালে রেঙ্গুন অধিকার করিবার পর ভারত সৈন্যদলের কতিপয় ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হয়। তাহাদের পা ফোলা, পেটের অসুখ, দাঁত হইতে রক্ত পড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখিয়া যদিও তাহাদিগকে স্কার্ভি রোগাক্রান্ত বলা হইয়াছিল কিন্তু পরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাকলিয়ড কর্তৃক এপিডেমিক ড্রপসির স্বরূপ নির্ণীত হইবার পর ১৮২৬ সালের আক্রমণ যে এপিডেমিক ড্রপসি দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে তাহা প্রমাণিত হয়। আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও এই রোগের উল্লেখ এবং প্রতিকারের বিধান আছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি অতি প্রাচীন রোগ বেরিবেরির সহিত ইহার রোগ-লক্ষণে সামঞ্জস্য থাকায় বেরিবেরির সহিত এপিডেমিক ড্রপসির ভেদ এতদিন ধরা পড়ে নাই। যদিও ১৮২৭ খৃষ্টাব্দেই এপিডেমিক ড্রপসি ও বেরিবেরি বিভিন্ন রোগ বলিয়া সন্দেহ করা হয় তথাপি ১৮৭৭ সালের পূর্বের চিকিৎসকমণ্ডলী ইহা মানিয়া লন নাই। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গার্ডেনরিচ প্রমুখ কলিকাতার দক্ষিণ শহরতলি অঞ্চলে এপিডেমিক ড্রপসির আক্রমণ প্রচণ্ডভাবে চলিতেছিল। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জন কর্নেল ম্যাকলিয়ড বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলিলেন যে, এই রোগ বেরিবেরি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

বেরিবেরির সহিত ইহার সামঞ্জস্য অপেক্ষা অসামঞ্জস্যই অধিক। এপিডেমিক ড্রপসির প্রধান উপসর্গ শোথ (dropsy)। রোগের প্রথমাবস্থায় প্রায়ই পেটের গোলমাল হয়। কাহারও হয় কোষ্ঠকাঠিন্য, কাহারও বা বাহ্য তরল হয়। সামান্য জ্বর, উত্তাপ সাধারণত ১০১ ডিগ্রির অধিক হয় না। সামান্য পরিশ্রম করিলে ক্লান্তি বোধ করা, সিঁড়ি দিয়া উঠানামা করিতে বুক টিপ টিপ করা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, দ্রুত নাড়ী চলা, রক্তহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ এপিডেমিক ড্রপসির প্রথম উপসর্গ। ইহার পরে পা ফুলিয়া ওঠে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, সকালের দিকে পা ফোলা প্রায় সারিয়া যায় এবং রোগী নিজেকে সুস্থ বোধ করে, কিন্তু বৈকালের দিকে পা ফোলা বৃদ্ধি পায়। পায়ের গোড়ালি হইতে হাঁটু অবধি ফুলিয়া ওঠে এবং তখন আঙ্গুল দিয়া জোরে পা টিপিলে আঙ্গুল বসিয়া বেশ একটি গর্ত হয় যাহা আঙ্গুল সরাইয়া লইবার অল্প পরেই বুজিয়া যায়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি পরে মুখ ও দেহের স্থানে স্থানে জ্বালা ও কণ্টক যন্ত্রণা বোধ করে। ইহা ব্যতীত অনেকের দেহে, বিশেষত সমগ্র মুখে, কৃষ্ণবর্ণ দাগ পড়ে এবং নাক, মুখ ও গুহ্যদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। এপিডেমিক ড্রপসি মানবদেহের জালক (capillaries) আক্রমণ করে এবং রোগের শেষাবস্থায় চক্ষুরোগ হয়। ইহাকে 'গ্লকোমা' বলে এবং ইহার সূত্রপাতে আলোর দিকে তাকাইলে তাহার চতুপার্শ্বে বহু চক্রবৎ মণ্ডল দেখা যায়। চিকিৎসার অভাবে এই গ্লকোমা হইতে বহু ব্যক্তি চিরজীবনের মত অন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বেরিবেরি ও এপিডেমিক ড্রপসির মধ্যে অসামঞ্জস্যের প্রথম প্রমাণ হইতেছে, বেরিবেরি রোগীর নার্ভ আক্রমণ করিয়া তাহাকে একেবারে চলনশক্তি রহিত করিয়া ফেলে এবং সাধারণত ইহা খাদ্যে ভিটামিন Bএর অভাব জন্য হইয়া থাকে। এইজন্য বেরিবেরিকে ভাইটামিনের অভাবজনিত রোগ বলা হয়। কিন্তু এপিডেমিক ড্রপসি খাদ্যের অভাবজনিত রোগ নহে এবং ইহা রোগীর নার্ভের পরিবর্তে রোগীর জালক (Capillaries) আক্রমণ করিয়া রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়। বেরিবেরি মাংসপেশী আক্রমণ করিয়া রোগীকে চলনশক্তিরহিত করে ও রোগীর হাতে পায়ে অসহ্য বেদনা থাকে। এপিডেমিক ড্রপসি একমাত্র মনুষ্য জাতি ব্যতীত অন্য কোনও প্রাণীকে আক্রমণ করে না এবং ছোট শিশুরা ইহার আক্রমণ হইতে মুক্ত। বেরিবেরি সকল প্রাণীতেই, সকল বয়সেই হই[illegible] ইহা ব্যতীত এপিডেমিক ড্রপসির সাধারণ উপসর্গ [illegible] (gastro intestinal irritatio[illegible] রক্তস্রাব, চক্ষুরোগ প্রভৃতি বেরিবে[illegible] না।

বেরিবেরি দু[illegible] প্রকার: শুষ্ক [illegible] সরস। শুষ্ক বেরিবেরিতে আক্রান্ত ব্যক্তির অবয়ব একেবারে শুকাইয়া বিকৃত ও বিবর্ণ হইয়া যায়। একমাত্র সরস বেরিবেরির সহিত এপিডেমিক ড্রপসির সামান্য সামঞ্জস্য আছে। ইহাতে রোগীর হাত-পা ফুলিয়া ওঠে ও জ্বর থাকে; কিন্তু সেই ফোলা সকল সময়ই এপিডেমিক ড্রপসিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মত কমে বাড়ে না, একভাবে থাকে। ইহা ছাড়া বেরিবেরি রোগীর হাত পায়ে অসহ্য বেদনা থাকে, যাহা এপিডেমিক ড্রপসির রোগীতে প্রায়ই অবর্তমান থাকে। এপিডেমিক ড্রপসির রোগী সকালের দিকে নিজেকে সুস্থ ও কার্যক্ষম মনে করে, কিন্তু অপর ক্ষেত্রে রোগী রোগাবস্থায় সকল সময়েই অসুস্থ ও অচল হইয়া থাকে।

এপিডেমিক ড্রপসি যদিও প্রাচীন রোগ, কিন্তু অনেকের মতে কলিকাতায় ইহার প্রথম আবির্ভাব হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় সেখানে এই রোগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। বহু লোক সে সময় মাদ্রাজ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে অনেকে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজে গমন করে। এই পরস্পর গমনাগমনের ফলে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে এই রোগ, মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার পরই ঢাকা, শিলঙ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, খাসিয়া পাহাড় এবং আসাম ও বাঙলার অন্যান্য স্থান হইতে এপিডেমিক ড্রপসির আক্রমণবার্তা আসিতে থাকে এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে হয় ইহার প্রথম আবির্ভাব। তখন হইতেই এই রোগ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

এপিডেমিক ড্রপসি যখন ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষ ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তখন চিকিৎসকমণ্ডলী ইহার নামকরণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাকলিয়ড যদিও প্রচার করিলেন, এই নূতন রোগটি বেরিবেরি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু কি যে ইহার নাম, তাহা তিনি বলেন নাই। সুতরাং এই রোগের নাম হইল 'নবরোগ' বা নূতন ভারতীয় রোগ। এই রোগের প্রধান উপসর্গ শোথ বলিয়াই পেইন, ক্রম্বী, স্মিথ, ডেবিন প্রভৃতি ইহাকে acute edema বলিয়া অভিহিত করিলেন, কিন্তু ও'ব্রায়নের মতে ইহাকে acute dropsy বলাই সমীচীন বোধ হইয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে চামবারস ইহাকে epidemic fever বলিয়া প্রচার করিলেন, অথচ স্মিথ বলিলেন, ইহা lymphatic fever। ইহার পর আসিল famine fever, famine edema ও famine dropsy নাম। শেষ পর্যন্ত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কর্নেল

ম্যাকলিয়ডেরই কৃত নাম 'এপিডেমিক ড্রপসি' বা ব্যাপক শোথ রোগ নাম স্থির হয়।

নাম স্থির হইলেও রোগের কারণতত্ত্বের কিছুই জানা গেল না। তন্ন তন্ন করিয়া গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে, এপিডেমিক ড্রপসি প্রধানত ভারতীয় রোগ। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহার প্রীতি যেন বাঙলা দেশ ও বাঙালীর উপরে অধিক।

বঙ্গদেশের কলিকাতা, হাওড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, দার্জিলিং, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, বর্ধমান, চব্বিশপরগনা, রংপুর, ফরিদপুর, যশোহর, বরিশাল, খুলনা, রাজশাহি, নদীয়া, মালদহ প্রভৃতি সকল স্থানেই ইহার আধিপত্য একচেটিয়া। ইহা ব্যতীত আসাম প্রদেশস্থ শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ, শিলং, গৌহাটি, খাসিয়া পাহাড়, বিহারের ধান[illegible] [illegible]পুর, দেওঘর, ঘাটশীলা, পুরুলিয়া, পাটনা, [illegible] [illegible]য়া এবং যুক্তপ্রদেশস্থ বারানসী, এলাহাবাদ [illegible] [illegible] স্থান হইতেও এপিডেমিক ড্রপসি [illegible] যায়। বোম্বাই মাদ্রাজ ও নাগপুরে [illegible] হাত [illegible] তার পায় নাই। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, বঙ্গদেশ বা ইহার বাহিরে যে স্থানেই বাঙালী থাক না কেন, তাহারাই প্রধানত এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের বাহিরে ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ ও মরিটিয়াস দ্বীপেও একমাত্র বাঙালী সমাজই ইহার কবলিত হইয়াছে।

স্যানিটারি কমিশনার গ্রেগ বলিয়াছেন, যদিও কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে বাঙালী ও মারোয়াড়ী পাশাপাশি বাস করে, তথাপি এপিডেমিক ড্রপসি একমাত্র বাঙালীদেরই আক্রমণ করে। এই রোগ যেন বাঙালীর নিজস্ব সম্পত্তি। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত অবস্থাসম্পন্ন পরিবারই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয় বেশী। এই রোগের আর এক বিশেষত্ব এই যে, ইহা সারা বৎসর ধরিয়াই আক্রমণ চালাইয়া থাকে এবং ইহা কোনও স্থানের জলবায়ু, আবহাওয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

এখন প্রশ্ন এই, একমাত্র বাঙালী জাতিকেই এই রোগ আক্রমণ করে কেন এবং ইহার কারণ কি। দেখা গিয়াছে, বাঙালী যে স্থানেই যাইয়া বসবাস করুক না কেন, তাহাদের খাদ্য-প্রণালীর পরিবর্তন সাধন না করিলে, তাহারা প্রায়ই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ম্যাককনেল, ও'ব্রায়ান প্রভৃতির মতে এই রোগ খাদ্যদ্রব্যে পুষ্টিকর অংশের অভাবের জন্যই হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালীর খাদ্যে ক্যালসিয়ম, ফসফরাস ও প্রধান প্রধান খাদ্যপ্রাণের (vitamins) অভাব থাকে। কিন্তু অল্পদিন পরেই ও'ব্রায়ান মত পরিবর্তন করিয়া বলিলেন, এপিডেমিক ড্রপসি স্পর্শক্রামী (contagious) রোগ। ম্যাককনেল ও ও'ব্রায়ানের পূর্ব যুক্তিকে অনেকে এই বলিয়া অগ্রাহ্য করেন যে, মাদ্রাজের মধ্যবিত্ত পরিবারের আহার্য বাঙালী পরিবার অপেক্ষা নিকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাহারা এই রোগে আক্রান্ত হয় না।

ও'ব্রায়ানের স্পর্শক্রমণবাদও চিকিৎসকমণ্ডলী গ্রহণ করিতে পারে নাই। নিত্য নব মতবাদের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ম্যাকলিয়ড প্রভৃতি পরে বলিলেন, এপিডেমিক ড্রপসি সংক্রামক (infectious) রোগ এবং ডোলানির মতে ইহা মানবদেহে শয্যাস্থিত ছারপোকা দ্বারা সংক্রামিত হয়। ১৯০৮ সালে সর্বপ্রথম মনরো বহু অনুসন্ধান করিয়া প্রচার করিলেন, এই রোগ খাদ্যদ্রব্যের গোলমালের জন্যই ঘটিয়া থাকে। তিনিই বাঙালীর প্রধান খাদ্য চাউল, ডাল ও সর্ষপ তৈলকে ইহার জন্য মুখ্যত দায়ী করিলেও কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে সক্ষম হন নাই। এদিকে সেই বৎসরই এই রোগ ঢাকা পাগলাগারদবাসীদের প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে। ইহার বিবরণ দিতে গিয়া ক্যামবেল সাহেব বলিলেন, এপিডেমিক ড্রপসি স্পর্শক্রামী রোগ হইতে পারে না। পাগলাগারদে স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থানে বাস করিত এবং পরস্পর মেলামেশা করিতে পারিত না। ইহা ব্যতীত বাহিরের লোকের সহিতও তাহাদের আদৌ সংযোগ ছিল না। এমন অবস্থাতেও এই রোগ স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলকেই আক্রমণ করিয়াছিল। স্পর্শক্রামী রোগের ধর্ম ইহা নহে। চাউল এবং মাছকেই ক্যামবেল এই রোগের কারণ বলিয়া প্রকাশ করেন।

ইহার পর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলিকাতা ও ইহার শহরতলিতে এপিডেমিক ড্রপসির তাণ্ডবলীলা শুরু হয়, তখন চিকিৎসকমণ্ডলী ইহার কারণ বাহির করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। হাওড়া হইতে এস এন সেন বলিলেন, এই রোগের জন্য খনিজ তৈল মিশ্রিত সর্ষপ তৈলই দায়ী। কিন্তু এই মতবাদ তখন অগ্রাহ্য হয়। ১৯১৮ সালে মেগো ও গ্রেগ এই রোগের সংক্রামণবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে সক্ষম হন। সংক্রমণবাদের বিরুদ্ধে আরও প্রমাণ এই যে, এই রোগ তাহা হইলে জাতি বিচার করিয়া একমাত্র বাঙালীদেরই আক্রমণ করিত না, কেননা কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চল বা যুক্তপ্রদেশের বেনারস, এলাহাবাদ, কানপুর ও বিহারের ভাগলপুর, পাটনা প্রভৃতি স্থানে এই রোগে আক্রান্ত বাঙালী মারোয়াড়ী বা বিহারীদের সহিত অবাধ মেলামেশা করিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই রোগ বাঙালীদের খাদ্যের কোনও বিশিষ্ট অংশের জন্যই দায়ী।

বাঙালীর আহার্যের বিশেষত্ব—চাউল ও সর্ষপ তৈল। ইহার মধ্যে সর্ষপ তৈল বাঙালীর অতি প্রিয় ও অত্যাবশ্যক। অন্য প্রদেশবাসীরা ইহা অতি অল্প পরিমাণে খাইয়া থাকে এবং অনেক প্রদেশে ইহা একেবারেই বর্জিত। ১৯২৫ সালে কর্নেল আকটন ও চোপরা তাঁহাদের 'বিষাক্ত চাউলই এপিডেমিক ড্রপসির কারণ', এই মতবাদ জগৎ সমক্ষে স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের মতে কোনও প্রকার চাউল সেঁতসেঁতে ঠাণ্ডা স্থানে রাখিলে bacillus vulgatus সম্প্রদায়ভুক্ত জীবাণু তাহাতে সংক্রামিত হয়। এই জীবাণু চাউলের মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়া জলে দ্রবণীয় একপ্রকার বিষাক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করে, যাহা আহার্যরূপে আমাদের শরীরে প্রবেশ করিলে আমরা রোগগ্রস্ত হই। আমরা অনেকেই আজকাল কলে ছাটা ঝকঝকে চাউল ব্যবহার করি। ইহাতে একটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ 'এনজাইম' নষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহার অভাবেই উপরোক্ত জীবাণু চাউলকে বিষাক্ত করে। এই সকল জীবাণু আক্রান্ত চাউলের কেন্দ্রস্থান দেখিতে অনচ্ছ হয়। প্রধানত কেন্দ্রীয় অনচ্ছতার উপর নির্ভর করিয়াই চাউলের শ্রেণীবিভাগ হইতেছিল। আ্যাকটন ও চোপরার এই নূতন গবেষণার ফল প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই এপিডেমিক ড্রপসির প্রকৃত কারণ বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে করিল। কিন্তু ১৯২৭ ও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে আ্যাণ্ডারসন ও গ্রসটর ইহার প্রতিবাদ করেন। মেগো সাহেবের মতে এপিডেমিক ড্রপসি বেরিবেরি রোগেরই শেষ সীমা। তিনি যে রোগবংশলতা রচনা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয়, চাউল এবং ভাইটামিনবিহীন খাদ্যই বেরিবেরির পূর্বপুরুষ।

যদিও বিষাক্ত চাউল ব্যবহারই এই রোগের জন্য দায়ী ভাবিয়া-সকলে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, তথাপি মাঝে মাঝে ইহার মৃদু প্রতিবাদ হইতেছিল এবং বিষাক্ত চাউল ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ইহার আক্রমণ কমে নাই। সন্দেহের একটু রেশ লাগিয়াই ছিল। কিন্তু সম্প্রতি 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাব্লিক হেল্‌থ'এ গবেষণা করিয়া ডাঃ লাল ও রায় প্রত্যক্ষভাবে দেখাইলেন যে, সর্ষপ তৈলই এপিডেমিক ড্রপসির প্রকৃত কারণ এবং বিষাক্ত চাউলের (?) সহিত ইহার কোনওই সম্পর্ক নাই। তাঁহারা করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট, জামসেদপুর, রংপুর প্রভৃতি বহু এপিডেমিক ড্রপসি আক্রান্ত স্থানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, এমন বহু লোক এই রোগাক্রান্ত হয়, যাহারা চাউল মোটেই ব্যবহার করে নাই। অ্যাকটন ও চোপরার গবেষণামতে আতপ চাউল বিষাক্ত নহে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, আলোচালভোজী বাঙালী বিধবাও এই রোগ এড়াইতে পারে না। ইহা ব্যতীত মাদ্রাজ অঞ্চলে একপ্রকার ঢেঁকিছাঁটা চাউল (যাহাকে বিষাক্ত বলা চলে না) পাওয়া যায়, যাহার কেন্দ্রস্থল অতিমাত্রায় অনচ্ছ।

১৯৩৭ সালে ডাঃ লাল ও রায় রংপুর, জামসেদপুর, খড়্গপুর প্রভৃতি এপিডেমিক ড্রপসি রোগে আক্রান্ত স্থান হইতে সংগৃহীত সর্ষপ তৈল জেলের কয়েদীদের মত লইয়া—তাহাদের ভোজ্য খাদ্যদ্রব্যের সহিত খাইতে দিয়া এই রোগ সৃষ্টি করিলেন। কয়েদীদের নিম্নলিখিত চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া এই গবেষণা হইয়াছিল। প্রথম শ্রেণীর সকলে খাইতে পায়—সুস্থ চাউল ও জেলে প্রস্তুত খাঁটী সরিষার তৈল। দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত খায়—সুস্থ চাউল, কিন্তু সংগৃহীত তৈল। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত কয়েদীদের দেওয়া হয়—যথাক্রমে বিষাক্ত চাউল ও জেলে প্রস্তুত খাঁটী সর্ষপ তৈল এবং বিষাক্ত চাউল ও সংগৃহীত তৈল। তেল আমরা যেভাবে খাই, ইহাদের সেই প্রকারে রন্ধন করিয়াই তাহা খাইতে দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত সকলেই সমপরিমাণে দুধ, মাছ-মাংস ও তরি-তরকারি পাইত।

পরীক্ষার ফল।—দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত কয়েদীরা, যাহদের সুস্থ চাউল ও সংগৃহীত সর্ষপ তৈল এবং বিষাক্ত চাউল ও সংগৃহীত তৈল খাইতে দেওয়া হয়—তাহাদের সকলেই এপিডেমিক ড্রপসিতে আক্রান্ত হয় কিন্তু অপর দুই শ্রেণী ভুক্ত ব্যক্তিদের এই রোগ আক্রমণ করে নাই। ইহাদের খাইতে দেওয়া হইয়াছিল সুস্থ চাউল ও খাঁটী তৈল অথবা বিষাক্ত চাউল ও খাঁটী তৈল। এইভাবেই সর্ষপ তেলই যে এই রোগের প্রকৃত কারণ, তাহা দেখান হয়।

এখন প্রশ্ন এই, সর্ষপ তৈল মাত্রই কি বিষাক্ত? বাঙালী 'তেলেজলে মানুষ'। চাউল ও সরিষার তেল আমাদের দৈনন্দিন আহার্য। যুগ যুগ ধরিয়া ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এপিডেমিক ড্রপসি ব্যাপকভাবে আমাদের দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে আজ একশত বৎসরও হয় নাই। ইহাতে স্বতঃই মনে হয়, খাঁটী সরিষার তৈল এপিডেমিক ড্রপসির কারণ নহে। পূর্বোক্ত গবেষণা দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা সভ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ঢুকিতেছে। লুব্ধ ব্যবসায়ীর শ্যেনদৃষ্টি হইতে বাঙালীর নিত্য প্রয়োজনীয় সরিষার তৈলও নিস্তার পায় নাই। সরিষার তৈল প্রধানত দুই-ভাবে বিষাক্ত হইতে পারে। (১) সর্ষপ তৈলে কোনও সস্তা অথচ বিষাক্ত তৈলের ভেজাল, (২) সর্ষপ তৈল বা সর্ষপ বীজ জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হইয়া এমন কোনও অনিষ্টকর রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করে, যাহা এই রোগের প্রকৃত কারণ হয়।

এই প্রবন্ধের লেখক ও ডাঃ লাল প্রভৃতি ব্যক্তিরা হাইজিন ইনস্টিটিউটএ গত কয় বৎসর গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন, জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত সর্ষপ তৈল বা সর্ষপ বীজের সহিত এই রোগের কোনও সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন, 'শিয়ালকাঁটা' বলিয়া একপ্রকার তৈলবীজই এপিডেমিক ড্রপসির প্রকৃত কারণ। শিয়ালকাঁটা (হিন্দুস্থানীতে বলে কাঁটাকার বা কাঁটাইয়া; ইংরেজী নাম argemone mexicana) বাঙলা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কবিরাজী টোটকা ঔষধ হিসাবে এই তেলের সামান্য ব্যবহার থাকিলেও, খাদ্য হিসাবে ইহার ব্যবহার কোনও দেশে নাই। শিয়ালকাঁটা বীজ দেখিতে অনেকটা রাই সরিষার ন্যায় এবং ইহার একটি দানা তুলনায় একটি সরিষার দানার চেয়ে অনেক বেশী তেল দেয়। শিয়ালকাঁটার তৈলমিশ্রিত সরিষার তৈল খাওয়াতেই যে এপিডেমিক ড্রপসি [illegible] কর্নেল চোপরা, মেজর প্যাসরিচা প্রভৃতি গবেষ[illegible]হা প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন। *

এই প্রবন্ধে [illegible] গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জি প্রমাণ [illegible] ব্যব[illegible] তেলে শিয়ালকাঁটা বীজের পরিমাণ শ[illegible] চার-পাঁচ ভা[illegible] থাকিলেও তাহা রীতিমত বিষাক্ত হইয়া ওঠে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে যে পরিমাণ তৈল ব্যবহৃত হয় তাহাতে শিয়ালকাঁটার তেল মিশ্রিত সরিষার তেল মাত্র ১৭-১৮ দিন খাইলেই এপিডেমিক ড্রপসি রোগের সকল লক্ষণ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইবে। শিয়ালকাঁটা তেলের পরিমাণ শতকরা দুই-তিন ভাগ হইলেও রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু সামান্য দেরি হয়। শিয়ালকাঁটা তেলের বিশেষত্ব এই যে, জনসাধারণ-স্বাস্থ্য-গবেষণাগারে অধুনা প্রযুক্ত সকল প্রক্রিয়া দ্বারাও সর্ষপ তৈলে শতকরা দশ ভাগ পরিমাণে শিয়ালকাঁটা তৈল থাকিলেও তাহা ধরা পড়িতে পারে না। কাজকাজেই এতদিন নিতান্ত বিষাক্ত তেলও খাঁটী তেল বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল। সম্প্রতি এই প্রবন্ধ লেখক, ডাঃ লাল ও শংকরন প্রমুখ ব্যক্তিরা শিয়ালকাঁটা তৈল দ্বারা বিষাক্ত সরিষার তৈল শনাক্ত করিবার অতি সহজ ও সাধারণ কতকগুলি পন্থা বাহির করিয়াছেন। একটির কথা বলিতেছি।

সমপরিমাণ তেল ও নাইট্রিক অ্যাসিড টেস্ট টিউবে লইয়া দুই-তিন মিনিট ঝাঁকাইয়া রাখিয়া দিলে অ্যাসিডস্তর নিম্নে যাইবে ও তৈলস্তর ঊর্ধ্বে ভাসিয়া উঠিবে। নাইট্রিক অ্যাসিডের রং সাদা। যে সরিষার তেল শিয়ালকাঁটার তেল দ্বারা বিষাক্ত তাহা নাইট্রিক অ্যাসিডের সহিত মিশ্রিত করিবার পর অ্যাসিডের বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া খয়েরী হয়। খাঁটী সর্ষপ তৈলের বেলায় অ্যাসিডের রং বদলায় না। শিয়ালকাঁটা তৈলের পরিমাণের উপর বর্ণের তারতম্য নির্ভর করে। বিশুদ্ধ শিয়ালকাঁটা তৈলের সহিত মিশ্রিত করিলে অ্যাসিড স্তর এক সুগভীর চকোলেট বর্ণে পরিণত হয়। যেমন যেমন ইহার পরিমাণ কমে, অ্যাসিডের রং সেই অনুপাতে চকোলেট হইতে কমলানেবু, ঘন হলদে ও ফিকে হলদে হইতে থাকে।

নাইট্রিক অ্যাসিডের বর্ণ-পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করিয়াই বিষাক্ত সর্ষপ তৈলে শিয়ালকাঁটা তৈলের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করিবার এক পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং শিয়ালকাঁটা তৈলের

(শেষাংশ ৫৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

*শিয়ালকাঁটার তেলই যে এপিডেমিক ড্রপসির জন্য দায়ী, এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চোপরা প্রমুখ গবেষকদের গবেষণার বিস্তৃত ও প্রামাণিক বিবরণ ১৯৩৯ সালের এপ্রিল সংখ্যা **Indian Medical Gazette**এ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের উক্তিতে মনে হয় তিনি ও ডাক্তার লাল প্রমুখ গবেষকরাই শিয়ালকাঁটা তেলের তত্ত্ব প্রথমে প্রমাণ করিয়াছেন। এমন হইলে মনে করি তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখানো উচিত ছিল। মেজর চোপরা প্রমুখ গবেষকদেরও সঙ্গে ডাক্তার লাল ছিলেন। **—দেশ সম্পাদক।**

লক্ষ্যহারা

শ্রীঅমিয়া সেন

সংসারে দুটিমাত্র মানুষ। স্বামী আর স্ত্রী।

কিন্তু সম্প্রতি দুজনার আশা আকুল উৎকণ্ঠাই যেন মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়া ক্ষুদ্র সংসারটির অঙ্গে অঙ্গে শতধা বিদীর্ণ হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল। শ্যামল ঘুরিয়া ফিরিয়া কাজে অকাজে আসিয়া রমার পাশে দাঁড়ায়। সন্ধানী দৃষ্টিতে তার মুখপানে চাহিয়া চুপি চুপি বলে, "সত্যি? সত্যি তো? তুমি ঠিক বুঝতে পারছ, অ্যাঁ?"

লজ্জায়, আশঙ্কায় রমা আরক্ত হইয়া ওঠে, "সে আমি কি ক'রে বুঝ[illegible]?"

ব্যগ্র হইয়া শ্যাম[illegible] [illegible]ই বুঝতে পারছ না? লক্ষ্মীটি সত্যি ক[illegible] [illegible]লজ্জা কি বোকা মেয়ে।"

তেমনি লজ্জারু[illegible] [illegible]খে ধীরে [illegible]মা বলে, "আর দু দিন যাক।"

আর দু দিন বাদে যখন রমার মনে আর সত্যই কোনও সংশয় থাকে না, তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ সম্বন্ধে আলোচনার সংকোচ ঘুচিয়া যায়।

রমা ইতিমধ্যেই অনাগত ক্ষুদ্র অতিথিটির সম্বন্ধে এত বেশী ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, তার উৎসাহের আতিশয্যে শ্যামল পর্যন্ত মাঝে মাঝে বিব্রত হইয়া ওঠে। ড্রইং রুমে বসিয়া শ্যামল হয়তো অফিস সংক্রান্ত কোনও জরুরী কাগজপত্র নিয়া মাথা ঘামাইতেছে, রান্না করিতে করিতে হলুদমাখা হাতেই সহসা রমা উঠিয়া আসে। শ্যামলের চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বিনা ভূমিকায় বলে, "দেখ, একটা কথা।"

শ্যামল মুখ না তুলিয়াই বলে, "বল লক্ষ্মী—" স্বরে স্নেহ যেন ঝরিয়া পড়ে।

রমা বলিয়া বসে, "একটা দোলনা কিনতে হবে যে!"

শ্যামল আশ্চর্য হইয়া তার মুখপানে তাকায়। রমা বিজ্ঞের মতো বলে, "বলছি এই জন্যে যে আমাদের হাতে তো মাসে একটি পয়সাও জমে না, অথচ একটি ভাল দোলনার দাম কম সে কম দশ পনের টাকা হবে। এখন থেকে যদি টাকা না জমাও—"

শ্যামল শঙ্কাতুর মুখে স্ত্রীর মুখপানে তাকায়। ভগবান! এর এত আশা, এত আয়োজন, সার্থক হইবে তো! মুখে ধমক দিয়া গম্ভীরভাবে বলে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি এখন থাম তো তুমি। দিন রাত আছ যাহ'ক ওই এক চিন্তা নিয়ে।"

ধমক খাইয়া রমা এতটুকু হইয়া যায়। কুণ্ঠিতমুখে বলে, "আমার যে মনে হয়।"

"মনে হয় মনেই রাখ, এখনও তো দেরি, হ'কই না আগে তোমার ছেলে, সব ব্যবস্থা হবে'খন।"

কিন্তু এ কথাও কি রমার মনে থাকে? দু দিন যাইতে না যাইতে বলিয়া বসে, "ওগো, একখানা ছোট মশারি লাগবে যে!"

"কেন?"

"বা খোকা হ'লে আমাকে বুঝি আলাদা শুতে হবে না! এখানে আর তো বাড়তি মশারি নেই।"

শ্যামল রাগ করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলে, "না', এ মেয়েকে লইয়া আর পারা যায় না।"

কখনও চিন্তান্বিত মুখে বলে, "দেখ, রান্নাঘরটা বড় দূরে। ভাবছি, খোকা হ'লে তাকে একলা ফেলে রেখে রান্নাবান্না করব কি করে?"

হাসি চাপিয়া গম্ভীর মুখে শ্যামল বলে, "তাকে লখিয়া রাখবে।"

মাথ নাড়িয়া রমা বলে, "না বাপু, চাকর বাকরের হাতে ছেলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না। তা ছাড়া ওর অন্য কাজকর্ম আছে, হাট-বাজার আছে, কতটুকু সময় আর খোকাকে নিয়ে ব'সে থাকবে।"

"তবে বাড়ি যেও।"

যশোহরের এক পল্লীগ্রামে শ্যামলের বাড়ি। বাড়িতে মা, বাবা, ভাই, বোন, ভাই বউয়েরা থাকে। একা সে-ই শুধু ব্যাঙ্কে চাকরি পাইয়া রমাকে লইয়া ময়মনসিংহ টাউনে থাকে।

রমা শিহরিয়া উঠিয়া বলে, "বাপ রে, বাড়ি? তা আমি কিছুতেই যাব না। কেবল কুসংস্কার আর কুশিক্ষা—খোকাও তো তাহলে ঐসব শিখবে! আমাদের সব আশা, সব আদর্শ তাহলে নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

শ্যামল আদর করিয়া দুই হাতে তার শঙ্কিত মুখখানা তুলিয়া ধরে। স্নেহকোমল কণ্ঠে বলে, "পাগলী কোথাকার! তোমাকে কোথাও পঠাচ্ছি না, ভয় নেই। যেভাবে খুশি তোমার সন্তানকে তুমি গ'ড়ে তু'লো।"

* * * *

এসব কথা রমার এখন স্বপ্নের মত মনে হয়। মাস-খানেক হইল সে যশোহরের সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে।

অনাগতের আগত হইবার আর বেশী দেরি নাই। কিন্তু রমার মনে এখন আর সে সম্বন্ধে একবিন্দু কৌতূহল বা আগ্রহ অবশিষ্ট নাই। মেঘে ভারাবনত মলিন আকাশের দিকে আপনার করুণ চোখ দুটি মেলিয়া ধরিয়া যখন-তখন যেখানে-সেখানে সে দাঁড়াইয়া থাকে। কখন প্রভাত হয়, প্রভাত কাটিয়া মধ্যাহ্ন আসে, কিছুই সে বিশেষ অনুভব করে না। শুধু সমস্ত দিনের শেষে যখন অপরাহ্ণ ঘনাইয়া আসে, তখন সে একটু চঞ্চল হইয়া ওঠে। সন্ধ্যার অন্ধকারে অনেক কথা স্পষ্ট হইয়া মনের পটে জাগিয়া ওঠে, চোখ দুটি অকারণে জলে ভরিয়া আসে।

কয়েকটি আগের দিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ে। রমা মেজেতে গড়াইতেছিল, বড় গরম পড়িয়াছিল, মনটাও বিশেষ ভাল নাই। কয় দিন ধরিয়া শ্যামলের যেন কি হইয়াছে, সদা হাস্যমুখ, চিরপ্রফুল্ল শ্যামল অসম্ভব গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে;

...রে রমাকে আদর না করিলে অহার মুহূর্ত কাটিত না, সেই রমার প্রতিও সে অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে। লুকাইয়া লুকাইয়া রমা চোখের জল ফেলিয়াছে, তবে আগের মত এখন আর অল্পেতেই বেশী অস্থির হইতে পারে না, ভাবী মাতৃত্ব তার মধ্যে একটা গাম্ভীর্য আনিয়াছে।

দ্বার ঠেলিয়া হঠাৎ শ্যামল আসিয়া ঘরে ঢোকে, রমার গা ঘেঁষিয়া তাহার পাশে শুইয়া পড়ে।

রমা নিজের মাথার বালিশটা স্বামীর শিয়রে গুঁজিয়া দেয়। শ্যামল আস্তে আস্তে বলে, "বাড়ি যাবে রমা?"

রমার নিরুদ্ধ অভিমান অশ্রুবেগে উথলিয়া ওঠে, ভাবে তাহাকে তাড়াইতে পারিলেই শ্যামল বাঁচে। কয় মাসই বা হইল সে আসিয়াছে, বছর তো এখনও ঘোরে নাই, ইহার মধ্যেই শ্যামলের কাছে রমার প্রয়োজন ফুরাইয়া গেল? অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া বলে, "তোমার যদি এখানে অসুবিধা হয়, যাব বই কি।"

শ্যামল ক্ষুব্ধস্বরে বলে, "ওতো তোমার অভিমানের কথা, আমি বলছি, এ অবস্থায় একা থাকা নানান দিক দিয়েই কষ্টকর। আমি তো তোমার শরীরের অবস্থা কিছুই বুঝি নে।"

রমা মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য স্বামীর কথায় সে একটুও খুশী হইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু আসল কারণ জানিতেও তার বাকী থাকে না। শ্যামলের চাকরি নাই, ব্যাঙ্কে লাল বাতি জ্বালিয়াছে। মুহূর্তের জন্য রমা স্তম্ভিত হইয়া যায়, তার পরেই স্বামীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া ঝরঝর ধারে কাঁদিয়া ফেলে।

শ্যামল আশ্বাস দেয়, অত ভয় পাচ্ছ কেন, দুর্দৈব পুরুষের জীবনেই আসে, সে দুর্দৈবকে জয় ক'রে ওঠাইতো মনুষ্যত্ব। কিছুদিন একটু কষ্ট চলবে, তার পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বলে বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে তেমন জোর দিতে পারে না, এখনকার দিনে চাকরি পাওয়া যে কত কষ্ট, তা শ্যামলের মত রমাও ভাল করিয়া জানে।

অথচ এই শ্যামলের উপরেই নির্ভর করিয়া আছে সমস্ত পরিবার।

তার পরেই রমা শ্বশুর বাড়ি চলিয়া আসিয়াছে। আর শ্যামল ছন্নছাড়ার মত চাকরির চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

রমার চোখের জল আর বাধা মানে না। আপন ভোলা মানুষ; পিছন হইতে তাড়া না দিলে নাওয়া খাওয়ার হুঁশ থাকে না, জামা কাপড় ময়লা হইলে বলিয়া দিতে হয়। সেই মানুষকে রমা একলা ফেলিয়া আসিয়াছে। হয়তো তার সকালের খাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, মেসের অখাদ্য রান্না হয়তো আধপেট খাইয়াই উঠিয়া পড়ে। এর উপরে আছে পরিবার প্রতিপালনের চিন্তা, রমার চিন্তা, রমার ভাবী সন্তানের চিন্তা।

সন্তানের কথা মনে হইতেই বিতৃষ্ণায় রমা চোখ বোজে কেবলই মনে হয়, জীবনের দুর্ভাগ্য বহিয়া আনিতেই যেন এ সন্তানের জন্ম। নহিলে এই সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনের মধ্যে ওকি আর এতদিন আসিতে পারিত না? কত আশা, কত আকুল প্রতীক্ষা, দেবমন্দিরে কত মানত এই একফোঁটা শিশুর জন্য। সমস্ত পরিবার আকুল আগ্রহে ওর আগমন প্রত্যাশা করিয়াছে। সেই শিশু এতদিন পরে আজ আসিতেছে, কিন্তু সমস্ত সংসারে সে আনন্দ কোলাহল কই? নিজের মনেও তো তার একবিন্দু উল্লাস জাগে না! নিদ্রায় জাগরণে মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, অর্থহীন অসহায় স্বামীর কথা।

কাঁদিয়া কোনও লাভ নাই, তবু রমা কাঁদে। ভগবান, আজ যদি শ্যামলকে সাহায্য করিবার মত এতটুকু ক্ষমতাও রমার থাকিত।

"ভর সন্ধ্যেবেলা অমন ক'রে বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন বউমা, কি যে ভাব-সা[illegible]কাল হয়েছে, যতসব অনাছিষ্টি!"

শাশুড়ি[illegible] চা[illegible]রের মধ্যে প্রবেশ করে। একা[illegible]সে বুক[illegible]বাহির হয়। শ্যামল যখন উপার্জনক্ষম ছিল, সংসারে তারও একটা গৌরব ছিল, আর আজ? যে সংসারের ভার সে এতকাল নিজের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, সেই সংসারই আজ তাহাকে দুর্দিনের হেতু মনে করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছে। স্বামীর জীবনে সে মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মত অর্থভাগ্যকে বহিয়া আনিতে পারিল না।

সমস্ত শরীরটা হঠাৎ কেমন করিয়া ওঠে। গর্ভের ক্ষুদ্র সন্তানটি মাতাকে তার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে চায়। মুহূর্তের জন্য পিছনে ফেলিয়া আসা দিনগুলির কথা রমার মনে পড়িয়া যায়, কত আশা, কত আগ্রহ, অদেখা শিশুর প্রতি স্বামী স্ত্রীর মনে কি গভীর স্নেহ! রমার মত শ্যামলও কত রাত্রে ছেলেমানুষ হইয়া উঠিয়াছে, বলিয়াছে, তোমার ছেলেকে বড্ড কোলে নিতে ইচ্ছে করছে রমা।"

লজ্জায় আনন্দে রমা আত্মহারা হইয়া গিয়াছে। হাসি মুখে স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া চুপি চুপি বলিয়াছে, হ'লে পর নেবে বই কি।" একটু থামিয়া বলে, "কিন্তু অতটুকু ছেলেকে তুমি নিতে পারবে না, যা শক্ত হাত তোমার! খোকা ব্যথা পাবে।"

শ্যামল উৎসাহে চঞ্চল হইয়া বলিয়াছে, "না, না, মোটে ব্যথা পাবে না, তুমি দেখো আমি খুব সাবধানে নেব।"

নাঃ, এসব কথা এখন আর রমার ভাল লাগে না, খোকা আসার আনন্দ যেন চুকিয়া গিয়াছে, বেদনাটাই শুধু কঠোর সত্যের মত জাগিয়া আছে।

* * * *

কয়দিন হইল রমার ফুটফুটে একটি খোকা হইয়াছে। রমার বিষণ্ণ মন বাহির হইতে ঘরে আসিয়া বন্দী হইয়াছে। জানালা দিয়া আকাশের ক্ষীণ একটুকরা অংশ চোখে পড়ে, দিবারাত্রি শুইয়া শুইয়া রমা তাহাই চাহিয়া চাহিয়া দেখে। পাশে রমার ছোট মানবশিশুটি মাঝে মাঝে কাঁদিয়া ওঠে, রমার খেয়াল থাকে না, সে শ্যামলের চিঠির কথা ভাবে।

"খোকা এসেছে, আজ তো আনন্দের দিন, কিন্তু খোকার বাবার দুর্ভাগ্য এ আনন্দে সে যোগ দিতে পারল না। দু দিন

হ'ল কলের জল খেয়ে কাটাচ্ছি। বয়েস হয়েছে, আর কি সংসারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব? কোথায় সে শক্তি আর উৎসাহ? তুমি যদি কাছে থাকতে! এত ভাবনা চিন্তা আর সহ্য হয় না তোমার কোলে মুখ গুঁজে পৃথিবীকে ভুলে থাকতে ইচ্ছে করে। খোকা যখন বড় হবে, ওকে মুখ দেখাব কি করে? অক্ষম অপদার্থ পিতা। কি আদর্শ পাবে সে আমার কাছ থেকে? নগণ্য অতি সাধারণ মানুষের মত হা অন্ন হা অন্ন ক'রে ঘুরে বেড়ানোই যার পেশা। মনুষ্যত্ব, ব্যক্তিত্ব সবই যে যন্ত্রের চাপে পড়লে গুঁড়ো হয়ে যায়।

যাক তুমি যেন ওকে অনাদর ক'রো না, ওতো ভগবানের আশীর্বাদ। ওকে দিয়েই [illegible] জীবনের মহত্তর স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠুক।"

শাশুড়ী তিরু[illegible] মাথা খেয়েছ বউমা, ছেলেটা কেঁদে ম'ল যে। বুড়ো বয়সে ছেলে হ'ল, তবু তোমার খুকীপনা গেল না?"

রমা করুণ চোখে ছেলের দিকে একবার তাকায়। কাঁদিয়া কাঁদিয়া খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘুমন্ত মুখে একটুকরা ক্ষীণ হাসির রেখা। রমার চোখের সামনে ভাসে স্বামীর মুখ। —অনাহারে শুষ্ক, দুশ্চিন্তায় ক্লিষ্ট, হতাশায় ম্লান। রমার চোখের কোণ বহিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে। দুর্ভাগ্য শিশু, ইহাকে পালন করিবার ক্ষমতাও আজ তাহার পিতার নাই। তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া রমার চিৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, এত দিন পরে কেন এলি, কেন এলি তুই?" কিন্তু কিছু বলে না, প্রাণপনে আপনাকে সংযত করিয়া সে মুখ ফিরাইয়া থাকে।

মনে ছিল আশা

(৫৬৭ পৃষ্ঠার পর)

মাস্টার মহাশয়ের সমস্ত বিক্রম তেমনি করিয়া হাত-পা গুটাইয়া তাঁহাকে বেতের চেয়ারটার মধ্যে যেন আরও কুণ্ডলী পাকাইয়া দিল। ভয়ে ভয়ে মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "তা, তা, তবে ও কি জন্যে এসেছে?"

মাস্টার-পত্নীর ক্লান্ত সুর আবার ফিরিয়া আসিল: কহিলেন, "কি জন্যে এসেছেন, খোঁজ কর না।"

তার পর তিনি নিজেই একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি চান আপনি?"

অমল ততক্ষণে প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে; সে কোনওমতে মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, "আমি কাজের জন্য এসেছিলুম।"

"কাজ!"

মাস্টার-পত্নীর নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভুবন-বাবুও এতক্ষণে আবার সোজা হইয়া বসিলেন, কহিলেন, "কাজ? কাজ কি আর বাঙালীর পাবার জো আছে! ইন্সপেক্টরের হুকুম, সমস্ত কাজেই বিহারীকে রাখতে হবে। এমন-কি, মাস্টার পর্যন্ত বাঙালী রাখতে গেলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। তা নইলে—"

ভুবনবাবুর স্ত্রী আবার ধমক দিলেন, "ফের ইস্কুল! ......তা কি কাজ চাও?"

তিনি অমলের দীন বেশভূষা ও শুষ্কমুখ দেখিয়া এবং কাজের কথা শুনিয়া 'আপনি' হইতে তুমি করিয়া ফেলিলেন।

অমল ঘাড় হেঁট করিয়া সহসা জবাব দিল, "আজ্ঞে, রান্নার কাজ কিছু কিছু জানি।"

সহসা ভুবনবাবুর স্ত্রী সোজা হইয়া বসিলেন, "জান রান্নার কাজ? সত্যি সত্যিই জান? কি জাত তুমি?"

অমল পৈতাটা জামার মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেখাইল; তার পর কহিল, "খুব ভাল জানি না, তবে আপনারা দেখিয়ে শুনিয়ে দিলে পারি হয়তো।"

ভুবনবাবুর স্ত্রী একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "বাঁচালে বাবা তুমি! বাবাজীটা কাল হঠাৎ অসুখ ক'রে বাড়ি চ'লে গেল, কি বিপদে যে পড়েছিলুম বলবার কথা নয়। ছেলেমেয়ে নিয়ে আটজন লোক, দুবেলা রান্না কি সোজা কথা? আজই তো হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। তাহ'লে তুমি যাও, স্নান-টান ক'রে নাও, আজ রবিবার ব'লে এখনও রান্না চাপেনি, তুমিই চাপিয়ে দাওগে, পান্নুকে ডাকছি, সে সব দেখিয়ে দিক।"

ভুবনবাবু বহুক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, এইবার ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় ওর বাড়ি, কি বৃত্তান্ত কিছুই খোঁজ নিলে না, এখানে কেউ চেনে কি না—"

পাছে ঠাকুরটি হাতছাড়া হইয়া যায় এই ভয়ে মাস্টার-পত্নী রাজবালার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ভুবনবাবুর কথাগুলি নাকি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, তাই তিনি কথা কহিতে পারিলেন না; অমলেরও মুখ শুকাইয়া উঠিল। সে খানিকটা মাথা চুলকাইয়া জবাব দিল, "বাড়ি আমার বাঙলা দেশেই: কলকাতায় অনেক দিন ছিলুম।"

রাজবালা কহিলেন, "এখানের সংবাদ দিলে কে?"

ভুবনবাবু কহিলেন, "কোনও ইস্কুলের মাস্টার-টাস্টার বোধ হয় কিম্বা কোনও ছাত্র।"

"আবার ইস্কুল।"

ভুবনবাবু ভয়ে চুপ করিয়া গেলেন। অমল কহিল, "ভবেশবাবু আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে চেনেন।"

রাজবালা যেন ধড়ে প্রাণ পাইলেন। কহিলেন, হ'ল তো তো? জামাইবাবু চেনেন, তিনিই পাঠিয়েছেন। তোমার সব তাতেই—"

(ক্রমশ)

শ্রীহট্টের রাজা গোবিন্দ চন্দ্র

শ্রীহারাণচন্দ্র দাস

তোয়ারিকে জলালীই শ্রীহট্টের সর্বপ্রথম লিখিত ইতিহাস, ইহাকে ভিত্তি করিয়াই ঐতিহাসিকগণ নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাতে আমরা গৌড়গোবিন্দ বা গৌড়ের গোবিন্দ নামক একজন সর্বশেষ হিন্দু রাজার সন্ধান পাই। শেষ থাকিলে আদিও ছিল; অথচ ইহার খবর কোথাও আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ঐতিহাসিক এলেন সাহেব সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া একটি সামঞ্জস্য বিধানের খাতিরে বলিতেছেন,

"Gour or North Sylhet was originally ruled by a line of Hindu kings. Nothing is known either of their dynasty or fortune, and they were probably pretty local princes with less power and influence than that enjoyed by a big zaminder of Bengal at the present day".

অর্থাৎ গৌড় বা উত্তর শ্রীহট্ট একটি হিন্দু রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। তাহাদের সম্পত্তি অথবা বংশবৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় নাই, খুব সম্ভব ইঁহারা স্বল্পবিত্ত ও ক্ষমতাহীন রাজা ছিলেন। বর্তমানকালে বঙ্গদেশের একজন বড় জমিদারের যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি, তাহাও তাঁহাদের ছিল না।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ইহাকে, ত্রিপুর রাজমহিষীর জারজ সন্তান প্রতিপন্ন করিয়া, সমুদ্রতনয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

দত্তবংশাবলী নামক একখানা পুস্তকে দেখা যায় যে, গোবিন্দচন্দ্রকে চিকিৎসা করার জন্য চক্রপাণি দত্ত শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন। ইহার দুই পুত্রকে রাজা জায়গির দিয়া শ্রীহট্টে রাখেন, ইহারাই সাতগাঁও লাখাই প্রভৃতি স্থানের দত্তবংশের আদিপুরুষ। এই রাজার রাজধানী কত বড় ছিল, তিনি যদি শুধু শ্রীহট্ট শহরে বা উত্তর শ্রীহট্টের রাজা হন, তবে কি করিয়া এই জায়গা দান করিতে সক্ষম হইলেন? তাহার মীমাংসা ইহাতে নাই। এই সকল প্রশ্ন সকলেই এড়াইয়া গিয়াছেন। ইহার মীমাংসা করিতে হইলেই গোবিন্দচন্দ্র ও তাহার রাজ্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

ময়নামতীর গান আবিষ্কার হওয়ায় বাঙলার খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতকের একটি ঐতিহাসিক কাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই গানের নায়ক নায়িকা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। রাজা গোপিচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের কাহিনীই এই গানের বিষয়বস্তু।

"এখন ঐতিহাসিকগণের অনেকেই এই গোপিচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপির বঙ্গাধিপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণে দেশময় যে লোকের উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, তাহা লইয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও বোম্বাই পর্যন্ত সমস্ত দেশগুলিই পল্লীগীতি রচনা করিয়াছিল। ত্রিপুরা জেলা ও উড়িষ্যায় এখনও বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্র গানের ছড়া প্রাচীন লোকের মুখে শোনা যায়। গোপীচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র নামের রূপান্তর, দুর্লভ মল্লিক কৃত পল্লীগাথায় তাহা উল্লিখিত আছে। তিনি পূর্ববঙ্গের অনেকটা জুড়িয়া রাজ্যশাসন করিতেন, ত্রিপুর মণ্ডলের পার্বত্য প্রদেশের এক বিস্তৃত অংশ তিনি তাঁহার মাতামহ হইতে প্রাপ্ত হন। গৌড়ের কতকাংশ তিনি মিরাশ লইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি নিতান্ত নগণ্য রাজা ছিলেন না। গোরক্ষনাথের শিষ্য হওয়ার দরুণ তাঁহার এই ত্যাগ পিতৃসত্য পালন কারী রামের নির্বাসনের মতই দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল, যেহেতু গোরক্ষ শিষ্য নাথ সম্প্রদায় ভারতের নানাস্থানে উপনিবিষ্ট হইয়া ছিলেন, তাঁহারা এই পল্লীগাথা সর্বত্র গান করিয়া বেড়াইতেন।" (২)

"গোবিন্দচন্দ্র আদৌ পাল রাজগণের কেহ ছিলেন কি না, তাহা সন্দেহস্থল; আমাদের বিশ্বাস তিনি পাল রাজগণের কেহই নহেন। ইঁহার পিতামহের নাম সুবর্ণচন্দ্র। আমরা বঙ্গীয় রাজা সুবর্ণচন্দ্রের নাম তাম্রশাসনে পাইয়াছি। তাম্রশাসনে আবার ত্রৈলোক্যচন্দ্রের নামও পাওয়া যায়। এই দুই নামই আমরা গোপীচন্দ্রের গানের কোনটিতে পাইতেছি। শ্রীচন্দ্র দেবের তাম্রশাসনে উল্লিখিত অল্পসংখ্যক নামের মধ্যে যখন দুইটি নামের গোপীচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের নামের সঙ্গে ঐক্য হইতেছে, তখন মাণিকচন্দ্র তথা গোপীচন্দ্রকে আমরা শ্রীচন্দ্র দেবের বংশীয় বলিয়া অনুমান করি।" (৩)

বিক্রমপুরের চন্দ্র বা দেব বংশের "...পূর্বপুরুষ পূর্ণচন্দ্র আধুনিক রোটাসগড়ের রাজা ছিলেন। তৎপরবর্তী রাজা সুবর্ণচন্দ্র বিক্রমপুর অঞ্চলের রাজা হন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানের অধিপতি হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র তৎপরে সিংহাসন অধিকার করেন। সম্ভবত মাণিকচন্দ্র শ্রীচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীচন্দ্র সিংহাসন অধিকার করিলে ইনি পৈতৃক অধিকারসূত্রে বিক্রমপুরের কতকাংশের মালিক হইয়া গৌড়ের এক [illegible] মিরাশ স্বরূপ গ্রহণ করেন।" (৪)

মাণিকচ[illegible] তিলকচন্দ্রের কন্যা ময়নামতীকে [illegible] পটিকায় ছিল, এখনও তাহা আছে।

মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরমা সুন্দরী কন্যা অদুনাকে বিবাহ করেন এবং দ্বিতীয়া কন্যা পাদুনাকে যৌতুক স্বরূপ গ্রহণ করেন। তিরুমলের শিলালিপি পাঠে জানা যায় ১০২৫ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার দেখা হয় এবং তিনি পলায়ন করেন, সেখানে কোনও যুদ্ধ হইয়াছিল কি না তাহা ইহাতে লেখা নাই। রাজেন্দ্র চোল তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া খবর পাওয়া যায় এবং ব্যাপার সুবিধাজনক হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহার সঙ্গে সন্ধি করেন।

এই চোল বংশ অতি প্রাচীন। "বুদ্ধ নির্বাণের ২৯৬ বর্ষ পরে। খৃঃ পূঃ ২৪৭ অব্দে চোলবীর সিংহল অধিকার করেন। তৎকালে তামিল ভাষী সমস্ত জনপদের উপর ইহারা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পল্লব বংশের অধঃপতন কালে চোল রাজগণ কাঞ্চীপুরে অধিষ্ঠিত হন।

" খৃষ্টীয় ৭ম শতকে চীন পরিব্রাজক হিউ এন্ সাং চোল রাজ্যে গিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে চোল রাজগণ আবার প্রবল হইয়া পাণ্ড্য ও কোঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। সেই সময় রাজেন্দ্র কোল তুঙ্গ বোড় দেব বঙ্গ বিহার পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। অনেকের মতে করমণ্ডল উপকূল চোলমণ্ডল শব্দের অপভ্রংশ।

"আর্কট, কাঞ্চীপুর, ত্রিচিনপল্লীর নিকটবর্তী বরিউর, কুম্ভকোণ, গঙ্গৈকোণ্ড, সোবপুর ও শেষে তাঞ্জোর চোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুরের আক্রমণে ও পরে বিজয়নগর রাজ্যের অভ্যুদয়ে চোল রাজ্য বিধ্বস্ত হয়।" (৫)

রাজেন্দ্র চোল ১০০২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়া গঙ্গা হইতে সিংহল পর্যন্ত দিগ্‌বিজয় করেন।

গোবিন্দচন্দ্র ঊনবিংশ বৎসর বয়সে ১২ বৎসরের জন্য মাতৃ আজ্ঞায় ঘরে সুন্দরী এক স্ত্রী রাখিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯ বৎসর বয়সে গৃহে থাকিলে মৃত্যু হইবে জ্যোতিষীর এই ভবিষ্যৎবাণীতেই মাতা সন্তানের মঙ্গল কামনায় তাহাকে সন্ন্যাস লইতে

---

(1) Allen's Assam District Gazetteers, Sylhet Vol. II P. 23.

(২) বৃহৎ বঙ্গ—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ১ম খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ

(৩) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডাঃ সেন ৬ষ্ঠ সং, ৫৪ পৃঃ

(৪) বৃহৎ বঙ্গ—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ২৭৩ পৃঃ

(৫) বিশ্বকোষ ১ম সং, ৬ষ্ঠয়, ৪৭৮ পৃঃ

বাধ্য করেন। তিনি ৩১ বৎসর বয়সে দেশে ফিরেন। তাহার বনগমনের শুভমুহূর্ত ব্রাহ্মণগণ ধার্য করিয়া দেন।

গোবিন্দচন্দ্রের সময় নির্দেশক কোনও ঐতিহাসিক নিদর্শন আমাদের হাতে নাই। আমরা শুধু তিরুমলের শিলালিপি দ্বারা তাহার সময় জানাইবার সুযোগ পাইলেও সেই সময় তাঁহার বয়স কত ছিল, তাঁহার জন্ম কবে হইয়াছিল, তিনি কবে সন্ন্যাসাশ্রম হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার কোনও মীমাংসা এই ফলকে হয় না। তবে ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, তিনি একাদশ শতকের লোক ছিলেন এবং তিরুমল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৯ বৎসর বয়সে রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, ১৮ বৎসর বয়সের বিস্তার মধ্যে রাজ্য করা খুবই অসম্ভব। রাজেন্দ্র চোল যখন কন্যা সম্প্রদান [illegible] গোবিন্দচন্দ্র নিশ্চয়ই ৬০।৭০ বৎসর বয়সের বৃ[illegible] বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যবিস্তারও নিশ্চয়ই করেন [illegible]ন একাদশ শতকের প্রথম কয় বৎ[illegible] রা[illegible] রাজ্য গ্রহণের পর সন্ন্যাসী হন এবং [illegible] ০১৫-১[illegible]ষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আসেন, এই অবস্থায় একাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

কামরূপ রাজ, রত্নপালের প্রথম শাসনে গৌড়ীয় রাজাকে জয়ের কথার উল্লেখ দেখিয়া ডাঃ হর্নলি পাল বংশের ন্যায় পালকে নয়া পাল মনে করিয়া মহীপালের সঙ্গে অভিন্ন করিয়া তাহার সময় ১০১০-১০৫০ নির্দেশক্রমে রত্নপালের ফলকে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়াছেন। (৬) মহীপাল ৯৭৮-১০৩০, তৎপুত্র নরপাল ১০৩০-১০৪৫, লামা তারানাথের মতে মহীপাল ৮৪৭-৮৯৯ এবং ন্যায়পাল ১০১৫-১০৫০ খৃঃ। মহীপাল কোনও যুদ্ধবিগ্রহে যোগ না দিয়া শান্তির সহিত রাজ্যশাসন করেন। এই সময় প্রচণ্ড শক্তি হিন্দু সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে অগ্রসর হয়, কিন্তু মহীপাল তাহা প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হন নাই। তৎপুত্র নরপাল নিশ্চিন্ত মনে নিজ রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, এমতাবস্থায় তাঁহাকে অন্যের ভয় করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, রত্নপাল তাঁহার শাসনে গোবিন্দচন্দ্রের ইঙ্গিতই করিয়াছেন।

গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন। তাঁহার পিতা তিলকচন্দ্র কিশোর বয়সে গুরুপ্রসাদে উপস্থিত হইয়া বালিকা ময়নামতীকে মহাজ্ঞান শিক্ষা দেন। তাঁহার পূর্বনাম শিশুমতী ছিল। হাড়ী সিদ্ধা নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে রানী ময়নামতী ব্যভিচারদোষে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথ পঞ্জাবের জলন্ধর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

"ময়নামতীর সম্বন্ধে ত্রিপুরার পর্বতে নানা প্রবাদ আছে— একটি পাহাড়ের নাম 'ময়নামতীর পাহাড়'। ময়নামতীর শৃঙ্গে একটি সুড়ঙ্গ আছে, জনশ্রুতি এই—ওই সুড়ঙ্গ দিয়া ময়নামতী ও হাড়ীসিদ্ধা অদৃশ্য হইয়া যান......।" (৭)

গোবিন্দচন্দ্রের মাতামহের নিকট হইতে ত্রিপুরা মণ্ডলের উপান্ত দেশ হিসাবে যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বর্তমান শ্রীহট্ট জেলা বলিয়াই আমাদের মনে হয় এবং এই ধারণা দৃঢ়তর হয় এই প্রবাদের সমর্থনে যে, বর্তমান শ্রীহট্ট শহর গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল। গোবিন্দচন্দ্রের মিরাশ যখন গৌড়ে ছিল, তখন তাহার নাম গৌড়েরও গোবিন্দ হওয়া স্বাভাবিক এবং সেই গৌড়ের গোবিন্দ কালে ক্রমে গৌড়গোবিন্দ এবং গৌড়ের জমিদারের বাসস্থান হিসাবে শ্রীহট্টও গৌড় নামে পরিচিত হয়। গোবিন্দচন্দ্র যে শ্রীহট্টের লোক ছিলেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ এই বলা যাইতে পারে যে,—

"ময়নামতীর গানে ও গোরক্ষ বিজয়ে যেসকল প্রসিদ্ধ নাথ যোগীদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাদের অনেকেই ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

"ত্রিপুরার উত্তরে শ্রীহট্টের নিকট সিদ্ধাই গ্রাম এখনও আছে এবং তথায় যোগী গুরু সম্বন্ধে প্রবাদ আছে।" (৮)

সিদ্ধাই বা সিদ্ধা সম্পর্কে এই অঞ্চলের একটি অর্থ আছে। এখানে সিদ্ধিলাভের অর্থে ইহা প্রয়োগ হয়। যে স্থানে হাড়ী সিদ্ধা সিদ্ধিলাভ করেন, সেই স্থানের বর্তমান নাম সিদ্ধাই গ্রাম বলিয়াই মনে হয়। সিদ্ধ পুং লিঙ্গ শব্দ, সিদ্ধি স্ত্রী লিঙ্গ, সাধু ভাষায় সিদ্ধা অষ্টযোগিনীর অন্যতম যোগিনী।

শ্রীহট্ট শহরে একটি খুব উচ্চ টিলা আছে। বর্তমানে এখানে জেলা জজ বাস করেন। ইহার নাম মনা রায়ের টিলা, ইতিবৃত্তকার ইহাকে মিনারের অপভ্রংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিনার ফারসী শব্দ, একাদশ শতকে ইহা প্রচলিত ছিল না। আমাদের বিশ্বাস, ইহা হয় গোবিন্দচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্রের নামের অথবা প্রসিদ্ধ যোগীগুরু মীন নাথের নামের অপভ্রংশ। মীন নাথ গোরক্ষ নাথের শিষ্য। যদি মাণিকচন্দ্রের নামের রূপান্তর মনা রায় হইত, তাহা হইলে এই টিলায় নিশ্চয়ই রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যাইত, কিন্তু তৎপরিবর্তে আমরা সন্ন্যাসীর ব্যবহার্য দ্রব্য এখানে পাইয়াছি। "বিগত ভূকম্পের পর (১৮৯৭ খৃঃ ১৩০৪ বাং) মিনা রায়ের টিলায় জজ সাহেবের বাসের জন্য 'বাঙ্গলা' প্রস্তুত হইতেছিল, তৎকালে ৫।৬ ফিট মাটির নীচে সন্ন্যাসীদের ব্যবহারোপযোগী 'ভাং' প্রস্তুত করিবার দুইটি 'খল-পাত্র' প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার একটি ইগনাস স্টোন নির্মিত, উহা ১৩ ইঞ্চি দীর্ঘ ১ ফুট প্রস্থ এবং ৫ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট। দ্বিতীয় খল-পাত্রটি বেলে পাথর (sand stone) নির্মিত এবং এক ফুট মাত্র দীর্ঘ। এই দ্বিবিধ প্রস্তরই ব্রহ্মপুত্র কি সুরমা উপত্যকায় মেলে না। ইহা দেবালয়বাসী ভিন্নদেশাগত সন্ন্যাসীদের দ্বারা আনীত হইয়াছিল।" (৯) সম্ভবত এখানেই মীন নাথের বাড়ি ছিল। মীননাথের টিলা পরে মীনাকরের টিলা এবং পরে ইহার নাম মনা রায়ের টিলা হওয়াই স্বাভাবিক।

গোবিন্দচন্দ্র খৃষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত থাকিলে তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য চক্রপাণি দত্ত এই দেশে কি করিয়া আসিতে পারেন? অনেকের মতে চক্রপাণি দত্ত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগের লোক।

সাধারণত রাজাদের কাহিনী তাহাদের মৃত্যুর পরেই প্রকাশিত হয়। ময়নামতীর গানও মৃত্যুর পরেই রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে গোবিন্দের আশ্চর্য অসুখের খবর আমরা পাই না এবং চিকিৎসারও এই প্রকার ব্যবস্থা দেখিতেছি না। রোগ হইলে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। যেখানে রোগ নাই, সেখানে চিকিৎসকেরও প্রয়োজন দেখা যায় না।

গোবিন্দের শরীরে ত্রিপুরার রক্ত প্রবাহিত, ইনি সমুদ্রে ভাসিয়া শ্রীহট্টের উপকূলে আশ্রয় লাভ করেন নাই, মাতামহই ইঁহাকে এই রাজ্য দান করেন। এলেন সাহেবের মতে ইনি 'petty loyal prince' বা গেইট সাহেব ও ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে— ভাটেরার তাম্র-ফলকের কেশব দেবের অপর নাম গোবিন্দ নহে। গোবিন্দ এবং কেশব দেব দুই ভিন্ন ব্যক্তি, ইহাদের সময়ের ব্যবধানও খুব কম নহে।

ডাঃ মিত্র কেশব দেবকে গোবিন্দ দেব ধরিয়া এবং তাহার দানপত্রের তারিখ নির্ধারণ করিয়া বলিয়াছেন, কেশব দেব অর্থাৎ গোবিন্দকে এই সময় জালালউদ্দীন খান পরাজয় করেন। ডাঃ মিত্রের মনে রাখা উচিত ছিল যে, এইখানা যুদ্ধজয় পত্র নয়, ইহা দানপত্র। এই বৎসরই তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইবেন, ইহা সাব্যস্ত

(৬) কামরূপ শাসনাবলী—পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য ১ম সং ভূমিকা পৃঃ ২৬ পাদটীকা।

(৭) বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ২৭৮

(৮) বৃহৎ বঙ্গ পৃঃ ২৭৬

(৯) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাঃ, ২য় খঃ, ১ম অধ্যায় ৫ম পৃষ্ঠার পাদটীকা।

করিয়া পরকালের পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য তিনি নিশ্চয়ই সম্পত্তি দেবোত্তর করেন নাই।

গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বের ছবিতে দেখা যায়—"প্রজারা সদাশয় রাজার রাজত্বকালে এরূপ সম্পন্ন হইত যে, সামান্য লোকের ছেলেরাও সোনার ভাটা লইয়া ক্রীড়া করিত এবং কৃষকগণও পুষ্করিণী কাটাইয়া নিজের রাস্তাঘাট নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লইত, পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকিত না। ব্যবসায়িগণ একটু অবস্থাপন্ন হইলে হাতি কিনিয়া ফেলিত এবং ধনাঢ্যগণ গৃহ প্রাঙ্গণে হীরা, মণি, মাণিক রৌদ্রে শুকাইতে দিত। এই সকল পুস্তকে আরও দেখা যায় যে, সমস্ত দেশময় তান্ত্রিক আচার ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কথায় কথায় লোকে অগ্নিপরীক্ষা, তপ্ততৈল পরীক্ষা, কিংবা বিষ-প্রয়োগ পরীক্ষার সহায় লইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের বিচার করিত। অভিচার দ্বারা শত্রুবিশেষকে বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টাও সর্বদা অনুষ্ঠিত হইত। রাজাদের পাশা খেলা একটি ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ব্রাহ্মণদের গলায় উপবীত সর্বদা থাকার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। অনেক সময় বস্ত্রাদির ন্যায় উহা টাঙ্গাইয়া রাখা হইত, বাহিরে যাইবার সময় তাহা ব্যবহারের প্রয়োজন হইত। এই রীতি মহাপ্রভুর সময় পর্যন্ত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোনও কোনও পরিবার যে উপবীত বিরহিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ বহুদিনের প্রবাদবাক্যে রহিয়াছে,—'পৈতা ছাড়ি পৈতা লয় বৈদিকে দেয় পাঁতি'।

"রাজসভার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দৃষ্ট হয় রাজাকে ঘেরিয়া ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, পণ্ডিতগণ উপবেশন করিতেন। সম্মুখভাগে রাজগুরু বসিতেন। এক পার্শ্বে ভাট রাজগণ গাথা গাহিত। এবং অপর পার্শ্বে প্রধান সচিব আসীন থাকিতেন। রাজার পশ্চাতে 'আরাণি' ও ছত্রধারকের স্থান ছিল; এবং তাহাদের সহিত সমসূত্রে জলের গাড়ু, পানের বাটা এবং ব্যজনী বাহক ভৃত্যগণ দাঁড়াইয়া থাকিত। সভার উত্তরদিকে সাধু সন্ন্যাসিগণের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। বৃহৎ প্রাঙ্গণে প্রজাগণ উপস্থিত হইয়া অভিযোগাদি করিত। প্রত্যহ রাজ ভাণ্ডারী রাজাকে আয়ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব শুনাইত।" (১০)

রাজা গোবিন্দের রাজসভা এবং প্রজা সাধারণের সমৃদ্ধির বর্ণনায় দেখা যায় (১) ব্যবসায়িগণ একটু অবস্থাপন্ন হইলেই হাতি কিনিয়া ফেলিত। শ্রীহট্ট অঞ্চলে হাতি কেনার প্রবাদ এখনও প্রচলিত আছে, কোন কাজে কেহ অধিককাল প্রবাসে থাকিলে বা কজের অনুপাতে তাহা নিষ্পন্ন করিতে দেরি হইলে বা ক্ষুদ্র ব্যক্তির মহৎ কল্পনাকে বিদ্রূপাত্মকভাবে খেদার সঙ্গে লোকে তুলনা করে। হাতি ক্রয় করা বা খেদা করা, এই অঞ্চলে খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার মোটেই ছিল না, ইহা দ্বারা তাহারই একটা আভাস পাওয়া যায়। খেদা করা শ্রীহট্টের বহুদিনের প্রথা। মুসলমান আমলে জমিদারগণ হাতি খেদা করিয়া, হাতি দ্বারা সরকারী রাজস্ব পরিশোধ করিতেন। কোম্পানির আমলের প্রথমভাগেও এই রীতি ছিল, মুসলমান সরকারের তরফ হইতেও হাতি খেদা করা হইত, কোম্পানির সরকারও কিছুদিন এই ব্যবসায় করিয়াছিলেন, নবাব আলিবর্দি খাঁ যুদ্ধের হাতি এখান হইতে ধরিয়া নিতেন, ইহা ইংরেজ আমলের প্রাচীন কাগজপত্রে দেখা যায়। (১১)

(২) এদেশের জনসাধারণ খুবই অবস্থাপন্ন ছিল, এই কারণে শ্রীহট্ট লক্ষ্মীর হাট নামে সর্বসাধারণে পরিচিত। লক্ষ্মী ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবী, মনসা বা বিষহরি ধনের অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে এই অঞ্চলে পূজিতা হন। প্রাচীনকালে অনেকের ঘরেই নৌকা পূজা হইত বলিয়া গল্প শুনা যায়। (৩) শ্রীহট্টের নানাস্থানে এখনও ভাট দেখা যায়। ইহাদিগকে ভট্ট বলে। ইহারা স্বভাবকবি, মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া বড়লোকের প্রশস্তি গানই ইহাদের ব্যবসায় ছিল। ইহাদের গানের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, ইহাদের কবিতার সাধারণ নাম ভাটের কবিতা।

(৪) খৃষ্টীয় একাদশ শতকের বহু পূর্ব হইতেই শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণ আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, সুতরাং রাজা গোবিন্দের সভায় ব্রাহ্মণ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

(৫) শ্রীহট্টের প্রাচীনতম গ্রামসমূহের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেই ইহাদের অসংখ্য পুকুর এবং রাস্তাঘাটের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়, বিশেষভাবে ইটা পরগণার লুপ্তপ্রায় ধ্বংসচিহ্ন যেন 'কদলী পত্তনে'র প্রজাদের সুখ সমৃদ্ধির জীবন্ত ফোটা। এই অঞ্চলের ঢুলী সম্প্রদায় আজও যেন গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বে বাস করিতেছে, ইহাদের প্রত্যেক পরি[illegible] এক একটি জলাশয় বা জলের গর্ত থাকে; এ[illegible]ক্ষল প্রায়ই ব্যবহার করে না।

(৬) তান্ত্রিক [illegible] অনুষ্ঠিত হইত, এখনও যে তাহার [illegible] তাহা ব[illegible]মৃত ব্যক্তির জীবন সঞ্চারের জন্য অন্য মানুষ বা পশুর প্রাণ তাহার দেহে প্রবেশ করানোর কাহিনী আমরা প্রাচীন প্রাচীনাদের মুখে শুনিয়াছি। আমার মা জেঠাইমা এই প্রক্রিয়া দ্বারা মুমূর্ষু রোগীর জীবন লাভ এবং সুস্থ সবল ব্যক্তির প্রাণত্যাগের প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখিয়াছেন বলিয়া গল্প করিতেন। ইহার নাম 'জীব কাড়া'। তান্ত্রিক প্রক্রিয়া দ্বারা মৃত্যু ঘটানো বা জীবনের মত পঙ্গু করিয়া দেওয়ার নাম 'বাণ মারা'। সাধারণ লোকের কোনও কঠিন ব্যাধি হইলে মনে করে যে তাহার কোনও শত্রু তাহাকে বাণ মারিয়াছে। অভিষ্ট স্ত্রী বা পুরুষকে লাভ করা অর্থাৎ বশ করার নাম 'বান্নি করা'। জলে ডুবিয়া সত্য মিথ্যা নির্ধারণের নিয়মও প্রচলিত ছিল। তন্ত্রের মারণ, উচ্চাটন, বাজীকরণ প্রভৃতির নানা প্রক্রিয়াই লোকের আয়ত্ত ছিল এবং কাজে অকাজে প্রায়ই ব্যবহার হইত। অগ্নিপরীক্ষা এবং তৈল জ্বাল দিয়া শত্রু বিনাশ করার কাহিনীও শুনা যায়। মন্ত্র দ্বারা তৈল জ্বাল দিলে নাকি শত্রুর গায়ে ফোস্কা পড়ে। শ্রীহট্টে দুইটি পীঠস্থান বর্তমান থাকিয়া, এক সময় শ্রীহট্ট যে তান্ত্রিকদের লীলানিকেতন ছিল, তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে।

(৭) এই অঞ্চলের চারিদিকে প্রকাণ্ড হাওর দৃষ্টে, ইহার পূর্বায়তন কল্পনা করিলে, ইহাকে বিরাট জলধি বলিয়া মনে হয়; এই সকল সুদূরপ্রসারী বারিরাশির অপর তীরে বণিকগণ নিশ্চয়ই পোতের সাহায্যে বাণিজ্য করিত; সুতরাং শ্রীহট্ট রাজসভায় বণিকগণের সম্মান হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই অঞ্চলে প্রচলিত কথা সাহিত্যে সদাগরের গল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

এই সকল কারণাধীন গোবিন্দচন্দ্রকে শ্রীহট্টের রাজা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

খৃষ্টীয় একাদশ শতকে ভারতে মুসলমান রাজ্য বিস্তারের জন্য আসে নাই, সুতরাং তাহাদের হাতে রাজা গোবিন্দের পরাজয়ের কোনও সম্ভাবনাই নাই।

শ্রীহট্টে মুসলমান বিজয়ের ইতিহাস খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে মুর্শিদ কুলি খাঁর আদেশে লিখিত হয়। সেই সময় গোবিন্দচন্দ্র বা ময়নামতীর গান শ্রীহট্টে খুবই প্রচলিত ছিল এবং সেই গোবিন্দ ও গৌড়কে একত্র করিয়া গৌড়গোবিন্দ নাম দিয়া তাহার নামে নানা অলীক কাহিনী সৃষ্টি করা হইয়াছে।

শ্রীহট্টে মুসলমান আসিয়াছে সত্য, কিন্তু ইতিহাসলেখক ধরিয়া লইয়াছেন, লোকমুখে প্রচলিত গানের গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গেই তাহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে মুসলমান আগন্তুক, যে দেশ তাঁহারা যখন জয় করিয়াছেন, সেই স্থানের পূর্বতন মালিকের সহিতই তাঁহাদের বুঝাপড়া করিতে হইয়াছে; সুতরাং শ্রীহট্টে

(শেষাংশ ৫৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(১০) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ষষ্ঠ সং ডাঃ সেন ৬৪ পৃঃ

(১১) Vide Firminger Sylhet District Records Vol. I.

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

কি করিয়া নন্দীদের এত দিনের এত বড় কারবার ফেল হইয়া গেল তাহা নিবারণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না; কিন্তু এটুকু বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে, এখানকার চাকরি তাহার শেষ হইয়া গেল। দীর্ঘ পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর নন্দীদের গুড়ের আড়তে খাতা লিখিয়া আর তসিলদারি করিয়া নিবারণের ধারণা হইয়া গিয়াছিল, জীবনের বাকী অংশটাও এখানেই কাটাইয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তাহা হইল না, কয়েকদিন আরও দুই তিনটা আড়তে চাকরির জন্য বৃথা ঘোরাঘুরি করিয়া নিবারণ শেষে বাড়ি চলিয়া আসিল।

নিবারণের দুই ভাই বিহারী আর শীতল যথেষ্ট সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়া বলিল [illegible] ভাল হয়েছে দাদা, এই বয়সে চাকরি করা তোমা[illegible] মানাত না। চিরকালই তো বিদেশে প[illegible] দেখাশোনা কর।"

কিন্তু নি[illegible] তাহ[illegible] না করিবার মত কিছুই আর নাই। সব[illegible] সুশৃঙ্খল [illegible]পাটিভাবে চলিতেছে। অন্দর ও বাহির দুই দিকের ব্যবস্থাই বড়বউ নিপুণভাবে করিয়া যাইতেছে, এক মুহূর্ত তাহার ফুরসত নাই। দুই জা আর তাহাদের পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়েকে কখনও ধমকাইতেছে, কখনও বা আদর করিতেছে, কখনও নানারকম কাজকর্মের নির্দেশ দিতেছে। আড়ালে কেহ কেহ একটু-আধটু আপত্তি অভিযোগ করিলেও তাহার সামনে কেহই কিছু বলিতে সাহস পাইতেছে না। এমন কি বিহারী আর শীতল পর্যন্ত তাহার মধুর তিরস্কার সহ্য করিয়া যাইতেছে। এরই মধ্যে এক ফাঁকে নিবারণের খোঁজখবরও সুশীলা আসিয়া লইয়া গিয়াছে।

'তোমার শরীর এত খারাপ হয়ে গেছে কেন? চাকরি নেই ব'লে ভাবনা চিন্তায় বুঝি? চাকরি কি চিরজীবনই করতে চাও?' তার পর সুশীলা একটু মুচকি হাসিয়া বলিয়াছে, 'আচ্ছা এবার থেকে না হয় আমার চাকরিই আরম্ভ কর।' কিন্তু পরমুহূর্তেই কর্তৃত্বের সুরে বলিয়াছে, 'কাজ নেই, কর্ম নেই, চুপচাপ মিছামিছি ব'সে আছ যে? যাও, সময়মত চান ক'রে নিয়ে খেয়ে দেয়ে শুয়ে একটু ঘুমাও গিয়ে। শন্তি, তোর জ্যেঠামশাইকে তেল আর গামছা দিয়ে যা তো।'

সুশীলার হাসিটুকু এখনও অবশ্য মধুর লাগে। কিন্তু তাই বলিয়া নিবারণের সঙ্গেও কি সে এইরূপ স্নেহ আর শাসনের ভঙ্গীতে কথা কহিবে? তাহা ছাড়া কাজ নাই কর্ম নাই এইরূপ খোঁচা দিয়া কথা বলা সুশীলা কি প্রথমদিন হইতেই আরম্ভ করিল? একটা দিনও কি তাহার সবুর সহিল না? আর শান্তিকে তেল গামছা না আনিতে বলিয়া সুশীলা নিজে আনিয়া দিলে কি তাহার অপমান হইত?

কয়েক দিনের মধ্যেই নিবারণের যেন দম আটকাইয়া আসিতে চাহিল। সংসারে প্রত্যেকেরই একটা স্থান আছে, যে যেভাবে পারিয়াছে, নিজেকে প্রত্যেকের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। কিন্তু নিবারণই যেন একমাত্র বেমানান এখানে। চাঁদপাটির বাজারে বিহারী মুদীর দোকান করে। ভোরে উঠিয়া চলিয়া যায় আর রাত্রি এগারটায় ফিরিয়া আসে। শীতল গ্রামের এম-ই স্কুলে মাস্টারি করে আর অবসর সময়ে সেনেদের বাড়ি গিয়া থিয়েটারের রিহার্সাল দেয়। ছেলেগুলি স্কুলে যায়, স্কুল হইতে আসিয়া তাড়াতাড়ি কিছু খাইয়াই আবার খেলিতে বাহির হয়। যে ছেলেমেয়েগুলি এখনও ছোট তাহাদের মারামারি আর চিৎকারে একমুহূর্তও স্থির থাকিবার উপায় নাই। শীতলের সবচেয়ে ছোট ছেলেটির বয়স মাস সাতেক। কিন্তু তাহার গলাই সবচেয়ে উপরে ওঠে। কানের পর্দা যেন ছিঁড়িয়া যাইতে চায়। সুশীলা ছাড়া আর কাহারও কোলে গেলেই নাকি এইরূপ কাঁদে তাই সুশীলাই তাহাকে প্রায় সর্বদাই কোলে করিয়া রাখে। নিবারণ সংসারের মধ্যে কিছুতেই নিজেকে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে পারে না। মাঝে মাঝে সংসারের জমাখরচ দেখিতে যায়, এক-এক সময় হয়তো এক-একটা মন্তব্য করে কিন্তু বিহারী শীতল কি বড়বউ যে যখন থাকে সেই মুচকিয়া হাসে; যেন তাহারা নিবারণের অনধিকার চর্চাকে স্নেহের প্রশ্রয় দিয়া মজা দেখিতেছে। বাড়ির কোনও ছেলে কি মেয়েকে ডাকিলে তাহারা প্রায়ই নিবারণের কাছে আসিতে চায় না, অনিচ্ছার সঙ্গে যদি বা কখনও আসে কিছুক্ষণ থাকিয়াই চলিয়া যায়। নিবারণ যেন এ সংসারের কেউ না, কলিকাতা হইতে মাসের পর মাস সে যে টাকা পাঠাইয়াছে, যেন সেই টাকার সঙ্গেই সংসারের যাহা কিছু সম্বন্ধ ছিল, তাহার সঙ্গে নয়। অথচ আশ্চর্য, এ সংসারের কর্ত্রী তাহার স্ত্রী সুশীলাই। কিন্তু নিবারণ শুধু সুশীলার স্বামী, সংসারের কর্তা নয়। কারণ নিবারণ লক্ষ্য করিয়াছে বিহারী, শীতল আর তাহার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সুশীলা যেভাবে ব্যবহার করে, নিবারণের সঙ্গেও প্রায় সেইরূপ ব্যবহারই করিতে চায়। যখন হাসিয়া, খুশী হইয়া নিবারণের সঙ্গে কথা বলে তখন মনে হয়, নিবারণকে সে আদর করিতেছে, যেমন করিয়া শীতলের ছোট ছেলেকে সে আদর করে। আবার যখন রাগ হয়, বিরক্ত হয় তখন তাহার ভাষায় ভঙ্গীতে স্ত্রীর গোপন অনুরাগ বা অভিমানের বিন্দুও প্রকাশ পায় না, সংসারের কর্ত্রীর কঠিন শাসনের কণ্ঠই বাহির হইয়া আসে। সুশীলা যেন নিবারণকে সর্বদাই স্মরণ করাইয়া দিতে চায় যে, সংসারে নিবারণের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া গেলেও সুশীলা শুধু নিজের শক্তি এবং বুদ্ধির বলেই আপন কর্তৃত্ব একটুও ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই। সুশীলা নিবারণের মুখাপেক্ষী নয়, সে নিজের শক্তিতেই নিজে প্রতিষ্ঠিত।

একদিন দুপুরে নিবারণ সুশীলাকে ডাকিয়া পাঠাইল। অনেকক্ষণ পরে সুশীলা আসিয়া উপস্থিত হইল নিবারণের ঘরে। কোলে তাহার শীতলের ছেলে। সুশীলা তাহাকে ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে। নিবারণ শুইয়া ছিল, মাথাটা একটু উঠাইয়া বলিল, 'ছেলে মেয়ে তুমি বুঝি খুব ভালবাস বড়বউ?' পাছে খোকা জাগিয়া ওঠে তাই নিবারণকে আস্তে কথা কহিতে ইঙ্গিত করিয়া সুশীলা বলিল, 'ছেলে মেয়ে কে না ভালবাসে?'

নিবারণ চুপ করিয়া কি একটু ভাবিল তার পর বলিল, 'আচ্ছা আমরা একটি পোষ্য পুত্র নিলে কেমন হয়, সদ্‌বংশের খুব ছোট্ট একটি সুন্দর ছেলে যদি পাওয়া যায়—'

সুশীলা রীতিমত ধমকাইয়া উঠিল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমার এমন সব সোনার চাঁদ ছেলে মেয়ে রয়েছে, আমি পোষ্যপুত্র নিতে যাব কোন্ দুঃখে?'

নিবারণ ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল, 'ওঃ, ওদের ছেলে মেয়ে বুঝি তোমারই ছেলে মেয়ে? দু-একটিকে নিজে পেটে ধরলেও তো পারতে।'

কথাগুলি সুশীলার বোধ হয় সম্পূর্ণ কানে গেল না, কারণ খোকা ততক্ষণে কাঁদিয়া উঠিয়াছে আর সুশীলা তাহাকে শান্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আর একদিন নিবারণ বলিল, 'ক'বছর আগে তুমি একবার বৃন্দাবন যাওয়ার কথা বলেছিলে, চল না এবার বেড়িয়ে আসি। কিংবা আর না এলেও তো পারি।'

সুশীলা বলিল, 'টাকা পাবে কোথায়?'

'টাকা বেশী লাগবে কিসে? কোনও প্রকারে যাওয়ার ভাড়াটা জুটলেই তো হ'ল। তার পর সেখানে গিয়ে ভিক্ষে তো মিলবে।'

ইশ, হঠাৎ তোমার মন এমন বিবাগী হয়ে গেল যে! চাকরি খুইয়ে বুঝি? দিনরাত এভাবে চুপ চাপ ব'সে থাকলে মাথায় এরকম বাজে চিন্তাই আসে মানুষের। ব'সে না থেকে হাত পা নেড়ে কাজকর্ম কর দেখি সংসারের। রান্না-ঘরের খুঁটি নেই। যাও বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে এনে খুঁটি লাগাও গিয়ে। হারু একাই গেছে বাঁশ কাটতে। বলেছিল ঘরামীর কথা, আচ্ছা করে ধমকে দিয়েছি। বাবু হয়েছেন সব। আমি মেয়েমানুষ হয়ে যা পারি তার জন্যে আবার ঘরামী লাগাবে। যাই, ওদিকে বাজার থেকে মাছ এসে বোধ হয় পড়েই আছে। কোন্ বেলায় কখানা মাছ রাঁধা হবে তাও আমি বলে না দিলে হবে না। যে দিকে না যাব সে দিকেই বিভ্রাট। এক দণ্ড এক জায়গায় বেড়াতে যাবার কি আমার উপায় আছে?'

নিবারণের মনে হইল সংসারের কর্তৃত্ব পাইয়া সুশীলার এতই অহংকার হইয়া গিয়াছে যে তাহাকেও সে গ্রাহ্য করে না, এক মুহূর্ত তাহার কাছে বসিয়া থাকিতেও সুশীলার ইচ্ছা হয় না। কি হইবে এমন স্ত্রী লইয়া? ইহার চাইতে মল্লিকাই অনেক ভাল ছিল কলিকাতায়। নন্দীদের আড়তে সারা দিন পরিশ্রমের পর মল্লিকার ওখানে গেলে যথার্থই আরাম পাওয়া যাইত, টাকা সে কিছু বেশী লইত বটে; কিন্তু তোয়াজও কম করিত না। সে যত্ন করিত, পরিচর্যা করিত, কোনও দিনই এমন কর্তৃত্ব করিতে সাহস পাইত না। সংসারের ছা পোনা হইতে আরম্ভ করিয়া বিহারী শীতলের সঙ্গে তাহাকে এমন সমান করিয়া দেখিত না। মল্লিকা তাহার ঘরখানা যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিত, নিজেও তেমনি সাজিয়া থাকিত। সাজিলে মল্লিকাকে সুন্দরই দেখাইত। আর মেয়েমানুষের রূপ তো সাজপোশাকের মধ্যেই। না সাজিলে কাহাকেই বা সুন্দর দেখায়? সে তাহাকে অবজ্ঞা করিত না, অগ্রাহ্য করিত না, তাহারই জন্য নিজেকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিত। সুশীলার মত এমন যেমন-তেমন-ভাবে তাহার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইত না।

কর্তৃত্ব পাইয়া সুশীলার বড় অহংকার হইয়াছে। তাহাকে স্বামী বলিয়াই যেন সে গ্রাহ্য করিতে চায় না। নিবারণ লক্ষ্য করিয়াছে সুশীলা প্রায়ই আজকাল মাথার কাপড় ফেলিয়া তাহার সামনে আসে। নিবারণের মনে হয় ইহার দ্বারা তাহাকে অগ্রাহ্যই করে, অপমানই করে সুশীলা। তাহার কাছে সুশীলার যেন কোনও লজ্জা নাই, সংকোচ নাই, ভয় নাই। সে যেন ছোট ছেলে কি চাকরবাকরের মত।

এই কর্তৃত্বের দেমাক সুশীলার ভাঙিতে হইবে। যখনই নিবারণ কোনও পরিহাস, কি কোনও চটুল ইঙ্গিত করিতে গিয়াছে, সুশীলা প্রায় চোখ রাঙাইয়া বলিয়াছে, 'আঃ ওসব কি, এখনও সেই [illegible] নাকি? ধম্মেকম্মে মন দাও এখন। ছি ছি ছি'

নিবারণের [illegible] ইচ্ছা হয় সকলের সামনে [illegible] তাহাকে অসম্মান করিতে, ছেলে মেয়ে [illegible] সকলের [illegible] তাহাকে অপদস্থ করিয়া তাহার কর্তৃত্ব, আর এই মা-গোঁসাই-এর মুখোশ ভাঙিয়া ফেলিতে নিবারণের এক-এক সময় তীব্র ইচ্ছা হয়।

একদিন নিবারণ শীতলকে বলিল, 'দেখ রে, মেয়ে-মানুষের ওপর অতটা নির্ভর করা ঠিক নয়।'

শীতল বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কার কথা বলছ দাদা?'

নিবারণ বলিল, 'কেন, তোদের বড় বউ-এর কথা। সংসারে সব দিক দিয়ে তাকে এমন কর্ত্রী করে রাখিস নে। জানিস তো স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী।'

শীতল একটু মুচকিয়া হাসিল। সে বুঝিল দাদার এটা লোক দেখানো ভালমানুষি। নিজের স্ত্রী সংসারে কর্ত্রী হইলে কার না আনন্দ হয়, কে নিজেকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে না করে?

শীতলের হাসি দেখিয়া তাহার মনের ভাব নিবারণ বেশ বুঝিতে পারিল। কিন্তু শীতলকে সে তাহার মনের ভাব বুঝাইবে কি করিয়া? স্বামী কর্তা হইলে স্ত্রীর গৌরব বাড়ে, কিন্তু স্বামী যেখানে কর্তা নয়, সেখানেও যদি স্ত্রী কর্ত্রী হইয়া থাকে, নিবারণের মনে হয় সেও স্ত্রীর পক্ষে এক রকমের অসতীত্ব। ইহার দ্বারা নিবারণ সকলের কাছে উপহাস্যাস্পদ হইতেছে, ব্যঙ্গের পাত্র হইয়া পড়িতেছে। স্বামী সংসারে বড় হইলে স্ত্রীকেও বড় করিয়া তুলিতে পারে, কিন্তু শুধু স্ত্রী বড় হইলে স্বামী যেন আরও ছোট হইয়া যায়।

নিবারণের অস্বস্তির কারণ সুশীলা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। বরং তাহার এই অকাল চাপল্য নিবারণের চরিত্রহীনতার ইঙ্গিতকেই সুশীলার কাছে স্পষ্ট করিয়া তোলে, আর ঘৃণায় তাহার সর্বাঙ্গ রি রি করিয়া উঠে। বছর কয়েক আগে কুলগুরু রাধাবল্লভ গোস্বামীর নিকট হইতে সুশীলা দীক্ষা লইয়াছে। চিঠি লিখিয়া নিবারণের অনুমতি আনাইবার সময় ছিল না, কারণ দীক্ষার উপযোগী দিন মাত্র সেই দিনই ছিল এবং গোঁসাই বলিয়াছিলেন, তাহার পর বৎসরের বাকী অংশটা সবই অশুদ্ধ হইয়া চলিবে। সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে, জপ, পুজো ইত্যাদিতেই আজকাল

সুশীলা আনন্দ পায়। রসরাজ শ্যামসুন্দরের লীলা আলোচনা ছাড়া আর কোনও রসের দিকে এখন আর সুশীলার মন যায় না। নিবারণের লঘু হাস্য পরিহাস তাহার কাছে অদ্ভুত, অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। ইহাতে তাহার বিরক্তিই বাড়ে। এসব যেন পায়েরতলায় সুড়সুড়ি লাগিবার মত; আরামের চেয়ে অস্বস্তিই তাহাতে বেশী বোধ হয়।

এদিকে নিবারণও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। সুশীলার এই অতি সাত্বিকতায় তাহারই যেন সব চেয়ে বড় অপমান। সুশীলার গাম্ভীর্য আর প্রবীণতা তাহাকে যেন সর্বদা উপহাস করে। সুশীলাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইবার মত, প্রলুব্ধ হইবার মত এখন আর এমন বিশেষ কিছু নাই; সে জন্য নয়, নিজের মর্যা[illegible]নাই যেন তাহাকে নামাইয়া আনা দরকার [illegible]রিতে না পারিলে নিবারণ যে স্বামী [illegible]মাণিত হয় না।

প্রথমে নিবারণ চেষ্টা করিল সংসারের কর্তৃত্ব নিজের হাতে লইতে। কিন্তু নিজের কাছেই নিজের অপটুতা ধরা পড়িয়া গেল। দীর্ঘ দিন চাকরি করিয়া করিয়া একই রকম কাজে সে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সংসারের নানাদিকে লক্ষ্য রাখিবার শক্তি আর তাহার নাই। এত গণ্ডগোল, এত ঝামেলা তাহার ভালও লাগে না। তাহা ছাড়া সব চেয়ে বেশী বাধা ছিল সুশীলা। নিবারণ ইচ্ছা করিয়া কিছু করিতে গেলেই সুশীলা হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়ে। 'তুমি আবার ওখানে কেন, যাও যাও নষ্ট করে ফেলবে সব', বাড়ির কোনও ছেলেকে কিছু করিতে বলিলে সুশীলাই আসিয়া নিবারণের আদেশ নাকচ করিয়া দেয়, বলে, 'মণ্টুকে এখন তুমি বাজারে যেতে বলছ? বেশ আক্কেল তোমার। ওর স্কুলের সময় হয়ে গেল না?' সুশীলা তাহার সংসারে একটু বিশৃঙ্খলাও সহ্য করিবে না, একটু অধিকারও ছাড়িয়া দিবে না।

সেদিন বিহারী আর শীতলের সঙ্গে সুশীলার নানা আলোচনা চলিতেছিল। তমিজউদ্দিনকে এবার আর খেজুর গাছ কাটিতে দেওয়া হইবে না। নানাভাবে সে রস চুরি করিয়া লয়। হঠাৎ নিবারণ আসিয়া বলিল, 'ভারী যে রসের আলোচনা হচ্ছে বড় বউ!' তিনজনই যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। পরমুহূর্তেই সুশীলা রীতিমত শাসনের সুরে বলিল, 'তুমি আবার এখানে এলে কেন? যাও এখান থেকে।' নিবারণের কণ্ঠে তখনও কৌতুক। 'আমি না গেলে বুঝি তোমাদের সুবিধা হয় না?'

বারাণ্ডার অন্য পাশের চৌকির উপর বিহারীর বড় ছেলে মণ্টু পড়া থামাইয়া এইদিকে চাহিয়া রহিয়াছে, ছেলে মেয়ে-গুলি এইদিক দিয়াই ঘোরাঘুরি করিতেছে। ঘরের মধ্যে শীতলের স্ত্রী লীলা বোতলে তেল ভরিতেছিল। তেল লইয়া যাইবার সময় জানলা দিয়া এইদিকে চাহিয়া গোপনে মুখ মুচকাইয়া একটু হাসিয়া গেল। কিছুই সুশীলার চোখ এড়াইল না। সুশীলার আর সহ্য হইল না। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল, 'তোমার কি ভীমরতি ধরেছে এই বুড়ো বয়সে। যাবে না এখান থেকে তুমি?'

'কি, কি বললি?' বলিয়া নিবারণও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল এবং নিমেষ ফেলিতে না ফেলিতে সুশীলার গালে সজোরে পর পর কয়েকটা চড় বসাইয়া দিল। বিহারী আর শীতল এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হইয়া ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই দুইজনে আসিয়া জোর করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। বিহারী বলিল, 'ছি ছি বউদি আমাদের সংসারের কর্ত্রী, তিনি আমাদের মায়ের মত, তাঁর গায়ে তুমি হাত তুলছ?'

নিবারণ হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, 'তোদের মা হ'তে পারে, কিন্তু আমার তো আর তা নয়, আমার তো সে স্ত্রী!'

কি হইতে কি হইয়া গেল। নিবারণ মনে করিয়াছিল রসিকতা করিয়া, পরিহাস করিয়া সুশীলাকে সে সকলের সামনে খেলো করিয়া দিবে, কিন্তু দিয়া বসিল চড়। নিবারণের অবশ্য তেমন অনুতাপ হইল না, বরং মনে হইল ইহাতেই তাহার উদ্দেশ্য বেশী সার্থক হইয়াছে, সংসারে তাহার গুরুত্ব ইহাতেই বেশ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। আর আলিঙ্গন চুম্বনের চাইতে অবাধ্য স্ত্রীকে মারিতে পারিলেই যেন আনন্দ পাওয়া যায় বেশী।

এপিডেমিক ড্রপসি

(৫৭০ পৃষ্ঠার পর)

কোন্ অংশ এপিডেমিক ড্রপসির সৃষ্টি করিয়া থাকে তাহা লইয়া গবেষণা চলিতেছে।

এখন প্রশ্ন এই, সর্ষপ তৈল শিয়ালকাঁটা তৈল মিশ্রিত হইলেই বিষাক্ত হয় না ব্যবহার্য তৈলে ইহার পরিমাণের একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় তাহা বিষাক্ত হয়? আমার মতে শিয়ালকাঁটা তৈল মিশ্রিত তৈল মাত্রেই আমাদের ব্যবহার করা অনুচিত। শিয়ালকাঁটা তৈল বিষাক্ত সন্দেহ নাই। বিষাক্ত পদার্থ যত অল্প পরিমাণেই খাওয়া যাক না কেন, তাহার পরিণাম ভবিষ্যতে অনিষ্টকর হওয়া অসম্ভব নয়। আফিমের সহিত ইহার তুলনা চলে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বহুদিন যাবৎ শিয়ালকাঁটার তৈল আমরা প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় সরিষার তৈলের সহিত আমাদের অজ্ঞাতসারে খাইয়া আসিতেছি। কলিকাতা অঞ্চলের তেলের কলে সঞ্চিত সর্ষপ বীজ ও তৈল এবং এপিডেমিক ড্রপসি আক্রান্ত স্থান হইতে সংগৃহীত তেল পরীক্ষা করিয়া ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার বিষময় ফল ফলিতেছে। এই রোগ বাঙালীর প্রতি ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহা ব্যতীত সমগ্র জাতির স্বাস্থ্য যেন ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। স্বাস্থ্যে, সম্পদে, কর্মক্ষেত্রে তাহার যেন আর স্থানই নাই।

আদমসুমারি

(অনুবৃত্তি)

শ্রীকমলচন্দ্র নাগ

ভারতবর্ষে প্রথম ব্যাপক ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীতে লোকগণনা হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। তার পর প্রতি দশ বৎসর অন্তে একবার করিয়া আদমসুমারি সম্পাদিত হইতেছে। আগামী ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে যে অষ্টম আদমসুমারি হইবে উহার উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং শীঘ্রই কাজ শুরু হইবে। এবার আদমসুমারির কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত ও ডব্লিউ ইয়েট্‌স এবং প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ করা হইয়াছে। বাঙলা দেশে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত আর এ ডাচ। সম্প্রতি দিল্লিতে ইঁহাদের বৈঠক হইয়া গিয়াছে। আদমসুমারির ব্যয়ভার অন্যান্যবারের ন্যায় এবারেও অর্ধেক প্রাদেশিক সরকার ও বাকী অর্ধেক পৌরপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বহন করিবেন।

যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এবারের আদমসুমারিও তেমন উৎসাহব্যঞ্জক হইবে বলিয়া মনে হয় না, বরং নানা কূটনৈতিক অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার মানসে বহু অসংগত ও অযৌক্তিক নীতি অনুসরণ করায় ইহার উদ্দেশ্য খর্ব হইবে বলিয়াই মনে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র যখন ইহাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহাকে নির্ভর করিয়া নিজেদের উৎকর্ষ সাধন করিতেছে এবং একাধিক দেশ ভারতবর্ষের মালপত্রের উপর নির্ভর করিয়া শিল্পবাণিজ্যে স্ফীত হইয়া মূলধন ও মালপত্রের উপর নির্ভর করিয়া শিল্পবাণিজ্যে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে, সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের এত সুবিধা, এত সম্পদ থাকিতেও আজ তেমনি পশ্চাতে পড়িয়া আছে ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ইহা অনেক ক্ষেত্রে আদমসুমারি পরিচালনায় ঔদাসীন্য ও নিশ্চেষ্টতার ফল।

আগামী ১৯৪১ সালের আদমসুমারির প্রশ্নপত্র দেখিয়া আমরা বিশেষ মর্মাহত হইয়াছি। যদিও ইহাতে দুই-তিনটি পুরাতন বিষয়েই ব্যাপকভাবে তথ্য লইবার বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে তথাপি যে-কয়টি অত্যন্ত এবং আশু প্রয়োজনীয় বিষয় বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এবারেও আদমসুমারি বিশেষ সুফল প্রসব করিবে না; বরং দেশের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বিবেচনা করিলে ইহা গভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাসই উদ্রেক করিবে। এই বিষয়গুলি বাতিল করার সপক্ষে ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, বর্তমানে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ নাই। এক দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইত্যাকার প্রয়োজনীয় কাজে অর্থাভাবের অজুহাত আমাদের বিশেষ বিস্মিত করে না; কারণ ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারদের যথার্থ জনহিতকর কাজে অর্থাভাব চিরদিনই ঘটিয়া থাকে। যদিই বা কখনও অর্থ পাওয়া যায় তখন তাঁহাদের উপযুক্ত পরিকল্পনা থাকে না। কিন্তু বৎসরে একটি-দুটি নয়, দশ বৎসর অন্তে এরূপ একটি কাজেও যদি সেই চিরাচরিত আমলাতান্ত্রিক মনোভাবই ফুটিয়া ওঠে, তাহার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর নাই।

আগামী আদমসুমারিতে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেক লোকের জন্য স্বতন্ত্র প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা। পূর্ববর্তী আদমসুমারিতে এক-একখানি মুদ্রিত ফরমে ২০ হইতে ৩০ জন লোকের গণনা হইত, তার পর তালিকা প্রস্তুত করিবার কালে এই সমস্ত ফরম হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্ত এক একটি পৃথক কাগজের টুকরা লিখিয়া তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য বিভাগ করা হইত। কিন্তু এবারের গণনা ব্যক্তিগত প্রশ্নপত্র হইতেই করা হইবে। স্ত্রীলোকদের প্রশ্নপত্র একইরূপ হইবে, তবে উহার দক্ষিণ দিকের নীচের কোণে কাটা থাকিবে যাহাতে প্রথম অবস্থাতেই স্ত্রী ও পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্র আপনাআপনিই বিভক্ত হইয়া যায়।

কিন্তু প্রশ্নপত্র যাহাই হউক, পত্রের অন্তঃস্থিত প্রশ্নগুলিই আমাদের আলোচ্য। এবারে যেসব বিষয়ে ব্যাপক ও উন্নত প্রণালীতে তথ্য গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা প্রথমত কৃষিকর্ম, শিল্পকারখানা ও ইহাতে নিযুক্ত কৃষক ও মজুর সম্প্রদায়ের জীবন প্রণালী, অবস্থা ও অবস্থান ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, শিল্পবাণিজ্য ব্যতীত কোনও দেশ উন্নতি করিতে পারে না, সমৃদ্ধশালী হইতে পারে না। ভারতের এ দিকে সমৃদ্ধি লাভ করিবার যথেষ্ট ঐশ্বর্য আছে, [illegible] জন্য সমুদ্রপথ আছে, কুলীকামিনেরও অভাব নাই, সুতরাং আদমসুমারিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তথ্য লইয়া তদনুসারে শিল্পপ্রসারে মনোযোগ দিলে এবিষয়ে ভারতও আর একটি আমেরিকা হইয়া উঠিবার স্বপ্ন দেখিতে পারে। গত আদমসুমারিতেও কলকারখানা [illegible] কৃষিশিল্প সম্বন্ধে তথ্য লওয়ার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু [illegible] ও অসম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয় যে, উহার [illegible] শিল্পবাণিজ্যের অথবা কুলীমজুরদে[illegible] লাভ হইবে না। যেমন প্রশ্ন : [illegible] তার [illegible] চাকুরি, চালুটে-মজুরি। কিন্তু চাকরি [illegible] এবং [illegible] কোথাকার, উহার বিশদ বিবরণ না থাকায় বুঝিতে পারা যায় না এদেশের শ্রমিকেরা কোথায় কাজ করে এবং তথায় কিরূপ ব্যবহার পায়! ফলে তাহাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কাহারও তেমন সুস্পষ্ট ধারণা গড়িয়া ওঠে না। আগামী আদমসুমারিতে উহা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; যেমন পেশা—মজুরি। কোথাকার মজুর? কয়লার খনিতে কাজ করে, না পাটকলে খাটে, অথবা কাপড়ের কলে কাজ করে, না লাক্ষা ফ্যাক্টরি বা মাটির শিল্পে পরিশ্রম করে সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিশদ ও সঠিক বিবরণ লওয়া হইবে। যাহারা স্বহস্তে নিজ নিজ ভূমি চাষ করে, যাহারা অপরের জমি চাষ করিয়া দেয় এবং যাহারা জনমজুর খাটাইয়া নিজেদের জমি চাষ করে তাহাদের সংখ্যা পৃথকভাবে গণনা করা হইবে। এ সম্পর্কে আরও বলা যাইতে পারে, যাহারা নিজের পণ্য উৎপন্ন করিয়া নিজেরাই উহা বিক্রয় করে তাহাদিগকে বিক্রয়কারী অথবা উৎপন্নকারী শ্রেণী ভুক্ত করা হইবে।

এদেশের কৃষক সম্প্রদায় ও কুলীমজুরদের জীবন যে কি অরুন্তুদ না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করা যায় না। ইহাদের মনিবেরা গৃহপালিত পশুকেও যে চক্ষে দেখেন ইহারা বুঝি তাহার চেয়ে নিকৃষ্ট, তাই ইহাদের বুকের রক্তে গড়িয়া-ওঠা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত লাভটুকু নিজেরাই আত্মসাৎ করেন। ইহারা তার এতটুকু আস্বাদ পায় না। কাজেই ইহারা থাকে কোথায়, জীবনই বা বহন করে কিরূপে, কেহই বড় জানিবার চেষ্টা করে না। এইরূপে এক জনের ভগ্নস্তূপের উপর আর একজনের প্রাসাদ গড়িয়া ওঠে। কিন্তু এরূপভাবে চলিতে থাকিলে যে এদেশের শিল্প স্থায়ীভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না তাহার বহু নজির দেওয়া যায়। বিগত কয়েক বৎসর হইতে অধিকাংশ কলকারখানাতেই ন্যায়সংগত ধর্মঘটাদি দেখিয়া কর্তৃপক্ষের ইহার অভাব-অভিযোগ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সংগ্রহে আগ্রহ জাগিয়াছে। নতুবা বারংবার এইরূপ ধর্মঘটাদি হইলে শুধু যে ইহাদেরই ক্ষতি হয় তাহা নয়, শিল্প-বাণিজ্যেরও অগ্রগতি যথেষ্ট ব্যাহত হয়। কারণ সেই সুযোগে বিদেশী মাল তাহাদের বাজার অধিকার করিয়া লইতে পারে। সুতরাং যাহাদের উপর সব প্রদেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে তাহাদের দিকটা বিশেষ সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করিলে শুধু যে শিল্পবাণিজ্যেরই লাভ হয় তাহা নয়, সমাজেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। অনেকেই জানেন, এদেশের অধিকাংশ শ্রমিকই অত্যধিক পরিশ্রম করিয়াও যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না, ফলে নানারূপ নেশা ভাং করিয়া দারিদ্র্যের জ্বালা এড়াইতে চায়; কাজেই তাহাদের নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত নিম্নস্তরে নামিয়া পড়ে।

সমাজের দিক হইতে ইহা অতীব অস্বাস্থ্যকর।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও শিল্পবাণিজ্য, কলকারখানা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে গেলে প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া তবে সফল হওয়া যায়। কারণ স্বভাবত এ দিকটা কলকারখানার মালিকেরা প্রকাশ করিতে চান না। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগৃহীত থাকে বটে, কিন্তু উহা প্রকাশ করিলে পাছে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুবিধা করিয়া দেওয়া হয় এজন্য তাঁহারা উহা যতদূর সম্ভব গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয়ত।—শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা, সাময়িক বেকারদের সংখ্যা এবং যাঁহারা নির্দিষ্ট কয়েক মাস বেকার থাকেন তাঁহাদিগের সংখ্যা গণনা করা হইবে। পরিবারস্থ ব্যক্তিরা কে কত সময় পরিশ্রম করেন উ[illegible]ও লিপিবদ্ধ [illegible] হইবে এবং যাহারা আংশিক-ভাবে পরনির্ভরশীল তাহ[illegible] করা হইবে।

দেশে আজ কলক[illegible] এবং কুটীর শিল্পও বেশ চলিতেছে। [illegible] আবশ্যক [illegible] মাপ্ত করিয়া চাকরির নিমিত্ত হতাশ [illegible] এই সমস্ত কলকারখানায় হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং পারদর্শী হইলে অল্প মূলধন যোগাইয়া তাহারা যাহাতে কুটীরশিল্পে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে উহার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক, কারণ এইসব কুটীরশিল্পের ছোটখাটো দ্রব্যের পিছুনেই এদেশ হইতে আজও লক্ষ লক্ষ টাকা বাহিরে চলিয়া যায়। সাময়িক বেকার বহু প্রকারের দেখা যায়। কোনও চলতি কারখানা বা আপিস ফেল করিলে উহার কর্মচারিবৃন্দ বেকার হইয়া পড়ে। দেশের কোনও কোনও শিল্প বেশ জোরালোভাবে চলিতে চলিতে সহসা বহিরাগত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া হটিয়া আসিলে তখন সে ব্যবসায়ে মন্দা পড়ে এবং ফলে কিছু-না-কিছু বেকার সৃষ্টি হয়। যেমন বাঙলার তাঁতশিল্প। পূর্বে এদেশে লোকে তাঁতের কাপড় পরিত, কাজেই একটা জাত নিশ্চিন্তে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিত। কিন্তু সহসা কলের প্রচলনে তাহাদের বাজার মন্দীভূত হওয়ায় তাহারা নিরুপায় হইয়া পড়িল এবং অগণিত লোক বেকার হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। এখন যদি ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তথ্য লইয়া ইহাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে শুধু যে একটা গুণিসম্প্রদায়ই বাঁচিয়া উঠিবে তাহা নয়, সমাজে শ্রীসমৃদ্ধিও ফিরিয়া আসিবে। একটা কল বা কারখানা চলিলে তদ্দ্বারা বহু লোক প্রতিপালিত হয় সত্য, কিন্তু কলের মালিকেরা নিজেরাই তার লাভের অংশটুকু গ্রাস করেন বলিয়া মজুরদের অভাবে দারিদ্র্যে নৈতিক চরিত্রের যে শৈথিল্য ঘটে উহার দ্বারা সমাজের বড় কম ক্ষতি হয় না।

আর এক প্রকারের বেকার আছে যাহাদের বৎসরে নির্দিষ্ট কয়েক মাস কাজ জোটে কিন্তু বাকী অংশটুকু বেকার থাকে। অর্থাৎ কতকগুলি কলকারখানা সম্বৎসর কাজ চালাইতে পারে না। যেমন চিনির কারখানা। ইঁহারা বৎসরে কয়েক মাস চিনি তৈয়ারি করিয়া বাকী কয়মাস ইক্ষু চাষের দিকে মনোযোগ দেন। কিন্তু তাহাতে অল্প লোকের প্রয়োজন হয় বলিয়া অবশিষ্টেরা বেকার বসিয়া থাকে। লবণ প্রস্তুতের কারখানা সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়, তাঁহারাও বর্ষার জন্য বার মাস কাজ চালাইতে পারেন না, কাজেই অনেকে নিশ্চিত কাজ পাইয়াও কিছুদিনের জন্য বেকার থাকে।

তৃতীয়ত।—প্রজনন হার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের সন্তান সংখ্যা, প্রথম সন্তানের জন্মকাল ও জন্মকালীন বয়স এবং পরবর্তী দুই সন্তানের জন্মের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে। গত ১৯৩১ সালের আদমসুমারিতেও এ প্রসঙ্গটি নির্দিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু তখন উহার উত্তর দেওয়া না-দেওয়া উত্তর-দাত্রীর স্বেচ্ছাধীন রাখা হইয়াছিল। ফলে অধিকাংশ স্ত্রীলোকই কুসংস্কারবশত অথবা কোনওরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া এ সকল প্রশ্নের জবাব দেন নাই। কাজেই এই ধারাটিতেও সন্তোষজনক আলোকপাত হয় নাই। এবারে যাহাতে অনুরূপ অসুবিধা না ঘটে, প্রশ্নে পাল্টা প্রশ্নে স্ত্রীলোকদিগকে বিব্রত হইতে না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ইহাতেও যদি তাঁহারা জবাব দিতে ইচ্ছুক না হন তাহা হইলে তাঁহাদের স্বামী বা পিতাই জবাব দিতে পারিবেন।

দেশে জনসংখ্যা হ্রাস অথবা বৃদ্ধি পাইতেছে কি না, কিংবা হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়ই বন্ধ আছে কি না, সে সম্বন্ধে সঠিক তথ্য লওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের ভরণপোষণ ও যাবতীয় ব্যবস্থাদি করা কিংবা হ্রাস পাইলে তাহা দেশের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর বলিয়া যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সবিশেষ দরকার। নানা কারণে এদেশে এত সম্পদ থাকিতেও এখনও অধিকাংশ লোকই অত্যন্ত হীন অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে। উহার মধ্যে অনেকে উপায়ান্তর না দেখিয়া এই দারিদ্র্য এড়াইতে গিয়া বহুবিজ্ঞাপিত হাতুড়ে চিকিৎসকদের জন্মনিরোধ ঔষধাবলী গ্রহণ করিয়া তাহাদের প্রজনন শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। সমাজ ও দেশও সঙ্গে সঙ্গে বহু সুস্থ-সবল ও প্রতিভাধর সন্তান হইতে বঞ্চিত হইতেছে। কিন্তু এ দারিদ্র্য যে একান্তই সাময়িক, দেশের শিল্প বাণিজ্য, কলকারখানা ও প্রভূত সম্পদের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার হইলেই যে এ দারিদ্র্য বিদূরিত হইবে তাহা বড় একটা কেহ ভাবিয়া দেখে না। এই অবস্থায় দেশের সব দিক বিবেচনা করিয়া শিল্পবাণিজ্য প্রসারে দৃষ্টি দেওয়া আশু কর্তব্য, তাহা হইলে একাধারে বেকার সমস্যাও মিটিবে এবং প্রজনন শক্তিরও যথাযোগ্য সুস্থতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

যাহাতে গণনাকারীরা অথবা যাহাদের গণনা হইবে তাহাদের যে কেহ অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট হইলেও সমুদয় প্রশ্নের জবাব সহজে লিপিবদ্ধ করিতে পারে, আগামী আদমসুমারির প্রশ্নপত্রে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কারণে কতকগুলি সাধারণ জবাবের জন্য বাক্যের পরিবর্তে সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবস্থা হইয়াছে। যেমন "হাঁ" কথার চিহ্ন "৵" এবং "না" কথার চিহ্ন "×" হইবে। ইহারই অল্প পরিবর্তন করিয়া নাগরিক অবস্থার প্রশ্নে প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহাতে "o" চিহ্নে অবিবাহিত, "৵" চিহ্নে বিবাহিত, "×" দ্বারা বিধবা ও "D" চিহ্ন দ্বারা বিবাহবিচ্ছিন্ন (divorced) বুঝাইবে। এইখানে আমরা একটি কথা বলিবার প্রয়োজন বোধ করি। "না" কথার চিহ্ন "×"টি নাগরিক অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়া "বিধবা" কথার চিহ্নে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু নগরেই কি শুধু বিধবা আছে, পল্লীগ্রামে নাই? সেখানে তাহাদের জন্য কি চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে? আমাদের মনে হয় উক্ত "×" চিহ্নটি পল্লীগ্রাম ও নগরে দুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি করিবে। সুতরাং পূর্বাহ্নেই সে সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অপর দিকে, ব্যয় সংকোচের ধুয়া তুলিয়া যে বিষয়গুলি বাতিল করা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথমত উল্লেখযোগ্য—অন্যান্যবারের ন্যায় এবারে সারা ভারতে একই দিনে গণনা হইবে না, বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন স্থানে গণনা হইবে। ইহা কতদূর সংগত ও সমীচীন হইয়াছে তাহাই ভাবিবার বিষয়। অন্যান্য বারে একই দিনে গণনা করিয়াও জনসংখ্যা সঠিকভাবে পাওয়া যায় নাই। ১৯০১ সালের লোক গণনায় অন্যূন ৯৪,০০০ হাজার সংখ্যার গরমিল হইয়াছিল। সেক্ষেত্রে উক্ত রীতিকেই সংস্কার করিয়া, আরও উন্নত করিয়া ব্যবহার করাই শ্রেয় ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ বিভিন্ন দিনে গণনা করিলে যাহারা ভ্রমণ করিতে থাকিবে

তাহাদিগকে একাধিকবার গণনা করা হইবে; আবার ট্রেনযাত্রিগণকে গণনায় ধরা হইবে না বলায় অনেকেই তালিকা হইতে বাদ পড়িবে। তদুপরি দেশের সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া এতই উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, কিছু সুবিধা সৃষ্টির জন্য অনেকেরই একাধিকবার গণিত হওয়া অসম্ভব নহে। ইহাতে গণনা সঠিক হইবে না এবং সকলেরই মধ্যে নিরন্তর সন্দেহের উদ্রেক হইবে।

১৮৭২ সালের আদমসুমারিতে এক দিনে বা এক রাত্রিতে গণনা করা হয় নাই। কিন্তু পরবর্তী ১৮৮১ সাল হইতে গত আদমসুমারি পর্যন্ত সে-নীতি পরিহার করিয়া একই দিনে গণনার ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষণে পুনরায় সেই ভ্রান্তিকর ব্যবস্থার সূচনা হইল! জানি না কর্তৃপক্ষের মনে কি ধারণা জন্মিয়াছে।

অন্ধ, খঞ্জ মূক-বধির ও দুরারোগ্য লোকদের কোনওরূপ পৃথক সংখ্যা-বিবরণ লওয়া হইবে না। সমাজের দিক হইতে ইহা কোনওরূপেই সমর্থন করা যায় না। কারণ উহারা এক-এক দিকে বিকলাঙ্গ হইলেও যদি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বাবলম্বী হইতে পারে, দেশেরও সমাজের কাজে লাগিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বহু অন্ধ ছেলেমেয়ে উচ্চ পরীক্ষায় পাস করিতেছে, নানা কাজকর্ম করিতেছে; একাধিক যুবক বিদেশ পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়া অধ্যাপনাও করিতেছেন। মূক-বধিরদের অনেকে নানা কুটীরশিল্পের কাজ লইয়া দিন নির্বাহ করিতেছে। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিও সারাইয়া রোগিদিগকে পুনরায় কার্যক্ষম করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমুদয় সম্ভব হইয়াছে উহাদের সম্বন্ধে পৃথক সংখ্যা-বিবরণ লওয়ার ফলে, নতুবা সাধারণের মধ্যে উহাদিগকে মিশাইয়া দিলে উহাদের প্রকৃত অভাব-অভিযোগ দেশবাসী জানিতে পারিবে না এবং উহারাও চরম দুর্দশায় পতিত হইবে। তাহা ছাড়া ভিক্ষুক সমস্যাও আমাদের সমাজ-জীবনকে ক্রমশ উৎপীড়িত করিয়া তুলিতেছে; অনেক কর্মঠ ব্যক্তিও আজকাল আলস্যবশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এ সমস্যা আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে। এ অবস্থায় উহাদের স্বতন্ত্র সংখ্যা বিবরণ না লইলে যাঁহারা ইহা বিদূরিত করিবার সবিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের কার্যে রীতিমত ব্যাঘাত দেওয়া হইবে।

বর্ণহিন্দুদের ও তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়ের পৃথক গণনা করা হইলেও এবার শ্রেণী হিসাবে জাত ইত্যাদির গণনা হইবে না। সমাজ-বিজ্ঞানের দিক হইতে ইহাকেও অসমীচীন বলা চলে। প্রত্যেক শ্রেণীর জনসংখ্যা, তন্মধ্যে স্ত্রী পুরুষ কত, কত অবিবাহিত বা অবিবাহিতা, কত বিধবা, শিক্ষা-দীক্ষা কিরূপ, জীবিকাই বা কি, ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করা আবশ্যক। কারণ শ্রেণী হিসাবেও ইহাদের উন্নতি-অবনতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারিলে সমাজের কল্যাণই হয়।

যেমন, কোন্ শ্রেণী পূর্বে কোন্ শিল্পে বা ব্যবসায় বিশেষে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিত, এখন তেমন আর পারে না। ইহার অন্তর্নিহিত কারণটি নির্ণয় করিয়া গলদ দূর করিবার প্রয়াস পাইলে সমাজের একটি শ্রেণী পুনরায় সজীব হইয়া ওঠে। তবে কোনও কোনও প্রাদেশিক সরকার এবিষয়ে সম্প্রদায়-বিশেষের শ্রেণী হিসাবে গণনা করার ব্যবস্থা করাইয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। কিন্তু যেখানে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই শ্রেণীগত পার্থক্য আছে সেখানে কেবলমাত্র এক সম্প্রদায়ের জন্য এরূপ ব্যবস্থা করিবার কি নিগূঢ় কারণ থাকিতে পারে এবং উহার দ্বারা কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন; নতুবা সাধারণের মনে যে সন্দেহ উঠিয়াছে উহা শীঘ্রই দৃঢ়মূল হইবে।

অর্থাভাবের অজুহাতে আরও একটি মারাত্মক ভুল করা হইয়াছে যাহার ফলে এবারে গণনা কোনওরূপেই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হইবে না বলিয়াই বিশ্বাস। পল্লীগ্রামের গণনার ভার এইবার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। এদেশের ইউনিয়ন বোর্ডসমূহকে একে তো নিত্যই কাউন্সিলের ভোটার লিস্ট, নতুবা জন্মমৃত্যুর তালিকা বা পাটের হিসাব প্রভৃতি কার্য করিতেই হয়, তদ্ভিন্ন বিনা পয়সায় উচ্চতন বোর্ড ও গভর্নমেণ্টের কত যে কাজ করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার ফলে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি নিজেদের ইউনিয়নের বিশেষ কোনও সৎকর্ম করিতে না পারিয়া ইহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ নষ্ট করিয়া শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিতেছে। সুতরাং এ অবস্থায় আরও অধিক এবং এরূপ দায়িত্বমূলক কাজের ভার চাপাইয়া দিলে উহা কতদূর নির্ভরযোগ্য হইয়া উঠিবে তাহা চিন্তার বিষয়। অবশ্য যথাযোগ্য ব্যয় করিলে ইহা যে নির্ভুল হইবে না তাহা আমরা বলি না কিন্তু অনুরূপ ব্যয় করা হয় না বলিয়াই সঠি[illegible] পাওয়া যায় না।

বিশ্বের অন্যান [illegible] শ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া ইহাকে সমাজে [illegible] ণে নিয়োজিত করিবার প্রয়াস পাইে [illegible] থা ব্যয় সংকোচের দ্বারা দেশের [illegible] ব্যাহ [illegible] নিতান্ত আযোগ্যতার পরিচায়ক। এজন্য আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া আছি, আজও আমরা শিক্ষায় বঞ্চিত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পপ্রসারে অনগ্রসর, অভাবে দারিদ্র্যে জর্জরিত। শিক্ষার সুমহান আলো পাইয়া যখন অন্যান্য দেশ কুসংস্কার আর ভ্রান্তধারণা কাটাইয়া উঠিয়া নূতনতর বৈচিত্র্যের আস্বাদনে উন্মুখ, শিল্পসম্পদ আর ধনোৎপাদনে অগ্রণী, তখনও আমরা এত সম্পদ ও সমৃদ্ধি লইয়া, এত সংস্কৃতি আর সভ্যতার ঐতিহ্য লইয়াও বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি। অথচ এই আদমসুমারি সুপরিচালনার ফলে বহু দেশ উন্নত হইল, বিশ্বের সমক্ষে আপন শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিল। এ অবস্থায় ভারতকে উন্নত হইতে হইলে অথবা সমৃদ্ধ করিতে হইলে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার ন্যায় বিপুল ব্যয়ভার ও প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়া ইহা নির্বাহ করিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের মত জটিল ও বিশাল মহাদেশেও যদি আদমসুমারি অভূতপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে তাহা হইলে ঠিক অনুরূপভাবে ভারতবর্ষেই বা হইবে না কেন?

যেখানে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে সারা দেশ সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে সেখানে উপযুক্তরূপ ব্যয় বরাদ্দ না করিলে একদিকে সুবিধা-বাদিগণের গণনায় যথেচ্ছচারিতা এবং অপরদিকে দেশের চৌদ্দ আনা অংশ পল্লীগ্রামের গণনার ভার ইউনিয়ন বোর্ডের উপর ছাড়িয়া দেওয়ায় আদমসুমারির সততা স্বতঃই কমিয়া আসিবে। এবং এই অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত বিবরণীর উপর নির্ভর করিয়া যদি শাসনকার্যের যাবতীয় বিধিব্যবস্থা ও পরিকল্পনা অনুসৃত হয় তাহা হইলে কাহারও কাহারও অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেও দেশের অধিকাংশ নরনারীর জীবনযাত্রা ও সামাজিক আবহাওয়া জটিল ও দুর্বহ হইয়া উঠিবে।

বিহারে বাঙলীদিগের দাবি ও প্রতিপত্তি খর্ব করিবার ও বাঙলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বাঙলাকে প্রত্যর্পণ করিবার প্রশ্নটি এড়াইয়া যাইবার জন্য সেখানকার বহু বাঙলা ভাষাভাষী অনুন্নত সম্প্রদায়কে হিন্দীভাষী বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে এবং গতবারেই এইরূপ করায় দুই একটি বৃহৎ শ্রেণী বাঙালী সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এবারেও যাহাতে উহার পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত যুগ্ম গণকের দ্বারা গণনা করা হউক; কিন্তু মামুলী অর্থাভাবের অজুহাত তুলিয়া উহা অগ্রাহ্য করা হইতেছে। বাঙলা দেশেও কোনও কোনও সম্প্রদায় কিছু সুবিধা লাভ করিবার জন্য গণনায় গরমিল ঘটাইবার ফিকিরে আছেন এবং এখানেও হিন্দুদিগকে খর্ব করিবার চেষ্টা চলিতেছে, যাহার দুইএকটা কার্যকারণ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য এখানেও যুগ্ম গণকের দ্বারা

গণনা করাইবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু কার্যত উহা হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আদমসুমারিতে যথেষ্ট অভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্র তো চলিতেছেই। যেমন, সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবার ছোটনাগপুরের আদি অধিবাসীদের অখণ্ড হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত না করিয়া উহাদের স্বতন্ত্র গণনা করা হইবে। ইহাতে হিন্দুজাতিকেও যেমন খণ্ডিত করা হইবে তেমনি একটা বিপুল সংখ্যাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া হিন্দুজাতিকে লঘু করিয়া দেওয়া হইবে।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া অন্যান্য দেশে আদমসুমারি নীতির সহিত তুলনা করিলে ভারত সরকারের শোচনীয় গলদই উদ্ঘাটিত হয়। অন্যান্য বহু অকাজে [illegible] যখন মাত্রাহীন ব্যয় করা সম্ভব হয়, তখন [illegible] সৎকাজেই বা ব্যয়সংকোচ করা হইবে কেন? এই [illegible] প্রত্ [illegible] যেখানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হাজার প্রতি [illegible] শত টাকার অধিক, ইংলণ্ডেও [illegible] সেখানে ভারতে ব্যয় করা হয় কিঞ্চিদ[illegible]কা মাত্র [illegible] তাহারও সংকোচ করা হইতেছে! ইহাতে আদমসুমারির মহান্ আদর্শ ও উদ্দেশ্য কতদূর বজায় থাকিবে এবং কতদূর দেশের ও সমাজের কল্যাণে তাহা নিয়োজিত হইবে দেশের মনস্বীরাই তাহার বিচার করিবেন।

আদমসুমারি আজ নানা কারণেই জাতির সহিত দেশের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া আছে। সমাজের তথা রাষ্ট্রের কিছু কল্যাণকর বিধিব্যবস্থা করিতে হইলেই আদমসুমারি যেমনি নির্ভুল তেমনি তথ্যবহুল হওয়া প্রয়োজন; যাহাতে দেশের ও দশের ছবি আয়নার মত চোখের সামনে প্রতিভাত হয়। বিশেষ করিয়া দেশে যখন শাসনভার রাজার হাত হইতে প্রজাসাধারণের হাতে চলিয়া আসে তখন আদমসুমারি আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং উহার উদ্দেশ্য আরও মহান হইয়া ওঠে। তখন এই জনসাধারণ নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই মিলিত হইয়া ব্যবস্থা পরিষদে শাসনভার পরিচালনার নির্দেশ দেন। কাজেই আদমসুমারি যথাযথ না হইলে উহার প্রতিনিধিও উপযুক্ত সংখ্যায় নির্ণিত হয় না; ফলে দেশব্যাপী নানা বাদ বিসম্বাদ ও কলহ বাড়িয়া চলে। এজন্য আদমসুমারি আজ মাত্র লোকগণনাই নহে তাহা এক একটা সম্প্রদায়ের জীবনমরণ সমস্যার স্বরূপ হইয়াছে। সুতরাং ইহা যাহাতে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হয়, তৎপ্রতি শাসক সম্প্রদায়ের যেমন লক্ষ্য রাখা দরকার, তেমনি জনসাধারণেরও ইহাতে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করা আবশ্যক। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টাতেই ইহা সার্থক ও সফল হইয়া উঠিতে পারে।

(শেষ)

শ্রীহট্টের রাজা গোবিন্দচন্দ্র

(৫৭৬ পৃষ্ঠার পর)

ইহার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। এই সাধারণ নিয়ম অনুসারেই এখানে বাস্তব হইতে কল্পনার আশ্রয় বেশী লইতে হইয়াছে।

আমরা ১২০৩ বাঙলার একখানা হাতের লেখা পদ্মা পুরান পুঁথিতে ময়নামতীর গানের আক্ষরিক মিল পাইতেছি। ১২০৩ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে যদি গোবিন্দচন্দ্র শ্রীহট্টে অজ্ঞাত হইতেন, তবে অধুনা প্রাপ্ত গানের সঙ্গে প্রাচীন হাতের লেখা পুঁথির স্থানবিশেষের অর্ধেক মিল কি করিয়া সম্ভব?

খৃষ্টীয় ৭ম শতকে শ্রীহট্টে স্বাধীন রাজ্য থাকার খবর পাওয়া যায়, সম্ভবত রাষ্ট্রের উত্থানপতনের স্বাভাবিক গতিতেই কয় শতকের মধ্যে ইহা ত্রিপুরার হস্তগত হয় এবং পরে তিলকচন্দ্র আপন দৌহিত্রকে ইহা দান করেন।

ভুলি নাই

শ্রীআশুতোষ সান্যাল, এম এ

ভুলিতে কি পারি?—এ জীবনে সখী
ভুলিব না কোনোদিন,
স্মৃতির পসরা লইয়া মাথায়
শুধিব প্রেমের ঋণ।
দেহের বেদনা ভুলে যায় লোকে,
হিয়ার বেদনা কে দেখেছে চোখে?
সেরে যায় ক্ষত তবু যে অঙ্গে
থাকে সে ক্ষতের চিন!

ভুলে গেছি প্রিয়া?—মিছে কথা ও যে,
ভোলা কি গো কভু যায়?
মনের কাঁটা যে ফুটে থাকে মনে
বনের কাঁটার প্রায়!

ভুজগ-দষ্ট অঙ্গুলি প্রায়
মর্ম উপাড়ি ফেলিব কোথায়?
কোন্ সে প্রলেপ আনি দিব মোর
মরম-যন্ত্রনায়?

ভাবিতে যে কথা পরম তৃপ্তি
ভুলিতে কি তাহা পারি?
শোকের অশ্রু হ'য়েছে আমার
সুখের অশ্রু বারি।
বেদনার রাগে রঞ্জিত হিয়া
রেখেছি ধ্যানের আসন করিয়া;
ক্রন্দন নহে—বন্দনা তোর,
নয়ন—পূজার ঝারি।
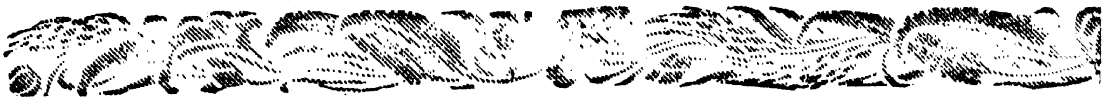
দিগন্ত

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

সে লোকটিকে কেউ মনে রাখে নি।

কিন্তু মনে তাকে পড়বেই। অসময়ে যখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়বে, অসম্ভাবিতের অকস্মাৎ আগমনে, আয়োজনহীন অতিথিসৎকারের উল্লাসে অন্তর হবে উৎসব-মুখী, তখন তাকে মনে পড়বে।

প্রকাণ্ড পুরনো কোঠাবাড়ির এক প্রান্তে ছিল একটা পরিচ্ছন্ন খড়ের ঘর; সেই ঘরে থাকতেন আমার জীবনকাকা, যাঁর কথা মনে ক'রে আজও রাস্তায় লম্বা চুল ওয়ালা লোক, দেখলে চমকে উঠি। তিনি আমার বাবার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোটো।

যেবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব, সেই বারে দিনকতকের জন্য আমরা সবাই বাড়িতে যাই। সেই সময় দেখতাম তিনি মাঝে মাঝে উঠন দিয়ে হেঁটে যেতেন। বাবার সঙ্গে দেখা হ'লেই তিনি জীবনকাকাকে একটা না একটা ছল খুঁজে অপমান করতেন। আমাদের আসর থেকে জীবনকাকা চলে গেলে বলতেন 'ওটা একটা মুখ্যু, ভদ্রসমাজের উপযুক্তই নয়।'

অথচ শুনেছি বাবা নাকি অর্থাভাবের অজুহাতে ওঁকে পড়ান নি। তিনি যখন মেদিনীপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, জীবনকাকাকে তখন তাঁর ম্যাট্রিক পাসের পর কলেজে না প'ড়ে গ্রামের টোলেতেই আদ্য, মধ্য পড়তে উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। তার প্রধান কারণ বোধ হয় অর্থাভাব। এ বাড়িতে তাঁর অন্তরঙ্গ কেউ ছিল না। পৃথিবীতে একটি মাত্র লোকের সঙ্গে জীবনকাকা ভাল ক'রে কথা বলতেন সে হচ্ছে আমার বড়দি; সে বহু দিন পর পর এ বাড়িতে আসত। এ দেশের একজন বিখ্যাত জমিদারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। দিদি ও জীবনকাকা সমান বয়সী। প্রথম প্রথম জীবনকাকার গতিবিধি কিছুই জানতাম না। দিদি আসবার পর থেকে তিনি সকলের সঙ্গে ব'সে খাবার খেতেন, দু বেলাই। তাঁর চেহারা ছিল ছবির শ্রীচৈতন্যের মত। চোখ দুটো ছিল কি রকম যেন।

ঠাকুরদাদা নাকি বৃদ্ধ বয়সে আমার আপন ঠাকুরমা বেঁচে থাকতেই, জীবনকাকার মাকে, অর্থাৎ আমার ছোট ঠাকুরমাকে বিয়ে করেছিলেন তাঁর পরম রূপের জন্য।

একদিন রাত্রে জীবনকাকা আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন না। দিদি বললে, 'আমার খাবার দিতে বারণ কর মা, কাকামণি এলে আমি ভাত বেড়ে দিয়ে তার পর খাব এখন'। মা বললেন, 'বেবীর যত বাড়াবাড়ি।' বাবা বললেন, 'সে হতভাগাটার জন্য তোকে আর জেগে থাকতে হবে না, তুই খেয়ে নে, বেবী।' বেবী অর্থাৎ আমার দিদি বললে, 'তোমরা চুপ কর।' সকলেই চুপ করল। দিদিকে ভয় করত সবাই।

সেদিন অনেক রাত্রে গোলমালের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। আমাদের শোবার ঘরের আশপাশে চাপা গোলমালের শব্দ কানে এল। জীবনকাকার ঘরের দিকে দু-একটা হ্যারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছে। দিদি কান্নাভরা উত্তেজিত গলায় চেঁচাচ্ছে, 'বাবা, আর নয়, এইবার ছেড়ে দাও। আবার, আবার কেন? এইবার ছেড়ে দাও। আমি কালই এ বাড়ি থেকে চ'লে যাব। মানুষটাকে একেবারে খুন ক'রে ফেললে তুমি।'

পাশের ঘরে দিদির কোলের ছেলে কেঁদে উঠল। মা তাকে চুপ করালেন। একটা [illegible] আমাদের মহলের দিকে এগিয়ে এল। সিঁড়ির ম[illegible]বার গলা, 'রাত দুপুরে বাড়ি ঢুকে [illegible] না করি তো আমার নামই মিথ্যে[illegible]

রহস্যের খানিকটা [illegible]আমার কা[illegible] হ'ল। জীবন-কাকা তাহলে মদ খায়! কলকাতায় আমাদের বাড়ির পাশের ধীরু মাতালের ভয়ে, ছেলেবেলার কত আবদারই না ছাড়তে হয়েছে, আর এখানে বাড়ির উপরেই মাতাল! কিন্তু দিদির কি ভয় নেই? বাড়িটা আবার নিঝুম হয়ে এসেছে।

দিদির গলা শুনতে পাচ্ছি, 'কাকামণি, লক্ষ্মী কাকামণি, এইটুকু খেয়ে ফেল। কেন যে তুমি এই সমস্ত খাও!' সেই বোবা জীবনকাকার গলায় তখন অভিনেতার সুর এসেছে; 'কোনও লাভ নেই বেবু, কোনও লাভ নেই। আমি নেশা কাটাবার জন্য নেশা করি না।' গলা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, 'পৃথিবী ময় বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছে বেবী; যারা মানুষ থেকে মানুষকে আলাদা করেছে, তারাই মদ থেকে মানুষকে আলাদা করেছে। বেশ করব মদ খাব, খেলা নেই, আনন্দ নেই, ধর্ম নেই, বাঁচব কী নিয়ে? বেশ করব, বেশ করব, এক শ বার করব।'

দিদি চেঁচিয়ে বললে, 'তোমার বকুনি থামাবে, না আমি উঠব? এ বাড়িতে মানুষ থাকে? আমি কালই চ'লে যাব।' জীবনকাকা ব'লে উঠলেন, 'ভূয়াৎ কুশেশয় রজো মৃদুরেণু রম্যা—'। দিদি ধমক দিয়ে উঠল।

হঠাৎ ঝরঝর ক'রে বৃষ্টি নামল। একলা ঘরে আমার ভয় হচ্ছিল, ঘুম আসে না। খানিক ক্ষণ পরে বৃষ্টি থামলে দেখি জীবনকাকার ঘরের আলো দেখা যাচ্ছে, কোনও কথা শুনতে পাচ্ছি না। পরবর্তী কালে অনেক মাতালকে অনেক জ্ঞানের কথা বলতে শুনেছি, কিন্তু সেই কুমারসম্ভব মেঘদূত আওড়ানো লোকটির তুলনা পাই নি। কিছুক্ষণ পরে শুনতে পেলাম জীবনকাকার আঁচানোর শব্দ।

'দেখ্ বেবী, যখন তখন অমনি ক'রে আমায় ধমকাস নি, আমার বয়েস সাতাশ আর তোর ছাব্বিশ। জীবনের বার আনা সময় তো কাটিয়েই দিলাম, আর ভাল হয়েই বা কি হবে?'

দিদি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, 'সেই জন্যই তো বলছিলাম কাকামণি, এইবার একটা বিয়ে কর।'

কোনও উত্তর শুনতে পেলাম না।

কিছুক্ষণ পরে দিদি আবার বললে, 'কথার জবাব দাও

না কেন, শ্বনতে পাও না, না কি?' কাকামণি বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কি বাজে বকছিস?' দিদি বোধ হয় চুপ করে গেল। খানিক পরে আবার শ্বনলাম, 'আচ্ছা কাকামণি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, রাগ করবে না?'

'রাগ করলে তুই তো ভারী ভয় পাস! যা বলবি বলে ফেল্।'

'সে আর আসে আজকাল?' দিদির গলায় অত্যন্ত সংকোচ।

'আসে, রাত থাকতে আসে আর রাত থাকতে চ'লে যায়।'

একটু পরে ঘরের সামনে পায়ের শব্দ শ্বনে ডাকলাম, 'দিদি?'

'কেন রে [illegible] ন্ত জেগে আছিস কেন?' বলতে বলতে [illegible] আমি জল চাইতে দিদি বারা[illegible] গে[illegible] এনে [illegible] জল খেয়ে নির্ভয়ে বললাম, 'ভয় করছে [illegible]।দিদি বললে, 'ভয় করছে? কেন রে! আচ্ছা সর্, এইখানেই শ্বই।'

একটু পরে দিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জীবনকাকা ওরকম করছিলেন কেন?' দিদি উত্তর দিলে, 'তোরা সবাই অমন জীবনকাকা, জীবনকাকা করিস কেন? আমার মত কাকামণি বলতে পারিস না?' আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, 'আচ্ছা, কাল থেকে তাই বলব, কিন্তু আমার যা ভয় করে,' দিদি বললে, 'তোদের সব বাড়াবাড়ি। কাকামণি খ্ব ভাল লোক। দেখিস না, ঠাকুর দেবতার মত চেহারা? একবার কথাবার্তা বলে দেখিস না!' ঠিক করলাম কাল সকালেই দিদির সঙ্গে কাকামণির কাছে যাব।

ঘ্বমে চোখ জড়িয়ে আসছে, এমন সময় নিষ্বতি রাতের ব্বক চিরে একটা আর্তনাদের শব্দে ঘ্বম ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্বনলাম, দিদি বলছে, 'এই রে, এত রাত্রে আবার কাকামণি তানপ্বরো বাজাতে আরম্ভ করল,' আমি বললাম, 'তানপ্বরো! তানপ্বরো কি?'

'এক রকমের যন্তোর, কাকামণি বাজিয়ে গান গায়।'

'গান গাইলে বাবা আবার গোলমাল করবেন না!'

'কি জানি। কাকামণির গান শ্বনলে বনের পশ্ব-পাখি পর্যন্ত চুপ করে থাকে, বাবা কি করবে কে জানে।'

স্বরের গ্বঞ্জন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল।—

কোথায় সংকটের ঔষধি
শংকরের হৃদিনিধি,
ওহে কৃষ্ণ, একি কষ্ট, যাদের রাখলে গৌরবে,
সেই পান্ডবের মান নষ্ট করে দ্বষ্ট কৌরবে,
ধরা প্বরিবে রবে, নামের কলঙ্ক হবে
শ্রীপদ ভেবে বিপদগ্রস্তা দ্রুপদ কন্যা দ্রৌপদী।

স্বরের বেদনায় আকাশ-বাতাস কাঁপছিল। এক ঝলক হাওয়া দিতে, গাছের পাতায় লেগে থাকা বৃষ্টির জল ঝ'রে পড়ল। গানের শেষের দিকে দিদি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিল। সে ছোঁয়াচ যে আমাকেও লাগেনি তা নয়। সামনের ঘর থেকে দেশলাই জ্বালবার আওয়াজ পেলাম। বাবা তা হ'লে জেগেই ছিলেন!

এমন অনেকগ্বলো শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা পার হয়ে এসেছি। এতদিনেও জীবনকাকার সেই লম্বা কোঁকড়ানো-কোঁকড়ানো চুল, তাঁর সেই ঠাকুরদেবতার মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনা যেমন পাই নি, তেমনি তাঁর গলার মত একখানা দরদী গলাও খ্বঁজে খ্বঁজে হতাশ হয়েছি।

পরদিন সকালে বাবা চ'লে গেলেন তাঁর কর্মস্থল সদরে, আমিও গেলাম দিদির সঙ্গে জীবনকাকার ঘরে, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হ'তে।

তখন তাঁর স্নান হয়ে গিয়েছে। মিশ কালো কোঁকড়ানো চুল থেকে দ্ব-এক ফোঁটা জল সাদা মারবেল পাথরের মত কপালের উপর ঝ'রে পড়ছে। দিদি বললে, 'কাকামণি, কাকে এনেছি দেখ।'

তিনি আমার দিকে ফিরে চাইলেন। সেইদিন প্রথম দেখলাম তাঁর চোখ। অল্প নীলাভ চোখে দেখেছিলাম ছায়াপথের রহস্যের আভাস। দিদি বলে কাকামণিকে ঠিক তাঁর মায়ের মত দেখতে; দিদি তাঁকে দেখেছিল। কাকামণি আমাকে একখানা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর গায়ে একটা মৃদ্ব স্বগন্ধ পেয়েছিলাম।

'কোন্ ক্লাসে উঠলে তুমি এবার?'

'ম্যাট্রিক ক্লাসে।'

'বাঃ বেশ তো! সেদিনের খোকা তুমি, এর মধ্যেই ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছ?'

দিদি বললে, 'ওকে একটু পড়িয়ে দিতে তো পার! আছেও তো মাসখানেক এখানে।'

'এলেই তো পারে। আমারও তো সময় বেশ কাটে।'

তার পরে টুকরো টুকরো অনেক কথারই আলোচনা হ'ল। অনেক বেলা পর্যন্ত কাকামণির সান্নিধ্যে খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে রইলাম।

একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'তে আমি কাকামণির ঘরে গিয়ে বসলাম। আমাদের পরস্পরের আকর্ষণ তখন এত বেড়ে গিয়েছে যে, আমি দিদিকে চেঁচিয়ে বললাম আমি কাকামণির কাছেই শোব। মা করলেন প্রবল আপত্তি, দিদি তাঁকে চুপ করিয়ে দিলেন। তার পর গল্প করতে করতে আমি ঘ্বমিয়ে পড়লাম।

তখনও রাতের অন্ধকার ভাল ক'রে কাটে নি, আমার ঘ্বম ভেঙে গেল। কে আমার পা ধরে নাড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে ডাকছে ঠাকুর, ওঠ ভোর হয়ে এল।" দ্ব তিনবার এ রকম ডাকাডাকির পর সাড়া দেব কি না ভাবছি, এমন সময় কাকামণি ওপাশ থেকে ব'লে উঠলেন, 'ও কাকে জাগাচ্ছ? থাক ওর ঘ্বম ভাঙিও না।'

অন্ধকার থেকে উত্তর এল, 'তুমি ওখানে? তবে এখানে কে?'

'ও খোকা, দাদার ছেলে অশোক।'

'ও, আমি তো জানি না। ও ব্বঝি তোমার কাছেই শ্বল?'

'হ্যাঁ, কাল রাত্রে গল্প করতে করতে এইখানেই ঘ্বমিয়ে

পড়েছিল। তা তুমি এখন যাও নিশা, আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। আমি এখনই উঠছি।'

তার আধ মিনিট পরেই মহিলাটি চ'লে গেল নিঃশব্দে। এই রকম দু-চার দিন চলবার পর আপনা থেকেই ভোরে ঘুম ভাঙা অভ্যাস হয়ে গেল।

একদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলাম কে যেন বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছে আর গুনগুন ক'রে গান গাইছে।—'নদীয়াতে চাঁদ উঠেছে, আয় দেখে যা প্রাণসখী।'

শুনতে শুনতে আবার ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। এমন সময় কাকামণি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'তুমি কি রাতে ঘুমও না, নিশা? রোজ এত ভোরে আস কি ক'রে!'

নিশা যার নাম, সে কোনও জবাব দিলে না। হাতের কাজ শেষ ক'রে ঘরের ভিতরে এসে কাকার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বললে,

'আমায় কিছু বলছিলে?'

'বলছিলাম, তুমি কি রাত্রে ঘুমও না?'

'ঘুমতে পারি না।'

'কেন?'

'খালি ভয় হয় কখন সকাল হয়ে যাবে আমি জানতে পারব না।'

'তুমি যদি কিছু মনে না কর নিশা তো তোমায় একটা কথা বলি। খোকা আজকাল আমার কাছে শোয়। তুমি যদি এ কদিন না আস তো ভাল হয়। ওরা তো কদিন বাদেই চ'লে যাবে।'

'খোকা থাকল তো কি হ'ল!'

'সে কথা কিছু বলছি না। ও ছেলেমানুষ, তোমার এইরকম অন্ধকারে যাওয়া-আসায় ওর মনে সন্দেহ হ'তে পারে তো?'

'ও তো ছেলেমানুষ, ওর মনে আবার কি হবে।'

'সে কথা অবিশ্যি সত্যি, তবে তুমি বিবেচনা ক'রে দেখ আমার কথাটা।'

খানিকক্ষণ কেউ কোন কথা বললে না। একটু পরে নিশা যার নাম সে আস্তে আস্তে বাইরে যেতে লাগল। যাবার সময় বললে, 'যা হয় হবে, আমি আসবই।'

এর পরে আমি নিজে থেকেই কাকামণির কাছে শোয়া বন্ধ ক'রে দিলাম।

এমনি ক'রেই দিন কেটে যায়, এমন সময় আমাদের ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এল। বহু দিন পরে পরে আসতে হয় গ্রামে, কিন্তু এবারে যা ঘটল তাতে ক'রে অবকাশ মত এই গ্রামের আতিথ্য গ্রহণের নিয়মিত বন্দোবস্তই হয়ে গেল।

আমরা আজ-যাব কাল-যাব করছি এমন একদিন সন্ধ্যা-বেলায় কাকামণি আমায় বললেন যে, গ্রামের ঘোষেদের নাটমন্দিরে আজ যাত্রা হবে। আমি যদি যাই তো যেন তৈরী হয়ে থাকি। কাকামণি যে মাঝে মাঝে যাত্রা থিয়েটার করেন তা তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি কিন্তু আজ যে একেবারে প্রত্যক্ষ দেখতে পাব এই সম্ভাবনায় অনেকের অনেক কিছুই নিষেধ ভুলে গেলাম।

রাত্রি আটটা নাগাত কাকামণি একটা হ্যারিকেন নিয়ে আগে আগে চললেন আমি চললাম পিছনে অনেক ক্ষণ ধরে। হঠাৎ চোখের সামনে ঝলমল ক'রে উঠল একটা আলোর মালা। একটা শামিয়ানার তলায় অনেক লোক ব'সে রয়েছে আর তার সামনে ঠাকুরের নাটমন্দিরে চিক ফেলা, যার আড়ালে মেয়েরা বসেছে। কাকামণি সেখানে পেঁছতেই লোকে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কর্মকর্তারা এগিয়ে এসে তাঁকে সাজঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। কতকগুলো রংমাখা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। অধিকাংশ লোকেই পায়ের ধুলো নিলে। একজন বুড়ো মতন লোক তাড়াতাড়ি কাছে এগি[illegible] এসে বললেন, 'এই যে জীবন এসেছ। নাও না[illegible] [illegible]ব'সে। এটি কে সঙ্গে? বিজয়ের [illegible] [illegible]বের ছেলে যে বড় যাত্রা দেখতে [illegible]কুে [illegible] [illegible]স যাক গে, তুমি চট ক'রে নাও [illegible] [illegible]নেক দে[illegible] [illegible] যাচ্ছে।'

একটা কালো মিশমিশে দুশমনের মত চেহারার লোক এগিয়ে এসে বললে, 'আপনার যেমন কথা চাটুজ্যে মশাই, ঠাকুর কি আমাদের মত মুখে চুন কালি মাখবে যে, দেরি হবে? যেমন এয়েচেন অমনি নেবে যাবেন।' এই ব'লেই লোকটি কাকামণির পায়ের ধুলো নিয়ে বললে 'ঠাকুর, জগাই সেজেছি, অনেক কিছুই তোমায় বলতে হবে। আগে থেকে মাপ চেয়ে রাখলাম।' কাকামনি বললেন, 'তোমরা কেউ খোকাকে কোথাও বসিয়ে দাও। যাও খোকা, এঁর সঙ্গে যাও।'

কাকামণির নির্দেশ মত সেই লোকটির সঙ্গে সাজঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমাকে সে মেয়েদের চিকের দিকে পিছন ক'রে একটা টিনের চেয়ার পেতে বসবার যায়গা ক'রে দিলে। একজন লোক এসে একটা লাল কাগজ হাতে দিয়ে গেল। খুলে দেখি তার উপরে লেখা—

জড়ুনতলা নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ গীতনাট্যাভিনয়

পাত্র পাত্রীর নামের উপোরেই দেখলাম, 'শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীজীবনানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়'। আগ্রহে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, কাকামনিই তা হ'লে শ্রীগৌরাঙ্গ!

প্রথম অঙ্কের শেষে কাকামনি এলেন। সেই লম্বালম্বা চুল, শান্ত নীলাভ চোখ, সারা গায়ে সোনার গয়না পরিয়ে দিয়েছে—শ্বেত পাথরের মত গায়ের রং। তার উপর ডে-লাইট-এর আলো প'ড়ে তাঁকে ঠিক ছবির গৌরাঙ্গের মত দেখাচ্ছিল। তাঁর অভিনয়ের ভঙ্গীতে এতটুকুও আধুনিকতার ছাপ ছিল না। তাঁর মত ক'রে অভিনয় অন্য কেউ করলে লোকে নিশ্চয়ই হেসে উঠবে, কিন্তু জীবন কাকার আবৃত্তির মধ্যে এমন একটা আবেদনের সুর বাজত যে মানুষকে না কাঁদিয়ে ছাড়ত না।

দৃশ্যের পর দৃশ্য শেষ হ'তে চলেছে, সামান্য একটু ঝিরঝির ক'রে বৃষ্টি হয়ে গেল। ত্রিপল টাঙানো ছিল ব'লে তেমন বিশেষ অসুবিধে হ'ল না। এমন সময় শুরু হ'ল সেই দৃশ্য, যে দৃশ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ মার কাছে সংসার

(শেষাংশ ৫৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আজ-কাল

প্রাচ্য সাম্রাজ্য সম্মেলন

গত ২৫শে অক্টোবর বড়লাট প্রাচ্য সাম্রাজ্য সম্মেলন বা এম্পায়ার ইস্টার্ন গ্রুপ কন্‌ফারেন্সের উদ্বোধন করেছেন। এই সম্মেলনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আফ্রিকা, মালয়, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিগণ এবং ভারত ও ব্রহ্মের সরকারী প্রতিনিধিরা যোগদান করেছেন। তা' ছাড়া ভারতীয় সরকারী প্রতিনিধিদের জন্য ভারত সরকারের মনোনীত ১৭জন বে-সরকারী পরামর্শদাতা নিযুক্ত হয়েছেন। এই পরামর্শদাত[illegible] মধ্যে ৩জন দেশীয় রাজ্য থেকে মনোনীত হয়েছেন [illegible] থেকে যাঁরা মনোনীত হয়েছেন তাঁদের ৭জ[illegible] [illegible] [illegible] ভারতবাসী। এখানে একটা কথা স্মরণ [illegible] আবশ্যক যে, অ[illegible] আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধি [illegible] ভারত বা ব্রহ্মের প্রতি[illegible] ঠিক এক শ্রেণীর নন। কারণ ঐ সকল দেশের প্রতিনিধিদের মত ভারতীয় সরকারী প্রতিনিধিদের ভারতের জনসাধারণের কাছে তাঁদের আচরণ সম্বন্ধে জবাবদিহি করার দায়িত্ব নাই। বে-সরকারী পরামর্শদাতাদের ক্ষমতা যে কি সে সম্বন্ধেও সঠিকভাবে কিছু জানা যায় নাই। বর্তমান যুদ্ধ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার দিক দিয়ে এই সম্মেলনের গুরুত্ব যে খুব বেশী তা বড়লাটের বক্তৃতা, সম্মেলনে প্রেরিত সম্রাটের বাণী, এমন কি বিলাতে ভারত সচিব আমেরীর ভাষণ থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে এ সম্মেলনের ফলাফল কি হতে পারে তা' এখন থেকেই ভাববার বিষয়। অনেকে আশঙ্কা করছেন যে, কেবল সামরিক শিল্পের প্রসারে অত্যধিক জোর দেওয়ার ফলে দেশের অন্যান্য শিল্পগুলির প্রসার ও উন্নতি ব্যাহত হতে পারে। তা ছাড়া অস্ট্রেলিয়া প্রমুখ উপনিবেশগুলি শিল্পের দিক দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে অনেক অগ্রসর এই অজুহাত দেখিয়ে ভারতবর্ষকে কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিণত করা হতে পারে, এ সন্দেহ কেউ কেউ করছেন। যুদ্ধকালীন শিল্পপ্রসারে সরকারী সাহায্যের ফলে এদেশে বিদেশী পুঁজির ভিত দৃঢ়তর হতে পারে, এ কথা চিন্তা করেও অনেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছেন। আমরা পূর্ব সপ্তাহেই বলেছি যে, এই সম্মেলনের সঙ্গে ভারতের আর্থিক তথা রাষ্ট্রিক ভবিষ্যৎ ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। কাজেই সকলেরই উচিত সংকীর্ণ বা প্রাদেশিক স্বার্থের আপাতসম্ভাবনায় প্রলুব্ধ না হয়ে দেশের বৃহত্তর কল্যাণের দিক থেকে এ বিষয়ে চিন্তা করা এবং কর্তব্য নির্ণয় করা।

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ

শ্রীভাবেকে নাগপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠান হয়েছে। সেখানে তিনি রাজনীতিক কয়েদী শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। তাঁর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও করাচী কর্পোরেশনের কাজ মুলতুবী ছিল। এর পর কে সত্যাগ্রহ করবে সে সম্বন্ধে গান্ধীজী এখনও কোন নির্দেশ দেন নাই। পুণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 'হরিজন', 'হরিজন সেবক' ও 'হরিজন বন্ধু' এই তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকের উপর এই মর্মে আদেশ জারি করেন যে, শ্রীবিনোবা ভাবের সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে কোন বিবরণ প্রকাশের পূর্বে তা' দিল্লির চীফ প্রেস অ্যাডভাইসরের কাছে দাখিল করতে হবে। এর ফলে গান্ধীজী ঐ তিনটি পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত রেখেছেন।

ধরপাকড়, খানাতল্লাস ইত্যাদি

২২শে অক্টোবর থেকে ২৮শে অক্টোবরের মধ্যে পুলিশ কলকাতার ফরওয়ার্ড ব্লক অফিস, বেঙ্গল লেবার পার্টির অফিস, অরুণাচল মিশনের মুখপত্র 'ওআর্লড পীস' পত্রিকার অফিস এবং মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতার কতকগুলি স্থানে খানাতল্লাস করেছে। এ ছাড়া বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে খানাতল্লাস, ভারতরক্ষা আইন অনুসারে কারাদণ্ড এবং কিষাণ-শ্রমিককর্মী ও ভূতপূর্ব রাজবন্দীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। শ্রীজওহরলাল নেহরুর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করার জন্য বাঙলা সরকার 'অ্যাডভান্স' পত্রিকার আমানত ২ হাজার টাকা থেকে এক হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছেন এবং আরও দুই হাজার টাকা জামানত দাখিলের আদেশ দিয়েছেন। বর্ধমানের 'বর্ধমান বার্তা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদককে ৬ মাস উক্ত কাগজে প্রকাশিতব্য সমস্ত বিষয় জেলা প্রেস অ্যাডভাইসরের নিকট দাখিলের জন্য গবর্মেণ্ট ভারতরক্ষা আইন অনুসারে আদেশ দিয়েছিলেন। তাতে ঐ কাগজের কর্তৃপক্ষ উক্ত কাগজ ছয় মাস প্রকাশ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করেছেন। নোয়াখালির 'দেশের বাণী'র সম্পাদকের উপরও তিন মাসের জন্য অনুরূপ আদেশ জারি করা হয়েছে। বাঙলা সরকার ভারতরক্ষা আইন অনুসারে এক আদেশ জারি করে আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে কোনপ্রকার সভা, শোভাযাত্রা বা জনসমাবেশ করা নিষিদ্ধ করেছেন। ভারত গবর্মেণ্ট ভারতরক্ষা আইন অনুসারে আদেশ দিয়েছেন যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধের বিরোধিতা হতে পারে এরূপ সংবাদ প্রকাশ বা এরূপ সভাসমিতির সংবাদ বা বক্তৃতা ইত্যাদি প্রকাশ নিষিদ্ধ।

বন্দীর মুক্তি

শ্রমিক নেতা শ্রীশিবনাথ বানার্জি ও শ্রমিক নেত্রী বেগম সাকিনাকে গত ধাঙড় ধর্মঘটের সময় ভারতরক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। গত ২৫শে অক্টোবর তাঁরা মুক্তি পেয়েছেন। সাম্যবাদী কাগজপত্র পাওয়ার অভিযোগে বেগম সাকিনার বিরুদ্ধে তাঁর কারাগারে থাকাকালে যে মামলা জারী করা হয়েছিল, তার তারিখ ৬ই নবেম্বর।

কেন্দ্রীয় পরিষদের উপনির্বাচন

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সূর্য্যকুমার সোমের মৃত্যুতে ঢাকা বিভাগ অ-মুসলমান পল্লী কেন্দ্রে যে উপনির্বাচন হবে, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু তাতে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এ ছাড়া শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার ও ময়মনসিংহের শ্রীঅঘোরবন্ধু গুহও ঐ কেন্দ্রে নির্বাচনপ্রার্থী হয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। সুভাষবাবুর মনোনয়নপত্র গৃহীত হলে অন্য প্রার্থীরা হয়তো মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করবেন।

সিন্ধুতে হিন্দু হত্যা

সিন্ধুতে হিন্দু হত্যা ও নির্যাতন হ্রাসের কোনই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এ সপ্তাহেও (২২—২৮ অক্টোবর) খবর পাওয়া গিয়েছে যে, সিন্ধুর রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীনিচলদাস ভাজিরাণীর বাসস্থানে গুলী বর্ষণ করা হয়েছে, শক্কর জেলার জাহানপুর গ্রামে ৮জন লোক নিহত ও ৪জন আহত হয়েছে। তা ছাড়া শিকারপুরের কাছে আরও এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। সিন্ধুর গবর্নর নাকি আশ্বাস দিয়েছেন এ অবস্থার প্রতীকার করা হবে। ফলাফল না দেখে আমরা এখনও ভরসা পাচ্ছি না।

আন্তর্জাতিক

হিটলার-পেত্যাঁ বৈঠক

হের হিটলার, ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মার্শাল পেত্যাঁ ও সহকারী প্রধান মন্ত্রী মঃ লাভাল-এর এক বৈঠক হয়। বৈঠকে মার্শাল পেত্যাঁ হিটলারের দাবীগুলি মেনে নিয়েছেন বলে প্রকাশ। হিটলারের সঙ্গে তাঁদের কি কি চুক্তি হয়েছে সঠিকভাবে জানা যায় নাই সত্য, কিন্তু অনেকে অনুমান করছেন যে, এই চুক্তির ফলে ফ্রান্স অর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সামরিক দিক দিয়ে জার্মানী ও ইতালীর সম্পূর্ণ পক্ষভুক্ত হবে। এর ফল হবে এই যে, জার্মানী ও ইতালী উত্তর আফ্রিকার, ভূমধ্যসাগরের ও অতলান্তিকের ফরাসী নৌ-ঘাঁটিগুলি ব্যবহার করতে পারবে এবং ফরাসী নৌবহরও তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। জার্মানীর হাতে আলসাস লোরেন, এবং নীস পর্যন্ত রিভিয়েরার সমগ্র অঞ্চল ইতালীকে অর্পণ; ফ্রান্স ও ইতালীর সম্মিলিতভাবে টিউনিসিয়ার শাসন পরিচালন, মরক্কোতে ফ্রান্স ও স্পেনের সম্মিলিত শাসন পরিচালন ও মিশর অভিযানে ফরাসী বাহিনী দ্বারা ইতালীয় বাহিনীর পার্শ্ব রক্ষা—এই সর্তগুলি নাকি মার্শাল পেত্যাঁকে মেনে নিতে বলা হয়েছে। এই সর্তে সম্মতির প্রতিদানে বর্দোতে ফ্রান্সকে কতকটা জায়গা ছেড়ে দেওয়ার, যুদ্ধের বন্দীদের অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়ার, ফ্রান্সের পক্ষে সুবিধাজনকভাবে নূতন করে সীমারেখা নির্দিষ্ট করার, প্যারিসে অবাধ যাতায়াত এবং শ্রমশিল্প ও আর্থিক দিক দিয়ে ফ্রান্সকে সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নাকি দেওয়া হয়েছে। এই সকল মর্মে এক চুক্তি মার্শাল পেত্যাঁ শীঘ্রই নাকি স্বাক্ষর করবেন। আরও খবর পাওয়া গেছে যে, ফরাসী মন্ত্রিসভাও নাকি পেত্যাঁকে সমর্থন করেছে। অবশ্য পরে এরূপ সংবাদও এসেছে যে, ফরাসী মন্ত্রিসভা পেত্যাঁর বিরোধিতা করবে। যদিও সে সংবাদের গুরুত্ব এখনও ঠিক বুঝা যাচ্ছে না।

হিটলার-ফ্রাঙ্কো সাক্ষাৎকার

সম্প্রতি জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সঙ্গেও হিটলারের সাক্ষাৎকার ও প্রায় দু'ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়েছে। কি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং তার ফলই বা কি হয়েছে সে সম্বন্ধে এখনও কিছুই জানা যায় নাই।

সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা

জাপান, সাংহাই ও চীনের ব্রিটিশ প্রজাদের ঐ সকল জায়গা ত্যাগের জন্য ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে বহু জাপানী ভারত ত্যাগের আয়োজন করছে। চীন-ব্রহ্ম রাস্তার উপর বোমা বর্ষণ করে কতকগুলি সেতু জাপানীরা নষ্ট করেছে বলে দাবী করছে। কিন্তু চীনারা তা' অস্বীকার করছে, অধিকন্তু বলছে যে, ঐ সকল সেতু নষ্ট হলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। কারণ মাল পারাপারের জন্য জলযানের ব্যবস্থা ঐ সকল জায়গায় বেশ ভালভাবেই করা হয়েছে। জাপানীদের বোমা বর্ষণ সত্ত্বেও কতকগুলি লরী মাল নিয়ে নিরাপদে কুনমিংয়ে পৌঁছিয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, হাওয়াই, কানাডা, আর্জেণ্টাইন, ব্রেজিল, পেরু ও চিলিতে যেসব জাপানী প্রজা বাস করে জাপ গবর্মেণ্ট তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করছেন বলে প্রকাশ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নৌ বিভাগের সেক্রেটারী কর্নেল নক্স এক বক্তৃতায় বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরের আরও সামরিক ঘাঁটি পাবে। তিনি আরও বলেছেন যে, ঘটনাচক্র কোনদিকে ও কিরূপ গতি নেয় তার উপর নির্ভর করবে ঘাঁটিগুলি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। মার্শাল চিয়াং কাইসেকের নিকট জাপানীদের পক্ষ থেকে আপোষ রফার নাকি প্রস্তাব করা হয়েছিল। আর প্রস্তাবের কতকগুলি সর্ত নাকি ছিল—ইয়াংসি অঞ্চল নিরস্ত্রীকরণ, চীনাদের কর্তৃত্বে উত্তর চীনের ৫টি প্রদেশ নিয়ে স্বায়ত্তশাসনশীল একটি রাষ্ট্র গঠন, এবং সেখানে জাপানকে পূর্ণ অর্থনীতিক কর্তৃত্ব দান, মাঞ্চুকুওর স্বাধীনতা স্বীকার আর সমস্ত বন্দরে জাপানীদের সুবিধা। এ প্রস্তাব মেনে নেওয়া মানে চীনের পক্ষে আত্মসমর্পণেরই নামান্তর। তিন বৎসরাধিককাল বহু ত্যাগ ও দুর্গতির ভিতর দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে চীন যে এখন এই অপমানকর সর্তে সম্মত হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে জাপানের তৈল সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনা এখনও চলছে। এদিকে মেক্সিকো গবর্মেণ্ট জাপানে তৈল রপ্তানি নিষিদ্ধ করে এক আদেশ জারী করেছেন।

কম্যুনিষ্ট দলন

ফ্রান্সের [illegible] গেরীতে ৬৫জন [illegible] নিস্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ[illegible] মধ্যে ১৩জন স্ত্রীলোক।

ইউরোপের হালচাল

এ সপ্তাহে জার্মান বিমান ইংলণ্ডের নানা স্থানে হানা দিয়েছে। মাঝে নাকি ইতালীয় বিমানও জার্মান বিমানের সঙ্গে গিয়ে ইংলণ্ডে হানা দিয়ে এসেছে। ব্রিটিশ বিমানও জার্মানীর নানা স্থানে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে। ফলে উভয় পক্ষেরই অল্পবিস্তর প্রাণহানি ও সম্পত্তিহানি হয়েছে। এ সপ্তাহে শত্রুপক্ষের আক্রমণে দুখানা ব্রিটিশ টহলদারী জাহাজ (পূর্বে ফ্রান্সের ছিল) বিধ্বস্ত ও একটা ব্রিটিশ ডেষ্ট্রয়ার জলমগ্ন হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ সাবমেরিনের আক্রমণে একটি ইতালীয় যোগানদার জাহাজ ডুবেছে বলে প্রকাশ। ফরাসী উপকূলে ব্রিটিশ সাবমেরিনের আক্রমণে একটা জার্মান টর্পেডো বোটও জলমগ্ন হয়েছে।

ইতিপূর্বে দানিয়ুব নদীতে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ ভার আন্তর্জাতিক দানিয়ুব কমিশন ও ইউরোপীয়ান দানিয়ুব কমিশনের হাতে ছিল। সম্প্রতি জার্মানী ঘোষণা করে যে, ঐ কমিশনগুলি ভেঙে দিয়ে একটা নূতন 'এক্সিস' কমিশন গঠন করা হবে। এতে সোভিয়েট জানায় যে, দানিয়ুব অঞ্চলে তারও স্বার্থ আছে। কাজেই সে সম্বন্ধে কিছু করতে হলে সোভিয়েটের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। ফলে দানিয়ুব সম্মেলনে রুশিয়ারও আহ্বান এসেছে এবং সোভিয়েট প্রতিনিধিদল সম্মেলনে যোগদান করতে গেছেন। সোমবার এই সম্মেলন আরম্ভ হয়েছে। এই সম্মেলনে জার্মানী দানিয়ুব নদীর জাহাজাদি চলাচল নিয়ন্ত্রণে কর্তৃত্ব লাভের চেষ্টা করবে। কিন্তু তাতে রুশিয়ার সঙ্গে তার স্বার্থ সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কি ভাবে এই ব্যাপারের সুরাহা সম্ভব হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে শুনা যাচ্ছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন, জার্মানী, ইতালী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, স্লোভাকিয়া ও যুগোস্লাভিয়াকে নিয়ে একটি সম্মিলিত দানিয়ুব কমিশন গঠনের কথা চলছে।

রুমানীর গবর্মেণ্ট এক আদেশ বলে ইংরেজদের ১৪টি শস্যবাহী জাহাজ, ৪টি টানা জাহাজ, ২টি তৈলবাহী জাহাজের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে। তা ছাড়া আরও ৬৫খানা ব্রিটিশ জাহাজ তারা হস্তগত করেছে। এগুলি রুমানিয়া সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছিল। এখন জার্মানীর দ্বারা ঐগুলি সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে। ঐ জাহাজগুলি ছাড়া রুমানিয়া দানিউবস্থিত ৪৪খানা ফরাসী জাহাজও হস্তগত করেছে। আলবানিয়া সীমান্তে গ্রীক ও আলবানীয় সেনার মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে বলে এক

(শেষাংশ ৫৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রোহিণী একদা প্রদীপের বাড়ীর কাছে মোটর দেখিল ও তাহার পর কুটীর অভ্যন্তরে "তুমি আমার আমি তোমার" নর ও নারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে শুনিল। চিত্রকর প্রদীপ জনৈকা চিত্র-রসিকাকে তাহার ঐ নামের একখানা চিত্র দেখাইতেছিল; রোহিণী বাহির হইতে শুনিয়া আসল ব্যাপারটি জানিতে পারিল না ও বাড়ী আসিয়া নটোয়ারলালের কাছেই বাহ্যতঃ আত্মসমর্পণ করিল; পূর্ব্বেকার রূঢ় ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাহিল।

"সেদিক দিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে, এই বিলাসের যোগ্যতাই ত সকলের অপেক্ষা বড় দেখা যায়। সেই অপদার্থটার তুলনায় তাহাতে ত তখন কোনমতেই উপেক্ষার বস্তু বলা সাজে না!"

দাবে মহাশয় যতদূর [illegible] পারিয়াছেন শরৎবাবুকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, কিন্তু [illegible]কতা দেখাইবার জন্য প্রদীপের বোনটির অকস্মা[illegible] [illegible] [illegible] ব্যাপারটা নাটকীয় করিয়া তুলিয়াছেন। [illegible] আর কোন বাধা[illegible] [illegible] না, তখন বিধবা বোনটিই প্র[illegible]। ও রোহিণীর মিলনে[illegible] বিঘ্নস্বরূপ হইল। বোনটি ভাইয়ের কল্যাণে ঘর ছাড়িল। প্রদীপ উন্মাদ হইয়া যে গাড়ীতে রোহিণী ও নটোয়ারলাল বোম্বাই যাইবে, তাহারই নীচে মাথা দিয়া পড়িয়া রহিল। এদিকে সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হইবার পর রোহিণী তাহাকে বাঁচাইতে ছুটিয়া চলিল। উভয়েই ঘটনাক্রমে বাঁচিল ও তাহাদের বিবাহ হইল; যে ভগবতী মা'র আশীর্বাদ ইহাদের বিবাহকে সার্থক করিল, তিনি বা সে স্বয়ং প্রদীপের বোন। গল্পের মৃত্যু এইখানেই।

রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী ওরফে কেদারনাথ ও নটোয়ার-লাল অপমানে বিতাড়িত হইয়াছিল।

আখ্যানবস্তু হিসাবে প্রায় সকলের চেহারাই বেশ মানানসই হইয়াছিল। নায়িকা রোহিণীর ভূমিকায় শোভনা খুব সরল ও সহজ অভিনয় করিলেও কোন কোন ভঙ্গি আতিশয্যে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। নায়ক প্রদীপের ভূমিকায় প্রেম আদিব সুঅভিনয় করিয়াছেন। সকলের চাইতে মিস্ প্রধান স্বচ্ছ অভিনয় করিয়াছে। কিন্তু যে কারণে রোহিণীর লঘু আচরণ তাহার চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে ঠিক সেই কারণে প্রদীপ ও তাহার ভগ্নীর ভঙ্গিগুলিতে ভাইবোন সম্পর্কের মধ্যে যে একটা নৈকট্য অথচ পার্থক্য বোধ আছে তাহা না থাকায় কোন কোন স্থানে দৃষ্টিকটু হইয়াছে। কেদারনাথের ভূমিকায় কে এন সিংহের অভিনয় প্রায় সর্বত্রই একরূপ এবং মন্দ হয় নাই। রামপ্রসাদের ভূমিকায় মজীদের অভিনয় তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নহে। সুশীলকুমার নটোয়ারলালের ভূমিকায় যথারীতি অভিনয় করিয়াছেন। সঙ্গীতের দিক হইতে চিত্রখানি বিশেষ উন্নত হয় নাই; প্রেম আদিবের কণ্ঠস্বর প্রশংসনীয় এবং মিস্ প্রধান যদি নিজে গাহিয়া থাকে, তবে তাহার কণ্ঠস্বর গানের অনুপযুক্ত; অত সরু ও মিহিকণ্ঠে গান আর্তনাদের মত শোনায়।

সেটিংএর জন্য সৈয়দকে প্রশংসা করিতে হয়। প্রযোজনা প্রশংসার্হ হইলেও পরিচালকের সংযম ও রুচিবোধ আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই লেখক মহাশয়ের এই না বলিয়া লইবার দুর্বল প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দিবার মত যথেষ্ট ঔদার্য আমাদের নাই, তাই "এই চিত্রখানি জনপ্রিয় হইয়া উঠুক" এইরূপ পেশাদারী কামনা আমরা করিতে পারি না।

বাঙলা দেশে বাঙলা সাহিত্যের দুর্ভোগ এইখানেই ক্ষান্ত নহে; প্রোগ্রামে বিভিন্ন ভাষায় গল্পটি সংক্ষেপে দেওয়া আছে কিন্তু বাংলা অক্ষর একটিও নাই। বাঙালীকে হয় ইংরাজী নতুবা হিন্দী পড়িয়া গল্প জানিতে হইবে। যাহার সর্বনাশ করিলাম তাহার প্রতি এই উপেক্ষার কম্‌প্লেক্স মনোবিজ্ঞানসম্মত।

প্যারাডাইস সিনেমায় 'বন্ধন'

২রা নভেম্বর শনিবার 'প্যারাডাইস' ছায়াচিত্র গৃহে দি বম্বে টকিজ লিমিটেডের নূতন চিত্র বন্ধনের শুভ উদ্বোধন হইবে। ছবিখানির কাহিনী রচনা করিয়াছেন শ্রীযুত শরদিন্দু বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং পরিচালনা করিয়াছেন মিঃ এন আর আচার্য। অশোককুমার ও লীলা চিৎনিস যথাক্রমে নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন এবং অন্যান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন দেশাই, পিথওয়ালা, নওয়াজ, পূর্ণিমা দেশাই, সুরেশ, জগন্নাথ প্রভৃতি।

ছবিটি একটি মামুলি প্রেমের সনাতন কাহিনী অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং দর্শকের ভাবপ্রবণতার সুযোগ লইবার জন্য গল্পের মধ্যে নানা বেদনাদায়ক ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে। গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে কমেডিতে।

বীণা চরিত্রে লীলা চিৎনিসের অভিনয় মনোজ্ঞ হইয়াছে। যাদের 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না' তাদের প্রাণের গোপন কথা লীলা চিৎনিসের অভিনয়ে সত্যই যেন খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বিরহ-বিধুরা প্রিয়ার অন্তর বেদনা, প্রিয়ার উদ্দেশ্যে মর্মন্তুদ বিলাপ, মিলন-স্মৃতি এই সব বিচিত্র সমাবেশ বীণার চরিত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অভিনয়ের মধ্যে প্রেমিকার ভয়, লজ্জাজনিত আড়ষ্টতা আছে কিন্তু অতিরঞ্জনের চেষ্টা কোথাও নাই। ইহা ছাড়া তাঁহার মধুর কণ্ঠের গানগুলির সুরে যেমন মিষ্ট কথাগুলিও তেমনি মর্মস্পর্শী। অশোককুমারের অভিনয়ে অন্তরবেদনার আবেদন বিশিষ্ট মূর্তিতে প্রকাশ পাইলেও পৌরুষের অভাব অত্যন্ত বেশী। ভোলানাথ চরিত্রে গ্রাম্য সরলতার যে প্রকাশভঙ্গি তাহা সত্যই অভিনয়ের দিক হইতে প্রশংসনীয়।

গল্পের কাহিনীতে নূতনত্বের ছাপ কিছু না থাকিলেও অভিনয়ের গুণে, পরিচালকের সংযত পরিচালনায় সত্য সত্যই বইখানি যে দর্শকদের আনন্দ বর্ধন করিতে পারিবে এ কথা ছবিটি দেখিয়াই আমরা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতেছি।

আজ কাল

(৫৮৮ পৃষ্ঠার পর)

সংবাদ পাওয়া গেছে। ইতালী ও গ্রীসের মধ্যে ডাকবিমান চলাচলও নাকি বন্ধ হয়েছে। দুটি খবরই আশঙ্কাজনক।

আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া

ইতালীয় ও ব্রিটিশ বিমানবহরের মধ্যে পরস্পরের নৌ ও বিমান ঘাঁটি আক্রমণ বেশ প্রবলভাবেই চলেছে। মিশরে ইতালীয়েরা দ্রুত অগ্রসর না হয়ে ঘাঁটি নির্মাণ করে অগ্রসর হওয়ার ব্যবস্থা করছে বলে মনে হচ্ছে। গত শনিবার মিঃ এন্টনি ইডেন মিশরের প্রধান মন্ত্রী মিঃ হাসান সাব্রী পাশার সঙ্গে আধ ঘণ্টা আলোচনা করেন। ইতালীয়েরা দাবী করেছে যে, তারা ব্রিটিশ কনভয়ের ছয়খানা জাহাজ ও লোহিতসাগরে একখানা ব্রিটিশ ক্রুজার ঘায়েল করেছে; কিন্তু এ সংবাদ এখনও সমর্থিত হয় নি।

লোহিতসাগরে একখানি ইতালীয়ান ডেস্ট্রয়ার ও ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ারের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে ইতালীয় ডেস্ট্রয়ার খানা ধ্বংস হয়েছে। সৌদি আরবে ইতালীয় বিমানের বোমাবর্ষণের ফলে মার্কিন কোম্পানীগুলির তৈল সম্পদের যে ক্ষতি হয়েছে মার্কিন গবর্মেণ্ট ইতালীর কাছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আফ্রিকায় ও পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কালো মেঘ যে ক্রমেই ঘনিয়ে উঠছে, চারদিকের তোড়জোড় থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

২৯।১০।৪০

বিষ্ণুশর্ম্মা

ব্যায়াম চর্চার ক্রমোন্নতির পরীক্ষা

ব্যায়াম চর্চার বিপুল প্রসারতা লক্ষ্য করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যায়াম পরিচালকগণ ক্রমোন্নতির পরীক্ষার জন্য বিভিন্নরূপ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সকল তালিকার মধ্যে কোনটি অনুসরণ করিলে অব্যর্থ ফল পাওয়া যাইবে, তাহার এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই। শীঘ্র যে হইবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। ব্যায়াম পরিচালকগণ সাধারণ ব্যায়াম চর্চার কোন এক নির্দিষ্ট পন্থার উপর নির্ভর করিয়া এই সকল তালিকা প্রস্তুত করেন নাই। ব্যায়াম চর্চার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে যে বিষয়টিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেই সেই বিষয়টির পরীক্ষার জন্য তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেইজন্য এই সকল তালিকার মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। তবে এই সকল তালিকার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে এ্যাথলেটিকস, খেলাধূলা বা সাধারণ ব্যায়াম চর্চার পরীক্ষা তালিকার অভাব হইবে না। যে সকল পরীক্ষা তালিকা ব্যায়াম চর্চা জগতে বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে, তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

(১) ব্রেসের মোটর এবিলিটি টেস্ট; (২) রজার্স ফিজিক্যাল এবিলিটি টেস্ট; (৩) ম্যাকক্লয়ের মোটর টেস্ট; (৪) ক্যালিফোর্নিয়া ডিকাথলস টেস্ট; (৫) ন্যাশনাল ফিজিক্যাল টেস্ট; (৬) এ এ ইউ টেস্ট; (৭) সিগমা ডেলটা পি সি।

উপরোক্ত তালিকার মধ্যে সকলগুলির ব্যবহার বর্তমানে নাই। বর্তমানে ন্যাশনাল ফিজিক্যাল এচিভমেণ্ট টেস্ট, এ এ ইউ টেস্ট ও সিগমা ডেলটা টেস্ট বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছে। তবে এই সকল পরীক্ষা তালিকার পথ প্রদর্শক হয় ন্যাশনাল রিক্রিয়েশন এসোসিয়েশন পরিচালিত এ্যাথলেটিকস ব্যাজ টেস্ট। এই পরীক্ষার ব্যবস্থা সর্বপ্রথম ১৯১৩ সালে হয়। ইহাদের চেষ্টায় ১৯১৬ সালে এ্যাথলেটিকস ব্যাজ টেস্ট ফর গার্লস আরম্ভ করা হয়। ১৯২৩ সালে এই সকল পরীক্ষা ব্যবস্থার অদলবদল করিয়া নূতন করিয়া বালক ও বালিকাদের জন্য তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ন্যাশনাল রিক্রিয়েশন এসোসিয়েশনের এই কার্যকলাপ আমেরিকার ফিজিক্যাল এডুকেশন এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২৪ সালে ফিজিক্যাল এডুকেশনের কর্তৃপক্ষগণ মোটর এবিলিটি স্টেট প্রবর্তন করিয়া সাধারণ এ্যাথলীটগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করেন। ১৯২৯ সালে ন্যাশনাল রিক্রিয়েশন এসোসিয়েশনও এক বিশেষ কমিটি নিয়োগ করিা পূর্বে প্রবর্তিত তালিকার অদলবদল করেন। মিঃ এ লেস্টার ক্রেপসার এই কমিটির চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। একরূপ বলিতে গেলে তিনিই কমিটির প্রবর্তিত তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এ এ ইউ টেস্ট অথবা এমেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়নের প্রবর্তিত টেস্ট তালিকা ন্যাশনাল রিক্রিয়েশন এসোসিয়েশনের অনুকরণেই প্রস্তুত হইয়াছে। এই তালিকা সাধারণ এ্যাথলীট অনুসরণ করিতে পারিবে না। কারণ ইহার স্ট্যাণ্ডার্ড খুবই উচ্চ। উচ্চস্তরের এ্যাথলীটদের জন্যই ইহা প্রবর্তন করা হইয়াছে। সিগমা ডেলটা পি সির প্রবর্তিত তালিকা ১৯১২ সালে গঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার পরিচালকগণ বলেন। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ ইহারা ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়ম রায়ানের লিখিত 'দি গ্রোইং সিগমা ডেল[illegible] প্রবন্ধের উল্লেখ করেন। এই প্রবন্ধটি ১৯১২ সালে [illegible] স্টুডেণ্ট নামক পত্রিকাতে প্রকাশিত [illegible]।

[illegible] ডেলটা পি সি

সিগমা ডেলটা পি সি একটি এসোসিয়েশনের নাম। এই এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে এ্যাথলেটিকস ও বিভিন্ন ব্যায়ামচর্চার উন্নতিতে সাহায্য করা। ১৯১২ সালে আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিঃ জর্জ ফিচ্ বক্তৃতা প্রসঙ্গে সুইডেনে এ্যাথলেটিকস ও সাধারণ ব্যায়ামচর্চার পরীক্ষার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। এই সভায় প্রেসিডেণ্ট রায়ান উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ বক্তৃতা হইতে সুইডেনের ব্যবস্থার কথা জানিয়া একজন ব্যায়াম শিক্ষককে সুইডেনে প্রেরণ করেন। সেই ব্যায়াম শিক্ষক সুইডেনের প্রবর্তিত ব্যবস্থার সকল কিছু ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। ডাঃ চার্লস পি হ্যাচিন্স এই ব্যবস্থা প্রচলনের ভার গ্রহণ করেন। ডাঃ হ্যাচিন্সের প্রচেষ্টায় মিনিসোটা ও ইয়েল বিশ্ব-বিদ্যালয়কে লইয়া একটি এসোসিয়েশন গঠিত হয়। এই এসো-সিয়েশনের নাম দেওয়া হয় সিগমা ডেলটা পি সি। এই এসোসিয়েশনের সভ্য হইতে হইলে প্রত্যেককে ইহার প্রবর্তিত টেস্ট বা পরীক্ষা পাস করিতে হয়। প্রথম প্রথম আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাথলিটগণ এই এসোসিয়েশনের সভ্য হইতে স্বীকৃত হন না। ডাঃ হ্যাচিন্সের চেষ্টায় ধীরে ধীরে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে এই এসোসিয়েশনের সহিত ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয় জড়িত। ক্যানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে এই এসো-সিয়েশনের সভ্য হওয়ার হুজুক দেখা দিয়াছে। সারা পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই এসোসিয়েশনের সভ্য একদিন যে হইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই এসোসিয়েশনের সভ্য হইতে গেলে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয় তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

(১) ১০০ গজ ১১-৩/৫ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিতে হইবে। (২) ১২০ গজ হার্ডল ১৬ সেকেণ্ডে। (৩) ১ মাইল ৬ মিনিটে। (৪) দৈর্ঘ্যলম্ফনে ১৭ ফিট। (৫) উচ্চলম্ফনে ৫ ফিট। (৬) জ্যাভেলিন বা বর্শা ১৩০ ফিট। (৭) গোলা ছোড়ায় ৩০ ফিট। (৮) ১০০ গজ সাঁতার ১ মিঃ ৪৫ সেকেণ্ডে। (৯) ফুটবল কিক্ ৪০ গজ দূরে নিক্ষেপ। (১০) ২০ ফিট দড়ি ১২ সেকেণ্ডে উঠিতে হইবে। (১১) হ্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড, হেড স্ট্যাণ্ড করিতে ও ডিগবাজী খাইতে হইবে।

ইহা ছাড়াও প্রত্যেক সভাকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিতে হইবে। উপরোক্ত তালিকার প্রত্যেক দিন তিনটি করিয়া পরীক্ষায় পাস করিতে হইবে। (ক্রমশ)

সমর বার্ত্তা
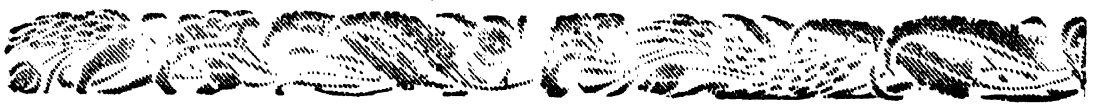
২৩ অক্টোবর।—

জ্যুরিখের এক সংবাদে প্রকাশ, এক্সিস শক্তিবর্গ ফ্রান্সের নিকট প্রস্তাব করিয়াছে যে, জার্মানিকে আলসাস ও লোরেন, ইতালীকে নিস, স্পেনকে মরক্কোর উত্তর অঞ্চল এবং জাপানকে ইন্দোচীন দিয়া দিতে হইবে। এ ছাড়া আরও খুচরা প্রস্তাব বা দাবি আছে। ভিসি গভর্নমেণ্টের এক বিশেষ অধিবেশনে এই সব দাবি আলোচিত হওয়ার পর ভোটের সংখ্যাধিক্যে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ইংলণ্ডে জার্মা[illegible] মন্দ। জার্মানির নানাস্থানে ইংরেজদের আক্র[illegible] [illegible]ার্লিনের গ্যাসের কারখানা একেবারে নষ্ট [illegible]ওয়ার সংবাদ অ[illegible] জার্মান কর্তৃপক্ষ বার্লিন হইতে শিশ[illegible]র অপসারণ জন্য [illegible]্যামবুলেন্স নিযুক্ত করিয়াছেন.

লোহিত সাগরে ব্রিটিশ ও ইতালীয় নৌবাহিনীর মধ্যে প্রবল যুদ্ধের ফলে একটি ইতালীয় ডেস্ট্রয়ার ধ্বংস হইয়াছে।

চীন-বর্মা রোড দিয়া প্রথম লরি বাহিনী কুনমিংএ উপস্থিত হইয়াছে।

২৪ অক্টোবর।—

ব্রিটেনে জার্মান বিমান আক্রমণ কিছু বাড়িয়াছে। লণ্ডন, কেণ্ট ও হ্যামশায়ার এলাকায় বোমা বর্ষিত হইয়াছে। ব্রিটিশ বিমান বিভাগের সহকারী প্রধান অধিনায়ক শ্রীযুত সি এইচ বি ব্লাণ্ট নিহত হইয়াছেন। ইংরেজরাও বার্লিন ও হামবুর্গে প্রবল হাওয়াই হামলা করিয়াছে।

জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী এক ক্ষুদ্র স্টেশনে হিটলারের ট্রেনের মধ্যে হিটলার ও ফ্রাঙ্কোর মধ্যে আলোচনা ঘটিয়াছে।

বার্লিনের এক সংবাদে প্রকাশ, মসিয়ে পেতাঁর সহিতও হিটলারের আলোচনা ঘটিয়াছে। এইসব আলোচনাকে ফ্রান্সের নিকট জার্মানির দাবি, স্পেনকে বাগাইবার চেষ্টা, আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান বন্ধের প্রয়াস প্রভৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

সাংহাই-এর সংবাদ—চীনের সহিত জাপান আপস করিবার চেষ্টায় আছে। চীন-ব্রহ্ম পথে জাপানীদের বোমাবর্ষণ চলিয়াছে। যানবাহন চলাচল বন্ধ হয় নাই।

২৫ অক্টোবর।—

হিটলারের স্পেশাল ট্রেনে হিটলার-পেতাঁ সাক্ষাৎকার হইয়াছে। নিউ ইয়র্ক টাইমসএর সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুত পেতাঁ অবিলম্বে ইতালি ও জার্মানিকে সাম্রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়া এক চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন। তাহাতে ফ্রান্স অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়া এক্সিস শক্তিবর্গের পক্ষভুক্ত হইবে। ফলে ব্রিটিশ অবরোধ নাশ করিবার জন্য জার্মানি ও ইতালি আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগর ও আটলাণ্টিকের ফরাসী নৌঘাটি যাহাতে কাজে লাগাইতে পারে, সে উদ্দেশে ফরাসী নৌবহর এই সব ঘাঁটি রক্ষায় তাহাদের সাহায্য করিবে।

জার্মানিতে ব্রিটিশ বিমান অভিযান আজ কিছু ব্যাপক। বার্লিনের উপর তিন ঘণ্টাব্যাপী প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের সংবাদ আছে। নাৎসী বিমানবহরও দলবদ্ধভাবে ইংলণ্ডে হামলা করে। লণ্ডনের জনাকীর্ণ রাজপথে অতি বিস্ফোরক বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। জার্মান হাইকমাণ্ডের ইস্তাহারে প্রকাশ, ইতালীয় বিমানবহর জার্মান অধিকৃত এলাকার বিমান ঘাঁটি হইতে ইংলণ্ড আক্রমণে জার্মানির সহযোগিতা করিতেছে।

সাংহাইএর সংবাদ—ইন্দোচীন সতর্কতা অবলম্বন মানসে শ্যাম সীমান্তে সৈন্যাদি সমাবেশ করিতেছে। ইতালি পোর্ট সইয়দ ও আলেকজান্দ্রিয়া এবং ব্রিটেন তেসেনি ও কাসলায় ইতালীয় ছাউনিসমূহে বোমা বর্ষণ করে।

২৬ অক্টোবর।—

লিয়ঁ রেডিওতে ভিসির এক সরকারী ঘোষণার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, শ্রীযুত পেতাঁ ও শ্রীযুত হিটলার জার্মানি ও ফ্রান্সের পারস্পরিক সহযোগ সম্পর্কে মূলত একমত হইয়াছেন। এই সহযোগিতার নীতি কি ভাবে প্রযুক্ত হইবে, তাহা পরে বিবেচিত হইবে।

মস্কোর সংবাদ—জার্মানির সহিত আলোচনার ফলে একটি সম্মিলিত দানিউব কমিশন গঠিত হইতেছে। প্রকাশ, অধি-রাষ্ট্রীয় (international) ও ইউরোপীয় এই দুই কমিশনই ভাঙ্গিয়া দিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন, জার্মানি, ইতালি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, শ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়াকে লইয়া একটি সম্মিলিত দানিউব কমিশন গঠন করার আবশ্যকতা বিবেচিত হইতেছে।

জার্মানি ও ইংলণ্ড এই উভয় রাষ্ট্রেই পারস্পরিক বিমান আক্রমণ পূর্ববৎ অল্পাধিক ঘটিতেছে। ব্রহ্ম-চীন পথে মেকং নদীর কয়েকটি সেতু জাপানীরা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। চুংকিংএর সংবাদ—বহুসংখ্যক ফেরি নৌকা ও রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থা থাকায় যানবাহন চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই।

২৭ অক্টোবর।—

ইংলণ্ড ও জার্মানি উভয় রাষ্ট্রেই উভয়ের অল্পাধিক বিমান আক্রমণ ঘটিয়াছে। জার্মানিতে বিমান হানায় ক্ষতি বেশী হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তবুকেও ইতালির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ নৌবহরের এক অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

চীন-ব্রহ্ম পথের উপর জাপ বিমান বাহিনীর আক্রমণ চলিতেছে। মেকং নদীর সেতুর কোনওই ক্ষতি হয় নাই বলিয়া চীনারা প্রতিবাদ করিয়াছে।

গ্রীস ও আলবেনিয়ার সীমান্তে এক সংঘর্ষ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এথেন্সের সংবাদ—ব্রিন্দিসি ও এথেন্স-এর মধ্যে ইতালীয় ডাক বিমান চলাচল বন্ধ হইয়াছে।

সোফিয়ার সংবাদে প্রকাশ, রুমানিয়া নাৎসী প্ররোচনায় এক নূতন আদেশ জারি করিয়া রুমানিয়ার দরিয়াস্থিত সমস্ত ব্রিটিশ জাহাজ ও ব্রিটিশ সনদপ্রাপ্ত জাহাজের উপর কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন।

২৮ অক্টোবর।—

বিদেশী এক রেডিওর সংবাদে প্রকাশ, ইতালীয় সৈন্যগণ আজ ভোর চারটার সময় সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গ্রীসে প্রবেশ করিয়াছে। সরকারী জার্মান নিউজ এজেন্সির সংবাদ—তিন ঘণ্টার মেয়াদে ইতালি কর্তৃক গ্রীসকে প্রদত্ত এক চরমপত্র অগ্রাহ্য করার ফলেই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। জেনারেল মেটাক্সাসের এক ঘোষণায় প্রকাশ, ইতালি গ্রীসের কয়েকটি অঞ্চল ইতালিকে ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিল। গ্রীস প্রবলবিক্রমে শত্রুকে বাধা দান করিবার জন্য স্থলে ও অন্তরীক্ষে সংগ্রামরত হইয়াছে। ব্রিটেন গ্রীসকে যথাসাধ্য সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি পাঠাইয়াছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা লণ্ডন হইতে জানাইয়াছেন, সোভিয়েট সীমান্তের এক স্থানে সশস্ত্র সন্ত্রাস-বাদী কর্তৃক এক হামলার সংবাদ মস্কো রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৩ অক্টোবর।—

বাঙলা সরকার ভারতরক্ষা বিধানের বলে এক আদেশ জারি করিয়া গভর্নমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত বাঙলার সর্বত্র সভা শোভাযাত্রা ও জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

আগামী ৬ নভেম্বর কলিকাতা হাওড়া ও গঙ্গাতীরবর্তী কারখানাসমূহে রাত্রি সাড়ে দশটা হইতে সাড়ে এগারটা পর্যন্ত আলোকহীন (black out) করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

সক্কর গ্রামে কালকের হিন্দু হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ৮ জন নিহত ও ৪ জন আহত হইয়াছে। প্রকাশ, কয়েকজন খাকী পরিচ্ছদ পরিহিত মুসলমান গ্রামে ঢুকিয়া দুজন পুলিসের লোকের নিকট হইতে মারপিট করিয়া বন্দুক ছিনাইয়া লয়। পরে কুঠার ও বন্দুকের সাহায্যে তাহারা চড়াও হইয়া হিন্দু খুন করে।

২৪ অক্টোবর।—

ভারতরক্ষা আইন।—'এডভান্স' পত্রিকা শ্রীযুত জওহরলাল নেহেরুর 'অন দি ভার্জ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করায় বাঙলা সরকার জমানতের দুই হাজার টাকার এক হাজার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। 'বর্ধমান বার্তা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সমস্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশের পূর্বে প্রেস অ্যাডভাইসরের নিকট দাখিল করিতে হইবে এই আদেশ জারির প্রতিবাদে উক্ত পত্রিকার ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত পত্রিকার প্রকাশ ছয় মাসের জন্য বন্ধ রাখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

মহাত্মাজী তাঁহার 'হরিজন' পত্র প্রকাশ বন্ধ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কারণ পরে জানা যাইবে।

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন, স্বর্গত সূর্যকুমার সোমের মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় পরিষদের শূন্য পদটির জন্য শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন।

২৫ অক্টোবর।—

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর প্রতি কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের শাস্তি-বিধানে দেশের সর্বত্র সভা-সমিতি ও বিবৃতি প্রকাশ করিয়া প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হইতেছে।

ভারতরক্ষা আইন—প্রতাপ অব্যাহত। সম্প্রতি মহাত্মাজী পরিচালিত 'হরিজন' 'হরিজন বন্ধু' ও 'হরিজনসেবক' নামক তিনটি সাপ্তাহিক পত্রের প্রতি এই আদেশ জারি হয় যে, শ্রীযুত বিনোবা ভাবে কর্তৃক আরব্ধ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে সকল সংবাদের কপি দিল্লির চীফ অ্যাডভাইসরের নিকট প্রেরণ করিয়া প্রকাশের সম্মতি লইতে হইবে। মহাত্মাজী এই তিন পত্রেরই প্রকাশ আপাতত স্থগিত রাখিয়াছেন।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন আগামী বড়দিনের ছুটিতে জামসেদপুরে হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেছে।

নিউ দিল্লীর সংবাদ—আজ শ্রীযুত বড়লাট ইস্টার্ন গ্রুপ কনফারেন্সের উদ্‌বোধন করিয়াছেন।

আরার সংবাদ—মণি-চাপতা গ্রামের অধিবাসিনী স্বর্গত মুসম্মৎ রেওয়ালী গোয়ালিনী (পূর্বে কলিকাতায় দুগ্ধের ব্যবসায় করিতেন) জনহিতকর কাজের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে ২৯ হাজার টাকা নিজের গ্রামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হইতেছে।

ছাত্রনেতা শ্রীযুত গৌর গঙ্গোপাধ্যায় হঠাৎ শ্রীরামপুর জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। পুলিসের নূতন আদেশের বলে তাঁহাকে আপাতত স্বগ্রামে অন্তরিত হইয়া থাকিতে হইবে।

২৬ অক্টোবর।—

শ্রীযত শরৎচন্দ্রের প্রতি কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের আচরণে দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের সংবাদ আসিতেছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকার' নিউ[illegible] সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, সংবাদপত্র সম্বন্ধে যে ন[illegible] অর্ডিন্যান্স জারি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে নিউদিল্লীর সম্পাদক মহলের অভিমত এই যে, গভর্নমেণ্টের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বিশিষ্ট সংবাদপত্রের পরিচালকবর্গের মধ্যে অবিলম্বে বৈঠক হওয়া উচিত।

সিন্ধুর হিন্দুবধ আন্দোলনের ফল স্বরূপ আজ শিকারপুরের নিকটে আর এক[illegible] হিন্দু নিহত হইয়াছে।

২৭ অক্টোবর।—

ভারতরক্ষা আইন।—ভা[illegible] [illegible]রপাকড়, খানা-তল্লাশ ইত্যাদি সমানে [illegible]।

বর্ধমানের সর্ব[illegible] [illegible]র্গাপূজার প্রতিমা বি[illegible]নের মিছিল লইয়া যে বিরোধ হইয়াছে তাহার মীমাংসার চেষ্টায় ব[illegible]গীয় হিন্দু মহাসভার এক ব্যক্তি বর্ধমানের হিন্দু নেতাদের পরামর্শ মত এক আপসের ব্যবস্থা করেন। এই আপসে মুসলমানদের আপত্তি ছিল না। এই প্রস্তাব ম্যাজিস্ট্রেটের গোচরে আনিলে তিনি আধ ঘণ্টা পরে জানান যে, আপসে পুলিশের সম্মতি নাই। কাজেই বিসর্জন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের প্রতি যে শাস্তি বিধান করা হইয়াছে তাহার জন্য দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও সভাসমিতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

বোম্বাইএ শ্রীযুত এম এস আনের জন্মতিথি উপলক্ষে আহূত এক জনসভায় শ্রীযুত আনে মহাত্মাজীর বর্তমান সত্যাগ্রহের প্রণালীর সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা দেশের স্বাধীনতা আসিতে পারে না; আর বলিয়াছেন, পাকিস্থান আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের সম্মিলিত হওয়া প্রয়োজন।

২৮ অক্টোবর।—

ভারতরক্ষা আইন—কুড্ডালোর, ত্রিচিনপল্লী, শিলচর, নিউদিল্লি, পেশোয়ার, ঢাকা, নোয়াখালি, ফরিদপুর প্রভৃতি নানা স্থান হইতে উক্ত আইনের প্রতাপের সংবাদ আসিয়াছে। বাঙলার বিশিষ্ট কংগ্রেস বামপন্থী নেতা ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ভূতপূর্ব সভ্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ কাহালী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

সিন্ধুর হিন্দুবধ আন্দোলনের ফলে সক্করের খানসুর নামক স্থানে আর একজন হিন্দু নিহত হইয়াছে। এ ছাড়া আরও তিনজন নিহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানি সুভাষচন্দ্রের শারীরিক অসুস্থতার জন্য আলিপুরের অ্যাডিশন্যাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্থগিত রাখিয়াছেন।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ বিবৃতি ইত্যাদি প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীযুত ফজলুল হকের আবাসে আহূত এক আপস-সভায় কালকের তারিখে প্রকাশিত আপস-শর্তানুযায়ী বর্ধমানের প্রতিমা বিসর্জনের গোলমালের অবসান হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীযুক্ত অঘোরবন্ধু গুহ ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার ঢাকা বিভাগের অমুসলমান নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের উপনির্বাচনে চতুর্থ নির্বাচনপ্রার্থী সুভাষচন্দ্রের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার করিয়াছেন। ২৯ অক্টোবরের সন্ধ্যায় সুভাষচন্দ্রকে যথারীতি নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

দিগন্ত

(৫৮৬ পৃষ্ঠার পর)

ত্যাগের অনুমতি চাইছেন জলকণাগুলো আলোর সামনে চকচক করছে, পাশে ভেজা কদমফুলের গন্ধে আসছে কিশোর কৃষ্ণে...

জীবনকাকার ক্লান্ত ক..., নিজের ব্যর্থতার অনুতাপ, সর্বাঙ্গীণ আত্মনিবেদনে ভদ্রলোক শ্রোতাদের গলা বন্ধ হয়ে আসছিল, অন্ধ শিক্ষিতেরা চোখ মুছছিলেন, অশিক্ষিত ও বৃদ্ধেরা তো হু হু ক'রে কেঁদে উঠছিলেন।

পিছনে মেয়েদের ভিতর কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। এই সার্বজনীন কান্নার দৃশ্য অভিভূত হয়ে অনুভব করছি, এমন সময় পিছনে চিকের ... শুনতে পেলাম কে যেন ডাকছে 'ও নিশা, ... করছিস কেন? ওগো ও নিশার মা, ... নিশা কেমন ... দেখ!'

এর পরে অনেকক্ষণ ধ'রে জল ... ত্যাদির জন্য হাঁকাহাঁকি চলল। সমস্ত আসর সুদ্ধ লোক জিজ্ঞাসা করছে 'কি হ'ল!' কর্মকর্তারা গম্ভীরভাবে উত্তর দিচ্ছেন, 'ও কিছু নয়, এদিকে মন দেবার দরকার নেই, যেমন গান শুনছিলে তেমনি শোন।'

এই ঘটনার আর খানিকক্ষণ পরে পালা শেষ হয়ে গেল। লোকজন সব আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল, আলোগুলো সব আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেলা হ'ল, শুধু ঠাকুর দালানের মাঝখানে একটা কেরোসিনের আলো জ্বলতে লাগল। তবুও কাকামনির দেখা নেই। নিশা মামটি আমার অত্যন্ত চেনা; তবে যে কি হ'ল জানবার জন্যে আমার উৎকণ্ঠার অন্ত নেই, অথচ কাকামনির কোন উদ্দেশ পাচ্ছি না।

অবশেষে তিনি এলেন। গম্ভীরভাবে শুধু ইশারা করলেন তাঁর পিছন পিছন যেতে। তিনি সোজা নাটমন্দিরে গিয়ে উঠলেন। সেখানে ভয়ানক অন্ধকার; সেই অন্ধকারে কাকে লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কেমন আছে?' অন্ধকার থেকে উত্তর এল, 'জ্ঞান হয়েছে বোধ হয়, তা হ'ক আর নাই হ'ক, কোনও রকমে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে বাবা।' কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা, এমন সময় অন্ধকার থেকে তৃতীয় কণ্ঠের শব্দ এল 'উঃ আর পারি না।' দ্বিতীয় কণ্ঠ কাতর স্বরে ব'লে উঠল, 'কি হয়েছে নিশা? অমন করছিস কেন মা?' উত্তর হ'ল, 'বুকটা ফেটে যাচ্ছে মা, নিশ্বেস নিতে পারছি না। ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে। লক্ষ্য করি নি যে কাকামনির হাতে একটা ঘটি ছিল। তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন 'উঠে ব'স নিশা, জল খাও।'

নিশা যার নাম সে নির্বিবাদে উঠে বসল এবং জল খেল। কাকামনি জিজ্ঞাসা করলেন বাড়ী যেতে পারবে, হেঁটে?'

'পারব, মায়ের কাঁধে ভর দেব না হয়।'

'তাই চল।'

আলো হাতে ক'রে তিনি আগে আগে চললেন, আমি চললাম তাঁরও আগে। পিছনে একবারও ফিরে চাই নি। শুধু একবার পাশাপাশি এসে পড়েছিলাম তাই দেখতে পেলাম, নিশা যার নাম সে সম্মোহিতের মত পথ চলছে মায়ের কাঁধে মাথা রেখে। রাশি রাশি জল ঢেলে কারা তার চুলের বোঝা ভারী ক'রে দিয়েছে।'

আমরা কখনও বনের মধ্যে দিয়ে কখনও চালা ঘরের পাশ দিয়ে পথ চলতে লাগলাম। দু একটা অজানা জীব-জন্তুর সাড়া পাচ্ছি, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে কাকামনির মুখের দিকে চেয়ে নির্ভয় হবার সাহস পর্যন্ত হচ্ছে না। অত রাত্রেও দু-একজন লোক জেগে আছে, বোধ হয় যাত্রা গানের আলোচনা করছে।

একটা খড়ের ঘরের পাশ দিতে যেতে যেতে শুনতে পেলাম কে যেন বলছে, 'নিশার মায়েরই তো বাড়াবাড়ি। মেয়ে তো আর আজ বিধবা হয় নি। তুই বদ্যির ঘরের মেয়ে, তোর অত বাড়াবাড়ি কেন? মেয়ে চুলে গন্ধতেল মেখে শুয়ে শুয়ে বই পড়বেন, গুনগুন ক'রে গান করবেন, আর মা ব'সে ব'সে দেখবেন। ছি ছি ছি, কি কেলেঙ্কারিটাই করলে আজ! তুই যদি দেখতিস নন্দা, নিশার সে কি হাত পা নাড়ার ভঙ্গী।—'ওকে যেতে দিও না, যেতে দিও না, আমি তা হ'লে ম'রে যাব'। ছি ছি ছি,......গ্রাম শুদ্ধ ঢি ঢি প'ড়ে গেল?—কে যায় আলো হাতে?'

কাকামনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন 'আমি'।

আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা বহু পুরনো কালের শান বাঁধানো পুকুর আছে, ভয়ানক সাপের ভয় সেখানে। এক কাকামনি ছাড়া এদিকে আর কেউ আসে না। বাড়ির কাকাকাছি এসে কাকামনি বললেন, 'খুড়ীমা, আলো উঁচু ক'রে ধরছি তোমরা চ'লে যাও।'

যখন ওরা পৌঁছে গেছে বলে মনে করলেন, তখন কাকামনি আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সেখান থেকে তানপুরোটা বের ক'রে কাকামনি বললেন। খোকা তোর কি ঘুম পেয়েছে?'

আমি বললাম 'না।'

'আমার সঙ্গে এস, একটু পরেই শোব এখন।'

তখন যে প্রায় শেষ রাত্রি তা বোধ হয় কাকামনির মনে ছিল না। যাই হ'ক আমি তাঁর পিছনে পিছনে চললাম এবং অবশেষে তিনি সেই পুরনো পুকুরটার একটা সিঁড়ির উপর গিয়ে বসতে আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। তানপুরোটা বেঁধে নিয়ে তিনি আস্তে আস্তে গান ধরলেন। আস্তে আস্তে সুর চড়তে লাগলো।—

এ বনেতে বনমালী, কোথা তব বনফুল
কার লাগি ধায় এত, দলে দলে অলিকুল।

অসম্পূর্ণ সৃষ্টির কদর্যতায় যাদের আত্মা ইহলোকে তৃপ্তি পায় নি, পরলোকেও যারা অশান্ত, নিরবলম্বন, তাদেরই অভিযোগের কান্না যেন অন্তরীক্ষে শুনতে পেলাম, তাদের অনুযোগে আকাশের তারারা লজ্জায় স'রে গেল।

প্রিয়তমের সাথে চরম বিচ্ছেদের কান্নাও শেষ হয়ে যায়, দেশ ভাসানো বন্যার পরেও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি এক সময় থামে: সে গানও তেমনি ক'রে শেষ হয়ে গেল।

ধূসর অন্ধকারে পিছন থেকে পেলাম মৃদু কান্নার শব্দ। যে কাঁদছিল কাকামনির ঠিক পিছনে ঘনকালো ভিজে চুলের রাশি মাটিতে লুটিয়ে, কাকামনি তার মাথায় উপরে হাত রেখে বললেন, 'কাঁদছো কেন নিশা?' যে মুখ কখনও দেখি নি সে মুখ তখনও দেখলাম না, শুধু কান্নার

মাঝে উত্তর শুনলাম, 'এমন ক'রে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আর কাটাতে পারি না।'

কাকামনি বললেন, 'আমি কি করব নিশা?'

'চল, কোথাও চ'লে যাই।'

কাকামনি খানিকক্ষণ কোনও উত্তর দিলেন না। শেষে খুব শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম হাসতে হাসতে তাঁর চোখে জল এসে গেল। চুলগুলো দু পাশে সরিয়ে নিশা যার নাম সে উঠে বসল, বললে, 'অত হাসছ কেন? আমার কথা শুনে?'

কাকামনি কোনও কথা না ব'লে তানপুরায় আবার সুর দিলেন।—

নন্দিনী ব'লো নগরে,
ডুবেছে রাইরাজনন্দিনী, কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সায়রে।'

হঠাৎ গান থামিয়ে আবার হাসতে লাগলেন। নিশা যার নাম, সে বললে, 'তা হ'লে কি এমনি ক'রেই দিন চলবে? আমি তো আর পারি না।' কথার প্রথমে মিনতি শেষে হতাশা।

কাকামনি তখনও হাসতে লাগলেন থেমে থেমে। শেষে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে তানপুরাটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে নিশা যা[illegible] ও ছড়ানো চুলের রাশ সামলাতে সামলাতে [illegible] উঠে দাঁড়াল। কাকামনি একটু এগিয়ে তার প্রতিবাদের সংব[illegible]খলেন।—

'নিশা, চল যাই'র' [illegible]

অত্যন্ত আস্তে যে [illegible]শা বললে, 'কোথায়?'

'সে কথা আমিও ঠিক জানি নি। চল বেরিয়ে পড়িগে!"

নিশা যার নাম সে বোধ হয় একটু অবাক হ'ল,—'এখুনি?'

'হ্যাঁ, এখুনি।'

'কিন্তু রাত যে শেষ [illegible] এসেছে। আকাশ যে আলো হয়ে এলো? লোকে দেখ[illegible]

'লোকে জানে স[illegible] না হ[illegible]খবে?'

না এমন [illegible] এখনও হয় [illegible]—লোকে রাত জেগে গান [illegible]নছে, কেউ ঘুম থে[illegible] ওঠে নি, কিন্তু তোমার বইপত্রগুলো? তানপুরোটা?'

'খোকা তুলে রাখবে এখন—আর খোকাই যত্ন করবে এখন থেকে।'

নিশা যার নাম সে তাড়াতাড়ি বললে, 'তা হ'লে আর দেরি নয়, চল।'

পুস্তক পরিচয়

নিরুক্ত:—বাঙলা কবিতার ত্রৈমাসিক পত্র। সম্পাদক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য। প্রতি সংখ্যা আট আনা।

আশ্বিনের পুজোর বাজারে এ বছর 'নিরুক্তে'র প্রকাশ সাহিত্যানুরাগীদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কবিতার এই নূতন পত্রিকাটি হাতে পড়তেই যুগপৎ আনন্দিত এবং শঙ্কিত হলাম। আনন্দিত হলাম এই ভেবে যে, কবিতার পাঠক বাঙলা দেশে নিশ্চয় বাড়ছে এবং তাদের অনেকেই গাঁটের কড়ি ব্যয় ক'রে পত্রিকা কিনে পড়ছেন নইলে বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদিত 'কবিতা' বাজারে বেঁচে থাকা সত্ত্বেও উচ্চ মূল্যের আরেকটি নতুন পত্রিকা বের করবার সাহস পত্রিকা সম্পাদকদের হয় কোথা থেকে? আধুনিক বাঙলা কাব্যের 'উন্মার্গযাত্রার' ব্যথায় ব্যথিত হয়ে কাব্যের সুস্থ আদর্শ অটুট রাখার আগ্রহে নিরুক্তের প্রকাশ—এটা সম্পাদকীয় মুখ্য প্রেরণা হলেও একমাত্র এই ভরসাতে আজকের এই দুর্মূল্যতার দিনে কেউ ঘরের কড়ি খরচ ক'রে বনের মোষ তাড়াতে পারে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শঙ্কিত হলাম সম্পাদকরূপে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম দেখে। প্রায় বছর পাঁচেক আগে এমনিতরো আর এক শারদীয় আশ্বিনে 'কবিতা' পত্রের প্রথম সম্পাদনার লগ্নে 'প্রথমা'র কবিকে যুগ্মসম্পাদকরূপে দেখেছিলাম। আজ এই নূতন পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে পুরাতন সম্বন্ধের কোনো বিরোধ সূচিত হল না ত? 'আধুনিক বাঙলা কবিতা' বইটির সমালোচনায় কিছু কণ্টকিত তীক্ষ্ণ খোঁচার চিহ্ন দেখে মন থেকে এই ধারণা সম্পূর্ণ মুছতে পারলাম না। মতভেদ হওয়া মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ ব'লেই বিশ্বাস করি, কিন্তু সেই মতভেদের উপর ভিত্তি ক'রে নতুন পত্রিকার ধ্বজা কারুকে উত্তোলন করতে দেখলে মনে ভয় হয়, বুঝিবা আর এক স্বাধীন চিত্তের সুস্থ বিভেদ বুদ্ধি ক্রমশ বিকৃত রূপ নিয়ে দেশের মাটিতে পাকা ভিৎ গাড়লো। বাঙলার সাম্প্রতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছুকাল আগেও এই ধরনের ধ্বজাধারীরা কী দলাদলি ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টিই না করেছিলেন!

'নিরুক্ত' হাতে নিয়ে 'কবিতা' পত্রের কথা মনে পড়া কিছু অস্বাভাবিক নয়, কারণ এই দুই পত্রের গোত্র এক। নিরুক্তের এই প্রথম সংখ্যা কবিতা পত্রিকার প্রথম কয়েক সংখ্যার তুলনায় হীনপ্রভ বলে বোধ হ'ল, বাইরের সৌষ্ঠব সুরুচিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও। রবীন্দ্রনাথের ছোট চিঠিটি কবিগুরুর বক্তব্যের অপ্রমত্ত ঐকান্তিকতায় এই সংখ্যার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। ওটিকে বাদ দিলে পত্রিকাটি কেবল সম্পাদকীয়ের জোরে নিজেদের উদ্দেশ্য পাঠকদের মনে ফুটিয়ে তুলতে পারত কি না সন্দেহ। 'সাম্প্রতিক কাব্যের রোগের লক্ষণ' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ভবিষ্যতের ভরসায় ফেলে না রেখে এই সংখ্যায় আরম্ভ করলে সম্পাদকীয় নিবন্ধ তার নীহারিকারূপের পরিবর্তে সুস্পষ্ট আকার প্রাপ্ত হত এবং অপরপক্ষে অনুদ্দিষ্ট 'রুগ্ন' কবিমানসের প্রতিও সুবিচার হত।

রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত থেকে শুরু ক'রে সঞ্জয় ভট্টাচার্য পর্যন্ত প্রায় ষোলজন কবির কবিতা নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সজনীকান্ত দাসের কবিবন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্রকে লেখা কবিতাটি, উৎকৃষ্ট কাব্য বলে নয়, প্রেমেন্দ্রের প্রতি সজনীবাবুর এতদিন পরে হঠাৎ নেকনজর দেখে। ছন্দ ও ভাষা থাক আর নাই থাক সজনীবাবুর খেয়ালের অনেক অজানা 'আরোর' খবর এ কবিতায় নিঃসন্দেহে পাওয় গেল। ভাল কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হুমায়ুন কবীর ও প্রমথনাথ বিশীর সনেট দুটি এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের স্বাধীন ছন্দের 'রূপ কোথা আছে' কবিতাটি, কিন্তু জানিনা কেন এই কবিতাটি এবারের পূজাসংখ্যা আনন্দবাজারেও দেখলাম। অনেক দিন পরে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের একসঙ্গে তিনটি কবিতা পড়ার সুযোগ হ'ল। ভাষায় অনুপ্রাসের পুরাতন মুদ্রাদোষ অনেকাংশে ত্যাগ ক'রে আর এক মুদ্রাদোষে দুষ্ট করা হয়েছে নতুন কবিতা দুটিকে, কে বলবে নতুন কিছুর নেশাতেই কি না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা কয়টি যথারীতি সুপাঠ্য হয়েছে, মনে হাল্কা মোহেরও সঞ্চার করে, কিন্তু কেবল শেষেরটি ছাড়া অন্যগুলি তাঁর ভাল কবিতার মধ্যে পরিগণিত হবার মত সবল নয়।

'নিরুক্তের' বিশেষত্ব রবীন্দ্রোত্তর প্রবীণ ও নবীন কবিদের একত্র সমাবেশ। এ মিলন ক্ষণিক 'মাহের সৃজন' যদি না হয়, তবে বলতেই হবে এতদিনে কাব্যচর্চার এক সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'ল। যেখানে বর্তমান বাঙলা কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল গোত্রনির্বিশেষে সকল কাব্যামোদীদের জন্যেই শ্রদ্ধার সঙ্গে বিতরিত হবে। রবীন্দ্রনাথের কামনা অনুযায়ী সাহিত্যের সুস্থ স্বরূপ নিজের সবল দৃষ্টান্তের ফলে রুগ্ন সাহিত্যকে সম্পূর্ণ আরোগ্য বা নিঃশেষিত ক'রতে পারুক বা না পারুক আজকের দুর্দিনে মিলনের এই প্রশস্ত ক্ষেত্রের মূল্যও বড় কম নয়। কাব্যে বীতশ্রদ্ধ পাঠকদের নতুন উৎসাহে কবিতার পথে ফিরিয়ে আনবার জন্যে এমনি একটি নিরঙ্কুশ মিলন ক্ষেত্রের একান্ত প্রয়োজন ছিল।

৭ম বর্ষ] ২৩শে কার্তিক, শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 9th November, 1940 [৫১ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কারাগারে জওহরলাল—

গোরখপুরে গত ৬ই এবং ৭ই অক্টোবর দুইটি আপত্তিকর বক্তৃতা করিবার অভিযোগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ৪ বৎসর কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। নূতন কিছু নয়—দেশ, কাল এবং পাত্র সবই ঠিক আছে। পরাধীন দেশে স্বাধীনতাকামীদের ভাগ্যে এই পুরস্কারই লাভ হয় এবং পণ্ডিত জওহরলালের ভাগ্যে উহার প্রাচুর্য বহুপূর্বেই ঘটিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় না হইলেও আমরা আশ্চর্য হইয়াছি, এ দেশের শাসকদের নীতির দূরদর্শিতার কত অভাব, তাহা উপলব্ধি করিয়া। পণ্ডিত জওহরলাল ভারতের জনমান্য নেতা এবং ভারতের জনমতের প্রতিনিধি-স্বরূপে তিনি আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। পণ্ডিতজী কি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কড়া খবরদারির কৃপায় তাহা জানিবার উপায় আমাদের নাই; তবে আমাদের স্থির বিশ্বাস এই যে, তাঁহার সেই বক্তৃতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপর্যস্ত হইবার কারণ ঘটে নাই। মহাত্মাজীর সংগে পণ্ডিত নেহরু দেখা করিয়া ফিরিবার অল্পসময়ের মধ্যে পণ্ডিতজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহার পূর্বে শুনা যাইতেছিল যে, মহাত্মাজী পণ্ডিত নেহরুকেই পরবর্তী সত্যাগ্রহী মনোনীত করিবেন; গভর্নমেণ্টকে বিব্রত না করার জন্য মহাত্মাজীর যেমন ঐকান্তিক ইচ্ছা, তাহাতে মহাত্মাজী এখনই পণ্ডিতজীকে সত্যাগ্রহ করিতে বলিতেন কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। মহাত্মাজী বাধ্য হইয়া হয়তো যে পথ পরে এক সময়ে অবলম্বন করিতেন, গভর্নমেণ্ট আগাইয়া গিয়া নিজেরাই সে কাজটা করিলেন। ডাক্তার অচ্যুত পটবর্ধনের ১৫ মাস কারাদণ্ডের ভিতরে এই নীতিরই প্রসার দেখা যাইতেছে। গভর্নমেণ্টের স্বার্থের দিক হইতেই এই নীতির অনিষ্টকারিতা সুস্পষ্ট—এ ব্যাপারে আমাদের বিস্ময়ের বিষয় শুধু এইটুকু।

বন্দী সুভাষচন্দ্র—

সুভাষচন্দ্রের বৃদ্ধা জননী আজ রুগ্ন শয্যায় শায়িত। জননীর কাতর নয়ন পুত্রের মুখ দেখিবার জন্য ব্যাকুল; কিন্তু কারাপ্রাকার ব্যবধান করিয়া রাখিয়াছে। রুগ্ন শয্যায় শায়িতা জননীর বুকে এই বেদনা বাঙলাকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের এই অপরাধ যে তিনি স্বদেশ প্রেমিক; ইহা ছাড়া, তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিচারে কোন অপরাধ এখনও প্রমাণিত হয় নাই। সুভাষচন্দ্র ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন, পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য পত্রও যথারীতি সুভাষচন্দ্র পাইয়াছেন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এ সম্বন্ধে কথাও উঠিয়াছিল; কিন্তু পরিণতি তাহার কি হইতে পারে, পূর্বেই জানা ছিল। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র যখন অন্তরণে আবদ্ধ অবস্থায় সদস্য নির্বাচিত হন, তখনও পরিষদে এই প্রশ্ন উঠে; কিন্তু টিকে নাই। পত্রী পাঠান দস্তুর মাত্র, হুকুমনামা নয়। সুতরাং বড়লাটের পত্রী বাঙলা সরকারকে সুভাষচন্দ্রকে পরিষদের উপস্থিতির দায়িত্বে বাধ্য করিতে পারে না। জানিতাম এসব কথা; কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইল এই যে, জনমতের দিকে তাকাইয়া, যদি বাঙলা সরকার তাহা না মানিতেও চাহেন, তাহা হইলে মানবতার দিকে তাকাইয়া সুভাষচন্দ্রকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা উচিত। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল সুভাষচন্দ্রকে যদি মুক্তি দান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সে

কাজ দূরদর্শিতারই পরিচায়ক হইবে। দেশের জনমতকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলে অশান্তির কারণই তাহাতে বৃদ্ধি পায়; বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টি ছাড়িয়া যদি এই সত্যকে স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের তেমন কার্য দেশের শান্তির সহায়কই হইবে।

অপ্রিয় হইলেও সত্য—

গত সপ্তাহে বারানসীতে যুক্তপ্রাদেশিক ভারতীয় খৃীষ্টান সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুত ধরমদাস যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার অন্তর্নিহিত স্বদেশপ্রেম, স্পষ্টবাদিতা এবং সত্যনিষ্ঠা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। সংখ্যালঘিষ্ঠের যে প্রশ্ন ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা প্রদানে ব্রিটিশ প্রভুদের উদার ইচ্ছাকে পদে পদে প্রতিরুদ্ধ করে, তিনি সেই সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ সংরক্ষণের ধুয়ার মূল্য কি, অভ্রান্তভাষায় উন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্রিটিশ রাজনীতিকরা যদি একবার ঘোষণা করেন যে, ভারতবাসীদের দ্বারা নির্ণীত শাসনতন্ত্র তাঁহারা কার্যকর করিতে কৃতসংকল্প, তাহা হইলেই সেই মুহূর্তেই যত ভেদ-বিভেদ দূর হইয়া যাইবে এবং সর্বস্বীকৃত শাসনতন্ত্রও অবিলম্বে নির্ধারিত হইবে। শ্রীযুত ধরমদাস বলেন, হিন্দু-মুসলমানের ভেদ বিরোধের জন্য দোষী প্রধানত সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের যাঁহারা প্রবর্তক তাঁহারাই। ভারতসচিব আমেরি সাহেবের বক্তৃতাকে তিনি ভারতের জাতীয়তার পক্ষে অবমাননামূলক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-নীতিই যে ভারতের জাতীয়তা গঠনের প্রকৃত অন্তরায় এবং ভেদ-বিরোধের প্ররোচক, শ্রীযুত ধরমদাস চোখে আঙুল দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থকে যাঁহারা বিভিন্ন করিয়া দেখেন, তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার পরিপন্থী। আমরা আশা করি, মুসলমান সমাজের মধ্যে যাঁহারা স্বাধীনচেতা এবং দেশের কল্যাণকামী, তাঁহারা শ্রীযুত ধরমদাসের বক্তৃতায় অনুপ্রাণনা লাভ করিবেন।

বড়লাটের কার্যকাল বৃদ্ধি—

বড়লাটের কার্যকাল আরও এক বৎসর বৃদ্ধি করা হইয়াছে; যুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ রাজনীতিকরা অন্যদিকে ব্যস্ত—ইহাই বোধ হয় কারণ। বড়লাটদের এই সব আসা-যাওয়ার সঙ্গে আমাদের ভাগ্যের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই; কারণ ভারত শাসন ব্যাপারে তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের স্থান অতি সামান্য, ব্রিটিশ নীতিচক্রের পাক অনুসারেই তাঁহাদিগকে চলিতে হয়। লর্ড লিনলিথগো ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারেন নাই। শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ, সমর পরিষদ সংগঠন প্রভৃতি স্বাধীনতার প্রাণবস্তুহীন পদার্থের দ্বারা তিনি ভারতের স্বাধীনতাকামীদিগকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু এখন তিনি বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, এইরূপ ফাঁকা বোলচালের নীতি ব্যর্থ, তাই রুদ্রনীতিই প্রকট হইয়[illegible] সুতরাং লর্ড লিন-লিথগোর কার্যকাল[illegible]ঙ্গে ভারতের শাসনচক্রে লোকমতানুবর্তিত[illegible] সুযোগ গ্রহণের প্রবৃত্তির কোন সম্পর্ক[illegible]া আশা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

ভারতের স্বাধীনতা ও নারী সমাজ—

যুক্তপ্রদেশ খৃীষ্টান মহিলা সম্মেলনের সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী উমা নেহরু। তি[illegible] বলেন, স্বাধীনতার প্রশ্নই আজ বড় প্রশ্ন এবং যত[illegible]রতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ না করিবে, তত[illegible]ের কোন [illegible]্যারই স্থায়ীভাবে সমাধান হইবে[illegible] ভারতের সামাজিক [illegible]বং শিক্ষাগত সংস্কারকে [illegible]রা রাজনীতিক এবং অ[illegible]তিক সমস্যা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি না। যদি সামাজিক সংস্কার যথাযথভাবে করিতে হয় এবং শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ বিস্তার সমাজের সর্বস্তরে করিতে হয়, তাহা হইলে সকলের আগে দরকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ। শ্রীমতী নেহরু মহিলাদিগকে দরিদ্রের কুটীরে কুটীরে গিয়া দীন-[illegible]রিদ্র নারীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে বলেন। শ্রীযুক্তা নেহরুর উক্তি নারী সমাজের পক্ষে বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। শুধু বড় বড় কথার কোন মূল্য নাই। প্রয়োজন ভারতের দীন-দরিদ্রের জন্য প্রকৃত বেদনা বোধের; এই বেদনা বোধ যতই তীব্র হইবে, ভারতের রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রেরণা ততই প্রবলতা লাভ করিবে। নারী সমাজের সর্বত্র সেই প্রেরণা সত্য হইয়া উঠুক।

আমেরিকার নির্বাচন—

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন হইয়া গেল। আন্তর্জাতিক অবস্থার সঙ্গে এই নির্বাচনের বড় একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিজড়িত আছে বলিয়া আমরা শুনি; কিন্তু আমরা ভারতবাসী, আমাদের সঙ্গে এই ব্যাপারের বিশেষ যে যোগ আছে ইহা আমরা মনে করি না। কারণ আমেরিকার রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রাটিক এই দুই দলের মধ্যে নীতি-গত পার্থক্য এখন বলিতে গেলে নামে মাত্র দাঁড়াইয়াছে। রিপাবলিকান দলের প্রার্থী উইলকি বলেন, রুজভেল্ট স্বেচ্ছাচারীর মত শাসন চালাইয়াছেন, আমি তৃণাদপি সুনীচ, জনগণের একান্ত বশংবদ ভৃত্য; রুজভেল্টও আওড়াইয়াছেন সেই কথা। তিনি বলিয়াছেন, উইলকি ব্যবসায়ী দলের স্বার্থ সমর্থক, আমি জনসেবক, প্রমাণ আমার নব বিধান। প্রকৃতপক্ষে নব বিধান এখন পচা জিনিস হইয়া পড়িয়াছে। পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে দুইজনের মতই সমান। আমেরিকার স্বার্থ, ইংরেজের সাহায্য ব্যাপারে দুই-জনই সমানভাবে ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন। রুজভেল্ট যদি নির্বাচিত হন এই সংকটে ব্রিটিশের স্বার্থ তিনি দেখিতে বাধ্য হইবেন। উইলকি নির্বাচিত হইলেও তথাকথিত মনরো নীতির গোঁড়ামি তিনিও ছাড়িতে বাধ্য হইবেন।

প্রেসিডেণ্টের ব্যক্তিত্বের ... জগতের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাই আমেরিকার নীতি ... রিবে বিশেষভাবে এবং পরাধীন ভারতের সঙ্গে ... তর্জাতিক রাষ্ট্র-নীতির প্রত্যক্ষ স্পর্শ যখন ... এই নির্বাচনের ফলাফলের জন্য আমাদের উদ্বে... থাকিতে পারে না।

ধর্মের নামে বর্বরতা—

সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতাকে আমরা বর্বরতা বলিয়া মনে করি, বিংশ শতাব্দীতে মধ্য... বর্বরতা শিক্ষা সভ্যতা যে দেশে আছে সে ... চিত ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় ... র্ষ পরাধীন, ...তের অন্য সব জায়গায় এই ... া বন্ধ হইলেও ভারতে ... চালু আছে। পাবনার কৃষ্ণল...া কীর্তনের উপর জুলুমবাজি, বারাসতে হিন্দু সভার উপর চড়াও প্রভৃতি সংবাদে ইহারই পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি এলাহাবাদ হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে আমরা বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। এলাহাবাদে একটি হিন্দু মেলায় কয়েকজন মুসলমান গুণ্ডা হিন্দু মহিলাদিগকে অবমানসূচক ভাষায় কথা বলে, হিন্দুরা ইহার প্রতিবাদ করিতে গেলে কলহ ঘটে। এই কলহে স্থানীয় মুসলমান দোকানদারেরা হিন্দুদের পক্ষে যোগ দিয়া গুণ্ডাদের কার্যের নিন্দা করে। ফল যাহা হইবার তাহাই হয়, মুসলমান গুণ্ডারা ঐ সব মুসলমানদিগকে আক্রমণ করে। হিন্দুরা তখন আক্রান্ত মুসলমান দোকানদারদিগকে নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দান করেন। গুণ্ডার কোন জাতি নাই, হিন্দুই সে হউক, আর মুসলমানই হউক গুণ্ডা যে সে গুণ্ডা, কোন ভদ্রলোকই হিন্দু বা মুসলমানের বিচার করিয়া গুণ্ডামিকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এলাহাবাদের মুসলমান দোকানদারগণ যে দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখিয়াছেন, সাম্প্রদায়িকতার অন্ধতায় মুসলমান সমাজের মধ্যে অনেকেই সে দৃষ্টিতে দেখে না, কুসংস্কারাচ্ছন্ন উত্তেজনা তথাকথিত শিক্ষিতদের বুদ্ধিকেও বিগড়াইয়া দেয় এবং বর্বরতার অনুকূলে একটা অযৌক্তিক ঝোঁক জাগায়। অধিকাংশ স্থলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অনর্থের কারণই হইল এই অযৌক্তিক অন্ধতা—ধর্মের নামে অধর্মের ভাব। এলাহাবাদের ব্যাপারে গুণ্ডামির আকারটা একটু স্থূল ছিল, ততটা স্থূল আকার না ধরিলেও ধর্মের নামে যে সব বাতিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সুক্ষ্ম তত্ত্বে সাড়া দেয়, তাহার বর্বরতাও কম নহে, বরং তাহার অনিষ্টকারিতা আরও সাংঘাতিক এবং তাহার অনিষ্টকর প্রভাব আরও সুদূর প্রসারী, স্থূল গুণ্ডামি অপেক্ষা ধর্মের দোহাইয়ের গুণ্ডামির অনিষ্টকারিতা এই জন্য বেশী যে, ইহা সমাজের সুস্থতাকে জীর্ণ করিয়া ফেলে এবং হিতাহিত বিচারের ভেদরেখাকে বিলুপ্ত করিয়া মার্জিত রুচিকেও বিগড়াইয়া দেয়।

দণ্ডের কঠোরতা—

কবির কথায়, "বন্ধন শৃঙ্খল যার চরণ-বন্দনা করি করে নমস্কার, কারাগার করে অভ্যর্থনা" জওহরলাল **এমন** শক্ত মানুষ। যে অপরাধে শ্রীবিনোবার তিনমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে, সেই শ্রেণীর সমান অপরাধেই পণ্ডিত জওহরলালের প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে দীর্ঘ চার বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড। দণ্ড দিবার ক্ষমতা আইন অনুসারে অবশ্য বিচারকের ছিল; কিন্তু এমন কঠোর দণ্ড বিধান করিবার সত্যই কি প্রয়োজন ছিল। কঠোর দণ্ডে তাঁহাকে যে শোধরান যাইবে এমন আশা করা ভুল, কারণ ইতিপূর্বেও তিনি কম করিয়া সাত বার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। কঠোর এই কারাদণ্ডে জওহরলালের নিজের কোন ক্ষতি হইবে না, জাতির কিছু ক্ষতি হইবে; কিন্তু সে ক্ষতিও পোষাইয়া যাইবে জওহরলালের দেশ সেবার আদর্শের অনুধ্যানের গভীরতার ভিতর দিয়া। জাতি দীর্ঘ চার বৎসরকাল জওহরলালকে হয়ত দেশ সেবার ক্ষেত্রে পাইবে না; কিন্তু তাঁহার দেশ সেবার প্রেরণা হইতে কারা প্রাচীর জাতিকে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হইবে না। ক্ষতি হইবে সব চেয়ে ব্রিটিশেরই বেশী, ব্রিটিশের আদর্শ সত্যই যদি গণ-তান্ত্রিক হয় এবং হিটলারী মত ও ফ্যাসিস্ট মতের বিরোধী হয়, তবে জওহরলালের কারাদণ্ডে ব্রিটিশ জাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। জওহরলাল মনে প্রাণে ফ্যাসিস্ট বিরোধী—ফ্যাসিস্ট বিরোধী মতের তিনি ধারক, বাহক ও পৃষ্ঠপোষক। ব্রিটিশ জাতি জওহরলালের অবদান হইতে যে শক্তি লাভ করিত, তাহা হইতে সে বঞ্চিত হইল। জবাবে আমরা শুনিব যে ইহাই বিধান; আইনের বিধান পাওয়া গেল; ইতিহাসের বিধান কাল দেবতা নির্ণয় করিবেন।

নূতন কর বৃদ্ধি—

গত মঙ্গলবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের অর্থ সচিব নূতন কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। আয়করের উপর শতকরা ২৫ টাকা সারচার্জ ধরা হইবে। এ চার্জ আয়কর যিনি দিবেন, তাঁহাদের সর্বস্তরেই সমান। বৎসরে দুই হাজার টাকা যাঁহার আয়, তাঁহারাও যে অনুপাতে, যাঁহার দুই লক্ষ টাকা আয় তিনিও দিবেন সেই অনুপাতেই। খামের দাম ৪ পয়সা হইতে ৫ পয়সা হইবে, টেলিগ্রামের মাসুল এক আনা বাড়িবে, বুক পোস্টের মাসুলও বাড়ানো হইবে। এই কর বৃদ্ধির ফলে যুদ্ধের বাজারে গরীবের উপর যে চাপ পড়িবে তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় যেখানে কর্ম সেখানে জনমতের কোন মূল্য নাই, সকলই নীরবে সহ্য করিতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধীর কর্মপন্থা—

মহাত্মা গান্ধী অনশন ব্রত অবলম্বন করিবেন কিনা এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোন সংবাদ জানা যায় নাই। প্রকাশ যে, ওয়ার্কিং কমিটির সভায় মহাত্মাজী বক্তৃতা প্রসঙ্গে অনশন ব্রত অবলম্বনের কথাও তুলেন। অপর সংবাদে জানা যায় যে, ৯ই নবেম্বর তিনি উপবাস আরম্ভ করিবেন। তিনি যাহাতে অনশন ব্রত অবলম্বন না করেন, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ

তজ্জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। মহাত্মাজী যে সংকল্প একবার গ্রহণ করেন, তাঁহাকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা কঠিন। তিনি স্থিরসংকল্প পুরুষ। এমন কথাও শুনা যাইতেছে যে, বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ-প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, পৃথিবী এবং ভারতের অবস্থা জটিল; এই জটিল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া তিনি অহিংস-নীতি প্রচারের উপরই জোর দিবেন। 'হরিজন' পত্র বন্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় মহাত্মাজীর মনের ভাব নাকি এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি যদি তাঁহার দেশের এবং পৃথিবীর জনসাধারণের নিকট তাঁহার বাণী প্রচার করিতে না পারেন তবে তাঁহার জীবন ধারণ বৃথা। দেশের সমস্যা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইবার সময় আসিয়াছে, ভাবপ্রবণতার স্থান আর নাই। আশা করি মহাত্মাজী তাহা বুঝিয়াই তাঁহার কর্ম-পন্থা নির্ধারিত করিবেন এবং নীতি নির্ধারণের বেলায় বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার কার্যকারিতার বিচার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতায় সমাচ্ছন্ন থাকিবে না।

মুন্সিগঞ্জের দাঙ্গা—

উন্মত্ত জনতা কলেজের হিন্দু ছাত্রাবাসের মধ্যে ঢুকিয়া মুনশীগঞ্জে দিনে দুপুরেই কলেজের একটি ছেলেকে নির্মম-ভাবে মারপিট করিয়া[illegible] সংবাদে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। হিন্দু[illegible] কোন ছাত্র সত্যই কোন মুসলমানের গা[illegible]ছিল কিনা জানা যায় না; অন্তত ইচ্ছাপূর্ব[illegible]মত কোন কারণ দেখা যায় না, দৈবাৎ পথের [illegible] জল পড়িলেও পড়িতে পারে। সামান্য এই ব্যাপার, এমন ব্যাপার সদাসর্বদাই ঘটিয়া থাকে। এই অপরাধে একেবারে সরাসরি বিচার দাবি, শুধু তাহাই নয় একেবারে লিঞ্চিংয়ের রকমফের অভিনয় বাঙলা মুল্লুকেই ঘটিতে পারে দেখিতেছি। আর আমরা বিশেষ বিস্ময় বোধ করি[illegible]কলেজের অধ্যক্ষের দুর্বলতা দেখিয়া। [illegible]র [illegible]তাকে ছাত্রাবাসের মধ্যে ঢুকিতে না দে[illegible]। যদি কে[illegible]ক, তাঁহার দণ্ডের ব্যবস্থা তিনি[illegible] এই বলিয়া তা[illegible]দৃঢ়তা দেখান উচিত ছিল। তিনি তাহা না করিয়া উন্ম[illegible]জনতার হুকুম তামিল করিতে বসিলেন, অসহায় ছা[illegible]কে আনিয়া দাঁড় করাইলেন কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানহীন গুণ্ডা প্রকৃতির লোকদের কাছে—এমন ক্ষেত্রে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। এখন তদন্ত প্রভৃতি চলিতে থাকুক। কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রলোক অসহায় ছাত্রটিকে জনতার হাত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া প্রহৃত হইয়াছিলেন এবং একজন মুসল-মান ডাক্তারই ছাত্রটির প্রাথমিক চিকিৎসা করেন, ইহাই একমাত্র আশার কথা।
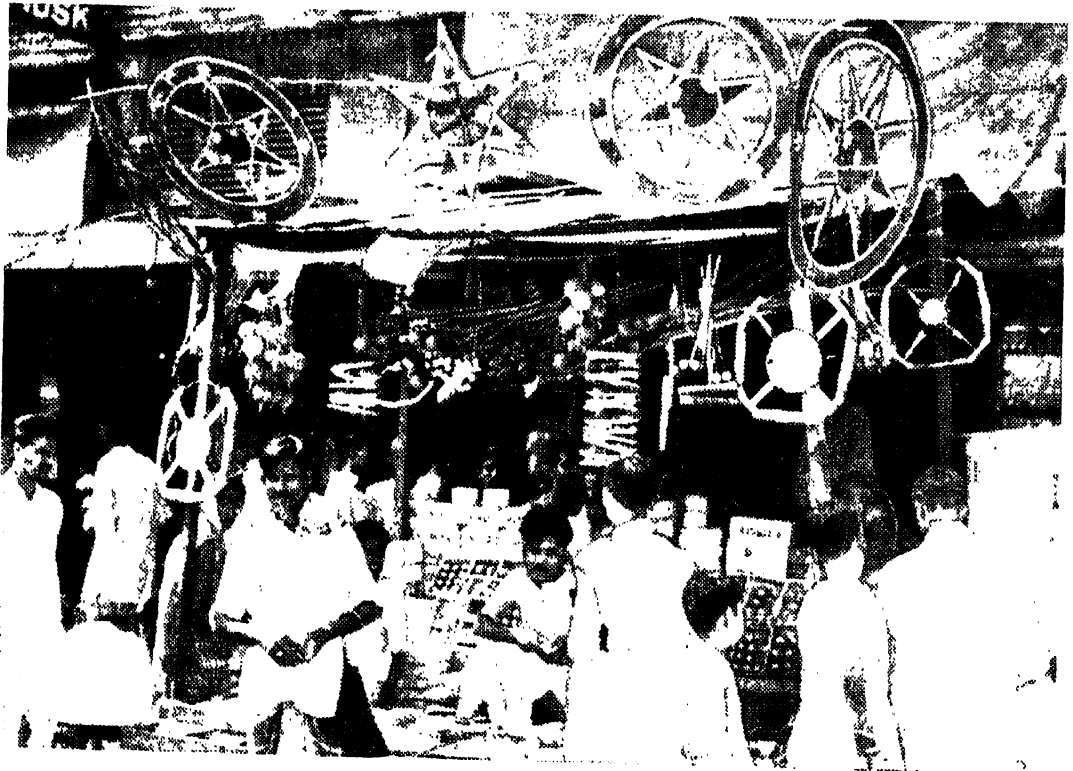
কলিকাতায় কালীপূজোর বাজির দোকান

ব্রি   সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান

ইতালির সেনাদল গ্র   য়াছে। গ্রীস প্রবল শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া   র নিজের কিছু নয়। মুসোলিনির সেনাবাহিনী   সীমানা অতিক্রম করিয়া প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ   র বিরুদ্ধেই অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। জার্মানি এখনও সরকারীভাবে গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই। আজকাল তাহা প্রয়োজনও হয় না। ইতালির গ্রীস আক্রমণের মূলে যে জার্মানির প্রেরণা আছে, ইহা স   করা ইতালির পক্ষ   উদ্দেশ্য হই   দেশের স্বার্থকে   করিয়া   রের নীতিকে আনুকূল্য করা, দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রীস ইতালি ও জার্মানির এই উদ্দেশ্য সাধনে অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে।

ইতালি ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ শক্তিকে কায়দায় ফেলিবার জন্য গ্রীসের কয়েকটি স্থান দখল করিতে চাহিয়াছিল, গ্রীস নিজের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাতে রাজী হইতে পারে নাই। গ্রীসের অবস্থান যেরূপ তাহাতে ভূমধ্যসাগরের দিকে ইংরেজের উপর চাপ দিতে হইলে জার্মানি ও ইতালির পক্ষে গ্রীসকে হাত করা নিতান্ত দরকার। পূর্ব দিকে আক্রমণের জোর বাড়াইবার জন্যই তাহারা এই উদ্যমে ব্রতী হইয়াছে ইহা সুস্পষ্ট। ইতালি ও জার্মানি দেখিয়াছে যে, মিশরের দিকে যদি তাহারা আক্রমণে জোর দিতে চায়, তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরে ইংরেজ বসিয়া থাকিবে না। ইংরেজেরা যদি গ্রীসের পশ্চিম উপকূলের আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ দখল করে, তাহা হইলে আদ্রিয়াতিক সাগরের দিকে ইতালিকে কাবু হইয়া পড়িতে হইবে। সেইরূপ এজিয়ান সাগরের সাইক্লেডস্ দ্বীপ ইংরেজ দখল করিলে ডেডোকানিজ দ্বীপপুঞ্জের ইতালির সামরিক ঘাঁটি অকেজো হইয়া পড়িবে। ইহা ছাড়া, গ্রীসের উপকূলবর্তী কয়েকটি বন্দর হাতে রাখিতে পারিলে উত্তর আফ্রিকায় অভিযানের সুবিধা হইবে। গ্রীসের বন্দরগুলি ইতালির হাতে গেলে ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশে ইংরেজের নৌশক্তির গতিবিধি সংকটসংকুল হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে ইংরেজের হাতে যদি ঐ সব বন্দর যায় তাহা হইলে মিশরের উপকূলবর্তী সামরিক ঘাঁটিগুলি এবং সাইপ্রাস দ্বীপের ইংরেজের ঘাঁটি দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। গ্রীসকে সাহায্য করিবার জন্য ব্রিটিশ নৌবহর এমন চেষ্টা করিতে পারে, জার্মানি এবং ইতালি ইহা বুঝিয়াছে। এইজন্যই গ্রীসের নিরপেক্ষতাকে দলন করিয়া তাহাদের এই চাল। ন্যায়, নীতি এবং অপরের স্বাধীনতার দিকে জার্মানির যে ভ্রূক্ষেপ নাই, আমরা ইতিপূর্বেই তাহা দেখিয়াছি, জার্মানির দোস্ত ইতালিই বা তাহা করিবে কেন? সুতরাং গ্রীসের নিজের কোন অপরাধ না থাকিলেও সে অপরাধী।

জেনারেল মেটাক্সাস ঘোষণা করিয়াছেন যে, গ্রীস কিছুতেই
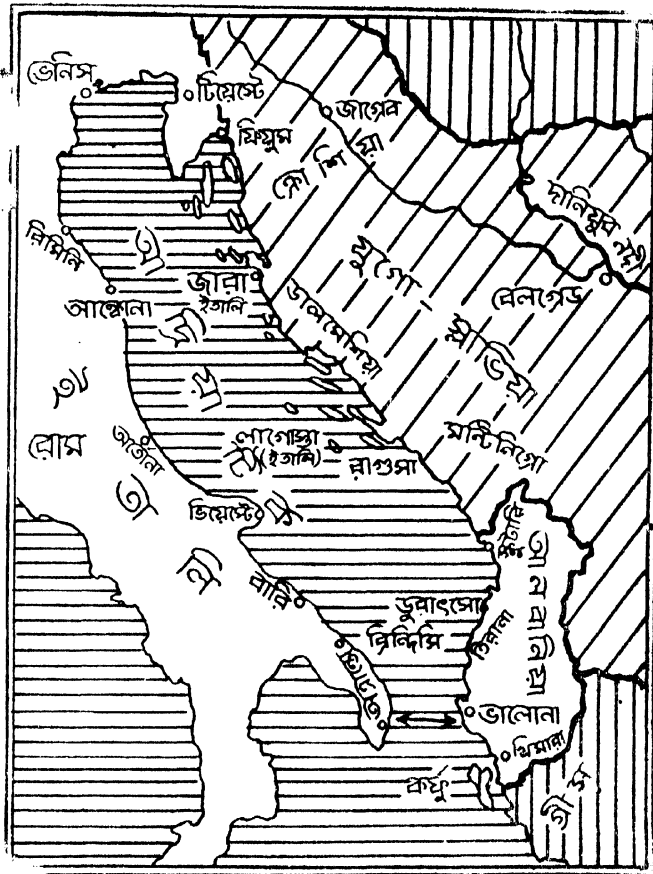
আত্মসমর্পণ করিবে না, শেষ পর্যন্ত লড়িবে। জেনারেল মেটাক্সাস রাজতন্ত্রবাদী। তাঁহার মতিগতি জার্মানি এবং ইতালির সর্বময় প্রভুদের মতের অনুকূলেই এতদিন ছিল। বিগত মহাসমরের পূর্বে জার্মানির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কাইজর তাঁহাকে 'খোকা মলটকে' বলিয়া আদর করিয়া ডাকিতেন। যুদ্ধের সময় তিনি মিত্রপক্ষের অনুকূল মত অবলম্বন করেন; কিন্তু গ্রীসের কর্তৃত্ব লাভ করিয়া তিনি ফ্যাসিস্টপন্থীই ছিলেন। গত জুন মাস হইতে বলিতে গেলে গত ৪ বৎসর হইতেই গ্রীসে একনায়ক শাসন চলিতেছে। গ্রীসের অধিবাসীরা গণতান্ত্রিক প্রকৃতির; এজন্য মেটাক্সাস্ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি কঠোর হস্তে জন-আন্দোলন পিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার কঠোর নীতির পীড়নে গ্রীসের প্রতিভাবান ব্যক্তিরা অনেকে দেশত্যাগ করিয়াছেন, কেহ কেহ আত্মহত্যাও

করিয়াছেন। মেটাক্সাসের নীতির পরিবর্তন ঘটাইয়াছে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় সংকট। আজ গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহার এই প্রচেষ্টায় গ্রীসের অতীত মর্যাদা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহার কথায় গ্রীসের পুরাতন সুর শুনা যাইতেছে। গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজ কবি বাইরন এবং রবার্ট ব্রুকের দান অতীত ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। পশ্চিম গ্রীসের মেসোলোঘি শহরে বাইরনের স্মৃতি-সমাধি রহিয়াছে এবং গ্রীসের সাইরেন্স নামক নির্জন দ্বীপে ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রুকের সমাধি রহিয়াছে। গ্রীস বর্তমানে প্রবল শক্তি নহে, তাহার সেনাশক্তি বেশী নয়। গ্রীসের লোকসংখ্যা বর্তমানে সত্তর লক্ষেরও কম। এথেন্স, স্যালোনিকা, পাত্রাস প্রভৃতি শহরের লোকসংখ্যা বেশী। দেশ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে উন্নত নহে। বাদাম, তামাক, মদের ব্যবসা, চাষবাস এবং মাছের কারবারই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। গ্রীসের বেতনভোগী স্থায়ী সেনার সংখ্যা মাত্র আশি হাজার। যুদ্ধের জন্য ৬ লক্ষ সেনা পর্যন্ত সে সজ্জিত করিতে পারে বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস। গ্রীসের বিমান শক্তি অতি ক্ষুদ্র, ৩০খানা মাত্র উড়োজাহাজ আছে, নৌশক্তিও সামান্য; দুইখানা পুরানো ধরনের ক্রুজার আছে, ১০খানা ডেস্ট্রয়ার এবং ৬খানা সাবমেরিন আছে। এমন অবস্থায় গ্রীস যে আজ প্রবলতর শক্তির সম্মুখীন হইয়াছে ইহাতে তাহার অতীত স্বাধীনতাপ্রিয়তার কথাই মনে পড়ে।

ইতালি দুই দিক হইতে গ্রীস আক্রমণ করিয়াছে। একদল ইতালীয় সেনা স্যালোনিকার দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে, আর [illegible] া করিতেছে, সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া জা[illegible] ক। স্যালোনিকার উপরই ইতালির বিশেষ [illegible] র অধিকৃত আলবেনিয়ার সীমানা হইতে ফ্লো[illegible] রিয়া তৎপর ম্যাসিডোনিয়ার ভিতর প্রবেশ করিয়া [illegible] সেনারা স্যালোনিকা দখল করিতে চায়। স্যালোনিকা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রধান বন্দর। ফ্লোরিনা হইতে স্যালোনিকা ৮০ মাইলের বেশী দূরে নয়। ফ্লোরিনা শহর হইতে, ঠিক শহর না হইলেও, [illegible] মাইল পূর্ব হইতে উত্তর গ্রীসের প্রধান [illegible] রেলপথ আকাবাঁকাভাবে

হিটলার

গ্রীসের রাজধানী 'এথেন্স'

গিরিসঙ্কটের ভিতর ...কা পর্যন্ত গিয়াছে। মনে হয়, এই রেলপথ দ... ...ীয় বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু আলবেনিয়া ... পথ পর্যন্ত পৌঁছানো সহজ নয়। পথ অত্যন্ত ... গিরিসঙ্কটের ভিতর থাকিয়া গ্রীক সৈন্যগণ ... ...হিনীকে বাধা দিবে। ইতালীয় বাহিনীর দ্বিতীয় আক্রমণ চলিতেছে দক্ষিণ আলবেনিয়ার কোনিজা হইতে দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের অভিমুখে, কর্ফু দ্বীপকে গ্রীসের আভ্যন্তর সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলাই বোধ হয়, এই অভি... উদ্দেশ্য। এই অভিযান সফল করিতে পারি... ...গরে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া ... এবং ... ...র সংযোগ-সূত্র ছিন্ন ... ফেলিতে পারি... ...ক জ্ঞান যাঁহাদের ... তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন ... ...গোশ্লাভিয়া এবং বুলগেরিয়ার পথে অভিযান চালাইতে পারিলেই মুসোলিনির পক্ষে সুবিধা বেশী ছিল; কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া কিংবা বুলগেরিয়া কাহাকেও চটান মুসোলিনি কিংবা হিটলার কাহারও ইচ্ছা নয়। পক্ষান্তরে মুসোলিনি এবং হিটলার বুলগেরিয়াকে গ্রীসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার এবং তাঁহাদের অনুকূল মতাবলম্বী করিবার চেষ্টাই করিবেন।

গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী

বুলগেরিয়ার রাজা বোরিস সুস্পষ্টভাবেই জার্মানি এবং ইতালির পক্ষে। বুলগেরিয়ার মন্ত্রিসভাও জার্মানি ও ইতালির সমর্থন করিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছে। গ্রীসের খানিকটা জায়গার জন্য বুলগেরিয়ার সঙ্গে গ্রীসের বহুদিন হইতে বুঝাপড়া চলিতেছে, এই সুযোগে বুলগেরিয়াকে সেই দাবির জন্য জোর দিতে জার্মানি এবং ইতালি উস্কাইতে চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু সেদিকে সংকট হইল তুরস্ক। তুরস্ক ঘোষণা করিয়াছে যে, গ্রীস-বুলগেরিয়ার সীমান্তের নিরাপত্তা ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত সে কোন পক্ষে যোগ দিবে না এবং তুরস্কের মতিগতিও অনেকটা নির্ভর করিবে রুশিয়ার উপর। জার্মানি এবং ইতালি এই সংঘর্ষ এড়াইয়া নিজেদের কাজ হাসিল

মুসোলিনী

করিতেই চেষ্টা করিবে। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, জার্মানি ও ইতালি যদি গ্রীসকে কবজার মধ্যে ফেলিতে পারে, তাহা হইলে দার্দেনেলিস প্রণালীর দিকেই পরে তাহাদের দৃষ্টি পড়িবে। সুতরাং বর্তমান অবস্থা তুরস্কের পক্ষে বিশেষভাবে রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ।

ইতালি জার্মানির মত শক্তিশালী না হইলেও গ্রীসের চেয়ে যে প্রবল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিলাতী কাগজে যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, আলবেনিয়াতে ইতালির ১ লক্ষ ৭০ হাজার সেনা আছে এবং এই সব সেনা আধুনিক উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত। গ্রীসের পক্ষে কতদিন পর্যন্ত এই বাহিনীকে বাধা দেওয়া সম্ভব হইবে বলা যায় না। সীমান্তভাগ প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত; এইজন্যই গ্রীসের ভিতর দিয়া তেমন জোর চাপ দিতে ইতালির পক্ষে কিছু সময়ের প্রয়োজন হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। জার্মানির ন্যায় ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হইবার শক্তি যে ইতালির সৈন্যদের নাই, এ পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গ্রীসের প্রধান ভরসাই হইল ইংরেজের নৌশক্তির এবং বিমান শক্তির সাহায্য। ব্রিটিশ পক্ষ

ইতিমধ্যেই গ্রীসের সামরিক সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারিগণ এথেন্সে পেঁৗছিয়াছেন এবং ইংরেজ নৌবহর ক্রীট দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে এবং সামরিক ঘাঁটিসমূহ নির্মাণ করিতেছে। ব্রিটিশ নৌবহর যদি ইজিয়ান সাগরের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি দখল করিতে পারে, তাহা হইলে ইতালি হইতে আলবেনিয়ায় সৈন্য এবং রসদ পাঠানো ইতালির পক্ষে সুকঠিন হইয়া পড়িবে। বর্তমানে অবশ্য আলবেনিয়াতে যে সৈন্য এবং রসদপত্র ইতালির মজুদ রহিয়াছে, তাহার জোরেই ইতালি অভিযান চালাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু পর্বতসংকুল [illegible] দেশ অতিক্রম করিতে ইতালির দীর্ঘ দিন [illegible] সংগ্রাম চলিবে অনেকদিন। গ্রীস দখলে আনা [illegible] হইবে না। তখন ব্রিটিশের নৌশক্তির আক্রমণের [illegible] গ্রীসে প্রেরিত ইতালির সেনাদের উপর। [illegible] দেখা যাইতেছে, হিটলার ইংলন্ডের উপর সোজাসুজি আক্রমণে সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারিয়া এইবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর চাপ দিবার নীতি অবলম্বন করিতে [illegible] হইয়াছেন। যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল আপাতত ইংলন্ড [illegible] হইতে ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগে [illegible]

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী

(স্বর্গীয় কবি বরদাচরণ মিত্র রচিত অপ্রকাশিত কবিতা)

১

তূর্যমন্দ্রে সিন্ধু গর্জে বিশ্বজননী চরণে তোর,
শুভ্র দর্পে অভ্র বিদারি অদ্রিতুঙ্গ কিরীট ঘোর,
চণ্ড প্রতাপ নিদাঘ সূর্য বর্ষে অনল দহিয়া দেশ
মা তোর তীব্র শোণিত প্রবাহে জন্মে কেমনে মানুষ মেষ!

২

গভীর নিশীথে রচি শিহরণ ত্রাস-চকিত বনানী গায়
প্রতিধ্বনিত জীমূতের নাদে তব শার্দূল শিকারে যায়,
শব্দ-মথিত ঊর্ধ্ব-গগনে পাণ্ডুর শশী বেপথুমান
নিম্নে আকুল শ্বসে পশুকুল শঙ্কা-ছিন্ন ভিন্ন প্রাণ,
সম্মুখে ছোটে উড্ডীনপ্রায় দীর্ঘ-শৃঙ্গ কৃষ্ণসার
বৃথা এ চেষ্টা নিমেষ মাত্র পৃষ্ঠে উপরে যমের ভার।
ভীষণ মুণ্ডে অগ্নি কুণ্ডে চক্ষু বিবর উছলি যায়
দংষ্ট্রা ময়ূখে দীপ্ত ব্যাদান ধূমকেতুযুত রজনীপ্রায়।
মাংস ভেদিয়া ভাঙ্গি পঞ্জর খর নখাঘাতে শোণিতপাত
নিঠুর দন্তে গ্রথিতকণ্ঠে রুদ্ধ যাহাতে আর্তনাদ।
প্রাণবায়ু মাখা উষ্ণ লোহেতে ঝলকে ঝলকে ভরিছে গাল
পড়েছে বাহিয়া সৃক্কণীযুগ শ্যামল শষ্প করিয়া লাল।
কি শোভা রুদ্র রুধিরে আর্দ্র পীতকৃষ্ণ সমর বেশ!
মা তোর ব্যাঘ্র প্রসাবী জঠরে জন্মে কেমনে মানুষ মেষ!

৩

নির্ভয়ে ফিরি নিবিড় গহনে ভ্রমে যূথপতি অমিত বল
শক্তি লুকায়ে অলস রঙ্গে খেলিছে লইয়া মৃণাল দল।
মুক্তা বরষি পত্র সহিত পদ্মকোরকে রচিত হার
গ্রথিত শুণ্ডে পর্ব-ভবনে স্রক বলয়িত স্তম্ভাকার।
পর্বতসম পৃথু কলেবর পর্বত সম উচ্চ শির
সচল অচল কঠিন অটল সুপ্ত শক্তিপুঞ্জে ধীর।
হেলায় দলিয়া মহা মহীরূহ মদের হরষে চলিয়া যায়
পদের পরশে ক্ষুব্ধ ধরণী লুব্ধ মধুপ ঊর্ধ্বে গায়।
বিপুল রঙ্গে, কালীয় ভঙ্গে, তুঙ্গীকৃত সে বক্র কর
বৃংহিত নাদে ভেরীর বাদ্যে বপ্রযুদ্ধে অগ্রসর।
সানুর গাত্রে গৈরিক শিলা ভেদিয়া শুভ্র দন্ত ভায়
ঊষার হর্ষ বর্ষণবৎ তরল অরুণে স্নাত প্রায়।
শুভ্র দন্তপুঞ্জ তিমির বিদারি আলোক শিখার শেষ
কুঞ্জর-ধর জঠরে মা তোর জন্মে কেমনে মানুষ মেষ!

৪

নগকন্দরে শঙ্করভূষা মনসার সখা ফণিনী বাস
সুন্দর তনু করকা শীতল তীব্র গরল জড়িত শ্বাস।
উরসগমনে দীর্ঘ শরীরে ঊর্মি বিলাস প্রকাশ পায়
নয়নে কর্ণে রুচির বর্ণে চারু চিত্রিত নশ্বর গায়।
বক্র রেখায় রচিত বক্র কুসুমের সম সুষমাধার
নয়নের বাণে মৃগয়াকারিণী রমণীর কুচ যুগ্মহার।
শান্ত যখন চুম্বি ধরণী লুটে বিনম্র শীর্ষদেশ
একান্ত যেন অভিমানহীন মৃদু বিনয়ের উপমা শেষ;
রুদ্ধ করুণা ক্রুদ্ধ যখন দোদুল ঊর্ধ্বে কঠিন কায়
দ্বিধা বিভিন্ন বহ্নির শিখা রক্ত জিহ্বাতে ক্ষিপ্তপ্রায়
কঠোর আঁখিতে মঘার দৃষ্টি চক্ষে ভীষণ গর্জে রোষ
উচ্ছিত ফণা লোমহর্ষণ মৃত্যু গর্জে দন্তকোষ
ধূর্জটি জটাপটলবিহারী সহেনা অবমাননা লেশ
মহোরগ-বহ জঠরে মা তোর জন্মে কেমনে মানুষ মেষ!

৫

জঠরে অনশনে নিধনপ্রাপ্ত চরণের তলে অযুত শব
জননী নিঠুর শ্মশানচারিণী কোমলতা তোর অসম্ভব।
নূপুর মুখর কঙ্কাল রাশি অক্ষি কোটরে অন্ধকার
দন্ত বিকাশে দেবতার প্রাণে বিদ্রূপযুত হাস্য যার।
কুণ্ডল তব মাগো ভৈরব কুলিশ-প্রহারী করাল মেঘ
দিগন্ত মথি ছুটে তাহে মহাঝঞ্ঝাবাতের ভীষণ বেগ।
প্রলয়াবর্তে পদ্মা মেঘনা করে উদ্দাম নৃত্য ঘোর,
সে শুধু গ্রীষ্মক্লিষ্ট ললাটে উগ্র ঘর্ম-প্রবাহ তোর।
শক্তির পূজা হত ঘরে ঘরে রক্ত পিছিল আঙিনা যার
ভক্ত কণ্ঠে গভীর নিনাদে হোমানল বহে ধূমের ভার।

* * *

সহসা মানস নেত্রে স্বপন জননী আমার বঙ্গদেশ
তুমিই ধরেছ শক্তি মূরতি দীপ্ত জগদ্ধাত্রী-বেশ।
দেবী ব্যাঘ্র-বারণ-বাহিনী গলে উপবীত ভীষণ নাগ
মহাকিরীটের কোটি প্ররোহে দহে গগনের মধ্যভাগ।
ও শ্রীপদ পানে আকুল লক্ষ নয়ন নির্নিমেষ।
বক্ষ চিরিয়া হৃদয় পদ্ম অঞ্জলি দিবে বাসনা শেষ।

[এই কবিতা স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত "বঙ্গ আমার জননী আমার" সঙ্গীতের পূর্বে রচিত হইয়াছিল।]

মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

অর্থাৎ অমল বাহাল হই [illegible]

চাকর পান্নু কলঘর দেখ [illegible] ার পর রান্নাঘর। উনানে সকালেই আগুন পড়ি [illegible] ম্ভব চায়ের জন্য: কিন্তু গৃহিণীর অত্যধিক আ [illegible] তাহাতে বার-দুই-তিন শুধু কয়লাই পড়িয়াছে, রান্ন [illegible] চাপে নাই।

একে অচেনা ঘর, তাহাতে [illegible] করা বলিতে যাহা বোঝায় রীতিমতভাবে তাহা [illegible] ব নাই। সুতরাং সে অত্যন্ত বিব্রত হই [illegible] সহজ বলিয়া পূর্বে [illegible] হল [illegible] লাগিল না। কিন্ত [illegible] রেই স্বয়ং রাজবা [illegible] াঘরের রোয়াকে বা [illegible] াহাকে রক্ষা করিলেন। তি [illegible] খানেক এটা-ওটা নির্দেশ দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "ও হরি, তুমি যে কিছুই জান না দেখছি!"

কিন্তু তিনি তাহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন বলিয়া বোধ হইল না, বরং তাঁহাকে যে উনানের ধারে গিয়া আগুনে তাত সহ্য করিতে হইল না, এই কৃতজ্ঞতায় তিনি ধৈর্য সহকারে বসিয়া বসিয়া সমস্তই দেখাইয়া দিলেন। এমন কি ছেলেমেয়েদের ও স্বামীর খাওয়ার সময়ও বসিয়া থাকিয়া কিভাবে পরিবেশন করিতে হয় তাহা বলিয়া দিলেন। অমল কোনও মতে সমস্ত কাজ সারিয়া বেলা তিনটার সময় আর একবার স্নান করিয়া নিজে দুইটি মুখে দিল। তার পর নিজের নির্দিষ্ট স্থানটিতে একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

গত তিন-চার ঘণ্টার পরিশ্রমেই তাহার দম যেন বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, কি করিয়া যে এইখানে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি কাটাইবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। অথচ কপর্দক শূন্য অবস্থায় এই নিরাপদ আশ্রয় ও নিশ্চিন্ত আহার্য ছাড়িয়া অপর কোথাও যাইবার কথা পর্যন্ত সে কল্পনা করিতে পারিল না। এমনই একটা নিদারুণ মানসিক অবসাদের মধ্যেই তাহার চক্ষু দুইটি বুজিয়া আসিল।

বেলা পাঁচটা না বাজিতে বাজিতেই আবার তাহার ডাক পড়িল। চা করিতে হইবে, তৎসহ হালুয়া ও পাঁপর ভাজা; তার পর রাত্রির খাবার। একদিন সে ভাবিত যে তাহার বাবা মাসিক পঁচিশ টাকা মাহিনাতে গ্রামের মাইনর স্কুলে সারাজীবন কাটাইলেন কি করিয়া; আজ সে পাঁপর ভাজিতে ভাজিতে ভাবিতে লাগিল যে গ্রামের স্কুলের সে মাস্টারিটা এখনও খালি আছে কি না এবং কোনও মতে এখনও দেশে ফিরিয়া যাওয়া যায় কি না।

কিন্তু সে দুরাশা! এখনকার এই জীবনই তাহাকে যাপন করিতে হইবে। হউক তাহা কষ্টসাধ্য, কিন্তু নিরাপদ এবং নিশ্চিত তো বটে।

দিন দুই কাজ করিবার পরই অমল পরিবারটিকে চিনিয়া লইল। ভুবনবাবু বেচারী স্কুলের বাহিরের কোনও পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ জীবনে কখনও পান নাই, আর কিছু তিনি জানেনও না। তাঁহার নিজের অত্যাবশ্যক জিনিসগুলি সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা অস্পষ্ট। পরিধেয় পেণ্টুলুনটা ময়লা হইয়াছে কি আরও একদিন তাহা পরিয়া স্কুলে যাওয়া যাইবে তাহা রাজবালাকে দেখাইয়া লইতে হইত; কবে তাঁহার শরীর খারাপ বোধ হইতে পারে এ কথাটা পর্যন্ত স্ত্রীর নিকট হইতে তাঁহার জানিয়া লইতে হইত। কিন্তু পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি যতই দুর্বল হউন স্কুলের ব্যাপারে তিনি অতিশয় দৃঢ় ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে একটি দিনও যদি তিনি স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন তো স্কুলটি সেইদিনই অচল হইয়া যাইবে এবং সেইটিই হইবে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ঘটনা। সুতরাং তিনি রাজবালার সমস্ত অনুজ্ঞাই নির্বিচারে পালন করিতেন, কেবল স্কুল কামাই করিবার কথা ছাড়া। ভদ্রলোক সংসার ও পৃথিবীর কোনই খবর রাখিতেন না। বাড়িতে যখন থাকিতেন, স্কুলের কাজেই ব্যস্ত থাকিতেন এবং কোনও লোক আসিলে তাহার বক্তব্য প্রায় জোর করিয়া থামাইয়া দিয়া স্কুলের উন্নতিকল্পে সম্প্রতি তিনি যে সব নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাই শুনাইতে বসিতেন।

সুতরাং সংসার ও সাংসারিক যাহা কিছু, সে সকলেরই সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন রাজবালা। তিনি সত্য সত্যই অলস নন, স্বামী ও পুত্রকন্যার স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ব্যবস্থাই সুচারুরূপে করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। কিন্তু একটি মাত্র দুর্বলতাকে তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না। সেটা তাঁহার আভিজাত্য প্রদর্শন। কদমকুঁয়ার অতি আধুনিকী অ্যাড্‌ভোকেট-পত্নীদের সহিত তাই সমান ভাবে গলা মিলাইয়া ক্লান্ত সুরে তাঁহাকে কথা কহিতে হয় এবং কিছুতেই তিনি রান্নাঘরে যাইতে চান না। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার ছেলেমেয়েদের মানুষ করিবার যে প্রণালী তিনি অনুসরণ করেন তাহার মধ্যেও ওই শ্রেণীর আভিজাত্যের সুরই হইতেছে প্রধান।

ছেলেমেয়ের সংখ্যা তাঁহার খুব কম নয়, সর্বসুদ্ধ সাতটি। বড় মেয়েটি ক্লাস নাইনে পড়ে, বয়স পনের-ষোল. তাহার পরে তিনটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে। সর্বকনিষ্ঠটি দুগ্ধপোষ্য।

লোক বেশী হইলেও ঝঞ্ঝাট খুব বেশী নয়। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণ পারিবারিক যন্ত্রের মধ্যে মানুষ হইয়াছে যে ছেলে এবং লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহার পক্ষে আগুনের তাতে গিয়া প্রত্যহ দুইবেলা রান্না এবং দশ-বারটি লোককে খাওয়ানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাহাও হয়তো সহ্য হইত কিন্তু তাহার সহিত রাজবালার আভিজাত্যের ঠেলা একেবারেই অসহ্য। কিন্তু দিন পনের কাজ করিবার পরে, একমাসের মাহিনা হস্তগত হইবা মাত্র কাজ ছাড়িবার একটা কল্পনা যখন মাথায় আনাগোনা করিতেছে, তখন সহসা এক অঘটন ঘটিয়া গেল। ব্যাপারটা বলি।—

ভুবনবাবুর বড় মেয়ে জ্যোৎস্না একদিন ভিতরের উঠানে একটা টেবিলে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছিল। এমন সময় একটা রান্না চাপাইয়া অমলও সেখানে পায়চারি করিতেছে, হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল জ্যোৎস্না অ্যালজেবরার সামান্য একটা প্রবলেম লইয়া হিমসিম খাইতেছে। অঙ্কশাস্ত্রটা অমলের কাছে চিরদিনই সহজ এবং প্রিয়। সুতরাং ঐ উত্তর বলিয়া দিবার জন্য সে যে চঞ্চল হইয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক। সে বহুক্ষণ নিজেকে সামলাইয়া রাখিয়া শেষ পর্যন্ত একসময়ে ভুলিয়া গেল যে সে পাচক-ব্রাহ্মণ মাত্র এবং জ্যোৎস্না বারে বারে যে ভুলটা করিতেছিল টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া এক সময় সেই ভুলটা আঙ্গুলে দিয়া সে দেখাইয়া দিল।

জ্যোৎস্না কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া অমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! তার পরই মুখে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল। তখন ভুবনবাবু বসিয়া পরীক্ষার খাতা দেখিতেছিলেন এবং রাজবালা স্কুলেরই অপর একটি মাস্টারের সহিত যতদূর সম্ভব ক্লান্তভাবে কথাবার্তা চালাইতেছিলেন। জ্যোৎস্না ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়াই কহিল, "বাবা আমাদের বামুনঠাকুর লেখাপড়া জানে।"

রাজবালা কহিলেন, "তা কি হয়েছে তাতে? তুমি অত হাঁপাচ্ছ কেন? আজকালকার দিনে একটু লেখাপড়া জানে না কে? মেথর মুদ্দোফরাশ পর্যন্ত আজকাল নাম সই করছে!"

জ্যোৎস্না কহিল, "একটু লেখাপড়ার কথা বলছি নাকি আমি! আমি একটা অ্যালজেবরার প্রবলেম কিছুতেই করতে পারছিলুম না, ঠাকুর মুখে মুখে বলে দিলে।"

এবার সকলেই রীতিমত বিস্মিত হইলেন। এমন কি ভুবনবাবু পর্যন্ত তাঁহার পরীক্ষার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাজবালাই কিছুক্ষণ পরে কথা কহিলেন, বলিলেন, "এখনি ওকে বিদেয় করে দাও।"

ভুবনবাবু আরও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কেন গো? রান্না তো আর খারাপ করে না!"

রাজবালা অগ্নিস্রাবী দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি থাম। পলিটিক্যাল সাসপেক্ট, বুঝতে পারছ না? বোমা।"

যে শিক্ষকটি বসিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী-স্থানেই প্রতিষ্ঠা, তিনি বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।"

ভুবনবাবু বোধ করি জীবনে এই দ্বিতীয়বার কি তৃতীয়বার স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করিলেন, "না না, বোমার চেহারা আলাদা। এর পলিটিক্স্-এ যাবার মত চেহারাই নয়।"

রাজবালা জবাব দিল, "হ্যাঁ, নয়! তুমি তো সবই জান। আচ্ছা কই ডাক দেখি ওকে, জিগগেস করেই দেখা যাক!"

সেদিনটা একটা ছুটির দিন, রান্নার খুব বেশী তাড়া ছিল না। পান্নুকে দিয়া বলিয়া পাঠানো হইল, হাতের রান্নাটা নামাইয়া র[illegible]লা দিয়া অমল যেন একটু বাহিরের ঘরে [illegible]

অমলের প[illegible]নুমান করা অসম্ভব নয়, এমন কি সে ঠি[illegible]শা করিতেছিল বলিলে ভুল করা হইবে না। [illegible] হইয়াই দেখা দিল।

"আমাকে ডাক[illegible]

কথাবার্তা রাজব[illegible]ইবেন, ইহা পূর্বাহ্ণেই স্থির ছিল, বা বহুপ[illegible] হইয়া আছে। কারণ যাহা কিছু কথাবার্তা[illegible] কাল হইতে তাঁহারই উপর ছাড়িয়া [illegible]ছেন। সুতরাং রাজবালাই [illegible]

[illegible], তুমি নাকি তা[illegible]ল দিয়েছ?"

[illegible]ত ভাবে কহিল, "আজ্ঞে [illegible]ড়া ঠিক নয়, একটা প্রবলেম পারছিল না, তাই।"

"তুমি অ্যালজেবরা জান?"

"কিছু কিছু জানি।"

"তুমি কত দূর পড়াশুনো করেছ?"

"ম্যাট্রিক পাস করেছিলুম।"

"কই, এতদিন সে কথা বলনি তো!"

"আপনারা তো কোনও দিন পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞাসা করেন নি!"

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন, সহসা যে এভাবে অমল জবাব দিবে তাহা বোধ হয় কেহই আশা করেন নাই। একটু পরে ভুবনবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কোন্ ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করেছিলে?"

"ফার্স্ট ডিভিসনে। তিনটে লেটার ছিল।"

"কোন্ ইস্কুল থেকে দিয়েছিলে?"

রাজবালা এইবার পুনরায় নিজের হাতে রশ্মি তুলিয়া লইলেন, স্বামীকে ধমক দিয়া কহিলেন, "ফের ইস্কুল? কাজের কথার সময় যদি তুমি আবার ইস্কুলের কথা তোল, আমি মাথা খুঁড়ে মরব।—তা তুমি লেখাপড়া শিখে এ কাজ করতে এলে কেন?"

অমল বিনীতভাবেই জবাব দিল, "কি কাজ করব বলুন? অন্য কোনও কাজের জন্য এলে কি আপনারা অত সহজে দিতেন? না লেখাপড়া কোনও কাজে আসত? ম্যাট্রিক পাস ক'রে দেশ থেকে এসেছি প্রায় বছর দুই তিন হ'ল। কলকাতায় থেকে টিউশনি করে বা অন্য কোনও কাজ ক'রে পড়াশুনো করব এমনিই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারলুম না। শেষে যখন দু মুঠো ভাতও বন্ধ হ'ল তখনই বাধ্য হয়ে এই চেষ্টা করলুম। কলকাতায় থেকে টিউশনি ক'রে বা অন্য কোনও কাজ থাকলে লজ্জা করত ব'লে এখানে চলে এলুম।"

"ভবেশবাবুর সঙ্গে কোথায় আলাপ হ'ল?"

"ট্রেনে। কাজ খুঁজছি শুনে তিনিই এই সন্ধান দিলেন।"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া রাজবালা পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, "পলিটিক্যাল ব্যাপারে কোনও দিন মাতামাতি করেছ? মানে বোমা-ফোমা তৈরি করেছ?"

"আজ্ঞে না।"

"তুমি যে সত্যি কথাই কি? কি ক'রে জানব আমরা?"

কলকাতায় যেখানে-যেখানে তাঁদের ঠিকানা দিচ্ছি চিঠি লিখে দেখুন। নাও দিতে পারি, তবে সেখানে একটা বিপদ কিছু টাকা পাবেন আমার কাছ থেকে, আ তাঁদের না জানানই ভাল।"

এইবার রাজবালা আদেশ চ্ছা তুমি যাও।"

তাহার পর 'প্রশ্ন

অমল এই হইয়া মনে মনে দিয়া আসিয়াছিল ন ঠিক বিশ্বাসের ী করিয়াই বলিয়াছিল। অল্প একটু বাদানুবাদের পরই স্থির হইল যে, আর যাহাই হউক, ছোকরার কথাবার্তা শুনিয়া সে সত্য কথা বলিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহাকে দিয়া রান্না করানোই বা চলে কি করিয়া?

ভুবনবাবু তখন কহিলেন, "আমাদের ছেলেমেয়েগুলোকে পড়ানোর জন্য তো একজন মাস্টার রাখব ভাবছিলুম, সেই কাজটাই ওকে দিলে কি হয়।"

যে শিক্ষকটি বসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখ কালি হইয়া উঠিল, কারণ তিনি ওই উদ্দেশ্যেই কিছুকাল যাবৎ রাজবালার কাছে হাঁটাহাঁটি করিতেছিলেন। কিন্তু রাজবালা খুশী হইয়া কহিলেন, "সেই বেশ কথা। সকাল বিকেল পড়াতেও পারবে, ছেলেমেয়েগুলোকে চোখে চোখেও রাখবে এখন। খাওয়া থাকা, আর সামান্য কিছু দিলেই চলবে।"

সেই ব্যবস্থাই স্থির হইয়া গেল। সেইদিনই পূর্বেকার 'বাবাজী'কে ডাকিয়া পাঠানো হইল এবং অপরাহ্নকালে অমলকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, আগামীকল্য হইতে সে যেন ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ভার গ্রহণ করে এবং সেজন্য তাহাকে আহার ও বাসস্থান ছাড়াও মাসিক দশটি করিয়া টাকা দেওয়া হইবে।

নূতন ব্যবস্থায় অমলের দিন ভালই কাটিতে লাগিল। আহার ও জলযোগের ব্যবস্থা ভাল, ছেলেমেয়েগুলি খুব গাধা নয়, সুতরাং পরিশ্রম করিতে হয় কম। পড়ানো ছাড়া অবশ্য আর একটি কাজ তাহার বাড়িয়াছে, সেটি রাজবালার জন্য কিছু কিছু শৌখিন বাজার করা। তাহার পছন্দ ভাল এবং দরদস্তুর করিতে পারে, এই দুইটি মহৎ গুণের পরিচয় পাইয়া রাজবালা এই কাজের ভারটি সম্পূর্ণরূপে তাহার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে সত্য-সত্যই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতে শুরু করিয়াছেন।

প্রথম প্রথম দুই-চারি দিন অসুবিধা হইয়াছিল পাড়ার মেয়েদের জন্য; রাজবালার মারফৎ এমন রসাল সংবাদটা প্রচার হইবামাত্র প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে অসংখ্য নারী সমাগম হইতে লাগিল। পাটনা সিটি হইতে শুরু করিয়া গর্দানিবাগ পর্যন্ত বোধ হয় কোনও মহিলাই বাকী রহিলেন না এবং রাজবালার অনুরোধে প্রত্যহই তাহাকে মিনিট কতকের জন্য 'কিউরিও' হিসাবে তাঁহাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। লজ্জায় অমলের মাথা কাটা যাইত বটে, কিন্তু এতদিনে সে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের মর্ম বুঝিয়াছিল, সুতরাং সে নীরবে সহিয়া যাইত।

যাক, সে অল্প কয়েকটা দিন; তার পর যত দূর সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়াই তাহার দিন কাটিতেছিল। কিন্তু মাস দুই পরে আবার তাহার দুশ্চিন্তার কারণ দেখা দিল। সহসা সে একদিন লক্ষ্য করিল যে, জ্যোৎস্না তাহার দিকে একটু বেশী মনোযোগ দিতে শুরু করিয়াছে।

সন্দেহ জিনিসটা এমনিই যে, প্রথমটা আসিতে যা একটু দেরি, কিন্তু মনে একবার দেখা দিলে অচিরেই তাহা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়, তাহার প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। অমলেরও প্রায় সেই ব্যাপার ঘটিল। প্রথম সন্দেহের পর এক সপ্তাহ কাটিতে না কাটিতে অমলের মনে সুনিশ্চিত বিশ্বাস দেখা দিল যে, জ্যোৎস্না দস্তুরমত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

অবশ্য সে বিশ্বাসের কারণও ছিল। জ্যোৎস্না পড়ার সময় অন্য ভাইবোনদের সহিত বিবাদ করিয়া অমলের পাশে বসিত এবং জলখাবারের থালা কিছুতেই সে পান্নু কিংবা মথুরাকে লইয়া আসিতে দিত না। তাহাতেও আপত্তির কোনও কারণ ছিল না, কিন্তু সহসা একদিন সে ফস করিয়া নিজের আঁচল দিয়া তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল এবং মায়ের অসাক্ষাতে আহারের সময় তাহাকে বাতাস করিতে শুরু করিল।

কুড়ি-বাইশ বছরের তরুণের পক্ষে এই ধরনের রোম্যান্স বিস্ময়কর, বিশেষত, আধুনিক বাঙালী তরুণদের। কিন্তু অমলের বয়সটা বাইশ হইলেও, মনটা আরও অনেকখানি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যে তরুণ প্রেমে পড়িতে চায়, যে তরুণ দিন রাত স্বপ্ন দেখে, কিশোরীর আঁচলের হাওয়ায় যে তরুণের মনের পাপড়িগুলি বিকশিত হইয়া ওঠে, অমলের মনের মধ্যের সে তরুণ বহুকাল মরিয়া গিয়াছিল। অভাব, নৈরাশ্য এবং আর একটি অত্যন্ত স্থূল অথচ অত্যাবশ্যক জিনিস, ক্ষুধা, তাহার অজ্ঞাতসারে কখন কি করিয়া এই গত দুই বৎসরের মধ্যে তাহার বয়সকে পুরো দশটি বৎসর বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। তাই যে কিশোরীর প্রেমের আভাসে তাহার মন লঘু দখিনা হাওয়ার মত চঞ্চল হইয়া ওঠার কথা, সেই প্রেমেরই অস্ফুট ইঙ্গিত পাইয়া সে রীতিমত ভীত হইয়া উঠিল।

কিন্তু ইঙ্গিতটা চিরকালই অস্ফুট রহিল না। সহসা একদিন সকলে স্কুলে চলিয়া যাইবার পর দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করিতে আসিয়া সে বালিশের তলায় একটা চিঠি পাইল। স্কুলের রুলটানা খাতা হইতে একটি পাতা টানিয়া লইয়া দুই পৃষ্ঠায় সুদীর্ঘ চিঠি লেখা হইয়াছে। জ্যোৎস্নার হাতের কদর্য লেখা চিনিতে অমলের বিলম্ব হইল না। কিন্তু এ যে রীতিমত প্রেমপত্র। নভেলী ঢংএ নভেলী ভাষাতেই প্রেম নিবেদন করা হইয়াছে, যদিও বানান ও ব্যাকরণের ভুলে তাহা কণ্টকিত।

চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়িয়া তাহার গা জ্বলিয়া গেল। এত দিন পরে যদি বা ভাল আশ্রয় মিলিয়াছে, এই হতভাগা মেয়েটার অকালপক্কতার জন্যই বুঝিবা তাহা যায়। সে অসহ্য ক্রোধে মনে মনে তাহাকে গালি দিতে লাগিল। কেন রে বাপু, এই তো সবে পনের-ষোল বছর বয়স, ইহারই মধ্যে এত বাড়াবাড়ি? সে ব্রাহ্মণ, ভুবনবাবুরা কায়স্থ, বিবাহের কোনও সম্ভাবনা নাই। তাহা ছাড়া ভুবনবাবু তাহার মত পাত্রকে দিবার জন্য নিশ্চয়ই মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতেছেন না, সুতরাং এ পথে আর অগ্রসর হইলেই মার খাইয়া এ বাড়ি হইতে বাহির হইতে হইবে।

সে চিঠিখানা কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। কিছু টাকা হাতে জমাইতে পারিলে সে এ স্থান ত্যাগ করিত, কিন্তু পাইয়াছে আজ অবধি মাত্র কুড়িটি টাকা। তাহার মধ্য হইতে জামা-কাপড় ও শতরঞ্জি, চাদর প্রভৃতিতে প্রায় আটটি টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। বার টাকা সম্বল করিয়া কোথায় যাওয়া যায়? আর তিনটি দিন কাটাইতে পারিলেও আর দশটি টাকা পাওনা হয়। কিন্তু তাহাতেই বা ক দিন?

সে দিন অপরাহ্ণে পড়াইতে বসিয়া নিজে ডাকিয়া সে দুটি ছোট ছেলেকে দু পাশে বসাইল এবং সামান্য একটা ছুতা করিয়া জ্যোৎস্নাকে কঠিন তিরষ্কার করিল। জ্যোৎস্নাও চিঠি দিবার লজ্জাতেই হউক অথবা জবাব বা উৎসাহ না পাইবার গ্লানিতেই হউক একবারও চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল না, কিংবা গায়ে পড়িয়া ভালবাসা দেখাইতে চেষ্টা করিল না। অমল ভাবিল, যাক বাঁচা গেছে।

কিন্তু তিন-চারটি দিন যাইতে না যাইতে বোঝা গেল মেয়েটিকে এখনও সে চিনিতে পারে নাই।

সে দিন গভীর রাত্রে শয়নের জন্য ঘরে ঢুকিয়া সহসা অনুভব করিল কে তাহার বিছানায় বসিয়া আছে। তাড়াতাড়ি সুইচ টিপিতে যাইবে কিন্তু তাহার পূর্বেই জ্যোৎস্না আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিল, ফিসফিস করিয়া কহিল, "চুপ! ভালয় ভালয় এসে ব'স বলছি, নইলে ভাল হবে না। গোটা-কতক কথা আছে, তোমার সঙ্গে।"

তাহার স্পর্ধা ও অসমসাহসিকতায় অমল স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভয়ে তাহার সারা অঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গেল, কিন্তু প্রতিবাদ করিতেও ভরসায় কুলাইল না। আস্তে আস্তে তাহার সহিত আসিয়া বিছানাতেই একধারে বসিয়া পড়িল।

জ্যোৎস্না কহিল, "আমার চিঠির জবাব দাও নি কেন?"

রাগে অমলের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল, কহিল, "আমার তো মাথা খারাপ হয় নি।"

জ্যোৎস্না জবাব দিল, "তার মানে আমার হয়েছে? কিন্তু কেন তাই শুনতে পারি সাধুপুরুষ? আজকালকার ছেলেদের চিনতে আমার বাকী নেই! তার মানে আমি কালো, কুচ্ছিত, আমাকে দেখলে তোমার ঘেন্না হয়, এই তো? নিজে কি? আয়নায় একবার চেহারাটা দেখেছ?"

এইবার অমলের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, সে কহিল, "সে জমা-খরচে তোমার তো দর[illegible] [illegible]ত্তি মেয়ে, এত ডেঁপোমি কেন? লুকিয়ে [illegible] [illegible] আর এইসব কর। প্রেম বানান করতে শে[illegible] [illegible] করতে চাও। এখনও ঢের বয়স পড়ে আছে, [illegible] [illegible]পার প্রেম ক'রো। এখন পড়াশুনোয় মন দা[illegible]

কোনও কথার জ[illegible] [illegible] জ্যোৎস্না উঠিয়া দাঁড়াইল। অমল তখনও রাগে [illegible] [illegible] [illegible]নশ্চ কহিল, "ফের যদি এসব মতলব দেখি[illegible] [illegible] কিছু বলুন আর না বলুন, আমিই চ[illegible] [illegible] ক'রে দেব।"

[illegible]

রা[illegible] [illegible] [illegible]চেহারাটা কি রকম দাঁড়াইয়[illegible] [illegible]কারে বোঝা গেল [illegible]ন্তু গলার আওয়া[illegible] [illegible]এ মতই হিশ হিশ করিয়া [illegible] সে বাহির হইয়া য[illegible]বার আগে দাঁতে দাঁত চাপিয়া শুধু বলিয়া গেল, "আচ্ছা, দেখা যাক।"

সে চলিয়া যাইবার পর অমল বহুক্ষণ চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকিবার পর উপরের ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজার শব্দ শুনিয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু ঘুম আসিল না। এই মেয়েটির যে অসমসাহসের পরিচয় সে এইমাত্র পাইল, তাহাতে সে নিশ্চিত বুঝিতে পারিল যে, ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। তাহার উপর শেষের কথাগুলি যতই মনে পড়িতে লাগিল ততই তাহার বুকের রক্ত হিম হইয়া যাইতে লাগিল। সে যে আরও কি করিবে, প্রতিহিংসা সাধনের জন্য আরও কত আয়োজন করিবে তাহার স্থির কি। এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের দোষ কেহই দেখে না, যাহা কিছু অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্নাম সব পুরুষদের। এই অপরিচিত স্থানে শেষ পর্যন্ত কি মার খাইয়া যাইতে হইবে?

তাহার গায়ে ঘাম দেখা দিল। সে আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তায় বহুক্ষণ ছটফট করিয়া রাত্রি আড়াইটা নাগাদ উঠিয়া পড়িল। না, এ স্থানে থাকা আর চলিবে না, চলিয়া যাইতে হইবে এবং আজই। সেই দিনই মাহিনার দশটি টাকা হাতে আসিয়াছে; তের আনা পয়সা সম্বল করিয়া সে যখন পাটনায় আসিতে পারিয়াছিল, তখন কুড়ি বাইশ টাকা লইয়া সে যে-কোনও স্থানে যাইতে পারিবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে থাকা কোনও মতেই সমীচীন নহে। জ্যোৎস্নার সহিত গোপনে সন্ধি করিয়া লইলে সে এখনও অনেক দিন স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু যে ভদ্রলোক তাহাকে একান্ত দুঃসময়ে আশ্রয় ও আহার দিয়াছিলেন তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে সে কিছুতেই পারিবে না। তাহার চেয়ে এত দিন যেভাবে কাটিয়াছে আরও কিছু-দিন সেইভাবেই কাটুক।

সামান্য বিছানা ও তাহার নিজের অল্প দুই-একখানি জামা-কাপড়ের একটি পুঁটলি বাঁধিয়া লইয়া ভুবনবাবুর নামে দুইছত্র চিঠি লিখিতে বসিল। তার পর বাহিরে তাঁহার লেখা-

(শেষাংশ ৬১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চিকাগোর পথে

[ভ্রমণকাহিনী—অনুবৃত্তি]

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

গ্রে হাউণ্ড বাস কোম্পানি [illegible] ন একখানা পাঁচ-তলা বাড়ি, সেখানে অনে [illegible] অসময়ে গিয়ে থাকে। এই হোটেলে কালো চামড়া [illegible]। বিনা আপত্তিতে একটি ঘর ভাড়া পাবার আ [illegible] অনেকটা শান্তি বোধ করলাম। হোটে [illegible] বাস [illegible] গী একটি কুঠরির জন্য ভাড়া দিতে হয় [illegible] খিড়কি দরজা খুলে দিয়ে শহরের সৌন্দর্য দেখ [illegible] সৌন্দর্য আমেরিকাতেই শুধু দেখা যায়। পৃথি [illegible] ই তো ঘুরলাম, এমনটি আর কোথাও দেখি নি। [illegible] অর্ধলক্ষ মাইল আমার ভ্রমণ করা হয়েছে। [illegible] বাইসাইকেলে ভ্রমণের ইতিহাস [illegible] মই সকলের চেয়ে বেশি [illegible] মাইল ভ্রমণ করে [illegible] র্ড আমার কাছে [illegible] আমেরিকান কিংবা ইউ [illegible] াম তবে আমার [illegible] সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত হ'ত [illegible] াই হ'ক, আমেরিকার নগরীর দৃশ্য বিশেষ ক'রে রাত্রিবেলায়, এক অভিরাম বস্তু। আমেরিকার নগরীর রাত্রির সৌন্দর্যের সঙ্গে ইউরোপ ও এসিয়ার কোনও নগরীরই রাত্রির সৌন্দর্যের তুলনা হয় না।

আরাম কেদারায় বসে খিড়কি দরজা দিয়ে নৈসর্গিক চিত্র দেখতে বেশ ভাল লাগে। নৈশ সৌন্দর্য দেখে যেমন সুখী হচ্ছিলাম, তেমনি এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল যে, আমাদের দেশেও যদি এমন সৌন্দর্য আনতে পারা যেত। অপরের দেশের সুখ শান্তি দেখলেই মনে ঈর্ষা হ'ত, মনে হ'ত, হায় রে, আমাদের দেশকে যদি এমন করা যেত। এমনি নানা কথা ভাবছিলাম আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে আলোকোজ্জ্বল নগরীর দিকে চেয়ে ছিলাম। গ্রে হাউণ্ড বাস কোম্পানির স্টেশনটিও কি সুন্দর!

গ্রে হাউণ্ড বাস কোম্পানির স্টেশনগুলি জি আই পি এবং এ বি আর রেল স্টেশনের চেয়েও বড়। যাত্রীর সংখ্যাও কম নয়। গ্রে হাউণ্ড বাস কোম্পানিতে বিনা টিকিটে কেউ বেড়াতে পারে না। প্রতিবিধানের ব্যবস্থা খুব ভাল। রেল গাড়িতে আমেরিকায় অনেক লোক বিনা পয়সায় যাওয়া-আসা করে; রেল কোম্পানিকে ফাঁকি দেবার ইচ্ছা সব দেশেই। তবে আমাদের দেশের মতন আমেরিকায় কেউ কখনও রেল গাড়িকে লাইনচ্যুত ক'রে সাধারণ লোকের সর্বনাশ করেছে ব'লে আজ পর্যন্ত শোনা যায় নি। আমেরিকার রেল গাড়িতে যেসকল দুর্ঘটনা ঘটে তা প্রধানত কোম্পানিদের দোষেই। যারা রেল কোম্পানির উপর প্রতিশোধও নেয়, তারা অন্যভাবে নেয়, নির্দোষ লোকের প্রাণহানি করে না।

আমাদের দেশে যেমন ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট আছে, আমেরিকাতেও তেমনি আছে। আমাদের দেশের ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টকে যেমন নানারকম সরকারী খেয়ালের আইন মেনে চলতে হয়, সে দেশে তেমন নয়। আমেরিকার ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট শুধু মানে বিজ্ঞান-সম্মত আইন। একবার নিজামের হায়দরাবাদ শহরে গিয়েছিলাম। পথে বার হবার পর কয়েকজন সাংবাদিক আমাকে তাঁদের শহরটির সম্বন্ধে আমার ধারণা কি তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বলেছিলাম, ভারতের আর সব শহর যেমন, হায়দরাবাদও তেমনি। বলেছিলাম, "ওই দেখুন সামনে মসজিদ পথ বন্ধ ক'রে রেখেছে, বায়ুর যাতায়াত বন্ধ; ওই দেখুন ইমারত থেকে পচা ইট খ'সে পড়ছে, তবুও দাঁড়িয়ে আছে পথের মাঝে। এতে শহরটির স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দুইই ব্যাহত হচ্ছে, কিন্তু নাগরিকদের সেদিকে হুঁশ নেই।"

আমেরিকার প্রত্যেক শহরে এবং নগরীতে down town ব'লে এক-একটা স্থান আছে। এই সব স্থানে সিনেমা, হোটেল, বড় বড় দোকান, রেস্তরাঁ প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের আয়োজন থাকে। ডাউন টাউনএ গৃহস্থের বাসের উপযুক্ত স্থান থাকে না। ডাউন টাউন ছাড়া নগরীর অন্যত্র কোথাও সিনেমা, বড় বড় দোকান, এবং বিলাসিতার সামগ্রী বিক্রয় করতে হ'লে সর্বসাধারণের ভোট নিয়ে তা করতে হয়। আদেশ না পেয়েও যদি কোনও দোকান কিংবা অন্য কিছু করা হয়, তবে তার স্থায়িত্বের ঠিক থাকে না। যদি কোনও লোক দোকানীর বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্য জনমত যোগাড় করে, তবে দোকানীকে দোকান ছেড়ে চ'লে যেতে হয়। আমেরিকাতেও অনেক বে-আইনী কাজ হয়ে থাকে বটে, কিন্তু ধরা পড়লে তার আশু প্রতিবিধানও হয়।

খানিকক্ষণ পরে স্নান করতে বার হলাম। স্নানাগারে ঢোকবার পথে একস্থানে লেখা আছে—this hotel only for male! স্নানাগারের সামনে লেখা রয়েছে—one person at a time! লেখাগুলি প'ড়ে মনে নানারূপ সন্দেহ হ'ল। বাড়িটাও দেখে মনে হ'ল এটা যেন গৃহস্থের বাড়ি; হালে পার্টিশন লাগিয়ে বাড়িটাকে হোটেলে পরিণত করা হয়েছে। স্নানাদি সমাপ্ত ক'রে ফল কিনতে বের হব, পথে দেখা হ'ল হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে। তিনি আমার পরিচয় পেয়ে বড়ই আপ্যায়ন করতে লাগলেন। সুযোগ বুঝে বাড়িটার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। ম্যানেজার বললেন, "বাড়িটা দেখে বোধ হয় গৃহস্থের বাড়ি, কিন্তু এরূপ স্থানে গৃহস্থ থাকে না, থাকতে পারে না; আইনের বারণ। কিন্তু কর্পোরেশনের চোখে ধুলো দিয়েই বাড়িটা রাতারাতি প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই চালাকি ধরা পড়ে এবং যিনি বাড়ি করেছিলেন তাঁকে দণ্ডিত হ'তে হয়। তাই আপাতত এই কাঠের পার্টিশন; সত্বরই অন্য ব্যবস্থা হবে।" ঘুষ দেওয়া আর পাপ করা শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই আছে, বিশেষত পুঁজিবাদীদের রাজত্বে। আমেরিকার confidence man, crook প্রভৃতির সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে চলছে। কে কোন্ মতলবে বাড়িখানা তৈরি করেছিল তা কে জানে। কিন্তু আমেরিকায় বাড়ি তৈরি কর, গির্জা তৈরি কর, যা ইচ্ছা তাই তৈরি কর, কিন্তু স্যানিটেশনের আইন মেনে চলতে হবে। এখানে আমেরিকা ধর্মের সাম্রাজ্যবাদ বর্জন করেছে দেখে ভারী আনন্দ হ'ল।

স্নানাগারে one person at a time এবং অন্যান্য কথা যা লেখা রয়েছে, তার তাৎপর্য 'Unkle Sham' বইএ বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া আছে। এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে যিনি বইখানা লিখেছেন, তিনি হয়তো ভাবেন নি যে এরূপ হয় কেন। আমেরিকার শিক্ষিত সমাজও এসবের কারণের কথা ভাবেন ব'লে মনে হয় না। আমার মনে হয়, অভাব অভিযোগই তার একমাত্র কারণ। ও দেশের সাম্প্রতিক হালচাল দেখে মনে হ'ল ওরা তার প্রতিবিধানে মনোযোগী হয়েছে। একবার এক ছোট সভায় Ham and Eggs movementএর বিরুদ্ধে আমি কিছু বলেছিলাম। বলেছিলাম, এতে লাভ হবে না, পঙ্গুকে পাখা ক'রে দেওয়া হবে মাত্র, ব্যভিচার আরও বেড়ে যাবে। কথাগুলো ছোট সভাতে বললেও তার প্রসারণ হয়েছিল বেশ। Grape Pickers Association আমার কথাগুলো Ham and Eggs নামক দ্বিসাপ্তাহিক সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছিল। তেমনি প্রকাশ করেছিল 'বুলেটিন' ও Peoples World নামক দুখানা সংবাদপত্র। বুঝলাম আমার কথায় ফল হয়েছে। গরিব লোকেরা টাকার দামের সঙ্গে সঙ্গে ভাল কথার দামও বুঝতে শিখছে।

সুখের বিষয় আমেরিকার মজুরেরা যেমনভাবে দিন কাটাচ্ছে, দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর কোনও দেশের মজুর তেমন সুবিধা পাচ্ছে না। আমেরিকার মজুর কোনও রকমে যদি সপ্তাহে তিন দিন কাজ করতে পারে তা হ'লে সপ্তাহের বাকী দিন কটা সে না কাজ ক'রেই কাটিয়ে দিতে পারে। অবশ্য যদি সে স্ত্রীপুত্রপরিবার বেষ্টিত না হয়। কলকাতার দু-হাজারী তিন-হাজারী ইউরোপীয়

কর্মচারীরা যেভাবে অবসর যাপন করে, আমেরিকার একক ঝাড়ুদারও সেইভাবে অবসর যাপন করতে পারে। এজন্য সপ্তাহে তার তিন দিন কাজ থাকলেই যথেষ্ট। বারান্তরে এ বিষয়ে বিষদভাবে বলবার ইচ্ছা রইল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে একটি ছোট রেস্তরাঁয় খেতে গেলাম। অনেক লোক তাতে ব'সে খাচ্ছিল। কেউ বা আপন আপন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খাওয়া শেষ ক'রে গল্প করছিল। সেসব গল্প কথায় দুঃখের ছায়া নেই, হালকা সরস আনন্দময় কথাবার্তা। মাঝে মাঝে তার দু-একটা আমারও কানে আসছিল। মোকিরুনি, জো লুইস, খেলার কথা, সুন্দরী বালিকাদের কথা, ইত্যাদি। তার মানে ওই রেস্তরাঁয় ব'সে যারা খাচ্ছিল তাদের কেউই বেকার নয়। যখন লোকের কাজ থাকে, অভাব তার থাকে না (কথাটা শুধু আমেরিকাতেই খাটে), মনে তখন তার হাসি-খুশির কথাই আসে। কর্মের গাম্ভীর্য দিনের শেষে কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। এখন কাজের কথা, দায়িত্বের কথা আর ওদের মনে নেই, তাই ওরা এখন এত সুখী। তারা এটাও ভাল ক'রে জানে, যখন তারা বুড়ো হবে তখন তারা প্রত্যেকে পেনশন পাবে। পেনশন যা পাবে, তার দ্বারা তাদের ভরণ পোষণ চলবে, তার পর Ham and Eggs আন্দোলন তো চলছেই। তাই আমেরিকার মজুর কাজ করতে পারলেই সুখী। যারা কাজকর্ম খুঁজে পায় না বা যাদের মাঝে নূতন ভাবের সঞ্চার হয়েছে তারাই আনত ও বিষন্ন মুখে, জীর্ণ বসনে আবৃত হয়ে পথে চলছে। পাশ্চাত্ত্য জাতকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। এদের মনের বল যে কত তা আমাদের ধারণাতীত। আমরা অনেক সময়েই পেটের নজির দিয়ে নিজেদের দুর্বলতাকে সমর্থন করি, এজন্য কাল্পনিক সম্মানের নজির দিতেও কসুর করি না; কিন্তু ওদের সেসব নেই।

রেস্তরাঁর দরজার সামনে একটু প্রকাশ্য স্থানেই বসেছিলাম। ওয়েটারকে দুধ আনতে বলেছিলাম। ওয়েটার গেলাসে ক'রে ঠান্ডা দুধ এনে দিয়েছিল। ঠান্ডা দুধ খেতে চাইলে তার সঙ্গে সরু খড়ের নল দেওয়া হয়। আমি ঠান্ডা দুধ খেতেই পছন্দ করি। ধীরে সুস্থে খাচ্ছিলাম আর নানা কথা ভাবছিলাম। কিন্তু দরজার সামনে ব'সে নি[illegible]সংকোচে ধীরে সুস্থে দুধ খাচ্ছি দেখে অনে[illegible]গায়ে নিগ্রো ব'লে ভাবছিল। এবং বার [illegible] দিকে তাকাচ্ছিল। একখানা প্রভাতী স[illegible]ত ছিল এবং মাঝে মাঝে সে দিকে চোখ বুলচ্ছিল[illegible] এরূপ বেয়াদবি অনেকেরই বোধ হয় সহ্য হচ্ছিল না[illegible] আমার কাছে এসে বললে, "মশাই, [illegible] জ্যোৎস্না [illegible]নেকক্ষণ বসলে আমাদের অনেক ক্ষতি [illegible]

"কি রকম?"

"আজ্ঞে তাই।"

"এঁরা যে[illegible]।"

"আজ্ঞে [illegible]দের [illegible]"

"বুঝে[illegible]দে[illegible]র আর আমি [illegible] তো?"

পয়সা [illegible]লাম, "একেই বলে অ[illegible]ডিমোক্র্যাসি, এরই [illegible]ভাই আপনারা ক'রে থাকেন। [illegible] হয়েছে এদেশে আসা, দূর থেকেই লিংকনকে মনে করা ভাল, কাছে এলেই স্বপনভঙ্গ হয়।" পরে বললাম, "আমি এদেশের লোক নই, আমি হিন্দু।" ওয়েটার তৎক্ষণাৎ বললে, "বসুন বসুন, তবে বসুন, আমাদের ভুল হয়েছে।" আমি বললাম, "পুঁজিবাদী আমেরিকান আপনারা আপনাদের ধন্যবাদ, নিগ্রোদেরে 'হরিজন' ক'রে রাখাই হ'ল পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রথম সূত্র।"

লোকটি আরও কি বলতে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে অনেকগুলি লোক এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। একটি লোক আমাকে বললে, "you talk against Imperialism, why not against British?"

বললাম, "বিশেষ ক'রে কোনও জাতের বিরুদ্ধে তো আর আমি কিছু বলছি না, সাধারণভাবে তাদের নীতির বিরুদ্ধেই বলছি। আপনি বোধ হয়—"

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, কতকগুলি লোক "উনি একজন পাকা দরের হুভারপন্থী, চলুন বাইরে যাই," ব'লে আমাকে সঙ্গে ক'রে বাইরে চ'লে এল। আমরা আমার হোটেলের দিকে চললাম।

অভিশাপ

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ, বি এ

ভাঙা কুটীরের সমুখে পিছনে ডাহিনে বামে
কৃষ্ণপক্ষ বিস্তারি নামে
গভীর নিশার গহন অন্ধকার,
দিঙ্মন্ডলে নিবিড় চিত্র ভাসিছে স্তব্ধতার!
ঘরখানা পুড়ে, ফুলবন পুড়ে, পম্পাই পুড়ে ছাই,
বড়বা ভীষণ আমারে ঘিরিয়া খিলখিল হাসে ভাই;
ব্যথার পাথারে জ্বলে কালানল
রুদ্র নগ্ন ঝঞ্ঝার হুংকার,
প্রবাল দ্বীপের দুর্গ পুড়িছে
গগন বিদারী উঠিতেছে হাহাকার।

আমারে ঘিরিয়া মন্বন্তর-মহামারী-ভয়
রক্তচক্ষে কত কি যে কয়
কণ্ঠ ভরিয়া দুর্ভিক্ষের জ্বালা,
কোটি নাগিনীর উগ্র গরল কালকূট যেন ঢালা।
[illegible]শ্বাসে ক্ষীণ ক্ষুধিত শিশুর ফেনিল আর্তনাদ
শুনে শুনে নিতি কৃষ্ণমলিন দূরে আকাশের চাঁদ।
গৃহহারা হয়ে যাযাবর সাজি'
পথে পথে ঘুরি, গৃহ যে পান্থশালা,
বিধাতা দিয়েছে কণ্ঠে জড়ায়ে
বিদ্যুৎ আর শত বজ্রের মালা।

মুমূর্ষুদের চক্ষের জল করেছে উষর
কণ্টক ভরা জীবনের চর
শীর্ণ দীর্ণ পুষ্পবিহীন মন,
দুঃখ ব্যথার তুহিন বাষ্পে কাঁপি যে অনুক্ষণ।
হীরা জহরত মণি মানিকের পুষি না তো কোনো আশা
হৃদয়-সায়রে মরাল ভাসে না, গৃধিনী লয়েছে বাসা।
আগামী কালের নীল চিন্তায়
নীহারিকা কাঁপে, পৃথিবীর ঘূর্ণন,
সাহারায় গড়া মোর ধরণীতে
গর্জি উঠিছে রিক্তের ক্রন্দন।

টানা-প'ড়েন

শ্রীপুলকেশ দে সরকার

অকস্মাৎ এবং অ [illegible] আগে যে সূক্ষ্ম তন্তুর
কোনও ছলে ছিঁড়িয়া য [illegible] াহাকেই আশ্রয় করিয়া
আজ যে ইহা াসিতে [illegible] পনা করিতে পারিয়া-
ছিল? অনুসন্ধান করিয় [illegible] মেলে না তাহারই
অদ্ভুত আবির্ভাব! বাঞ্ছি [illegible] া তাহা আজ বলা শক্ত,
কিন্তু অবাঞ্ছি [illegible] উপেক্ষা করা গেল না!
বরং মনে হই [illegible] কিন্তু তবু মনে হয় এই
দুর্যোগ না ঘা [illegible] বই কি। আজ উৎপল
বিবাহিত, আজ আ [illegible]

তবুও যখন এই [illegible] গেল, উৎপলের মনে
হইল ঠিক এই [illegible] করিতেছিল।

অফিস [illegible] রে কে যেন
উৎপলে [illegible] তছে। বেয়ারা [illegible] সিল উৎপল
তাহা [illegible] । এই লোকটিই তাহ [illegible] ? লোকটি
নয় বা [illegible] কালো, চোয়াল ভাঙ্গা, অথ [illegible] ফের রেখাটি
পর্যন্ত পড়ে নাই। উৎপলের ভাল লাগে না। অফিসিয়াল কায়দায় একবার ছেলেটার অপাঙ্গে তাকায়, অর্থাৎ কি চাই?

আপনার নাম উৎপলবাবু?

হুঁ।

লিসি একবার আপনাকে যেতে বলেছে।

লিসি? লিসি কে?

ছেলেটি বলিল, জলপাইগুড়ির—

জল-পাই-গু-ড়ির? উৎপল যেন ভাবিতে লাগিল, ও, লিসি পাইন?

ছেলেটি ভরসা পাইয়া বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ।

ওদের বাড়ি—ওই, ইয়ে—সেই কি যেন স্টেশনটার নাম? উৎপল জিজ্ঞাসা করিল।

ছেলেটি চুপ করিয়া রহিল।

তুমি জান না?

ছেলেটি বলিল, না।

উৎপল বলিল, আমিও যাই নি কখনও কিন্তু তুমি জান না?

ছেলেটি আবার বলিল, না।

উৎপল আবার সন্দিগ্ধ হইল, বলিল, তুমি লিসির কে হও?

ভাই।

কি রকম ভাই? আপন ভাই? উৎপল জানিতে চাহিল।

ছেলেটি বলিল, না।

উৎপল বলিল, তবে?

ছেলেটি জবাব দিল, মাসতুতো।

উৎপল অন্য কথা পাড়িল, বলিল, সে করে কি? শুনেছিলাম ক্যালকাটা ক্লিনিক্স-এ কাজ ক'রত, তাও ছেড়ে দিয়েছে। আজও কি তার ছেলেমানুষি গেল না? সে করে কি আজকাল?

ছেলেটি চুপ করিয়া থাকিল, বোধ হয় সে জানে না।

উৎপল বলিয়া চলিল, এখন তো তার ভবিষ্যতের একটা বন্দোবস্ত করতে হবে। হঠাৎ বলিল, বিয়ে টিয়ে করেছে?

ছেলেটি তেমনি স্বল্পাহতকণ্ঠে বলিল, না। কিন্তু আপনি কবে যাচ্ছেন বলুন।

উৎপল বলিল, আজকাল—শিগগির আমার সময় হয়ে উঠবে না।

ছেলেটি বলিল, ওঁর ভয়ানক দরকার।

উৎপল বলিল, বেশ তো একদিন যাব'খন, বাসাটা কোথায় বল তো?

ছেলেটি বিস্তৃতভাবে বাড়িটির নির্দেশ জানাইল, পরে বলিল, পরশুর মধ্যে যাচ্ছেন নিশ্চয়ই?

উৎপল বলিল, আজ কি বার? বুধবার? এই—শনিবারের মধ্যে একদিন যাব। বাড়িতে ভয়ানক অসুখ, কিছুই নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না।

ছেলেটি বলিল, তা হ'লে শনিবারের মধ্যে একদিন যাবেন—বলব তাই।

হ্যাঁ, তাই ব'লো, উৎপল যেন আপাতত 'হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

আমি চলি? ছেলেটি সসংকোচে বলিল।

এসো। বলিতেই উৎপল মুক্তি পাইল যেন।

কেন, কিসের জন্য এই দীর্ঘদিন পরে যাহা মিথ্যা তাহা সত্য হইতে চাহে? কোথাও এতটুকু অঙ্কুরের খোঁজও উৎপল পায় না, যাহার এই অপ্রত্যাশিত ফল আজ যাচিয়া তাহার জীবনের পথে পড়িতে পারে। উৎপল স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার মোটা-মুটি সরল ও ঋজু জীবনরেখা সমস্যার ঘূর্ণিপাকে জটিল হইয়া উঠিবে। যাহা সর্বাংশেই অনৃত তাহাই পাপাচারী সন্দিগ্ধ জগতে অমৃতস্বাদ লইয়া উঠিবে এবং উৎপলের আজিকার রং পৃথক ও অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

অথচ যে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আপামর সাধারণ ও বিত্তশালী পুরুষ বা দেউলিয়া বিধবা মহাদুর্যোগ কাটাইয়া উঠে, উৎপলের সেই আশ্রয়টুকুও নাই। উৎপল ভগবান মানে না, এইজন্য নয় যে ওটা না মানাটাই আধুনিকতা, মানে না নিষ্প্রয়োজন বোধে। পরের উপর নির্ভর করিবার যে অলস মধুর অধীনতা তাহা উৎপলের ধাতে প্রশ্রয় পায় নাই এবং আত্মাবমাননা করিয়া অদৃশ্য শক্তির পায়ে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করাকে সে নিতান্ত অবান্তর ও অযথা সময়ক্ষেপ বলিয়া মনে করে। তবে আত্মচেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে আত্মবিশ্বাসের মূলে সে জলসিঞ্চন করে বটে। সেদিক হইতে পৌত্তলিকতা বা নিরীশ্বরবাদ কোনওটাকেই সে অবহেলা বা শ্রদ্ধা করিবার কারণ খুঁজিয়া পায় না। বরং মানুষের দুঃখে দুই ফোঁটা জল ও এক মুঠা চাল অঞ্জলি দেওয়াকে সে পরমার্থ মনে করে।

কিন্তু আজ? আজ এই দুর্যোগ। অথচ ইহাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া আত্মপ্রতারণা করিবার অবসর উৎপলের কোথায়? ভাগ্য-নির্দিষ্ট পথে উৎপলের মাথায় বহু চেষ্টা করিয়াও এই কথা কেহ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। তবে? আজিকার এই দুর্যোগ সে কি বলিয়া গ্রহণ করিবে? অতীতের কোথাও বীজ উপ্ত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তার কাহারও অজানিত প্রতিক্রিয়া তাহারই উপর এমন বিপর্যয় সৃষ্টি করিবার জন্য উদ্যত হইতে পারে, ভাগ্যহীনতা দিয়া তো ইহার ব্যাখ্যা করা চলে না।

এই মিস লিসি। উৎপলের মনে আর পাঁচজন দুঃস্থ অসহায় যেরকম দাগ কাটে এও ইহার বেশী কাটে নাই। মিস লিসি তাহাকে ততটুকুই আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার বেশী নহে, কিন্তু ইহাকেই অবোধগতিতে ঘুলাইয়া তুলিয়াছে স্বয়ং মিস লিসি, অন্তত আজিকার এই আকস্মিক আবির্ভাবে তাহাই মনে হয়। কে জানিত, উৎপলের অজানিতে দীর্ঘদিনব্যাপী অন্য এক তপস্বিনী তাহাকেই অবিশ্রান্ত খুঁজিয়া ফিরিয়াছে। একনিষ্ঠ সাধনার যাহাই ফল হউক, মিস লিসির এই অদ্ভুত সন্ধানে উৎপল বিস্মিত না হইয়া পারিল না। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার কোনও সূত্রই ছিল না, তবুও উৎপল অনাবিষ্কৃত রহিল না, অব্যর্থ সন্ধানে সেই ঠিক জায়গাটিতে আসিয়া হাজির। অথচ ইহার মধ্যে কত সংঘাত ও পরিবর্তনই ঘটিয়া গিয়াছে।

পৃথিবী গ্রহে যখন নিশ্চিন্তে ঘর বাঁধিয়া সংসার করিতেছি তখনই কিনা আর একটা গ্রহের সঙ্গে পৃথিবী গ্রহটার এই বিপর্যয় সংঘর্ষ? উৎপল চঞ্চল হইয়া উঠিল। অফিসের বর্তমান কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটা অনাস্বাদিত অবাঞ্ছিত ভবিষ্যৎ অবোধ্য বিঘ্নের মত উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

অথচ উৎপলের মন লিসিকে অপরাধী করিতে পারিল না। মেয়েমানুষ যখন যাচিয়া দেখা করিতে চায় তখন স্পষ্টত একটা বোঝাপড়ার ইচ্ছাই তাহাতে থাকে। উৎপলের না হউক, মিস লিসির মনে একটা কিছু যে ঘনাইয়া উঠিয়াছে তাহা মনে করিতেও উৎপল শিহরিয়া উঠিল। চারিদিককার বিস্তৃত জালখানি গুটাইয়া অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাও উৎপলের নাই, তাই আজ যাইব না বলিয়া এই সমস্যাকে অপসারিত করিলেও উৎপলের মনে ইহা একটি স্থির কাঁটার মতো বিঁধিয়া রহিল যে, মিস লিসির সহিত তাহার দেখা না করিয়া গত্যন্তর নাই।

আজ মনে হইল তাহার সমগ্র জীবনের বায়স্কোপটা বুঝি এই দুর্যোগ ও বাড়ির অসুখের সন্নিহিত পারম্পর্য দিয়াই রচিত; কোনওটাকেই অন্তরাল দিবার উপায় নাই।

সিন্দবাদের ভূত কাঁধে লইয়াই অনেক রাত্রে উৎপল বাড়ি প্রবেশ করিল এবং রুগ্ন সন্তানের মুখের উপর প্রতিফলিত আলোকে চমকাইয়া উঠিল। সমস্ত দেহমনের নির্যাস এই, ভবিষ্যৎ অমরত্বের অবিচ্ছিন্ন শিখা! জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, আর পিতৃমনের 'বোধ হয় বাঁচিবে না' এই আশঙ্কায় তাহা আরও যেন অসহ্য রকমে সুন্দর হইয়া ফুটিয়া আছে। বেশী সুন্দর, বেশী সুখপ্রদ বলিতে ভরসা হয় না।

জামা ছাড়িতে ছাড়িতে উৎপল অত্যন্ত সরল ও আদিম প্রশ্ন করিল স্ত্রীকে, কেমন আছে?

উৎপল যেন অপরাধ করিয়াছে এবং এত দেরিতে চাকরি হইতে ফিরিয়া স্ত্রীকে ইচ্ছা করিয়া বিড়ম্বিত করিয়াছে এইরূপ একটা ভাবপ্রকাশ করিয়া কিছুকাল নীরব থাকিবার পর স্ত্রী বলিল, ভাল ডাক্তারটাক্তার দেখাবে না, না কি? মেয়েটাকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছ বুঝি?

উৎপল বলিল, তার মানে?

স্ত্রী বলিল, তার মানে আবার কি, গেলাম, কি বললাম না বললাম তার ঠিক নেই সস্তা দু পয়সার হোমিওপ্যাথিক নিয়ে এলাম, আর লোককে দেখানো হ'ল ভারী চিকিৎসা হচ্ছে।

উৎপল বলিল, বা রে!

স্ত্রী বলিল, বা রে আবার কি? তোমার মতলবটা কি বল তো?

বস্তুত মেয়ের অসুখ হইয়াছে বলিয়াই যে স্ত্রীর এই উত্তেজনা, তাহা নহে, সব কিছুতেই একটা মতলব খুঁজিয়া বাহির করা উৎপলের স্ত্রীর স্বভাব এবং তাহা লইয়াই হইচই করিয়া সে অসম্ভব কাণ্ড করিয়া তুলিত; উৎপলের পুরুষস্নায়ু সমান প্রতিক্রিয়ায় চঞ্চল হইয়া উঠিতে একটা লজ্জাকর বচসা হইত বটে, কিন্তু স্ত্রীর বাতিকগ্রস্ত ভালবাসাই আবার পরক্ষণে আপসের পথ খুঁজিত। উৎপলের পক্ষে এই কদর্য অভিনয় নিত্য মানিয়া চলা যতই অসম্ভব হইতেছিল, স্ত্রীর মস্তিষ্কের অসুস্থতা ও ভালবাসার উন্মাদনা ততই তীব্রতর হইতে লাগিল। উৎপলের পক্ষে পালাইবার পথ না থাকাতেই ইহা তাহার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে এবং মান, সম্মান, সম্ভ্রম সকলই স্ত্রীর চরণে উৎসর্গ করিয়া সংসারে একটি ক্লাউনের ভূমিকায় উৎপল নিজেকে সর্বাংশে নিয়োজিত করিয়াছে। স্বামীকে লোকচক্ষে অপমানিত করিয়াই যে স্ত্রীর আনন্দ, উৎপল তাহাকে যথারীতি সম্মান দিতে পারিত না ইহাও যেমন সত্য, অন্য কোনও অবস্থার উদ্ভবের দুশ্চিন্তায় যে স্ত্রীকে সে সমীহ করিয়া চলিত ইহাও তেমন সত্য। লোকলোচনে ইহার নাম স্ত্রৈণতা হইলেও উৎপলের আজ আর অভিযোগ করিবার মত প্রবৃত্তি ছিল না। পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ব্যাপারে নির্বিকার চিত্ততার পরিবর্তে অসহিষ্ণুতাই উৎপলের চরিত্র-মাহাত্ম্য হইয়া উঠিল।

এই সংসার—এই কদর্য সংসার, প্রত্যুষ হইতে অভাব, হাঙ্গামা, সমস্যার পথ কাটিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত অসহ্য এই জীবন, উৎপল ভাবিতে ভাবিতে মরিয়া হইয়া উঠে। মনে হয় অশান্তির এই হিমালয় সে যাচিয়া লইয় [illegible] পূর্বাহ্ণে ইহাকে হিমালয় মনে করিতে পারে ন[illegible] তা আছে ইহা জানিত, কিন্তু স্ত্রীকে পরিতুষ্[illegible] ট ও অসম্ভব তাহা ভাবিতে পারে নাই; আজ ইহাকে [illegible] যায় না? এক টান মারিয়া দূরে বহু দূরে ছিটকা[illegible] না?

যায় না। আশ্চর্য [illegible] আছে; উৎপল মানুষ, তাই যায় না। এ[illegible] জ্যোৎস্না-নেত্রার জন্য যখন সে কাহাকেও দায়ী ক[illegible] দুনিয়ায় সে ছাড়া আর কেহ এই [illegible] হইয়াছে [illegible]। ফলে, পরের স্কন্ধে অপরাধ চাপাইয়া নি[illegible] আশ্বাস উপভোগ করা যাইত তাহার [illegible] গিতে লাগিল। পথ নাই, পরিত্রা[illegible]

ইতিম[illegible] পাঁচবার ঝুঁকিয়া [illegible] লের উক্ত অসমাপ্ত [illegible] ক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া [illegible] কমল স্থানান্তরে [illegible] বাকীটা আত্মসাৎ করিল এবং [illegible] কমলের মুখোমুখি হইতে জিজ্ঞাসা করিল, আমার কুষ্ঠি লিখছ জানি, কিন্তু এই লিসি পাইনটি কে, শুনি?

কমল উপেক্ষাভরে জবাব দিল, লিসি পাইন—লিসি পাইন।

বিশাখা বলিল, হ্যাঁ সেটি কে?

বলিল, ওই যে বললাম।

বিশাখা বলিল, আমি জানি, উটি বেলা মিত্তির।

কমল সহিংস দৃষ্টিতে বিশাখার দিকে তাকাইল।

বিশাখা বলিল, নিশ্চয়—নিশ্চয়—।

কমল বলিল, এ কথা তোমার মনে আসে কেন?

বিশাখা বলিল, তুমি বেলাকে ভালবাস, এ আমি টের পেয়েছি।

কমল বলিল, টের পেয়েছ?

বিশাখা জবাব না দিয়া বলিল, যদি তাই মতলব ছিল, তবে আর একটা মেয়ের সর্বনাশ করা কেন?

কমলের শরীরের রক্ত চলাচল যেন বাড়িয়া গেল।

বিশাখার ভ্রূক্ষেপও নাই। না এসব লিখতে পারবে না।

কমল বলিল, বা রে, কি লিখব না লিখব তাও তুমি ঠিক করে দেবে?

বিশাখা বলিল, কেন তুমি আমার নামে যা-তা লিখবে?

কমল বলিল, এতে তুমি যদি নিজেকে টেনে আন—

বিশাখা বাধা দিয়া বলিল, 'টেনে আন' আবার কি? না না, ওসব দুশ্চরিত্রার সঙ্গে আমার নাম করতে পারবে না। লোকে স্ত্রীর গুণ প্রকাশ করে আর তুমি—আত্মীয় স্বজনের কাছে মুখ দেখানো তো অসম্ভবই করে তুলেছ তাতেও তৃপ্তি নেই আবার লিখে তা প্রচার করবে? আর ওইসব মেয়েমানুষের সঙ্গে।

কমল দম লইয়া বলিল, চট করে পরের সমালোচনা ক'রো না।

বিশাখা বলিল, নিশ্চয়, দম্ভ করে বলতে পারি সে বিষয়ে তুমি সৌভাগ্যবান। কেউ বলতে পারবে না, বিয়ের আগে আমি অনাত্মীয়ের সঙ্গে মেলামেশা করেছি।

কমল প্রতিহিংসায় স্ফীত হইয়া বলিল, হয়তো সুযোগ মেলেনি।

বিশাখা তেমনি রুক্ষকণ্ঠে বলিল, যাও যাও তোমার মত দুষ্প্রবৃত্তি আমার নয়।

কমল বলিল, দুষ্প্রবৃত্তি? আমার?

বিশাখা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, নইলে বিয়ে করেও আর কেউ কাউকে ভালবাসে?

কমল সাবধান করিয়া দিবার ভঙ্গিতে বলিল, একটা গল্প নিয়ে বড্ড বাড়িয়ে তুলছ ব'লে দিচ্ছি।

বিশাখা বলিল, ও গল্প নয়, ও নির্ঘাত বেলা মিত্তির আর

আমার কুণ্ঠি, তোমায় অ[illegible]ত্যাকা[illegible]

কমল আগাইয়া আ[illegible]নান্তর।[illegible]জান তুমি আমার? এবং জবাবের প্রতীক্ষা না র[illegible] বিশাখার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল; কি[illegible]সাত্যক[illegible]

বিশাখা উত্তপ্ত হইয়া বা[illegible] স্ত্রীর দোষ তো এক গাদা লিখতে পার, এই য[illegible] খলে[illegible] মারে তার গুণাগুণ লিখতে পার না[illegible]

এই রূঢ় ব[illegible] [illegible]য়া উঠিল, কিন্তু এই কঠিন ইঙ্গিতে [illegible]হইল এই বিষাক্ত আবহাওয়া ছাড়িয়া গিয়া[illegible]াকে শাস্তি দেয়। সমস্ত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া [illegible] করিয়া ফেলে। আজও প্রতিহিংসার [illegible]আমার একথা পড়িয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া [illegible]র হইয়া পড়িল। [illegible] মাথা তুলে [illegible]

* * *

উৎপল[illegible] পাইনের সহিত দেখা করিতে পা[illegible]ই, সময় হইয়া উঠে নাই, আজ তাগিদ আসিয়া হাজির।

কই, গেলেন না তো? সেই ছেলেটি বলিল।

উৎপল বিরত হইয়া পড়িল, একটু বিরক্তও হইল। বলিল, যেতে পারি নি আর তা ছাড়া আমি তো বলেছি শনিবারের মধ্যে যাব।

কাল যাবেন?

কি করে বলি? উৎপল জবাব দেয়।

দিদি ভয়ানক তাগিদ দিচ্ছেন যে।

উৎপলের রাগ হইল, বলিল, যাব বলেছি, একদিন যাবই।

যাবেন, বলিয়া ছেলেটি প্রস্থানোদ্যত হইতে উৎপল বলিল, হ্যাঁ, তোমাদের ওখানে কোথা দিয়ে যেন যেতে হয়?

ছেলেটি বলিয়া গেল; কিন্তু কথাগুলি উৎপলের সবটা কানে গেল না। জটিল সমস্যার ঘূর্ণিপাক তখন তাহার চতুর্দিকে ঘুলাইয়া তুলিতেছে। কি মুশকিল, হঠাৎ এই অসময়ে এই অনাহূত আগমন কেন, কি চায় সে? গৃহে তাহার শান্তি নাই, না থাক, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও তো সে চাহে নাই। সে চাহিয়াছে, যাহা সে গড়িয়াছে তাহা যেন না ভাঙ্গে। আর যদি ভাঙ্গেই তবে যেন এই কলঙ্ক লইয়া না ভাঙ্গে যে উৎপল আর কাহারও দিকে ঝুঁকিয়াছিল! উৎপল তাহার চরিত্রাভিমান রক্ষা করিতে চাহে; ইহাই তাহার অহংকার। এই অহংকারে প্রতিবার স্ত্রী আঘাত করিয়াছে, প্রতিবার সে প্রতিহত করিয়াছে, কিন্তু মীমাংসা হয় নাই। না হইলেও তাহার চরিত্র আজও সমুন্নত, ভবিষ্যতেও ইহাকে সে এইরূপেই দেখিতে চাহে। তাহা না হইলে কি লইয়া সে থাকিবে?

অথচ ইহার সহিত পরের উপকার, অনাত্মীয়ের প্রতি অনুকম্পা বা অনাত্মীয়ার আগ্রহ আহ্বান কোনওটাই বেমানান নয়। লিসি পাইন ডাকিতেছে, তাগিদ জানাইতেছে, নিশ্চয় সে বিপদে পড়িয়াছে, বিপদ না হইলে এত দীর্ঘ দিন পরে এত খোঁজ অনুসন্ধানের পর উৎপলকে তাহার কি প্রয়োজন? তবু মনে সংকোচ জাগিতেছে কেন? বিবাহ করিয়াছে বলিয়া? স্ত্রী যদি জানিতে পারে, এই ভয়ে? কি ভয় তাহার? দ্বিতীয়বার বিবাহ সে করিবে না, ইহা নিশ্চিত। কেবল কি ইহাই ভয়? মেয়েরা বিবাহকে ভয় করে না, ভয় করে—আর কাহাকেও বুঝি স্বামী ভালবাসিল। একনিষ্ঠ স্বামীই তাহাদের কাম্য। তাই পুরুষেরা একনিষ্ঠ হইলেও তাহাদের সন্দেহ ঘোচে না। স্ত্রীর সম্মুখে আর কাহারও সৌন্দর্য বলিবার উপায় নাই, আর কোনও মেয়ের প্রশংসা করিতে নাই, সর্বোপরি কুমারী মেয়ের সহিত মিশিতে নাই। যে নারী সন্তানবতী সে বন্ধ্যাকে ভয় পায়। ভয় পায় পাছে সেই বন্ধ্যা তাহার স্বামীর শরণাপন্ন হয়। এত সন্দেহ লইয়া ঘর করা যায় না, বাবা! পুরুষ দুর্লভ নহে, স্বামী কি এতই দুর্লভ? অথবা নারীর প্রতি অপমান নিক্ষেপ করিতে গিয়া সন্দেহাতুর নারীরা নারী শ্রেণীকেই অতিমাত্রায় সুলভ করিয়া তোলে?

কিন্তু এই লিসি? যে আজ তাহাকে এত অনুসন্ধান করিয়া আগ্রহ আহ্বান জানাইয়াছে? বিপদগ্রস্ত পুরুষ হইলে এত ভাবনার কথা ছিল না, বিপদগ্রস্তা নারী বলিয়াই কি উৎপল এই আকর্ষণ বোধ করিতেছে? আকর্ষণ? নিশ্চয়ই আকর্ষণ। সে তো এক কথায় লিসির আবেদন উড়াইয়া দিতে পারিত; তবে দিল না কেন? না, লিসি কোনও অপরাধ করে নাই, করিতেও চাহে নাই; তবে তাহার আহ্বানকে উপেক্ষা করিতে হইবে ভাগ্যক্রমে লিসি নারী হইয়া জন্মিয়াছে বলিয়া? নারী, কিন্তু অপ্রতিদ্বন্দ্বী নহে, উৎপলের ঘরে স্ত্রী আছে, শুনিলে বিষম বিপর্যয় ঘটিবে। তবে কি সে এই কথাটা স্ত্রীর কাছে চাপিয়া যাইবে? ভাল বিপদ, একটা ভাল কাজ করিতে গিয়াও এত লুকোচুরি, কি প্রয়োজন এই লুকোচুরির? লিসিকে তো সে গৃহে আনিতে যাইতেছে না যে সে সত্য সত্যই প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িবে! তা ছাড়া, প্রথম দিনের আহ্বান দিয়া এত কথা বিচারও করা যায় না। হয়তো জিনিসটা অতি সামান্য, অতি সরল। হয়তো বড় জোর বলিবে, অমুকের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে? একটু আলাপ করিয়ে দিতে পারেন? একটা কাজ নাকি খালি আছে, একটা দরখাস্ত লিখে দেবেন? অথবা হয়তো বলিবে, একবার দেখা করার ইচ্ছে ছিল—ইশ কত দিন পর দেখা!

কিন্তু এত করিয়াও উৎপল ব্যাপারটা সহজ করিতে পারিল না। নিজের মনের অভ্যন্তরে এই সত্যটা আবিষ্কৃত হইতে দেখিয়া একাধারে লজ্জিত ও পুলকিত হইল যে লিসি তাহাকে ভালবাসে। পরে তাহাকে ভালবাসে একথা ভাবিতেও সুখ। অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল, মন্মথও লিসিকে ভালবাসে। বিবাহের পর পরের ভালবাসা সামাজিক লজ্জার দিক হইতে অর্থহীন হইতে পারে; কিন্তু মিথ্যা হইবে কেন?

* * * *

লেখার মাঝখানেই বিশাখা আসিয়া হাজির এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া এই শেষের কথা কয়টিই পড়িয়া ফেলিল। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'পরে ভালবাসে একথা ভাবিতেও সুখ', কেমন?

কমল বিরত বোধ করিল। জবাব দিতে পারিল না।

বিশাখা বলিল, পুলকিত হও এই ভেবে যে বেলা তোমায় ভালবাসে?

কমল রুদ্ধ রোষে জবাব দিল, নোংরা মন তোমার, এযে গল্প!

বিশাখা বলিল, বাজে কথা ছাড়, এমন বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে বিয়ে করেছিলে কেন?

কমলের শ্বাসরোধকর অভিমানে আর একবার মনে হইল, বৃথা বৃথা, ইহাকে বলিয়া লাভ নাই, ইহার সংশোধনের উপায় নাই, ইহার সহিত সংসার করা অসম্ভব। বলিল, সবটাতেই নিজেকে আরোপ করতে চাও কেন?

বিশাখা বলিল, আরোপ কি?

কমল বলিল, আমার সব লেখাতেই তুমি নিজেকে ও আমাকে খুঁজে ফের। গল্প কি কেবল আমাকে আর তোমাকে নিয়েই হয়?

বিশাখা বলিল, অন্তত তোমার গল্প এ ছাড়া আর কিছু নয়।

কমল বলিল, একটা গল্প লেখার অধিকারও আমার নেই? বিয়ে করে শেষটায় এইটুকুই কি পাওনা হল?

বিশাখা বলিল, গল্প লেখার আর কি বস্তু নেই?

কমল বলিল, আছে, কিন্তু লেখার উৎসাহ নেই। একথা নিঃসংশয়ে বুঝেছি যে লেখা আর স্ত্রী এক সঙ্গে রাখা চলবে না,

একটি ছাড়তে হবে। বলিয়া সমগ্র লেখাটা ছিঁড়িতে যাইতেই বিশাখা বাধা দিল।

বলিল, থাক, আর কিছু বলব না, লেখ। বলিয়া জোর করিয়া চোখের জল আনিয়া নাকি সুরে বলিল, আমার আবার একটা সম্মান!

কিন্তু কমল শত সাধ্যসাধনাতেও আর কলম ধরিল না।

রাত্রে শুইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সুকঠিন নীরবতায় কাটিয়া গেল। তন্দ্রার নেশাটা একটা ধাক্কা খাইয়া কাটিয়া যাইতেই কমল টের পাইল বিশাখার একখানি কোমল হাত তাহার হাতখানি খুঁজিয়া ফিরিতেছে এবং ইহাও ক্রমশ টের পাইল যে, একটি কোমল মধুভার তাহার সর্বাঙ্গ আঁটিয়া চাপিয়া ধরিতেছে। কমল আত্মসমর্পণ করিল।

* * * *

মিস লিসি পাইনের উদ্দেশে উৎপল বাহির হইয়া পড়িল। তাহার যেন একটু লজ্জা করিতেছে, একটু সংকোচ জন্মিতেছে, একটু কুণ্ঠা জাগিতেছে। এ কেন? সে তো অপরাধী নহে, অপরাধ সে তো আজও সত্যিই করে নাই, তবে এই দুর্বলতা কেন? এমনও নহে যে অসাধু উদ্দেশে সে পা বাড়াইয়াছে। কাজটাকে সে ভাল বলিয়া মনে করিয়াই বাহির হইয়াছে। তবে কেন? স্ত্রী জানিলে অপছন্দ করিবে? সংসারে বিভ্রাট বাধিবে? তা, এই সামান্য কারণে—সামান্য কারণ? মেয়েদের কাছে

বাস হু হু করিয়া চলিয়াছে, কণ্ডাকটার পয়সা চাহিল, বাস ঠিক পথে যাইতেছে তো? ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সে ওই পাড়ায় কোনও দিন যায় নাই। যাওয়ার দরকার পড়ে নাই। রাস্তা ঠিকানা সবই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু সে যাইতেছে কোথায়? লিসি পাইনের কাছে? কেন, কি তাহার কাজ? একটা মেয়ে ডাকিলেই যাইতে হইবে? হ্যাংলার মত আদেশ মানিতে হইবে? সে না বিবাহ করিয়াছে? তাহার না সন্তান আছে? কোথায় যাইতেছে সে? ছি! এত কথা কেন? সংসার করিবার সঙ্গে একটি বিপন্না নারীকে দেখিতে যাইবার বিরোধ কোথায়? এইবার—এইখানে না নামিতে হইবে? এই তো এদিকে। বোধ হয় ওই বাড়িটা, ওই পরের বাড়িটা; কিন্তু একি নম্বরগুলি এমন বিপরীত ঠেকিতেছে কেন?

মশায়, তেষট্টি নম্বরটা কোন্ দিকে হবে?

তেষট্টি নম্বর? ওইদিকে চলে যান, অনেকটা যেতে হবে।

উৎপল ভুল আসিয়া পড়িয়াছে, বিপরীত পথে অনেকটা চলিতে হইবে। এই বাড়ি, এই বাড়ি—ওই বাড়িটা কি? কর্পোরেশন ফ্রি প্রাইমারী স্কুল, দরজীর দোকান, ৪৭নং, জন লেন, রুটি বিস্কুটের দোকান, মস্ত বাজার—৫৭।১।১ উৎপল না জানিয়া আসিতেছে, হঠাৎ, অকস্মাৎ; হয়তো মিস লিসি নাই না থাকিবার সম্ভাবনা আছে কি? কিন্তু যদি না থাকে তবে তাহাকে বড় অসুবিধায় পড়িতে হইবে। আবার সুবিধা এই যে, এই অজুহাতে সে লিসির দূত মারফত জানাইতে পারিবে যে, সে তো সন্ধান লইতে আসিয়াছিল, মিস লিসিই অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন, অতএব আর তাহার দায়িত্ব নাই, খোঁজের প্রয়োজন—এই না নম্বরটা? পকেট হইতে ঠিকানাটা মিলাইয়া দেখিল, ঠিক। কড়া নাড়িবে নাকি সে? যিনি দরজা খুলিবেন, তিনি যদি একটি যুবক হন, সে যদি একটি ছোট্ট ছেলে হয়, অথবা তিনি যদি একটি বৃদ্ধ হন, অথবা মিস লিসি স্বয়ং—উৎপল কড়া নাড়িল।

দরজা খুলিল; বালকও নয়, মিস লিসিও নয়, অন্য কোনও নারী নয়, কর্তৃত্বের ছাপ মারা এক বৃদ্ধ; উৎপল মুহূর্তের সংকোচ কাটাইয়া বলিল, মিস লিসি আছেন?

আছেন— বলিয়া বৃদ্ধ ভিতরে গিয়া কাহাকে ডাকিতেই মিস লিসি স্বয়ং হাজির। ঠিক তেমনি। একেবারেই কি বদলায় নাই? বিচার করিতে [illegible] উৎপলের আবার মনে পড়িল, লিসিকে সে [illegible]

চলুন ওপরে [illegible]ন আগাইয়া চলিল; উৎপলকে অনুসরণ করা ছাড়া [illegible] রহিল না। এত দূরে আসিয়া আবার পিছু-পা কে[illegible] লিসি, ওই তো পথের ইঙ্গিত!

আসুন! উৎপ[illegible] গিল। আঙ্গিনার বারান্দায় কাহারা ভিড় করিয়া [illegible] চোখ উৎপলের সারা দেহে আসিয়া [illegible] লাজুক উৎপল দেখিল লিসি সিঁড়ি[illegible]ক ভাবিতেছে ও? উৎপলের পরিবর্তি[illegible] চোখে পড়িয়াছে? কেবল কি চেহারা? [illegible]র নাড়িয়া চাড়িয়া লিসি বলিল, বস[illegible]

তুমি[illegible]

এ[illegible] হাইতে বিছাইতে [illegible]।

উ[illegible], ওইটেই ভাল করে পা[illegible] নিজেই মাদুরের [illegible] দিক টানিয়া বসিল।

লিসি হাসিল কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে তাহার মনের ভাবনার যেন যোগাযোগ নাই; মনে হইতেছে, ঠেলাঠেলি করিয়া অনেক কথাই তাহার আসিতেছে, কিন্তু কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে বলিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

উৎপলের মনে হইল, লিসি যেন আরও গম্ভীর হইয়াছে, স্বাস্থ্যটা তো খুব খারাপ হয় নাই? অথচ পারিপাট্য নাই। উৎপলের আরও মনে হইল, লিসির সর্বাঙ্গে যেন সংযমের সম্ভ্রান্ত পরিচয়।

উৎপল বলিল, তার পর?

লিসি মাথা নীচু করিয়া শাড়িটাকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল পর্যন্ত বার বার টানিয়া দিতেছিল, এই অহেতুক প্রশ্নের জবাব দিল না, তাকাইলও না।

উৎপল পরিহাস করিয়া বলিল, তোমার বিরুদ্ধে আমার নালিশ আছে, তুমি কি করেছ? উৎপলের নিজেরই মনে হইল, এ কি উলটা অভিযোগ! তাহারই নালিশ।

লিসি তাকাইল। বিস্ময়, প্রত্যাশা ও অভিমান চোখে চেতনা আনিয়া দিয়াছে। ধীরে ধীরে বলিল, কি করেছি?

কি করেছ? উৎপল বিচারকের মত জিজ্ঞাসা করিল। তোমার সেই কালো ছেলেটাকে মনে আছে? সেই যে আমার সঙ্গে প্রায়ই থাকত, মনে আছে তাকে?

নলিনী বাবু? লিসি জানিতে চাহিল।

হবে—আমার মনে নেই নামটা। উৎপল উপেক্ষাভরে বলিয়া চলিল, কলকাতায় এসে অবধি তোমার যথেষ্ট খোঁজ করেছি, খোঁজ কেবল তারই কাছে পেলাম।

খোঁজ করেছিলেন আমার আপনি? লিসি উৎসুক হইল।

যথাসম্ভব! উৎপল বলিল; সেই নলিনীবাবুকেই জিগগেস করলে জানতে পারবে। কলকাতায় খোঁজ পাওয়া যে কী দুর্ঘট।

আমাদের গাঁয়ে খোঁজ নিলেন না কেন? লিসি বলে, আপনি তো আমাদের গাঁয়ের নাম জানতেন।

ভুলে গেছি। উৎপল বলিল, কিন্তু থাক গে সে সব কথা। এখন কথা হচ্ছে, সেই নলিনীবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লেই তোমার খোঁজ করতাম, কিন্তু তিনি যে সব কথা বলতেন তাতে খোঁজ করার উৎসাহ আমার ক'মে যেত।

কি বলতেন তিনি? লিসি জানিতে চাহিল।

অনেক কথা, উৎপল বলিল, সেই কথাই তোমাকে বলব। আগেও তোমার দুর্নাম শুনেছি, কান পাতি নি কিন্তু নলিনী বাবু যা বললেন—

ও! লিসি হঠাৎ বলিল।

[illegible] সত্যকার

কি? উৎপল জানিতে [illegible] নামান্তর।

না—বলুন, লিসি সংযত [illegible]

উৎপল বলিতে লাগিল, [illegible] সত্যবাবুনে আমি ভাবতাম লিসি কি এত ছেলেমানুষ যে [illegible] তে জানে না?

তাই বলতেন [illegible] খ [illegible] সি বলিল।

কারা কারা [illegible] সঙ্গে তোমার বিয়ে পর্যন্ত নাকি ঠিক [illegible] নে [illegible] বলিতে লাগিল।

ইস্! লিসি মানব [illegible]

আর— উৎপল না [illegible] বলিতে

আর কি? [illegible]

তুমি নাকি, উ [illegible] এ [illegible] শুনতে পারতে না [illegible] যখনই জিগগেস [illegible] কোথায় থাকে বলতে [illegible] তুলে নলিনীবাবু বল [illegible] খোঁজে কি হবে মশাই? [illegible] আপনার কথা ভুলেও জিগগেস করে না, আর তা ছাড়া [illegible] শুরু করেছে—। আমি বলতাম, আমার বিশ্বাস আছে আমার সঙ্গে দেখা হ'লে নিশ্চয়ই তার পরিবর্তন হবে, আমায় একবারটি দেখাতে পারেন? তিনি বলতেন, আপনিও যেমন!

লিসি বলিল, ও, এই মতলবেই ওরা কক্ষনো আমায় আপনার ঠিকানা দেয় নি। আমার তখনই মনে হচ্ছিল ওরা কি একটা ষড়যন্ত্র করছে। আমি কত অনুরোধ করেছি—ওরা আমাকে দিন-রাত জ্বালিয়ে খাচ্ছিল—

উৎপল বলিল, নলিনীবাবু যাদের নাম করতেন তারা সব বাজে তবে?

লিসি বলিল, বাজে নয়, সব সত্যি। নলিনীবাবু ওঁরা দল করে আসতেন এও যেমন সত্যি, নলিনীবাবু যাদের নাম করেছেন তাঁরাও সত্যি। অথচ এঁরা—নলিনীবাবু ওঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীও নন। আজ বুঝছি—

উৎপল বলিল, কি বুঝছ?

লিসি ধীরে ধীরে বলিল, আজ বুঝছি জেনেও ওরা আমায় আপনার খোঁজ কেন দেয় নি, আমি যত অনুরোধ করেছি ততই ওরা নানান কথা বলেছে আর আমার ওপর চাপ দিয়েছে। কাল বাড়ির চিঠি পেয়েছি, আনব চিঠিটা?

উৎপল বলিল, না তুমি ব'স, এনো 'খন।

লিসি একটু খুশী হইল, বলিল, ওরা কত কি বলেছে, তাঁকে কেন খুঁজছেন আপনি, তিনি তো বিয়ে করেছেন, আরও কত কি। আশ্চর্য এই, কোনও কথাই তাদের আমার বিশ্বাস হয় নি, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে কোনও উপায়ে আমায় হাত করা। কতদিন আমায় ওরা সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছে, কত রকম ফাঁকি দিয়েছে—

উৎপলের আচরণে অকস্মাৎ একটা সংকোচ আসিয়া পর-মুহূর্তেই শিথিল হইয়া গেল, বলিল, লিসি, মিথ্যে তাঁরা বলেন নি, একথা সত্যি যে আমি বিয়ে করেছি।

উৎপল আপনাআপনিই স্তব্ধ হইয়া গেল। আরও কিছু প্রয়োজন মনে করিয়া তাকাইতেই দেখিল, লিসি একদৃষ্টে তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে। চোখোচোখি হইতেই লিসি হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, সত্যি?

উৎপল বিপদ গণিল, তবু বলিল, সত্যি, কিন্তু তুমি যে সত্যিই এখনও আমাকে ইয়ে—কোথাও কোনও ছলে সে কথা তো বুঝতে দাও নি। উৎপলের আবার মনে পড়িল লিসিকে সে ভাল-বাসে এবং এই কথাটা লিসিকে জানানো দরকার।

লিসি বলিল, দিয়েছিলাম।

উৎপল বলিল, না দাও নি। তবু মনে আমার কেন যে সংশয় ছিল জানি নে, তোমার খোঁজ আমি করেছিলাম।

লিসি বলিল, পুরুষ হয়ে খোঁজ না পেলে, মেয়েমানুষ কি ক'রে খোঁজ পায় বলুন তো?

উৎপল বলিল, ভুল বললে, মেয়েমানুষের খোঁজ পুরুষে করবে কি ক'রে?

লিসি বলিল, কিন্তু তবু আমিই খুঁজে বের করলাম—

উৎপল বলিল, এ কেবল তোমার কৃতিত্ব নয়, এ আশ্চর্য, আর তোমার ভালবাসার নিদর্শন। সত্যি, তুমি যে—, কেন তুমি আমায় ঘুণাক্ষরেও তোমার মনের কথা জানতে দাও নি? যদি দাও নি তবে আজই কেন—

লিসি উঠিয়া পড়িল, বলিল, বসুন, বাড়ির একখানা ফোটো আপনাকে দেখাই—

উৎপলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া লিসি ছুটিয়া নামিয়া গেল এবং সমস্ত ব্যাপারটার অপরিশোধনীয় অন্যায় উৎপলের কাছে অত্যন্ত বীভৎস লাগিতে লাগিল। মনে হইল, সে অজ্ঞাতে একটি নিরীহ নারীকে একেবারে সর্বস্বান্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। ছি!

লিসি ফোটো লইয়া উৎপলের অত্যন্ত নিকটে সরিয়া আসিয়া সকলের পরিচয় দিতে লাগিল। উৎপলের কিছু কানে গেল, কিছু গেল না।

উৎপল দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, লিসি তোমার জীবনের ব্যর্থতার জন্য আমাকে দায়ী না ক'রে পারছি না। তুমি আমায় কিছু বুঝতে দাও নি, আজ এ কথার কোনও মানে হয় না। তবু আমি ক্ষমা চাইছি।

লিসি সরিয়া বসিল, এ কথার কোনও জবাব দিল না। অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল, বিয়ে কোথায় হ'ল?

উৎপল বলিল, এ কথা কি আজ তোমার না জানলেই নয়?

লিসি হাসিয়া বলিল, ক্ষতি কি? বলুন না, বউ কেমন?

উৎপলের অকস্মাৎ রাগ হইল, বলিল, সুন্দর। কিন্তু তোমার কাছে যে এইমাত্র ক্ষমা চাইলাম সে কি তোমার কানে গেছে?

ক্ষমা আমি করতে পারব না। ধীরে অথচ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে লিসি বলিল।

উৎপল সর্বদেহে একটা ঝাঁকুনি বোধ করিল, তার পর মনে হইল, চোখের সমুখটা ঘোলা হইয়া গিয়াছে। লজ্জায় তাড়া-তাড়ি মাথাটা গুঁজিতে যাইতেই লিসি কোনও কথা না বলিয়া আঁচল আগাইয়া আনিল কিন্তু তাহার নিজের চোখও তখন শুষ্ক ছিল না।

উৎপল বলিল, আশ্চর্য তোমার সংযম, আজ কোনও যুক্তিরই কোনও মানে হয় না, কিন্তু তোমার ব্যর্থ জীবনের দিক থেকে ক্ষমা করতে না পারাটাই সত্যি।

মনে হইতেছে কথা ফুরাইয়া গিয়াছে কিছু বলা হয় নাই; ঘরে একটা অসহ্য স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। কাহার পদশব্দে চকিত হইয়া লিসি বলিল, খোকা?

কে জবাব দিল, হ্যাঁ।

লিসি বলিল, ভাই আমার সুটকেসে একখানা চিঠি আছে, নিয়ে এস না—কাল যেখানা এসেছে। তার পর উৎপলের দিকে না ঘুরিয়াই বলিল, আর কি, এবার সবই তো চুকে গেল, এবার যাদবপুর হাসপাতালে যাব।

উৎপল চমকাইয়া বলিল, কেন?

লিসি তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, আমার খুশী।

খোকা চিঠি লইয়া আসিল। চিঠিটি হাতে লইয়া বলিল, খোকা, ভাই, একটা পান নিয়ে এস তো, লক্ষ্মী।

পান? বলিয়া খোকা চলিয়া গেল।

লিসি পড়িতে লাগিল। —দুই দিন হইল সরোজবাবু আসিয়াছেন— খালি গা, মাথায় একটা কাপড়ের পাগড়ি, এক গাল দাড়ি; একেবারে উন্মত্ত। নদীর ধারে বসিয়াছিলেন, মায়ের সহিত

দেখা হইতেই সে কি কান্না! বাবা যত্ন করিয়া স্নান আহারাদি করান। তিনি তোমার খোঁজ করিতেছেন। স্পষ্টতই তিনি তোমার জন্য পাগল হইয়াছেন। তাঁহার অবস্থা দেখিলে সত্যিই কষ্ট হয়......

* * * *

লিখিয়া কমলের ফেলিয়া রাখিবার জো নাই। একেবারে পড়িতে পায় না। কমলের ঠিক ঠিক ফাঁকগুলি বিশাখা আসিয়া জুড়িয়া বসে। ঠিক খাতাখানি তাহার হাতে আসে এবং মন্তব্যের স্রোত বহিতে দেরি হয় না।

হুঁ, বটে, এতদূর! চোখের জলও পড়ল? বড় যে দুঃখ দেখতে পাই? কি ব্যাপার কি? এতই যদি ভালবাসাবাসি তবে আর কটা দিন সবুর করলেই তো হ'ত। আর একটা মেয়ের জীবনও এমন ক'রে নষ্ট হ'ত না। কিন্তু বলিই বা কাকে? শয়তান যারা তাদের শয়তানির নমুনাই তো এই। আজ সংসার করেছে, মেয়ে হয়েছে, আজ এ কান্নাকাটি কেন? এমন দুর্দিন যদি হয়ই যে সতীন নিয়ে ঘর করতে হবে তবে—সে দিন, সে দিন—দেখে নিও কি করি। মনে ভাবছ, এত সয়ে যাই ব'লে সেও সইব? আমি যা সহ্য ক'রে গেলাম—তোমার ওই—তাই বা কেন? এ সব শয়তানিই কেন—।

কমল বলিল, আমার লেখকজীবনের তুমি শনি, তা জানি, কিন্তু গল্প লিখতে বসলেই তাতে তুমি নিজেকে কেন হাতড়ে বেড়াও বলতে পার? আর যে-মেয়ে তুমি নও সে-মেয়েই আমার পরকীয়া প্রেমতত্ত্বের বাহন—

বিশাখা ফাটিয়া পড়ে—এ ছাড়া তুমি যে লিখতে পার না।

কমল বলিল, গল্পলেখক ব'লে আমার সুখ্যাতি নেই কিন্তু লেখায় এমনি ক'রে যদি মতলব খুঁজে বেড়াও—

বিশাখা বাধা দিয়া বলিল, মতলব আবার কি? সত্যি ক'রে বল তো, তুমি আমায় ভালবাস? অথবা আর কাউকে ভালবাস?

কমল বলিল, এর জবাব কি দেব বল? সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা স্ত্রীকে যদি বোঝাতে হয় তবে সে এক পারে বড়লোক, গরিবেরা নয়।

বিশাখা বলিল, আবার বড়লোক গরিবের খোঁটা দাও তুমি? বিয়ে করেছি অবধি কি চেয়েছি আমি, কি দিয়েছ তুমি? শাড়ি না গয়না?, এক গজ শেমিজের কাপড় দিয়েছ ব'লেও তো মনে পড়ে না।

কমল বলিল, এই দুঃখই তোমাকে বড়লোকের দিকে উন্মুখ করে।

বিশাখা বলিল, মোটেই না।

কমল বলিল, হ্যাঁ ঐ দুঃখই তোমাকে রাখে উত্তেজিত, সুযোগ পেলে ফেটে পড়। দোহাই তোমার চিৎকার ক'রো না, লিখতে দাও।

বিশাখা বলিল, লেখ না তুমি, আমার মুণ্ডুপাত কর; কিন্তু ও জিনিস যদি তুমি ছাপতে দাও—

কমল বলিল, দেবই তো—

বিশাখা বলিল, এক্ষুনি ছিঁড়ে ফেলে দেব না!

কমল বলিল, তোমার তো ভয়ানক আস্পর্ধা!

বিশাখা বলিল, স্ত্রীকে ছেড়ে যার-তার সঙ্গে—

কমল ছুটিয়া আসিয়া বিশাখার ঘাড়ে হাত দিয়া ঠেলিয়া বলিল, বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে তুমি, বেরিয়ে যাও। চুলোয় যাক এ সংসার—হয় তুমি নয় আমি এ সংসারের বাইরে।

বিশাখা গেল না, প্রতিরোধ করিয়া থাকিয়া গেল এবং এবার বুক কাঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, বহুক্ষণ পরে বলিল, যাবার জায়গা নেই বলে—

কমল বলিল, নেই-ই তো—

বিশাখার কান্ [illegible] গেল; মনে মনে ভাবিল, এই তাহার স্বামী [illegible] হাকে খুঁটিয়া খাইতে হইবে। কি প্রয়োজন, কেন [illegible] র? না খাইয়া মরা যায় না? বিশাখা কাঁদিয়া কা[illegible] রিয়া ফেলিল, তাহার মরিবার কোনও বাধা নাই।

লিসির সহিত [illegible] হ। আবার সেই একই কথা হইয়াছে [illegible] লবাসে এই বিষয়ে উৎপলের যেমন [illegible] লের নিজের ভালবাসা সম্বন্ধেও তাহার [illegible] কিন্তু এ কি করিয়া সম্ভব? [illegible] সত্য উৎপল নিজে যেমন জ[illegible] বিষয়ে [illegible] ই, উৎপলের নিজের [illegible] বিশ্বাস না করিবার [illegible] রণ ঘটে নাই। [illegible] র ভালবাসা! উৎপলের আ[illegible] র্য লাগে এই জন্য [illegible] লিসির প্রতি আচরণে ভালবাসা স্পষ্ট, কিন্তু উৎপলের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পরও কি সে-লিসির পরিবর্তন হয় নাই? উৎপল রূপ ও বয়স হারাইয়াছে, বিবাহ করিয়া সম্ভাবনার পূর্ণচ্ছেদ টানিয়াছে, তবুও যে লিসির এই নিঃসংশয় আচরণ ইহা কি অভিনয় নহে? এতদিনকার খোঁজ-তল্লাশের জের মাত্র! লিসির ব্যবহার সত্যই প্রশংসনীয় এবং অভিনয় যদি হয়ই তবে সে নিখুঁত অভিনয়। অথবা সে অত্যন্ত ভদ্র—কল্পনার উৎপলের সহিত বাস্তব উৎপলের এত পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াও সে তাহা খুলিয়া বলিয়া উৎপলকে ব্যথা দিতে চাহে না। উৎপল লিসির দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে মুগ্ধ হইয়া যায়, আবার মনে পড়ে, ইহাকে উৎপল ভালবাসে না, ইহা কি সত্য? উৎপল সমগ্র-ভাবে মানা করিয়া উঠে; এমন হইতেই পারে না; সে লিসিকে নিশ্চয় ভালবাসে এবং পূর্বেও এমনি ভালবাসিয়াছে।

উৎপল ডাকে, লিসি!

লিসি তাকায়। উৎপল বলে, এর আর সংশোধন নেই? কোন উপায় নেই?

লিসি বলিল, তা জানিনে, এতদিন খোঁজ ক'রেছি, আমার বলবার ভার আমি ব'লেছি, আর আমার কোনও দায়িত্ব নেই।

উৎপল বলিল, তার মানে সেই দারিত্বের বোঝা আমার কাঁধে এমন সময়ে দিলে যখন তা বইবার ক্ষমতা আছে কিনা সে বিশ্বাস-টুকু পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছি না।

লিসি বলিল, মাঝে মাঝে খোঁজ নেবেন, এর বেশী দাবি আজ আমার নেই। আত্মীয়ের বাড়ি থাকি বটে কিন্তু তারা অনাত্মীয়। সেখানে আপনি যাবেন না।

উৎপল বলিল, তবে কি ক'রে তোমার খোঁজ পাব?

লিসি বলিল, খোঁজ নেবার কাজ যখন আমার তখন আমিই আপনাকে জানাব।

ক্ষণিকের নিস্তব্ধতা। শুকনো চুলে পরিপূর্ণ মাথাটার দিকে তাকাইয়া উৎপল ভাবিতে লাগিল, এই তো ক্ষুদ্র পরিসর, ইহার মধ্যে কি ভীষণ ঝড় বহিতেছে কে জানে? কি ভাবিতেছে সে? ভালবাসার কথা? ভালবাসার কথা কি কেহ ভাবে? ভালবাসার কথা কি ভাবিবার? না উহা মানুষের একটি বিশেষ আচরণ? অথবা সে উৎপলকে ভালবাসে এই আত্মতৃপ্তিতেই মশগুল। কিন্তু কেবল ভালবাসিয়া কে কবে সুখী হইয়াছে? অপরের ভালবাসা না পাইলে নেহাত বৈধব্যের পীড়া ভোগ করিয়াছে। আসলে অপরকে কেহ ভালবাসে না, আত্মতৃপ্তির জন্য একটা বস্তুকে আশ্রয় লয় মাত্র; সে কেবল আপন ভোগের জন্য। মানুষ নিজেকে ছাড়া আর কাহাকেও ভালবাসে না। উৎপল কি লিসিকে ভালবাসে? লিসির দেহটাকে? কিন্তু কই, দেহভোগের ইচ্ছাটা তো উৎপল এই মুহূর্তে অনুভব

করিতেছে না? লিসির [illegible] নামান্তর। [illegible]ই মনের আয়না তো দেখা যায় না? তবে কি [illegible] [illegible]সর ভঙ্গি? অথবা লিসির সমস্ত কিছু? উ[illegible] [illegible]র্সাত্যাব কাছেও ইহা স্বীকার না করিয়া পারিল না যে, [illegible] [illegible]সবোধ্য আকর্ষণ বোধ করিতেছে। অ[illegible] [illegible] অভিমানের কথা লিসি, কোথায় আমাকে [illegible] [illegible]ই বল।

লিসি ব[illegible] [illegible]খানে থাকব।

উৎপল বলি[illegible] [illegible]সুবিধে আমার পক্ষে অসুবিধে হবে না। [illegible]

লিসি বলিল, [illegible] আমার পরশু পাঁচটার সময় যাবা[illegible] [illegible]মার এক[illegible]নি।

উৎপল [illegible] [illegible]কব। কিন্তু [illegible]?

লি[illegible] পরের বাড়িতে থাকি[illegible] তুলে

উৎ[illegible] [illegible]ন, কিন্তু উঠতে যে ইচ্ছা ক[illegible] উৎপলের সেই মুহূ[illegible] মনে হইল সমস্ত বিশ্ব চুলায় যাউক, সে এইখানেই বসিয়া থাকিবে আর থাকিবে লিসি।

লিসি অভিভূত হইয়া বলিল, আর একজনের পক্ষেও তো এ কথা সত্যি হ'তে পারে।

উৎপল মোহাচ্ছন্ন কণ্ঠে ডাকিল, লিসি! ডাকিয়াই অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না চল।

লিসি অহেতুক শাড়িটাকে গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আর কথা নাই। কিন্তু কথা চলিতেছে। কি কথা? একে অপরকে পাওয়া-না-পাওয়ার কথা। ইহার আদি আছে কিন্তু অন্ত নাই।

উৎপলের সারা পথ কেবল এই জীবনের জটিলতার কথা মনে হইল। একে তো বাঁচিয়া থাকিবার প্রাথমিক সমস্যা, সামান্য ডালভাত সংগ্রহের জন্য কুরুক্ষেত্র লড়াই। তার পর যদি সংসার হয়, অর্থাৎ স্ত্রী একক যতদিন থাকে ততদিন প্রেম, সন্তান জন্মিলেই সংসার। সংসার পাতিলেই বৃহত্তর সংসার, অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন। তার পর স্ত্রী, সংসার ও বৃহত্তর সংসারের মন জোগাইয়া চলা—সকলেই যেন অবুঝ, এক বাড়ির কর্তা ছাড়া, আর সকলের সব চাই, কর্তার আপন প্রয়োজন কমাইতে কমাইতে শূন্যে দাঁড়ায়। তাহার উপর লিসি! লিসির ব্যাপারটি উৎপল কতদিন টানিতে পারিবে? সে দরিদ্র, তাহার পক্ষে এটি বিলাস—মস্ত বড় বিলাস। বন্ধুসমাজও ইহা সহ্য করিবে না। অর্থাৎ না পারে সে ইহাকে বহন করিতে, না পারে নিজেকে ক্ষুদ্র করিতে। অথচ উৎপল একথা নিঃসংশয়ে বুঝিল, লিসিকে ছাড়া তাহার চলিবে না, লিসিকে তাহার বড় প্রয়োজন। কিন্তু যাহা প্রয়োজন তাহাই যে পাওয়া যায় না, এতদিনকার অভিজ্ঞতায় উৎপল তাহা বুঝিয়াছে; এ কথাও অতি সহজ সত্য যে, স্ত্রী বর্তমানে লিসিকে পাওয়া অসম্ভব।

* * * *

বিশাখা বলিল, হ্যাঁ এখন এই তো চাও, আমি থাকতে তো তোমার ইয়ে হচ্ছে না।

কমল বলিল, আর কিছু হ'ক না হ'ক লেখা তো হচ্ছেই না।

বিশাখা বলিল, ছাই লেখা, পোড়া কপাল, কোথায় যে যাই!

কমল বলিল, সত্যি দিন-দুই কোথাও গিয়ে থাক তো তুমি, এ সংসার ছাই আর তো ভাল লাগে না।

বিশাখা বলিল, একটা চাকর বাকর থাকলে তাই যেতাম।

কমল বলিল, সে ভাবনা তোমার নেই।

বিশাখা বলিল, নেই তো কি?

কমল বলিল, না নেই; অন্তত থাকবার দরকার নেই। একটু জুড়োতে দাও দিন কয়েক।

বিশাখা বলিল, এত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ তুমি?

কমল বলিল, হ্যাঁ, হাঁপিয়ে উঠেছি।

বিশাখা ছলছল চোখে বলিল, বেশ, কোথায় যাব?

কমল বলিল, সে তুমি জান। যেখানে তুমি সুখে থাকতে পার।

বিশাখা বলিল, সে তুমি বল। কিন্তু আমি তোমার কি করেছি?

কমল বলিল, তুমি কি না করেছ? যাক সে তর্ক তুলে লাভ নেই।

বিশাখা বলিল, তার চাইতে আমায় বিষ এনে দাও না, মরি।

কমল বলিল, তুমি মরবে, আমায় বিষ এনে দিতে হবে!

বিশাখা বলিল, নইলে আমি কোথায় পাব? দাও, তাই দাও।

কমল বলিল, তা হ'লে আর কোথাও যাওয়া হয়ে গেল?

বিশাখা বলিল, কোন্ লজ্জায় যাব?

কমল বলিল, তা যাবে কেন? আমায় জ্বালাতে হবে তো!

বিশাখা বলিল, ভয় নেই এ জ্বালার শিগগিরই অবসান হবে।

কমল বলিল, অন্তত তার আগে একটু লিখতে দাও—লিখলে তবে না তোমার সংসার চলবে?

বিশাখা চুপ করিয়া গেল এবং কমলের লেখার প্রতি যেন কোনও ঔৎসুক্য নাই এইভাবে অন্য কাজে হাত দিল।

* * * *

উৎপল বাড়িতে পা দিতেই স্ত্রী বলিল, এলে? সমস্ত সংসারের বোঝা আমার ওপর ফেলে দিয়ে দিব্যি ঘুরে এলে তো?

উৎপলের মেজাজ ভাল ছিল না, বলিল, এলাম। সে কৈফিয়ৎ তোমায় দিতে হবে নাকি?

স্ত্রী বলিল, না সে কৈফিয়ৎ আমায় দেবে কেন? সংসারের দাসী ছাড়া তো আমি আর কিছু নই?

উৎপল বলিল, শুনেতাম, বাড়িটা শান্তির জায়গা, কিন্তু দেখছি বাইরেই থাকি বেশ।

স্ত্রী বলিল, তা থাকবে না? যাক, এখন বাড়ির কাজ সেরে আমায় উদ্ধার কর। আজ আমি মাসীর বাড়ি যাব ব'লে দিচ্ছি।

উৎপল কিছু বলিল না।

স্ত্রী বলিল, কিছু বলছ না যে?

উৎপল বলিল, কি বলব? দিন কয়েক ওখানে গিয়ে থাকতে পার?

স্ত্রী বলিল, হ্যাঁ, তাই থাকব।

কি জানি কেন, স্ত্রীকে মাসীর বাড়ি রাখিয়া আসিতে উৎপলের কষ্ট হইল না। তাহার পরদিনের পরদিন লিসির সহিত দেখাও হইল। কিন্তু আর একটা দিন না কাটিতেই উৎপলের মনে হইল, লিসিকে তাহার সম্পূর্ণ একটা দিনের জন্য ভয়ানক দরকার। লিসির সহিত দেখা করিয়া বলিল, কালকে ছুটির দিন, কাল কি তুমি কোথাও যাবে?

লিসি বলিল কেন?

উৎপল বলিল, কালকে চল না আমরা কোথাও যাই!

লিসি বলিল, কিন্তু ছুটির দিনেই যে আমার কাজ, আমার সেই কাজটা পেতে হ'লে যাঁদের সঙ্গে দেখা করার কথা তাঁদের ছুটির দিন ছাড়া বাড়িতে পাবার জো নেই।

উৎপল বলিল, তা হ'লে হবে না?

লিসি বলিল, আচ্ছা তুমি ছটার সময় এসপ্লানেডে থেকো, খুব চেষ্টা করব যেতে।

উৎপল অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সেদিন নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির। এইবার লিসি আসিবে। এইবার নিশ্চয়। ঘড়িতে কটা বাজিল? সে কি যথাসময়ের আগে আসিয়াছে? না, সময় পার হইয়া গিয়াছে? বহুক্ষণ পর উৎপল যখন দূরের একটা

বড় ঘড়ির দিকে তাকাইল তখন দেখিল নির্দিষ্ট সময় পার হইয়া আধ ঘণ্টা বেশী হইয়া গিয়াছে। তবে আর সে আসিবে না! উৎপল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জনতায় মিশিয়া গেল।

পাঁচ দিন পর আবার খোঁজ লইতে ইচ্ছা হইল। লিসির খোঁজ বাড়িতে পাওয়া গেল। লিসি সেদিন কিছুতেই সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই। উৎপল যেন তাহাকে ভুল না বোঝে।

সামনের ছুটিটায় তোমার সময় হবে? উৎপল জানিতে চাহিল।

লিসি বলিল, সেদিন যে আমার কয়েকটি বন্ধুর এখানে চা খাবার কথা।

উৎপল ভাঙিগয়া পড়িয়া বলিল, ও!

লিসি বলিল, এর পরের আর কোনও ছুটি?

উৎপল বলিল, নাঃ দরকার নেই। আজ উঠি, তোমার প্রয়োজনে খবর দিও।

লিসি বসিতে অনুরোধ করিল না; ইহাতে উৎপলের অভিমান বাড়িল। বাড়িতে ফিরিয়া চিঠির বাক্সে একখানা চিঠি পাইল। খুলিয়া পড়িয়া দেখে স্ত্রীর চিঠি। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। লিখিয়াছেঃ মেয়ের [illegible] পেয়েই চ'লে আসবে।

উৎপল তাড়াত[illegible] [illegible]রিয়া যথাস্থানে গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে এক [illegible] ঘুরিয়া গেল এবং নিজের উপর অসম্ভব একটা [illegible] উঠিল। মেয়ের ব্রঙ্কাইটিস, একটু বাড়াবাড়ি।

দরিদ্র সংসারের [illegible] [illegible]পেক্ষা করিয়াই অফিসে যাইতে হয়। [illegible] [illegible]গে না। উৎপল একটা কাগজে লিখি[illegible] [illegible] প্রতি তোমার মোহ কাটিয়া যাইতে[illegible] [illegible]ক্ষণ। আমার দেহ ও আচরণকে [illegible] ভালবাসা গড়িয়া উঠিয়াছিল [illegible] সাহ[illegible] তাহ[illegible] [illegible]না পৃথক! অপ্রয়োজ[illegible] [illegible]ক আহ্বান করিতে ব[illegible] [illegible]প্রয়োজন বোধ কি[illegible] [illegible] ব্যক্তি তোমার জন্য পাগ[illegible] [illegible] তাহার প্রতি [illegible] অনুকম্পা না হইলে তোমাকে [illegible] বলিব। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছ শুনিলে আমার সুখের সীমা থাকিবে না। ইতি তোমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী।

মনে ছিল আশা

(৬০৮ পৃষ্ঠার পর)

পড়ার টেবিলের উপর চিঠিখানি রাখিয়া সে অন্ধকারেই বাহির হইয়া পড়িল।

তখনও রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয় নাই বটে, কিন্তু ময়দানের কাছাকাছি যাইতে ততরাত্রেই দুই-একখানি টমটম নজরে পড়িল। সে একটি টমটম ডাকিয়া তাহাকে চারিটি পয়সা কবুলে করিয়া উঠিয়া বসিল। কারণ জনহীন পথে পুঁটলি হাতে করিয়া গেলে অকারণে গোলমাল বা জবাবদিহির মধ্যে পড়িবার সম্ভাবনা।

স্টেশনে পোঁছিবার সময়ও সে কোথায় যাইবে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। সেখানে টমটম হইতে নামিয়া একটা কুলীকে ডাকিয়া আন্দাজে ঢিল মারিল, কহিল, "আভি যো গাড়ি আতা হয়, উ কাঁহা জায়গা?"

সে জবাব দিল, "দিল্লি জায়গা, দিল্লি।"

দিল্লি, ইতিহাস প্রসিদ্ধ দিল্লি, ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লি! তাহাই হউক। সে টিকিটঘরের কাছে গিয়া দিল্লিরই একখানি টিকিট কিনিয়া ফেলিল। ততক্ষণে গাড়িও প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আসিয়া ঢুকিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি একটা খালি গাড়ির মধ্যে উঠিয়া পড়িয়া টিকিট দেখিয়া হিসাব করিতে বসিল যে সে জ্যোৎস্নার নিকট হইতে কতটা দূরে চলিয়া যাইতেছে।

পরদিন সকালে চিঠিখানা ভুবনবাবুর নজরেই আগে পড়িল; চিঠিতে লেখা ছিল,

সবিনয় নিবেদন,

কোনও বিশেষ কারণে আপনার আশ্রয় ছাড়িয়া আমাকে চলিয়া যাইতে হইল। ইহাতে আমিই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম; কিন্তু আমি থাকিলে হয়তো আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন! আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি,—

ভুবনবাবু রাজবালাকে চিঠিটা পড়িয়া শুনাইয়া বিস্মিত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "তার মানে? এ আমি তো কিছুই বুঝলুম না।"

রাজবালা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমি সন্দেহ করেছিলুম, কিন্তু এতটা বুঝতে পারি নি!"

ভুবনবাবু কহিলেন, "কি সন্দেহ, ব্যাপার কি?"

কিছু না। দেখ, আজ জ্যোৎস্নার ইস্কুলের গাড়ি এলে তুমি ফিরিয়ে দিও। ওকে আমি আর ইস্কুলে পাঠাব না।

(ক্রমশ)

চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ

শ্রীফণী মজুমদার

দেশময় সমস্ত [illegible] ত্যকার এই ঘোরতর দুর্দিনে চলচ্চিত্রের ভাগ্যাকাশে [illegible] নের নির্দেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। এ [illegible] তোবাসী ও অন্যান্য শিল্পীদের কাছ থেকে আ [illegible] ভাব।

এ আঘাত দেশবাসী [illegible] শিল্পীদের অহেতুক গাত্রদাহের নি [illegible] চ্চিত্র শিল্পের আত্ম-প্রতিষ্ঠার নিদ [illegible] এই শিল্পকে অন্যান্য শিল্পের সমক [illegible] গ্রহণ করেছেন এ আঘাত তারই নির্দেশ [illegible] এ শিল্পকে প্রশ্ন করছেন, সন্দেহ [illegible] নিন্দা করছেন, প্রশংসা করছেন [illegible] একথ

দু [illegible] ও দেখেছি দেশের [illegible] নেতা এই শিল্পকে [illegible] এ কোলে কোলে দোলা [illegible] ড়িয়েছেন, যেন সে [illegible] যেন কোনও শক্তি নেই তার নিজের। [illegible] আত্মাভিমানী কোনও শিল্পী প্রতিবাদ করলে ধমক দিয়ে তার মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। অনুকম্পা দেখিয়ে বলা হয়েছে, 'ওরা দুর্বল, ওরা শিশু, ওরা অবোধ। ওদের স্থান মায়ের আঁচলের তলায় মুক্ত আকাশের নীচে নয়।'

মায়ের আঁচলের তলায় প্রকৃতির আলো-বাতাস-হীন বন্ধ গৃহে এ শিল্প এতদিন পথ খুঁজে মরেছে। শঙ্কাকুল মন নিয়ে আমরা ভেবেছি একেও বুঝি 'মুগ্ধা জননী' 'সাত কোটি বাঙালীর মত বাঙালী ক'রে তোলেন, বুঝি বা এ পঙ্গু হয়ে যায়। চলচ্চিত্র শিল্পিগণ প্রাণপণ চিৎকার ক'রে বলেছে, 'দোহাই তোমাদের, তোমাদের অনুগ্রহ চাই না, মুরুব্বীয়ানা চাই না, অনুকম্পা চাই না। তার চেয়ে আঘাত কর, সেই হবে আমাদের সত্য অভ্যর্থনা, সেই হবে আমাদের জড়ত্ব থেকে জেগে ওঠবার প্রথম প্রেরণা।'

আজ চারদিক থেকে সেই বিদ্বেষের অভ্যর্থনা চলচ্চিত্র লাভ করেছে। তার কারণ অহরহ সাদর দোল খেয়েও এ শিল্প ঘুমিয়ে পড়ে নি। যে শিল্পীদের আনন্দে এ শিল্পের জন্ম তাদের দেওয়া সনাতন মুক্তির সুর এর মাঝে আছে চির-জাগ্রত হয়ে। সে সুর চায় প্রকাশ, সে সুর চায় অনন্ত রাগিণীর মাঝে বিচিত্র আলোকের মাঝে ছন্দে ছন্দে তালে তালে প্রতি পলে পলে ফুটে উঠতে, আপনাকে এ বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে, বিলিয়ে দিতে। কেন? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে আনন্দ। সমস্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে যেটা খাঁটি নিছক সত্য সেটা হচ্ছে ওই আনন্দের খেলা। এই আনন্দকে বুকে ক'রে এই আনন্দময় জগতে কেউ কখন ক্ষুদ্র অন্ধকার কুঠরিতে চোখ বুজে চিরকাল ব'সে থাকতে পারে না। সে চায় আলো, সে চায় বাতাস; সে চায় অন্তরের সঙ্গে বাহিরের মিলন। তাই মায়ের আঁচল আর এই শিল্পকে লুকিয়ে রাখতে পারলে না। বাইরের ডাক তাকে ঘর ছাড়া করল। সে বেরিয়ে এল আপনার আনন্দে বিশ্বের মাঝে, খোলা আকাশের নীচে।

হঠাৎ মুক্ত আকাশের তলায় বেরিয়ে এসে চলচ্চিত্রশিল্প কিছুদিন একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার পরই সে স্থির করল সে নূতন ক'রে ভাববে, বুঝবে, প্রশ্ন করবে, সন্দেহ করবে, নেড়েচেড়ে উল্টে পাল্টে দেখবে; চিন্তা ও চেষ্টার সকল বিভাগেই দুঃসাহসের জয়পতাকা সগর্বে তুলে ধ'রে দুর্গম পথে যাত্রা করবে। যৌবনের চাঞ্চল্যে সমস্তকে নাড়া দিয়ে প্রাণশক্তিকে সকল দিকেই তরঙ্গিত মুখরিত ক'রে তুলবে।

যেসব শিল্পী অন্যান্য শিল্পক্ষেত্র থেকে একে এতদিন অনুকম্পা দেখাচ্ছিলেন, তাঁরা এর এই ধৃষ্টতায় অবাক হয়ে গেলেন। বয়সের ধর্মে বা মনের ধর্মে পুরাতন ব'লেই তাঁরা সনাতন সেজে বিজ্ঞের মত হেসে বললেন, 'তুমি নূতন, ভিত্তি-হীন। আমরা পুরাতন এবং সনাতন। আমাদের প্রশ্ন করবে, আমাদের সন্দেহ করবে তোমরা,—এ হ'তেই পারে না।' তাঁরা চেষ্টা করলেন পুরাতনকে সনাতন নাম দিয়ে অচলায়তন গ'ড়ে তুলতে। ভুলে গেলেন নূতনের জন্ম পুরাতনে। আজ যেটাকে তারা পুরাতন বলছেন, এমন এক দিন গেছে যখন সেটা নূতনের মুকুট মাথায় দিয়ে এসে তরুণের বুকে আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল।

তাই তাঁদের বিজ্ঞ ধমকের দৃষ্টি এ শিল্পের পথ রোধ করতে পারল না, এরা সবাইকে প্রশ্ন করল, সন্দেহ করল, উলটে পালটে দেখতে লাগল। এদের ঘরে লক্ষ্মী সরস্বতীর নিত্য আনাগোনা। 'কারণ দেবদেবীদের সকলেরই চিরযৌবন। তারা আসেন সেইখানে যেখানে তাজা প্রাণের আনন্দ দিয়ে মন্দির তৈরী করা হয়েছে।'

যদি দেখতাম চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সবাই একেবারে উদাসীন, তা হ'লে মনে হ'ত দেশের মনের উপর এর কোনও প্রাণের ক্রিয়া নেই। যদি দেখতাম দেশবাসীর কাছ থেকে এ পাচ্ছে অবিমিশ্র সম্মান, তা হ'লে বুঝতাম ওর প্রাণের ক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে চলচ্চিত্র আজ আঘাত দিচ্ছে, আর তাই আঘাত পাচ্ছেও। হবু সনাতনী সংগীতজ্ঞরা চিৎকার ক'রে বলছেন, 'এরা আমাদের খুন করছে', সাহিত্যিকের দল কর-জোড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, 'এই আনাড়ীর অরাজকতা থেকে আমাদের রক্ষা কর', কবি চোখের জল ফেলছেন, 'তাই আজ ছায়ালোকে এ করুণ মিথ্যার উৎসব।'

কিন্তু আপনার প্রাণবেগে চঞ্চল এই তরুণ শিল্প প্রাণের আনন্দে নিজের নূতন পথ ক'রে চলেছে। সে বোঝা নয়। সে ভার দিয়ে পুরাতনকে চেপে রাখতে চায় না। সে চায় ধার দিয়ে পুরাতনের সব বন্ধন কেটে দিয়ে তাকে পূর্বঅর্জিত সংস্কার থেকে মুক্ত করতে।

সস্তায় কিস্তিমাত করবার চেষ্টা নবীন চলচ্চিত্র শিল্পি-গণের নয়। তারা হবু সনাতনী সংগীতজ্ঞ কবি সাহিত্যিক-দের ভ্রূকুটিকে অবজ্ঞা করবার সাহস রাখে। চলচ্চিত্র তাদের ধ্যানের ধারণা, তাদের একমাত্র সাধনা। যেমন তারা চল-চ্চিত্রের শিক্ষাক্ষেত্রের বাধাগুলোকে সাহস ভরে অতিক্রম ক'রে চলেছে তেমনি সাহসে তারা তাদের এগবার পথের বাধা-গুলোকেও একে একে জয় ক'রে যাবেই। এদেশের নবীন চলচ্চিত্র শিল্পীরা সগর্বে আজ এই কথাই বলতে চায়—

"বাধা দিয়ে বাধবে লড়াই, মরতে হবে,
তাই ব'লে কি করবি বড়াই—সরতে হবে।"

দুই পুরুষ ও এক নারী

(অনূদিত গল্প)

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

২৩শে মার্চ গোধূলির সময় যে কয়েদীর দল জেলের দরজায় এসে পেঁছিল তার মধ্যে ছিল একটি যুবা ; যার চেহারা দেখলেই সে যে সাধারণ কয়েদী থেকে অনেকখানি তফাত, এটুকু বুঝতে দেরি হয় না। পাঁশুটে রংএর পোশাক, পাঁশুটে রঙের বড় টুপিটিতে তার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের অনেকটুকুই ঢাকা পড়েছিল। সারাটা পথ তাকে একটি কথাও বলতে শোনা যান নি। সর্বক্ষণ সে শুধু নতমুখে চকচকে ইস্পাতের হাতকড়ায় বাঁধা নিজের শীর্ণ হাত দুটির উপর বুঝি বা নির্নিমেষেই তাকিয়ে ছিল চোখে একটা ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি নিয়ে। জেলে পেঁছিবার পর সে একবার দৃষ্টি তুলে জেলারের পানে তাকিয়েছিল; এবং জেলারও তাকিয়েছিলেন, তার পানে, অবজ্ঞার দৃষ্টিতে।

আশ্চর্য এই যে, জেলার ও এই কয়েদী, দুজনের নাম এক, ক্যাসিয়ো লঙ্গিনো। দুজনেই দুজনের নামের পরিচয় পেয়ে পরস্পরের পানে তাকাল।

কিন্তু প্রথম দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের মনে একটা ঘৃণার ভাব জেগে উঠল। জেলার লোকটি মাঝবয়সী এবং বেঁটে। বেঁটে বেঁটে হাতদুটোকে সর্বদা তাঁর কালো ওভার কোটের পকেটের ভিতর রেখে তিনি চলতেন একটুখানি সামনের দিকে ঝুঁকে। মুখে চোখে কি যেন যন্ত্রণার একটা সুস্পষ্ট ছাপ লেগে রয়েছে, পাতলা ফেকাশে ঠোঁট দুটোর আশপাশে গভীর কালো দাগ। মাথার চুলগুলি ছোট ক'রে ছাঁটা, কান দুটো মাথার তুলনায় অনেকটা বড় এবং দুই চোখে এমন একটা নির্লিপ্ততার ভাব, যাকে নিষ্ঠুরতা ব'লে মনে করলেও হয়তো অন্যায় হবে না। এর উপর আবার এই লোকটিই হলেন এখানকার জেলের সর্বময় কর্তা। এইসব কারণে ২৪৫ সংখ্যক ওই যুবা কয়েদীটির তাঁকে যেন বিষবৎ মনে হ'ত, তার ওই কয়েদীটিকেও জেলার দেখতে পারতেন না, তার কারণ তার গর্বিত চালচলন, তার সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি এবং সর্বোপরি তার সুকুমার অটুট যৌবন।

কয়েদী থাকত তার নির্জন কুঠরিতে প'ড়ে। পাথরের দেওয়ালে কাটা ছোট্ট জানলার ভিতর দিয়ে দূরস্থিত তুষারাবৃত অ্যাপেনাইন তার চোখে পড়ত, আর চোখে পড়ত নবাগত বসন্তের প্রকৃতির শ্যামশোভা।

সে তার কুঠরি থেকে বড় বেশী দূরে যেত না। নিজের গভীরতম মর্মবেদনায় সে সর্বদাই বিপর্যস্ত হয়ে থাকত। সুদীর্ঘ সায়াহ্নগুলি তার কাছে বহন ক'রে আনত হৃদয়ভেদী নৈরাশ্য এবং রাত্রে সে প্রায়ই বিনিদ্র নয়নে তার খড়ের বিছানার উপর ছটফট ক'রে কাটাত। সকালে যখন রক্ষী আসত তার ঘরের গোছগাছ করতে, সে ততক্ষণে পোশাক প'রে ছোট জানালাটার গরাদে ধ'রে দাঁড়াত। সেখানে দাঁড়িয়ে সে দেখত, প্রত্যুষের কাঁচা রোদে পাখির দলে কেমন উৎসবের সাড়া প'ড়ে গেছে। পাশের ঘরের কয়েদীটা রকমারি অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত অনুযোগ করত, সেদিকে তার কানও যেত না।

খুব শীঘ্রই জেলের মধ্যে গুজব র'টে গেল যে, যুবকটি হচ্ছে সার্ডিনিয়া দেশের একজন খুব বড় ধনী এবং সে জেলারের আত্মীয়ও। জেলার বেচারা সকলের কাছে পেয়েছিল শুধু ঘৃণা আর আতঙ্ক, সুতরাং তাঁর আত্মীয় ব'লে কয়েদীটিও তার বেশী আর কিছুই পেল না।

১লা এপ্রিল। সে লেখবার অনুমতি চেয়েছিল, সুতরাং ডাক পড়েছিল তার অফিস ঘরে। বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়া সূর্যালোকের খানিকটা নিস্তেজ রশ্মিরেখা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল এবং তারই আলোতে দূরের একটা তরুশিরের ছায়াটুকু স্পন্দিত হচ্ছিল। অন্য দিনের চেয়ে সামনের দিকে আরও অনেকখানি ঝুঁকে প'ড়ে জেলার তাঁর টেবিলে কিসব কাজ করছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি মাথাও তুললেন না, কথাও কইলেন না। এবং কয়েদী ক্যাসিয়ো সোজা [illegible] দাঁড়িয়ে সেই কম্পমান তরুছায়ার পানেই দৃষ্টি [illegible] সমানে জ্বলতে লাগল।

জেলার হঠাৎ [illegible] নেই বললেন, "হ্যাঁ দেখ, জাল করার অপরাধে তো[illegible] বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে, কাজেই মাসে মাত্র এক[illegible] ম লিখতে পাবে।"

"তা জানি।" [illegible] "তবে, আমি তো আমার বাড়িতে চিঠি [illegible] আমার নিজের কুঠরিতে ব'সে একটু [illegible]

"তা হ'তে পারে [illegible] [illegible]নীদের অফিসে আসবার প্রার্থনা জান[illegible]

"প্রার্থনা জানা[illegible]"

"হওয়া[illegible]

সেই [illegible] না [illegible] পরের দিন থেকেই ত[illegible] র দেওয়া হ'ল। [illegible] তিনজন কয়েদীতে [illegible] কাজ নিয়ে কিছুতেই যে [illegible] উঠতে পারছে [illegible] রটা জেলারের ঘরের ঠিক পাশেই, [illegible] যেন তার সেই নির্জন কারাকক্ষের চেয়েও অবসাদে ভরা। বেশী ক'রে সেটা মনে হ'ত ওই কেরানী তিনজনের পানে তাকিয়ে। তারা যেন নিজেদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তাদের ওই নির্বোধ বশ্যতার সামনে তার অন্তর্দাহ যেন ঢের বেশী বেড়ে যায়।

তিন দিন পরে সার্ডিনিয়া থেকে তার একখানি চিঠি এসে পেঁছিল। সব দিক দিয়েই অপূর্ব সেই চিঠিখানি। গোটাগোটা পরিষ্কার অক্ষরগুলি এবং একটা খুব ফিকে সুগন্ধ কাগজ ক-খানা থেকে নাকে এসে লাগছে।

জেলার চিঠিখানি খুলে পড়লেন, যেন কতকটা ইতস্তত ভাব নিয়ে। যৌবন এখনও এই লোকটির কাছ থেকে পুরোপুরি বিদায় নেয় নি। জীবনে ইনি অনেক দুঃখও পেয়েছেন, ভালও বেসেছেন। কিন্তু, জীবন জোড়া সেই বেদনার রাশী তাঁর বুকের নীচের স্বাভাবিক সহৃদয়তা সমবেদনাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলতে পারে নি। অবশ্য, যদি ওই ২৪৫ নম্বর কয়েদীটিও সাধারণ কয়েদীদের মত হতভাগ্য বদমাশ হ'ত তা হ'লে হয়তো প্রথম দিনটির পর আর একটি মুহূর্তের জন্যেও তার কথা জেলারের মনের কোণে স্থান পেত না। কিন্তু এই অপরিচিত যুবকটির ভিতর এমন একটা অহংকারে মেশা অপরূপ রহস্য ছিল, যেটাকে কোনও লোকই অবহেলা করতে পারত না ; জেলারও পারেন নি। ওই যুবার সম্বন্ধে যেসব গল্প এই কারাগারের কক্ষে কক্ষে সঞ্চারিত হয়ে ফিরত, সেগুলো জেলারেরও কানে আসতে বাকী ছিল না। আজ আবার কয়েদীর এই চিঠিখানি পড়তে পড়তে জেলারের মনে ওই কথাটাই অস্পষ্টভাবে জাগছিল,—হয়তো ওই গুজবগুলো হলেও বা সত্য।

চিঠিতে যে এমন বিশেষ কিছু ছিল, তা নয়; লিখেছিল, ক্যাসিয়োর এক বৈমাত্রী বোন। কিন্তু, ওই চারখানি কাগজ জুড়ে ছড়িয়ে আছে একটা সুগভীর স্নেহচ্ছায়া, এবং তার সঙ্গে মিশে আছে কি যেন একটা অনির্বচনীয় মধুরিমা এবং অপরূপ সান্ত্বনা আর আশ্বাসের বাণী।—

"......হতাশায় ভেঙ্গে প'ড়ো না ক্যাসিয়ো। এ দুর্দিনে যেন সাহস হারিয়ে নিজের কষ্টকে আরও দুঃসহ ক'রে তুলো না। মনে জেনো, এই পৃথিবীর মধ্যে আমরা আছি শুধু দুটিতে ভালবাসতে এবং নির্ভর করতে। এ দুর্যোগের দিন আমাদের থাকবে না, এবং যেদিন ঈশ্বরের অনুগ্রহে আবার আমরা পরস্পর কাছে এসে দাঁড়াব সেদিন দেখাব, আমারই জন্যে তোমার এই বিপুল স্বার্থ ত্যাগের পুরস্কার কেমন ক'রে দিতে হয়। অপমানের ভারে

মুষড়ে প'ড়ো না তুমি। [illegible] সত্যিকার ভাল যারা, তারা জানে, তোমার অপরাধ শুধু বীরত্ব [illegible]।"

মন্দ নয়। জেলার ভাব[illegible] তো এই কথাটাই শুনে আসছি, কয়েদীরা সবাই নির্দো[illegible] সত্যিকার নির্যাতিত তারাই। কিন্তু তাদের বীরত্বের কথা এই [illegible]নলুম।

অপরূপ এই [illegible] খলে [illegible]তেই যেন তাঁর মন থেকে সরিয়ে ফেল[illegible] হ[illegible] যেন তাঁর চিন্তাধারার খোরাক জোটালে[illegible] [illegible]মানে, ওই কয়েদীর সম্বন্ধে সকল কথা[illegible] মনে এক অদ্ভুত কৌতূহল জেগে উঠল [illegible]

কয়েদীকে নিজে[illegible] [illegible] কাজের কথার ফাঁকে হঠাৎ এক সময় [illegible] [illegible]আমার একখানা চিঠি এসেছে।" [illegible]

নি[illegible] [illegible]য়ো শুধু একবার মাথা তুলে তাকালে। মুখখানা [illegible] [illegible]র্ণ রাঙা হয়ে উঠেছিল।

এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল তার পর। জেলের সর্বময় কর্তা এই হতভাগ্য কয়েদীর পানে চাইলেন কেমন একটা ঈর্ষায় মেশা দৃষ্টি নিয়ে। হ'ক না কয়েদী, তবু তো তার এই অসীম দুর্ভাগ্যের দিনে তার কাছে এমন একটি সান্ত্বনার বাণী এসে পৌঁছেছে যার দীপ্তি অন্তরকে উদ্ভাসিত ক'রে তার মুখের কিনারায় লেগেছে। আর তিনি নিজে? স্বাধীন তিনি, খ্যাতি প্রতিপত্তিরও তাঁর অভাব নেই, কিন্তু এই অতলস্পর্শী বেদনা আর নিঃসঙ্গতার মাঝে এক ফোঁটা স্নেহের বার্তা পেঁৗছে দেবার মত বন্ধু তাঁর সারা বিশ্বে একজনও যে নেই!

কয়েদী ক্যাসিয়ো লক্ষ্য করলে, জেলার অন্যমনস্ক। সে ব্যগ্রভাবে চিঠিখানি চেয়ে নিলে।

সেইদিন থেকে কয়েদীটির চালচলনে পার্থক্য দেখা গেল। সে যেন অনেকটা মোলায়েম হয়েছে, এবং নিজের দুর্ভাগ্যের কাছে যেন অনেকখানি আত্মসমর্পণ করতে পেরেছে। এদিকে জেলারও যেন তাকে বেশ খানিকটা [illegible]র করতে শুরু করেছেন। এ পরিবর্তনটুকু এত স্পষ্ট যে সাধারণ চোখকেও তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নি। এবং তার ফলে এই দুজনের মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ আছে, এই গুজবটাই কয়েদীদের মধ্যে পাকা হয়ে গেল।

তবু কিন্তু এক মাস পূর্ণ হবার আগে লেখার অনুমতি পাওয়া গেল না। ঠিক এক মাস পূর্ণ হ'তেই তার কাছে এল দু'ফালি লেখবার কাগজ। ক্যাসিও লিখলে। আসল চিঠির চেয়ে ক্যাসিওর জবাবটা কম স্নেহমাখা হ'ল না, যদিও ততখানি কমনীয়তা আর মাধুর্য তাতে ছিল না। চিঠির প্রতি ছত্রে ফুটে উঠল শুধু একটা সুগভীর হতাশা।—

"মোটে ত্রিশ দিন এখানে এসেছি, যদিও মনে হচ্ছে, ত্রিশ বৎসর বুঝি কেটে গেল। মনকে আমি নানা সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছি। ওরা আমাকে কেরানীদের ঘরে রেখেছে, সঙ্গী আমার তিনটে বীভৎস (একথাটা জেলার মুছে দিয়েছিলেন) অচেনা লোক। প্রথম প্রথম এ জীবনের সঙ্গে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি নি, কিন্তু আজ যেন ততটা মরিয়া ভাব আমার ক'মে গেছে। জেলার ভদ্রলোকটি আমার প্রতি খুব সদয়। জানি আমি, সময় যেমন ক'রেই হ'ক কেটে যাবে, তবু যেন মনে হয়, আমার এই কারাবাসের শেষ কোনও দিন হবে না। মনে হয়, এখনও যে ৯৮৭ দিন বাকী রয়েছে, তা বুঝি সাগরতরঙ্গের মতই সীমাহীন। কিন্তু পাওলা, তোমার কথা যখন ভাবি, তখনই কষ্ট আমার সবচেয়ে দুঃসহ হয়ে ওঠে। অথচ, তোমার স্মৃতিতেই সান্ত্বনা পাই অনেকখানি। কত মহৎ তুমি! কিন্তু, আমার একটা অনুরোধ, আমি এখানে থাকতেই তুমি যেন বিবাহ ক'রো না। অবশ্য জানি যে, তুমি তা কিছুতেই পারবে না। স্নেহময়ী ভগ্নীটি কখনও কি তার দুর্ভাগা ভাইটিকে এমন ক'রে ভুলতে পারে? জানি তো সব; তবু, তবু এখানে এই সংকীর্ণ শয্যার পরে বিনিদ্র চোখে ছটফট করতে করতে ওই চিন্তার আমি শিউরে উঠছি।......"

গোটা চিঠিটার ভিতর আর কারও কথা নেই, শুধু তার ওই ভগ্নীটিরই কথা।

পরের মেলেই তার জবাব এল। সঙ্গে এল কাপড় চোপড়, বই এবং টাকা। পাওলার সেই অনিন্দ্য সুকুমার লিপিখানি পড়তে পড়তে জেলারের মনে নূতন ক'রে ঈর্ষা এবং বাসনায় জড়ানো একটা অপূর্ব মুগ্ধতার ভাব জেগে উঠল। তার ভাইএর চিঠিতে তার প্রতি যে অবিশ্বাসের ইঙ্গিতটুকু ছিল, তার জন্যে সে এতটুকুও ভৎর্সনার কথা বলে নি, শুধু জানিয়েছে, তার মর্ম-বেদনায় নিজে কতখানি ব্যথিত হয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি জানিয়েছে তার প্রত্যাবর্তনের আগে কিছুতেই সে বিবাহ করবে না। জেলার মহাশয়ের জন্যও সে তার শ্রদ্ধানিবেদন করেছে। "তাঁকে শ্রদ্ধা ক'রো এবং ভালবেসো, তিনি তোমার জন্যে অনেক কিছুই করতে পারেন। আমি তোমার এবং তাঁর দুজনের জন্যেই প্রার্থনা জানাচ্ছি।"

ধন্যবাদ! জেলার আপনার মনেই বললেন। কিন্তু কথাটায় কেমন যেন একটা তিক্ততার আস্বাদ পাওয়া গেল।

কেমন ক'রে তার দিনগুলি কাটছে ক্যাসিয়ো জানতে চাওয়ায় পাওলা তার তৃতীয় পত্রখানিতে লিখেছিল—

"তোমার অভাবে দিনগুলো নিরতিশয় দুঃখের ভারে অবনত। যতটা পারি, নিজে আমি সর্বকিছুর দেখাশোনা করি এবং প্রায়ই আমার পালক পিতামাতার সঙ্গে গ্রামের দিকে বেড়াতে যাই। তাঁদের নিয়ে আমি অনেকটুকু স্বস্তি পাই। আমরা যাই ঘোড়ায় চ'ড়ে। এখন আমার একঘেয়ে জীবনের মাঝে বৈচিত্র্য বলতে এইগুলিই। বাড়ির ভিতরে নূতনের নামগন্ধ নেই। স্কুলে পড়ার সময় যে ছুঁচের কাজটা আরম্ভ করেছিলাম, এত দিনে সেটা শেষ করতে বসেছি। মনে পড়ছে, এটা শুরু করার সময় থেকে আজ পর্যন্ত জীবনের স্বপ্ন আমার কত মর্মান্তিক ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ওর ভিতরে আমি সার্ডিনিয়ার বিশেষ কতকগুলি ছুঁচের কাজ বসিয়ে দিচ্ছি।

"বাইরের কারও সঙ্গে দেখা করি না আমি, কেবল তোমার কথাই মনে করি, আর দিনের পর দিন গুনে যাই।"

চিঠি প'ড়ে জেলার ভাবলেন, এদের তো বেশ ধনী এবং মার্জিতরুচি ব'লেই মনে হচ্ছে, তবে কেন ক্ষমা প্রার্থনার কথা এদের মাথায় আসে না?

ক্লান্ত মনে তিনি উঠে বাগানের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। বাগানে তখন সাদা, হলুদ, গোলাপী, লাল, বিবিধ বর্ণ-বৈচিত্র্যে বসন্তের সমারোহ লেগেছে। ঘন সবুজ গুল্মবনের মাঝে মাঝে কয়েদীদের নীল টুপিগুলি যেন উজ্জ্বল কতকগুলি প্রজাপতির মত দেখাচ্ছে। এক অপূর্ব মধুর চিন্তাধারা জেলারের মন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। সে চিন্তার উৎস হ'ল ২৪৫ নম্বর কয়েদীর বোন। তাঁর মনে হয়, যেন চোখের সামনে তিনি সেই মেয়েটিকে দেখছেন; তাঁর ভাইএরই মত লম্বা এবং কালো, আর তারই মত সম্ভ্রান্ত। যেন সে তার শান্ত সহিষ্ণুতায় সামনের দিকে নুয়ে প'ড়ে তার সেই সূচী-কাজটিতে তন্ময় হয়ে আছে। কিংবা যেন সে তার ছোট্ট সার্ডিনিয়ান্ ঘোড়াটিতে চ'ড়ে ছুটে চলেছে, দ্বিপ্রহরের সূর্য তার মুখে লেগে চোখ দুটিকে নিমিলিত ক'রে এনেছে।

হঠাৎ জেলারের নিজেরই বিস্ময়ের সীমা রইল না। কেমন ক'রে এইসব অদ্ভুত ছেলেমানুষী কল্পনা তাঁকে পেয়ে বসল! বিস্ময় ক্রমশ ক্রোধে পরিণত হ'ল এবং নিজের নির্বুদ্ধিতাকে কোনও রকমেই তিনি মার্জনা করতে পারলেন না।

এমনি ক'রে তিন-চার মাস কাটল। পাওলার কাছ থেকে তিন-চার খানা চিঠি এসেছে। শেষের চিঠিতে সে ক্যাসিয়োকে তার ফোটো পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অবশ্য যদি তাতে কোনও নিষেধ না থাকে। কয়েদীর কাছে পাঠাবার আগে চিঠির তলায় জেলার লিখে দিলেন, "কোনও নিষেধ নেই।"

তার পর, এক দুই তিনটি সুদীর্ঘ সপ্তাহ ধ'রে সেই বিরাট জেলখানার একান্তে ব'সে দুইটি অন্তর একটি নারীর ছবি পাবার জন্য আকুল উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা ক'রে রইল, যদিও একের আগ্রহের সঙ্গে অপরের মনের ঠিক সংগতি ছিল না।

ক্যাসিয়োর প্রতীক্ষার মধ্যে ছিল একটা শান্ত কমনীয়তা, ছিল আশার আলো। প্রত্যাশিত আনন্দ আগে থেকেই যেন খানিকটা সুখের অনুভূতি এনে দিয়েছিল। প্রতি দিন প্রত্যুষে উঠেই সে ভাবত, হয়তো আজই এসে পড়বে, সেই ঈপ্সিত বস্তুটি এবং তারই প্রতীক্ষায় সেই ছোট্ট জানালাটির ধারে সে দাঁড়িয়ে থাকত।

এদিকে, জেলার যখন তাঁর বিছানা থেকে উঠতেন, তখন যেন তাঁর পাণ্ডুর মুখখানা আরও বেশী পাণ্ডুর দেখাত এবং তাঁরও মনে জাগত সেই ছবিটির কথা। কিন্তু তাঁর প্রতীক্ষার মাঝে ছিল অস্থিরতার সঙ্গে জড়ানো কেমন যেন একটা রিক্ততার গ্লানি। মনের এই অহেতুক কৌতূহল, এই নিরর্থক ভাব-বিলাস সংবরণ করতে না পারার জন্য নিজের প্রতি বিতৃষ্ণাও তাঁর কম হয় নি।

বাগানে ঘুরে তিনি নিজের আফিসে এসে ব'সে দৈনন্দিন একঘেয়ে কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করতেন। কয়েদীর পোশাক পরা ওই লোকগুলোকে পরিদর্শন করতেন, কিন্তু কোনও কাজের সঙ্গেই যেন তাঁর অন্তরের কোনও যোগ ছিল না। অন্তর যেন পথ চেয়ে আছে সেই অদৃষ্টপূর্ব ছবিখানির। কঠোর নির্লিপ্ততা আর বিরক্তির পিছনে অন্তরের অন্তস্তলে একটা যেন আনন্দের শিখাও প্রদীপ্ত হয়ে থাকত এবং তারই একটা খুব ক্ষীণ রশ্মি তাঁর দুটি চোখের উপর স্থির হয়ে জ্বলত। ছবিটি যখন সত্যই এসে পৌঁছল, তখন এই শিখাটি থেকেই তাঁর সারা অন্তরে যেন আগুন ধ'রে গেল, এমনি সজীব সুষমায় ভরা সেই ছবিখানি। কল্পনা দিয়ে তিনি এই মেয়েটির সৌন্দর্যের একেবারেই নাগাল পান নি। এই দুটি সুন্দর কালো চোখ, অধর দুখানির এই কমনীয় বক্ররেখা, এই টোল খাওয়া চিবুক, সবগুলিতে জড়িয়ে আছে যেন এক অপরিসীম মাধুর্য। এমনি অনুপম মাধুর্য ছিল তার চিঠিগুলিতে, যার প্রত্যেকটি কথা থেকে কেমন যেন একটি সুরভির স্পর্শ পাওয়া যেত। অপরূপ রহস্যে ঘেরা ওই মধুরিমাই মন্ত্রমুগ্ধ করলে এই মৌন স্বপ্নবিলাসীর অন্তরখানিকে।

ফোটোর সঙ্গের চিঠিখানিও ছিল ঠিক পূর্বের মতই মধুর।

"ছবি তোলার সময় আমি তোমারই কথা ভেবে হাসছিলুম। ছবিটি যেন তোমার মনে সামান্য একটুও আনন্দ ও আশ্বাস এনে দিয়ে ভবিষ্যৎ সুদিনের আশায় তোমাকে উজ্জীবিত ক'রে তোলে। আমার অন্তরের ভাষা তুমি আমার চোখের দৃষ্টিতেই দেখতে পাবে।"

এই পর্যন্ত প'ড়ে জেলার নিজেও তাকিয়ে দেখলেন তার দুটি চোখের পানে। তার পর চিঠি শেষ ক'রে আবার সেই ফোটোটি এমন ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন, যাতে সবটুকু আলো এসে তার মুখের উপর পড়ে। দেখতে দেখতে তাঁর মনে হ'ল জ্বল জ্বল ক'রে উঠেছে ওই চোখ দুটি, হাস্যস্ফুরিত হয়ে উঠেছে ওই অধর দুখানি।

মুখে যদিও বলেন, উঃ কত বড় বোকামি আমার! মন কিন্তু বলে, ভাইকে যে এমনি ক'রে চিঠি লেখে, না জানি কী ভাষা দেবে সে তার প্রেমাস্পদের লিপিতে!

সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের ভিতর থেকে কে যেন গুমরে ওঠে—কিন্তু নিজে আমি তো কুৎসিত, [illegible] এবং বৃদ্ধ হ'তে চলেছি। জীবনে পাবার মধ্যে পেলাম শ[illegible] ঘৃণা আর ভয়, আর তো কিছু না!

আবার একবার চিঠিখানি [illegible]ড় ফোটোর পানে তাকালেন। এবং শেষ পর্যন্ত, ছবি [illegible] কোনোটিই সেদিন আর কয়েদীর কাছে পৌঁছল না।

রাত্রে জেলার এ[illegible] যেন কয়েদীদের মধ্যে বিদ্রোহ জেগে[illegible] ক'রে তাদের শৃঙ্খল ভাঙবার [illegible] আক্রমণ করতে আসছে। হাতে [illegible] ছবিখানি, গোলমালের মধ্যে ছবিটি যদি [illegible] হয়তো ক্যাসিয়ো দেখতে পাবে এবং বুঝবে যে[illegible]ছ। কিন্তু আশ্চর্য, ক্রুদ্ধ কয়েদীরা তাঁকে হত্যা করবার [illegible] করতেই ক্যাসিয়ো তাদের পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে ব[illegible]দার! ওঁর গায়ে হাত দিও না। ওঁর সঙ্গে আমার [illegible] হবে। তখন দেখবে, ভালর সংস্পর্শে এসে উনি নিজে [illegible] কতটা ভাল হয়ে উঠেছেন!"

হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেলার দেখলেন, সারা দেহ তাঁর ঘামে ভিজে উঠেছে। এবং তার পর বাকী রাতটুকু তাঁর অনিদ্রাতেই কেটে গেল।

এদিকে যতই দিন যাচ্ছিল, ক্যাসিয়োর মনে ততই একটা অস্পষ্ট উদ্বেগ দেখা দিচ্ছিল। আরও এক সপ্তাহ কেটে গেল, তবু ছবি বা চিঠি কিছুই এল না। কে জানে, সেখানে ওই রৌদ্র-দীপ্ত সাগরের ওপারে কিসব ব্যাপার ঘটেছে। নিশ্চয় পাওলার কিছু অসুখ করেছে, কিংবা—ভুলে গেল কি সে?

ক্যাসিয়োর মনে আবার জেগে ওঠে সেই প্রথম দিনগুলির মর্মান্তিক নৈরাশ্য। সে টেলিগ্রাম [illegible] তে চাইলে, কিন্তু অনুমতি পেলে না। কেবল মাস শেষ [illegible] দুদুদিন আগেই সে এবার লেখবার অনুমতি পেলে। [illegible]

এত দুঃখ আর নৈরাশ্য ছিল ক্যাসিয়োর এই চিঠিখানির প্রতি ছত্রে যে, জেলার নিজের কৃতকর্মের জন্য নিরতিশয় কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু, কে বুঝবে, এই দুটো সপ্তাহ ধ'রে কি অন্তর্দাহই না তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে! বাইরে থেকে লোকে অবশ্য তাঁকে আরও বেশী নিষ্ঠুর মনে করছে। কিন্তু, ওই সব কয়েদীর দিকে গভীর মর্মবেদনার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে এখন যেন তিনি বুঝতে শিখেছেন, কেমন ক'রে মানুষ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অপরাধ ক'রে বসে।

ক্যাসিয়োর এই চিঠিখানা পড়তে পড়তে জেলার মনে মনে আবার বলেন, তবু কেন এরা ক্ষমা প্রার্থনা করে না? কিন্তু, এটুকু নিজের বুঝতেও তার বাকী থাকে না যে, ২৪৫নং কয়েদীর প্রতি তাঁর এই সহৃদয়তার আড়ালে রয়েছে একটা স্বার্থে মেশা আশা; যেন মার্জনা পাবার পর ঐ লোকটির কাছে তাঁর একটা বড় রকমের দাবি জানাবার সুযোগ আসবে।

চিঠি পাবামাত্রই পাওলা টেলিগ্রাম ক'রে জানালে যে, পরের মেলেই সে একখানি ফোটো পাঠাচ্ছে। ভাগ্যহীন কয়েদীর মনে যাতে কোনও রকম অশান্তি না হয়, তাই সে এমনভাব দেখিয়েছে, যেন সে ইতিপূর্বে চিঠি বা ফোটো কিছুই পাঠাতে পারে নি অনেক কারণে। প্রধান কারণ এই যে, এর আগে ফোটো তোলাবার সুবিধাই তার হয়ে ওঠে নি।

জেলারের মন কৃতজ্ঞতায় ভ'রে ওঠে। ইচ্ছা হয়, মেয়েটিকে চিঠি লিখে তিনি সমস্ত অবস্থার সঠিক বিবরণ জানান।

কিন্তু তা তিনি করলেন না, কেননা, পাওলা হয়তো মনে করবে, লোকটা উন্মাদ, এবং বেচারা হয়তো তার ভাইএর জন্যে উদ্বিগ্নও হয়ে পড়বে।

এমনি ক'রে গ্রীষ্ম [illegible] শরৎ এসে পড়ল। কত কয়েদী এল, কত গেল। অফিস [illegible]সই তিনজন কেরানীর এই গর্বিত সার্ডিনিয়ানের প্রতি বিতৃষ্ণার[illegible]টুকু ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সে নিজে কিন্তু যেন অনেক[illegible] [illegible]শান্ত হয়ে পড়েছিল। শরতের প্রত্যুষে বা দিনান্তে [illegible] [illegible] স্বর্ণাভায় রঞ্জিত হ'ত, তখন স্বদেশের [illegible]র মুক্তিতৃষ্ণায় আকুল হয়ে উঠত। [illegible] অশান্ত বিদ্রোহভাব দমন ক'রে সে [illegible] ডুব দিতে পেরেছিল, কিন্তু যখন [illegible] সঙ্গে ঝ'ড়ো মেঘের দল অ্যাপেনাইনকে [illegible]লে, আর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারা ক্রুদ্ধ আ[illegible] প্রাকারে আঘাত করতে লাগল, তখন যে[illegible]ন্ত বাঁধন ছিন্নভিন্ন হয়ে খ'সে প'[illegible] [illegible]খের সামনে ওই তিনজন কেরানীকে দেখতে দেখতে [illegible]ত একটা যেন দুঃসহ দুঃস্বপ্ন তার চোখের সামনে [illegible]ছে। কি যেন একটা উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা তার মনে জাগত। যেন কোনও কিছুকে সে তার বন্ধমুষ্টির মধ্যে চেপে ধ'রে চূর্ণ ক'রে ফেলতে পারলে তবু খানিকটা শান্তি পায়।

এমনিভাবে যখন দিন কাটছে [illegible] সেই সময় হঠাৎ একদিন তার ডাক পড়ল জেলারের ঘরে।

অন্যান্য অনেক কথার [illegible]র হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, আপনি কি [illegible] ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য আবেদন করেছিলেন?"

ক্যাসিয়ো জবাব দিলে, "[illegible]রেছিলাম মন্ত্রিসভায়।"

"দুর্ভাগ্য আপনার। মা[illegible]রা কোনও দিনই আবেদন সম্বন্ধে কোনও রকম শেষ সিদ্ধান্ত করেন না। এমনও হয়েছে যে, মন্ত্রিসভার মতামত যখন এল, তখন কয়েদীর কারাবাসের পুরো সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।"

ক্যাসিয়ো অত্যন্ত গম্ভ[illegible]য়ে রইল।

"তার চেয়ে বরং রা[illegible]ছে আবেদন পাঠান, শীঘ্র জবাব পাওয়া যাবে।"

"কিন্তু সত্যিই কি[illegible]শা আছে নাকি মার্জনা পাবার?" ক্যাসিয়ো নতমুখে বললে।

"যদি আপনার ভগ্নী আবেদন করেন, তা হ'লে পাওয়া যেতে পারে।" জেলার জবাব দিলেন এবং এই কথা ব'লেই তিনি কয়েদীর দিকে পিছন ফিরে বসলেন, যাতে পরস্পরের মুখের ভাবটুকু দেখতে পাবার সুযোগ না ঘটে।

সেদিন অফিস ঘরে ফিরে এসে ক্যাসিয়োর মনে হ'ল সে যেন সত্যই অনেকখানি বদলে গেছে, তার আশপাশের সর্বকিছুরই যেন বদল হয়ে গেছে, এমন কি, ওই হতভাগ্য কেরানী তিনটিকে দেখে তার মনে আর ঘৃণার উদ্রেক হচ্ছে না, বরং একটা অনুকম্পাতেই হৃদয় ভ'রে উঠছে। আজই সর্বপ্রথম জেলার অন্তত একজন কয়েদীর কাছে আন্তরিক শ্রদ্ধা লাভ করলে।

রানীর নিকট ক্ষমার আবেদন পেশ করবার জন্য ক্যাসিয়ো পাওলাকে অনুরোধ জানালে।

শীত কেটে গেল। ফেব্রুআরির এক স্বচ্ছ প্রত্যুষে ক্যাসিয়ো তার জানালার গরাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল। মুখ রক্তহীন পাণ্ডুর, কিন্তু চোখ দুটি যেন আশার আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তুষারশুভ্র অ্যাপেনাইন থেকে বাতাস যেন বরফের খানিকটা সুরভি বয়ে আনছিল। সামনের উপত্যকায় ঘন সবুজের আস্তরণ এবং বাগানের বাদামগুলিতে গোলাপী রংএর ফুলের ছড়াছড়ি।

ক্যাসিয়ো বুঝতে পারছিল, প্রত্যাশিত সুখের নিগূঢ় আশায় তার শিরায় শিরায় রক্তধারা বয়ে চলেছে এবং বিকশিত প্রায় বসন্তের সবটুকু গরিমা যেন তার নিজের অন্তরের উপর প্রতিফলিত হয়েছে।

ওদিকে, আর একটি লোক, যদিও সে তার মত কয়েদী নয়, তার নিরানন্দ বন্ধঘরে ব'সে ব'সে ঠিক তারই মত এমনি চঞ্চল-মধুর অনুভূতির দোলায় দোল খাচ্ছিল। চোখে তার লেগেছিল আধো-বিকশিত বসন্তের কোমল স্পর্শ এবং বুকের নীচে যেন এক পবিত্র বেদীতল তার দেবতার আগমনের প্রতীক্ষায় সজ্জিত হচ্ছিল।

মন্ত্রিসভা থেকে একদা জেলারের কাছে পত্র এল। তাতে ক্যাসিয়ো লঙ্গিনো নামে কয়েদীর সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছে। উত্তরে জেলার জানালেন, ২৪৫নং কয়েদীর মত লোক কেন যে জালের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হ'ল তা তিনি বুঝতে পারেন না। তাঁর বিশ্বাস; ও অতি সৎ, ওর মার্জিত রুচি আর বিদ্যার সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। এ ছাড়া তিনি আরও একখানা চিঠি দিলেন মন্ত্রিসভাস্থ তাঁর এক বন্ধুর কাছে, যেন তাঁর এই সুপারিশটুকু নিষ্ফল না হয়।

তাঁর ওই সুপারিশের ফলেই হ'ক বা অপর যে কারণেই হ'ক ক্যাসিয়োর মার্জনার আদেশ এসে পৌঁছল শীঘ্রই, ঠিক যখন তার কারাবাসের প্রথম বৎসর পূর্ণ হয়েছে।

ডাক পড়ল তার জেলারের ঘরে। বাইরে তখন বাতাস বইছিল একটা স্নিগ্ধ সুবাস বুকে নিয়ে এবং আকাশে নীলিমার যেন আর অন্ত ছিল না। ঘরের ভিতরে জানালার ফাঁক দিয়ে এসে-পড়া সূর্যালোকে দূরের বৃক্ষচ্ছায়া স্পন্দিত হচ্ছিল। জেলার তার টেবিলের সামনে বসেছিলেন, আজ কিন্তু ক্যাসিয়ো আসতেই উঠে দাঁড়ালেন। আজকের এ সম্মানটুকু ক্যাসিয়োর দৃষ্টি এড়াল না, কিন্তু অন্তরের দুরন্ত আশাকে সে ব্যক্ত করতে সাহস করলে না; নিজের দ্রুত হৃৎস্পন্দনে তার নিজেরই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল।

কি একটা জিনিস হাতে তুলে ধ'রে জেলার বললেন, "এসেছে আদেশ।"

"আদেশ?"

"হ্যাঁ মার্জনার আদেশ।"

"কার?" রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলে ক্যাসিয়ো।

জেলারের ধৈর্য হারাবার উপক্রম হচ্ছিল। বললেন, "তোমার ছাড়া আর কার হ'তে পারে?"

যুবকের আনন্দাবেগে নিজেও তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। যে বস্তুটি এতখানি অপ্রত্যাশিত ছিল তার কাছে, কৃতজ্ঞতাও তার জন্য বেশ বড় রকমেরই হবে বই কি।

"হাঁ, মুক্ত তুমি। তবে ঠিক আজই নয়। শুধু গোটা কয়েক মামুলী কাজ বাকী, যা সেরে নিতে এক সপ্তাহের বেশী লাগবে না।"

ধীরে ধীরে ক্যাসিয়ো যেন তার চেতনা ফিরে পেলে। সে এতক্ষণ সোজা জেলারের দিকে চেয়ে থাকলেও যেন তাকে ঠিক দেখতে পাচ্ছিল না। এখন দৃষ্টি পড়ল ওই লোকটির উপর; এবং সে দেখলে, বিবর্ণ মুখখানা তার আরক্ত, আর তার ছোট নীল চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

নিজের মনে সে বললে, "চমৎকার লোক! পরের আনন্দে ও কত সুখী! কতখানি ভুল বুঝেছিলাম আমি এই মানুষটিকে!"

পরক্ষণেই তার মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠল, কিন্তু আমার জন্যে এতটা তিনি কেন করতে গেলেন?

জেলার তাকে বসতে ব'লে রাজার স্বাক্ষরিত আদেশপত্র দেখতে দিলেন এবং সেই সুযোগে বললেন, "এবার তোমার কাছে একটি কথা আছে আমার। কথাটা শুনেই তাড়াতাড়ি যেন কোনও সিদ্ধান্ত ক'রে ব'সো না। অনেক দিন থেকে আজকের এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করছিলাম আমি। এখন, আমাদের পরস্পরকে বুঝতে হ'লে আমার চাই অনেকখানি সাহস এবং তোমার চাই অনেকখানি ধৈর্য।"

শুষ্ক একটু হাসির সঙ্গে তাঁর মুখের সেই স্বাভাবিক ক্লেশ-ব্যঞ্জক ভাবটুকু ফুটে উঠল। ক্যাসিয়ো হতবুদ্ধির মত তাঁর পানে চেয়ে রইল।

আর কালক্ষেপ না ক'রে জেলার বললেন, "হয়তো আমি তোমায় ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু জানি যে তুমি বুদ্ধিমান। শোন, ওই হুকুমনামা পাবার জন্য আমার যতটা ক্ষমতা ছিল তা করেছি এবং করেছি তুমি মার্জনা পাবার যোগ্য ব'লেই। অবশ্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশী নই, বরং যাতে কৃতজ্ঞতার খাতিরে কোনও কিছু না কর, তাই আমি চাই। তুমি যা ভাল বোঝ সেটুকু করবার তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা রইল।"

"বলুন," ক্যাসিয়ো অসহিষ্ণুভাবে বললে; "যা আমার সাধ্য"—

"জানি না, আমি যা চাইব, সেটা তোমার সাধ্যের অতিরিক্ত কি না।"

"বলুন, বলুন।"

"বলছি, শোন। কিন্তু আমায় ভুল বুঝো না। কিংবা ভেবো না যে, লোকটা পাগল হয়ে গেছে। তোমার ভগ্নীর চিঠি-গুলি থেকে তার অন্তরের মহত্বের পরিচয়ে মুগ্ধ হয়েছি আমি এবং সঙ্গে সঙ্গে ভালবেসেছি তাকে। হেসো না তুমি। সত্যিই আমি কিছু বৃদ্ধ হই নি।"

কিন্তু তবু হাসি এল ক্যাসিয়োর মুখে। হঠাৎ সে প্রশ্ন করলে, "আপনি লিখেছেন না কি তাকে?"

"আরে না না। ক্ষুব্ধ হয়ো না তুমি। অতদূরে অগ্রসর হই নি। শুধু তোমার কাছেই"—

"কিন্তু, এ যে অসম্ভব, এ যে ভাবতেও পারা যায় না!" হঠাৎ ব'লে উঠল ক্যাসিয়ো এবং কথার সঙ্গে সঙ্গে সে তার কোলের উপরকার কাগজখানার উপর সশব্দে করাঘাত করলে।

"তা, অসম্ভবই মনে হয় বটে, তবু এ সত্যি। দাবিটা আমার কিছু গুরুতর রকমেরই বটে। তোমার ভগ্নী কি তাতে সম্মত হবেন?"

"কি দাবি?"

"অর্থাৎ, আমার বিবাহের প্রস্তাব আর কি।"

ক্যাসিয়োর মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। মর্মান্তিক সাহিষ্ণুতায় সে নিজেকে সামলে নিলে। চোখের ঝাপসা ভাবটা কেটে যেতে সে জেলারের পানে চেয়ে দেখলে, ঠিক যেমন সেই প্রথম সাক্ষাতে দেখেছিল, তেমনি ক্লেশপাণ্ডুর এবং শ্রীহীন। না না, পাওলা কখনওই তাকে গ্রহণ করতে রাজী হবে না। নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যেও ক্যাসিয়োর মনে এই চিন্তাটা যেন এক ফোঁটা স্নিগ্ধতা এনে দিলে।

প্রকাশ্যে সে বললে, "কিন্তু আপনি কথাটা ভেবে দেখেছেন কি সব দিক দিয়ে? আমাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর কিছু আনিয়েছেন আমাদের দেশ থেকে?"

"কিছু না। দরকার কি তাতে? আমি জেনেছি তোমার ভগ্নীকে, পরিচয় পেয়েছি তার মহত্ত্বের। তার চেয়ে বেশী আমি কিছু চাই না। এ সংসারে আমি সম্পূর্ণ একা।"

"আপনি মহৎ। কেমন ক'রে আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব তা বুঝতে পারছি না। আপনার ইচ্ছায় আমি সম্মান বোধ করছি এবং যদি তা পূর্ণ করবার হাত আমার থাকত— অবশ্য, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করব না, আপনি হতাশ হবেন না।"

সে উঠে দাঁড়িয়ে আদেশপত্রটিকে গুটিয়ে নিলে। তার পর জেলারের অনুমতি নিয়ে সে তার কুঠরিতে ফিরে এল। এবং সেখানে নিজের বিছানার উপর অত্যন্ত অসহায়ভাবে প'ড়ে প'ড়ে মর্মান্তিক যাতনায় ছটফট করতে লাগল। সত্যই তো পাওলা তার বোন নয়, প্রণয়িনী। তারই [illegible] সে তার নিজের সম্মানকে কুণ্ঠিত করেছে, ভবিষ্যতকে বি[illegible]রেছে, পরিজনবর্গের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। এখন জগতে[illegible] ওই মেয়েটিই তার সর্বস্ব। শুধু, যাতে সে তাকে অবাধে [illegible] লিখতে পারে, তারই জন্যে সে তার ভগ্নী ব'লে প[illegible]য়েছিল। আজ তাকেও সে হারাবে না কি? ও[illegible] এবং মর্যাদায় তার চেয়ে অনেক বড়। [illegible]কে নষ্ট ক'রে দেবার কি অধিকার [illegible]

সে অবশ্য ওই [illegible]ন এবং প্রায় দুটি বৎসরের স্বাধীনতাকে [illegible] সে তো তা চায় নি। সুতরাং এই অযাচি[illegible]রূপ মেয়েটির সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনকে দাবি ক[illegible]বে? অবশ্য, পাওলার কর্তব্য ঠিক করবার উপযুক্ত পাত্র [illegible] তবে, ক্যাসিয়ো তো জানে, কোন্ পথে সে তার [illegible] নেবে! তখন কি ওই সদাশয় জেলারের প্রতি তার দি[illegible] কতকটা প্রতারণা করা হবে না?

একবার মনে হ'ল ফলাফল যাই হ'ক, সব কথা সে জেলারের কাছে ব্যক্ত করবে। পরে আবার মনে হ'ল, না, কেনই বা বলতে যাবে? কী অধিকার আ[illegible]কটার এইসব গোপন কথা জানবার? সে যা করেছে[illegible]ধু তার নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশাতেই করেছে। [illegible]ড়ালের মত চোখ দুট দেখে আশঙ্কায় তার মন ভ'রে [illegible]ব কথা জানতে পারলে হয়তো কোনও কিছু অনিষ্ট কর[illegible]বে না।

বিবেক কিন্তু বললে, "[illegible]ছ এসব? সত্যিই তুমি শেষে এতখানি সংকীর্ণ হ'য়ে পড়বে না কি?"

আকাশে সাদা মেঘের পরে মেঘ জ'মে জ'মে সুদূরপ্রসারী একটা সোপানশ্রেণীর মত দেখাচ্ছিল। কোথায় গিয়ে মিশেছে ওই সিঁড়ির ধাপগুলি কে জা[illegible] তাদের পানে চেয়ে চেয়ে স্বদেশের জন্য একটা মর্মান্তিক [illegible]ক্যাসিয়োর মন ভ'রে ওঠে। হঠাৎ মনে হয়, একটা যেন গভী[illegible] পবিত্রতায় তার চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেছে, যেন ঐ রূপালী [illegible]র শেষ ধাপ পর্যন্ত উঠে গিয়ে সে তার প্রিয়তম জন্মভূমির [illegible]টুকু দেখতে পেয়েছে।

নিজের মনে সে বললে, শুধু তো ওই লোকটির জন্যই। নইলে আরও কত দিন যে এই কারাবাসে পচতে হ'ত! হয়তো মৃত্যুও হ'ত এইখানেই, হয়তো উন্মাদ হয়ে বীভৎস একটা কিছু ক'রে ফেলতুম। নাঃ আমি সব বলব তাকে, ফল তার যা-ই হ'ক।

জেলারের সঙ্গে দেখা ক'রে সে সহজে স্পষ্ট ভাবে বললে, "আপনার আজকের কথাটাই আমি সারা দিন ধ'রে ভেবেছি।"

"বেশ তো।" জেলার বললেন। মনে তাঁর কেমন যেন একটা আশঙ্কা ধূমায়িত হ'তে লাগল।

"শুনুন। আজ দশ বৎসর হ'ল আমি আমার দেশের একটি মেয়েকে ভালবেসেছি। তার ঐশ্বর্য ছিল প্রচুর, কিন্তু বাপ মা দুজনকেই হারিয়ে সে তার এক আত্মীয় অভিভাবকের হাতে পড়েছিল। আমি গিয়েছিলাম কলেজে পড়তে এবং অনেক দিন বিদেশেই ছিলুম। বাড়ি ফিরে দেখলুম, হতভাগিনী মেয়েটি বড় হয়ে উঠেছে, আর অভিভাবকের অত্যাচারে সর্বদাই তাকে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। তার সমস্ত সম্পত্তি দখল ক'রে বসেছিলেন তার অভিভাবক। তাকে তো কিছুই তিনি দিতেন না, বরং রকমারি হুমকি দেখিয়ে তাকে সর্বদা বাড়ির ভিতরে আটকে রাখা হ'ত। অনেক কষ্টে আমি তার অন্তরের পরিচয়ে বুঝলুম আমাকে সে ভালবাসে। প্রতিজ্ঞা করলুম আমি তাকে বাঁচাব এই অত্যাচারের হাত থেকে এবং তার সম্পত্তিও উদ্ধার ক'রে দোব। সে আমাকে বিবাহ ক'রে আমার সঙ্গে পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু,

তাতে অনেক বিপদ [illegible] আমি রাজী হই নি। আমি তাকে কোনও রকমে উন্ধার ক[illegible]ার হিতৈষীদের কাছে রেখে দিলুম।

"তার পর আমি [illegible] করলুম, হয়তো অনুমান করতে পারবেন। আমি তার ধন[illegible]ভিভাবকের নাম জাল ক'রে ক'রে বহু টাকা সংগ্রহ করলুম [illegible] সমস্ত টাকা জমা রাখলুম মেয়েটির নামে [illegible] জানি হ'তে বাকী রইল না। বোকার [illegible] আমার এই বীরত্বের তারিফ ক[illegible] ড়লুম, পেলুম অজস্র নিন্দা আর [illegible] কারাদণ্ড। যা কিছু আমার সম্পত্তি [illegible] এবং আমার আত্মীয় পরিজন আমা[illegible] স্বীকার করলে। এখন, এই বিরাট পৃ[illegible] তে আমার আছে শুধু সে, পাওলা [illegible]

[illegible] বারে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন। কিই বা বলবার ছিল [illegible] ক্যাসিয়োর এবং তাঁর নিজের সমস্ত কাহিনীটাই আগাগোড়া তাঁর কাছে একেবারে অসম্ভব ব'লে মনে হ'তে লাগল, যদিও অন্তরে অন্তরে বুঝলেন, এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছুই নেই।

ক্যাসিয়ো বললে, "অস[illegible] ন হচ্ছে আপনার, নয়? তা সত্যিই তো, আমাকেও [illegible] থা বললে আমিও বিশ্বাস করতে পারতুম না।"

"অদ্ভুত এই জীবন! [illegible] মুখ থেকে বেরিয়ে এল; এবং এই কথার সঙ্গে স[illegible] জোরে তিনি তাঁর হাতদুটোকে মুষ্টিবদ্ধ করলেন যে, [illegible] চামড়া ভেদ করবার উপক্রম করল। ভাগ্যের গতি তো [illegible] ই রহস্যময়।

ক্যাসিয়ো কি বলতে গিয়ে [illegible] জেলারের মুখের বেদনাক্লিষ্ট অভিব্যক্তি দেখে হঠাৎ সামলে [illegible] ল। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে সে বললে, "কিন্তু, যাই [illegible] ব [illegible] না, আমি আমার কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্যে আমা[illegible] নিয়োগ করব।"

"তার মানে?" [illegible] লি

"প্রকৃত অবস্থা[illegible] আপনার কাছে সবই দিয়েছি, তবু আপনি আমার [illegible] করেছেন, আমি কথা দিচ্ছি, আমার সাধ্যমত—"

"কি বলছেন? কি বলছেন আপনি?" কেমন যেন একটা অদ্ভুত [illegible] জেলারের মুখ থেকে ও কথা দুটো বেরিয়ে এল। যেন তিনি বহুদূরের কোনও মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন, ক্যাসিয়োর সঙ্গে নয়।

"অবশ্য, এর মীমাংসা করতে পারে পাওলা নিজেই। আমি আমি তাকে সব কথা জানাব, যেন সত্যই আমি তার ভাই, আর কিছু না।"

"না না এ তুমি কি বলছ?"

"আর, বলেন যদি আজই তাকে আমি চিঠি লিখি এবং দুজনে আমরা তার জবাবের প্রতীক্ষায় থাকি। হয়তো তার জবাব পাবার পর আর আমার স্বদেশে ফেরবার প্রয়োজনই থাকবে না।"

"কি যে বলছ তুমি!" জেলার আবার বললেন; কিন্তু এবার কণ্ঠে তাঁর ফিরে এসেছে তাঁর শক্তি। এবং এতক্ষণে সোজা মুখ তুলে তিনি ক্যাসিয়োর মুখের পানে তাকালেন।

"কক্ষনো আপনি ওসব লিখতে পাবেন না। ফিরে যান আপনার দেশে। আমি বলছি, অনন্ত সুখ সেখানে আপনার পথ চেয়ে আছে। অন্তরের সঙ্গে কামনা করি, একথা যেন আ[illegible] সত্য হয়।"

"না না, নিষেধ করবেন না, আমায় লিখতে দিন তাকে। আপনার কাছে অনুগ্রহের প্রার্থী আমি। জানি, কর্তব্যকে প্রেমের চেয়ে বড় ক'রে দেখা উচিত। আমার হাতে পড়ার চেয়ে আপনার আশ্রয় পেলে পাওলা অনেক বেশী ভাগ্যবতী হবে এবং আমার কাছে জগতের সব বস্তুর চেয়ে বড় হচ্ছে তার সুখ, তার মঙ্গল।"

ঘরের অপর প্রাণীটি শান্তভাবে শুনলেন তার কথা। তার দুটি চোখে একবার একটা অপূর্ব দীপ্তি খেলে গেল।

খানিকটা স্তম্ভিতভাবে ব'সে থেকে তিনি আবার কথা বললেন। ক্যাসিয়োর মহত্ত্বের প্রশংসা ক'রে বললেন, "আপনার কর্তব্য যেমন আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সহৃদয়তা দেখানো, তেমনি তাঁরই জন্যে আপনার এই কঠোর কারাবরণ স্মরণ ক'রে আপনাকে সুখী করাটাও তাঁর কম কর্তব্য নয়।"

"কিন্তু—," ক্যাসিয়ো বাধা দিয়ে বলতে গেল, কিন্তু বাধা পেলে।

"আর এক মুহূর্ত। তা হলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ ক'রে ফেলব। যদি তিনি তাঁর ওই কর্তব্যটুকু না করেন, তা হ'লে তাঁর যে মহিয়সী মূর্তিখানি আমি কল্পনায় গ'ড়ে তুলেছি, তার কোনও অস্তিত্বই যে আর থাকবে না এবং তখন আমার মূল প্রস্তাবটিও নিরর্থক বিবেচনায় প্রত্যাহৃত ব'লে ধ'রে নিতে হবে।"

ক্যাসিয়ো নির্বাক্ হয়ে র'ইল এবং জেলার জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অনির্বচনীয় একটা পুলকের উচ্ছ্বাসে দুজনেরই অন্তর যেন ভেঙ্গে আসছিল।*

---

*গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার গল্প হইতে।

পশুশালার ডাক্তার

জীবজন্তুরাও মানুষের মত অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে তারা যতখানি অসহায় মানুষ ততখানি নয়। বহুদিনের গবেষণার পর মানুষ নানা রোগের বীজাণুকে ধ্বংস করবার প্রতিষেধক উপায় আবিষ্কার করেছে। জীবজন্তুরা গবেষণার ধার ধারে না, তারা যদি প্রকৃতির প্রচুর দয়ার পাত্র না হ'ত তাহ'লে পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না। নানা রোগ তাদের আক্রমণ করে, কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যে সেই সব রোগ থেকে নিজেদের মুক্ত ক'রে সুস্থ ক'রে তুলে। সামান্য অসুখে ডাক্তারকে সংবাদ পাঠাবার প্রয়োজন হয় না, জন্মগত অভ্যাসে প্রকৃতির রাজ্য থেকেই তারা রোগের ওষুধ সংগ্রহ ক'রে নেয়। এই সব নির্বাক জীবজন্তুর প্রতি প্রকৃতির করুণা অপরিসীম। তবুও জীবজন্তুদের চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

বড় বড় পশুশালায় পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন জাতীয় কত অদ্ভুত জীবকেই না আমদানী করা হয়। জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে ভিন্ন দেশীয় জন্তুরা প্রবাসে এসে বেশ স্বচ্ছন্দে সেই সব পশুশালায় বাস করতে পারে না। বেশীর ভাগ সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেও পশুশালার কর্তৃপক্ষরা কোন কোন শ্রেণীর জন্তুদের জীবনরক্ষা করতে সক্ষম হন না। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকায় জীবজন্তুরা পশুশালার মধ্যে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। বৎসরে কয়েকবারই হাতী তার নখ কাটার প্রয়োজন মনে করে, সাপের চোয়ালে ফোঁড়ার আবির্ভাব হয়, পাখীর দল প্রায়ই খাঁচার মধ্যে আঘাত পেয়ে ডানা নষ্ট ক'রে ফেলে; বাঁদর, বনমানুষ দাঁতের গোড়া ফোলার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চিৎকারে পশুশালা কাঁপিয়ে তুলে। এই সব জীবজন্তুদের যন্ত্রণা নিরাময়ের ভার শেষে পশুশালার ডাক্তারদের উপরেই পড়ে। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস ও বার্লিন পশুশালার সংলগ্ন পশু চিকিৎসালয়ের সুব্যবস্থার কথা শুনে আজ আমরা আশ্চর্য না হয়ে থাকতে পারি না। সাপের মত কুটিল, বাঘের মত হিংস্র জীবজন্তুদের রোগ নিরাময়ের জন্য মানুষ দীর্ঘদিন সাধনা করেছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যতখানি সুখ সুবিধা হাসপাতালে পেয়ে থাকে জীবজন্তুরা পশুশালার হাসপাতালে তার থেকে কিছু কম সুবিধা পায় না। পশুশালায় কোন নতুন জন্তু আমদানী করবার পূর্বে তাদের হাসপাতালের বিচক্ষণ

ডাক্তারকে দিয়ে বিশেষ ... হয়। রোগগ্রস্ত পশুদের সত্বর হাসপ... ডাক্তার দিয়ে পশুশালা পরীক্ষা ... শুকে পৃথক-ভাবে রাখবার সুব্য... ড় পশুশালায় অবলম্বন করা হয়েছে ...ক এবং চিকিৎসক

একখানা ধারাল ছুরির উপর পর পর ডিম বসিয়ে খে... হ। ছেলেটি কিন্তু যাদুকর নয়। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে ফ... শল

পশুপক্ষীদের রোগমুক্তে... রমাণ অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করেছেন তা শুনে সা... অতিমাত্রায় আশ্চর্য হয়ে পড়বেন। জীবিত এবং মৃত পশুপক্ষীর ...র মধ্যে অনুসন্ধিৎসু চক্ষু দীর্ঘ দিন অনুসন্ধান করেও বাঞ্ছিত বস্তুর সন্ধান পায় নি। প্রতি বৎসর রিজেণ্ট পার্কের শবব্যবচ্ছেদালয়ে এক হাজার পশুপক্ষীর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। নির্বাক জীবজন্তুদের রোগ চিকিৎসা করা বেশীর ভাগ সময়েই নানা বাধার সৃষ্টি করে। রোগের কারণ অনুসন্ধান করাও চিকিৎসকের পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়ে। একবার নিউইয়র্ক শহরের জুতে একদল ওরাং-ওটা সপরিবারে মারাত্মক পেটের অসুখে বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। রোগের চিকিৎসা হবার পূর্বেই কয়েকটির মৃত্যু ঘটে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে জানা গেল ওরাং-ওটার বাসস্থানের পাশেই কচ্ছপের বাসস্থান হওয়ায় সুস্থ পরিবারের এরূপ বিপত্তি ঘটেছে। কচ্ছপের দেহ থেকে এক শ্রেণীর বীজাণুর আবির্ভাব হয়। ঐ বীজাণুর কচ্ছপের ক্ষতি করবার শক্তি নেই কিন্তু ওরাং-ওটার দেহে প্রবেশ করে বংশ নির্ম্মূল করবার যথেষ্ট শক্তির যে পরিচয় দিয়েছিল তাতে পশুশালার চিকিৎসকগণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ডাক্তারদের মতে, রোগী হিসাবে ভাল বলতে গেলে বাঁদর,

বড় জাতীয় এপ্‌ ... করা যায়। ডাক্তারদের রোগ পরীক্ষার জন্য ... রভাবে যতখানি সুযোগ দেয় অন্য জীবেরা ত... দেয় না। একবার এক শিম্পাঞ্জী শিশুকে শ্বাস গ্রহণে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে দেখে ডক্টর ... খলেন তার ফুসফুসের একদিকের অত্যন্ন ... হয়েছে। তৎক্ষণাৎ অক্সিজেনের ... শী-শিশু ডাক্তারের ব্যবস্থা মত ... করে' সে যাত্রায় প্রাণরক্ষা পায়। ...

...দরদের ... ল্যাজের শেষ দিক কামড়ে আক্রমণ ...রে য...ণায় ... কাতর হয়ে পড়ে। ছোট ... মেয়েদের দাঁত দিয়ে... কাটা অভ্যাস যেভাবে ক'রে ... করান হয় এ ক্ষেত্রেও ...ডনের পশুশালার ডাক্তারেরা সে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ক্ষত ল্যাজে তিক্ত লাল মলম লাগিয়ে ক্ষত সারান হয়। ... মলমের তিক্ততা তাদের বদ্‌অভ্যাস দূর করে। ...আর ...ণ্ডসে জনসন্‌ পশু-পক্ষীর চক্ষু চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ... গবেষণা করে যথেষ্ট কৃতকার্য হন। একবার লণ্ডন পশুশালায় এক জাপানী বাঁদর বহুদিন ধরে চোখের ছানির রোগেতে ভুগছিল। মিঃ আর্থার হেডের সহায়তায় ডাঃ জনসন সেই জাপানী বাঁদরে ছানি চোখেতে একদিন অস্ত্রোপচার করেন। কিন্তু ... মধ্যে বাঁদরটি বেশ সুস্থ হয়ে উঠে। জানোয়ারে ফোঁড়া, বাত ক্ষত প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। পশু চিকিৎসকেরা জানোয়ারদের এই ব্যাধি থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সুস্থ করেন। মানুষের মত পশুদের মধ্যেও আক্কেল দাঁতের আবির্ভাব দেখা যায়। জ্বর, পেটের গোলযোগ এ সবে প্রায়ই তারা আক্রান্ত হয়। জিরাফ যখন বেশী ঠাণ্ডা লাগায় তখন তাদের লম্বা গলায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ওষুধ দেওয়া হয়। সিন্ধুঘোটক, জলহস্তী প্রভৃতির দাঁতের অসুখ হ'লে ডাক্তারের মুস্কিল হয় সব থেকে বেশী। এই সব জানোয়ারদের চিকিৎসা করা বিপদ। তবে জানোয়ার হলেও তারা ডাক্তারদের অনিষ্ট সহজে করেছে বলে কোনও খবর পওয়া যায় নি। পশুশালার পশুপক্ষীরা তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের যথেষ্ট পরিমাণে ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে।

সকাল বেলায় ডাক্তারেরা পশুশালা পরিদর্শনে বের হ'লে চারিদিক থেকেই সকলে সুপ্রভাত জানায়। ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জী, বানরেরা ত ডাক্তারদের করমর্দন ক'রে সুপ্রভাত জানায়—হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। শিম্পাঞ্জী-শিশুর বুক পরীক্ষা করবার সময় শিম্পাঞ্জী-মাকে চিন্তিত মুখে ডাক্তারের মুখে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়।

মিঃ রায় বিশপ দেওয়ালের গা বেয়ে আট দশ ফিট উপরে উঠে যান এবং নীচের দিকে আবার নেমে আসেন। পৃথিবীতে আর কোন লোককে এভাবে দেওয়ালের গায়েতে হাঁটতে দেখা গেছে বলে শুনা যায়নি। শরীরের ভার, গতি সংযত রেখে এবং কোন রকম দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে তিনি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেন। মিঃ বিশপের বয়স মাত্র আঠার বৎসর।

নখের গঠনে ব্যক্তিত্বের পরিচয়

প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়ালে মানুষের দেহের কোন্‌ ...ান বিশেষ অঙ্গের গঠন বৈচিত্র দেখা যায়। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, মানুষের এ ভাবের গঠন বৈচিত্র নাকি তার ভাগ্য-ইতিহাসের শুভ-অশুভের অনেকখানি ভবিষ্যৎ-বাণী প্রচার করে। দেহের বিভিন্ন স্থানে এক তিলের অবস্থানকে অবলম্বন ক'রে আমাদের দেশে তিলতত্ত্বের যে ইতিহাস গড়ে উঠেছে, তাতে আজকের বিজ্ঞানী মন সায় না দিলেও, প্রাচীনেরা আজও সেটাকে অবিশ্বাস করতে পারে না। প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, এ-সব মানুষের বলিষ্ঠ চরিত্র এবং পৌরুষের পূর্বাভাস। সম্প্রতি একটি বিলাতী পত্রিকায় 'হাতের নখের ভিন্ন ভিন্ন গঠনে কিভাবে মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়,' এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে, নখের বিস্তৃত গঠন লাজুকের পরিচয় দেয়। যাঁরা অপ্রশস্ত নখের অধিকারী, তাঁদের জীবনে বহু দুঃখ কষ্টের সম্ভাবনা দেখা যায়। যাঁদের নখ লম্বা, তাঁরা সাধারণত ভদ্র স্বভাবের অধিকারী হন; কিন্তু তাঁদের চলাফেরা সংশয়প্রবণ। তির্যক নখযুক্ত মানুষ বিশ্বাসঘাতক বলে পরিচিত। নখের আকার গোল হয় সেই সব লোকের যারা একগুঁয়ে, দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত এবং বদ্‌রাগী। নখ গোলাকার, কিন্তু ছোট, এ রকম হ'লে সাধারণত রুক্ষস্বভাব বুঝায়। স্বভাব রুক্ষ হ'লেও এই

(শেষাংশ ৬২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)